



কলকল

রচনা সমগ্র

জুলভার্ন ও তার সৃষ্টি

ফরাসী দেশের অন্ধ এক দ্বীপ নানতেস। সে দ্বীপে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি জন্ম জুলভার্নের। প্রাথমিক পাঠ নানতেসের প্রাইমারিতে। তারপর সর্বোচ্চ ডিগ্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। আইন পাশ করে হন আইনবিদ।

যোগ্যতা এবং ব্যবহারগুণে অল্পদিনেই আইন ব্যবসায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন, সেইসাথে অর্থও আয় করতে থাকেন।

কিন্তু জুলভার্ন তো অন্য দশ জন মানুষের মতো নন। বাঁধাধরা জীবন, অর্থের জন্য সত্যমিথ্যা নানা কৌশল ও অনর্থক কথা ব্যয় তাঁর ধাঁতে নয় না। এ যেন নিজের সঙ্গে নিজের ধ্বংস।

জুলভার্নের মন বিজ্ঞানীসুলভ। নতুন নতুন চিন্তায় তিনি ডুবে থাকেন। দুঃসাহসী সমুদ্র অভিযান সম্পর্কে জানার প্রবল আগ্রহ। বিজ্ঞান বিষয়ক বই আর বিজ্ঞান-আবিষ্কার সম্পর্কে অনেককিছু জানতে চান জুলভার্ন।

এই নিরলস সাধনা এবং প্রত্যয় তাকে বিজ্ঞানের কাল্পনিক জগতে নিয়ে যায়। অসম্ভব সব কল্পনার পাখায় ভর করে তিনি উড়ে চলেন বিজ্ঞানের বাস্তব আকাশে।

জাদুমাখা তাঁর কলম। কলমের নিব থেকে যা বেরোয় তাই হয়ে ওঠে সত্যের চেয়েও সত্য। কল্পনাভীত কল্পনার আশ্চর্য বাস্তব। আসলে, তাঁর সঙ্গে করাও কঠিন। সাফ কথায় বলবো—জুলভার্ন, জুলভার্নই। কল্পবিজ্ঞান কাহিনী বা সায়েন্স ফিকশনের তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বি লেখক। ঠিক, আর্থার কোনান ডয়েলের মতো। ডয়েল যেমন, গোয়েন্দা কাহিনীর একক সম্রাট। না, জুলভার্ন বিজ্ঞানী নন। কিন্তু, তিনি বিজ্ঞানীদের পথিকৃৎ—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শত বছরের আগের জুলভার্নের কল্পনায় যে বিজ্ঞান, কল্পনার কলমে এসেছে—পরবর্তীতে বাস্তব পৃথিবীতে সেই বিজ্ঞান আবিষ্কারটি সত্যে প্রমাণিত হয়েছে।

আজকের অনেক আবিষ্কার—জুলভার্নের কলমে অতীতে বর্ণিত হয়েছে। না, তিনি জাহাজে চড়ে শুধু সাত সাগর চষে বেড়ান নি। বিমানে চড়ে পৃথিবীর আয়তন মাপেন নি। বন-উপবন-অরণ্য-উপত্যকায় ছুটে বেড়ান নি জগতের অজানা তথ্য উৎখাতনে। তিনি যা করেছেন, যা লিখেছেন নিরিবিলা, নির্জনে নিজের ছোট্ট ঘরটিতে বসে। তিনি কল্পনার রথে চড়ে বেড়িয়েছেন। বাস্তবে নয়। অথচ কী অচিন্তনীয় শক্তি ছিল তার।

তাঁর 'মিস্টরিয়াস আইল্যান্ড'—অসাধারণ এই কল্পবিজ্ঞান গ্রন্থটি পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। এ কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র হয়েছে। সেই চলচ্চিত্র-সারাবিশ্বের টিভি দর্শকরা দেখে তন্ময় হয়েছেন, ঠিক বাস্তবেই যেন ঘটছে এমন মনে হয়েছে দর্শকদের।

টুয়েন্টি থাউজেন্ট লীগস আন্ডার দ্য সী। নোটিলাস, ব্লাক ডায়মন্ড, এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটটি ডেজ, জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ, ফাইভ ইউ'কস

ইন এ বেলুন দ্য ক্রিসেন্ট অব দ্য আইল্যান্ড ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন, রাউন্ড দ্য মুন, দ্য সিক্রেট অব দ্য আইল্যান্ড, দ্য স্টিম হাউস, এ ফ্লোটিং সিটি, অ্যাডভেঞ্চার্স অব ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস দ্য মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড, দ্য বেগমস ফরচুন, এক্সপেরিমেন্ট অব ডক্টর অক্স, দ্য পারচেজ অব দ্য নর্থ পোল-ইত্যাদি জুলভার্নের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি, জুলভার্ন বিজ্ঞানী না হয়েও অসাধারণ বিজ্ঞানী, অভিযাত্রী না হয়েও দুঃসাহসী অভিযাত্রী, গণিতবিদ না হয়েও নির্ভুল গণিত বিশ্লেষক, ভূগোলবিদ না হয়েও ভূগোল সম্পর্কে অসাধারণ জ্ঞান এবং মহাকাশচারী না হয়েও মহাকাশ সম্পর্কে অসাধারণ বিজ্ঞান ভিত্তিক তথ্যের পন্ডিত।

আসলে জুলভার্ন সবকিছুই তাঁর কল্পনার কলমে বলেছেন। সে কল্পনা-জীবনের সত্যগল্প হয়েছে, হয়েছে বিশ্বাস্য উপন্যাস।

শুধু কি ছোটরা! চুলপাকা, দাঁতপড়া বুড়ো দাদুটিও যখন তাঁর মিস্টিরিয়াস ডকুমেন্ট, ক্লীপার অব দ্য কাউন্স প্রপেলার আইল্যান্ড অথবা মাস্টার জ্যাকারিউস, দ্য স্কুল ফর রবিনসন্স, ফর দ্য ফ্যাগ, দ্য স্কীন ফ্ল্যাস, সিটি ইন দ্য সাহার-যেটাই পড়েন না কেন একেবারে অবাক হয়ে যাবেন। হারিয়ে যাবেন এক নতুন সত্য পৃথিবীতে।

প্রায় অর্ধশত কাহিনীর জনক জুলভার্ন। তাঁর বাবার স্বপ্ন-'ছেলে হবে নাম করা ধনাঢ্য আইন ব্যবসায়ী'; এই স্বপ্ন রাখতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু সেই স্বপ্নের চেয়েও বড় স্বপ্নকে তিনি জয় করেছেন। বাবার ইচ্ছেকে তিনি একেবারে পূরণ করেন নি এটা নয়, ঠিকই তিনি আইনবিদ হয়েছিলেন, কিন্তু সে জগত ছেড়ে তিনি আরো বড় জগতের রাজা হয়েছিলেন। সে জগতের নাম-কল্পবিজ্ঞানের অসীম-অশেষ মহাজগত।।

ফ্রাঙ্কের জুলভার্ন ৬৭ বছর বয়সে আমেরিকায় পাড়ি জমান। সেখানেই তাঁর সেরা সৃষ্টিগলি রচিত হয়। ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে তাঁর সমগ্র রচনা। তাঁর পর নানা দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে কল্পবিজ্ঞানের খুদে পাঠকদের হাতে পৌঁছে গেছে পৃথিবীর চারপাশে।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মার্চ। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসিয়েসয়ে এই আশ্চর্য মহাপ্রাণের প্রাণ প্রদীপ নিভে যায়। নিভে নি তাঁর সৃষ্টির আলোকরশ্মি। তা জ্বলছে এবং জ্বলবে।

বাংলাভাষা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি ভাষা। এই বাংলা ভাষাতেও জুলভার্ন আজ প্রকাশিত। তাঁর সৃষ্টিকর্ম ইতোমধ্যে বাঙালি অনুবাদকদের হাতে অনূদিত হয়েছে। কিন্তু, অনুবাদ ঠিক অবিকল জুলভার্নকে তুলে ধরতে পারেনি, সাহিত্য প্রবন্ধ বাদে-মানে কোনো মৌলিক সাহিত্যের প্রকৃত অনুবাদ হয় না। তবুও, কেউ কেউ চেষ্টা করেছেন-যতোটা সম্ভব অবিকল রাখা। বর্তমান সংকলনটি কতটুকু সফল হয়েছে তা সচেতন পাঠকদের কাছে বিচার্য।।

-ফারুক নওয়াজ

সূচিপত্র

টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি	৯
মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড	৪১
ব্ল্যাক ডায়মন্ডস	৭১
এরাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটটি ডেজ	১০১ X
জানি টু দি সেন্টার অব দি আর্থ	১২৩
দ্য লাইট হাউস এ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড	১৪১
মাইকেল ভক্ট গফ	১৫৮ X
অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস	১৭৪
ক্রিপার অব দি ক্লাউডস	২১১
সিক্রেট অব উইলহেম স্টোরিজ	২২৪
ভিলেজ ইন দি ট্রি টিপস	২৪৩
প্রপেলার আইল্যান্ড	২৫৫
কার্পেথিয়ান ক্যাসল	২৬৯ X
স্টিম হাউস	২৯৩
অ্যাড্রিফট ইন দ্য প্যাসিফিক	৩০৭
এ ফ্লোটিং সিটি	৩১৫
বেগমস ফরচুন	৩২১
ইটারন্যাল অ্যাডাম	৩৪১
ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন	৩৪৭
রাউন্ড দি মুন	৩৬১
ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন	৩৭৫
অফ অন এ কমেট	৩৯৩ X
দ্য পারচেজ অব দি নর্থ পোল	৪০১
মাস্টার অব দি ওয়ার্ল্ড	৪২১
দি গ্রিন ফ্লাশ	৪৫৩
এক্সপেরিমেন্ট অব ড. অক্স	৪৬৩
দ্য স্কুল ফর রবিনসন্স	৪৭৫
ইন টু দ্য নাইজার বেড	৪৮৫ X
সিটি ইন দি সাহারা	৫০৫
মাস্টার জ্যাকারিয়ুস	৫২৭
মিস্টিরিয়াস ডকুমেন্ট	৫৩৩
অন দি ট্রাক	৫৪১
দি সিক্রেট অব দি আয়ল্যান্ড	৫৪৭

টুয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি

আঠার শ ছেঘটি খ্রিস্টাব্দের কথা।

সেই সময় এমন একটা অভাবনীয় রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল যে-জন্য পৃথিবীর মানুষ আজো সে বছরটাকে মনের মধ্যে সযত্নে জাগরুক রেখেছে।

সে বছর এমন কী ঘটেছিল যে-জন্য বছরটা স্মরণীয় হয়ে রয়েছে? হ্যাঁ, ঘটনাটা সত্যই অকল্পনীয়, চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী, রীতিমতো রহস্যজনকই ছিল বটে।

কী ঘটেছিল যে-জন্য পৃথিবীবাসী আজো ঘটনাটাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে সযত্নে পোষণ করে চলেছে?

রহস্যজনক সে ঘটনাটা ছিল—উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের ওপর দিয়ে পথ পাড়ি দেবার সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং খালাসিরাই কেবল নয় যাত্রীরাও অতিকায় একটা প্রাণীকে জলের ওপর ভেসে থাকতে দেখেছে। আবার পর মুহূর্তেই চোখের পলকে তাকে যুবে যেতে দেখেও কম অবাধ হয় নি। বিচিত্র দর্শন অতিকায় প্রাণীটার শরীর লম্বাটে। তার সামনের দিকটা অনেকটা মোচার অগ্রভাগের মতো শঙ্কুর আকৃতিবিশিষ্ট।

সমুদ্রের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী সর্বাধিক আয়তনবিশিষ্ট প্রাণী তিমির চেয়েও অনেক অনেক বড় সে রহস্যজনক প্রাণীটা।

আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যজনক সে প্রাণীটার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সেটা ছিল খুবই দ্রুতগতিসম্পন্ন। পৃষ্ঠদেশ ছিল খুবই মসৃণ, একেবারে তেল চিকচিকে। আর গা দিয়ে অনবরত ফসফরাসের মতো অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্ক বের হত।

রহস্যসৃষ্টিকারী অতিকায় প্রাণীটা জনমানসে এতই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তথ্যসমৃদ্ধ রাশি রাশি চিঠি আসতে লাগল। তবে প্রতিটা চিঠির ভাষা ভিন্নতর হলেও তথ্যগুলি কিছু মোটামুটি একই ছিল। প্রতিটা চিঠিতেই অতিকায় ত্রাস সঞ্চারকারী সামুদ্রিক প্রাণীটার আকৃতি ও অবস্থাস্য গতিবেগের উল্লেখ ছিল।

ভুল? চোখের ভুল? তা-ই বা কীভাবে মনে নেয়া সম্ভব? দুই দশজনের ব্যাপার হলেও না হয় চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হত। কিন্তু এতগুলো চোখ সমুদ্রের বিভিন্ন প্রান্তে যাকে দেখেছে বলে দাবি করছে তাকে তো আর চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

সেদিনটা ছিল আঠার শ ছেঘটি খ্রিস্টাব্দের বিশ জুলাই। সেদিন দুপুরের কাছাকাছি 'ক্যালকাটা অ্যান্ড বার্নার স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির গভর্নর হিগনসন' নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসিরা বিচিত্রদর্শন গতিশীল বস্তুটাকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল থেকে মাইলপাঁচেক দূরবর্তী সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াতে দেখেছিল।

অনুসন্ধিৎসু নজরে কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে জাহাজটার ক্যাপ্টেন বেকার প্রথমে ভেবেছিলেন অতিকায় বস্তুটা নির্ধাৎ একটা বালিয়াড়ি। আর কিছুক্ষণ সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন সেটার পৃষ্ঠদেশ থেকে জলের ফোয়ারা তীব্র বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। জল প্রায় একশো পঞ্চাশ ফুট ওপরে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর মনে খটকা লাগল, তবে কি বালিয়াড়িটার কেন্দ্রস্থলে কোনো প্রস্রবণ রয়েছে? তাঁর এরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার পিছনে যুক্তিও ছিল যথেষ্টই। পৃথিবীর বড় বড় জীববিজ্ঞানীরা আজ পর্যন্ত এমন কোনো অতিকায় জীবের সন্ধান পান নি যার পিঠ থেকে গ্যাসমিশ্রিত জলরাশি সবগে আকাশের দিকে উখিত হয়ে থাকে।

তেইশে জুলাই ওয়েস্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড প্যাসিফিক স্টিম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ কলম্বাসের ক্যাপ্টেন প্রশান্ত মহাসাগরে একই দৃশ্যের মুখোমুখি হন। গভর্নর হিগনসন নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন বিশালায়তন ও বিচিত্রদর্শন সামুদ্রিক প্রাণীটাকে চাক্ষুস করার পর কলম্বাসের ক্যাপ্টেন সেটাকে দেখতে পান। জাহাজ দুটোর মধ্যে তখন স্থানগত ব্যবধান ছিল দুই হাজার চার শত পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি।

উপরোক্ত ঘটনাটার পর আরো পনের দিন পেরিয়ে গেল। পনের দিনের দিন পূর্ববর্ণিত সমুদ্রের এলাকা থেকে আরো পনের অন্তত দুই হাজার মাইল দূরবর্তী স্থানে পর পর দুটো জাহাজের ক্যাপ্টেন ও খালাসিরা অতিকায় ও বিশ্বয় সৃষ্টিকারী চলমান বস্তুটাকে চাক্ষুস করল।

জাহাজ দুটোর মধ্যে একটা ছিল 'হেলভেশিয়া' এবং দ্বিতীয়টা 'প্যাসন'।

'অ্যালিগেশিয়ান', 'উসপালিক' এবং 'কুলাম্পাক' প্রভৃতি দ্বীপগুলোই পৃথিবীর সর্বাধিক বিশালায়তন তিমির বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু তাদের কোনোটারই দৈর্ঘ্য ষাট ফুটের বেশি হয় না।

পেরো নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন আরও একটা বিশেষ ঘটনার দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তিনি জানালেন যে, ইনসান কোম্পানির 'অ্যাটনা' নামক জাহাজের সঙ্গে নাকি অতিকায় প্রাণীটার সংঘর্ষ হয়েছে।

আমেরিকা ও ইউরোপের অত্যাশ্চর্য অনুসন্ধানী ব্যক্তিরা ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন।

বাস, তখনকার মতো এ পর্যন্তই। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর রহস্য সঞ্চারকারী দৈত্যাকৃতি প্রাণীটার আর কোনো হাদিস মিলল না। তাই সঙ্গত কারণেই রহস্যজনক ঘটনার ব্যাপার মানুষের মন থেকে ক্রমে ধুয়ে মুছে যেতে লাগল।

প্রায় একটা বছর কেটে গেল।

আঠার শো সাতঘটি খ্রিস্টাব্দ। সে বছর গোড়ার দিকে সমুদ্রযাত্রীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যজনক দৈত্যাকৃতি প্রাণী আবার সমুদ্রের বুকে ভেসে উঠল। সেটা এতদিন কেবল জীববিজ্ঞানীদের কাছেই গভীর সমস্যার কারণ হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। এতদিন বার্লিনের 'জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউশান', ও 'রয়্যাল একাডেমি অব সায়েন্স', ওয়াশিংটনের 'স্মিথ সোনিয়াল ইনস্টিটিউশান' এবং 'ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশান' প্রতি প্রতিষ্ঠান উক্ত সমস্যাটার রহস্যভেদ করার চেষ্টায় ব্রতী ছিল। আর এখন? তাদের সঙ্গে যোগ দিল সমুদ্রযাত্রীদের আতঙ্ক আর হতাশা। তাদের কেউ অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটিকে ছোট্ট একটা দ্বীপ বলে প্রচার করল। আবার কেউ-বা এটাকে চলমান শিলা বলে মতামত ব্যক্ত করল। তারা এও বলল এ দ্বীপটা একটা অজ্ঞাত রহস্যের আধার।

আঠার শো সাতষট্টির পাঁচই মার্চ। সে তারিখের রাতে মন্ট্রিল ওশান কোম্পানির 'মোরোভিয়ান' নামক জাহাজটা দেখল ২৭.৩ অক্ষাংশ ও ৭১.১৫ দ্রাঘিমার মধ্যে বিশালায়তন একটা শিলা চলতে চলতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবচেয়ে আশ্চর্য হতে হল যখন জাহাজের চার্টে সে জায়গাটায় শিলাখণ্ডের খোঁজ করতে গিয়ে হতাশ হতে হল। শিলাখণ্ডের নামগন্ধও সেখানে আছে বলে বোঝা গেল না।

বরাত ভালো যে, 'মোরোভিয়ান' নামক জাহাজটা অতিকায় ও বিশেষ শক্তিশালী ছিল। নইলে সাঁইক্রিশ জন যাত্রীসহ তার সলিল সমাধি ঘটে যেত। জাহাজের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘটনার রহস্যভেদ করতে দারুণভাবে হতাশ হলেন।

উপরোক্ত ঘটনার সপ্তা তিনেক বাদে এক বিকালে, তিনটে সতের মিনিটে এমন ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে যার ফলে মানুষের আতঙ্ক দ্বিগুণ বেড়ে যায়। জাহাজটা হঠাৎ খুব জোরে দুলে ওঠে। ভয়ঙ্কর সে ধাক্কা।

না, ধাক্কাটা যে অবশ্যই স্কোরশিয়া মারে নি, এব্যাপারে কারো মনেই এতটুকু দ্বিধার সঞ্চার হয় নি। সবাই দৃঢ় মতবাদ প্রচার করল, দ্রুতগামী সুতীক্ষ্ণ কোনো অতিকায় বস্তুর দ্বারা ঘটনাটা ঘটেছিল।

প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটাকে মেরামত করতে গিয়ে কর্মীরা দেখল, তার তলদেশটা অস্বাভাবিকরকম দুমড়ে মুচড়ে একসার হয়ে গেছে।

স্কোরশিয়া জাহাজটার গঠনপ্রণালী অন্যসব সাধারণ জাহাজের তুলনায় একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। তার নিচের তলাটা সাতটা পৃথক পৃথক কক্ষের সমন্বয়ে গঠিত। ক্যাপ্টেন দ্রুত নিচের তলায় গিয়ে লক্ষ করলেন, পাঁচ নম্বর কক্ষের এক জায়গায় একটা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। আর সেখান দিয়ে জল ভেতরে ঢুকে আসছে। বরাত ভালো যে বয়লার ও ইঞ্জিন ওই কক্ষে ছিল না। যদি থাকত তবে আর দেখতে হত না।

ক্যাপ্টেন কোনোক্রমে জাহাজটাকে নিয়ে তিন শো মাইল দূরবর্তী কেপ ক্রিয়ার বন্দরে নিয়ে ফেললেন। জাহাজের তলদেশে এত পুরু লোহার পাত ছিদ্র হয়ে গেছে দেখে সবাই ভাবলেন সুতীক্ষ্ণ কোনো অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া তো এরকম অবিস্বাস্য রকমভাবে ছিদ্র হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব নির্ধাৎ কঠিন কোনো না কোনো সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে সজোরে স্কোরশিয়ার তলদেশে আঘাত হানা হয়েছে। ব্যাপারটা চারদিকে প্রচারি হতে দেরি হল না। ব্যস, সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে ভয়ানক আতঙ্কের সঞ্চার হল। তবে? তবে কেন এমন অবিস্বাস্য কাণ্ড ঘটল। এবার থেকে সমুদ্রে কোনো জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হলেই সঙ্গত কারণেই অতিকায় ওই সামুদ্রিক প্রাণীটার ওপরই যাবতীয় দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতে লাগল।

রহস্যজনক অতিকায় প্রাণীটার আতঙ্কের মধ্য দিয়ে সমুদ্রযাত্রীরা যখন দিন কাটাচ্ছিল আমি তখন সবে আমেরিকার দুর্গম নেব্রাস্কা অঞ্চল থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ মিটিয়ে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসেছি। এর-ওর মুখে বিশালায়তন ওই প্রাণীটা এবং সমুদ্রযাত্রীদের আতঙ্কের ব্যাপার-স্বাপার শুনে আমিও কম অস্থির হয়ে পড়িনি। সত্য বলতে কি, ব্যাপারটা আমাকেও রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল, বুকে রহস্যের সঞ্চার করল। আর সামুদ্রিকপ্রাণীটার অস্তিত্বের ব্যাপার আমার মধ্যে সামান্যতম দ্বিধাও রইল না।

আমি নিউইয়র্কে থাকাকালীন শুনেছিলাম, সেটা কোনো ভাসমান দ্বীপ বা বালিয়াড়ি ছাড়া কিছু নয়। সেটা যদি নেহাৎই কোনো চড়া হয় তবে তার ভেতরে কোনো শক্তিশালী যন্ত্র বসানো রয়েছে যার দ্বারা খুবই দ্রুতগতিতে স্থানান্তরে গমন করতে সক্ষম হয়। আর কারো কারো মধ্যে দূরকম ভাবনার উদয় হল—হয় সেটা কোনো সাবমেরিন নতুবা অমিত শক্তির কোনো না কোনো অতিকায় জলজপ্রাণী। তবে সাবমেরিনের যুক্তিটা টিকল না। বিভিন্ন দেশে খবরাখবর নেয়ার পরে সবাই জানাল তাদের কারোই সাবমেরিন নেই।

রহস্যটার পিছনে যে কোনো কারণই থাক না কেন আটলান্টিক মহাসাগরের উভয় তীরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা মারাত্মক সমস্যা আর বিপদসঙ্কুল হয়ে দাঁড়াল। আর এরই জন্য সব দেশকেই অপূরণীয় লোকসানের বোঝা বহিতে হল।

আমি যখন ফরাসিদেশে অবস্থান করছিলাম তখন 'সাবমেরিনের রহস্য' নাম দিয়ে দুখণ্ডের একটা বই লিখে বিশ্বসমাজে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলাম। তাই নিউ ইয়র্কে পা দিতে না দিতেই অনেকেই অত্যাশ্চর্য হল প্রসঙ্গটা নিয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।

গোড়াতে আমি সতর্কতার সঙ্গে ব্যাপারটা সম্বন্ধে উদাসীন থাকলেও পরিস্থিতির চাপে পড়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে মুখ না খুলে পারলাম না। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত হ্যারল্ড পত্রিকা ও প্যারিস মিউজিয়ামের অধ্যাপক অ্যারোনোজ আমাকে অনুরোধ করে বসল।

হেরল্ড পত্রিকার ত্রিশে এপ্রিল সংখ্যায় ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার সূচিক্রিত ও সারগর্ভ বক্তব্য সফলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। তাতে আমি ব্যক্ত করলাম, অতিকায় কোনো জলজ প্রাণী সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করছে। সমুদ্রের গভীরে, বারো কি পনের মাইল জলের তলায় কোন কোন সামুদ্রিক প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি বহির্ভূত। আর তাদের জৈবিক ক্রিয়া সম্বন্ধেও আমরা একেবারেই অজ্ঞ। ব্যাপারটা দুঃসাহ্য্যও বটে। সমস্যা থেকে উত্তরানোর উপযোগী ও নির্ভরযোগ্য যে কয়টা সূত্র পাওয়া গেছে তা থেকে কেবল অনুমান করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখন জিজ্ঞাস্য যে, আমাদের গ্রহের যাবতীয় প্রাণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় রয়েছে কি না? সবার আগে আমাদের খোঁজ নিতে হবে মৎস্যবিজ্ঞানের বহির্ভূত কোনো জলচর প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে কি না। যদি পাওয়াই যায় তবে মেনে নিতেই হবে সেটা

সমুদ্রের তলদেশে বসবাসকারী কোনো একটা অজ্ঞাত প্রাণী। আর কখনো সখনো খেয়ালবশত সমুদ্রের উপরিতলে ভুস করে ভেসে ওঠে ও ভেসে বেড়ায়। নইলে অতিকায় দাঁতযুক্ত দৈত্যাকৃতি কোনো ভিমে। এরা খুব বড় হলে ষাটফুট মতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট হয়। যদি তাদের কারো আকার পাঁচ থেকে দশগুণ বেড়ে যায় তবে এমন দৈত্যাকৃতি অমিত শক্তির অধিকারী আবারও একটা সামুদ্রিক প্রাণী আমাদের নজরে পড়বে।

অতিকায় দাঁত দুটোকে ভিমিরা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। জাহাজের গায়ে তাদের দাঁত গেঁথে থাকতে দেখা গেছে। এমন ঘটনার বহু নজির রয়েছে। পনের ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট আক্রমণাত্মক, একটা মারাত্মক অস্ত্র প্যারিসের চিকিৎসা বিভাগের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হচ্ছে।

পত্রিকার পাতায় আমার প্রবন্ধটা ছাপা হওয়া-মাত্র সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করল। সকলে আতঙ্কে শিউরে উঠল। বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোও কম ভাবিত হয়ে পড়ে নি। তবে নৌ-বিমার পরিমাণ বৃদ্ধি করার নোটিশ দেয়া হল।

আমেরিকার উপকূলবর্তী সমুদ্রবক্ষ থেকে জমাটবাঁধা আতঙ্কের অবসান ঘটাতে বিশালায়তন জাহাজ আব্রাহাম লিন্কনের ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হবে মনস্থ করা হল।

দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজটাকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে তুলতে সাধ্যমতো ব্যবস্থা নেওয়া হল।

আশ্চর্য ব্যাপার! আব্রাহাম লিন্কন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার পর আর রহস্য ও আতঙ্কসৃষ্টিকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটার টিকির নাগালও পাওয়া গেল না। হতচ্ছাড়া প্রাণীটা হঠাৎ পা-ঢাকা দেওয়ার ফলে আমাদের দুমাসের উদ্যোগ আয়োজন ব্যথা গেল।

আব্রাহাম লিন্কন যাত্রা করার ঠিক তিনঘন্টা পরে লেখা একটা চিঠি আমার হাতে এল। নৌ-বিভাগের সেক্রেটারি জে. বি. হবসন চিঠিটার লেখক। চিঠিতে তিনি আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন, আমি আব্রাহাম লিন্কনের দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ আনন্দিত হবে।

চিঠিটা হাতে পাওয়ার পর আমি ব্যাপারটা নিয়ে বিশেষ কৌতূহলী ও আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লাম। এর আগে এটা নিয়ে আমার সামান্যতম আগ্রহও ছিল না।

আমার বয়স তখন বছর চল্লিশেক। আর আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী ও গৃহভৃত্য কনসিলকে সঙ্গে নিতে ভুললাম না। তার বয়স মাত্র ত্রিশের কাছাকাছি। এর আগে কল্লো ও চীন প্রভৃতি দেশে যখনই গেছি তখন ওর বুদ্ধি পরামর্শ আমার কাজের বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এবার আমার অভিযান অবশ্য স্বতন্ত্র ধরনের। আমার প্রস্তাব শোনার পরই সে সোৎসাহে যাত্রার প্রস্তুতি নেয়ার কাজে মেতে গেল।

জাহাজঘাটে আমাদের স্বাগত জানাতে ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট জাহাজের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি মুচকি হেসে আমাকে স্বাগত সন্মিলন জানিয়ে আমার জন্য রক্ষিত সুসজ্জিত ক্যাবিনে আমাকে নিয়ে গেলেন।

বিশালায়তন জাহাজটা সভ্যই উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন। ঘন্টায় প্রায় আঠার মাইল বেগে ছুটতে পারে। তবে দ্রুতগতিসম্পন্ন সামুদ্রিক প্রাণীটার তুলনায় এর গতিবেগ খুবই নগণ্য।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডটা খালিসিদের জাহাজের নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন।

বিশালায়তন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিন্কন সমুদ্র তোলপাড় করে দ্রুত এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। জাহাজের গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট প্রবীণ ব্যক্তি। জাহাজ চালনার ব্যাপারে তার জুড়ি পাওয়া ভার। তার দৃঢ় বিশ্বাস, সমুদ্রের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীই সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে চলেছে। এর বিরুদ্ধে মন্তব্যকারীদের তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না। আর তাঁর মনে এ আশঙ্কাও রয়েছে অতিকায় সে প্রাণীটাকে ধরতে গিয়ে তাদের বিপদাপন্ন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। যাই ঘটুক না কেন তাকে তিনি যে করেই হোক ধরবেনই। জাহাজের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে কেউ কেউ অতিকায় জন্তুটাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য শক্তিশালী দূরবীন চোখে লাগিয়ে সমুদ্র বক্ষের ওপরে চঞ্চল চোখের মণিগুলোকে বারবার ঘোরাতে লাগল। এর কারণও রয়েছে যথেষ্টই। জাহাজের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছিলেন, যে সবার আগে রহস্য সঞ্চারকারী অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীটাকে দেখতে পাবে তাকে পুরস্কারস্বরূপ দুই হাজার ডলার দেবেন। তাই তো জাহাজের অনেকেই দূরবীন চোখে লাগিয়ে বাঙ্কিত সে প্রাণীটাকে খুঁজে বের করার তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। তবে খুবই সত্য বটে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী গৃহভৃত্য কনসিলের মধ্যে সামুদ্রিক প্রাণীটা সম্বন্ধে সামান্যতম উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষিত হয় নি।

একটা কথা আগেই বলে রাখা উচিত ছিল। ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট দেশের সেরা ভিমি শিকারি, হারপুন ছোড়ার অদ্বিতীয় বীর নেডকে জাহাজে, আমাদের সঙ্গী হিসেবে নিয়েছিলেন। এবারেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়, স্বীকার করতেই হয়। তার ছোঁড়া হারপুনের আঘাত অগ্রাহ্য করে পাড় পেতে পারে এমন কোনো ভিমি আছে বলে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

অতিকায়, অমিত শক্তিশালী ও দ্রুত গতিবেগ সম্পন্ন জাহাজ 'আব্রাহাম লিন্কন' প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তিন সপ্তাহ কাটিয়ে দিয়েছে।

এক বিকেলে জাহাজের ডেকের ওপরে নেডকে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। একথা সেকথার পর আমি তাকে বললাম—'নেড, একটা কথা, বিশালায়তন ওই ভিমিটার ব্যাপারে তোমার মতামত কী, খোলসা করে বলো তো?'

সে মুচকি হেসে আমার প্রশ্নের জবাবে বলল—'প্রফেসর, অন্ধের পক্ষে পৃথিবীর সবকিছু অকপটে মেনে নেওয়া খুবই সহজ বটে। কিন্তু ভূতত্ববিদ এবং জ্যোতির্বিদদের পক্ষে ভূতপ্রেত বা প্রেতাত্মার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কি সহজ, আপনিই বলুন? আমি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে ভিমি শিকার করতে গিয়ে বিভিন্ন সব আভিজ্ঞতা আমার কোলায় সঞ্চার করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোনো নিদর্শন আমি পাই নি যে, ভিমির দাঁতে জাহাজের খোল ফুটো হওয়া তো দূরের ব্যাপার, জাহাজের গায়ে সামান্য আঁচড় লেগেছে।

নেড কোনো যুক্তিতেই এমন ভয়ঙ্কর ও অমিত শক্তির কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীর অস্তিত্বের কথা মেনে নিতে উৎসাহী হল না। মোক্ষা কথা, তাকে কিছুতেই স্বীকার করানো গেল না।

আমি আমতা আমতা করে তবুও বললাম, 'সমুদ্রের অতল গহ্বরে বসবাসকারী অতিকায় কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীর অস্তিত্ব যদি স্বীকার করাই হয় তবে সে যে অমিত শক্তির অধিকারী হবেই, আশ্চর্য কি? তার শারীরিক গঠনও অবিশ্বাস্য বৈচিত্র্য থাকা অসম্ভবই বা কী?'

'আমি তবুও বলব, তার শারীরিক গঠন বৈচিত্র্যময় হওয়ার সম্ভব কারণই বা কি থাকতে পারে প্রফেসর?'

'এর সম্ভব কারণও রয়েছে। সমুদ্রে অতল গহ্বরে, অত্যন্ত গভীরে জলের চাপ প্রবল। সেখানে সে চাপ অমিত শক্তির কোনো প্রাণী ছাড়া কারো পক্ষে বরদাস্ত করাই তো সম্ভব নয়। জলজ প্রাণীদের জলের তলায় কী স্বাভাবিক চাপ সহ্য করে টিকে থাকতে হয়, বলছি শোন—যদি তুমি কোনোক্রমে জলের বত্রিশ ফুট গভীরে যাও তবে তোমার দেহকে, প্রতিবর্ণ ইক্ষিতে পনের পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হবে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যাবে, প্রায় দুমাইল গভীরে প্রতি বর্গ ইঞ্চির জন্য পাঁচ হাজার দশ পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হবে। তোমার এ দেহটা কত ইঞ্চি জায়গা দখল করতে পারে তা হয়ত তোমার অজানা। বলছি শোনো, প্রায় দুই হাজার পাঁচ শ' ইঞ্চি। প্রতি ইঞ্চিতে যদি পনের পাউন্ড চাপ প্রয়োগ হয় তবে হিসাব করলে দেখা যাবে তোমার দেহটা মোট সাতানব্বই হাজার পাঁচ শ' পাউন্ড চাপ সহ্য করার ক্ষমতা ধারণ করেছে।

আর একটা ব্যাপার হচ্ছে, তোমার দেহের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখে বিপরীত দিকের বাতাসের চাপ। আরো আছে উর্ধ্বচাপ এবং নিম্নচাপ আমাদের শরীরের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার মূলে অবস্থান করে।

নেড-এর মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে এবার মুখ খুলল—'হ্যাঁ, এতদক্ষেপে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল।'

'তবে আমরা বুঝতে পারলাম, বত্রিশ ফুট জলের গভীরে তোমার দেহ সাতানব্বই হাজার পাঁচ শ' পাউন্ড আর তিন শ' কুড়ি ফুট গভীরে তার প্রায় দশগুণ হবে। আবার বত্রিশ হাজার ফুট গভীর জলে তোমার দেহ প্রায় সাতানব্বই কোটি পাউন্ড পাউন্ড ওজন বহন করবে।'

'আরে অবাক ব্যাপার! এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড!' কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে নেড বলে উঠল।

'নেড, এবার তুমিই ভেবে দেখ, কয়েক শ' গজ দৈর্ঘ্য ও সে অনুপাতে প্রস্থবিশিষ্ট একটা প্রাণী যখন জলের তলায় অবস্থান করে তখন কতখানি চাপ তাকে সহ্য করতে হয়। তার দেহের ওপর সে সহজেই কয়েক কোটি পাউন্ড চাপ বহন করে। এখন তুমিই ভেবে দেখ, যে প্রাণীটা এমন অবিশ্বাস্য চাপ সহ্য করতে সক্ষম সে কেমন অমিত শক্তির অধিকারী। আর তার শরীরের যন্ত্রতন্ত্র কতখানি শক্তিশালী! ঠিক এমনই অতিকায় এবং অমিত শক্তির সামুদ্রিক প্রাণী যে স্কোরশিয়া জাহাজের তলদেশে ফুটে করে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ত্রিশে জুন। এর আগে পর্যন্ত লক্ষণীয় কোন ঘটনার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়নি। ত্রিশ তারিখেই আমরা কয়েকটা আমেরিকান তিন শিকারী জাহাজ দেখতে পেলাম। তাদের মধ্যে একটা জাহাজের নাম 'মনরো'। মনরোর ক্যাপ্টেনের অনুরোধে আমাদের জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট, নেডকে অনুমতি দিলেন সে জাহাজে গিয়ে হারপুন ছুঁড়ে তিমি বধ করে দিয়ে আসার জন্য।

বীর নেড হারপুন ছুঁড়ে দুটো তিমি ঘায়েল করে ফিরে এল। অব্যর্থ বটে তার লক্ষ্য।

সাতই জুলাই। সেদিন আমাদের জাহাজ 'অব্রাহাম লিন্কন' উত্তাল-উদ্দাম প্রশান্ত মহাসাগরের পড়ল।

জাহাজের কর্মীদের অনুসন্ধিসূ সজাগ দৃষ্টি সমুদ্রের বুকে অস্থিরভাবে ঘুরপাক খেতে লাগল। সবার চোখে-মুখেই অত্যাশ্চর্য আশ্চর্যের প্রলেপ। আসলে পুরস্কারের লোভই তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে কাজ করছে।

দুর্বীর গতিতে পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের পঞ্জীরাজ 'অব্রাহাম লিন্কন' কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করে ম্যাকুইস এবং স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি হাজির হল। বিশালকায় সামুদ্রিকপ্রাণীটাকে সবাই এ অঞ্চলেই দেখতে পেয়েছিল।

আমাদের জাহাজটা উদ্ধার বেগে জাপান ও আমেরিকার উপকূলে ছুটোছুটি করে বেড়াল রহস্য ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিশালায়তন প্রাণীটার সন্ধানে। ভয়ে ঘী ঢালাই সার হল।

আমাদের জাহাজ অব্রাহাম লিন্কন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তিন তিনটে মাস অনবরত চক্রের মেরে বেড়াল।

দিনের পর দিন ব্যর্থপ্রয়াস চালিয়ে আমাদের জাহাজের কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ল। যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে সবাই জাহাজে উঠেছিল আজ তা প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি ভাঙবেন কিন্তু মচকাবার পাত্র নন। তিনি একটু নরম হলেই হতাশায় জর্জরিত জাহাজের কর্মীরা এতদক্ষেপে প্রত্যাবর্তনমুখী থাকত।

দিনের পর দিন ব্যর্থতা আর হতাশায় জর্জরিত হয়ে জাহাজের কর্মীরা অনন্যোপায় হয়ে জোটবোঁধে ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজায় হাজির হল। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে স্বদেশের অভিমুখে যাওয়ার জন্য বেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর কাছে তাদের ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল।

ক্যাপ্টেন তার অধঃস্তন কর্মীদের কাছ থেকে তিনদিনের সময় চাইলেন। এর মধ্যে যদি বহু আকাজিক্ত সামুদ্রিক প্রাণীটার দেখা না পাওয়া যায় তবে তিনি অবশ্যই তাদের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

জাহাজের কর্মীরা এবার নতুন উদ্যমে অতিকায় তিমিটাকে গভীর জল থেকে ওপরে তুলে আনার জন্য চমৎকার একটা ফন্দি বের করল। তারা একের পর এক শুয়োরের মাংসের টুকরো উত্তাল উদ্দাম সফেন সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল।

হায় কপাল, জাহাজের কর্মীদের ফেলা শুয়োরের মাংস দিয়ে হাঙরের ভোজ চলতে লাগল।

নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর হাহাকারের মধ্য দিয়ে জাহারের কর্মীদের চোঁটা নভেম্বরের রাত্রি কাটল। পূর্ব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠল। পাঁচই নভেম্বরের ভোর। সেদিন বেলা বারোটা বাজলেই ক্যান্টেনের নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাবে।

যাত্রীদের মনে অফুরন্ত আনন্দের জোয়ার। আর মাত্র ঘণ্টা ছয় বাদেই জাহাজের মুখ ঘোরানো হবে। উল্কা বেগে স্বদেশের দিকে বিশালায়তন জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন ধরতে হবে।

আব্রাহাম লিঙ্কন এখন জাপান দ্বীপপুঞ্জ থেকে দুশো মাইল ভেতরের দিকে অবস্থান করছে।

ঘড়িতে তখন আটটার কাছাকাছি বাজে। আমি জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে সমুদ্রের ওপর নজর রেখে চলছি। আমার ব্যক্তিগত ভৃত্য কনসিল আমার প্রায় গায়েবে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের জলরাশির ওপর ব্যস্ত চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে চলেছে।

জাহাজের ক্যান্টেন আমাদের থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে দূরবীণ। অত্যাশ্র অত্থের সঙ্গে সমুদ্রের ওপর নজর রেখে চলেছেন।

আমরা যখন অনুসন্ধিৎ দৃষ্টিতে সমুদ্রের বুকে বাঙ্কিত সে বিশালায়তন সামুদ্রিকপ্রাণীটার খোঁজ করে চলছি ঠিক তখনই হারপুনবির নেড-এর আর্তস্বর কানে এল—‘ওই—ওই যে দেখুন! ওই দিকে—ওই দেখুন! আমরা উল্কাগতির মতো যার খোঁজ করে বেড়াচ্ছি—ওই যে সে! ওই যে—ওই দেখুন!’

নেড-এর আর্তস্বর জাহাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ফলে জাহাজের ক্যান্টেন থেকে শুরু করে খালাসি পর্যন্ত সবাই হটোপাটা করে ডেকের ওপর উঠে এল। এমন কি ইঞ্জিনিয়ার ও স্ট্রোকরারও তাদের দায়িত্বপূর্ণ কাজ ফেলে হস্তদত্ত হয়ে ডেকের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

আমার মনেও সন্দেহ দানা বাঁধল, নেড কি তবে সত্যি কিছু দেখেছে? ফলে আমার পক্ষে উত্তেজনা এড়িয়ে দূরে থাকা সম্ভব হল না। আমি ভিড় ঠেলে নেড-এর কাছে হাজির হয়ে দেখি, সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ক্যান্টেনকে কী যেন দেখাচ্ছে।

আমি নেড-এর অঙ্গুলি নির্দেশিত পথে দৃষ্টিপাত করামাত্র সচকিত হয়ে ঝাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ একে তাকিয়ে রইলাম জাহাজ থেকে মাত্র দু রশি দূরবর্তী স্থান অত্যাঙ্কল আলোকরশ্মি চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভাবনীয় সে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপার দেখে আমার হৃদপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

প্রথম দর্শনে আমি ধরেই নিয়েছিলাম, সেটা ফসফরাসের আলো ছাড়া কিছু নয়। পর মুহূর্তেই আমার মনের ধন্দ ঘুচল। অতিকায় একটা দানব ভূস করে জলের তলা থেকে ভেসে উঠেছে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। চোখের পাতা ফেলতে না ফেলতে রহস্যময় দানবটা অত্যাঙ্কল আলোকরশ্মিসহ আবার জলের তলায় গাঢ়াকা দিল। ব্যস, একেবারে নিশ্চিহ্ন।

আমি পূর্বস্মৃতি মন্থন করতে লাগলাম। হ্যাঁ, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন জাহাজের নাবিকদের মুখ থেকে অত্যাঙ্কল আলোকটার যে বর্ণনা শুনেছিলাম এর সঙ্গে সামান্যতম বৈসাদৃশ্য তো নেই-ই বরং পুরোপুরি সাদৃশ্য রয়েছে। আর আলোটা অনবরত নড়ছিলও বটে।

রহস্য সঞ্চারকারী আলোটা দেখামাত্র এমনিতেই জাহাজের সবার আশ্রয়মাঝে ঝাড়াছাড়া হবার জোগাড় হয়েছিল। তার ওপর যখন দেখা গেল সেটা আবার অতর্কিতে ভেসে উঠে আমাদের জাহাজটার দিকে এগিয়ে আসছে তখন জাহাজময় গগনবিদারী আতঁনাত শুরু হয়ে গেল। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় সবাই কাঁঠ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

ইঞ্জিনিয়ার ক্যান্টেনের লুকুম তামিল করতে গিয়ে ঝট করে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে সাধ্যমত দ্রুত গতিতে জাহাজ ছুটিয়ে দিলেন। না, এতেও নিশ্চিতি পাওয়ার উপায় দেখা গেল না। রহস্যজনক আলোটা যেন অলৌকিক গতিতে, আমাদের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত গতিতে, আমাদের জাহাজের দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

অত্যাকর্ষ আলোটার কাণ্ড দেখে জাহাজের খালাসিরা তো চোখ বন্ধ করে ভগবানের নাম করতে লাগল। অজানা আতঙ্কে শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাবার মত ব্যাপারই বটে। আসলে বহুটা সঙ্কল্পে আমাদের সামান্যতমও ধারণা না থাকার জন্যই আমরা অকস্মাৎ মুম্বড়ে পড়েছিলাম।

অজ্ঞাত আলোটা আমাদের জাহাজটাকে বার কয়েক চক্রের মেরে একসময় আরো অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। দ্রুতগতিতে আমাদের জাহাজটা থেকে দুতিন মাইল দূরে সরে গেল। পরমুহূর্তেই আবার ফুসফুসকাঁপানো শব্দ করে উঠল উল্কা বেগে ছুটে এসে আমাদের জাহাজটা থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরবর্তী স্থানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ব্যস, একেবারে নিশ্চল নিখর।

জাহাজের সবাই ধরেই নিল কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের জাহাজটার সঙ্গে রহস্যময় আলোর আধারটার সংঘর্ষ বেঁধে যাবে।

কাঁপা কাঁপা গলায় ক্যান্টেন কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন—‘অতিকায় প্রাণীটা সঙ্কল্পে কোনো ধারণা করতে না পারায় কোনোরকম ঝুঁকি নিতে উৎসাহ পাচ্চিনে। সবচেয়ে বড় কথা তার স্বভাবচরিত্র, বিশেষ করে আক্রমণ পদ্ধতিও আমাদের বিন্দুমাত্রও জানা নেই।’

‘আমার বিশ্বাস, এটা বিশালায়তন একটা দাঁতাল তিমি। আপনার কি অন্যরকম কোনো ধারণা—’

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যান্টেন আবার বলতে শুরু করলেন, ‘অবশ্য না। বরং এ ব্যাপারে আমি শতকরা একশো ভাগ নিঃসন্দেহ।’

‘সঙ্গে টর্পেডো না থাকলে এমন বিশালায়তন ও ভয়ঙ্কর একটা তিমির সঙ্গে সমুদ্রসমরে অবতীর্ণ হওয়ার চিন্তা পাপলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।’

‘আপনার ধারণাই অপ্রাচ্য। আর তাই যদি সত্য হয় তবে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম তিমি হিসেবে দাবি করতে পারে। আর সবচেয়ে ভয়ঙ্করও বটে।’

আমরা জাহাজের সবাই নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সারাটা রাত্রি নিরুন্ম অবস্থায় কাটিয়ে দিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আতঙ্ক সৃষ্টিকারী রহস্যময় প্রাণীটা সমুদ্রের জলে গা-ঢাকা দিয়ে দিল।

তখন একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। অকস্মাৎ সুতীব্র একটা ছইসেলের আওয়াজ শোনা গেল।

অভিজ্ঞ তিমি-শিকারি হারপুনবির নেড বার-কয়েক এদিক ওদিক নজর ফিরিয়ে ক্যান্টেনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘স্যার, এর আগে আমি বহুবার তিমির গর্জন শুনেছি বটে, কিন্তু এমন বুক-কাঁপানো গর্জন তো কোনোদিনই শুনি নি! ইস, আমি হারপুনের আওতায় যদি একটা বারের জন্য পেতাম, মজা কাকে বলে হতচ্ছাড়া তিমিটাকে টের পাইয়ে দিতাম।’

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুটোর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। রাত্রি প্রায় দুটো বাজতে চলেছে। আবার রহস্যজনক অত্যাঙ্ক আলোকরশ্মিটা অতর্কিতে সমুদ্রের বুকে ভুস করে জেগে উঠল।

আমাদের জাহাজ থেকে আলোটার দূরত্ব অনুমান করা সম্ভব হচ্ছিল না।

কেন? কেন রহস্যসম্পন্নকারী অতিকায় প্রাণীটা বারবার এমন করে জলের ওপর ভেসে উঠছে, আর কেনই বা কয়েক মুহূর্ত পরে আবার জলের তলায় গাঢ়া দিচ্ছে? হয়ত বা নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য সেটা বারবার ভেসে উঠছে। এর সপক্ষে যুক্তিও রয়েছে। তার শ্বাসক্রিয়া চালাবার ফাঁস ফাঁস আওয়াজ পর্যন্ত বাতাসে ভেসে আমাদের কানে পৌঁছচ্ছিল।

লড়াই। হ্যাঁ, অতিকায় সামুদ্রিকপ্রাণীটার সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেই হবে। মাছধরা বিশালায়তন ও মজবুত জাল সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেয়া হল। হারপুন ছোঁড়ার বন্দুকগুলোকে এনে হাতের কাছে জড়ো করা হল। সেগুলো থেকে এক মাইল দূরবর্তী স্থান পর্যন্ত হারপুন ছোঁড়া যায়। কিছুসংখ্যক গাদা বন্দুকও জাহাজের গুদাম থেকে বের করে এনে একধারে রাখা হল।

তখন ঘড়িতে আটটা বাজে। বিশালায়তন সামুদ্রিকপ্রাণীটা তখন আমাদের জাহাজটা থেকে মাইল দেড়েক দূরে পিঠ ভানিয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছে। তার গায়ের রঙ কালচে। আর আক্কেশে জলের ওপর বারবার এত জোরে হিংস্র সামুদ্রিকপ্রাণীটা আঘাত হানছিল যার ফলে কেবল জল তোলাপাড়ই হচ্ছিল না, রীতিমতো ঘূর্ণিও সৃষ্টি হচ্ছিল।

আমাদের জাহাজ আব্রাহাম লিন্কন সেটার দিকে ধীরমন্তর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

আমি অতিকায় প্রাণীটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, হেলভেটিয়া আর শ্যামনের ক্যান্টেন ও জাহাজের কর্মীরা রহস্যজনক অতিকায় প্রাণীটার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আসলের সঙ্গে বেশকিছু পরিমাণে খাদ মিশিয়ে পরিবেশন করেছে। আমি কিন্তু নিশ্চিত সেটা লন্ড্রয় ত্রিশ ফুটের বেশি কিছুতেই হবে না।

আরে বাস! অকস্মাৎ বিশালদেহী প্রাণীটার পিঠের ছিদ্র দিয়ে প্রায় দুশো কুড়ি ফুট ওপরে জল উঠে গেল। সেটা ঠিক যেন একটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ফোয়ারা।

ক্যান্টেনের কেবিনে ইঞ্জিনিয়ারের তলব পড়ল। ক্যান্টেন তাঁকে বললেন—‘আপনি তৈরি হয়ে নিয়েছেন তো? বয়লারে যথেষ্ট বাষ্প সঞ্চিত আছে তো?’

ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ‘বাষ্প যথেষ্টই সঞ্চিত।’

‘তবে জাহাজটাকে সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে দিন।’

ক্যান্টেনের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার সাধ্যমতো দ্রুতগতিতে আব্রাহাম লিন্কন ছুটিয়ে নিয়ে চললেন। প্রায় পৌন এক ঘণ্টা ছুটোছুটি করে সেটা সামুদ্রিক প্রাণীটাকে ধরার জন্য দাপাদাপি করল। কিছুতেই সেটাকে দুশো গজের মধ্যে আনা সম্ভব হল না।

নেড হারপুন হাতে সুযোগের সন্ধানে রইল। কিন্তু সে যেই হাতের হারপুনটাকে ছুঁড়তে যাবে অমনি সেটা আগের চেয়ে দ্রুতগতিতে হারপুনের আওতার বাইরে চলে গেল।

এবার ক্যান্টেনের নির্দেশে কামান দাগা হল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! কামানের গোলাটা জলুটার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। চেষ্টা ব্যর্থ হল।

ক্যান্টেন ঘোষণা করলেন, ‘জলুটার গায়ে যে আঘাত হানতে পারবে তাকে নগদ পাঁচ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।’

এক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ গোলন্দাজ এবার জলুটাকে লক্ষ করে কামান দাগল। হ্যাঁ, কাজ হয়েছে। কামানের গোলাটা তার গায়ে লাগল।

আমাদের জাহাজ তীব্রতর গতিতে জলুটার দিকে ধেয়ে চলল। আমাদের জাহাজ ধ্বংস না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই হতচ্ছাড়া জলুটাকে নিস্তার দিচ্ছি নে।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, অনবরত ছুটোছুটি দাপাদাপি করে করে জলচর প্রাণীটা একসময় কাহিল হয়ে রণে ভঙ্গ দেবে, হয়রান হয়ে এলিয়ে পড়বে। ব্যস, আমরা কাজ হাসিল করে ফেলতে পারব।

কিন্তু সেটা আমাদের অবাক করে, ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের বুকে দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

একসময় সমুদ্রের বুকে সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমার ফুসফুস নিঃশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আপন মনে বলে উঠলাম, ‘হায়! তবে কি সব শেষ। আমাদের লক্ষ্যবস্তু কি এ পর্যন্তই? অতিকায় হিংস্র জলচরটার দেখা কি আর পাওয়াই যাবে না?’

না, যা আশঙ্কা করেছিলাম তা নয়। রাত্রি এগারোটায়ে আবার সমুদ্রের বেশ কিছুটা অংশ হঠাৎ অতৃষ্ণ আলোকচ্ছটায় বলমলিয়ে উঠল।

আমি ঘাড় ঘুড়িয়ে তাকালাম। দাঁতাল ভয়ঙ্কর সে তিমিটাকে এক জায়গায় নিশ্চল নিখরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন হঠাৎ হাতে আসা সুযোগটাকে কাজে লাগাবার জন্য ডেকের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

অব্রাহাম লিঙ্কন নিঃশব্দে, সাধ্যমত চুপিসারে ভয়ঙ্কর দাঁতাল তিমিটার দিকে গুটিগুটি এগোতে লাগল।

দুর্ধর্ষ তিমি শিকারি নেড হারপুন হাতে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে।

জাহাজ আর সামুদ্রিক দানবটার মধ্যে ব্যবধান কমতে কমতে মাত্র কুড়ি ফুটে দাঁড়িয়েছে। ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে অস্থিরচিত্ত নেড শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দিল হাতের হারপুনটাকে ছুঁড়ে।

বিকট একটা আওয়াজ বাতাসবাহিত হয়ে আমাদের কানে এসে পৌঁছাল। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। হারপুনটা তীরবেগে ছুটে গিয়ে হিংস্র সামুদ্রিক দানবটার গায়ে আঘাত হানল। আরে, কী অদ্ভুত ব্যাপার! দানবটার গায়ে হারপুনের আঘাত লাগামাত্র অতৃষ্ণ আলোটা দুম করে নিভে গেল। আর মুহূর্তের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ দুটো সুউচ্চ জলস্তম্ভ সবেগে ওপরের দিকে উঠে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশালায়তন জাহাজটা মোচার খোলার মতো অনবরত দোল খেতে লাগল। চোখের পলকে মাছুলের দড়িগুলি গেল ছিঁড়ে। আর আমরা, জাহাজের লোকজন শোলার পুতুলের মতো যে যেদিকে পারলাম ছিটকে আছাড় খেয়ে পড়লাম উন্মত্ত সমুদ্রের বুকে। আমি? কয়েকবার শূন্য চক্রের মেরে বেসামাল হয়ে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ামাত্র প্রচণ্ড বেগে জলের প্রায় কুড়ি ফুট নিচে চলে গেলাম। পিতৃপুরুষের বরাতের জোরে প্রাণে বেঁচে গেলাম। সাঁতারে দক্ষ না হলে আমার গতি যে কী হত স্বয়ং ঈশ্বরও হয়ত জানতেন না।

প্রাণরক্ষার তাগিদে উত্তাল উদ্‌ম সমুদ্রের সঙ্গে উদ্ভ্রান্তের মতো আমি লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলাম।

প্রাণের মায়ায় অনবরত হাতপা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভাবতে লাগলাম, আমি যে অসহায়ভাবে সমুদ্রের বুকে ছিটকে পড়েছি তা আমার জাহাজের সঙ্গীরা দেখেছে কি? আমাকে উদ্ধারের জন্য নৌকা পাঠাবে কি? আমার প্রাণ রক্ষা হবে কি? আমি বাঁচব? বাঁচার কোনো সম্ভাবনা রয়েছে কি?

একসময় আবহা অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে একটু একটু করে নজরের আড়ালে চলে যেতে দেখলাম। চোখে বারবার নোনা জলের ঝাপটা লাগায় ভালো দেখতে পাচ্ছিলাম না বটে, তবে সেটা যে আমার প্রাণরক্ষার একমাত্র সম্ভব অব্রাহাম লিঙ্কনের তা বুঝতে ভুল হল না। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, তাই বার বার সাধ্যমত গলা ছেড়ে চিৎকার ছুড়ে দিলাম, ‘বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! আমি সমুদ্রে—সমুদ্রে পড়ে গেছি! এই যে, এখানে আমি। কে আছে, বাঁচাও!’

কে, কার কথা শোনে? কে, কাকে বাঁচাবে? প্রাণের তাগিদে আমি ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের বুকে অসহায়ভাবে হাতপা ছুঁড়েই চললাম।

হায় ঈশ্বর! অব্রাহাম লিঙ্কন তবে আমাকে সমুদ্রের বুকে নির্মমভাবে নির্বাসন দিয়ে চলেই গেল। জাহাজটার সঙ্গে চিরদিনের মতো সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল।

আচমকা আমার জামা ধরে কে যেন টান দিল। চমকে উঠলাম। ধরেই নিলাম, জীবন সংশয়। নির্ঘাৎ কোনো হিংস্র সামুদ্রিকপ্রাণীর খপ্পড়ে পড়েছি। হাতপা শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে ঘাড় ঘোরালাম। ব্যাপার দেখে আরো চমকে উঠলাম। দেখি, আমার একেবারে গা-ঘেষে কনসিল সাঁতার কেটে চলেছে। সে বলল, ‘স্যার, আমার কাঁধে ভর দিন। দেখবেন, সাঁতারকাটা অনেকটা সহজ হবে।’

‘কিন্তু তুমি? তুমিও কি জাহাজ থেকে ছিটকে—’

‘না স্যার, আপনাকে জাহাজ থেকে ছিটকে জলে পড়ে যেতে দেখেই আমি জলে ঝাঁপ দিই।’

কনসিল, আমার অনেকদিনের ভূতা, একান্ত পার্শ্বচর কনসিলের কৃতজ্ঞতায় আনন্দে আমার প্রাণটা নেচে উঠল।

আমি কনসিলের কাঁধে ভর রেখে কোনোরকমে পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করার জন্য সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই অব্যাহত রাখলাম।

চাঁদের আলোয় প্রায় মাইল পাঁচেক দূরে আমাদের অব্রাহাম লিঙ্কনকে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যেতে লাগল।

এতক্ষণ মরিয়া হয়ে ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মৃত্যুদূত ভয়ঙ্কর সে সামুদ্রিক দানব তিমিটার কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল। হঠাৎ তার স্মৃতি বুকে ভেসে উঠল। ব্যস, আতঙ্কে হাত পা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

আচমকা কোনো একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শে চমকে উঠলাম। মনে হল, কে যেন আমাকে ধরে টানটানি করছে।

পারলাম না। আর নিজের মনকে শক্ত রাখতে পারলাম না। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।

যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখি, আমার একদিকে ভূত্য কনসিল আর অন্য দিকে অন্য আর একটা ভেজা কাপসা মুখ, উভয়ে ধরাধরি করে আমাকে কোনোরকমে চাঙা করে রেখেছে। অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে চমকে না উঠে পারলাম না।

আমার বিশ্বয়ের ব্যাপারটা অনুমান করে সে বলে উঠল, ‘স্যার, আমি নেড। আমি জাহাজ থেকে ছিটকে জলে না পড়ে ভাসমান ঝাঁপটার ওপর আছাড় খেয়ে পড়েছিলাম। না, ঝাঁপ নয়, বরং অতিকায় ভয়ঙ্কর তিমিটার ওপর পড়েছিলাম।’

একটু দম নিয়ে সে আবার বলতে শুরু করল, ‘স্যার, আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমার ছোঁড়া হারপুনের ফলাটা একেবারে ভোঁতা—দুমুড়ে মুচড়ে একসার হয়ে গেছে। তার দেহটা শক্ত পুরু লোহার চাদরে মোড়া না হলে তো এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিছুতেই সম্ভব নয়।’

আর কিছুক্ষণ লড়াই চালাবার পর আমরা তিনজন কোনোরকমে রহস্যজনক ঝাঁপটার ওপরে উঠে গেলাম। ভাবলাম, ক্রান্তে যাই থাকুক না কেন, কিছু সময় বিশ্রাম করে স্বস্তিতে একটু দম তো অন্তত নিয়ে নেয়া যাক।

বুঝলাম, যে বস্তুটার ওপর বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম তার দেহের অর্দ্ধাংশ জলের নিচে তলিয়ে রয়েছে। বার-কয়েক পদাঘাত করে বিশ্রিত না হয়ে পারলাম না, যত বড় সামুদ্রিকপ্রাণীই হোক না কেন তার পিঠটা এমন অস্বাভাবিক কঠিন কী করে হতে পারে? হায় ঈশ্বর! এ যে লোহাকেও হার মানাবে!

নেড তার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'স্যার, সামুদ্রিকপ্রাণী না হয়ে, স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীভুক্ত না হয়ে সরীসৃপ গোষ্ঠীর কোনো প্রাণী হলেও তবু না হয়ে বিশ্বাসযোগ্য হত। কুমীর বা কচ্ছপ হলেও কিছুটা বিশ্বাস করা যেত। আবার গিরগিটি বা সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর পিঠই বা এমন মসৃণ কী করে হতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা, হারপুনটা আঘাত করা যাত যে গম্ভীর আঘাতের উদ্ভব হয়েছিল তাতে আমার ধারণা একেবারে বদলে গেছে—'

আমি সচকিত হয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'সে কী নেড, বলছ কি হে! পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের বিদ্বজ্জন রহস্যজনক সামুদ্রিকপ্রাণীটিকে কেন্দ্র করে হৈ চৈ বাঁধিয়েছে—আর তুমি কি না কোটি কোটি মানুষের ধারণাকে নস্যাৎ করে দিচ্ছ! তুমি বলতে চাইছ, এটা আদৌ কোনো প্রাণী নয়! মানুষের সৃষ্ট অত্যাশ্চর্য কোন বস্তু এটা!'

হারপুনবীর নেড এবং আমার ভৃত্য কনসিলের দৃঢ় বিশ্বাস, এটা ইশ্পাতের তৈরি অতিকায় কোন মাছ বা সে জাতীয়ই কিছু একটা।

চোখের পলকে বিশালায়তন বস্তুটা আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড শুরু করল। তার পিঠের এক জায়গা থেকে জল বেরোতে লাগল। এবার রহস্যসৃষ্টিকারী বস্তুটা একটু একটু করে এগোতে শুরু করল।

কী বিচিত্র কাণ্ডের বাবা! বিশালায়তন বস্তুটার ভেতর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। খুবই ক্ষীণচাপা কণ্ঠস্বর। ব্যাপার দেখে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। বুকের ভেতরে টিবিটবানি শুরু হয়ে গেল। আর শরীর ক্রমেই শিথিল হয়ে আসতে লাগল। এমন একটা ভয়ঙ্কর রহস্যজনক ঘটনার মুখোমুখি কোনোদিন হতে হবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

উৎকর্ষ হয়ে নিঃসন্দেহে হবার চেষ্টা করলাম, আদৌ সেটা মানুষের কণ্ঠস্বর, নাকি আতঙ্কগ্রস্ত মনের ধ্বংস।

না, মনের ভুল নয়। মানুষের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

ভোরের হাঙ্কা আলা সমুদ্রের বুকে উঁকি দিতেই আমি সাহসে ভর করে উদ্ভূত রহস্যটা ভেদ করার জন্য প্রয়াসী হলাম। জন্ম যখন হয়েছে তখন আজ না হোক কাল মৃত্যু হবেই। তাই বলে এমন জমিটাবাধা আতঙ্কের মধ্যে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে যদি হঠাৎ করে প্রাণটা বেরিয়েই যায় আক্ষপের কীই বা থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আমার ধারণাই অস্বাভাবিক; মানুষের কণ্ঠস্বরই বটে। পর মুহূর্তেই ডুবোজাহাজটার ভেতর থেকে দুম করে একটা শব্দ ভেসে এল। লোহার ঢাকনাটা খুলে কে যেন বাইরে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমাদের দেখে বিকট আতঙ্কিত হয়ে আবার সশব্দে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দরজাটা দুম করে খুলে গেল। ভেতর থেকে আটজন যগমার্কী মুখোশধারী লোক নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল। তেমন নিঃশব্দে আমাদের বন্দি করে ভেতরে নিয়ে গেল।

আমি নিঃসন্দেহে হলাম, জলদস্যুদের ডুবোজাহাজ এটা। অত্যাধুনিক কায়দায় সমুদ্রের বুকে লুণ্ঠরাজ্য করছে।

নেড সত্যিই অকুতোভয়! প্রাণের মায়া তার নেই। ভয়ডর কাকে বলে সত্যি তার জানা নেই। নইলে এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কেউ মুখ খোলে, গলা ছেড়ে প্রতিবাদ করতে উৎসাহী হয়? নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে কঁকড়ে যাওয়া আমি ও কনসিল সাধ্যমতো থামিয়ে তাকে সতর্ক করে, সামলে সুমলে রাখার চেষ্টা করলাম।

অন্ধকার একটা কামরায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। চারদিকে কোনো দরজা জানালা আছে বলে মনে হল না। অকস্মাৎ অত্যুজ্জ্বল আলোকছটায় কামরাটা ঝলমলিয়ে উঠল। এবার নিঃসন্দেহ হলাম, এ আলোই সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের এবং সমুদ্রযাত্রীদের মধ্যে রহস্যের সঞ্চার করত।

আমাদের কামরাটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে যগমার্কী মুখোশধারীরা তেমন নীরবে চলে গেল। কামরাটার ভেতরে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ ছিল না।

আচমকা সশব্দে একটা দরজা খুলে গেল। দুজন লোক নীরবে কামরার ভেতরে ঢুকে এল। তাদের একজন বেঁটে, গাট্টাগোটা। আর দ্বিতীয়জন অপেক্ষাকৃত লম্বা।

কামরার ভেতরে ঢুকেই লোক দুটো অনুসন্ধিৎসু নজরে আমাদের তিনজনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল। দূর্বোধ্য ভাষায় অপেক্ষাকৃত লম্বা লোকটা তার সঙ্গীকে কী যেন বলল। এবার সে তেমন দূর্বোধ্য ভাষাতেই আমাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল।

আমি অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'ক্ষমা করবেন, আমি ফরাসি ভাষা জানি না।'

তাদের ভাবখানা দেখে বুঝলাম, তারাও আমাদের কথা কিছুমাত্রও বুঝতে পারল না। ফলে আমাদের পরিস্থিতি যারপরনাই সঙ্কটজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি হাল ছাড়লাম না। কনসিলের পরামর্শে আমি আমাদের মর্যাদাসিক পরিস্থিতির কথা সবিস্তারে তাদের কাছে ব্যক্ত করলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত ফল যা হল, ভাষা যি চালা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার কথার একটা শব্দও তাদের হৃদয়ঙ্গম হল বলে মনে হল না। শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মুখ বুজে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে অদৃষ্ট সঞ্চল করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

লোক দুটো কয়েক মুহূর্ত নিজেদের মধ্যেই সেই দূর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলাবলি করল। চোখেমুখে দৃষ্টিভ্রান্ত হ্রাস ফুটিয়ে তুলে একসময় তারা কামরা ছেড়ে গেল। আমরা অজ্ঞাতপরিচয় রহস্যজনক লোকগুলোর হাতে বন্দি হলাম।

আমরা অসহায় দৃষ্টি মেলে একে অন্যের মুখের দিকে বারবার তাকাতে লাগলাম। একটু পরেই আবার সশব্দে

দরজাটা খুলে গেল। কিছু পোশাক পরিচ্ছদ নিয়ে এক ভৃত্য ঘরে ঢুকে এল। সেই ইশারায় আমাদের বুঝিয়ে দিলে পোশাক বদলে নাও।

পোশাকগুলো নতুন এক বিশেষ ধরনের তত্ত্ব দিয়ে তৈরি বুঝলাম।

আমরা পোশাক বদলানোর কাজ সারতে না সারতেই সে ভৃত্যটাই আবার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। এবার তার হাতে রয়েছে বিচিত্র সব খাদ্যবস্তু। খাবারের থালার মধ্যে যা-কিছু রয়েছে তাদের মধ্যে একটা বস্তুই আমাদের পরিচিত দেখতে পেলাম—কাঁটাচামচ।

থালি ও কাঁটাচামচের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা দেখলাম, 'মোবিলিস এন মোহিলি-এন'।

অক্ষরগুলো পড়ে অনুমান করলাম, 'এন' কোন একজনের নামের আদ্যক্ষর। আর 'এন' আদ্যক্ষরযুক্ত নামের কোনো এক ব্যক্তি এ ডুবোজাহাজটার মালিক বা প্রধান পদাধিকারী।

আহারাদি সেরে সবে চেয়ারে বসে একটু ঝিমিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি। ঠিক সে মুহূর্তেই মনে হল ডুবো জাহাজটা অল্প অল্প করে জলে তলিয়ে যাচ্ছে।

ডুবোজাহাজটার চারদিকে শক্ত কাচ দিয়ে ঘেরা। ভেতরে বসেই বাইরের দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। সেটা জলের নিচে যেতে যেতে একসময় বেশ গভীরে চলে গেল।

কাচের দেয়াল দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই আমার বুকের ভেতরে কেমন মোচড়া মুচড়ি শুরু হয়ে গেল। হাজার হাজার বিচিত্র চেহারাধারী সামুদ্রিকপ্রাণী আমাদের ডুবোজাহাজটার গায়ে চরম আক্রোশে ছুটে এসে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। কেউবা অবস্থিত বস্তুটাকে মোটেই বরদাশ্ত করতে না পেরে বিরাট গ্রীবা বিস্তার করে লম্বা লম্বা দাঁতে কাচের গায়ে সজোরে কামড় বসাতে ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে লাগল।

আমি চেয়ারটার গায়ে হেলান দিয়ে অথর্ব পঙ্গুর মতো বসে নিবিষ্ট মনে ভাবতে লাগলাম, 'ডুবোজাহাজটা কোন শক্তিবলে চালিত হচ্ছে? কোন প্রক্রিয়াতেই বা স্বাস্থ্যকর্মের একান্ত অপরিহার্য অস্ত্রিজন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে? আর কেনই বা এটা একটু পর পর ভুস করে জলের উপরিভাগে ভেসে ওঠে? এমন বহু টুকরো টুকরো চিন্তা আমার মাথায় ভিড় করতে লাগল।

একসময় আকস্মিক তর্জন গর্জনে আমি সচকিত হয়ে ঘাড় ঘোরলাম। ব্যাপার দেখে রীতিমতো চমকে উঠলাম। দেখি ইতোমধ্যে কে একজন ঘরে ঢুকেছে। অন্য কোনো ভূত্য হবে হয়তো। নেড তাকে দেখেই উন্মাদের মতো তার ঘাড়ো লাফিয়ে পড়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে।

আমি ও কনসিল ব্যস্ত হয়ে নেডকে নিরস্ত করার জন্য এগিয়ে যেতেই পিছন দিক থেকে ভেসে আসা এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসতে থমকে গেলাম, 'নেড ক্ষান্ত হও। ওকে ছেড়ে দাও।'

এবার আগন্তুক আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'অধ্যাপক অ্যারোনাস্স, আপনাকে কটা কথা বলার জন্য এসেছি। অনুগ্রহ করে আমার বক্তব্য শুনুন—

ইংরাজি, ল্যাটিন, ফরাসি ও জার্মান চারটে ভাষাই আমার রপ্ত রয়েছে। অতএব আশা করি অনুমান করতে পারছেন, আমি অনেক আগেই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করতে আসতে পারতাম। কিন্তু আসি নি কেন, জানেন? আসলে আগে আপনাদের ভালভাবে জানতে, বুঝতে সময় নিয়েছি। আর আশা করি এও অনুমান করতে পারছেন, আপনাদের সব পরিচয়ই আমার নখদর্পণে। আপনি প্যারিস মিউজিয়ামের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক অ্যারোনাস্স। আর ইনি আপনার পারিবারিক ভৃত্য কনসিল। আর উনি আমেরিকান জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কন-এর তিমিশিকারি হারপুনবীর নেড—নেড ল্যান্ড—ঠিক বলি নি?'

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে আগন্তুক এবার বললেন, 'একসময় আমি সভ্যসমাজ থেকে বহু দূরে সমুদ্রের বুকে নিরিবিদলী জীবনযাপন করছিলাম। আপনারা এসে আমার সে শান্তি কেড়ে নেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন, আমাকে যারপরনাই অস্থির করে তুললেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'কথাটা অবশ্যই মিথ্যা নয়। তবে এটুকু অন্তত জানবেন, নিতান্ত হীনশ্রুতভাবেই—'

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'কী? অনিশ্চিতভাবে? সে কী! আব্রাহাম লিঙ্কনকে নিয়ে আপনারা যে রকম হন্যে হয়ে আমাকে রোজ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতেন তা কি নেহাতই অনিশ্চয়, আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? আর নেড যে হারপুন হুঁড়ে আমার ডুবোজাহাজটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল তাও কি অনিশ্চিতেই? আর আপনাদের হোঁড়া কামানের গোলাটা যে আমার ডুবোজাহাজটার গায়ে আছড়ে পেড়েছিল তাও কি আপনাদের অনিশ্চিতেই বলতে চাইছেন?'

দম নিয়ে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে গিয়ে বললাম, 'আপনার ডুবোজাহাজটা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যে রহস্য ও আতঙ্কের সম্ভার করেছিল তা নিরসনের জন্যই আমরা সে কাজে উৎসাহী হয়েছিলাম। আসলে এটা যে একটা ডুবোজাহাজ তা আবিষ্কারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল আমরা কোনো একটা অতিকায় সামুদ্রিকপ্রাণীর পিছনে ছুটে বেড়াছি। আর একটা কথা হয়তো আপনার জানা নেই, এ ডুবোজাহাজটাকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে যে কী গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে তা আপনাকে ভাষায় বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, যদি বুঝতে পারতেন এটা একটা ডুবোজাহাজ, মোটেই সামুদ্রিকপ্রাণী নয় তবে কি আমাকে নিস্তার দিতেন, বলুন? এবার আশা করি মেনে নিচ্ছেন, আমরা যে আপনাদের শত্রুজ্ঞান করছি তার যথেষ্ট সঙ্গত ধারণ রয়েছে। তাই আপনাদের প্রতি শিষ্ট আচরণ করতে আমি মোটেই বাধ্য নই। আমি চাইলে আপনাদের জলে ডুবিয়ে মারতেও কিছুমাত্র—'

‘সে কী! এ যে রীতিমত পাষণ্ডের কাজ জনাব! এ যে সভ্যতা বহির্ভূত বর্বরের মত কাজ!’

‘সভ্যতা? সভ্য মানুষ বলতে আপনাদের যা কিছু বিশ্বাস, যাদের সভ্য ভাবেন তারা কিন্তু আসলে মোটেই সভ্য নয়। বিশেষ ব্যক্তিগত কোন কারণে আমি আজ মনুষ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন করতে বাধ্য হয়েছি। আর সে কারণেই আমি সমাজে প্রচলিত নিধিনিষেধ মানতে আগ্রহী নই—বাধ্যও অবশ্যই নই। আপনাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি অধ্যাপক, ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে এ প্রসঙ্গে কিছু বলার চেষ্টা করবেন না। এটা আমার অনুরোধ এবং আদেশ দুই মনে করতে পারেন।’

দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে ভদ্রলোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ‘আপনারা এখানে এসেই যখন পড়েছেন তখন এখানেই থাকবেন। তবে একটা শর্ত—এখানে বহুদিন আপনাদের বন্দি জীবনযাপন করতে হবে। আর মনে রাখবেন, আমি বল প্রয়োগ করে কাউকে দিয়ে কিছু করতে আগ্রহী নই। আমার হুকুম তামিল করবেন, কথা রইল। তবে হ্যাঁ, জাহাজের সর্বত্র আপনাদের যাওয়ার অনুমতি রইল। কিন্তু কোনোক্রমে জাহাজ ছেড়ে যেতে পারবেন না। তবে এটুকু আপনাদের বলতে পারি, আপনাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কষ্টকে আমার ডুবোজাহাজ অবশ্যই ভুলিয়ে দিতে সক্ষম। বুঝতেই পারছেন, আমি যে-জন্য পৃথিবীবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্না করেছি, আপনাদের ছেড়ে দিলে আমাকে সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হবে।’

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হতাশা সুরে বললাম, ‘অনুগ্রহ করে আপনার নামটা বলবেন কি?’

‘আমাকে আপনারা ক্যাপ্টেন নিমো বলেই সম্বোধন করবেন। আমার এ ডুবোজাহাজটার নাম ‘নোটিলাস।’

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কামরা ছেড়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন নিমো আবার আমাদের কামরায় ফিরে এলেন। আমাদের সঙ্গে তার প্রিয় নোটিলাসকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন। সবার আগে তাঁর সুসজ্জিত গ্রন্থাগারটা দেখালেন। সেলফে স্তরে স্তরে বহুমূল্যবান বই সাজানো দেখলাম। ঘরের কেন্দ্রস্থলে একটা টেবিলে কয়েকটা সংবাদপত্র, সাময়িকী আর কাগজপত্র সাজানো গোছানো। সমুদ্রের তলদেশে এমন মূল্যবান গ্রন্থসমৃদ্ধ একটা গ্রন্থাগার দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

আমার বিশ্বয়টুকু অনুধাবন করে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন, ‘অধ্যাপক অ্যারোনাল্ড, এখানে বিভিন্ন ভাষা ও বিষয়ের ওপর লেখা বারো হাজার বই রয়েছে। পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্না করতে পারলেও একমাত্র পার্থিব বস্তু বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্না করতে পারিনি। বরং এদের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহই বোধ করি। আপনাকে বলে রাখছি অধ্যাপক, আপনি নির্দিষ্টায় এসব বই ব্যবহার করতে পারেন।’

ক্যাপ্টেন নিমো আবার আমাদের নিয়ে বেশ বড়সড় একটা ঘরে হাজির হলেন। ধূমপান গৃহ।

ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে তাঁর মুখোমুখি একটা সোফায় বসালেন। একটা চুরুট আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ‘নিন চুরুট খান। হাভানা থেকে সংগ্রহ করা নয়। এক বিশেষ জাতের সামুদ্রিক উদ্ভিদের পাতা থেকে তৈরি।’

আমি কৌতূহলবশত চুরুটে আগ্নি সংযোগ করে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলাম—‘বাঃ চমৎকার তো! সামুদ্রিক উদ্ভিদের পাতা থেকে এমন চুরুট যে তৈরি করা সম্ভব, ভাবাই যায় না!’

ধূমপান সেরে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে দুশ্রাব্য শিল্পদ্রব্য ও প্রকৃতিবিদ্যার সামগ্রীকে সুসজ্জিত একটা কামরায় নিয়ে গেলেন। রীতিমতো একটা যাদুঘর।

এক সময় ক্যাপ্টেন নিমো একটা রেকাবির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, ‘অধ্যাপক, এসব যুক্তো আর বিনুক আমি নিজে হাতে সমুদ্রের তলদেশ থেকে সংগ্রহ করেছি। আমি গবেষণা করিনি এমন কোন সমুদ্রই নেই।’

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে পায়ে পায়ে সুসজ্জিত একটা কামরায় হাজির হলেন। চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরটার মেঝেতে পা দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘অধ্যাপক, একটা আপনার থাকার ঘর। আশা করি তেমন কোনো অসুবিধা হবে না, কী বলেন? আপনার পাশেরটাই আমার মাথা পোঁজার জায়গা।’

আমাকে চেয়ার বসতে বলে তিনি নিজে অন্য একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, ‘অধ্যাপক, আমার ঘরটা একবারটি ঘুরে দেখে আসবেন নাকি?’

‘অবশ্যই। আপনি কীভাবে এখানে ডুবোজাহাজে বাস করছেন তা দেখার কৌতূহল থাকাটাই তো স্বাভাবিক।’

ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের নিয়ে একটা বড়সড় কামরায় হাজির হলেন। দেয়ালের গায়ের একটা সেলফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘অধ্যাপক, এদের এ ডুবোজাহাজ নোটিলাসকে চালাতে ব্যবহার করতে হয়। এদের ব্যবহারের মাধ্যমে আমি নোটিলাসের অবস্থান নির্ণয় করতে পারি। নোটিলাস কোন পথে, কোনদিকে যাচ্ছে, তাও নির্ণয় করতে পারি এদের ব্যবহারের মাধ্যমেই। যেমন মনে করুন, এ থার্মোমিটারটার সাহায্যে তাপমাত্রা নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আর এর নাম ব্যারোমিটার। আবহাওয়ার পূর্বাভাস আর বায়ুর ওজন নির্ণয়ে এটাকে ব্যবহার করি। আর এ হাইড্রোমিটারটা ব্যবহার করে আবহাওয়ার শুষ্কতা অনুমান করা যায়। এটা স্ট্রয় গ্রাস। আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেত জানিয়ে এটা ডুবোজাহাজটাকে চালানোর কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে দ্রাঘিমাংশ হিসাবে করার সহায়ক কম্পাসটা আর ক্রনোমিটার। আর এ কাচগুলোর কাজ ডুবোজাহাজটা কোথায় ডেসে উঠল তা বুঝতে সাহায্য করা। আর মনোমিটারটাকে ব্যবহার করি জলের গভীরতা নির্ণয় করতে। ফলে আমি ডুবোজাহাজটাকে নির্বিঘ্নে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আর একটা হচ্ছে—বিদ্যুৎ যা ডুবোজাহাজটার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলা যেতে পারে।’

আমি কপালের চামড়ায় বিষয়ের ছাপ ঝঁক বলে উঠলাম—‘বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ মানে—’

আমাকে এখাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ—হ্যাঁ, বিদ্যুৎ। তবে হ্যাঁ, আমি যে বিদ্যুৎ শক্তি এতে ব্যবহার করি তা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। আপনার অবশ্যই জানা আছে, প্রতি একহাজার গ্রাম সমুদ্রের জলে শতকরা ৯৬^২/৩ ভাগ জল, ৩^২/৩ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সামান্য ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড বর্তমান। তাই বুঝতেই পারছেন, এতে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ খুব কম নয়। সমুদ্রজলের সোডিয়াম ক্লোরাইড

ব্যবহারের মাধ্যমে আমি বিদ্যুৎ তৈরি করি। আমার এ ডুবোজাহাজ নোটিলাসের প্রাণশক্তিই তো এ-বিদ্যুৎ। এ ব্যবহার করেছে তো আমি এটাকে চালনা করি। আর পাই আলো।'

আমি কপালের চামড়ায় বিশ্বয়ের ভাঁজ কটা বজায় রেখেই বললাম, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আর একটা জিনিস, স্বাস্থ্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তা সংগ্রহ করেন কীভাবে?'

'হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে বাতাস তৈরি করার ক্ষমতাও আমার আছে। কিন্তু তার আর দরকার হয় না। কারণ, আমি তো যখন তখন নোটিলাসকে জলের ওপর ভাসাতে পারি। আর একটা ব্যাপার, এই যে ঘড়িটা রয়েছে এও বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যেই চলছে। বিদ্যুৎতের আর একটা অবিশ্বাস ক্ষমতা দেখুন, এর ডায়ালটা নোটিলাসের গতির পরিমাণ নির্দেশ করে। এদিকে লক্ষ করুন, আমাদের ডুবোজাহাজটা এখন পনের মাইল গতিবেগে এগিয়ে চলেছে।'

ক্যাপ্টেন নিমো এবার দরজার বাইরের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'লোহার সিঁড়িটার ওপরে নৌকাটাকে দেখতে পাচ্ছেন? এর গঠন বৈচিত্র্য যেমন দৃষ্টিনন্দন হাক্কাও ঠিক তেমনই। এটায় চেপে বেড়ানো আর মাছ ধরা হয়। জাহাজের গায়ে আর একটা নৌকা খুলানো রয়েছে যার গঠন প্রণালীরও আকর্ষণীয়। সবচেয়ে বড় কথা, এক ফোঁটা জলও এতে ঢুকতে পারে না। কি, বৈচিত্র্যের অধিকারী, তাই না?'

*

*

*

এক বিকেলে ক্যাপ্টেন নিমো আর আমি মুখোমুখি খোস মেজাজে ধূমপান করছি। তিনি দাঁত দিয়ে চুরুটটাকে চেপে ধরে নোটিলাসের নকশাটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। এর গায়ে নোটিলাস-এর গঠনপ্রণালী স্পষ্টভাবে আঁকা রয়েছে। রক্তাটার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'আমার ডুবোজাহাজ নোটিলাসের গঠন অনেকটা চুরুটের মতো। এটার দৈর্ঘ্য ২৩২ ফুট আর প্রস্থ ২৬ ফুট। এর মোট আয়তন ১৯১১ মিটার ৪৫ সেন্টিমিটার। আর ওজন? ১৫০০ টন।

চুরুটটাকে ঠোঁট থেকে নামিয়ে এবার বললেন, 'এর মূল কাঠামোটা দুটো অংশে বিভক্ত। অংশ দুটো ইংরেজি 'টি' আকৃতিবিশিষ্ট একটা শক্ত লোহার সাহায্যে জুড়ে দেয়া আছে। এদের প্রথম অংশটা আড়াই ইঞ্চি পুরু আর ওজন তিন শ' চুয়ানব্বই টন। আর দ্বিতীয়টার উচ্চতা কুড়ি ইঞ্চি, আর পুরু দশ ইঞ্চি। এর ওজন বাষট্টি টন। ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মিলে মোট ওজন নয় লক্ষ দুই হাজার একশো বাষট্টি টন। জলে ভাসমান অবস্থায় নোটিলাসের এক দশমাংশ জলের ওপরে ভেসে থাকে। জাহাজটাকে জলের ওপরে ভাসিয়ে রাখার জন্য এর একভাগের সমপরিমাণ জল ধরে রাখার জন্য যদি আমি জলাধার ব্যবহার করতাম তবে এ পরিস্থিতিতে জাহাজের ওজন দাঁড়াতে এক হাজার পাঁচশো সাত টন। এবার তবে অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন, এ-পরিস্থিতিতে জাহাজটা তলিয়ে যেত। নোটিলাসের গঠনপ্রণালী একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এর জলের জলাধারগুলো জাহাজের তলদেশে রক্ষিত আছে। জলাধারগুলোতে জল ভরতে শুরু করামাত্র জাহাজটা ক্রমে ডুবতে শুরু করবে। এ সময়ে নোটিলাসকে প্রতি ইঞ্চিতে পনের পাউন্ড পরিমাণ জলের চাপ সহিতে হয়।'

একটু থেমে দম নিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো আবার বলতে শুরু করলেন, 'অধ্যাপক, একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে, সবকিছুর মধ্যেই জলে ডুবে যাবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বর্তমান। নোটিলাসকে জলের তলায় ডুবিয়ে রাখতে হলে কতখানি চাপের প্রয়োজন তার হিসাব করতে গিয়ে লক্ষ রাখি, জলের উচ্চচাপ গভীরতা অনুযায়ী কতটা কমছে।'

আমি চুরুটের শেষাংশটুকু ঠোঁট থেকে নামিয়ে নিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, ব্যাপারটা তবে দাঁড়াল, আপনার নোটিলাসকে একহাজার গজ জলের তলদেশে একশো স্তরের জলের চাপ সহিতে হয়। কি বলেন? জল নির্গমণের মাধ্যমে নোটিলাসকে ভাসিয়ে রাখার যে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাই যদি হয় তবে তো পাশ্চাত্যলোকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার পাঁচশো পাউন্ড চাপ সহ্য করতে হয়। এ শক্তি সংগ্রহের উপায় কী?'

'বিদ্যুৎ, শক্তি বিদ্যুৎই জোগায়। তার ওপর আমার ইঞ্জিনও অমিত শক্তিদর।'

'আর একটা প্রশ্ন—কোথায় বসে আপনি এ কঠিনতম কাজটা সম্পন্ন করেছিলেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?'

'অধ্যাপক, আপনি শুনলে হয়ত-বা অবাকই হবেন, সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ এক দ্বীপে আমার কারখানাটা গড়ে তুলেছিলাম। কয়েকজন অসীম সাহসী সহকর্মীকে নিয়ে আমি এমন একটা কঠিন কাজ সম্পন্ন করি। কাজ মিটে যাওয়ার পর দ্বীপে অগ্নি সংযোগ করে আমার কাজের চিহ্ন নষ্ট করে ফেলি।' একটু থেমে আবার তিনি মুখ খুললেন, 'এটা তৈরি করতে আমার কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, ভাবছেন? অধ্যাপক, আপনি হয়ত জানেন, লোহার তৈরি একটা সাধারণ জাহাজের জন্য টন প্রতি পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড খরচ হয়। আর আমার নোটিলাসের মোট ওজন পনের শো টন। অতএব হিসাব করলে দাঁড়াবে সাতষট্টি হাজার পাঁচ শো পাউন্ড। কিন্তু এর পৃথক পৃথক অংশগুলোকে জোড়া দিতে আরও অতিরিক্ত আশি হাজার পাউন্ড লেগেছে। সে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার জন্য যা কিছু ব্যয় হয়েছে তা দিয়ে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ পাউন্ড।'

তার কথা শুনে আমার মূর্ছা যাবার অবস্থা। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে এবার প্রশ্ন করলাম, 'ক্যাপ্টেন, এমন বিপুল অর্থ সংগ্রহ তো কঠিন সমস্যা! তবে বলতেই হয় আপনি অগাধ অর্থের মালিক, ঠিক কিনা?'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'যথার্থই বলেছেন। আমি অপরিসীম বিস্তার অধিকারীই বটে। সত্য বলতে কি, ফ্রান্সের যাবতীয় ঋণ যদি আমি পরিশোধ করে দিই তবুও আমার তহবিল শূন্য হবে না।'

আমি বুঝতে পারলাম না, ক্যাপ্টেন নিমো সুযোগ বুঝে আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন কিনা। কৌতূহল ভবিষ্যতে যদি নিবৃত্ত হয় সে আশায় ভখনকার মতো নিজেকে সংযত রাখতেই হল।

নোটিলাসকে জলের ওপরে ভাসিয়ে তুলতে গিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো একটা বোতামে আলতো করে টিপ দিলেন। ব্যাস, ডুবো জাহাজটার তলদেশের ট্যাঙ্ক থেকে শোঁ শোঁ করে জল বেরোতে লাগল। আর লক্ষ করলাম, মনোমিটারের কাঁটাটা এগোতে এগোতে একসময় নিশ্চল নিখর হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, আমরা জলের ওপরে পৌঁছে গেছি।' লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। লক্ষ করলাম, নোটিলাসের পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে সামুদ্রিকপ্রাণীর পৃষ্ঠদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। এবার ধ্বংস দূর হল কেন আমরা আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নোটিলাসকে সামুদ্রিকপ্রাণী মনে করে বারবার ভুল করেছিলাম।

একটু পরেই জরুরি কাজের তাগিদে ক্যাপ্টেন নিমো ব্যস্তপায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলেন।

সুযোগ বুঝে নেড বিমর্ষমুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে এখান থেকে মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছে, বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমি তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললাম, 'নেড, কিছুদিন অন্তত ভুলেও এমন কোনো চিন্তা মাথায় এনো না। আমার মনেও কি শান্তি বা স্বস্তি কোনোটা আছে, বলো? একটা কথা মনে রাখবে, ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের জন্য সবকিছু করতে রাজি, কিন্তু দলত্যাগের কথা বললেই একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবেন।' তবে এও সত্য নেড, সুযোগের সন্ধানে আমরা থাকব। আর একটা কথা, এমন একটা সুযোগ যখন বরাতগুণে হাতের মুঠোয় এসেই গেছে তখন এর যান্ত্রিক কলাকৌশল ও যন্ত্রবিদ্যার উৎকৃষ্টতা ভালোভাবে দেখে না গেলে অপূর্ব একটা জিনিস সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যাব, বর্জিত হবে।'

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আচমকা বিকট একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়ে পড়লাম। ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জেগাড়া হল। আতঙ্কিত চোখে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতেই অত্যাশ্চর্য একটা আলোকচ্ছটা চোখে পড়ায় চোখ দুটো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। নোটিলাস থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হচ্ছে। পর মুহূর্তেই চোখ দুটোতে আলোকরশ্মিটুকু সামলে নিয়ে বললাম, 'নেড, সমুদ্র কী অপূর্ব সাজে সেজেছে! সমগ্র বিশ্বের সৌন্দর্যরাশি যেন সমুদ্রের বুকে এসে জড়ো হয়েছে। আর কত সব বিচিত্র রং আর বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট মাছের সমাবেশ ঘটেছে, দেখ!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের দেয়ালে রক্ষিত যন্ত্রপাতিগুলোর ওপর চোখ বুলাতে লাগলাম। কম্পাসের কাঁটা উত্তরপূর্বে অবস্থান করছে। আর নোটিলাস ঘন্টায়ে পনের মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে।

বাস, সেদিন ওই পর্যন্তই। রাতে আহারাতি সেরে আমরা বিছানা আশ্রয় করলাম।

নয়ই নভেম্বর। সকালে ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা করার আশায় খুঁজতে খুঁজতে সেলুনে গেলাম। হতাশ হতে হল। এখানেও তাঁর দেখা পেলাম না। তবে সেখানে কাচের জারে বহুবিধ ও বহু আকৃতিবিশিষ্ট কিছু সামুদ্রিক গাছ আমার মন কেড়ে নিল।

বিচিত্র গাছগাছালি দেখে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সেদিন সারাটা দিন খোঁজাখুঁজি করেও ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা পেলাম না।

পরদিন দশই নভেম্বর। সেদিনটাও বৃথা গেল। ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা মিলল না। তাঁকে তো দূরের কথা ডুবোজাহাজটার একটা কর্মচারীকেও দেখতে পেলাম না। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার বাবা! জাহাজের লোকজন গেল কোথায়? কর্পূরের মতো উবে গেল না তো!

বাইশে নভেম্বর। ভোর হতে না হতে আমি বুঝতে পারলাম, ডুবোজাহাজটা ক্রমে ওপরে উঠতে শুরু করেছে। অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন সংগ্রহের জন্যই তার ওপরে ওঠা।

ক্যাপ্টেন নিমোর খোঁজে ডুবোজাহাজের ওপরে উঠে গেলাম। ভোরের সমুদ্রের রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করছি, এমন সময় পিছন থেকে কার পায়ে শব্দ শুনে সচকিত হয়ে পিছন ফিরতেই দেখি ক্যাপ্টেন নিমো নন, তার সহকারী।

ভদ্রলোক জাহাজের ছাদে উঠে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে কী যেন দেখার চেষ্টা করছেন।

একটু পরেই তিনি চোখ থেকে দূরবীণটা নামিয়ে নিমোক্ত আদেশ জারি করলেন—'NAUTRON RESYOCTORR VIRCH।' কথাটা আমার কাছে একেবারেই দুর্বোধ্য মনে হ'ল।

কথাটা আমার উদ্দেশ্যে বলেই লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নিচে নেমে গেলেন।

আমি তাঁর কথার মর্মার্থ উদ্ধার করতে না পারলেও মোটামুটি অনুমান করলাম, নোটিলাস এখন জলের নিচে তলিয়ে যাবে। অতএব আমি যেন শীঘ্র কামরায় চলে যাই।

তারপর আরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আমাদের নোটিলাসেই কেটে গেল। এবার থেকে ক্যাপ্টেন নিমোর সহকারী এসে আমাকে একই দুর্বোধ্য ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

আমি ধরেই নিলাম, ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা আর কোনোদিনই পাব না।

আমি বিষণ্ণমনে নিজের কামরায় ফিরেই থমকে গেলাম। দেখি, আমার টেবিলে ফরাসি ভাষায় লেখা একটা চিঠি। ক্যাপ্টেন নিমোর লেখা। তিনি লিখেছেন, 'প্রফেসর অ্যারোনান্স, ত্রিন্স্পো দ্বীপের গভীর জঙ্গলে শিকারে অংশগ্রহণ করতে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে এ শিকার অভিযানের অংশগ্রহণ করবেন। ইতি—ক্যাপ্টেন নিমো।''

সবার আগে আমার জানা দরকার ত্রিন্স্পো দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত। মানচিত্রের ওপরে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, ওই দ্বীপটা ৩২.৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ১৫৭.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আর দ্বীপটাকে ক্যাপ্টেন নিমোই আবিষ্কার করেছেন।

তার পরদিন সতেরই নভেম্বর। পোশাক পাল্টে দ্রুত কামরা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেলুনে ঢুকেই ক্যাপ্টেন নিমোর মুখোমুখি হলাম। তাঁর দীর্ঘ অদর্শনের ব্যাপারে আমি কোনো প্রশ্ন করলাম না। তিনি নিজেও কিছুই বললেন না।

প্রাতঃরাশ সারতে সারতে ক্যাপ্টেন নিমো প্রথম মুখ খুললেন, 'অধ্যাপক, শিকারের আমন্ত্রণ পেয়ে আমাকে নিশ্চয়ই একজন বদ্ধ পাগল ঠাণ্ডেছেন, তাই না? আপনার তো আর অজানা নয় যে, বাতাসের সুব্যবস্থা থাকলে মানুষের পক্ষে

জলের তলায় অবস্থান করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। আর এ-ও জানেন, ডুবুরিরা টিউবের ভেতরে বাতাস নিয়ে জলের তলায় যায়। কিন্তু আমার জাহাজ নোটিলাসের কর্মচারীরা কাজ করার সময় মাথায় বিশেষ ধরনের টুপি ব্যবহার করে। আর তাদের প্রয়োজনীয় বাতাস সরবরাহ করা হয় যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পাম্প করে। ডুবুরিদের পক্ষে ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা করা সম্ভব নয়। কারণ বাতাসের টিউব তাদের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই আমি সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির যন্ত্রপাতি এ কাজের জন্য ব্যবহার করি। লোহার পাতমোড়া একটা পত্রে বাতাস ভরে ডুবুরিদের পিঠে বেঁধে দেই। ডুবুরিদের নাক ও মুখের সঙ্গে সংযুক্ত দুটো নল বাতাসের পাত্রটার গায়ে লাগানো থাকে। একটার কাজ পাত্র থেকে বাতাস ফুসফুসে চালান দেয়া আর দ্বিতীয়টা দিয়ে ফুসফুসের বাতাস বের করে দেয়া।

আমি জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, যদি কোনোক্রমে পাত্রের বাতাস ফুরিয়ে যায়, তখন?'

'আপনাকে তো বলেইছি অধ্যাপক, আমাদের নোটিলাসের পাম্প যন্ত্রগুলো উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন। প্রচুর পরিমাণে বাতাস সংরক্ষণও করে রাখতে পারে।'

'চমৎকার! বাতাসের ব্যবস্থা না হয় হল। কিন্তু আলো? আপনি কীভাবে আলো জ্বালেন?'

'ক্ষমকর্ষ দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রের সাহায্যে। এর একটা থাকে কোরের সঙ্গে আর দ্বিতীয়টা আটকানো থাকে পিঠের সঙ্গে। আমি ব্রাইক্রোনেট অব পটাশের পরিবর্তে সোডিয়াম ব্যবহার করি। এতে সুবিধা হচ্ছে, লণ্ঠনের ভেতরে সামান্য কার্বোলিক গ্যাস থাকে। একটা তার দিয়ে লণ্ঠনটাতে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা সম্ভব হয়। স্যুইচ টিপলেই লণ্ঠনের কার্বোলিক গ্যাস জ্বলতে থাকে।'

মুহূর্তের জন্য থেমে ক্যাপ্টেন নিম্নো আবার বলতে লাগলেন, 'এবার শুনুন জলের তলায় আমরা কোন ধরনের বন্দুক ব্যবহার করি। বলতে পারেন সেগুলো এক-একটা এয়ার গান। বাকুদের পরিবর্তে বাতাস ব্যবহার করা হয়। আর এর গোলাগুলো কাচের তৈরি। ভেতরে থাকে সিসার গুলি আর বাইরের দিকে থাকে লোহার পাতলা প্রলেপ দেয়া। যতই অমিত শক্তিদ্র বা হিংস্র জন্তুই হোক না কেন এগুলির আঘাতে সে কাবু হতে বাধ্য।' কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন নিম্নো আমাদের নিয়ে জাহাজের অস্ত্রাগারে গেলেন। রবারের তৈরি পোশাক পরে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। সবাই একটা করে এয়ারগান কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম। আর পিঠে বেঁধে নিলাম বাতাসের পাত্র। শিরশ্রাণে একটা বাতির ব্যবস্থা রইল।

আমি ভাবলাম, এমন জবরদস্ত পোশাক পরে কী করে জাহাজের ছাদে যাব। কিন্তু মুহূর্তে আমার চিন্তা ভাবনার অবসান ঘটিয়ে আমাদের জাহাজটা ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল। পর মুহূর্তেই দেখলাম, তীব্রবেগে জল ঢুকে পুরো ঘরটা কানায় কানায় ভরে গেছে। ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করার আগেই আমি বুঝতে পারলাম, আমরা সমুদ্রের একেবারে তলদেশে, মাটিতে পা ঠেকে রয়েছে। সে মুহূর্তে আমার সে কী আনন্দ! বুকভরা আনন্দ নিয়ে আমি বালির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলাম। আমার ওজন সামান্যতমও আছে বলে মনে হল না। আমি তখন ক্রিশ ফুট জলের তলায় অবস্থান করছি।

অদূরে কতসব নাম না জানা সুদৃশ্য গাছগাছালি দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। জলের এত গভীরে সূর্যরশ্মি পৌঁছোতে পারে ভেবে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। শুধু কি এই? চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথর, বিনুন, শামুক আর লতাপাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ায় এক অভূতপূর্ব মনোলোভা দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে, লক্ষ করলাম।

ক্যাপ্টেন নিম্নো আমাদের আগে আগে পথ প্রদর্শকরূপে অগ্রসর হতে লাগলেন। একসময় অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'অধ্যাপক, ঐ-ঐ যে ক্রিস্পো দ্বীপ দেখা যাচ্ছে।'

সামান্য এগিয়ে আমরা ক্রিস্পো দ্বীপের জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। এখানে বিচিত্র সব গাছের সমাবেশ ঘটেছে। আরো অবাক হলাম খাড়াভাবে উঠে যাওয়া গাছগুলো দেখে। ডালপালা পর্যন্ত এদিকওদিক ছড়ানো নয়।

একটা ব্যাপার আমাদের আরো অবাক করল। এখানকার কোনো গাছেরই পাতা নেই। ডালপালা পর্যন্ত এদিকওদিক ছড়ানো নয়।

একটা ব্যাপার আমাদের আরো অবাক করল। এখানকার কোনো গাছেরই পাতা নেই। ডালপালা থেকে আঁকড়া গজায়।

আমরা আরো কিছুটা এগিয়ে ক্যাপ্টেন নিম্নোর নির্দেশে একটা অতিকায় খালারিগাছের তলায় দাঁড়লাম। খুব ইচ্ছা করছিল কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে মনের ভাব আদান প্রদান করি। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়।

গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে বিশ্রাম করতে করতে আমি কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারি নি। ক্যাপ্টেন নিম্নোর ধাক্কায় ঘুম থেকে জেগে ছড়মুড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুরাতেই চমকে উঠলাম। দেখি, অতিকায় একটা সামুদ্রিক মাকড়সা। সেটা ডিমের মতো চোখ দুটো মেলে পিট পিট করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাকড়সাটা বাস্তবিকই দানবাকৃতি। লম্বায় তিন ফুট তো হবেই। আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, বুঝতে পারলাম। তবু ভরসা যে, সে আমার গায়ের ডুবুরির পোশাক ভেদ করে কামড়াতে পারবে না। ভরু বিপদাশঙ্কায় আমার বুকের ভেতরে কামারের হাঁপর চলতে লাগল। বন্দুক হাত দেবার মতো শক্তিতুকুও যেন আমার মধ্য থেকে নিঃশেষে উবে গেছে।

আমি যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অথর্বের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন নিম্নো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সজোরে দানবাকৃতি মাকড়সাটার গায়ে আঘাত হানলেন। প্রাণীটা যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে লম্বা-সূতীক্ষ্ম নখযুক্ত ধাবাগুলিকে মাটিতে বারবার আছাড় মারতে লাগল। ব্যস, সব শেষ। হিংস্র জানোয়ারটা এলিয়ে পড়ল।

আমরা আবার ক্যাপ্টেন নিম্নোকে অনুসরণ করে সংকীর্ণ একটা উপত্যকায় হাজির হলাম। এখানে জলের গভীরতা প্রায় একশো পঞ্চাশ গজ। সমুদ্রের এত গভীরে সূর্যরশ্মির পক্ষে হানা দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন নিম্নো বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতেই আমাদের সামনে সবকিছু কলমলিয়ে উঠল। আমিও বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে দিলাম।

অত্যুজ্জ্বল আলো দেখে কৌতূহলবশত কিছু প্রাণী গুহা থেকে বারবার উঁকি মারতে লাগল। তবে প্রাণনাশের ভয়ে এগোতে কারো আর সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ব্যাপারটা চোখে পড়তেই ক্যাপ্টেন নিমো ঝট করে বন্দুকটা হাতে নিয়ে নিলেন। বলা তো যায় না, হিংস্র প্রাণীগুলো যদি আচমকা আমাদের আক্রমণ করে বসে।

চারঘণ্টা একনাগাড়ে পথ চলার পর আমাদের থামতে বললেন।

এবার আমাদের নোটিলাসে ফেরার পালা। ক্যাপ্টেন এবার একটা নতুন পথ ধরে আমাদের নিয়ে ফিরতে লাগলেন। খুবই খাড়াই সে পথ। হাঁটা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। তাই কখনো সাঁতরে, আবার কখনো-বা পায়ে হেঁটে আমরা পথ পাড়ি দিতে লাগলাম।

একসময় লক্ষ করলাম, ক্যাপ্টেন নিমো বন্দুকটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে লম্বা লম্বা পায়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মনে হল কিছু একটা দেখার ফলে তাঁর মধ্যে এমন ব্যস্ততা প্রকাশ পেয়েছে।

আচমকা বিকট আর্তনাদ করে ভয়ালদর্শন অতিকায় একটা প্রাণী অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় দাপাদপি করতে লাগল।

আমি দূরদূর বৃকে সামান্য এগিয়ে কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে দেখি অতিকায় একটা সামুদ্রিক ভৌদর। চতুষ্পদ। সামুদ্রিকপ্রাণীদের মধ্যে একমাত্র ভৌদরই চতুষ্পদ। এদের বাদামি চামড়া দিয়ে চমৎকার কোট তৈরি করা যায়। তাই এরা মূল্যবান প্রাণী বিবেচিত হয়। তবে শিকারিদের লিঙ্গার শিকার হয়ে বর্তমানে এরা পৃথিবী থেকে লোপ পেতে বসেছে।

মৃত ভৌদরটাকে নিয়ে সামান্য এগিয়ে আমরা একটা বালির স্থূপে হাজির হলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্দুকের গুলির শব্দ আমার বৃকের মধ্যে নতুন করে কাঁপুনি শুরু করে দিল। খাড়া ঘুরিয়ে তাকিয়ে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। দেখি, অতিকায় এক সামুদ্রিক পাখি। গুলিবিদ্ধ। কাৎরাচ্ছে। আমার কানের কাছে মুখ এনে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন—‘এর নাম অ্যালবট্রেস। লম্বা ডানা মেলে উড়ে যেতে দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। গুলি করে ফেলে দিলাম।’

এবার অনবরত হেঁটে আমরা দুর্গম অ্যানজির জঙ্গল পেরিয়ে গেলাম।

আমি এদিকওদিক তাকাতে তাকাতে পথ পাড়ি দিয়ে চলেছি হঠাৎ কাছে আলতো চাপ অনুভব করলাম। ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে ইশারায় বসে পড়তে বললেন।

ঝট করে বসে পড়লাম। অকস্মাৎ আমার বৃকের ভেতরে হৃদপিণ্ডের লাফলাফি দাপাদপি শুরু হয়ে গেল। বিপদাশঙ্কায় শরীরের স্নায়ুগুলো একসঙ্গে বনবনিয়ে উঠল। চোখ দুটো নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে জানলে আমি অন্তত ক্যাপ্টেন নিমোর প্রস্তাবে রাজি হতাম না। দু-দুটো অতিকায় হাঙরকে গ্রীবা বিস্তার করে দ্রুত এগোতে দেখলে এমন কোন বীরপুরুষ আছে যে নিজেকে শক্ত রাখতে পারে? আঁতকে উঠে স্বগতোক্তি করলাম, ‘হায় ঈশ্বর! এ কী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ফেললে।’

হাঙর দুটো গ্রীবা বিস্তার করে এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। যাক, তবু রক্ষা। একঝাঁক রূপালি রঙের মাছ দেখে আচমকা গতিপথ পাল্টে বাদিকে এগোতে লাগল যমদূত দুটো। আমাদের প্রতি অশেষ করুণা প্রদর্শনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতাই হল।

আরো আধঘণ্টা হাঁটাহাটীর পর আমাদের আশ্রয়স্থল নোটিলাসে পৌঁছাতে পারলাম।

পরদিন আঠারোই নভেম্বর। সকাল। আমি একাকী নোটিলাসের প্রাটফর্মের ওপরে দাঁড়িয়ে। একটু পরেই ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে হাজির হলেন। তার সঙ্গে রয়েছে দুজন আফ্রিকান নাবিক।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আগের দিন যে জালগুলো সমুদ্রের বৃকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল সেগুলো তোলার জন্য কৃষ্ণকায় গাট্টাগোষ্ঠী নাবিক দুটো প্রাটফর্মে হাজির হয়েছে। জাল তোলা হল। বিভিন্ন রঙ ও আকৃতিবিশিষ্ট মাছগুলো আমার চোখ ও মনকে যারপরনাই অভিভূত করল। ব্যাঙের মতো অতিকায় কিছু মাছ আমার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিস্ময় সৃষ্টি করল। ক্যাপ্টেন নিমো পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন—এগুলো ‘ট্রিগার’ ফিস। আর ওইগুলো ‘ট্রিবিউরি’। সদ্য ধরা মাছগুলোকে রান্নাঘরে চালান দিয়ে দেয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার চুরটে অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন। এবার মুচকি হেসে বললেন, ‘অধ্যাপক অ্যারোনাল্ড, সমুদ্রের বৃকে দিন কাটাতে আপনার কেমন লাগছে বলুন তো! যত দিন যাচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছেন, তাই না? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সমুদ্রের বৃকের ভেতর দিয়ে চলাফেরা করা বাস্তবিকই এক অকল্পনীয় আনন্দময় ব্যাপার, স্বীকার করতাই হবে।’

আমি তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললাম, ‘খুবই সত্য বটে। তবে দেখার মতো চোখ না থাকলে সমুদ্রজীবন দুঃসহ যন্ত্রণার কারণ হতে বাধ্য।’

‘ভালো কথা, সমুদ্রের গভীরতা কত আপনার জানা আছে কি অধ্যাপক?’

‘সমুদ্রের গভীরতা অবশ্যই সর্বত্র সমান নয়। স্থান বিশেষে এর গভীরতা বিভিন্ন। উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রের গভীরতা আট হাজার গজ, ভূমধ্যসাগরের গভীরতা ২,৫০০ গজ, দক্ষিণ আটলান্টিকের গভীরতা বায়ো হাজার গজ থেকে শুরু করে পনেরো হাজার গজ পর্যন্ত।’

‘যদি তাই হয় তবে আমি আপনাকে প্রমাণ করে দেখাতে পারি, সমুদ্রের এ অঞ্চলের গভীরতা মাত্র চার হাজার গজ। চলুন, এবার সেলুনে গিয়ে একটু আয়েশ করে বসা যাক।’

আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে সেলুনের দিকে এগিয়ে চললাম।

ক্যাপ্টেন নিমো আবার পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। একেবারে বেপাতা। একনাগাড়ে কয়েক সপ্তাহ তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর পুনরায় অন্তর্ধানে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না।

সাতাশে নভেম্বর। সেদিন ক্যাপ্টেন আমাদের জানান নোটিলাস স্যান্ডউইচ দ্বীপের কাছাকাছি হাজির হল। এটা এ অঞ্চলের দ্বীপগুলোর মধ্যে বৃহত্তম।

নোটিলাসের প্রাটিকর্মে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের উচ্চতম পর্বত চূড়া হেভার মার্টিনের রূপ সৌন্দর্য আমার মনকে রীতিমতো দোলা দিল।

এগারোই ডিসেম্বর। গবেষণার কাজে অত্যাবশ্যক কিছু কালসার মাছের বৈচিত্র্যময় আকৃতি ও দৃষ্টিনন্দন রঙ আমাকে মুগ্ধ করল।

বারোই ডিসেম্বর। প্রাতঃরাশ সেরে ক্যাপ্টেন নিম্নের গ্রন্থাগারে বসে 'পাকস্থলীর মূল্য' নামক বইটার পাতায় চোখ ও মনকে আবদ্ধ রাখলাম। দুপুরের কাছাকাছি অকস্মাৎ কনসিলের ডাক শুনে দৌড়ে বাইরে গেলাম।

কনসিলের তর্জনি-নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই চমকে উঠলাম। দেখি, কালো মত বিশালাকৃতি একটা বস্তু পড়ে রয়েছে। আচমকা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল 'আরে বাস! এ যে একটা জাহাজ! ভাঙা একটা জাহাজ পড়ে রয়েছে!'

নোটিলাস আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল কয়েকটা ভাগ্যহত নারী-পুরুষের মৃতদেহ ভাঙা জাহাজটার বিভিন্ন অংশের সঙ্গে আটকে রয়েছে। মনটা যারপরনাই বিস্ময়ে উঠল। যে মর্মান্তিক দৃশ্য! কী অসহনীয় যে সে দৃশ্যটা তা ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আকস্মিক বিষাদ-আতঙ্কে মনপ্রাণ বিস্ময়ে উঠল। আর একটা দৃশ্য আজও আমার বুকে ছবির মত গাঁথা রয়েছে। ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ। তাঁর হাত দুটো দিয়ে চাকাটা তখনও শক্ত করে ধরে রাখা। নিঃসন্দেহ হলাম, শেষমুহুর্ত পর্যন্ত তিনি জাহাজটাকে রক্ষা করার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করেছেন।

দেখলাম জাহাজের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, 'দ্য ফ্লোরিডো স্যান্ডার ল্যান্ড'।

জলের ভিতর দিয়ে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে আরও এমন কিছু বীভৎস নরকীয় দৃশ্য নজরে পড়ল যা আজও আমাকে ব্যথিত মর্মান্বিত করে। অগণিত শিশু, নারী ও পুরুষের মৃতদেহ, কঙ্কাল, ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি, কামান, নোঙর, লোহার শেকল এবং ছোট-বড় বহু বায়ু পেটরা চারদিকে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

এগারোই ডিসেম্বর। সেদিন আমরা পেরিয়ে এলাম প্রবাল নির্মিত পোটোসেটাই দ্বীপসমূহ।

আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবার আমরা ক্যাপ্টেন নিম্নো কর্তৃক ১৮৬২ বাষট্টি সালে আবিষ্কৃত 'কারমন্টিনেরে' নামক সাগরে-ঘেরা সবুজে ঢাকা চমৎকার একটা দ্বীপকে পাশে রেখে এগিয়ে যেতে লাগলাম। এখানকার জলের উষ্ণতা বড় জোর ১০—১২°। পনেরই ডিসেম্বর আমরা অতিক্রম করলাম রূপ-সৌন্দর্যের আকর 'তাহিতি' দ্বীপটা। লক্ষ করলাম, সমুদ্রের এ অঞ্চলে মাছ যেন কিলবিল করছে। শুধু মাছ আর মাছ।

১৬০৬ সালের কথা। সে বছর সমুদ্রপ্রেমী কুইবোস 'নিউহেরাউডিস' নামক বিশালায়তন দ্বীপটা আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আমাদের ডুবোজাহাজ পঁচিশে ডিসেম্বর ইতিহাস-বিখ্যাত এ দ্বীপটাকে পাশে রেখে দ্রুত এগিয়ে গেল।

সাতাশে ডিসেম্বর সকালে ক্যাপ্টেন নিম্নো আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমার চোখ দুটো তখন মানচিত্রের ওপর অলসভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্যাপ্টেন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'অধ্যাপক, 'ড্যানিকোরা' দ্বীপের নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন। ওই দেখুন, আমাদের নোটিলাস এখন 'ড্যানিকোরা' দ্বীপটাকে পাশে রেখে এগিয়ে চলেছে।

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন! আমি ওই দ্বীপটাকে ঘুরে দেখার সুযোগ পেতে পারি। ওর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা বইতে পড়েছি বটে। এত কাছে এসেও যদি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারি তবে আমত্বা আপশোষ থেকে যাবে।

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে ইঞ্জিন ঘরের দিকে হাঁটলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলাম আমাদের জলযানটা ড্যানিকোরা দ্বীপে ভিড়ছে।

দু-দুটো আগ্নেয়গিরি সজলিত দ্বীপ ড্যানিকোরা। চারদিকে চল্লিশ মাইল জুড়ে রয়েছে দৃষ্টিনন্দন প্রবাল-প্রাচীর। পর্যটক ডুমন্ট ডি উরভিল এর নামকরণ করেছিলেন—'আইল দ্য রেচেটে'। সম্প্রতিকালে এ নামেই দ্বীপটাকে সবাই চেনে।

আমি ক্যাপ্টেন নিম্নোকে বললাম, 'আপনি হয়ত জানেনই, ডুমন্ট ডি উরভিল দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে একটা সুন্দর কাহিনী রয়েছে।'

আমি এবার লা প্যারাউজের লিখিত কাহিনীটা সংক্ষেপে ব্যক্ত করলাম, '১৮৮৫ সালের কথা। সে বছর লা পেরাউজ এবং তাঁর সহকারী ক্যাপ্টেন ডে ল্যাংলের ডাক পড়ল রাজা ঘোড়শ লুই-এর দরবারে। রাজামশাই জাহাজ ও প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে তাঁদের দুজনকে সমুদ্রযাত্রায় পাঠালেন। উদ্দেশ্য সমুদ্রের বুকে নিখোঁজ হওয়া দুটো জাহাজের খবর সংগ্রহ করে রাজার কাছে পৌঁছে দেয়া। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জাহাজ নিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। বৃথা চেষ্টা। শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন ডিলম এক প্রবীণ নাবিক লা পেরাউজের জাহাজের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেলেন। আঠার শো চক্রিশের পনেরোই মে ক্যাপ্টেন ডিলম তাঁর প্রিয় জাহাজ সেন্ট পেট্রিকে চেপে টিকোপিয়াসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এক মাঝবয়সী লোকের কাছ থেকে রূপার একটা তরবারির হাতল কিনলেন। কথা প্রসঙ্গে লোকটা তাঁকে বলল, 'প্রায় ছয় বছর আগে ড্যানিকোরা দ্বীপে দুজন ইউরোপিয়ান ভ্রমলোকের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। তাঁদের দুটো জাহাজ নাকি খাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগায় ধ্বংস হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন ডিলম ভাবলেন, তাঁরা নির্ধাৎ লা পেরাউজের ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন ডিলম মনস্থির করে ফেললেন তিনি যে করেই হোক ড্যানিকোরাতে গিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটোর খোঁজ করবেন। কিন্তু বিধি বাম। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব অগ্রাহ্য করে তাঁর পক্ষে সেখানে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হল না। বার্থ মনোরথ হয়ে তাঁকে ফিরে যেতেই হল।

১৮২৭ সালে ক্যাপ্টেন ডিলম অত্যাশ্চর্য্য অগ্রহাণ্বিত হয়ে কলিকাতাহ্ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এ সংস্থার পক্ষ থেকে তিনি রোর্চেচ নামক একটা জাহাজ সাহায্যস্বরূপ পেলেন। এবার রোর্চেচ-এ চেপে তিনি ড্যানিকোরা-তে হাজির হলেন। সাধাভীত কায়দা কসরতের মাধ্যমে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটো থেকে একটা ব্রোঞ্জের ঘড়ি, লোহার বাসনপত্র এবং অন্যান্য কিছু দ্রব্য সামগ্রী উদ্ধার করতে পারলেন।

১৮২৮ সালের মাঝামাঝি তিনি ফ্রান্সে ফিরে রাজা দশম চার্লস-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

এদিকে গটে গেছে আর এক ঘটনা। ডুমন্ট ডি উরভিল ডিলমের অজ্ঞাতসারে জাহাজ দুটোর খোঁজ করতে রওনা হয়ে গেছেন।

ডিলম ড্যানিকোরা ছেড়ে যাওয়ার ছয় মাস বাদে ডুমন্ট ডি উরভিল সেখানে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে কিছু দিন অবস্থান করে ডিলমের সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য অবগত হন।

এত কিছু সত্ত্বেও সব পরিশ্রম পশ্চাতে পরিত্যক্ত হল। জাহাজটার খোঁজ পাওয়া তো দূরের ব্যাপার, সেটা কোথায় নিখোঁজ হয়েছে সে খোঁজও কারো কাছ থেকে পেলেন না। বরাত নেহাত মন্দ। হতাশ হয়েই তাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে হল।

আমি ঘটনাটার এ পর্যন্ত বলে চূপ করলাম।

আমাকে থামতে দেখে ক্যাপ্টেন নিমো জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘অধ্যাপক, আপনি কি তবে এটাই বলেই চাইছেন যে, তৃতীয় জাহাজটার ব্যাপারে কেউ-ই কিছু জানে না?’

‘হ্যাঁ, ঠিক তা-ই। কোনো সন্ধানই পাওয়া যায় নি।’

ক্যাপ্টেন প্রসঙ্গটাকে আর এগোতে না দিয়ে সেলুনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

ক্যাপ্টেন কাচের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বক্তব্য শুরু করলেন, ‘অধ্যাপক, সেটা ছিল সতের শো পাঁচশির সতেরই ডিসেম্বর। লা বুসোল এবং অ্যান্টোইনেল জাহাজ দুটো নিয়ে লা পেরাউজ যাত্রা করলেন। দুর্বীর গতিতে অগ্রসর হবার সময় ড্যানিকোরা অজ্ঞাত খাড়িতে প্রথমে লা অ্যান্টোইনেল এবং তারপর লা বুসোল অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ব্যস, দু-দুটো জাহাজ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যায়। লা প্যারাউজ এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী প্রাণে বেঁচে গেলেন। জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার খবরটা অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা লা প্যারাউজ আর তাঁর সহকর্মীদের অতিথি হিসেবে দ্বীপে নিয়ে যায়।

এবার লা প্যারাউজ তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ দুটোর কিছু ভাঙাচোরা অংশ জল থেকে উদ্ধার করলেন। এবার তিনি তাদের সাহায্য সহযোগিতায় জাহাজের অংশগুলো দিয়ে ছোট্ট একটা জাহাজ তৈরি করে ফেললেন। অদৃষ্টের ফেরে তাঁকে সে জাহাজটাও হারাতে হল।’

ক্যাপ্টেন নিমো এবার হাত বাড়িয়ে তাক থেকে ছোট্ট একটা টিনের বাস্র টেনে নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তার গায়ে ফরাসি দেশের সিলমোহর দেখতে পেলাম।

আমি তাঁর হাত থেকে বাস্রটা নিয়ে ডালা খুলতেই জীর্ণ একটা কাগজ ভেতর থেকে উঁকি মারল। তবে তার লেখা পাঠোদ্ধার করতে কিছুমাত্রও অসুবিধা হল না।

ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘অধ্যাপক, এটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আর ফ্রান্সের তৎকালীন নৌ-বিভাগের মন্ত্রী লা পেরাউজকে যেসব নির্দেশ দিয়েছিলেন সেসব কথা এতে লিখিত রয়েছে।’ মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—‘অধ্যাপক, একজন নাবিকের পক্ষে এভাবে মৃত্যুবরণ সত্যিই গৌরবের। প্রবাল স্থূপের সমাধির চেয়ে শান্তি আর কোথায়, আপনিই বলুন? আমার আর আমার সহকর্মীদের কাছে এরকম মৃত্যুর চেয়ে গৌরবের আর কী-ই-বা থাকতে পারে?’

১৮৬৮, ১ জানুয়ারি। ভোর হতে না হতেই কনসিল আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাল। আমি প্রত্যাগারে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। কনসিল বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমরা যাত্রা শুরু থেকে পয়লা জানুয়ারি পর্যন্ত ১১,৩৪০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি।

সেদিন নাবিকরা বিচিত্র ধরনের কিছু মাছ ধরল। গার্মান মাছ। ডোরাকাটা নীলচে রঙবিশিষ্ট মাছ। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু হওয়ায় তাদের গায়ের ডোরাগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ক্যাপ্টেন নিমোর মুখে শুনলাম, তিনি এবার টোরোস প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরে যেতে চাচ্ছেন।

টোরোস প্রণালীতে অসংখ্য ছোট-বড় দ্বীপের বিচিত্র সমারোহ। যে-কোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটানো সম্ভাবনা। তাই ধীরমুহুরে গতিতে, খুবই সাবধানতার সঙ্গে নোটিলাসকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। আবার এখানে প্রবাল প্রাচীরও মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কম সমস্যা সৃষ্টি করছে না।

আমি তখন গ্রন্থাগারে বসে একটা বইয়ের পাতায় অলস চোখের পাতা দুটোকে বুলাচ্ছি। ঠিক তখনই মনে হল প্রমাদ ঘটল বুলি। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। খোঁজ নিয়ে জানত-পারলাম অজ্ঞাত এক খাড়ির সঙ্গে আমাদের নোটিলাস-এর আচমকা সংঘর্ষ হয়েছে।

ক্যাপ্টেনকে তার একান্ত সহকারীর সঙ্গে বলতে শুনলাম। তাঁর মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত হতে চলেছে। নোটিলাস আটকা পড়ে গেছে। পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন।

নোটিলাসের তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি বটে, তবে বহু চেষ্টা চরিত্র করণেও তাকে কিছুতেই ভাসানো সম্ভব হচ্ছে না। তাকে বের করে আনতে না পারলে চিরদিনের জন্য আমাদের আটকা পড়ে থাকতে হবে।

ক্যাপ্টেন নিমো ভাঙবেন তবু মচকাবার পাত্র নন। তার দৃঢ় বিশ্বাস পাঁচদিন পর পূর্ণিমা তিথিতে জোয়ারের সময় নোটিলাস আবার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে।

কনসিলের মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তার পালিয়ে যাবার আশা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে।

আমরা তখন চমৎকার একটা দ্বীপের গায়ে অবস্থান করছি। সবুজ দ্বীপ। জানা-অজানা গাছের বিচিত্র সমারোহ।

পাপুই দ্বীপ। নোটিলাস থেকে বেরিয়ে দ্বীপে গিয়ে শিকার করার জন্য সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু সময়সীমা হচ্ছে ক্যান্টেন নিমোর কাছে নেভ-এর শিকারে যাবার অত্যাশ্চর্য বাসনার কথা জানাতেই তিনি এক কথাতেই সম্মতি দিয়ে দিলেন।

বাস, আর দেরি নয়, আমি নেভ আর কনসিলকে নিয়ে পাপুই দ্বীপে পদার্পণ করলাম। আমাদের সঙ্গে রয়েছে বন্দুক, কুঠার আর একটা বড়সড় ছোরা।

দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই নেভ যেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হল। এমনটা তো হবার কথাই বটে। কতদিন পর মাটির স্পর্শ পেল, ভাবা যায়! তার আনন্দ উচ্ছ্বাসের আরো কারণ রয়েছে। বহুদিন পর আজ মাংস খেতে পারবে। হরিণের বলসানো মাংস।

আমরা অফুরন্ত উৎসাহ উদ্যম নিয়ে বনের গভীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কনসিল কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে গাছে উঠে কিছু নারকেল পেড়ে নিয়ে এল। নারকেলের সুপেয় জল আর শাস আমাদের তৃপ্ত করল। আরও কিছুটা এগিয়ে রুটিফল গাছের প্রাচুর্য আমাদের বিস্মিত করল। মালয়ের অধিবাসীদের কাছে রুটিফল “রিমা” নামে পরিচিত।

নেভ ঝটপট শুকনো ডালপালা দিয়ে আগুন জেলে রুটিফল দিয়ে উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য তৈরি করে ফেলল। একটু বাদেই কনসিল বনুকের গুলিতে একটা সাদা পায়রা আর একটা বুনা পায়রা শিকার করল। নেভ ব্যস্ত হাতে সে দুটোর পালক ছাড়িয়ে বলসে ফেলল। বহুদিন পর আমাদের জিভ মাংসের স্বাদ পেল। সবার চোখেমুখেই খুশি আর তৃপ্তির স্বাদ।

আমার বার্ড অব প্যারাডাইস শিকারের ইচ্ছা। কিন্তু নেভ হোক হোক করতে লাগল কোনো চতুষ্পদ প্রাণী ঘায়েল করার জন্য।

নেভ—হ্যাঁ, নেভই সুদৃশ্য একটা বার্ড অব প্যারাডাইস ভূপাতিত করে আমার শখ পূরণ করল। আমি আহত পাখিটাকে হাতে তুলে নিয়ে তার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। কী যে তার রূপের বাহার তা ভাষায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তিন ফুটের ওপর লম্বা জখম পাখিটা তার যন্ত্রণাকাতর চোখ দুটো মেলে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমার মনটা অস্বাভাবিক রকম বিধিয়ে উঠল।

আমি যখন মৃত্যুপথযাত্রী বার্ড অব প্যারাডাইসটাকে হাতে নিয়ে তার সৌন্দর্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি ঠিক তখনই নেভ একটা বিশালদেহী শূয়ার শিকার করে আমার সামনে হাজির হল। দুম করে সেটাকে কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলল। কনসিল মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তাকে বলসে নেয়ার কাজে মেতে উঠল।

নেভ কিছুতেই দ্বীপটা ছেড়ে আসতে চায় না। কিন্তু নিরুপায়, নোটিলাসে ফিরে আসতে হবেই।

আমরা সবে নোটিলাসে ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছি ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটে গেল একেবারে অবিদ্যায় অঘটনটা। নেভের ঠিক পায়ের কাছে এসে পড়ল পাথরের টুকরোটা। আমরা রহস্যভেদ করার আগেই আরো একটা পাথরের টুকরো দুম করে করে আমাদের সামনে এসে পড়ল। অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় আমাদের বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম।

আতঙ্কিত কনসিল কাঁপা-কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, ‘নির্ঘাত এ দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীদের কাজ।’

আমরা তিনটি প্রাণী প্রাণরক্ষার তাগিদে উদ্ভ্রান্তের মতো তীরের দিকে ছুটেতে লাগলাম। আমচকা জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা অসভ্য জংলীকে ভূতের মতো এগিয়ে আসতে দেখলাম। সামান্য এগিয়ে তারা ঝোপের আড়াল থেকে অনবরত পাথর ছুড়তে লাগল।

আমরা উর্ধ্বস্থানে ছুটেতে ছুটেতে এসে নৌকায় উঠে পড়লাম। বাস, নেভ পাগলের মতো বৈঠা চালিয়ে নৌকাটাকে বিপদসীমার বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অসভ্য জংলীগুলো কোমরজলে দাঁড়িয়ে বারবার দাঁত-মুখ খিচিয়ে অবোধ্য ভাষায় চিৎকারি করিতে লাগল।

আমি তখনো মন থেকে আতঙ্কটুকু নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারি নি। দুরু দুরু বৃকে ক্যান্টেন নিমোর কাছে অসভ্য দ্বীপবাসীদের ব্যাপারটা বলার জন্য সেলুনে হাজির হলাম। আমার মুখ থেকে সবকিছু শুনে ক্যান্টেন নিমো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘অধ্যাপক, আমরা যতই সভ্যতার বড়াই করি না কেন, পৃথিবীর বৃকে আজও কোটি কোটি মানুষ পত্তর মতো জীবন যাপন করছে। তারা জানে যে সভ্যভাব হয়ে উন্নত জীবনের স্বাদ পাবে, কে জানে?’

তার পরের দিন আটাই জানুয়ারি। আমাদের জাহাজ তখনও পাপুই দ্বীপের কাছে আটকা পড়ে রয়েছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে প্রাটফর্মের পা দিয়েই থমকে গেলাম। দেখি অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীরা তখনও হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বিস্ময়মাখানো দৃষ্টিতে আমাদের জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের দেহসৌষ্ঠব বাস্তবিকই লক্ষণীয়। মাথায় ঝাঁকড়া-কোঁকড়ানো চুল। গলায় হাড়ের টুকরোর মালা। আর কান ফুটো করে হাড়ের টুকরো গেঁথে রেখেছে।

গাট্টাগোষ্টা একজন লোকা সামান্য এগিয়ে নোটিলাসের দিকে কৌতূহল মিশ্রিত রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। আমি ইচ্ছা করলে তাকে গুলি করতে পারতাম। কিন্তু সে কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম। অবশ্য তারা যদি আক্রমণ করতে আসত তখন হয়ত আর নিজেকে সংযত রাখতে পারতাম না।

দুপুর একটা বাজল। জোয়ারের জল ক্রমে বাড়তে শুরু করল। অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের পক্ষে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না। তারা হুড়মুড় করে উঠে দ্বীপের জঙ্গলের ঢুকে গেল।

আমি তখনও নোটিলাসের প্রাটফর্মের দাঁড়িয়ে দ্বীপটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিল।

অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীরা কয়েকটা ডোঙায় চেপে আমাদের নোটিলাসের দিকে এগোতে লাগল। তারা সংখ্যায় কম হলেও একশো তো হবেই। ব্যাপারটা দেখে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তারা সবাই আমার দিকে তীর

বাগিয়ে ধরে ক্রোধান্বিত বাঘের মতো রোষপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। তাদের চোখ-মুখের আদিম হিংস্রতার ছাপটুকু আমার নজর এড়াল না।

ব্যস, অসভ্য দ্বীপবাসীদের আক্রোশ চরম রূপ নিল। তারা উন্মাদের মতো আমাদের নোটিলাস-এর ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বর্ষণ করতে শুরু করল।

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে আমি প্লটফর্ম ছেড়ে ক্যাপ্টেন নিমোর খোঁজে সেলুনের দিকে ছুটলাম। দরজায় পা দিয়ে দেখি, তিনি বীজগণিতের পাতায় চোখ রেখে তন্ময় হয়ে বসে।

আমি আতঙ্কিত মুখে দরজায় দাঁড়িয়েই কাঁপা কাঁপা গলায় কানোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'ক্যাপ্টেন, একদল অসভ্য জংলী দ্বীপবাসী তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের নোটিলাসের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে!'

আমার কথায় ক্যাপ্টেনের মধ্যে সামান্যতম ভাবান্তরও হল না। তাঁর কাছে এটা যেন নিছকই একটা সামান্য ব্যাপার। তিনি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত বাড়িয়ে একটা বোতাম টিপলেন। এবার আমার দিকে ফিরে মুচকি হেসে বললেন, 'ও কিছু না। তবে আমাদের উচিত ছিল আগেই জাহাজে প্রবেশের মুখ বন্ধ করে দেয়া। এখন তারা তো সামান্য ব্যাপার অধ্যাপক, কামানের গোলাও লজ্জায় ফিরে যেতে বাধ্য হবে। ভাববেন না, আমরা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

আমি আশ্বস্ত হয়ে সেখান থেকে ফেরার উদ্যোগ নিলে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, আগামীকাল দুপুর ঠিক তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিট আগে টোরেস প্রণালী থেকে আমাদের জাহাজ যাত্রা করবে।' কথাটা শেষ করে তিনি আবার বইয়ের পাতার দিকে চোখ ফেরালেন।

শিকারি নেডের কল্যাণে আমাদের নৈশভোজ ভালোই জমেছিল।

রাত্রে কেবিনে শুয়েও ক্রোধান্বিত অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের চিংকার চোঁচামেচি শুনতে পেলাম। আমরা তিনটি প্রাণী ছাড়া জাহাজের অন্য কারোর মধ্যেই দ্বীপবাসীদের ব্যাপার নিয়ে লেশমাত্রও আতঙ্ক লক্ষিত হল না।

সকাল হল। প্লটফর্মে গিয়ে দ্বীপের দিকে নজর ফেরাতেই ক্রোধান্বিত দ্বীপবাসীদের আক্ষালন নজরে পড়ল। ফলে কেবিনে শুয়ে বসেই দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দিলাম।

আড়াইটার কাছাকাছি ক্যাপ্টেন নিমো আমার দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'অধ্যাপক, জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। পূর্ব নির্ধারিত সময়েই আমাদের নোটিলাস টোরেস প্রণালী ছেড়ে এগিয়ে যাবে। আমি ঢাকনা খোলার অনুমতি দিয়ে এলাম।'

ঢাকনা খোলার কথাটা কানে যেতেই আমি যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসে পড়লাম। চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ ঝাঁকি বললাম, 'সে কি ঢাকনা খুললে ক্রোধান্বিত অসভ্য জংলীগুলো—'

'হুড়মুড় করে জাহাজে ঢুকে পড়বে, তাই না?' তাচ্ছিল্যের হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে ক্যাপ্টেন নিমো আমার দিকে কথাটা ছুড়ে দিলেন।

তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই মৃদু শব্দ করে নোটিলাসের ঢাকনাটা খুলে গেল।

ব্যস, উন্মোচিত দ্বীপবাসীরা ক্রোধে ফৌস ফৌস করতে করতে নোটিলাসের কাছে এগিয়ে এসে সিঁড়ির রেলিঙ ধরতেই বিকট আতর্জন করে কোন এক অদৃশ্য শক্তি বলে পিছন দিকে এক এক করে ছিটকে পড়তে লাগল। এক-এক করে সবাই একইভাবে আতর্জন করে জলে ছিটকে পড়ল।

রেলিঙে বৈদ্যুতিক শক্তি নিয়োগ করা ছিল। তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। ক্যাপ্টেন নিমো অবশ্যই তাদের নিধন করতে চান নি। অসভ্য জংলী দ্বীপবাসীদের আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই এরকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

তিনটে বাজতে ঠিক কুড়ি মিনিট আগে আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস সামান্য দূলে উঠল। এবার টোরেস প্রণালীকে বিনায় জানিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম সমুদ্রের দিকে।

দশই জানুয়ারি অর্থাৎ তার পরের দিন। আমাদের নোটিলাস ঘণ্টায় প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে পশ্চিমদিকে ছুটে চলল।

এগারোই জানুয়ারি। নোটিলাস তার চলা অব্যাহত রেখে কেপ ওয়েলস অতিক্রম করে গেল। এ অঞ্চলে অসংখ্য খাঁড়ি ছড়িয়ে রয়েছে।

তেরোই জানুয়ারি আমরা ট্রিমর সাগরে উপস্থিত হলাম। এবার নোটিলাস দক্ষিণ-পশ্চিম কোণা বরাবর ভারত মহাসাগরের দিকে ছুটে চলল।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম, তিনি মনস্থ করেছেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আন্টার্টিকার তুষার রাজ্যে যাবেন। সেখান থেকে ঘুরতে ঘুরতে প্রশান্ত মহাসাগরের এ অংশেই নাকি আবার ফিরে আসবেন।

চৌদ্দই জানুয়ারি। আমরা এবার এক এক করে হাইবারনিয়া, কাটিয়েরও সেরিসাপট্রম প্রভৃতি বালুকাময় দ্বীপগুলো অতিক্রম করে যেতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন নিমো নিবিষ্টমনে সমুদ্রের বিভিন্ন অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা পরীক্ষা করে চলেছেন।

পনেরোই জানুয়ারি। দুপুরের আগে নোটিলাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলের সামান্য তলা দিয়ে যাবার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে গেছে। নাবিকরা মেরামতি কাজে লিপ্ত হল।

আমি সমুদ্রের ওপর চোখের মণি দুটো নিবন্ধ রাখলাম। একসময় বিশেষ ধরনের রূপালি দ্যুতি আমার চোখ দুটোতে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। প্রথমে ভাবলাম, নোটিলাস হঠাৎ করে বৈদ্যুতিক আলো সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে দিয়েছে। পর মুহূর্তেই আমার ভুল ভেঙে গেল। দেখলাম, একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর গা থেকে অতুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নির্গত হয়ে সমুদ্রের জলে এমন অবিশ্বাস্য আলোর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। ঠিক যেন গলিত সিসার স্রোত বয়ে চলেছে।

একটু বাদেই আরও অবাক হতে হল। প্রায় দশ-বারো ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট সোর্ডফিশ আর অতিকায় কয়েকটা গুস্তককে সঁতার কেটে এগিয়ে যেতে দেখলাম। সোর্ড ফিসের আগুনের মতো আলোকরশ্মি রয়েছে বটে, সেগুলো জ্বলে কিন্তু

দহন করার ক্ষমতা নেই। আশ্চর্য! সমুদ্রের বুকে যে এমন আরও কত অত্যাশ্চর্য অবস্থাস্য ব্যাপার ছড়িয়ে রয়েছে, তাই বা কে জানে।

ঘোলই জানুয়ারি আমাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে এমন একটা অবজ্ঞিত ঘটনা ঘটে গেল যা আমাদের মধ্যে যারপরনাই আতঙ্ক সঞ্চার করল।

বাতাসের চাপ হঠাৎ স্বাভাবিক কমে গেল। নোটিলাস তখন ১৫০° দ্রাঘিমাংশ এবং ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থান করছে। আচমকা বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় সমুদ্র উত্তাল রূপ ধারণ করল।

ক্যাপ্টেন নিমোর মতো ধীরস্থির প্রকৃতির লোকের মধ্যেও ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। তিনি দূরবীণের নলটা চোখে লাগিয়ে দিগন্তে পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হলেন।

আচমকা দূরবীণটাকে চোখ থেকে নামিয়ে সহকারীর সঙ্গে দুর্বোধ্য ভাষায় দু-একটা কথা বলেই আমার দিকে একঝলক দৃষ্টিপাত করলেন। মুখে কিছুই বললেন না। পাশ কাটিয়ে দ্রুতবেগে সেখান থেকে চলে গেলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার জলের ওপর ঝুঁকে কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

এবার ক্যাপ্টেন নিমোর সহকারী ব্যস্তপায়ে এগিয়ে এসে সমুদ্রের এক বিশেষ স্থানের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করলেন। অত্যুগ্র অধঃহের সঙ্গে সেদিকে তাকিয়ে তিনি কী যেন দেখতে লাগলেন। একসময় আচমকা হেঁ মেরে আমার হাত থেকে টেলিস্কোপটা ছিনিয়ে নিয়ে চোখে লাগালেন। পর মুহূর্তেই সেটাকে চোখ থেকে সরিয়ে নিলেন। তাঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল। সর্বাস্থ আড়ষ্ট। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি কী যেন ভাবতে লাগলেন। তাঁর পায়ের কাছে আমার টেলিস্কোপটা পড়ে রইল।

কেমন যে ক্যাপ্টেনের মধ্যে এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার হল আমি ভেবে পেলাম না। ব্যাপার কী? তিনি কি ভেবেছেন, আমি তাঁর কোনো গোপন তথ্য জেনে ফেলেছি?

একসময় কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে ক্যাপ্টেন বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই আমাকে বললেন—‘অধ্যাপক অ্যারোনাল্ড, একটা শর্তসম্মত আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমি খুশি হয়ে যতদিন আপনাদের মুক্তি না দেব ততদিন নির্দিষ্ট কামরায় আপনারা বন্দিজীবন যাপন করবেন, মনে থাকে যেন।’

আমি নীরবে ঘাড় কাৎ করলাম। চোখের ভাষায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আপনিই আমার বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সবকিছু। নৈশভোজ সেরে বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নিঃসন্দেহ হলাম, আমাদের বন্দি করেও ক্যাপ্টেন নিমো নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। তাই আমাদের খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। যত বেশি সময় আমাদের ঘুমে আচ্ছন্ন করে রাখা যায় সেজন্যই এ-ব্যবস্থা।

পরের দিন দুপুরে আমি কলকজার ঘরে বসে আপন মনে কাগজপত্র গোছাগছে ব্যস্ত। এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। ভাবলাম, গত দিনের রহস্যটার ব্যাপারে তিনি নিজে থেকেই কিছু বলবেন। তাই আমি নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

না, ক্যাপ্টেন নিমো মোটেই মুখ খুললেন না। আমি আড়চোখে তার মুখের দিকে একঝলক তাকলাম। তার চোখ মুখের ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপটুকু আমার চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল।

সে সময় আমার দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘অধ্যাপক, আপনি কি চিকিৎসাবিদ্যা জানেন?’ সত্য বলতে কি এমন কোনো প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই তেরি ছিলাম না। তবে এও সত্য যে, এক সময় আমি হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জেন এবং ডাক্তারের পদে নিযুক্ত ছিলাম।

আমি সামান্য ঘাড় কাৎ করে তাঁর প্রশ্নের জবাব দিলাম। তিনি তার এক অসুস্থ নাবিককে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন।

রোগীকে আমার সামনে হাজির করা হল। এক নজর দেখেই মনে হল লোকটা অ্যাংলো-স্যান্সন। তবে তেমন অসুস্থ নয়। আহত। মাথায় পট্টা বাঁধা। তাতে শুকনো রক্ত দেখা যাচ্ছে। পট্টাটা খুলতেই ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাথার ঘিলু পর্যন্ত ঠিকড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নাকীর গতি খুবই ক্ষীণ। ক্রমেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মৃত্যু আসন্ন।

আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে প্রশ্ন করলাম, ‘এতবড় আঘাত কীভাবে লাগল?’

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি পাঁচটা প্রশ্ন করলেন, ‘ওর অবস্থা কি বুঝছেন? খারাপ কোন আশঙ্কা করছেন কি?’

ক্ষণিক ইতস্ততের পর না বলে পারলাম না—‘আর মাত্র দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই—’

আমার কথাটা শেষ হবার আগেই তিনি বলে উঠলেন, ‘অধ্যাপক, আপনি এখন যেতে পারেন।’

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন নিমো আমার কামরায় এলেন। তার চোখে মুখে গাভীর ঘের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি কোনোরকম সন্ধান না করেই আমাকে বললেন, ‘আমি সমুদ্রের তলদেশে যেতে চাইছি, আপনার পক্ষে আমার সঙ্গদান করা কি সম্ভব?’

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, ‘আপনার আদেশ পালন করতে আমি এক পায়ে খাড়া। আপনার সঙ্গে যমের দক্ষিণ দুয়ারে যেতেও আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই ক্যাপ্টেন।’

ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে জলের তলদেশে নামতে নামতে আমি প্রায় তিন শো গজ নিচে নেমে গেলাম। এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য এখানে লক্ষ্য করলাম। গাছগুলো সবই খনিজ পদার্থের রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আরও কিছুটা এগিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ঘাড় ঘোরাতেই নজরে পড়ল আমাদের পিছন পিছন একটা চৌকোণা বাস্ক নিয়ে চারজন আসছে। আমি কেবল এটুকুই বুঝলাম, অচিরেই আমি কিছু একটা অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হব।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গীদের একজন কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। ব্যাপারটা এবার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। কবর খোঁড়া হচ্ছে। আর ওই বাস্কেটায় সে হতভাগার মৃতদেহটা রয়েছে।

কবর খোঁড়ার কাজ সেসে শববাহকরা আবারে আচ্ছাদিত মৃতদেহটাকে ধীরে ধীরে তার মধ্যে রেখে দিল। মাটিচাপা দিয়ে কবর দেওয়ার কাজ মিটিয়ে ফেলল। এবার সবাই কবরের সামনে হাটুগেড়ে বসে প্রার্থনা করল।

তারপর আমরা প্রবাল দ্বীপের পাশ দিয়ে নোটিলাস-এ ফিরে এলাম। ক্যাপ্টেন নিমোর বৈচিত্র্যময় জীবনের আর একটা দিক কবরস্থানে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করলাম।

ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারলাম, তিনি যে কেবল সমুদ্রের বুকে স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপন করছেন তাই নয়, বিশ্রাম গ্রহণও তাঁর আর একটা উদ্দেশ্য।

চব্বিশে জানুয়ারি। নোটিলাস জলের তলায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা তখন ভারত মহাসাগরের বুকে অবস্থান করছি।

প্রায় তিন শো থেকে ছয় শো ফুট জলের তলা দিয়ে নোটিলাস এগিয়ে যেতে লাগল। এ অবস্থায় আমরা কয়েকটা দিন অতিবাহিত করলাম। এ অঞ্চলে ভারী সুন্দর অ্যালবেট্রিস ও শঙ্খচিল আমার চোখ ও মনকে যারপরনাই আনন্দ দিল। অ্যালবেট্রিস অনেকটা গাধার ডাকের মতো সুর করে থেকে থেকে চিল্লিয়ে ওঠে। আর দেখলাম, লাল ডোরাকাটা প্রচুরসংখ্যক পায়রার মতো ফিটন পাখি। আর্মডিলো মাছগুলো কচ্ছপের মতো খোলসের ভেতরে থাকে। তবে আবারগটা খড়ি বা পাথরের মত নয়। প্রকৃত হাড় দিয়ে গঠিত। আর চিটোভন মাছও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এদের গঠন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় মুখের দুপাশের গুঁড় দুটো। এদের শিকার ধরার কাজে ব্যবহার করে। আবার বন্দুকের গুলির মতো অভ্যাসার্ঘ্যভাবে জল ছুঁড়তেও এরা ওস্তাদ।

একশ থেকে তেইশে জানুয়ারি নোটিলাস চার শো পঞ্চাশ মাইল পথ অতিক্রম করে ফেলল।

চব্বিশে জানুয়ারি নোটিলাস কীলিং দ্বীপকে পাশে রেখে এগিয়ে চলল।

কিলিং দ্বীপের এলাকা ছাড়িয়ে নোটিলাসের গতি অনেকাংশে মন্থর করে দেওয়া হল।

পঁচিশে জানুয়ারি নোটিলাস ধীর মন্থরগতিতে এগিয়ে যাওয়ার সময় একঝাঁক আরগোনটস দেখে আমি ও কনসিল বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে পড়লাম। এরা শামুক জাতীয় প্রাণী। লম্বা গুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে কয়েক শো আরগোনটস সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে লাগল। প্রত্যেকের আঁটটা করে গুঁড়। এদের মধ্যে দুটোকে ইচ্ছানুযায়ী এদিক ওদিক চালাতে পারে। দৈর্ঘ্য কমাতে-বাড়াতেও পারে।

পরের দিন ছাব্বিশে জানুয়ারি। আমরা এবার উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ করলাম। এখানে বসে আমরা ভয়াল দর্শন ও ভয়ঙ্কর প্রকৃতিবিশিষ্ট হাঙরের মুখোমুখি হলাম। এরা সমুদ্রের আতঙ্ক হিসাবে বিবেচিত হয়। আর বংশবৃদ্ধিও খুবই দ্রুত হয়। সেস্ট্রাশি ও ফিলিস্ট গোস্টারী অন্তর্ভুক্ত এরা। এদের পিঠ গাঢ় খয়েরী, পেটের দিকটা সাদা আর গলায় কালো দাগের চারদিকে সাদা দাগ থাকে। একটা ব্যাপার ভাবলে অবাক না হয়ে পারা যায় না। এদের মুখে এগারো সারি লম্বা লম্বা দাঁত।

দানবাকৃতি অমিতশক্তিধর প্রাণীগুলো প্রচণ্ড আক্রোশে বার বার নোটিলাসের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। হাতের নাগালের মধ্যে এতগুলো হাঙর পেয়ে হারপুনবির নেডের আতঙ্কগুলো রীতিমতো নিসপিস করতে লাগল।

সাতাশে জানুয়ারি। সেদিন ভোর হতে না হতেই বঙ্গোপসাগরে ঢোকার মুখে অনেকগুলো মৃতদেহ জলে ভেসে যেতে দেখে চমকে উঠলাম। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত ভারতীয় গ্রামবাসীদের মৃতদেহ ওগুলো। গঙ্গা দিয়ে ভেসে সমুদ্রে এসে পড়েছে। মনে হল এখনও শকুনের শ্যেনদৃষ্টিতে পড়ে নি।

সক্কো সাতটার কাছাকাছি কনসিল। বিষয়ে অভিভূত হয়ে আমাকে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে অনুরোধ করল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই আমার চোখ দুটোও সমুদ্রের ওপর স্থির হয়ে গেল। দেখি সমুদ্রের জল দুধের মতো সাদা। অ্যামবরণার উপকূলবর্তী অঞ্চলেও এরকম দৃশ্য নজরে পড়ে। ইনফিসেরিয়া নামক অসংখ্য পোকা একত্রিত হয়ে সমুদ্রের জলকে এমন করে তোলে। এরা এক একটা এতই ক্ষুদ্র যেন, এক ইঞ্চির হাজার ভাগেরও কম। কখনও দেখা যায় এরা চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল এলাকা ঢেকে ফেলে।

আঠাশে জানুয়ারি। সকালে আমাদের নোটিলাস সমুদ্রের জলের ওপর ভেসে ওঠায় বুঝলাম, আমরা সিংহল দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি।

বিকালের দিকে ক্যাপ্টেন নিমো আর তাঁর সহকর্মীদের দর্শন মিলল। তিনি তাঁর সহকারীকে নির্দেশ দিলেন, মান্নার উপসাগরের দিকে নোটিলাসের মুখ ঘুরাতে। মানচিত্রের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'অধ্যাপক, মুক্তো সংগ্রহের ব্যাপারটা তেমন জটিল কাজ নয়। তবে মুক্তো সংগ্রহের সময় এখনও হয়নি। কিন্তু মনের সাধ মিটিয়ে হাঙর শিকার করা যাবে। তাই জাহাজের মুখ ঘুরাতে বলেছি।'

হাঙর শিকারের লোভটা আমার মনকে রীতিমতো চঞ্চল করে তুলল। ভারতবর্ষের জঙ্গলে বাঘ আর সুইজারল্যান্ডের জগ্গে ভল্লুক শিকার করা একই ব্যাপার। কিন্তু হাঙর শিকার করতে নামার আগে একবার ভেবে নেওয়া দরকার। হাঙরের সঙ্গে জলে ছুটোছুটি ও বারবার ওঠানামা করতে হয়। তখনই বুঝা যায় হাঙর শিকার কী কঠিন সমস্যা। জলে তারা অমিত শক্তিধর। মানুষের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি শক্তি—আমার ভালোই জানা আছে।

আন্দামানের অসভ্য জানোয়ারা একহাতে সুতীক্ষ্ণ ছোরা আর অন্য হাতে দড়ির ফাঁস নিয়ে হাঙরের সঙ্গে লড়াই করতে যায়। তাদের খুব কম সংখ্যই প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

আমি কনসিল আর নেডকে মুক্তো সংগ্রহে বুঝাতে গিয়ে বললাম, 'মুক্তো এক একজনের কাছে এক এক রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছে। কবির দৃষ্টিতে একটা মুক্তো এক বিন্দু চোখের জল, প্রাচ্যের মানুষরা একে শিমির বিন্দুর সঙ্গে তুলনা করে, নারীরা রক্ত নাম দিয়ে হাতে কানে গলার গহনায় ব্যবহার করে।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে মুক্তো ফসফেট এবং কার্বোনেট অব লাইমের মিশ্রণমাত্র। আর আমাদের মত বৈজ্ঞানিকরা বলেন, বিশেষ একপ্রকার ক্ষরিত রসই মুক্তো। সে যাই হোক, শোনা গেছে, একবার নাকি একটা ঝিনুক ভেঙে একশো পঞ্চাশটা মুক্তো বের করা হয়েছিল।

ঝিনুক থেকে মুক্তো বের করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, সমুদ্রের পাড়ে মাদুর বিছিয়ে ঝিনুকগুলো উপড় করে রাখা। খোলা-বাতাসের সংস্পর্শে তারা মারা যায়। দশ-বারোদিন পরে তারা পচতে থাকে। এবার তাদের সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে রাখা যায়। তারপর খোসা ছাড়িয়ে ঝিনুকের ভেতরের অংশটা সিদ্ধ করা হয়। এবার সতর্কতার সঙ্গে ছেঁকে নেয়া হয় যাতে মুক্তো বাইরে বেরোতে না পারে।

পরের দিন সকালে আমরা ডুবুরির পোশাক গায়ে চাপিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে প্রাটফর্ম গিয়ে দাঁড়ালাম। ডাঙার দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, নোটিলাস সিংহল দ্বীপের পশ্চিমে অবস্থান করছে। প্রায় কুড়ি মাইল এলাকা জুড়ে অফুরন্তা মুক্তো মেলে।

আমাদের নৌকো দ্বীপটার তীরের কাছাকাছি গেল। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘অধ্যাপক, ডুবুরিরা সমুদ্রের জলে হাতড়ে হাতড়ে মুক্তো সন্ধান করে।’

এবার বাতাসের যন্ত্রটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। গলা পর্যন্ত রবারের পোশাক তো আগেই পরে নিয়েছি। আমি জলের তলায় আলো পাওয়ার জন্য রুমকর্ক যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়াতেই ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, আমরা এমন কোন গভীর জলে যাব না যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশাধিকার পায় না। আরও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে, তার অত্যাঙ্ক আলোকরশ্মি স্থানীয় অধিবাসীদের নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষা নেই। তারা এমন হিংস্র যে, যে-কোনো সময় বিষমাখা তীর ছুঁড়ে প্রাণহানি ঘটতে পারে। অতএব আলো জ্বালার পরিণাম শুভ না হওয়ারই কথা।

ক্যাপ্টেন আমার হাতে বন্দুকের পরিবর্তে একটা ছোরা তুলে দিলেন। মুচকি হেসে তিনি বললেন—‘সিসার চেয়ে ইস্পাতের ক্ষমতা অনেক গুণ বেশি।’

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিত পাওয়ায় অবিশ্বাস্য উপায়ে একটা সমুদ্রের ঢেউ আচমকা এগিয়ে এসে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

সামান্য যেতেই অকস্মাৎ একটা গুহা আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন নিমো তার ভেতরে ঢুক গেলেন। আমরাও এক এক করে তাঁকে অনুসরণ করলাম। এবার বুঝলাম, খাড়া উৎরাই বেয়ে আমরা একটা গোলাকার গর্তের ভেতরে নেমে গেছি। ক্যাপ্টেন নিমোর তর্জনি-নির্দেশিত পথে চোখ ফেরাতেই অতিকায় একটা ঝিনুক চোখে পড়ল। সেটার প্রস্থ আড়াই গজেরও বেশি। এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম, একটা গ্রানাইট পাথরের ওপরে এবং পরবর্তীতে গুহার জলে ক্রমে আয়তনে বেড়ে উঠেছে। অনুমানে বুঝতে পারলাম, সেটার ওজন দশো পাউন্ডের কম নয়।

ক্যাপ্টেন নিমোর কথায় বুঝলাম, ঝিনুকটার অস্তিত্বের কথা ক্যাপ্টেন নিমো আগেই জান ছিলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো সেটার ডালা দুটো সামান্য ফাঁক করে তাতে হাতের ছোরাটা ঢুকিয়ে দিলেন, যাতে বন্ধ হয়ে না যায়।

আমি উপড় হয়ে উঁকি দিতেই ঝিনুকটার ফাঁক দিয়ে প্রায় নারকেলের সমান গোলাকার একটা মুক্তো স্পষ্ট চোখে পড়ল। তার অত্যাঙ্ক কিরণছটা জানান দিচ্ছিল, অমূল্য একটা রত্ন।

অকস্মাৎ ক্যাপ্টেন নিমো হেঁচকা টানে হাতের ছোরাটাকে বের করে নিলেন। বুঝতে অসুবিধা হল না। গুহাটার গোপন অন্তরালে ঝিনুকটা আরও বেড়ে উঠুক, তাঁর ইচ্ছা। ঝিনুকটার গা থেকে বছর বছর রস ক্ষরিত হলে মুক্তোটার আকৃতি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। আমার বিশ্বাস, সেটার তখনকার দামই কম সে কম পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড।

আরো মিনিট দশেক গুহাটার ভেতরে কাটিয়ে আমরা বেরোবার জন্য তার মুখে আসতেই ক্যাপ্টেন নিমো থমকে গেলেন। ইশারা করে আমাদের বসতে নির্দেশ করলেন। ফাটলের ধারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকতে বললেন। অতিকায় একটা ছায়া চোখে পড়তেই বুঝতে পারলাম, ক্যাপ্টেন নিমো কেন আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন। প্রথমে ভাবলাম, সেটা হাঙরের ছায়া। বসে, আমার কাঁধের কাছ থেকে একটা হিমেল শ্রোত সোজা নিচে নেমে এল। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস শুরু হয়ে গেল। আর শরীরের স্নায়ুগুলো ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভুল ভেঙে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সেটা হাঙর তো নয়ই অন্য কোনো সামুদ্রিকপ্রাণীও নয়—একজন ভারতীয় জেলে। মুক্তোর লোভে সমুদ্রে হানা দিয়েছে। তার পা দুটোর ফাঁকে একটা পাথর বাঁধা। আর একটা লম্বা দড়ির সাহায্যে নৌকার সঙ্গে দেহের সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করেছে। ঝিনুক কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে কোমরে বাঁধা একটা খোলায় ঢুকিয়ে দিতে লাগল।

ডুবুরিটা আমাদের দেখতে পায় নি। দেখলেও ধরে নিত তারই মতো কেউ ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ঝোলাটা বোঝাই হলেই ওপরে গিয়ে ঝিনুকগুলো নৌকায় ঢেলে রেখে আবার ফিরে আসতে লাগল। রাশিরাশি ঝিনুক সে কুড়িয়েছে বটে। কিন্তু তাদের কটার মধ্যেই বা মুক্তো আছে? হয়ত বা একটাতোও না। তবুও পেটের তাগিদে প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করে সমুদ্রের তলায় ঘোরা ফেরা তাকে করতেই হয়।

একসময় দেখলাম, লোকটা ব্যস্ত হয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। পর মুহূর্তেই একটা অতিকায় ছায়া নজরে পড়ল। দানবাকৃতি একটা হাঙর। বিশালাকৃতি গ্রীবা বিস্তার করে দ্রুত তার দিকে খেয়ে আসতে দেখা গেল। হিংস্র প্রাণীটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সে ঝট করে শুয়ে পড়ল।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল না। হিংস্র সামুদ্রিক প্রাণীটা লেজ দিয়ে সজোরে তার গায়ে আঘাত হানল। তার পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ক্যাপ্টেন নিমো হাতের ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে বিদ্যুৎগতিতে তার দিকে ছুটে গেলেন। ক্রোধান্বিত হাঙরটা তখন স্তব্ধ দাঁতগুলি দিয়ে হতভাগাটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়ার জন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি

হতেই ক্যাপ্টেন নিমো নরমাংসলোভী হিংস্র প্রাণীটার গায়ে ছোরাটা আমূল গেঁথে দিলেন। ব্যস, ফিনুকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সমুদ্রের জল লাল হয়ে উঠল। শুরু হয়ে গেল হিংস্র প্রাণী আর মানুষের মরাবাঁচার লড়াই। অচিরেই ক্যাপ্টেন নিমোর অভিজ্ঞ হাতের ছোরাটা হাঙরটার এক পাশের ডানার তলায় আবার গেঁথে গেল। হাঙরটার দাপাদাপি লেজের এক ঝটকায় ক্যাপ্টেন নিমো মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে গিয়ে আত্নানাদ করার চেষ্টা করলাম—আমার একটা পা পাথরের ফাটলে আটকে গেছে। হাঙরটা আমার দূরবস্তার ব্যাপারটা হয়ত বুঝতে পেরেছে। ক্যাপ্টেন থেকে আমি তার কাছাকাছি হওয়ায় সে গ্রীবা বিস্তার করে ফুঁসতে ফুঁসতে আমার দিকে ধেয়ে এল। ঠিক সে মুহূর্তেই নেড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এসে তার গায়ে হাতের ছোরাটা গেঁথে না দিলে সে নির্ধাৎ আমার মাংসেই জীবনের শেষ ভোজ সেরে তবে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করত।

আমরা যখন অক্ষত দেহে নোটিলাসে পৌঁছলাম তখন সাড়ে আটটা বাজতে চলেছে।

মান্নানের তীরে যে ক্যাপ্টেন নিমোকে আমি দেখলাম তাতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি মনুষ্যসমাজ ছেড়ে সমুদ্রে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছেন সত্য বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর স্নেহ-মায়া-মমতা কী গভীর। হৃদয়বৃত্তিকে তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি বলেই তো নিজের জীবনের মায়া তুচ্ছ করে হিংস্র হাঙরটার কবল থেকে ভুরিটাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে যেতে উৎসাহী হয়েছিলেন।

* * * *

উনত্রিশে জানুয়ারি। আমরা ক্রমে সিংহল থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। একসময় দ্বীপটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

নোটিলাস এবার কিলটার দ্বীপের গা দিয়ে সোজা এগিয়ে চলল। ভাস্কো-ডা-গামা চৌদ্দ শো নিরানব্বইয়ে এ দ্বীপটাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

আমরা জাপান থেকে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করার পর এ পর্যন্ত মোট ষোল হাজার দুশো কুড়ি মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

ত্রিশে জানুয়ারি। আমাদের জলযান নোটিলাস আরব এবং ভারতের মধ্যবর্তী সমুদ্র দিয়ে ওমানের দিকে ছুটে চলছিল।

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যাপ্টেন নিমো যে আমাদের কোথায়, কোনদিকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন তা কিছুতেই আমার মাথায় আসছিল না। পারস্য উপসাগর থেকে তো বেরোবার কোনো পথ নেই। পারস্য উপসাগরের পর বাবেলমণ্ড প্রণালী দিয়ে অবশ্য লোহিত সাগরে হাজির হওয়া যায়।

তেসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো চারটা দিন ধরে বিভিন্ন গতিপথ ধরে ও গভীরতায় নোটিলাস ওমান সাগরের জল তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কর্কটক্রান্তি পেরিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না।

শেষপর্যন্ত পাঁচই ফেব্রুয়ারি এডেনে উপস্থিত হতে পারলাম।

পরের দিন ছয়ই ফেব্রুয়ারি। নোটিলাস এডেনের কাছাকাছি একটা পাথরের ওপরে উঠে গেল। দুর্গ। আঠার শো উনচল্লিশে ইংরেজরা এটা তৈরি করেছিল।

সাতই ফেব্রুয়ারি। নোটিলাস বাবেলমণ্ডের প্রণালীতে প্রবেশ করল। এর দৈর্ঘ্য বত্রিশ মাইল আর প্রস্থ কুড়ি মাইল। নোটিলাসকে এবার জলের তলদেশ দিয়ে কিছুটা পথ অতিক্রম করতে হল। কারণ, বোম্বাই, কলকাতা ও মেলবোর্নগামী বহু জাহাজ ও স্টিমার বন্দরে নোঙর করে অবস্থান করছিল।

আউই মার্চ। আমরা লোহিত সাগর দিয়ে যাবার সময় অধুনালুপ্ত মোচা শহরটাকে একঝলক দেখে নিলাম। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এখনও কেবল দু-একটা প্রাচীর নিজের নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

নোটিলাস এবার আফ্রিকার দিকে ছুটতে লাগল।

নয়ই ফেব্রুয়ারি নোটিলাস পূর্বদিকে কুমফিঙ্গা আর পশ্চিমদিকে সৌযাকিন উপকূল রেখে এগিয়ে চলল। সত্য বলতে কি নোটিলাস যে কেবল উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র পাড়ি দেয়ার পক্ষেই উপযোগী তা-ই নয়, যথেষ্ট নির্ভরযোগ্যও অবশ্যই।

প্রাচীনকালেও ঝড়ঝঞ্ঝার ব্যাপারে লোহিত সাগরের খুবই অখ্যাতি ছিল। লাতিন এবং গ্রিক ঐতিহাসিকদের কেউ-ই এর যশগান করেন নি। আরবি ঐতিহাসিক এদ্রিসি আর স্ট্রাবো উভয়েই এর অখ্যাতি করতে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, ঝড়ের কবলে পড়ে এখানে বহু জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। আর রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে কেউই এখানে জাহাজ চালাতে সাহস করে না। আগাথার সুইডিস, আর্টস ডোরাস ও আরিয়ান প্রমুখরাও একই মত পোষণ করতেন। এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে, ওইসব ঐতিহাসিক বা অন্য কোনো সমুদ্রযাত্রীই ডুবোজাহাজে চেপে লোহিত সাগর অতিক্রম করার সুযোগ পান নি।

প্রসঙ্গক্রমে ক্যাপ্টেন নিমো মুচকি হেসে বললেন, ‘অধ্যাপক, কথাটা খুবই সত্য বটে। আধুনিক জাহাজও তো উন্নত হতে হতে বহুদিন বাদে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাষ্পের আবিষ্কার হতেই তো কয়েক যুগ পেরিয়ে গেছে। অতএব আর একটা নোটিলাস তৈরি করতে আরও একশো বছর পেরিয়ে যাবে, ঠিক কি না? আর মানুষের অগ্রগতি ঘটেছে খুবই চিমে ভালো।’

আমি মুচকি হেসে ঘাড় কাৎ করে তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলাম, ‘সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ক্যাপ্টেন, একটা প্রশ্ন করছি, সমুদ্রের সঙ্গে আপনার পরিচয় তো দীর্ঘদিনের। লোহিত সাগর নামের উৎস আপনার জানা আছে কি?’

‘হ্যাঁ, আছে। অনেক ঐতিহাসিকই এ ব্যাপারে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন বটে। তবে এখন আপনাকে চতুর্দশ শতাব্দীর এক ঐতিহাসিকের মতামতের কথা বলছি। যদিও তিনি কিছুটা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, তবু বলছি।

তিনি বলেন, মিশরের ফ্যারাও যখন মুশাকে তাড়া করে অহসর হচ্ছিলেন তখন মুশাক নির্দেশে সমুদ্র উপ্তাল উদ্দাম রূপ ধারণ করে ফ্যারাও ও তার বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তখন থেকেই এর নামকরণ করা হয় 'রেডসি' বা 'লোহিত সাগর'।

‘এটা তো নিছকই একটা কল্পনাপ্রবণ মনের ব্যাখ্যা। এ ব্যাপারে আপনার মত কি ক্যাপ্টেন?’

‘আমার বিশ্বাস, এ নামটা প্রাচীন হিব্রু শব্দ ‘অ্যাডাস’ থেকেই উৎপত্তি হয়েছে। প্রাচীনকালের মানুষ সমুদ্রটাকে জলরাশির রঙের বিশেষত্বের দিকটা বিবেচনা করেই এরকম নামকরণ করেছেন। আর একটু এগিয়ে গেলেই রঙের বিশেষত্বের ব্যাপারটা আপনার চোখেও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে অধ্যাপক। আর এখানকার জাল লাল রঙ বিশিষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে, এখানকার জলে এক প্রকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লাল রঙের প্রাণী বিদ্যমান। তারা অসংখ্য অগণিত। খালি চোখে রঙ ছাড়া তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়।’

‘ক্যাপ্টেন, মুশা ও ফ্যারাও যে পথ ধরে অহসর হয়েছিলেন লোহিত সাগরের বুকে কেমন কোন নিদর্শন আপনার চোখে পড়েছে কি?’

‘না। সে পথটা এখন বালিচাপা পড়ে গেছে। সে পথে নোটিলাসকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আশা করি বুঝতেই পারছেন অধ্যাপক?’ ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন—আগামী পরশুর মধ্যে পোর্ট সৈয়দের ধার দিয়ে যাব। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সুরেজের ভেতর দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ, তার তলদেশে একটা ভূগর্ভস্থ রয়েছে।

আমাদের নোটিলাস এবার আরবের তীরভূমির দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরের দিন, দশই ফেব্রুয়ারি সমুদ্রের বুকে অকস্মাৎ কি যেন একটা লম্বাকৃতি বস্তু দেখতে পেলাম। নোটিলাস থেকে এখন তার দূরত্ব এক মাইলেরও কম ছিল। গোড়াতে আমি সেটাকে একটা বালুতট ভেবেছিলাম। একটু বাদেই আমার ভুল ভাঙল। প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা ডিউগং। অতিকায় সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী।

ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, ‘ডিউগং শিকার করা বাস্তবিক কঠিন সমস্যা। তারা অতর্কিতে শিকারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর নৌকা ডুবিয়ে দেয়া তাদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।’

আমরা নৌকা নিয়ে ডিউগংটার দিকে ধীরগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলাম। নেড হারপুন হাতে নৌকার গলুইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে। সেটার সঙ্গে কুড়ি ফুট লম্বা শক্ত দড়ি বাঁধা।

অতিকায় দানবটার মুখের দুই ধারে হাতির মত লম্বা দুটো দাঁত ঝকঝক করতে লাগল। আর সে নিজে চল্লিশ ফুট লম্বা তো হবেই।

দূর থেকে মনে হল সামুদ্রিক দানবটা ঘুমে অচৈতন্য। মাত্র ছয় গজ দূর থেকে নেড হারপুনটা ছুঁড়ে দিল। বরাত মন্দ। হারপুনটা তার গায়ে আঘাত করল না। সে কেবলমাত্র বার কয়েক সূতীর স্বরে হিসহিস শব্দ করে ঝপ করে ডুব দিল। বাস। একেবারে উপাধ। হারপুনটা গিয়ে সশব্দে জলে আছাড় খেয়ে পড়ল।

না, ডিউগংটা জলের তলায় বেশিক্ষণ রইল না। কয়েক মুহূর্তেই আবার ভুস করে ভেসে উঠল। নেড হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। তাকে তাড়া করল। আবার শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দিল হারপুনটাকে ছুঁড়ে। এবারও প্রয়াস ব্যর্থ হল। হারপুনটা ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই সে আচমকা ডুব দিয়ে নজরের আড়ালে চলে গেল।

ডিউগংটার শয়তানি দেখে নেড তো রেগে একেবারে আগ্নিশর্মা হয়ে গেল। প্রায় একঘণ্টা ধরে হতচছাড়া ডিউগংটা নেডের সঙ্গে লুকোচুরি খেলল।

এবার ডিউগংটার মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। আমাদের নৌকা থেকে মাত্র কুড়ি ফুট দূরে অবস্থান করে সে অত্যাচার্য্য এক কাণ্ড করে বসল। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে রুখে দাঁড়িয়ে বিশালায়তন নাকের ছিদ্র দুটো দিয়ে নিঃশ্বাস নিল। শক্তি সঞ্চয় করে অতর্কিতে একটা লাফ দিয়ে দুম করে আমাদের নৌকার ওপর এসে পড়ল। তারপর সে কী দাপাদাপি! আমাদের মাঝি খুবই অভিজ্ঞ বলে কোনোরকমে নৌকাটাকে রক্ষা করতে পেরেছে। এদিকে নেড তার গায়ে হারপুন দিয়ে ঘন ঘড়ন আঘাত হানতে লাগল। সবশেষে চরমতম একটা আঘাত হেনে সামুদ্রিক দানবটাকে কাবু করতে পারল। প্রায় দশ হাজার পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট মড়া ডিউগংটাকে নিয়ে আমাদের নৌকাটা নোটিলাসের দিকে এগিয়ে চলল।

এবার আমাদের ডুবোজাহাজটা একটা সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল। প্রায় মিনিট চল্লিশ চলার পর সেটা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে হাজির হল।

পরের দিন চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি, ক্যাপ্টেন নিমো এক অত্যাচার্য্য কাণ্ড করে বসলেন। সেলুনের জানালাগুলো দৃঢ়ভাবে আটকে দিলেন। এরকম ঘটনা এই প্রথম দেখলাম।

আমি সেদিন এক ধরনের ক্ষুদ্রাকার ও অত্যাচার্য্য প্রকৃতির মাছ দেখতে পেলাম। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন—‘এরা রোমোরো মাছ। এরা অদ্ভুতভাবে হাঙরের পেটের সঙ্গে ঝুলে থাকে। প্রাচীন লোকদের মতে জাহাজের তলদেশে এরা অনায়াসে আটকে থেকে তার গতি রুদ্ধ করে দেয়। কথিত আছে, অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধচলাকালীন এরা সম্রাট অ্যাস্টেমের জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দিয়ে সম্রাট অগাস্টামের জয়লাভ সহজতর করে দিয়েছিল। গ্রিকদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত হয় যে অ্যানথিই মাছ তাও চোখের সামনে দেখলাম। ‘অ্যানথিই’ নামটার অর্থ ফুল।

ক্যাপ্টেন নিমো এক বুড়ো ডুবুরির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে খুব কম সময়ই ডাঙায় কাটায়। তার নাম নিকোলাস পেস্কা। মুক্তোর খোঁজে সে এমন কি ফ্রিট দ্বীপ পর্যন্ত চলে যায়।

এক দুপুরে ক্যাপ্টেন নিমোকে দেখলাম সিন্দুক খুলে তার ভেতরে থেকে একটা বাস্ক বের করতে। তার মধ্যে অনেকগুলো সোনার বাট। আমার ধারণা কম হলেও চার হাজার পাউন্ড সোনা তো হবেই। আর সেগুলোর দাম অস্তুত দুই লক্ষ পাউন্ড। আমি আড়াল থেকে তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। তিনি এবার বাস্কটর গায়ে ঠিকানা লিখলেন। মনে হল তিনি গ্রিক ভাষা ব্যবহার করলেন। বাস্কটাকে আবার সিন্দুকটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা বন্ধ করলেন। এবার

বোতাম টিপলেন। চারজন গাটগোটা লোক ছুটে এসে সিন্দুকটাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। তারপর কপিকলের সাহায্যে সেটাকে ওপরে তুলে নেয়া হল।

আমি মনোমিটারের দিকে চোখ ফেরালাম। বুঝলাম, আমরা সাট ফুট জলের তলায় রয়েছি। কিন্তু খুব গরম বোধ করতে লাগলাম। মনে হল নোটিলাসে বুঝি আন্তন লেগে গেছে। নইলে এত গভীর জলে তো কিছুতেই গরম লাগতে পারে না। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। আমার বিশ্বাসের কারণ বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন, 'অধ্যাপক, আমরা এখন ফুটন্ত জলের মধ্য দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছি।'

বাইরের দিকে চোখ ফেরাতেই নজরে পড়ল, সাদা জল। গন্ধকের গন্ধ বেরোচ্ছে। আর জল রীতিমতো টগবগ করে ফুটছে।

ক্যাপ্টেন নিমো আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বললেন, 'আমরা এখন সানটোরিন দ্বীপের কাছাকাছি অবস্থান করছি। আমাদের বর্তমান অবস্থান পলিবেমেনি ও নিয়োকোমেনির মধ্যস্থলস্থ একটা খাল। সমুদ্রের যে অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে সেখানকার গঠনকার্য এখনও মোটেই সম্পূর্ণ হয়নি।

আঠার শো হেক্টরির তেসরা ফেক্রয়ারি নিয়োকোমেনির কাছে গন্ধক পরিপূর্ণ উষ্ণ বাষ্পের মধ্য থেকে একটা দ্বীপের আবির্ভাব ঘটেছিল। 'জর্জ আইল্যান্ড' যার নামকরণ করা হয়। সে মাসেরই ছয় তারিখে দ্বীপটা আবার সমুদ্রে তলিয়ে যায়।

অ্যাঙ্কোয়েসরা দ্বীপটা আবির্ভূত হয় তার সাতদিন বাদে, তেরোই ফেক্রয়ারি। অবিস্থাস্য কাণ্ডটা যখন ঘটে আমি তখন সমুদ্রের ওপরে অবস্থান করছি। সেটা একটা গোলাকার দ্বীপ। তার ব্যাস তিন শো ফুট এবং উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ত্রিশ ফুট। কেমনির কাছাকাছি রেকা নামক সে দ্বীপটার অবস্থান।

আমাদের ডুবোজাহাজ নোটিলাস জিব্রাল্টার প্রণালীর চিবি অতিক্রম করল। আমরা ভূমধ্যসাগরের দ্বিতীয়ার্ধে হাজির হলাম যোলই ফেক্রয়ারি। এখানে গভীরতা ছয় হাজার ফুটের কাছাকাছি।

আঠারোই ফেক্রয়ারি বলা তিনটায় নোটিলাস জিব্রাল্টার প্রণালীর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। হারকিউলিসের সুদৃশ্য মন্দিরটার ধ্বংসাবশেষ আমাদের মাত্র একবলক দেখার সৌভাগ্য হল।

আমরা সুপ্রশস্ত আতলাস্তিক মহাসাগরে হাজির হলাম। এতে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলি পতিত হয়েছে। টেম্পেস্ত ও হর্ন অন্তরীপ দুটো এর দুধারে অবস্থান করছে।

নোটিলাস চলেছে তো চলেছেই। তার চলার বুঝি শেষ হবে না কোনোদিনই। এবার আমরা ডিস্কো উপসাগরে হাজির হলাম।

অত্যুজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো নোটিলাসের চারদিকে ছড়িয়ে নেয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিমো সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগলেন— 'অধ্যাপক, এটাই সতের শো দুই সালের বাইশে অক্টোবরের রণক্ষেত্র বলে পরিচিত। এখানেই স্পেনীয় জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এখানকার যাবতীয় ধনরত্নের আমিই একমাত্র মালিক। একমাত্র এখানেই সোনাদানা ও মণিমুক্তো প্রভৃতি প্রায় দুই কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে। ডিস্কো উপসাগরের এ জায়গাটা ছাড়াও আরো হাজারো স্থানে জাহাজডুবি হয়েছে। আমার মানচিত্রে সবগুলো জায়গার উল্লেখ রয়েছে।'

এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে তিনি বললেন, 'অধ্যাপক, এবার আশা করি বুঝতে পারছেন, আমার কাছে কোটি কোটি টাকা কোথেকে আসে, তাই না?'

উনিশে ফেক্রয়ারি। ক্যাপ্টেন নিমো আমার কামরায় এলেন। কোনোরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিলেন, আমাকে নিয়ে একটা জায়গায় বেড়াতে যেতে অগ্রহী। আর আজ পর্যন্ত আমাকে যত জায়গায় নিয়ে গেছেন সবই দিনের আলোতে। এবার রাত্রের অন্ধকারে আমি বেড়াতে উৎসাহী কি না?

আমি এক কথাতেই রাজি হয়ে গেলাম।

কেবল বাতাসের পাত্রটা পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম। আর একটা বর্শা ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিতে দিলেন না। এমনকি অত্যাাবশ্যক আলোটা পর্যন্ত না। তাঁর কথায় বুঝলাম, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই সঙ্গে যাচ্ছে না।

আমরা যাত্রা করলাম। আশ্চর্য ব্যাপার! মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আতলাস্তিকের তলদেশে পৌঁছে গেলাম। গাঢ় অন্ধকারে মোড়া সম্পূর্ণ অঞ্চলটা হঠাৎ একটা অত্যুজ্জ্বল লাল আলো আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করল। আরও অবাক হতে হল রহস্যজনক আলোটার উৎসস্থল বুঁজতে গিয়ে। সেটা যে কিভাবে জ্বলছে কিছুতেই আমার বোধগম্য হল না।

ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই আলোটার রহস্যভেদ করতে পারলাম। আট শো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত সাদা উজ্জ্বল একটা পিও থেকে অত্যুজ্জ্বল যে আলোকচ্ছটা নির্গত হতে দেখলাম, পাহাড়ের ওপরের আলো স্বচ্ছ জলে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের যাড়ে পড়ছে, এবার বুঝতে পারলাম।

সকাল হলে আমরা পাহাড়ের ওপরের একটা ঢালু জায়গায় হাজির হলাম। বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিলে তবে তার চূড়ায় উঠতে পারব। ক্যাপ্টেন নিমো বীরবিক্রমে পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। হাতের বর্শাটার ওপর ভর দিয়ে, সন্তর্পণে উঠতে হচ্ছে। কোনক্রমে পা হড়কে গেলে আর দেখতে হত না। আমাদের তখনও এক শো ফুট ওঠার বাকি। দুধারে জানা অজানা কত সব গাছের জঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে পথ তৈরি করে করে আমাদের এগোতে হচ্ছে।

পাহাড়টার আরও কয়েকটা খাপ উঠে বিরাট একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। বুঝতে অসুবিধা হল না, ঈশ্বর নন, মানুষই এর সৃষ্টিকর্তা। কারণ, দুর্গ ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে এরকম না ভেবে

উপায় কী? আরো বুঝলাম প্রলয়ঙ্কর প্রাবনের ফলে শহরটা কোনো না কোনোদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। শহরটার নাম কী? এ আমি কোথায় এসেছি, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ক্যাপ্টেন কিছুই বললেন না। কেবলমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করে আমাকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ করলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে গেলাম। পরে বুঝতে পারলাম যেটা আগুনের মতো রক্তাভ দেখতে সেটা আসলে আগ্নেয়গিরি। সেটাই মশালের মত সমুদ্রের অনেকখানি অংশ অত্যাঙ্কুল আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। এটা কেবল লাভা উদ্দীর্ণণই করে। আগুনের বৃদ্ধি পেতে পারে না। বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, লাভা সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত হতে থাকে। প্রথমে পাহাড় সৃষ্টি করেছে। পরে সেগুলো পাহাড়টার গায়েও তার পাদদেশে সঞ্চিত হচ্ছে। ভিসুভিয়াসে ঠিক যেমন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে। বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে।

আমি চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ একে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে টান্ধান স্থাপত্য ও সভ্যতার নিদর্শন চাক্ষুস করতে লাগলাম। আর এখানেই তো একটা খ্রিস্টীয় দুর্গ ছিল। অ্যাথিনি দেবীর মন্দিরের চূড়াটাকেও জলে ভাসমান অবস্থায় দেখতে পেলাম। আর বন্দরের ধ্বংসাবশেষও আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

কিন্তু একটা কথা বারবার আমার মনের কোণে ঊঁকি মারতে লাগল—আমি কোথায় এসেছি? এর উত্তর না জানা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নাই। ক্যাপ্টেন নিম্নোক্ত জিজ্ঞাসা করেও ফল পেলাম না। এবারও তিনি সতর্কতার সঙ্গে প্রশ্নটা এগিয়ে গিয়ে কালো একটা পাথরের গায়ে বড় বড় হরফে লিখলেন—‘অ্যাটলান্টিস’।

‘অ্যাটলান্টিস’ শব্দটা পড়তেই আমার সর্বাস্থে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগল। মনপ্রাণ অবর্ণনীয় রোমাঞ্চে ভরপুর হয়ে গেল। ভাবলাম, তবে প্লেটো ও থিওসপাস ওরিয়েন জ্যামব্লিকাস, অ্যাটলান্টিস, হ্যামবোল্ট এবং মন্টেক্রন প্রভৃতি সভ্যতার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। আর আমি এ-ও স্পষ্ট অনুমান করতে পারলাম, ইউরোপ, এশিয়া, লিবিয়া এবং হারকিউলিস স্তম্ভের ওপর অবস্থানরত এ ঐতিহ্যময় দেশটা বিরাট কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ধ্বংসস্থাপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাকেই আজ আমি চোখের সামনে দেখছি। এখানে, ঐতিহ্যের ধারক ও স্থানেই একদিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ আর তার সঙ্গী সাথীরা বসবাস করত।

ক্যাপ্টেন নিম্নের পিছনে পিছনে নোটিলাসে ফিরে এলাম। তার পরের দিন অর্থাৎ বিশেষ ফেব্রুয়ারি কম্পাসের দিকে তাকালাম। বুঝলাম, নোটিলাস দক্ষিণাদিকে, ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এখানে পাঁচ ফুট লম্বা রে মাছ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তা ছাড়া পনের ফুট লম্বা গ্রুকার মাছ, বিভিন্ন জাতের হাঙর তো আছেই।

কনসিল প্রায় তিন গাজ লম্বা এক বাক মাংসল ম্যাকারাইস মাছের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ প্রান্তে সুদীর্ঘ একটা প্রাচীর আমার চোখে পড়ল। দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

ক্যাপ্টেন নিম্নো মুচকি হেসে বললেন—‘অধ্যাপক, আমরা এখন একটা মৃত আগ্নেয়গিরির ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি। আপনি তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। নোটিলাস একটা খালের ভেতর দিয়ে এ গর্তটায় প্রবেশ করে। এমন নিশ্চিত আশ্রয়স্থল সচরাচর পাওয়া যায় না। ঝড়ের প্রকোপ কিছুই করতে পারে না।’

আমি বললাম, ‘এখানে প্রবেশ, মানে আশ্রয় নেওয়ার দরকার কি, বলুন তো?’

‘বিদ্যুৎ তৈরি করে নিতে—নোটিলাসের গতির জন্য এর দরকার। বিদ্যুৎ তৈরি করতে গেলে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর মধ্যে প্রথম নাম করতে হয়। সোডিয়ামের। কয়লা থেকে সোডিয়াম পাওয়া যায়। এখান থেকে আমার লোকেরা কয়লা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। সোডিয়াম থেকে আমি বিদ্যুৎ তৈরি করে নোটিলাসে ব্যবহার করি।’

পাহাড়টার চূড়ার দিকে ওঠা সম্ভব হল না। ফলে নামতে লাগলাম। মৃত আগ্নেয়গিরির মুখটাকে বিশাল একটা কুয়ার মতো মনে হল। আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আমরা নোটিলাসে ফিরে আসতে পারলাম।

আটলান্টিকে ‘গালফ’ নামে একটা উষ্ণ জলস্রোত আছে। এটা মেক্সিকো উপসাগর অতিক্রম করে দুটো পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে এগিয়ে গেছে। একটা ধারা আফ্রিকার তটভূমি হয়ে আটলান্টিকের দিকে বিস্তৃত আর অন্যটা আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ের দিকে এগিয়ে গেছে। আতলান্তিকে সার্মাসো নামে একটা হ্রদ বর্তমান। এতে এমনসব সামুদ্রিক উদ্ভিদ রয়েছে যারা জাহাজ চলাচলে বাধা প্রদান করে।

বাইশে ফেব্রুয়ারি। সামুদ্রিক উদ্ভিদ আচ্ছাদিত সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে আমাদের সারাটা দিনই কাটিয়ে দিতে হল।

তেইশে ফেব্রুয়ারি থেকে বারোই মার্চ পর্যন্ত আমাদের আটলান্টিকের মধ্যভাগেই কাটাতে হল। আমি ভাবলাম, নিম্নো হর্ন অন্তরীপ ঘুরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে হাজির হবো।

নেভ এবার ক্যাপ্টেনের মতিগতিতে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। দ্বীপহীন সমুদ্রে নোটিলাস ছেড়ে পালানোর চিন্তা তো করাই যায় না। তাছাড়া তাঁর মতের বিরুদ্ধে পা বাড়াবার ক্ষমতাই বা আমাদের কোথায়?

গত উনিশ দিন লক্ষণীয় কিছুই ঘটে নি।

এবার নোটিলাস প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট জলের তলা দিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। এখানে জলের চাপ এতই বেড়ে গেছে যে, নোটিলাসের লোহার পাতগুলো বেঁকে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল।

আরও—আরও গভীরে যেতে লাগল নোটিলাস। আমরা এবার জলের ছিয়ানব্বই হাজার গজ তলায় অবস্থান করছিলাম। আরও কিছুটা পথ পার হয়ে ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোটিলাসকে ক্রমে ওপরে তুলে নেয়া হল।

তেরো এবং চৌদ্দই মার্চ নোটিলাস সোজা দক্ষিণ মুখে এগিয়ে মেক্স প্রদেশের দিকে চলতে লাগল।

একটা ব্যাপার আমার নজরে পড়ল—ইদানিং নেভ খুবই কম কথা বলছে। দীর্ঘ বন্দিদশাই তার মুখের ভাষা একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে। বুঝতে অসুবিধা হল না। তাছাড়া এখন ক্যাপ্টেন নিম্নোকে দেখলেই সে রেগে একেবারে কাঁই হয়ে যায়। মুখ গোমড়া করে অনবরত ফুঁসতে থাকে। আমার একটাই ভয়, মাথা গরম করে আবার হাস্যাম জুড়ে না দেয়।

সেদিনই কনসিল আমার কামরায় ঢুকে সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, নোটিলাসে কজন আছে বলে আপনার বিশ্বাস?'

তার এরকম আচমকা প্রশ্নে আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। মনের ভাবটুকু সামলে নিয়ে বললাম, 'এটা তো আমার পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।' আমতা আমতা করে বললাম, 'এটা চালানোর জন্য জনা দশেক লোকই যথেষ্ট।' আসলে বোধ হয় বেশিই রয়েছে।'

'আপনি কি হিসাব করে বের করতে পারবেন না স্যার? এর আয়তন, কতখানি বাতাস ধরতে পারে—চব্বিশ ঘন্টায় তো জলের ওপর ভেসে বাতাস সংগ্রহ করে নিতে হয়। পারবেন না হিসাব কষে লোকের সংখ্যা বের করতে?'

'এভাবে একেবারে নির্ভুল সংখ্যা পাওয়া সম্ভব না—ও হতে পারে। তবে ঘন্টায় কুড়ি গ্যালন অক্সিজেন একজনের পক্ষে পক্ষে দরকার হয়। তবে চব্বিশ ঘন্টায় চারশো আশি গ্যালন অক্সিজেন এক-একজনের চাই। তবে নোটিলাসে কত গ্যালন বাতাস মোট ধরে। নোটিলাসের মোট ওজন দেড় হাজার টন। এক টনে দুহাজার গ্যালন বাতাস বহন করতে পারে। তবে মোট বাতাসের পরিমাণ হচ্ছে, ত্রিশ হাজার গ্যালন। একে আটচল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে ফল দাঁড়ায় ছয়শো পঞ্চাশ গ্যালন। এতে একজন লোক চব্বিশ ঘন্টা সুষ্ঠুভাবে স্বাস্থ্যকর্য চালাতে সক্ষম হয়।'

আমার কথা শুনে কনসিল দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফ্যাকাশে মুখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে নেডের ব্যাপার-সাপার দেখে কনসিল আবার আমার কামরায় এল। বলল, 'স্যার, নেড যেন একেবারে ক্ষেপে গেছে। তার পক্ষে সম্ভব নয় এমন কোন কাজই নেই। সে থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।'

সেদিন নেড বিষণ্ণমনে দাঁড়িয়ে। অতিকায় একটা তিমি দেখে সোল্যাসে আমাকে বলে উঠল, 'স্যার, ওই দেখুন! ওই যে, ওই দিকে কত বড় একটা তিমি! তার নাক দিয়ে তীব্র বেগে জল বেরিয়ে আসছে, দেখুন!' হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'ধ্যুং চাই! এ খাঁচায় বন্দি থেকে জীবনটা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল! এমন একটা তিমি হাতের নাগালে পেয়ে কিছু করার নেই।' কথাটা বলেই সে আক্রোশ ও উত্তেজनावশত নোটিলাসের গায়ে আচমকা একটা ঘুষি হাঁকিয়ে বসল।

পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'স্যার, এগুলো অনেকটা উত্তরাংশের তিমির মতোই, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমি এক হাত পর্যন্ত লম্বা তিমি দেখেছি। শুনেছি, অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের উমগালিক লা হুমালক দ্বীপে নাকি দেড় শো হাত লম্বা তিমি দেখা যায়।' নেড এবার আমাকে লক্ষ করে বলল, 'স্যার, আপনি বলেছিলেন, ক্যানেন্টরা ছোট্ট প্রাণী। আসলে তা কিন্তু নয়। আর বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ তারা নাকি সামুদ্রিক গাছপাছালি দিয়ে নিজেদের সারা দেহ এমন অত্যাশ্চর্যভাবে ঢেকে রাখে যে, লোকে তাকে দ্বীপ ভেবে আশ্রয় নিতে যায়—আরে এষে দেখছি দশ-দশটা—না, দশটা নয়, কুড়িটা।—আরেকবার! তিমির পুরো একটা দল! হায়! এ দেখেও আমাকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে!'

আমি নিতান্তই নিরুপায়—অসহায়! কথাগুলো বলে সে উত্তেজनावশত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

একটু পরে ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। নেড নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বলে উঠল, 'স্যার, আমি একজন দক্ষ হারপুনবির। আমাকে যদি দয়া করে তিমি শিকারের অনুমতি দেন—'

'কেন অনুমতি দেব? নিতান্তই শিকারের নেশা? তিমির চর্বিব প্রয়োজন আমাদের তো হয় না। তবে লোহিত সাগরে ডিউগংটাতে শিকার করতে গিয়েছিলাম আমাদের মাংসের চাহিদা পূরণের জন্য। শোন, শখ পূরণ করতে গিয়ে ধ্বংস করতে তো আমি দিতে পারি না। তেল ব্যবসায়ীরা এমনিতেই তিমি মেরে মেরে তাদের বংশলোপাটা করতে চলেছে!'

এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, 'অধ্যাপক, সমুদ্রের বুকে ওই যে কালো মতো বস্তু দেখা যাচ্ছে, ওটা ক্যাচাল্টে নামক ভয়ঙ্কর একপ্রকার প্রাণী। তিমির প্রধানতম শত্রু। এক একটা দলে একশো থেকে দুশো পর্যন্ত ক্যাচাল্টে থাকে। তারা খুবই হিংস্র। তাদের হত্যা করলে আমার তিলমাত্রও আক্ষেপ হয় না। হিংস্র প্রাণীদের জন্য আমার সামান্যতমও মায়া-মমতা নেই।'

পকেট থেকে চুরট বের করে ক্যাপ্টেন নিমো তাতে অগ্নিসংযোগ করে একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'ক্যাচাল্টেদের এক একটার দৈর্ঘ্য প্রায় পঁচাত্তর ফুট। দেহের এক তৃতীয়াংশই মাথা। এক ইঞ্চি লম্বা পঁচিশটা করে দাঁত তাদের ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তিমির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে তারা দুদিক থেকে সুবিধা পায়। যেমন ধরুন, তিমির চেয়ে অনেক, অনেক বেশি সময় ক্যাচাল্টে জলের তলায় অবস্থান করতে পারে। আবার অস্ত্রও তিমির চেয়ে অনেক বেশি।'

ব্যস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুই সমুদ্র-দানবের মুখোমুখি লড়াই। ভয়ঙ্কর সে লড়াই! সমুদ্রের জল রীতিমত তোলাপাড় করতে লেগে গেল। কেবলমাত্র তিমিই নয়, হিংস্র ক্যাচাল্টেদের মধ্যে কয়েকটা তো নিদারুণ আক্রোশে নোটিলাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু নোটিলাস তো নিজেই একটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র। ফলে সমুদ্রের জল রক্তবর্ণ ধারণ করল। আর সে লালবর্ণ বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করে নিল। শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখে চার-ছয়টা ক্যাচাল্টে প্রাণ নিয়ে পালাল।

নোটিলাসের গা ঘেঁষে একটা তিমিকে ভেসে যেতে দেখা গেল। মরা তিমি। নোটিলাসের দুজন কর্মী এক অবাক কাণ্ড শুরু করে দিল। তারা দুটো বালতি নিয়ে নোটিলাস থেকে বেরিয়ে তিমিটার বুকের ওপর চেপে বসল। তার বুক থেকে দুধ দোহন করতে লাগল। পুরো দুই বালতি দুধ নিয়ে তারা আনন্দে নাচতে নাচতে নোটিলাসে ফিরে এল। একটু পরে আমাকে এক গ্লাস গরম তিমির দুধ পান করতে দিল। আশ্চর্য ব্যাপার তো, মনে হল আমি বৃষ্টি মৌজ করে গরুর দুধ পান করছি।

চব্বিশে মার্চ। নেড ইতিপূর্বে একবার উত্তর মেরুতে যাওয়ার সৌভাগ্যলাভে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু আমি আর কনসিল এই প্রথম সেদিকে এগোচ্ছি। জলে ভাসমান বিশালায়তন বরফের চাঁইকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে দেখে

আমরা উভয়েই খুশিতে লাফালাফি করতে লাগলাম। সূর্যের আলো এদের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে নানারঙে আমাদের চোখে হাজির হয়।

বরফের রাজ্য দিয়ে নোটিলাসকে এগোতে এগোতে একসময় ষাট ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছাতেই দেখলাম আমাদের পথ রুদ্ধ। ক্যাপ্টেন অনেক চেষ্টা করে সংকীর্ণ একটা পথ দিয়ে সেটাকে কোনোক্রমে বের করে আবার এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন।

বরফের সমতল ক্ষেত্রে পৌঁছে দেখলাম সেখানে তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির চেয়েও তিন ডিগ্রি নিচে। ক্যাপ্টেন বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে নোটিলাসকে সাধ্যমত গরম রাখার ব্যবস্থা করলেন। আমরা যদি আরও দুই মাস পরে এখানে আসতাম তবে সূর্যের পূর্ণ আলোক দেখে চোখ ও মনকে ধন্য করতে পারতাম। এখন ঘণ্টা তিনেক করে অন্ধকার এখানে বিরাজ করে। ক্রমে ক্রমে একসময় এক নাগাড়ে ছয় মাস সূর্য অদৃশ্য থাকবে—ঘুটঘুটে অন্ধকার।

ষোলই মার্চ নোটিলাস দক্ষিণ মেরুর মেরুবলয় অতিক্রম করে এগিয়ে চলল। তুষারাজ্যের সৌন্দর্য যে এমন অকল্পনীয় হতে পারে তা নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাওয়া যায় না।

আমি কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, একটা কথা, এর আগে কেউ দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করতে পেরেছেন কি?'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'না, কেউই না। আমরাই প্রথম দক্ষিণ মেরুতে যাছি।'

ক্যাপ্টেনের কথায় গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠল।

নোটিলাসকে বরফের ওপর দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করলাম।

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন—'না, এখন থেকে আর বরফের ওপর দিয়ে নয়, নোটিলাস এবার থেকে বরফের তলা দিয়ে পথ পাড়ি দেবে।'

'বরফের তলা দিয়ে' কথাটা শুনেই আমার বুকের ভেতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন নিমো আমার মনে অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন—'হ্যাঁ, অবাক হবার মতো কথাই বটে। সাধারণ জাহাজের পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হলেও নোটিলাস অনায়াসেই বরফের তলা দিয়ে যেতে পারে। অধ্যাপক, আপনি তো জানেনই, বরফ এক ফুট জলের ওপরে থাকলে তিন ফুট থাকে জলের তলায়, এ তুষারশৈলটার উচ্চতা যদি জলের ওপরে উচ্চতা তিন শো ফুটের বেশি না হয়, তবে নয়শো ফুটের বেশি এর গভীরতা হতে পারে না। আর আপনি তো জানেনই, নয়শো ফুট তলা দিয়ে পথ পাড়ি দেওয়া নোটিলাস-এর পক্ষে মোটেই সমস্যার ব্যাপার নয়।

বাস, ক্যাপ্টেন নিমো এবার দুঃসাধ্য অভিযান শুরু করলেন।

একসকালে আমাদের জলযান নোটিলাস সুদৃশ্য একটা পাথরের ঢিবির কাছাকাছি এগিয়ে গেল। আমরা দ্বীপটায় নামার জন্য নৌকায় চেপে সেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

দ্বীপটার গায়ে নৌকাতা ভিড়তেই কনসিল ব্যস্ত হয়ে লাফিয়ে নৌকা থেকে দ্বীপে নামতে চেষ্টা করল। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'এ দ্বীপে আজ পর্যন্ত মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি।'

কথাটা শুনেই আমি কনসিলকে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললাম—'এ দ্বীপে প্রথম পদার্পণের অধিকার কিন্তু আপনারই ক্যাপ্টেন নিমো।'

মুচকি হেসে ক্যাপ্টেন নিমো ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নৌকা থেকে দ্বীপে নেমে গেলেন। এবার আমরা এক এক করে দ্বীপের মাটিতে পদার্পণ করলাম।

একনজরে দেখেই আমার মনে হল দ্বীপটা আগ্নেয়গিরির লাভা দিয়ে গঠিত। আমার জানা আছে, মেরু অঞ্চলের টেরর এবং এরোবাস নামক আগ্নেয়গিরি দুটোকে জেমসরস আবিষ্কার করে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

বিশ মার্চ। তুষারপাত বন্ধ থাকায় আমরা দলবঁধে তুষার রাজ্য পরিক্রমায় বেরোলাম। পথ চলতে চলতে বিভিন্ন আকারের সিলমাছ দেখলাম। তারা স্তন্যপায়ী প্রাণী। দলবন্ধভাবে বাস করে। কয়েকটা জলহস্তীকে অস্থিরভাবে চলাফেরা করতে দেখলাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ছোট্ট একটা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে একদল প্রাণীকে তীব্রস্বরে ডাকাডাকি করতে শুনলাম। ঘাঁড়ের ঐকতানের মত তাদের কণ্ঠস্বর। পরে নিঃসন্দেহ হলাম সেটা জলহস্তীদের আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুরুষ জলহস্তী তার প্রেয়সীকে প্রেম নিবেদন করছে। জলহস্তীগুলো এক একটা সোয়া চার গজ লম্বা। ওজনও সে পরিমাণই। গায়ের চামড়া খুব মোটা হলে কি হবে একেবারে তেলতেলে।

একুশে মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখা অতিক্রম করবে। তখন দিনরাত্রি সমান হয়ে যাবে। বাস, এবার থেকে পুরো ছয় মাস সূর্যকে আর দেখা যাবে না।

সেপ্টেম্বর মাসে আবার সূর্যোদয় হবে। তখন থেকে আবার চলবে একনাগাড়ে ছয়মাস দিন।

ক্যাপ্টেন নিমো মেরু অঞ্চল পর্যবেক্ষণের বাকি কাজটুকু দ্রুত সেয়ে নিতে লাগলেন। কারণ, রাত্রির পালা শুরু হয়ে গেলে কাজ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছেই ক্যাপ্টেন নিমো ব্যারোমিটার নিয়ে কাজে মেতে গেলেন। এবার আতসকাচ চোখের সামনে ধরে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

আমিও হাতগুটিয়ে বসে নেই। ক্রনোমিটারের দিকে দৃষ্টি রাখলাম। সূর্যের অর্ধাংশ যদি বেলা বারোটায় নিশ্চিহ্ন অর্ধাংশ ডুবে যায় তবে ধরে নিতে হবে আমরা দক্ষিণ মেরুতে হাজির হয়ে গেছি।

বেলা ঠিক বারোটায় আমি চিৎকার জুড়ে দিলাম, 'সূর্যের অর্ধাংশ ডুবে গেছে! ক্যাপ্টেন, দেখুন—ওই দেখুন!'

ক্যাপ্টেন নিমো সোল্লাসে বললেন, 'পৌঁছে গেছি! আমরা দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেছি অধ্যাপক!'

ক্যাপ্টেন নিমো আমার কাঁধে হাত রেখে আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আমি, আমি ক্যাপ্টেন

নিমো, আজ আঠারো শো চৌষটি সালের একুশে মার্চ দক্ষিণ মেরুর নব্বই ডিগ্রিকে উপনীত হয়েছি।' কথাটা বলেই তিনি 'এন' শব্দ চিহ্নিত একটা পতাকা বের করে সেখানে পুঁতে দিলেন। এবার বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আবেগমধুর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'হে সূর্য, বিদায়! তোমাকে আমি বিদায় জানাচ্ছি। এবার আমার সদা বিজিত রাজ্যে ছয় মাসের জন্য রাত্রি' নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার নেমে আসুক; বিদায়—তোমাকে বিদায়।'

পরের দিন বাইশে মার্চ। আমাদের যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। তাপমান যন্ত্রের কাঁটা শূন্যের নিচে বারো ডিগ্রিতে রয়েছে দেখা যাচ্ছে।

নোটিলাস জলের তলায় নামতে শুরু করল। প্রায় এক হাজার ফুট জলের তলায় নেমে সেটা স্থির হল। সেটা এবার সোজা উত্তর দিকে এগোতে লাগল।

রাত তখন তিনটা। আকস্মিক একটা ঝাঁকুনিতে আমি ঘুম থেকে জেগে ছড়মুড় করে বসে পড়লাম। পরমুহূর্তেই প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলাম। নিজেকে সামলাতে না পেরে ছিটকে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, নোটিলাস আচমকা দ্বিগুণতম শক্তি প্রয়োগ করে একের পর এক আঘাত হেনে চলেছে।

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, নোটিলাস তখন প্রায় চার শো মিটার জলের তলায় অবস্থান করছে। ঠিক তখনই ব্যস্তপায়ে ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। কোনো কথা না বলে সবার আগে কম্পাসের দিকে তাকালেন, পরে ক্রনোমিটারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

আমি ছোট্ট করে বললাম, 'ক্যাপ্টেন, কোনো ঘটনা—'

আমাকে কথাটা বলতে না দিয়েই বিবর্ণ মুখে তিনি বললেন, 'ঘটনা না বলে একে দুর্ঘটনাই বলা ভালো! তবে আমাদের কোনো ক্রটি এর জন্য দায়ী নয়। প্রকৃতির বিরুদ্ধতার জন্যই এমনটা হতে চলেছে। বিশালায়তন একটা বরফের চাঁই, পুরো একটা পাহাড়ই উল্টে পড়ে গেছে অধ্যাপক। সেটা পড়তে গিয়ে নোটিলাসের গায়ে আছড়ে পড়েছে। নোটিলাস একদিকে কাৎ হয়ে পড়েছে। আগ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি, বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য। ক্রনোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখুন, নোটিলাসকে ইতোমধ্যেই অনেকখানি সোজা করে ফেলেছি। প্রায় দশ মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে পুনরায় সোজা করতে সক্ষম হলেন।

কিছুদূর এগোতেই হাত দুটো চোখের ওপর চেপে ধরতে বাধ্য হলাম। নোটিলাস পূর্ণ গতিতে চলছে বলে বরফের অত্যাঙ্ক সাদা রঙ শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে কাচের গায়ে প্রতিফলিত হয়ে চোখ দুটোকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগল।

সর্বনাশ! আমাদের জলযান নোটিলাস বরফে আটকা পড়ে গেছে। বরফ সরাতে না পারলে আর অব্যাহতি নেই। এদিকে বাতাসও ফুরিয়ে এসেছে। ভয় হচ্ছে—বাতাসের অভাবে এতগুলো প্রাণীকে শেষ পর্যন্ত দাপাদপি করে মরতে না হয়।

ক্যাপ্টেন নিমোর অশেষ ধৈর্য। এমন দুঃসময়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্যকর্মে অবিচল রয়েছেন দেখে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশে কয়েকজন নাবিক কোদাল, গাঁইতি, শাবল আর বেলচা নিয়ে বরফ কাটতে লেগে গেল। কনসিল আর নেভ-ও তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেল। তবে বরফ কেটে সঠিক রাস্তা করা দুঃসাধ্য বলে নোটিলাস-এর চতুর্দিকে পরিখা খনন করতে লাগল। বারো ঘণ্টায় ছয়শো গজ বরফ কাটা গেল। হিসাব করে দেখা গেল পাঁচ দিন পাঁচরাত্রি একনাগাড়ে বরফ কাটলে তবে আমরা তুষার সমাধি থেকে মুক্তি পাব।

এবার সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। এক রাত্রে বরফের সঙ্গে কিছু জল পরিবার ভেতরে ঢুকে গেল। এবার বরফের চাপে নোটিলাস ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গুঁড়ো হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্যাপ্টেন ফ্যাকাসে মুখে বললেন—'এটা দেবখি একটা বাড়তি উপাত্ত শুরু হল! বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে, জল জমে উঠতে উঠতেই আমাদের যেন-কোনো ভাবে এ জায়গা ছেড়ে যেতে হবে। আর যেটুকু বাতাস রয়েছে তাতে কোনোরকমে কাল পর্যন্ত চালিয়ে নেয়া যাবে। বাস, তারপরই—' কথাটা শেষ না করেই তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে বললেন—'অধ্যাপক, চমৎকার একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে। গরম জল—'

আমি চমকে উঠে বললাম—'গরম জল! গরম জল—কী ব্যাপার?'

'প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালতে পারলে ক্রমে জমে ওঠা জলের জমাটবাঁধার ব্যাপারটাকে বন্ধ করা যাবে।'

ক্যাপ্টেন নিমো পরিকল্পনা মারফিক কাজ শুরু করলেন। যন্ত্রের সাহায্যে জল গরম করা শুরু হল। জলের উষ্ণতা একশো ডিগ্রি হলে তাকে পাম্পের ভেতর দিয়ে চালান দেয়া হতে লাগল। হ্যাঁ, ফল পাওয়া গেল। তার পরের দিন অর্থাৎ সাতাশে মার্চ হিসাব করে দেখা গেল, আর আটচল্লিশ ঘণ্টার কাজ বাকি রয়েছে।

দূষিত বাতাস গ্রহণ করে করে আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অভিন্নহৃদয় ভৃত্য আমার শিয়রে বসে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'হায় ঈশ্বর! নিঃশ্বাস না নিয়ে যদি থাকা সম্ভব হত তবে আমার ভাগ্যের বাতাসটুকু প্রভুর সেবায় লাগাতাম।'

বরফ কাটার কাজ জোরকদমে চলতে লাগল। আর মাত্র দুই গজ পরিমাণ বরফ কাটার বাকি। মাত্র দুই গজ বরফ! এদিকে হাওয়া প্রায় শেষ। দম আটকে আসার জোপাড় হল। তার পরের দিনও একইরকম দুঃসহ যন্ত্রণা। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। আর বাঁচার আশা বৃদ্ধি নেই।

আমাদের বন্দিজীবনের ষষ্ঠদিন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোটিলাসের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ছাড়া বাকি সব বের করে দিয়ে সেটাকে হাক্কা করে ফেলা হল। এবার তার ওজন দাঁড়াল মাত্র আঠার শো টন।

অকস্মাৎ বিকট আওয়াজ করে বরফের স্তরটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বাস, আর দেরি নয়, নোটিলাস নামতে নামতে নিচে ডুব দিল।

ক্যান্টেনের নির্দেশে বৈদ্যুতিক পাস্পের সাহায্যে জলাধারের জল বের করে দেয়া হল।

মনোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, নোটিলাস দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে। প্রাণান্ত চেষ্টা চরিত্রের মাধ্যমে শেষপর্যন্ত নোটিলাসকে জলের ওপরে তুলে আনা সম্ভব হল। ফুসফুস বরে সমুদ্রের মুক্তবায়ু নিয় পিতৃদত্ত প্রাণটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হল। অস্ত্রজেনের যে কী অপরাধীসীম ক্ষমতা এবার যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম।

আমরা আবার এগোতে লাগলাম। সূর্য তখন উত্তরদিকে অবস্থান করছে। নোটিলাস উত্তর দিকেই এগিয়ে চলেছে। আমাদের ভয় ছিল, যে সুবিশাল সাগর আমেরিকা ও এশিয়াকে স্পর্শ করে রেখেছে ক্যান্টেন নিম্নে হয়ত আমাদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে যাবেন।

একত্রিশে মার্চ আমরা মেরু বলয় অতিক্রম করে হর্ন অন্তরীপকে ছাড়িয়ে এগোতে লাগলাম।

ভেসেরা এপ্রিল আমরা পেন্টাগোনিয়ার তটরেখার ধার দিয়ে এগোতে লাগলাম।

চৌঠা এপ্রিল নোটিলাস উরুগুয়ে পেরিয়ে আরো ছাপ্পান্ন মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল।

জাপান সমুদ্র থেকে যাত্রা করার পর আমরা ইতিমধ্যে ষোল হাজার মাইল পথ পাড়িয়ে দিয়ে ফেলেছি। এবার উচ্চা বেগে ছুটে নোটিলাস ত্রিযো অন্তরীপকে পিছনে ফেলে এগোতে লাগল।

কয়েকদিন ক্রমাগত পথ পাড়ি দিয়ে নোটিলাস নয় এপ্রিল দক্ষিণ আমেরিকার পূর্বপার্শ্ব স্যামরোক অন্তরীপকে পিছনে ফেললাম।

নোটিলাস তখন জলের তলা দিয়ে এগোতে এগোতে এগারোই এপ্রিল ভেসে উঠল।

আমরা জাল ফেলে দুদিনে প্রচুর সংখ্যক মাছ, যেমন—প্রায় চার শো পাউন্ড ওজনবিশিষ্ট ও খুব সুস্বাদু কাকুয়ানি মাছ ধরলাম। আর সামুদ্রিক কচ্ছপও কম ধরলাম না। কয়েকটা সারীসৃপও জালে ধরা পড়েছিল।

ষোলই এপ্রিল আমরা গুয়াজলুপ মাটিনেকের শৃঙ্গ দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলাম। নোটিলাসে আমরা প্রায় ছয় মাস অতিবাহিত করে ফেলেছি। আর প্রায় সতের হাজার মাইল পথ ইতমধ্যেই পাড়ি দিয়ে দিয়েছি।

আমাদের হতাশা ক্রমে চরম সীমায় পৌঁছোতে লাগল। আমরা নিঃসন্দেহ, ক্যান্টেন নিম্নে নিজে থেকে আমাদের মুক্তি দেবেন না। অতএব ফন্দি ফিকির যা-কিছু আমাদেরই করতে হবে। তার ওপর ক্যান্টেনের মধ্যে নির্জনপ্রিয়তা লক্ষিত হচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে আমাদের সংস্রব এড়িয়ে চলতেই তিনি উৎসাহী, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। কিন্তু কেন?—কেন এ মৌনব্রত?

বিশে এপ্রিল। সেদিন আমরা প্রায় পনেরো ফুট ওপরে উঠে গেলাম। তখন আমাদের সবচেয়ে কাছের স্থলভূমি ছিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ।

বেলা এখন এগারোটা। কনসিল নিকটবর্তী একটা গুহার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আমার মনে হ'ল ওটা পোল্ল-গুহা। দৈত্যাকৃতি পোল্লরা যদি গুহা থেকে বেরিয়ে আসে তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটিয়ে ছাড়বে।

কনসিল কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'স্যার, আমি সেন্ট মালোর একটা গির্জায় ছবিতে দেখছি, একটা পোল্ল তার দাঁড়া দিয়ে একটা জাহাজকে টেনে নিয়ে চলেছে।'

নেড তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল, 'এ কথা আমিও শুনেছি। তাই যদি হয় তবে তো এরা নোটিলাসকে শুকনো পাতার মতো টেনে নিয়ে যাবে।'

আমি হেসে বললাম, 'ওটা আসলে একটা কিংবদন্তীর ছবি। কিংবদন্তী আর উপকথার সবকিছুতেই সম্ভব করে তোলা যায়, জানই তো। তবে আমিও পল্ল শুনেছি, কেবল জাহাজকে টেনে নেওয়াই নয়, কোনো কোনো পোল্ল নাকি একটা দ্বীপের আয়তনের সমান হয়ে থাকে। প্রাচীন জীববিজ্ঞানীগণ বলেন, পোল্লদের অত্যাচারে বিজ্ঞানটার প্রণালী দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আবার পটোপিডান নামে এক বিশপ বলেন—বিরাত এক সেনাদল ভুল করে একটা পোল্লের পিঠে নেমে গিয়েছিল। দুই গজ লম্বা একটা পোল্লের কঙ্কাল মন্ট্রোশেলিওর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এক জীববিজ্ঞানী লিখেছেন, দুই ফুট লম্বা একটা পোল্লের দাঁড়াগুলো লম্বায় সাতাশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কী ভয়ঙ্কর প্রাণী ওরা আশা করি অনুমান করতে পারছ? মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আমি আবার বলতে লাগলাম—'আঠারো শ' একষষ্টি ত্রিষ্টান্দে একটা ঘটনায় মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে যে, পৃথিবীতে এখনও এরকম ভয়ঙ্কর প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে।'

একসময় আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে নোটিলাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, গোটা সাতেক কাটল মাছ নোটিলাসের পিছনে আসছিল। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এ সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

হ্যাঁ, কাটল মাছ সত্যিই দানবাকৃতি। এক-একটা প্রায় আট গজ লম্বা। মাথায় আট-আটটা করে দাঁড়া। আর ওজন? চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড তো হবেই।

ক্যান্টেন দৌড়ে এলেন। একপলকে দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই। ওদের জন্য নোটিলাস খেমে গেছে। ওদের চোয়ালে ব্লেন্ড আটকে গিয়ে হয়ত-বা এ সর্বনাশা কাণ্ড ঘটছে। জলের ওপরে উঠে গিয়ে ওদের ধ্বংস না-করা পর্যন্ত আমাদের এখানে আটকা পড়েই থাকতে হবে।

জাহাজের দশ-বারোজন কর্মী অন্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হল। নেড দাঁড়াল তার হারপুন হাতে নিয়ে। নোটিলাস ক্রমে ওপরে উঠতে লাগল।

হঠাৎ একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড দেখে চমকে উঠলাম। একটা অষ্টোপাস তার ইয়া লম্বা একটা পা নোটিলাসের জানালা দিয়ে গলিয়ে দিয়েছে।

ক্যান্টেন নিজে কুড়ালের এক কোপে তার পা-টাকে কেটে নামিয়ে দিলেন। মুহূর্তে সে আরো দুটো পা ঝট করে

তুলে একজন নাবিককে জাপ্টে ধরে ফেলল। প্রাণভয়ে সে তো বিকট আর্তনাদ জুড়ে দিল। সে কী ভয়ঙ্কর আর মর্মান্তিক দৃশ্য! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। না, কিছুতেই বেচারাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কেউ এগোতে সাহসী হল না। ক্যাপ্টেন নিমো আবার কুড়ালের এক কোপে হতস্খাড়া জন্তুটার আর একটা পা কেটে ফেললেন। তার আটটা পায়ের মধ্যে সাতটা পা-ই আমরা টুকরো করে ফেলেছি। সবশেষে অবশিষ্ট একটা পা দিয়েই সে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নাবিকটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। উপায়ন্তর না দেখে ক্যাপ্টেন নিমো সেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ব্যস, তার গা থেকে গলগল করে আলকাতরার মতো কালো বস্তু বেরিয়ে এল। সবকিছু যেন হঠাৎ অন্ধকারে ঢেকে গেল। সুযোগ, অপূর্ব সুযোগটাকে অষ্টোপাসটা কাজে লাগাতে ছাড়ল না। যখন জলের রঙ কিছুটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেল তার আগেই অতিকায় কিস্তকিমাকার জন্তুটা গা-ঢাকা দিল। অদ্ভুত কৌশল!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাদের নোটিলাসের চারদিকে ক্রোধান্ডিত অষ্টোপাসদের মেলা বসে গেল। একটা পা আচমকা হারপুনবির নেডকে জড়িয়ে ধরে আছাড় মেরে ফেলে দিল। ব্যাপার দেখে আমার তো আত্মারাম খাচাছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড়। শরীর কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। আমি রীতিমতো হায় হায় করতে লাগলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো কর্তব্যে অটল। তিনি কুড়াল দিয়ে অষ্টোপাসটার পা-টায় একের পর এক ঘা মেরে চলেছেন।

নেড সুযোগ বুঝে হাতের হারপুনটা সজোরে বিকটদর্শন অষ্টোপাসটার পেটে গেঁথে দিল।

ক্যাপ্টেন এবার অষ্টোপাসটার খ্রীষায় উন্মাদের মতো কুড়াল চালাতে লাগলেন।

প্রায় এক ঘণ্টাকাল তুমুল লড়াই চালিয়ে হিংস্র জন্তুগুলো হতাশ হয়ে প্রাণ নিয়ে পালল। আমরা এবার সত্যি সত্যিই শত্রুমুক্ত হতে পারলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো তার দুজন সঙ্গীকে আমাদের চোখের সামনে হারালেন। অষ্টোপাসের হাতে যে হতভাগটা প্রাণ দিয়েছে তার জন্য আমার আক্ষেপের সবচেয়ে বড় কারণ, সে ছিল আমার দেশবাসী।

নোটিলাসের পরিস্থিতি দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ক্যাপ্টেন নিমো মনের দিক থেকে বড়ই ভেঙে পড়েছেন, হতাশায় জর্জরিত।

আটই যে আমরা হাটেরাস অন্তরীপ অতিক্রম করছিলাম, এখানে গালফ গভীরতায় দুশো দশ গজ আর পঁচাত্তর মাইল বিস্তৃত।

আমরা এবার পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করতে লাগলাম। ধারে কাছে লোকালয়ও রয়েছে। পালিয়ে বাঁচার অপূর্ব সুযোগ। পরে আর এমন সুযোগ নাও আসতে পারে। বোষ্টন ও নিউইয়র্কে অসংখ্য জাহাজ চলাচল করতে দেখলাম। দরবার হলে তাদের কারো কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করা যাবে। কিন্তু প্রবল ঝড়তুফান আমাদের পালিয়ে যাওয়ার গথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। এ পরিস্থিতিতে নৌকা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার অর্থই হচ্ছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়া।

নেড কিছু পালানোর জন্য একেবারে ক্ষেপে গেছে। সে বেশ রাগতস্বরেই আমাকে বলল, 'স্যার, আমার সাফ কথা শুনুন, ক্যাপ্টেনের ধান্দা হয়ত উত্তর মেরুর দিকে যাওয়া। দক্ষিণ মেরুতেই আমার সাথ মিটে গেছে। উত্তর মেরুর দিকে আমি আর যেতে নারাজ। তার চেয়ে চলুন, ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলি আমরা এবার আমার দেশের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—সেন্ট লরেন্সে এবার আমরা পড়ব। সেটা আমার দেশের নদী। তারই তীরে আমার বাড়ি। কুইবেক শহর তো নদীটার একেবারে পাড় ঘেঁষে। চলুন, দেখাই যাক না, ক্যাপ্টেন কী বলেন?'

নেডের অত্যাশ্রয় অগ্রহে আমি তাকে নিয়ে ক্যাপ্টেন নিমোর কামরায় উপস্থিত হলাম।

ক্যাপ্টেন নিমো নিবিষ্ট মনে কাজ করছেন।

আমি বললাম, 'ক্যাপ্টেন, আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে আলোচনা করতে চাই।'

ক্যাপ্টেন নিমো কাজের মধ্যে ডুবে থেকেই বললেন, 'আমি এখন ব্যস্ত, জরুরি একটা কাজ করছি। যদি তেমন কিছু বলার থাকে পরে না হয় আসবেন।'

ক্যাপ্টেন নিমোর ব্যবহার আমার কাছে মোটেই বাঞ্ছনীয় মনে হল না। বাধ্য হয়ে আবারও বললাম, 'আমি এমন একটা জরুরি ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি যা কিছুতেই দেরি করা যায় না।'

'আপনি কি হঠাৎ কোনো কিছু আবিষ্কার করে ফেললেন নাকি অধ্যাপক? যাক গে, এ বাস্তবায় আমার সমুদ্রবিষয়ক গবেষণার যাবতীয় তথ্য, আমার জীবনকাহিনী ও নোটিলাসের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। এগুলো একটা বাস্তববন্দি হয়ে জলের ওপর ভেসে বেড়াবে। আমার আন্তরিক ইচ্ছা, আমার দেহাবসানের পর এ ইতিহাস যেন বেঁচে থাকে। আর এও আমার ইচ্ছা, নোটিলাসের শেষ জীবিত লোকটা বাস্তবটাকে জলে ভাসিয়ে দেবে।'

আমি ভেতরে ভেতরে পুলকিত হলাম, একদিন না একদিন ক্যাপ্টেন নিমোর যাবতীয় রহস্যের পর্দা সরে গিয়ে মানুষের নজরে আসবে। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আমি একসময় আমতা আমতা করে বললাম, 'আমাদের ব্যাপারে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী? আপনি কি আমাদের আমৃত্যু এখানে বন্দি করেই রাখবেন?'

'অধ্যাপক আমি তো আগেই বলেছি, আজও আবার বলছি, নোটিলাসের দরজা দিয়ে যে একবার ঢোকে সে আর জীবন্ত অবস্থায় বাইরে বেগোতে পারে না। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে আর এ প্রসঙ্গে কথা বলতে উৎসাহী হবেন না এটাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা, মনে রাখবেন।'

নেড আমার মুখ থেকে ক্যাপ্টেন নিমোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা শুনে রাগে গজগজ করতে করতে বলল, 'নোটিলাস লং আইল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে। সেখানে আবহাওয়া যেমনই থাক না কেন চম্পট দিতেই হবে।'

উনিশে মে নোটিলাস লং আইল্যান্ডের কাছে হাজির হল। ঝড়ের তাণ্ডব উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে জলে ডুবিয়ে না নিয়ে ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। ঝড় তুফানের রুদ্ধমূর্তি দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলাম। প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু ডেউ ভাগ্যে না থাকলে চোখের সামনে দেখা দেখা যায় না।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটায় নোটিলাসের ট্যাঙ্কে জল ভরার শব্দ কানে এল। বুঝলাম, সেটা জলে ডুবে যাচ্ছে। ঝড়ের জন্য আমাদের পূর্ব দিক দিয়ে যেতে হয় বলে নিউইয়র্ক বা সেন্টলরেসে আমাদের পালানোর আশাই ছাই পড়ল। নেড মুষড়ে পড়ল।

সতেরই মে আমরা হার্টস কনটেক্ট থেকে পাঁচ শ' মাইল দূরে প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট সমুদ্রের গভীরে একটা বৈদ্যুতিক তার দেখতে পেলাম। আঠার শ' সাতান্ন—আটান্ন সালে প্রথমে এটা সমুদ্রের নিচে পাতা হয়। চার শ'টা টেলিগ্রাফের বার্তা পৌঁছে দিয়েই এটা অকেজো হয়ে পড়ে। তারপর আঠার শ' তেষট্টিতে দু-হাজার মাইল লম্বা এবং চার হাজার পাঁচ শ' টন ওজনের আরও একটা তার পাতা হয়। আজ সেটাও অকেজো হয়ে পড়েছে।

নোটিলাস তখন যেখানে দিয়ে যাচ্ছিল তারটা সেখানেই ছিড়ে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তারপর সাইরাস ফিল্ডের তত্ত্বাবধানে আবার তারটা জোড়া দেওয়া হয়। তারপর আর সমস্যা দেখা দেয় নি।

আঠাশে মে নোটিলাস এমারব্যান্ড দ্বীপটাকে অতিক্রম করার সময় ক্রিয়ার অন্তরীপের আলোকস্তম্ভটা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হল।

১ জুন ক্যাপ্টেন নিমো নোটিলাসকে দুই হাজার পাঁচ শ' ফুট জলের তলায় নিয়ে গেলেন। এখানে সেটাকে মাটিতে দাঁড় করানো হল। একটা বিশালায়তন উঁচু ডিবিং ওপর আমার চোখ পড়ল। বুঝলাম, এটা একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত মাস্তুলবিহীন জাহাজ। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন—‘অধ্যাপক, এক সময় জাহাজটার নাম ছিল ‘মার্সেইলার্স’ সতের শ’ বাহান্নতে প্রথম জলে ভাসানোর সময় চুয়াত্তরটা কামান এতে বসানো ছিল। সতের শো আটাত্তরের প্রেস্টনদের বিরুদ্ধে এবং একস্পিতে কোংসিংসের যুদ্ধে একটা অংশ নিয়েছিল। সতের শো চুরানব্বইয়ের ফোলই এপ্রিল আমেরিকা থেকে খাদ্যশস্য বহন করে নিয়ে আসার সময় একটা ব্রিটিশ জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ডুবে যায়। আজ আঠার শো আটষট্টির পয়লা জুন—ঠিক চুয়াত্তর বছর আগে এখানে, ১৭.২৮° অক্ষাংশে এবং ৭৪.২৪° দ্রাঘিমাংশের মধ্যে জাহাজটা ডুবে যায়। দুই শত ছাপ্পান্ন জন নাবিক জাহাজের গায়ে তাদের দেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জাহাজের বুক চেপেই হাসিমুখে জলে তলিয়ে যায়। জলে তলিয়ে যাবার সময় তারা সমস্ত ধ্বনি দিচ্ছিল—‘ফরাসি সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক!’

এবার আমার মনে পড়ল জাহাজটার নাম দেওয়া হয়েছিল—‘দ্য অ্যাডভেঞ্চার’।

নোটিলাস ইতিমধ্যে জলের ওপরে উঠতে লাগল। অকস্মাৎ একটা গুলির শব্দ কানে এল। ক্যাপ্টেন নির্বাক। দৌড়ে বাইরে এসে দেখি একটা যুদ্ধজাহাজ। নোটিলাস থেকে সেটার দূরত্ব মাত্র দুই মাইল।

নেড এবার পালাবার জন্য রীতিমত ক্ষেপে গেল। সে বলল, ‘স্যার, জাহাজটা যখন আমাদের থেকে এক মাইল দূরত্বে চলে আসবে তখন আমি অবশ্যই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

মুহুরুহু কামান দাগার শব্দ কানে আসতে লাগল। আর সেটা আমাদের লক্ষ করে কামান দেগে চলেছে দেখে আমার আত্মারাম খাচাছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

নেড বলল, ‘স্যার, তারা বোধ হয়, এ জীবটার রহস্য জেনে ফেলেছে।’

আমার মনেও কেমন যেন সন্দেহ হল। আমরা যখন আব্রাহাম লিঙ্কনে ছিলাম তখন ক্যাপ্টেন ফ্যারাণ্ডট নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন, এটা অবশ্যই দাঁতাল তিমি নয়—ভুবোজাহাজ।

এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমোকে অদ্ভুত একটা কাজ করতে দেখলাম। কালো একটা পতাকা উড়িয়ে দিলেন। আমাদের নিচে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

আমি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললাম, ‘একী ক্যাপ্টেন, আপনি কি তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে চাচ্ছেন নাকি!’

‘কেবল আক্রমণই নয় অধ্যাপক, আমি তাদের ডুবিয়ে ঝাড়ে বংশে ধ্বংস করে ছাড়ব।

‘অধ্যাপক, অনুগ্রহ করে আমার কাজের সমালোচনা, বা বিচার করতে উৎসাহী হবেন না। এখন আপনার লোকজন নিয়ে নিচে চলে যান। আমাকে কর্তব্য সম্পাদন করতে দিন। আমি চাই, জাহাজটা কাদের সেটা আপনার কাছে গোপন রাখতে।’

আমি এবার নেড ও কনসিলকে নিয়ে গোমড়ামুখে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলাম।

নোটিলাস এবার ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র জানোয়ারের মত ওই অতিকায় জাহাজটাকে কায়দা কৌশল করে পূর্বদিকে টেনে আনতে লাগল।

আমি আবার সাহসে ভয় করে ক্যাপ্টেন নিমো-র পাশে এসে দাঁড়ালাম। তিনি ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে বললেন—‘হতচ্ছাড়া ওই জাহাজটার জন্যই আমি প্রিয়বন্ধু ও প্রিয়জনদের হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছি, যন্ত্রণায় দগ্ধে মরিছি। আজ আমিই বিচারক। আমার কথাই আইন। ওকে আমি ধ্বংস করবই—করতেই হবে আমাকে।’

আমি ব্যস্তপায়ে নেড আর কনসিলের কাছে ছুটে এসে বললাম—‘আজ রাতের মধ্যে ক্যাপ্টেন ওই জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেবেন। আমার মতে, এতবড় একটা অন্যায্য কাজের সঙ্গী হওয়ার চেয়ে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রে ডুবে মরা অনেক, অনেক শ্রেয়।’

নেড ও কনসিল সোচ্চারে আমাকে সমর্থন করল।

তখন রাত্রি তিনটা। আমি গুটিগুটি প্রাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম। সকাল ছয়টা পর্যন্ত সেখানেই অস্থিরভাবে কাটিয়ে

দিলাম। ওই জাহাজটার সঙ্গে নোটিলাস-এর ব্যবধান যখন মাত্র দেড় মাইল দাঁড়াল, তখন নতুন করে গোলাবর্ষণ শুরু হল।

আমি এবার বুঝতে পারলাম, নোটিলাস ক্রমে জলে তলিয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম, নোটিলাস তলা থেকে ওই জাহাজটার ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছে।

আচমকা কোন জিনিস দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে আমি শিউরে উঠলাম। হ্যাঁ, অনুমান অশ্রান্ত। নোটিলাস ওই জাহাজটার তলদেশে ছিদ্র করে দিয়েছে। শৌ শৌ শব্দে জল ঢুকছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। ব্যাস, জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে ডুবে যেতে লাগল।

আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ ক্যাপ্টেন নিমো-র দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম—কী ভয়ঙ্কর প্রকৃতির নিষ্ঠুর এ লোকটা! জ্বলন্ত ঘৃণায় এর মনটা পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন নিমো বিষণ্ণমুখে ধীরপায়ে একটা ঘরে ঢুকলেন—এক মহিলা আর শিশুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহিলাটার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে ডুকড়ে ডুকড়ে কাঁদতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দরজা জানালা বন্ধ করে যবনিকা টেনে দেওয়া হল।

নেড-এর ব্যাপার স্যাপার দেখে কনসিল একেবারে ঘাবড়ে গেছে।

নোটিলাসের পাহারা দেয়ার কাজ মোটামুটি বন্ধ হয়ে গেছে। কনসিল ও নেড এরকম একটা অপূর্ব সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য বদ্ধপরিকর। আমার কাছে পালাবার প্রস্তাব দিল। নোটিলাসের কাছাকাছি এখন যে দেশ বা যে রাজ্যই হোক না কেন তারা এবার পালাবেই। তাদের প্রস্তাবে আমিও রাজি হয়ে গেলাম। যে করেই হোক বন্দিজীবনের অবসান এবার ঘটাতেই হবে।

দশটা বাজতে চলল। আমরা তিনজন সাধ্যাতীত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সেলুনের দরজায় গেলাম। দেখলাম, ক্যাপ্টেন নিমো দরজার দিকে পিছন দিয়ে বসে আপন মনে অর্গান বাজিয়ে চলেছেন। তারপর রুদ্ধশ্বাসে লাইব্রেরি সিঁড়ি ও প্লাটফর্ম একসময় ডিঙিয়ে এলাম।

আচমকা নোটিলাস থেকে তার গর্জন কানে এল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগলাম—তবে কি সূচতর ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের দূরভিসন্ধির কথা টের পেয়ে গেছেন!

উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ করলাম। নিঃসন্দেহ হলাম, কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর নয়। ঘূর্ণিঝড়—সুতীত্র ঘূর্ণিঝড়ের শব্দ আমাদের কানে চিৎকারের মতো মনে হতে লাগল।

আমাদের নৌকা ডেউয়ের তালে তারে বার বার ওঠানামা করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। তবে তখনও আমাদের নৌকাটা নোটিলাসের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। একসময় চমকে উঠলাম। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড় হল। লক্ষ করলাম, আমাদের নৌকাটা তীব্রবেগে ঘূর্ণিঝড়ের দিকে ধেয়ে চলেছে।

তারপর যা কিছু ঘটল সবই আমার অজ্ঞাতসারেই ঘটল। আমি সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে এক সময় চোখ মেলে তাকালাম। দেখি, এক জেলের ঝুপড়িতে আমি শুয়ে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, সেটা গফোডন দ্বীপপুঞ্জ।

সেখান থেকে সরাসরি ফ্রান্সে যাবার কোন উপায় ছিল না। সেখান দিয়ে কেপ নর্থের একটা দ্বিয়ার মাসে একবার যাতায়াত করে। অনন্যোপায় হয়ে আমাকে তারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় থাকতে হল।

কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানি না। কিন্তু আমি তো জানি, দশ মাসে আমি বিশ হাজার লীগ পাড়ি দিয়ে এসেছি।

কিন্তু নোটিলাস-এর কী অবস্থা হল? কোথায়, কী অবস্থায়ইবা সেটা আছে, কিছুই আমার জানা নেই। আর ক্যাপ্টেন নিমো? তিনি কি আজ জীবিত, নাকি প্রলয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে তাঁর দেহাবসান ঘটেছে? আমি কি কোনদিনই তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারব না? তিনি কে, কোন দেশের অধিবাসী? কে আমাকে বলে দেবে? তার অন্তরের অতল গহ্বরে ডুব দিতে না পারলে তাঁকে চেনা, সত্যোপলব্ধি করা সম্ভব নয়। উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ডেউ কি কোনদিন ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনকথা সম্বলিত পাণ্ডুলিপিটা সমেত বাজ্রটাকে সভ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড

১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ২৩ মার্চ, বিকেল চারটা।

প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল-উদ্দাম-সঞ্জন জলরাশির ওপর, শূন্য থেকে কয়েকটা পুরুষ-কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। গল্প বা হাসি-মশকরা নয়। জটিল সমস্যা সমাধানের সুচিন্তিত পরামর্শ। বরং বলা চলে টুকরো টুকরো প্রশ্নোত্তর।

‘কী ব্যাপার বল তো? আমরা কি তবে ওপরে উঠে চলেছি?’

‘না। ওপরে অবশ্যই নয়।’

‘ওপরে উঠছি না? তবে? তবে কি নিচেই নামছি?’

‘হ্যাঁ, নিচেই নামছি বটে। তবে পরিস্থিতি অবশ্যই স্বাভাবিক নয় স্যার, আমরা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হয়েছি।’

ক্যাপ্টেন যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসেত গিয়ে বলে উঠলেন, ‘ভয়ঙ্কর বিপদ? কী রকম পিবদ বলা তো? ব্যাপার কী?’

‘স্যার, আমরা পড়ে যাচ্ছি। দ্রুত নিচে পড়ছি।’

‘এক কাজ করো, যত তাড়াতাড়ি পার বেলুনের ওজন কমানোর চেষ্টা করো।’

‘সে চেষ্টারও ক্রটি রাখি নি স্যার। অনেক আগে থেকেই বেলুনের ওজন কমানোর জন্য সাধ্যমতো প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি।’

অস্থিরচিণ্ড ক্যাপ্টেন ধমকের স্বরে প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন, ‘ওজন কমানোর ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করাই হয়ে থাকে তবে বেলুনটা ওপরে উঠছে না কেন?’

‘বিপরীত দিক থেকে কোনো উত্তরই ভেসে এল না।’

কয়েক মুহূর্ত পরে আবার ক্যাপ্টেনের অস্থির কণ্ঠ ভেসে এল, ‘কী ব্যাপার, মুখে কুলুপ এঁটে দিলে কেন?’ উন্মত্ত বাতাসের তীব্র আর্তনাদ ভেদ করে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ ভেসে এল, ‘কী বুঝছ, বেলুনটা কি এখন ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে?’

‘না।’ নিচের দিক থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ ভেসে আসছে, ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গর্জন।

কথাটা শেষ হতে না হতেই আর্তস্বর শোনা গেল, ‘সর্বশেষে কাণ্ড ঘটতে চলেছে! গেল! সব গেল! সমুদ্র যে মাত্র শো পাঁচেক ফুটও নিচে নয়। ফেলে দাও, ফেলে দাও। বেলুনে ভারী যা কিছু আছে সমুদ্রের জলে ফেলে দাও। বেলুনটাকে ভারমুক্ত করো। গোলাবারুদ, বন্দুক আর খাবারদাবার যা কিছু আছে ফেলে দিয়ে বেলুনটাকে হাল্কা করে ফেলো।’

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে দেখা দিল এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। সর্বগ্রাসী ঝড়। এ ধ্বংসাত্মক ঝড় পরবর্তীকালে কিংবদন্তী হয়ে দীর্ঘদিন মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে জাগরুক ছিল। গল্পকথার মতো দীর্ঘদিন সবার মুখে মুখে ঘুরে বেঁটিয়েছে।

১৮ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত ধ্বংসাত্মক এ ঝড়ের তাণ্ডবে ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিরাট একটা ভগ্নাংশ ধ্বংসস্থলের রূপ নিয়েছিল।

বিশালায়তন একটা বেলুন উন্মত্ত এলোপাথাড়ি ঝড় আর জমাটবাঁধা কুয়াশার কবলে পড়ে অনবরত চক্রর মায়তে মারতে নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। বেলুনের গা থেকে ঝুলন্ত একটা দোলনায় পাঁচজন লোক হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে, অদৃষ্ট সম্বল করে বিরুদ্ধ প্রকৃতির মোকাবেলা করে চলেছে। তারা পাশাপাশি কাছাকাছি অবস্থান করলেও ঘন কুয়াশায় কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না।

বাতাসের দাপটে দোল খেতে খেতে বেলুনটা ক্রমে নিচের দিকে নামছে তো নামছেই।

বিপদ আরো ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দিল যখন বোঝা গেল বেলুনটার আয়তন ক্রমেই কমে আসতে লাগল। আসলে তার গায়ে সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র তৈরি হয়ে তিরতির করে গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে। চিপসে যাওয়া বেলুনটা পথহারা উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো ধীর-মস্থর গতিতে গর্জনরত ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে।

একদিকে উন্মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব আর পায়ের তলায় ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন ফোঁস ফোঁসানি। উভয়ের মর্মভেদী গর্জনে বকের ভেতরে ফুসফুস দুটোকে অস্থির করে তুলেছে। বেলুনের নির্ভীক যাত্রীরা আর কতক্ষণই বা নিজেদের মনকে শক্ত রাখতে পারে। ক্রমেই তাদের মধ্যে হতাশা আর হাহাকার দানা বাঁধতে লাগল।

আরও—আরও নিচে নেমে গেল দিশাহারা বেলুনটা। বেলুনের যাত্রীরা প্রমাদ গুল। সমুদ্রের বুকে বেলুনসমেত তারা আছাড় খেয়ে পড়বে। উঃ! ভাবলেও বকের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগাড়। তখন কি মর্মান্তিক অবস্থা যে তাদের হবে তা স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি অনুমান করতে পারছেন না।

বেলুনের যাত্রীদের শরীরের স্নায়ুগুলো ক্রমে শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

এবার দমকা ঝড়ের কবলে পড়ে বেলুনটা তিরতির করে আবার ওপরের দিকে কিছুটা উঠে গেল।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব-আকাশে হাল্কা রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। সমুদ্রের বুকে শুরু হল আলো-আঁধারীর খেলা। কুয়াশার দাপটও অনেকাংশে হাল্কা হয়ে আসতে লাগল।

সকাল হল। চর্বিবেশে মার্চের সকাল।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস। বেলুনটা আবার দ্রুত নিচের দিকে নামতে লাগল।

হাক্কা কুয়াশায় মোড়া গোপন অন্তরাল থেকে আবার পূর্বপরিচিত সেই নির্ভীক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এবার? এবার কর্তব্য কী?'

'বেলুন অদরকারি জিনিসপত্র এখনো যা কিছু আছে সব সমুদ্রে ফেলে দেয়াই একমাত্র কর্তব্য।'

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে বেলুন থেকে ঝপাঝপ কিছু জিনিসপত্র সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হল।

হায় ঈশ্বর! এতকিছু সত্ত্বেও বেলুনের গতি উদ্ভ্রমুখী না হয়ে ক্রমেই নিচের দিকে নেমে যেতেই লাগল। এখন উপায়!

মুমূর্ষু রোগীর মতো ধুকতে ধুকতে বেলুনটা তিরতির করে আরও কিছুটা পথ এগিয়ে গেল। কিন্তু জল আর জল। গাছপালা বা বাড়িঘরের চিহ্নমাত্রও কারো নজরে পড়ছে না।

আবার অদৃশ্য আতঁস্বর শোনা গেল—'আবার—আবারও আমরা নিচের দিকে নামতে শুরু করেছি! আমরা নামছি—পড়তে যাচ্ছি!'

'হায় ঈশ্বর! কপালে কি এই লিখে রেখেছিলে—সমুদ্রের বুকেই বেঘোরে প্রাণটা খোয়াতে হবে! ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রে ডুবেই যাব! ডুবেই মরতে হবে আমাদের!'

বাতাসবাহিত নির্ভীক কণ্ঠের অভয়বাণী শোনা গেল—'ধ্যুৎ! এমন করে মুহূর্তে পড়লে চলবে কেন? বেলুন থেকে প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সবকিছু ফেলে দেওয়া হয়েছে কি? ভালো করে দেখে নাও, কিছু পড়তে রয়েছে—'

'না। একমাত্র ডলারের খলেটা রয়ে গেছে। চার হাজার ডলারের খলেটার কথা বলছি।'

'ফেলে দাও। মিছে মায়া করে সর্বনাশ ডেকে আনার কোন মানে হয় না। ডলারের খলেটাও ফেলে দাও।'

কথাটা শেষ হতে না হতেই ছোট্ট একটা খলে নিচে নেমে গেল। ঝপ করে পড়ল গিয়ে জলে।

কই, তেমন কাজ হল না তো। আচমকা ভারমুক্ত হওয়ায় বেলুনটা মুহূর্তের জন্য ওপরে উঠে গেল বটে, কিন্তু সে আর কতটা বা কতক্ষণের জন্য? পরমুহূর্তেই আবার সেটা বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

আবার সে অদৃশ্য কণ্ঠের স্বর ভেসে এল—'কাজ হল কই? এখন উপায়? বেলুন থেকে সবই তো ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর তো কিছুই ফেলার মতো নেই।'

'আছে। দোলনা—উইলো কাঠের দোলনাটা এখনও রয়ে গেছে।'

ব্যস, বেলুনের যাত্রীরা শক্ত দড়ি দিয়ে বেলুনের আঙটার সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলল। আর ছুরি দিয়ে দোলনার বাঁধন কেটে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে।

দোলনাটার ভারমুক্ত হওয়ার ফলে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বেলুনটা দ্রুতগতিতে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। কিন্তু কপাল নেহাৎই মন্দ। কিছুতেই কিছু হবার নয়। বেলুনের গ্যাস কমতে কমতে একেবারেই চিপসে পড়ছে। এদিকে বাতাসের বেগও অনেকাংশে কমে এসেছে। ফলে বেলুনটা আবার ধুকতে ধুকতে নিচের দিকে নামতে লাগল।

সকাল পেরিয়ে দুপুর হল। ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকাল হতে চলেছে। ঘড়িতে প্রায় চারটা বাজে। বেলুন আর সমুদ্রের মাঝখানে আর মাত্র পাঁচশো ফুট ব্যবধান। ব্যস, তারপরই যাত্রীদের নিয়ে বেলুনটা ক্রোধোন্মত্ত সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে।

পর মুহূর্তেই একটা কুকুর তারস্বরে যেউ যেউ করে উঠল।

আরোহীদের একজন বলল—'মনে হচ্ছে টপ কিছু দেখতে পেয়েছে—কিছু বলতে চাচ্ছে।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, ডাঙা—ঐ তো ডাঙা! ডাঙা দেখা যাচ্ছে! ঐ যে ডাঙা!'

ডাঙা। সত্যি ডাঙা দেখা যাচ্ছে বটে। তবে তার দূরত্ব ত্রিশ মাইল তো হবেই। বাতাস এখনি প্রতিকূল থাকলে পথটুকু পাড়ি দিতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। আর এরই মধ্যে বেলুনের গ্যাস বেরিয়ে একেবারে চিপসে যাবে। ব্যস, সমুদ্রের বুকে ধপাস করে পড়তে হবে। এতগুলো প্রাণীর সলিলসমাধি হয়ে যাবে।

বেলুনের অভিযাত্রীরা হতাশায় ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। তবু তারা মনকে শক্ত করল, যে করেই হোক তাদের আজ্ঞাপরিচয় দ্বীপটাকে পৌঁছাতে হবেই।

হায় ঈশ্বর! শেষ রক্ষা বৃষ্টি আর করা গেল না। বেলুনটা ক্রমে আরও চিপসে গিয়ে সমুদ্রের একেবারে কাছাকাছি নেমে গেল। জলের ছিটা লেগে তার নিচের দিকটা ভিজ জবজবে হয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, জলের ঝাপটায়া অভিযাত্রীরাও ভিজ গেল। জল ছিটকে এসে নাকে মুখে লাগছে।

ক্যাপ্টেন আতঁনাদ করে উঠলেন, 'সবাই শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে ফেলো। এবার সবাই দড়ি ধরে বাদুরের মতো কুলতে লাগল। উডেয়ের সঙ্গে বারবার আছাড় খেয়ে খেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল।

উডেয়ের ধাক্কা খেতে খেতে অভিযাত্রীরা একসময় অজ্ঞাতপরিচয় দ্বীপটার নরম বালির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়, অভিযাত্রীরা এক এক করে দড়ি ছেড়ে বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। পাঁচ-পাঁচজন লোকের বোঝা হাক্কা হওয়ায় বেলুনটা ভারমুক্ত হয়ে দ্রুতগতিতে ওপরের দিকে উঠে গেল। চোখের পলকে সেটা বাতাসে ভাসতে ভাসতে সবার নজরের বাইরে চলে গেল।

আনন্দ-উদ্বেগে অভিভূত হয়ে বেলুনের অভিযাত্রীরা বালির ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? অকস্মাৎ সবার মুখে নেমে এল বিষাদের কালো ছায়া। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর তাঁর প্রিয় কুকুরটা কোথায়? কোথায় তাঁরা? তবে? তবে কি বেলুনেই রয়ে গেলেন?

আমেরিকার মানুষ যখন গৃহযুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় মত্ত, তখনকার এক রোমহর্ষক কাহিনী নিয়ে এ গল্পের অবতারণা।

আঠার শো পঁয়ষাট সালের কথা।

বল্লাহীন অত্যাচার আর সর্বনাশ এ মারণযন্ত্রকে বন্ধ করার অভিপ্রায়ে জেনারেল গ্রান্ট রিচমন্ড নগর অবরোধ করলেন। তিনি দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের একজন বড় সমর্থক। অভিশপ্ত দাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি সাধ্যাতীত

সংগ্রাস চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু হয়। এত কিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হল। রিচমন্ড নগর আয়ত্তে আনতে পারলেন না। কাজ যেটুকু হল, জেনারেল গ্রান্টের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার রিচমন্ড নগরে বন্দি হয়েই রইলেন। আর তাদের ওপর চলতে লাগল বন্ধ্যাহীন অভ্যাসের তাণ্ডব। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন, প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং। আর তাঁর সঙ্গে পারদে ঢুকতে হয়েছে নিউইয়র্ক হ্যারাল্ডের প্রধান সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট। চট্টিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স। তিনি পিস্তল ও কলম—উভয় ব্যাপারেই সমান পারদর্শী। বন্দি হবার পূর্বমুহূর্তে তিনি দিনলিপি পাঠ্য লিখেছেন, ‘এক পুলিশ আমার দিকে রাইফেল উঠিয়ে নজর রেখে চলেছে। কিন্তু—’

কর্তব্যকর্মে অবিচল না হলে এমন নজির কেউ সৃষ্টি করতে পারেন? মৃত্যু শিরে জেনেও কেউ কি কর্তব্যকর্মে এমন অবিচল থাকতে পারেন? সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট এবং প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং পূর্বপরিচিত নন। তারা কেউই কাউকে চিনতেন না। তবে হ্যাঁ, উভয়েই উভয়ের নাম ও গুণাবলির কথা অনেকবার শুনেছেন।

সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট এবং ইঞ্জিনিয়ার ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং উভয়েই রিচমন্ড নগরের সীমানার মধ্যে বন্দি ছিলেন, কড়া পাহারায়। নগরের সীমানা চেড়ে বাইরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। একদিন ঘটনাচক্রে তাঁরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেন। পরিচয় হল। মনের ভাব বিনিময় হল। মতলব আঁটতে লাগলেন, প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কীভাবে রিচমন্ড নগর থেকে পালিয়ে যাওয়া যায়।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ান স্পিলেট যখন প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবার মতলব আঁটছেন ঠিক তখনই প্রবল বিক্রমে নেবুচ্যাডনেজার শহরের মধ্যে ঢুক গেলেন। তিনি ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দীর্ঘদিনের ভৃত্য। অনন্য তাঁর প্রভুভক্তি। হার্ডিং বহুদিন আগেই তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রভু শত্রুকবলিত। জানতে পেরে কৃতজ্ঞতাবশত দুর্বীর গতিতে ঢুকে পড়েছেন নগরের অভ্যন্তরে। তাঁর একমাত্র সঙ্গী ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর।

রিচমন্ড নগর অবরোধ করেও জেনারেল গ্রান্ট তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। কেবলমাত্র নগরের মানুষগুলো আটকা পড়ায় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে। ব্যাস, এর বেশি কিছু নয়।

ব্যাপার দেখে জেনারেল লি মহা ফাঁপরে পড়লেন। তিনি রিচমন্ডের সর্বসর্বা—শাসনকর্তা। সেনাপতিদের আদেশ পাঠানো তো দূরের ব্যাপার, তাঁর পক্ষে যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যন্ত জানা সম্ভব হচ্ছে না। কিছুতেই যখন সুবিধা করতে পারছেন না তখন বুদ্ধি করে একটা বেলুন সংগ্রহ করলেন। ভাবলেন, বেলুনটায় চেপে কয়েকজনকে নগরের বাইরে পাঠিয়ে সেনাধ্যক্ষকে খবর দেবেন।

জেনারেল লি তার মতলবটাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারলেন না। দমকা বাতাস প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। কারণ, বাতাসের বেগে বেলুন পথভ্রষ্ট হয়ে অন্য পথে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মনস্ত করলেন, বাতাসের বেগ একটু কমে গেলে তিনি পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করবেন।

জেনারেল লি তাঁর গোপন অভিসন্ধিটার কথা ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের কাছে ব্যক্ত করলেন।

জেনারেল লি এবং ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের গোপন শলাপরামর্শের কথা প্যানক্রফট নামের এক নাবিক গোপন অন্তরাল থেকে শুনে ফেলল। সেও রিচমন্ড নগর থেকে গা-ঢাকা দেয়ার চেষ্টায় বেশ কয়েকদিন ধরে হেঁক হেঁক করছে। সে এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করল। বেলুনটা চুবি করে রিচমন্ড গা-ঢাকা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগের কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করল।

এমন একটা অপূর্ব সুযোগের কথা শুনে ক্যাপ্টেন হার্ডিং যেন আচমকা আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলেন। তিনি এবার ব্যস্তপায়ে সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেটকে অপূর্ব সুযোগ ও গোপন পরিকল্পনাটার কথা জানালেন।

সাংবাদিক গিডিয়ান স্পিলেট অভাবনীয় পরিকল্পনাটাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরামর্শের মাধ্যমে স্থির করে ফেললেন, রাত্রি দশটায় বেলুন অভিযান শুরু করবেন।

বেলুনে চাপার পূর্ব মুহূর্তে ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঈশ্বরের কাছে করজোড়ে একটাই প্রার্থনা করলেন, ‘হে ঈশ্বর! ঋড়ের বেগ যেন বন্ধ করে দিও না।’

স্পিলেট, প্যানক্রফট, নেবুচ্যাডনেজার আর তার প্রিয় কুকুর টপকে নিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঈশ্বরের নাম নিয়ে বেলুনে চাপলেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ রাত ঠিক দশটায় অভিযাত্রীদের নিয়ে গ্যাসবর্তি বিশালায়তন বেলুনটা শূন্যে উড়ল। তিরতির করে পথ পাড়ি দিতে শুরু করল।

নির্জন-নিরালা দ্বীপের বালির স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গিডিয়ান স্পিলেট ফ্যাকাসে বিবর্ণমুখে ভাবতে লাগলেন, ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং কোথায় উধাও হয়ে গেলেন? জলজ্যান্ত একটা লোক একেবারে বোপাত্তা হয়ে গেলেন।

গিডিয়ান স্পিলেট সঙ্গীসাহীদের নিয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলেন। বলা তো যায় না। কোন অসতর্ক মুহূর্তে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুকে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

একসময় বিস্তীর্ণ দ্বীপ ও অন্তহীন সমুদ্রের বুকে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। অভিযাত্রীরা তবু ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে খুঁজে বেড়াতে লাগল।

প্যানক্রফট চমৎকার একটা মতলব বের করলেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর খোঁজ করে অগ্রসর হওয়ার সময় আগুন জ্বেলে পদচিহ্ন রেখে যাওয়া যাক। সকাল হলে ক্যাপ্টেন যদি তাঁদের খোঁজ করেন তবে অনায়াসেই তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন।

কাঠকুটো তো জোগাড় করা যাবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আগুন জ্বালা নিয়ে। আগুন জ্বালার কোনো উপকরণই তাঁদের কারো সঙ্গে নেই।

প্যানক্রফট-এর পকেটে ম্যাচ একটা ছিল বটে। সমুদ্রের জল সবকিছু ভিজিয়ে জবজবে করে দিলেও সেটার তেমন ক্ষতি করতে পারে নি।

কাঠ জোগাড় করতে গিয়ে হতাশ হতে হল। দীর্ঘ সময় হাঁটাচাটি করেও তারা এক টুকরো কাঠ জোগাড় করতে পারল না। পারবে কী করে? দ্বীপের এদিকটায় গাছগাছালি মোটে নেই। রুক্ষ-রুক্ষ। কেবল বালি আর বালি।

একসময় অভিযাত্রীরা হতাশ হয়ে বালির স্তূপের ওপর বসে পড়লেন। প্যানক্রফট চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ক্যান্টেনকে আমরা হয়ত কোনোদিনই খুঁজে বের করতে পারব না। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের মানুষকেও প্রাণীরা তাকে হয়ত খেয়েই ফেলেছে।'

মনের জমাটবাঁধা হতাশা আর হাহাকার গোপন রেখে স্পিলেট দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করলেন, 'সকাল হতে ভালো করে খুঁজলে তাকে অবশ্যই পাওয়া যাবে। যে করেই হোক খুঁজে বের করতেই হবে। এমনও তো হতে পারে, দ্বীপের কোথাও আছাড়া খেয়ে পড়ে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছেন। যার ফলে আমরা তাঁর হদিস পাচ্ছি না। তাঁর নিশ্চাপ শরীরটাকে নিজের হাতে স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না, তিনি আমাদের মধ্যে নেই।'

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আবছা অন্ধকার থেকে ছপছপ আওয়াজ ভেসে এল। নেবুচ্যাডনেজার জলে লাফিয়ে পড়ে সঁতারাতে শুরু করলেন। প্রভুঅন্তঃপ্রাণ নিখোঁটা নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে সঁতারাতে সঁতারাতে প্রভুর নাম ধরে অনবরত ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

‘একসময় ছোট্ট একটা নদী পেরিয়ে তিনি বিপরীত পাড়ে হাজির হলেন।

অভিযাত্রীরা সারাদিন দ্বীপে হাঁটাচাটি করলেন। ক্ষুধা-তেষ্টায় সবাই কাহিল হয়ে পড়েছেন।

ইতিমধ্যে হতাশ হয়ে নেবুচ্যাডনেজার সঙ্গীদের কাছে ফিরে এসেছেন।

খাবারের খোঁজে বেরিয়ে অভিযাত্রীরা কিছু বিনুক সংগ্রহ করলেন। কাঠকুটো জোগাড় করে আগুন জ্বালালেন। তাদের ইচ্ছা, বিনুকগুলো ভেঙে তাদের মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে পেটের জ্বালা নেভাবেন। চেষ্টা চরিত্র করে তারা করলেনও তাই।

নেবুচ্যাডনেজার কিন্তু তাঁর প্রভু ক্যান্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না। তিনি অন্য সবাইর থেকে দূরে বিষণ্ণমুখে বসে নিবিষ্টচিত্তে অনবরত প্রভুর কথাই ভেবে চলেছেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা, কী করে প্রভুকে খুঁজে বের করবেন।

বেলুনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্ব মুহূর্তে বেলুন থেকে শাবল, গাঁইতি, কাটারি প্রভৃতি ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল। এবার অভিযাত্রীরা এক-এক করে সেগুলো খুঁজে বের করলেন। জড়া করলেন এক জায়গায়।

অভিযাত্রীরা এবার খোঁজাখুঁজি করে একটা গুহা বের করলেন। আশ্রয় নেবার মতো উপযুক্ত জায়গাই বটে। প্যানক্রফট তাঁর গাদা বন্দুকটাও খুঁজে পেলেন।

সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে হলে পড়েছে। অভিযাত্রীরা দ্বীপের বুকে হাঁটাচাটি করতে করতে এক বিচিত্র ধরনের পাখি দেখতে পেল। ইয়া দশাসই তাদের এক একটার চেহারা। প্যানক্রফট গাদা বন্দুক দিয়ে তাদের একটাকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি নন। মাথা খাটিয়ে অদ্ভুত একটা ফন্দি বের করলেন। শক্ত অথচ সরু লতার এক প্রান্তে বাবলা কাঁটার মতো কাঁটা বেঁধে তাতে কঁচোর টোপ গেঁথে দিলেন। সেগুলো পাখির বাসায় রেখে তারা দূরে ঘাপটি মেরে রইলেন। পাখিরা বাসায় ফিরে টোপগুলোকে গপ্পগপ্প করে গিলতে চেষ্টা করল। ব্যস, কাঁটাগুলো গলায় বিধে শিকারির কজায় পড়ে গেল বহুসংখ্যক পাখি। দারুন কায়দা—কাঁটার বড়শী দিয়ে পাখি শিকার।

পাখির মাংস আর বিনুকের মাংস পুড়িয়ে ভোজের আয়োজন করা হল। সে সঙ্গে পাখির ডিমের ওমলেট তো রইলই।

নেবুচ্যাডনেজার-এর মন কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। প্রভু ক্যান্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর অনুপস্থিতিই তাঁর বিষণ্ণতার একমাত্র কারণ।

পাখির ডাকে সকাল হল। অভিযাত্রীরা দেখলেন, নেবুচ্যাডনেজার গুহায় অনুপস্থিত। তারা ব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। সবাই ধরেই নিলেন, তিনি হন্যে হয়ে প্রভুকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হলে পড়ল। বিকেল হতে না হতেই প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের প্রকোপ ক্রমে বেড়েই চলল। অভিযাত্রীরা গুহা ছেড়ে বেরোতেই পারলেন না। তখন রাত্রি প্রায় আটটা। অভিযাত্রীরা গুহার ভেতরে গুটিমুটি মেরে বসে। এমন সময় গুহার অদূরে টপ বিকট স্বরে আর্তনাদ জুড়ে দিল।

অভিযাত্রীরা টপ-এর আর্তনাদের শুনে হুড়মুড় করে গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হার্ভাট একসময় চৈতন্যে উঠলেন—‘তিনি আসছেন। অবশ্যই আসছেন তিনি। প্রভুকে ছাড়া টপ একা ফিরে আসার পাত্র নয়।’

কথা বলতে বলতে হার্ভাট একটি জ্বলন্ত কাঠ অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—‘টপ, আমরা এখানে। এদিকে—এদিকে আমরা।’

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তীব্রস্বরে খেউ খেউ করতে করতে টপ গুহার মুখে হাজির হল। তাকে একা দেখে সবাই অবাক হলেন। আরও অবাক হলেন, যখন দেখলেন, ঝড়-বাদলের মধ্যে সে ছুটে এসেছে অথচ তার গায়ে এক ফোঁটাও জল নেই। অসম্ভব—একেবারেই রহস্যজনক এক ব্যাপার। কী করে যে সম্ভব হল তা কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব হল না। রহস্যময় দ্বীপের প্রথম ধাপ।

স্পিলেট বললেন, ‘আমার মনে হয় টপকে যখন পাওয়া গেছে তখন তার প্রভুকেও অবশ্যই পাওয়া যাবে।’

অস্থিরচিত্র উপ খেউ খেউ করতে করতে পিছন ফিরে আবার হাঁটতে লাগল। অভিযাত্রীরা ব্যস্তপায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

টপ আর্তনাদ করতে করতে একটা গর্তের মুখে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর্তনাদের মাধ্যমে অভিযাত্রীদের সঙ্কেত দিয়ে টপ অকস্মাৎ গর্তটার মধ্যে সঁধিয়ে গেল।

অভিযাত্রী তিনজন কোনোরকম দ্বিধা না করে নিজেদের জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে টপের পিছন পিছন রহস্যজনক গর্তটার মধ্যে ঢুক গেলেন।

গর্তটার মধ্যে ঢুকই অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন। তাঁরা দেখলেন, ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে রয়েছেন। আর তাঁর শিরের বিষণ্ণমুখে বসে তাঁরই প্রিয় নেবুচ্যাডনেজার।

স্পিলেট ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। ক্যাপ্টেনের ডানহাতটা তুলে তাঁর নাড়ীর অবস্থা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। পরমুহুর্তেই সোদাসে বলে উঠলেন—‘আছে! আছে—প্রাণ আছে, ক্যাপ্টেন বেঁচে আছেন।’

নেবুচ্যাডনেজার যেন অকস্মাৎ সখিৎ ফিরে পেলেন। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, ‘বেঁচে আছেন? আমার প্রভু বেঁচে আছেন? কীভাবে, কী করলে এখন সংজ্ঞা ফিরে পাবেন বলুন?’

নেবুচ্যাডনেজার যেন অকস্মাৎ সখিৎ ফিরে পেলেন। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, ‘বেঁচে আছেন? আমার প্রভু বেঁচে আছেন? কীভাবে, কী করলে এখন সংজ্ঞা ফিরে পাবেন বলুন?’

সংক্ষেপে নেবুচ্যাডনেজারকে প্রবেশ দিয়ে স্পিলেট এক মুঠো শুকনো ঘাস পাতা তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত ও পায়ের পাতাগুলোতে জোরে জোরে ঘষতে লাগলেন।

নেবুচ্যাডনেজার এবার বললেন যে তাঁর প্রভুকে খুঁজে বের করার জন্য গভীর রাতে তিনি সবার অলক্ষ্যে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। প্রভুর নাম ধরে গলা ছেড়ে চিৎকার করে ধীপে ছুটোছুটি দাপাদপি করতে লাগল। প্রভুভক্ত কুকুর টপও তাঁর সঙ্গে ছিল। একসময় টপ তাঁর টাউজার ধরে টানতে টানতে গর্তটার ভেতরে নিয়ে গেল। নেবুচ্যাডনেজার দেখলেন, তাঁর প্রভু ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে।

স্পিলেটের কাছে এবার রহস্যটা পরিষ্কার হল—ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও টপের গায়ে কেন এক ফোঁটাও জল লাগে নি। শুকনো ঘাস-পাতা দিয়ে অনবরত ঘষার ফলে ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং-এর ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে দেখা দিল রক্তের ছোপ। ফিরে এল প্রাণের স্পন্দন। চোঁট দুটো বারবার নাড়তে লাগলেন। স্পিলেট বুঝলেন, তিনি কিছু বলতে চাইছেন। তার মুখের ওপর ঝুঁকে তাঁকে কথা বলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন শত চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলেন না। স্পিলেটের অনুরোধে হার্বাট ও প্যানক্রফট ডালপালা দিয়ে একটা স্ট্রোচারের মতো তৈরি করে নিয়ে এল।

স্পিলেটের সাহায্যে ক্যাপ্টেন কোনোরকমে উঠে বসলেন। ক্যাপ্টেনকে স্ট্রোচারে তুলে অভিযাত্রীরা তাদের আশ্রয়স্থল গুহাটায় নিয়ে এলেন।

ঝলসানো পাখির মাংস আর কয়েক টোক জল পান করে ক্যাপ্টেন এবার কিছুটা সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তিনি এবার সহযাত্রীদের কাছে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কাহিনী বলতে লাগলেন, ‘সমুদ্রের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে আমরা যখন এগোচ্ছিলাম তখন আচমকা ডেউয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে হাতের দড়িটা ফসকে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে যাই। ক্রোধোন্মত্ত ডেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি আমার ঠিক আগে আগে প্রিয় কুকুর টপও সীতরে চলেছে। বুঝলাম, আমার পিবিদ দেখে সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাহাড়সমান টেউগুলোর সঙ্গে লড়াই করে করে আমি কাহিল হয়ে এলিয়ে পড়তে লাগলাম। আমার বিপদ দেখে টপ আমার ট্রাউজারের কোণা কামড়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। টেনে হিঁচড়ে পাড়ে তুলে নিল। তারপর যে কী হল, কিছুই বলতে পারব না।’

মাঘে দুটো মাত্রই কাঠি ছিল। অনেক আগেই সে দুটো ফুরিয়ে গেছে। আশুন জ্বলে রাখা হয়েছিল। চেষ্টা করে টিকিয়েও রাখা হয়েছিল দীর্ঘসময়। কিন্তু ক্যাপ্টেনের খোঁজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সে আশুন নিভে গেছে।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং একজন কৃতী বৈজ্ঞানিক। অদ্ভুত তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতা। পৃথিবীর তাবড় তাবড় বৈজ্ঞানিকরা আজ পর্যন্ত যেটুকু জানতে পেরেছেন তিনি একাই যেন তা জেনে ফেলেছেন। তাঁর ছোট মাথাটার ওপর তাঁর সহযাত্রীদের অগাধ বিশ্বাস।

প্যানক্রফট কোথায় যেন শুনেছিল, অসত্য জঙ্গলীরা শুকনো কাঠে কাঠ ঠুকে আগুন জ্বলে থাকে। তিনি দু টুকরো কাঠ সংগ্রহ করে চোকাঠুকি করতে লাগলেন। তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, ‘আরে করছ কী হে! আগুন জ্বালার জন্য এত ভাবনা কিসের। অপেক্ষা করো, আমি কেমিক্যাল দেশলাই তৈরি করে দিচ্ছি।’

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে সবার তো চমকুস্থির। সবাই বলাবলি করতে লাগল, তিনি কি জাদু জানেন নাকি? হার্বাট চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, ‘স্যার, আপনি কি যাদুমন্ত্র জানেন, নাকি আপনার কাছে বার্নিং গ্রাস আছে?’

‘বার্নিং গ্রাস? না, বার্নিং গ্রাস ছিল না বাটে। তবে একটু আগে একটা বার্নিং গ্রাস তৈরি করে নিয়েছি। আমার আর স্পিলেটের ঘড়ির কাচ দুটো খুলে নিয়ে পাশাপাশি রাখলাম। কাদামাটি দিয়ে ফাঁকগুলো বন্ধ করে দিলাম। একটামাত্র জ্বালগয় সামান্য একটু ফাঁক রেখে দিয়ে ভুললাম না। সেটা দিয়ে জল ঢুকিয়ে দিলাম। বাস, এতে পেটটা পুরু এবং কিনারা পাতলা একটা লেন তৈরি হয়ে গেল। যাকে বলা হয় কনভেন্স লেন। তার ওপর সূর্যের উত্তাপ পড়ে কেন্দ্রীভূত হয়, সূচ্য বিস্মৃতে জড়ো হয়। সূর্যের উত্তাপে খড়কুটার ওপর লেনটাকে ধরলে কিছুক্ষণের মধ্যে দপ করে জ্বলে ওঠে।

কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে। তার ওপর দমকা বাতাসের তাণ্ডব তো রয়েছেই। আশুন জ্বালানো সম্ভব হওয়ায় সবাই চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। রাত্রি একটু গভীর হলে সবাই স্মৃতি করে শূয়ারের রোঁট দিয়ে রাত্রের খাবার সারলেন।

পরদিন ২৯ মার্চ। সকাল দশটা বাজে। অভিযাত্রীরা এবার পর্বতারোহণ শুরু করলেন। ব্যাসাল্ট আর পিউনিস পাথর

দিয়ে তৈরি পাহাড়। পাহাড়ে উঠতে উঠতে হার্বাট কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখতে পেলেন। বড় বড় জানোয়ারের পায়ের ছাপ।

আরও কয়েক পা এগোতেই কয়েকটা বেশ বড়সড় ভেড়াকে ছুটোছুটি করে পালিয়ে যেতে দেখলেন। হার্বাট উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, ‘মুশামন! মুশামন!’

কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রীরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে পারলেন। উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই নজরে পড়ল কেবল জল আর জল। আর দক্ষিণ দিকে দ্বিতীয় চূড়টা কাৎ হয়ে থাকায় বোঝা গেল না জল, নাকি কোনো মহাদেশ সেটা। দ্বিতীয় চূড়টায় পা দিতেই লাভাস্রোতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক জমে থাকতে দেখা গেল। অচিরেই রাতের অন্ধকার নেমে এল। বাধা হয়ে তারা সেখানেই রাত কাটাতে লাগলেন।

মাথার ওপরে শুষ্ক পক্ষের চাঁদ। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। তিনি চাঁদের হাক্সা আলোয় হার্বাটকে নিয়ে হাঁটাচাঁট করতে লাগলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তারা একটা বিশালায়তন গহ্বর দেখতে পেলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং ব্যস্ত হয়ে গহ্বরটার ভেতরে উঁকি দিয়ে চমকে উঠলেন। দেখলেন প্রকৃতিদেবী যেন নিজেই চমৎকার একটা সিঁড়ি তৈরি করে রেখেছেন। তিনি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। হার্বাট তাঁকে নিঃশব্দ অনুসরণ করে চললেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর সহযোগী হার্বাটকে নিয়ে ঘন অন্ধকার এক স্থানে হাজির হলেন। অন্ধকারের জন্য তিনি বুঝতে পারলেন না, সেটা কোনো দ্বীপ, নাকি কোন মহাদেশ।

হাজারখানেক ফুট উঁচুতে যখন তাঁরা উঠলেন তখন নিঃসন্দেহ হলেন সেটা আসলে কোনো মহাদেশ নয়, একটা দ্বীপ। উত্তাল-উদাম সমুদ্রের বুকে দ্বীপটা অতিকায় একটা ভিমি মাছের পিঠের মতো ভাসছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং জ্বালামুখ থেকে ওপরে উঠে এলেন। তিনি দীর্ঘ পথ হাঁটাচাঁট করে আর একটা ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হলেন। দ্বীপটায় মনুষ্যবাসতি নেই। আর যদি থাকত তবে অবশ্যই কদিনে চোখে পড়ত।

সেদিনটা ছিল ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মার্চ। সেদিন গুপ্তঘাতকের গুলিতে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রাণ দেন। অভিযাত্রীরা তাঁর সুমহান কীর্তিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে দ্বীপটার নামকরণ করলেন—‘লিঙ্কন আইল্যান্ড’।

১৬ এপ্রিল। সারা বছরে যে চারদিন প্রকৃত সময় গড় সময়ের সমান হয় কাল অর্থাৎ ১৭ এপ্রিল সেই দিন। এ তারিখে সূর্য ঠিক বারোটায় মধ্যরেখা অতিক্রম করে যায়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর ইচ্ছা, সুযোগ যখন হাতের মুঠোয় রয়েছে তখন লিঙ্কন দ্বীপটার দ্রাঘিমা নির্ণয় করবেন।

ক্যাপ্টেনের ইচ্ছার কথা শুনে স্পিলেট বললেন—‘দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে হলে তো সেক্সট্যান্ট যন্ত্র চাই-ই।’

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ছাড়াই দ্রাঘিমা নির্ণয় করব।’

ক্যাপ্টেন দ্রাঘিমা নির্ণয়ের কাজে মেতে গেলেন। কাঠ চেঁছে ছলে দুটো চ্যান্টা স্কেলের মতো তৈরি করে ফেললেন। এবার দুটো বাবলার কাঁটা দুদিকে আটকে চমৎকার একটা কম্পাস তৈরি করলেন। এবার সদ্য তৈরি কম্পাসটা নিয়ে অভিযাত্রীদের সঙ্গে করে প্রসপেক্ট হাটে উঠে গেলেন। আকাশের দিকে ঘাড় ফেরাতেই হঠাৎ সাদার্নক্রস নজরে পড়ল। তার নিচে দেখা গেল আলপা নক্ষত্র যার গা ঘেঁষাঘেঁষি করে অবস্থান করছে দক্ষিণ মেরু। ক্যাপ্টেন হার্ডিং জানেন, দক্ষিণ মেরু থেকে আলফা নক্ষত্রের ব্যবধান সাত শো ডিগ্রি। তিনি এবার কম্পাসের কাঁটা ফেললেন আলফার দিকে। এভাবে দিগন্ত নক্ষত্রের কৌণিক দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হল। এবার অঙ্ক কষে বের করে ফেললেন দিগন্ত থেকে আলফার দূরত্ব কত।

সেদিনটা ছিল ইস্টার সানডে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেদিন কোনো কাজই করলেন না। পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে মনটাকে চাঙা করে নিলেন।

বিকলে জঙ্গলে হাঁটাচাঁট করতে করতে ক্যাপ্টেন ওঅর্ম উড নামে একটা গাছ আবিষ্কার করে ফেললেন। এটা একটা উল্লেখযোগ্য কাজ বটে। পটাসিয়াম নাইট্রেটে এ গাছের কাঠ শুকিয়ে নিতে পারলে দেশলাইয়ের অভাব পূরণ করা যায়। দ্বীপে পটাসিয়াম নাইট্রেট আর সোডা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। এবার আর আগুন জ্বালানোর কোনই সমস্যা রইল না।

ভাগ্য যদি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লিঙ্কন আইল্যান্ডেই রেখে দেয় তবে আমাদের ধীরে ধীরে বেঁচে থাকার মতো বন্দোবস্ত করে নেয়া দরকার।

হার্বাট একা হাঁটতে হাঁটতে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। একসময় তাঁকে বিমর্ষমুখে ফিরে আসতে দেখে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিস্মিত হলেন।

হার্বাট ফ্যাকাশে বিবর্ণমুখে ফিরে এসে ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের কাছে দুটো মাত্র শব্দ কোনোরকমে উচ্চারণ করতে পারলেন, ‘আগুন’ আর ‘অসভ্য জঙ্গলী’। শব্দ দুটো অভিযাত্রীদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে চললেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একসময় আগুনটার কাছে হাজির হলেন। ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার উঁকি দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন, ‘সাধারণ আগুন নয়—গন্ধকের আগুন। তাই আগুনের রঙ নীলাভ। আর গ্রানাইট পাথর দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, একসময় এখানে অসংখ্য আগ্নেয়গিরি ছিল। দিনের পর দিন লাভা জমতে জমতে গ্রানাইট পাথর সৃষ্টি হয়েছে।

বিকলের দিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে হার্বাট এক সময় সোন্নারসে চোঁচিয়ে উঠলেন, ‘ওই যে ক্যাডার! ক্যাডার! ক্যাডার! মাংস খুবই সুস্বাদু।’

নেবুচাডনেজারকে সঙ্গে নিয়ে হার্বাট লাঠিসোটা হাতে করে ক্যাডারের পিছনে ধাওয়া করলেন। কিন্তু জানোয়ারগুলো লম্বা লম্বা পা চালিয়ে চোখের পলকে গভীর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল। তারা বাধা হয়ে বিপুল মনে ফিরে এলেন।

২ এপ্রিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং মৌলিক পথ অবলম্বন করে লিঙ্কন দ্বীপটার মধ্যমা নির্ণয় করলেন।

সূর্য ঠিক কোন স্থান থেকে উদিত হয়েছে লক্ষ করলেন। গতদিন কোন স্থান থেকে উদিত হয়েছিল তাও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ রেখেছিলেন। এবার লক্ষ করলেন সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ঠিক বারো ঘণ্টা চব্বিশ মিনিট। অর্থাৎ ছয় ঘণ্টা বারো মিনিটের পর সূর্য মধ্যরেখায় উপস্থিত হয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের চেষ্টায় অভিযাত্রীরা ইট তৈরি করে মাথাগোজার মতো চমৎকার একটা আস্তানা বানিয়ে ফেলল। এখানেই যখন থাকতে হবে তখন ঠাই তো একটা চাই।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বাস্তবিক একজন যথার্থ বিজ্ঞানসাধক। তিনি এক-একটি কাজের মাধ্যমে একের পর এক বিশ্বয় উৎপাদন করে চলেছেন।

ক্যাপ্টেন এবার বারো ফুট একটা লাঠি নিলেন। সেটাকে সমুদ্র থেকে ২০ ফুট এবং পাহাড় থেকে ৫০০ ফুট দূরে পুঁতে দিলেন। মাটির ওপরে রইল দশফুট আর বাকি চার ফুট পুঁতে দিলেন মাটির তলায়।

ক্যাপ্টেন এবার মাটিতে শুয়ে শুয়ে ক্রমে পিছিয়ে যেতে লাগলেন। যেখানে দেখলেন, লাঠির মাথা ও পাহাড়ের চূড়াটা এক দৃষ্টিরেখায় অবস্থান করছে সেখানে ছোট লাঠিটাকে মাটিতে পুঁতে দিলেন। এবার দেখলেন, কাঠি ও লাঠিটার মধ্যে ব্যবধান ১৫ ফুট এবং কাঠি ও পাহাড়ের দূরত্ব ৫০০ ফুট। এবার পাথরের গায়ে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কন ও অঙ্ক কষার কাজে মেতে গেলেন। হিসেব কষে বের করলেন ভূমি থেকে পাহাড়টার চূড়ার উচ্চতা ৩৩৩ ফুট। ব্যস, এবার কাঁটাকম্পাস নিয়ে বালির ওপর বৃত্ত ও বৃত্তচাপ প্রভৃতি আঁকার কাজ শুরু করলেন। একটা বৃত্ত এঁকে তাকে ৩৬৮ ভাগে ভাগ করে ফেললেন। এর মাধ্যমে নির্ণয় করলেন দক্ষিণ মেরু থেকে আলফার উচ্চতা ২৭ ডিগ্রি।

এবার বাকি রইল দ্রাঘিমা নির্ণয় করা। ভাবলেন দুপুরবেলা একাজটা সারবেন।

অভিযাত্রীরা এবার দলবঁধে এগিয়ে এমন জায়গা আবিষ্কার করলেন, যেখানে সুবিশাল এলাকা জুড়ে মুক্তোর ছড়াছড়ি।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুক্তোর দিকে কোনোই ঝোঁক নেই। অতিকায় সিলমাছগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে উঠলেন—‘আমাকে আবারও এখানে আসতে হবে। কথা বলতে বলতে ছয় ফুট লম্বা একটা লাঠি সমুদ্রের তীরে পুঁতে দিলেন। লাঠির মাথাটাকে দক্ষিণদিকে সামান্য হেলিয়ে দিলেন। এটাকে তিনি সূর্যখুঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করলেন। স্পিলেট বালির ওপর ছায়ার অবস্থান লক্ষ করে করে সময় বলতে লাগলেন আর ক্যাপ্টেন হার্ডিং তা শুনে শুনে বালির ওপর আঁক কষতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং পাথরের গায়ে অঙ্ক কষে বের করে ফেললেন, লিঙ্কন দ্বীপ ও ওয়াশিংটনের মধ্যে দূরত্ব ঘণ্টা-পাঁচেকের পথ।

সূর্য ষাট মিনিটে পনেরো ডিগ্রি পথ পাড়ি দিচ্ছে। অর্থাৎ পঁচাত্তর ডিগ্রি যেতে সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা। আর ওয়াশিংটন গ্রিন উইচের সাতাত্তর ডিগ্রি পশ্চিমে অবস্থান করছে। এ হিসাব অনুযায়ী লিঙ্কন দ্বীপের দ্রাঘিমা একশো বাহান্ন ডিগ্রি (পশ্চিম)। তা যদি নাও হয় তবে অবশ্যই একশো পঞ্চাশ থেকে একশো পঞ্চান্ন ডিগ্রির মধ্যে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর অঙ্ক কষার বিরতি নেই। হিসেব নিকাশের মাধ্যমে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন, লিঙ্কন দ্বীপ ও তাহিতি আর প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ব্যবধান কম করেও ১২০০ মাইল। আবার লিঙ্কন দ্বীপ থেকে নিউজিল্যান্ডের দূরত্ব ১৮০০ মাইলের বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। আর এও হিসেব কষে তিনি বের করে ফেললেন লিঙ্কন দ্বীপ থেকে সাড়ে চার হাজার মাইল অতিক্রম করলে তবে আমেরিকার উপকূলে হাজির হওয়া যাবে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সহযাত্রী সহকর্মীদের নিয়ে আলোচনা করলেন, বিশালায়তন একটা নৌকা তৈরি করতে পারলে ১২০০ মাইল দূরবর্তী তাহিতি দ্বীপে পৌঁছানো সম্ভব। আর তার জন্য কুড়ুল, করাত, হাতুড়ি ও রাঁদা প্রভৃতি অবশ্যই চাই। আর দ্বীপে রয়েছে অফুরন্ত খনিজ পদার্থ। একমাত্র কারখানা গড়ে তোলার মাধ্যমেই সেগুলোকে কাজে লাগানো সম্ভব।

নৌকা তৈরি বা কারখানা গড়ে তোলার ব্যাপারে প্যানক্রফট-এর মোটেই মাথাব্যথা নেই। তাঁর কাছে সবচেয়ে দরকারি একটা বন্দুক তৈরি করা।

বন্দুকের ব্যাপারে প্যানক্রফটকে ভাবিত দেখে স্পিলেট তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘বন্দুক তৈরির ব্যাপারটা মোটেই তেমন সমস্যা নয়। কার্তুজ তৈরির বারুদ তৈরি করার উপযোগী অফুরন্ত সোরা, গন্ধক আর কয়লা রয়েছে দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে। ব্যাপারটা নিয়ে—’

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন—‘যত সহজ ভাবছেন, বন্দুক তৈরির কাজটা কিন্তু অত সহজ নয়। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ছাড়া বন্দুক তৈরি করা সম্ভব নয়। তবে প্যানক্রফটকে আমি হতাশ করছি। ভবিষ্যতে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব, যদি প্যানক্রফটের আশা পূরণ করা সম্ভব হয়।’ এবার প্যানক্রফটের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—‘প্যানক্রফট, আমরা সেফটি আইল্যান্ডে পৌঁছালে আপনি লোহা সাফাইয়ের কাজে লেগে যাবেন। লোহা তাড়বার জন্য সিলের চামড়া দিয়ে হাঁপর তৈরি করে নেব।’

সেফটি আইল্যান্ডে গিয়ে অভিযাত্রীরা খুঁজতে খুঁজতে একটা সিলকে বালির ওপর শুয়ে রোদ পোহাতে দেখলেন। ব্যস, তারা চারদিক থেকে বেচারা জলচর প্রাণীটাকে ঘিরে ফেললেন। লাঠির আঘাত আঘাতে তাকে মেরে ফেললেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং তার চামড়াটাকে শুকোবার জন্য বালির ওপর মেলে দিলেন।

বিশে এপ্রিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আকরিক লোহা থেকে চমৎকার একটা কুড়ুল তৈরি করে ফেললেন।

একুশে এপ্রিলের সকাল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় নেই। তিনি একটি লোহার স্তর বের করলেন। মাটিতে ছোট একটা গর্ত করে তাতে কয়লার টুকরো ছড়িয়ে দিলেন। মাটি দিয়ে চমৎকার একটা চোঙ তৈরি করে হাঁপরের গায়ে লাগিয়ে দিলেন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল কাজ চলার মতো একটা হাঁপর। হাঁপরের বাতাস পেয়ে কয়লা পুড়ে কার্বলিক অ্যাসিডে পরিণত হবে, তারপরই তৈরি হবে কার্বন মনোক্সাইড। এ পদ্ধতিতে আয়রন অক্সাইড

থেকে অস্ত্রিজেণ বেরিয়ে গিয়ে পড়ে থাকবে আয়রন। এবার লোহা গলানোর কাজ শুরু হল। লোহা গলে জলের মত তরল হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং গলানো লোহা থেকে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে ফেললেন। এভাবেই পৃথিবীর প্রথম ধাতুবিদ্যা লোহা বের করেছিলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর উদ্ভাবনী প্রতিভা ও অনন্য অধ্যবসায়ের ফলে তৈরি করা সম্ভব হল—কুড়ুল, কোদাল, শাবল, গাঁইতি, ছুরি, কাঁচি ও খুঁটি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি।

পাঁচই মে। অভিযাত্রীরা সদ্য তৈরি করা যন্ত্রপাতি নিয়ে ছাউনিতে ফিরে এলেন। সেদিনের মতো বিশ্রাম।

৬ মে। সামনে শীতকাল। অভিযাত্রীরা ভালো একটা গুহার খোঁজে বেরোবার উদ্যোগ নিলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং একটা গভীর রহস্যের মুখোমুখি হলেন। রেডক্লিক থেকে জল বেরিয়ে এসে হুদে আছাড় খেয়ে পড়ছে। কিন্তু জল তো কোথাও বেরিয়ে যাচ্ছে না। তবে? এত জল কোথায় যাচ্ছে? কোনো না কোনো পথ ধরে লেকের জল সাগরে গিয়ে মিশছে। ব্যাপারটার কিনারা করার জন্য হার্ডিং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর ব্যাপার দেখে স্পিলেট যারপরনাই বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'জনাব, এ কী পাগলামি জুড়ে দিলেন! হুদের জল যে পথ দিয়েই সাগরে গিয়ে পড়ুক না কেন তা নিয়ে আপনার মাথায় পোকা ঢুকল কেন, তবে পাচ্ছি নে তো!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চোখে-মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন—'আমার বিশ্বাস, কোনো না কোনো সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে হুদের জল তীব্র বেগে এগিয়ে গিয়ে সাগরে পড়ছে। সে সুড়ঙ্গটাকেই আমি মাথা গোঁজার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করতে চাই।

প্রভুভক্ত কুকুর টপ সর্বক্ষণ ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পিছন পিছন ঘুরে বেড়ায়। মুহূর্তের জন্যও সে তাঁর পিছন ছাড়ে না।

টপ একসময় ঘেউ-ঘেউ করতে করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক সে মুহূর্তেই অতর্কিতে অতিকায় একটা তিমি জলের ওপর ভুস করে ভেসে উঠল। টপ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিমিটা অকস্মাৎ জলে তলিয়ে গেল। টপও জলে ডুব দিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আচমকা জলের প্রায় ফুট দশকে উঁচুতে ছটকে উঠে গেল। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি যেন তার ওপর ভর করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। তার গায়ে রক্ত থাকা তো দূরের ব্যাপার, সামান্য একটা আঁচড়ও লাগে নি।

একটু পরেই হুদের জল ভীষণরকম তোলপাড় হতে শুরু হল। লাল জল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা আরও অবিশ্বাস্য রূপ নিল যখন দেখা গেল অতিকায় তিমিটার নিঃসাড় দেহ জলের ওপর ভেসে উঠল। দানবাকৃতি প্রাণীটা নিঃশ্রাণ নিষ্পন্দ অবস্থায় জলের ওপর ভাসতে লাগল। এবার বুঝা গেল, গুটা তিমি নয়। বিশালাকৃতি একটা ডুগং। গলার কাছে বেশ বড়সড় একটা কাটা দাগ।

টপের দাঁতে ক্ষত অবশ্যই নয়। ছুরি জাতীয় ধারালো কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

ব্যাপার দেখে প্যানক্রফট আত্নানাদ করে উঠল—'হায় ঈশ্বর! ছুরি—জলের তলায় ছুরি কোথেকে আসবে!'

মুচিক হেসে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন—'ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও মোটেই অসম্ভব নয়। এমন একটা রহস্যময় দ্বীপে সবই সম্ভব।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি এবার বললেন—'জল থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আমাকে কে গর্তটার ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল? বড় বাদলের দিনে কে টপকে সম্পূর্ণ শুকনো অবস্থায় পৌঁছে দিয়েছিল? জলের তলায় কেই বা ডুগংটাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেছে, এমন সব রহস্য একের পর এক আমাদের চোখের সামনে হাজির হচ্ছে যার হিসাব আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে অক্ষম। নির্ধাত কেউ না কেউ আমাদের এমন রহস্যের মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর সে আমাদের ওপর প্রতি মুহূর্তে নজর রেখে চলেছে। কে? কে সে? তাকে খুঁজে বের করাও আমাদের অন্যসব জরুরি কাজগুলোর মধ্যে একটা।' ক্যাপ্টেন হার্ডিং কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাজ এঁকে অন্যান্যমনস্কভাবে কথাগুলো ছুড়ে দিলেন।

৭ মে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং হুদের ধারে, ডুগং বধের জায়গাটায় হাজির হলেন। রহস্যটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে। কে সে? কী সে চায়? কেনই বা জাঁকের মতো তাঁদের পিছনে লেগে রয়েছে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অকস্মাৎ লক্ষ করলেন, হুদের জলে স্রোতের টান দেখা দিয়েছে। পর মুহূর্তের লক্ষ করলেন—ঘূর্ণিপাক। বিরাট একটা ঘূর্ণিপাক। জল দ্রুতবেগে চক্রর খাচ্ছে। তিনি বাট করে শুয়ে পড়ে ভূমিতে কান পাতলেন। আচমকা উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—'পেয়েছি! পেয়েছি! এখানে, মাত্র কয়েক ফুট নিচেই সুড়ঙ্গ রয়েছে।'

স্পিলেট হাঁটতে হাঁটতে সেখানে হাজির হলেন। উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁকে বললেন—'সুড়ঙ্গ! জলটাকে কোন একটা পথে বের করে দিয়ে আমি সুড়ঙ্গটাকে শুকিয়ে ফেলব। যদি কে সমুদ্র রয়েছে সেদিকটা ঝোঁনেট দিয়ে উড়িয়ে দেব। মাত্র ফুট তিনেক জল কমিয়ে দিতে পারলেই কাজ মিটিয়ে ফেলতে পারব।'

স্পিলেট চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে বললেন—'এ কী আজব কথা শোনাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। বারুদ দিয়ে ঝোঁনেট ফাটাবেন? তাও আবার কেবল গান পাউডার ব্যবহার করে?'

'ঈশ্বরের কৃপায় প্রয়োজনীয় মালমশলা দ্বীপেই অটেল রয়েছে। কেবল বুদ্ধি ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে বিস্ফোরক তৈরি করে নিতে হবে।'

বাস। ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাজে লেগে গেলেন। বিশেষ ধরনের সামুদ্রিক গুল্ম পুড়িয়ে সোডা সমৃদ্ধ ক্ষার তৈরি করা হল। তা দিয়ে সাবান তৈরি করা হল। এতে চর্বি থেকে গ্লিসারিন পৃথক হয়ে গেল। মৃত ডুগংটার চর্বি আগেভাগেই যত্ন করে রেখে দেয়া হয়েছিল। তা এখন কাজে লাগানো হল। সোডার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে তরল পদার্থ তৈরি করে নেয়া হল। এবার তেজস্ক্রিয় নাইট্রোগ্লিসারিন। এ দিয়ে কেবল সুড়ঙ্গটাকেই নয় সমগ্র দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। অনায়াসে থানাইট পাথর গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়া কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়।

২১ মে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে প্যানক্রফট গাঁইতি-শাবল দিয়ে গর্ত খোঁড়ার কাজে মেরে গেলেন। দিনভর হাড়ভাঙা খাটনি করে প্রয়োজনীয় গর্তটা খুঁড়ে ফেলা সম্ভব হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তিনটা খুঁটি গর্তে পুঁতে তাদের মাথাগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে দিলেন। তার মাথায় একটা বড়সড় লোহার টুকরো ঝুলিয়ে রাখলেন। এবার গন্ধকের বারুদ ছড়িয়ে গায়ে মাখিয়ে দিলেন। তারপর লোহার টুকরোটোর ঠিক নিচে নাইট্রোগ্লিসারিন ঢেলে দিলেন। বাস, কাজ সারা হয়ে গেল। এবার গন্ধকের বারুদমাখানো দড়িটার গায়ে দিলেন আগুন ধরিয়ে। দড়িটা পুড়তে পুড়তে একসময় লোহার টুকরোটা নাইট্রোগ্লিসারিনের ওপর দুম করে পড়ে গেল। বিকট আওয়াজ হল। সম্পূর্ণ দ্বীপটা তিরতির করে কেঁপে উঠল। এমনকি মাইল দুই দূরে যে-সব অভিযাত্রী ছিলেন তাঁরাও দমামদ আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। আর ইয়া বড় বড় পাখরের চাঁই শোলার মতো আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল। রীতিমতো এক তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। প্রবল বেগে হুদের জল সাগর গিয়ে পড়তে লাগল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি ফুটে উঠল।

সুড়ঙ্গটার পরিধি বাড়িয়ে চওড়া করা দরকার। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে প্যানক্রফট গাঁইতি-শাবল নিয়ে কাজে লেগে গেলেন।

সুড়ঙ্গটার ভেতরে দিয়ে অগ্নসর হতে গিয়ে অভিযাত্রীরা লক্ষ করলেন, তার ছাদটা ক্রমেই উঁচু হয়ে গেছে। সবার আগে আগে টপ হেঁটে চলেছে। কিছুটা পথ পাড়ি দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে কর্কশস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন। বুঝলেন, অতিকায় কোনো জলচর প্রাণী হঠাৎ কুয়ার ভেতরে ঢুকে গেল। সেটাকে দেখেই টপ এমন চিল্লাচিল্লি করছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অন্ধ কবে সিদ্ধান্তে এলেন, কুয়াটা কম হলেও নব্বই ফুট গভীর তো হবেই।

গুহার ভেতরে যাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেজন্য তার গায়ে গর্ত তৈরি করতে সবাই লেগে পড়লেন। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফলে তা শেষপর্যন্ত সম্ভব হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং গুহাটিকেই মাথাগোঁজার স্থান হিসাবে নির্বাচিত করলেন। তার নামকরণ করলেন 'গ্রানাইট হাউস'।

জুন মাস পড়ল। শীতের প্রকোপ ক্রমেই বেড়ে চলল। নতুন বাসস্থলে এসে অভিযাত্রীরা নিশ্চিন্ত হলেন। এবার গুহার ভেতরে আলোর সমস্যা দূর করতে মোমবাতি তৈরি করা দরকার।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মোমবাতি তৈরি করার কাজে লেগে পড়লেন। সালফিউরিক অ্যাসিড, চুন আর সিলের চর্বি দিয়ে তিনি চমৎকার মোমবাতি তৈরি করে ফেললেন। সলতে তৈরি করলেন শাক সবজির আঁশ দিয়ে।

শীত! হাড়কাঁপানো শীত! শীতের প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডিং চমৎকার কয়েক জোড়া জুতা তৈরি করে ফেললেন। চামড়ার অভাব পূরণ করল সিলের চামড়া। আর গরম পোশাক তৈরি করলেন ভেড়ার মতো লম্বা ল্যাজওয়ালা মুশামনের চামড়া দিয়ে। গায়ে চাপালে রীতিমত গরম বোধ হয়।

লিঙ্কন দ্বীপে প্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রীরই অভাব নেই। একরকম গাছের শেকড় থেকে টক সরবৎ তৈরি করা হল, যা দারুণ উপাদেয়। মাছ, মাংস, ঝিনুক আর লবণ তো অফুরন্ত। ম্যাপল গাছ দিয়ে চিনির অভাব মেটানো সম্ভব হল। এবার দরকার চায়ের মকো কোন ক্রান্তি দূরকারী পানীয়। একরকম ঘাস দিয়ে সে অভাবও মেটানো গেল বটে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বনের পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় দুধারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন, ব্রেডফুড জাতীয় কোনো গাছ যদি নজরে পড়ে। তা দিয়ে রুটির অভাব মেটানো সম্ভব।

হার্বাট দেশে থাকার সময় পায়রা পুষতেন। হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটে গেল। দেশে পায়রার খাবার হিসেবে ক্যান্টের পকেটে গম রাখতেন। পকেটের এক কোণে অদ্ভুতভাবে কয়েকটা গমের দানা আটকে ছিল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সেগুলোকে ভেজা মাটিতে পুঁতে দিলেন। বৃষ্টির জল পেয়ে তাতে চারাগাছ গজাল। সেগুলো ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল।

পাঁচ জুলাই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিকেলের দিকে তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন।

হাটতে হাটতে স্পিলেট বললেন, 'ক্যাপ্টেন, মহাদেশে যেসব জন্তু জানোয়ার দেখা যায় এখানকার জঙ্গলেও সে সবার অভাব নেই। ব্যাপারটা আশ্চর্য হবার মতোই বটে, তাই না?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মুচকি হেসে তাকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন, 'দ্বীপটার গঠনবৈচিত্র্য আমাদেরও ভাবতে উৎসাহিত করছে, সুদূর অতীতে দ্বীপটা কোনো মহাদেশের অঙ্গ ছিল। শোনা গেছে, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া মিলে নাকি পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশ ছিল। তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে এদেশটাও সমুদ্রের জলে ডলিয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বর্তমান কেবল পর্বতের চূড়াটা মাথা উঁচিয়ে অতীতের স্বাক্ষর বহন করছে। প্রবাল কীটের দৌরাণ্ডো সমুদ্রের বুকে একের পর এক দ্বীপ গড়ে উঠছে। এটা অবশ্য প্রবাল দ্বীপ নয়। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফসল।

রাত আটটায় অভিযাত্রীরা গুহাবাড়িতে ফিরে এলেন।

আগস্টের মাঝামাঝি হাড়কাঁপানো শীতে অভিযাত্রীরা গরম জামা-কাপড়ের অভাব বড় বেশি করে বোধ করতে লাগলেন। লিঙ্কন দ্বীপে ভল্লুক থাকলে শীতের মোকাবেলা করার উপযোগী পোশাক তৈরি করা কোনো সমস্যার ব্যাপারই ছিল না। তাই ক্যাপ্টেন হার্ডিং সহযোগীদের নিয়ে জঙ্গলে ফাঁদ পেতে কিছু সংখ্যক শেয়াল ধরে ফেললেন। কয়েকটা বুনা শূয়োরও ফাঁদে ধরা পড়ল।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা আগস্টের শেষার্ধ্বে ধরতে গেলে গুহার ভেতরেই কাটিয়ে দিলেন। এক সকালে বরফ পড়া বন্ধ

থাকলে তারা গুহা থেকে বেরিয়েই চমকে উঠলেন। দেখলেন, গুহার মুখে চতুষ্পদ প্রাণীর খাবার চিহ্নের মত কিছুসংখ্যক চিহ্ন বরফের গায়ে জুল জুল করছে। তারা ভাবলেন, পশ্চিমের দ্বীপ থেকে কোনো হিংস্র প্রাণী এচও ঠাণ্ডায় লিঙ্কন দ্বীপে পালিয়ে এসেছে। টপ-এর অস্থিরতা বেড়ে গেল। সে কুঁয়োটার পাড়ে বসে হরদম চিল্লাচিল্লি করতে লাগল।

ক্যান্টেন হার্ডিং নিঃসন্দেহ, নির্বাং কোনো না কোনো হিংস্র প্রাণী কুঁয়োর ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে। নইলে টপ এমন উত্তেজিত হবে কেন?

কিছুদিন যেতে না যেতেই এমন এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল যা লিঙ্কন দ্বীপের ক্ষেত্রে অরণীয় হয়ে রইল।

২৬ অক্টোবর। দুপুরের দিকে অতিকায় একটা শুয়োর বান্ধাকান্ধাসহ ধরা পড়ল। সেদিন দুপুরে অভিযাত্রীরা পরম তৃপ্তিতে কোন্ডারর কোল আর বান্ধা শুয়োরের স্যাঁকা মাংস দিয়ে ভোজ সারতে মেতে গেলেন। মাংস চিবাতে গিয়ে কী যেন শব্দ একটা জিনিস প্যানক্রফট-এর দাঁতে বাঁধল। খট করে উঠল। ভাবলেন, শুয়োরের ভাঙা দাঁত। আঙুল করে মুখ থেকে বের করে এনেই চমকে উঠলেন 'হায় ঈশ্বর! এ যে বন্দুকের গুলি। পাণ্ডববর্জিত এ-দ্বীপে বন্দুকের গুলি এল কোথেকে।' ব্যাপারটা দ্বীপবাসী অভিযাত্রীদের মনে যারপরনাই বিস্মিত করল।

ম্যাকরনড

হায় ঈশ্বর! বন্দুকের গুলি!

যে দ্বীপে মানুষের অস্তিত্বের কথা কল্পনা ও করা যায় না সেখানে জানোয়ারের গায়ে বন্দুকের গুলি এল কোথেকে? অবশ্যই কোনো না কোনো মানুষের কাজ। কিন্তু কে সে?

ক্যান্টেন হার্ডিং বন্দুকের গুলিটার দিকে অশ্লোক চোখে তাকিয়ে থেকে এক সময় বললেন—‘প্যানক্রফট, বুলেটটা যার গায়ে ছিল তার বয়স কত হতে পারে, বলো তো?’

‘বড়জোর মাস তিনেক। ফাঁদে আটকা পড়েও শুয়োরের বান্ধাটা মায়ের দুধ খাচ্ছিল।’

‘তবে ধরে নিতেই হয় তিন মাসের মধ্যে কেউ না কেউ তাকে গুলিবিদ্ধ করেছিল। ঠিক কি না? তাই এবার থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। হয়ত কেউ ধারে কাছে ঘাপটি মেরে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আর সে মালয়-ডাকাত হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।’

পাঁচদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা একটা ক্যানো জাতীয় নৌকা তৈরি করে ফেললেন। উদ্দেশ্য, নৌকায় চেপে দ্বীপটাকে প্রদক্ষিণ করা। নদীগুলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজি দেখা, দ্বীপটায় অন্য কারো অস্তিত্ব রয়েছে কি না।

এবার অভিযাত্রীরা রীতিমতো অবিশ্বাস্য এক কাণ্ডের মুখোমুখি হলেন। অতিকায় একটা কচ্ছপকে সমুদ্রের কিনারা বরাবর বালির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে দৌড়ে গিয়ে সেটাকে চিৎ করে দিলেন। কোনোক্রমে কচ্ছপকে চিৎ করে দিতে পারলে তার পক্ষে আর চলার ক্ষমতা থাকে না। তারপরও অধিকতর সতর্কতাস্বরূপ চারদিকে পাথরের চাঁই সাজিয়ে দিলেন।

ক্যান্টেন হার্ডিং তখন গ্রানাইট হাউসে ছিলেন। অভিযাত্রীরা তাকে খবরটা দিতে এবং একটা ঠেলাগাড়ি এনে কচ্ছপটাকে নিয়ে যাবার জন্য সেখানে গেলেন।

ঠেলাগাড়ি নিয়ে এসে অভিযাত্রীরা তো রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এতকিছু আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়ে কচ্ছপটা পালিয়েছে। এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার ঘটল কী করে। ব্যাপারটা তাদের মনে গভীর রহস্যের সঞ্চার করল।

ব্যাপারটা ক্যান্টেন হার্ডিং-কে যারপরনাই ভাবিয়ে তুলল। তিনি নতুনতর এক ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লেন।

ঊনত্রিশে অক্টোবর। সকাল হতে না হতেই অভিযাত্রীরা সদ্য তৈরি নৌকাটা নিয়ে উল্লাস করতে করতে সমুদ্রের তীরে হাজির হলেন।

সমুদ্রের গা ঘেষে নৌকাটাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলতে চলতে একসময় হার্বাট আতঙ্কিত কণ্ঠে চৈচিয়ে উঠলেন—‘ওই—ওই যে। ওটা কী? ওটা কী? ওই যে—ওটা—’

হার্বাট-এর অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই প্যানক্রফট আঁতকে উঠলেন। তিনি দেখলেন, সমুদ্রের জলে দুটো ইয়া পেল্লাই পিপা ভাসছে। আর তাদের মাঝখানে একটা সিঁদুক বাঁধা। তীরের কাছাকাছি ছিল সেগুলো।

অভিযাত্রীরা জলে নেমে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সিঁদুক সমেত পিপা দুটোকে টেনে হিচড়ে পাড়ে তুলে আনলেন। কঠিন-কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এমন একটা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পেরেছেন।

সিঁদুকটাকে পিপে দুটোর বাঁধন মুক্ত করা হল। এবার সিঁদুকটাকে ঠেলে তাঁদের আন্তানা গ্রানাইট হাউসের সামনে নিয়ে এলেন।

সিঁদুকটাকে নিয়ে সবাই নানা জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠলেন। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, মালয়-দস্যুদেরই সিঁদুক এটা। কোথাও থেকে ডাকাতি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। জাহাজডুবির ফলে তা আর তাদের বরাতে জটল না।

অভিযাত্রীরা ছুটোছুটি করে হাতুড়ি, শাবল ও গাঁইতি নিয়ে এলেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক সিঁদুকটাকে খোলা সম্ভব হল। আশ্চর্য ব্যাপারতো। দীর্ঘ সময় জলে থাকতেও ভেতরের কোনো কিছুই নষ্ট হয় নি।

জামা কাপড়, বইপত্র, বাল্লার সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র এবং অত্যাবশ্যক বহু যন্ত্রপাতিতে সিঁদুকটা একেবারে বোঝাই। খোঁজাখুঁজি করে একটা ক্যামেরা, ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার ও সেন্সরট্যাক ও গেলিস প্রভৃতিও পাওয়া গেল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি পেয়ে ক্যান্টেন হার্ডিং-এর আনন্দ যেন আর ধরে না।

আশ্চর্য ব্যাপার। সিঁদুকটায় এতসব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে কিন্তু কোনটির গায়েই লেখা নেই সেগুলো কোন দেশে এবং কবে তৈরি হয়েছে।

রাতে খাবার আগে ক্যাপ্টেন হার্ডিং সিন্দুক থেকে পাওয়া বাইবেলটার পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

প্যানক্রফট উৎসাহিত হয়ে বললেন—‘স্যার, একটা কাজ করুন। হঠাৎ করে বাইবেলের কোনো একটা জায়গা খুলুন, দেখবেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কী, উপদেশ দেয়া রয়েছে।’

ক্যাপ্টেন হার্ডিং হঠাৎ করে বাইবেলের একটা জায়গা খুললেন। সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকটার দিকে তার চোখ পড়ল। সেখানে লেখা রয়েছে—‘দিশ্বরের কাছে যা কিছু প্রার্থনা করা যায় তা-ই পাওয়া যায়। যে তাঁকে আন্তরিকভাবে খোঁজে, সে-ই পায়।’

৩০ অক্টোবর। সকাল হল। ঘড়িতে তখন সকাল ছয়টা বাজে।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীর দল ক্যানোয় চেপে মার্সি নদীপথে দ্বীপটাকে ঘুরে দেখে বেড়াচ্ছেন।

একসময় হার্বাট গলা ছেড়ে চৈচিয়ে উঠলেন—‘ইউক্যালিপটাস! ইউক্যালিপটাস!’

ক্যাপ্টেন হার্ডিং টোন্টের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—‘অস্ট্রেলিয়ার মানুষরা ইউক্যালিপটাসকে বলে ‘ফিভার-ট্রি’। এগাছের হাওয়ায় জ্বর হয় ভেবে মুখড়ে পড়লে আমরা কিছু ভুলই করব। বরং বলা চলে, এ গাছের হাওয়ায় গা থেকে জ্বর পালিয়ে যায়।’

আরও কিছুদূর এগিয়ে তাঁরা একদল প্রাণীকে কিচির মিচির করতে করতে ডালে ডালে ছুটোছুটি করতে দেখলেন। মানুষের প্রায় সম আকৃতিবিশিষ্ট প্রাণী এই প্রথম তারা দেখতে পেলেন।

বরাত মন্দ। নৌকো বালির চড়ে আটকে গেল। নদীর এ অংশে জল খুবই কম। নৌকা নিয়ে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অভিযাত্রীরা নদীর পাড়ে, পাথরের ওপর শুয়ে-বসে রাত্রি কাটালেন।

পূর্ব আকাশে রক্তিম ছোপ দেখা দিল। সকাল হল। ৩১ অক্টোবরের সকাল।

দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা ঝঞ্জলের পথ ধরে এগোতে এগোতে ছোট্ট একটা বর্নার ধারে হাজির হলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মনে একই চিন্তা বার বার ঘুরপাক কেতে লাগল, কদিন ধরে সমুদ্রের তীরে হাঁটাচাটি করেছেন তবু জাহাজডুবির কোনো চিহ্নও নজরে পড়ল না। কোনো জাহাজ যদি ডুবে নাই থাকে তবে সিন্দুকটা এল কোথেকে?

বর্নার পাড় ধরে আধ মাইলখানেক পথ পাড়ি দিয়ে তবে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের তীরে হাজির হতে পারলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং একটা ব্যাপার দেখে অবাক না হয়ে পারলেন না। সমুদ্রের পূর্বদিকে পাথরের যে বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে তার পশ্চিম দিকটায় ঘন সবুজের সমারোহ।

এখানে দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটাচাটি করেও জাহাজডুবির কোনো চিহ্ন না দেখতে পেয়ে তিনি আরও হতাশ হলেন, একেবারেই মুখড়ে পড়লেন। তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠলেন—‘তবে... তবে কি এ-দ্বীপেই কোনো মানুষ বাস করছে? নইলে শূয়ারের গায়ে বুলেটটা এলই বা কোথেকে?’

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর সহচরদের নিয়ে অদূরবর্তী কার্পেন্টাইন অন্তরীপে যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে লাগলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ক্যাপ্টেন হার্ডিং সবাইকে নিয়ে কার্পেন্টাইন অন্তরীপের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

একসময় সক্ষ্যার অন্ধকার মেনে এল। হার্বাট খোঁজাখুঁজি করে একটা গুহা বের করে ফেললেন। সেটা বেশ বড়সড়ই বটে। পাঁচ-সাতজন লোক অনায়াসে শুয়ে-বসে রাত্রি কাটিয়ে দিতে পারে।

গুহাটার কাছে গিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি দিয়েই হার্বাট ঝট করে একলাফে পিছিয়ে এলেন। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, ভেতরে কে যেন গম্ভীর স্বরে গর্জন করে চলেছে।

হার্বাটকে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে পিছিয়ে যেতে দেখে স্পিলেট ব্যস্তপায়ে এগিয়ে গেলেন। প্যানক্রফটের কাঁধে সদ্য তৈরি একটা গাদা বন্দুক আছে বটে। কিন্তু সেটা এতই ছোট ও কম ক্ষমতা সম্পন্ন যে, বড় কোনো জানোয়ারকে তার গুলি ঘায়েল করতে পারবে না।

এদিকে স্পিলেট সাহসে ভর করে গুহার মুখে এগিয়ে যেতেই অদ্ভুত দর্শন ভীষণাকৃতি একটা জানোয়ার থাবা বাগিয়ে, ভয়ঙ্কর হুন্কার দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সামনের পা দুটো উঁচু করতেই তিনি ঝট করে প্যানক্রফটের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়েই চোখের পলকে তার ঘোড়াটা টিপে দিলেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য। জানোয়ারটা বুকফাটা তীব্র আত্ননাদ করে শূন্যে লাফ দিল। পর মুহূর্তেই সেটা মাটিতে পড়ে দাপাদাপি শুরু করে দিল। মরণযন্ত্রণা।

দুচোখের ফাঁকে বন্দুকের গুলি আঘাত হেনেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্তে মাখামাখি অবস্থা বেশিক্ষণ তাকে আর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটাতে হল না। অচিরেই দৈত্যাকৃতি জানোয়ারটা এলিয়ে পড়ল। শেষ—সব শেষ!

জানোয়ারটার বিশাল বপুটা এলিয়ে পড়তেই নেবুচাদনেজার সূতীকৃত ছুরিটা নিয়ে এগিয়ে গেল। ব্যস্ত-হাতে তার গা থেকে চামড়া ছাড়াতে লেগে গেল। শীতের মধ্যে মাংসের চেয়ে চামড়ার লোভেই সে এমন কঠিন পরিশ্রম করতে উৎসাহী হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা এবার হৈ হৈ করে গুহাটার ভেতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। দেখেন, গুহাটার ভেতরে হাড়ের পাজী। উৎকট গন্ধে ভেতরে দাঁড়ানো সাধ্য কি?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে অদ্ভুত একটা ব্যবস্থা করলেন। শুকনো কাঠ আর লতাপাতা দিয়ে আগুন জ্বেলে দিলেন। কিছু শুকনো বাঁশের টুকরো এনে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দেয়া হল। বিকট আওয়াজ তুলে বাঁশের গাঁটগুলো ফাটতে লাগল। জন্তু-জানোয়ার তো দূরের কথা ভূতপ্রেত বা দতিদানোও সাহস করে গুহার কাছে আসবে না।

দ্বীপবাসীরা গুহাটার ভেতর থেকে হাড়গুলো বের করে মোটামুটি বসবাসোপযোগী করে নিলেন।

সকাল হল। ক্যানোটাকে মার্সি নদীর কিনারায় বাঁধা অবস্থায় রেখেই দ্বীপবাসীরা দক্ষিণদিকে যাত্রা শুরু করলেন।

পথে যেতে যেতে তারা জাহাজডুবির চিহ্ন নজরে পড়ে কি না সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়িয়ে দিয়ে দিলেন, তবু জাহাজডুবির কোনো চিহ্নই কারো নজরে পড়ল না। আশ্চর্য ব্যাপার তো! জাহাজ ডুবি না হলে সিন্দুকটার আবির্ভাব কী করে সম্ভব হল। ব্যাপারটা ক্যান্টেন হার্ডিং-এর মধ্যে গভীর রহস্যের সঞ্চার করল। তিনি কিছুতেই রহস্যটার কুলকিনারা করতে পারছেন না।

ক্যান্টেন হার্ডিং-এর মনোভাব অনুমান করতে পেরে প্যানক্রফট বললেন—‘জাহাজ ডুবি যদি সত্য সত্যই হয়ে থাকে সে কি আর আপনার জন্য মাথা ভাসিয়ে রেখেছে নাকি? মাস্তুল সমেত কবেই জলের তলায় চলে গেছে।’

ক্যান্টেন হার্ডিং-এর মুখে গম্ভীরের ছাপ ফুটে উঠল।

প্যানক্রফট বলে চলল—‘জলে যদি তলিয়ে না-ই গিয়ে থাকে তবে নির্ধাত সেটা বালির তলায় চাপা পড়ে গেছে।’

ক্যান্টেন হার্ডিং নিরুত্তর রইলেন।

পথ চলতে চলতে দ্বীপবাসীরা বেলা তিনটার সময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আসলে ক্যান্টেন হার্ডিং চোখের সামনে দূরবীণ ধরে কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন। আপন মনে বলে উঠলেন—‘খ্যৎ, জাহাজের কোনো চিহ্নই তো নজরে পড়ছে না! এ কেমন ভোজবাজির খেল রে বাবা!’

এমন সময় অদূরবর্তী ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর টপের তীব্র আর্তনাদ কানে ভেসে এল।

দ্বীপবাসীরা তখন বিশালায়তন একটা সরোবরের ধারে দাঁড়িয়ে। পাশেই গভীর জঙ্গল। সবার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে টপ কখন যে চুপিচুপি ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেছে কারোরই জানা ছিল না।

মুহূর্তের মধ্যেই টপ এক চিলতে কাপড় মুখে করে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। সেটাকে সবার সামনে ফেলে দিয়েই সে তেমনি উত্তেজিতভাবেই আবার ঝোপটার ভেতর ঢুকে গেল। ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুনতর এক গভীর রহস্যের সঞ্চার করল। রহস্যের পর রহস্য!

প্যানক্রফট উদ্ভাসের মতো ছুটে ছুটে টপকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

দ্বীপবাসীদের সবার মনেই গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। ঝোপের ভেতর থেকে প্যানক্রফটের উত্তেজিত ও ব্যস্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল—‘এই যে—এই যে, পেয়েছি। জাহাজের চিহ্ন পেয়েছি। জাহাজের চিহ্ন—এখানে।’

অস্থিরচিত্ত দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে ঝোপের ভেতরে সামান্য ঢুকে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সবার চোখের সামনে ভেসে উঠল, অনুচ্চ একটা গাছের ডালে কাপড় আলতোভাবে বাতাসে দোল খাচ্ছে। এরই একটা প্রান্ত টপ কোনোক্রমে দাঁত দিয়ে ছিড়ে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিল।

স্পিলেট কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে কাপড়ের টুকরোটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—‘আমি নিঃসন্দেহ এর সঙ্গে জাহাজ বা জাহাজডুবির কোনো সম্পর্কই নেই। আসলে এটা আমাদের বেলুনটার কাপড়। বেলুনটার ধ্বংসাবশেষ।’

প্যানক্রফট এবার বললেন—‘বেলুনের কাপড় হলেও এটা আমাদের উপকারে আসবে, সন্দেহ নেই। নৌকোতে ব্যবহার করা যাবে। আর আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের অভাবও কিছু না কিছু পূরণ হতে পারে।’

নেবুচাদনেজার, প্যানক্রফট আর স্পিলেট চোখের পলকে পাছটায় উঠে ডাল থেকে কাপড়টাকে পেড়ে নিয়ে এলেন।

বেলুনটার অংশ বিশেষ ছিড়ে উধাও হয়ে গেলেও যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তার পরিমাণও নেহাৎ কম নয়। বেলুনটার সঙ্গে বেশ কিছু দড়িও পাওয়া গেল যা আখেরে বড়ই উপকারে আসতে পারে।

দ্বীপবাসীরা জায়গাটাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় তার নামকরণ করলেন, ‘বেলুন-বন্দর’। আর যেখানে সিন্দুকটাকে পাওয়া গিয়েছিল তার নাম দেয়া হল ‘স্ট্রেটমাস পয়েন্ট’।

দ্বীপবাসীরা আবার দক্ষিণদিকে হাঁটতে লাগলেন। এবার তাঁরা মার্সি নদীর যে জায়গায় পৌঁছোলেন তার বিস্তার প্রায় আশি ফুট।

ভেলা ছাড়া নদীটা অতিক্রম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। প্যানক্রফট দা-কুডোল নিয়ে ভেলা তৈরির জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময় অভিযাত্রীরা এক অভ্যাচার্য—একেবারেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন। দেখলেন, তাদের ক্যানোটা ভাসতে ভাসতে এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনকই বটে। শুধু রহস্যজনক বললেই যথেষ্ট হল না, তাদের কাছে এটা অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হল। শক্ত বাঁধন খুলে ক্যানোটার তো কিছুতেই চলে আসা সম্ভব নয়। তবে? বিজ্ঞানকে যারা প্রতি মুহূর্তে ব্যবহার করছেন তাঁদের কাছে এমন একটা অভাবনীয় অলৌকিক ব্যাপার একেবারেই অপ্রত্যাশিত। ভুতুড়ে ব্যাপারটাকে মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও চোখের সামনে ঘটে পাওয়া দৃশ্যটাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই।

প্যানক্রফট হাঁটু জলে নেমে একটা লগি দিয়ে ক্যানোটাকে টানাটানি করে তীরে নিয়ে এলেন। তার সঙ্গে বাঁধা দড়িটার দিকে নজর পড়তেই ক্যান্টেন হার্ডিং-এর দৃষ্টিশক্তি স্থির হয়ে গেল। তিনি ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখের তারায় বিশ্বের ছাপ ফুটে উঠল। ব্যাপারটাকে অধিকতর রহস্যজনক বলেই তাঁর কাছে মনে হল। বুঝলেন, কোনো ধারালো পাথর দিয়ে ঘষে ঘষে দড়িটাকে কেটে দেয়া হয়েছে। কে এ অদৃশ্য ভুতুড়ে কাণ্ডের নায়ক? কেই বা তাদের সামনে একের পর এক রহস্যের সঞ্চার করে চলেছে? শুধু কি এই? বিপদের মুহূর্তে রহস্য সৃষ্টিকারী বারবাক্ত বন্ধুর মতো, পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে। কে সে? কেনই বা নিজেকে গোপন অন্তরালে রেখে এমন রহস্য সঞ্চার করে চলেছে?

ক্যানোটার চেপে দ্বীপবাসীরা তাদের আশ্রয়স্থল গুহাটার কাছে হাজির হলেন। গুহার মুখে যাওয়ার আগেই আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হলেন তাঁরা। টপ নৌকো থেকে নেমেই উর্ধ্বশ্বাসে গুহার দিকে ছুটে গিয়েছিল। গুহার মুখে পৌঁছেই সে আবার পিছন ফিরে যেউ যেউ করতে করতে তাঁদের দিকে ছুটে আসতে লাগল।

ব্যাপার দেখে সবাই বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে যাবার জোগাড় হলেন। নিজেরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন—‘এ কী অভ্যাচার্য্য ব্যাপার! টপ আবার কোন রহস্যের গন্ধ পেল, বোঝা যাচ্ছে না তো!’

ক্যাপ্টেন হার্ডিং হস্তদন্ত হয়ে গুহাটার কাছে গিয়েই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে স্বগতোক্তি করে উঠলেন—‘এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! এ কী হল! কে এমন একটা কাজ করল। গুহায় গুহাটার ঝুলন্ত সিঁড়িটা গেল কোথায়? সেটাকে তুলে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল?’

দ্বীপবাসীরা একে অন্যের মুখের দিকে নীরব দৃষ্টি মেল তাকিয়ে রইলেন। কারো মুখেই রা সরছে না। বিশ্বয়ে সবাই যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

রহস্য! একের পর এক রহস্যের মুখোমুখি হয়ে দ্বীপবাসীরা যেন ক্রমেই স্তম্ভিত হয়ে পড়তে লাগলেন।

সবাই হেন্যে হয়ে সিঁড়িটার খোঁজে লেগে পড়লেন। না, তাঁদের সব প্রয়াসই ব্যর্থ হয়ে গেল। কোথাও সিঁড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

স্পিলেট প্রায় হাহাকার করে উঠলেন—‘বরাতো যা ছিল, হয়ে গেল। এখন নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, যে রহস্যজনক ব্যক্তি শূয়োরটাকে গুলিবদ্ধ করেছিল সেই আমাদের সিঁড়িটাকে নিয়ে বেপাভা হয়ে গেছে। এবার আমাদের একমাত্র সম্ভব গুহাটাও হাতছাড়া হয়ে গেল। আমাদের এখন নিশ্চেষ্টভাবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই।

গুহাটার মুখের কাছাকাছি পৌঁছে অস্থিরচিত্ত প্যানক্রফট গলা ছেড়ে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন।

না, গুহাটার ভেতর থেকে কোনো সাড়াই ভেসে এল না। কেবল তাঁরই কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল। তবে হ্যাঁ, মনে হল ভেতর থেকে কার যেন মৃদু হাসির শব্দ ভেসে এল। আর তাতে বিদ্রূপের ছোঁয়া রয়েছে বলেই মনে হল।

উপায়ান্তর না দেখে দ্বীপবাসীরা তাদের আশ্রয়স্থল গ্রানাইট-হাউসের মায়া ত্যাগ করে বিষণ্ণমনে চিমনি গুহার দিকে যাত্রা করলেন। স্থির করলেন ভোরের আলো ফুটে উঠলে আবার সিঁড়িটার খোঁজ করবেন।

তবে ব্যাপারটাকে তুচ্ছতাচ্ছল্য জ্ঞান না করে তাঁরা গ্রানাইট হাউসের দরজায় অকুতোভয় টপকে পাহারায় নিযুক্ত করে রেখে এলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে গ্রানাইট হাউসের কাছ গেলেন। তন্নতন্ন করে সিঁড়িটার খোঁজ করলেন। দেখলেন, সিঁড়িটাকে কে যেন চাতালের ওপর তুলে রেখে গেছে। জানালাগুলো আগের মতোই বন্ধ। কিন্তু দরজাটা কোন অদৃশ্য হাত যেন খুলে রেখে দিয়ে গেছে। ভুতুড়ে কাণ্ড ছাড়া একে কী-ই বা বলা যেতে পারে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বুদ্ধি খরচ করে একটা আঁকশি দিয়ে মইটাকে চাতাল থেকে টেনে নামানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপারের মুখোমুখি হতেই তিনি সচকিত হয়ে আঁকশিটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। সিঁড়িটা সামান্য নামিয়ে আনতেই রহস্যজনক একটা হাত এগিয়ে এসে সেটাকে টেনে আবার চাতালটার ওপর তুলে নিল। হাতটা গ্রানাইট হাউসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে আবার সেই পথেই বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে গেল। রীতিমতো ভুতুড়ে কাণ্ডই বটে।

প্যানক্রফট গলা ছেড়ে গালিগালাজ শুরু করে দিলেন—‘হতচ্ছাড়া ভুই বানর, গরিলা, বেবুন বা ওরাংউটাং যাই হোস না কেন, একটামাত্র বুলেটে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। শয়তানি করার আর জায়গা পাসনি!’

প্যানক্রফট—এর হস্তিত্ব শেষ হতে না হতেই জানালা দিয়ে একটা বানরের মুখ উঁকি দিল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই তার বন্দুক থেকে একটা সিসার গুলি ছিটকে গিয়ে বানরটার মাথায় আঘাত হানল। বিকট গর্জন করে তার রক্তাক্ত দেহ ওপর থেকে দূম করে মাটিতে পড়ে গেল। কয়েকবার আছাড়ি পিছাড়ি করে সেটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিশ্চল হয়ে পড়ল।

এবার তাঁদের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, সেটা বানর নয়, ওরাংউটাং।

দ্বীপবাসীরা এবার নিঃসন্দেহ হলেন, লিঙ্কন দ্বীপে তাঁদের প্রধানতম শত্রু ওরাংউটাং। তাদের একটাকে ঘায়েল করলেন বটে। কিন্তু আরও আছে। এবার থেকে বুদ্ধিমান মানুষ আ জঙ্গলি জানোয়ার ওরাংউটাং-এর মধ্যে লড়াই বেঁধে গেল।

শয়তান ওরাংউটাংটার মৃত্যুসংবাদ মুহূর্তের মধ্যেই বনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তারা তাদের জাতভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দল বেঁধে হাজির হল গুহাটার কাছে। শুরু হয়ে গেল তুমুল লড়াই। তারা গুহাটার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে লাগল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে তারা গুহার মধ্যে ঘাপটি মেরে রইল।

ওরাংউটাংগুলি গুহা ছেড়ে বেরোচ্ছে না দেখে দ্বীপবাসীরা গুহার মুখে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কেউ টু শব্দটিও করলেন না। ওরাংউটাংগুলো ভাবল, শত্রুরা হতাশ হয়ে গুহার মুখ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে।

ওরাংউটাংরা বুদ্ধি রাখে যথেষ্ট। গরিলাদের মতো অস্থিরচিত্তও নয়। দূম করে কোনো কাজ তারা করে না। বুদ্ধি খরচ করে, আগে পিছে ভেবে ভবেই কাজ করে। আবার বেবুনদের মতো নির্বোধও নয়। দ্বীপবাসীদের সব বুদ্ধি জঙ্গী জানোয়াররা ভোঁতা করে দিল।

অনন্যোপায় হয়ে দ্বীপবাসীরা সাব্যস্ত করলেন, হ্রদের দিককার জানালাটা খুলে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকে যাবেন।

শাবল আর গাই নিয়ে দ্বীপবাসীরা হ্রদের দিককার জানালাটা খোলার চেষ্টা শুরু করতেই টপকে অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করতে দেখা গেল। আর সেই সঙ্গে গলা ফাটানো চিৎকার চেঁচামেচি চালিয়েই যাচ্ছে।

টপের অস্থিরতা লক্ষ করে সবাই ছুটোছুটি করে গুহাটার মুখের কাছে জড়ো হল। জানোয়ারগুলোর আকস্মিক নীরবতাও তাদের কম ভাবিয়ে তুলল না। মনে হল, কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তারা মুষড়ে পড়েছে।

প্যানক্রফট সুযোগ বুঝে বন্দুক চালাতে লাগলেন। এলোপাখাড়ি বন্দুক চালানো যাকে বলে। গুহার ভেতরে তুমুল আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গুহার ভেতর থেকে কোনোরকম শব্দ আসা বন্ধ হয়ে গেল। একতরফা লড়াইয়ে তারা বেশিক্ষণ সুবিধা করতে পারল না।

সম্পূর্ণ অভাবনীয় একটা কাণ্ড আচমকা ঘটে গেল। হঠাৎ করে সিঁড়িটায় অপেক্ষমাণ দ্বীপবাসীদের সামনে চলে এল। রহস্যের পর রহস্য!

বাস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সবাই ছুঁড়ু ছুঁড়ু করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যেতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ছিলেন সবার ওপরে। তিনি সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই যন্ত্রচালিতের মতো হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। আচমকা বিকট একটা চিৎকার শুনে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। সাক্ষাৎ যমরাজের কোনো দূত যেন আচমকা গুহাটার ভেতরে ঢুকল। ওরাংওটাং—ওরাংওটাং।

আসলে ওরাংওটাংটাকে কুড়ুল নিয়ে নেবুচ্যাডনেজার তাড়া করেছে বলেই তার অতর্কিত আগমন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে বাধা দিয়ে বললেন—‘খবরদার, এটাকে না মেরে ধরার চেষ্টা করো। আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাকে তৈরি করে নেব। আমাদের উপকারে আসবে।’

সবাই মিলে জানোয়ারটাকে ধরে দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেললেন। তার নামকরণ করা হল জ্যাপ। আদর করে সবাই তাকে ‘মাস্টার জ্যাপ’ বলে ডাকেন।

বহু চেষ্টা চরিত্রের পর দ্বীপবাসীরা তাদের বাসস্থান গুহাটার দখল পেলেন সত্য, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, এতগুলো লোক প্রাপ্তান্ত প্রয়াস চালিয়েও লিঙ্কন দ্বীপের সর্বশেষ রহস্যটার কুলকিনারা করতে পারলেন না।

জ্যাপের প্রশিক্ষণ পুরোদমে চলতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষের স্বভাবচরিত্র ও কাজকর্মের পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টায় লিপ্ত থাকা ছাড়া তার মধ্যে তিলমাত্র ঔদ্ব্যতুৎও মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পায় না।

জ্যাপ কঠোর পরিশ্রম করে মার্সি নদীর ওপর বিশেষ ধরনের ও চমৎকার একটা সেতু তৈরি করে ফেলল। অদ্ভুতভাবে সেটার মাঝখানের অংশ খুলে রাখা যায়। এতে দ্বীপবাসীদের নদীর ওপারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা ছাড়াও হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের নদীর বিপরীত দিক থেকে আসা বন্ধ। গ্রানাইট হাউসের দিকে আসা বন্ধ করা গেল। ‘সাবাস জ্যাপ! মাস্টার জ্যাপ!’—গায়ে হাত বুলিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে আদর করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার করে মার্সি ও লেকগ্রান্টের মাঝখানের শক্ত পাথরের বাধা দূর করে ফেললেন।

এবার নেবুচ্যাডনেজার আর প্যানক্রফট মিলে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে মজবুত একটা খোঁয়াড় তৈরি করে ফেললেন। তাদের পরিকল্পনা মার্সি নদীর ওপার থেকে লম্বা লোমওয়ালা জন্তু আর মুশমন ধরে এনে পুষবেন। শীতের খাদ্যাভাব দেখা দিলে তাদের ব্যবহার করবেন। আর একটা পোলট্রিও তৈরি করে ফেললেন। এখানে পাখি পুষে ডিম আর মাংসের অভাব পূরণ করবেন।

দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ যে, তাঁদের এখানেই জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কাটাতে হবে। তাই প্যানক্রফটের উদ্যোগে জঙ্গল সাফাই করে তাঁরা চাষের জমিও গড়ি তুললেন। পাখির উৎপাত ঠেকানোর জন্য চাষের ক্ষেত্রে বিকটদর্শন কাকতাদুয়ার মূর্তিও তৈরি করা হল। সেটাকে বসিয়ে দেওয়া হল ক্ষেতের ঠিক মাঝখানে। অবশ্য এতে জ্যাপই কার্যিক পরিশ্রম বেশি করল। শাবল দিয়ে শক্ত মাটি খোঁড়া তো সামান্য ব্যাপার নয়, ইয়া পেট্রাইট সব পাথরের চাঁই সে অনায়াসে বয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। সে যেন গায়ে হাতির শক্তি ধরে। আর তার বুদ্ধিবিবেচনাও প্রায় মানুষেরই মতো।

২৩ ডিসেম্বর। দ্বীপবাসীরা মনস্থ করলেন, সেই গুহায় রক্ষিত হেঁড়াফাটা বেলুনটাকে বয়ে গ্রানাইট হাউসে নিয়ে আসবেন। কিন্তু অতিকায় ও পাহাড়ের মতো ভারী বেলুনটাকে বয়ে আনা তাদের কাজ নয়। এমনকি জ্যাপের সাহায্যও নয়। তবে ঘোড়া বা বলদের মতো আর দু-একটা জানোয়ার হলে হয়ত কাজটা সেয়ে ফেলা যেত। কিন্তু কোথায় মিলবে তাঁদের বাঞ্ছিত সে শক্তিশালী জন্তু জানোয়ার?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর প্রিয় কুকুর টপই দ্বীপবাসীদের সমস্যার সমাধান করে দিল। এক সকালে সে দেখল, ইয়া দশশাই চেহারাধারী একটা জন্তু চাষের ক্ষেতের ফসল খাচ্ছে। জন্তুটা ঘোড়ার মতো হলেও চংচং অনেকটা গাধার মতো।

হার্ভাট অদ্ভুত দর্শন জন্তুটাকে দেখেই সনাক্ত করে ফেললেন। তিনি সোজাসে চিল্লিয়ে উঠলেন—‘ওনাগা! ওনাগা! কোনাগার আর জেব্রার মিলনের ফলে এদের সৃষ্টি।’

প্যানক্রফট বললেন—‘ওনাগা, জেব্রা বা গাধা যাই হোক না কেন জন্তুটা আমাদের গাড়ি টানার কাজে লাগবে। চাষের ক্ষেতের বেড়ার একটা জায়গা ভেঙে যাওয়ার জন্যই জন্তুটা ভেতরে ঢুকতে পেরেছে। একটা নয় দুটো। নেবুচ্যাডনেজার জ্যাপের সাহায্যে ঝটপট বেড়ার ভাঙা জায়গায় কয়েকটা পাথরের চাঁই ফেলে বন্ধ করে দিলেন। ব্যাস, বাহাদুর ওনাগা আটকা পড়ে গেল। এবার সবাই মিলে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে তাদের ধরে ফেললেন। অবশ্য একাজে জ্যাপ আর টপের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবার ওনাগা দুটোকে বশ মানাবার ব্যবস্থা করলেন। বশে আনতে না পারলে তাদের মধ্যে আতঙ্কহীন প্রভুভক্তি জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বহু কায়দা কসরৎ করে তাদের বশীভূত করা সম্ভব হল।

প্যানক্রফট এবং জ্যাপের সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি করে ফেললেন। তাতে অতিকায় ও অমিত শক্তিদ্বারা ওনাগা দুটোকে জুড়ে দিয়ে অনায়াসেই বিশালায়তন বেলুনটাকে গ্রানাইট হাউসের সামনে আনা সম্ভব হল।

নতুন একটা পরিবেশকে মানুষের বাসোপযোগী করে তুলতে গেলে হাজারো ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়। দ্বীপবাসীদেরও লিঙ্কন দ্বীপটাকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে কম ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না।

প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি দু দুটো মাস কেটে গেল। সমুদ্র থেকে পাওয়া সিন্দুকটায় কয়েকটা সূঁচ পাওয়া গিয়েছিল। আর বেলুনের কাপড় থেকে পাওয়া গেল শক্ত সূতো। তা দিয়ে

বেলুনটার কাপড় কেটে কেটে প্যানক্রফট চমৎকার কয়েকটা জামা তৈরি করে ফেলল। আর জুতো? সে সমস্যা তো সিলের চামড়া দিয়ে আগেই মোটানো হয়েছে। শক্ত ও মজবুত চামড়ার জুতো পায়ে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটাচলা অনেকাংশেই নিরাপদ।

এ মুহূর্তে নেবুচ্যাডনেজারের সবচেয়ে বড় চিন্তা কী করে পাউরুটি তৈরি করা যায়। জ্যাপ তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। তাকে নিয়ে নেবুচ্যাডনেজার পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যে করেই হোক উপাদেয় পাউরুটি তৈরি করবেন। পাউরুটি না হলে পাখির মাংস জমে না।

ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের ওপর একটা প্রশস্ত সমতল জায়গা বেছে নিয়ে অধিকতর মজবুত আর একটা খোঁড়ায় তৈরি করা হল। পাথরের দেয়াল সম্বলিত রীতিমতো মজবুত খোঁড়ায়।

সাতই ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা মুশমনদের বিচরণ ক্ষেত্রে হাজির হলেন। জ্যাপ আর টপ তো সঙ্গেই রয়েছে। তারা মুশমনের একটা ঝাঁককে তাড়িয়ে খোঁয়াড়ের দিকে নিয়ে এলেন। শ'খানেক মুশমনের মধ্যে মাত্র ত্রিশটাকে খোঁয়াড়ে ঢোকানো সম্ভব হল। ভেতরে ঢুকে স্বাধীনচেতা জানোয়ারগুলো মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাল। বৃথা চেষ্টা। খোঁয়াড়া ভেঙে কিছুতেই বাইরে বেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। নিতান্ত অনন্যোপায় হয়েই তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। এবার থেকে মাংস, পশম আর চামড়া কোনটারই অবাব রইল না। কিছুদিন আগে প্যানক্রফট বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে এক বিশেষ ধরনের শুকনো বীজ সংগ্রহ করে এনে চাষের জমিতে পুঁতে দিয়েছিল। চমৎকার লকলকে গাছ হয়েছে।

প্যানক্রফট এবার ক্লান্তি অপনোদনের চমৎকার একটা উপায় বের করে ফেললেন। নতুন ধরনের গাছগুলোর শিকড়ের রস নিঙড়ে বিয়ার জাতীয় মদ তৈরি করে ফেললেন। এর দু-এক গলাস গলায় ঢাললেই শরীর একেবারে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। প্যানক্রফটের আবিষ্কৃত মদ দ্বীপবাসীদের কাছে অমৃততুল্য হয়ে উঠল।

দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ যে, এখানেই তাঁদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাতে হবে। অতএব নিজেদের চেষ্টাতেই জীবনরক্ষার অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী জোগাড় করে নিতে হবে।

সহযোগীদের ব্যাপার স্যাপার দেখে ক্যান্টেন হার্ডিং তেমন কিছু বলেন না বটে অনুসন্ধিসূ দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপের ওপর সর্বদা নজর রাখেন। কখনো তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন আবার কখনো-বা হাসেন।

ক্যান্টেন হার্ডিং দিনের একটা ভগ্নাংশই নির্জনে বসে কাটান। আপনমনে ভাবেন, কুহক দ্বীপে কতই না রহস্যের জাল ছড়িয়ে রয়েছে। কত ভেলকিই না চাক্ষুষ করতে হচ্ছে। আরো কত রহস্যই যে তাঁকে ভেদ করতে হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আজ পর্যন্ত যে-সব রহস্যের সম্মুখীন হয়েছেন তাদের সবকটার রহস্যভেদই তো করতে পারলেন না।

ফেব্রুয়ারি গিয়ে মার্চ মাস এসে গেল। মাসের মাঝামাঝি আসতে না আসতেই ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ শুরু হয়ে গেল। আর দমকা হাওয়া তো সর্বক্ষণ লেগেই রয়েছে। মোটা জামা কাপড় না হলে ঠাণ্ড হাওয়ার মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

ক্যান্টেন হার্ডিং কাঠ কেটে কেটে কিছুসংখ্যক বোতাম তৈরি করে জামার সঙ্গে আটকে দিলেন। জামা কাপড় কাচা ধোয়ার কাজ জ্যাপের ওপর বর্তাল।

সবই তো এক এক করে তৈরি করা হল। দ্বীপের জীবনযাত্রা এখন অনেকটা সুখকর হয়ে উঠেছে বটে। কিন্তু গুহা ঘরে গুঠার ঝামেলা এড়াবার জন্য এখন একটা লিফট গোছের যন্ত্র তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বীপবাসীরা ক্যান্টেন হার্ডিংকে ফিলট তৈরির ব্যাপারে ধরে বসলেন।

তাঁদের ইচ্ছার কথা শুনে ক্যান্টেন হার্ডিং মুখে কিছুই বললেন না, কেবল ঠোঁট টিপে টিপে নীরবে হাসলেন। শেষমেশ মুখ খুললেন—‘তোমাদের নতুন আঙ্গুরটার কথা আমার শোনা রইল। আশা করি অচিরেই তোমাদের আশা পূরণ করে সমস্যা দূর করতে পারব।’

চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে প্যানক্রফট বললেন—‘লিফট না হয় তৈরি করলেন, কিন্তু সেটা চলবে কী করে তা তো আমার মাথায় আসছে না।’

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ক্যান্টেন হার্ডিং জবাব দিলেন—‘আরে চলবে—চলবে। জলের শক্তিতে লিফট চলবে।’

কাজটা ক্যান্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে মোটেই সমস্যার নয়। নেহাতই মামুলি ব্যাপার। একটা চোঙ নিয়ে তার এক প্রান্তে কয়েকটা বোঁটা আর বিপরীত প্রান্তে একটা মোটা ও লম্বা দড়ি লাগিয়ে দিলেন। দড়িটার বিপরীত প্রান্তে বুড়ি বেঁধে দিলেন। গ্রানাইট হাউসের ভেতরে, ছোট একটা বর্নীর ঠিক নিচে চোঙটাকে রেখে দেয়া হল। জলপ্রপাতে যখন তীর বেগে জল নেমে আসে ঠিক তেমনিভাবে বোঁটাগুলোর ওপর প্রবল বেগে জল পড়তে লাগল। অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জল কুয়োতে গিয়ে পড়তে লাগল। এর ফলে চোঙটা ঘুরতে লাগল। আর মোটা লম্বা দড়িটা চোঙের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে শুরু করল। এতে দড়িতে টান লাগায় সেটা গুটোতে গুটোতে গ্রানাইট দরজার সামনে ঝুড়িটাকে তুলে দিল। ঝুড়িটায় চেপে একজন মানুষ অনায়াসেই ভূমি থেকে গ্রানাইট হাউসের দরজায় পৌঁছে যেতে পারে।

১৭ মার্চ। এদিনই প্রথম ওয়াটার লিফট চালু করা হল।

ক্যান্টেন হার্ডিং এতেই সন্তুষ্ট হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নন। তিনি এবার কাচ তৈরির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। উনুনে গনগনে আঙন জ্বলে উঠল। এবার বালি, খড়ি ও সোডা একসঙ্গে মিশিয়ে গুলিয়ে নিলেন। তরল হওয়া মাত্র তাতে লোহার নলের সাহায্যে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তিনি ইচ্ছামতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করে নিতে লাগলেন।

প্যানক্রফট হাপরে লোহার পুড়িয়ে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে যে লোহার নলটা তৈরি করেছিলেন, আজ ক্যান্টেন হার্ডিং সেটার সদ্যবহার করলেন। এবার আর কাচের দ্রব্যসামগ্রী তৈরির কোন বাধাই রইল না। কেবল গ্রেট বা গ্লাসই

নয়, দরজা-জানালায় শার্পি পর্যন্ত কাচ দিয়ে তৈরি করে নেয়া হল। তবে অত্যাব্যশ্যকীয় যন্ত্রপাতির অভাবে সদ্য তৈরি করা সামগ্রীগুলো একটু-অধটু বাঁকা-ট্যাড়া হল। কিন্তু কাজ তো চলে যাচ্ছে।

১ এপ্রিল। দ্বীপবাসীরা কাজের ফাঁকে বসে গল্পগুজব করছেন। এমন সময় ক্যাপ্টেন হার্ডিং প্রস্তাব দিলেন, সেক্সট্যান্টের সাহায্যে তিনি নির্ণয় করতে চান লিঙ্কন দ্বীপটা প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোন স্থানে অবস্থিত?

সমুদ্র থেকে পাওয়া সিঁদুক একটা উন্নত মানের সেক্সট্যান্ট ছিল। অতএব কাজ শুরু করতে কোনো বাধাই নেই। স্পিলেট তাঁকে সমর্থন করলেন। এর মাধ্যমে লিঙ্কন দ্বীপের কাছাকাছি অন্য কোনো দ্বীপ বা মহাদেশের অবস্থিতি আছে কি না জানে রাখলে ভবিষ্যতে উপকারে আসতে পারে।

হার্বট এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে সিঁদুক হাতড়ে একটা মানচিত্র বের করে ফেললেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং মানচিত্রটার ওপরে চোখ বোলাতে লাগলেন। অঙ্ক কষে হিসেব নিকেশ করার দায়িত্ব পালন করতে লাগল সেক্সট্যান্ট নামক যন্ত্রটা। হিসেব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সেক্সট্যান্টের হিসেবের সঙ্গে সূর্যের হিসেবের ছবছ মিল রয়েছে। হিসেব অনুযায়ী দেড় শো মাইল উত্তর-পূর্ব কোণে একটা দ্বীপ রয়েছে। মানচিত্রেও এর উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে একে 'ট্যাবার দ্বীপ' নামে উল্লেখ করা রয়েছে।

বেশ বড়সড় একটা নৌকা তৈরি করা হল। উদ্দেশ্য ট্যাবার দ্বীপে যাওয়া হবে। পালে হাওয়া লাগলে দুদিনেই সেখানে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

স্পিলেট আর হার্বট জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক আবিষ্কার করে ফেলেন। ডালে ডালে আঙুরের মতো থোকা থোকা ফল ঝুলছে এমন এক অত্যন্ত রুচি গাছ তাঁরা পেয়ে গেলেন। ফলগুলি যেমন মিষ্ট তেমন সুস্বাদু। আর মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে গলে যায়।

স্পিলেট তারপর যা আবিষ্কার করলেন তাতে প্যানক্রফট উরসিত হয়ে তাকে কাঁধে, নাকি মাথায় তুলে নাচবেন ঠিক করে উঠতে পারলেন না। কি যে অমৃততুল্য সামগ্রী, তাই না। তামাকগাছ। এর জন্য তিনি এতদিন ধরতে গেলে জীবনুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

এক বিকেলে দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের তীর বরাবর হাঁটাচাঁটা করতে করতে অতিকায় একটা তিমিকে চর্কির মতো বারবার পাক খেয়ে বেড়াতে দেখলেন। ব্যাপারটা সেরকমই বটে। সামান্য একটা হারপুনের অভাবে একটা শিকার হাতছাড়া হলে কপাল চাপড়বার মতো ব্যাপারই বটে।

না, হারপুন ব্যবহারের আর দরকার নেই। বিশালায়তন জলজ প্রাণীটি নিশ্চল নিথর। অনেক আগেই মারা গেছে। শকুন আর অন্যান্য কয়েকটা পাখি মাংসের লোভে জল থেকে মাত্র কয়েক হাত উঁচু দিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল।

দ্বীপবাসীরা ভাসমান মড়া তিমিটার দিকে অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকিয়ে রইলেন। এক সময় তিমিটার গায়ে একটা হারপুন গাঁথা রয়েছে দেখে তাঁরা চমকে উঠলেন।

ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের ভাবিয়ে তুলল। তারা বলাবলি করতে লাগলেন, 'তবে কি তাঁদের বা দ্বীপের কাছাকাছি কোনো তিমি-শিকারি আত্মগোপন করে রয়েছে? নইলে তিমিটার গায়ে হারপুন বিদ্ধ করল কে?'

হারপুন! হারপুনটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুন করে রহস্যের সঞ্চার করল।

ব্যাপারটা স্পিলেটকেই সবচেয়ে বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছে।

প্যানক্রফট তাকে বুঝাতে গিয়ে বললেন, 'মি. স্পিলেট, ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে যে, তিমি-শিকারি দ্বীপে তো দূরের ব্যাপার, কয়েক শো মাইলের মধ্যেও নেই। আমার ভালোই জানা আছে, তিমিরা হারপুনবিদ্ধ অবস্থায় হাজার হাজার মাইল জুড়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি করতে পারে। এমনও হতে পারে অদৃষ্ট বিড়ম্বিত তিমিটা মরণবাণ পিঠে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে দাপাতে দাপাতে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে।

প্যানক্রফট তিমির চরিত্র সম্বন্ধে ভালোই জ্ঞান রাখেন। তিনি একসময় তিমি শিকারে বিখ্যাত জাহাজ হোয়েলারে কাজ করতেন।

স্পিলেট আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিস্তেজ নিথর তিমির গা থেকে হারপুনটা তুলে নিয়েই চমকে উঠলেন। তার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা রয়েছে, 'মেরিলা স্টেলা—ভিনিয়ার্ড'। কারণ স্পিলেট জানেন, ভিনিয়ার্ড প্যানক্রফট-এর জন্মস্থান আর মেরিলা-স্টেলা তার খুবই পরিচিত তিমি শিকারের জাহাজ। তাই স্পিলেট ভাবল প্যানক্রফট হারপুনটার পরিচয় পেলে নির্ধাত আনন্দে নাচনাচি জুড়ে দেবেন।

দ্বীপবাসীরা টানাটানি করে নিশ্চাপ তিমিটাকে ডাঙায় তুলে আনলেন। তিমির দেহের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তার চর্বি র স্তরটা। হাড়গোও কম দরকারি নয়।

কুড়ুল আর সুতীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে কাটাকাটি করে তিমিটার গা থেকে চর্বি বের করে আনা হল। কেবল তিমিটার জিভটা থেকেই দুশো পাউন্ড এবং নিচের ঠোঁট থেকে প্রায় চার শো পাউন্ড চর্বি বের করা হল।

গ্লিসারিন ও স্টিয়ারিন উৎপাদনের কাজে ব্যবহারের জন্য চর্বিগুলো জমিয়ে রেখে দেয়া হল।

প্যানক্রফট কেবল চর্বিতেই খুশি থাকতে পারলেন না। তিনি ব্যস্তহাতে তিমিটার হাড়গোড় বের করে জড়ো করে ফেললেন। তিনি ভালোই জানেন, রাশিয়া ও আমেরিকার কোনো কোনো অহংলর অ্যালুইসিয়ান শিকারিরা তিমির হাড়ের এক বা উভয় প্রান্ত ছুঁচলো করে নিয়ে বরফচাপা দিয়ে রাখে। বেশ কিছুদিন বাদে তাদের আকৃতির পরিবর্তন হয়ে যায়। বেকে গিয়ে অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এবার মাংসের টুকরো গৌঁথে জঙ্গলে রেখে দিলে ক্ষুধার্ত জানোয়াররা সেগুলো গিলে ফেলে। সকালে শিকারিরা তাদের জ্যান্ত বা মৃত অবস্থায় ধরে নিয়ে যায়। তাদের মাংস দিয়ে খিদে নিবৃত্ত করে আর চামড়া দিয়ে চমৎকার পোশাক তৈরি করে।

প্যানক্রফট উজ্জ্বলিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বরাতের জোরে হারপুন যখন একটা পাওয়াই গেছে তখন আমরা এবার তিমি-শিকারে মন দেব। তাদের চর্বি আর হাড় আমাদের অনেক সমস্যা দূর করবে।'

প্যানক্রফটকে উৎসাহিত করার জন্য স্পিলেট পকেট থেকে তামাকের পোঁটলাটা বের করে তার হাতে দিলে বললেন, 'আপনার কাজের পুরস্কার।'

তামাক তো নয় যেন প্যানক্রফট আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছেন। দ্বীপে আসার পর থেকে তিনি হন্যে হয়ে তামাকগাছের খোঁজ করেছেন। আজ এতদিন পরে তা স্পিলেটের দৌলতে হাতে পেলেন। আর দেরি নয়। তিনি তামাক গুটিয়ে গুটিয়ে চুরুট তৈরি করে নিলেন। তারপর তাতে অগ্নি সংযোগ করে পরপর কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে পরম তৃপ্তিতে এক গাল ধোঁয়া ছাড়লেন।

জুন মাস। মাসের গোড়া থেকেই শীত পড়ে গেছে। শীতের প্রকোপ ক্রমেই বাড়তে লাগল। প্রচণ্ড শীতে দ্বীপবাসীরা গুহা ছেড়ে বেরোতেই পারছেন না। হাত-পা যেন আড়ষ্ট হয়ে অবস্থা।

কফি আর তামাক নিয়ে দ্বীপবাসীরা অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে গোল হয়ে মৌজ করে বসে গল্প গুজবে মেতে গেলেন। কথার ফাঁকে স্পিলেট বললেন, 'পৃথিবীর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের কয়লার স্তর যেদিন ফুরিয়ে যাবে সেদিন যন্ত্রসভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়বে। তখনই পৃথিবীবাসী পড়বে প্রকৃত সমস্যায়—'

ঠোঁটের কাছ থেকে কফির পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'এখন বহুদিন প্রায় আড়াই-তিন শো বছরের আগে পৃথিবীর অভ্যন্তরের কয়লা ফুরোবার নয়। তার পৃথিবীবাসী—'

'তারপর? তারপর পৃথিবীর মানুষ কী করবে?'

'পৃথিবীর মানুষ তখন কয়লার বিকল্প সামগ্রী আবিষ্কার করে ফেলবে।'

'বিকল্প? কয়লার বিকল্প এমন কি আবিষ্কার করতে পারবে যাতে আগুন জ্বালার সমস্যা মিটতে পারে?'

'জল। জলই হবে ভবিষ্যৎপৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্বল।'

'জল? জল দিয়ে ট্রেন আর জাহাজ—'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন—'প্যানক্রফট, আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীর মানুষ অদূর ভবিষ্যতে জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে কলকারখানার মেশিন চালাবে, আলো জ্বালাবে আর ট্রেনও চালাতে সক্ষম হবে। অফুরন্ত এ বিদ্যুৎশক্তির ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সভ্যতা গড়ে উঠবে। মানুষের কাছে জল তখন আর কেবল—'

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই টপ-এর বিকট আর্তস্বর শোনা গেল। কুয়োর দিক থেকেতার আর্তনাদ ভেসে আসছে মনে হল। উৎকীর্ণ হয়ে সবাই ব্যাপারটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করলেন। হ্যাঁ, টপের সঙ্গে জ্যাপও গলা মিলিয়েছে। টপ-এর যেউ-যেউ আর জ্যাপের যোঁং যোঁং মিলে সে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হল।

সবাই ছুটোছুটি করে এগিয়ে গেলেন।

উর্ধ্বাঙ্গে ছুটতে ছুটতে স্পিলেট বললেন—'ব্যাপার কী? সামুদ্রিক প্রাণীটা আবার কুয়োর ভেতরে আশ্রয় নেয় নি তো?

আরও সামান্য এগিয়ে প্যানক্রফট জ্যাপের নাম ধরে এমন গভীর স্বরে ধমকাতে লাগলেন যে, সে থমমত খেয়ে মুখেবলুপ এঁটে দিল। সে সঙ্গে টপও ঘাবড়ে গিয়ে গর্জন বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মধ্যে বিশেষ ভাবান্তর ঘটাল, মনে হল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তিনি মুখে কিছুই বললেন। তবে এটুকু বুঝা গেল তাঁর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও দুর্ভাবনা আশ্রয় করেছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে বহুভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরও তাঁর মুখ থেকে কিছুই বেরল না। কপালের চামড়ায় দৃষ্টিভঙ্গির ভাঁজ ঐকে তিনি নীরবে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ায় ব্যস্ত রইলেন।

আগষ্টের গোড়াতেই আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করল। আকাশের সে গোমড়া ভাব আর নেই।

৩ আগস্ট। দ্বীপবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারে বেরোলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং শিকারে গেলেন না। তিনি একাই গ্রানাইট হাউস আগলাতে লাগলেন। কোন এক জরুরি কাজের নাম করে তিনি শিকারে বেরোলেন না। তাঁর জরুরি কাজটা যে কিতা অনুমান করা কারোর পক্ষেই অসুবিধা হল না। কিন্তু কেউই মুখ খুললেন না।

গ্রানাইট হাউসে একা একা বসে ক্যাপ্টেন হার্ডিং গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। তার এখন সবচেয়ে বড় ভাবনা, টপ মাঝে মধ্যেই কুয়োর ধারে গিয়ে তর্জন গর্জন করে—কেন? কেন তার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করে? কুয়োর মধ্যে কার উপস্থিতি তার মধ্যে অস্থিরতা জাগিয়ে তোলে। তবে কি সমুদ্র ছাড়া অন্য কোনো স্থানের সঙ্গে কুয়োটার সম্পর্ক রয়েছে? কার? কার উপস্থিতি? তবে কি কোনো গোপন সুড়ঙ্গ কুয়ো আর পাতালের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে? তাঁকে কি এটাই বিশ্বাস করতে হবে, রহস্যময় কুক দ্বীপে আজ পর্যন্ত যত কিছু রহস্যের মুখোমুখি তারা হয়েছেন সবকিছুরই উৎস কি এ কুয়োটা? ব্যাপারটা অনেক আগেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মাথায় এসেছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে কুয়োটার মধ্যে নেমে রহস্যভেদ করা হয়ে ওঠে নি। তিনি চান একা—একেবারে একা কাজটা করবেন। কেউ যেন ঘৃণাক্ষরেও তাঁর মতলবের কথা জানতে না পারেন।

দীর্ঘ অধীর প্রতীক্ষার পর আজ অপূর্ব সুযোগ এসেছে। লিফট তৈরি করার পর মইটাকে গুহার একধারে রেখে দিয়েছিলেন। সেটাকে কোনরকমে নামিয়ে এনে কুয়োটার ভেতরে খাড়া করে দিলেন। একটা পিস্তল আর সূতীক্ষ্ম ছুরি কোমরের বেল্টের সঙ্গে বেঁধে নিলেন। আর হাতে নিলেন একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন। এবার অকুতোভয় হার্ডিং মইয়ের একের পর একধাপ নেমে চললেন।

কুয়োটার দেয়ালের গা মসৃণ—একেবারে তেলতেলে। এর গা-বেয়ে কোনো জন্তু জানোয়াররের পক্ষেই ওঠানামা করা সম্ভব নয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মইয়ের একেবারে শেষধাপের কাছাকাছি নেমে গেলেন। কই, কিছুই তো নেই। কাউকেই তো জ্বল ভাৰ্ণ-৪(ক)

নজরে পড়ছে না। আর সুড়ঙ্গ বা নালা জাতীয় কোনো কিছুর অস্তিত্বও তাঁর চোখে পড়ল না। শুধু কি এই? জল পর্যন্ত শান্ত। তবে? না, কোনো সিদ্ধান্তেই তিনি আসতে পারলেন না।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং সভাই মহাসমস্যা পড়ে গেলেন। তাঁর চোখ বলছে, কুয়ার ভেতরে রহস্য সঞ্চাবুকাকারী কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কিন্তু মন কিছুতেই একথা মানতে নারাজ। মন রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছে—আছে! আছে! আছে! আর সে যখন কুয়ার মধ্যে আবিস্কৃত হয় ঠিক তখনই উপ গলা ফাটিয়ে যেউ যেউ করতে থাকে। অন্য সবার চোখে ধুলো দিতে পারলে উপকে ঠকানো সম্ভব নয়।

শিকার সেরে দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পক্ষে নিজেকে আর সামলে রাখা সম্ভব হল না। তিনি স্পিলেটকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন।

স্পিলেট-এর চোখে মুখেও দৃষ্টিভ্রান্ত ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বললেন, 'আমিও এমন কিছুই অনুমান করেছি। এমন কোনো ভয়ঙ্কর জানোয়ার কুয়ার ভেতরে মাঝে মধ্যে আসে। সে আমাদের চোখে ধুলে দিলেও টপের নজর এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হয় না।'

১১ আগস্ট। স্পিলেট ছোট্ট একটা ভুল করার ফলে বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

শেষ রাতের দিকে সবাই যখন ঘুমে অচেতন্য তখন টপ বিকট স্বরে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিল। ব্যাপারটা কেবল অত্যাশ্চর্যই নয়, রহস্যজনকও বটে। সে ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে আর অনবরত গর্জন করছে।

প্যানক্রফট হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে চারদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে চাইলেন। জমাটবাঁধা অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার ভেদ করে অদৃশ্য কণ্ঠের চাপা গর্জন তাঁর কানে এল।

ইতিমধ্যে সবার ঘুম ভেঙে গেছে। প্যানক্রফট কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন—'সর্বনাশা ব্যাপার ঘটে গেছে!! প্রটোতে কোন জানোয়ার হয়ত ঢুকেছে।'

নেবুচ্যাডনেজার ভুরু কঁচকে, চোখে মুখে বিস্ময়ের ছাপ একে বললেন—'গর্জন শুনে মনে হচ্ছে নেকড়ে। নেকড়ে যদি নাও হয় তবে অবশ্যই কোন না কোন হিংস্র জানোয়ার—'

'সে না হয় হল। কিন্তু জানোয়ারটা নদী পেরিয়ে এখানে এল কী করে এল কী করে?'

হার্ডিং রীতিমতো রাগতস্বরেই বললেন—'তোমাদের খামখেয়ালি জন্যই এমন একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছে। নির্ধাত তোমাদের কেউ না কেউ পোলটা তুলতে ভুলে গেছে।'

স্পিলেট নিতান্ত অপরাধীর স্বরে বলে উঠল—'আমি, আমিই এমন ভয়ঙ্কর ভুলটা করেছিলাম। পোলটা তোলার কথা একদম খেয়াল ছিল না।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'দোষ-গুণ বিচারের সময় এটা নয়। সবার আগে সমস্যার সমাধান করা দরকার।'

আবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই হিংস্র জানোয়ারের তর্জন গর্জন শুরু হয়ে গেল। তবে এখন মনে হচ্ছে, জানোয়ারের সংখ্যা অবশ্যই একটা নয়, অনেকগুলো।

হার্ডিং নিঃসন্দেহ হলেন এরা নেকড়ে জাতীয় এক বিশেষ ধরনের জানোয়ার। হিংস্র শেয়াল কাউকে বাটে পেলে জান খতম না করে রেহাই দেয় না।

দ্বীপবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হৈ হৈ করে বেরিয়ে পড়লেন। ব্যস, শুরু হয়ে গেল হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে তুমুল লড়াই। রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে প্রায় একশো জোড়া চোখ জুলজুল করতে লাগল।

হিংস্র জানোয়ারদের ওপর অকুতোভয় টপ বীর বিক্রমে গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুতীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে সে কতকগুলো জানোয়ারকে টুটি চেপে ধরে ঘায়েল করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল রীতিমতো রক্তারক্তি কাণ্ড। ভোরের আলো ফুটে উঠলে দেখা গেল প্রায় পঞ্চাশটা হিংস্র জানোয়ার মাখামাখি অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হল, সবার হুঁশ হল। জ্যাপ কোথায়? কই তাকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। দ্বীপবাসীরা চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি করে তার খোঁজ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত ক্ষেতের আলো কাছে জ্যাপের নিঃসাড় দেহটাকে মুখ খুবড়ে পড়ে থাকতে দেখলেন।

অস্থিরচিত্ত নেবুচ্যাডনেজার প্রায় মাটিতে শুয়ে পড়ে জ্যাপ-এর বুকের ওপর মাথা রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। একসময় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে, প্রাণ আছে। জ্যাপ বেঁচে আছে!'

সবাই মিলে ধরাধরি করে জ্যাপকে গ্রানাইট হাউসের সামনে নিয়ে ওইয়ে দিলেন। তার ঘাড়ের কাছে একটা ক্ষত। হিংস্র জানোয়ারদের দাঁতের দাগ।

জ্যাপের শোচনীয় পরিস্থিতিতে টপের মন ভারাক্রান্ত। ছলছল চোখ দুটো মেলে তার দিকে তাকিয়ে সে সর্বক্ষণ গুম হয়ে শুয়ে রইল।

দ্বীপবাসীদের আন্তরিক সেবা যত্নে কয়েক দিনের মধ্যেই জ্যাপ সুস্থ হয়ে উঠল, স্বাভাবিকতা ফিরে পেল।

২৫ আগস্ট। জ্যাপ আবার কাজে মেতে গেল। সে এক অত্যাশ্চর্য কাজের মাধ্যমে নতুন করে দ্বীপবাসীদের চমক লাগিয়ে দিল। দ্বীপবাসীরা যখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত তখন গুটিগুটি গ্রানাইট হাউসে ঢুকে প্যানক্রফটের পাইপটা নিয়ে তামাক টানতে লাগল। ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। পায়ের ওপর পা তুলে সে যখন মৌজ করে তামাক টানছে তখন সবাই এক-এক করে ঘরে ফিরলেন। তার কাণ্ড দেখে সবাই তো হেসে গড়াগড়ি খাবার জোগাড় হলেন।

প্রভুদের দরজায় দেখেই জ্যাপ দুম করে লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে নিল। নিতান্ত অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। এখন আর সবাই সরবে না হেসে পারলেন না।

অক্টোবর মাস এল। দ্বীপবাসীরা নতুন একটা নৌকা তৈরি করলেন। সদ্য তৈরি বিশালায়তন নৌকাটার নামকরণ করা হল—‘বন-অ্যাডভেঞ্চার।’

নৌকাটাকে জলে ভাসানো হল। দ্বীপবাসীদের নিয়ে সেটা উদ্ধার বেগে ছুটে চলল।

একসময় হার্বাট নৌকা থেকে জলের ওপর ঝুঁকে পড়ে রহস্যজনক একটা কাচের বোতল তুলে নিলেন। তার ছিপিটা খোলামাত্র তার ভেতর থেকে একটা পাকানো কাগজ বেরিয়ে এল। তাতে দুটো ছত্র লেখা—

“ট্যাবর দ্বীপে নির্বাসিত এক অদৃষ্টবিড়ম্বিত।

১৫.৩ পশ্চিম দ্রাঘিমা ও ৩৭.১১ দক্ষিণ অক্ষাংশ।

প্যানক্রফট ইতিপূর্বে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে ট্যাবর দ্বীপের কথা বহুবার বলেছেন। কিন্তু কোনো প্রয়োজন বোধ না করায় তিনি বারবারই নানা কৌশলে তাঁর প্রস্তাবটাকে এড়িয়ে গেছেন। রহস্যজনক বোতলটা আবিষ্কৃত হওয়ায় তিনি এখন নিজে থেকেই সেখানে যাওয়ার কথা তুললেন। কাগজের টুকরোটার গায়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, ‘কাগজের চিলভেটার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, নির্বাসিত ভদ্রলোক নৌ-বিদ্যার অনেক কিছুই রপ্ত করেছেন। আর তিনি হয় আমেরিকান, না হয়ত ইংরেজ। নইলে ছত্র দুটো ইংরেজিতে লিখতেন না।’

ব্যাপারটা অত্যাশ্চর্যই বটে। নইলে বোতলটা তাঁদের নৌকার ধার-কাছ দিয়ে না গিয়ে অন্য কোনো জায়গা দিয়েও তো ভেসে যেতে পারত।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। ট্যাবর দ্বীপে যাবেনই।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীদের নিয়ে বন-অ্যাডভেঞ্চার ট্যাবর দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

বেলা এগারোটার কাছাকাছি অ্যাডভেঞ্চার দ্বীপের মাটি স্পর্শ করল।

ব্যাপার দেখে দ্বীপবাসীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। লোকটার তো সমুদ্রের পাড়ে ছুটে আসা উচিত ছিল। বহু দূর থেকেই তো নৌকাটাকে দেখা গেছে। নির্বাসিত লোকটা কি এতক্ষণেও তাঁদের দেখতে পায় নি?

দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেন, দ্বীপে নেমে খোঁজাখুঁজি করলে নির্ধাত তাকে পাওয়া যাবে।

দ্বীপের এবড়োখেবড়ো পথ ধরে কিছু দূর এগোতেই তারা একটা কাঠের ঘর দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ধরেই নিলেন এটাই নির্বাসিত লোকটার আস্তানা। এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দিয়েই তাঁরা যারপরনাই বিস্মিত হলেন, ভোঁ-ভোঁ—ভেতরে কেউ-ই নেই।

দ্বীপের বৃকে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। তবু অদৃষ্ট বিড়ম্বিত লোকটার ডেরায় ফেরার নামটিও নেই।

উপায়ান্তর না দেখে প্যানক্রফট গলাফাটা চিংকার চেঁচামেচি করে লোকটাকে বহুভাবে সন্বেদন করে ডাকাডাকি করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা। কোনো সাড়াই এল না।

ঘরের ভেতর পাত্রভর্তি বারুদ আর কার্তুজ ছাড়াও অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল। তবে? লোকটা গেল কোথায়? তবে কি দ্বীপ ছেড়ে চলেই গেছে। তা যদি না হয় তবে তার দেহটা বা দেহের খাঁচাটাই বা গেল কোথায়? ঘরটার মধ্যে সবাই গুটিগুটি মেরে রাতটা কাটিয়ে সকাল হতেই সবাই নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দ্বীপটাকে চক্রর মারার জন্য।

দ্বীপবাসীরা রহস্যময় লোকটার ঘরে শুয়ে বলাবলি করছিলেন—‘ঘরটা কাঠের তৈরি। জাহাজের কাঠ। জাহাজের ভাঙা অংশ। একটা কাঠের গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—‘BR—TAN—A’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ নামটা হয়ত ‘BRITANIA’ ছিল। মাঝের কয়েকটা অক্ষর রোদ বৃষ্টিতে মুছে গেছে।

দ্বীপের চারদিকে একবার চক্রর মেরে দ্বীপবাসী অভিযাত্রীরা এবার সত্যসত্যই হতাশ হলেন।

একসময় নৌকা থেমে নেমে তাঁরা খাবারের খোঁজে জঙ্গলের ভতরে ঢুকলেন। ফলমূল খোঁজাখুঁজি করতে করতে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ পর একসময় হার্বাটের বুকফাটা আর্তনাদ তাঁর সহযাত্রীদের কানে এল। কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে সবাই উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে কাছে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভয়ঙ্কর একদৃশ্যের মুখোমুখি হলেন তাঁরা। দেখলেন, হার্বাট চিং হয়ে মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করতে করতে বুকফাটা আর্তনাদ করছে। আর ভীষণাকৃত একটা দানব তাঁর বৃকের ওপর বসে চরমতম আক্রোশে তাকে কিল চড় মেরে চলেছে। রীতিমতো ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য।

সবাই ছুটোছুটি করে অনেক কষ্টে ভয়ঙ্কর সে দানবটার কবল থেকে হার্বাটকে মুক্ত করলেন। পূর্বপুরুষের বরাতের জ্ঞারে তিনি এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কারো বুঝতে অসুবিধা হল না এ লোকটাই নির্বাসিত লোক। জনমানবহীন দ্বীপে একা একা বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে গিয়ে তার মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে গেছে। আজ সে মানুষের স্বভাব হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা রহস্যজনক নির্বাসিত লোকটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সে রাগে অনবরত ক্রূসে চলেছে। দীর্ঘদিন একা কাটিয়ে সে কেবল হিংস্র ভাবই পায় নি। হারিয়েছে বিবেক, মনুষ্যত্ব আর মুখের ভাষা পর্যন্ত, আজ পশুর মতোই বোবা। বিশীর্ণরে ঘোং গোং করা ছাড়া আর কোনো সাধাই তার নেই।

স্পিলেট বললেন—‘লোকটাকে আমরা লিঙ্কন দ্বীপে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার ভেতরের মনুষ্যত্বটাকে আবার জাগিয়ে তুলব। অচিরেই তাকে আবার অন্য দশজনের মতোই সভ্যভাষা করে তোলা যাবে।

রহস্যজনক লোকটাকে ঝলসানো শুরোরের মাংস খেতে দেয়া হল। সে চরম বিতুষায় সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। কিন্তু কাঁচা মাংসের টুকরো দিতেই ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো দাঁত দিয়ে ছিড়ে ছিড়ে পরম তৃপ্তিতে খেতে আরম্ভ করল। পনেরই অক্টোবর।

সকালে বন অ্যাডভেঞ্চার লিঙ্কন দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। ১৭ অক্টোবর দ্বীপবাসী অভিযাত্রীদের নৌকা নির্বিঘ্নেই

চলল। বিকেলের দিকে নৌকারোহীরা প্রমাদ গুনলেন। প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। প্যানক্রফটের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠল।

১৭ অক্টোবরও নৌকারোহীরা নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাবনার মধ্যে কাটালেন।

বিকালের দিকে একেবারেই অভাবনীয় ও অবিশ্বাস্য এককাণ্ড ঘটতে গেল। দেখা গেল, কয়েদি দানবটা তার জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডেকের কার্নিশের কাঠ ভেঙে নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে এসেছে। নৌকার ভাঙা জায়গা দিয়ে হুড়হুড় করে নৌকার ভেতরের জমে থাকা জল বেরিয়ে যাওয়ায় নৌকাটা অস্বাভাবিক হাল্কা হয়ে গেল। আশ্চর্য! নৌকাটা এবার উদ্ধার বেগে ছুটতে শুরু করল।

কয়েদিটার উপস্থিত বুদ্ধি দেখে স্পেলট রীতিমতো হকচকিয়ে গেল। চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে অপলক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখন রাত্রি দুটোর কাছাকাছি। নৌকারোহীরা হঠাৎ অদূরে আলো দেখে উল্লসিত হয়ে সমস্তরে চৌঁচিয়ে উঠলেন, 'আলো! আলো! ওই যে, আলো দেখা যায়।'

হ্যাঁ, আলোই বটে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং লিঙ্কন দ্বীপের গ্রানাইট হাউসে আগুন জ্বলছেন। আলোকরশ্মিটুকুর উৎস ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এরই জ্বালা আলো।

এতক্ষণ নৌকাটা লিঙ্কন দ্বীপটাকে ছেড়ে ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর আলো নৌকারোহীদের পথের নির্দেশ দান করল।

গ্রানাইট হাউসে পৌঁছে দ্বীপবাসীরা ট্যাবর দ্বীপ থেকে বন্দি করে নিয়ে আসা রহস্যজনক নির্বাসিত লোকটাকে ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর সামনে হাজির করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং দুপা এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখতেই একটা অদ্ভুত ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন।

প্যানক্রফট বললেন, 'মাস কয়েক আগেও সে আমাদের মতোই সুস্থ স্বাভাবিক ছিল। জ্ঞান-বুদ্ধি আর বিবেচনাবোধ পুরোদস্তুর ছিল। তা যদি না-ই ছিল তবে লোকটা এমন গোছগাছ করে চিঠি লিখে বোতলে করে পাঠালোই বা কী করে?'

এদিকে বিচক্ষণ হার্ডিং অপলক চোখে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে রহস্যজনক লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। থেকের ইতিমধ্যে অনেক কিছুই আবিষ্কার করে ফেললেন। তিনি নিঃসন্দেহ হ'লেন, লোকটার মধ্যে চেতনার স্কুলিঙ্গ ছাইচাপা পড়ে রয়েছে। সুযোগ পেলে যথা সময়েই তার প্রকাশ ঘটতে বাধ্য।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে দ্বীপবাসীরা আগন্তুক লোকটার সঙ্গে স্নেহ, মায়া, মমতাপূর্ণ আচরণ করতে লাগলেন। অচিরেই তার মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তার মাথার উসকো-খুসকো চুল অন্য দর্শজনের মতো করে কেটে দেওয়া হল। বুক পর্যন্ত নেমে আসা দাড়িগুলোকে কামিয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হল। আশ্চর্য ব্যাপার লোকটা কিছুমাত্রও আপত্তি করল না। কথাবার্তা, চালচলন ও চাহনি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আর হৃৎস্পৃশ্টিও একটু একটু করে ফিরে আসার লক্ষণ প্রকাশ পেল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে লোকটাকে স্মৃতি রোমন্থন করতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। ফল যে কিছু পাচ্ছেন না তাও নয়।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ইতিমধ্যেই লোকটার মুখ থেকে নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত ও চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছেন যা তাঁকে যারপরনাই অভিভূত করেছে।

কিছুদিন যেতে না যেতেই স্পষ্ট বুঝা গেল লোকটা ক্রমেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর অনুগত হয়ে পড়েছে। সে সর্বদা তাঁর কাছাকাছি পাশাপাশি থাকার চেষ্টা করে।

এক বিকেলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটাকে নিয়ে সমুদ্রের তীরে হাজির হলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য সমুদ্র দেখে তার মধ্যে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তবে এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন, লোকটা যদি অতর্কিতে পালাবার চেষ্টা করে তবে যেন অনায়াসেই জাপ্টে ধরে ফেলতে পারেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! লোকটা কিন্তু পালানোর চেষ্টাও করল না। বরং সে সমুদ্রের দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে একসময় ধীরে ধীরে পাশের জঙ্গলের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অপলক চোখে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল। একটু পরেই তার দুচোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটার কাঁধে হাত রেখে স্নেহে বলতে লাগলেন, 'ভাই, আমি তোমার দুঃখ যন্ত্রণার কারণ পুরোপুরি উপলব্ধি না করতে পারলেও এটুকু অন্তত বুঝতে পারছি, তোমার মধ্যে পুরনো স্মৃতি ফিরে আসছে। নইলে অবশ্যই তোমার চোখ দুটো এমন করে জলে ভরে উঠত না।'

সন্ধ্যার কিছু আগে ক্যাপ্টেন হার্ডিং লোকটাকে নিয়ে গ্রানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অন্যান্য দ্বীপবাসীদের কাছে বিকেলে সমুদ্রের তীরে যা কিছু ঘটেছে হুবহু বর্ণনা করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাবাক্রিষ্ট মুখে বললেন, 'কী জানি, হলে হতেও পারে। তবে একটা কথা, আমাদের কাছে আজ পর্যন্ত তো কোনো অপরাধ করে নি। সে নির্দোষ বলেই আমরা জানি। আর যদি কোনো অন্যায় করে তবে অবশ্যই তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি পেতেই হবে, কোনো ভুল নেই।'

এবার রহস্যজনক লোকটা চোখের জল মুছতে মুছতে ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আপনারা কি ইংরেজ, নাকি—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'না, ইংরেজ নয়। আমরা আমেরিকান তুমি কোন দেশের লোক, বলোতো?—ইংল্যান্ডের?'

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অশ্রুত। ইংল্যান্ডেরই বটে।'

কথাটা বলেই সে অস্থিরভাবে কয়েক মুহূর্ত পায়চারি করে একসময় ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবার বলল, 'আচ্ছা, এটা কোন মাস, বলুন তো?'

'নভেম্বর।'

'নভেম্বর? কত সাল বলুন তো?'

'১৮৬৭।'

আচমকা উল্লসিত হয়েসে বলে উঠল, 'বারো বছর! বারো! বারো বছর পেরিয়ে গেছে!'

'পাণ্ডববর্জিত ট্যাবর বীশে তুমি বারোটা বছর একা একা কাটিয়ে দিয়েছ!' লোকটা নীরবে ঘাড় কাৎ করল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে চললেন, 'কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তুমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছ, বলবে কী?'

লোকটা মৌনব্রত গ্রহণ করল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং স্বগতোক্তি করলেন—নির্দিষ্ট সময়ের আগে কিছুতেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় বলেই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে বোতলে চিঠি ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

রহস্যজনক লোকটা আবার মৌনব্রত গ্রহণ করে পাহাড়ের নির্জন-অন্ধকার গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। খেতে পর্যন্ত আসে না। রাত্রোও বিষণ্ণমনে সেখানেই কাটায়।

দ্বীপবাসীরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, একদিন না একদিন সে তার অতীত জীবনের কাহিনী বলে নিজের মনকে হাফা করবেই।

১০ নভেম্বর। রাত্রি আটটা। লোকটা হঠাৎ ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মতো তর্জন গর্জন করতে লাগল, 'আমাকে কেন এখানে নিয়ে আসা হল? আমাকে এখানে আনার অধিকার কে দিয়েছে, জান তে চাই? আপনারা কী আমার পরিচয় জানেন? কেন আমাকে পট্টাবর বীশে নির্বাসিত করা হয়েছে, জানেন কি আপনারা?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ছুটে ক্রোধোন্মত্ত লোকটার কাছে উপস্থিত হলেন। তাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাতে লাগলেন।

আচর্য ব্যাপার! লোকটা কিছুতেই শান্ত হল তো না-ই, বরং ঘাড় ঝাঁকিয়ে উন্মাদের মতো বলতে লাগল 'না-না-না! একটা কথার জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আমি কিছুতেই থামব না।'

'কী? কী সে প্রশ্ন?'

'আমি কেবল জানতে চাই—আমি কি স্বাধীন, নাকি পরাধীন? চুপ করে থাকবেন না, উত্তর দিন—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবার বলে উঠলেন, 'স্বাধীন। অবশ্যই স্বাধীন।'

হঠাৎ লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে সে এবার বলল, 'স্বাধীন? তবে আমি চললাম।'

কথা বলতে বলতে লোকটা বিদ্যুৎগতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল।

প্যানক্রফট আর হার্বাট তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল। বৃথা হল চেষ্টা। চোখের পলকে সে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। একেবারে বেপান্ডা।

দীর্ঘ সময় ধরে জঙ্গল তোলপাড় করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা বিষণ্ণমুখে ফিরে এসে বলল, 'হায়! লোকটা পালিয়েছে। আর কোনো দিনই সে ফিরে আসবে না।'

দ্বীপবাসীরা রহস্যজনক সে লোকটাকে ফিরে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিলেন, এবার তাঁরা একটা বায়ুকল তৈরির কাজে মেতে উঠলেন। প্রসপেক্ট হাউসের ওপর সেটাকে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৩ ডিসেম্বর।

লেকের দক্ষিণ দিকে মাছ ধরতে গিয়ে হার্বাট বিকট একটা আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলেন। বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল।

আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ছুটেছুটি করে গিয়ে দেখলেন, দানবাকৃতি একটা জাগুয়ার। ভয়ঙ্কর হিংস্র জাগুয়ার কলিজা-কাঁপানো স্বরে তর্জন গর্জন করে চলেছে। একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে হার্বাট থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

ক্রোধোন্মত্ত হিংস্র জাগুয়ারটা হার্বাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নিতেই অতর্কিতে ঝোপের আড়াল থেকে রহস্যজনক সে লোকটা সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরি হাতে হিংস্র জানোয়ারটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক হাতে সজোরে তার টুটি চেপে ধরল। আর অন্য হাতে ঘন ঘন ছুরির আঘাত হানতে লাগল।

রক্তাপ্ত জাগুয়ারটা বিকট আর্তনাদ করে শূন্যে দুই তিনটে পাক খেয়ে দুম করে আছাড় খেয়ে পড়ল। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করে একসময় নিশ্চয় নিখরভাবে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, সবশেষ।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে ভাবাপূত কণ্ঠে বললেন, 'বন্ধু, তুমি যথার্থ হিতকাজক্ষীর কাজই করলে বটে। নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তুমি এই যে হার্বাট-এর জীবন রক্ষা করলে এতে আমাদের কৃতজ্ঞতাশাশে আবদ্ধ করলে।'

'জীবন? জীবন তুচ্ছ করা? আমার জীবনের কী-ই বা দাম আছে বলুন?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে করমর্দনের জন্য তার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিতেই সে যন্ত্র চালিতের মতো কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন? আমাকে দিয়ে আপনারদের কি দরকার? কে-ই বা আপনারা? না-না-না আমাকে ছেঁবেন না। আপনারা সাধু—সজ্জন—মহৎ! আর আমি—'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং রহস্যময় লোকটার কথার মধ্যে তার অতীতজীবনের সামান্যতম হলেও ইঙ্গিত পেয়ে গেলেন। সে যে নিজেকে চরম অপরাধী জ্ঞান করছে তা 'সাধু-সজ্জন—মহৎ' শব্দগুলো থেকে অনুমান করতে পারলেন।

রহস্যজনক লোকটা এবার আর গভীর বনে অদৃশ্য না হয়ে পাহাড়ের অদূরবর্তী একটা ফাটলে আশ্রয় নিল। কিন্তু দ্বীপবাসীদের এড়িয়ে চলায় একটা ঝোক তার মধ্যে দেখা গেল।

১০ ডিসেম্বর।

রহস্যজনক লোকটা হঠাৎ ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের সামনে এসে করজোড়ে নিবেদন করল, 'স্যার, আমার একটা অনুরোধ রয়েছে। আপনাদের খোঁয়াড়টা দেখাশোনার দায়িত্ব যদি আমাকে—'

'জায়গাটা খুবই নির্জন। তোমার পক্ষে একা সেখানে থাকা সম্ভব হবে। তুমি যদি নিতান্তই খোঁয়াড়ের দায়িত্ব নিতে চাও তবে না হয় তোমার জন্য একটা খুপড়ি বেঁধে দেব।

রহস্যজনক লোকটার অগ্রহে ক্যাপ্টেন হার্ডিং খোঁয়াড়টার গায়ে একটা খুপড়ি বানিয়ে দিলেন। সে সেখানে থেকে খোঁয়াড় পরিচর্যা করতে লাগল।

এক সকালে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে কথাপ্রসঙ্গে বলল, 'আমার অতীতজীবনের কাহিনী আপনাকে বলতে চাই, অবশ্য যদি আপনি শুনতে আগ্রহী হন। বলছি শুনুন—ডানকান তো সমুদ্রে গা-ঢাকা দিল। আয়ারটন রয়ে গেল একেবারেই একা। দ্বীপে খাবার দাবার আর গুলি বারুদ সবই ছিল। শুরু হল তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত। অন্তর্জালায় দৃষ্ট মরতে লাগল আয়ারটন। নিজেও ভালোই বুঝত, একদিন সে মনুষ্যত্ব হারিয়ে জঙ্গলী জানোয়ারে পরিণত হবে। হলও ঠিক তা-ই। আপনারা সে জানোয়ারটাকেই বারো বছর পর উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এলেন।' কথাটা বলেই সে একরাশ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং তার কাঁধে আলতো করে হাত রেখে সমবেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, 'বন্ধু, পাপ হয়ত তুমি করেছিলে ঠিকই। কিন্তু অন্তর্জালায় আঙনে সে পাপ ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এখন থেকে তুমি আমাদেরই একজন হয়ে নিতান্ত আপনজনের মতো গ্রানাইট হাউসে থাক। খোঁয়াড়ে থাকার আর দরকার নেই, গ্রানাইট হাউসেই আমাদের কাছাকাছি পাশাপাশি থাক।'

'না, আমাকে এখানে, খোঁয়াড়েই স্বেচ্ছা নির্বাসন জীবন যাপন করতে দিন। পাপজালায় পুড়ে পুড়ে আমার এখনো খাঁটি হওয়ার কিছু বাকি রয়েছে।'

রহস্যজনক লোকটা আরো কিছুদিনের জন্য খোঁয়াড়েই রয়ে গেল।

খোঁয়াড় ছেড়ে যাবার মুখে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা, বোতলের চিঠিতে তুমি তোমার ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছিলে কোন উদ্দেশ্যে, বলা তো?'

চিঠির কথা শুনে লোকটা যেন আচমকা ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। সে চোখে মুখে বিষয়ের ছাপ এঁকে বলল, 'ঠিকানা? কই, আমি তোমাকে, কোনো ঠিকানা লিখে পাঠাই নি।'

'ঠিকানা লেখ নি?' চোখ দুটো কপালে তুলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'ঠিকানা লেখনি? বোতলে করে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা লিখে—'

লোকটা তেমনি মাথা ঝাঁকিয়ে এবারও রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'না, না। অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা বা ঠিকানা—আমি কিছুই পাঠাই নি।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে দৃষ্টিভ্রমের রেখা ফুটে উঠল। তিনি কপালের চামড়ায় দৃষ্টিভ্রমের ভাঁজ এঁকে এক পা দু'পা করে খোঁয়াড় ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

বোতলের চিঠি বা ঠিকানা তবে বুড়ো আয়ারটন পাঠায়নি? তবে? তবে কে সেটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল? ঠিকানার ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে নতুনভাবে এক রহস্যের জালে জড়িয়ে ফেল। কে? তবে কে বোতলটাকে ঠিকানা সমেত সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল? আজ পর্যন্ত লিঙ্কনদ্বীপে ক্যাপ্টেন হার্ডিং যতকিছু রহস্যজনক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন তাদের মধ্যে বোতলের ঘটনাটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যের সম্ভার করেছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আপন মনে বলে উঠলেন, 'রহস্যগুলোর কিনারা করতে গিয়ে আমাকে যদি দ্বীপের পেটের ভিতরেও সঁধিয়ে যেতে হয় তবু কুণ্ঠিত হব না। বরাতে যা ঘটে ঘটুক, রহস্যভেদ আমাকে করতেই হবে।'

নানা ঘটনা দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে দ্বীপবাসীরা আরও দু-দুটো বছর কাটিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং মানচিত্রে তন্ন তন্ন করে লিঙ্কন দ্বীপের নাম খুঁজতে লাগলেন। হতাশ হতে হল তাঁকে। পৃথিবীর সভ্য মানুষের কাছে এ দ্বীপটা একেবারেই অজ্ঞাত। ভুলেও কোনোদিন কেউ এখানে জাহাজ ভেড়াবে না।

ট্যাবর দ্বীপ? এর নাম সবাই জানে। আয়ারটনকে সেখানে নির্বাসিত করা হয়েছিল। তার নির্বাসনের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। অচিরেই তাকে নিয়ে যেতে সেখানে জাহাজ আসার কথা। তাই সেখানে একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দেয়া দরকার। তার গায়ে লিঙ্কন দ্বীপের অবস্থান, আয়ারটন-এর বর্তমান ঠিকানা লেখা থাকবে।

জাহাজ আসবে। কিন্তু কবে? কবে জাহাজ আসবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে না থেকে সবাই মিলে কসরত করে একটা জাহাজ তৈরি করে নিলেই তো স্বামেলা চুকে যায়। কাঠ ও যন্ত্রপাতি কোনো কিছুরই তো এখানে অভাব নেই। মাত্র বারো শো মাইল নিয়ে এত ভাববার কী আছে? স্পিলেট তাঁর জাহাজ তৈরির পরিকল্পনার কথা ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কাছে ব্যক্ত করলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ধৈর্য ধরে স্পেলিটের বক্তব্য শুনে বললেন, 'আমার পরিকল্পনাটা আবার অন্যরকম। সবার আগে ট্যাবর দ্বীপে গিয়ে লিঙ্কন দ্বীপের ঠিকানা সম্বন্ধিত বিজ্ঞপ্তিটা সমুদ্রের ধারে ঝুলিয়ে রাখা দরকার।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের কথায় স্পিলেট মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

যেলেই এপ্রিল দ্বীপবাসীরা বন-আডভেঞ্চারে রচণে লিঙ্কন দ্বীপটাকে ভালো করে ঘুরে দেখতে বেরোলেন। বিরাট নৌকা তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

কথা প্রসঙ্গে স্পিলেট বললেন, 'একটা কথা ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা কিছু একটা ধন্যবাদ

পাওয়া রয়েছে। সেদিন রাতে ট্যাবর দ্বীপ থেকে ফেরার সময় আপনি যে লিঙ্কন দ্বীপ থেকে আগুন জ্বেলে পথনির্দেশ দিয়েছিলেন তার কথা বলতে চাইছি। সেদিন আমরা পথ হারিয়ে যে চক্রে পড়েছিলাম, কোনোদিন এখানে ফিরতে পারতাম কিনা—

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বলে উঠলেন, 'আগুন? আগুনের সঙ্কেত? কই, আমি তো আগুন জ্বালিনি, সঙ্কেত দেই নি। সেটা তো উনিশে অক্টোবর ছিল। সে রাতে আমি আবার আগুন কখন জ্বালাম। নির্ধাত তোমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।'

বিকেল চারটের কাছাকাছি মার্সি নদীর কিনারায় নৌকাটা নোঙর করানো হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মুখে গাভীরের ছাপ। উনিশে অক্টোবর রাতে আগুনের রহস্যটা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

২৫ এপ্রিল। সূর্য অস্ত যেতে বসেছে। প্রকৃতির বুকে আলো-আঁধারির খেলা শুরু হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সবাইকে নিয়ে গল্পে মেতে গেলেন।

কথা প্রসঙ্গে তিনি সবাইকে লক্ষ করে বললেন, 'আমার মধ্যে কতকগুলো রহস্যজনক ঘটনা জমাটবেঁধে রয়েছে। আর সেগুলো আমাকে প্রতিনিয়ত উন্মত্ত করছে। রহস্যজনক সে ঘটনাগুলো নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আমি খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। গোড়াতেই সে রহস্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম—বেলুনটা থেকে আচমকা ছিটকে পড়েছিলাম। সমুদ্র থেকে সিকি মাইল দূরে জঙ্গলের ভেতরের এক গর্ত থেকে আমাকে তোমরা উদ্ধার করলে। টপের পক্ষে তোমাদের কাছে খরবটা পৌছে দেয়া কী করেই বা সম্ভব হয়েছিল। ঠিক কি না? আবার দেখ টপ ঝড়বাদের মধ্যে ছুটে গেল, এক ফোঁটা জলও তার গায়ে লাগল না। আবার ডুগং-এর মৃত্যুর ব্যাপারটাও কম রহস্যজনক নয়। বলতে পারো, কার সুভীক্ষ ছুরির ফলা দিয়ে তার কণ্ঠনালীটা কেটে দেয়া হয়েছিল? আবার কেই বা টপকে অমন করে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, ভেবে দেখ তো? শ্যোরটাকে গুলি করার ব্যাপারটাও আমাদের মধ্যে কম রহস্যের সম্ভার করে নি। ঠিক তেমনি রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে জাহাজডুবিবির ব্যাপারটা। সমুদ্র ও দ্বীপের উপকূলবর্তী অঞ্চল চষে ফেলেও আমরা কিছু জাহাজডুবির চিহ্নমাত্রও দেখতে পাই নি। জাহাজডুবি যদি নাই হয়ে থাকে তবে সিন্দুকটা তো আকাশ থেকে পড়ে নি বা উড়েও আসে নি, কী বলা?'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং আবার বলতে শুরু করলেন, 'ভালো করে ভেবে দেখ তো, আয়ারটানের ঠিকানাসহ বোতলটা কেই বা জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এ ব্যাপারে আয়ারটন কিছুই জানে না, তোমরা তো তার মুখ থেকেই শুনেছ। আমাদের প্রিয় সঙ্গী টপ কোনো না কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়ে মাঝে মাঝেই চিৎকার চোঁচামেচি করে, তোমরা তো জানই? সে নির্ধাত এমন কিছুর অস্তিত্ব টের পেয়েছে যার ফলে তার মধ্যে এমন অস্থিরতা ভর করে কবার বলছি, শক্ত করে বেঁধে রাখা নৌকাটার ব্যাপার! সেটা আপনা থেকে বাঁধন খুলে আমাদের কাছে এসেছিল এটাই কি আমরা বিশ্বাস করব? আমি নিশ্চিত যে, দ্বীপে এমন কোনো রহস্যজনক ব্যাপার রয়েছে যা আমাদের কাছে একবোরেই অজ্ঞাত। আর সে প্রতিনিয়ত আমাদের মঙ্গল কামনাই করে চলেছে। কে সে? কোথায়ই বা সে থাকে? আর কেনই বা প্রতিনিয়ত ছায়ার মতো অনুসরণ করে আমাদের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি থেকে বারবার উদ্ধার করে চলেছে।

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি।

১৭ অক্টোবর ক্যাপ্টেন হার্ডিং ক্যামেরা নিয়ে নতুন সাজে সজ্জিত দ্বীপটার ছবি তুলে বেড়াতে লাগলেন। অন্ধকার কামরায় রাসায়নিক তরল পদার্থে বুয়ে ফটো নেগেটিভ করে নিলেন। সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতে একটার গায়ে সাদা দাগ নজরে পড়ল। জল দিয়ে আচ্ছা করে বুয়ে ফেললেন। না, রহস্যজনক দাগটাকে কিছুতেই ওঠাতে পারলেন না।

সেদিনই বিকেলের দিকে হার্বাট টেলিস্কোপের মাধ্যমে ছবিগুলো দেখতে গিয়ে থমকে গেলেন। তার কপালের চামড়ায় বিষয়ের ভাঁজ ফুটে উঠল। আবার টেলিস্কোপের ছিদ্রে চোখ লাগিয়েই সোহাস্যে চিল্লিয়ে উঠলেন—'জাহাজ! জাহাজ! এটা জাহাজের দাগ—জাহাজের ছবি। জাহাজেরই বটে।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং অত্যাশ্চর্য অগ্রহের সঙ্গে হার্বাটের হাত থেকে নেগেটিভটাসহ টেলিস্কোপটা নিয়ে চোখের সামনে ধরলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, জাহাজ! হার্বাট ঠিকই বলেছে—জাহাজই বটে। লিঙ্কন দ্বীপের দিগন্তে একটা জাহাজ দেখা দিয়েছে। জাহাজ! জাহাজ!'

দ্য সিক্রেট অব দ্য আইল্যান্ড

লিঙ্কন দ্বীপে জাহাজ আসছে।

দ্বীপবাসীদের দীর্ঘদিনের অধীর প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তবু দ্বীপবাসীদের মনে স্বস্তি বা শান্তি কোনোটাই নেই। কেন? কি-ই তার কারণ? দ্বীপ ছেড়ে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করতে হবে বলেই কি তাদের মধ্যে এমন আকস্মিক ভাবান্তর ঘটেছে? হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন নির্জন নিরালা দ্বীপে থাকার ফলে এখানকার ধুলো-মাটি থেকে শুরু করে প্রতিটা গাছগাছালির সঙ্গে যেন তাদের আত্মিক সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। সে সম্পর্কের আজ ছেদ ঘটতে চলেছে বলেই আজ মন ভারাক্রান্ত, অকথিত ভাবান্তর ঘটেছে।

জাহাজটা এখনো প্রায় কুড়ি মাইল দূরে রয়েছে। হ্যাঁ, তবু তার গতি লিঙ্কন দ্বীপের দিকেই। কিন্তু এমনটা কী করেই বা হতে পারে? প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অজ্ঞাত পরিচয় দ্বীপটার খবর কারো তো জানার কথা নয়। তবে কেন, কী করেই বা জাহাজটা এদিকে ধেয়ে আসছে? ব্যাপারটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে গভীর কৌতূহলের সম্ভার করল।

আয়ারটনকে খোঁয়াড়বাড়ি থেকে ডেকে আনানো হল।

আয়ারটনের চোখের সামনে টেলিস্কোপটা ধরে অস্থিরচিহ্ন ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, 'দেখ তো জাহাজটাকে চিনতে পার কি না? ভালো করে লক্ষ্য করো, এটা কি ডানকান জাহাজ?'

টেলিস্কোপের নলটাকে বারবার এদিক-ওদিক নেড়েচেড়ে আয়ারটন বলল, 'না, ডানকান বলে তো মনে হচ্ছে না। ডানকান তো কলে চলে। কলের জাহাজ এটা নয়।'

দ্বীপবাসীরা জাহাজের কথা শুনে উল্লসিত হলেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং কিন্তু এটাকে মোটেই সৌভাগ্য বলে মেনে নিতে পারলেন না। জাহাজটার অতর্কিত আবির্ভাব তাঁর মধ্যে গভীর ভাবনার সমুদ্র করল।

টেলিস্কোপের নলে এবার প্যানক্রফট চোখ লাগালেন। অনুসন্ধিৎসু নজরে মুহূর্তকাল জাহাজটার দিকে তাকিয়ে থেকে একসময় বললেন, 'কটা ফ্লাগ—জাহাজটার মাথায় একটা ফ্লাগ উড়ছে। ওই তো মাস্তুলের ডগায় পতপত করে উড়ছে সেটা। ফ্লাগটা আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের তো নয়ই, মনে হচ্ছে জার্মানি বা ফরাসিরও নয়। আর যদি স্পেনের ফ্লাগ হত তবে তো তার রঙ হলুদ হওয়া উচিত ছিল।'

টেলিস্কোপটা ছেঁা মেরে প্যানক্রফটের কাছ থেকে নিয়ে আয়ারটন চোখের সামনে ধরল। আচমকা সে আতর্জন করে উঠল, 'হায় ঈশ্বর। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড ঘটতে চলেছে! এ যে কালো ফ্লাগ। জলদস্যুদের প্রতীক—জলদস্যুদের জাহাজ!'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন, যে আতঙ্কে ভুগছিলেন, কার্যত ঘটতেও চলেছে ঠিক তাই। তিনি সবাইকে কড়া নির্দেশ দিলেন। বন্দরের সব আগুন নিভিয়ে ফেলার জন্য। থানাইট হাউসের দরজা-জানালা বন্ধ করে দিতে বললেন। এক টুকরো আলোও যেন ঘরের বাইরে যেতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সবাইকে বার বার নির্দেশ দিতে লাগলেন।

দ্বীপবাসীরা একজোট হয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মরবেন তবু দ্বীপের দখল ছাড়বেন না।

রাতের অন্ধকারে জাহাজটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। জাহাজটার আলো নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সহজেই অন্ধকারের বুকে তলিয়ে যেতে পেরেছে বিশালায়তন যন্ত্রদানবটা।

প্যানক্রফট এক মুহূর্তের জন্যও চোখ থেকে টেলিস্কোপটা নামালেন না। একসময় ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ কি, জাহাজটায় কামানও রয়েছে দেখা যাচ্ছে!'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সমুদ্রের বুকের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ভেদ করে কামানের শব্দ ভেসে এল। আলোও দেখা গেল। আলো দেখা আর শব্দ শুনতে পাওয়ার মধ্যে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধান। ক্যাপ্টেন হার্ডিং হিসেব করে দেখলেন, জাহাজটা তাঁদের কাছ থেকে প্রায় সওয়া মাইল দূরে অবস্থান করছে। একটু বাদেই অন্ধকার থেকে কড়কড় শব্দ ভেসে এল। দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ হলেন, জাহাজ নোঙর করেছে। মোটা শিকলের শব্দ সেটা।

ব্যস, আর কোনো সাড়া শব্দ শোনা গেল না। দ্বীপবাসীরা ধরেই নিলেন, বাকি রাতটুকু জাহাজে কাটিয়ে বোম্বেরটা জাহাজ ছেড়ে দ্বীপে নামবে।

হার্ডিং বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করতে নারাজ। তিনি সহযোগীদের নিয়ে বোম্বেরটাদের মোকাবেলা করার জন্য সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মনে বিচ্ছিন্ন চিন্তা ভর করল। বোম্বেরটা সংখ্যায় কত জানা নেই। তার ওপর তাদের সঙ্গে কামান রয়েছে। কামানের সঙ্গে কয়েকটা মাত্র গাদা-বন্দুক নিয়ে লড়াইয়ে নামতে যাওয়া তো পাগলের খেলা ছাড়া কিছুই নয়।

এমন সময় আয়ারটন অদ্ভুত একটা প্রস্তাব দিল, 'স্যার, যদি অনুমতি দেন তবে আমি গোপনে গিয়ে বোম্বেরটা সংখ্যায় কত দেখে আসি।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাবলেন তবু মচকাবেন না। নিজের জেদ বজায় রাখতে জান কবুল করতেও পিছপা হন না। তিনি আয়ারটনকে প্রায় ধমকের স্বরেই বলে উঠলেন, 'কোনো দরকার নেই। আমি কাউকেই পরোয়া করি না। আর প্রাণের মায়্যা? প্রাণের মায়্যা আমার আদৌ নেই।'

'স্যার, মাত্র সোয়া মাইল পথ, এক ছুটে চলে যাব। চোখের পরকে খবরটা নিয়ে ফিরে আসব।' কথা বলতে বলতে আয়ারটন ঠাণ্ডা কম লাগার জন্য গায়ে চর্বি মেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

জাহাজের কাছে পৌঁছেই আয়ারটন নোঙরের মোটা শিকলটা বেয়ে তরতর করে জাহাজের ডেকের ওপর উঠে গেল। জমটবাঁধা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জাহাজের যাত্রীদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। জাহাটর নাম 'স্পিডি'। আর তার ক্যাপ্টেনের নাম বব হার্ডি।

ক্যাপ্টেন বব হার্ডির নাম কানে যেতেই অতীত স্মৃতি তার মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বব হার্ডি অস্ট্রেলিয়ার জেল-পালানো কয়েদিদের নিয়ে দুর্ধর্ষ একটা ডাকাতদল গড়ে তুলেছিল। নাবিক হিসেবে তার খ্যাতি রয়েছে। আর দুর্ধর্ষ ডাকাত বলেও কম অখ্যাতি নেই। প্রচুর গোলাবারুদ আর অস্ত্রশস্ত্রে সমৃদ্ধ স্পিডি জাহাজটা বব হার্ডির দল অস্ট্রেলিয়ার নরফোক দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে থেকে করায়ত্ত করে নিয়েছে।

আয়ারটন ভাবতে লাগল, সামান্য কয়টা গাদা বন্দুক নিয়ে মাত্র ছয়জন দ্বীপবাসীর পক্ষে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া পাগলের খেলা ছাড়া কিছুই নয়।

আরো মুহূর্তকাল নীরবে মাতাল বোম্বেরটাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে সে ভাবল, যদি আত্মবিসর্জনের কারণ ঘটে তবু কয়েকজন হিতকারী দ্বীপবাসীর প্রাণরক্ষা পাবে, জাহাজের বারুদঘরে সে আগুন ধরিয়ে দেবে। চোখের পলকে জাহাজটা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আচমকা কে যেন পিছনদিক থেকে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার ঘাড়টা চেপে ধরে গর্জে উঠল, 'খবরদার! খবরদার, এক পাও এগোবে না, বলে দিচ্ছি!'

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়েই আয়ারটন চিনে ফেলল 'ববি হার্ডি'। তার কণ্ঠস্বরও তাকে সনাত্তকরণে সাহায্য করল। ববি হার্ডি কিন্তু আয়ারটনকে মোটেই চিনতে পারল না। পারার কথাও তো নয়। কারণ, সে নিশ্চিত জানে, আয়ারটন অনেক আগেই মরে ভূত হয়ে গেছে। কেউ বললেও সহজে বিশ্বাস করতে উৎসাহী হবার কথা নয়। তাদের চৌচামেচিতে মাতাল নাবিকদের একজন আয়ারটনের কাছে আচমকা পিছনদিক থেকে গুলি চালিয়ে দিল। বরাত ভালো, যে আঘাত সামান্যই লেগেছে।

আয়ারটন বুদ্ধি করে বন্দুকের গুলিতে লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিল। জাহাজের বুকে নেমে এল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার। বাস, অন্ধকারে আত্মঘাতী লড়াইয়ে মেতে উঠল। একের পর এক রক্তমাখা বোম্বের রক্তমাখা শরীর মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে কাতরাতে লাগল।

সুযোগ বুঝে আয়ারটন শিকলটা বেয়ে তরতর করে জলে নেমে গেল। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে কুলের দিকে এগোতে লাগল।

আহত আয়ারটন কাজ হাসিল করে দ্বীপবাসীদের কাছে ফিরে এল।

পুব আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। ভোরের হালকা আলোয় স্পিডির ঝাপসা চেহারা দ্বীপবাসীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

বুদ্ধি করে দ্বীপবাসীরা চারটে দলে বিভক্ত হয়ে বোম্বেরদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য তৈরি হলেন।

আয়ারটন ইয়া পেল্লাই একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলেন।

এদিকে বোম্বেররা জাহাজ থেকে দ্বীপটা লক্ষ করে মুহূর্তে কামান দাগাতে লাগল।

দ্বীপবাসীরাও সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে বন্দুক ছুঁড়ে দু-একটা করে বোম্বেরটেকে ঘায়েল করতে লাগলেন।

বন্দুকের ধোঁয়া লক্ষ করে ববি হার্ডির কামান গর্জে উঠতে লাগল।

কয়েক মিনিট পরে জাহাজ থেকে দুটো নৌকা নেমে এল। কয়েকটা বোম্বের ছুটোপাটা করে জাহাজ থেকে নৌকায় নেমে এল। এবার একটা নৌকা লিঙ্কন দ্বীপের দিকে এবং অন্যটা মার্সি নদীর মোহনার দিকে উদ্ধার বেগে ছুটে চলল। আয়ারটন ও প্যানক্রফট বিশালায়তন একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে বন্দুক চালিয়ে দু-একটা করে বোম্বেরটেকে গুলি করতে লাগলেন। পাথরের আড়াল থেকে গুলি করার জন্য বোম্বেরদের গুলি তাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারছে না।

মার্সি নদীর দিকে বন্দুক হাতে অপেক্ষা করছিলেন বীরযোদ্ধা স্পিলেট। তিনি একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। বোম্বেরদের নৌকাটা কাছাকাছি আসতেই তিনি বন্দুকের ঘোড়া টিপতে লাগলেন বাস, চোখের পলকে দুজন বোম্বেরট বিকট আর্তনাদ করে নদীর জলে আছাড় খেয়ে পড়ল। আচমকা দোলা লাগায় নৌকাটা প্রচণ্ড বেগে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাথর ধাক্কা খেল। বাস, মুহূর্তে সেটা গুঁড়ো হয়ে গেল। বোম্বেরেরা দারুণভাবে আহত হল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আগেই অনুমান করেছিলেন, অচিরেই যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাবে। বোম্বেরেরা খাড়ির দিকে স্পীডিকে নিয়ে এগোবে। তারা শেষপর্যন্ত করলও তাই।

সমূহ বিপদ বুঝে নেবুচ্যাডনেজার ও স্পিলেট দ্রুত চিমনিতে ঢুক গেলেন। বোম্বেরেরা চিমনিটা লক্ষ করে কামান দাগল। চিমনির গায়ে ফাটল দেখা দিল। কামানের একটা গোলা বাতাসের বেগে ছুটে গিয়ে গ্রানাইট হাউসের গায়ে আঘাত করে উঠলেন। বোম্বেরেরা তাদের মাথাপোঁজার জায়গাটার হৃদিস পেয়ে গেছে।

একটু পরেই জাহাজটার দিক থেকে অনেকগুলো মানুষের সমবেত আতঁস্বর শোনা গেল। দ্বীপবাসীরা যে যার গোপন অন্তরাল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলেন, বোম্বেরদের একমাত্র সম্বল স্পীডি জলস্তম্ভের মাথায় চেপে সজোরে আছাড় খেয়ে পড়ল। মুহূর্তে গুঁড়ো হয়ে গেল এমন বিশালায়তন জাহাজটা।

বাস, সব শেষ।

স্পীডি কেন অকস্মাৎ এমন করে ধ্বংস হয়ে গেল? এমন একটা অবিস্থাস্য ঘটনা কেন ঘটল?

ভাঁটার টানে স্পীডির ধ্বংসাবশেষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এমন একটা অপূর্ণ সুযোগ দ্বীপবাসীরা নষ্ট করতে নারাজ। তারা গাঁইতি, শাবল, কুড়োল আর কাটারি প্রভৃতি নিয়ে লেগে পড়ল ভাঙা জাহাজটার প্রয়োজনীয় অংশ কাটাকাটি করে দ্বীপে তুলে নেয়ার জন্য। জোয়ার আসার আগেই কাজ মিটিয়ে ফেলতে হবে তাই এ ব্যস্ততা। বাস-পেটরা, ছোট বড় যন্ত্রপাতি, গোলাবারুদ, বন্দুক, বাসনকোসন আর অতিকায় দুটো সিঁদুক তারা ভাঙা জাহাজটা থেকে উদ্ধার করল।

দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের ধার বরাবর হেঁটে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাথরের ওপর পড়ে থাকা একটা লোহার চোঙ তাদের গতিরুদ্ধ করে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং চোঙটা দেখেই চমকে উঠলেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি সহজেই চিনতে পারলেন, এটা অবশ্যই মামুলি একটা চোঙ নয় টর্পেডোর ধ্বংসাবশেষ।

হ্যাঁ, টর্পেডোর ধ্বংসাবশেষই বটে। কিন্তু এটা এখানে এল কী করে? ক্যাপ্টেন হার্ডিং ভাবছেন—তবে কি কেউ গোপন অন্তরাল থেকে মারাত্মক অস্ত্র টর্পেডোটা ছুঁড়ে বিশালায়তন জাহাজটাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে? কে? কে সে? আবার একটা রহস্যজনক ঘটনা ঘটে গেল দ্বীপবাসীদের চোখের সামনে। তবে কি ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কথাই ঠিক, কোনো এক অজ্ঞাত শক্তি তাদের একের পর এক ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে চলেছে? কি সে রহস্য? আর সে রহস্যের শেষ কোথায় তাই বা কে জানে?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় মারাত্মক মারণাস্ত্র তৈরী করার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তার অসীম শক্তি, বোম্বেরদের জাহাজ স্পীডি তো সামান্য ব্যাপার, ছোটোখাটো একটা পাহাড়কেও ঝুড়িয়ে দিতে পারে। কে সে অক্রিম হিতাকাজী যে গোপন অন্তরাল থেকে অলৌকিক, অপারিঁব এবং অমানুষিক ক্ষমতাবলে একের পর এক রহস্য সৃষ্টি করে দ্বীপবাসীদের বিষয় উৎপাদন করে চলেছে?

জাহাজ থেকে পাওয়া কামানটা গ্রানাইট হাউসে বসিয়ে দিয়ে প্যানক্রফট সেটাকে রীতিমতো একটা দুর্গ বানিয়ে তুলেছে। আর বাল্লদের স্থপও সেখানেই রাখা হয়েছে।

এবার দ্বীপবাসীদের চিন্তা যে ছয় জন বোম্বের বেকায়দায় পড়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়েছিল তাদের খুঁজে বের করার ব্যাপারে। আবার নৌকোয় চেপে সটকে পড়াও বিচিত্র নয়। আর সবচেয়ে বড় কাজ, হিতকারী অদৃশ্য ব্যক্তিটাকে সন্ধান করা।

হার্ভাট, প্যানক্রফট আর স্পিলেট তাদের জলযান বন-অ্যাডভেঞ্চারের বাঁধন খুলতে গিয়ে যারপরনাই বিস্মত হলেন। গাছের সঙ্গে নৌকাটাকে বেঁধে রাখা ছিল। গিটাইই তাদের বিস্ময়ের কারণ। তাঁদের মধ্যে এমন দাঁট কেউই দেয় না, দিতে পারেও না। তবে? কে এমন অসম্ভব একটা কাজ করল? এতেও রহস্যজনক হিতাকাজীটার হাতের ছোঁয়া পড়েছে দেখা যাচ্ছে। কে এই রহস্যসৃষ্টিকারী অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি।

আয়ারটন খোঁয়াড়ের অবস্থা দেখতে গিয়েছিল, কাজ সেরে তার অনেক আগেই ফিরে আসার কথা। তার অস্বাভাবিক দেরি দেখে দ্বীপবাসীরা অস্থির হয়ে তার খোঁজে গেলেন। খোঁয়াড়ের সামনে পা দিয়েই সবাই বিষ্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ার জোগাড়। আয়ারটন অনুপস্থিত। খোঁয়াড়টাও লগভও। সবাই মিলে আয়ারটনের নাম ধরে ডাকাডাকি করে চারদিকে খোঁজ করলেন। কোথাও তাকে পাওয়া গেল না।

দ্বীপবাসীরা যখন হতাশদুষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কর্তব্য নির্ধারণে ব্যস্ত ঠিক তখনই টপকে অস্বাভাবিক অস্থির হয়ে পড়তে দেখা গেল। সে অনবরত খেউ খেউ করতে করতে চারদিকে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

টপের অস্থিরতার কারণ জানতে হার্ভাট উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটে যেতেই আচমকা বিকট আত্ননাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে স্পিলেট ও প্যানক্রফট ছুটোছুটি করে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, হার্ভাটের রক্তাণুত দেহটা মাটিতে পড়ে আছাড়ি পিছাড়ি করছে। তবে প্রাণে বেঁচে গেছেন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ইতিমধ্যে সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনিও বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে হার্ভাটের দিকে এগোতে লাগলেন। এমন সময় তাঁর দিকে বন্দুকের একটা গুলি ছুটে এল। ব্যাপারটা লক্ষ করে তিনি অতর্কিতে বসে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন। একটা বোম্বের। বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় অসহায় দৃষ্টি মেলে ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের দিকে সে তাকিয়ে রইল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং একলাফে তার ওপর পড়ে হাতের ছুরিটা তার বুকে আমূল গাঁথে দিলেন।

বোম্বেরগুলো খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সারাদিন জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে খাবারে খোঁজ করে আর তারা রাত কাটায় খোঁয়াড়ে। দ্বীপবাসীরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধা ঘটছে।

২৭ নভেম্বর। স্পিলেট টপকে নিয়ে ভোরে বনের দিকে রওনা হলেন। সোয়া মাইল গিয়ে টপ গলা ছেড়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। সে দৌড়ে গিয়ে অদূরবর্তী ঝোপের ফাঁক থেকে রক্তমাখা পোশাকের একটা টুকরো বের করে আনল। তাকে সেটা দাঁতে কামড়ে আনতে দেখেই স্পিলেট চিনতে পারলেন, এটা আয়ারটনের পোশাকের টুকরো ছিঁড়ে গাছে আটকে গেছে। তবে? তবে কি সে বেঁচে রয়েছে?

২৯ নভেম্বর। কদিন ধরে নেবুচাডনেজার একা গ্রানাইট হাউস আগলাচ্ছেন। সেদিন দুপুরের ঠিক আগে ব্যস্ত-পায়ে জ্যাপ খোঁয়াড়বাড়িতে হাজির হল। তার গলায় একটা চিরকুট বাঁধা। তাকে লেখা—“শুক্রবার সকাল ছয়টায় বোম্বেরেরা প্রেটোর ওপর চড়াও হয়েছে।—ইতি নেব।”

চিঠিটা পড়েই দ্বীপবাসীরা রীতিমতো হায় হায় করে উঠলেন।

ওনাগা দুটোকে গাড়িতে জুড়ে দেয়া হল। অসুস্থ হার্ভাটকে গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সে সংজ্ঞাহীন। গায়ে তখনও জ্বর। ক্যাপ্টেন হার্ডিং জঙ্গল থেকে উইলো গাছের ছাল এনে রস করলেন। হার্ভাটকে খাইয়ে দিলেন। কুইনাইনের বিকল্প ব্যবস্থা। তবু তাঁর জ্বর ছাড়ল না। একমাত্র কুইনাইন প্রয়োগ করতে পারলে জ্বর অবশ্যই ছাড়বে।

অনন্যোপায় হয়ে তখনকার মতো যাত্রা স্থগিত রাখতেই হল। অচৈতন্য হার্ভাটকে নিয়ে এতটা পথ যাওয়ার ঝুঁকি নিলেন না।

হার্ভাট সারারাত জ্বরের ঘোরে ছটফট করলেন। সকালে এক অত্যন্তর্ষ ব্যাপার ঘটে গেল। একে অলৌকিক ব্যাপারও বলা চলে। খোঁয়াড়বাড়ির সামনে একটা শিশি পড়ে থাকতে দেখা গেল। তার গায়ে লেখা—সালফেট অব কুইনাইন।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর নির্দেশে কফির সঙ্গে আঠার গ্রেন কুইনাইন মিশিয়ে হার্ভাটকে খাইয়ে দেয়া হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্বর কমতে লাগল। বিকালে উপসর্গও রইল না। প্রলাপ বকাও বন্ধ হয়ে গেল।

কুইনাইনের শিশিটা দ্বীপবাসীদের মধ্যে নতুন করে রহস্যের সঞ্চার করল। কে শিশিটাকে খোঁয়াড়ের দরজায় রেখে দিয়ে গেল। কে সে হিতাকাজী?

ফেব্রুয়ারি মাস পড়ল। দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে অবস্থান করছেন। এদিকে বোম্বেরদের উপস্থিতির কিছু কিছু চিহ্ন এখানে ওখানে পাওয়া যেতে লাগল। ভাড়া ডালপালা, পায়ের চিহ্ন, পোড়া ছাই দেখে দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহে হলেন, দুর্ঘর্ষ বোম্বেরেরা ধারে কাছেই ঘর ঘুর করছে।

স্পিলেট ভাবছেন, বোম্বেরেরা হয়ত-বা ফ্রান্সলিন পাহাড়ের গুহায় মাথা গুঁজেছে। তারা সাবই আবার কদিনের জন্য খোঁয়াড়-বাড়িতে গেলেন। সেখান থেকে ফ্রান্সলিন পাহাড়ের প্রতিটা গুহায় হানা দিয়ে বোম্বেরদের খোঁজ করতে লাগলেন।

এক বিকেলে দ্বীপবাসীরা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড় থেকে খোঁয়াড়-বাড়িতে ফিরে চমকে উঠলেন। দেখলেন ঘরের ভেতরে কে একজন পিছন ফিরে শুয়ে। দরজা দিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়েই তারা চিনে ফেললেন, আয়ারটন পিছন ফিরে শুয়ে।

দ্বীপবাসীরা ব্যস্তপায়ে ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকাল। ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বিপদ সামনে। বন্দুক নিয়ে সবাই তৈরি থাকুন।'

ঠিক তখনই টপ-এর গর্জন শোনা গেল। বন্দুক-হাতে তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করলেন। সামান্য এগিয়েই তারা ঝর্নার ধারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাদের সামনে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পাঁচ-পাঁচটা বোম্বের মৃতদেহ পড়ে। কে দ্বীপবাসীদের চরমতম শত্রু বোম্বের মেরে সাবাড় করল? রহস্য! গভীর রহস্য! দ্বীপবাসীরা নতুনতর এক সমস্যায় জড়িয়ে পড়লেন।

আয়ারটন একটু সুস্থ হলে তার দুর্বস্থার কথা এক-এক করে বলতে লাগল। আয়ারটন খোঁয়াড়ে আসার পরদিনই কে বা কারা যেন আচমকা পিছন থেকে তার চোখ দুটো চেপে ধরল। পিঠমোড়া করে বেঁধে ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের গুহায় নিয়ে গেল। বোম্বের মেরে একজন তাকে হঠাৎ চিনে ফেলল। তাকে না মেরে দ্বীপবাসীদের তথ্য সংগ্রহের আশায় জিয়ে রাখল। কিন্তু আয়ারটন তাদের হত্যাশ করল। কোনো তথ্যই সে তাদের কাছে ফাঁস করল না। তার পরের ঘটনা, কী করে সে খোঁয়াড়বাড়ির ঘরে এল—কিছুই তার জানা নেই। তাই বোম্বের মেরে হত্যার ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। এতবড় একটা রহস্য আড়ালেই থাকল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বোম্বের মেরে লশগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হলেন, কোনো উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে তাদের হত্যা করা হয়েছে। আবার একটা রহস্য ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর মাথায় ভর করল।

১৯ ফেব্রুয়ারি। অজ্ঞাতপরিচয় দেবতুল্য হিতাকাজকীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্বীপবাসীরা ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ে হাজির হলেন।

একটা অন্ধকার গুহার দরজায় গিয়ে অনুসন্ধানকারী দ্বীপবাসীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, গুহার জমাটবাঁধা অন্ধকার থেকে কেমন একটা চাপা গুঞ্জন ভেসে আসতে লাগল। গুঞ্জন ঠিক নয়—দুমদুম আওয়াজ।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং রহস্যটার সমাধানের জন্য তৎপর হলেন।

স্পিলেট বললেন, 'আমরা বোধ হয় ভয়ঙ্কর এক বিপদের মুখোমুখি হতে চলছি। আমার মনে হচ্ছে, অদূরে কোনো সুপ্ত আগ্নেয়গিরি নতুন করে অগ্নি-উদগীরণ করার প্রতুতি নিচ্ছে। তার যদি হয়ই তবে আমাদের মৃত্যু কেউই রদ করতে পারবে না।'

স্পিলেট-এর কথায় ক্যাপ্টেন হার্ডিং মোটেই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন না। হিতকারী অধিদেবতা থাকতে তিনি কোনো বিপদকেই যথার্থ বিপদ মনে করেন না। তাঁর একমাত্র চিন্তা, তাঁকে খুঁজে বের করা।

ইতোমধ্যে দ্বীপবাসীরা ভাঙা জাহাজটার ভাঙা খোল, পাটাতন ও মাছুলা ব্যবহার করে চমৎকার একটা জাহাজ তৈরি করে ফেলেছেন।

১৫ অক্টোবর একেবারেই নতুনতর একটা ঘটনা ঘটে গেল। টেলিগ্রামের বৈদ্যুতিক ঘটনাটা ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং করে বেজে উঠল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিশ্বাসে হতবাক হয়ে পড়ার জোপাড় হলেন। দ্বীপবাসীরা সবাই তো তাঁর কাছাকাছি রয়েছেন। তবে কে ঘটনা বাজাচ্ছে। তিনি ব্যস্তপায়ে এগিয়ে যন্ত্রের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? কে আপনি? কী চাই, বলুন?'

'মুহূর্তমাত্র দেরি না করে আপনারা সবাই খোঁয়াড়বাড়িতে চলে আসুন।' বিপরীত দিক থেকে অচেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আপন মনে বলে উঠলেন, 'এতদিনে তবে রহস্যের পর্দা একটু একটু করে সারে যেতে শুরু করেছে।'

জ্যাপের ওপর থানাট হাউস রক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে দ্বীপবাসীরা দলবেঁধে খোঁয়াড়বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। হার্বাট খোঁয়াড়বাড়িতে পৌঁছেই এক ছুটে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। দেখলেন, টেবিলের ওপর একটা চিরকুট পড়ে। ইংরেজিতে একটা ছত্র লেখা—

'নতুন তার অনুসরণ করে চলে আসুন।'

তিনি এক লাফে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, পুরনো তারের গায়ে নতুন তার রাখা হয়েছে।

দ্বীপবাসীরা চিঠির বক্তব্য অনুযায়ী নতুন তার অনুসরণ করতে করতে সমুদ্রের ধারে হাজির হলেন। তারটা সমুদ্রের জলে নেমে গেছে দেখা গেল।

দ্বীপবাসীরা তা একেবারেই মুম্বড়ে পড়লেন। পরমতম হিতাকাজকীর খোঁজে শেষপর্যন্ত সমুদ্রের জলে ডুব দিয়ে হবে নাকি?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর পরামর্শে সবাই ভাঁটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। ভাঁটার টানে জল নেমে গেলে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তারই অপেক্ষায় থাকা। কোনো গুহার মুখও ভেসে ওঠা অসম্ভব নয়।

একটু বাদেই তুমুল ঝড় আর মুঘলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কড়া কড়া শব্দে বাজও পড়ছে মুহূর্তে।

জোয়ারের জল নেমে যেতেই সত্য সত্যই একটা গুহার মুখ দ্বীপবাসীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দেখা গেল টেলিগ্রাফের তারটা সোজা গুহার ভেতরে ঢুকে গেছে। গুহার মুখে কালো একটা বস্তু দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেটা ধরে এক হেঁচকা টান দিলেন। একটা লোহার নৌকার গলুই এগিয়ে এল। সবাই টানাটানি করে নৌকাটা বের করে ফেললেন। মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সবাই নৌকাটায় চেপে দ্রুত গুহার ভেতরে ঢুকে গেলেন। নৌকা এগিয়ে চলল অন্ধকার গুহা পথে।

কিছুদূর যেতেই নৌকারোহী দ্বীপবাসীরা সামনে অত্যাশ্চর্য একটা আলো দেখতে পেলেন। সেটাকে বৈদ্যুতিক আলো বলেই মনে হল।

আরও কিছুদূর যেতেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং দেখলেন অতিকায় একটা মাছের মতো বস্তু। মাছের মতোই তার দুদিক সরা। তাঁদের মাকু যেমনটা হয়ে থাকে।

অতিকায় বস্তুটাকে দেখেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং সোলাসে বলে উঠলেন—‘হ্যাঁ, আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীর খোজ পাওয়া গেছে। পেয়েছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা বুঝতে আমার মোটেই ভুল হয় নি। হ্যাঁ, ইনিই তিনি! পেয়েছি! পেয়ে গেছি!’

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে লম্বা একটা সিঁড়ির গায়ে নৌকাটা ভেড়ালেন। সবাই ব্যস্তপায়ে সিঁড়িটা বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং বিনীতস্বরে নিবেদন করলেন—‘ক্যাপ্টেন নিমো, আপনি আমাদের ডেকেছেন? আমরা এসেছি। ক্যাপ্টেন, এই যে আমরা।’

মাথা নিচু করে গভীর ভাবনায় তলিয়ে থাকা ক্যাপ্টেন নিমো ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। গভীরস্বরে উদ্ভাষণ করলেন, ‘—না, আমার কোনো নাম নেই। আজ আমি নামগোত্রহীন বৃদ্ধ—’

‘আপনার কিছুই আমার অজানা নেই ক্যাপ্টেন। আমি আপনাকে চিনি, জানিও সবই।’

‘জানলেই বা এখন আর ক্ষতি কী? আমার তো সময় ঘনিয়ে এসেছে। মরতে বসেছি।’ মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন হার্ডিংয়ের দিকে নিস্তেজ চোখের মণি ঘুরিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, ‘আপনি কি আমার নাম জানেন? বলুন তো, কী নাম আমার?’

‘ক্যাপ্টেন নিমো। ঠিক কি না? আর আপনার এই অত্যাশ্চর্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য ডুবোজাহাজটার কথাও আমার অজানা নয়।’

‘হ্যাঁ, আমার প্রিয়তম বাহন এই নোটিলাসে চেপে আমি অনেকগুলো বছর অতিবাহিত করেছি। একটা কথা, পৃথিবীর সঙ্গে তো দীর্ঘদিন আমার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। বলুন তো, আমার অজ্ঞাতবাসের খবরটা কে প্রচার করেছে?’

‘তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক তো নেই—ই এমনকি তার ওপর কোনো কর্তৃত্বও আমার নেই। তাকে বিশ্বাসঘাতক জ্ঞান—’

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ক্যাপ্টেন নিমো চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন, ‘বুঝতে পেরেছি। ষোল বছর আগেকার কথা। এক ফরাসি ভদ্রলোক, নাম তাঁর প্রফেসর অ্যারোনান্স, তখন আমার এই ডুবোজাহাজে এসেছিলেন। তিনিই আমার অজ্ঞাতবাসের খবরটা চাউর করেছেন। আমি তো নিশ্চিত ছিলাম, নরওয়ের ঘূর্ণিপাকে পড়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।’

‘অবশ্যই না। তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। আর স্বদেশে ফিরে আপনার কীর্তিকাহিনী সম্বলিত ‘টুয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস্‌ আন্ডার দ্য সি’ নামে এক বই লিখে জনসমাজে প্রচার করেন।’

‘সে যা—ই হোক না কেন, সাত মাসের বিশ্বয় ভরা কীর্তিকথাই আপনাকে বিশ্ববাসীর কাছে অমর করে রাখবে ক্যাপ্টেন নিমো।’

চোখে-মুখে তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে তুলে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, ‘অমর চিরজীবী স্বরণীয়—তাই না? কেন স্বরণীয়? সমাজবিরোধী, সভ্যমানুষের চরমতম শত্রু জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত হিসাবে স্বরণীয় ঠিক কি না?’

‘ক্যাপ্টেন নিমো আপনার কাজের সামলোচনা করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া আপনার অতীত কাহিনীও আমার অজানা। কেবল এটুকুই উপলব্ধি করেছি, আমরা লিঙ্কন দ্বীপে পা দেয়ামাত্র একজন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, যথার্থ বন্ধু প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্কটমুক্ত করার জন্য তৎপর। আর সে পরোপকারী মহাশ্বার স্নেহ মায়া মমতার জন্যই আমরা এতগুলো প্রাণী আজও প্রাণে বেঁচে রয়েছি। আর সে হিতাকাঙ্ক্ষী, অকৃত্রিম বন্ধুটি হচ্ছেন আপনি।—হ্যাঁ, আপনি ছাড়া আর কেউ নন।’

‘হ্যাঁ, আমিই সে ব্যক্তি। আমার জীবনকথা আপনার কাছে তুলে ধরছি। সবকিছু শুনে আমার সম্বন্ধে যা ধারণা করার করবেন।’

ক্যাপ্টেন নিমো এবার যা বললেন তার মর্মার্থ হল—তিনি একজন ভারতবর্ষীয়। বৃন্দেলখণ্ডের রাজকুমার। রাজকুমার ডাক্তার ছিল তাঁর ছাত্র, ছয় থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞান, শিল্পবিদ্যা আর সাহিত্যচর্চা করে অতিবাহিত করেন। ভবিষ্যতে স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। নিজেকে সেভাবেই তৈরিও করছিলেন।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের জোয়ার বইতে লাগল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। রাজকুমার ডাক্তারও বিদ্রোহের সামিল হলেন। তাঁর বীরত্বের ব্যাপার চাম্ফুস করে ইংরেজ সরকার তাকে জ্যাক্স অথবা মৃত ধরিয়ে দেয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করলেন। উপায়ান্তর না দেখে তিনি আত্মগোপন করলেন। বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ দেশগুলোকে পূর্ণ দখল করে ফেলল। বিদ্রোহী বীর রাজকুমার ডাক্তার বিশ জন অনুগত সহকর্মীকে নিয়ে বৃকে অনন্ত হাহাকার আর জমাটবীধা ঘৃণা নিয়ে গা-ঢাকা দিলেন।

শ্বেতাঙ্গ মহাপুরুষরা যেখানে তাঁর টিকির নাগালও পাবে না এমন শান্তির স্থান সাগরের বুকে আশ্রয় নিলেন তিনি। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এক নির্জন নিরালো দ্বীপে তিনি হঠাৎ হাজির হলেন। অস্ত্র ফেলে সৈনিক হলেন একজন বৈজ্ঞানিক। নিজের পরিকল্পনামাফিক অত্যাশ্চর্য এক ডুবোজাহাজ তৈরি করলেন। তার নামকরণ করলেন ‘নোটিলাস’। অত্যাশ্চর্য পদ্ধতিতে তৈরি এটা। সমুদ্রের জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে ব্যবহার করতে লাগলেন।

নোটিলাসে চেপে ক্যাপ্টেন নিমো সাত সমুদ্র চষে বেড়াতে লাগলেন। কখন সমুদ্রের বুকে আবার কখনো—বা জলের তলা দিয়ে অগ্ন্যস্র হতে হতে ক্যাপ্টেন নিমো কত সব জাহাজভুবির ধনরত্ন উদ্ধার করেছেন তার শেষ নেই।

১৭০২ সালে কোটি কোটি মোহর ও মূল্যবান সন্ধান নিয়ে স্প্যানিশ জাহাজ সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন নিমো পরবর্তীকালে সেগুলো উদ্ধার করে স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দরাজহাতে বিতরণ করলেন। তবে সতর্কতার সঙ্গে নিজের নাম ও পরিচয় গোপন রাখলেন।

সেটা ছিল ১৮৬৬ সালের শেষ। ডুবোজাহাজ নোটিলাসে এসে আশ্রয় নিলেন ফরাসি প্রফেসর অ্যানোন্স। সঙ্গে এল তাঁর এক ভৃত্য ও এক যুবক জেলে। তাঁরা নোটিলাসকে ধ্বংস করার গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। তাঁদের দূরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে ক্যাপ্টেন নিমো তিনজনকেই কয়েদিদের সঙ্গে আটকে রেখেছিলেন।

১৮৬৭ সালের ২৩ জুন সুযোগবৃত্তে তাঁরা তিনজনই নোটিলাসেরই এক নৌকায় চেপে পালিয়ে যান। নোটিলাস তখন নরওয়ের কৃষ্ণ্যত ঘূর্ণিপাক মেলস্টেমের এলাকায় অবস্থান করছিল। অতএব ক্যাপ্টেন নিমো নিঃসন্দেহ হলেন তাদের তিনজনেরই সলিলসমাধি হয়েছে।

ঈশ্বর সহায় থাকলে মারে সাধ্য কার? তারা প্রাণে বেঁচে গেলেন। নিজের দেশে ফিরে প্রফেসর অ্যানোন্স ক্যাপ্টেন নিমোর বিচিত্র কাণ্ডকারখানা সম্বলিত 'টুয়েন্টি থাউজেন্ট লগিস আন্ডার দ্য সি' নামক বইটি লেখেন।

ক্যাপ্টেন নিমো এখন নিঃসঙ্গ—একবারেই একা। তাঁর সহকর্মীরা এক-এক করে সবাই মারা গেছে। লিঙ্কন দ্বীপের এ গহ্বরে নোটিলাস দুবছর কাটাচ্ছে। আগ্নেয়গিরির লাভা জমে জমে গহ্বরটার মুখ ছোট করে দিয়েছে। নোটিলাসের বেরোবার পথ বন্ধ। তাই এখানেই তিনি মৃত্যুর জন্য ধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেন নিমো দেখলেন, অতিকায় একটা বেলুনে চেপে কয়েকজন লোক লিঙ্কন দ্বীপে পড়ছেন। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে ক্যাপ্টেন নিমো তাকে কাঁধে তুলে গর্তটার মধ্যে রেখে দিয়ে এসেছিলেন, ভাবলেন, পাঁচজন দ্বীপবাসীর কাছে নিজেকে গোপন রাখবেন। তিনি তাদের গতিবিধি লক্ষ করে বুঝলেন, লোকগুলো সং, নিষ্ঠাবান, খুব উদ্যমী ও পরিশ্রমী। ডুবুরির পোশাক পরে থানাইট হাউসের কুয়োয় ঢুকে তিনি মাঝে মাঝেই তাঁদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নীরবে শুনতেন। এভাবেই তিনি জানতে পারলেন, তাঁরা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশছাড়া হয়েছেন। তাই মুক্তিকামী উদারহৃদয় ক্যাপ্টেন নিমোর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হলেন। এবার থেকে তিনি তাঁদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে বিভিন্নভাবে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো দ্বীপবাসীদের বিশেষ করে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে কিছু জরুরি উপদেশ দেয়ার জন্য এখানে, নোটিলাসে ডেকে এনেছেন।

ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর অতীতকাহিনী শেষ করে এবার বললেন, 'আমার কথা তো শুনলেনই। আবার বলুন তো আমার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা জন্মাল?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বুঝতে পারলেন ক্যাপ্টেন নিমো বিশেষ একটা জাহাজডুবির কথা জানতে অগ্রহান্বিত। ডুবোজাহাজ নোটিলাস প্রচুরসংখ্যক শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাসহ যে জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার কথা। ব্যাপারটা নিয়ে সভ্যসমাজে সমালোচনার জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। ফলে ক্যাপ্টেন হার্ডিং তাঁর প্রশ্রুটাকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেলেন। তিনি কেবল বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার শারীরিক অবস্থা দেখে আমি সত্যি আতঙ্কিত। আপনার মতো একজন হিতাকাঙ্ক্ষীকে হারালে আমাদের আপশোধের সীমা থাকবে না। নোটিলাসের বাইরে নিয়ে গেলে হয়ত আপনার শরীরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে—'

‘তা কী করে হয়, বলুন তো? নোটিলাসের সঙ্গে আমার আত্মিক যোগ রয়েছে। এখানেই আমি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আগামীকাল আমি পৃথিবী ছেড়ে যাব।’ কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে আবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমার একটা অনুরোধ আপনাদের রাখতে হবে। রাখবেন তো? আমার মৃত্যুর পর আপনাদের এ দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে হবে। রাজকুমার ডাক্তারের এক বাস্তব হীরা আপনার হাতে তুলে দিলাম। সময় সুযোগমতো সং কাজে এগুলো ব্যয় করবেন। আর কিছু সমুদ্রের মহামূল্য মোতি দিচ্ছি। আমার শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে নৌকায় উঠলে দেখতে পাবেন, নোটিলাসের গায়ে সামনের দিকে দুটো ছিদ্র আছে, তাদের মুখ খুলে দিলে নোটিলাসের তলদেশের জলাধারে হুড়হুড় করে জল ঢুকবে। আমার মৃতদেহ নিয়ে নোটিলাস ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে থাকবে। এবার ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে মিনতির স্বরে বললেন, 'আমার অন্তিম বাসনা পূর্ণ করবেন, কথা দিচ্ছেন তো?'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং ঘাড় কাত করে তার কথার সম্মতি জানানলেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন নিমো পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দ্বীপবাসীরা চোখ মুছতে মুছতে হাঁটু গেড়ে বসে পরমপিতার কাছে তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করলেন।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশ অনুযায়ী ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাজ করলেন। তাঁর নশ্বর দেহটাকে বুক নিয়ে নোটিলাস ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং এবং তাঁর সহকর্মীরা কঠোর পরিশ্রম করে বিশালায়তন নৌকাটার তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

১৮৬৯ সালের ১ জানুয়ারি।

প্রকৃতি হঠাৎ ভীষণ ক্ষেপে গেল। ঝড় ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাতের তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। বজ্রপাতে গাছপালা জ্বলে পুড়ে ঝাঁক হয়ে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন হার্ডিং লক্ষ করলেন, এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে পাতালপুরীর

যেন একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। নইলে আগ্নেয়গিরিই বা এমন করে ফেপে উঠবে কেন? খোঁয়াড়ের দিকে গলিত লাভা ও ধোয়ার কুণ্ডলী প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে চলেছে। অন্তিরচিণ্ড বন্যজন্তু জানোয়াররা বিকট আর্তনাদ করতে করতে ছুটোছুটি দাপাদপি করছে।

সকাল সাতটার কাছাকাছি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। জঙ্গলে আগুনের বন্যা শুরু হল। এমনকি খোঁয়াড়ে যাবার পথও বন্ধ হয়ে গেল।

লেকের জল একমাত্র ভরসা। জল শুকিয়ে গেলে পানীয় জলের অভাবে দ্বীপবাসীদের তৃষ্ণায় বুক চাপড়াতে হবে। মরতে হবে অসহায়ভাবে।

কিছুক্ষণ কাটতে না কাটতে পাহাড় থেকে পাথরের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আর আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার স্রোত তো রয়েছেই।

ক্যাপ্টেন হার্ডিং আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হায়! তোমার হাঁ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছ! তাড়াতাড়ি যন্ত্রপাতি নিয়ে এসো। বাঁধ দিয়ে লাভার স্রোত আটকাতে হবে। আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ব্যস্ত হাতে পাথরের চাঁই সাজিয়ে প্রায় তিন ফুট উঁচু করে বাঁধ দিয়ে দিল।

জোর কদমে নৌকা তৈরির শেষ কাজটুকু তারা সেরে ফেলল। কুড়িদিনের কাজ মাত্র দুদিনে সেরে ফেলল। আবার আবার লাভার স্রোত বইতে লাগল। এবার উত্তপ্ত গলিত লাভা প্রসপেক্ট হাউস পর্যন্ত ধেয়ে এল। দ্বীপবাসীরা, এমন কি টপও পর্যন্ত আতঙ্কে মুগ্ধে পড়ল। একসময় প্রসপেক্ট হাউস আর থানাইট হাউস উভয়ই লাভার স্রোতের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল।

দ্বীপবাসীরা সকাল হলেই নৌকা জলে ভাসাবার পরিকল্পনা নিলেন। কিন্তু হায়! সকাল আর হতে পারল না। তার আগেই প্রচণ্ড শব্দসহ অগ্নিবাম্প প্রায় হাজার তিনেক ফুট উঁচু হয়ে আকাশের দিকে উঠল, চারদিক ছেয়ে ফেলল। সমুদ্রের তলদেশের ফাটল দিয়ে লাভার স্রোত ঢোকার প্রচণ্ড শব্দ করে জল ওপরের দিকে ছিটকে ছিটকে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। প্রবল বাষ্পবৃষ্টি হতে লাগল।

পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে প্রবল বেগে ওপরের দিকে উঠে পর মুহূর্তেই সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। সৃষ্টি ধ্বংস করার চক্রান্ত।

দ্বীপবাসীরা উপায়ান্তর না দেখে জলে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হলেন। একটুকরো পাথর ছাড়া লিঙ্কন দ্বীপের কিছুই যে আর অব্যাহতি পেল না।

দ্বীপবাসীরা সমুদ্রের ভয়ঙ্করতাকে অগ্রাহ্য করে সাঁতারে চলেছেন। কিন্তু বেচারা জ্যাপ একটা ফাটলে আটকে পড়ে অসহায়ভাবে প্রাণ দিল। দ্বীপবাসীরা কোনোক্রমে সাঁতারে পর্বতের অবশিষ্ট অংশটুকুতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ নয় দিন অনাহারে অনিদ্রায় সেখানেই কাটিয়ে দিতে বাধ্য হলেন সবাই। পাথরের খাঁজে যেটুকু বৃষ্টি জল জমেছিল তা ভাগাভাগি করে এতগুলো প্রাণী পিতৃদত্ত প্রাণরক্ষা করলেন। আয়ারটন ছাড়া বাকি সবাই কাহিল হয়ে পড়লেন।

২৬ মার্চ।

আয়ারটন বিষণ্ণ মনে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে রইল। একসময় সমুদ্রের বুকে কালো একটা বিন্দুর মতো দেখতে পেল। ব্যাপারটা তার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। বিন্দুটার আকৃতি ক্রমে বড় হতে লাগল। ক্রমে আরো বড়—আরো—আরো। হ্যাঁ, তার অনুমান অত্রান্ত। জাহাজ—হ্যাঁ, জাহাজই বটে। পালতোলা জাহাজ। ডানবান জাহাজ। অকস্মাৎ আয়ারটন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

আয়ারটনের যখন সংজ্ঞা ফিরল তখন সে দেখল, সুসজ্জিত কেবিনে নরম বিছানার ওপর শুয়ে।

রবার্ট গ্রান্ট কী করে জানতে পারলেন, আয়ারটন লিঙ্কন দ্বীপে বাস করছেন।

দ্বীপবাসীদের কৌতূহল দমন করতে গিয়ে রবার্ট গ্রান্ট বললেন, 'চরম উত্তেজনা ও আতঙ্কে বোধ হয় আপনাদের স্মৃতিভ্রম ঘটছে। জনাব, আপনারাই তো ট্যাবর দ্বীপে বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়ে এসেছিলেন।'

ক্যাপ্টেন হার্ডিং—এর মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। একসময় ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'তবে এটা নির্ধাৎ ক্যাপ্টেন নিমোর কাজ। তিনি আমাদের অজান্তে এমন একটা কাজ করে এতগুলো প্রাণীর জীবন রক্ষা করে গেছেন।'

উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে দ্বীপবাসীরা স্বদেশে ফিরে এলেন। ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরা-মোতি বিক্রি করে নতুন একটা লিঙ্কন দ্বীপ গড়ে তুললেন তারা। একটা মাত্র থানাইট পাথরের টুকরোর ওপর গড়ে উঠল ক্যাপ্টেন নিমোর চিরশান্তির নীড়, তার সমাধিস্তম্ভের সাক্ষ্য বহন করতে লাগর সদ্য গড়ে তোলা লিঙ্কন দ্বীপ।

ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

১৮০০ সালের তেসরা ডিসেম্বর।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সকালে এক জরুরি কাজের তাগিদে বাড়ি থেকে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

জেমস স্টার যখন কোর্টের শেষ বোতামটা লাগাতে ব্যস্ত ঠিক তখনই সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। ব্যস্ত হয়ে দরজার শিটকিনি খুলতেই ডাক পিওন সুপ্রভাত জানিয়ে বাদামি রঙের একটা খাম তাঁর হাতে ধরিয়ে দিল।

জেমস স্টার হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে সিলমোহরের দিকে একবার নজর ফিরিয়ে নিলেন। হ্যাঁ, সকালের ডাকেই চিঠিটা এসেছে। খামটার গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লেখা—‘মি. জে. স্টা—ইঞ্জিনিয়ার (গ্রিশ, ক্যানন গেট, এডিনবরা) সমীপে’—খামটার সামান্য অংশ ছিড়তেই জেমস স্টার দেখলেন, হালকা আকাশী রঙের এক চিলতে কাগজ ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে।

বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড চিঠিটা লিখেছেন। চিঠির বক্তব্য—‘মি. জেমস স্টার, আগামীকাল অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে এলে (ডোচার্ট পিট, ইয়ারো শ্যাফট) এমন একটা ব্যাপার সম্বন্ধে অভিহিত হতে পারবেন, যা আপনার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এবং আকর্ষণীয় বিবেচিত হবে।’

সাইমন ফোর্ড চিঠিতে এও জানালেন, প্রাক্তন ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের ছেলে হ্যারি ফোর্ড মি. জেমস স্টারের অপেক্ষায় ক্যালানডার টেবিলে উপস্থিত থাকবে। আর বিশেষ একটা সনির্বন্ধ অনুরোধও করেছেন, তিনি যেন এ গোপন অনুরোধের ব্যাপারটা কারো কাছেই ফাঁস না করেন।

জেমস স্টার চিঠিটা গোড়া থেকে শেষপর্যন্ত বারবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়লেন। তাঁর মধ্যে কেমন যেন একটা অবর্ণনীয় মানসিক উত্তেজনা ভর করল। বারবার পড়েও চিঠিটার বক্তব্যে সামান্যতমও প্রবঞ্চনার আভাস লক্ষিত হল না। অর্থাৎ চিঠিটার বক্তব্যের মধ্যে তাঁর মনে বিরাগ কোনো চিন্তারই উদয় হল না। ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড দীর্ঘদিনের সহকর্ম হিসাবে তাঁরা কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করেছেন।

ইঞ্জিনিয়ার-জীবনের পঞ্চাশটা বসন্ত পেরিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাঁকে একনজরে দেখলে চল্লিশ বছরের বেশি বয়স মনেই হয় না। ব্রিটেনে যারা পদের অবদানে উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছেন, ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তাঁদের অন্যতম বিবেচিত হন।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অঙ্ককার পাতালপুরী থেকে কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে তুলে আনার ওপরে নির্ভর করে আজকের যে অপ্রত্যাশিত সাফল্য, তার মূলে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনির ব্যাপারে তাঁর নাম আগে উল্লেখ করতে হয়।

দিনের পর দিন কয়লাখনির সংখ্যা বৃদ্ধি আর সবদিক থেকে উত্তোলনের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে কয়লার চাহিদাও বেড়েই চলেছে। আর সে চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বহু খনি নিঃস্ব—একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। অনবরত কালো হীরা জোগান দিয়ে অ্যাবারফয়েল আজ সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। আর আজ সেটা একবারেই অবহেলিত।

আজ থেকে দশ বছর আগের ঘটনা। শেষদিন একটন কালো হীরা উপহার দিয়ে অ্যাবারফয়েল রিজুতা ঘোষণা করে। বাধ্য হয়েই খনির মালিক পাতালপুরী থেকে সাধ্যমতো যন্ত্রাংশ তুলে নিয়ে এলেন। কয়লা বহন করার ঠেলাগাড়ি, লিফটের ঝাঁচা আর বাতাস সরবরাহের নল প্রভৃতি পাতালপুরীর গহবর থেকে তুলে এনে পর্বতপ্রমাণ উঁচু করে পাজা করে ফেলে রেখেছেন।

আজ অতিকায় বীভৎস চেহারাদারী বহুপদ জানোয়ারের কঙ্কালের মতো পড়ে রয়েছে নিঃস্ব-রিজুত যক্ষপুরী কয়লাখনিটা। আচমকা একনজর দেখলেই আঁতকে উঠতে হয়। খনিগর্ভ থেকে যাবতীয় যন্ত্রপাতি তুলে আনলেও একটামাত্র নড়বড়ে সিঁড়ি আজও মায়া কাটিয়ে খনি ছেড়ে আসতে পারে নি। অব্যবহৃত—অবহেলিত অবস্থায় সেটা আজও একই জায়গায় পড়ে ধুকছে।

শেষের সেদিনটার স্মৃতি জেমস স্টার-এর অন্তরের গভীরে আজও জ্বলজ্বল করছে। প্রবেশপথের একধারে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ডোচার্ট পিটের ওভারম্যান সাইমন বোর্ড (তখন পঞ্চাশ বছর বয়স্ক) আর কয়েকজন বিভাগীয় ম্যানেজার তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবার মুখেই বিষণ্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর অন্তরের অন্তস্থলে অস্তহীন হতাশা আর হাহাকার। সবাই মাথা থেকে টুপি নামিয়ে হাতে ধরে রেখেছেন। চোখের তারার নীরব ভাষা—খনি নিঃস্ব রিজু। এক টুকরো কয়লাও অবশিষ্ট নেই। সে বছর খনির কয়লা কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে লাভ হয়েছিল তা কর্মীদের মধ্যে সমহারে বিলি করে দেয়া হয়। যাতে নতুন চাকরি জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত অন্তত রুটির জোগাড় তাদের হতে পার। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সবাইকে চিরদিনের মত বিদায় সম্বাধন জ্ঞাপন করলেন। বিদায় মুহূর্তে তাঁর মুখ থেকে কিছু শোনার জন্য সবাই অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বিষণ্ণমুখে শ্বেতাজড়িত ভাঙা ভাঙা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, ‘বন্ধুগণ, আমাদের বিচ্ছেদের মুহূর্ত আসন্ন। যে কয়লাখানি একদিন আমাদের সবাইকে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার ডোরে বেঁধে কাজে নিযুক্ত করেছিল আজ সে নিঃস্ব রিজু। দীর্ঘদিন যোজাখুজি করেও আমাদের নিদারুণভাবে ব্যর্থ হতে হয়েছে—কিন্তু কোনো স্তরেরই হদিস পাওয়া যায় নি। এইমাত্র ডোচার্ট পিট থেকে শেষ চাঁইটাকেও তুলে আনা হয়েছে, আপনারা তো দেখলেনই।’

খনি শ্রমিকরা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে বিদায় জানিয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে গেল। অন্তহীন অন্ধকার আর নীরবতা বুকে নিয়ে যক্ষপুত্রী কয়লাখনিটা পড়ে রইল।

জেমস স্টার চোখের তারায় ওঁদাসিন্যের ছাপ একে অন্ধকার দিগন্তের দিকে নির্বাক ও নিশ্চল নিখরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

জেমস স্টার সখিৎ ফিরে পেয়ে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, তার পাশে একজন দাঁড়িয়ে। না, একজন অবশ্যই নয়, দুজন। তাদের একজন ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড আর দ্বিতীয়জন এক কিশোর। তার ছেলে, বড়জোর বছর পনের তার বয়স। সে কিছুদিন কয়লাখনিতে কাজ করেছিল।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাদের দিকে তাকালেন। ওভারম্যান হাত তুলে বললেন, 'গুডবাই। মি. স্টার, গুডবাই।'

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার তার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বিষণ্ণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'মি. স্টার, এডিনবরা তো অনেক দূরের পথ। ডোচার্ট পিট আর এডিনবরার মধ্যে বিস্তর ফারাক।'

'সে কী!' অনেক দূর বলছ যে বড়! তুমি তবে এবার কোথায় মাথা গুঁজছ, বলবে কি?'

'এখানে।' এখানেই রয়ে যাচ্ছি।'

'অন্ধকার এ-যক্ষপুত্রীতে একা থাকবে, বলছ কী!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে সাইমন ফোর্ড এবার বললেন, 'তা হোক গে, তবু এখানেই থেকে যাব। বৌ-ছেলে নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না, এখানেই থাকব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।'

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার অনন্যোপায় হয়ে এখানেই কথার ছেদ টানলেন, 'তবে দেখ চেষ্টা করে যদি থাকতে পারো।'

কয়লাখনির বাইরে প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। জেমস স্টারকে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে তবে পাড়ি পৌছোতে হবে। তাই অস্তিত্ব হৃদয় সহকর্মী বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে বিষণ্ণমুখে উচ্চারণ করলেন, 'বিদায় সাইমন, বিদায়। এখন তবে আসি।'

সাইমন শোকে মুহূর্তমান হয়ে বললেন, 'বিদায়। মিঃ স্টার, দয়া করে একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের আবার এ অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভেই দেখা হবে।'

জেমস স্টার নিঃসন্দেহ যে, সাইমন-এর দুরাশা কোনোটাই পূরণ হবে না, হতে পারে না। তবু একটা বুড়ো মানুষকে আশাহত করে, মনে ব্যথা দিয়ে কী লাভ? এরকম ইচ্ছা তাঁর আদৌ ছিল না। সবাই অলক্ষে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এবার বিষণ্ণকণ্ঠে তাকিয়ে থাকা কিশোর ছেলেরা সামনে তার বাবার হাত দুটো আবেগভরে জড়িয়ে ধরলেন। পরমুহূর্তেই হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে ধীর-মস্থর পায়ে নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যে দশ-দশটা বছর পেরিয়ে গেছে। এ দীর্ঘ কয়েক বছরে জেমস স্টার তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড-এর কাছ থেকে চিঠিপত্র তো দূরের কথা, এমন কি কোনো খবর পর্যন্ত পান নি।

এই প্রথম—এতদিন পর জেমস স্টার সাইমন ফোর্ড-এর কাছ থেকে জঠরশূন্য পরিত্যক্ত কয়লাখনিতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

জেমস স্টার চিঠিটার ওপর চোখের মশি দুটো নিবন্ধ রেখেই ভাবেন—'আর দুটো ছত্র লিখলেই তো ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করে নেয়া যেত। সাইমন ফোর্ড অ্যাবারফয়েল কয়লাখনির গর্ভে এমন কিসের সন্ধান পেল যা তাঁর কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে? আসল ব্যাপারটা কী? বুড়ো ওভারম্যান হঠাৎ করে আবার কয়লার স্তর আবিষ্কার করে ফেলেছে নাকি? মুহূর্তকাল অস্থিরভাবে ভেবে নিয়ে আবার স্বপ্নাত্তিক করলেন—'নতুন কয়লার স্তর আবিষ্কার? কিন্তু তা কী করে হতে পারে! জঠরশূন্যখানি আবার কোথেকে কয়লা দেবে?'

চিঠিটা হাতে করে কয়েকবার অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে তিনি আবার ভাবতে লাগলেন, 'কই, চেষ্টার সামান্যতম ক্রটিও তো তখন তিনি রাখেন নি। জঠরশূন্য, একেবারে নিঃস্ব রিক্ত কয়লাখনির প্রতিটা শিরা-উপশিরা তিনি হল্যো হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, নতুন কোনো কয়লা স্তরের হৃদিস যদি মেলে। বারবারই ব্যর্থ হতে হয়েছে তাঁকে। অনন্যোপায় হয়ে তিনি অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভ ছেড়ে উঠে এসেছেন। ব্যস, অ্যাবারফয়েলের সঙ্গে সম্পর্ক চিরদিনের মতো তিনি মিটিয়ে এসেছেন। কিন্তু আজ, এতদিন পর কেন আবার এ-চিঠি? কেন অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ নিয়ে চিঠিটা তাঁর কাছে হাজির হল?'

হ্যাঁ, খনির কাজে, বিশেষ করে কয়লাখনির ব্যাপারে সাইমন ফোর্ড-এর দক্ষতা বাস্তবিকই অতুলনীয়। দীর্ঘদিন ধরে তিলে তিলে অর্জিত তাঁর অভিজ্ঞতাকে তো আর অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

অ্যাবারফয়েল খনিগর্ভ ছেড়ে আসার পর থেকে জেমস স্টার ওভারম্যান সাইমন ফোর্ডের কোনো খবরই জানেন না। তিনি সপরিবারে কোথায় মাথাগুঁজে দীর্ঘ দশ বছর কাটিয়েছেন, এটা তাঁর কাছে একেবারেই অজানা। দীর্ঘদিন পর পাঠানো কাগজের চিলতেটায় তিনি লিখেছেন, 'সাইমন ফোর্ড তাঁর জন্য ইয়ারো শ্যাফটে অপেক্ষা করবেন। আর ক্যালানডার স্টেশনে তাঁকে স্বাগত জানাতে, থাকবে তার ছেলে হ্যারি।'

জেমস স্টারের পক্ষে বুড়ো সাইমন ফোর্ড-এর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ইয়ারো শ্যাফটে তিনি অবশ্যই যাবেন।

জেমস স্টার সারাটা দিন এক অকথিত অস্থিরতার মধ্যে কাটালেন। দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মধ্যে এতটুকু দ্বিধা, এতটুকু সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে নি যার ফলে তিনি চিঠিটার বক্তব্যকে নিছক ভাওতা জ্ঞান করে উড়িয়ে দিতে পারেন।

চোখের পলকে একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। ডাক পিওন সন্ধ্যা ছয়টার ডাকে আসা আর একটা পুরু ও খসখসে খাম জেমস স্টারের হাতে দিয়ে গেল।

খামটার ওপরে ঠিকানাটা বড় বড় হরফের লেখা। কাঁচা হাতের লেখা। অবশ্যই স্বল্প শিক্ষিত কারো লেখা, বুঝতে অসুবিধা হল না।

খামটা হাতে পাওয়া মাত্র জেমস স্টার-এর মধ্যে এক অবর্ণনীয় অস্থিরতা ভর করল। ব্যস্ত হাতে খামের মুখটা ছেঁড়াভাবে অথল্লৈ রক্ষিত বহু পুরনো একটা কাগজের টুকরো ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। টানটানি করে খামের ভেতর থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে চোখের সামনে ধরতেই তাঁর চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখের মণি দুটো চিঠিটার ওপর ব্যস্ততার সঙ্গে বুলাতে লাগলেন। অনভ্যস্তহাতে লেখা রয়েছে—“ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করাই সার হবে। পরিশ্রম কিন্তু একেবারেই বৃথা যাবে।”

চিঠিটার ওপর চোখের মণি দুটো নিবন্ধ রেখেই তিনি এবার ভাবতে লাগলেন—তবে তো সাইমন ফোর্ডের চিঠিটা একেবারেই অর্থহীন মনে হচ্ছে। ছোট্ট চিঠিটার তলায় কারো নাম বা স্বাক্ষর কিছুই নেই। আর ইচ্ছাকৃত, সতর্কতার সঙ্গেই পত্রলেখক এ ব্যাপারটাকে এড়িয়ে গেছে, তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না।

জেমস স্টার সাইমন ফোর্ডের চিঠিটা পাওয়ার পর থেকে যে নিদারুণ ও নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে সারাটা দিন কাটিয়েছেন তা অপ্রত্যাশিতভাবে ছোট্ট এ চিঠিটা মুহূর্তের মধ্যেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

জেমস স্টার সদ্য হাতে পাওয়া চিঠিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সিলমোহরটা দেখতে লাগলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ খামটার গায়েও তো অ্যাবারফয়েল ডাকঘরের সিলমোহর অঙ্কিত রয়েছে। তবে এটা অবশ্যই বুড়ো সাইমনের হাতের লেখা নয়। তার হাতের লেখা তিনি খুব ভালোই চেনেন।

অস্থিরচিত্ত জেমস স্টার কয়েকবার ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করে একসময় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আবার তিনি আপনমনে বলতে লাগলেন, ‘চিঠিটা যে-ই লিখুক, সে এমন একজন যে প্রথম চিঠিটার বক্তব্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। এটা তবে কার লেখা চিঠি? এমন একটা উড়োচিঠি দেয়ার অর্থই বা কী? কী তার উদ্দেশ্য? কী-ই বা চায়? এমন কি গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে ছোট্ট এ চিঠিটাকে?’

জেমস স্টার অকস্মাৎ নতুন করে গভীর ভাবনায় ডুবে গেলেন।

তিনি আবার স্বগতোক্তি করলেন, ‘সকালের ডাকে আসা চিঠিটা কি তবে সত্য সত্যই অর্থহীন? কোন মূল্যই কি তার নেই? নাকি এ চিঠি দুটোকে কেন্দ্র করে কোনো জটিল রহস্য সংগোপনে কাজ করে চলেছে?’

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে তিনি এবার বিপরীত ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি ভাবলেন, কোন কুচক্রীর দুরভিসন্ধি এর পিছনে অন্তরাল থেকে কাজ চলেছে না তো? তাঁর অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে যাওয়া বন্ধ করার মতলবে নেই তো? বুড়ো সাইমন ফোর্ডের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেয়ার কুমতলব নিয়ে রহস্যময় অজ্ঞাত পরিচয় লোক এ পথটাকেই আঁকড়ে ধরে নি তো?

ধ্যুৎ! তিনি আর ভাবতে পারছেন না। টুকরো টুকরো হাজারো চিন্তার জট ইঞ্জিনিয়ার অদ্রলোকের মাথায় ভর করে তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। বিপরীত বক্তব্যবাহী চিঠি দুটো তাঁর মানসিক অস্থিরতাকে চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। তিনি রীতিমতো উত্তোজিত হয়ে পড়লেও একসময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন—এর পিছনে রহস্যই লুকিয়ে থাক না কেন ডোচার্ট পিটে তিনি অবশ্য যাবেন। ভাঁওতা যদি হয় হোক। অন্তত আসল রহস্যটাতে ভেদ করতে পারবেন।

জেমস স্টার চিঠি দুটোর মধ্যে প্রথম চিঠিটার গুরুত্ব দিয়ে ডোবার্ট পিটে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। আর বিকালের ডাকে আসা চিঠির ব্যাপারটাকে মনব থেকে ধুয়ে মুছে ফেললেন। নিজের মনকেই বলে প্রবোধ দিলেন, সেটা তো নিছকই নামঠিকানাহীন একটি উড়ো চিঠি।

সকাল পাঁচটা। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছেই জানালাটা ফাঁক করে দেখলেন, মুম্বলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলেন যাত্রা করতে সেরি করা উচিত হবে না। পোশাক বদলে বৃষ্টির মধ্যেই তিনি রাস্তায় নেমে পড়লেন।

লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটতে হাঁটতে জেনারেল রেলওয়ে স্টেশনে হাজির হলেন। ভিজে একেবারে জবজবে হয়ে গেছেন। কোটের পকেট হাতড়ে রুমালটা বের করে কাকভেজা মাথাটাকে মুছে নিলেন।

জেমস স্টারের আধঘণ্টা সময় লেগে গেল নিউ হ্যাভেন গ্রামে পৌঁছতে। প্রায় দৌড়েই তিনি ‘ব্রিস অব ওয়েলস’ জাহাজে উঠতে পারলেন। স্টোরিং বন্দরে পৌঁছতে জাহাজটা প্রায় তিন ঘণ্টা সময় নিয়ে নিল।

জাহাজ থেকে নেমে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে তিনি উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে ছুটে স্টেশনের প্রাটফর্মে পা দিলেন। মিনিট পাঁচেক সময়ের মধ্যেই ট্রেন এসে গেল। এক ঘণ্টা ছুটে ট্রেনটা ক্যালানডার স্টেশনে থামল। জেমস স্টার ট্রেন থেকে নেমে প্রাটফর্মে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা নামিয়ে আনলেন। অনুসন্ধিৎসু নজরে চারদিকে চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিলেন। ট্রেন থেকে যেসব যাত্রী নেমেছিল সবাই প্রাটফর্ম ছেড়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে।

এক কিশোর প্রাটফর্মের এক ধারে দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে যাত্রীদের মুখের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে এক সময় জেমস স্টার-এর মুখে তার দৃষ্টি স্থির হল। হ্যাঁ, সে চিনতে পেরেছে, নিঃসন্দেহ হল।

এবার কিশোরটা জোর কদমে এগিয়ে এসে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাঁর মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল।

জেমস স্টার দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন, ‘তুমিই কি হ্যারি ফোর্ড? তুমি কি সাইমন ফোর্ড-এর ছেলে হ্যারি?’

কিশোরটি মুচকি হেসে বলল, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ, মি. স্টার। আমিই হ্যারি ফোর্ড। আপনাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছি।’

‘তাই নাকি হে? আর দেখ দেখি, আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি! বছর দশকেই তুমি এমন বদলে গেছ, লম্বা চওড়া হয়ে গেছ!’

হ্যারি ফোর্ড মাথার টুপিটা নামিয়ে হাতে নিয়ে সলজ্জ বিনয়ের সঙ্গে জেমস স্টারের প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'স্যার, আমি কিন্তু আপনাকে এক নজরে দেখেই ঠিক নিচে ফেলেছি।'

'আরে জলবৃষ্টির মধ্যে টুপিটা মাথা থেকে খুললে কেন!' তার মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিতে দিতে এবার বললেন, 'বিনয় প্রদর্শন করতে গিয়ে বৃষ্টির জল লাগিয়ে তুমি কি সর্দি-জ্বর বাঁধাবে নাকি হে!'

'কি ঠিক করবেন স্যার? বৃষ্টি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, নাকি—'

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই জেমস স্টার বলে উঠলেন, 'না হে, কতক্ষণ আর অপেক্ষা করব। বৃষ্টির যা ধরণ তা কিছুক্ষণের মধ্যে থামবে বলে মনে হচ্ছে না। চলা, হাঁটা শুরু করা যাক।'

পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে জেমস স্টার বললেন, 'তোমার বাবা কেমন আছেন, বলো তো? তোমার মাই বা কেমন—'

'উভয়েই ভালো আছেন।'

'ভালো কথা, তোমার বাবা আমাকে আসার জন্য চিঠি দিয়েছেন, কিন্তু কেন আমাকে তলব করেছেন, জান কিছ?' হ্যারি মুচকি হেসে তাঁর কথার উত্তর দিল—'হ্যাঁ, জানি।'

'কেন বল তো?'

'একটু বাদেই তো বাবার সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন। তাঁর মুখেই না হয় কানঘটা শুনবেন।'

'তোমার বাবা এখন কোথায় আছেন?'

'কেন? খনির ভেতরে। আমরা তো সেখানেই—'

'সে কি হে! খনির ভেতরে! খনি বলতে সে ডোচার্ট পিটের ভেতরে তাই না? তোমরা কি তবে সেখানেই থাক নাকি?'

'হ্যাঁ, সেখানেই। আমরা সে জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই নি। সেই থেকে খনির ভেতরেই আছি।'

'তাই বুঝি! কী অবাক কাণ্ড হে! তোমরা এতদিন সেখানেই ছিলে? খনির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তোমরা খনি ছেড়ে যাও?'

'অন্য কোথায় আবার যাব?'

'মানে খনির বাইরে কোথাও—'

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই হ্যারি এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল, 'অবশ্যই না। একটা দিনের জন্যও আমরা খনি ছাড়ি নি। আমরা নাবা বাকো তো আপনি ভালোই চেনেন স্যার। তাঁর ওই এক কথা, খনিতে জন্মেছি—মরণে যদি হয় খনির ভেতরেই মরব।'

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেমস স্টার এবার বললেন, 'হ্যারি, আমি সবই জানি, বুঝিও সব। খনিটা তো তার কাছে নিছক একটা খনিই নয়, সেটা যে তার জন্ম ও কর্মস্থল। শত কষ্টে পড়লেও মানুষ তার জন্মস্থলের মায়া কাটাতে পারে না।' মুহূর্তের জন্য হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে এবার বললেন, 'হ্যারি, একটা কথা—'

'বলুন।'

'সত্যি করে বলতো, খনির ভেতরে বাস করে তোমরা, মানে তুমি কি সুখী?'

'অবশ্যই, কেনই বা সুখী হব না? আমাদের চাহিদা তো মোটেই বেশি নয়। একেবারেই—' কথা বলতে বলতে তাঁরা ইতিমধ্যেই স্টেশন চত্বর ছেড়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছেন।

এডিনবরা থেকে গ্রাসগুপো পর্যন্ত দশ-বারো মাইল পথ জুড়ে অনেকগুলি কয়লাখনি রয়েছে। আজ তারা প্রত্যেকেই নিশ্ব—রিভ। ধরতে গেলে সবাই পরিত্যক্ত। আজ যে কয়লাখনি অবহেলিত সে অ্যাবারফয়েলের দুই হাজার ফুট গভীরে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বহুবার হানা দিয়েছেন, নতুন কয়লার খোঁজে বারে বারে ছুটোছুটি করেছেন। কিন্তু না, তাঁর প্রয়াস সার্থক হয় নি। বার্ষিকতার জ্বালা বুকে নিয়ে বারবারই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। ব্যস, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি থেকে তিনি জন্মের মতো বিদায়, অবসর নিয়েছেন।

হারিফোর্ডের পাশাপাশি পথ চলতে চলতে তিনি এবার আপনমনে ভাবতে লাগলেন, 'তবে? তবে কি তাঁর অনুসন্ধান কার্যে কোনো ফ্রুটি রয়ে গিয়েছিল? ব্যাপার কী? অ্যাবারফয়েলের জটরে কি তবে নতুন কোনো কয়লার স্তরের হিন্দিস পাওয়া গেছে? কিন্তু এও কি কখনো সম্ভব হতে পারে? আর তা যদি নিতান্তই হয় তবে তো তাঁরই সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা। অ্যাবারফয়েলের প্রতিটা শিরা-উপশিরার সঙ্গে তার তো একেবারে আত্মিক যোগ ছিল, আজ দীর্ঘদিন পরেও সে সম্পর্কে এতটুকু চিড় ধরে নি, ধরা সম্ভবও নয়।

ইয়ারো শ্যাফট থেকে ক্যালানডার প্রায় চার মাইল পথ। এক সময় কয়লাবাহী গাড়ি আর খনিশ্রমিকদের যাতায়াতে এ বিস্তীর্ণ অঞ্চল গমগম করত। আজ খনিশিল্প বিদায় নিয়েছে। কৃষিশিল্প সেখানে একাধিপত্য বিস্তার করেছে। চাষের ক্ষেত আর কৃষকদের খামার গড়ে উঠেছে। মাইলের পর মাইল জুড়ে নিস্তক্ক বিরাজ করছে মহাশূন্যতা নেমে এসেছে অঞ্চলের প্রতিটা আনাচে কানাচে। জেমস স্টার পথ চলতে চলতে বারবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। তার বারবারই মনে হচ্ছে, এটা কি তাঁর পরিচিত অ্যাবারফয়েল অঞ্চল, নাকি ভুল করে অন্য কোথাও তিনি হাজির হয়েছেন? এ যেন তাঁর পরিচিত এলাকা নয়, কোনো না কোনো মরু প্রান্তরের ওপর দিয়ে তিনি পথ পাড়ি দিচ্ছেন।

হারি ফোর্ড-এর বয়স বড় জোর বছর পঁচিশেক হলেও তার চেহারাটা একটু বেশি রকমই ভারিকী হয়ে পড়েছে। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় আসলের চেয়ে তার বয়স যেন অনেক বেশিই।

হারির জন্ম হয়েছিল খনির ভেতরেই। পাতালপুরীর অন্ধকারের ভেতরেই তার শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের দুরন্তপনার দিনগুলি কেটেছে।

হারি ছেলেবেলা থেকেই খনির কাজে যোগদান করেছিল।

দীর্ঘ সময় ধরে বিষণ্ণমনে পথ চলতে চলতে এক সময় জেমস স্টার মুখ খুললেন, 'এ কী আজব ব্যাপার হ্যারি! এ যে একেবারেই বদলে গেছে দেখছি! কয়লাখনির সামান্যতম স্মৃতিচিহ্নও যে কোথাও নজরে পড়ছে না! আশ্চর্য ব্যাপার তো!' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যারি বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন মি. স্টার। সব কিছুই বদলে গেছে। অ্যাবারফয়েল অক্ষমতা প্রকাশ না করলে পরিস্থিতি অবশ্যই এমনটা হত না। বসুমতী যদি অনাদি অনন্ত কাল ধরে জঠর থেকে কয়লা জোগান দিতে সক্ষম হত, তবে আমাদের এমন দুঃসহ দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হত না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেমস স্টার বললেন, 'এমনটা হলে তবে তো কথাই ছিল না হে। কিন্তু হ্যারি, এমন অসম্ভব যে কিছুতেই সম্ভব হবার নয়। বসুমতী বড়ই কৃপণ। তার দৃষ্টিও বড়ই প্রখর। তাই তো নিজ জঠরের বিরাট ভগ্নাংশ জুড়ে চুনাপাথর ভরে রেখেছে। আর বেলে পাথর ও আগ্নেয় পাথরের পরিমাণও নেহাত কম নয়। আগুন এদের কাউকেই স্পর্শ করতে পারে না। কয়লার পরিমাণ এতই কম যে—'

'একদম ঠিক কথা বলেছেন স্যার। তাই তো বসুমতী আজও নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। নইলে পৃথিবীর সভ্য শিক্ষিত মানুষ সভ্যতা গড়ে তোলার অতুল্য অগ্রহে বসুন্ধরার জঠর, গোটা পৃথিবীটা খুঁড়ে খুঁড়ে একেবারে অন্তসারশূন্য করে ছাড়ত। আর তা আগুনে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে ফেলত। স্যার, এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?' 'হ্যাঁ, ভূমি যথার্থই বলেছে।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা আরো অনেকটা পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছেন। সেখান থেকে আবছা অন্ধকারে ডোচার্ট পিটকে ঝাপসা দেখাচ্ছে। ভূতের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাতালরূ ন্যাডা গাছগুলো। হঠাৎ করে দেখলে বৃকের ভেতরে ফুসফুস আতঙ্কে কেমন নড়ে চড়ে ওঠে।

একসময় জেমস স্টার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, পথের ধারে, টিলার ওপর একান্ত অবহেলা অথচ দৈত্যাকৃতি একটা লোহার কঙ্কাল মুখ খুবড়ে পড়ে রয়েছে। একসময় এর খুবই সমাদর ছিল। একদিন এটা ইঁচাভাতি মানুষকে তাদের দড়ির টানে অনায়াসেই ওপরে তুলে আনতে পারত। আর নিচের তলার ইঞ্জিনঘরটার শোচনীয় অবস্থা দেখলে বুকফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চায়। দীর্ঘদিন অথচ পড়ে থাকা হতশ্রী ধ্বংসাবশেষটুকুর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে জেমস স্টার একরাশ দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে লেন। পরমুহূর্তেই অদূরবর্তী একটা ভাঙা তোবড়ানো বালতির দিকে তাঁর চোখ পড়ল। তারই পাশে টুকরো টুকরো, দোমড়ানো, মোচড়ানো ও জংপড়া রেললাইনের অংশ, আর ভাঙা যন্ত্রগাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

ধ্বংসস্থাপের সামনে দাঁড়িয়ে জেমস স্টার বিষণ্ণ মনে ভাবতে লাগলেন, এ যেন যুদ্ধবিধ্বস্ত কোন অঞ্চলের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। আর মাত্র কয়েক হাত দূরে আদিবাল্যের কামানের মত নিচল নিখরভাবে পড়ে রয়েছে ভাঙা চিমনি আর তার ছোট-বড় টুকরোগুলো।

আর? কয়েকটা লম্বালম্বা কড়ি বরণা ও বয়লারের ভাঙা দুমড়ানো প্লেট ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে।

শুক্লাপক্ষের আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত যন্ত্রণায় ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের বৃকের ভেতরটা বারবার কেমন মোচড় দিয়ে উঠতে লাগলেন। নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি আপন মনে বলে উঠলেন, 'এ আমি কোথায় দাঁড়িয়ে। এ যেন খনি অঞ্চল নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো দুর্গ। কোন এক সময়ের আকাশচুম্বী দুর্গ যেন অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মুখ খুবড়ে পড়ে।

সতর্কতার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে ধ্বংসস্থাপের লোহালঙ্কার ডিঙিয়ে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার ইয়ারো শ্যাফটের প্রবেশপথে হাজির হলেন। পাতালপুরীর প্রবেশপথের মুখের ছাঁটনিটা আজও কোনোদিকম্বে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে দেখতে পেলেন। জেমস স্টার ভাবতে লাগলেন, এ যেন কোনো মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। দীর্ঘদিন ফুটন্ত লাভা আর বাষ্প উদগীরণ করে করে আজ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

উচ্ছ্বসিত আবেগে আগুত জেমস স্টার অন্ধকার পাতালপুরীর প্রথম চাতালটায় পা রাখলেন। একসময় স্বয়ংচালিত যন্ত্রদানব মই শ্রমিকদের নিয়ে অ্যাবারফয়েল খনির প্রবেশপথে ওঠা নামা করত। সেটাকে বসানোর ব্যাপারে, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি ছিল। তারই বুদ্ধি-কৌশলে এটা তৈরি করা হয়েছিল। তিনি স্বনির্মিত যন্ত্রটার 'ইঞ্জিন-মানব' নামকরণ করেছিলেন। খনির কাজ আজ বন্ধ হওয়ায় সেটা অন্তর্হিত হয়ে দীর্ঘাকৃতি কয়েকটা মই তার জায়গা দখল করেছে।

এক একটা চাতাল প্রতি পঞ্চাশ ফুট দূরত্বে অবস্থান করছে। প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা মইয়ের বন্দোবস্ত। সবচেয়ে নিচের গহবরে নামতে এরকম ত্রিশটা মই বেয়ে নেমে যেতে হয়। যাকে বলে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৫০০ ফুট পাতালগহবরে চলে যাওয়া। এটা ছাড়া অন্য কোনো প্রবেশপথের অস্তিত্ব নেই যেখান দিয়ে ডোচার্ট পিটের খনিগর্ভে নেমে যাওয়া সম্ভব।

হ্যারি একটা তেলের সলতে জ্বালিয়ে মই বেয়ে আগে আগে নামতে লাগল। আর তার পিছনে খুবই সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে নেমে চললেন জেমস স্টার।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো ছায়ামূর্তি অন্ধকার অতল গহবরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একচক্ষু বিশিষ্ট প্রাণীর মতো তেলের সলতেটা ধিক ধিক করে অনবরত জ্বলতে লাগল।

এক এক করে পর পর দশটা মই ডিঙিয়ে জেমস স্টারের হাঁপ ধরে গেল। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে নিলেন। আবার শুরু হল সলতের আলোয় আলোকিত মই বেয়ে অনবরত পাতালপুরীতে নেমে যাওয়া।

একসময় জেমস স্টার আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজে থেকে যেন দাঁড়াননি তিনি। কে যেন জোর করে তাঁরা পা দুটো চেপে দরেছে। অন্ধকার যক্ষপুরীর কোনো এক গোপন অন্তরাল থেকে অতর্কিতে ভেসে আসা রহস্যজনক একটা শব্দ তাঁর গতি বন্ধ করে দিয়েছে। তাঁর শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। শরীরের সব কয়টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে ঝনঝনিতে উঠল।

খুবই ক্ষীণ রহস্য সঞ্চারকারী সে কণ্ঠস্বর। ভীতি সঞ্চারকারী তো বটেই। অব্যক্তিত সে শব্দটা যেন এবার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে, আরো কাছে এগিয়ে এল, রহস্য সঞ্চারকারী সে শব্দটা।

অজানা একটা ভয় ভীতিতে জেমস স্টারের সর্বাস্থ কেমন অবশ হয়ে আসতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর কপালে জমে উঠল বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাত মুঠো করে সাধ্যমতো শক্ত করে মইটাকে আঁকড়ে ধরলেন তিনি।

রহস্য সঞ্চারকারী সে গোপন শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল।

জেমস স্টারের পক্ষে আর মুখবুজে থাকা সম্ভব হল না। অন্তরের অন্তস্থলের পুঞ্জীভূত ভয় ভীতিটুকু গোপন রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েই বললেন, 'হারি, ওটা কী, বল তো? ও কিসের শব্দ। ওটা কার কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে?'

জেমস স্টারের কথার জবাব দেয়ার আগে হারি উৎকর্ণ হয়ে শব্দটাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল। এক সময় মুখ খুলল, 'না, কিছুই বুঝতে পারছি না তো।'

'তোমার বাবার কণ্ঠস্বর না তো?'

হারি আবার মুহূর্তকাল উৎকর্ণ হয়ে কণ্ঠস্বরটা শোনার ও বুঝার চেষ্টা করে বলল, 'আমার বাবার? না, না বাবার কণ্ঠস্বর অবশ্যই নয়। তাঁর কণ্ঠস্বর তো এরকম—'

'তোমার বাবার কণ্ঠস্বর না হলে প্রতিবেশী কারো হবে হয়ত।' মনে সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে জেমস স্টার বলে উঠলেন—'হ্যাঁ, সেরকমই কারোর—'

জেমস স্টারকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই হারি প্রতিবাদের স্বরে বলল, 'প্রতিবেশী? আমাদের কোনো প্রতিবেশীই নেই, আবার কণ্ঠস্বর। আমরা একাই তো খনির মধ্যে বাস করি।'

জেমস স্টার ইতিমধ্যে জোর করে যেটুকু সাহস সঞ্চার করেছিলেন তা মুহূর্তে মন থেকে উবে গেল। ফুটো বেলুনের মতো চিপসে গিয়ে এবার কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'তবে এক কাজ করা যাক হারি। আমরা বরং এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি।' এবার অপেক্ষাকৃত কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ওই—ওই শোন হারি, শব্দটা ক্রমেই এদিকে এগোচ্ছে।'

তাঁরা চাতালে পৌঁছেই থমকে গেলেন। অজ্ঞাত রহস্যজনক কণ্ঠস্বরটা এবার আরো স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এবার স্পষ্ট মনে হল, নিছক কথা বা শব্দ নয়, গানের কলি।

উৎকর্ণ হয়ে তাঁরা রহস্যজনক কণ্ঠের গানের কলি লক্ষ্য করে বুঝলেন—স্কটল্যান্ডের গানের কলিই বটে। ওই—ওই তো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

হারি তাক্ষিল্যের সঙ্গেই বলল, 'কেউ সরোবর সঙ্গীতের সুর ধরেছে।'

আরও কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ্য করে হারি এবার বলল, 'জ্যাকরিয়ান। জ্যাকরিয়ান ছাড়া অন্য কারোর কণ্ঠস্বরই এটা নয়। হ্যাঁ, জ্যাকরিয়ানই বটে।'

কপালের চামড়ায় পরপর কয়েকটা ভাঁজ এঁকে জেমস স্টার বললেন, 'জ্যাকরিয়ান? তোমার ওই জ্যাকরিয়ানটা কে হে? গলাটা খুবই মিষ্টি তো! সুরজ্ঞানও খুবই ভালো!'

হারি ধীরপায়ে চাতালটার ধারে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'জ্যাকরিয়ান! একসময় এ খনিরই শ্রমিক ছিল জ্যাক। আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। অভিনু হৃদয় বন্ধু।' চাতালটার একেবারে শেষপ্রান্তে এগিয়ে গিয়ে সে এবার গলা ছেড়ে হাঁক দিল, 'জ্যাক, জ্যাক! এ-ই জ্যাক!'

জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে বিপরীত দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে? কে রে, হারি নাকি?'

'হারি, আমি হারি। জ্যাক, এদিকে আয় তো একবার।'

'একটু অপেক্ষা কর আসছি।'

মিনিট কয়েকের মধ্যেই দীর্ঘদেহী এক যুবক গুনগুন করে গানের কলি ভাজতে ভাজতে এগিয়ে এসে হারি আর জেমস স্টারের মুখোমুখি দাঁড়াল।

জেমস স্টার সলতের অনুজ্জ্বল আলোতে জ্যাকরিয়ানের হাসির প্রলেপ দেয়া মুখটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

উচ্ছ্বসিত আবেগে হারি ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার-এর সঙ্গে জ্যাকরিয়ানের পরিচয় করিয়ে দিল।

সদ্য পরিচিত যুবক জ্যাকরিয়ান-কে লক্ষ্য করে জেমস স্টার বললেন—'খনির কাজ তো বন্ধ, এখন করছ কী?'

'কী-ই বা করার আছে বলুন?' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্যাকরিয়ান বলল, 'উপায়ান্তর না দেখে চাষ আবাদ করেই দিন কাটাতে হচ্ছে। তেমন সুবিধে করতে পারছি নে।'

জেমস স্টার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জ্যাকরিয়ান বলে চলল, 'আসল কথা কি, জানেন স্যার? গাঁইতির মতো কোদাল চালাতে পারে নি—উৎসাহ পাই নে।' এবার হারির দিকে ঘাড় ঘুড়িয়ে সোলাসে বলল, 'আরে হারি, আমি তোরা খোঁজেই এসেছিলাম। আমাদের মহান্নায় একটু গান-বাজনার মজলিশের আয়োজন করেছে। সেখানে তোকে আশা করছি, আসছিস তো?'

অপ্রতিভমুখে হারি বলল, 'দুঃখিত। আমার হয়ত যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না ভাই। যেতে না পারলে কিছু মনে করিস না যেন। আসলে মি. স্টার আমাদের অতিথি। তিনি এখানেই কিছুদিন—'

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই জেমস স্টার বলে উঠলেন, 'আরে, আমার জন্য ভাবছ কেন? তুমি যাবে, অবশ্যই যাবে। আমার জন্য তোমার যাওয়া আটকাবে না।'

হারি এবার জ্যাকরিয়ানের হাত দুটো ধরে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার কথা রাখব, আমি তোমাদের গানের মজলিশে উপস্থিত থাকছি।'

জ্যাকরিয়ান তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আগের মতোই গুনগুনিয়া গানের কলি ভাজতে ভাজতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জ্যাকরিয়ানের অনুজ্জ্বল লণ্ঠনটা দূরে সরতে সরতে একসময় চোখের আড়ালে চলে গেল।

হারি হাতের জুলন্ত সলতেটা আবার উঁচু করে ধরে মই বেয়ে অন্ধকার যক্ষপুত্রীর দিকে নেমে চলল। জেমস স্টার মইয়ের ধাপে মৃদু শব্দ করে করে তাকে অনুসরণ করে চললেন।

গোটা পঞ্চাশেক ধাপ নামতে না নামতেই জেমস স্টার আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। আচমকা একটা পাথরের চাঁই বুককাঁপানো শব্দ করে লাফাতে লাফাতে হুড়মুড়িয়ে তার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

কেবল জেমস স্টারই যে ভয়ে কঁকড়ে গেলেন তা নয়। আকস্মিক রহস্যজনক ঘটনাটার মুখোমুখি হয়ে কিশোর হারিও কম ঘাবড়ে যায় নি, রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়ল সে। আজানা এক ভয় ভীতিতে তার সর্বাঙ্গ হুমহুম করতে লাগল।

জেমস স্টার অতর্কিতে লাফিয়ে উঠে দুই পা সরে গেলেন। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। নির্বাক নিষ্পন্দ।

পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, বুকের জমাটবাঁধা আতঙ্কে জোরে নিশ্বাস নিতেও তাদের সাহস হচ্ছে না।

কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে জেমস স্টার উচ্চারণ করলেন, 'আরে বাস! অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি। আর একটু হলেই—পিতৃদত্ত প্রাণটা তবে এ যাত্রায় রক্ষাই পেয়েই গেল।'

একটু দম নিয়ে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক স্বরেই উচ্চারণ করলেন—'হারি, ব্যাপার কী বলতো? হাদের কোনো অংশ হঠাৎ খসে পড়ে নি তো?'

বিচলিত হারি ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখে বলল, 'না স্যার, হাদের কোনো অংশ ধসে পড়ে নি, ছাদ থেকে খসেপড়া পাথর এমন করে কিছুতেই গড়াতে পারে না। কেউ না কেউ অতর্কিতে পাথরটাকে ছুড়ে মেরেছে। আর তা মানুষেরই কাজ। নির্দোষ কেউ—'

'মানুষ! কী বললে? মানুষের কাজ! মানুষ পাথরটাকে এমন করে ছুড়ে মেরেছে। এ কী অদ্ভুত কথা বলছ হারি! কী বলতে চাচ্ছ, খোলসা করে বল তো?'

নিজেকে সামলে নিয়ে হারি বলল, 'ও কিছু না স্যার।' মুহূর্তের জন্য উদ্বেগ উকণ্ঠা ভরা দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে এবার সে বলল, 'আকস্মিক কোনো ব্যাপার ট্যাপার হবে। ব্যাপারটা আসলে কিছুই না। চলুন, যাওয়া যাক।'

এবার কাছাকাছি, একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা একটা একটা করে ধাপ নামতে লাগলেন আর প্রতিমুহূর্তে চারদিকে সতর্ক ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে নিয়ে তবে পরবর্তী ধাপটাতে নামার চেষ্টা করতেন।

একসময় হারি অথও নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, 'স্যার, আসলে এরকম রহস্যজনক ব্যাপার আগে কোনোদিনই খনির ভিতরে ঘটে নি। আচমকা পাথর ছিটকে আসা—'

মনে সাহস সঞ্চয় করে জেমস স্টার বললেন, 'হারি, একেই তো বলে দুর্ঘটনা। যে-কোনো সময়, যে-কোনো পরিস্থিতিতে তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এত সহজে ঘাবড়ালে চলবে কেন হে?'

হারি কয়েকটা ধাপ সতর্কতার সঙ্গে নেমেই হারি আবার সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বার বার এদিক ওদিক দৃষ্টি ফিরিয়ে উৎকণ্ঠ হয়ে কী যেন লক্ষ করে একসময় ওকনো গলায় বলল, 'স্যার, ব্যাপারটা কেমন যেন মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে যেন পায়ের শব্দ কানে এল। আর একটু কাছে সরে আসুন। ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

হারি আবার সতর্ক দৃষ্টি মেলে চারদিকে তাকিয়ে নিল। বুধা চেষ্টা। বহু চেষ্টা করেও রহস্যটার কিনারা করতে পারল না। সামান্য সলতের আলেয় জমাটবাঁধা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার চোখে পড়ল না।

আরও কয়েক ধাপ নেমে হারি এক সময় বলল, 'স্যার, আমরা এসে গেছি। আর মাত্র কয়েকটা ধাপ নামলেই আমাদের আস্তানা।'

বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড পাতালপুরীর অন্ধকার গহ্বরেই কুঁড়েঘর তৈরি করে মাথাগোঁজার জায়গা করে নিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ ফুট নিয়ে তাঁর এ শান্তির নীড়। কয়লাখনির সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ, নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাঁর জন্মও হয়েছিল প্রাচীন এক খনি পরিবারে। নিউক্যাসলের ২০০০০ খনি পরিবারের মধ্যে তাঁর পূর্বপুরুষও ছিলেন একজন। আর তিনি নিজে ডোচটপটে ওভারম্যান হিসাবে কাজ করেছেন পাক্সা ত্রিশটা বছর। তাইতো তাঁর পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়, অ্যাবারফয়েল চিরদিনের মতো অক্ষম, জঠরশূন্য হয়ে পড়েছে।

অ্যাবারফয়েলের প্রসঙ্গ উঠলেই বুড়ো সাইমন ফোর্ড দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলে ওঠেন—'না, না মরে নি। অ্যাবারফয়েল ঘুমিয়ে আছে। আজ না হোক কাল তার ঘুম ভাঙবেই। আবার তার বুক মানুষের ব্যস্ততা গুরু হয়ে যাবে। আবার যন্ত্র আর মানুষ এক সঙ্গে কর্মচঞ্চল হয়ে পড়বে।'

বুড়ো সাইমন ফোর্ড ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে দেখেই সোপানাসে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে তাঁকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

রাতে খাবার খেতে খেতে জেমস স্টার কথায় কথায় বললেন—'ফোর্ড, তোমার চিঠিটা কিন্তু রীতিমতো কৌতূহল উদ্যেককারী বলে দাবি করতে পারে। আচ্ছ, আসল ব্যাপারটা কি খোলসা করে বল তো?'

মুখের কাছ থেকে হাতটা নামিয়ে নিয়ে সাইমন ফোর্ড মুচকি হেসে বললেন, 'বলব, সবই বলব স্যার। আর এসেই যখন পড়েছেন সবই নিজের চোখেই দেখতে পাবেন, জানতেও পারবেন সবই। আগে ধীরেসুস্থে খেয়ে নিন।' কথা ক'টা জেমস স্টারের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের খাবারটুকু মুখে পুড়ে দিলেন।

জেমস স্টার বাঁ হাতে বুক পকেট থেকে বেনামী চিঠিটা টেনে বের করলেন। সেটা সাইমন ফোর্ড—এর চোখের সামনে ধরে বললেন, 'ভালো কথা, এটা কার চিঠি বল তো?'

সাইমন ও ফোর্ড উভয়েই সুতীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে মুহূর্তকাল জেমস স্টারের হাতের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসাই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হল না।

এক সময় সাইমন ফোর্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মি. স্টার, আপনি এখানে আসুন এটা হয়ত কারো মনঃপূত নয়। তাই আপনার আসা বন্ধ করার জন্যই উড়ো চিঠিটা ছেড়ে দিয়েছে।' এবার অধিকতর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আমার গুপ্তরহস্য জেনে ফেলেছে। কিন্তু কে—কে সে? কি তার উদ্দেশ্য? কীই বা তাঁর নাম? আশ্চর্য!'

নৈশ ভোজ সারা হলে জেমস স্টার অদূরবর্তী একটা চাতালে বুড়ো সাইমন ফোর্ডকে পাশে বসালেন। অত্যুগ্র আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'সাইমন, এবার তোমার গোপন রহস্যটা কি, খুলে বলে আমার নিরবচ্ছিন্ন কৌতূহল নিবৃত্ত করো।'

সাইমন ফোর্ড কিন্তু জেমস স্টার-এর কথার জবাব না দিয়েই হ্যারিকে বললেন, 'বাছা, তাড়াতাড়ি একটা সেফটি ল্যাম্প জ্বেলে তৈরি হয়ে নাও।'

সেফটি ল্যাম্পের কতায় জেমস স্টার-এর মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'সে কী হে, সেফটি ল্যাম্প দিয়ে কী হবে? খনিতে কোনো দাহ্য বস্তু অস্তিত্ব থাকলে তবেই না দুর্ঘটনার ভয় থাকে, সেফটি ল্যাম্প ব্যবহার করার দরকার পড়ে। কয়লাই যখন নেই—'

'মি. স্টার, ঝুঁকি না নেয়াই উচিত। বলা তো যায় না?—কথা বলতে বলতে তিনি গাঁইতি আনতে এগিয়ে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যে গাঁইতি কাধে আর হাতে সেফটি ল্যাম্প ঝুলিয়ে সাইমন ফোর্ড বললেন, 'চলুন স্যার আমি তৈরি। চলুন, এবার হাঁটা যাক।'

এই তল্লাটের, বিশেষ করে খনি শ্রমিকরা ভূতপ্রেত দত্যা দানবের খুবই বিশ্বাসী। অশরীরী আত্মারা নাকি রাতের অন্ধকারে সর্বদা পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায়। কেবল এ-অঞ্চল বা খনি শ্রমিকদের কথাই বা বলি কেন সমগ্র পোল্যান্ড ও হাইল্যান্ড উভয় অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভূত-প্রেত দত্যা-দানোর আর অশরীরী আত্মাদের নিয়ে কত সব রোমহর্ষক গল্প প্রচলিত রয়েছে। মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও কুসংসারমুক্ত মনোভাবের একান্ত অভাব।

খনিগর্ভে বারো মাসই ভূত-প্রেতের উপদ্রব লেগেই থাকে। আর খনির উপদেবতা নাকি অসীম শক্তিদর। খনির মানুষদের বিশ্বাস, ফায়ার ড্যান্স অর্থাৎ দাহ্যগ্যাস তো তারাই ধরিয়ে দিয়ে মানুষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে। আর বিদ্বৎসী প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণের নায়কও তারাই। দুর্ঘটনার রাতে তারাই নাকি পৃথিবীকে নাড়া দেয়, আলোড়ন সৃষ্টি করে। আর অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে—হ্যাঁ, এখানেও ভূতপ্রেত বিশ্বাসীদের সংখ্যা যথেষ্ট দেখা যায়।

বুড়ো সাইমন আর তার কিশোরের ছেলে হ্যারি অবশ্য ভূতপ্রেতের ব্যাপারে একটু অন্য ধরনের। অশরীরী আত্মাটাম্বারা তাঁদের বিশ্বাস নেই। ভূতপ্রেতে তাঁরা যেমন বিশ্বাসী নন তেমনি তার চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসী, অ্যাবারফয়েলের জঁঠর একেবারে কয়লাশূন্য হয়ে পড়ে নি। আর এ বিশ্বাসটুকু তাঁদের মধ্যে বন্ধমূল বলেই তাঁরা বাপ-বেটায় দশ দশটা বছর গাঁইতি কাধে করে সেফটি ল্যাম্প হাতে নিয়ে অন্ধকার পাতালপুরীতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন। গাঁইতি নিয়ে আঘাত করে, উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করেছেন পরিচিত সে কণ্ঠস্বর শোনা যায় কিনা। কয়লাস্তরের শব্দের কথা বলা হচ্ছে।

এরকম হন্যে হয়ে গাঁইতি চালাতে চালাতে হ্যারি একদিন আচমকা একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিল। মনে হয়েছে, সে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লাস্তরে আঘাত করেছে। সে এক অবিশ্বাস্য রহস্যজনক শব্দ। শব্দটা শোনামাত্র তার গা ছমছম করতে লাগল। সর্বাস্তে এক অবর্ণনীয় শিহরণ জেগে উঠল।

শব্দটার উৎসস্থলের সন্ধান করতে সে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি শুরু করে দিল। কিছুই দেখতে পেল না। কাউকেই নজরে পড়ল না তার। কিন্তু তার যে স্পষ্ট মনে হল অদূরে কে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লাস্তরে আঘাত হানছে। ছুটোছুটি করল বহুক্ষণ। কিন্তু না, কাউকেই দেখতে পেল না সে। তবে? কিন্তু কোনো মানুষের লুকিয়ে থাকার মতো কোনো গহ্বরও তো ধারে কাছে নেই। বিস্ময়ে অভিভূত হ্যারি ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সেদিন কুঁড়েঘরে ফিরে এসেছিল।

আবার! অবাক কাণ্ড তো! আবার সে রহস্যজনক শব্দটা হ্যারি কানে এল। আবার তার মনে হল কে যেন গাঁইতি দিয়ে কয়লার স্তরে আগাত হানছে।

এক মাসের মধ্যে পর পর দুবার অবিশ্বাস্য শব্দটা শুনতে পেয়ে আশান্বিত হ'ল। আরও বেশি বিস্ময় হল যেদিন সে শুনল অবিকল ডিনামাইট ব্যবহার করে কয়লাস্তর বিচ্ছিন্ন করার মতো শব্দ। এবার তাঁর বুক আশায় একেবারে ভরে উঠল। সে অনুসন্ধানের কাজ আরও ক্ষিপ্তরত করল। অচিরেই সে একটা ধসেপড়া খাম আবিষ্কার করল। তার গায়ে সদা বিস্ফোরণের সুস্পষ্ট চিহ্ন।

হ্যারি এবার নিঃসন্দেহ হল, কেউ না কেউ গোপনে কয়লার স্তর খোঁজ করছে। আর তা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারেই করছে। কিন্তু কে? কে সে? রহস্যজনক কয়লা অনুসন্ধানকারীটি কে? কেই-বা এমন গোপনে একের পর এক রহস্যজনক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে?

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার খনিতে ফিরে আসার মাত্র সপ্তাহ দুই আগেকার কথা।

এক সকালে হ্যারি একা একা খনিগর্ভে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অকস্মাৎ একটা উজ্জ্বল আলো তার চোখের সামনে ফুটে উঠল। ব্যাস, মুহূর্তকাল পরেই মাত্র শ-খানেক ফুট দূরে অবস্থানরত আলোটা দুম করে নিভে গেল।

সাইমন ফোর্ড সদা আগত অতিথি জেমস স্টার-কে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রধান গ্যালারির মাইল দুই অতিক্রম করে ফেললেন। এবার তাঁরা এক সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ ধরলেন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ ফুট গভীরে অবস্থানরত সুড়ঙ্গটা ফর্দ নদীর গতিপথ বরাবর এগিয়ে গেছে।

হ্যারি সেফটি ল্যাম্প হাতে আগে আগে আলো দেখিয়ে চলেছে। হঠাৎ তার পা দুটোকে যেন ভূমির সঙ্গে চেপে ধরল। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলল। কেন? এমন কী ঘটল যে, তার গতি হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল? হ্যাঁ, কারণ অবশ্যই আছে। একটা ছায়ামূর্তি তার পা দুটো থামিয়ে দিয়েছে। ছায়ামূর্তিটা যেন বাতাসের বেগে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে

গেল। ব্যস, সবই তাঁঁ ভাঁ। হ‍্যারি ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করে নিল। জেমস স্টার তো দূরের ব্যাপার, এমনকি তার বাবার কাছেও আকস্মিক দেখা রহস্যজনক ছ‍্যায়মূর্তিটার কথা ফাঁস করল না।

সাইমন ফোর্ড জেমস স্টারকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে ফোকলা দাঁতে মুচকি হেসে বললেন, 'স‍্যার আর বেশি দূরে নয়। এই তো ওই বাকটা ঘুরলেই আমরা জায়গামতো পৌঁছে যাব, আধমাইল খানেক—'

'আধমাইল? আধ মাইল তো এ স্তরটাকে একেবারে শেষ প্রান্তে হে!'

সাইমন ছোট্ট করে হেসে বললেন—'স‍্যার, এতদিন হয়ে গেল তবু কিছুই স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি দেখছি! সেখান থেকেই তো কয়লার শেষ চাঙরটাকে তুলে এনেছিলাম, মানে আছে নিশ্চয়?'

'হুম।'

'মি. স্টার, গাঁইতির শেষ ঘা-টা আমিই মেরেছিলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সাইমন বললেন—'ওসব কথা ছাড়া যাক। স‍্যার, একটা আশার আলো, মানে আশার সূত্র পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, ডোচার্ট পিট আজও বেঁচে আছে। আমি তার প্রাণের স্পন্দন শুনতে পেয়েছি।'

জেমস স্টার অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

সাইমন ফোর্ড বলে চললেন—'আমার কথা শুনে আপনি হয়ত ভাবছেন আমি কয়লার স্তরের সন্ধান পেয়ে গেছি। কিন্তু আসলে এতদূর এগোতে পারিনি। তবে হ্যাঁ, কয়লার স্তরের অবস্থিতির উপযুক্ত প্রমাণ আমি হাতেনাতে পেয়ে গেছি।'

কণ্ঠস্বরে বিশ্বাস প্রকাশ করে জেমস স্টার বলে উঠলেন—'কয়লার স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ। ফায়ার-ড‍্যাম্প অর্থাৎ কয়লার খনির দাখ্য গ‍্যাস কি কয়লার অবর্তমানে বেরোয়, নাকি কখনও বেরনো সম্ভব. আপনি বলুন?'

'না, তা কি করে সম্ভব। কারণ ছাড়া কার্য তো সম্ভব নয়। কয়লার অস্তিত্ব নেই, ফায়ার-ড‍্যাম্পও অনুপস্থিত।'

'তবে?'

'তবে কি আপনি, বলতে চাইছেন হাইড্রোজেন আর কার্বোরেটের হদিস পেয়েছেন?'

'স‍্যার, খনির ব্যাপার স‍্যাপার, মানে খনির চরিত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যথেষ্টই—একজন বাস্তবদৃষ্টি। তাই আশা করি স্বীকার করবেন, এত সহজে ভুল করার পাত্র এ বান্দা নয়। আমাদের চিরশত্রুই হচ্ছে ফায়ার ড‍্যাম্প। আর তাকেই চিনতে আমার মত লোকের ভুল হবে? কখনই না।'

জেমস স্টার রুদ্ধশ্বাসে সাইমন ফোর্ডের কথাগুলো শুনতে লাগলেন।

সাইমন ফোর্ড বলে চললেন—'মি. স্টার, আসল ব্যাপারটা বলছি শুনুন—আমরা বার দুই খনির পশ্চিমদিকে আগুন দেখতে পেয়েছিলাম। চোখের পলকে আবার সেটা নিভেও গিয়েছিল। ফায়ার ড‍্যাম্পের উপস্থিতি ছাড়া তো আর আগুন জ্বলে নি, আপনি কী বলেন?'

জেমস স্টার তাঁর কতার কি জবাব দেবেন হঠাৎ করে শুছিয়ে উঠতে না পেরে চূপ করেই বইলেন।

সাইমন বলে চললেন, 'স‍্যার, তাই যদি সত্য হয় তবে মেনে নিতেই হয় ধারে-কাছে কোথাও না কোথাও কয়লার স্তরের উপস্থিতি রয়েছে।

'বিস্ফোরণ আগুন থেকে ঘটে নি।'

'আপনার তো আর অজানা নয় মি. স্টার, বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভি সেফট-ল‍্যাম্প আবিষ্কার করার আগে কয়লাখনিতে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হত।'

জেমস স্টার বললেন—'তুমি তো মস্ত-এর কথা বলতে চাইছ, তাই না? হ্যাঁ, আমি শুনেচি বটে। তবে নিজের চোখে দেখি নি।'

'আমি দেখছি।' মুচকি হেসে সাইমন বললেন—'স‍্যার, আপনি তো জানেনই, আমি আপনার চেয়ে কম হলেও দশ বছরের বড়। অন্ধকার খনিগহ্বরে, বিভীষিকা জমাটবাঁধা অন্ধকারে সর্বশেষ মস্তকের কাজ করা করত? তারা মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মত ইয়া লম্বা আলখাল্লা পরত বলে তাদের নামকরণ হয় মস্ত বা সন্ন্যাসী। কাজের প্রকৃতি অনুসারে তাদের 'আগুন যোদ্ধা' নামেই অভিহিত করাই সম্ভব ছিল। তখনকার দিনে ছোটকাটো বিস্ফোরণের মাধ্যমে ফায়ার-ড‍্যাম্পের গ‍্যাস জ্বলিয়ে দেওয়া হত। নইলে সে গ‍্যাস ছাদে গিয়ে জমা হয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়ত। মস্তরা মশাল নিয়ে ওপরের দিকে তুলে অনবরত নাড়ত। গ‍্যাস জমে থাকলে তা সশব্দে ফেটে যেত। কিন্তু গ‍্যাসের পরিমাণ-বেশি হলে মস্ত অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে মৃত্যুর শিকার হত। মি. স্টার, ব্যাপার স‍্যাপার আমার ভালই জানা রয়েছে, তাইতো ফায়ার-ড‍্যাম্পের উপস্থিতি অনুমান করতে পেরে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। আর পিটে নতুন কয়লার অস্তিত্বেরও সন্ধান পেয়েছি।'

হ্যাঁ, সাইমন ফোর্ডে কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ফায়ার ড‍্যাম্প, কার্বোরেটেড হাইড্রোজেন বা মার্শ গ‍্যাস কেবলমাত্র যে গন্ধহীন তা নয়, বর্ণহীনও বটে। আর তা খিকখিক করে জ্বলতে থাকে।

অন্ধকার খনির জঠরে ও গ‍্যাস অগ্নি অগ্নি করে জমকে জমকে একসময় শ্রমিকদের শ্বাসকার্য চালানোর কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর যদি তা কোনরকমে আগুনের হোঁয়া পায় তবে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তা সর্বনাশের কারণ হয়।

সাইমন ফোর্ড কথা প্রসঙ্গে জেমস স্টারকে বললেন—তিনি কনির পশ্চিমাংশে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ফায়ার-ড‍্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন।

সাইমন ফোর্ডের বক্তব্য শুনে জেমস স্টারের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা ভর করল।

সেফটিল্যাম্প-হাতে আরও সামান্য এগিয়ে হ্যারি ঘাড় ঘুরিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—‘মি, স্টার, আমরা সে জায়গাটায় পৌঁছে গেছি।’

জেমস স্টার অভাবনীয় অগ্রহ-উত্তেজনায় হ্যারির অঙ্গুলি নির্দেশিত জায়গাটাকে দেখতে লাগলেন। এখান থেকেই দশ বছর আগে সর্বমেষ কয়লার চাইটা কেটে নেয়া হয়েছিল।

সাইমন ফোর্ড ছোট্ট করে একটা গাঁইতির ঘা মেরে অত্যাশা আশা ও অগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন—‘স্যার, কঠিন পাতরের স্তরটাকে কোনক্রমে সরিয়ে ফেলতে পারলেই কালো হীরে উঁকি মারবে। ভূমি থেকে প্রায় দশফুট ওপরে এখানেই ফায়ার ড্যাম্প বেরোতে দেখা গেছে।’

জেমস স্টার আশান্বিত বাপ-বেটার মুখের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তাঁর চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ। এর সম্ভব কারণও রয়েছে। কারণ, বাতাসে বিসাক্ত গ্যাসের সামান্যতম গন্ধও পাচ্ছেন না। গ্যাসের পরিমাণ যত কমই হোক না কেন, তাঁর অভিজ্ঞ নাককে ফাঁকি দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁর ভাবনা হল, সাইমন আর হ্যারি-র কি তবে ভুলই হয়েছে? সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবনার উদয় হল, তাও তো হবার নয়। এরা যে জাতশ্রমিক। এদের তো এতবড় একটা ভুল হতে পারে না।

হ্যারির মনে সন্দেহের উদ্বেগ ঘটল। নাকটাকে দেওয়ালের কাছাকাছি নিয়ে বলল—‘বিষাক্ত গ্যাস তো আর বেরোচ্ছে না। এখান তবে বন্ধ।’

সাইমনও অত্যাশা অগ্রহের সঙ্গে ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা নিতে চেষ্টা করলেন। বৃথা চেষ্টা। ধাতব প্লোটা সরানোতেও কোন ফল পাওয়া গেল না। লঠনটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াতেও চটপট বা অন্য কোন আওয়াজ হল না। নামমাত্র ফায়ার ড্যাম্প থাকলে অদ্ভুত এক শব্দ তোলে। লঠনটা লাঠির মাথায় বেঁধে ওপরে তুলে ব্যর্থ হলেন। কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষিত হল না। হ্যারিও বহুভাবে চেষ্টা করল ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে। সব প্রয়াসই ব্যর্থ হল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লঠনের আলেয় দেওয়ালের গা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে এক সময় হ্যারি বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠল—‘এই যে!—এই দেখুন! পাথরের গ্যাসের ফটিলটা কে যেন বন্ধ করে দিয়েছে।’ হাতের লঠনটা সাধ্যমত উঁচু করে দরে সে এবার বলল—‘এই যে, এই দিকে—এখানে!’

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে জেমস স্টার বুঝলেন, হ্যারির অনুমান অস্বাভাবিক। সিমেন্ট বালির প্রলেপ জুলজুল করছে।

হ্যারির মুখে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠল—‘এবার বুঝলাম, কাজটা সে—ই করেছে!’ সে ছাড়া আর কারোর দ্বারা অন্য কারোর পক্ষে—

‘সে? সে বলতে কার কথা বলতে চাইছ হ্যারি? কে? কে সে?’

‘আমার অনুমান সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। রহস্যজনক আগতুক ছাড়া আর কারোর পক্ষে এমনটা করা সম্ভব নয়। প্রেতচ্ছায়ার মতই সে সংগোপনে পাজলপুরীর খনির জঠরে হানা দিচ্ছে! তাকে চোখে দেখেছি বটে, কিন্তু হাতে নাতে ধরা সম্ভব হয়নি।

জেমস স্টারের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে অস্থিরচিত্ত হ্যারি বলল—‘মিঃ স্টার, যে উড়োচিঠি দিয়ে আপনার এখানে আসা বন্ধ করার চক্রান্ত করেছিল, যে ইয়ারো শ্যাফটের সুড়ঙ্গপথে আমাদের দিকে পাথর ছুড়ে মেরেছিল, তার কথা বলতে চাইছি। একই লোক সব কাজ করে চলেছে।’

হ্যারির দৃঢ় প্রত্যয়যুক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে জেমস স্টারের মন থেকে দ্বিধা ঘন্দের মেষ অল্প অল্প করে সরে যেতে লাগল। আর প্রমাণ তো হাতেনাতেই পেয়েছেন। কাল রাতেও সেখানে দিয়ে তির তির করে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়েছে। এখন সেখানে সিমেন্ট-বালির প্রলেপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সাইমন ঝট হরে হামা দিয়ে বসে পড়লেন। তার কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে হ্যারি সিমেন্ট বালির প্রলেপের গায়ে গাঁইতি দিয়ে আঘাত হানতেই ভুসভুস করে বিষাক্ত গ্যাস বেরোতে শুরু করল।

হ্যারি অত্যাশা অগ্রহের সঙ্গে হাতের লঠনটাকে উঁচু করে ফটিলটার কাছে নিতেই বাজির মত চটপট আওয়াজসহ রক্তিম আলোক শিখা যার চার দিকটা নীলাভ—এমন অদ্ভুত আলোকচ্ছটা ঠিকরে পড়তে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে গেল। একমাত্র আলোয়ার খেলার সঙ্গেই এর তুলনা করা চলে।

সাইমন ঝট করে জেমস স্টার-এর হাত দুটো চেপে ধরে উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন—‘স্যার, আছে! ফায়ার-ড্যাম্পের অস্তিত্ব আছে! ফায়ার-ড্যাম্প যখন আছে তখন কয়লাও অবশ্যই আছে। কয়লা—কয়লা আছে মি. স্টার!’

হ্যাঁ, ফায়ার ড্যাম্পের অস্তিত্ব বলে দেয়, কয়লার স্তর অবশ্যই আছে। ফায়ার ড্যাম্প আর কয়লার ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ খনি শ্রমিকদের অজানা নয়। ব্যস, কয়লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারোর আর সামান্যতম দ্বিধাদ্বন্দ্বও থাকার কথা নয়।

ডোচার্ট পিটে কয়লা যে আছে এতে আর কারোর সন্দেহের অবকাশই রইল না বটে। তবে এখন যা ভাবা দরকার, সেখানে কী পরিমাণ কয়লা রয়েছে? আর তা কোন জাতের?

জেমস স্টার কয়লার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর ভাবতে লাগলেন—‘কয়লার খোঁজ যখন পাওয়া গেছে তখন তাকে উদ্ধারের আয়োজনও করতে হবে। কিন্তু হাজারো সমস্যা এতে। দশ দশটা বছর আগের যন্ত্রপাতিগুলোকে অনাদরে অথচ ফেলে রাখায় অধিকাংশই আজ বিকল। ঝেড়েমুছে মেরামত করে সেগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হলে হ্যাঁপাও অনেক। তা হোক গে। এমন একটা কাজ করতে গেলে ঝুঁকি নিতেই হবে। এর শেষ না দেখে ছাড়া যায় না।’

সাইমন ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন—‘মি. স্টার। আপনার ডোচার্ট পিটে ছুটে আসা সার্থক হয়েছে, ভাবছেন তো? নাকি—’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই সার্থক হয়েছে। চল, এবার তোমার আস্তানায় গিয়ে কালকের কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করা যাক। কাল ভোরে ডিনামাইট নিয়ে হাজির হব। পাথরের বুক চিরে কালোহীরের মুখ না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। নিউ অ্যাবারফয়েল কোম্পানি আমরাই গড়ে তুলব সাইমন।’ দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলতে বলতে জেমস স্টার সেখান থেকে ফেরার উদ্যোগ নিলেন।

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ভোর হল। সাইমনফোর্ডের স্ত্রীও তাদের পিছন ধরলেন।

ডিনামাইট, সেফটি ল্যাম্প, লণ্ঠন, শাবল, আর গাঁইতি প্রভৃতি অত্যাৱশ্যক যন্ত্রপাতি ঘাড়ে নিয়ে পুরো দলটা এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গের সর্বশেষ প্রান্তটার উদ্দেশ্যে।

জেমস স্টার জায়গামত পৌঁছে সবার আগে নিশ্চিন্ত হয়ে নিলেন, ফায়ার-ড্যাম্প বেরিয়েই চলেছে। গাঁইতি শাবল দিয়ে ঘা মেরে মেরে বড় সড় কয়েকটা ছিদ্র করে নেয়া হল।

ডিনামাইট কার্টিস ঠেসে ঠেসে ছিদ্রগুলোর ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। এবার লম্বা সলতেটাকে সাধামত দূরে টেনে নেয়া হল। সলতের মাথায় অগ্নিসংযোগ করে সবাই ছুটোছুটি করে নিরাপদ অশ্রয়ে গিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

ব্যস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিকট গভীর আওয়াজে পাতালপুরী থরথরিয়ে কঁপে উঠল।

সবার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করলেও সাইমন ফোর্ডের নির্দেশে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা অধীর প্রতীক্ষায় রইলেন।

একটু পরে হ্যারি ব্যস্ততার সঙ্গে সদ্য তৈরি গর্তটার মধ্যে লণ্ঠন নিয়ে ঢুক গেল। গর্তটার মুখ খুবই ছোট। একজনের বেশি কিছুতেই ঢোকা সম্ভব নয়। বাধ্য হয়ে অন্য সবাই গর্তের মুখেই অধীর প্রতীক্ষায় গ্রহণ গুণতে লাগলেন। ঘড়ির কাঁটা ঘুরেই চলেছে। কিন্তু হ্যারির ফেরার চিহ্নও নেই। কোথায় সে? কোথায় গেল সে! ফিরতে এত দেরি করছে কেন? কী আশ্চর্য ব্যাপার। হ্যারি কি বাতাসে উবে গেল নাকি?

অস্থিরচিত্ত জেমস স্টার বার বার গর্তের মুখে উঁকি দিয়ে লণ্ঠনের আলোয় হ্যারির খোঁজ করতে লাগলেন। বার্থ প্রয়াসের কোন চিহ্নও নেই।

বুড়ো সাইমন ফোর্ড এবং তাঁর স্ত্রী ম্যাগ অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় মুষড়ে পড়ার জোগাড় হলেন। সাইমন আর ধৈর্য ধরতে না পেরে গর্তটার মধ্যে ঢোকার জন্য একটা পা ভেতরে চালান দেয়ামাত্র জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে মৃদু একটা আলো হঠাৎ দেখতে পেলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই হ্যারির কর্তৃত্বের ভেসে এল—‘মি. স্টার, আসুন। এসে দেখুন, কী অবিস্মাশ্য কাণ্ড! মা-বাবা তোমরাও এস। সবাই নিজের চোখে দেখে যাও, অ্যাবারফয়েলের দ্বারোদ্ঘাটন করে ফেলা হয়ে গেছে। বুকভরা কালো হীরা নিয়ে পাতালপুরী সবাইকে আহ্বান করছে! এসো! সবাই এসে নিজের চোখে দেখে যাও!’

আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ব্যস্ত পায়ের ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার আর বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড গর্তটার ভেতর দিয়ে সদা আবিস্কৃত খনিটার দিকে এগিয়ে চললেন।

সুড়ঙ্গটা ধরে সামান্য যেতে না যেতেই তাঁরা রীতিমতো চমকে উঠলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এ যে পুরোদস্তুর একটা গ্যালারি। মানুষের অভিজ্ঞ হাতের ছোঁয়ায়ই বুঝি এমন একটা অসম্ভব কে বাস্তবে পরিণত করা হয়েছে। শাবল আর গাঁইতির ঘা মেরে মেরে, কে যেন সবার অলক্ষ্যে গ্যালারিটা তৈরি করে রেখে গেছে। ঠিক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো একটা খনি।

আসলে কোনো মানুষের হাতের স্পর্শে গড়ে তোলা গ্যালারি এটা মোটেই নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ভূস্তরই নিজের খেলালের বশে নিজেকে এমন অদ্ভুতভাবে গড়ে তুলেছে।

অফুরন্ত কালো হীরার মুখোমুখি হয়ে বুড়ো সাইমন রীতিমতো স্তম্ভিত। মুখ দিয়ে রা পর্যন্ত তাঁর বেরোচ্ছে না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে একদম শেষপ্রান্তে গিয়ে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন।

গ্যালারিটার একেবারে শেষ প্রান্তে বিশালায়তন একটা গর্তের দিকে সবার নজর গেল। তারা তার ভেতরে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়ার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। গর্তটার গভীরতা সম্বন্ধে কোনো ধারণাই করতে পারল না। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় বুঝা গেল জলস্তর স্থির।

সাইমন ফোর্ড সেদিনের মতো ফিরে আসার প্রস্তাব দিলেন।

সবাই পিছন ফিরতেই হ্যারি থমকে গেল। উৎকর্ণ হয়ে কোন একটা অত্যাশ্চর্য শব্দ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য উৎকর্ণ হয়ে মুহূর্তকাল কাটিয়ে বলল, ‘ওই—ওই যে শব্দন, মাথার ওপর কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের পাথরের স্তরে চাপা দুম দুম শব্দ ভেসে আসছে।’

সাইমন এবার কানে হাত রেখে আকস্মিক উদ্ভূত শব্দটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে সোঁপ্লাসে বলে উঠলেন—‘কী আশ্চর্য কাণ্ড স্যার! এরই মধ্যে নিউ অ্যাবার ফয়েল ট্রাক চলাচল করতে লেগেছে। ট্রাকের মদ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।’

‘না, ট্রাকের শব্দ বলে তো মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, সমুদ্রের ঢেউ তীরে এসে সবেগে আছাড় মেরে পড়ছে। ওই—ওই সমুদ্রের গর্জন!’—হ্যারি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলল।

সাইমন চোখে মুখে চিন্তার ছাপ অক্ষুণ্ণ রেখেই এবার বললেন—‘সমুদ্রের গর্জন হওয়ার কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। আমরা হয়ত বালক ক্যাটরিনের ঠিক তলায় অবস্থান করছি। আর ছাদটা তেমন পুরু না হওয়ায় আওয়াজটা হয়ত এমন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।’

হ্যারি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জেমস স্টার-এর মুখের দিকে তাকাল। জেমস স্টার তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে মুচকি হেসে বললেন—‘সাগরের তলদেশে হলেও এখান থেকে কয়লা তোলা সমস্যার ব্যাপার হবে না। আমরা এমন একটা সুড়ঙ্গ গড়ে তুলব যার ভেতর দিয়ে আমেরিকায় হাজির হওয়া সম্ভব হবে।’

জুল বার্ন-৫(ক)

সাইমন ফোর্ড তাঁর কথাটাকে নিছক তামাশা বলে ধরে নিলেন।

এবার ফিরে আসার পালা।

মাইলখানেক পথ তাঁরা নির্বিঘ্নেই ফিরে এলেন। এবারই একেবারে অকল্পনীয় এক ঘটনার মুখোমুখি হলেন। হঠাৎ এক জোড়া অতিকায় ডানার জটপটানি তাঁদের কানে এল।

মুহূর্তের মধ্যে এমন একটা ঝাপটা লাগল যে হ্যারির হাতের লণ্ঠনটা হাড থেকে খসে পড়ল। ব্যস, একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেল একমাত্র স্বল্প লণ্ঠনটা। নিমেষে খনিগর্ভের জমাটবাঁধা অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেলল। চোখের পলকে বুড়ো সাইমন ফোর্ড, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, হ্যারি ফোর্ড আর তার মা সবাই কে কোথায় যে ছিটকে পড়ল তার ঠিক ঠিকানা রইল না। অজানা এক ভীতি আর বিপদশঙ্কায় সবাই কঁকড়ে গিয়ে বাকশক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

আতঙ্কিত হয়ে সবাই ধরেই নিলেন, অদৃশ্য সে শয়তানটারই কাজ। হতচ্ছাড়াটা কি তবে খনিগর্ভে কারো উপস্থিতিই বরদাস্ত করতে চাইছে না। তাই সে বিভিন্ন কৌশলে আক্রোশ প্রকাশ করে সবার মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে চলেছে!

ভীতসন্ত্রস্ত মনে সবাই ভাবতে লাগলেন, সবে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে পেরেছেন। এখনো পাঁচ মাইল বাকি।

সাইমন ফোর্ড সবার মধ্যে সহাস সঞ্চার করতে গিয়ে বললেন—‘কেউ ভয় পাবেন না। মুষড়ে পড়ার কোনোই কারণ নেই। পথ তো আমাদের চেনাই। অন্ধকার হলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক ডেরায় ফিরে যেতে পারব। পাশাপাশি গা-ষোষাষি করে চলুন। দলছুট হবেন না।’

সবার মধ্যেই অজানা একটা ভীতি কাজ করে চলেছে—কে? কে এই অদৃশ্য শত্রু? শয়তানটা কেন বারবার অতর্কিত আক্রমণে এমন উৎসাহী হচ্ছে? কিই বা তার উদ্দেশ্য?

সাইমন ফোর্ড পথপ্রদর্শক হয়ে আগে আগে চলেছেন। কিছুটা পথ অতিক্রম করে এক সময় আর্তনাদ করে উঠলেন—‘হায় সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে গেছে! আর বাঁচার কোনো উপায় নেই—!’

‘পথ হারিয়ে অন্যদিকে চলে এসেছি। পাতালের অন্ধকার পুরীতে আমরা বন্দি হয়ে পড়েছি। পথ যদি নাও হারাই তবে কোন শত্রু পাথর চাপা দিয়ে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অন্ধকার কারণার থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোনো ফিকিরই দেখা যাচ্ছে না।’

ব্যস, নিউ অ্যাবারফয়েলে জেমস স্টার সদলবলে কয়েদ হয়ে পড়লেন। অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন সবাই।

একদিন—দুদিন করে পুরো একটা সপ্তাহ কেটে গেল।

হঠাৎ আবিষ্কার করা হল, ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার নিরুদ্দেশ। একেবারেই বেপাতা হয়ে গেছেন তিনি। গলাছেড়ে ডাকাডাকি হাকাহাকি করে তাঁর কোনোই হদিশ পাওয়া গেল না। চারদিকে ঝোঁজখবর ও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, উদলোক গ্র্যানটনশায়ার বন্দর থেকে জাহাজে উঠেছেন।

বহুভাবে তল্লাশি চালিয়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের ক্যাপ্টেনকে বের করা সম্ভব হল।

মাঝবয়সী ক্যাপ্টেন বললেন, তিনি নাকি ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারকে স্টার্লিং বন্দরে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন। ব্যস, এর বেশি কিছুই তাঁর জানা নেই।

বুড়ো সাইমন ফোর্ড ক্যাপ্টেনের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখলেন, তিনি যেন ব্যাপারটাকে কারোর কাছেই ফাঁস না করেন।

ব্যাপারটা নিয়ে এডিনবরার রীতিমত হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের অন্তর্ধান জনমানসে ক্রমশ রহস্যের সঞ্চার করল, লোকের মুখে মুখে নানা কল্পিত কাহিনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। হাটে-মাঠে-বাজারে ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় একই গল্প। আর সব গল্পের নায়ক একই ব্যক্তি—জেমস স্টার।

একদিন রয়েল ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট স্যার ডব্লিউ এনফিসস্টোন ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের লেখা একটা চিঠি পেশ করলেন। চিঠিটার বক্তব্য থেকে জানা গেল, তিনি এডিনবরার বাইরে কোথাও রয়েছেন। কিন্তু কোথায়, কেন এবং কোন অবস্থায় রয়েছেন তার কিছুই জানা গেল না। পুরো ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। আসলে তিনি যে অ্যাবারফয়েলে পাড়ি জমিয়েছেন তা তো আর কারোরই জানা নেই। অতএব এদিকটা নিয়ে কারো চিন্তার অবকাশও নেই।

একমাত্র জ্যাকরিয়ান জেমস স্টারকে দেখেছিল। তাও অ্যাবারফয়েল খনি থেকে মাইল চল্লিশের দক্ষিণ পশ্চিমে। আর সে গানবাজনা নিয়েই সর্বক্ষণ মেতে থাকে। এসব ব্যাপার নিয়ে তার মাথা ঘামাবার সুযোগই বা কোথায়?

চারদিকে লোকজন ছুটোছুটি করে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের খোঁজ করতে লাগল। খবরের কাগজের পাতায় বিজ্ঞাপনও ছাপা হল। কিন্তু সবই বৃথা চেষ্টা। কেউই তাঁর খোঁজ দিতে পারল না।

বারোই ডিসেম্বর। সে রাতে এক অত্যন্তর্ঘ্য, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। যারা ভূতপ্রেত, অলৌকিক অশরীরী আত্মার গল্প শুনে নাক সিটকায় তারাও কাণ্ডটা শুনে বিষয়ে হতবাক হয়ে গেল।

হায় ঈশ্বর! এ কী কলেঙ্কারী কাণ্ড। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডও কোননি ঘটতে পারে! অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা হচ্ছে—ফির্থ অব ক্লাইডের বাঁকে পোতাশ্রয়ে একটা আলোকস্তম্ভ গড়ে রাখা হয়েছে। এর ভূমিকা জাহাজকে উপকূল আর চোরা পাহাড়ের সংকেত দেখানো।

অরভিন নগরের একান্তে একটা ভাঙাচোরা দুর্গ আছে। জায়গাটা একেবারেই জনমানবশূন্য। এরকম নির্জন নিরালা পরিবেশে নাকি প্রেতাত্মারা দাপাদপি করে বেড়ায়। পোল্যান্ড ও হাইল্যান্ডের মানুষ ভূতপ্রেত দৈত্য দানোর প্রতি বিশেষ জুল ভার্ন-৫(খ)

আত্মহত্যাজন। কেবলমাত্র অরভিন নগরের ভাঙা দুর্গটাই নয়, সবচেয়ে পুরনো দুর্গ রবার্ট স্ট্রাট-এর ডোনডোনাল্ড দুর্গকে নিয়েও কম অলৌকিক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত নেই। তবে জনসমাজে যত কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও রোমহর্ষক আশুন ডাইনির বুক কাঁপানো কাহিনী। সে নাকি মুখে লকলকে আগুনের শিখা নিয়ে আকাশচুম্বী মিনারের চূড়ায় রোজ রাতে রীতিমতো দাণিয়ে বেড়ায়। এমুহূর্তে অশরীরী আত্মা আশুন ডাইনির কাহিনী জনগণের মনে সবচেয়ে বেশি আতঙ্ক সঞ্চার করেছে।

এক রাতে জ্যাকরিয়ান সমুদ্রের কাছাকাছি একটা ঘরে গান বাজনার মজলিশ বসিয়েছে। আচমকা সমুদ্রের দিক থেকে বুকফাটা কান্না ও চোঁচামেচি ভেসে এল। তিনজন লোক একটা বড়সড় পাথরের চাঁইয়ের ওপরে দাঁড়িয়ে গল্প ছেড়ে চোঁচাচ্ছে। জ্যাক রিয়ানের দলের সবাই ছুটোছুটি করে গিয়ে এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্যটার মুখোমুখি হল।

অন্ধকার ভেদ করে একটা জাহাজ উল্কার বেগে তীরের দিকে ছুটে আসছে। সেটা দেখেই লোক তিনজন এমন আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

অস্থির চিত্ত জ্যাকরিয়ান অনুসন্ধিসু নজরে চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই রীতিমত শিউরে উঠল। সে দেখল, অদূরবর্তী ডানডোনাল্ড দুর্গের চূড়া থেকে আশুন ডাইনি লকলকে আগুনের শিখা ছড়াচ্ছে। দমকা বাতাসে অলৌকিক আগুনের শিখাটা নাচনাচি করছে। আর সেটাকে লাইট হাউস ভেবে জাহাজের ক্যাপ্টেন পুরোদমে জাহাজ চালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কাছেই উপসাগর আছে। অতএব কোনই সমস্যা নেই। কিন্তু আশুন ডাইনি বা জৌতিক আলোর ব্যাপারটা তো আর তাঁর জানা নেই।

উপস্থিত সবাই তারদ্বরে চিলিয়ে উঠল—‘সিগন্যাল। সিগন্যাল দেখাও। জাহাজটা চোরা-পাহাড়ে আছাড় খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে যে! কিন্তু কার বুকের পাটা এমন শক্ত যে, আশুন ডাইনির কাছে গিয়ে জাহাজটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে।

না, জাহাজটা রক্ষা পেল না। উল্কার বেগে ছুটতে ছুটতে এসে বিশালায়তন জাহাজটা চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শেষ! সব শেষ! কোনোভাবেই সমস্যা নেই। কিন্তু আশুন ডাইনি বা জৌতিক আলোর ব্যাপারটা সংজ্ঞাহীন নাবিককে উদ্ধার করতে পারল।

জাহাজটার আকস্মিক দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু হল। ম্যাজিস্ট্রেটের তদন্ত। সবাই একই কথা বলল। ডানডোনাল্ড দুর্গের রহস্যজনক অলৌকিক আশুনই এর জন্য একমাত্র দায়ী।

ভূতপ্রেত বা অশরীরী আত্মার ব্যাপারে বিচারক উৎসাহী নন। এসব ব্যাপার বিচারে স্থান পায় না। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া বিচারক এক পাও নড়তে নারাজ। দুর্গের চূড়ায় নির্ধাৎ কোনো না কোনো চক্রান্তকারী আশুন জ্বালে।

পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসারেরা ডানডোনাল্ড দুর্গে হনো হয়ে খুঁজে বেড়াল। অশরীরী আত্মার পদচিহ্ন মাটিতে পড়ে না বটে, কিন্তু মানুষের পায়ের ছাপ দুর্গের মেঝেতে পড়তে বাধ্য। না, পায়ের ছাপতো দূরের ব্যাপার। দেশলাইয়ের কাঠি বা একটা কাগজের টুকরোও কারো চোখে পড়ল না। অনন্যোপায় হয়ে পুলিশের লোকেরা পথ ছেড়ে দাঁড়াল। এবার ভূত প্রেতে বিশ্বাসীদের উল্লাস হাজার গুণ বেড়ে গেল।

একদিন জ্যাকরিয়ান স্টেশনে দাঁড়িয়ে। ট্রেনের দেরি থাকায় প্রাটফর্ম পায়চারি করছে। হঠাৎ একটা পোস্টারের দিকে তার চোখ পড়ল। তাতে লেখা—“এডিনবরা ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার গত ৪ ডিসেম্বর গ্র্যান্টনলয়ার বন্দর থেকে প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজে চেপে যাত্রা করেন। সেদিনই তিনি স্টার্লিং বন্দরে জাহাজ থেকে নামেন। তারপর থেকেই তার আর কোনোই খবর নেই। তার খোঁজ কারোর জানা থাকলে অনুগ্রহ করে এডিনবরা রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতিকে জানানো বাধিত হব।”

বিজ্ঞপ্তিটা পড়া শেষ করে জ্যাকরিয়ান আপনমনে বলে উঠল—‘যা বাবা! এ যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি! জেমস স্টারকে ৪ ডিসেম্বরই তো হারির সঙ্গে দেখেছি। এই তো ৭-৮ দিন আগেকার কথা। ব্যস, তারপর থেকে অদলোক বোপাড়া। এজন্যই হয়ত হারি আমার গানের মজলিশে উপস্থিত থাকে নি।’

পোস্টারের বক্তব্য পড়ার পর ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের খবরটা রয়েল ইনস্টিটিউশনের সভাপতিকে পৌঁছে দেয়ার জন্য জ্যাকরিয়ান খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল। ইয়ারো শ্যাফটের মুখে গিয়ে দেখা ভেতরটায় জমাটবাঁধা অন্ধকার বিরাজ করছে। অন্ধকার অগ্রাহ্য করে সে মই বেয়ে নামতে লাগল। পরপর ত্রিশটা চাতাল পেরিয়ে হারির আস্তানায় হাজির হওয়া যায়। এ পথ তার খুব চেনা। একের পর এক ধাপ বেরিয়ে সে সাতাশ সংখ্যক মইটার পরের ধাপে পা দিতে গিয়ে ধমকে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! মইটা তো যথাস্থানে নেই! তবে কি সেটাকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে? তবে কি জেমস স্টার হারির সঙ্গে পাতালপুরীতে নেমে যাওয়ার পর মইয়ের অভাবে আর উঠে আসতে পারেন নি? তবে কি গত দশদিন জেমস স্টারসহ সবাই পাতালপুরীতে বন্দিদশা প্রাপ্ত হয়েছে? সবাই অসহায়ভাবে আটকা পড়ে গেছে?

ব্যস, মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে জ্যাকরিয়ান মই বেয়ে তরতর করে পাতালপুরী ছেড়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে উঠে এল। এডিনবরা থেকে ফিরে জ্যাকরিয়ান অবিশ্বাস্য খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিল। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার যে পাতালপুরীতে পড়ে অসহায়ভাবে বন্দি জীবন যাপন করছেন এব্যাপারে কারোর মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগল না।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টারের সহকর্মী ও অভিনু হৃদয় বন্ধু স্যার উইলিয়াম এলফিনস্টোন ব্যাপারটা শোনামাত্র যত শীঘ্র সম্ভব আবারফয়েল খনির মধ্যে লোক নামানোর জন্য জরুরি হুকুম জারি করলেন। আর হুকুম দিলেন, যে-কোনোভাবে জেমস স্টার-এর খবর এনে তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে জ্যাকরিয়ানের নেতৃত্বে একদল লোক শাবল, গাঁইতি ও অন্যান্য অত্যাাবশ্যক যন্ত্রপাতিসহ খনিগর্ভের সাতাশ নম্বর চাতালেত হাজির হল। এবার ইয়া লম্বা দড়ির প্রান্তে লণ্ঠন বেঁধে সোজা নিচে নামিয়ে দিল।

লণ্ঠনের আলো অনুজ্জ্বল হলেও স্পষ্ট দেখা গেল নিচের মইটা হাফিস হয়ে গেছে। এবার দড়ির মই বেয়ে স্যার উইলিয়াম এলফিনস্টোন ও অন্যান্যরা নিচে নেমে চলল। সবার শেষ চাতালটায় পৌঁছেও কারোরই সাড়া মিলল না।

একসময় জ্যাকরিয়ান চিৎকার করে উঠল 'ওই—ওই যে, পোড়া মইটা পড়ে রয়েছে। মইটাকে কে যেন পুড়িয়ে দিয়েছে।'

পোড়া মইটা দেখে স্যার উইলিয়ম হঠাৎ অস্বাভাবিক মুখড়ে পড়লেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি সদলবলে সাইমনের ডেরায় হাজির হলেন।

উইলিয়মের আশা ছিল সাইমনের বাড়ি এলে আসাল ব্যাপারটা জানতে পারবেন। কিন্তু কুঁড়েঘরটার দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই সবাই তাঁকে উঠলেন। ঘর ফাঁকা। ভোঁ ভাঁ! এতগুলো লোক কোথায় চলে গেল!

সাইমন, হ্যারি আর জেমস স্টারের নাম ধরে গলা ফাঁটিয়ে ডাকাডাকি করা হল। ব্যর্থ প্রয়াস। কেউই সাড়া দিল না।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ পড়তেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সাইমনের স্ত্রী ম্যাগি ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে দিয়ে হিসাব রাখতেন। দেখা গেল ২রা ডিসেম্বরের তারিখটা শেষ কাটা হয়েছে। এবার বুঝা গেল, ফোর্ড-পরিবারের সবাই ছয়ই ডিসেম্বর অর্থাৎ ঠিক দশদিন আগে বাড়ি ছেড়ে কোথাও না কোথাও চলে গেছে। ভয়ঙ্কর কোন পরিণতির আশঙ্কায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে উইলিয়ম কপালে হাত দিয়ে মাটিতে ধপাস করে বসে পড়লেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জ্যাকরিয়ান চিল্লিয়ে উঠলেন—'ওই—ওই যে, একটা আলোকশিখা দেখা যাচ্ছে! ওই যে, ওই আলোকশিখা!'

উইলিয়ম ঝট করে লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মধ্যে অবর্ণনীয় উত্তেজনা ভর করল। অস্থিরভাবে ডানদিক-বাঁদিক বেকে আলোকশিখাটাকে বার বার দেখতে লাগলেন।

উইলিয়ম অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠলেন—'ধর! ধর! দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেল।'

জ্যাক প্রতিবাদের স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কাকে? কাকে ধরতে বলছেন? ওটা তো আর সাধারণ আলোকশিখা নয় যে ধরে ফেলবেন?' এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

'তবে? ওটা তবে কী?'

'অশরীরী আত্মা! পেত্নীর আলো! আপনি বলছেন ওটাকে ধরতে?'

উইলিয়ম ভূত প্রেত বা অশরীরী আত্মাটাস্থার প্রতি আস্থা রাখেন না। তিনি কণ্ঠস্বরে বিরক্তি প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ধ্যা! আরে রাখ তোমার ভূতপ্রেত আর অশরীরী আত্মা! কথা বলতে বলতে তিনি লম্বালাম্বা রহস্য সঞ্চারকারী আলোকশিখাটার দিকে ধাওয়া করলেন। বাধ্য হয়ে জ্যাকরিয়ান আর উপস্থিত অন্যান্যরাও তাঁকে অনুকরণ করতে লাগলেন।

আলোকশিখাটার পিছনে তারা উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগলেন। দৌড়াচ্ছেন তো দৌড়াচ্ছেনই। দৌড়! দৌড়! আর দৌড়! দৌড়াতে দৌড়াতে সবার হাঁপ ধরে গেল। জিত বেরিয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু আলোকশিখাটাকে ধরতে পারা তো দূরের কথা, তার কাছাকাছি পর্যন্ত দলের কেউ যেতে পারলেন না। মায়া আলোক শিখাটা কখনো অদৃশ্য হচ্ছে, কখনো নিভে যাচ্ছে আবার কখনো-বা অত্যাঙ্ক হয়ে উঠছে।

জ্যাকরিয়ান আলোয়ার আলোর মতো রহস্যময় আলোক শিখাটার দিকে তাকিয়ে অনবরত ইষ্টনাম জপ করতে লাগল। কারণ, ভূত পেত্নীর পিছন ধাওয়া করে মানুষের যে শেষ পরিণতি কী হয় তা সে যে ভালোই জানে।

উইলিয়ম যখন বুকভরা হতাশা আর ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে ঝুঁকতে ঝুঁকতে ছুটছেন তখন দেখা গেল আলোক শিখাটার সঙ্গে তাদের ব্যবধান ক্রমে কমে আসছে। সেটা আগের মতো নিভছে—জ্বলছেও, না আর অদৃশ্যও হচ্ছে না। আর দূরত্ব কমতে কমতে শ' দুই ফুট থেকে এখন মাত্র ফুট পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে।

জ্যাকরিয়ান একসময় থমকে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো! এবার আলোক শিখাটার তলায় অস্পষ্ট একটা প্রাণীর মতো কী যেন দেখতে পেলেন। আলোর শরীর? না, তা কী করে সম্ভব? ঠিক যেন একটা মানুষের অবয়ব। এ কী অলৌকিক কাণ্ড রে বাবা! আলোর দেহান্তর! ধ্যাৎ, এ কী করে হতে পারে! তবে ওটা কি? জ্যাকরিয়ান মহাধক্কে পড়ে গেলেন।

আশঙ্কাতা প্রথম উইলিয়মের মগজে এল। রহস্যসঞ্চারকারী মনুষ্যদেহধারী আলোটা আবার যে পাভা না হয়ে যায়। তার ভাবনাটাই বাস্তব রূপ পেল। চোখের পলকে আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাধ্যমত দ্রুত ছুটে সবাই সেখানে হাজির হয়ে থমকে গেলেন। দেখলেন, বিশাল একটা ফটল। আর তার পাশেই বিরাট একটা সুড়ঙ্গ।

উইলিয়ম মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকে গেলেন। অন্যান্যরা দুরূহ দুরূহ বকে তাঁকে অনুকরণ করলেন। ক্রমে সঙ্গীর্ণ হয়ে যাওয়া সুড়ঙ্গটা ধরে সামান্য অগ্রসর হয়েই সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। হঠাৎ দেখলেন, দেওয়াল ঘেঁষে চার চারটে মানুষ নিশ্চল নিথর ভাবে পড়ে।

উইলিয়ম স্বগতোক্তি করলেন, 'লাশ? লাশ নাকি?' পরমুহূর্তেই তিনি বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জেমস! জেমস স্টার! বন্ধু জেমস!'

জ্যাকরিয়ান আঁতকে উঠে বুকফাটা আর্তনাদ করল, 'হ্যারি! হ্যারি! এ কী হল! হায় ঈশ্বর—এ কী করলে!'

হ্যাঁ, নিশ্চল নিথরভাবে পড়ে থাকা শরীর চারটে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার, বুড়ো ওভারম্যান সাইমন ফোর্ড, তাঁর স্ত্রী ম্যাগি ফোর্ড আর কিশোরপুত্র হ্যারি ফোর্ড—এরই বটে।

মুহূর্তের মধ্যে ম্যাগি ক্ষীণকণ্ঠে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'ওঁদের—ওঁদের, আগে ওঁদের—'

উইলিয়ম ক্লাক থেকে কয়েক ফোঁটা করে ব্রান্ডি সবার মুখে দিতে লাগলেন। সামান্য পরিমাণে ব্রান্ডি পেটে যেতেই এক এক করে সবাই নড়েচড়ে উঠতে লাগলেন। আরও মিনিট কয়েকের মধ্যে তারা প্রায় চাঙা হয়ে উঠলেন।

জেমস স্টার সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'গত দশদিনে আমাদের অবশ্যই স্বর্ণপ্রাপ্তি ঘটত। কিন্তু

এ দশদিনে তিনবার কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় উদার হৃদয় ব্যক্তি আমাদের অগোচরে পাউরুটি আর জগভর্তি জল শিয়রে রেখে গিয়ে আমাদের ধড়ে প্রাণটুকু টিকিয়ে রেখেছে।’

উইলিয়াম ভাবলেন, তবে কি সে উদার হৃদয় ব্যক্তিই তাদের আলোর নিশানা দেখিয়ে এখানে টেনে এনেছে? মৃতপ্রায় মানুষগুলোকে বাঁচানোই কি তার অভিপ্রায়?

জেমস স্টারএরও একই ধারণা, এখানে এমন কেউ একজনও রয়েছে যাকে শত্রু বলে অভিহিত করা চলে। সে ছায়ার মতো তাদের পিছনে লেগে রয়েছে। অদৃশ্য সে শক্তিদ্বারই তাদের আলো নিভিয়ে দিয়ে চরমতম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। আর অ্যাবারফয়েল খনির প্রবেশপথ বন্ধ করে নিয়ে সে শক্তিই মরণ ফাঁদ তৈরি করেছিল।

ইতিমধ্যে তিন তিনটা বছর কেটে গেছে। এতদিনে দ্রুত পরিবর্তন হতে হতে নিউ অ্যাবারফয়েল কয়লাখনি পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করেছে। পুরনো সে খনি থেকে আবার নতুন করে কয়লা গুঠানোর কাজ পুরোদমে চলেছে।

আমেরিকায় যতগুলো প্রাকৃতিক গুহা রয়েছে তাদের মধ্যে ‘ম্যাডাম ডোথ’ বৃহত্তমের দাবিদার। সেখানে পাঁচ হাজার মানুষ ভালোভাবেই থাকতে পারে। অ্যাবারফয়েল বিশালতার দিক থেকে তার সমকক্ষ।

গম্বুজের ঠিক নিচের দিকে রয়েছে স্বচ্ছ ও মিঠা জলের হ্রদ একমাত্র যার তুলনা চলতে পারে। সেটা ম্যামাথ গুহার অভ্যন্তরস্থ ডেডসি।

হ্রদটার গা ঘেঁষে সাইমন ফোর্ড তাঁর নতুন বাড়িটা তৈরি করেছেন। তারই পাশে আর একটা নতুন বাড়ি তৈরি করে জেমস স্টার মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছেন। লেক ম্যালকমের তীরে সারিবদ্ধ বাড়ি তৈরি করে খনির শ্রমিকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেখতে দেখতে টিলার ওপরে সুন্দর একটা গির্জাও তৈরি করে ফেলা হল।

জেমস স্টার আর সাইমন ফোর্ড খনির কাজেই মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। নিউ অ্যাবারফয়েল খনিই তাঁদের ইহকাল পরকাল—সর্বস্ব।

একদিন কথা প্রসঙ্গে সাইমন বললেন, ‘জ্যাক-এর জন্যই আমরা এতগুলো মানুষ প্রাণে বেঁচে গেলাম। নইলে এতদিনে—’

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই জ্যাকরিয়ান অপ্রতিভ মুখে বলে উঠল, ‘আমি আর তেমন কী-ই বা করেছি, আপনাদের প্রাণ রক্ষার কৃতিত্ব তো খনির উপদেবতারই পাও না।’

‘ধৃৎ! উপদেবতা আবার কি হে! তোমরা এখনও কুসংস্কারে ডুবে রয়েছ।’

‘সে কী হে হ্যারি! এ কী বলছ! উপদেবতার অস্তিত্বের কথা আমরা সেদিন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম! খনির ভেতরে আমরা যখন দৌড়ে দৌড়ে হরান হয়ে পড়েছিলাম তখন উপদেবতাই তো আমাদের কাছে আমাদের পোঁছে দিয়েছিলেন। নইলে রহস্যজনক অলৌকিক আলোটার খপ্পরে পড়ে আমরা এতক্ষণে পরপারের বাসিন্দা হয়ে যেতাম।’

‘ভালো কথা, প্রতিজ্ঞা করছি তুমি যাকে রহস্যজনক অলৌকিক আলো বলছ, তার রহস্যভেদ আমি করবই করব।’

‘হায় ঈশ্বর! ভুলেও সে চেষ্টা কারো না হ্যারি। এতে কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে আনা ছাড়া লাভ কিছুই হবে না।’

বুড়ো সাইমন ফোর্ড এবার আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন—‘ভালো, দেখাই যাক না আসল রহস্যটা কী?’

খনি গর্ভের প্রতিটা নাড়ি নক্ষত্র বিশোর হ্যারির নখদর্পণে। বিচিত্র এক বিশোর সে। একটা লণ্ঠন আর অবসর পেলেই পঁই পঁই করে খনি আনাচে কানাচে সে চক্কর মেরে বেড়ায়। যে রহস্যময় হিতাকাঙ্ক্ষী স্বৈচ্ছায় এগিয়ে এসে তাদের চার-চারটে প্রাণিকে নিশ্চিতমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার হৃদিস তাকে পেতেই হবে। করতে হবে গভীর রহস্যটার কিনারা। খনিগর্ভে নতুন কয়লার স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে ফোর্ড পরিবারের ওপর আর অতর্কিত আক্রমণ হচ্ছে না।

পাতালপুরীতে সাইমন ফোর্ড, জেমস স্টার প্রমুখ সবাই নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করলেও হ্যারির মধ্যে মোটেই আনন্দ নেই। বরং সে কী যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিয়ে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে। সর্বদা মনমরা হয়ে বসে কিসের যেন ভাবনায় তলিয়ে থাকে। কারো কথায় থাকে না। ঠাট্টা তামাসাও সতর্কতার সঙ্গে আজকাল এগিয়ে চলে।

অস্থিরচিও হ্যারি একদিন কথার ফাঁকে বলল, ‘জ্যাক, আমার শেষ কথাটা শুনে রাখ। পাতালপুরীতে রহস্য সম্ভারকারী উপদেবতাকে আমি খুঁজে বের করবই। সে রহস্যভেদ আমি করবই করব।’

‘ভালো কথা। কিন্তু তুমি শুনে রাখ হ্যারি, আজ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সবকিছুর নায়ক কিন্তু একই ব্যক্তি, নির্ঘাত কোনো না কোনো পাগল—’

‘শোন জ্যাক, আমি অদ্ভুত একটা কুঁয়োর খোঁজ পেয়েছি। নিউ অ্যাবারফয়েল থেকে মাইল-পাঁচেক পশ্চিমে সেটার অবস্থান। আমি ভেতরে উঁকি দিয়ে ভেতরের দিকটা দেখে বুঝেছি, দেওয়ালটা একেবারেই খাড়া ও মসৃণ। মই ছাড়া তার ভেতরে নামে কার সাধ্য। দিন-সাতেক আগে আমি সেটার গভীরতা মাপতে গিয়ে দড়ি ছাড়ছিলাম। কিছুটা দড়ি ছাড়ার পর আমি কৌতুহলবশত নিচের দিকে ঝুঁকতেই অদ্ভুত একটা রহস্যজনক ব্যাপারের মুখোমুখি হই। মনে হল কুঁয়োটার ভিতরে কে যেন ভীষণরকম আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে উদ্ভূত আকস্মিক শব্দটা লক্ষ্য করে বুঝলাম, বিশালায়তন কোনো একটা পাখি অনবরত ডানা ঝাপটাচ্ছে। ভয়ঙ্কর রোমহর্ষক সে শব্দ।

জ্যাকরিয়ান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ‘ভেতরে কোনো পাখি ঢুকে থাকবে হয়ত।’

হ্যারি গভীরমুখে প্রতিবাদ করল—‘না, কেবল একটা পাখির ব্যাপার বলে মনে নিতে পারি মোটেই মন থেকে উৎসাহ পাচ্ছি না জ্যাক।’

‘আজ সকালেই কৌতূহলবশত কুঁয়োটার ধারে গিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়েই আমি চমকে উঠি। গায়ে রীতিমত কাঁটা দিয়ে ওঠে। শরীরের সব ক’টা স্নায়ু যেন একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কুঁয়োটার ভেতরে কে যেন থেকে থেকে গোঙাচ্ছে।’

জ্যাক চোখে-মুখে বিষ্ময়ের ছাপ ঝাঁক বলল, ‘গোঙাচ্ছে! কে গোঙাচ্ছে? কিসের গোঙানি অনুমান করতে পেরেছিস কিছু? ওসব বাজে বামেলা ছাড়ান দে। নিশ্চয়ই দমকা বাতাসের শব্দকেই তুই গোঙানি মনে করে আঁতকে উঠেছিলি।’

‘সে যা-ই হোক না কেন, আমি কুঁয়োটার মধ্যে নেমে রহস্যটার কিনারা করবই। কালই, আগামীকালই নামব।’

‘সে কি রে! তুই কি ক্ষেপেছিস! যুগ যুগ ধরে পতিত পড়ে রয়েছে এমন একটা কুঁয়োয় তুই নামতে চাচ্ছিস।’

কোনো যুক্তির অবতারণা করেই জ্যাকরিয়ান হ্যারিকে নিবৃত্ত করতে পারল না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই হ্যারি ইয়া লম্বা ও মোটা একটা দড়ি নিয়ে রহস্য সঞ্চরকারী কুঁয়োটার ধারে হাজির হল। দূর দূর বৃকে জ্যাকরিয়ান তার পিছন পিছন গিয়ে কুঁয়োটার ধারে দাঁড়াল। সে চারজন খনি শ্রমিককেও সঙ্গে নিল।

ব্যাপারটা হ্যারির বাবা-মায়ের কাছে গোপনই রাখা হল।

হ্যারি ঝটপট দড়ির একটা প্রান্ত নিজের কোমড়ে বেঁধে ফেলল। তারপর সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন কায়দায় উরুর সঙ্গে বাঁধল যাতে সে অন্যায়সে শূন্যে বুলে থাকতে পারে। প্রয়োজনে যাতে ব্যবহার করতে পারে সেজন্য খালি রেখে দিল। আর কোমরে সুতীক্ষ্ণ একটা ছুরি ঝুঁজ নিল। আর নিল একটা সেফটি ল্যাম্প। এবার দড়ির বিপরীত প্রান্তটাকে অদূরবর্তী একটা শক্ত খুঁটির সঙ্গে বেঁধে তৈরি হয়ে নিল।

এবার জ্যাক ও অন্যান্যরা দড়ি ধরে হ্যারিকে ধীরে ধীরে কুঁয়োটার মধ্যে নামিয়ে দিতে লাগল।

হ্যারি অন্ধকার কুঁয়োটার ভেতরে নামতে নামতে সেফটি ল্যাম্পের আলোয় কুঁয়োটার আনাচে কানাচে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল।

দড়িতে ঝুলন্ত হ্যারি মাঝে মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে অন্ধকার ভেদ করে ক্রমেই নিচে নামতে লাগল।

হ্যারি ভাবল, দড়ি ছাড়া এমন মসৃণ দেওয়ালযুক্ত একটা কুঁয়োর ভেতরে নামা কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব এর ভেতরে মানুষের অবস্থান কেবল অসম্ভবই নয়, কল্পনাও করা যায় না।

কুঁয়োর ভেতরের সেই চাপা গোঙানির শব্দটা হ্যারির কানে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। অত্যাস্চর্য ভীতিপ্রদ আর ভয়ঙ্কর রহস্যজনক সে শব্দটা অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা আর আতঙ্কে তার বুকের ভেতরে টিবিটিব করতে লাগল। স্নায়ুগুলো ক্রমেই যেন কেমন অসাড় হয়ে পড়ছে, শরীরের রোমগুলো পড়ছে ঝাড়া হয়ে।

হ্যারি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না, শব্দটা কিসের? আসল ব্যাপারটাই বা কি? কেই বা এমন বিশ্রী স্বরে গোঙাচ্ছে? কেনই বা তার এরকম যন্ত্রণার উদ্দেশ্য ঘটছে? তবে কি মানুষেরই কঠিন স্বর সেটা? যদি মানুষের কঠিন স্বর হয়েই থাকে তবে সে এমন মসৃণ একটা কুঁয়োর মধ্যে কেন—হ্যারি বুঝল, ব্যাপার সুবিধার নয়। সে কোমর থেকে ঝট করে ছুরিটা টেনে হাতে নিয়ে নিল। অকস্মাৎ যে-কোনো বিপদের মুখোমুখি হলে যাতে অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও মোকাবেলা করতে পারে।

হ্যারি কান দুটোকে সজাগ রেখে খুবই সন্তর্পণে মরণফাঁদের ভেতরে নেমে যেতে লাগল। খুবই দ্রুত নামছে। মিনিট দুইয়ের ভেতরেই সে প্রায় একশ’ কুড়ি ফুট গভীরে নেমে গেছে। সে নামছে তো নামছে, আরও কত গভীরে নামতে হবে তাই বা কে বলতে পারে।

আরও কিছুটা নামার পর সেফটি ল্যাম্পের আলোয় হ্যারি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল, কুঁয়োটার নিচের দিকটা যেন ক্রমেই সরু হয়ে গেছে।

হ্যারি নামছে তো নামছেই। অনবরত নেমেই চলেছে। এবার তার মনে হল যত নিচে নামছে ততই যেন কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। হিমেল বাতাস বইছে। কিন্তু নিচের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে জমাটবাঁধা অন্ধকার ছাড়া কিছুই তার নজরে পড়ছে না। শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার। অথৈ অন্ধকার সমুদ্রের ভেতর দিয়ে সে কেবলই নিচে নামছে।

এবার যেন হ্যারির দম বন্ধ হয়ে আসার জোপাড়া হল। গা ছমছম করা একেবারে থমথমে ভাব।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ভূপৃষ্ঠ থেকে সে এত গভীরে নেমে এসেছে, কিন্তু এখনও রহস্যজনক কোন কিছুরই মুখোমুখি হল না তো? হিংস্র খাবা নিয়ে কেউ-ই তো তার পথ আগলে দাঁড়ায় নি। এখন দড়িটা কেটে দিয়েও তাকে নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় নি।

হ্যাঁ, রহস্যময় গোঙানিটা কিন্তু খামে নি, বরং অবাস্তব কুহরটা অনবরত হ্যারির কানে ভেসে এসে আতঙ্কটাকে আরও গভীরতর করে তুলছে।

নামতে নামতে হ্যারি ১৮০ ফুট গভীরে নেমে গেল। জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্যরা, যারা ওপর থেকে দড়ি জুগিয়ে চলেছে তারা হঠাৎ লক্ষ করল দড়িটার টান হঠাৎ যেন বন্ধ হয়ে গেছে। দড়িটা এখন রীতিমত হাল্কা বোধ হচ্ছে। সবাই ভাবল, তবে কি হ্যারি একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল? নইলে দড়িটা কেনই বা টিরে হবে?

ঠিকই, হ্যারি কুঁয়োটার শেষ প্রান্তে, একেবারে তলদেশে পৌঁছে গেছে। তার পা দুটো মাটি স্পর্শ করেছে।

হ্যারি সেফটি ল্যাম্পের আলোটাতে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে একসময় চমকে উঠল। সচকিত হয়ে ফুটখানেক সরে গিয়ে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। হ্যাঁ, তার আশঙ্কা, অজান্তেই বটে। কুঁয়োটার তলদেশে সঙ্গীর্ণ একটা সুড়ঙ্গ তার নজরে পড়ল। আলোটা সে ঘোরাল। না, নিঃসীম অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আর সেটা এতই সঙ্গীর্ণ যে, একটা মানুষের পক্ষে অন্যায়সে তার ভেতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

হ্যারি ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে বসল। এবার প্রথমে মাথাটাকে সঙ্গীর্ণ সুড়ঙ্গটার ভেতরে গলিয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ফুট পাঁচেক এগিয়ে যেতেই তাকে থমকে থেকে যেতে হল। আচমকা ফুটখানেক পিছনের দিকে সরে এল। সুড়ঙ্গটা এতই সঙ্গীর্ণ যে, সেফটি ল্যাম্পটাকে বাড়িয়ে ধরে সে ব্যাপারটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তারও উপায় নেই,

কাঁপা কাঁপা ডান হাতটাকে ধীরে ধীরে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিল। অন্ধকারে এমন কোন কিছুর সঙ্গে হাতটা গিয়ে ঠেকল যার ফলে সে কেন্নোর মতো হাতটাকে ঝট করে গুটিয়ে আনতে বাধ্য হল।

হারির হাতটা কিসের, কার গায়ে গিয়ে ঠেকল যার ফলে সে আতঙ্কে এমন মুষ্ণু পড়েছে? কি? কী ওটা? ওটা কি সত্যি কোনো মানবদেহ? কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে এত গভীরে মানবদেহের অস্তিত্বের কথা ভাবতেও সে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অসম্ভব—একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

সত্যিই কি সেটা কোন মানবদেহ? যদি মানবদেহই হয়ে থাকে তবে সে মৃত, নাকি জীবিত?

বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে আতঙ্কিত হারি আবার কাঁপা কাঁপা হাতটাকে সামনের দিয়ে এগিয়ে নিতে লাগল। আবার সে বস্তুটাকে হাত ঠেকল। এবার সাহসে ভর করে তার গায়ে হাতিয়ে হাতিয়ে ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল। হ্যাঁ, তার অনুমান অস্বাভূই বটে। সত্যিই ওটা মানবদেহ। আর তার হাতটা, যাকে স্পর্শ করেছে সেটাও একটা পা। কিন্তু ঠাণ্ডা, ধরতে গেলে বরফের মত ঠাণ্ডা। হায় ঈশ্বর! রহস্যময় লোকটা কি তবে মৃত? আবার নিশ্চল নিখর পা-টার গায়ে হাত বুলাতে লাগল। না, হাঁটুর কাছাকাছি তেমন ঠাণ্ডা নয়তো। হাতটা যত ওপরে উঠেছে ততই যেন তার গরম বোধ হতে লাগল, এবার পা-টা আর নিশ্চল রইল না। পায়ের মালিক আচমকা সেটাকে টেনে নিল।

হারি সোঁদ্বায়ে চিৎকার করে উঠল—‘আছে! আছে! প্রাণ আছে! বেঁচে আছে!’—

হারি এবার সজোরে এক টান দিয়ে রহস্যময় লোকটার পা-টার কিছু অংশ বাইরে বের করে নিয়ে এল। তারপর আবার টানতে লাগল। ক্রমে তার সম্পূর্ণ শরীরটাই সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। সেফটি ল্যাম্পের আলোয় তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। এবার সে বুঝল, সেটা একটা শিশু। তার নাকের কাছে হাত নিয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, ক্ষীণ হলেও শ্বাসক্রিয়া চলছে। কিন্তু এতই ক্ষীণ যে, যে-কোনো মুহূর্তে তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যেতে পারে।

হারির মধ্যে ব্যস্ততা প্রকাশ পেল। যত শীঘ্র সম্ভব তাকে ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। দেরি করলে তাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না।

আর মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে হারি মৃতপ্রায় শিশুটাকে কাঁধে তুলে নিল। বাঁ হাতটা দিয়ে তাকে শক্ত করে ধরল। এবার দড়িটার গায়ে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। এর মাধ্যমে ওপরে অপেক্ষমান জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্যদের দড়িটা টেনে ওপরে তোলার ইঙ্গিত দিল।

ব্যস, দড়িটা এবার হারিকে নিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

হারি কাঁধের শিশুটাকে বাঁ হাত দিয়ে জাপ্টে ধরে গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে রাখল। আর ডান হাতে ছোরাটাকে শক্ত করে ধরে রাখল বেকায়দায় পড়লে যেন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করতে পারে।

দড়ির টানে হারি ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগল। ক্রমে উঠতে উঠতে অর্ধেকের চেয়ে বেশি পথ ওপরে উঠে এল।

এক সময় হঠাৎ হারির পায়ের তলা থেকে বুক কাঁপানো একটা শৌ শৌ শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মনে হল কুঁয়োর তলদেশে ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

হারি কাঁধের শিশুটাকে জাপ্টে ধরে কুঁয়োর তলদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। না, কিছুই দেখতে পেল না। কেবল নিঃসীম অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তার নজরে পড়ল না।

রহস্য সঞ্চারকারী শৌ শৌ শব্দটা ক্রমেই যেন হারির কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। একেবারে তার পায়ের কাছে উঠে এল। এমনকি এক ঠাণ্ডা বাতাস পর্যন্ত অনুভব করল সে। ব্যাস, অব্যক্তিত শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

হারি ডান হাতের ছুরিটাকে সাধ্যমত চেপে ধরল। আচমকা তার গায়ে কিছু ঝাঁপিয়ে পড়লে যাতে মোকাবেলা করে আত্মরক্ষার চেষ্টা অন্তত করতে পারে।

হারি কুসংস্কারের ধার ধারে না। ভূত প্রেত বা অশরীরী আত্মাটাদ্বারা ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়। তবু নিজেকে উৎকর্ষামুক্ত করতে পারছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারল বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি অনবরত হয়েছে চলছে।

দড়ির টানে সে ওপরে উঠেই চলেছে। আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট বাকি। একটু উঠে যেতে পারলে সব আশঙ্কা আর আতঙ্কের অবসান ঘটে যাবে। ব্যস, একেবারে তখন সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

জ্যাক ও তার সঙ্গী সাথীরা হারির সমস্যা ও ভয়ঙ্কর বিপদের কথা কিছুই জানতে পারে নি। আর যদি জানতেই পারত তবে অবশ্যই দড়িটাকে আরও দ্রুত গতিতে টেনে তাকে ওপরে তুলে নেয়ার জন্য তৎপর হত।

আবার! আবার সেই অব্যক্তিত শৌ শৌ শব্দটা তার কানে এল। এবার শব্দটা তাকে পাশ কাটিয়ে ঝট করে তার ওপরে উঠে গেল।

বিপদ অধিকতর কঠিন রূপনিয়ে দেখা দিল। হারি এবার নিশ্চিন্ত হল, বিশলাকৃতি একটা পাখি তার ঠিক মাথার ওপরে বার বার ডানা ঝাপটাচ্ছে। শুধু কি এই! সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ ঠোট দিয়ে তার মাতায় ঘন গন ঠোকর মারছে।

অসহ্য! একেবারেই অসহ্য। দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারটায় হারি উন্মাদের মত হাতের ছুরিটা অনবরত চালাতে লাগল। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সে দৈত্যাকৃতি পাখিটার গায়ে সামান্যতম আঁচড়ও দিতে পারছে না, আসলে শয়তান পাখিটা এমন ক্ষীপ্রগতিতে আক্রমণ করে উড়ে পালাচ্ছে যার ফলে আঘাত হানা তো দূরের ব্যাপার সে তার পালক পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারছে না।

হারির ধমক ধামক বা ছোরাটা কোনো কিছুই ক্রোদ্ধোন্মত্ত পাখিটার মধ্যে এতটুকুও ভীতির সঞ্চার করতে পারছে না।

আর একবার! আর একবার পাখিটা হারির কপালের কাছে সজোরে একটা ঠোকর বসিয়ে দিল।

হ্যারি পড়ল মহাসঙ্কটে। একদিকে হিংস্র পাখিটার কাছ থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা আর অন্যদিকে কাঁধের শিশুটা যাতে অসতর্কতার মুহূর্তে আচমকা পড়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তবে হ্যাঁ, হ্যারি অন্তত একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছে যে, শিশুটা ক্রোধোন্মত্ত পাখিটার আক্রমণের লক্ষ্য নয়। তার গতিবিধিই তাকে এরকম ভাবতে সাহায্য করছে। তবে এও তার বুঝতে বাকি রইল না যে, তার ক্রোধের কারণ, আক্রমণের উদ্দেশ্য শিশুটাই।

পাখিটার সূতীক্ষ্ণ ঠোঁটের মুহূর্মুহু আঘাতে জর্জরিত হয়ে হ্যারি একবার ভাবল শিশুটার জন্যই যখন তাকে এমন দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে তখন তাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে বিপদমুক্ত হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ভাবেতই তার সর্বস্ব কাঁটা দিয়ে উঠল। এত উঁচু থেকে একটা শিশুকে অতর্কিতে ছেড়ে দেয়ার পরিণাম যে কী হবে তা ভেবেই সে ভয়ে একেবারে কঁকড়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

হ্যারি পারল না কাঁধের অসহায় শিশুটাকে ফেলে দিয়ে পাখিটার ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে। এত চেষ্টা করে, নিজের প্রাণের মায়া তুলছে করে যাকে সুগভীর সুড়ঙ্গটা থেকে উদ্ধার করে এনেছে তাকে মুহূর্তে নির্মমভাবে যমের হাতে ঠেলে দিতে তার মনপ্রাণ কাতর হয়ে পড়ল। শিশুটাকে সে কাঁধ থেকে ফেলে তো দিলই না বরং আগের চেয়ে শক্ত করে জ্যান্ট ধরে গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে নিল।

একটু বাদেই শয়তান হিংস্র পাখিটার আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। যমের সাক্ষাৎ বাহন পাখিটার শৌ শৌ গর্জনও আর হ্যারি-র কানে আসছে না। হ্যারি ভাবল, পাখিটা হয়ত হতাশ হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়েছে, আক্রমণ বন্ধ করে সরে পড়েছে।

হ্যারি এবার একটু যেন দম ফেলার সুযোগ পেল। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করল সে। ওপরের দিকে সাধ্যমত ঘাড় ঘুরিয়ে জ্যাকের নাম ধরে গলা ছেড়ে কয়েকবার ডাকাডাকি করল।

হ্যাঁ, হ্যারির আত্মস্বর জ্যাক শুনতে পেয়েছে বটে। শুনতে অবশ্যই পেয়েছে। নইলে দড়ির টান অকস্মাৎ এমন বেড়ে গেল কেন?

হ্যারি এবার দড়ির টানে আগের চেয়ে অনেক দ্রুত গতিতে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল।

হ্যারি অবশ্যই মাথার ওপরের দড়িটার দিকে চোখ ফেরাল, তার দৃষ্টি এক জায়গায় থমকে গেল। বুকের ভিতরে হৃদপিণ্ডটা যেন আচমকা ডিগবাজি খেয়ে আবার ধীরে ধীরে সোজা হতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল তার। এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! এখন উপায়? এমন কি দেখল হ্যারি যার জন্য তার মধ্যে অকস্মাৎ এমন আতঙ্কের সঞ্চার ঘটল?

হ্যারি দেখল, তার মাথা থেকে আড়াই ফুটমত ওপরে শয়তান হিংস্র পাখিটা পায়ের সূতীক্ষ্ণ নকের আঁচড় আর ঠোঁটের কামড়ে দড়িটা কাটতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে হ্যারির বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

হ্যারি অনবরত হাতের ছুরিটা নাচিয়ে মুখে হিস হিস শব্দ করে পাখিটাকে তাড়াবার চেষ্টা করল। ব্যর্থ প্রয়াস। পাখিটা নির্বিকার। এবার সে আরও সর্বনেশে কাণ্ড শুরু করল। পায়ের লম্বা লম্বা নখগুলি দিয়ে দড়িটাকে আঁকড়ে ধরে ঠোঁট দিয়ে একের পর এক সুতো ছিঁড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে হতচ্ছাড়া শয়তান পাখিটা দড়িটার অনেকগুলো সুতো কেটে কাজ হাসিল করার পথে অনেকটা এগিয়ে গেছে। হ্যারি আঁতকে উঠে ভাবতে লাগল দড়িটা ছিঁড়ে কোনোক্রমে সুগভীর কুয়োকাটা মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। চোখের পলকে পঞ্চতৃপ্তি ঘটে যাবে।

নিশ্চিত মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হ্যারি তবু বাঁচার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে গিয়ে ঘন ঘন হিস হিস শব্দ করে পাখিটাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা অব্যাহত রাখল। কিন্তু পাখিটাকে নিরস্ত করতে পারল না। যমদূতটা নির্বিষ্ট মনে তার কাজ করেই চলল।

মৃত্যুভয়ে কাতর হ্যারি এবার গলাছেড়ে বিকট চিৎকার করতে লাগল। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! ওপর থেকে কোন অভয়বাণীই ভেসে এল না।

জ্যাক তার সাহায্যকারীদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর না পেয়ে হ্যারি আরও মুখড়ে পড়ল। সে ভাবল, জ্যাকরিয়ান যখন তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় নি তবে কি ভূপৃষ্ঠে ওঠার এখনও অনেক পথ বাকি? প্রাণরক্ষার কোনো আশাই কি তবে নেই?

চোখের তারায় আতঙ্কের ছাপ ঝাঁকে হ্যারি আবার মাথার ওপরে অবস্থানরত পাখিটার কাজের অগ্রগতি দেখার চেষ্টা করল। সে রীতিমত আঁতকে উঠে এবার বলল, 'হায় ঈশ্ব! এ যাত্রায় কি তবে রেহাই নেই! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমার ভবলীলা সাক্ষ করে দেবে।'

ক্রোধোন্মত্ত পাখিটা সে তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর পথ অবলম্বন করে প্রতিশোধ নেবে ঘৃণাক্ষরেও সে ভাবে নি।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হ্যারি শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে অধিকতর ক্ষীপ্রতার সঙ্গে হাতের দড়িটাকে নাচিয়ে সজোরে হিস হিস শব্দ করতে লাগল।

না, এবারও তার প্রয়াস সার্থক হল না। পাখিটা জুলজুল করে হ্যারির দিকে তাকিয়ে দড়িটা কাটার কাজ অব্যাহত রাখল।

হ্যারি এবার সরিয়া হয়ে ভাবল, যার জন্য তাকে এমন ভয়ঙ্কর সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে সে শিশুটাকে কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করবে। একজনের জন্য দুই দুজনের জীবন নষ্ট করা বোকামি ছাড়া কী।

হাতের বাঁধন সামান্য শিথিল করতেই তার বুকের ভেতরে কেমন যেন একটা অব্যর্থ যন্ত্রণার উদয় হল। তার মনে হল বুকের ভেতরে কেন অকস্মাৎ কঁকিয়ে উঠল।

না, হ্যারি পারল না। কাঁধের শিশুটাকে অঙ্গকার সুগভীর সুড়ঙ্গে ফেলে দিয়ে নিজের জীবন রক্ষার মতলবটাকে বাস্তবায়িত করতে পারল না। বরং অধিকতর বল প্রয়োগ করে তাকে চেপে ধরে রইল।

হারি এবার প্রাণান্ত প্রয়াস চালাল, দড়ির যে অংশটা পাখিটা কেটে ফেলে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর সে জায়গাটাকে ডান হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু হায়! সে জায়গাটা ধরা তো দূরের ব্যাপার হাতটা তার কাছাকাছিও পৌঁছল না।

দড়িটার আরও কয়েকটা সুতো কেটে দিয়ে শয়তান পাখিটা এখন এমন অবস্থা করেছে যে, যেকোন মুহূর্তে অবশিষ্ট সুতো কয়টা ছিঁড়ে গিয়ে হারির চরম পরিণতি ঘটিয়ে দেয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

নিরুপায় হয়ে হারি এবার পাখিটাকে লক্ষ্য করে একমাত্র সম্ভব হাতের ছোরাটা ছুঁড়ে দিল। হ্যাঁ, ছোরাটা তার গায়ে আঘাত করল ঠিকই। কিন্তু সেটা তাকে কতখানি আহত করেছে তা সে বুঝতে পারল না।

কাজ হয়েছে। ছোরাটা ছুঁড়ে মারায় কাজ অবশ্যই কিছু হয়েছে। আঘাত পেয়েই পাখিটা দড়ির আশ্রয় ছেড়ে উড়ে গেল। চোখের পলকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

হারির উপস্থিত বুদ্ধি ও তৎপরতার ফলে পাখিটা উড়ে গেল বটে। বিপদ কিন্তু পুরোপুরি কাটল না। কারণ, পাখিটা উড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দড়িটার সুতো কাটতে কাটতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তাতে সে কতক্ষণ যে হারি ও শিশুটার ভার সইতে পারবে, বুঝা যাচ্ছে না। বাকি সুতো কয়টা ছিঁড়ে গিয়ে যেকোন মুহূর্তে তাদের পাতালপুরীতে নিক্ষেপ করতে পারে।

না, ব্যাপারটা নিয়ে হারির ভাবনা চিন্তার অবকাশ নেই। মৃত্যুপথযাত্রী সে এবার বাঁচার শেষ চেষ্টা চালাতে গিয়ে বহু কায়দা কসরৎ করে কোনরকমে দড়িটাকে ধরে মুখের কাছে নিয়ে এল। এবার বহু কষ্টে সেটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে সাধ্যমতো ওপরের কাটা অংশটা ছাড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করল। পেরেছে—হ্যাঁ, হারি পেরেছে। দড়ির কাটা অংশের ঠিক ওপরের একটা জায়গা সে খুঁপ করে ধরে ফেলল। হারি যেন নবজন্ম লাভ করল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

হারি এবার নিঃসন্দেহ হল, কোনোরকমে দড়ির এ-জায়গাটা ধরে রাখতে পারলে এ যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যাবে। কিন্তু হায়! এ যে আরও সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তিনেকের মধ্যেই পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়ল। হাতের শিরা উপশিরাগুলি ফুলে উঠেছে। ব্যথায় রীতিমতো টনটন করছে। গেল! গেল! এই বুঝি দড়িটা হারির হাত থেকে খসে গেল। সে দাঁতে দাঁত চেপে সেটাকে ধরে রাখার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণই বা।

হারি দাঁতে দাঁত চেপে দড়িটাকে শক্ত করে ধরে মুহূর্তের জন্য ওপরের দিকে নজর ফেরাতেই সে আশান্বিত হল। আশা আনন্দে বুকাটা ভরে উঠেছে। জ্যাকরিয়ান ও অন্যান্য খনিকর্মীদের গলা কানে এল। মাত্র আর কয়েক ফুট উঠতে পারলেই সে স্বস্তি পেয়ে যাবে।

এদিকে হারির অবস্থা শোচনীয় অনুমান করে জ্যাকরিয়ানরা যত তাড়াহুড়ি সম্ভব দড়িটাকে টেনে হারি-কে ওপরে তুলে নিতে থাকল।

এদিকে হারির শক্তি প্রায় নিঃশেষ। মূঠোর মধ্যে দড়িটা থেকে থেকে হড়কে যেতে চাইছে। কিন্তু কাঁধের শিশুটাকে কোনরকমে ছুঁড়ে ওপরে ফেলে দিতে পারলে সেও বাঁচত আর তার নিজের প্রাণটাও কোনরকমে রক্ষা পেয়ে যেত। কারণ, দুহাতে দড়িটাকে আঁকড়ে ধরতে পারলে তো আর সমস্যাই থাকে না। হারি উপায়ান্তর না দেখে শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে দড়িটাকে ধরে বসল। না, আর সম্ভব নয়। শেষ রক্ষা করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। শরীরের সবটুকু রক্ত বুঝি মুখে এসে ভর করেছে।

হায় ঈশ্বর! হারির হয়ত আর প্রাণরক্ষা হল না। দড়িটা ঠিকই ওপরে পৌঁছবে, কিন্তু হারির পক্ষে তা আর সম্ভব হবে না। পৌঁছাবে কেবলমাত্র দড়ির প্রান্তটা। নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় তার চোখদুটো আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল।

গেল! গেল! গেল! এই বুঝি দড়ি আর হারির হাতটার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। হাতের কজি আলগা হয়ে যাবার জোগাড় হল। গেল—এই গেল-গেল—

হারি আচমকা চোখ মেলে তাকাল। হ্যাঁ, শেষ রক্ষা হয়েছে। অকস্মাৎ সবল দুটো হাত শিশুটাকে সমেত হারি-কে ধর করে ধরে ফেলল।

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। জ্যাক ও অন্যান্য খনি শ্রমিকরা হাঁচকা টানে হারিকে ওপরে তুলে আনল। হ্যাঁ, শেষপর্যন্ত হারি সত্যি ওপরে উঠতে পারল।

ওপরে উঠেই হারি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার ক্রান্ত অবসন্ন দেহটা জ্যাক রিয়ান এর কাঁধে এলিয়ে পড়ল। ইতিমধ্যেই খনি শ্রমিকদের একজন ছোঁ মেরে তার কাঁধ থেকে শিশুটাকে নিয়ে নিয়েছে।

জ্যাকরিয়ান বহু কষ্টে হারি-র হৃত সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। শিশুটা তো গোড়া থেকেই নিশ্চল নিথর। চোখ দুটো বন্ধ করে হারির কাঁধে মড়ার মত এলিয়ে পড়েছিল। তাকে উদ্ধার করার জন্য হারি এতক্ষণ নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে হতচ্ছাড়া শয়তান অতিকায় পাখিটার সঙ্গে কীভাবে লড়াই চালিয়েছে সেসবের কিছুই তার জানা নেই। খনিশ্রমিকদের একজন তার বুকের ওপর কান ঠেসে ধরে সোলাসে চেঁচিয়ে উঠল—‘আছে! আছে! প্রাণ আছে—এখনও বেঁচে আছে!’

জ্যাকরিয়ান সঙ্গে সঙ্গে এক যুবক খনিশ্রমিককে দিয়ে শিশুটাকে কটোজে হারি-র মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিল।

হারির মা ম্যাগি দুধ গরম করে চামচে দিয়ে অল্প অল্প করে দুধ শিশুটাকে মুখে দিতে লাগলেন। আশ্চর্য ব্যাপার তো। শিশুটা মৃদু শব্দ করে করে সবটুকু দুধই খেয়ে ফেলল। এবার সে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতে লাগল। একটু বাদেই সে বাদামি চোখ দুটো মেলে ম্যাগির মুখের দিকে তাকাল।

ম্যাগি ব্যস্ত হয়ে তার মুখের ওপর বুকে অতুল্য অগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—‘কী? কিছু বলবে বাছা?’

না, কিছুই বলল না সে। আসলে কিছু বলার ক্ষমতাই তার নেই। জীবনীশক্তি প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। ম্যাগির প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সে আবার ধীরে ধীরে চোখ দুটো বন্ধ করে দিল।

এদিকে জ্যাকরিয়ানের অকৃত্রিম সেবায় হ্যারির মধ্যে ক্রমে সংজ্ঞা ফিরে আসতে লাগল। একসময় সে চোখ মেলে তাকাল। অস্থির চোখের মণি দুটোকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে কাকে যেন খুঁজতে লাগল। এক সময় জ্যাকরিয়ানের দিকে জিজ্ঞাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—‘কোথায়? সে কোথায়? শিশুটা কোথায়? কেমন আছে সে?’

‘ভালোই আছে। তাকে তোমার মায়ের কাছে কটেজে পাঠিয়ে দিয়েছে।’

জ্যাক তার প্রশ্নের উত্তর দিল। সে এবার হ্যারি-কে নিয়ে কটেজের দিকে যাত্রা করল।

বুড়ো সাইমন ও তাঁর স্ত্রীর সেবা যত্নে শিশুটা এখন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

হ্যারি কটেজে পৌঁছে লণ্ডনহাতে ব্যস্ত-পায়ে শিশুটার দিকে এগিয়ে গেল।

লণ্ডনের আলোয় তাকে এক ঝলক দেখে নিয়েই সে চমকে উঠল, ‘আরে এ যে শিশু বা কিশোর নয়। কিশোর! বয়স পনের ষোল তো হবেই। অপুষ্টিজনিত কারণে দৈহিক বৃদ্ধি না হওয়ায় তার চেহারা কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। ঠিক যেন কোন এক কিশোরীর কঙ্কালের ওপর চামড়া জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এক পলকে দেখলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আর দীর্ঘদিন সূর্যালোকের স্পর্শ না পাওয়ায় তার গায়ের চামড়া ফ্যাকাসে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। শ্বেতীরোগীদের চামড়া ঠিক যেমনটা হয়ে থাকে। আর মায়ের জঠর থেকে পড়ার পর পুষ্টিকর খাদ্যের মুখ সে কোনদিনই দেখে নি।’

হ্যারি চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, কোনো কিশোরী এমন শীর্ণ ও নিস্বেজ হতে পারে এ যে কল্পনাও করা যায় না।

জ্যাকরিয়ান কুসংস্কারে বিশ্বাসী। সে মেয়েটাকে পরি বলে পরিচিত মহলে প্রচার করতে লাগল। তার মত, পরি না হলে এমন অলৌকিকভাবে তার আবির্ভাব কী করে সম্ভব হত? তার ওপর মেয়েটার গড়নেও অস্বাভাবিকতা রয়েছে যা সাদারগ্ন মেয়েদের মধ্যে আদৌ দেখা যায় না। জ্যাকরিয়ানের চোখে সবচেয়ে বেশি করে যে অস্বাভাবিকতাসমূহ ধরা পড়েছে তা হচ্ছে মেয়েটার চোখের চাহনি। আর চোখের তারাগুলোও অপ্রতিভ যা মানবীর মধ্যে চোখে পড়ে না। লণ্ডনের আলোয় সে নীরব চাহনি মেলে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। চারদিকে দৃশ্যাবলি, লোকজন যা কিছু দেখছে সবই তার কাছে বিশ্বয়ের সামগ্রী। কোন মানবীর মধ্যে এমন অমানবিকতা এবং অলৌকিকতা কখনই লক্ষিত হতে পারে না।

পরি কিশোরীটা ম্যাগির বিছানায় শুয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল না। যেন কয়েক বছরের ঘুম এক সঙ্গে ঘুমিয়ে নিয়েছিল পাতালপুরীর অন্ধকার কুয়োটার ভেতরে।

ম্যাগি সম্মুখে বললেন, ‘বাহা তোমার নাম কী, বলো তো?’

পরি কিশোরী ক্ষীণকণ্ঠে প্রায় অস্ফুট উচ্চারণ করল, ‘নেল।’

‘আচ্ছা নেল, তোমার কি কোনো কষ্ট, কোনো যন্ত্রণা—’

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই নেল বলল—ক্ষিধে—বড্ড ক্ষিধে। কিছু খেতে দিন। বহুদিন খাওয়া জোটে নি আমার।

‘ঠিক আছে বাহা, আমি এখনই তোমার জন্য খাবার নিয়ে আসছি।’

ম্যাগি কিছু হান্ধা ধরনের খাবার এনে নেলের সামনে রাখতেই সে গোম্বাসে সেগুলোর সন্ধ্যবহারে মেতে গেল।

একটু বাদে ম্যাগি বললেন, ‘নেল, ওই কুয়োটার ভেতরে তুমি কতদিন ছিলে বলো তো?’

নেল নিরুত্তর। মনে হল সে যেন গম্ভীর মুখে কিছু একটা ভেবে চলেছে।

ম্যাগি এবার বললেন, ‘ঠিক কতদিন ছিলে বলতে পারছ না! তবু আনুমানিক কতদিন ওখানে ছিলে বলো তো?’

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে নেল উচ্চারণ করল, ‘দি-ন? দি-ন, ক-ত দিন?’ তার ভাব দেখে মনে হল ‘দিন’ শব্দটার সঙ্গে তার ইতিপূর্বে কোনোদিন পরিচয় ছিল না। আজই প্রথম, এইমাত্র শুনল।

‘ঠিক আছে দিনের কথা নাই বা বলতে পারলে, বলো তো তোমার বয়স কত?’

এবারও সে চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে আগের মত অসহায় দৃষ্টি মেলে নীরবে তাকিয়ে রইল। আসলে ‘বয়স’ শব্দটাও সে আজই প্রথম শুনল।

হ্যারি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তার মধ্য থেকে আগেকার ঘোরটুকু নিঃশেষে কেটে গেছে।

হ্যারি এবার পায়ে পায়ে রুগ্ন অসহায় মেয়েটার বিছানার কাছে এগিয়ে গেল। শিয়রে বসল। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে তার ডান হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিল।

এবার নেলের ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে হান্ধা হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার পর হয়ত বা সে আজই প্রথম হাসল।

হ্যারি তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বলল, ‘নেল একটা প্রশ্নের জবাব দেবে? বলো তো, কুয়োটার ভেতরে তুমি ছাড়া আর কে ছিল? তুমি কি একাই ছিলে, নাকি অন্য কেউ তোমার সঙ্গে সেখানে ছিল?’

নেল এবার যেন কেমন ক্ষেপে গেল। প্রায় চিল্লিয়েই তার প্রশ্নের জবাব দিল, ‘একা? একদম একা। আমি ছাড়া আর কেউই সেখানে ছিল না।’

‘তোমার কে কে আছে? কোথায়—’

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই নেল বলে উঠল, ‘আমার কেউ নেই। আমি একা—একদম একা। আমি সহায় সম্বলহীন। বড় একা আমি।’ কথাটা বলেই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তখন আর কোনো কথা হল না।

হ্যারি এবার নেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর গিয়ে বসল। তার মাথায় টুকরো টুকরো বহু ভাবনা এসে ভিড় করল। সে আপনমনে ভাবতে লাগল, ‘কে এই নেল। কী-ইবা তার পরিচয়? কী

করে সে অন্ধকার কুয়োটার অতল গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নিল? অন্ধকার যক্ষপুরীতে সে কতদিন ধরে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে? তার এমন মর্মান্তিক অবস্থা কি করেছে বা হল? তার সে পাতাল জীবনের সঙ্গে অতিকায় পাখিটারই বা কী সম্পর্ক? নেলকে নিয়ে কুয়োটা থেকে উঠে আসার সময় কেনই বা সে এমন মরিয়া হয়ে আক্রমণ চালিয়ে হ্যারিকে বিপর্যস্ত করেছিল? পাখিটার সঙ্গে তার কোন গভীর রহস্য জড়িয়ে রয়েছে যার জন্য সে শেষ পর্যন্ত লড়ে গেছে? এরকম বিচ্ছিন্ন হাজারো ভাবনা তাকে নিদারুণ অস্থির চঞ্চল করে তুলল।

কুয়োটার অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করে আনা নেলের রহস্যজনক ব্যাপারটা কেবল ফোর্ড পরিবার ও অন্যান্য জনা কয়েক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। পাতালপুরীর খনি শ্রমিকদের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল তার রহস্যজনক কুয়ো জীবন আর আকস্মিক আবির্ভাবের কাহিনীটা। তবে হ্যাঁ, অলেকেই আসল ঘটনার সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে প্রচার করতেও ছাড়ল না।

এক সময় নেলের ব্যাপারটা পাতালপুরী থেকে উঠে এল স্টার্লিং শায়ারের কক্ষি হাউসে, রেন্টোরা, অফিস-কাছারি আর মাঠে ময়দানে কৌতূহলী মানুষের মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অনেক পরিবর্তন আর খাদ মেশাতে মেশাতে শেষপর্যন্ত কাহিনীটা এমন দাঁড়াল যে, নেলকে নাকি কয়লার স্তরের ভেতরে থেকে আবিষ্কার করা হয়েছে। কয়লার স্তরের ভেতরে যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু কঙ্কাল গাঁইতি আর শাবলের আঘাতে উঠে আসে তেমনি রহস্যজনকভাবেই নাকি, নেলকেও আবিষ্কার করেছে। শুধু কি এ-ই? কত শত বছর কয়লার স্তরের ভেতরে অবস্থান করেও তার জীবনীশক্তি অব্যাহত রয়েছে। ঘটনাটা যেখানে, যে রূপ নিয়েই পরিবেশিত হোক না কেন আসলে নেল একজন সর্বজন পরিচিত বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেল।

যে নেলকে খনি-শ্রমিক থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠের হাজার হাজার মানুষ আলোচনার ঝড় তুলে চলেছে সে কিন্তু এসবের তিলমাত্রও জানে না। মাত্র কয়েকটা দিনের মধ্যে সে যে কতখানি বিখ্যাত হয়ে গেছে তা তার একেবারেই অগোচরে রয়ে গেল।

সে অঞ্চলে অন্ধ কুসংস্কারের পূজারীর সংখ্যাই বেশি। ভূত-প্রেত বা অশরীরী আত্মাটোছার ব্যাপারে যারা বিশ্বাসী তারা পাতাল-কন্যা নেলকে কেন্দ্র করে রোমহর্ষক অত্যাচার্য গল্প ফাঁদতেও ছাড়ল না। আবার কেউ বা নেলকে অশরীরী আত্মার ছায়ামূর্তিতে পরিণত করে আসার জমিয়ে বসল। আবার কেউ কেউ তো সরাসরিই প্রেতাত্মা বলতেও দ্বিধা করল না।

জ্যাকরিয়ান বন্ধুদের মুখে শোনা নেলকে কেন্দ্র করে তৈরি কিছু কিছু খোস গল্প হ্যারিকে শোনাল।

গল্প শুনে হ্যারি মুচকি হেসে বলল—‘মন্দ কি? যেভাবেই হোক না কেন হ্যারি তো বিখ্যাত হয়ে উঠছে। যদি কিছু মনে না করিস তোকে একটা কথা বলতে পারি জ্যাক।’

‘কী? কী কথা? এত দ্বিধার কি আছে বুঝছি না তো? কি বলতে চাইছিস, বলেই ফেল না।’

‘শোন, না হয় মেনেই নিলাম, নেল অশরীরী আত্মা। তবে শুনে রাখ, সে যদি অশরীরী আত্মা হয়েই থাকে তবু অশুভ আত্মা মোটেই নয়—শুভ আত্মা।’

‘কী করে? শুভ আত্মা কেন?’

‘সে যদি অশুভ আত্মা নাই হয়ে থাকে তবে জল আর খাবার দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করতে অবশ্যই উৎসাহী হত না, ঠিক কি না? আমি হলপ করে বলতে পারি নেলই কাজটা করেছিল। তবে এ-ও শুনে রাখ জ্যাক, খনিতে একটা অশুভ আত্মার অস্তিত্বও রয়েছে। আমি প্রতিজ্ঞতা করছি, যে করেই হোক আমি তাকে খুঁজে বের করবই। আমাকে সে রহস্যটা ভেদ করতেই হবে।’

নেল বছরের পর বছর অন্ধকার কুয়োটার অতল গহ্বরে বাস করার ফলে তার চোখের মণি সরে গিয়েছিল। তাই মাত্রাতিরিক্ত দ্যুতিসম্পন্ন আলো তার কাছে পীড়াদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। অত্যাঙ্ক আলোর দিকে দৃষ্টিনিষ্ফেপ করলে তার চোখ দুটো যেন ঝলসে যায়। অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে একধারে সরিয়ে নেয়। তবে অন্ধকারে তার দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যেকোন প্রাণীর চোখের সঙ্গেই তার চোখের তুলনা চলে না। জমাটবাঁধা অন্ধকারে অনেক দূরের জিনিসও সে যেন এখন স্পষ্ট দেখতে পায়।

নেল কুয়োটার পাতাল গহ্বরেই জীবনের চৌদ্দ-পনেরটা বছর কাটিয়েছে। কুয়ো আর খনি ছাড়া আর কিছুই সে দেখে নি। ভূপৃষ্ঠের মানুষের কথা কারোর মুখে শোনেও নি কোনোদিন।

সবার মনেই একটা কৌতূহল কাজ করে চলেছে।

নেল কি কোনদিন সূর্য দেখেছে, পৃথিবীর বুকে কত সব সমৃদ্ধ নগর রয়েছে সে-সব ব্যাপারে সে কিছু জানে নি?

নেলকে ঘিরে প্রতিনিয়ত কৌতূহলী মানুষের ভিড় লেগেই থাকে। হাজার জন হাজাররকম প্রশ্ন করে করে তাকে রীতিমতো বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। নেল তাদের কোন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

একদিন ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার নেলকে আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন, ‘নেল, মন খোলসা করে বল তো, তুমি কি আমাদের সঙ্গে এখানেই বাস করতে উৎসাহী, নাকি তোমার প্রিয় সে কুয়োটাতেই ফিরে যেতে চাইছ?’

‘না, আমি এখানেই থাকতে চাই।’ কথাটা বলার পর তার দুচোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

আশ্চর্য! সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার! পর পর এতগুলো ঘটনা চোখের ওপর ঘটে গেল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন ঘটনা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তই জেমস স্টার বা সাইমন পরিবারের কেউ দিতে পারলেন না। তবে এও সত্য যে, গত তিন বছরে কয়লাখনিতে কোনো রহস্যজনক ঘটনা ঘটে নি।

হ্যারি সম্প্রতি একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করল। ব্যাপারটা হচ্ছে, পাতালপুরীতে যে অন্ধকার কুয়োটা রয়েছে তার ভেতরে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। সেটা দিয়ে হুড়হুড় করে কুয়োটার ভেতরে জল ঢোকে। তবে বেশি জল থাকে জোয়ারের

সময়। জেমস স্টার, বুড়ো সাইফীন ও তাঁর ছেলে হ্যারি আর তাদের জানা পরিচিত ব্যক্তিরা ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ভাবিত। তবে তাদের বিশ্বাস পাতালপুরীতে কোন বিপদাশঙ্কা থেকেই থাকে তবে নেল অবশ্যই তাদের সতর্ক করে দিত।

কয়েকদিন পর এক অত্যাকর্ষ, একেবারেই অভাবনীয় এক ব্যাপার হ্যারি আবিষ্কার করে ফেলল। ব্যাপারটা হচ্ছে, আরভিন ডানডোনাল্ড দুর্গের রহস্যজনক আগুনপরিদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল যা কারো পক্ষে কোনো যুক্তি তর্কের মাধ্যমেই খণ্ডন করা সম্ভব হ'ল না। হ্যারি পরপর কয়েকদিন অভিযান চালিয়ে সক্ষীর্ণ একটা গলিপথ ধরে কোনোরকমে ওপরে উঠে দুর্গের একটা ফাটলে গিয়ে দেখল পথটা থেমে গেছে। গলি থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় পা দিয়েই সে চমকে উঠল। দেখল, চারদিকে দুর্গটার ধ্বংসস্থল।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে এর আগে কারো কিছুই জানা ছিল না, নিউ অ্যাবারফয়েল খনি আর দুর্গটার ধ্বংসস্থলের মধ্যে কোনো সক্ষীর্ণ গলির অবস্থান রয়েছে। সাধারণের জানার কোনো উপায় নেই, সত্য। ওপরে থেকে দেখলে ধ্বংসস্থলের ইট, কাঠ আর ভাঙাচোরা লোহা লব্বর ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। তাই তো ম্যাজিক্ট্রেট ও পুলিশ পুঙ্গবরা বারবার অভিযান চালিয়েও রহস্যজনক অগ্নিশিখার রহস্যভেদ করতে পারেন নি।

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার হ্যারির সদ্য আবিষ্কারটার কথা শুনে হতবুদ্ধ হয়ে ছুটে এলেন। তার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে সুড়ঙ্গপথটা সরজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে তিনি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'ভূত-প্রেত দৈত্য-দানো আর অশরীরী আত্মাটাদ্বারা রহস্য এবার ফাঁস হয়ে গেল।' সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপারটা প্রচার হতেই সবাই তো হেসে গড়াগড়ি যাবার যোগাড়।

হ্যারি এবার বলল, 'আগুনপরিদের রহস্যভেদ করা গেলেও খনির রহস্য এখন গোপন অন্তরালেই রয়ে গেল কিন্তু মি. স্টার।'

চোখে মুখে বিষণ্ণতার ছাপ ঐকো জেমস স্টার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ হ্যারি। যে-সব রহস্য আজও খনির অন্ধকার অতল গহবরে গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে তাদের ইঙ্গিতই তুমি দিচ্ছ, ঠিক কি না? একটা ব্যাপার কিন্তু আমাদের কাছে এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, সুড়ঙ্গপথটার মাধ্যমেই সে রহস্য সম্বন্ধকারী বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। এখন একটাই জিজ্ঞাস্য, সে বা তারা যে-ই হোক এখন কোথায়? বেকায়দায় পড়ে এখন কি চম্পট দিয়েছে, নাকি খনিরই কোন আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে রয়েছে?'

কণ্ঠস্বরে রীতিমত দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করে হ্যারি এবার বলল, 'আছে মি. স্টার। অবশ্যই আছে। এখানে, খনির অন্ধকারেই লুকিয়ে রয়েছে। আমি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, এসব প্রসঙ্গ উঠলেই নেল-এর মধ্যে কেমন অস্বাভাবিক ভাবান্তর ঘটে, চোখে মুখে অবর্ণনীয় বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে ওঠে। যদি তাদের অস্তিত্ব নাই থাকত তবে সে আঁতকে উঠবে কেন আর কেনই বা আতঙ্কে এমন শিউরে উঠবে?'

হ্যারির বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্রও দ্বিধা থাকার কথা নয়। রহস্যময় প্রেতচ্ছায়ার মতো কেউ না কেউ অন্ধকার খনিতে ঘুরে বেড়ায় বলেই তো নেল-এর মধ্যে এমন গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করে, সে মিথিয়ে গিয়ে একেবারে কঁচোর মতো হয়ে যায়। কোনো প্রশ্ন করলে সে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে নীরব চাহনি মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। কেন? কেন তার এ নীরবতা? আর কিসেরই বা আতঙ্ক? কারণ একটাই হতে পারে, তাদের অসীম-অপরাজেয় ক্ষমতার কথা স্মরণ হলেই তার কলিজা শুনিয়ে কাঁপ হয়ে যায়।

জেমস স্টার এত সহজে রণে ভঙ্গ দেয়ার পাত্র নন। এ রহস্যের শেষ কোথায় দেখে তবেই ক্ষান্ত হবেন। প্রেতচ্ছায়ার মত কে বা কারা অন্ধকার খনি গহবরে ঘুরে বেরিয়ে অনবরত রহস্য সঞ্চার করে চলেছে তার কিনারা তিনি করবেনই। খনিতে যে বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করেছে তার হিল্লো করতে না পারলে সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়বে।

রহস্যটা উদ্ধার করতে হ্যারি ও জেমস স্টার সতর্কতার সঙ্গে খনির অন্ধকারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, পুরনো দুর্গে বার বার হানা দিয়েছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝোপঝাড় বসে নীরবে মশার কামড় খেয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে জেমস স্টার ও হ্যারি তখনকার মত হাল ছেড়ে দিল।

সবাই নিঃসন্দেহ, রহস্য সম্বন্ধকারী শয়তান হানাদারটা বেগতিক দেখে খনি ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছে। অথবা নেলকে পাতালপুরীর যে কুঁয়ায় রেখে গিয়েছিল সেখানে নেলের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করে হতাশ হয়ে খনি ছেড়েছে।

ব্যাপারটা এমনও হতে পারে খনিটা এতদিন পতিত পড়ে থাকায় হানাদার ভেবেছিল, এখানে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। কিন্তু নতুন খনিটা আবিষ্কৃত হওয়ায় আর লোকজন চলাচল শুরু করায় তার পক্ষে জায়গাটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

জেমস স্টার বা হ্যারি কেউই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারল না। নেলকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না। তাদের বদ্ধমূল ধারণা, খনির রহস্যের সঙ্গে তার অবশ্যই কোন না কোনোভাবে যোগসাজেস রয়েছে। নইলে ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা যখন দূর হয়েছে তখন আর তার মুখ খোলার সময়টা তো থাকার নয়।

ছুটির দিন। খনির কাজকর্ম বন্ধ।

বিকালের দিকে হ্যারি লেনকে নিয়ে ম্যালকম হ্রদের বাদিকের পথটা দিয়ে অলসভাবে হাঁটাচলা করছে। একটু পরেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। একে একে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো জ্বলে উঠল। অত্যাশ্চর্য বৈদ্যুতিক আলোতে চলাফেরা করতে এখন আর নেলের তেমন অসুবিধা হয় না।

হ্যারি কৌতূহলাপন্ন হয়ে বলল, 'আচ্ছা নেল, বৈদ্যুতিক আলো তোমার কাছে এখন আর তেমন অসুবিধা হয় না, কী বলো? ভালো কথা, সূর্যের আলো তোমার চোখ দুটো এখনও বরদাস্ত করতে পারে না, তাই না?'

মুচকি হেসে নেল বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ হ্যারি। তোমার মুখে সূর্যের কথা যা শুনেছি তাতেই তো আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে যায়। সে রকম আলো সহ্য করার মতো—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হারি বলে উঠল, 'নেল, সূর্যের আলো সহ্য করার মতো করে তোমার চোখ দুটোকে যেদিন তৈরি করে নিতে পারবে, পৃথিবীকে স্বচ্ছ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে সেদিন দেখবে পৃথিবী নিজেকে কেমন অপরূপ করে সাজিয়ে তুলেছে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বলল, 'আর তুমি মনে মনে উপলব্ধি করবে, দৃষ্টিহীনদের ব্যথা কত মর্মান্তিক!'

'জন্মের পর খনির নিঃসীম অন্ধকার ছেড়ে কোনোদিনই আমার পৃথিবীকে দেখার সৌভাগ্য হয় নি।'

অত্যুগ্র আগ্রহ হয়ে হারি বলল, 'নেল, যাবে তুমি, অপরূপ পৃথিবীকে নিজের চোখে দেখতে, তার সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করতে? যাবে? যাবে নেল? দেখতে পাবে—'

'হারি, এখন নয়। আর কয়টা দিন যাক, চোখ দুটোকে আরও আলো সহনীয় করে তৈরি করে নিই। তারপর যাব, অবশ্যই যাব। আর যাব তোমার সঙ্গেই।'

'হারি, আলোর সমস্যাটাই পৃথিবী সম্বন্ধে তোমার আতঙ্ক আর অনাগ্রহের একমাত্র কারণ, নাকি—'

উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে নেল বলে উঠল, 'প্রিজ হারি, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। হারি, পৃথিবী জুড়ে সৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে তা তো তোমার মুখ থেকে অনেকবারই শুনেছি। লোভও হয় কম না। কিন্তু একটা কথা তো মিথ্যা নয়, সৌন্দর্য দেখার মতো চোখ অবশ্যই থাকা চাই।'

'একটা কথা, একা একা থাকতে তোমার ভয় করে না নেল?'

ভয়ের কথা শুনে নেল তাল্‌ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলল, 'ভয়? সে কি, ভয় করবে কেন? না, ভয় কাকে বলে আমি জানি না। একেবারেই ভয় করত না।'

'যদি কনির অলিগলির মধ্যে হারিয়ে যেতে?'

'সে কী! হারি যাব আমি! খনির প্রতিটা নাড়ী নক্ষত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে। আর আমি হারিয়ে যাব!'

'তুমি তবে বলতে চাইছ, নতুন খনির বাইরে কোনোদিনই আস নি?'

'কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মাঝে-মধ্যে অ্যাবারফয়েলের পুরনো খনিতে চলে গিয়েছিলাম।'

'তাই বুঝি? আমাদের সেই পুরনো কটেজটা দেখেছিলে?'

'তোমাদের কটেজটার কথা বলছ তো? অবশ্যই দেখেছিলাম। আড়াল থেকে কটেজের বাসিন্দাদের দেখতাম। কৌতূহল হত খুবই।'

'কাদের তুমি দেখতে। বলতে পার? আমার মা বাবা আর আমাকে দেখতে?'

'খনির সবাই তো এক এক করে খনি ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন কেন?'

'মায়া। খনির সঙ্গে এতদিনের সম্পর্ক, মায়ার বাঁধনে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তাই তো অন্য সবার মতো খনি ছেড়ে যেতে পারি নি।'

'হারি, কেন ও কাজ করতে গিয়েছিলে বল তো? খনি ছেড়ে চলে গেলেই তো তোমাদের পক্ষে মঙ্গল হত।'

'সে কী! কটেজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই নি বলেই তো আমাদের পক্ষে নতুন খনিটার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছে। নতুন খনিটা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে কত লোকের নুন রুটির ব্যবস্থা হয়েছে, বল তো? আর আমরা খনি ছেড়ে চলে গেলে তোমার পক্ষে কি প্রাণ ফিরে পাওয়া সম্ভব হত, একবারটি ভেবে দেখ তো?'

'হ্যাঁ, আমার অশেষ উপকার হয়েছে, খুবই সত্য বটে। কিন্তু অন্য কারো তো উপকার হল না।'

হারি চোখ দুটো কপালে তুলে সবিম্বয়ে বলল, 'অন্য কারো কোন উপকারই হল না! অন্য কারো বলতে তুমি কী বলতে চাইছ, খোলসা করে বল তো হারি?'

হারির কথায় নেল যেন অকস্মাৎ কেমন অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, 'না, না, ও কিছু নয় হারি। কিছু মনে করো না। আসলে অন্যান্যমন্ডতা বশত আমি একটু অসংলগ্ন কথা বলে ফেলেছি।'

'আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি নেল, তুমি ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছ। আসল কথাটা কী, খোলসা করে বল তো?'

'নতুন খনিটা মোটেই নিরাপদ নয়। তুমি জান কি না জানা নেই। কিছুদিন আগে একবার বহুলোক খনির ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু বেরোবার সময় পথেরই হদিস পায় নি। আসলে বাড়ি নিতে যাওয়ায় তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়, পথ হারিয়ে ফেলে। অনন্যোপায় হয়ে তারা আটদিন আটরাতি অন্ধকার যক্ষপূরীতে কয়েদ হয়ে থাকে। তারা নির্ঘাত প্রাণে মারা যেত। কিন্তু একটা পরীর দয়ায় তাদের পক্ষে পিতৃদত্ত প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই পরোপকারী পরী তক্ষার জল আর খাবার জুগিয়ে পরম হিতকাজক্ষীর কাজ করেছিল। তার অকৃত্রিম দয়া ও মায়া মমতার কথা আমি অন্তত তুলতে পারব না কোনদিন।'

সেদিন আর কোনো কথা হল না। হারি নেলকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

নতুন কয়লাখনিটা আবিষ্কারের ফলে চারদিকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। জ্যাকরিয়ান কোম্পানির অংশীদার হয়েছে। বুড়ো সাইমন ফোর্ড অক্ষমতার জন্য কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন। তাঁর পদে উন্নীত হয়েছে তাঁর ছেলে হারি ফোর্ড। সাইমন ও জেমস স্টার অনেক, অনেক আগে থেকেই কয়লাখনির লভ্যাংশ আধাআধি করে নিতে শুরু করেছিলেন। ফলে উভয়েরই বরাত খুলে গেছে। হারি এখন ওভারম্যান। খনির কাজের একটা বড় ভগ্নাংশই তার ওপর বর্তছে।

জ্যাকরিয়ানও কম খুশি নয়। হারির খুশিই তাকে খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। আসলে হারি আর নেল—এর ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলেছে বলেই তার মনে এমন অবর্ণনীয় খুশির আমেজ।

জ্যাকরিয়ান একদিন কথা প্রসঙ্গে বলল, 'কী হে হারি, আর কতদিন, মেয়েটাকে আশায় আশায় রাখবে, বল তো? বিয়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

হারি চোখে মুখে বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে বলল, 'বিয়ে? কাকে? 'মেয়েটা' বলতে কার কথা বলতে চাইছ, বল তো?'
'ন্যাকা কোথাকার! এমন ভাব দেখাচ্ছিস যেন কিছুই বুঝতে পারছিস না! নেল-এর কথা বলছি। বিয়েটা মিটিয়ে ফেল। আমরাও কবজি ডুবিয়ে খানাপিনা—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হারি বলে উঠল—'জ্যাক, তুমি আমার অভিন্ন হৃদয়বন্ধু। তোমার কাছে গোপন করার ইচ্ছা আমার নেই। আর সে চেষ্টা করবও না। আসল কথা কী জান? মেয়েটা অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রায় জন্মের পর থেকেই কাটিয়েছে। সূর্যের অত্যাঙ্ক আলো ধরতে গেলে তার কাছে অসহনীয়। এমনকি পৃথিবী সম্বন্ধে সে একেবারেই অজ্ঞ। আর পেটে কালির অঙ্করও নেই। এমন একটা জড়বস্তুকে বিয়ে করার কথা বলছ! আর নেলই বা আমাকে বিয়ে করতে—'

'সে কী হারি! তোমাকে পেলে নেল তো বর্তে যাবে হে। আর তুমি কি তাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে—'

'পাঠশালায় না হয় নাই পাঠশালায়। আমি নিজেই তাকে পড়িয়ে শুনিতে অন্য দশটা মেয়ের মতো শিক্ষায় দীক্ষায় ভব্য করে তুলব।'

'আর পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটতে যদি তুমি আগ্রহীই হয়ে থাক তবে তাকে নিয়ে কদিনের জন্য কোথাও থেকে ঘুরে এলেই তো পাব।'

'যাব। ক'দিনের মধ্যেই যাব ভাবছি। আর এখন সে বোধ হয় সূর্যের আলো সহ্য করতে পারবে। ভাবছি, খুব শীঘ্রই একদিন তাকে নিয়ে গিয়ে সূর্য দেখিয়ে আনব।'

ক'দিনের মধ্যেই খনির সবাই হারি আর নেল-এর ব্যাপারটা নিয়ে কানাদুসো শুরু করে দিল। হারি-র বাবাও তাদের বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহী। খনির কর্মী খনিতেই জন্ম এমন একজনকে জীবনসঙ্গিনী করবে আশ্চর্য্য কি! তবে বিয়ের আগে নেলকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নিতে হবে।'

একদিন হারি কথা প্রসঙ্গে জেমস স্টারকে বলল—'নেল তার ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে কোলসা করে কিছুই বলছে না। কথা পাড়লেই সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যায়। তবে আমার বিশ্বাস, আমাদের বিয়ের বিয়ে পর সে স্বেচ্ছায়ই মুখ খুলবে। তখন সবকিছু ফাঁস করে আমাকে অবশ্যই সতর্ক করে দেবে। তাতে করে খনির সবাই অনিশ্চিত ভয়ভীতি ও বিপদাশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। আর পাতালপুরী হবে উৎকণ্ঠামুক্ত। তাই সবকিছু বিবেচনা করে ভাবছি, বিয়ের পাটটা যত শীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে নেয়াই উচিত।'

এবার ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। হারি আর নেলের বিয়ের খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে গেলে সবার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেলেও একজন অন্তত খবরটা শুনে যারপরনাই অশুশি হয়েছে। কে সে? খনির কাজ মিটে গেলে আলোগুলো রোজ নিভিয়ে দেওয়া হয়। খনিগর্ভে তখন নামে যমপুরীর নিঃসীম অন্ধকার। তখন অজ্ঞাত পরিচয় রহস্যময় ছায়ামূর্তি তার গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে চরম আক্রোশে খনিগর্ভে দাপিয়ে বেড়ায়, তার কথা বলা হচ্ছে।

ব্যাপারটা খনিবাসীদের খুবই ভাবিয়ে তুলেছে। তাদের সবার একই বক্তব্য—অজ্ঞাত পরিচয় রহস্যময় ব্যাক্তিটি কে? কেনই বা সে হারি আর নেলের বিয়ের খবরে অন্য সবার মত খুশি হতে পারে নি? আর তার রহস্যময় আবির্ভাবেরই বা কারণ কী? জমটবাঁধা অন্ধকার। অন্ধকারে কেনই বা সে গুটিগুটি হানা দেয়? কিসের জুলন্ত আক্রোশে সে প্রতিনিয়ত দন্ধে মরছে? চরম আক্রোশ বশে কেন সে হারির বাড়ির দরজার স্থাপদের মতো বারবার গুটিগুটি হানা দেয়? কেন? কেন সে এমন নিঃশব্দ পদসঞ্চারণের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চারণ করছে? কী তার উদ্দেশ্য? কী চায় সে? ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়? এটা কি তার ভয়ের। নাকি প্রতিহিংসার বহির্প্রকাশ? অন্তরের অন্তস্থলের কোন অসং উদ্দেশ্যের তাড়নায় সে রোজ রাতে দাপিয়ে বেড়ায়? কয়েকজন এমন ঘটনাও চাক্ষুস করেছে রহস্যময় ছায়ামূর্তিটা গভীর রাতে অন্ধকার কালোগোমটার আড়ালে দাড়িয়ে হারির জানালার ফাঁক দিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করে, উৎকণ্ঠ হয়ে কী যেন শোনার জন্য তৎপর হয়। এক গভীর রাতে হারির ঘরের বাইরে তাকে ভয়ানক ক্ষেপে গিয়ে চরম আক্রোশে দাপাদাপি করতে দেখেছিল অনেকেই। মনে হচ্ছিল আক্রোশবশত সে সবকিছু ছারখার করে দেবে। গুঁড়িয়ে দেবে। প্রলয়ঙ্কর কিছু একটা করার জন্য সে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেন তার এমন জুলন্ত বিক্ষোভ? প্রতিহিংসায় এমন দাপিয়ে বেড়ায়? কিসেরই বা এ প্রতিহিংসা?

হাঁ, রহস্যময় ছায়ামূর্তিটার ক্ষোভের একটাই কারণ হতে পারে। হারি আর নেল-এর বিয়ের পরিকল্পনা। তাদের বিয়ে ভাঙার জন্যই তার এই অতর্কিত হানা। বিয়েটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই রহস্যময় ছায়ামূর্তিটা নিদারুণ আক্রোশের মধ্য দিয়ে বার বার হানা দিচ্ছে হারি-র বাসস্থলে।

বিশে আগষ্ট।

হারি তার প্রেয়সী নেলকে নিয়ে খনির বাইরে যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছে। পরে ঠিক হল জেমস স্টার এবং জ্যাকরিয়ান তাদের সঙ্গ দান করবে।

তারা চারজন রাত্রির অন্ধকারে যাত্রা করল। কেন তারা দিনের আলোয় যাত্রা না করে রাত্রির অন্ধকার স্থাপদের মতো যাত্রা করল? কারণ অবশ্যই আছে? কারণ একটাই, রাত্রির অন্ধকার ঘুচে গিয়ে যখন দিনের আলো একটু একটু করে উঁকি দেবে তখন নেল-এর অনভ্যস্ত চোখ প্রত্যক্ষ করবে কীভাবে অন্ধকারের বুক চিরে আলোর উৎস সূর্যটা পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে উঁকি দেয়। আর তাকে অসহ্য জ্ঞান না করে নেল-এর চোখ দুটো বরং স্বাগতই জানাবে।

চারজন রাত্রির শেষ ট্রেনে চেপে খনি থেকে অনেকখানি দূরে চলে এসেছে।

নীল আকাশের গায়ে ভাসমান পঁজা তুলোর মতো মেঘগুলোর দিকে অপলোক চোখে তাকিয়ে থাকার পর একসময় কৌতূহলবশত নেল বলল, 'হারি, মাথার ওপরে ওগুলো কী ভেসে বেড়াচ্ছে, বল তো?'

হ্যারি তার কৌতূহল নিবৃত্তি করতে গিয়ে বলল, 'নেল তোমাকে তো বহুব্যবহারই বলেছিলাম আকাশের মেঘরাত্রির কথা, মনে নেই তোমার? আর মেঘের ফাঁকে ওই যে, মিটমিট করছে ওগুলো তারা? তারার কথাও তো তোমাকে বলেছিলাম, তাই না?'

নেল আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ঘাড় কাত করে হ্যারির কথায় সম্মতি জানাল। তারপর বলল, 'কিন্তু তারাগুলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে কই? তুমি না বলেছিলে, সূর্যের আলো খুবই তেজি, চোখ ঝলসে দেয়, বল নি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই, বলেছিলাম। আসল ব্যাপার কী জান নেল? ওই তারাগুলো সূর্যের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি দূরে অবস্থান করে বলে এত দূরবর্তী পৃথিবীতে তাদের আলো পৌঁছায় না। দূরত্বের জন্যই তাদের এক একটা জোনাকির মতো আকাশের গায়ে জ্বলতে দেখা যায় আর সূর্য অপেক্ষাকৃত কাছে থাকায় তাকে বড় দেখায় ও তার আলো ও তেজ আমাদের কাছে অনায়াসেই পৌঁছে যায়।

পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের নাম তুমি অবশ্যই জান না? তার নাম ভেগা। পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব পাঁচ হাজার কোটি লাখ অর্থাৎ পনের হাজার কোটি মাইল।

ফোর্ড-এর তীরে তারা যখন পৌঁছাল তখন রাত্রি সাড়ে এগারোটা। জেমস স্টার আগে থেকেই নৌকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তারা নৌকায় উঠল।

নেল কৌতূহলাপন্ন হয়ে গভূষ ভরে জল নিয়ে মুখে ঠেকিয়েই থু থু করে উঠল। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'ওরে কবাস, জলটা কী নোনতা রে বাবা!' হ্যারি-র মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কেন? এর জল এমন নোতা কেন গো?'

'হ্যাঁ, এসময়ে এর জলের লবণতা একটু বেশি থাকে। এখন জোয়ারের সময় কি না। এসময়ে সমুদ্রের জল বেশি পরিমাণে এতে ঢুকে যায়।

মুহূর্তকাল পরে বলল, 'নেল, পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর একভাগ স্থল তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম, তাই না?'

'তুমি তো আমাকে বইতে পড়িয়েছ, সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। সে মেঘই বৃষ্টির কারণ, তাই যদি সত্য হয় তবে নদীর জল মিষ্টি কেন, মাথায় আসছে না তো?'

'সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় বটে। কিন্তু লবণটুকু পড়েই থাকে। কেবলমাত্র জলই বাষ্পীভূত হয়। জলীয় বাষ্প উর্ধ্বাকাশে উঠে গিয়ে শৈত্যের সংস্পর্শে মেঘের রূপ ধারণ করে। তারপর সে মেঘ ভাসতে ভাসতে পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটায়। সে জল ভূমিভাগ, নদী আর সমুদ্রে পড়ে।'

আকাশের গায়ে অলসভাবে চোখ বুলাতে বুলাতে নেল এক সময় চিন্তিয়ে উঠল—'আগুন! ওই দেখ, আগুন! আকাশের গায়ে আগুন লেগে গেছে।'

হ্যারি কিছু বলার আগেই জেমস স্টার হো হো করে হেসে বললেন—'দূর পাগলি। আগুন লাগতে যাবে কেন? আকাশের গায়ে ওটা তো চাঁদ। ঝকঝকে চকচকে চাঁদ।

নেল চাঁদের রূপ সৌন্দর্যের কথা বহুব্যবহারই শুনেছিল। তাই জেমস স্টারের সামনে এমন বোকামি করার জন্য অপ্রতিভ হয়ে চুপ করে গেল।

নৌকাটি ছোট্ট একটা ধাক্কা খেয়ে গ্রান্টন বন্দর স্পর্শ করল। এবার হ্যারি সবাইকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আর্থাস সিটের চূড়ায় হাজির হল।

ছোট্ট পাহাড়। উচ্চতা মাত্র ৭৫০ ফুট। সর্বজনবন্দিত সাহিত্যসাধক স্যার ওয়ালটার স্কট তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাসে লিখেছেন, সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের শোভা দেখে আনন্দ পেতে হলে এখানে চলে এসো। এখানে, এ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রূপ সৌন্দর্য উপভোগ কর।

জেমস স্টার সবাইকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে একটা প্রায় সমতল ও প্রশস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসলেন।

পূব আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল। ভোরের পূর্বাভাস, রক্তিম আভাটা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে মাথার ওপরের ভাসমান মেঘ খণ্ডের গায়েও প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

আর্থাস সিট পাহাড়ের পাদদেশের এডিনবরা শহর তখনো কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সূর্যোদয়ের অপেক্ষায় গভীর ঘুমের ঘোরে কাটাচ্ছে।

ভোরের মৃদু আলো কী অতুলনীয় শোভার সঞ্চারণই না করেছে।

নেল পূব আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। চোখের পাতা বন্ধ করলেই যে লোকসান, রূপ সৌন্দর্যের কিছু না কিছু অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

একটু পরেই নেল নিদ্রাচ্ছন্ন এডিনবরা শহরের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

পর মুহূর্তেই পূব আকাশের দিকে ফিরতেই সে দেখল রক্তিম ছোপ আর বেগুনি ছোপ মিলেমিশে এক অপূর্ণপ শোভার সৃষ্টি করেছে।

এবার পূব আকাশ একটু একটু করে ফর্সা হতে হতে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। এবার সমুদ্রের বুক থেকে রক্তজবার মতো লাল টুকটুকে একটা থালা যেন একটু একটু করে উঠে আসছে। রক্তিম থালাটা যেন লক্ষ লক্ষ ফার্নেসের লকলকে গনগনে আগুন একত্রে পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে।

নেল এবার অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করে হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে ফেলল।

হ্যারি ও জেমস স্টার তাকে পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়াতে বললেন।

নেল প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, 'না, অমন কথা আমাকে বলবেন না। আমাকে সহিতে দাও হ্যারি। সূর্যের অভ্যঞ্জন আলোকরশ্মি আমার চোখ দুটোকে একটু একটু করে সহিতে দাও।'

মুহূর্তকাল পরে নেল হাতের আঙুলগুলো সামান্য ফাঁক করে রক্তিম সূর্যের আলেয় চোখদুটোকে একটু একটু করে সহিয়ে নিতে লাগল। পরমুহূর্তেই আবার আঙুলগুলো জুড়ে দিল। বার কয়েক এমনি করার পর একসময় চোখের ওপর থেকে হাত দুটোকে আলতো করে সরিয়ে নিল। চোখের পাতাগুলো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। উচ্ছ্বসিত আবেগভরে সে বলে উঠল, 'ভগবান, কী অপূর্ব তোমার সৃষ্টি! তোমার নিপুণ হাতের সৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার সৃষ্টি সৌন্দর্য আমার মধ্যে উদ্ভাদনা জাগিয়ে তুলেছে। আমি পাগল হয়ে গেছি! হ্যাঁ, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যরাশি প্রত্যক্ষ করে আমি যেন সত্যি পাগল হয়ে গেছি!'

সৌন্দর্য! পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্যের মুখোমুখি হয়ে নেল সংজ্ঞা হারিয়ে হ্যারি কোলের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

জেমস স্টার এমন এক ভ্রমণসূচি তৈরি করে নিয়েছেন যাতে দুদিন ধরে ঘুরে নেলকে সৌন্দর্যের আকর পৃথিবীটার কিছুটা অংশ অন্তত দেখিয়ে নিতে পারেন।

জেমস স্টার এবার সঙ্গীদের নিয়ে ট্রেনে চাপলেন। গ্লাসগো হয়ে রবরয়ের মুল্লুকে যাবেন মনস্থ করেছেন। স্যার ওটলন্টার স্কটের খুবই প্রিয় রবরয়। পাহাড় আর সবুজের সমন্বয়ে গঠিত রূপসীর মনোলোভা চিত্র তাঁর এক উপন্যাসে নিপুণ হাতে একে রেখেছেন। স্টিমবোট রবরয়। অপূর্ব তার গঠন বৈচিত্র্য।

জেমস স্টার রবরয়ের পথ চলতে চলতে নেলকে দু-ধারের সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যাবলি সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

চারজনের দলটা হাঁটতে হাঁটতে লক ক্যাটারিনের পাড়ে হাজির হলেন। কোনো নদী বা উপসাগর এটা নয়। আসলে এটা একটা হ্রদ। আকাশচুম্বী পর্বতমালাবেষ্টিত দৃষ্টিনন্দন হ্রদটোকে দুচোখ ভরে দেখে নেল আবেগে উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়ল।

জেমস স্টার বললেন, 'জান নেল, এ হ্রদের জল জমে কোনদিন বরফে পরিণত হয়ে যায় না। মনে রেখো, এ লেকের জলেই লেডি অব দ্য লেকের সর্বজন সমাদৃত অ্যাডভেঞ্চার ঘটেছিল।'

একের পর এক অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে নেলের বিশ্বয় বিস্ময়িত চোখের মণি দুটো যেন অস্থির হয়ে পড়েছে। মাত্র তো চব্বিশটা ঘণ্টা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত সৌন্দর্য তার অনভ্যস্ত চোখ দুটোর বরদাস্ত করতে পারার কথাও নয়। তাই তার শরীর ও মন দুইই ক্রান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

হ্যারি তার মনের মানুষ নেলকে একটু আড়ালে আবড়ালে পেয়ে হঠাৎ তার হাত দুটো চেপে ধরল। আবেগমধুর স্বরে বলে উঠল, 'নেল, প্রেয়সী আমার! ঈশ্বর সাক্ষী, মানুষ সাক্ষী আর পাহাড় ঘেরা প্রকৃতি সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তোমায় আমার করে, একান্তই আমার করে পেতে চাই। নেল, আমার প্রাণাধিকা নেল, তুমি সে অধিকার আমাকে দেবে কি, খোলসা করে বল। তোমাকে আপন করে পাবার অধিকার আমাকে দেবে কি তুমি?'

আবেগে আপ্ত নেল আকস্মিক আনন্দটুকু সহিতে পারল না। তার দুচোখের কোণ বেয়ে আনন্দাশ্রুর ধারা নেমে এল। হ্যারি, আমি তোমার সুখের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াব না। তুমি সুখী হও। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখ শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠুক এটাই আমার একমাত্র কাম্য। তুমি আমার, আর আমি তোমারই হয়ে থাকব চিরকাল।'

নেল আকস্মিক আনন্দটুকু সহিতে না পেরে হ্যারি-র বুকে মুখ ঝুঁজিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

একটু পরেই এক অভাবনীয় ঘটনার মুখোমুখি হল এ অভিযাত্রী দলটা। তারা তখন স্টিমবোট রবরয় ভ্রমণ সারছে। এমন সময় সেটা ভীষণ রকম দুলে উঠল। তীর থেকে তখনো মাইল খানেক দূরে রয়েছে সেটা। তার তলদেশ হ্রদের তলদেশ ঘষে ঘষে চলতে লাগল। তার যুবক চালক সাধ্যাতীত কসরত করেও জলযানটাকে একচুল সরাতে পারল না।

দুর্ঘটনা। হ্যাঁ, একে দুর্ঘটনা ছাড়া কীই বা বলা যেতে পারে? জানা গেল, লক ক্যাটারিনের পূর্বদিকটা হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। হ্রদের তলদেশে বিশালায়তন একটা ফাটল সৃষ্টি হওয়ার জন্যই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। আর তার ভেতর দিয়ে হ্রদের জল গলগল করে নেমে যাচ্ছে। জলরাশি পাতাল গহ্বরে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার পরিস্থিতিটা হৃদয়সম করে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন—'সর্বনাশ হতে চলেছে। সর্বনাশ! সব গেল! সব তলিয়ে গেল! হায় ঈশ্বর! এ বিচিত্র খেয়াল তোমার! আবার ফয়েলও যে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। অসহায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে নির্মমভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার বিচিত্র খেলায় তুমি মেতেছ! কেন? কেন? কেন তুমি নির্মম হয়ে উঠলে?'

সেদিন কাজের শেষে, সাইমনফোর্ড তাঁর স্ত্রী ম্যাগিকে নিয়ে কটেজের সামনের অগ্রশস্ত সমতল প্রাঙ্গণে বসলেন, বাক্যলাপে মগ্ন। তাঁরা উভয়েই একমাত্র পুত্র হ্যারি এবং ভাবী পুত্রবধূ নেলের প্রত্যাবর্তনের দেরি দেখে উদ্বিগ্ন। তাদের প্রসঙ্গেই তারা টুকরো টুকরো বাক্যলাপে মগ্ন।

অকস্মাৎ ভয়ঙ্কর একটা শব্দ সমগ্র পাতালপুরী কাঁপিয়ে দিল। সে কী কম্পন! পাতালপুরী একেবারে চূরমার হয়ে লগভগ হয়ে যাবার জোগাড় হল। মনে হল বহু উঁচু কোনো জায়গা থেকে তীব্র বেগে জল খনিগর্ভে পড়তে শুরু করেছে।

আকস্মিক প্রলয়ঙ্কর কর্কশ শব্দটা হতে না হতেই খনিবাসীরা প্রাণভয়ে কান্নার রোল তুলল। প্রবল বিক্রমে জল যেন গলগল করে খনিগর্ভ ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য বন্ধপরিবর।

ম্যালকম হ্রদের জলরাশি ফুলে ফেঁপে তীব্রবেগে খনিগর্ভের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার জন্য ছুটছে। আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে

দিশাহারা হয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য খনিবাসীর অসহায় নরনারী নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটোছুটি দাঁপাদাঁপি বুড়ে দল। বুড়ো সাইমন ত্রীকে নিয়ে উর্ধ্বস্থানে ছুটে লাগলেন। সবাই গিয়ে উঁচু একটা পাথরের ওপর গিয়ে আশ্রয় নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফাড়া কেটে গেল। ক্রোধান্বিত জলরাশি একসময় বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত উঠেই থেমে গেল। আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসের ফলে খনির তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি। তলদেশে যথাকিঞ্চ ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া বড় রকমের কোনো ক্ষতি হতে পারে নি।

খনিবাসীদের অবর্ণনীয় দূর্বস্থার কথা খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হল। ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার সফর শেষ করে হ্যারি ও নেলকে নিয়ে খনিতে ফিরে কাহিনীর যে বর্ণনা দিলেন, খনিবাসীরাও একই কথা বলল।

এ কী ভূতুড়ে কাণ্ডের বাবা! এমন দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে খনিবাসীরা এর আগে আর কোনদিনই পড়ে নি। ব্যাপারটা কেবল অবিশ্বাস্য বললে যথার্থ বলা হবে না। বরং তার সঙ্গে অলৌকিক শব্দটা জুড়ে দেয়াই বুদ্ধি সঙ্গত। অবিশ্বাস্য তো বটেই। কয়েক সেকেন্ডে এমন বিশালায়তন ও সুগভীর একটা হ্রদের জল চৌ চৌ করে শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যাওয়ার ঘটনাকে আর কীভাবেই বা ব্যাখ্যা করা চলে?

এখন সবার মনেই কৌতূহল দানা বেঁধেছে, ব্যাপারটা কি নিছকই কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, নাকি অতি প্রাকৃতিক কোনো ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত? আবার কেউ কেউ এমনও ভাবতে লাগল, রহস্যজনক ঘটনাটার পিছনে কোনো কুচক্রীর কালো হাত থাকলে থাকতেও পারে।

জেমস স্টার আর হ্যারি ফোর্ড অন্য কোনো আশঙ্কা করে আকস্মিক অবিশ্বাস্য ঘটনাটা সম্বন্ধে নেলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের পীড়াপীড়িতে তার মুখের এমন ভাবান্তর ঘটল যে, তার মুখ থেকে ঘটনাটা সম্বন্ধে কোনো অর্থই বের করতে পারলেন না। বুঝলেন, যে-কোন কারণেই হোক ব্যাপারটা সম্বন্ধে সামান্যতম আলোকপাত করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর মন খোলসা করে প্রকৃত ব্যাপারটা বলতে না পারার বেদনা তাকে আরো বেশি করে মুমূর্ষু দিয়েছে।

কোনো সিদ্ধান্তেই আসতে না পেরে অস্থিরচিত্ত হ্যারির উপায়ান্তর না দেখে রহস্যভেদ করার জন্য একই একদিন নৌকায় চেপে বসল। পাথরের থামের ওপর হ্রদটার যেদিকটার ভার রক্ষিত ছিল তার কাছাকাছি যেতেই পুরো ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এর পিছনে কোনো না কোনো কুচক্রীর কালোহাতের ছোঁয়া যে রয়েছে এতে তার ভিলমার সন্দেহও রইল না।

খনির একদিকটায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ব্যবহার করে এরকম ভয়ঙ্কর একটা ধ্বংসাত্মক কাজ করা হয়েছে, সে নিঃসন্দেহ।

হ্যাঁ, বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ধ্বংসাত্মক কাজটা করা হয়েছে। পাথরের গায়ে বিস্ফোরণের দাগ, বারুদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। শক্তিশালী ডিনামাইট ব্যবহার করে লেকের পাথরের থামটা উড়িয়ে দিয়েছে। ফলে ক্যাটারিনের জলের ভার পাথরে সহ্য করতে পারল না। ছাদ ধ্বসে গিয়ে সর্বনাশ কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

জেমস স্টার আঁতকে উঠে বললেন—“বিস্ফোরণের ফলে কেবল লেকটা ধ্বসে না গিয়ে হুড়মুড় করে পুরো খনিটা ধ্বসে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না।

এদিকে হ্যারি আর নেলের বিয়ের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে খনিতে একের পর এক হিংসাশ্রী ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটে চলেছে।

জ্বলন্ত কাঠের স্তুপের ধারে একটা লণ্ঠনও পাওয়া গেছে। বরাত ভাল যে, আগুন নিভিয়ে বড় রকমের একটা সর্বনাশ এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

দুই দিন নির্বিঘ্নে কাটল বটে। তৃতীয় দিন মাইন ইঞ্জিনের ইয়া মোটা খুঁটি কেটে দিয়ে খাঁচাটাকে নিচে ফেলে দিয়ে গেছে। এতে হ্যারি প্রাণে মারা না গেলেও মারাত্মক আহত হয়েছে। রক্তক্ষরণও হয়েছে প্রচুর।

আবার! আবার এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেল পাতালপুরীতে। ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। এতেও হ্যারি বাদ গেল না। আর একটু হলেই ওয়গানভর্তি কয়লা চাপা পড়ে তার জীবনাবসান ঘটে যেত।

তার পরদিন আবার রহস্যময় সে কালো হাতের ছোঁয়ায় অন্ধকারে লাইনের ওপর মোটা একটা কাঠের বরগা ফেলে রেখে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটানো হয়।

তারপর দুদিনও কাটল না। কাজের শেষে হ্যারি বাড়ি ফেরার সময় অতর্কিতে ইয়া বড় একটা পাথরের চাঁই তার ঠিক সামনে, একেবারে পায়ের কাছে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল। পিতৃপুরুষের ভাগ্যের জোরেই তার প্রাণটা রক্ষা পেয়েছে।

একের পর এক ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটতে দেখে খনিবাসীরা আতঙ্কে মুমূর্ষু পড়ল। খনি তো নয় যেন এক বিজীষিকার রাজ্য গড়ে উঠেছে।

একের পর এক ঘটে যাওয়া অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কথা পুলিশের কানে না দিয়ে পারা গেল না। রহস্যজনক ঘটনাগুলোর কিনারা করার জন্য তাঁরা প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েও হতাশ হয়েছে। অনন্যোপায় হয়ে হাল ছেড়ে দিতেই হল। তবে সম্ভাব্য স্থানগুলোতে বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হিংসাত্মক প্রতিটা আক্রমণের লক্ষ্য যে একমাত্র হ্যারি তা আর কারো বুঝতে বাকি রইল না। তবে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এসব কথা নেল-এর কাছে গোপন রাখা হয়েছে।

হ্যারি তার বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ভাবিত। দৃশ্টিভ্রমের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত সে কাটাতে লাগল। তার বিয়ের দিন

হয়ত চক্রান্তকারী চরম আক্রমণ চালিয়ে সর্বনাশের চূড়ান্ত করে দেবে। ভয়ঙ্কর কোন হিংসাত্মক কাজের মধ্যে সে সম্পূর্ণ খনিটাকে ধ্বংসস্থাপে পরিণত করে দেওয়াটাও কিছুমাত্র অবাক হবার নয়।

হারি আর নেলের বিয়ের মাত্র আর এক সপ্তাহ বাকি। এক রাতে অন্ধকারে হাঁটতে গিয়ে সে চোখের সামনে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল। কি? কী দেখে তার মধ্যে এমন অবর্ণনীয় ভাবান্তর ঘটল? সে অপলক চোখে সামনের একটা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত চোখে রহস্যজনক কয়েকটা ছত্রের ওপর চোখ বুলাতে লাগল। সেখানে কে যেন লিখে রেখেছে—“সাইমন ফোর্ড, তুমি আমার হাত থেকে পুরনো খনির সর্বশেষ কয়লার স্তরটাকেও ছিনিয়ে নিয়েছ। আমার বুকের ধন নেলকে তোমার পুত্র হারি ছিনিয়ে নিয়েছে। তুমি নিপাত যাও! যাহান্নামে যাও! নিউ অ্যাবারফয়েল ধ্বংস হোক!—ইতি, সিলফ্যান্স।”

নেল বিকট স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—“সিলফ্যান্স! সিলফ্যান্স।”

কথাটা বলেই নেল দুম করে মাটিতে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার চিৎকার শুনে ম্যাগি ছুটে এলেন। কোনোরকমে কোলে তুলে কটেজে নিয়ে গেলেন।

সিলফ্যান্স! কে এই সিলফ্যান্স? কোথায় থাকে সে? কোন অন্ধকার গুহায় আশ্রয় নিয়ে সে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনাগুলো ঘটিয়ে চলেছে?

দেয়ালের লেখাটার ওপর একটাবার মাত্র অস্থির চোখের মণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে জেমস স্টার তারস্বরে চেষ্টা করে উঠলেন, ‘চিনি, আমি চিনি। এ হাতের লেখা আমার পূর্বপরিচিত।’

ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার এবার সাইমনকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘সাইমন, তোমার চিঠির পাল্টা চিঠি যে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল এটা ভারই হাতের লেখা। এতদিন অন্তত এটুকু জানা গেল, তার নাম সিলফ্যান্স।’

সিলফ্যান্স-এর নামটা কানে যেতেই বুড়ো সাইমনের মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠল। যেন অকস্মাৎ তিনি ফুটা বেলুনের মতো চিপসে গেলেন। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে একটা সুপরিচিত মুখ অতর্কিতে ভেসে উঠল। ডোচার্ট সুড়ঙ্গের সর্বশেষ মন্দের নাম ছিল সিলফ্যান্স। খুবই দুর্দর্শ প্রকৃতির লোক ছিল। মৃত্যুভয় তার আদৌ ছিল না। খনিগর্ভের যেসব স্থানে বিষাক্ত গ্যাস জমে বিপদজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সেখানে মৃত্যু ভয় অগ্রাহ্য করে সে লঠন হাতে নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খনির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করত।

এমন অকুতোভয় দুর্দর্শ প্রকৃতির মঞ্চ সিলফ্যান্স একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেল। যাবার সময় অনাথিনী নেলকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সিলফ্যান্স তার ঠাকুরদা। সে ছাড়া নেলের তিনকুলে আপনজন বলতে কেউ-ই ছিল না।

সিলফ্যান্স কেন যে অতর্কিতে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়েছিল আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সে রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হয় নি। তার অন্তর্ধানের কাহিনী আজও পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে।

আজ থেকে পনের বছর আগে সিলফ্যান্স লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল। তার বয়স সাইমন ফোর্ডের চেয়ে বছর বিশ বছর বেশি।

চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ ঐকে ইঞ্জিনিয়ার জেমস স্টার বললেন, ‘সাইমন, একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না—‘আমার হাত থেকে তুমি কয়লাখনির সর্বশেষ স্তরটাকে ছিনিয়ে নিয়েছ’ এর মাধ্যমে সিলফ্যান্স কী বুঝাতে চাইছে?’

মান হেসে সাইমন বললেন, ‘শেষের দিকে তার মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছিল। তার বিশ্বাস জন্মেছিল, অ্যাবারফয়েল কয়লাখনিতে তার অধিকার রয়েছে। তাই খনি থেকে কয়লার চাঁই কাটার নামে সে রীতিমতো ক্ষেপে লাল হয়ে যেত।’

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ঐকে জেমস এবার বললেন, ‘হ্যাঁ, কথাটা খুবই সত্য বটে। এতক্ষণে আমারও মনে পড়েছে, সে নতুন একটা কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়ার পর উন্মাদের মতো সেটাকে সবসময় আগলে রাখত। অন্ধকার পাতালপুরীতে প্রতিনিয়ত চক্রর মেরে মেরে গোপন রহস্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করে নিয়েছিল। তাই তো তোমার আমন্ত্রণপত্রের পাল্টা চিঠি দিয়ে আমার এখানে আসা বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। তাই প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে আমাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যা কিছু রহস্যের সঞ্চয় করেছে, ধ্বংসাত্মক কাজগুলোর নায়কের ভূমিকা পালন করেছে।’

‘উন্মাদ! বন্ধ উন্মাদ! সিলফ্যান্স একজন বন্ধ উন্মাদ মি. স্টার। তা যদি না হত সে কিছুতেই অতিকায় হিংস্র পঁচাটাকে দিয়ে আমাদের লঠনটা নিভিয়ে দিয়ে বেকায়দায় ফেলত না। আবার আমি নেলকে নিয়ে কুয়েটা থেকে গুটার সময় পঁচাটাকে দড়িকাটার কাজে নিযুক্ত করে আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কিছুতেই উৎসাহী হত না’—হারি বলল।

‘জেমস স্টার এবার মুখ খুললেন, ‘সে না হয় হল। কিন্তু সিলফ্যান্স যে চরম পত্র দিয়েছে তার প্রতিকার কি করবে, একবারটি ভেবে দেখেছি কি? উন্মাদ শয়তানটার পৈশাচিক মনোবৃত্তির জবাব আমরা কি করে দেব, ভেবে দেখেছি কি?’

জ্যাকরিয়ান এবার মুখ না খুলে পারল না। সে বলল, ‘আজকের সিলফ্যান্স আর অতীতের সিলফ্যান্স যে একই ব্যক্তি এ ব্যাপারে কি আমরা নিঃসন্দেহ? অতীতের সিলফ্যান্স-এর বয়সের হিসাব করলে আমরা মানতে বাধ্য যে, সে আজ আর ইহলোকে নেই। আর নেহাতই যদি বেঁচে থাকে তবে অবশ্যই অর্থহীন হয়ে গেছে। চলাফেরার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আজ পর্যন্ত খনিগর্ভের যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে তা কি কোন অতিবুদ্ধের পক্ষে সম্ভব? তাই আমার বিশ্বাস আজকের সিলফ্যান্স নির্ধাত অন্য কোন লোক, তা নইলে পুরনো সিলফ্যান্সের সহযোগী কেউ না কেউ আছে।’

জ্যাকরিয়ান-এর পরামর্শ অনুযায়ী সবাই নেল-এর শরণাপন্ন হল।

নেল চোখের জল মুছতে মুছতে কান্নাভেজা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করল, 'আপনারা যাকে ঘরের বউ করতে উৎসাহী তাঁরা ধৈর্য ধরে শুনুন—আমি, হ্যাঁ আমিই সিলফ্যান্সের নাতনি। আপনারা যে সিলফ্যান্সকে চিনতেন তিনিই আজকের সিলফ্যান্স। বার্ষিক্য তার শরীরের অমিত শক্তিকে তিলমাত্র হ্রাস করতে পারে নি। আজও বাঘের শক্তি তাঁর গায়ে। যাক, এবার আমার প্রসঙ্গে আসা যাক, মা কি জিনিস আমার জানা ছিল না। এখানে এসে তা জানতে পারলাম, বুঝতে পারলাম। বাবার স্নেহ থেকে বঞ্চিত আমি। এখানে এসে ওনাকে পেয়েছি। পেয়েছি বাবার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসা।' এবার হ্যারির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে নেল বলল, 'এতদিন অন্ধকার কুঁয়োর ভেতরে বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয়েছে আমাকে। এখানে আসার পর অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরূপে হ্যারিকে পেয়ে আমার সে অভাব পূরণ হয়েছে, পেয়েছি পরিপূর্ণ স্বাদ।

আশা করি আপনাদের আর বলতে হবে না, একমাত্র সাথী বুড়ো ঠাকুরদাকে নিয়ে অন্ধকার যক্ষপুরীতে আমাকে পনেরটা বছর কাটাতে হয়েছে। ঠাকুরদার মধ্যে ভয়ঙ্করতা পরিপূর্ণ থাকলেও আমাকে কিন্তু খুবই স্নেহ করতেন। কুদর্শন অতিকায় একটা পঁচা ছিল ঠাকুরদার সর্বকণ্ঠের সঙ্গী। নাম তার হারফাঙ্ক। গোড়ার দিকে তো ওটাকে দেখলেই আমি ভয়ে কঁকড়ে যেতাম। পরে কিন্তু হারফাঙ্ক ঠাকুরদার চেয়ে আমারই বেশি অনুগত হয়ে পড়ে।

আর একটা কথা, খনিরাজ্য বিশাল। তা সত্ত্বেও ঠাকুরদা আড়াল থেকে আপনাদের কটেজের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতেন। খনির মধ্যে আপনাদের উপস্থিতি তিনি কোনক্রমেই মনে নিতে পারতেন না। তিনি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন, যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, পুরনো খনিতে আপনারা আদৌ সন্তুষ্ট না থেকে ঠাকুরদার খনির দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন। স্বার্থগুপ্ত মন নিয়ে হাত বাড়ান্ধেন। অস্থিরচিত্ত ঠাকুরদার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা করলেন, খনির দিকে পা বাড়ালেই আপনাদের জানে মেরে ফেলবেন। আমি ভয়ে কঁকড়ে গেলাম। আসলে আমার নিজের জন্য ভয় মোটেই নয়, ঠাকুরদা আর আপনাদের জন্যই ছিল আমার যত ভয়। ভয়ঙ্কর কোন সর্বনাশ ঘটিয়ে না দেন। আপনারা নতুন খনিতে পা দেয়ার দিনই আমার স্বার্থগুপ্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ ঠাকুরদা রেগে একেবারে লাল হয়ে গেলেন। জ্বলন্ত ক্রোধে গর্জন করতে করতে পাথর চাপা দিয়ে সুড়ঙ্গের পথটা দিলেন বন্ধ করে। ক্রোধে রীতিমত ফুঁসতে লাগলেন। কয়েকজন খ্রিস্টান না খেয়ে শুকিয়ে কঁকড়ে মারা যাবে এই আশঙ্কায় আমি ঠাকুরদার অগোচরে আপনাদের জন্য রোজ কিছু জল আর রুটি রেখে যেতাম। ভেবেছিলাম আপনাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তিও দেব। কিন্তু সম্ভব হল না। আমার মনের ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। অতন্ত্রপ্রহরী আমার ঠাকুরদা চোখের ধুলো দিয়ে আপনাদের কয়েদমুক্ত করতে পারলাম না। একদিন জ্যাকরিয়ানকে আলা দেখিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম। ফেরার পথে আমাকে ঠাকুরদার মুখোমুখি পড়তে হল। হাতেনাতে ধরা পড়ে গেলাম। তাঁর রোষদীপ্ত মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমার কলিজা কেঁপে উঠল। তিনি আমার প্রাণনাশ করলেন না। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন অন্ধকার পাতাল কুঁয়োতে। সেখানে কয়েদ করে রাখলেন। আমার পাহারায় রাখলেন হিংস্র পঁচা হারফাঙ্ককে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে একটু দম নিয়ে নেল আবার মুখ খুলল, 'আশা করি আর আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারছেন, হ্যারির সঙ্গে আমার বিয়ের পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে? আমাকে বরং কয়েক দিনের জন্য আমার ক্রোধান্বিত ঠাকুরদার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি চেষ্টা করে দেখি, বুঝিয়ে শুনিয়ে যদি তাঁকে ক্রোধমুক্ত করতে পারি।'

'না, তা হয় না নেল। সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে তোমাকে ছেড়ে দেয়া মোটেই সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বরং আমরা প্রতিহিংসাপরায়ণ শক্তিদ্বারকে নাশ করার চেষ্টা করি। সফল আমাদের হতেই হবে।' হ্যারি ও জ্যাকরিয়ান সম্মুখে বলে উঠল।

নেল তাদের কথায় সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। সে ঠাকুরদার কাছে যাওয়ার জন্য জেদ ধরল। এতকাল বুড়ো সিলফ্যান্স তার মনে মানুষের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্য একটা কথাই বার বার বলেছে, মানুষজাতটা বিশ্বাসঘাতক, দারুণ স্বার্থগুপ্ত। কিন্তু ফোর্ড-পরিবার ও জেমস স্টার-এর সান্নিধ্যে এসে সে এ সত্যই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, ঠাকুরদা এতকাল তাকে ভুলপথে চালিত করেছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে পাওয়া অফুরন্ত স্নেহ-ময়া-ভালবাসা তাকে মুগ্ধ করেছে। তাই আজ নেল-এর একান্ত ইচ্ছা, বুঝিয়ে শুনিয়ে তার ঠাকুরদাকেও ক্রোধমুক্ত করে সৎপথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।'

কিন্তু হ্যারি ও তার মা-বাবার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে নেল-এর পক্ষে আর তার ঠাকুরদার কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব হল না।

হ্যারি ও নেল-এর বিয়ের তারিখ এগিয়ে আসতে লাগল। সিলফ্যান্স তাদের বিয়ে ভঙ্গুল করার জন্য যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সে পথ থেকে তাকে ফেরাবার জন্য হ্যারি ও জ্যাক সাধ্যাতীত প্রয়াস চালাতে লাগল।

শেষপর্যন্ত বহু আকাজিক বিয়ের তারিখ এল। ইতিমধ্যে সিলফ্যান্স-এর দিক থেকে আর কোনোই প্রতিহিংসার লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

হ্যারি ও নেল-কে নিয়ে সাইমন পরিবার গির্জার দিকে নৌকাযোগে যাত্রা করল। তাদের নৌকাটা যখন গির্জা থেকে মাইলখানেক দূরে ঠিক তখনই আচমকা ভাঙা একটা পাথরের ফাঁক থেকে উদ্ধার বেগে ছোট্ট একটা নৌকা বেরিয়ে এল। নৌকার গলুইয়ে ছিপছিপে গড়নের এক বুড়ো সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাকে ঢাকা। মাথায় একরাশ কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা রুক্ষ পাকা চুল আর শনপাটের মতো সাদা দাড়িগুলো বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। তার হাতে একটা সেফট লাম্প।

পাতালপুরী কাঁপিয়ে বুড়ো সিলফ্যাক্স বিকট আত্নানাদ করে উঠল, 'ফায়ার ড্যাম্প! ফায়ার ড্যাম্প! সব ধ্বংস হয়ে যা! হারবার হয়ে পাতালপুরীর অন্ধকার খনিতে ছড়িয়ে যা। ধ্বংস হয়ে যা।'

সিলফ্যাক্স-এর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বাতাসবাহিত কার্বোরেটেড হাইড্রোজেনের গন্ধ সবার নাকে আসতে লাগল।

একটু আগে বিশালায়তন চাতালটা ছড়মুড় করে ভেঙে পড়েছিল। তার ফাঁক দিয়ে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে কনির সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে লাগল। জেমস স্টারও অন্যান্য নৌকা-যাত্রীরা মৃত্যুভয়ে মুগ্ধ পড়লেন। খনি ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা পাগলের খেয়ালমাত্র। পালাবেই বা কি করে? ক্রোধোন্মত্ত সিলফ্যাক্স পথ আগলে দাঁড়িয়ে। তার চোখে মুখে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলজ্বল করছে। আর বিশালায়তন হিংস্র পঁচা হারফাঙ তার মাথার ওপর দিয়ে ফুঁসতে ফুঁসতে উড়ে বেড়াচ্ছে।

সবাই প্রমাদ গনল। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো মানুষ সিলফ্যাক্স-এর প্রতিহিংসার শিকার হয়ে নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দেবে। কারোর সাধ্য নেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পায়।

জ্যাকরিয়ান আচমকা নৌকা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটান আগেই ক্রোধোন্মত্ত বুড়োর সিলফ্যাক্স-এর নৌকায় হাজির হবে।

জ্যাকরিয়ানকে উদ্ধারের মতো সাঁতার কেটে এগিয়ে যেতে দেখেই সিলফ্যাক্স অকস্মাৎ ডেভিল্যাম্পের কাচটা দুম করে ভেঙে দিল।

ভয়ঙ্কর সে মুহূর্ত আসন্ন! মৃত্যুভয়ে কাতর সবাই চোখ বন্ধ করে ইস্টনাম জপ করতে লাগল।

সিলফ্যাক্সের ডাকে অতিকায় পঁচা হারফাঙ বাতাসের বেগে উড়ে এসে ভাঙা ডেভিল্যাম্পের জ্বলন্ত সলতেটা ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে চলল। এমন সলতে ব্যবহার করে সে এর আগেও বহুবার খনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

ব্যাপার সঙ্গীন দেখে নেল গলা ছেড়ে হারফাঙ-এর নাম ধরে ডাকতে লাগল। নেলের গলা শুনে সে কর্তব্য ভুলে গিয়ে আচমকা মুখের সলতেটা মুখ থেকে ফেলে দিল। নেলকে পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। সে আহ্বাদে গদ গদ হয়ে নেলের মাথার ওপরে হাক্কা ভাবে ডানা ঝাপটাতে লাগল। এদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিলফ্যাক্স ছুটে গিয়ে আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জ্যাকরিয়ান ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বস্থানে সাঁতার কেটে সিলফ্যাক্স-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

পরিস্থিতি ভয়াবহ অনুমান করে নেল বিকট স্বরে আত্নানাদ করে উঠল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! জ্যাককে বাঁচাও!'

না, জ্যাকের কোনো বিপদই ঘটল না। আসলে প্রতিহিংসাপরায়ণ সিলফ্যাক্স তীব্রস্বরে গর্জন করতে করতে সেই যে জলে ঝাঁপ দিল সেখান থেকে আর উঠল না। সে আতঙ্কে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করল। জীবন্ত সলিলসমাধি।

শুভ মুহূর্তে হ্যারি আর নেল-এর বিয়ে হয়ে গেল। তারা বুড়ো সাইমনের কটেজেই সুখে দাম্পত্যজীবন যাপন করতে লাগল।

বুড়ো সিলফ্যাক্স পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। তার বিয়োগ-ব্যথা নেলকে চরম মর্মান্বিত করে। সে অতিকায় পঁচা হারফাঙকে নিজের কাছে রাখতে চাইল। পারল না। সে তার প্রভু সিলফ্যাক্সের মতোই সভ্য মানবসমাজ থেকে দূরে থাকতেই আগ্রহী। সে বিষণ্ণমনে মালকম-হুদের দিকে সেই যে উড়ে গেল আর কোনোদিনই মানুষের সংস্পর্শে আসে নি। তার বয়স কত হয়েছে কেউ জানে না আর কতদিনই বা সে পৃথিবীর বুকে থাকবে তাও সবার ধ্যানধারণা বহির্ভূত। তবে মালকম-হুদের শান্ত জলরাশির ওপর দিয়ে অনেকেই তাকে মাঝেমধ্যে উড়তে দেখে। বিষণ্ণতার প্রতিমূর্তি হাড়ফাঙের চোখ দুটো হন্যে হয়ে কাকে খোঁজে? তার অতিবৃদ্ধ প্রভু সিলফ্যাক্সকে কি? হয়ত-বা তাই সত্য।

=== ○ ===

জার্নি টু দ্য সেন্টার অব দ্য আর্থ

সেটা ছিল ১৮৬৩ সালের ২৪ মে।

এ কী ব্যাপার! এরই মধ্যে কাকা বাড়ি ফিরছেন! বেলা দুটোও যে বাজে নি। মহা মুশকিলেই পড়ল মার্থা। কাকা এরকম কাণ্ড করে বসবেন, স্বপ্নেও ভাবে নি সে।

সংসারের সর্বময়ী কব্রী মার্থা। সব ব্যাপার তাকেই সামলাতে হয়। খুঁটিনাটি ব্যাপার স্যাপার কোথায় কী হয়েছে, কী করতে হবে, তাকেই খেয়াল রাখতে হয়।

কাকা বাড়ি ফিরছেন, অথচ কিছুই তৈরি নেই। এমনকি জলটুকু পর্যন্ত গরম হয় নি এখনো। এমনিতেই যা তিড়িকি মেজাজের মানুষ, পান থেকে চুনটি খসলেই রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন।

ওই তো কাকা লম্বা লম্বা পায়ে কোনিগসট্রাস ধরে হাঁটছেন। কিন্তু আর মাত্র আধঘণ্টা পরে এলেই, মার্থার কিছু ভাবনার ছিল না। মার্থা ভীতসন্ত্রস্ত পায়ে জানালার দিকে আরো দুপা এগিয়ে গেল। পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'দাদা এসে পড়লেন যে!' এবার আমার কাছে এসে বলল, 'তুমি কাকাকে একটু সামলে নাও। আমার হয়ে একটু বুঝিয়ে বলবে কিন্তু, কথা কটা কোনোরকমে আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে একদৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

কাকে বুঝিয়ে বলব? কাকাকে? তবেই হয়েছে! মার্থা এতদিন পরেও তাঁকে চিনতে পারল না! নইলে বুঝিয়ে বলার কথা সে মুখে উচ্চারণ করতে পারত না।

আমার প্রাতঃস্মরণীয় কাকা এই অটো লিভেনব্রক লোকটি রীতিমতো খিটমিটে মেজাজেয়। বদ মেজাজি বলেও পরিচিত মহলে তাঁর খেটে সুনাম রয়েছে। এক কথায় লোকটি একটি বান্ধবের স্তূপ। নিয়মে একটু ব্যতিক্রম হলেই দপ করে জ্বলে ওঠেন। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় হাতপা ছোঁড়াছুঁড়ি ও তর্জন গর্জন। মার্থা তো কচি খুকি, আমি তাঁর বিষয় সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ভয়ে সর্বদা কেঁচো হয়ে থাকি।

বাড়ি ঢুকেই কাকা খাওয়ার টেবিলের দিকে ছোটেন, আর সেটি যদি খালি দেখেন? এমন হস্তিষি জুড়ে দেবেন যে, ছাদটাই হয়ত ফেটে টোচির হয়ে যাবে। আমিও মার্থার পথ বেচে নেব কি না, ভাবতে লাগলাম। ইচ্ছা থাকলেও তা আর হয়ে উঠল না।

কাঁটামারা বুটে ঘন ও গম্বীর আওয়াজ তুলে কাকা বাড়ি ঢুকলেন। ব্যস, আর কথা নয় সোজা হলঘরের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

হল ঘরে ঢুকে টুপিটা ছুঁড়ে দিলেন হুঁকের দিকে, হাতের ছড়িটি ছুঁড়ে দিলেন কোনের দিকে। এবার তেমনি লম্বা লম্বা পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ঘরে ঢুকে কাকা গা থেকে কোটাটা খুলে চৌকির দিকে ছুড়ে দিতে গিয়ে গলাফাটানো চীৎকার জুড়লেন—'এ্যাক্সেল শিপগির শুনে যা!'

এবার ব্যাপার পরিষ্কার হল, কাকা খেতে আসেন নি। মার্থা তবে এ যাত্রা বেঁচেই গেল। খেতে এলে সোজা মার্থার রান্নাঘরে হাজির হতেন, যাকে শুদ্ধভাষায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি 'উদর পূর্তি ল্যাবরেটরি' নাম দিয়েছেন।

মার্থা স্বস্তি পেল বটে, আমি কিন্তু মহাসমস্যায় পড়ে গেলাম। এই ভর দুপুরবেলা যদি খনিবিজ্ঞান বা ভূবিদ্যা নিয়ে মজে যান তবে আমার একেবারে সাড়ে সর্বনাশ! আর তাঁর মজে যাওয়া যা তা ব্যাপার নয়, একটানা ছয় সাত ঘণ্টা বকবক করবেন। আর আমার অবস্থা? আহা! নিদ্রার প্রয়োজন সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকা সত্ত্বেও জোর করে ভুলে থাকতে হয়। তাঁর বক্তব্যের প্রতি আশ্রয়ের ভান করে বার বার ঘাড় কাত করতে হয়। ব্যাপারটা খেলসা করে বলছি, আমি কেবল অপূত্রক কাকার বংশধর এবং উত্তরাধিকারীই নই, তার গবেষণার সহকারীও বটে। তিনি একজন পৃথিবীর খ্যাতনামা অধ্যাপক। হামবুর্গ শহরের বিখ্যাত সেন্টপলস কলেজে অধ্যাপনা করেন। ভূতত্ত্ব সম্পর্কীয় তাঁর সৃষ্টিভিত্তি মতামত পৃথিবীর সব দেশের পণ্ডিতজনের কাছে সমাদৃত। আর আমি? তাঁর এই সুমহান কর্মযজ্ঞে আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁকে সাহায্য করে থাকি।

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আত্মপ্রচার করছি না। এক্সেল নামধারী এই অধমটার বয়স মাত্র চব্বিশ বছর। তবে এটুকু বলতে পারি, সুপণ্ডিত কাকাটি বিজ্ঞানের যে-সব শাখায় প্রভূত জ্ঞান ধারণ করেন, সে-সব বিষয়ে আমিও কম পড়াশুনা করি নি। একথা বলার অর্থ এই নয় যে, আমি তাঁর একজন সুযোগ্য ভাইপো। তবে এটা তো মিথ্যে নয়, আমি তাঁরই হাতে গড়া ছাত্র। তাঁর চিন্তাধারা ও প্রশ্নও যুক্তিগুলোর অর্থ বোঝার মতো ক্ষমতা অন্তত আমার হয়েছে। আর এরই জন্য আমাকে কম দুর্ভোগ ভুগতে হয় না। আজকের দুর্ভোগের কথাই ধরুন না, স্নানাহার শিক্কেয় তুলে তাঁর পাশে বসে, ঘাড় নেড়ে যেতে হবে।

ভীতসন্ত্রস্ত মনে গুটিগুটি কাকার ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে পা দিলাম। ঘর বললে হয়ত ঠিক বলা হবে না—আন্তাকুঁড়ে। বইয়ের তাকগুলো দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সত্য। কিন্তু স্তূপাকৃতি বই, অগণিত যন্ত্রপাতি ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তাদের কোনটা বন্ধ, কোনটা আবার খোলা অবস্থায়ই দেখা যাচ্ছে। এরকমই প্রচলিত ব্যবস্থা। জ্ঞানগম্যা হওয়ার আগে এগুলোকে গোছগাছ করে রাখার চেষ্টা করতাম। ব্যস, আর যাবে কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত খিচুনি। পরিকার বুঝিয়ে দিতেন, ওগুলো ছোঁয়ার অধিকার আমাকে মোটেই দেয়া হয় নি।

আজ ভয়ে ভয়ে কাকার ঘরে পা দিয়েই দেখলাম, তিনি টেবিলে বসে। সামনে মোটা একটা বই খোলা অবস্থায় রয়েছে। সেটার বয়স এত বেশি যে, হাত দেয়ামাত্র পাতাগুলো শুকনো তামাকপাতার মতো গুঁড়ো হয়ে পড়ছে। পাতা উল্টে দেখার আঘাত তো একটু লাগছিলই, মিথ্যে নয়। তিনি বইয়ের মধ্যে বিভোর হয়ে ডুবেছিলেন অন্য কোনোদিকে খেয়লমাত্র ছিল না।

আমি তাঁর টেবিলের পাশে কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে একসময় বই খুললাম—বইটা খুবই পুরনো দেখা যাচ্ছে। ছাপা কোন ভাষায়?

আমার কথা কানে যেতেই কাকা আঁতকে উঠলেন। মুখ তুলে আমার দিকে এমন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকালেন যে, অকস্মাৎ মনটা বিধিয়ে উঠল। তিনি দাঁত মুখ খিচিয়ে উঠলেন, ‘কে বললে ছাপা? কে বললে এটা ছাপা বই? হাতে লেখা! বইয়ের পাণ্ডুলিপি এটা।’

আমি কয়েকবার ঢোক গিলে কোনোরকমে উদ্ধারণ করলাম, ‘তাই নাকি পাণ্ডুলিপি এটা? কোথায় পেলেন? হলই বা হাতে লেখা, কোন ভাষা এটা?’ সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এরই মধ্যে আমি একবারটি চোখ বুলিয়ে নিলাম। দেখেও চিনতে পারি নি। আর পারি নি বলই আমার মধ্যে কেমন যেন একটা উদ্বেজনা ভর করল। কাকার মতো বহু ভাষার দখল না থাকলেও জার্মান, স্পেনিস, ফরাসি, ইতালীয়, ল্যাতিন ও গ্রিক প্রভৃতি পাঁচ ছয়টা ভাষায় একটু-আধটু দখল আমার রয়েছে। কিন্তু এই পাণ্ডুলিপিতে এগুলোর মধ্যে কোনোটিতেই ব্যবহার করা হয় নি।

আমার মনোভাব বুঝতে পেরে কাকা কণ্ঠস্বর গম্ভীর করে বজায় রেখেই বললেন, ‘রিউনিক! আইসল্যান্ডের প্রাচীন ভাষা। তোমাকে কী আর দোষ দেব? আসলে তো আমিও এ ভাষা জানিনে! সত্য বলতে কি, পৃথিবীতে আজ আর কেউই হয়ত নেই যে এটা জানার মতো করে জানে। লন্ডনের কোনো কোনো প্রকাশকের সঙ্গে আমার ব্যবস্থা রয়েছে দুষ্টাপ্য কোনো পাণ্ডুলিপি হাতে পড়লেই সোজা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। তাই উদবার্ন হাস্যাস-স্মিত এটা পাঠিয়েছে। কিন্তু এই অমূল্য সম্পদের কী সদগতি যে করতে পারব, জানি নে।’

‘বাস্তবিকই যে এটা অমূল্য সম্পদ কী করে বুঝলেন? পোকায় কাটা কয়টা পাণ্ডুলিপি হলই যে সর্বজ্ঞানের আধার হবে তারই কি যুক্তি রয়েছে?’

তিনি ধমকের সুরে বললেন, ‘অপদার্থ কোথাকার! পোকায় কাটা বলেই যে মূল্যবান মনে করছি, মোটেই তা নয়। এমন একজন লোকের লেখা এ-পাণ্ডুলিপিটা—’

কথা শেষ না করেই ব্যস্ত হয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। হলদে পার্চমেন্টের ওপর একটা কালির দাগের ওপর আঙুল দিলেন। পুরোপুরি কালি ছিটানো নয়, কালো কালির ওপর এলোমেলো সাদা সাদা আঁচড়কাটা। আমি যার একবিন্দু মর্মও উদ্ধার করতে পারলাম না। কাকা রীতিমতো বিজয়ী বীরের মতো বলে উঠলেন, ‘অন্ধ অপদার্থ, বলছি শোন। এই দুর্বোধ্য বইটা হাতে পেয়ে অহেতুক আমার মধ্যে উদ্ভাস জেগে ওঠে নি। যার লেখা এটা, তিনি ছিলেন, ষোল শতকের ইউরোপের অতুলনীয় পণ্ডিত। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, ভৌগোলিক, আবিষ্কারক ও দার্শনিক। এই যে কালির ওপর সাদা সাদা আঁচড়কাটা দেখছ, তাঁর স্বাক্ষর। নইলে পার, স্বাক্ষরের মধ্য দিয়েও আত্মগোপনের চেষ্টা। জানই তো, দর্শন, বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্বে নতুনতর চিন্তাধারার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে সেকালে বহু পণ্ডিতজনকে রাজার কোপে পড়তে হয়েছে, শাস্তি পেতে হয়েছে। অন্য কারো কথা না জানলে গ্যালিলিওর কথা শুনেছ নিশ্চয়? নতুন মতবাদ ও চিন্তাধারার জন্য এই আর্নে স্যাকনুসেমকেও শাস্তি পেতে হয়েছিল। আর এই যে সে কালি ছিটানোর ওপর সাদা সাদা আঁচড়, এতে তাঁর নামটাই লেখা রয়েছে—আর্নে স্যাকনুসেম। নাম লেখা আছে বটে, কিন্তু খুব কম লোকই তা পড়তে পারবে। কী মজার ব্যাপার লক্ষ করছ? আমি নেহাতই ভাগ্যবান বলেই রিউনিক হরফে যৎসামান্য জ্ঞান পেয়েও পাঠ করতে সক্ষম হচ্ছি না।’

আর্নে স্যাকনুসেম! আর্নে স্যাকনুসেম! স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। নামটি শুনে আমার মধ্যে কিন্তু কাকার মতো আবেগ উদ্ভাস জাগল না। শুধু দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্ববিদ হলেও তবু না হয় চলত, আবার বৈজ্ঞানিকও বটে। লোহাকে সোনা বানানোর কায়দা হয়ত তাঁর রপ্ত ছিল। রাজার কোপদৃষ্টি এ রকম কিছু একটা দাবি করে থাকলে তো রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়তে হবে। পড়বে নাই বা কেন।

এর বেশি ভাবতে পারলাম না আমি। আসলে চিন্তা করার সময় না দিয়েই কাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। কলেজে ছাত্র পড়ানোর কায়দায় বক্তৃতা জুড়ে দিলেন—চেষ্টা থাকলে, সাধনা থাকলে সাফল্য অবশ্যই আসবে। তবে কাজের আঁট থাকা চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস স্যাকনুসেম-এর মতো একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি আজীবনে কথায় পাতা ভরেন নি, যা লিখে গেছেন, তা মানুষের হিতার্থেই লিখেছেন সন্দেহ নেই। এটা যে দীর্ঘ যুগ মানুষের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে, নেহাতই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তবে শিগগিরই সে-দুর্ভাগ্যের অবসানের সময় আসছে। আমাদের কাছে যখন পাণ্ডুলিপিটা পৌঁছে গেছে, তখন অবশ্যই আশা করা যেতে পারে বিহিত হবে।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটুকু তাঁর নজর এড়ায় নি। আমাকে কিছু বলতে হল না। তিনিই আবার বললেন, ‘কী? ভাষার কথা বলছ তো। বলছিই তো রিউনিক ভাষায় আমার ভালো দখল নেই! আমার সমসাময়িক কোনো ভাষা-তত্ত্ববিদ-এরও জানা নেই। কিন্তু জানি, চেষ্টা করলে অবশ্যই জানতে পারব। সাধনায় লিপ্ত থাকলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যজারী!’

কাকা আবেগবশত জীর্ণ পাণ্ডুলিপিটি টেবিল থেকে হাত তুলে নিয়ে পর-মুহূর্তেই আবার সেখানেই রেখেদিলেন। কলেজের ছাত্র পড়ানোর সময়ও এমনটিই করে থাকেন নতুন কিছু নয়।

এরকমটা আশা করা হয় নি। পাণ্ডুলিপির গোছার ভেতর থেকে একটি পাতা খসে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পার্চমেন্টেরই পাতা। রং দেখে বোঝা গেল, পাণ্ডুলিপির পার্চমেন্টের চেয়ে এর বয়স বড় একটা কম নয়। আর লেখা দেখেও একই সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু মিলিয়ে দেবার সুযোগ কোথায়?

কাকা আলগা কাগজের টুকরোটো টেবিলের ওপর রেখে তার দিকে অলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, মুখে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। আমি গুটিগুটি এগিয়ে সাহসে ভর করে টেবিলের ওপর ঝুঁকলাম। ব্যর্থ প্রয়াস! টুকরোটোতে যা লেখা সবই রিউনিকে। বিদ্যো যা, তাতে এটার পাঠোদ্ধার একেবারেই অসম্ভব। একটি অক্ষরও উদ্ধার করতে পারলাম না।

আমার অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও কাকার তো রয়েছে। তিনি ক্ষিণহাতে এক টুকরো কাগজ নিয়ে একের পর এক জার্মান অক্ষর বসাতে লাগলেন।

কয়েক মুহূর্ত পর আমার দিকে মুখ তুলে বললেন, 'যা বাব্বা! এ কী দাঁড়াল!' আপন মনে বিভ্রিভ্র করে বলতে লাগলেন, 'এ কেমন হল? ওতে রিউনিকে যা লেখা রয়েছে, তার আক্ষরিক আকার তো এরকমই হওয়ার কথা। কিন্তু কই অর্থ কিছু দাঁড়াচ্ছে না তো! কিছুতো অর্থ করতে পারছি না!'

কাগজটার দিকে চোখ রেখে আমি মনে মনে পড়তে লাগলাম, 'বেরপাতেহ তনিপউনেমাঝমা কঠি রকেল গো নিরধয়মসক এ দিখ কথা তেধে মেনে রেভিগ লতয় কেথে রভিগ নেথাই সে—'

কী ব্যাপার! এটি কী হল? ধাঁধা নাকি। কোনো অর্থবোধই হচ্ছে না যে!

কাকা আবারও গোড়া থেকে পুরোটা পড়লেন। শেষপর্যন্ত আমি হতাশ হয়ে উচ্চারণ করলাম, 'ভাষার সৃষ্টি যদি হয়ই মনের ভাব গোপন করার জন্যই হয়েছে। আর তাই যদি সত্য হয় তবে এই লেখটাকে অবশ্যই ভাষায় বলতে হবে।'

'ভাষা? না, বরং একে ভাষা না বলে ভাষার বিকৃতিই আখ্যা দিতে পারি। স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে এই ছকের মধ্যে স্যাকনুসেম কিছু অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রেখে গেছে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় ঠেকছে, মিথ্যা নয়। এই অক্ষরগুলোর মধ্যে সে রহস্যের সমাধান গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আমরা যাকে ক্রিপ্টোগ্রাম আখ্যা দিয়ে থাকি। প্রকৃত ব্যাপারকে বিকৃতরূপে প্রকাশ করা! এমনটা তো হামেশাই দেখা যায়।'

মার্থা বারান্দা দিয়ে হাঁটছে হাঁটতে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ভেতরের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল, 'দুটো তো বেজে গেছে, খাবার দেব কি?'

মার্থার কথায় কান দেয়ার মতো সময় ও মানসিক অবস্থা কাকার তখন নেই। মার্থার কথা শুনতেই পেলেন না। আমি তার হয়ে ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। মার্থা বিদায় নিল।

কিছুক্ষণ পরে কাকা আমার দিকে চোখ ফেরাতেই বললাম, 'আপনার মধ্যাহ্নভোজনের সময় হয়েছে। মার্থা বলে গেল, খাবার তৈরি।'

আচমকা বাজখাই গলায় গর্জে উঠলেন, 'কী? কী হয়েছে? খাবার? না, এই জটিল রহস্যের কুল কিনারা না করা অবধি খাবারের কথা উচ্চারণ করবে কে? এখন ওসময় রেখে দাও। আমি এখন লাইব্রেরিতে যাচ্ছি। ক্রিপ্টোগ্রাম সমাধানের কী কী উপায় বইপত্র লেখা আছে দেখতে হবে! একে একে সবরকম প্রক্রিয়াই তো অবলম্বন করে দেখতে হবে।' ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। কাগজের টুকরোটো টেবিলের ওপর রেখেই গটমট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হলঘর থেকে টুপি আর লাঠিটা তুলে নিয়ে তিনি একেবারে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠলেন।

ব্যাপারটা আমার কাছে বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। কাকা না খেয়ে বেরিয়ে গেছেন, আমার খেতে বসা সম্ভব হবে কি না ভাবছি। এদিকে পেটের মধ্যে ছুঁচো ডিগবাজি আছে। আগেও অনেকবার তাকে এরকম করতে দেখা গেছে। যখন গুরুতর কোনো ব্যাপার মাথায় চাপে তখন একনাগাড়ে দুই তিনদিন মুখে কুটোটি পর্যন্ত কাটেন নি। কিছু বলতে গেলে এমন ঢ্যাবা চোক করে তাকিয়েছেন, লেজ গুটিয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

হ্যাঁ, ব্যাপার খুবই বেগতিক। আর পারা যাচ্ছে না। নিজের উদরদেবতাটিকে আগে ঠাণ্ডা করাই উচিত। নইলে কপালে আটল্লিশ না বাহান্তর ঘণ্টা নিরুপ উপবাস লেখা আছে, কে জানে? কর্তব্য স্থির করে উঠে দাঁড়লাম।

কিন্তু খেতে যে যাচ্ছি, কাকার ক্রিপ্টোগ্রামটা যে টেবিলে পড়ে আছে? সবকিছুতেই তাঁর খামখেয়ালি, কাগজটি যে একটি কিছু চাপা দিয়ে রাখা দরকার ছিল খোয়ালই হয় নি। দুর্ঘটনা কোন পথ দিয়ে, কী রূপ নিয়ে দেখা দেবে, কে বলতে পারে।

আমি টেবিলের কোণা থেকে একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে পার্চমেন্টটাকে অনায়াসেই চাপা দিতে পারতাম। কিন্তু সে চেষ্টা না করে কেন যে পার্চমেন্টটাকেই হাতে তুলে নিলাম, বলতে পারব না। শুধু তুলে নেয়াই নয়, তার উল্টো পিঠটোও দেখা যেন একান্ত দরকার আমার। কী যেন কী ভেবে কাগজটা উল্টে ধরলাম।

ব্যস, অমনি ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। খোলা জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। আচমকা কাগজটি আলোতে যেতেই অক্ষরগুলো আমার সামনে উল্টো হয়ে ভেসে উঠল।

শেষ শব্দটিই যে স্পষ্ট বোঝা গেল, 'স্নেফেলস'।

সেই থেকে শব্দটি আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল—স্নেফেলস।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে, স্নেফেলস নামে তো একটা পাহাড় আছে, শুনেছি।

ব্যস, আর মুহূর্ত দেরি না করে এক নিশ্বাসে পরের লেখাটিই পড়ে ফেললাম, যেখান থেকে স্নেফেলস পাহাড়ের আগুন নির্গত হত, সেখান থেকে ক্রমে অতল গহ্বরে নেমে যাও, একসময় পৃথিবী-গোলকের ঠিক কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যেতে পারবে।

পার্চমেন্টটার ওপর বারবার চোখ বোলাতে লাগলাম।

স্নেফেলস! স্নেফেলস! স্নেফেলস!

আমি আজ পর্যন্ত ভূতত্ত্ব বিষয়ে যেটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি, তাতে করে জেনেছি, স্নেফেলস পাহাড় আইসল্যান্ড দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। আর এটা একটা মৃত আগ্নেয়গিরি। গত পাঁচশো বছরের মধ্যে এ-পাহাড়টা অগ্নি উদগীরণ করে নি, ভবিষ্যতেও করবে বলে আশঙ্কা করেন না ভূতত্ত্ববিদরা। উচ্চতা বড় কমই বা বলি কী করে, পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি। খুবই দুরারোহ পর্বত এটা। তাই পর্যটক বা পর্বত আরোহীরা সচরাচর এ পথ মাড়ায় না।

একটু আধটু জানা আছে বটে। কিন্তু কেবল এটুকুই জানা ছিল না যে, মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে নেমে পড়লে পাতাল দর্শনের পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। ব্যস, এইটুকুই কেবল অজানা ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্যাকনুসেমে তত্ত্ব জানলেন কী করে? মনে করতে হয়, সে পথ দিয়ে তিনি পাতালে নেমে গিয়েছিলেন। নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার! যদি সত্যিই নেমে থাকেন তবে আবার কী করেই বা ওপরে উঠে এলেন? ওপরে থেকে নেমে যাওয়ার বহু ফন্দি ফিকির বের করে ফেলা যায় কিন্তু ফিরে আসার ফিকির? সিঁড়ির ব্যবস্থা নেই, সসীমসিঁড়িও কেউ নেই যে, দড়িটুপি ধরে টেনে তুলবে। আর লাফিয়ে তো খুব বেশি হলেও আর ফুট খানেক ওঠা সম্ভব। কিন্তু স্নেফেলস যে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু! যা তা কথা নয়, পাঁচ হাজার ফুট।

সত্য বলতে কি ক্ষিদে তেঁটা মাথায় উঠে গেছে। মার্খাকে দেখেই সে বোধহি আবার ফিরে এল। যা খুশি হোক গে, আগে উদর-দেবতাতিকে তো ঠাণ্ডা করি। মার্খাকে অনুসরণ করলাম।

কাবার ঘরে গিয়ে মার্খা জিজ্ঞেস করল, 'স্যার কি চলেই গেলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী! চলে গেলেন, খাবেন না?'

'না। চলে গেলে কী হবে, তাঁর আর আমার দুজনের খাবার আমিই খাব। গতিক সুবিধের নয়, স্যাকনুসেমের দৌলতে হঠাৎ আমাদের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। সময়-সুযোগ থাকতে উদর পূরণ করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

আমি খাবার টেবিল থেকে ওঠার বেশকিছু সময় বাদে কাকা ফিরে এলেন। মাথা রুক্ষ, চোখে ক্লান্তির ছাপ, গাল দুটো রোদে ঝলসে গেছে। ক্লান্তি আর অবসাদ যেন তার দেহ মনে ভর করেছে। হতাশ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে করুণস্বরে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'না, কোনোই খোঁজ পাওয়া গেল না! ওটা আবার লাইব্রেরি নাকি, একেবারে যাচ্ছেতাই। দরকারি খবর যদি নাই দিতে পারে তবে কী হবে ওটাকে রেখে! আমি কিন্তু এত সহজে দমছি না। সে পাত্রই নয় এই অটোমিডেনব্রক। যে করেই হোক ক্রিস্টোফ্রাম আমি উদ্ধার করবই। পড়ে তবে ছাড়ব। ঈশ্বর সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, ওটা না পড়া অবধি জলটুকু পর্যন্ত ছোঁব না।'

'হ্যাঁ, যে-রকমটা আশঙ্কা করেছিলাম কার্যতও হল তাই। তিনি যদি না-ই খান, বাড়িতে চুলা জ্বালার সজ্জাবনা নেই। মার্খা কোন মুখে হেঁসেলে যাবে? সে যাই হোক পরে দেখা যাবে। এখন ব্যাপারটা তবে প্রথম থেকেই বলছি। খাবার টেবিলে বসে আমি ভেবে নিয়েছি, এই যে চিঠির বয়ালটা আমি উদ্ধার করলাম, সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে কী কর্তব্য, সেই কথাই এতক্ষণ ধরে ভেবেছি। প্রশ্নটা হচ্ছে, কী করা উচিত?'

অনেকে হয়ত অনেই বলবেন, এটা কোন সমস্যার মধ্যেই পড়ে না। যেহেতু পাণ্ডুলিপির পাতাটায় স্বাধিকারী প্রফেসর লিডেনব্রক, আর যেহেতু আমি চব্বিশ বছরের নাবালক এ্যাক্সেনা তাঁরই আশ্রয়ে দিন কাটাচ্ছি ও পোষ্য। আমি তাঁর সহকারী ছাড়া কিছুই নই। অতএব আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য উক্ত চাবিকাঠি আমার কাকাটির হাতে তুলে দেয়া। তার বিনিময়ে তিনি যদি একটিবার মাত্র আমার পিঠ চাপড় দেন তবেই এই অধম বর্তে যায়।

ঠিকই তো, অনেকেই হয়ত এ কথা বলবেন। তারা তো আর প্রফেসর অটো লিডেনব্রক-কে চেনেন না। তাই তাঁদের পক্ষে তো এটা বলাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু চিনি। কি ব্যাপার? কেমন চিনি? নেহাত যদি জানতে চান তবে বলছি শুনুন, কিন্তু স্নেফেলসের লেখনীর অর্থ জানতে পারলে আর রক্ষে নেই, কেলেঙ্কারী করে ছাড়বেন। তার অর্থ জানামাত্র তিনি দারুণ ক্ষেপে উঠবেন, স্নেফেলস ছুটেতে হবে, পাতালে নেমে যেতে হবে। ফলে কী হবে? এই পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় কীর্তি প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে। আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও ও কোপারনিকাসের সমকক্ষ হয়ে চিরস্মরণীয় হতে হবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি প্রত্যাবর্তন সম্ভব নাই হয়? প্রফেসর এটা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে সম্মত হবেন না। দাঁত মুখ খিচিয়ে বলে উঠবেন, এটা কেমন কথা হে? ফিরে আসা কেন সম্ভব হবে না? নেহাতই যদি না যায় তাতেই বা হয়েছে কী! পৃথিবীতে বঁচে থাকাটাই আসল কথা নাকি হে? কীর্তিহীন জীবনের কতটুকুই বা মূল্য, বল তো?'

স্নেফেলসের দুর্বোধ্য লেখনিটা সামনে মেলে রেখে নির্বাক চাহনি মেলে কাকা সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন। মাথাগুঁজে বসে আকাশপাতাল ভেবেই চলেছেন। সারা বাড়িটাই যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। মার্খা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে, কাকার সামনে আমি মুখে কলুপ এঁটে বসে রয়েছি। কার সাহস, তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে যাবে! ক্রোধানলে জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে যেতে হবে যে!

সারাদিন পার হয়ে গেল। ক্রমে রাত্রিটাও গেল। কাকা নির্জলা উপবাসে কাটিয়ে দিলেন। মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা দুটো এক করেন নি। আমাকেও রাত্রিটা পেটে খিল মেরে কাটাতে হয়েছে। মার্খারও কেটেছে উপবাসই। তবে মার্খা দেয়ালে হেলান দিয়ে একটু আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছে। আমি কিন্তু এক মিনিটও চোখের পাতা দুটো এক করে রাখতে পারি নি। বারবার ঘুম চটে গেছে। বিবেক মানল না।

আমার কাজের জন্য নিজের প্রতি বিদ্রোহ এল—এটা করছি কী আমি! বুদ্ধ কাকা দম্ভে মরছেন বুঝেও আমি মুখ বুঝে রয়েছি! দৃষ্টান্ত আর দুর্ভাবনায় তিনি যে একেবারে শেষ হয়ে যাবেন! আর আমি সব জেনে, সব বুঝেও মুখ বুজে তামাসা দেখছি! এতবড় পৃথিবীটায় আমার আত্মজ্ঞান বলতে তো আজ তিনি একটাই টিকে আছেন।

রাত্রিটা এভাবেই কাটল। পূব আকাশে দেখা দিল রক্তিম আভা। সকাল হল। এক পেয়ালা কফি নিয়ে মার্খা দরজায় এসে দাঁড়াল। সে চোকাঠের ওপারে দাঁড়িয়েই পর পর দুতিনবার প্রভুকে ডাকল। কা কস্য পরিবেদনা! সে গলা চড়িয়ে আবারও ডাকল। ব্যস, কাকা একেবারে উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন। ভীতসন্ত্রস্ত মার্খার হাত থেকে পেয়ালাটা ছিটকে পড়ল।

কাকা আবার ধ্যানে বসলেন। কাগজের টুকরোটোর দিকে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

আমার মন বড়ই দুর্বল হয়ে পড়ল। স্নেফেলস—পাতালপুরী ফিরে আসা সম্ভব নয়—মৃত্যু অবধারিত—যাবতীয় আশঙ্কাই চকিতে আমার মন থেকে উঠে গেল। মুহূর্তে মনস্থির করে ডাকলাম—‘কাকা। কাকা।’

কপালের লিখন ঠেকায় সাধ্য কার! হ্যাঁ, যা হবার তাই হল শেষপর্ষদ।

কাকা এমনভাবেই ব্যস্তবাগীশ। এ ব্যাপারে আরো ব্যস্ততা লক্ষিত হল। একমাস যেতে না যেতেই বাড়ি-ঘরের দায়দায়িত্ব মার্থার হাতে তুলে দিলেন। সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা আইসল্যান্ডে পা দিলেন।

পুরো একটা মাস হাড়ভাঙা খাটুনি নিজে খেটেছেন। আমাকেও কম খাটানি। লম্বা কাছি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কোদাল, হাতুড়ি, খত্তা, কুড়োল, তিনজন লোকের ছ’মাসের মত খাবারদাবার সবই কেনাকাটা করতে হয়েছে। এতেও ক্ষান্ত দেন নি। দুটো পিস্তল, দুটো বন্দুক আর সে সঙ্গে স্থপাকৃতি বারুদ কিনতেও ভুল করেন নি। তিনজননের খাদ্য কেন? কাকা আর আমি তো রয়েছিই, আর একজন সঙ্গীও তো নিতান্ত দরকার।

পথপ্রদর্শক না নিয়ে চলাফেরা করাই তো দায়। যে সে পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নেয়া হবে না, আইসল্যান্ড থেকেই জোগাড় করা হবে।

এতেই ঝঙ্কি মিটল নাকি? পাসপোর্টেরও ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে আইসল্যান্ডের ক্ষমতাসীনদের নামে কয়েকটা চিঠি নিতে হয়েছে। প্রকৃতিপর্বের ঠেলায় ভিরমি খাওয়ার উপক্রম। কাকার কর্মক্ষমতা আর ভবিষ্যৎদৃষ্টি! আমাকে বাস্তবিকই অবাক করে দিল। এতদিন আমি তো তাঁকে বইয়ের পোকা বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু এই দুঃসাহসিক অভিযানের কর্মপদ্ধতির ছক দেখে মাথা ঘুরে যাবার উপক্রম। জায়গা মত গিয়ে কোনো জিনিসের জন্য পত্তাবেন, তাঁর কাজে সে রকম কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছি না।

একের পর এক সুপারিশ ডিঙিয়ে আমরা এসে য়াঁর কাছে পৌঁছলাম তিনি আইসল্যান্ডের রাজধানী রেগজিয়াভিগের এক কলেজের অধ্যাপক। নাম তাঁর ফ্রেডারিকসন। দারুণ চমৎকার লোক! সততায় একনিষ্ঠ একজন। বয়সে শ্রৌঢ়, নিঃসঙ্গ। ভদ্রলোক আমাদের সেবার কাজে পুরোপুরি নিজেই সঁপে দিয়েছেন।

আমি খুবই সতর্কতার সঙ্গে ভদ্রলোককে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। বলা তো যায় না, কখন মুখ ফসকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বেরিয়ে যায়।

গোপন? হ্যাঁ, গোপন তো নিশ্চয়ই! আমি স্যাকনুসেমের প্রচ্ছন্ন বার্তার অর্থ যে মুহূর্তে উদ্ধার করেছিলাম, তখন থেকেই কাকা বারবার আমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন, সাবধান, আমরা কোথায় চলছি কেনই বা চলেছি, কোনোক্রমেই যেন ফাঁস না করি।

প্রথম প্রথম আমি বিশ্বয়ে প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করতাম, ‘কেন? যদি ফাঁস হয়েই যায়, অসুবিধা কী?’ কাকা রীতিমতো দাঁতমুখ খিচিয়ে বলে ওঠেন, ‘গর্দভ কোথাকার! বুঝতে পারছ না, কী ক্ষতি? খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে পৃথিবী জুড়ে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যাবে। কে, কার আগে হাজির হতে পারে, রীতিমতো প্রতিযোগিতায় মাতবে সবাই। এমনও তো হতে পারে, ছুটোপাটা করেও আমরাই হয়ত স্নেফেলসে সবার আগে গিয়ে হাজির হতে পারব না। আমাদের এ মেহনতের আবিষ্কারের মুনাফা লুঠবে, হয় ফরাসি বিজ্ঞানী, নয়ত ইংরেজ।’

আমি তাঁকে কথায় সামান্য অবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেই ফেলেছিলাম, ‘এত বুট ঝামেলায় যাওয়ার মতো বেশি লোক পৃথিবীতে আছে কী? কার এত মাথাব্যথা—’

ব্যাস, আর যাবে কোথায়! কাকা একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন, ‘তুমি তো আর বিজ্ঞানী নও, কী করে বুঝবে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেশায় মানুষ কেমন পাগল হয়ে উঠতে পারে? আমার দিকে চোখ মেলে তাকাও, সেটা বুঝতে চেষ্টা করো। একটু চিন্তা করলেই ছবির মতো সব স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠবে—কলেজের চেয়ার আর আরামদায়ক বিছানাটার মোহ ছেড়ে ষাট বছর বয়সে ছুটে চলেছি স্নেফেলস পাহাড়ে! পাতালে নামার জন্য পাগল হয়েছি। এটুকু হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাও তোমার নেই?’

মাথা নিচু করতে আমি বাধ্য হলাম। তাতেও রেহাই নেই। বেশ কড়া সুরেই তিনি বলেছিলেন, ‘আমাদের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে পড়লে মহা সর্বনাশ হবে! বিজ্ঞানীরা মিছিল করে ছুটবে। সাবধান! দারোগায় ডিম খেয়ে নেবে কিন্তু! লক্ষ রাখবে, কিছুতেই যেন সেটা না হয়ে যায়।’

তারপর থেকেই আমি মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছি। ফ্রেডারিকসনই পথপ্রদর্শক জোগাড় করে দিলেন। লোকটার নাম হ্যান্স। রেগজিয়াভিগ ও স্নেফেলস-এর মাঝামাঝি জায়গায় তার বাড়ি। বাড়ি আছে বটে, কিন্তু ত্রিসংসারে তার কেউই নেই। ভালোই তো হল। সংসারে যার পিছুটান রয়েছে এমন লোককে সঙ্গে নেয়া ঠিক নয়। বেশ শক্তসাবুত, কথাও কম বলে। কথা না বলতে হলেই খুশি।

হ্যান্সের সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়ে গেল। পারিশ্রমিক সম্বন্ধেও রফা হল। আর স্নেফেলস পর্যন্ত তো আমাদের সঙ্গে যাবেই, তারপর যদি আর কোথাও যাই, সঙ্গে যেতে বাধ্য।

কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে ফ্রেডারিকসন বললেন, ‘অনেক দিনের পরিচয়। তবে পথ প্রদর্শকের কাজ তার পেশা নয়। এতে পয়সা কোথায়? আইসল্যান্ডে কজন পর্যটকই বা আসে যে পেট চলবে? তাঁর পেশা ইডার পাখির পালক কুড়ানো। প্রচুর পয়সা এতে।’

আমি আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কাজটা কী জাতীয়, বলবেন কি?’

এক জাতের পাখির নাম ইডার। খুব বড় হয়। পাহাড়ের ওপর, গাছের মগডালে বাসা বেঁধে থাকে। তারা বাসা যা দিয়েই করুক না কেন, নিজেদের বৃকের নরম লোম দিয়ে ভেতরের দিকটা ঢেকে দেয়। বান্ধাদের গায়ে যাতে শক্ত জিনিসের খোঁচা না লাগে, তাই এই কায়দা করে দেয়। মেয়ে পাখির পালক বেশি নরম বলে বাসা তৈরির ভার তাদের ওপরই বর্তায়। এদিক হ্যান্সের মতো শিকারিরা সুযোগের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তৈরির কাজ শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে

বাসাটা ভেঙে নিয়ে যায়। তারা আবার নতুন করে আর একটা বাসা তৈরি করে। আবারও শিকারিরা নিয়ে যায়। এভাবে বাসা তৈরি আর চুরি হতে হতে মেয়ে পাখিটার বুকে আর লোমই থাকে না। তাই বলে বাসা ছাড়া ত আর থাকা যায় না। এবার পুরুষ পাখি বাসা তৈরির দায়িত্ব নেয়। কিন্তু এদের লোমের রং টংও তেমন নয়, মোলায়েমও নয়। শিকারিরা এগুলো নেয় না। আসলে বাজারে চাহিদা নেই যে, কিনবে কে? এবার বাসাটিতে যায়, ডিম পাড়ে, বাচ্চা হয় বংশ রক্ষা হয়। আবার মেয়ে পাখিটা বাসা বাঁধে, ব্যবসা শুরু হয়।'

আমি তন্ময় হয়ে তার গল্প শুনছিলাম। ভালোই লাগল, কিন্তু পালক চোর হ্যানসই যে আজ চুরি হয়ে যেতে বসেছে, সে খোঁজ কে রাখে! একে চুরি বলাই ঠিক। কাকা সুযোগ বুঝে তার জীবনটাকেই চুরি করেছেন, কথটা তো আর মিথ্যা নয়।

হ্যানসের সহায়তায় আমরা স্নেফেলসে গিয়ে হাজির হলাম। রেগজিয়াভিগ থেকে নৌকায় আসতে পারলে তিন চারদিনের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নৌকা জোগাড় করতে না পারায় পৌঁছাতে সময় বেশি লেগে গেল। জেলেরা নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গেছে। মাছের মরতম। নৌকা খালি পাওয়াই দুষ্কর।

এখন জুন মাস। সেন্টেশনের আগে কিছুতেই নৌকা পাওয়া যাবে না। কী ঝকমারি যে করেছি বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে-কথা কাকেই বা বুঝাই! কাকাকে কতবার কতভাবে যে সতর্ক করেছিলাম, সে কথা আজ বড্ডবেশি করে মনে পড়ছে।—পৃথিবীর এই কঠিন বহিরাবরণটা, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা ইত্যাদি নিয়ে চারকোটির মত মানুষ আমরা, নিরাপদে জীবনযাপন করছি সেটা মাত্র মাইল পঞ্চাশেক পুরু। তার তলাকার ভূগোলকটা আগুনের কুণ্ড। অনবরত দাউ দাউ করে জ্বলছে। তার দাহিকা শক্তি এতই প্রখর যে, গ্রানাইট ছাড়া আর সব পাথর তার উত্তাপে গলে যাচ্ছে। ফুটতে ফুটতে এক সময় লাভার রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসছে ভূত্বক ছিঁড়ে। সেই আগুনের সমুদ্রে ডুব দিয়ে ভূকেন্দ্র স্পর্শ করা কি আর দেহধারী মানুষের কাজ? এ অসম্ভবকে সম্ভব করা মানুষের সাধ্য কী?

কাকা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন, 'এটা যে সম্ভব সে কথা তো স্যাকনুসেমই বলে গেছেন! নিজে পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ না হলে তথ্যটা অবশ্যই প্রচার করতেন না। আর যদি সর্ববাদীসম্মতই বল, তারা ঘরে বসে হিসাব মিলিয়েছেন। আর স্যাকনুসেম? তিনি নিজে পৃথিবীর উদরে নেমে গিয়েছিলেন। সব জায়গায় যে আগুন নেই তা স্যাকনুসেম সশরীরে ভূকেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছে প্রমাণ করে গেছেন।'

'সক্ষম? আসলে সক্ষম হয়েছিলেন কি না—'

কাকা কথটা আমাকে শেষ করতেই দেন নি। বাজখাই গলায় গর্জে উঠেছিলেন, 'তবে কি তুমি বলতে চাচ্ছে, স্যাকনুসেম যা লিখে গেছেন, সবই মিথ্যা!'

সে-মুহুর্তে আমার ঠোঁটের কাছে এর যে-উত্তর এসে পড়েছিল, প্রকাশ করি নি। কৃতবিদ্যা বিজ্ঞানী জেনে শুনে মিথ্যার হিড়িক তোলার জন্যই কি এমন একটা কুকর্মের আশ্রয় নেবেন? কিন্তু সে অপবাদ তো স্যাকনুসেম-এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। আসলে কথটা তো তিনি প্রকাশ করতেই চান নি। তারপরেও বলব, দুর্বোধ্য ক্রিষ্টোপ্রামের আড়ালে তথ্যটাকে তো গোপনই রাখতে অগ্রহী হয়েছিলেন।

বাড়িতে বসে তাঁর সঙ্গে মোটেই আমি তর্ক করি নি, করেছিলাম হামবুর্গে বসেই। এখন তাঁর আজ্ঞাবহ সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছি। তর্ক ছেড়ে, মৃত্যুপণ করে, আদেশ পালন করে চলেছি।

যাক, যে-কথা বলেছিলাম, রেগজিয়াভিগ থেকে নৌকা জোগাড় করা সম্ভব হল না। হ্যানস তিনটি নাদুস নদুস ঘোড়া এনে হাজির করল। দুটো আমাদের বইবে, তৃতীয়টা মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে। সে নিজে হেঁটেই যাবে। কাকা তাঁর জন্যও একটি ঘোড়া নিতে বললেন। রাজি হল না। হেঁটেই যাবে বলল। কার্যত দেখা গেল ঘোড়ার সঙ্গে পা মিলিয়ে সে সমান তালেই হেঁটে গিয়েছিল।

আমাদের আগে আগে হ্যানস হেঁটে চলল। তার পিছনে আমি, কাকা আমার পিছনে। সবার শেষে মালবাহী ঘোড়াই চলছিল। এভাবে সমুদ্রের ধার দিয়ে আমরা পথ পাড়ি দিচ্ছিলাম। কারণ খুবই সাধারণ। এ পথে কেউ যাতায়াত করে না। স্নেফেলস তাঁরই মতো চরিত্রের কেউ ছাড়া কে আর আগ্নেয়গিরি দেশে যাবে? কী করতেই বা যাবে? জেলদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ।

লোকগুলো ভালোই বলতে হবে, অতিথিদের জামাই আদরে রাখে। তবে এটাও প্রত্যাশা করে যে, বিদায় নেয়ার সময় অতিথি নিজে থেকেই খাদ্য ও আশ্রয়ের ন্যায্য দাম চুকিয়ে দিয়ে যাবে। অবশ্য ব্যতিক্রম যে থাকে না তাও নয়। এক যাজকের বাড়িতে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হ্যানস পরিচয় করিয়ে না দিলে যাজক বলে চিনবে কার সাধ্য। আমরা তাঁর উঠানে পা দিয়ে দেখি, ঘোড়ার পায়ের নাল পরাতে তিনি ব্যস্ত। পরনে চামড়াভূষাদের মতোই পোশাক। তা হোকপে, পোশাক দিয়ে কী হবে? আমাদের কাছে যেটুকু খারাপ লাগল তা হচ্ছে তিনি আচার ব্যবহারে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের উপস্থিতিতে তিনি মোটে খুশি নন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ধারে কাছে বাড়িও নেই যে, অন্য কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেব। বাধ্য হয়ে চোখ-কান বুঝে রাতটা কাটিয়ে দিতেই হল।

সকাল হল। আমাদের বিদায় নেয়ার পালা। এবার দাবি মেটাতে হবে। ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিতে ভরসা পাচ্ছিলেন না তিনি। একটা বেশ লম্বা বিল এনে সামনে ধরলেন। তার দাবিও কম নয়। কাকা চোখ দুটো কপালে তুলে আমার দিকে তাকালেন। উপায় নেই, মুখে কৃত্রিম হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বিল মেটাতে হল। আশ্রয় ও খাদ্য পরিবেশনের জন্য ধন্যবাদও জানাতে হল বৃদ্ধ যাজককে।

অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা স্নেফেলসে পৌঁছলাম।

আমি বিশ্বয় বিক্ষুরিত চোখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম—এই সেই আমাদের বহু আকর্ষিত স্নেফেলস? যার জ্বালামুখ দিয়ে অতল গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়লে পরলোকগত স্যাকনুসেম-এর শত ভূগোলকের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে যেতে পারব? কথটা মনে হতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল—হায়

সর্বনাশ! ঝাঁপ দিতে গিয়ে হাড় মাংস দলা পাকিয়ে যাবে না? ঝাঁপিয়ে পড়লে অদৃশ্য কোনো আগুনের সমুদ্রে পড়ে জ্বলেপুড়ে ঝাঁক হয়ে যাব না? দম আটকে মরতে হবে না? পৃথিবীপূজা অধ্যাপক লিডেনব্রক এসব কথাকে আমলই দেন না। অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন। অদৃষ্ট মন্দ হলে কনিগস্ট্রাসের বাড়িতে শুয়েও তো আমরা মারা যেতে পারে। অনিবার্য মৃত্যুকে ঠেকাবে সাধ্য কার?

আমি হ্যানসের ওপর খুবই আশা রেখেছিলাম। গত তেরো দিনের সফরে সে মুখ বুজে কর্তব্য সম্পাদন করেছে। তার সুখ্যাতি না করে উপায় নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এবার কী করবে? শর্ত ছিল, স্নেফেলস পর্যন্ত যাবেই, তার পরেও আমরা কোথাও যেতে চাইলে সে সঙ্গে যেতে বাধ্য। তবে এটা অবশ্যই ভাবা যায় না যে, অতল গহ্বরে যাওয়ার প্রসঙ্গটাও ঐ শর্তের মধ্যে ছিল।

তাই আমরা যখন স্নেফেলসের চূড়ায় উঠে বিমর্ষ মুখে তার গহ্বরে নেমে যেতে চাইব, স্বাভাবিকভাবেই হ্যানস তখন খুবই ঘাবড়ে যাবে। শর্তটই সব বাতিল করে দিয়ে বলবে, যে পর্যন্ত এসেছি এই যথেষ্ট। রইল আপনার শর্ত, আমি চললাম। সে যদি এ কথা বলে তবে কাকার মতো তিরিক্তি মেজাজি ও একগুঁয়ে লোকও তার ওপর জোর করতে পারবেন না। বক্তব্যকে অন্যায় আখ্যা দিতেও পারবেন না। তাকে তো পথ প্রদর্শনের জন্য নিয়েছেন। সে নিজে কোনোদিন যায় নি, অন্যকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে কী করে?

মিথ্যে বলব না, এমন একটা ভরসা আমি গোপনে পোষণ করছি। শেষ-মুহুর্তে হ্যানস যদি বেকে বসে, কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়, এমন একটা পরিস্থিতি দেখা যায়, লিডেনব্রকের মতো অত্যুগ্র উদ্ভাবনী শক্তির আধারও তাল হারিয়ে ফেলবেন। পাতালের পথ তাঁর অজানা। পথপ্রদর্শকও কেউ নেই, তার ওপর গাদাখানেক মালপত্র বয়ে নেয়ার মতো হাতির বলও কাকার বা আমার কারোর গায়েই নেই।

কাকা বললেন, 'হ্যানস আমরা এর চূড়ায় উঠব।'

হ্যানস মুখে কিছু বলল না। ঘাড় তুলে চূড়া পর্যন্ত পুরো পাহাড়টার একবারটি চোখ বুলিয়ে নিয়ে মুখ খুলল, 'হজুর আজ আমার কাজের দ্বিতীয় সপ্তাহ পূর্ণ হল। আমার প্রাণ্য দয়া করে শোধ করে দিন।'

তার কথায় আমরা যেন একেবারে হকচকিয়ে গেলাম এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে সামান্য প্রাণ্যের কথা বলছে। কাকা কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিলেন না। মুহুর্তের মধ্যেই পকেট থেকে নোট বের করে হ্যানসের দিকে এগিয়ে দিলেন।

হ্যানস আমাকে অবাচ করে দিল। নিঃশব্দে নোটগুলো নিয়ে পকেটে রাখল। ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামাল এক-এক করে। ঘোড়াগুলো নিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দায় পড়ে নি তার। আর এটাও তো ঠিকই, ঘোড়াগুলো পাহাড়ে উঠবে কী করে? যাত্রী নিয়ে স্নেফেলস পাহাড়েও উঠতে পারবে না।

আমি হতাশ দৃষ্টিতে কাকার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'হ্যানস তো বেগতিক দেখে কেটে পড়ল। এবার আমাদের কী কর্তব্য, বলুন?'

আমার দীর্ঘশ্বাসটুকু প্রবীণ অধ্যাপক লিডেনব্রক-এর নজর এড়ায় নি। তিনি মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ঘাবড়িয়ে না বাছা, আমি জানি, হ্যানস শুধু ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করতে গেছে। কাছেই হয়ত কোনো জনবসতি রয়েছে, রেগজিভিগের দিকানায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ফিরে এল বলে।'

আমি চোখে মুখে বিশ্বাসের ছাপ ঝাঁকি বললাম, 'আবার আপনার কাছেই ফিরে আসবে, বিশ্বাস করেন?'

'করি, অবশ্যই ফিরে আসবে। নইলে বুঝব, এই ষাট বছর বয়সেও আমি মনুষ্যচরিত্র বোঝার ক্ষমতা অর্জন করি নি। একটা কথা জানবে, যারা কথা কম বলে, চরিত্রবল তাদের খুবই বেশি! আর সে এই বলে বলিযান যে, বিপন্নকে ফেলে রেখে নিজে বাঁচার চেষ্টা করে না।'

আমি আর কথা বাড়ীলাম না। তবে আমি নিঃসন্দেহ, কাকাকে শেষপর্যন্ত ফিরতে হবে। দু-চার দিন এখানে ঘোরাকেরা করে ফিরবেন এই যা। তা যদি নাও হয়, পাহাড়টার চূড়া পর্যন্ত কোনোরকমে উঠবেন, এদিক-ওদিক চক্কর মারবেন। গহ্বরটার ভেতরের দিকে উঁকিও মারবেন হয়ত। কিন্তু এইটুকুই, এবার হতাশ মনে বাড়ি ফেরার পালা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এতসব লটবহর নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা দুঃসাধ্য। আবার বেশ কিছুদিনের খাবারদাবার না নিয়ে গহ্বরে নামার অর্থই হচ্ছে উপোস করে শুকিয়ে তিলে তিলে মরা। আবার মনোমিটার, কম্পাস ও ব্যারোমিটার ইত্যাদি সঙ্গে না নিলে স্বর্গ মর্ত পাতাল কোথাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা তো ভাবাও যায় না। আর আত্মরক্ষার উপকরণ? বন্দুক, পিস্তল, গোলা বারুদ সঙ্গে নিতে হবে না? তবে?

হঠাৎ পাহাড়ের অনেকটা নিচে কালোমতো কী একটা সচল বস্তু আমার নজরে পড়ল। আপন মনেই বলে উঠলাম, 'কে ওটা? হ্যানস নাকি? উঠে আসছে কে? কয়েকবার এদিক-ওদিক হেলে-বেকে নিঃসন্দেহ হলাম। হ্যাঁ, হ্যানস-ই তো বটে।' সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল তিনটি ঘোড়া, ফিরে এল তিনটে গাটাগোষ্ঠী মানুষ নিয়ে। আমার কাকার মনুষ্যচরিত্র জ্ঞানের উদ্দেশ্যে মাথা নোয়ালাম।

হ্যানস ফিরে এল। কাকা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, সেও কিছু বলল না। সে গাঁটরি খুলে কবল বের করল। একটা কাকার হাতে দিল, আমাকে দিল একটা। আর একটা নিজে। সে তিনজন দেশওয়ালীকে নিয়ে পাহাড়ের কোনো একটা গর্তে বসে শীতের রাত্রি কাটিয়ে দেবে। খাবার ভাগ হওয়ার কথা ছিল, আমরা কাকা-ভাইপো আর হ্যানসের মধ্যে। আমি ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম, 'তাদের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে?' সে দূরের কোনো জায়গা দেখিয়ে দিল। অনুমানে ধরে নিলাম ওদিকে বাড়ি। বাড়ি থেকে সবাই খেয়ে এসেছে। তাদের জন্য ভাবতে হবে না।

আমাদের এ অভিযানে ছেদ পড়ার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, হ্যানস ফিরে আসায় সে সম্ভাবনায় ছেদ পড়ল। অতএব বাড়ি ফেরার চিন্তা ছাড়তেই হল।

পথশ্রমে ক্লান্ত দেহটা একবার কোনোরকমে কবলমুড়ি দিতেই সকাল হয়ে গেল। পাহাড়িয়া পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। সকালে সূর্যের সতেজ আলোর সুউচ্চ স্নেফেলস চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। না, আমার ভুলই হয়েছে। সকাল হয়নি। এটা নিশীথ সূর্যের অভ্যাজ্জল আলো। ভুলেই গিয়েছিলাম, আইসল্যান্ডের উত্তর দিকটায় সূর্য বছরে ছয় মাস অস্ত যায় না। পুরো ছয়টা মাস একটানা দিন।

একসময় আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরলাম। কী খেয়াল হল ঘড়িটা তুলে নিলাম। ছয়টা বেজে গেছে। কবল ফেলে উঠে পড়লাম। সকাল হয়েছে। সত্যিকারের সকাল।

আমাদের স্নেফেলস আরোহণপর্ব শুরু হল। অমানুষিক কষ্টের মধ্য দিয়ে ঘন ঘন চড়াই উত্থাই অতিক্রম করে এগোতে হচ্ছে। মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলে আর রক্ষা নেই, নিশ্চিত অপঘাতে মৃত্যু। আমাদের আগে আগে হাঁটছে হ্যানস। এটা যেন তার কাছে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে চলার মতই স্বাভাবিক। পথ চলতে চলতে আমরা তার থেকে বেশিরকম পিছিয়ে পড়ায় সে পিছন ফিরে আমাদের অপেক্ষা করতে লাগল। তার একটা কাজের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। পথের ধারে সে এক এক জায়গায় কতকগুলো করে পাথর জড়ো করে রাখতে লাগল। ফেরার পথে যাতে পথ ভুল না হয়। আমি তো ভালোভাবেই জানি, আমরা আর ফিরছিও না, ওগুলোও কোনো কাজে লাগবে না। আমাদের ভাগ্য বিড়ম্বনার সঙ্গে বাধ্য হয়েই হ্যানসকেও জড়াচ্ছি। দোষটা পুরোপুরি আমাদের না! তারপর দোষ কম না। আমাদের পিছন নেবার জন্য তারও যথেষ্ট আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। সপ্তাহে তিন রিগসডলার-এর দাম যে এত বেশি, জানতাম না।

ঘণ্টা চারেক হাঁটার পর হ্যানস প্রায় সমতল একটা জায়গা দেখতে পেয়ে ইশারায় আমাদের দাঁড়াতে বলল।

আমরা তার নির্দেশ পালন করলাম। সে খাবারের পুটলিটা খুলে ভাগ করতে বসল।

কাকা বুঝেই নিয়েছেন, শাহাড়ের চূড়ায় উঠতে প্রচুর সময় লেগে যাবে, ধকলও সহিতে হবে খুবই। তাই বিনা বাক্যব্যয়ে গোয়াসে যতটা সম্ভব খাবার উদরের মধ্যে ভরে নিলেন।

খাওয়াদাওয়া মিটলেই কাকা আবার হাঁটার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হ্যানস কিন্তু পুরো একটা ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে তবে যাত্রার উদ্যোগ করল।

আমি এতক্ষণে বুঝেছি, কম কথা বলা এখানকার মানুষগুলোর বৈশিষ্ট্য। কারণ, সঙ্গে করে নিয়ে আসা সেই তিনজন লোকও হ্যানসের মতোই কম কথা বলে।

আবার শুরু হল হাঁটা। আশ্চর্য ব্যাপার! ওপর দিকে তাকালেই মনে হয়, এই তো নাগালের মধ্যেই চূড়াটা। অনেক আগে থেকেই এমনটা মনে হচ্ছিল। এবার বুঝলাম, অনেক পাহাড়েই নাকি এমন বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

আরো কিছুটা উঠেই থমকে দাঁড়াতে হল। এখানটায় পাহাড়টা খুবই খাড়া, ঢালুও খুব কম! সোজা উঠে যাওয়া অসাধ্য। হ্যানস সমস্যার সমাধান করে দিল, কোনোকুনি ওঠার পরামর্শ দিল। তাতেও কি আর কষ্ট কম! লোহার ফলা লাগানো লাঠিতে ভর দিয়ে আমরা অনেক কষ্টে উপরে উঠতে লাগলাম। কাকা আমাকে সবসময় চোখে চোখে রেখে পথ পাড়ি দিচ্ছেন। প্রয়োজনে হাত ধরে ওপরে তুলেও নিচ্ছেন মাঝে মাঝে। আমি তো জানিই, যতই তিনি বাক্যবাকি করুন, নিজের প্রশ্নের চেয়ে বেশি ভালোবাসেন আমাকে।

আমি অবাক হচ্ছি, একবারের জন্যও তাঁর পা হড়কে যাচ্ছে না! কই, পাহাড় পর্বতে ওঠার অভিজ্ঞতা তাঁর আছে, আগে কোনোদিন শুনি নি তো। আসলে কার ভেতরে কী আছে সারা জীবন ঘর করেও অন্যের তা জানা সম্ভব নয়।

আমি ওপরের দিকে হতাশদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইছি। কষ্টের পরিমাণ না বাড়লেও চূড়ায় ওঠা সম্ভব কি না সন্দেহ। কাকা বারবারই আমাকে টেনে-হিচড়ে তুলে নিয়ে সমস্যার সমাধান করে দিতে লাগলেন। একসময় ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে বরফ শ্রাঙ্গণে হাজির হলাম। বরফের মাঝখান দিয়ে সিঁড়ির মতো উঠে গিয়েছে, আর অসুবিধা কী?

‘এই যে প্রাকৃতিক সিঁড়িমতো দেখছ, আইসল্যান্ডের ভাষায় এর নাম স্কিনা। অগ্ন্যুৎপাতের সময় যদি ভূগর্ভ থেকে অসংখ্য পাথরের টুকরো বেরিয়ে আসতে থাকে আর পাহাড়ের গায়ে যদি আটকে যায়, তবেই এরকম পাথরের সিঁড়ি তৈরি হওয়া সম্ভব।’ কাকা আমাকে লক্ষ করে বললেন।

সিঁড়িগুলো থাকায় আমাদের বড় উপকার হল। জ্যামিতির ভাষায় যাকে লম্ব বলা হয়, পাহাড়টা ক্রমশ সে আকার নিচ্ছে। একের পর এক সিঁড়ি টপকে আমরা ক্রমেই ওপরে উঠতে লাগলাম। মোটেই কষ্ট হচ্ছে না। উপরে! ধরতে গেলে বিনা ক্রেসেই আমরা দ্রুত উপরে উঠতে লাগলাম।

সিঁড়ির শেষধাপের উপর যখন আমরা উঠে দাঁড়ালাম তখন সঙ্গে সাতটা! কিছু না হলেও দুহাজার ধাপ ডিঙিয়ে এসেছি, সন্দেহ নেই। শেষ ধাপটা খুবই প্রশস্ত, বক্তৃতা মঞ্চের মতো। পাহাড়ের চূড়াটা সুবিশাল একটা পাথরের শঙ্কুর আকৃতি বিশিষ্ট। তারই মুখবির দিয়ে স্নেফেলস-এর উত্তম গলিত লাভা বেরিয়ে আসত! ৩২০০ ফুট নিচে রয়েছে সমুদ্র। চিরতুষারের রেখা ডিঙিয়ে এসেছি। আইসল্যান্ড এমনকিছু উচুতে নয় যে তুষার জমবে। চির অর্দ্র আবহাওয়ার জন্যই এমনটা হয়েছে, কাকা বললেন।

আমার অধ্যাপক কাকা বুঝলেন, আমি পথশ্রমে বড় ক্লান্ত, নইলে কখনই বলতেন না, ‘এসা, আজ রাতের মতো এখানে মাথা গাঁজার ব্যবস্থা করা যাক।’

মাথা গাঁজার কথা শুনেই হ্যানস কয়েকবার ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, ‘না, অবভানকোর! মিস্তৌর! মিস্তৌর!’ তার চোখ-মুখের আতঙ্কটুকু আমাদের নজর এড়াল না।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে কাকার মুখের দিকে তাকলাম।

কাকা বললেন, ‘অবভানকোর—মানে আরও উঠতে হবে। আর মিস্তৌর? তর্জনি নির্দেশ করে বললেন, ‘দেখ, ওই দেখ!’

আমি ব্যস্ত হয়ে ঘাড় ফেরালাম, সুবিশাল ধূসর বর্ণ একটা স্তম্ভ, চক্রর খেতে খেতে ওপরে উঠছে। ঠিক যেন সমুদ্রের বুকের জলস্তম্ভ। কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর বুঝলাম—সূক্ষ্ম পাথরচূর্ণ, বালি আর ধূলা প্রভৃতি মিলে ওই ভয়ঙ্করকে গড়ে তুলেছে। হাওয়ার বেগে মেফেলস-এর চূড়ার দিকে উঠে আসছে! এই মহাপ্রলয়ঙ্কর ধূলা-বালির স্তম্ভ পাহাড়ের উপর উঠে এলে, মহা আক্রোশে ভেঙে পড়লে বীভৎস ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হবে। ব্যাস, আর দেখতে হবে না আমরা কাগজের ঠোঙার মতো চক্রর খেতে খেতে শূন্যে, মহাশূন্যে ভেসে যাব। আইসল্যান্ডবাসীরা একে মিস্টেরি বলে। হিমবাহের উপর দিয়ে ঝড় তীব্র বেগে বয়ে যাবার সময় প্রায়ই এই প্রলয়ঙ্কর মিস্টেরি সৃষ্টি হয়।

ব্যাস, আর কথা নেই, হ্যানস মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল। আর বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে উদ্ধারণ করল, 'হেঁটাভই!' আমি শব্দটার অর্থ বুঝতে না পারলেও অনুমানে ধরে নিলাম, তাড়াতাড়ি ছুটতে বলছে। আমরা বিনা বাঁকাব্যয়ে ক্ষিপ্ৰগতিতে তাকে অনুসরণ করলাম।

হ্যানস পাথুরে শঙ্কুটাকে বেড় দিয়ে তার আড়াল দিয়ে কোনাকুনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

বেশি দূরে নয়। আমাদের কাছাকাছিই স্তম্ভটা পাহাড়ের ওপর আছড়ে পড়ল। বিকট শব্দ হল, কানে তালো লেগে যাবার উপক্রম। পাহাড়টা রীতিমতো কঁপে কঁপে উঠল। লাভা উদ্‌গীরণের সময় নাকি ঠিক এমনটা হয়। কপাল ভালো, ইতমধ্যেই আমরা শঙ্কুটার বিপরীত দিকে পৌঁছতে পারলাম।

এবারকার মতো বিপদ কেটে গেছে। তবু হ্যানস এখানে আমাদের রাতের আন্তানা গড়তে দিল না। সে অনবরতই আমাদের ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আরো ওপরে নাকি উঠে যাওয়া দরকার। ঘুরিয়ে পৌঁছিয়ে কম হলেও দশ মাইল পথ আমাদের পাড়ি দিতে হয়েছে।

একদিকে শীতের নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণ। অন্যদিকে পেটের মধ্যে আগুনের দাপাদাপিতে শরীর ক্রান্ত। পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। তারপর এ-অঞ্চলে বাতাস খুবই পাতলা, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

রাত প্রায় এগারটা আমরা স্নেফেলসের চূড়ায় উঠে গেলাম। কয়েক মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে শরীর ও মন সতেজ করে নিলাম।

এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলাম, মৃত আগ্নেয়গিরির মুখবিবর এখানেই ছিল।

খাওয়া দাওয়ার চিন্তা শিকয়ে উঠে গেছে। শরীরের যা অবস্থা, সেদিকে মন দেয়ার মতো সুযোগও ছিল না। সমতল জায়গা বেছে নিয়ে শুয়ে পড়লাম। ধুম ভেঙে গেল। মধ্য রাত্রির কনকনে ঠাণ্ডায় কঞ্চল আর কতটা শীত ক্লান্তিতে পারবে? পা দুটো যেন বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মুখের ওপর থেকে কঞ্চল সরিয়ে কাকা খোলা আকাশের দিকে তাকালেন। সূর্যটাকে সে মুহূর্তে কেমন যেন ঠাণ্ডা, অতিবৃদ্ধ ও চলচ্ছক্তি রহিত বলেই মনে হর। অতি শ্রুত তার গতি। একটু একটু করে নিচের দিকে নামছে।

মুখের ওপর থেকে কঞ্চলটা সরাত্তেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া সূতীক্ক সূঁচের মতো চামড়ায় আঘাত করতে লাগল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে বলে এমনটা মনে হচ্ছে। তার ওপর আইসল্যান্ড, এমনতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

সকাল হল। কঞ্চল ফেলে উঠে পড়লাম। গত রাতের ক্রান্ত অবসন্ন ভাবটা কেটে গিয়ে দেহ-মন চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কাকা কখন এসে যে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন, টের পাইনি। তাঁর গলা শুনে চমকে ঘাড় ঘোরালাম। তিনি তর্জনি উচিয়ে বললেন, 'ওই দেখ, গ্রিনল্যান্ড দেখা যাচ্ছে! গ্রিনল্যান্ড! গ্রিনল্যান্ড!'

আমি বিশ্বয়ভরা চোখে তাঁর তর্জনি বরাবর তাকিয়ে বললাম—'গ্রিনল্যান্ড! গ্রিনল্যান্ড ওটা?'

'হ্যাঁ, দূরত্ব ১০০ মাইল থেকে সামান্য বেশি। বরফ গলে জলধারা এদিকে ধেয়ে আসার সময় দু-একটা মেরুস্তম্ভও এই দ্বীপে বয়ে নিয়ে আসে।

আমি তো রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। এইরে, কাকা বৃষ্টি অধ্যাপকসুলভ ভাষণ শুরু করে দিলেন। মুহূর্তেই আমার ধারণা পাল্টে দিয়ে তিনি এবার বললেন, 'এবার আমাদের গতি নিচের দিকে। পাহাড়ের বাইরের দিক দিয়ে নিচে নামব না, ভেতরের দিক দিয়ে। ভাবে মনে হল, কথটা তিনি হ্যানসকে লক্ষ্য করেই বললেন।

কথটা কানে যেতেই হ্যানস আঁতকে কাকার মুখের দিকে তাকাল। আশ্চর্য! মুখে টু শব্দটা পর্যন্ত করল না।

স্নেফেলস-এর গহবরের ভেতর দিকটা? একটা মৌচাককে উল্টে দিলে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম মনে হল যেন। তার মুখ-বিবরের ব্যাস কত হবে? গভীরতাই বা কত? উপড় হয়ে ভেতরের দিকে ঝুঁকলে যা অনুমান করা যায় কিছু না হলেও দুহাজার ফুট তো বটেই। এই সুবিশাল পাত্রটা থেকে যখন গলিত টগবগে লাভা তীব্র আক্রোশে বেরিয়ে আসত সে দৃশ্য কল্পনা করতে গেলে মাথা কিমঝিম করে। মুখ-গহবরের নিচে ফাঁপা জায়গাটা ৫০০ ফুটের কম হবে না ধরে নেয়া যায়। এর গা বেয়ে নামার কথা চিন্তা করা মাত্র গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সব কয়টা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। গহবরটার গা দিয়ে সিঁড়িমতো থাকলে তবুও সম্ভব হত। নইলে?—ভাবতে পারছি না, মাথা ঘুরিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো।

আমাদের নিচে নামার চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা নয় নামতেই হবে। কাকার মুখের ওপর কে সাহস করে বলবে, নামব না।

অনন্যোপায়। নামতে শুরু করতেই হল শেষপর্যন্ত। নামতে বেশি কষ্ট যাতে না হয় সে জন্য ডিম্বাকৃতি একটা পথ হ্যানস কল্পনা করে নিল! অনবরত নিচের দিকে নেমে যেতে হবে, কিন্তু কিভাবে? সবসময় কোনাকুনিভাবে নামতে হবে। ঝুঁজে বের করতে হবে, কোথায় পা রাখার উকি মারছে। সন্তর্পণে পা দিয়ে এক দাপ নামতে হবে। আবার ধৈর্য ধরে পা রাখার মত আর একটা পাথর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। বেরিয়ে থাকা পাথরগুলো সব কয়টা আবার সমান শব্দে নষ্ট, চাপ দিতেই আলগা হয়ে অতল গহবরে গিয়ে পড়বে। কেউ যাতে পা হড়কে পড়ে যেতে না পারে তাই দড়ি দিয়ে পশ্চপ্পরের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে নিলাম। একজন বেকায়দায় পড়ে বিপদগ্রস্ত হলেও জীবনহানী ঘটবে না।

৫০০ বছর ধরে গহ্বরের গায়ে আগুনের ছোঁয়া না-লাগায় পাথরগুলো বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। কোথাও-বা জমাটবাঁধা বরফের চাঁই। বরফ কতটা শক্ত একজন মানুষের ভার সইতে পারবে কি না, আগেই পরীক্ষা করে নিতে হবে। আমাদের লাঠিগুলোর মাথায় আগেভাগেই একটা করে ইস্পাতের শূল গেঁথে নিয়েছিলাম। আমাদের চেয়ে অনেকগুণে অভিজ্ঞ দেখলাম হ্যানসকে। পা দেয়ার আগে শূলটা গেঁথে বরফের গভীরতা পরীক্ষা করে নিচ্ছে। সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতার জন্য আমরা নিরাপদে নেমে যেতে পারলাম। নিরাপদে? একরকম নিরাপদেই তো বলব! ক্ষতি যেটুকু হয়েছে তা হচ্ছে মালবাহীদের কাঁধ থেকে একগোছা দড়ি নিচে পড়ে গিয়েছিল। সেটা গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে যে থেমেছে বলা মুশকিল।

ঠিক দুপুরবেলা আমরা তলদেশে হাজির হলাম। সাফল্য আমার মনে কর্মপ্রেরণা এনে দিয়েছে, মিথ্যে নয়। আমি উল্লসিত হয়ে ওপরের দিকে তাকলাম। শুধু নীল আকাশের ছোট একটা টুকরো নজরে পড়ল। গহ্বরের ভেতরটা যেন যক্ষপুরী। সঙ্গে আলো না থাকলে নিজের হাতটাও দেখা যেত না।

গহ্বরের তলদেশে দাঁড়িয়ে আমি বারবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করলাম, পাহাড়টার তিনটে জ্বালামুখ। একটা সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে, অন্য দুটো দুপাশ থেকে প্রায় আড়াআড়িভাবে নেমে গেছে।

এবারই দেখা দিল আসল সমস্যা। কোন গহ্বর দিয়ে নেমে গেলে ভূগোলিকের কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছানো যাবে, বেছে নেয়া দুশ্বর। মুখগুলো যেন আমাদের গ্রাস করার জন্যই গ্রীবা বিস্তার করে রেখেছে। আমরা তো দেখেছাই টুকতে চাচ্ছি। কিন্তু কোনটায় আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, কিসে জানে? মুখে গহ্বরের বিস্তার কিছু না হলেও একশ ফুট তো হবেই।

কাকাকে নির্বাচ দেখে মনে হল তিনি নির্ঘাত স্যাকনুসেমের সেই ধাঁধাটা স্মরণ করার চেষ্টা করছেন। আবিষ্কারকদের পথের হিন্দস দিতে তিনি কি কোনো নির্দেশই রেখে যান নি? আমার কাকা আপনমনে কর্তব্য স্থির করার চিন্তায় বেশ কিছুক্ষণ আত্মগম্ব হইলেন।

বুঝতেই পারলাম কাকার মনে হতাশার ছাপ পড়েছে! একসময় সোজা হয়ে উঠে তিনি দাঁড়ালেন। পথের উদ্দেশ্যে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। একসময় হাঁটতে হাঁটতে আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

এদিকে আমি একটা পাথরের চাঁইয়ে বসে ভবিষ্যতের চিন্তায় অস্থির হচ্ছি। আচমকা কাকার কণ্ঠস্বর কানে এল—‘আর্নে স্যাকনুসেম, আর্নে স্যাকনুসেম’ আমি একলাফে উঠে পড়লাম। তড়িৎগতিতে কাকার কাছে পৌঁছলাম। সমতল একটা পাথরের দিকে কাকাকে বিষ্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। পাথরের বুকে অস্পষ্ট প্রায় লেখনী। পরিষ্কার বোঝা না গেলেও একেবারে মিলিয়ে যায় নি, এখনও পড়া যাচ্ছে—‘আর্নে স্যাকনুসেম’।

‘আমরা তবে নিশ্চিত হলাম। নিঃসন্দেহও হলাম বটে, স্যাকনুসেম এ-জ্বালামুখ নিয়েই নিচে নেমেছিলেন’—কাকা মুখে স্বস্তির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন।

কাকা স্বস্তি পেলেন বটে, কিন্তু আমার অস্বস্তি যেন ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ভেবেছিলাম, এতেই রেহাই পাব। এবার বুঝলাম, অতল গহ্বরে নামতে হবে, রেহাই অবশ্যই নেই।

পরমেশ্বর নামে অদৃশ্য দেবতাকে আগে কোনোদিন এমন করে স্মরণ করি নি। কতদূর নামতে হবে, কেমন করে নামতে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হবে সেই পরমপিতা ছাড়া কে জানবে? এমন সুন্দর পৃথিবীটাকে আর কোনো দিন কি দুচোখ ভরে দেখার সৌভাগ্য হবে? মুক্ত বাতাসে ফুসফুস দুটোকেও কোনোদিন ভরিয়ে দিতে পারব না। মুহূর্তের মধ্যে মনটা মারাত্মক বিষিয়ে উঠল।

একসময় কাকার ডাকে চমক ভাঙল, ‘এ্যাক্সেল! এ্যাক্সেল!’ আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকলাম। ইতিমধ্যে আমাদের দলটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে জানতেই পারি নি। হ্যানস ছাড়া বাকি সাহায্যকারী তিনজন প্রাণ বুঝে নিয়ে কেটে পড়েছে। সবাই তো আর আমাদের মতো পিছনটানহীন নয়, ঘর সংসার রয়েছে। পথপ্রদর্শক হ্যানস আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেল। হয়ত আমাদের পর্যটনের শেষ দেখার অভ্যর্থনা ইচ্ছা তার।

আমরা নতুন পথে পা বাড়লাম। গহ্বরটা যেন ক্রমেই বেশ অন্ধকার হয়ে আসছে। কাকা মুহূর্তের জন্য উপরের দিকে তাকিয়েই গর্জে উঠলেন, ‘আকাশটাও যেন আমাদের সঙ্গে ঘোরতর শত্রুতা শুরু করে দিয়েছে। আকাশের যে টুকরোটা আবছা দেখা যাচ্ছে তাতে ঘন মেঘ জমেছে, চিড়িক মিড়িক করে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। বৃষ্টি নামার পূর্বলক্ষণ। কোথায় বকঝকে রোদ উঠবে, ভেতরে হাল্কা আলো ছিটকে আসবে, তা না করে মুখ গোমড়া করে রেখেছে। যত্নসব!’

কাকার কথায় আমি সর্ধন বা প্রতিবাদ কোনোটাই করলাম না। আসলে আমার মন অনেক আগেই চিপসে গেছে। জ্বালামুখটার ব্যাস যখন একশ ফুটের কাছাকাছি তখন পরিধি অবশ্যই তিনশ ফুটের বেশিই হবে। আমি ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরের দিকে উঁকি দিলাম। যা দেখলাম, পিলে চমকে যাবার উপক্রম। আগে শুনেছিলাম, গভীর খাদ দেখলে মানুষের মধ্যে ল্যাফিয়ে পড়ার একটা প্রেরণা জেগে ওঠে। কার্যত ঘটলও তাই। আমি পড়েই যাচ্ছিলাম, কে যেন আচমকা আমাকে ধরে ফেলল। শুধু এটুকুই বুঝেছিলাম, আমার রক্ষাকর্তা হ্যানস।

ভেতরের দিকে উঁকি মেয়ে খুব সামান্যই দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু যত সামান্যই হোক, আমার আশ্রয়মাথা খাচা ছাড়া হবার উপক্রম। সুড়ঙ্গটার পাশগুলো খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। পাশ থেকে দুই চারটে পাথরের মাথা বেরিয়ে আছে বটে। দাঁড়ানো যাবে ঠিকই। কিন্তু ধরব কী? একটা কাজ অবশ্য করা যেতে পারে, ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে দিলে ধরে ধরে নামা সম্ভব। সমস্যাও আছে যথেষ্ট। দড়ি ঝুলিয়ে নেমে তো যাব, কিন্তু দড়িটা নামাব কি করে? ওপরের প্রান্ত যে বাঁধা থাকবে।

কাকা ইতিমধ্যেই কর্তব্য স্থির করে নিয়েছেন। আঙুলের মতো মোটা একটা দড়ি বেছে নিলেন। দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট। তার মাঝামাঝি অংশটা তুলে দিলেন শক্ত একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর। তারপর দড়ির মাথা দুটো ঝুলিয়ে দিলেন নিচের দিকে, আমি কৌতূহলী চোখে তার কাজ দেখছি। তিনি কাজের ঝাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, ‘বোকারাম কোথাকার! নিচে নেমে গিয়ে দড়ির একটা মাথা ধরে টান দিলে পুরো দড়িটাই তোমার হাতে চলে যাবে না?’

আমি ঠোঁটের কোণে সলজ্জ হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ঘাড় কাত করলাম। নিজের বোকামির জন্য বাস্তবিকই লজ্জা হল। খুবই সামান্য ব্যাপার, অথচ কিছুতেই আমার মাথায় এল না।

আমি আবারও বোকামির পরিচয় দিলাম, 'কিন্তু গর্তের দৈর্ঘ্য তো ৪০০ ফুটের বেশিও হতে পারে—তখন?'

কাকা রীতিমতো ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তুমি এমনতর বোকা ত্যো জানতাম না হে! কেন? এই ফন্দি তো বারবারই খাটানো যেতে পারে। আর খুঁজে বের করতে হবে কোন পাথরটা বাইরের দিকে খুব বেশি বেরিয়ে আছে। বাস, কাজ হাসিল।

নামার ব্যবস্থা পাকা করে কাকা মালপত্রগুলোকে বিশেষ করে খাবারদাবার তিন ভাগ করে ফেললেন। একভাগ নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন, দুই ভাগ দিলেন হ্যানস আর আমাকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—বিছানাপত্র আর দড়িদাড়া?

ধমকের সুরে বললেন, 'সে বুদ্ধি তোমার নেই জানি। সবই নেমে যাবে।' তাঁর নির্দেশে হ্যানস আগেভাগেই অভঙ্গুর জিনিসগুলো, বিছানাপত্র, দড়ি, শাবল, কুড়োল, গাইত প্রভৃতি ফেলেশিল।

কাকা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ডাকিয়ে দেখ, এগুলো কি করে নিচে নেমে যায়!' কথা শেষ হবার আগেই বিরাট সেই গাঁটরিটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন। এবার বললেন—দেখলে, আমাদের আগেই কেমন নিচে পৌঁছে গেল?' বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিগুলো কিন্তু হ্যানস বা আমাকে—কাউকেই দিলেন না। নিজের পিঠে বেঁধে নিলেন।

আমাদের প্রস্তুতিপর্ব মিটেলে কাকা বললেন, 'চলো, এবার নামা যাক।'

এখানেও আগে আগে নামছে হ্যানস, তারপর কাকা, শেষে আমি।

আধঘণ্টা লড়াই করে আমরা একটা সমতল ও চওড়া পাথরে গিয়ে দাঁড়লাম। খুবই মসৃণ, রাজমিস্ত্রি যেন যত্ন করে তৈরি করছে। কাকার নির্দেশে হ্যানস দড়িটার একটা প্রান্ত ধরে টান দিল। অপর প্রান্ত একটু একটু করে ওপরে উঠে একসময় দপ করে আমাদের পায়ের কাছে পড়ে গেল। চাতালটায় দাড়িয়ে নিচের দিকে উঁকি দিলাম, গর্তটার তলার চিহ্ন এখান থেকেও দেখা গেল না।

হ্যানস আবার দড়ির ফাঁস দিল! আবার নামা মুক্ক হল। আরও দশ ফুট নেমে আবার চওড়া একটা চাতালে পৌঁছলাম। আঙুলের মতো মোটা একটা দড়ির ওপর আমাদের তিন তিনটে জীবন নির্ভর করছে। চালে সামান্য ভুল হলেই অতল গহবরে পড়ে গিয়ে একেবারে ফেটে ফুটে ধপাস। কতরকম মাটিই যে চোখে পড়ছে, বলে শেষ করা যাবে না। ভূতত্ত্ববিদ কেউ এলে উপকৃত হতেন। কিন্তু আমার কাকার মতো মাথার দোষ তো আর কারও নেই, দড়ি ধরে মরণ-কুয়েয় নামতে যাবে।

কাকা পাশের দেয়াল থেকে এক টুকরো মাটি তুলে এনে পরখ করে দেখে বললেন, 'শোন বলছি, এটা প্রাইমডিয়াল! এই মাটি জলের সংস্পর্শে এলেই এর ধাতব অংশে তাপের সঞ্চয় হয়, আগুন জ্বলে ওঠে। আর কিছুই নয়, এই মাটির জন্যেই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে। হামফ্রে ডেভির সঙ্গে আমি একমত। ভূকেন্দ্রে কেবলই আগুন, এ-মতটা সর্বৈব ভুল। অথচ এটাই প্রচলিত। তাই বলছিলাম কি, ভূকেন্দ্রে গিয়ে হাজির হলে আমরা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়ে যাব—কথাটা ঠিক না।

আমরা কতবার জায়গা বদল করেছি। কতবার দড়ির ফাঁদ পড়িয়েছি, মোট কত ফুট নেমেছি, সবই হিসেব রেখেছি আমি। চৌদ্দবার দড়ির ফাঁস পড়িয়েছি দড়িটার দৈর্ঘ্য ৪০০ ফুট। সেটা দুই ভাগ করে ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব প্রতিবারে দুশো ফুট নেমেছি। চৌদ্দবারে নেমেছি মোট ২৮০০ ফুট।

আবার নামতে আরম্ভ করলাম।

একসময় হ্যানস চেষ্টায়ে ওঠে—'খামুন!' সর্বনাশ! আর একটু হলেই কাকার মাথায় পা দিয়ে বসতাম। কাকা বললেন, 'আমরা পৌঁছে গেছি। চিমনির তলদেশে পৌঁছেছি! ডানদিকে একটা পথমতো দেখা যাচ্ছে বটে। কাল পরীক্ষা করে দেখব। আজকের জন্য কেবল আহর নিদ্রার কাজ বাকি।'

কাকার নির্দেশে হ্যানস মুহূর্তের মধ্যে খাবারের পুটলি খুলে ভাগ করতে বসে গেল।

চাতালের ওপরই আধশোয়া অবস্থায় রাত্রি কাটলাম। বেলা আটটায় ঘুম ভাঙল।

কাকা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'কি হে, কেমন লাগছে পাতালের দিকে এগোতে।'

'এখন পর্যন্ত ত নির্বিঘ্নেই কাটল। প্রতি মুহূর্তে ভয়—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকা বললেন, 'ভয় বছর কি এ্যাক্সেল! এখনও তো আমরা ভূত্বকের নিচে এক ইঞ্চিও প্রবেশ করি নি। অর্থাৎ কি না—আমরা—সবে স্বীপের-গড় উচ্চতায় নেমেছি। এ জায়গাটা সমুদ্র বক্ষের সমস্তরে। ব্যারোমিটার রয়েছে, পরীক্ষা করে দেখতে পার।'

আমি আর পরীক্ষা পথে গেলাম না। হাজারো মালপত্র বেঁধে যে পুটলিটা ফেলে দিয়েছিলাম, সেটার গতি কী—হল, ভাবছি। কিন্তু সেটা তো এখানে এসে পড়ার কথা।

হ্যানস এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে এক সময় সোলাসে ওপরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরে তাকাতেই দেখি, প্রায় একশো ফুট উপরের ঝুলন্ত পাথরে আটকা পড়ে রয়েছে। বেড়ালের মত আঁচড়ে আঁচড়ে ওপরে উঠে গিয়ে বিশালায়তন আটকা পড়ে রয়েছে। বেড়ালের মতো আঁচড়ে আঁচড়ে ওপরে উঠে গিয়ে বিশালায়তন পুটলিটা ঠেলে দাক্ষিণ্যে নিচে ফেলে দিল।

কাকা এবার বললেন, 'শোন এ্যাক্সেল, এবার সত্যি সত্যি ভূকেন্দ্র আবিষ্কারের অভিযান শুরু হবে।' কাকা আমার গলায় যে রামকোরক—ব্যাটারি ঝোলান ছিল তাতে তার সংযোগ করে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরল।

কাকা বললেন, 'ব্যাস, এবার চলো, যাওয়া যাক। এই পুঁচিলিটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের কথা। সে বছর শেষবারের মতো অগ্নিবমন করেছিল স্নেফেলস। তখন উত্তপ্ত গলিত লাভার সূতীর স্রোত পাহাড় ফুটো করে এ-পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সাবধানে হাঁটতে হচ্ছে। ভেতরটা নিচের দিকে বড় বেশি রকম ঢালু একটু অসতর্ক হয়ে পা চালালেই ছিটকে পড়তে হবে। হ্যানসের সুবিধেই হল এতে। বিশালায়তন পুঁচিলিটা অনায়াসে গড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

পাশের দেয়ালের ওপর উজ্জ্বল আলোটা পড়ে মুক্তোর মত চকচক করতে লাগল। বিশ্ময়ভরা চোখে সে দিকে ফিরেই বললাম, 'কাকা, কী চমৎকার দৃশ্য, দেখুন!'

কাকা ঠোঁটের কোণে হাসি রেখা ফুটিয়ে তুললেন। আলতো করে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'এতেই আশ্চর্য হচ্ছে? চলো এগিয়ে চলো, আরো কত সব আশ্চর্য জিনিস মনকে দোলা দেবে দেখবে।'

এবার হ্যানস নয়, কাকাই আমাদের থামতে বললেন। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন মনে হল। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'হ্যানস, এক বোতল জল দাও তো।'

হ্যানস একটা বোতল তাঁর হাতে দিয়ে বলল, 'আর মাত্র ছয় বোতল জল রয়েছে কর্তা।'

'জলের জন্য ভেবো না। আর সামান্য এগোলেই অফুরন্ত জল পেয়ে যাবে।'

কাকা হিসেব করে বললেন, 'আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুটেরও বেশি নেমেছি। আমাদের সঙ্গে সব কটা যন্ত্রপাতিও একই কথা বলছে।'

আসল সমস্যা হচ্ছে, নিয়ম অনুযায়ী মাটির নিচে যত নামব তাপের পরিমাণও ততই বেড়ে যাবে! প্রতি ১০০ ফুটে মোটামুটি এক ডিগ্রি তাপ বাড়বে। আমরা বর্তমানে যেখানে রয়েছি, তার উত্তাপ হওয়ার কথা ছিল একাশি ডিগ্রি। কার্যত রয়েছে কিন্তু পনের ডিগ্রিরও কম। তবে কি সত্যিই ও-কেন্দ্রে আগুনের একাধিপত্য নেই? স্যাকনুসেমে যদি সেখানে পৌঁছেই থাকেন তবে বলতেই হবে পণ্ডিতজনের দেয়া আগুনের হিসেব সেখানে মিলবে না।

কাকার এদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। তিনি সুড়ঙ্গ-পথটা পরীক্ষা করার কাজেই আত্মমগ্ন। এক সময় বললেন, 'এ্যাক্সেল, এতক্ষণে আমরা সবে চিমনিটার কাছে পৌঁছেছি। এবার আমাদের পূর্বদিকে যেতে হবে।'

টিলেমি করার সময় এটা নয়। তার নির্দেশে আমরা পূর্বদিকের সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়লাম। তবে তিনি যে আন্দাজেই ফিলটা ছুড়েছেন, বুঝতে পেরেছি। লাভামণ্ডল পেরিয়ে না গেলে জল পাওয়া যাবে না! এবারের পথটা ঢালু নয়। আরও কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, গ্রানাইট পাথরের কতগুলো খাষা ছাদটাকে ধরে রেখেছে। আরও কিছুটা এগিয়েই দেখা গেল, সুড়ঙ্গের প্রকৃতি অন্যরকম। আর উত্তাপ প্রায় একইরকম চলেছে! একটা প্রসঙ্গ কল্পনা করতে গিয়ে শরীরে ঘাম দেখা গেল। এই পর্বতটা যখন উত্তপ্ত গলিতে লাভা উল্লীর্ণ করত তখন এখানকার উত্তাপের পরিমাণ কী ছিল! উত্তপ্ত গলিত লাভার স্রোত কি এখান দিয়ে বহিত?

ব্যাপারটা কল্পনা করতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, মনে মনে বললাম, 'প্রাচীন আগ্নেয়গিরিটার যদি আবার অগ্নিবমন করার সাধ জেগে ওঠে! চোখের পলকে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতে হবে।'

ঘড়িতে তখন ছয়টা বাজে। সন্ধ্যা ছয়টা। সোজা পথে ছয় মাইল এগিয়েছিল, সে অনুপাতে মোটেই এগোতে পারি নি! খুব বেশি হলেও সিকি মাইল হতে পারে।

'এবার থামা যাক, কী বলো? রাতটা এখানে কাটিয়ে খুব ভোরে আবার হাঁটা শুরু করা যাবে।' কাকা বললেন

সকাল হল। কবল গুটিয়ে আবার পুঁচিলি বাঁধা হল। শুরু হল হাঁটা। কী আশ্চর্য! বরাবর একই সমতল বজায় রেখে রাস্তাটা চলেছে। নিচের দিকে এক ইঞ্চিও নামছি না তো! কোথাও আবার ওপরের দিকে উঠছে। নইলে হাঁটতে এমন কষ্ট হবে কেন? সুড়ঙ্গের এদিকটার দেয়ালে আর লাভার প্রলেপ দেখা যাচ্ছে না। কঠিন কঠোর পাথর। ব্যাপারটা আমাদের ভাবিয়ে তুলল। আমরা কি তবে পথ ভুল করেছি? ভাবলাম, কাকা ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন না? হয়ত পেরেছেন। পথটা কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, দেখতে চাচ্ছেন। আবিষ্কারকের মোহই তাঁকে পেয়ে বসেছে। তা হোক। কিন্তু মোহের পরিমাণ তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বনাশ ঘটায়। সঙ্গে যা খাবার রয়েছে তাতে আরো কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। কিন্তু জল? সমস্যা তো জল নিয়েই। বোতল তিনেক জল আছে বটে, কালই নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুড়ঙ্গপথের শেষ মাথায় পৌঁছবার আগেই জলভেটায় মারা যাব না তো? আবার বাইরে বেরোবার ব্যবস্থা যদি নাই থাকে? তখন উপায়? কাকা কেন যে পশ্চিমের সুড়ঙ্গটা ছেড়ে দিয়ে পূর্বেরটাকে আঁকড়ে ধরলেন বুঝতে পারছি না।

জলের প্রসঙ্গটা কাকার কাছে উত্থাপন করায় তিনি তাচ্ছিল্যের সুরেই ব্যক্ত করলেন, 'আরে, ভাবছ কেন? জল পাওয়া যাবেই। যতক্ষণ না পাওয়া যায়, খরচ কম করবে।'

সামান্য এগিয়েই আমাদের থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। কালো একটা পাথরের দেয়াল আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। তিনজনে ক্রমাগত ধাক্কাধাক্কি করলাম। কোনো ফলই হল না।

কাকা মোটেই ভেঙে পড়লেন না। অবলীলাক্রমে বলে ফেললেন, 'কি আর করা যাবে, ফিরেই চল। ক্রমাগত ছয় দিন হাঁটাহাঁটি করে এ-পর্যন্ত এসেছি। ফিরতে কদিন লাগবে, ঠিকঠিকানা আছে? আসার সময় উৎসাহ ছিল, এখন তো জমাটবাঁধা নৈরাশ্য! তখন সঙ্গে জল ছিল। এখন সব কটা বোতলই শূন্য। তেষ্টায় কলজে ফেটে যাবে।'

হ্যানস কাকার নির্দেশে পেছন ফিরে আবার হাঁটা জুড়ল। একদিন কাটল। এক ফোঁটাও জল নেই! দ্বিতীয় দিন রাতে বৃকের মধ্যে মরুভূমির হাহাকার। তৃতীয় দিন আমার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে উঠল। বিকেলের দিকে হাঁটার সময় আমি হঠাৎ পড়ে গেলাম। ঠোট দুটো ফুলে গেছে, ফাটল ধরেছে। জিভটা কুঁকড়ে গেছে। বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম। স্বাস নেয়ার মতো সামান্য ক্ষমতাও হারিয়ে ফেললাম। কাকা আমার মাথাটা কোলে নিয়ে বসলেন। নিজের জন্য রক্ষিত জলের বোতলটা আমার মুখে নিঃশেষে ঢেলে দিলেন।

কাকার ব্যবহারে অবাক হতেই হল। নিজের বুকফাটা তৃষ্ণা সহ্য করে বিপদের মুহূর্তের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। আবার চরম সঙ্কট মুহূর্তে অমূল্য অমৃতটুকু ব্যয় করলেন।

এক ঢোক জল ফুসফুসে যেতেই হাত বল ফিরে পেলাম। দীর্ঘপথ সামনে পড়ে রয়েছে। পূর্ণ উদ্যমে আবার পথ চলা শুরু হল। পূর্বকথিত মাথায় পৌঁছতে কষ্ট হল বটে, কিন্তু পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। তেরদিন আগে এখান থেকে ভুল পথে চলা শুরু হয়েছিল। এবার পশ্চিমের সুড়ঙ্গপথ ধরলাম আমরা। দ্রুত পায়ে শুধুই পথচলা।

এই মুহূর্তে আমরা যে জিনিসটার অভাব বেশি করে অনুভব করছি সেটা হল জীবনদায়িনী অমৃত বারি। তেঁষ্টা মেটাবার জন্য এক ফোঁটা জল। পথের দুধারে আগের মতোই পাথরের বিচিত্র সমারোহ। কঠিন পাথরে জল কী করে আসবে?

নতুন সুড়ঙ্গটায় দুই তিনদিন কেটে গেল। আগের মতোই আবার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসল। একদিন ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়লাম আমি। সেদিন তাঁর সঙ্গে জল ছিল, আজ কিছুই নেই।

কাকা আমার মাথায় সম্মেহে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বড় ভুল করে ফেলেছি। নিজে তো মরলামই, নিভেদন বংশের শিবরাত্রির পলতে তাকেও মারলাম।'

এক-একবার উঠে বসার চেষ্টা করলাম, পারলাম না, নেতিয়ে পড়লাম পর-মুহূর্তেই। পাথরে মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছি, চোখ বন্ধ করে হঠাৎ চমকে উঠলাম। ডান কানটাকে জোরে পাথরের ওপর ঠেসে ধরলাম। কী যেন একটা অবিস্ম্য শব্দ কানে এল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ করে শব্দটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলাম। কুলকুল করে তরল পদার্থের ধারা বয়ে চলেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, জল! জলনা হলে কুল কুল শব্দ কেন?

কাকাকে বললাম ব্যাপারটা। কান পাতলেন। আশায় তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কাকার ধারণা মিথ্যে নয়। লাভা অঞ্চল পার হলেই, জল পাওয়া যাবে, আগেই বলেছিলেন।

রইলই বা জল, আমরা পাব কী করে? বেশ পুরু একটা গ্রানাইট পাথর তাকে যে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এখন উপায়? হ্যানস ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। জল আছে, বুঝতে যখন পারল তখনই বড় পুঁটুলিটা খুলে মুহূর্তের মধ্যে শাবলটা বের করে ফেলল। চলল গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম।

আমি প্রথমটায় তাকে পাগলের কাণ্ড বলেই উড়িয়ে দিলাম। একে তো গ্রানাইট লোহার মতো শক্ত, তার ওপর স্তরটা কতখানি পুরু তাই বা কে জানে?

কাকা আশ্বাস দিলেন, গ্রানাইটের স্তরটা খুব পুরু হলে এখন শব্দটা এত স্পষ্ট শোনা যেত না।'

অমিত শক্তির আধার আইসল্যান্ডের কঠোর পরিশ্রমী জোয়ান হ্যানসের শাবলের কাছে গ্রানাইটও হার মানল! পাথর ফুটো হলে জল বেরিয়ে এল। আমি মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে গলা পর্যন্ত জল ভরে নিলাম।

হ্যানসের প্রশংসা করতেই হয়। সত্যিই পথপ্রদর্শক হবার যোগ্য বটে সে। জলধারাটার নাম হ্যানসব্য্যাশ। স্থানীয় ভাষায় 'ব্য্যাশ' শব্দটির অর্থ ছোট নদী। সারা সুড়ঙ্গ জুড়ে দুই ফুট গভীর হ্যানসব্য্যাশের ধারা বইতে লাগল। জলটা গরম। কাছে কোনো আগ্নেয়গিরি আছে নিশ্চয়ই! শরীরের পক্ষে উপকারী সন্দেহ নেই, সুস্বাদু নাই-বা হল। জলধারাটা আমাদের গতিপথেই এগিয়ে গেল। ভালোই হল। একবার যে জীবনদায়িনীর দেখা পেয়েছি, তাকে ছাড়ছি না।

হ্যানসব্য্যাশই এখন আমাদের পথের দিশারী। তার পথ ধরেই এগিয়ে যাব, বরাতে যা থাকে।

সে আমাদের নিয়ে এখন একটা অপ্রত্যাশিত জায়গায় গেল যা আমার অধ্যাপক ও ভূতত্ত্ববিদ কাকাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—এর অস্তিত্ব ভূতত্ত্বের দশ হাজার ফুট তলায় সম্ভব। এর আগে কেউ তাঁকে এ কথা বললে মাথা খারাপ বলে তাড়িয়ে দিতেন। হ্যানসব্য্যাশকে অনুসরণ করে আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেটা একটা সমুদ্র। তাঁকে ওঠার মতো কথাই বটে। হ্যাঁ, সমুদ্রই বটে। সামনে অনন্ত জলরাশি। হ্যানসব্য্যাশ-এর মতো আরো অনেক জলধারা উন্মাদের মতো ছুটে এসে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। কোন অদৃশ্য পথ ধরে আলো এসে পুরো জায়গাটা আলোকিত করে দিচ্ছে। আমার অধ্যাপক কাকা বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় বৈদ্যুতিক আলো। সে-বিন্যূতের উৎপত্তি দেখতে হবে যুঁজে।'

কিন্তু এই আলোর উৎস সন্ধানে যাওয়া তার এই মুহূর্তে ইচ্ছা নেই। তবে এটাই প্রথম ও প্রধান কাজ? হ্যাঁ, কাজ শুরু হয়ে গেছে। তাঁর নির্দেশে হ্যানস সে-কাজ শুরু করে দিয়েছে। কুড়োল দিয়ে অনবরত আঘাত হানতে লাগল। তবে এবার আর গ্রানাইট পাথরের ওপর নয়। শিলায় পরিণত হয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক গাছের ওপর।

অমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে কিছু দূরে একটা অরণ্যমতো মনে হল যেন। অরণ্য? হতেও পারে! সমুদ্র থাকলে অরণ্য থাকার বাধা কোথায়? কাকা পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। আমিও কিছু নিলাম। গাছ, —শিলীভূত গাছ। অমিত শক্তির আধার হ্যানস ধারালো কুড়োল দিয়ে কয়েক মিনিটেই এক একটা গাছ কাট করে দিচ্ছে।

আমি ব্যাপার দেখে কাকার দিকে অবাক বিষ্ময়ে তাকলাম। সঙ্কোচ ভাগ করে বলেই ফেললাম, 'কী ব্যাপার কাকা, জাহাজ তৈরি করবে নাকি?'

কাকা হেসে বললেন—'জাহাজ নয়। জাহাজ তৈরির উপায় তো নেই।' হ্যানস বলল, 'একটা নৌকা তৈরি করবে। আসলে যা হবে তা হচ্ছে, ভেলা।'

'সে কী! ভেলা দিয়ে সমুদ্রটা পাড়ি দেবার চিন্তা করছ নাকি?' আমি বললাম।

'দূর পাগল কোথাকার! সমুদ্র কে বলল? এটা তো একটা খাড়ি। বেশি হলেও আমাদের ইংলিশ চ্যানেলের দ্বিগুণ হবে। বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল বিস্তার। শোন বলছি, হিসেব করে দেখেছি, আমরা আজ পর্যন্ত দশ হাজার ফুট মতো নিচে নেমেছি। আর দূরত্ব হিসেব করলে, সাত-আট শো মাইল। এখানকার ওপরে থেকে হিসেব করলে আমরা ফ্রান্সের স্বাক্ষামাঝি রয়েছি। মাইল পঞ্চাশেক পরে ভূমধ্যসাগর।

সেখানে—সেই পাতাল সাগরের সৌন্দর্যে নেমেই আমরা দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম। আর হ্যানস নৌকা তৈরি কাজে ব্যস্ত!

হ্যানসের নৌকা তৈরির কাজ শেষ হল। শিলীভূত গাছের অনেক গুণ, জলে ভাসবে, গলবে না। আগুনের সাধ্য কি স্পর্শ করে।

উপায় নেই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নৌকায় উঠতেই হল। কাকার হাতের কাছেই রয়েছে থার্মোমিটার, মনোমিটার আর ব্যারোমিটার ও কম্পাস প্রভৃতি। একটুকরো কাগজে কিছু সংখ্যা লিখে কী যেন করছেন। হিসেব টিসেব হবে হয়ত।

হ্যানস ইশ্পাতের তার দিয়ে বড়শি তৈরি করল। তার বিশ্বাস, জল থাকলে মাছ থাকবেই।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে, বড়শিতে মাছ গাঁথছে হ্যানস। অনেকটা স্টার্জিয়ন-এর মত। কিন্তু তফাত আছে স্টার্জিয়নের মাথা একদম গোল ও চ্যাপ্টা হয় না! কাকা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মন্তব্য করলেন, ‘এ জাতের মাছ পৃথিবীতে এখন আর নেই। তবে শিলীভূত কয়েকটা মাছ পাওয়া গেছে, এইমাত্র।’

কাকার নির্দেশে হ্যানস মাছধরা ফেলে সমুদ্রের গভীরতা মাপতে ব্যস্ত হল। ৪০০ ফুট লম্বা দড়ি অনেকগুলোই সঙ্গে রয়েছে। মাথায় মাবল বেঁধে ছেড়ে দিলে কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবেই! যত বেশি বা কম গভীরতাই হোক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা বিশেষ একটা অঙ্গ।

এ ব্যাপারে আমার উৎসাহ কমই ছিল। কিন্তু চতুর্থ দিনে শাবলটা জল থেকে তুলতেই আমার সেই ভাঁটাপড়া উৎসাহটা হঠাৎ বেড়ে গেল। থার্মোমিটারের পারা ১০০ ডিগ্রিতে ছিল, ২০০ ডিগ্রি উঠে গেল। লোহার মোটা শাবলটা বেকে দুমড়ে গেছে দেখলাম।

আমি বিষয়ভরা চোখে দোমড়ানো শাবলটার দিকে তাকিয়ে ভাবছি, এ কার ক্ষমতা? লোহার শাবলটাকেও দুমড়ে দিয়েছে।

কাকা শাবলটা নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাতে ফেরাতে একসময় চমকে গিয়ে বললেন, ‘কাও দেখেছ। শাবলের গায়ে এই যে গর্তগুলো দেখছ, কিসের বলত? দাঁতের দাগ।’ খুবই নীচুগলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

আমি চোখের মণি দুটো কপালে ভুলে বললাম, ‘দাঁত? কার দাঁত? কার বলুন তো? বর্তমান পৃথিবীতে এমন কোনো জীব আছে বলে তো আমার অন্ত মনে হয় না!’

‘আসল জায়গায়ই তো ভুল করছ বাছা। আমরা এই মুহূর্তে যেখানে বাস করছি, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বাইরে এটা। আর এটাই তিন লক্ষ বছর আগেকার পৃথিবী। ভূত্বকের ওপরের অংশে যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে, প্রাগৈতিহাসিক জন্তুজানোয়ার নিয়ে আরো একটা পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে।’

আমার সর্বাসে কাঁটা দিয়ে উঠল, দাঁতের মালিক সেই বিশালায়তন জন্তুটা যদি চোখের সামনে ভেসে ওঠে? আমাদের এই ছোট ডিঙিটার কী গতি হবে? আর আমরা? আর ভাবতে পারলাম না। গায়ে কাঁটা দিল।

আমি হতাশ চোখে ডিঙির কোণায় পড়ে থাকা অস্ত্রগুলোর দিকে তাকালাম। ওই দাঁতগুলোর মালিক, অমিত শক্তির আধার বিশালায়তন জানোয়ারটার চামড়া ঘায়েল করবে কি না, ভাবতে বসলাম!

আমরা পাহারার ব্যবস্থা করলাম। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, এই সমুদ্র নিরাপদ নয় বলেই বিশ্বাস। দাঁতগুলোর মালিক কখনও, কী রূপ নিয়ে হাজির হবে, কে জানে?

আজ আমার পাহারার পালা। চারদিকে সজাগদৃষ্টি রেখে হাল ধরে থাকতে হবে। আচমকা ডিঙিটা মারাত্মকরকম কেঁপে উঠল! কেঁপে নয়, দুলে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার! কিছুই ত চোখে পড়ল না। কিন্তু আমার যে স্পষ্ট মনে হল, কে যেন তলা থেকে সজোরে ঠেলে দিল। চোখের পলকে অন্তত ১০০ ফুট দূরে নৌকাসহ আমাদের ছুড়ে দিল।

কাকার ঘুম ভেঙে গেল। হ্যানসও উঠে বসল। সে জলরাশির ওপর একবারটি চোখ বুলিয়েই আঙুল উঁচিয়ে প্রায় হাজার ফুট দূরের কী যেন দেখালাম, বিশালদেহধারী কী যেন একটা লাফিয়ে শূন্যে উঠছে। কখনও বা জলের নিচে চলে যাচ্ছে। আমি আপন মনে বলে উঠলাম, ‘শুণক নাকি? বিশালায়তন—’

কাকা আমাকে সমর্থ করলেন, ‘হ্যাঁ, শুণকই বটে। কিন্তু তারা তো এমন হিংস্র নয়! এদের মধ্যে বিশালায়তন সারীসূপের আচরণ লক্ষ করছি।’

তার পিছনে ওটা কী? অতিকায় কুমীর? বাব্বা! চোয়ালটা কত বড়? নৌকাটাকেই যেন গিলে ফেলতে পারবে। দাঁতগুলোও পিলে চমকে দেয়। আমাদের যতদূরটা ডুব দিল। কাকা জলের ওপর চোখ রেখেই আবার বললেন, ‘ওই—ওই যে তিমি। কত বড় বড় পাখনা, এক একটা জাহাজের পালের মতো। মুখ দিয়ে কী পরিমাণ জল ছাড়ছে দেখ।’

দুটো জলস্তম্ভ সবেগে ওপরে উঠে আবার দুম করে ভেঙে পড়ছে। এ কোন দানবের দরবারে এলাম রে বাবা! সর্বশক্তি প্রয়োগের দরকার পড়বে না, আমাদের নৌকাটা ঝুড়িয়ে দিতে একটা দাঁতই যথেষ্ট। হ্যানসের ইচ্ছা, নৌকাটাকে এই যমপুরী থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। হ্যানস নৌকার মুখ ঘোরাতে গিয়েও আবার হঠাৎ থেমে গেল। পালিয়ে যাবে কোথায়? পিছনেও শত্রুপক্ষের শিবির। বিশাল একটা কঙ্কপ, চল্লিশ ফুটের কম হবে না। পঞ্চাশ ফুট একটা সাপকে তাড়া করে আমাদের দিকেই এগোচ্ছে। চারদিকে শত্রু, পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ। আমাদের উপস্থিতিই হয়ত তাদের এই অভিযানের কারণ। আমাদের ডিঙিটাকে কেন্দ্র করে তারা বৃত্তাকারে চক্রর মারছে। বন্দুক বাগিয়ে দাঁড়িয়েছি বটে, কিন্তু গুলি চালিয়ে হয়ত হতাশই হতে হবে! এত মোটা চামড়া ভেদ করে গুলি পৌঁছাতে পারবে না হয়ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড নজরে পড়ল। অতিকায় সাপ ও বিশালায়তন কঙ্কপটা ছাড়া সবাই জলের নিচে চলে গেল, কিছুটা স্বস্তি পেলাম। নিজেদের মধ্যেই তারা শক্তিপরীক্ষায় মেতেছে। আমাদের দিকে নজর দেয়ার সময় কোথায় তাদের?

কাকা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে। যুদ্ধোন্মত্ত জানোয়ার দুটোর ওপর নজর রাখছেন। একসময় চোঁচিয়ে উঠলেন, 'ইথথিয়োসোরাস! পেলসিয়োসোরাস! পরস্পরের সঙ্গে সাপে নেউলে সম্পর্ক। কে বলবে পেলসিয়োসোরাস একটা সাপ? গায়ে তার বেশ পুরু ও শক্ত খোলা, কচ্ছপের যেমন থাকে। আর ইথথিয়োসোরাস দেখতে শুভকের মতো। গলাটা তার সরীসৃপের মতো, কুমীরের মতো বড় বড় দাঁত। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র।

কী মরণপথ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে বিশালায়তন ও অদ্ভুতদর্শন জন্তু দুটো! পুরো দুই ঘণ্টা ধরে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে! আমি বন্দুকটা ধরেই রেখেছি। হঠাৎ জলের ওপর ভুমল একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে তারা কোথায় যেন অদৃশ হয়ে গেল। এবার হয়ত তারা জলের নিচেই লড়াই চালাবে! আচমকা জলের ওপর বিরাট একটা মাথা ভেসে উঠল। সেই পেলসিয়োসোরাসটার মাথা। তার চারদিকের জল লাল হয়ে গেছে। মারাত্মক রক্তম জখম হয়েছে। গলগল করে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। জলের ওপর ওঠার সময় খাড়াভাবেই সে উঠেছিল। এখন গলাটা এলিয়ে পড়ছে। উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। কাত হয়ে পড়ে গেল। মৃত্যুযন্ত্রণায় দাপাচ্ছে। বারবার পাক খেয়ে কিছুটা উঠেই সে আবার পড়ে যাচ্ছে দেখলাম। একসময় যন্ত্রণার হাত থেকে চিরভরে রেহাই পেয়ে গেল জানোয়ারটা।

এবারের মতো বিপদ কাটল বটে। দমকা হাওয়ায় নৌকা ঘণ্টায় ২০০ মাইল বেগে ছুটবে।

দুপুরের দিকে আবার মনটা বিধিয়ে উঠল। একটা রহস্যজনক শব্দ কানে এল। কাকা বললেন, 'আমরা পাড়ের কাছাকাছি এসে পড়েছি। তীরের কাছে ছুটে গিয়ে ঢেউগুলো সশব্দে ভেঙে যাচ্ছে। নির্ঘাত সেই ঢেউ ডাঙার শব্দই এটা।' আমি মনে মনে বললাম, 'তাহলে তো কোনো কথাই নেই।' হ্যানস অনুমানের ওপর নির্ভর করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। সে দ্রুত ছোট্ট মাছুলটার ওপর উঠে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করল। সমুদ্রের উপরিভাগে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না! তবে অব্যক্তি শব্দটার উৎস কোথায়?

প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শব্দটাকে জলপ্রপাতের শব্দ বলে মনে হল। আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হল! ভাবছি, সমুদ্রটাই গড়াতে গড়াতে গিয়ে হঠাৎ কোনো নিম্নতলে পড়ছে না তা? তাই যদি হয়, আমরাও নৌকোসহ গড়িয়ে গিয়ে পড়ব—উঃ! ভাবতে পারছি না, মাথা ঝিমঝিম করছে!

এইভাবে যদি পাতালে গিয়ে পড়তে পারি কাকা হয়তো খুশিই হবেন, তাঁর বাক্তিত জায়গায় পৌঁছে গেছেন বলে।

শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ভীতসন্ত্রস্ত মনে ভাবছি, শব্দের উৎপত্তি আকাশে নয়, সমুদ্রে। তাই যদি হয় তবে চক্রবালরেখা? সেখানে তো বিন্দুমাত্র কুয়াশাও নেই। অতএব সমুদ্রটাই নির্ঘাত কোনো নিম্নস্তরে লাক্ষিয়ে পড়ছে। বিকেলের দিকে হ্যানস আবার মাছুলে উঠে চারদিকে দেখতে গিয়ে এক জায়গায় দৃষ্টি স্থির করল। কিন্তু কী দেখছে অমন করে? মুহূর্তের মধ্যে সে নেমে এসে দক্ষিণ দিকে তর্জনী নির্দেশ করল। নিঃশব্দে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল।

আমি চকিত ঘাড় ঘুরলাম। দেখলাম—সাগরের বুক চিরে বিশাল একটা ফোয়ারা বহু ওপরে উঠে যাচ্ছে। কী ব্যাপার? আবার কি অতিকায় কোনো সামুদ্রিক জানোয়ারের আবির্ভাব ঘটল? আমি বিপদের আশঙ্কায় হ্যানসকে বললাম, নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে দিক পরিবর্তন করতে।

কাকা বাগড়া বাঁধালেন, 'ভয়ে মোটেই আমাদের পথ পরিবর্তন করব না। যেদিকে যাচ্ছি, সেদিকেই চলা।'

আমাদের যাত্রাপথ অপরিবর্তিতই রইল। জন্তুটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। অতিকায় দেহটা দেখতে কিন্তুতকিমাকার। কালো তার গায়ে রঙ, পিঠে বিরাট কুঁজ তাকে আরো বিশ্রী করে তুলেছে। তবে কি এটা তিমিস্লি? তিমিকে যারা গিলে খেতে পারে, তাদেরই তিমিস্লি বলে। নিশ্চল-নিখরভাবে পড়ে রয়েছে। ঢেউগুলো তীব্র আক্রোশে তার গায়ে আছড়ে পড়ছে। তবুও তার ঘুম ভাঙছে না। স্বাস্থ্যপ্রস্থানের আকারে জলের ফোয়ারা সবগে ৫০০ ফুট মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে। তারই গায়ে আবার বৃষ্টির মতো মুঘলধারে পড়ছে। তার দৈর্ঘ্য কিছু না হলেও ৫০০০ ফুট। তারই দিকে এগিয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটাকে আমি নিছক পাগলের বলে মনে করলাম। ৫০০ তিমি যে গিলে খেতে পারে তার কাছে আমরা তিনজন তো এক টিপ নস্যের চেয়েও নগণ্য।

ধরেই নিয়েছি, বিক্ষোভ বিদ্রোহ ছাড়া কাকাকে সোজা করা যাবে না। আমি গর্জে উঠলাম, 'এটা কী করছেন, কাকা! শেষপর্যন্ত হাতে ধরে শ্রাণটা দেবেন, নাকি?'

কাকা তেমনি নির্বাক। অপলক চোখে জলজ জানোয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইলেন! আরো কিছু সময় কাটিয়ে একসময় সোম্ব্লাসে বলে উঠলেন, 'দীপ! দীপ! জন্তু-জানোয় নয়, দীপ!'

আমি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কিন্তু অতিকায় যমদূত? জলের ফোয়ারা? সবই কি ভুল।'

'হ্যাঁ। সম্পূর্ণ ভুল। আইসল্যান্ডের জেইসির নাম শোনো নি? পৃথিবী বিখ্যাত ফোয়ারা! এটাও সে-রকমই একটা ফোয়ারা। তবে এটা তার চেয়ে অনেক বড় সন্দেহ নেই।'

লুকানো আগ্নেয়গিরি থাকার জন্যই জল তীব্র বেগে এত ওপরে উঠতে পারছে। নিজের আগলে থেকে চাবিকাঠি নাড়াচ্ছে।

ফোয়ারাটার কাছে গিয়ে দেখার সাধ থাকলেও সাধ্য আমার অন্তত নেই। জলের ওপর যা তাগুব চলছে, যে-কোনো সময় আমাদের ডিঙিটা উল্টে যেতে পারে।

দীপের গায়ে নিয়ে গিয়ে হ্যানস ডিঙিটা দাঁড় করাল। জলে ঘুরে ঘুরে আমাদের ডাঙার মোহ পেয়ে বসল। আমি লাক্ষিয়ে দীপে নামলাম। মাটিতে পা দিয়ে চমকে গেলাম, এ কী ব্যাপার! গ্রানাইট পাথর, অথচ পাকা আমের মতো তুলতুলে নরম! লাভাস্তর। আগুনের মতো না হলেও খুবই গরম। কাকাকে পূর্ব মন্তব্য স্বরণ করতে গিয়ে বললাম, 'কী কাকা, ভূকেন্দ্রে তরল আগুনের অস্তিত্ব নেই, বলাছিলেন যে? ভূকেন্দ্রে পা দেবার আগেই যতি এত আগুন, জায়গামতো কী হতে পারে, বোঝাই যাচ্ছে।'

কাকা নির্বাক।

নষ্ট করার মতো সময় আমাদের নেই। আবার ডিঙি ছাড়লাম। হিসেব নিয়ে বসলাম। সমুদ্রের ওপর দিয়েই ৮০০ মাইল পাড়ি দিয়েছি। আইসল্যান্ড থেকে ২০০০ মাইলের কম নয়। এও সিদ্ধান্ত নেয়া যায়, এই মুহূর্তে আমাদের মাথায় ওপর রয়েছে ইংল্যান্ড।

কাকা নির্বাক। চোখের তারায় দৃষ্টিভ্রম ছাপ। তবে ভয়ে মুষড়ে পড়ার অবস্থা এ নয়, এটা ঠিকই। কিন্তু এই দৃষ্টিভ্রমের কারণ কী? বাতাসে ঝড়ের পূর্বাভাস সুনিশ্চিত। আমাদের পরিচিত মেঘের মতো এখানকার মেঘ কালো নয়, জলপাই-এর রঙ।

মাস্তুলে পাল টাঙানো রয়েছে সত্য। বাতাস থাকলে বড়ই উপকারে আসে। কিন্তু ঝড়ের সময় নৌকাকে মারাত্মক বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। আমি ধমকের সুরে হ্যানসকে বললাম, 'করছ কী! তাড়াতাড়ি পাল নামাও। সম্ভব হলে মাস্তুলটাও।'

কাকা চোঁচিয়ে উঠলেন, 'না! ঝড় উঠুক! ঝড় তুফানে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে তীরে আছড়ে ফেলুক। অপস্র সমুদ্রটাই আমার সব পরিকল্পনার বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে একমাত্র চিন্তা, যে-কোন অবস্থায় সমুদ্রটা পার হওয়া। পরিণাম পরে ভাবা যাবে।'

আমার হিসাবটিসাব শিকেয় উঠল। চোখের পলকে প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। সে কী গর্জন! বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা রীতিমতো দাপাদাপি শুরু করে দিল।

মাস্তুলটা অনবরত দোল খাচ্ছে। কোনোকরমে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখনও। আর পালটা? হাওয়া ভরা বেগুনের মতো ফুলে উঠেছে। ফাটে—ফাটে অবস্থা।

আমি গলা ফাটিয়ে চোঁচাই, 'পাল নামাও! মাস্তুল খোলো!'

কাকা ততোধিক গলা চড়িয়ে বলেন, 'না। পাল নামাবে না!'

ডিঙিটা মোচার খেলার মতোই হালকাভাবে দোল খাচ্ছে! কাত হচ্ছে! যে-কোনো মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে। কড়কড় শব্দে বিদ্যুৎ চমকাবে। সে সঙ্গে বৃষ্টির দাপাদাপি ত রয়েছেই। আমি মরিয়া হয়ে মাস্তুলটা জাপটে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি। আচমকা ভেঙে পড়লেই সর্বনাশের চূড়ান্ত করে ছাড়বে। ডিঙিটা কাঁপছে—দুলছে—কাত হচ্ছে।

নৌকোটা ঝড়ের দাপটে তীরবেগে ছুটে চলেছে। আমরা কোথায় চলছি? কোথায়ই বা এর শেষ?

কাকা টার্নটান হয়ে গলুইয়ের ওপর তয়ে পড়লেন। অসহ্য গরম! গায়ে ফোঁকা পড়ার উপক্রম।

থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে আমার তো চক্ষুস্থির। পারা অবিশ্বাস্যরকম উঠে গেছে। এ কেমন হল রে বাবা!

আমিও কাকার মতোই হাল ছেড়ে দিলাম। খুবই হতাশ হয়ে পড়লাম। একমাত্র হ্যানসই দৃঢ় রয়েছে। তাই ডিঙিটা তলিয়ে যায় নি এখনও।

দুপুরের দিকে ঝড় আরও রুদ্ধরূপ ধারণ করল। তিনদিন আমাদের কথা বন্ধ। ইচ্ছে করে কথা বন্ধ করিনি। চোঁচিয়ে কথা বললেন শোনা যায় না। ঠোট নাড়ে, শব্দ বেরোয় না। কাকা হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'এ যাত্রায় আর রেহাই নেই! দেখা যাক, শেষ, কোথায় এর?'

আমি আবারও পাল নামিয়ে নিতে অনুরোধ করলাম! কাকা এবারে কিন্তু মোটেই আপত্তি করলেন না। ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেন।

চেষ্টা করেও ফল হল না। মুহূর্তের মধ্যে একটা আগুনের গোলা হঠাৎ আমাদের নৌকার ওপর এসে পড়ল। চোখের পলকে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল। মাস্তুলটা টুকরো টুকরো করে দিল। আর পাল? ছিড়ে ছিড়ে একাকার! আত্মারাম খাচাছাড়া হবার উপক্রম! আগুনের গোলাটার রঙ সত্যিই বিচিত্র। অর্ধেক সবুজ, বাকি অর্ধেক সাদা। আকারে দশ ইঞ্চি বোমা যেন একটা। নৌকার খেলার মধ্যে অনবরত চক্রর মারছে। আমি তো প্রমাদ গুললাম, বারুদের বস্তার ওপর গেলেই কেলেকারীর চূড়ান্ত করে ছাড়বে। বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আমাদেরও শোলার মতো উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আতঙ্কে আমার সর্বাত্মক খরখর করে কাঁপতে লাগল। বাতাস ভারী। নাইট্রাস গ্যাসের ধর্মই এটা। শ্বাসনাশি দিয়ে ফুসফুসে যাচ্ছে, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। নিজের পা, তাঁর ওপরও কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছি। টানার চেষ্টা করছি, কিছুতে পারছি না। কে যেন সজোরে টেনে রেখেছে পা দুটোকে।

একসময় সে আগুনের গোলাটা আপনা থেকেই দাঁড় দাঁড় করে জ্বলে উঠল। চোখে মুখে তার তাপ এসে বলসে দিল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। তবে আমি কতক্ষণ যে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারব না। আমাদের ডিঙিটা সজোরে একটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। আমি অথৈ জলে ছিটকে পড়লাম। মুহূর্তেই হ্রতজ্ঞান ফিরে পেলাম। হ্যানস ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে হিচড়ে আমাকে ডিঙিতে উঠিয়ে নিল। চেউয়ের নাগালের বাইরে, বালির ওপর নিরাপদ স্থানে শুইয়ে দিল।

এবার মালপত্র তুলে আনতে সে সমুদ্রে নামল। বার বার ডুবসাঁতার দিয়ে একে একে সবগুলো টেনে তুলতে লাগল।

একসময় বৃষ্টি নামল। ঝড়ের বেগ কমে গেল। আমি আর কাকা পাহাড়ের বিপরীত পীঠে আশ্রয় নিলাম।

আমি ডিঙিতে বসে ঝড়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হিসাব করেছিলাম, আমরা স্নেফেলস থেকে রওনা দিয়ে আটলান্টিকের অংশবিশেষ, তারপর ঝটল্যান্ড, ইংল্যান্ড, ইংলিশ চ্যানেল ও ফ্রান্স এসব জলভাগও স্থলভাগের তলা দিয়ে ইতালির তলায় হাজির হয়েছি। ঝড়টা যদি আর সামান্য পূর্বদিকে ঠেলে নিয়ে যেত তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের পরিবর্তে জার্মান এলাকার মাটির তলা দিয়ে ভেসে আসতে পারতাম। হায়রে অগ্নের জন্য আমাদের বাঙ্কিত স্থানের কানে পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছি।

আমি আপন মনে কত কি ভাবছি। কাকা আমার গাঞ্জিফটুক লক্ষ করে বললেন—‘কি খোকা, ভাবছ কী?’

আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ‘কাকা, আমাদের বাড়ি ফেরার উপায় কী?’

কাকা ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললেন, ‘সে কী হে! পৌঁছে নাও তো আগে, তারপর ফেরার চিন্তা।’

‘চিন্তার ব্যাপার নয়। জানতে কৌতূহল হয়, তাই জিজ্ঞেস করলাম। আসলে উপায় কিছু মাথায় আসছে না।’

‘আছে। একটা নয়, দুটো উপায়। প্রথমত নতুন কোনো রাস্তা আবিষ্কার করে ফেলতে পারি, দ্বিতীয়ত পথ তো জানাই আছে, যে পথে এসেছি! এ নিয়ে ভাবনার কিছু নেই তো।’

হ্যানস নৌকোটাকে সারাই বলতে লাগল। কাকা আমাকে বললেন, ‘হ্যানস, নৌকো সারাই করতে করতে, চলো দেশটা একটু ঘুরে দেখে আসি।’

আমি কাকার প্রস্তাবে রাজি হলাম। ঘুরতে বেরোলাম, তবে আমি হাতে নয়, বন্দুক ও পিস্তল সঙ্গে নিয়ে নিলাম। কাকার ত ভয় ডর কিছুই নেই। এখানে ঘুরতে ঘুরতে একটা মজার ব্যাপার নজরে পড়ল, ছায়া বলে এখানে কিছু নেই। কারণ, যাকে আমরা আলো বলে দেখছি, নির্দিষ্ট কোনো উৎস তো তার নেই। কুয়াশা বা মেঘেরও অস্তিত্ব তো নেই এখানে। যে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ছে তা সর্বত্র সমভাবে বিকীর্ণ।’

মাইলখানেক পথ পেরিয়ে আমরা এক জায়গায় পাইন, পাম, ইন্ড, সাইথ্রেস প্রভৃতি গাছের সমারোহ দেখতে পেলাম। তবে ওপরের পৃথিবীর গাছের আকারের সঙ্গে এদের যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য রয়েছে। গাছগুলো কেমন যেন বেটে বেটে। সূর্যালোক থেকে যে রঙের উৎপত্তি হয়, এখানে তার অভাব। এখানকার গাছ-লতা-পাতা সবই কেমন যেন ধূসর রঙ বিশিষ্ট। ইঠাৎ করে দেখলে মনে হয়, পুরো বনটাই বুঝি শুকিয়ে গেছে।

একসময় আমাকে থমকে দাঁড়াতে হল। অনন্যোপায় হয়ে কাকার হাত ধরে নিঃশব্দে টেনে ধরলাম। একদল বিশালাকার স্থলজ জানোয়ারই আমার এই আকস্মিক আতঙ্কের কারণ। একদল হাতিকে দূর থেকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ওপরের পৃথিবীতে হাতী ত অনেকই দেখেছি। কিন্তু এরা যে আকারের, তা পৃথিবীর ওপরের হাতির চেয়ে অনেক গুণ বড়। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না। আমাদের থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরের একটা প্রাণীল দিকে কাকা অঙুল নির্দেশ করলেন। সেদিকে তাকাতেই আমার চক্ষুস্থির। প্রাণীটা অতিকায় একটা মানুষের মতো দেখতে। মানুষের মতো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই রয়েছে বটে। কিন্তু পৃথিবীর ওপরের মানুষের চেয়ে আকারে পাঁচ-ছয় গুণ ত হবেই। লম্বায় বার ফুটের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়।

ভয়ে আমার হাত পা পেটের মধ্যে সিঁথিয়ে যাবার উপক্রম। সে আমাদের দেখে ফেললে নির্যাত তেড়ে আসবে। প্রাণভয়ে বন্দুক পিস্তল ব্যবহার করতেই হয়ত ভুলে যাব।

আমি পালিয়ে যাবার চিন্তা করলাম। কাকাও আপত্তি করলেন না। দৈত্যটার হাতে প্রাণ দিলে, বাঞ্ছিত কাজ হাসিল করবে কে এটাই হয়ত ভাবলেন।

মুহূর্তও দেরি না করে আমরা পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করলাম। হাঁপিয়ে গেছি! কাকাও ক্লান্ত। সমুদ্রের কাছাকাছি নিরাপদ স্থানে বিশ্রামের জন্য দাঁড়লাম। কাকা সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমি পায়েচাির করতে করতে একজায়গায় থমকে দাঁড়লাম। বড় একটা পাথরের গায়ে কী যেন গভীরভাবে খোদাই করে লেখা দেখলাম। সেটার দিকে কাকার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। রিউনিক ভাষায় দুটোমাত্র অক্ষর লেখা রয়েছে। ‘এ, এস।’ আর্নে স্যাকনুসেম নামের দুই অংশের আদ্যক্ষর, কী বলো? কাকা আমাকে লক্ষ করে বললেন।

আমি মুচকি হেসে তাঁকে সমর্থন করলাম।

আমরা নিঃসন্দেহ হলাম, আর্নে স্যাকনুসেম তবে এ-পর্যন্ত এসেছিলেন। আর এটাও সত্য। এ-পর্যন্ত এসে অবশ্যই ফিরে যান নি। অতএব তার গতিপথের চিহ্ন ধারে কাছে কোথাও পাওয়া যাবে, সন্দেহ নেই। শুরু হল তল্লাশি পর্ব। অক্ষর দুটো যেখানে লেখা তারই পাশে একটা গুহামুখ পাওয়া গেল। এ গুহা দিয়ে কোথায় যাওয়া যাবে? ভূকেন্দ্রে কি? দ্বিধা ছন্দে পড়লাম।

আমাদের শরীরে কেমন একটা উত্তেজনা ভর করেছে। কাকার চোখে মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি—‘আমরা তো ভূকেন্দ্রের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি!’

গুহার ভিতরটা প্রায় অন্ধকার। খুবই হালকা আলো। কোনরকমে পা টিপে টিপে চলা যায়। দশ ফুটের কাছাকাছি যেতেই থমকে দাঁড়াতে হল। গুহাতল থেকে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে একটা পাষাণ প্রাচীর। মহা সমস্যায় পড়লাম। ভাবলাম, স্যাকনুসেম এ পথে এলে এই প্রাচীর উপকালেন কী করে? তবে কি স্যাকনুসেম ফিরে যাবার পর পাহাড়ের ধ্বস নামার ফলে পাথরটা এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে? প্রাচীর ভাঙতে হবে।

হ্যানস কী বলে, জানা দরকার। আমরা ক্ষিপ্ত পায়ে তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। নৌকো মেরামত সেরে সে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে, দেখলাম। মালপত্র নৌকায় তুলে আমরা আধঘণ্টার মধ্যেই সেই জায়গাটায় নৌকো ভেড়লাম, যেখানে পাথরের গায়ে আর্নে স্যাকনুসেমের স্বাক্ষরযুক্ত পাথরটা দেখে গিয়েছিলাম। আমাদের পথনির্দেশ দেয়ার জন্য সে কতগুলো বছর আমাদেরই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে, কে জানে। কঠিন কঠোর সেই বাধার প্রাচীরটা হ্যানসকে দেখালাম। সে পাথরটার গায়ে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, কিছু শোনা যায় কিনা? না, কোনো শব্দই কানে এল না।

প্রাচীর ভাঙতেই হবে। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে হ্যানস কুড়াল দিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগল। তার পেশীবহুল হাত দুটো হাতির বল ধরে। কিন্তু হায়! গ্রানাইটের গা থেকে একটা টুকরাও খসাতে পারল না সে। সেই মুহূর্তে ভূকেন্দ্রে নামার তিলমাত্র উৎসাহও আমার মনে জাগাতে পারল না। এখন ভাবছি, স্যাকনুসেমের স্বাক্ষরটা না

দেখলেই বরং ভালো ছিল। অনুতাপের সময় এটা নয়। কাকা আমার মতো উদ্যম হারালেন না। পাথরটাকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত হলেন। আমি আমচকা বলে উঠলাম—‘কুড়োল-শাবলে যখন হলই না, এক কাজ করলে কেমন হয়? বারুদ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া যাক।’ আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কাকা সোদাসে এক লাফ দিয়ে বললেন, ‘বাঃ! চমৎকার বুদ্ধি তো! সত্যি চমৎকার বলেছ!’

কাকার নির্দেশে হ্যানস আর আমি শাবল দিয়ে প্রাচীরটার তলায় খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম। কপালগুণে এখানকার পাথর বেশ নরম দেখলাম। বালি ও কঁাকর মেশানো। আমাদের সেই ভাবনাটাই হয়ত ঠিক। স্যাকনুসেম যখন এসেছিলেন তখন পাথরটা এখানে ছিল না। পরে যে-কোনো প্রাকৃতিক কারণে এটা হড়কে এসে পথরোধ করেছে। আমাদের উভয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ হল। এবার পেট্রোলে সলতে ভিজিয়ে বসিয়ে দেয়া হল। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে বারুদ ঠেসে দেয়া হল। কাকার ইচ্ছে, নিজে হাতে পলতেটাতে আগুন দেবেন। আমি কিন্তু দাবি ছাড়লাম না। পরিকল্পনাটা আমার, সুড়ঙ্গও আমি খুঁড়েছি। বাকি কাজটুকু অন্য কাউকেই করতে দিতে আমি রাজি হলাম না।

আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছি। সলতেটাতে আগুন দেয়ার সময় যতই সতর্ক হই না কেন, বিস্ফোরণের সময় দুর্ঘটনা ঘটতে কতক্ষণ! যদিও পলতেটার একটা প্রান্ত বারুদের গাদায় ঠেসে দিয়ে অন্য প্রান্তটা সমুদ্রতীরে অন্তত একশো ফুট দূরে। শব্দে বেয়ে বারুদ পর্যন্ত আগুন যেতে দশ মিনিট সময় ত লাগবেই। ইতোমধ্যে আমরা তিনটে দাঁড় টেনে সমুদ্রতীরে থেকে অনেকটা দূরে পৌঁছাতে পারব।

সলতেটার প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করেই আমি এক লাফে নৌকায় গিয়ে উঠে গেলাম। হ্যানস ও কাকা দাঁড় ধরে বসেই ছিলেন। কাকা দাঁড় টানছেন বটে, চোখ কিন্তু তার ব্যারোমিটারের ওপর। প্রতিটা সেকেন্ড ও মিনিটের ওপর কড়া নজর রাখছেন।

আমরা অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছি। আশ্চর্য! বিস্ফোরণের শব্দ কানে গেল না মোটেই। দেখলাম, চোখ ছানাবড়া হবার উপক্রম। মুহূর্তে পাহাড়টার চেহারাটাই গেল বদলে! দুটো পাশে ফাঁটল দেখা দিল। শোবার মত একটা অংশ ওপরে উঠে গেল। পর মুহূর্তেই আবার বিটক আওয়াজ করে নিচে পড়ে গেল। ফাটলের জায়গায় প্রশস্ত একটা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল। আর সমুদ্র ভীষণ ক্ষেপে গেল? আকাশছোয়া ঢেউ, পিলে চমকানো তর্জন গর্জন। মুহূর্তে আমাদের ডিঙিটাকে ভালগাছ সমান উঁচুতে তুলে নিল। পর মুহূর্তেই মনে হল সেটা যেন সোজা পাতালের দিকে নেমে যাচ্ছে। বিস্ফোরণের ফলে প্রশস্ত একটা প্রণালী তৈরি হয়ে গেল। সেই বাধার প্রাচীরটা ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে হয়ে জলের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগল। আমাদের ডিঙিটাও জলের টানে দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, স্যাকনুসেম এপথেই পাতাল নেমেছিলেন। তিনি কিন্তু একাই নেমেছিলেন। আর আমরা! পুরো সমুদ্রটাকে সঙ্গে নিয়ে ছুটেছি উদ্ধার বেগে। আমাদের খাবার দাবার, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও লোটাকল্ল সব জলের টানে কোথায় তলিয়ে আছে, কে জানে? এই মুহূর্তে সেগুলো তো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। মৃত্যু যাদের শিরে তাদের তো কোন কিছুই দরকার থাকার কথা নয়।

কিন্তু এ কেমন হল? আমাদের নিম্নগতি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল যে! ডিঙিটা যে নিচল নিথরভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে! মনে কত প্রশ্নই জাগল—এই কি সেই ভূকেন্দ্র? এতকাল কি শুকনো খটখটে ছিল? আমাদের বোকারিম ফলেই কি এখানে জলরাশি সঞ্চিত হয়েছে!

কাকাকে প্রশ্ন করতে যাব, অমনি অবিস্বাস্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল আমাদের ডিঙির তলা। সেখানকার জল টগবগ করে ফুটতে লাগল। উত্তণ্ড জল সোজা উপরে উঠে আমাদের ডিঙিটাকে আঘাত করতে লাগল। দু-চারটে পাথরও নৌকোর তলায় ঘা মারছে মনে হল। আমি বিড় বিড় করে বললাম, ‘ভূমিকম্প শুরু হ’ল নাকি!’

কাকা কথাটা ঠিকই লক্ষ করেছেন। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আরে ভূমিকম্প বলছ কি! নিশ্চয়ই এটা কোন সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতেরই ফল। বড়ই আপশোস রয়ে গেল এ্যাব্রেল, ভূকেন্দ্রের এত কাছে পৌঁছে ও তাকে স্পর্শ করার সৌভাগ্য তেকে বঞ্চিত হলাম! আমচকা জলের স্পর্শ পেয়ে আগ্নেয়গিরিটা গলিত লাভা উদগীরণ করতে শুরু করেছে। জল আগুনের মতো গরম, বাতাসও গরম। গায়ে ফোঁস পড়ার উপক্রম। তিন দিন তিন রাত্রি আগুনের কুণ্ডে দগ্ধ হয়ে একসময় নৌকাসহ আমাদের উড়িয়ে নিয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এক টিলার ওপর ফেলল। একসময় সংজ্ঞা ফিরে পেলাম। গিরিশৃঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি গড়াতে গড়াতে এলাম। এক মেঘপালককে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আগ্নেয়গিরিটার নাম স্ট্রোবলি।

দ্য লাইট হাউস এ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড

উত্তাল উদ্‌গম ইগোর উপসাগর। উপসাগরের বুকে একটি বিশালায়তন জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। জাহাজের নাম 'সাঁতা-ফি'।

জাহাজের ডেকে কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কী করছে লোকগুলো? ব্যাপার কিছু অনুমান করার আগেই পর পর তিন বার কামান গর্জন করে উঠল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই মাতুলের উগায় উঠে গেল আমেরিকান রি-পাবলিকের জাতীয় পতাকা।

জাহাজ থেকে কামানের তীব্র গর্জন বাতাসে ছড়িয়ে যেতেই বাতিঘরের বন্দুক গর্জে উঠল। দুজন আলোকরক্ষী অত্যাঙ্ক আলো হাতে সমুদ্র সৈকতে এসে দাঁড়াল। অভিনন্দন জানাল তাদের হাত উঠিয়ে।

আবার দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল স্টেটন আইল্যান্ড দ্বীপের বুকে। তিনজন আলোকরক্ষীই দ্বীপে ছিল। একজনের ওপর বাতিঘর আগলানোর দায়িত্ব। অন্য দুজন উজ্জ্বল আলো হাতে সমুদ্রসৈকত ধরে পাঁয়চারি করছে। তাদের মধ্যে একজনের নাম ভ্যাসকুয়েজ বলল, অন্যজন ফিলিপ।

ভ্যাসকুয়েজকে লক্ষ করে ফিলিপ বলল, 'আগামীকাল সাঁতা-ফি নোঙর তুলছে।'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'আমি। আমার বিশ্বাস সাঁতা-ফি নিরাপদেই দেশে ফিরে যাবে। ভূমি কি বলো, ফিলিপ?'

আসলে এটা আমাদের ধারণা। মানুষ যা খুশি ভাবতে পারে, ফলাফল অনিশ্চিতই থেকে যায়। সমুদ্রের এ-অঞ্চলে এমন কোনো নিরাপদ আশ্রয় নেই যেখানে ঝড়ের মুখে পড়ে বিপদগ্রস্ত জাহাজ আশ্রয়লাভ করতে পারে। নাবিকরা এ-অঞ্চলের প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কথা ভালোই জানে। তা ছাড়া হর্ন অন্তরীপের আত্মগোপনকারী পাথরের প্রাচীরের কথাই বা কার না জানা আছে? অসতর্ক মুহূর্তে ধাক্কা লেগে অনেক জাহাজই তো সাগরের বুকে আশ্রয় নিয়েছে, টুকরো টুকরো হয়ে সাগরের তলদেশে জমা হয়েছে। তবে সে-সব দিন আজ আর নেই। স্টেটন আইল্যান্ডে এখন বাতিঘর বসানো হয়েছে। বিজ্ঞানসন্মত ব্যবস্থা। ঘূর্ণিঝড় যত প্রবল রূপ নিয়েই দেখা দিক না কেন, আলো নেভার সম্ভাবনা নেই। জাহাজগুলোকে আলো দেখিয়ে সেন্ট-দীপগম অন্তরীপ, সেন্ট-জি অন্তরীপ, বাফ্যালোস অন্তরীপের মতো মরণফাঁদের হাত থেকে জাহাজগুলোকে আজ বাঁচাতে পারবে।

ফিলিপ যখন প্রথম এই দ্বীপে চাকরি নিয়ে এল, জনমানবশূন্য এই দ্বীপে দিন কাটাতে হবে জেনে রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল। বিবর্ণ মুখে সবসময় গুম হয়ে বসে থাকত। পরে অবশ্য বাকি দুজন সঙ্গী আসায় হতাশা ভাবটা অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

'বলছি শোনো, চল্লিশটা বছর তো জাহাজের বিভিন্ন কাজে জলের ওপরই কাটিয়ে দিয়েছি। আজ বয়স হয়েছে, বুড়োর পর্যায়ে পড়েছি। অবসর নেয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। লাইট হাউসের রক্ষীর কাজ ছাড়া কী-ইবা করার আছে, বলো তো ফিলিপ? আর যে সে বাতিঘর তো নয়, পৃথিবীর একেবারে শেষ সীমানার 'বাতিঘর'। বুড়ো ভ্যাসকুয়েজ সহকর্মী যুবক ফিলিপকে উৎসাহ দিতে গিয়ে কথাগুলো বলল। আটলান্টিক মহাসাগরের জোয়ারের খ্যাতির কথা যে-কোন দেশের নাবিকমন্ডলের জানা আছে। কী তার উন্মাদনা! কী তার গগনবিদারী গর্জন! জলের গতিবেগও নাবিকদের মনে ভীতির সঞ্চার করে সন্দেহ নেই।

১৬০ অশ্বশক্তিতে বলীয়ান আর্জেন্টিনা নৌবাহিনীর জাহাজ সাঁতা-ফি। ২০০ টন মাল অনায়াসে বহন করতে পারে জাহাজটি। ক্যান্টেন লাফায়েৎ এবং ফেলটান্যান্ট রিগাল তো সর্বময় কর্তৃত্বে রয়েছেনই। পঞ্চাশজন নাবিকও জাহাজের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত। লেময়র প্রণালীর প্রবেশমুখে নির্মীয়মাণ বাতিঘরের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সরবরাহের জন্য এই জাহাজের ওপর আর্জেন্টিনা সরকার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাই তাকে বারবার স্টেটন আইল্যান্ডে যাতায়াত করতে হয়েছিল। বাতিঘর তৈরির কাজ ভালোভাবেই শেষ হল। প্রায় সপ্তাহ তিনেক আগে সাঁতা-ফি এ-দ্বীপে নোঙর করেছে। বাতিঘরের তিনজন কর্মীর চার মাসের উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে এবার বিদায় নেয়ার জন্য প্রস্তুত।

পৃথিবীর শেষসীমানার বাতিঘরটার এখন দায়িত্বে রয়েছে মরিস, ফিলিপ ও ভ্যাসকুয়েজ। ৩ ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি—তিন মাস বাতিঘরটার দায়িত্বে থাকবে। মাঠের শুরুতেই নতুন আলোকরক্ষী কাজে বহাল হবে।

মিনারের নিচেই আলোকস্তম্ভের দরজায় উঠে যাওয়া যায়। অগ্রস্তুত একটা সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়িপথ অন্ধকার নয়। গোটা দশক লুপহাল দিয়ে সূর্যের আলো এসে তাকে মোটামুটি আলোকিত করে। দেয়ালসংলগ্ন গ্যালারি। এতে বসে চারদিকের সমুদ্র দেখতে অসুবিধা হয় না। আলোকরক্ষীরা এখানে বসেই কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে।

পরদিন বিকেলে জাহাজ ছাড়বে। সকাল থেকেই নাবিকরা তৎপর হয়ে উঠল। গতরাতে 'সাঁতা-ফি'র ডেক থেকে কামান দাগার সঙ্গে সঙ্গেই বাতিঘরের আলোটা প্রথম জ্বলেছিল। বাতিরক্ষক ভ্যাসকুয়েজ ক্যান্টেন লাফায়েৎকে আশ্বস্ত করল, 'ছড়র বাতিটা ভালোভাবেই কাজ করছে, চিন্তা করবেন না।'

নির্জন-নিরীক্ষা দ্বীপে তিনজন বাতিরক্ষককে দিন কাটাতে হয়। কাজটা কিন্তু খুব সোজা নয়। তবে আলোকরক্ষীদের মধ্যে প্রত্যেকেই সমুদ্র সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। একদিক থেকে বিচার করলে জাহাজে পাখার খাঁটুনির তুলনায় কাযিক পরিশ্রম কম, স্বীকার করতেই হবে। তিনটা মাস টানা বিশ্রাম, এই আর কি।

আলোকরক্ষক তিনজন বিকেলের দিকে সমুদ্র-সৈকতে গিয়ে দাঁড়াল। একটু পরেই সাঁতা-ফি নোঙর তুলবে।

এক সময় সাঁতা-ফি'র বয়লার গর্জে উঠল। বাড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। লম্বা চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। সিটির আওয়াজ বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়ল। জোয়ার এলে নাবিকরা নোঙরা তুলে দিল। বিশালায়তন জাহাজ সাঁতা-ফি হেলেদুলে এগিয়ে চলল দূর সমুদ্রের দিকে। হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল আলোকরক্ষী তিনজন। আটটা বাজলে সাঁতা-ফি বিশাল সমুদ্রের বুকে পৌঁছে গেল। এবার সে সাঁ জুয়া অন্তরীপটা পাশ কাটিয়ে, পশ্চিমে রেখে এগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘরটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। সাঁতা-ফি'র ডেক থেকে কেবল তার আলোটাকে মিট মিট করে জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আলোকরক্ষীরা সামান্যতম আভাসও পেল না, তাদের জীবনে কী ভয়ানক বিপর্যয় অচিরেই নেমে আসবে।

আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আইল্যান্ডকে কেউ কেউ 'স্টেটেনল্যান্ড' নামে চিহ্নিত করে। দ্বীপটাকে হর্ন অন্তরীপ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া জাহাজ থেকে ছোট একটা কালো বিন্দু বলে মনে হয়।

এ-অঞ্চলে লেময়র প্রণালী নামে একটা প্রণালী আছে। এই প্রণালীই স্টেটেন আইল্যান্ড এবং দ্যোল ফুগো দ্বীপ দুটোকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তাদের উভয়ের মধ্যে দুরূহ পনের-বিশ মাইল। স্টেটেন আইল্যান্ডের পূর্বদিকে কেম্প ও সেন্ট অ্যান্থনি অন্তরীপ দুটো অবস্থিত। পূর্ব-থেকে পশ্চিমে দ্বীপটার বিস্তার উনচল্লিশ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে এগার মাইল। এর আশেপাশে প্রচুর সংখ্যক ডুবো পাহাড়ের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। তাই এদের দৌলতে প্রায়ই জাহাজডুবি হয়। সমুদ্র উপকূলের ধারে কাছেও বহু পাহাড় পর্বত আত্মগোপন করে রয়েছে।

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কয় মাস স্টেটেন আইল্যান্ডের গ্রীষ্মকাল! এ সময়ে মানুষ অবশ্য এখানে বাস করতেপারে। গ্রীষ্মকাল হলেও হাড়কাঁপানো শীত। দ্বীপটার এখানে ওখানে গভীর অরণ্যের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। গুয়ানাকো নামে এক বিশেষ জাতের হরিণ এখানকার অরণ্যে দেখা যায়। শরৎকালে গাছগাছালী বরফে চাপা পড়ে গেলেও তারা পাতা, মূল প্রভৃতি টেনে হিঁচড়ে তুলে এনে সেগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। এভাবে বরফের রাজ্যেও হরিণগুলো অস্তিত্ব বজায় রেখে চলে।

আসল দ্বীপটাকে দেখতে অনেকটা পাথরের টিলার মতো। এখানে প্রাণী বলতে স্থলভাগে কয়েক রকম পাখি ও রয়েছে জলে বিভিন্ন আকার ও রঙ বিশিষ্ট মাছ। দ্বীপটার স্বত্বাধিকারী হল রিপাবলিক অব-আর্জেন্টিনা আর চিলি। পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তে বাতিঘরটা তৈরি করে দিয়ে আর্জেন্টিনা সরকার পৃথিবীবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

এখানকার সমুদ্রে জাহাজের ছড়াছড়ি, কিন্তু ধ্বংসাত্মক ঝড়ের দাপাদাপি। এই মরণ-সমুদ্রে স্টেটেন আইল্যান্ডের বাতিঘরটা নাবিকদের বড়ই উপকারে আসবে সন্দেহ নেই।

দ্বীপটার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তার মাঝখান থেকে চারদিকে কিছুদূর পর্যন্ত মরুভূমি ছড়িয়ে পড়েছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই তিলে তিলে এটা গড়ে উঠেছে। এর সমতল অংশের প্রকৃতি অনেকটা তুল্লা অঞ্চলের মতো। শীতকালে বরফের পুরু আচ্ছাদন জমে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝড় বজ্রপাত, বৃষ্টির উৎসব সারা বছর লেগেই থাকে। সমুদ্রের তীরে সুউচ্চ পাহাড় মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে। কোনো নদী বা ঝর্ণার অস্তিত্ব এখানে নেই। গ্রীষ্মে বরফ গলে। বরফ গলা জলখানা খন্দে জমে গিয়ে বিস্তীর্ণ জলাশয় সৃষ্টি করে। জনমানবহীন এ দ্বীপে এসে একদল দস্যু আস্তানা গাড়বে, কেউ কোনদিন ভাবতে পেরেছে; নাকি বললেও বিশ্বাস করবে?

বিশালায়তন জাহাজ সাঁতা-ফি স্টেটেন আইল্যান্ড থেকে বিদায় নেবার পর তেমন কোনো লক্ষণীয় ঘটনাই ঘটে নি।

একদিন বিদায়ী সূর্য শেষ রক্তিম আভ্যুত্থান নিঃশেষে পশ্চিম আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দেবার জন্য উন্মুখ। দ্বীপের সর্বত্র আলো-আধারের খেলা শুরু হল! বাতিঘরের সমতল চাতালের ওপর বসে গল্প করছে ফিলিপ, মরিস আর ভ্যাসকুয়েজ—সাদ্ধা—মজলিসে মেতেছে। কথার ফাঁকে ভ্যাসকুয়েজ এক সময় বলল, 'কি হে, এই দ্বীপটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে বল তো?'

ফিলিপ ঠোটের কোণে হাসির রেখা টেনে বলল, 'সবে তো কয়েকদিন হল। ক্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার মতো সময় এখনো আসে নি। যাক না আরো কয়েকদিন, তার আগে নয়।'

মরিস তাকে সমর্থন করল—'হ্যাঁ, ঠিকই তো। মাত্র তো তিন মাস, চোখের পলকে কেটে যাবে। জাহাজের পাল যেমন চোখের আড়ালে চলে যায়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

ফিলিপ কপালের চামড়ায় কয়েকটা ভাঁজ ফেলে বলল, 'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি এ ক'দিনে একটা জাহাজও এ-পথে যেতে দেখলাম না!'

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'সবুরে মেওয়া ফলে। অচিরেই জাহাজ দেখতে পাবে। জাহাজই যদি না চলাচল করে তবে মিছে এ-বাতিঘরটা তৈরি করতে যাবে কেন, বল তো? তাছাড়া বাতিঘরটার কথা প্রচার হওয়াও তো দরকার।'

'সাঁতা-ফি বুয়নস এরিয়সে না পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ এর কথা জানতে পারবে না। তারপরই দেখতে দেখতে খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে।' ফিলিপ বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। ক্যাপ্টেন লাফায়েথের মুখে খবরটা শোনামাত্র কর্তৃপক্ষ খবরটা চাউর করে দেবে, ধরে নিতে পার।' ফিলিপকে সমর্থন করতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল।

মরিস বলল, 'পাঁচদিন হল সাঁতা-ফি নোঙর তুলেছে। সন্ধ্যাকালে মধ্য পৌঁছে যাবে।'

দ্বীপবাসী বাতিঘরের কর্মী তিনজনের মধ্যে বেশ কিছুদিন সাঁতা-ফি'র কথাই শুধু আলোচনা হচ্ছে, হবেও আরো কয়েকদিন।

বোলোই ডিসেম্বর। সে তারিখে রাত ছয়টা থেকে দশটা পর্যন্ত বাতিঘরের আলো জ্বলছে কিনা, দেখার দায়িত্ব বর্তাল মরিস-এর ওপর। পাঁচ-ছয় মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে একটা হালকা আলোর বিন্দু ফুটে উঠল। খুলে বলার দরকার হবে না, ওটা নির্ধাত একটা জাহাজ। বাতিঘর তৈরি হবার পর এটাই প্রথম জাহাজ।

মরিস তার সহকর্মী ভ্যাসকুয়েজ ও ফিলিপকে তাড়াতাড়ি ডাকতে গেল। উদ্দেশ্য—এই অবিস্ফাস্য ব্যাপারটা তাদেরও দেখাবে। দ্বীপজীবনের প্রথম জাহাজ কি না।

মরিস-এর ডাকে ফিলিপ ও ভ্যাসকুয়েজ ছুটে এল। সবাই পূর্বদিকের জানালার কাছে গেল, চোখে টেলিস্কোপ লাগিয়ে সমুদ্রের ওপর চোখ রাখল।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'আলোটা সাদা! স্টিমারের আলো বলেই মনে হচ্ছে।'

স্টিমারটা সাঁ জুঁয় অন্তরীপ দিয়ে এগোচ্ছে। বাতিঘরটা দক্ষিণ-পশ্চিমে রেখে ওটা লেময়র প্রণালীতে এগোতে লাগল। এক সময় সাদা আলোটা অধিকতর উজ্জ্বল হল লাল হয়ে দেখা দিল টেলিস্কোপ-এর কাঁচের গায়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা তাদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

'পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘরের সীমানায়-পড়া প্রথম জাহাজ এটা।' ফিলিপ সদম্বে বলল।

'প্রথম বটে, তবে শেষ জাহাজ অবশ্যই নয়।' ভ্যাসকুয়েজ মন্তব্য করল।

সে-দিন এ পর্যন্তই। পরদিন বিকেলে ফিলিপ পালতোলা বড় একটা জাহাজ দেখতে পেল। কুয়াশা থাকা সত্ত্বেও জাহাজটাকে দেখতে অসুবিধা হয় নি। সে সহকর্মী মরিস ও ভ্যাসকুয়েজকে বাতিঘরে নিয়ে গেল, উঁকি মারল জানালা দিয়ে। জাহাজটা এগিয়ে আসছে বটে, কিন্তু কোনদিকে বোঝা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারটা নিয়ে তারা তিনজন তর্কে লিপ্ত হল। শেষপর্যন্ত দেখা গেল মরিসই ঠিক বলেছে। সে দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করেছিল—'আমেরিকায় তৈরি দ্রুতগতি সম্পন্ন জাহাজ এটা। আয়তন বিশাল। আঠারো শ' টন মাল তো বইবেই। অবশ্যই এটা প্রণালী মুখে আসবে না।'

ভ্যাসকুয়েজ তার কথা মনতে রাজি নয়। সে বেশ গলা ছেড়েই বলল—'রাখ হে, তোমার আমেরিকা। জাহাজটা ন্যু ইংলন্ডের যদি না হয় আমার টেলিস্কোপটা ছুঁড়ে ফেলে দেব, কথা দিচ্ছি।'

আলোকরক্ষীদের তর্কের অবসান ঘটিয়ে জাহাজটা সংকেত-পতাকা উড়িয়ে দিল। জানা গেল তার নাম মন্ডাংক। আমেরিকার ন্যু-ইংলন্ডস্থ বোস্টন বন্দর থেকে এসেছে।

আলোকরক্ষীরাও আর্জেন্টিনার পতাকা উড়িয়ে স্বাগত জানাল। জাহাজটা ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল।

সমুদ্র আবার নির্জন। দূর সমুদ্রে দু-একটা পাল কেবল নজরে পড়েছিল, এই মাত্র। সবাই আমেরিকান বন্দরে গিয়ে নোঙর করবে। ভ্যাসকুয়েজ বলল—'তারা আন্টিকটিকা যাচ্ছে, মাছ ধরবে। বাতিঘরটাকে বেশ কয়েক মাইল দূরে রেখে আরো কয়েকটা জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের উদ্দেশ্যে চলে গেল।'

দেখতে দেখতে চলে এল বিশেষ ডিসেম্বর। এই কয়দিনের মধ্যে খাতায় টুকে রাখার মতো উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না। তবে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে দেখা গেল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ব্যাস বইতে লাগল! একুশে ডিসেম্বর সকালের দিকে ফিলিপ সমুদ্রের ধার দিয়ে পাশ্চাত্য করছিল। সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী ঘোপে একটা জানোয়ার দেখতে গিয়েছিল। প্রথম দর্শনেই সে চিনে ফেলল, 'বেশ বড়সড় একটা গুয়ানাকো! চোখের সামনে সুবাদু খাবার দেখতে পেলো কার না জিভে জল আসে? সে নিঃশব্দে বাতিঘরে গিয়ে সঙ্গীদের ডেকে আনল। কোনোরকমে শিকারটাকে বাগেড় আনতে পারলে অন্তত কয়েকদিনের জন্য নিশ্চিন্ত। জিভটাকে সুবাদু মাংসে একটু ভুগ করা যাবে খেয়ে। টিনের খাবার খেয়ে খেয়ে বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করল, ফিলিপ তৈরি হয়ে উপসাগরের পথে ওৎ পেতে থাকবে। আর মরিস বন্দুক নিয়ে পেছন থেকে তাকে তাড়া করবে।

তাদের সতর্ক করে দিতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'খুব সন্তর্পণে কাজ করতে হবে কিন্তু। মনে থাকে যেন, এসব জানোয়ারের ইন্দ্রিয়গুলো খুবই সজাগ। কোনোরকমে শিকারীর গন্ধ পেলেই হল, এমন ছুট দেবে যে, গুলি করে সাধ্য কার?'

ফিলিপ আর ভ্যাসকুয়েজ টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে গুয়ানাকোটাকে নজরে নজরে রাখতে লাগল। মরিস গাছের ফাঁক দিয়ে তাদের প্রস্তুতিপর্ব করতে লাগল। গুয়ানাকোটা তখনো নিশ্চিন্তে নিশ্চল নিখরভাবে দাঁড়িয়ে রইল। হতভাগা জানোয়ারটার বরাত নেহাৎই মন্দ! কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তো! মরিস তখনো গুলি চালাচ্ছে না কেন? ব্যাপারটা আরো অবাক করে দিল! একসময় গুয়ানাকোটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। টেলিস্কোপ চোখে রেখেই তারা বলাবলি করল—'কেমন হল, বন্দুকের আওয়াজ নেই, অথচ গুয়ানাকোটা হঠাৎ লুটিয়ে পড়ল যে!'

মরিস মুহূর্তের মধ্যে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল! নিশ্চল গুয়ানাকোটার দিকে মুহূর্তকাল অপলক চোখে তাকিয়ে থাকার পর ঊর্ধ্বদ্বারে ছুটতে শুরু করল। বাতিঘরের কাছাকাছি এসে সে গলা ছেড়ে সঙ্গীদের ডাকল।

মরিস-এর কাণে দেখে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'ফিলিপ, নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে, নইলে মরিস এমন উত্তেজিত হবে কেন!' কথা বলতে বলতে সে ফিলিপকে নিয়ে মরিস-এর কাছে হাজির হল। বিশ্বয় প্রকাশ করে সে বলল, 'মরিস, কি হয়েছে বল তো? তোমাকে এমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন? সেই গুয়ানাকোটাই বা কি হল?'

মরিস সংক্ষেপে জবাব দিল, 'চল। সেখানে গেলেই সব দেখতে পাবে।'

মরিস তাদের নিয়ে সেই মৃত গুয়ানাকোটার কাছ গেল। ব্যাপার দেখে তো আলোকরক্ষীদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। গুয়ানাকোটার গায়ে গুলির দাগ! ক্ষতস্থান থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে।

ভ্যাসকুয়েজ কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ প্রকাশ করে কোনোরকমে উচ্চারণ করল। তবে আমি ছাড়া এখানে আরো শিকারী রয়েছে?

স্টেটন আইল্যান্ডের পশ্চিম প্রান্তের উপকূলরেখা রীতিমতো স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মরিস, ফিলিপ ও ভ্যান্সকুয়েজ এদিকটা মোটেই মাড়ায় নি, কিছু জানেও না। জল ভেদ করে সমুদ্র থেকেই পাহাড় সোজা উঠে গেছে। এই অংশে সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য গুহা। কোনোটা বা উপরে খ্রিবা বিস্তার করে রেখে পাতাল পর্যন্ত নেমে গেছে। দ্বীপের কেন্দ্রস্থলের সমতল ভূমিতে যেতে হলে অন্তত দু-হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ভিড়িয়ে মাইল পনের পেরিয়ে তবে সমতলভূমির দেখা পাওয়া যায়। দ্বীপের এদিকটা এমনই ভয়ংকর যে, একটা বাতিঘর এখানেও তৈরি করা একান্ত দরকার। আর্জেন্টিনা সরকারের দেখাদেখি চিলি সরকারও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একটি বাতিঘর করলে করতেও পারেন।

অসুবিধা? হ্যাঁ, কারো কারো অসুবিধা তো নিশ্চয়ই রয়েছে। একই দ্বীপের দু-প্রান্তে দুটো বাতিঘর তৈরি করলে ডাকাত-দলের বেকায়দায় পড়তে হবে বৈকি। এখানকার ডাকাতদের উৎপাতের কথা তো নাবিকদের ভালোই জানা আছে।

এই তো কয়েক বছর আগের কথা। ইগোর উপসাগরের প্রবেশ মুখে এ ডাকাতের দলটা এখানে এসে আস্তানা গাড়ে। প্রয়োজনে লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত একটা গুহাও আবিষ্কার করে নিয়েছিল। স্টেটন আইল্যান্ডে কোনো জাহাজ দাঁড়ায় না, উৎপাত মোটেই নেই। তাই জায়গাটাকেই নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে বেছে নিল। দলপতির নাম কংগ্রি। দশ-বারজন ডাকাত নিয়ে তার দল। তাদের মধ্যে সারসাঁতে নামে এক অসীম সাহসী ও বলিষ্ঠ যুবক তার পার্শ্বচর, তার সব ব্যাপারে পরামর্শদাতা, সহায়ক। প্রায় সবাই দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী, আর্জেন্টিনার মাত্র চার-পাঁচজন। কংগ্রির দলে ভিড়ে সবাই জলদস্যুতে পরিণত হয়েছে। আর সারসাঁতে? চিলির অধিবাসী। চম্বিশের কাছাকাছি বয়স। দেখে হাতির শক্তি ধরে, গাধার মতো খাটতেও পারে। এমন কোনো অপরাধ নেই যা তার দ্বারা সম্ভব নয়।

জলদস্যু দলের মাতব্বরের পূর্ব পরিচয়? তার সম্বন্ধে, বিন্দু-বিসর্গও কেউ জানে না। তার নাম কংগ্রি কিনা নিশ্চিত করে বলা কঠিন।

কুখ্যাত জলদস্যু কংগ্রির কথা জানে না এমন লোক এ অঞ্চলে কেউ আছে বলে সন্দেহ।

এবার অল্পকথায় সেরে নিচ্ছি, কংগ্রি কি করে সাকরেদদের নিয়ে এখানে এসে ঘাটি গেড়েছে। ফাঁসির দড়িতে ঝুলবার মতো বহু কুকাজ করে কংগ্রি ও তার সাকরেদ সারসাঁতে মাগেলান প্রণালীর প্রধান বন্দর থেকে পাליয়ে টিরা দ্যোস ফুগোয় গিয়ে উঠেছিল। সেখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার সময় এ-অঞ্চলের ঘন ঘন জাহাজডুবির কথা শোনে। স্টেটন আইল্যান্ডের ধারে কাছে প্রচুর জাহাজডুবি হয়েছে, আর সেই সব জাহাজের মূল্যবান সম্পদ নির্ধাৎ সমুদ্রের তলদেশে সঞ্চিত রয়েছে। এরকম চিন্তা করে কংগ্রি আর সারসাঁতে স্থানীয় কিছু গুণ্ডা প্রকৃতির লোক নিয়ে জলদস্যু দল গড়ে তুলল।

ছোট একটা নৌকো নিয়ে স্টেটন আইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে সদলবলে রওনা দিল কংগ্রি। বিধি বাম! লেময়র প্রণালী পাড়ি দেবার সময় কলনেট অন্তরীপে পৌঁছেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ল দলটা। কোনোরকমে ধাক্কা মেরে সেই ছোট নৌকোটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কোনোরকমে পিতৃদণ্ড প্রাণটুকু রক্ষা পেল। এবার শুরু হল পায়ে হাঁটার পালা। হাঁটতে হাঁটতে কংগ্রি শেষপর্যন্ত ইগোর উপসাগরের তীরে পৌঁছে গেল। সাঁ জুয়া অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার সমুদ্রতল থেকে যাবতীয় সম্পদ তারা উদ্ধার করল। অগণিত সোনালুপার পিণ্ড, মূল্যবান অন্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, পিস্তল, বাজ্র বাজ্র গুলি বারুদ প্রভৃতি লাভ করে তারা সহজেই দলটাকে শক্তিশালী করে তুলতে সক্ষম হল।

আসলে স্টেটন আইল্যান্ডের ধ্বংসাত্মক ঝড়ের কথা বহু নাবিকের জানা ছিল না। যে কয়টা জাহাজ এ-মুখো হয়েছে, কেউ অব্যাহতি পায় নি। চোরাপাহাড়ের ধাক্কা খেয়ে নির্মমভাবে ধ্বংস হয়েছে। কংগ্রি সাকরেদদের নিয়ে উপসাগরের মাঝখানে আশ্রয় না নিয়ে সাঁ জুয়া অন্তরীপের ওপর নজর রাখার জন্য প্রবেশপথের কাছাকাছি ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে থাকে। বিশাল গুহার ভেতরে তাদের যাবতীয় মালপত্র জমা করে রাখল। কংগ্রিক ইচ্ছা ছিল কোনোরকমে একটা জাহাজ দখল করা। সম্ভব হলে মালপত্র ও সাকরেদদের নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একটি দ্বীপে গিয়ে ঘাঁটি গাড়বে। সুযোগের অভাবে আজো স্টেটন আইল্যান্ডেই পড়ে রয়েছে।

দু-দুটো বছর ধরে লুণ্ঠরাজ চালিয়ে তারা অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছে। জাহাজডুবির ফলে কম সম্পদ হাতায় নি কংগ্রি। কিন্তু এত চেষ্টা করলেও তারা একটা জাহাজও দখল করতে পারল না। তাই অনন্যোপায় হয়েই তাকে স্টেটন আইল্যান্ডে পড়ে থাকতে হচ্ছে। নিত্যকারের মতো সেদিনও সে সারসাঁতেকে বিষণ্ণ মুখে বলল, 'সারসাঁতে, যেমন করেই হোক, এ-জায়গা আমাদের ছাড়তেই হবে।'

সারসাঁতে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু কি করে, বলবে কি?'

এর জবাব কংগ্রির জানা নেই। সে গোমড়ামুখে বসে রইল।

দলপতি নীরব দেখে সারসাঁতে এবার বলল, 'কিন্তু সমস্যা হয়তো দেখা দেবে রসদ নিয়ে। দ্বীপের মাছ আর শিকার আজ না হোক কাল ফুরবেই। তার ওপর শীত আসছে। হাড়-কাঁপানো শীতে হয়তো জমে বরফই হয়ে যেতে হবে।

কংগ্রি তবুও নিরুত্তর রইল।

এ কাহিনী শুরু হবার বছর দেড়েক আগের কথা। সেটা ছিল আঠারো শ' আটানু খ্রিস্টাব্দ। সে বছর অক্টোবরের প্রথম দিকে দ্বীপে একটি জাহাজ এসে নোঙর করল। আর্জেন্টিনার পতাকা মাতুলে উড়ছিল। কংগ্রি ও তার সাকরেদরা এটাকে যুদ্ধ-জাহাজ ভাবল। তাই ভীত-সন্ত্রস্ত মনে তড়াতিড়ি গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল। জাহাজটা ফিরে না যাওয়া অবধি গুহা থেকে বেরুনের প্রশ্নই ওঠে না। আশা করি না বললেও চলবে, জাহাজটা ছিল সাঁত-ফি। দ্বীপে বাতিঘর তৈরির উদ্দেশ্যেই তার আগমন। প্রারম্ভিক কাজটুকু সেরে জাহাজ এখান থেকে বিদায় নিল। কংগ্রি তার সাকরেদদের নিয়ে ধরা

হোয়ার বাইরেই রয়ে গেল। একদিন রাতের অন্ধকারে সারসাঁতে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে জাহাজটার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। লোকজনদের কথাবার্তা যেটুকু কানে গিয়েছিল তাতে এটুকুই বুঝেছে, এখানে একটা বাতিঘর তৈরি হতে চলেছে।

সারসাঁতের মুখে বাতিঘর তৈরির কথা শুনে কংগ্রি রীতিমতো আতঙ্কে উঠল। সে বুঝে নিল, এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতেই হবে। কিন্তু যাবেই বা কোথায়? সামনে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র প্রতিনিয়ত ফুঁসছে। গতান্তর না দেখে সে সাকরেদদের নিয়ে আইল্যান্ডের পশ্চিমদিকের গুহায় গিয়ে মাথা গুঁজল। মালপত্র সব সঙ্গে করে নেওয়ার সুযোগ না পাওয়ায় তখনকার মতো গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আবার সাঁতা-ফি বাতিঘর তৈরির কাজ সরঞ্জাম ও লোকজন নিয়ে দ্বীপে হাজির হল। গড়ে উঠল আকাশচুম্বী বাতিঘর।

গুহার ভেতরে বসে কংগ্রি অপেক্ষা করতে লাগল, কবে বাতিঘর তৈরির কাজ সেরে সাঁতা-ফি নোঙর তুলবে। তারপরেই সে নিজ মূর্তি ধারণ করবে।

কংগ্রি মোটামুটি একটা হিসাব করে নিল, বাতিঘর তৈরির কাজ ডিসেম্বর মাসের দিকে শেষ হবে। কাজ সেরে সাঁতা-ফি বন্দর ছেড়ে গেলে আলোকরক্ষীরা একা হয়ে পড়বে। নয়ই ডিসেম্বর সারসাঁতে খবর নিয়ে গুহায় ঢুকল—সাঁতা-ফি বন্দর ছেড়ে গেছে।

তারপরই সেই শিকারের ঘটনা। সারসাঁতে সেদিন গুয়ানাকোটাকে গুলির ঘায়ে আহত করল। আহত জানোয়ারটা কাৎরাতে কাৎরাতে এসে ধরাশায়ী হল। এটাকে দেখেই সেদিন ভ্যাসকুয়েজ ও অন্যান্যরা নিঃসন্দেহ হয়েছিল, দ্বীপে তারা ছাড়াও মানুষ বাস করে।

কংগ্রি সিদ্ধান্ত নিল, সাকরেদদের নিয়ে বাইশে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রওনা হবে। চব্বিশে সন্ধ্যায় বাতিঘর দখল করবে। ব্যস, পূর্বগুহায় মালপত্র স্থানান্তরিত করার কোনো সমস্যাই থাকবে না।

এদিকে সাঁতা-ফি ফিরে গিয়ে অবশ্যই বাতিঘর তৈরি হয়ে গেছে, প্রচার করবে। অতএব একটা জাহাজ পাওয়া আর অসুবিধা হবে না। জাহাজ পেলে আর এখানে পড়ে থাকতে যাবে কে? সটান প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো দ্বীপে গিয়ে হাজির হবে। পর মুহূর্তে এ-ও ভাবল, যদি কিছুদিনের মধ্যে কোনো জাহাজ না ভিড়ে? সাঁতা-ফি যদি ইতিমধ্যে ফিরে আসে? বাধ্য হয়ে গুটি গুটি এ গুহায়ই ফিরে আসতে হবে।

কংগ্রি তার সাকরেদদের নিয়ে বাইশে ডিসেম্বর বাতিঘর দখলের উদ্দেশ্যে রওনা দেবার পূর্ব মুহূর্তে দূর সমুদ্রে একটা কালো মতো কি যেন দেখতে পেল।

সারসাঁতে সমুদ্রের বুকে ভাসমান বহুটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। এক সময় আপন মনে বলে উঠল—‘জাহাজ! নির্ধাৎ গুটা একটা জাহাজ! কয়েক মুহূর্তে পরে আবার বলল, ‘একটা কুনারের মতো মনে হচ্ছে। এদিকেই তো এগোচ্ছে।’

কংগ্রি বলল, ‘হ্যাঁ, কুনারই বটে! দেড়-দু-শ’ টনের একটা কুনার। তোমরা শোন, কিছুতেই এ-সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। যেন তেন প্রকারে কুনারটা দখল করা চাই। আর একটা কথা, রাত্রির অন্ধকারে গুটা প্রণালীর ভেতর ঢুকতে পারবে না। আমাদেরও সকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে হবে।’

পাখির ডাকে সকাল হল। কংগ্রি গুহার বাইরে বেরিয়ে দেখল, বার্খোলোমিউ অন্তরীপের পাহাড়ের পাদদেশে কুনারটা দাঁড়িয়ে।

কংগ্রির জাহাজ সন্ধ্যে খুবই অভিজ্ঞতা আছে। আর তার পার্শ্বচর সারসাঁতে? সেও একাজে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে হাত পাকিয়েছে। তারা উভয়েই একই সঙ্গে জাহাজের কাজ নেয়, দস্যুবৃত্তিও শুরু করে একই সঙ্গে।

কংগ্রি বুঝল, কুনারটা বালির চড়ায় আটকা পড়ে গেছে। বাতাসের গতি পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত স্ববিরের মতো এখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তবে রাতের আগে আর তা হবার নয়।

জাহাজের ক্যাপটেন একসময় দেখলেন, জাহাজটা হাওয়ার টানে পাহাড়ের দিকে ছুটে চলেছে। উপায়ান্তর না দেখে তিনি নৌকো নামিয়ে দিয়ে যাত্রীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রী বোঝাই নৌকাটাকে সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব কোণে ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে দেখা গেল। অথচ যাত্রীরা জাহাজে থাকলে হয়তো নিরাপদেই থাকত। নিয়তিই তাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পাঠিয়েছে। ফ্রাংকলিন উপসাগরের দিকে তীরবেগে ছুটে চলেছে একটা কুনার।

কংগ্রির দল কুনার-এর দিকে এগোতে লাগল। পূর্ণ জোয়ার, অসুবিধার কিছু নেই। মাত্র তো আধ মাইল খানেক পথ, কয়েকটা মাত্র টিলা পার হতে হবে। কংগ্রি সদলবলে কুনার-এর কাছে হাজির হল। সে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে সোদােসে বলল, ‘এটার তলায় যদি ছিদ্র না হয়ে থাকে তবে এতে ভালোভাবেই আমাদের কাজ মিটবে। তবে দু-একটা ছিদ্র হলেও সারিয়ে নেওয়া যাবে, বেশি কিছু হলেই সমস্যা।’ জাহাজটা ভালোভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলল, ‘না’ আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, দেখছি। যাক, বাঁচা গেল।’

কংগ্রি অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর সদলবলে কাৎ করে থাকা জাহাজটায় চুপিচুপি উঠে পড়ল। সে সটান ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে জাহাজ সম্পর্কিত কাগজপত্র হাত করল।

ভ্যালপারসিয়োর চিলির একটি কুনার এটা—এর নাম মউল। জাহাজটা তেইশে নভেম্বর ফকল্যান্ড আইল্যান্ডে যাচ্ছিল। হর্ন অন্তরীপ পেরিয়ে লেমিয়র প্রণালীতে ঢুকতে গিয়ে স্টেটন আইল্যান্ডের বালিয়াড়িতে আটকা পড়ে যায়। মউল-এর সাহায্যে কোনোরকমে এখান থেকে পাড়ি দিতে পারলেই কংগ্রির ইচ্ছা পূরণ হবে।

কংগ্রি সারসাঁতেকে লক্ষ্য করে বলল, ‘জাহাজের ক্যাপ্টেনসহ নৌকো নিয়ে সবাই অঁথে সাগরে পাড়ি দেওয়া ভালোই হল। খালি জাহাজটাই পেলাম আমরা।’

সারসাঁতে সোন্দ্রাসে বলল, 'এবার আমাদের একমাত্র চিন্তা, পূর্ণ জোয়ার কখন আসবে। কিন্তু জোয়ার এলে আমাদের প্রথম কাজ কি হবে বলত?'

কংগ্রি বলল, 'নিয়ে যাব শুহটার কাছে। ধনরত্ন যা কিছু আছে, সবই জাহাজে তুলে নেব।'

জোয়ার শুরু হয়েছে। আড়াই ঘণ্টা পরে পূর্ণ জোয়ার আসায় মোচার খালের মতো জাহাজটা জলের ওপর ভেসে উঠল। বাস, আর কথা নেই, কংগ্রি সোন্দ্রাসে নোঙর তোলার হুকুম দিল। সারসাঁতে জাহাজ চালাতে ওস্তাদ, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। জাহাজ কেঁপে উঠল। বালিয়াড়ি থেকে বেরিয়ে এল বিশালায়তন জাহাজ মউল।

বেশি সময় লাগল না। আধঘণ্টার মধ্যেই জাহাজটাকে সে গুহার কাছে গিয়ে ভেড়াল।

কংগ্রি এবার জাহাজটাকে ভালোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত হল। বলা যায় না, কোনোরকম মেরামতের দরকার হতে পারে। এখনই সেরে নেওয়া দরকার। ছোটখাট ত্রুটি দেখা গেল। মেরামত করতে দিন সাতেক তো লাগবেই। ঠিকমত মেরামত না করলে মউলকে নিয়ে অথৈ সাগর পাড়ি দেবার চিন্তা পাগলের খেয়াল মাত্র। সাকরেনদের মধ্যে একজন বলল, 'হুজুর, সামান্য যা ত্রুটি রয়েছে, অসুবিধা হবে না। এখানে জাহাজ সারানো অসুবিধা; উপযুক্ত স্থান না হলে—'

কংগ্রি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ইগোর উপসাগরে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাতে আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। তোমরা মনে রেখ, আমরা শুধুমাত্র দ্বীপের অভ্যন্তরে গা ঢাকা দেবার বদলে সোজা সমুদ্র-পথে পাড়ি জমাচ্ছি।'

কংগ্রি যাত্রার প্রস্তুতির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মালপত্র তোলার কাজ ইতিমধ্যেই মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল সমুদ্রের বুকে। ধীর-মধুর গতিতে মউল এগিয়ে চলল। দশ মিনিটের মধ্যেই খাড়া থেকে বেরিয়ে স্কনার সমুদ্রে ঢুকল। অনুকূল হাওয়ায় বার্থোলোমিউর পাহাড় ঘুরে পূর্বদিকে চলল সে। কংগ্রি হয়তো সন্ধ্যার আগেই ইগোর উপসাগরের প্রবেশ-পথে পৌঁছে যেতে পারবে।

পথে কোনো জাহাজই দেখতে পেল না জলদস্যুরা। সন্ধ্যার দিতে তারা ওয়েবস্টার অন্তরীপের পূর্ব দিকে পৌঁছল। কংগ্রির নির্দেশে উপকূল থেকে কিছুটা দূরে স্কনারটা দাঁড় করাল সাকরেনদরা। পূর্ব আকাশে দেখা দিল রক্তিম ছোপ। জাহাজের নোঙর তোলার ব্যবস্থা করল! জোয়ারের টানে তরতর করে এগিয়ে চলল বিশালায়তন জাহাজ মউল।

তারা রজম উপসাগরের মুখে যখন পৌঁছল তখন ঘড়িতে দশটা বাজে। বিকাল চাটে নাগাদ কংগ্রি দেখল, জাহাজটা লক্ষ্যস্থল পেরিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে গেল। সর্বনাশ; জাহাজের মুখ ঘোরাতে হয় যে! ইগোর উপসাগরের দিকে জাহাজ চালাতে হুকুম দিল কংগ্রি।

জাহাজের ক্যান্টেনের ঘরে কংগ্রি একটা টেলিস্কোপ পেয়েছিল। সে সেটাকে চোখে লাগিয়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতি-ঘরটার দিকে চোখ রাখল। টেলিস্কোপে ধরা পড়ল, আলোকরক্ষীদের একজন। আলোকরক্ষীরাও অভ্যাসমত টেলিস্কোপের সাহায্যে সমুদ্রের ওপর নজর রাখতে গিয়ে মউলকে দেখতে পেল। তারা ধরে নিল, জাহাজটা ফকল্যান্ড দ্বীপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। স্টেটন আইল্যান্ডই তার গন্তব্যস্থল। আলোকরক্ষীরা মউলকে দেখতে পেল কিনা, এ নিয়ে তার তিলমাত্রও চিন্তা নেই। দেখতে পেলেই বা কি? তারা যে ধরা-ছোয়ার বাইরে।

এতক্ষণ মউল নির্বিঘ্নেই পথ প্যাড়ি দিচ্ছিল। কিন্তু এখন? পদে পদে বিপদের ইঙ্গিত। চোরা-পাহাড় চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যে-কোনো সময় পাহাড়ে ধাক্কা লেগে জাহাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে। যে কথা, সেই কাজ। নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার পূর্ব মুহূর্তে দস্যুদের একজন চোঁচিয়ে উঠল—'জাহাজ ফুটো হয়ে গেছে! জল উঠছে!'

হ্যাঁ, ফুটো হয়েছে ঠিকই। কিন্তু খুবই ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সহজেই মেরামত করে ফেলা গেল।

মউল সন্ধ্যা ছয়টায় ইগোর উপসাগরের প্রবেশ-পথে এসে পৌঁছল। সাড়ে ছয়টায় বাতিঘরের আলো জ্বলে উঠল।

বাতিঘরের নিশানা লক্ষ্য করে মউল মধুর গতিতে তীরের দিকে এগিয়ে চলল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন হাত নেড়ে স্বাগত জানাল মউলকে। এরা কারা? আলোকরক্ষী মরিস ও ফিলিপ। নোঙর পড়তেই তারা তরতর করে জাহাজে উঠে গেল। কংগ্রি চোখ টিপে এগিতা করতেই জলদস্যুদের একজন পিছন থেকে মরিস-এর ঘাড়ে কুড়োল দিয়ে আঘাত করল। ফিলিপ ব্যাপারটা বোঝার আগেই বিকট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল। পিস্তলের গুলিতে প্রাণ দিল সে।

লণ্ডন-ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে ভ্যাসকুয়েজ পিস্তলের শব্দ শুনতে পেল উৎকর্ষার সঙ্গে বাইরের দিকে চোখ ফেরাল। সহকর্মীদের চরম পরিণতির দৃশ্য দেখে আতকে উঠল সে। কর্তব্য স্থির করতে না পেয়ে নিচল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার সংজ্ঞা ফিরে এল। মনস্থির করে ফেলল, যে-কোনো ভাবে জলদস্যুদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতেই হবে। কিন্তু টাও তো মিথ্যে নয়, জাহাজটা নোঙর করার সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরা অবশ্যই বাতিঘরের দিকে ছুটবে। তার উপস্থিতি তারা হয়তো এখনো বুঝতে পারে নি। তাই সে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে সিঁড়ি দিয়ে বাতিঘরের নিচে নেমে এল। চোখের পলকে দুটো পিস্তল জামার তলায় গুঁজে নিল। এখন তার একমাত্র চিন্তা, কি করে জলদস্যুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে?

স্টেটন আইল্যান্ডের বুকে নেমে এল এক জমাটবাঁধা কুম্ভাশাবরা রাত্রির অন্ধকার। সর্বত্র কেমন যেন একটা থমথমে ভাব, ঠিক যেন যক্ষপূরী ভয়ংকর একটা রাত্রি নেমে এল ভ্যাসকুয়েজ-এর সামনে। আজ সহকর্মীদের হারিয়ে বড়ই নিঃসঙ্গবোধ করছে। অদৃষ্টবিড়ম্বিত সহকর্মীদের রক্তাশ্রুত মৃতদেহ উত্তাল সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে। তারা একসঙ্গে বাতিঘরের কাজ নিয়ে স্টেটন আইল্যান্ডে এসেছিল, একই সঙ্গে মিলেমিশে কাটিয়েছে বেশ কয়েকটা দিন। আর এখন? এই যমপুরীতে সে একা, একেবারেই একা।

ভ্যাসকুয়েজ বিষণ্ণ মনে ভাবছে, স্কনারটা কাদের? স্টেটন আইল্যান্ড-এ কেনই বা সে ভিড়ল? জলদস্যুরা কি চায়? বাতিঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়ার পিছনেই বা তাদের কি দূরভিসন্ধি রয়েছে? কোনো জাহাজ যাতে তাদের তাড়া করতে না পারে, এটাই কি উদ্দেশ্য তাদের? ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথা ঝিমঝিম করছে, আর ভাবতে পারছে না। না, সে তাদের কাছাকাছি যাবে না। একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। ব্যস্ততার জন্য বাতিঘরের নথিপত্রগুলো নিয়ে আসতে পারে নি। সেগুলো দিয়েই জলদস্যুরা সহজেই তার উপস্থিতি অনুমান করে ফেলবে। না, আর ভাবতে পারছে না। মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার দেখছে!

বাতিঘর থেকে জলদস্যুদের চৌচামেচি ভ্যাসকুয়েজ-এর কানে আসছে। হান্কা আলোও দেখা যাচ্ছে। রাত দশটায় আলোটুকু নিভে গেল। অন্ধকারে তলিয়ে গেল আকাশচুম্বী বাতিঘরটাও। দিনের আলো ফুটে উঠলেই আত্মগোপন করার সুযোগ টুকু থেকেও বঞ্চিত হবে সে। তখন জলদস্যুদের হাতে ধরা পড়তেই হবে। পাষাণগুলোর কাছ থেকে সামান্যতম দয়াও আশা করা যায় না। কিন্তু হাল ছেড়ে, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে করেই হোক নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে হবে, পিতৃদত্ত প্রাণটুকু। দ্বীপের গোপন অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে হবে সাঁতা-ফি-র পুনরাগমনের অধীর প্রতীক্ষায়। সমস্যা বহু। মাত্র দিন তিনেকের রসদ রয়েছে। মাছ ধরার চেষ্টা করা যাবে না। আগুন জ্বালার চেষ্টা করলেও ধরা পড়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। অনেক ভেবেচিন্তে মনস্থির করল, রাতটা তো কাটুক, সকাল হলে যা হোক করা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ প্রাণের দামে ঘূটঘূটে অন্ধকার টিলার নিচ দিয়ে নিঃশব্দে উত্তর দিকে চলতে শুরু করল। রাত এগারটায় অন্তরীপের শেষ প্রান্তে সমতল একটা জায়গায় গুয়ে পড়ল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই ভ্যাসকুয়েজ-এর ঘুম ভেঙে গেল। সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে রইল। কোনো নৌকাও দেখা গেল না। আলোকরক্ষীদের নৌকা মউল-এর নিজস্ব নৌকা সবই তো জলদস্যুদের কজায়। সে সমতল একটা পাহাড়ের ওপর বসে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। না, সাঁতা-ফি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছুই করার নেই। এখনো পুরো দুটো মাস বাকি। জলদস্যুদের হাতে ধরা যদি না-ই পড়ে, বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনাও তো নেই। খাবে কী? শীতের মধ্যে থাকবে কোথায়? সর্বাত্মে একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। বাঁচার অভ্যর্থনা বাসনা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। আশ্রয়ের সন্ধানে হাঁটতে লাগল। বেশি বেগ পেতে হল না, কিছুদূর গিয়েই ছোট্ট একটা গুহা তার নজরে পড়ল। সুরক্ষিতই বলা চলে। জোয়ারের জল বা ঝড়ের আক্রমণের সম্ভাবনা নেই। দেখল কাছেই একটা পুকুর মতো রয়েছে। বরফগলা জলে পুষ্ট। পানীয় জলের অভাবও নেই। আর খাদ্য? আপাততঃ দিন তিনেকের ব্যবস্থা তো সঙ্গেই রয়েছে, পরে যা হয় দেখা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। দূরে কয়েকজনের কথাবার্তা কানে এল। সে ভাবল, শয়তানগুলো হয়তো বা তারই খোঁজে দ্বীপ তোলপাড় করছে। গুহার মুখে লুকিয়ে থেকেই সে বাইরের দিকে উকি দিল। সমুদ্রের তীর ঘেষে একটা নৌকাকে এগিয়ে আসতে দেখল। নৌকা চারজন যুগ্মমার্কী লোক বসে। স্কনারের নিজস্ব নৌকা এটা। বাতিঘরের নয়। যে লোকটা নৌকা চালাচ্ছে, বেশ দক্ষ বলেই মনে হল। হয়তো স্কনারটার ক্যাপ্টেন সে। নৌকাটা তীরে ভিড়ল।

ব্যাস, আর নয়। ভ্যাসকুয়েজ গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানে বসেই তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। কে একজন বলল—‘কি হে, এ জায়গাটাই তো?’

‘হ্যাঁ। পাহাড়টার বাকের কাছে।’

‘বরাত ভালো বলতে হবে, আলোকরক্ষীরা আমাদের গুহাটার খোঁজ পায় নি।’

‘শুধু আলোকরক্ষীদের কথাই বা বলি কেন? দেড় বছর ধরে যারা বাতিঘর তৈরি করল, তারাও খোঁজ পায় নি এটার। আসলে গুহার মুখটা যেভাবে পাথর দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে, খোঁজ পাওয়ার কথাও তো নয়।’

গাট্টাগোষ্টা মাতব্বর লোকটা তাদের ডেকে নিয়ে বালিগাড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। তারা কিছুটা এগোতেই ভ্যাসকুয়েজ আবার গুহার মুখে এসে তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল।

ভ্যাসকুয়েজ ভাবল, তবে কাছাকাছি তাদের একটা গুহা রয়েছে? এবার ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার হল—জলদস্যুরা বাতিঘর তৈরির আগে থেকেই এই দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। গুহার মধ্যে দীর্ঘদিনের লুণ্ঠতরাজের মালপত্রগুলো লুকিয়ে রেখেছে। তবে কি এবার তাদের স্কনারে করে মালপত্র পাচার করার ইচ্ছে?

ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথায় একটা মতলব এল, গুহায় লুকানো রসদগুলো সে অনায়াসেই হাতাতে পারে। বেঁচে থাকতে গেলে সেগুলো তার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। সে করজোড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, সাঁতা-ফি ফিরে না আসা পর্যন্ত দস্যুরা যেন এ-দ্বীপ ছেড়ে না যায়। তারপর তাদের শক্তির পরীক্ষা নেওয়া যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জলদস্যুরা হাসিমুখে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজন টোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু বজায় রেখেই মন্তব্য করল—‘আলোকরক্ষীরা ভালো ছিল, বলতেই হবে। আমাদের মালপত্রগুলো স্পর্শও করে নি। অন্য আর একজন বলল—‘ঠিকই বলেছ। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে আমাদের প্যাসিফিক আইল্যান্ডে পৌঁছবার আগে বেশি খাবার-দাবার ব্যবহার করা ঠিক হবে না। অনেকটা পথ খাবার ফুরিয়ে গেলেই কেলেঙ্কারী একশেষ হবে।’

জলদস্যুদের মধ্যে একজন উম্মাদের মতো হেসে বলে উঠল—‘পৃথিবীর শেষ প্রান্তের বাতিঘর তবে আমরা অন্ধকার করে ছাড়লাম, তাই না?’

যুগ্মমার্কী সেই মাতব্বর প্রথম মুখ খুলল—‘আমরা বিদায় নেবার আগেই চোরা-পাহাড়াগুলোতে ধাক্কা খেয়ে দু-একটা জাহাজ গুঁড়িয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস, আর এরই ফলে আমাদের আরো কিছু প্রাণিযোগের নিশ্চিত সম্ভাবনা।’

‘হ্যাঁ, বরাত আমাদের ভালো, বলতেই হবে। স্কনারটাকে ফাঁকাই, রক্তপাত না ঘটিয়েই ওটাকে পাওয়া গেল। পুরো ব্যাপারটাই যেন স্বপ্নের মতো ঘটে যাচ্ছে, কি বল?’

গুহার মুখে লুকিয়ে থেকে আলোকরক্ষক ভ্যাসকুয়েজ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। তার বুঝতে অসুবিধে হল না, জলদস্যুরা কি করে জাহাজটাকে হাতিয়েছে।

‘এবার তবে আমাদের কর্তব্য কি, কংগ্রি?’

ভ্যাসকুয়েজ যাকে এতক্ষণ জলদস্যুদের মাতব্বর বলে ধরে নিয়েছিল, সেই গাটাগোটা লোকটা জবাব দিল—‘মউলে ফিরে যাব। গুহার জিনিসপত্র এভাবেই থাকবে। জাহাজ মেরামতির কাজ শেষ হলে চিন্তা করা যাবে তখন। তবে মেরামতি কাজের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি দরকার, নৌকায় তুলে নাও।’

জলদস্যুরা অত্যাবশ্যকীয় কিছু জিনিসপত্র নৌকায় তুলে হৈ হৈ করতে করতে চলে গেল!

জলদস্যুরা বিদায় নিলে ভ্যাসকুয়েজ ভাল, আর কিছু না হোক, গুহামুখের পাথরটা সরিয়ে অন্তত কিছুদিনের মতো রসদ বের করে নিতে হবে।

কংগ্রির নির্দেশে তার সাকরেনদরা জাহাজ মেরামতির কাজে লেগে গেল। আর কংগ্রি নিজে? সে বাতিঘরের লেজার খাতাটায় চোখ রাখল। লেজার লেখা রয়েছে,—‘প্রতি তিন মাস অন্তর বাতিঘরের সাহায্যে জাহাজ আসবে।’ সে হিসাব করে দেখল, সবে একমাস মাত্র হয়েছে, দু-মাস এখনো বাকি। অতএব প্রচুর সময় হাতে রয়েছে। সে নিশ্চিত হল। খাতা দেখে আলোকরক্ষী তিনজনের নামও জেনেছে—মরিস, ফিলিপ আর ভ্যাসকুয়েজ! দুজন মারা গেছে চোখের সামনেই। অতএব একজন ধীপের কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তবে তাকে নিয়ে তেমন কিছু চিন্তার নেই। সে একা আর কি করতে পারবে? ধীপে পালিয়ে পালিয়ে বাঁচবে কতদিন? না খেয়ে শুকিয়ে কঁকড়ে মরতে হবে শেষপর্যন্ত।

তেসরা জানুয়ারি রাতের দিকে আবহাওয়া আকস্মিকভাবে বদলে গেল। আকাশের দক্ষিণে দেখা দিল জমাটবাঁধা কালো মেঘ। ঘোল ডিগ্রি তাপমাত্রা দেখতে দেখতে বেড়ে গেল। মুরু হল ঝড়ের তুমুল তাণ্ডব। সমুদ্র রুদ্ধরূপ ধারণ করল। প্রচণ্ড আত্মরোশ মাথা-সমান ডেউ তীরে এসে আছড়ে পড়তে লাগল। কপালের জোর না থাকলে জলদস্যুরা মউলকে রক্ষা করতে পারত না। কংগ্রি বাড়তি একটা নোঙর ব্যবহার করে জাহাজটাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করল। তবু বলতে হবে বরাতের জোরেই জাহাজটা রক্ষা পেয়েছে। নইলে সেটা এক আছড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত চোখের সামনে।

পুরো একটা সপ্তাহ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করেই জলদস্যুদের কেটে গেল! শেষপর্যন্ত বারই জানুয়ারি তারিখে ঝড়ের তাণ্ডব কিছুটা স্তিমিত হল। ইতিমধ্যে একটামাত্র জাহাজ ঝড়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে স্টটেন আইল্যান্ড-এর ধার দিয়ে গেছে। তিন মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল বলে বাতিঘর সক্রিয়, কিনা বুঝতে পারল না জাহাজের আরোহীরা। ভ্যাসকুয়েজ হাত নেড়ে সংকেত দেবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু হয়! এতদূর থেকে কিছু দেখতে পায় নি, বুঝতেও পারে নি। অনন্যোপায় হয়ে হতাশ মনে তাকে হাত নামিয়ে নিতে হল।

ঝড়ের তাণ্ডব মউল-এর খুবই ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। বারই জানুয়ারি কংগ্রি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখে বুঝল, মেরামতের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, সময় তো কম লাগবে না। সে আরো বুঝল, জাহাজটাকে চড়ায় না তুললে মেসার্সের অসম্ভব। বাধা হয়েছে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

কংগ্রি এবার সারসাতেকে নিয়ে সেই পুরনো গুহাটায় গেল। জোয়ারের জন্য যখন কয়েকদিন অপেক্ষা করতেই হবে, ইতিমধ্যে নৌকো করে গুহা থেকে সোনা রূপা, আর মূল্যবান জিনিস যা কিছু আছে, নিয়ে এসে কাজ কমিয়ে রাখা যাক। নৌকায় বসে কংগ্রি চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল। বলা তো যায় না, আশ্চর্যগোপনকারী তৃতীয় আলোকরক্ষী পাহাড়ের আড়ালে কোথাও ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে। পিস্তলের দুটোমাত্র গুলিই তাদের দুজনকে ঘায়েল করার পক্ষে যথেষ্ট। না, কোথায় কাউকে দেখা গেল না। বেলা প্রায় এগারটায় তারা গুহার মুখে পৌঁছল। পাথরটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তারা। বাঃ চমৎকার! সব ঠিকঠাকই আছে দেখতে পেল। গুহাটা ছিল মালপত্র একেবারে ঠাসা। ছোটখাট আলো জ্বলেও বোঝার সাধ্য কি কেউ কিছু সরিয়েছে কিনা?

মালপত্র তুলে ডিঙি বোঝাই করে সেখান থেকে রওনা দেবার পূর্ব-মুহূর্তে কংগ্রি তাড়াতাড়ি পাহাড়ের ওপর উঠে গেল। চূড়ায় দাঁড়িয়ে চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখতে লাগল ধারে কাছে কাউকে দেখা যায়, কি না? আসলে সে তৃতীয় আলোকরক্ষীর খোঁজ করছে। সন্দেহজনক কিছু দেখতে না পেয়ে সে নেমে এল। তিনটির কাছাকাছি মউল-এর কাছে পৌঁছল তারা।

ষোলোই জানুয়ারি জোয়ার এল। জলদস্যুরা পূর্ণ উদ্যমে জাহাজ মেরামতির কাজে লেগে গেল। পনের দিন একটানা কাজ চলল। মাঝে মাঝে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও আবহাওয়া তেমন একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি।

কয়দিনের মধ্যে স্টটেন আইল্যান্ডে দুটা মাত্র জাহাজ চোখে পড়েছে। তার মধ্যে প্রথম জাহাজটা ছিল ইংরেজদের। সে দুপুর বেলা এ-অঞ্চল অতিক্রম করেছে। অতএব বাতিঘরের দিকে তাকাবার দরকার পড়েনি। আর দ্বিতীয়টা? রাতের অন্ধকারে বোঝা যায় নি, কোন দেশের জাহাজ। জাহাজটা হয়তো কয়েক মাস ধরে সমুদ্রে ঘুরছে, হয়তো বাতিঘর তৈরির কথা জানেই না। ঘূটঘূটে অন্ধকার থাকায় ভ্যাসকুয়েজ কোনোরকম সন্দেহে দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। লাভও তো ছিল না কিছু, কে দেখতে পেত তাকে। দূর সমুদ্র দিয়ে আরো কয়েকটা জাহাজ এ-অঞ্চল দিয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এত দূর দিয়ে চলে গেছে, হিসেবের মধ্যেই পড়ে না।

স্কনার-এর মেরামতির কাজ প্রায় শেষ হল। একত্রিশ জানুয়ারি আবার আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল। আবার ঝড়, মুম্বলধারে বৃষ্টি, মেঘের সুতীব্র গর্জন। কংগ্রি ও তার সাকরেনদরা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল, জাহাজটাকে রক্ষা করতে। শেষপর্যন্ত করলও তাই।

কংগ্রি ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তাদের সেই পুরনো গুহায় যাতায়াত করে মালপত্র এনে জাহাজে তুলেছে। গুহার ভেতরে মালপত্রের সঙ্গে কয়েকটা রঙ-এর টিনও ছিল। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে দিল সে। সাকরেনদের লাগিয়ে দিল জাহাজের নামটা বদলানোর কাজ। বড় বড় হরফে নতুন নাম লেখা হল 'সারসাঁতে'।

চৌদ্দই ফেব্রুয়ারি ভরা জোয়ারে সারসাঁতের নোঙর তোলার চেষ্টা চলছে। আর দেরি নেই সমুদ্রে কাঁপিয়ে সে এগিয়ে যাবে দূর দূরান্তের উদ্দেশ্যে। কংগ্রির এতদিনের স্বপ্ন আজ সত্যি সত্যি বাস্তবরূপ নিতে চলছে।

স্কনারটা স্টেটন আইল্যান্ডে নোঙর করার পর থেকেই ভ্যাসকুয়েজ গুহার গোপন আন্তনায় আশ্রয় নিয়েছে। ইচ্ছে করলে সে অনায়াসেই দ্বীপের ভেতরের দিকে চলে যেতে পারত। কিন্তু সে-চেষ্টা সে করে নি। মনে তার প্রতিশোধের সুতীক্ষ্ণ আশুন ধিক ধিক করে জ্বলছে। আর ক্ষীণ আশার আলো যে সে মনের গভীরে পোষণ করে নি, তা নয়। তার কাছাকাছি দিয়ে কোনো জাহাজ গেলে হাতের ইশারা করে দাঁড় করাবে। জাহাজে উঠে ক্যাপ্টেনকে জলদস্যুদের ব্যাপারটা খুলে বলবে। এভাবে প্রতিশোধ নিতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। নিজের জীবনের জন্য সে মোটেই ভাবিত নয়। জলসদস্যদের গুহা থেকে রসদ এনে নিজের গুহায় জমা রেখেছে, উপোষ করে অন্তত মরতে হবে না তাকে।

সে জানে পুরো দু-মাস পরে সঁতা-ফি এখানে আসবে। কিন্তু এর মধ্যেই জাহাজটা হয়তো বা প্যাসিফিক আইল্যান্ড-এর দিকে রওনা হয়ে যাবে। আর তা-ই যদি হয় তার পক্ষে তখন আর কিছুই করার থাকবে না। জলদস্যুদের গুহা থেকে তার গুহাটা খুবই কাছে। যে-কোনো সময় তারা তার খোঁজ পেয়ে যেতে পারে। মুহূর্তের মধ্যেই তার সব আশায় ছাঁই পড়বে। খোঁজাখুঁজি করে সামান্য দূরে সে আর একটা নিরাপদ গুহার খোঁজ পেল। রাতের অন্ধকারে মজুত খাবার দাবারগুলো নিয়ে নতুন গুহাটায় চলে গেল।

সারাদিন ভ্যাসকুয়েজকে প্রায় অন্ধকার গুহায় কাটাতে হয়। সন্ধ্যায় জলদস্যুদের আসার সজ্জাবনা থাকে না। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে গুহা থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। তার মাথায় সর্বক্ষণ একটা মাত্র চিন্তাই অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে, কি করে জলদস্যুদের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবে? অপরাধীদের প্রাণ্য শাস্তি দিতেই হবে তাকে।

কিন্তু কি করে প্রতিশোধ নেবে সে? জলদস্যুরা বাতিঘরের লেজার খাতা থেকে অবশ্যই জেনে নিয়েছে। দু-মাসের আগে সঁতা-ফি এদিকে আসছে না। অতএব যত অসুবিধাই থাক, এর আগেই তারা জাহাজ নিয়ে এখান থেকে চম্পট দেবেই।

সেটা ছিল ষোলোই ফেব্রুয়ারি। সেদিন ভ্যাসকুয়েজ-এর অস্থিরতা দারুণভাবে বেড়ে গেল। সময় চলে যাচ্ছে। কি করবে সে? কাকে ডাকবে? কার সাহায্য নেবে, জলদস্যুদের জঘন্য কাজের প্রতিশোধ নিতে? অস্থিরচিত্ত ভ্যাসকুয়েজ উর্ধ্বাশ্বাসে ছুটেতে লাগল বাতিঘর-এর দিকে। চারদিকে যুঁটুয়ুঁটে অন্ধকার কারো সঙ্গে দেখা হবার সজ্জাবনা ছিল না। পুরো তিন মাইল হাঁটলে তবে বাতিঘর। রাত নয়টায় বাতিঘর-এর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। স্কনারটাকে দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে। জলদস্যুরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সে মনে মনে বলে উঠল—'জাহাজটায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে হত!'

সকাল হল। খাবার ফুরিয়ে গেছে। জলদস্যুদের গুহায় গেল খাবার সংগ্রহ করতে। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে লাগল। দস্যুরা মালপত্র নিয়ে যেতে গুহায় আসতে পারে। ধরা পড়ে গেলে কেলেকারী! প্রাণ যাক, কিন্তু প্রতিশোধ যে নেওয়া হবে না তার। খাবার খুঁজতে গিয়ে হতশা হতে হল তাকে। ঠেলাঠেলি করে গুহার মুখ থেকে পাখরটা সরিয়ে দিয়ে ভেতরে গেল। মালপত্র কিছু আছে বটে, খাবারগুলো জাহাজে নিয়ে গেলে ভ্যাসকুয়েজ-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হবে। মাত্র তিন-চারদিনের খাবার তার কাছে রয়েছে। তারপর শুরু হবে বিরস্থ উপবাস।

ইতিমধ্যে গুহার বাইরে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে ভ্যাসকুয়েজ রীতিমতো আতকে উঠল। এখন উপায়? গুহা থেকে পালাবার পথ বন্ধ। সে উপায়স্বরূপ না দেখে গুহার একেবারে শেষপ্রান্তে চলে গেল, মালপত্রের আড়াল লুকিয়ে থাকল। সেখানে বসে সে মনস্থির করে নিল, ধরা যদি পড়ে-ই সহজে মৃত্যুবরণ করবে না। দু-একটাকে অন্তত সঙ্গে নিয়ে যাবে। কোমর থেকে পিস্তলটা তুলে তৈরি হয়ে বসল। সারসাঁতে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে গুটিগুটি গুহার ভেতরে চুকে গেল। তার পিছন পিছন গেল ভার্গাস নামে অন্য এক দস্যু। মালপত্র বের করতে গিয়ে তারা বলাবলি করছে—'আজ সতেরই ফেব্রুয়ারি। আর নয়, এবার এখান থেকে চম্পট দিতে হবে!'

সারসাঁতে বলল—'আবহাওয়া জাহাজ চালানোর অনুকূল থাকলে কালই আমরা এখান থেকে রওনা দিচ্ছি। কিন্তু বরাত খারাপ হলে, দিন সাতেক এখানে পড়ে থাকতে হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে সঁতা-ফি ভিড়ে যাবে।'

কথা বলতে বলতে সারসাঁতে আর ভার্গাস লণ্ঠনহাতে এদিক ওদিক দেখে বুঝল, তেমন কোনো দরকারি জিনিস আর নেই। একসময় তারা প্রায় ভ্যাসকুয়েজ-এর গা ঘেঁষে চলে গেল। পিস্তলটা ব্যবহার করতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। সামান্য কিছু দরকারি মালপত্র নিয়ে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। ভ্যাসকুয়েজ এবার নিরাপদ। গুটি গুটি জলদস্যুদের গুহা থেকে বেরিয়ে নিজের গুহায় চলে গেল। এই মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা, মাত্র দু-দিন পরে তার আর এক কণাও খাবার থাকবে না। আর বাতিঘরে? জলদস্যুরা কি আর সেগুলো রেখে যাচ্ছে? অতএব একটানা বিরস্থ উপবাস।

আকাশে একটু একটু ক'রে মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসে পড়ে গেছে। সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখে কংগ্রি ও তার সাকরেনদের আশ্রামর খাচাছাড়া হবার উপক্রম। শুরু হল ঝড়। সমুদ্র উত্তাল রূপ ধারণ করল। পরিস্থিতি এভাবে উত্তরোত্তর পরিবর্তন হতে থাকলে জাহাজ ছাড়বে কী করে?

ভ্যাসকুয়েজ-এর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে ঝড়ের মধ্যেই গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকাল। সমুদ্রের বুকে কি যেন কালো মতো একটা তার নজরে পড়ল। জাহাজ! হ্যাঁ, জাহাজ! একটা জাহাজ! এই দ্বীপের দিকেই এগোচ্ছে বটে।

দেখতে দেখতে ঝড়ের তাণ্ডব প্রচণ্ড রকম শুরু হয়ে গেছে। ঘূর্ণিঝড়! কী কেলেকারী ব্যাপার! জলদস্যুরা বাতি ঘরটা অন্ধকার করে রেখেছে। জাহাজটা নির্ধাৎ বাতি-ঘরের আলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা জানতেও পারবে না, কয়েক মাইলের মধ্যে যে একটা দ্বীপ রয়েছে। ঝড়ের মুখে পড়ে উদ্ধার বেগে ছুটে আসছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চোরাপাহাড়ে থাকা খেয়ে গুড়োগুড়ো হয়ে যাবে।

জাহাজটার দিকে নিষ্পলক চোখে ভ্যাসকুয়েজ তাকিয়ে রইল। সে অসহ্য উত্তেজনায় হটফট করতে লাগল। কিন্তু জাহাজটার পরিণতির কথা বুঝেও কি-ই বা করতে পারে সে? হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলল—জাহাজের লোকজন কোনোক্রমে যদি জানতে পারে এখানে স্থল আছে, অবশ্যই গতিপথ পাণ্টে দেবে। দু-দিন ধরে তুমুল ঝড় হচ্ছে বটে, বৃষ্টি হয় নি এক কোঁটাও। তাই শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করতে অসুবিধা হল না। এবার সে আশুন জেলে জাহাজকে বিপদ-সংকেত দিল।

কিন্তু হায়! ভ্যাসকুয়েজ-এর এত চেষ্টা সবই বিফলে গেল। বড়ই দেরি হয়ে গেছে। সমুদ্রতীর থেকে সামান্য দূরে জাহাজটা বার কয়েক ঘুরপাক খেয়ে চোরা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল। ব্যস, সব শেষ! মুহূর্তের মধ্যে এতবড় জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল!

সকাল হল। ঝড়ের তাণ্ডব একই রকম রয়েছে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে সুতীব্র গর্জন করে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমুদ্রও উন্মাদিনায় মাতল।

ভ্যাসকুয়েজ ভাবল, ক্রুনারটার সকালে নোঙর তোলার কথা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সেটা আর সম্ভব হয় নি হয়তো! সে গুহা থেকে বেরিয়ে এল। সমুদ্রের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, গতরাতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটাকে। জাহাজটার ভাঙা টুকরোগুলোর কিছু কিছু কাং হয়ে পড়ে থাকতে দেখল সে। ভাবল, তবে কি জলদস্যুরা এ-ব্যাপারটা এখনো জানে না? নইলে এতক্ষণে লুণ্ঠতরাজ শুরু করে দিত। সাহসে ভর করে সে সমুদ্রের তীর ধরে জাহাজটার আরো কাছ গেল। কাং হয়ে থাকা জাহাজটার গায়ে লেখা দেখল—‘সেঞ্চুরি’ মবিল। ‘সেঞ্চুরি’? হ্যাঁ, আমেরিকান জাহাজ। যুক্তরাষ্ট্রের আলবা প্রদেশের রাজধানীর জাহাজ এই ‘সেঞ্চুরি’। জাহাজের কেউই প্রাণে বাঁচে নি।

ভ্যাসকুয়েজ জীবনের মায়ী তুচ্ছ করে অতি কষ্টে জাহাজে গিয়ে উঠে পড়ল। কোনোরকমে হাঁটাচলা করল কিছুটা। একটাও মৃতদেহ দেখতে পেল না। হতভাগ্যগুলো স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেছে, কে বলতে পারে।

জলদস্যুরা হয়তো ব্যাপারটা জানে না। নিজেদের জাহাজ রক্ষা করতেই তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে রাতভর। এ-পরিস্থিতিতে অন্যের জাহাজ লুট করার চিন্তা তো মাথায় আসার কথা নয়। ঘোরাফেরা করতে করতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল সে। এই মুহূর্তে তার সবচেয়ে বেশি করে যা দরকার সেই খাদ্য বস্তু প্রচুর পড়ে রয়েছে, দেখল। কয়েকটা শুকনো মাংসের টিন, ও বেশ কয়েকটা বিস্কুটের টিন দেখে খুশিতে তার মনটা ভরে উঠল। কিছু না হলেও দু-মাসের জন্য সে নিশ্চিত হল। কোনোরকম চিন্তা না করেই খাবার টিন কটা নিজের গুহায় রাখতে গেল। গুহার কাছাকাছি গিয়ে সে কার যেন করুণ আর্তনাদ শুনতে পেল। খাবারের টিনগুলো কাঁধ থেকে নামিয়ে আর্তনাদের উৎস সন্ধানে ছুটল। কাছে গিয়ে দেখল, বছর চল্লিশের একজন অচেনা মানুষ মুখ খুঁড়ে পড়ে রয়েছে। তার গায়ে কোনো ক্ষতের চিহ্ন নেই। পোশাকে রক্তের দাগও চোখে পড়ল না। সে ভাবল, লোকটা হয়তো ‘সেঞ্চুরি’র একমাত্র জীবিত ব্যক্তি।

ভ্যাসকুয়েজ নিচু হয়ে যন্ত্রণাকাতর লোকটার কাঁধে হাত রাখতেই সে উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। ভ্যাসকুয়েজ তাকে সাবুনা দিতে গিয়ে বলল, ‘ভয় নেই বন্ধু। আমি তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছি।’ কথা কটা শেষ করেই সে লোকটাকে কাঁধে তুলে নিল, নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করে তুলবে বলে। জলদস্যুরা এসে পড়লে একূল-ওকূল দু-কূলই যাবে। সে লোকটাকে নিয়ে নিজের গুহায় হাজির হল। সাবধানে শুইয়ে দিল পাথরের ওপর। বেশ কিছুক্ষণ পরে লোকটা কিছুটা সুস্থ হল। চোখ মেলে তাকাল। ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করল—‘জল! একটু জল দিতে পার?’

ভ্যাসকুয়েজ তাড়াতাড়ি জল এনে তার মুখে দিল। লোকটা কোনোরকমে উঠে বসল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ভ্যাসকুয়েজ-এর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আমি এখন কোথায়? তুমি কে? আমি এখানে কি করে এলাম?’

‘তুমি নিরাপদ আশ্রয়েই আছ। ভয় নেই। সেঞ্চুরি দুর্ঘটনায় পড়লে তুমি তীরে এসে পড়েছিলে।’

‘সেঞ্চুরি? আমাদের সেঞ্চুরি কোথায়?’

‘তোমার নাম কি? তুমিই কি সেঞ্চুরির ক্যাপ্টেন ছিলে?’

‘আমার নাম জন ডেভিস। জাহাজের ক্যাপ্টেন নয়, মেট ছিলাম আমি। আমাদের জাহাজের আর সবাই কোথায়?’

‘নেই। সবাই জাহাজ দুর্ঘটনায় মারা গেছে।’

মর্মসিক্ত খবরটা শোনামাত্র জন ডেভিস মুখড়ে পড়ল। ভ্যাসকুয়েজ কিছু ব্রাব্টির সঙ্গে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে তার মুখের কাছে ধরল। সে ঢকঢক করে সবটুকু গিলে খেয়ে নিল। এখন কিছুটা সুস্থ বোধ করছে, মনে হল। এবার সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে লাগল ‘স্যাডে পাঁচ শ’ টন ভারবাহী জাহাজ। সেঞ্চুরি মবিল বন্দর থেকে তিন সপ্তাহ আগে যাত্রা করেছিল। জাহাজটা ছিল ক্যাপ্টেন হেনরির কর্তৃত্বাধীন। হেনরি ও জন ডেভিস ছাড়া আরো বারজন নাবিক কর্মরত ছিল। স্টেটন আইল্যান্ডের কাছাকাছি জাহাজ পরিচালনা করা নাবিকদের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ভীষণ ঝড়ই এর একমাত্র কারণ। ক্যাপ্টেন আশা করেছিলেন, অন্তত দশ মাইল দূর থেকে বাতির সংকেত দেখতে পাবেন। কিন্তু কার্যত কোনো আলো না দেখে তিনি ভাবলেন, স্টেটন আইল্যান্ড থেকে অনেক দূরে রয়েছেন। আচমকা জাহাজটা সমুদ্রতীরের শক্ত পাথরের আছড়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল।’

কথা কয়টা কোনোরকমে শেষ করে ডেভিস একটু দম নেবার জন্য থামল। এক সময় আবার বলল, ‘এটা কোন জায়গা? আমি এখন কোথায়?’

ভ্যাসকুয়েজ বলল, ‘স্টেটন আইল্যান্ড।’

‘তাই যদি হয় তবে বাতিঘরটা কোথায়?’

‘বাতিঘর আছে ঠিকই। কিন্তু আলো জ্বালা হয় নি।’

ভ্যাসকুয়েজ তখন জলদস্যুদের কাণ্ড কারখানার কথা বিস্তারিত বর্ণনা করলেন। জন ডেভিস তার কথা শুনে রীতিমতো আতঙ্কে উঠল, ‘কী কেলেকারী কারবার! জলদস্যুরাই তবে বাতিঘর দখল করেছে! তারাই ইচ্ছাকৃত বাতিঘরের আলো জ্বালে নি। তাদেরই জন্য সেধুরি ধ্বংস হল?’

এবার ভ্যাসকুয়েজ জলদস্যুদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা ব্যক্ত করল। তারা সে অবধি লুণ্ঠরাজের জন্য প্যাসিফিক আইল্যান্ডকে বেছে নিয়েছে সে-কথাও বলল! এরকম ঝড়-তুফানে জাহাজ এক সপ্তাহের মধ্যে নোঙর তুলতে পারবে না, দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল।

ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে জন ডেভিস বলল, ‘তারা যতক্ষণ এখানে থাকবে ততক্ষণ অবশ্যই বাতিঘরের আলোর সম্বন্ধে দেওয়া হবে না। সেধুরির মতো বহু জাহাজই তবে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই যদি হয় অন্য জাহাজকে এ-অঞ্চলে দেখামাত্র সাবধান করে দিতে হবে, কি বল?’

‘সে তো নিশ্চয়। সেধুরিকে সাবধান করে দিতে আমি চেষ্টার ক্রটি করি নি বন্ধু। বাতাস এমন জোরে বইতে লাগল যে, আগুন জ্বালতেই পারলাম না।’

‘তুমি একা পেরে ওঠোনি। কিন্তু আমাদের দু-জনের চেষ্টায় নিশ্চয়ই তা সম্ভব হবে। সেধুরির ভাঙা টুকরোগুলো তো রয়েছেই, আগুন জ্বালাতে অসুবিধা হবে না। জলদস্যুরা যতদিন এখানে থাকবে ততদিন চেষ্টা করব আগুন না জ্বালাতে।’

‘ভালো কথা। আবহাওয়ার একটু পরিবর্তন হলে কংগ্রি তার দলবল নিয়ে এখানে থেকে কেটে পড়বে! কারণ, তারা ভালোই জানে, বাতিঘর রক্ষীদের ছুটি দিয়ে অন্য লোক নিয়োগ করতে, কয়েক দিনের মধ্যেই সাঁতা-ফি এখানে আসছে।’

‘তবে কয়েকদিনের মধ্যেই একটা জাহাজ স্টেটন আইল্যান্ডে ভিড়বেই, তাই না?’

‘হ্যাঁ, ভিড়বে। ব্যাটন-এরিয়স থেকে যাত্রা করে মার্চের দশ তারিখের কাছাকাছি এখানে নোঙর করবে।’

‘ঈশ্বর সহায় হলে জলদস্যুদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব! এ-কটা দিন ঈশ্বর যেন আবহাওয়া এর চেয়ে খারাপ করেই রাখেন। সাঁতা-ফি কোনোরকমে পৌঁছে গেলেই কাজ হাসিল, জলদস্যুগুলোকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।’

‘হ্যাঁ, বন্ধু, আমিও ঈশ্বরের কাছে দিনের পর দিন এ প্রার্থনাই করছি। এত করে ডাকছি, কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন না।’

কংগ্রি মহা সমস্যায় পড়ল। ঝড়ের তাণ্ডব যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্রের উদ্‌মানদাও বাড়ছে বৈ এতটুকুও কমছে না। ঝড়ের গতিবিধি দেখে কংগ্রি ধরেই নিয়েছে, এক মাসের আগে আবহাওয়া পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কপালে যা লেখা আছে কেউ তা ঝগুন করতে পারবে না। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছ থেকে একবারটি ঘুরেই আসি। মূল্যবান জিনিসপত্র পেলে সাকরেনদের দিয়ে জাহাজে এখানে তুলে নেওয়া যাবে।

কংগ্রি একটু চেষ্টা করলে বাতিঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে জাহাজটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু কি লাভ হত তাদের। বরং ধ্বংস হলে কিছু না কিছু তাদের ভাগ্যে উঠবেই।

একটা ডিঙি নিয়ে কংগ্রি সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছে গেল। ব্যাপারটা জন ডেভিস আর ভ্যাসকুয়েজ-এর নজর এড়ায় নি। তারা গুহার মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রি-র নৌকোটাকে ভাঙা জাহাজটার দিকে এগোতে দেখল। এক সময় তারা দেখল, জলদস্যুরা হেলে পড়া জাহাজটায় উঠছে। ভ্যাসকুয়েজ জলদস্যুদের মাতব্বর কংগ্রি ও তার পাশ্চটর সারসাঁতের দিকে তর্জনী তুলে জন ডেভিসকে দেখাল।

জন ডেভিস তীব্র ক্রোধে গর্জে উঠল—‘একবার নাগালের মধ্যে পেলে টুকরো টুকরো করে কেটে নম্বর দুটোর গায়ে নুন ছিটিয়ে ছাড়ব।’

ভ্যাসকুয়েজ বলল, ‘কী লোভ দেখছে বন্ধু! সোনা-রূপার খোঁজে পিশাচগুলো এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।’

‘সোনা-রূপা কোথা থেকে পাবে শুনি? জাহাজ হলেই বুকি মূল্যবান সম্পদে ঠাসা থাকে? ঠিক আছে, আবহাওয়া আর কয়েকটা দিন খারাপ থাকলে তাদের নগদ পাওয়া মিটিয়ে দেব।’

জলদস্যুরা হেনো হয়ে মূল্যবান সম্পদ খুঁজে বেড়াল। ব্যর্থ হল। শেষপর্যন্ত বড় বড় কুড়োল দিয়ে জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করতে লাগল।

চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে ভ্যাসকুয়েজ জন ডেভিস-এর দিকে তাকাল।

জন ডেভিস বলল, ‘তারা জাহাজটাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইছে। সেধুরি নামে কোনো জাহাজ এখানে এসে বাতিঘরের আলোর অভাবে ধ্বংস হয়েছে, তার কোনো চিহ্ন রাখতে চাইছে না।’

হ্যাঁ, ডেভিস-এর কথাই ঠিক। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সারসাঁতে ক্যাপ্টেনের কেবিন থেকে একটা আমেরিকার জাতীয় পতাকা নিয়ে বাইরে এল। টুকরো টুকরো করে কেটে বাতাসে ছড়িয়ে দিল।

রাগে-দুঃখে-অপমান জন ডেভিস-এর সর্বাস্ব খরখরিয়ে কাঁপতে লাগল। সে চোঁচিয়ে উঠল, ‘দস্যুরা আমার দেশের জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলল, অপমান করল!’

বিপদের সম্ভাবনায় ভ্যাসকুয়েজ তার মুখে চেপে ধরল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, ‘এ কী করছ বন্ধু! আমরা যে সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছি। আমাদের অস্তিত্ব জানতে পারলে আর রক্ষা নেই! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুযোগ আমরা পাবই। কয়েকদিনের মধ্যে ঝড় থামবে না, সমুদ্রও শান্ত হচ্ছে না। সাঁতা-ফি কোনোরকমে পৌঁছাতে পারলেই—’

‘মার্চের গোড়ার দিকে ছাড়া সাঁতা-ফি ফিরছে না, তুমিই তো বলেছ।’

‘বলেছি, মিথ্যে নয়। কিন্তু তার আগেও তো এসে যেতে পারে। বরাত ভালো থাকলে সবই সম্ভব।’

বিকেল চারটে বাজল। কংগ্রি সেধুরি নিশ্চিৎ করে, প্রচুর মালপত্র নিয়ে সেখান থেকে নৌকো ছাড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই ঝড়ের বেগ অনেকাংশে বেড়ে গেল। ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস গুহার বাইরে যেতে পারল না। রাত বাড়তেই আবহাওয়া প্রলয়রূপ ধারণ করল। সমুদ্র উম্মাদের মতো তীরে আছড়ে পড়তে লাগল। সমুদ্রের এরকম রুদ্ররূপে সচরাচর দেখা যায় না।

ক্রোধাগ্নি জন ডেভিস বলে উঠল, 'তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ ঈশ্বর! জলদস্যুদের জাহাজটা যেন ঝড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।'

পাগলা ঝড় সারারাত ধরে দাপাদাপি করে বেড়াল। সে সঙ্গে চলল সমুদ্রের সুগভীর গর্জন। উত্তাল সমুদ্র সেধুরির ভাঙা টুকরোগুলো ভাসিয়ে কোথায় নিয়ে চলে গেল, কে জানে। সেধুরি থেকে প্রচুর খাবারদাবার সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলে ভ্যাসকুয়েজ কিছুটা নিশ্চিন্ত। সেগুলো ফুরোতে ফুরোতে সাঁতা-ফি অবশ্যই স্টটেন আইল্যান্ডে পৌঁছে যাবে।

জন ডেভিস বলল, 'মনে রেখো বন্ধু, ঈশ্বর অবশ্যই জলদস্যুদের পাপের শাস্তি দেবেন। মর্তভূমিতেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে শয়তানগুলোকে।'

দেখতে দেখতে একুশ ফেব্রুয়ারি চলে গেল। বাইশ তারিখেও ঝড়ের তান্ডব এতটুকুও কমল না। সমুদ্র উত্তাল। আকাশছোঁয়া সফেন ঢেউ তীব্র আর্তনাদ করে তীরের পাথরে আছড়ে পড়তে লাগল।

সকাল হল। তেইশে ফেব্রুয়ারির সকাল। আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন লক্ষিত হল বটে। কিন্তু সে আর কতটুকু? ঝড়ের বেগ তেমনই রইল, বৃষ্টিটা কেবল একটু কমল। সমুদ্র আগের মতোই ভয়ঙ্কর রয়ে গেল।

তিন তিনটে দিন গুহার ভেতরে কাটিয়ে তেইশ তারিখ সকালে দুজনে বাইরে বেরল। গুহা থেকে সামান্য দূরে যেতেই মাটিতে প্রোথিত কি যেন একটা জিনিসে হোঁচট খেয়ে জন ডেভিস পড়ে গেল, কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। পিছনে ফিরে ব্যাপারটা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে একটা ধাতুর বাস্র। গোলা বারুদে বোঝাই বাস্রটা। তার গায়ে বড় বড় হরফে 'সেধুরি' লেখাটা চোখে পড়ল। সে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'গোলা-বারুদগুলো আমাদের কাজে লাগাতে হবে। শয়তানগুলোর ওপর প্রয়োগড় করব। ঈশ্বরের ঈচ্ছায় যদি জলদস্যুদের জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটতে পারতাম, গায়ের ঝাল মিতত।'

কথা বলতে বলতে তারা সমুদ্রের তীর ধরে আরও কিছুটা এগিয়েই ভ্যাসকুয়েজ থমকে দাঁড়াল। সমুদ্রের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে চোঁচিয়ে উঠল, 'সমুদ্রের জলে কামানের মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, সেরকম তো মনে হচ্ছে। চলো এগিয়ে গিয়ে দেখি, ব্যাপারটা কী? মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তারা দৌড়ে ওটার কাছে গিয়ে নিঃসন্দেহ হল। হ্যাঁ, কামানই বটে। সমুদ্রের তীর ঘেষে ওটা পড়ে রয়েছে। সেখানে মাত্র হাত দুই জল হবে। ভ্যাসকুয়েজ জলে নেমে গেল তরতর করে। জন ডেভিসও আর নিশ্চিন্তে তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ভ্যাসকুয়েজ কামানটার বিপরীত দিকে গিয়ে চোঁচিয়ে উঠল, 'সেধুরি! সেধুরি-র নাম লেখা রয়েছে।' সে ডেভিসকে লক্ষ্য করে বলল, 'বন্ধু এটা তোমার সম্পত্তি।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখা যাচ্ছে। কামান দেখে আমরা সজ্জিত করতাম! গোলাবারুদ আর কামান, দুই-ই যখন পাওয়া গেছে অবশ্যই কাজে লাগাচ্ছি।'

'আমার বিশ্বাস, সে সুযোগ আমরা পাব না। তবে আর কিছু না পারি কামান দেগে বিপন্ন কোনো জাহাজকে তো সতর্ক করে দিতে পারবই।'

'ভালো কথা! কিন্তু এতেই কি তুমি সন্তুষ্ট?'

'হ্যাঁ, সন্তুষ্ট। কামান-দাগলে জলদস্যুরা আমাদের উপস্থিতি বুঝে ফেলবে, নিমর্মভাবে হত্যা করতে পারে। তবু একটা জাহাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি, অন্তত একটুকু সাহুনা নিয়ে তো মরতে পারব!'

কথা বলতে বলতে অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা ঠেলে-ধাক্কা কামানটাকে ওপরে তুলে আনল। গোলা বারুদের বাস্রটাকেও নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়।

রাতে শুয়ে জন ডেভিস বলল, 'বন্ধু, একটা কথা বলছি শোন, তুমি আমার জীবনরক্ষা করেছ। তাই তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজই আমি করব না। মাথায় একটা মতলব এসেছে। শুনে বলবে সেটা অনুমোদনযোগ্য কি না?'

'তুমি তোমার মতলবটা কি?'

'আবহাওয়ার পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দ্রুত পরিবর্তনের পথে। শীঘ্রই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঝড় যাবে থেমে, সমুদ্রও শান্ত হবে। জলদস্যুরা সুযোগের সন্ধ্যাবহার করবে। জাহাজ ছেড়ে দেবে আর তাই-যদি হয় তবে তোমার সঙ্গীদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়া হবে না। আর 'সেধুরিটা' ধ্বংস করার জন্য কোনো শাস্তিই তারা পাবে না।'

'কি বন্ধু, তোমার মতলবটা কি, তা তো বললে না।'

'বলছি শোন, এই মুহূর্তে আমাদের সামনে একটামাত্র পথই খোলা। জলদস্যুরা দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার আগে স্কুনারটাকে গুঁড়িয়ে দিতে চাচ্ছে! আমাদের কামান আর গোলাবারুদ সবই বৃথা যাবে না কি? আমাদের যত কষ্টই হোক, কোনোরকমে কামানটাকে টেলে-ধাক্কা টিলার ওপর তুলে নেব। ঠেসে ঠেসে বারুদ ভরে দেব। জলদস্যুদের জাহাজটা যখন টিলার কাছ দিয়ে যাবে, সেই মুহূর্তে কামান দেগে তাকে গুঁড়িয়ে দেব। আশাকরি তখন আর তার দীর্ঘ পথ পাড়ি দেবার মতো অবস্থা থাকবে না। ব্যস, কয়দিনের জন্য এখানেই আটকা পড়ে থাকবে। মেরামত করতে অন্তত দু-সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে সাঁতা-ফি নিশ্চয়ই এসে যাবে।'

ডেভিস-এর মন্তব্যে ভ্যাসকুয়েজ-এর বকের মধ্যে দীর্ঘদিন পুষে রাখা প্রতিহিংসার আগুনটা হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল।

সেটা ছিল পঁচিশে ফেব্রুয়ারি। ধীরে ধীরে বুকে ফুটে উঠল ভোরের রক্তিম আভা। শেষ রাত থেকেই আবহাওয়ার দারুণ পরিবর্তন দেখা গেল। আকাশে মেঘ নেই, ঝড়ের তাণ্ডব নেই বললেই চলে। উত্তাল-উদাম সমুদ্র শান্ত সৌমভাব ধারণ করল। কংখি কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকে এসে দাঁড়াল। মনে তার অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা। সাকরেনদের ডেকে বলল, 'প্রকৃতি এতদিন পরে মুখ তুলে তাকিয়েছে। আর দেরি নয় আজই নোঙর তুলতে হবে! জোয়ার থাকতে থাকতে কাজ হাসিল করতে হবে। সন্ধ্যার দিকে আবার আবহাওয়া বদলে যেতে পারে। সবাই তৈরি হও। বিকেলের আগেই আমরা রওনা দিচ্ছি।'

সাকরেনদরা ঘাড় কাৎ করে জাহাজ ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

সারসাঁতে পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। সবাই চলে গেলে সে এবার মুখ খুলল, 'মাঝরাতে যদি দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে? ঘন অন্ধকারে সমুদ্র ডুবে থাকবে, তখন যদি—'

কংখি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'কী বাজে বকছ! রাতের মধ্যেই আমরা অনেক দূর চলে যাব। কাল সকালেই আমরা সেন্ট বার্থোলোমিউকে পিছনে রেখে সমুদ্রে পৌঁছে যাবে আশা রাখি।'

'এখানে কিছুদিন থাকায় আমাদের খুবই লাভ হল তাই না? ভালো কথা। সেই তৃতীয় আলোকরক্ষীটা কোথায় ডুব দিল? তার যে-কোনো হৃদসই পাওয়া গেল না! দু-মাস না খেতে পেয়ে সে শুকিয়ে শুকিয়ে লেগেছে হয়তো।'

'মরুকণে হতচ্ছাড়াটা! সঁতা-ফি আসার আগেই আমরা যে এখান থেকে কেটে পড়তে পারছি, আমাদের পিতৃপুরুষের ভাগ্য বলতে হবে!'

'বাড়িঘরের কাগজপত্র যা বলছে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সঁতা-ফি পৌঁছে যাবে। বাতিঘরে গিয়ে উঁচু থেকে একবার সমুদ্রটাকে দেখে আসা দরকার। যদি সমুদ্রে কোনো জাহাজ—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কংখি ধমকের সুরে বলল, 'জাহাজ আসলে আসুক। আমরা আর কেউ কাউকে পরোয়া করি না। সারসাঁতের নথিপত্র সবই ঠিকঠাক আছে। প্রশান্ত মহাসাগর আর আটলান্টিক মহাসাগর তো সবার কাছেই উন্মুক্ত। অতএব নির্ভয়ে অন্য যে-কোনো জাহাজকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারব আমরা।'

একটু বেশ বেলা হবার পর সারসাঁতে বাতিঘরে গিয়ে হাজির হল। জানালা দিয়ে বার বার দূর সমুদ্রের ওপর চোখ বোলাতে লাগল সে। দেখতে দেখতে প্রায় দুঘন্টা কেটে গেল। না, কোনো জাহাজই নজরে পড়ল না। উঠে আসতে গিয়েও আরো কিছুক্ষণ দেখা দরকার মনে করে আবার বসে পড়ল। আবার অপলক চোখে তাকিয়ে রইল সমুদ্রের দিকে। আরো কিছুক্ষণ পরে দূরের, বহু দূরের একটা কালো বিন্দুর ওপর তার দৃষ্টি স্থির হল। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে। কিছুক্ষণ পরে সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। জাহাজ! কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে স্টেন আইল্যান্ডের দিকেই ছুটে আসছে জাহাজটা। সারসাঁতের মধ্যে কেমন চাঞ্চল্য দেখা দিল। তার শরীরের সবগুলো মায় একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল, কী ব্যাপার! সঁতা-ফি নয় তো? কিন্তু ৩ মার্চের গোড়ার দিকে তো তার আসার কথা। আজ তো সবে ফেব্রুয়ারির পঁচিশ। তবে কি জাহাজটা আগেভাগেই যাত্রা করেছিল? বাতিঘর থেকে সারসাঁতের দিকে তাকাল সে। হ্যাঁ, যাত্রার জন্য তৈরি হচ্ছে। বয়লারে আগুন পড়ে গেছে। কালো ধোঁয়া ছাড়ছে আকাশচুম্বি চোঙটা। কিন্তু যাই করা যাক, স্টিমারটা আসার আগে নোঙর তোলা যাবে না।

সারসাঁতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় বাতিঘরের জানালায় বসেই রইল। কিছুই যখন করার নেই, মিছে কংখিকে বিরক্ত করে কী হবে? জাহাজটা উল্কার বেগে ছুটে আসছে। তার মন ক্রমেই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। জাহাজটা আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। জাহাজটা ছোট। 'সঁতা-ফি' এত ছোট নয়। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি অনেকদিন। আরো কিছুক্ষণ বাদে তার উৎকণ্ঠা দূর হল। জাহাজটাকে এবার বাক ঘুরে কলনেট অন্তরীপের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল।

নিরুদ্বেগ মনে সারসাঁতে বাতিঘর থেকে নেমে এল।

কংখিরা নির্দেশে তার সাকরেনদরা সারসাঁতের নোঙর তোলার জন্য তৈরি হল। নোঙর তুললেই জাহাজটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবে।

ছয়টায় কংখি সদলবলে জাহাজে উঠল। জোয়ারের ঢেউ জাহাজের গায়ে সশব্দে আঘাত হানতে লাগল। নোঙর উঠল। হাওয়া পেয়ে ফুলে উঠল পালটা। সাড়ে ছয়টায় অন্তরীপের শেষপ্রান্তে পৌঁছল সারসাঁতে।

কংখি সোন্নােসে বলে উঠল, 'আমরা তবে সত্যি সত্যি উপসাগর ছাড়িয়ে এলাম। মিনিট কুড়ির মধ্যেই সাজুয়া অন্তরীপকেও ছেড়ে যাব।'

এমন সময় জলদস্যুদের একজন ব্যস্ত হয়ে কংখির কাছে এসে বলল, 'হজুর, সামনে তাকান। বলুন, এখন কী কর্তব্য? জাহাজটা তখন জলদস্যুদের সেই গুহাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। পাশেই সেই জাহাজটার বড় বড় কতকগুলো টুকরো ভাসছে। সেগুলো না সরিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপায়ান্তর না দেখে কংখি জাহাজটাকে একেবারে তীরের কাছে নিয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটা ভীষণরকম কঁপে উঠল। কংখি গর্জে উঠল, 'কী ব্যাপার! আমাদের লক্ষ্য করে কামানদাগা হয়েছে।'

কংখি যেখানে কামানের গোলাটা এসে লেগেছে সেদিকে ছুটে গেল। সারসাঁতে তাকে অনুকরণ করল। জলরেখা থেকে দুই ফুটমতো উঁচুতে জাহাজের খোল ফেটে বড় একটা গর্ভ হয়ে গেছে। গোলাটা আর একটু নিচে আঘাত করলেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত করে ছাড়ত। আবার একটা কামানের গোলা গর্জন করতে করতে এসে জাহাজের উপর আছড়ে পড়ল। এবারে গোলাটা আগেরটা থেকে কয়েক ইঞ্চি নিচেই আঘাত করল। কংখি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল জাহাজটাকে কামানের গোলায় আওতার বাইরে নিয়ে যেতে। ব্যস নিশ্চিন্ত। জাহাজ এখন পাহাড়ের আড়ালে চলে এসেছে।

জুল ভান-চ(ক)

এবার জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখা দরকার। জাহাজ থেকে ডিভিটিকে নামিয়ে দেখা হল। কংগ্রি সারসাঁতকে নিয়ে জাহাজের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। মারাত্মক ক্ষতি না হলে এটাকে নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার কথা ভাবা যায় না। জল ঢুকতে শুরু করলে গুটিগুটি ডুবে মরতে হবে। মেরামত করতেই হবে।

কংগ্রি গর্জে উঠল, 'এটা বোধহয় সেই তৃতীয় আলোকরক্ষীর কাজ। আর সেখুরির কোন লোককে হয়ত সে উদ্ধার করেছে। উভয়ের মিলিত প্রয়াসেই আমাদের উপর এই আক্রমণ। কামানটাও সেখুরিতেই ছিল। যাক, সে যা হয় পরে ভাবা যাবে। এই মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জাহাজটা মেরামত করে ফেলা।'

কংগ্রি তার বিশ্বস্ত সারসাঁতের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করল, সেই পুরনো জায়গাই ফিরে যাবে। জাহাজ মেরামতের প্রশস্ত জায়গা সেটা। কিন্তু জোয়ারের বিপরীত দিকে জাহাজ চালানো অসম্ভব ভেবে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। মাঝরাতে জোয়ারের টান কমে আসায় জাহাজটাকে বাঙ্কিত জায়গায় এনে নোঙর করল।

জলদস্যুরা গুলিখাওয়া বাঘের মত ক্ষেপে উঠল। তাদের এতদিনের সাধ্য-সাধনা মুহূর্তের মধ্যে নস্যাৎ করে দিল! এদিকে সাঁতা-ফির জন্যও তারা কম ভাবিত নয়। চার পাঁচদিনের মধ্যেই যমদূত এখানে পৌঁছে যাবার কথা। রাগে দুঃখে অপমানে কাঁপতে লাগল জলদস্যু কংগ্রি।

জাহাজটার ক্ষতির পরিমাণ যদি সামান্য হত তবে কংগ্রি অবশ্যই তাকে এখানে এনে ফেলত না। অন্য কোথাও দাঁড় করিয়ে মেরামত করে নিত। জাহাজ নোঙর করামাত্র সারসাঁতে গর্জে উঠল, 'সবার আগে আমরা আমাদের চরমতম শত্রুর খোঁজ করব। কংগ্রি বাধা দিল। তারা সংখ্যায় কতজন অন্ত্রশস্ত্রই কী পরিমাণ আছে কে জানে। অতএব সবদিক বিচার বিবেচনা করে ব্যাপারটা চেপে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মানে মনে দ্বীপ ছেড়ে চম্পট দেওয়া। কংগ্রি জাহাজ মেরামতের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেল।

আমরা আবার ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসের খোঁজ করি। তারা কামানটাকে অতি কষ্টে, বার বার বিশ্রাম করে করে টিলার ওপর তুলে নিয়ে স্কনারটার জন্য অধীর অপেক্ষায় রইল। জন ডেভিস ঠিক করেছিল স্কনারটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবে না। জাহাজ ডুবে গেলে জলদস্যুরা সাঁতরে দ্বীপে উঠে আসবে। তাদের খুঁজে বের করে নির্মমভাবে হত্যা করবে। কিন্তু সামান্য ক্ষতি করলে মেরামতের চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে কয়েকদিন কেটে যাবে। সঞ্জাহখানেকের মধ্যে সাঁতা-ফি এসে গেলে তো কথাই নেই।

জন ডেভিসের পরিকল্পনার কথা শুনে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'তুমি তবে বলতে চাচ্ছ, কাজ এমনভাবে করতে হবে যাতে জাহাজ না ডোবে, অথচ জাহাজের ক্ষতি হয়? মেরামত করতে গিয়ে জলদস্যুদের কয়েকটা দিন ব্যয় হয়, এই তো! ঠিক আছে, তাই হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ চূড়ায় বসে স্কনারের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইল।

কামান দাগার ঘটনা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্কনারটা মেরামতের জন্য নোঙর করার পর থেকে জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ টিলার চূড়ায় বসে গোপনে জলদস্যুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে লাগল। একসময় ভাবল, জলদস্যুরা উত্তেজিত হয়ে তাদের খোঁজ করতে বেরোলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তারা উপযুক্ত আশ্রয়ের আশায় দ্বীপের গভীরে চলে গেল। ছোট একটা গুহায় তারা আশ্রয় নিল। গুহার মুখে বসলেই সমুদ্রের অনেকটা অংশ দেখা যায়। এ-অঞ্চলে কোন জাহাজ এলে অনায়াসেই দেখতে পাবে।

উভয়ে পালা করে গুহার মুখে বসে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগল। জলদস্যুরা খুঁজতে খুঁজতে এ পর্যন্ত ধাওয়া করলেও অবাক হবার কিছু নেই।

সেটা ছিল মার্চ মাসের প্রথম দিন। স্কনার মেরামতের কাজ পুরোদমে চলেছে। জন ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজ সারাটা দিন গুহার মুখে কাটাল। পরের দিনও কাটল একইভাবে। একদিকে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতি, অন্য দিকে ডেভিস ও ভ্যাসকুয়েজের প্রহরা চলল।

ডেভিস সাহসে ভর করে গুহা থেকে বেরিয়ে সামনের সমতল চত্বরে পায়চারি করতে লাগল। চোখ দুটো নিবন্ধ রাখল সমুদ্রের দিকে কিছুক্ষণ পরে আবার সঙ্গীর কাছে ফিরে গিয়ে বলল, 'আমরা গুঁটি গুঁটি গিয়ে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতের ব্যাপারটা দেখে এলে কেমন হয়। এই জোয়ারে রওনা দেবে, কি না জানা যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ চমকে উঠে বলল, 'সে কি? জলদস্যুদের আড্ডার কাছে গিয়ে প্রাণ দেবে, নাকি?'

'ঠিক আছে। তুমি তবে এখানেই থাক, আমি বাতিঘরে যাচ্ছি। এক জায়গায় এমন করে অতর্কের মত বসে থাকতে ধৈর্য ধরছে না আমার। তুমি কিন্তু সমুদ্রের দিকে নজর রাখবে। আমি সন্ধ্যায়ই ফিরে আসছি।'

শেষপর্যন্ত স্থির হল উভয়েই সেখানে যাবে। জন ডেভিসকে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে বলে ভ্যাসকুয়েজ গুহার ভেতরে গেল। জামা ছিড়ে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা দড়ির মতো তৈরি করল। কোমরের একদিকে একটা সুতীক্ষ্ম ছোরা আর অন্য দিকে পাশাপাশি দুটো পিস্তল গুঁজে নিল। ফিরে এসে সে একটা পিস্তল জন ডেভিসকে দিল। কোমরের দড়িটা দেখিয়ে জন ডেভিস ভ্যাসকুয়েজকে ব্যাপার জিজ্ঞেস করল।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'সন্ধ্যায় ভালো করে বুঝিয়ে দেবখন। সেখানে থেকে বাতিঘরের দূরত্ব তিন মাইলের কম নয়। তারা পাথরের আড়াল দিয়ে পথ চলতে লাগল। ফাঁকা জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে চলল। সন্ধ্যা ছয়টার কাছাকাছি তারা বাতিঘরের সামনে পৌঁছল। চুপিচুপি বাতিঘরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখান থেকে জলদস্যুদের জাহাজ মেরামতের কাজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তারা পুরোদমে কাজ করে চলেছে।

একসময় ডেভিস আচমকা ভ্যাসকুয়েজের হাত চেপে ধরে প্রায় ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'জোয়ার আসছে! শোনো, ওই শোনো শব্দ!'

ভ্যাসকুয়েজ অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে একটা পাথর তুলে নিল। ব্যস, একটা গহ্বর সৃষ্টি হ'য়ে গেল। দুজন কোনোরকমে গর্তটায় ঢুকতে পারে। ভ্যাসকুয়েজ জন ডেভিসকে গর্তে ঢুকিয়ে বলল, 'তুমি অপেক্ষা করো এখানে, কাজ সেরে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরছি। জলদস্যুরা যাতে দ্বীপ ছেড়ে যেতে না পারে সে-ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি আমি।'

কথা বলতে বলতে ভ্যাসকুয়েজ পকেট থেকে দুটো মোড়ক বের করল। তারপর মোড়ক দুটো জন ডেভিসকে দেখিয়ে বলল, 'বারুদ দিয়ে ডিনামাইটের মত দুটো বিস্ফোরক তৈরি করেছি! আর জামা ছিড়ে তৈরি করা দড়িটা পল্টে হিসেবে ব্যবহার করব। মোড়ক দুটো মাথায় বেঁধে অন্ধকারে সাঁতার কেটে জাহাজে যাব। মাস্তুলের কাছে মোড়ক দুটো রেখে সলতেতে আগুন জ্বেলে পালিয়ে আসব।'

জন ডেভিস তার কাঁধ চাপড়ে বলল, 'আঃ! বেড়ে বুদ্ধি তো! কিন্তু এরকম বিপদজনক কাজে তোমাকে একা ছাড়ব না। আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

ভ্যাসকুয়েজ তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল সে একাই যাবে।

জাহাজটা ঘূটঘূটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভ্যাসকুয়েজ খালি গায়ে বিস্ফোরক পদার্থগুলো মাথায় বেঁধে জলে নামল। কোনোরকম শব্দ না করে, খুবই সাবধানে সাঁতারে জাহাজটার কাছে গেল। নোঙর ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করল। ঝাঁকুনি খেয়ে শিকলটা বনবনিয়ে উঠল। জাহাজের গায়ের সঙ্গে মিশে শেকল বেয়ে একটু একটু করে উঠে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে মাস্তুলের কাছে গেল। ডেকের ওপর মাস্তুলের একেবারে গা-ঘেঁষে বিস্ফোরকের মোড়ক দুটো রাখল। দুটো সলতে লাগিয়ে দিল সেগুলোতে। এখন সমস্যা দেশলাইটা ভিজে গেছে কি না না, তবু রক্ষে-ভেজে নি। খুব সাবধানে যতটা সম্ভব কম শব্দ করে দেশলাই জ্বালাল। সলতে দুটোয় অগ্নি সংযোগ করল। ব্যস, কাজ হাসিল। শেকল বেয়ে আগের মতোই সাবধানে জলে নেমে এল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ভয়ঙ্কর দু-দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। সে কী শব্দ! ঘুমন্ত জলদস্যুরা হকচকিয়ে উঠল।

জলদস্যুরা যখন হৈ হুটগোলের মধ্যে আকস্মিক ঘটনাটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে জল্পনা কল্পনা করছে, ঠিক তখনই নিঃশব্দে জল থেকে উঠে এল একটা লোক। হাঁপাতে হাঁপাতে জন ডেভিস এর কাছে এল, গুহায় ঢুকে পড়ল। গুহার মুখে পাথরটাকে এমনভাবে রাখল যাতে হঠাৎ করে বাইরে থেকে গুহা বলে মনে না হয়।

জন ডেভিস-এর কৌতূহল দূর করতে গিয়ে ভ্যাসকুয়েজ বলল, 'মনে হচ্ছে কাজ হয়েছে। তবে ক্ষতির পরিমাণ বুঝতে পারছি না। ঈশ্বর যেন শয়তানগুলোকে আরও একমাস দ্বীপে ফেলে রাখেন।'

জলদস্যুরা বুঝতে পারল, এটা তৃতীয় আলোকরক্ষীটার কাজ। তারা দলবেঁধে আঁততায়ী খোঁজে ঘুরে বেড়াল হাতে হাতে বন্দুক নিয়ে। ব্যর্থ প্রয়াস। সকালের দিকেও তাদের গুহার আশেপাশে জলদস্যুদের পায়ের ছাপ ও টুকরো টুকরো কথাবার্তা শুনতে পেয়েছে। না, কোথাও তাদের খুঁজে পেল না। বাধ্য হয়ে হতাম মনেই তাদের জাহাজে ফিরতে হল।

ভ্যাসকুয়েজ নির্দিষ্ট লক্ষে আঘাত হানতে পারে নি। আর একটু হলেই জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যেত। নেহাত ভাগ্য ভালো, অস্ত্রের ওপর দিয়েই গেছে। ডেকের সামান্য অংশ ভেঙে দুমড়ে গেছে। তেমন কোনো ব্যাপার নয়।

ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস গুহার বসে জলদস্যুদের একটা কথা শুনতে পেল তাতে বুঝে নিল এত প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। জীবনের মায়া তুচ্ছ করে সে যে বুকি নিয়েছিল তাতে জলদস্যুদের কতটুকু ক্ষতিই বা করতে পারল? মাত্র কয়েক ঘণ্টা দেরি হয়েছে মাত্র, কালই অনায়াসে নোঙর তুলে দ্বীপ ছেড়ে যাবে।

জলদস্যুরা জোয়ারের অপেক্ষায় রয়েছে।

অস্থিরচিত্ত ভ্যাসকুয়েজ আর গুহার মধ্যে থাকতে পারল না। সে পাথরটা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। একটা পাথরের চাইয়ের আড়ালে যথা সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রেখে জলদস্যুদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগল। উত্তেজনায় সে ফেটে পড়ছে যেন।

জলদস্যুরা কংগ্রি নির্দেশে জাহাজে উঠে পড়ল। কংগ্রি পার্শ্বদূর সারসাঁতেকে নিয়ে বাতিঘরটা দেখতে গেল। ভ্যাসকুয়েজ দূর থেকে দেখতে পেয়ে জন ডেভিসকে বলল, 'সাবধান তারা দুজন বাতিঘরের দিকে আসছে।' উপায়ান্তর না দেখে সেও গুহায় ঢুকে পড়ল।

গুহা থেকে উঁকি দিয়ে তারা দেখল, 'সারসাঁতে বাতিঘরের জানালায় সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, চোখে তার টেলিস্কোপ। সমুদ্রে কোন জাহাজ দেখা যায় কি না খুঁজছে। সারসাঁতে টেলিস্কোপের মুখটা বার বার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে খুঁজল। না, সমুদ্রের বুকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবু নিশ্চিত হতে পারল না সে। যন্ত্রটা চোখে লাগিয়েই রাখল। বেশ কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে একসময় আচমকা বাঘ দেখার মত চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশ! সর্বনাশ হতে চলেছে। সাঁতা-ফি! সাঁতা-ফি আসছে? আতঙ্কে তার সর্বাস্থ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। হাত থেকে পড়ে গেল টেলিস্কোপটা। কংগ্রি ছুটে এল। জানালা দিয়ে উঁকি মারল। উদ্ভার বেগে ছুটে আসছে সাঁতা-ফি। কংগ্রির শরীরের সব কটা মায়ু সমস্তর বনবনিয়ে উঠল। রক্তের গতি হল দ্রুততর।

সুবিশাল জাহাজ সাঁতা-ফি উদ্ভার বেগে ছুটে আসছে, উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের বুকে আলোড়ন সৃষ্টি করে! বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে কংগ্রি। সারসাঁতে বলল, 'সাঁতা-ফি এসে পড়ল বলে! এখন উপায়?'

কংগ্রি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'নির্মম অভিশাপ জড়িয়ে রয়েছে আমাদের প্রতি পদক্ষেপে। ঐ শয়তান দুটো দু-দুবার আমাদের ওপর আঘাত না হানলে আজ আমাদের এমন দুর্ভোগে পড়তে হত না।'

সারসাঁতে বলল, 'গতস্য শোচনা নাহি। এখন কী কর্তব্য বলো?'

'কর্তব্য একটাই। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে নোঙর তুলতে হবে।'

‘আমরা বেশি দূর এগোতেও পারব না, সাঁতা-ফি এসে পড়বে।’

‘অসম্ভব! বাতিঘরের আলো না জ্বললে জাহাজের ক্যাপ্টেন এখানে আসতে ইতস্তত করবে।’

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ অন্ধকারে যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে সেটা ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিসও বুঝতে পেরেছে। কেন বাতিঘরের আলো জ্বলছে না, ভেবে হয়ত জাহাজ দাঁড় করিয়ে রাখবে দূর সমুদ্রে। আর তা যদি না হয় তবে সেধুরির মতো তীরে এসে আঁহুড়ে পড়বে, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, ‘বন্ধু, চলো আমরা ছুটে বাতিঘরে যাই, আলো জ্বলে সাঁতা-ফি’কে দীপের অবস্থিতি জানাই।’

‘সে সময় নেই! আমরা পৌঁছবার আগেই হয়ত দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অতএব এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।’

কংগ্রি সাকরেদদের জাহাজের নোঙর তুলতে বলল। তড়িঘড়ি কাজ হল। বিকট আওয়াজ তুলে জাহাজ এগিয়ে চলল। একসঙ্গে সব কটা পাল তুলে দেওয়ায় উপসাগরে পৌঁছতে সময় লাগল না তারা।

বিধি বাম! হঠাৎ হাওয়া পড়ে গেল। জাহাজের গতি গেল কমে। শ্রোতের বেগ কম। হাওয়াও নেই। জাহাজের ক্ষমতা কী যে আগের মতো ছুটেবে? জোয়ারের জন্য অপেক্ষা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ধীরমহুর গতিতে জাহাজ ইগোর উপসাগরের দক্ষিণ উপকূলের দিকে এগোচ্ছে। এদিককার উপকূল ‘জাহাজবিধ্বংসী’ নামে পরিচিত। বহু জাহাজ ধ্বংস করে এ-উপকূল গায়ে কলঙ্ক মেখেছে।

কংগ্রি ও তার সাকরেদরা কঠোর পরিশ্রম করে জাহাজটাকে কোনরকমে মাঝসমুদ্রে নিয়ে ফেললে। কিন্তু জোয়ার? জোয়ার এলেই বা কী লাভ? এখান থেকে জোয়ারের সাহায্য পাওয়াও দুরাশা। তবে এখন উপায়? তারা জাহাজের নোঙর ফেলতে বাধ্য হল।

ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিস শেষ পর্যন্ত একমত হল। দ্রুতপায়ে বাতিঘরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল।

জলদস্যুদের একজন আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, ‘আলো! আলো! বাতিঘরে আলো জ্বলছে!’

সারসাঁতে উম্মাদের মতো গলা ছাড়ল, ‘আলো! শয়তানগুলো বাতিঘরের আলো জ্বলে দিয়েছে! সর্বনাশ করেছে!’

কংগ্রি গর্জে উঠল—‘ভেড়াও! জাহাজ তীরে ভেড়াও!’

সারসাঁতে জিজ্ঞেস করল, ‘কেন? তীরে ভেড়াবে কেন?’

‘শয়তানগুলোকে হত্যা করে বাতিঘরের আলো নেভাতে হবে। দেরি নয়, জাহাজ তীরে ভেড়াও।’

‘কিন্তু ইতিমধ্যে সাঁতা-ফি যদি পৌঁছে যায়?’

ই, কথাটা তো ঠিকই! সাঁতা-ফি পৌঁছে গেলে একেবারে কেলঙ্কারীর একশেষ করে ছাড়বে। কংগ্রি দমে গেল।

নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। জাহাজ তীরে ভেড়াতে যখন বিপদের আশঙ্কা, জাহাজ থাক। নৌকা করে চলল তারা বাতিঘরের দিকে। যে করেছে হোক, বাতিঘরের আলো নেভাতেই হবে। সঙ্গে করে বন্দুক, পিস্তল আর গুলিগোলা নিতে ভুলল না তারা। মিনিট পনের মধ্যই প্রায় দেড় মাইল-রাস্তা অতিক্রম করে এল কংগ্রি। বাতিঘরের দরজার কাছে গিয়েই থমকে দাঁড়াতে হল কংগ্রিকে। এ কেমন হল। উন্মত্ত প্রায় কংগ্রি গর্জে উঠল, ‘ভেঙে ফেল! দরজা ভেঙে ফেল! কিন্তু হায়! ইস্পাতের চাঁদর দিয়ে তৈরি দরোজা ভাঙবে কী করে? তবু কুড়োল দিয়ে চেষ্টা করল বহুক্ষণ না, অসম্ভব। সারসাঁতে বন্টু খোলার চেষ্টা করল। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বন্টুগুলো ভেতর থেকে আটকানো। এখন উপায়? মিনারে ওঠার একটামাত্রই পথ। সর্বনাশ! সাঁতা-ফি যে এসে পড়ল!

কংগ্রি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। সারসাঁতে কোথেকে একটা লোহার বড় মই টানতে টানতে নিয়ে এল। কংগ্রির মনে আবার উৎসাহ জেগে উঠল।

মই বেয়ে তারা ওপরে উঠতে লাগল! সবার আগে আগে উঠছে দলের মাতব্বর কংগ্রি, তারপর সারসাঁতে ও অন্য দু-তিনজন জলদস্যু! আচমকা পিস্তলের শব্দ গর্জে উঠল। একবার দুবার নয়, পরপর কয়েকবারই পিস্তল গর্জে উঠল। ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। সারসাঁতে ও অন্য এক জলদস্যু গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

‘সাঁতা-ফি’র সিঁটি শোনা যাচ্ছে। কাছে—একেবারে তীরের কাছাকাছি চলে এসেছে।

কংগ্রি প্রমাদ গুল! সব শেষ! পালাবার সুযোগ পর্যন্ত বন্ধ। পালিয়ে যাবেই বা কতদূর? মৃত্যু মাথার ওপরে। সাঁতা ফি নোঙর ফেলেছে! শেকলের ঝনঝন আওয়াজ ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসের মনে আশায় সঞ্চার করল।

ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিস ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর কামরায় ঢুকল। ক্যাপ্টেনই তলব করেছেন তাদের। কর্তব্যে অবহেলা। দেরি করে আলো জ্বালার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে।

ভ্যাসকুয়েজ বলল, ‘স্যার, নয় সপ্তাহ পরে আজই প্রথম আলো জ্বলল।’

‘কেন? ফিলিপ কোথায়? মরিস কী করছে?’

‘সাঁতা-ফি এখান থেকে নোঙর তোলার তিন সপ্তাহ পরে তারা নির্মমভাবে নিহত হয়েছে স্যার।’

ভ্যাসকুয়েজ এক এক করে বলল, কী করে ফিলিপ আর মরিস নিহত হয়েছে। বিশালায়তন জাহাজ সেধুরির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির কথাও বিস্তারিত বিবরণ দিল।

জন ডেভিস জানাল, বাতিঘরে আলো জ্বলবার উদ্যোগে ভ্যাসকুয়েজই নিয়েছিল। তারই অটুট মনোবলের জন্যই বাতিঘরের আলো জ্বলে সাঁতা-ফি-কে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এ-কথা বলতে ভোলে নি। আর আলো না জ্বাললে জলদস্যুরা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে যেত।

ভালোভাবে সকাল হয় নি তখনো। ঘীপের সর্বত্র আলো-আঁধারীর খেলা চলছে। জলদস্যুদের জাহাজটা দখল করার জন্য একদল সশস্ত্র যুবক-নাবিক গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল। ফিলিপ ও মরিসের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গত রাতে অবশ্য সারসাঁতে ও অন্য একজন নাবিক ভ্যাসকুয়েজের হাতে প্রাণ দিয়েছে। বাকি শয়তানগুলো কোথায় গিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে, কে জানে? বিশালায়তন দ্বীপে পাহাড়, গুহা ও খানাপ্রদ ছড়িয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বের করা বাস্তবিকই সাধ্যাতীত। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ তবু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার লোক নয়। তাদের খাবার দাবার পড়ে রয়েছে। উপোস করে কদিন টিকে থাকবে? এদিকে সকাল হতে না হতেই ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ ভ্যাসকুয়েজ ও জন ডেভিসকে নিয়ে জলদস্যুদের গুহার দিকে রওনা দিল। সঙ্গে রয়েছে বন্দুক ও পিস্তল। গুহার ভেতর ঢুকে তাদের হতাশই হতে হল। গুহা শূন্য, জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবে গুহায় যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র জমা রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে তাদের তেমন কিছু অস্ত্রও নেই। অতএব আশা করা যাচ্ছে, না খেয়ে শুকিয়ে কুকড়ে মরার চেয়ে আত্মসমর্পণ করাকেই শ্রেয় মনে করবে দস্যুরা।

জলদস্যুরা আত্মসমর্পণ করলেও অবাক হবার কিছু নেই ঠিকই। কিন্তু সে আশায় তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর নির্দেশে নাবিকরা প্রায় সম্পূর্ণ দ্বীপটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু কোথায় তাদের টিকির নাগালও পাওয়া গেল না।

১০ মার্চ। সকালের দিকে কয়েকটা ফুজিয়ান বাতিঘরে ঢুকল! ক্লাঙ্ক—অবসন্ন তাদের দেহ। ক্ষিদে-তেষ্টায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল তারা। কিন্তু দলের মাতব্বর সেই কংগ্রি? হ্যাঁ, সেও ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। পা টলছে, কথা বলার শক্তি পর্যন্তও নেই তার। তার সেই তেজ, সেই দর্প কোথায় কর্পূরের মতো নিঃশেষে উবে গেছে।

কিন্তু কংগ্রি কেন ধরা দিল? তার তো ভালোই জানা আছে, অনেক দুর্ভিক্ষের জন্য তাকে ফাঁসির দড়ি গলায় পরতেই হবে।

না, নিষ্ঠুর জলদস্যু সর্দার কংগ্রি তার কাজের জন্য অনুতপ্ত নয়। কিন্তু হাতকড়া পড়বার সুযোগ না দিয়ে সে চকিতে কোমর থেকে পিস্তলটা টেনে নিল। পিস্তলের মুখটা নিজের কপালে ঠেকিয়ে গুলি ছুড়ল। শেষ! মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ।

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ সঙ্গে করে তিনজন নতুন আলোকরক্ষী নিয়ে এসেছিল। ৩ মার্চ তারা বাতিঘরের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করল। বাতিঘরের আলো আবার জ্বলল। মাত্র সাতজন জলদস্যু জীবিত রয়েছে। 'সাঁতা-ফি'র বন্ধ ঘরে বসে তারা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে।

ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ নবনিযুক্ত আলোকরক্ষীদের তিন মাসের প্রয়োজনীয় খাবারদাবার ও অস্ত্রশস্ত্র বুঝিয়ে দিল। 'সাঁতা-ফি'র এবার নোঙর তোলার পালা ভ্যাসকুয়েজ আর জন ডেভিসও জাহাজে উঠল। স্টেটন আইল্যান্ডকে চিরদিনের মতো বিদায় জানিয়ে স্বদেশে ফিরে চলেছে।

সেটা ছিল ১৮ মার্চ। পশ্চিম আকাশে তখন বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিম আভার মেলা বসেছে। ক্যাপ্টেন লাফায়েৎ-এর নির্দেশে নোঙর তোলা হল। সমুদ্রের ডেউয়ের ভালে ভালে হেলে-দুলে মাঝ-দরিয়ার দিকে এগিয়ে চলল 'সাঁতা-ফি'। বাতিঘরের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা তাকে জানানো বিদায়-সম্ভাষণ।

অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস

১৮৬০-এর ৫ এপ্রিল।

সেদিন সকালের লিভারপুল হ্যারল্ড পত্রিকার পাতায় খবরটা প্রকাশিত হল। ব্যস, আর দেরি নয়, পরের দিন ভোর হতে না হতেই ফরোয়ার্ড নামক জাহাজটা অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে নাঙের তুলল।

প্রতিদিন চার মাইল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নিউ গ্রিন্স বন্দর থেকে কত জাহাজই তো ছাড়ে, ভেড়েও কত জাহাজ, কে তার খবর রাখে। কিন্তু ৬ এপ্রিলের ব্যাপারটা একেবারেই স্বতন্ত্র। কাকডাকা সকাল থেকেই কৌতূহলী মানুষ দলে দলে কাতারে কাতারে এসে জমা হতে লাগল, একমাত্র 'ফরোয়ার্ড' নামের জাহাজটির সমুদ্রযাত্রার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার অত্যাশ্রয় বাসনা নিয়ে।

সতাই অত্যাকর্ষ্য অবিস্বাস্য গঠন নৈপুণ্যের অধিকারী অত্যাধুনিক জাহাজ এই ফরোয়ার্ড। এটা ইঞ্জিনের সাহায্যে তো চলেই, পালের দ্বারাও অনায়াসে পথ পাড়ি দিতে পারে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জাহাজটার বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিজদের মধ্যে জল্পনা কল্পনায় লিপ্ত হয়েছেন, এটা নির্ঘাত উত্তর মেরুর দিকে চলেছে। বিশেষ করে পালটার আকার তাদের এরকম ধারণা করতে উৎসাহিত করেছে। আর জাহাজে বোঝাই করা হয়েছে, পাঁচ-ছয় বছর চলার মতো খাদ্যসামগ্রী, সিলমাছের চামড়ার পোশাক আশাক আর, বস্তা বস্তা উল আর ওষুধপত্র দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, জাহাজের নাবিক ও লঙ্করা জানে না জাহাজটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে। কাড়ি কাড়ি টাকা বেতন পাওয়ায় সবাই মুখে কুলুপ এঁটে মহানন্দে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করে চলেছে।

ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে নিযুক্ত যিনি হয়েছেন তিনি নিপাত্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্যানডন নামে লোকটা ক্যাপ্টেন হবার সবদিক থেকে যোগ্য। আর তাকেই কি না করা হয়েছে জাহাজের মেট। এর চেয়ে হাস্যকর ও অবিস্বাস্য ব্যাপার আর কী-ই বা হতে পারে। ক্যাপ্টেনকে মুহূর্তের জন্যও কেউ চোখে দেখে নি। গন্তব্যস্থল কোনদিকে, কোথায়, কিছুই জানা নেই। সবচেয়ে বেশি কৌতূহল সঞ্চার করেছে কুকুরটার খবর প্রচার হওয়ার পর থেকে।

একটা কুকুর নাকি ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেনের পদে বহাল হয়েছে। এমন একটা অবিস্বাস্য কথা প্রচার হলে শহরবাসীদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার তো হবেই। জাহাজের মালিক ও সৃষ্টিকর্তা রিচার্ড শ্যানডন। দুহাতে টাকা খরচ করে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশালায়তন জাহাজটাকে গড়ে তুলেছেন। নিউ ক্যাসলের এক কারখানা ১২০ হর্সপাওয়ার-বিশিষ্ট ইঞ্জিন তৈরি করে দিয়েছেন। ডেকের ওপর ষোল পাউন্ড কামান রাখা হয়েছে। কামান আর বন্দুকের সংখ্যা বেশি না রাখলে কী হবে বস্তা বস্তা বারুদ কিন্তু তোলা হয়েছে। এসব ছাড়া আর যা কিছু নেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিগন্যাস-ল্যাম্প, সহস্রাধিক রকেট, বিচিত্রদর্শন সব যন্ত্রপাতি আর বিশালায়তন কয়েকটা কব্রাত।

রিচার্ড শ্যানডনের হাতে আটমাস আগে অ্যাবারডন থেকে ১৮৫৯-এর ২ আগস্ট তারিখে লেখা অদ্ভুত একটা চিঠি এসেছিল। চিঠিটার লেখক ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন কে. জেড। তিনি লিভারপুলে বসে ওই চিঠিটা হাতে পান। চিঠিটার লেখক জানিয়েছেন, ম্যাকুয়ার্ট কোম্পানির ব্যান্ডে ষোল হাজার পাউন্ড মজুত রেখেছেন। নিজের স্বাক্ষরযুক্ত বেশ কিছুসংখ্যক চেকও চিঠিটার সঙ্গেই তিনি পাঠিয়েছেন। তিনি যেন ব্যান্ড থেকে ইচ্ছামতে প্রয়োজনীয় অর্থ তুলে নেন। আর এও লিখেছেন, রিচার্ড শ্যানডন চিঠির লেখক কে, জেডকে চেনেন না বটে, তবে তিনি তাঁকে চেনেন। ব্যস, এর বেশি কিছু দরকার নেই। তাঁকে ৫০০ পাউন্ড বেতনের বিনিময়ে ফরোয়ার্ড জাহাজের প্রধান কার্যনির্বাহকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আর বছর বছর পঞ্চাশ পাউন্ড করে বেতন বৃদ্ধি করা হবে। তবে এও লিখতে বাদ দেন নি যে, অভিযানটা দীর্ঘদিনের আর বিপদ ও ঝুঁকিবহুলও বটে। চিঠির সঙ্গে জাহাজের নকশাটাও পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ জাহাজটা তৈরির কাজ এখনও আরম্ভই করা হয় নি। নকশা অনুযায়ী মজবুত একটা জাহাজ যেন তিনি তৈরি করেন। জাহাজ তৈরির কাজ মিটে গেলে পছন্দমাক্ষিক পনের জন কর্মচারী যেন বহাল করেন। চিঠির লেখক এবং রিচার্ড শ্যানডনকে নিয়ে তা দাঁড়াবে সতের জনে।

ডা. ক্লবোনি নামে আর একজন সময়মতো হাজির হবেন। তবে একটা শর্ত, নাবিকরা সবাই যেন অবশ্যই ইংরেজ হয়। আর সবাইকে অববাহিত এবং সন্তানসন্ততিহীন হতেই হবে। সবার দৈহিক গঠন সুদৃঢ় এবং মদাসক্তহীন হতে হবে। পাঁচ গুণ বেতন তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। প্রতিবছর শতকরা দশভাগ করে বেতন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা থাকবে। অভিযানের পাট মিটে গেলে প্রত্যেক কর্মীকে অতিরিক্ত ৫০০ পাউন্ড দেয়া হবে। আর তাঁকে অর্থো রিচার্ড শ্যানডনকে দেওয়া হবে অতিরিক্ত ২০০০ পাউন্ড। চিঠিটার শেষের দিকে লিখেছেন, রিচার্ড শ্যানডন যদি উপরোক্ত প্রস্তাব মেনে কাজ করতে সম্মত থাকেন তবে যেন কে. জেডকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেন। ঠিকানা দেয়া আছে—পোস্ট রেস্টানডে, গোটবার্গ, সুইডেন।

তিনি আবার লিখেছেন, ১৫ ফেব্রুয়ারি অতিকায় একটা ড্যানিশ কুকুরকে রিচার্ড শ্যানডনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তার দেখভালের দায়িত্ব তাঁর ওপরই বর্তাবে। কুকুরটার প্রাপ্তিসংবাদ ইতালির পোস্টমাস্টারকে যেন চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেন। প্রয়োজন হলেই ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন হাজির হবেন। নইলে তাঁকে ছাড়াই লিখিত নির্দেশ মেনে রিচার্ড শ্যানডনকেই ফরোয়ার্ড জাহাজকে চালাতে হবে। চিঠির বক্তব্য এ পর্যন্তই।

রিচার্ড শ্যানডন রহস্য সঞ্চারকারী চিঠিটা হাতেপাওয়ার পর অত্যাশ্রয় অগ্রহের সঙ্গে একাধিকবার সেটাকে পড়লেন। কিন্তু কিছুতেই রহস্যভেদ করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না। ব্যাপারটা তাঁর কাছে কুয়াশাশ্রুই রয়ে গেল। কিন্তু

কোনোরকম উত্তেজনার লেশমাত্রও তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল না। তিনি একজন ঝানু নাবিক। সুমেরু প্রদেশে দীর্ঘদিন শিকারে ব্যস্ত ছিলেন। সংসারের পাট নেই। বিয়ে করেন নি। সন্তানসন্ততির প্রশ্নই ওঠে না।

রহস্যজনক চিঠিটা পাওয়ার পরই ঠাণ্ডা মাথায় সোজা ম্যাকুয়াট ব্যান্ডে হাজির হলেন। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন, সত্যিই তার নামে ১৬,০০০ পাউন্ড ব্যান্ডে জমা পড়েছে। ব্যাস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সেখানেই তিনি চিঠি লিখতে বসে গেলেন। কে. জেড. নামক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিটিকে তাঁর সম্বন্ধের কথা জানিয়ে দিলেন।

রিচার্ড শ্যানডন ব্যান্ড থেকে বেরিয়ে সোজা জাহাজ নির্মাণ কারখানায় হাজির হলেন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই শুরু হয়ে গেল 'ফরোয়ার্ড' জাহাজটা তৈরির কাজ।

রিচার্ড শ্যানডনের বয়স চল্লিশ। অকৃতদার। কঠোর পরিশ্রমী। একটা কথা তো অক্ষরে অক্ষরে সত্য, কে. জেড. নামক ব্যক্তিটি যতই অদ্ভুত প্রকৃতির হোন না কেন, তিনি তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে এতগুলো অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, গন্তব্যস্থলের কথা ঘুমাচ্ছেও প্রকাশ করেন নি, সত্য বটে। তিনি তার বিশ্বাসের মর্যাদা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করবেন না। আর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে পীড়াপীড়ি ও করবেন না কিছুতেই।

তিনি এবার বছর ত্রিশেক বয়স্ক জেমস ওয়ান নামে এক যুবককে সেকেন্ড মেট অফিসারের পদে বহাল করলেন। দক্ষ নাবিক। অনেকবার উত্তরাঞ্চলে গিয়েছে। তারপর ডেক নাবিকদের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করা হল জনসনকে। এবার তিনজনে প্রোটেক্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী সূঠামদেহী নাবিক জোগাড় করলেন। এদিকে উল্টানো তিমি মাছের মতো পাখনাওয়ালা হাড়গোড় বের করা ফরোয়ার্ড জাহাজ তৈরির কাজ জোর-কদমে চলতে লাগল। রিচার্ড শ্যানডন মাঝে-মধ্যেই এসে কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে যান।

কর্মী সংগ্রহের পাট চুকে গেলে রিচার্ড শ্যানডন খাদ্যবস্তুসমূহ, পোশাকপরিচ্ছদ, ওষুধপত্র এবং যন্ত্রপাতি কেনাকাটার কাজ শুরু করলেন।

২৩ জানুয়ারি। অন্যদিনের মতোই রিচার্ড শ্যানডন দেরি না করে নৌকায় চেপে জাহাজ কারখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হঠাৎ এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলেন। আগন্তুক বেটেখাটো ও মোটাসোটা, চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। ব্যবহার খুবই সাদাসিঁদে ও হাসিমুখি। একনাগাড়ে কতা বলতে অভ্যস্ত। তবে এত তাড়াতাড়ি কথা বলেন যে, রিচার্ড শ্যানডন তার একটা শব্দও হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। আগন্তুক তদ্রলোক দম নয়োর জন্য মুহূর্তের জন্য থামতেই রিচার্ড শ্যানডন আচমকা প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন, 'আমি কি ডা. ক্রুবোনির সঙ্গে কথা বলছি?'

'তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটানা পনের মিনিট আপনার খোঁজ করছি কমান্ডার। তবে আর মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজির পর মনে করতাম কমান্ডার রিচার্ড শ্যানডন নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। এবার হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সোপ্লাসে বলে উঠলেন, 'করমর্দন করুন জনাব! হাত বাড়ান, করমর্দন করুন!'

করমর্দন সেরে ডা. ক্রুবোনি অনর্গল বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন জনাব, ফরোয়ার্ড হবে কেবল দুজনেরই অভিযান। তবে হুঁশিয়ার। কোনো অজুহাতেই কিছু ফেরা সম্ভব হবে না। অবশ্য আপনি একজন সুদক্ষ ও পাকাপোক্ত নাবিক। আপনারা নিয়ে আমার কিছুমাত্রও আশঙ্কার কারণ নেই। আর সাহসিকতাও অতুলনীয়। আর উপযুক্ত অফিসারই আপনি নিযুক্ত করেছেন জনাব!'

অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে শেষপর্যন্ত রিচার্ড শ্যানডন মুখ খোলার সুযোগ পেলেন, 'ডা. ক্রুবোনি, এরকম একটা অভিযানে আপনি কীভাবে মাতলেন, দয়া করে বলবেন কি?'

কোটের পকেট থেকে একটা চিঠি বের করতে করতে ডা. ক্রুবোনি বললেন, 'এইষে, এভাবে।'

চিঠিটা রিচার্ড শ্যানডনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'নিঃ, চিঠিটা পড়ে দেখুন।'

খুবই ছোট্ট, মাত্র দুছত্রের একটা চিঠি। ইনভারনেস থেকে আঠার শো ঘণ্টার বাইশে জানুয়ারি লিভারপুলের ঠিকানায় ডা. ক্রুবোনিকে চিঠিটা লেখা হয়েছে। লিখেছেন ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন কে. জেড.।

তিনি লিখেছেন—ডা. ক্রুবোনি যদি ফরোয়ার্ড জাহাজে করে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার অগ্রহী হন তবে যেন কমান্ডার রিচার্ড শ্যানডনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

রিচার্ড শ্যানডন চিঠিটা পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই ডা. ক্রুবোনি বললেন, 'একটু আগেই চিঠিটা হাতে পেয়েছি।'

'কিন্তু কোথায় যাবেন জানা আছে কি?'

'তা জেনেই বা কী লাভ, বলুন তো? সবাই আমাকে একজন অতি বিজ্ঞ লোক বলে জানলেও আসলে কিছু আমার পক্ষে কিছুই জানা হয়ে ওঠে নি। কয়েকটা বই লিখেছি বটে। কাটতিও খুব মন্দ হয় নি। তবু স্বীকার করি কিছুই জানা হয়ে ওঠেনি। তাই তো সুযোগ পেলেই জানার অত্যাশ্রয় অগ্রহ নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। শল্যবিদ্যা, ওষুধপত্রাদি, ভূবিদ্যা, ইতিবৃত্ত, খনিজবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, মহাকাশবিদ্যা, শব্দবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে একটু-আধটু জ্ঞান যা অর্জন করেছি সেগুলোকে একটু নাড়াচাড়া দিতেই সমুদ্রে ভাসতে অগ্রহী। যেদিকে, যেদেশে গেলে জানা যাবে, শেখা যাবে সেদিকে যেতেই আমি উৎসাহী।'

রিচার্ড শ্যানডন মুচকি হেসে বললেন, 'তবু সেটা কোনদিকে বলুন তো?'

'যতটা ওনেছি তাতে বুঝেছি, উত্তরদিকে।'

'ক্যাপ্টেন কে, জানেন কি?'

'না, তা জানি না বটে। তবে তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছি, খুবই সদাশয় ব্যক্তি।'

কথা বলতে বলতে উভয়ে জাহাজ নির্মাণ কারখানায় হাজির হলেন। চিৎ হয়ে পড়ে থাকা হাড়গোড়া বের করা ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে দেখামাত্র ডা. ক্রুবোনি আবেগে উচ্চাসে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি জাহাজে চিকিৎসকের পদে বহাল হয়েছেন। বছর চল্লিশেক বয়স। জ্ঞানপিপাসু।

৫ ফেব্রুয়ারি ফরোয়ার্ড জাহাজ নোঙর তুললো।

পনেরোই মার্চ একটা ড্যানিশ কুকুর এডিনবরা থেকে জাহাজে উঠল। রিচার্ড শ্যানডন সেটাকে জাহাজে তুলে নিয়েছেন।

জাহাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেবিন সাজিয়ে গুছিয়ে নিলেন।

ফরোয়ার্ড জাহাজটার ৫ এপ্রিল নোঙর তোলার কথা। রিচার্ড শ্যানডনের যেন আর তর সইছে না। অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন পারলে যেন এখনই নোঙর তুলে জাহাজকে দূর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এর পিছনে কারণও রয়েছে যথেষ্টই। এত সাধ্যসাধনা করে যাদের জোগার করা হয়েছে তারা দেরি দেখলে গুটিগুটি সরেও পড়তে পারে।

আশ্চর্য ব্যাপার! রহস্যজনক ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা তালাবন্ধ। কেবিনটার জানালার গায়ের ঘরটা বরাদ্দ করা হয়েছে কুকুরের জন্য। সত্যই বিচিত্র তার হাবভাব। সে ঘরে থাকার চেয়ে বাইরে ঘুরতেই বেশি আগ্রহী। এমন গঞ্জীর মুখে, দুলকি চালে জাহাজে ঘুরে বেড়ায় যে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় জাহাজের ক্যাপ্টেনই বুঝি ঘুরে ঘুরে কাজের তদারকিতে লিপ্ত। আর তার হাবভাবে এও স্পষ্ট বোঝা যায়, সমুদ্রযাত্রায় সে খুবই পটু। তবে মাঝেমধ্যে এমন ঝকঝকি শুরু করে দেয় যা বাস্তবিকই অসহনীয়। কারো বাগে আসতেই রাজি নয়। ডা. ক্লুবোনি জঙ্গলের হিংস্র বাঘকেও বাগে আনতে পারেন, কিন্তু বেয়াদপ কুকুরটাকে কজা করতে পারলেন না। নাবিকদের কেউ কেউ তো তাকে শয়তানের পার্শ্বচর বলেও আখ্যা দিতে ছাড়ল না।

সময়মতো নাকি সে মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করে জাহাজের কর্মীদের ওপর হুকুম চালাবে। এক নাবিক তাকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই মাথা ফাটিয়ে রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল। ব্যস, এবার থেকে রহস্য সঞ্চারকারী কুকুরটা সম্বন্ধে জাহাজের কর্মীদের মনে ভয় আরও প্রগাঢ় হয়ে উঠল।

ডা. ক্লুবোনি অবুখ শিশুর মতোই সহজ-সরল প্রকৃতির লোক। নিজের কেবিনটাকে তিনি বইপত্র দিয়ে রীতিমতো একটা গ্রন্থাগারে পরিণত করে তুলেছেন। তাকে বৃটিশ মিউজিয়াম বলেও কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না।

রহস্যজনক অদৃশ্য ক্যাপ্টেনের শেষ নির্দেশ, তিনি পত্রমারফত আদেশ না দেয়া পর্যন্ত জাহাজের নোঙর তোলা হবে না। কিন্তু নাবিকদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাদের অনবরত ফোঁসলাচ্ছে জাহাজের চাকরি ছেড়ে কেটে পড়ার জন্য। এমন হতচ্ছাড়া অভিযানে যাওয়ার দরকারই বা কী? জাহাজের গন্তব্যস্থল কোথায় কারোরই যে জানা নেই।

নাবিকরা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় রিচার্ড শ্যানডন খুবই ভীত হয়ে পড়েছেন। আগামীকাল চিঠি যদি নাও আসে তিনি জাহাজ ছাড়তে বন্ধপরিকর।

রাত গিয়ে ভোর হল। চিঠি এল না। এগারোটা বাজল তবু চিঠি আসার নামও নেই। বারোটোর ডাকেও বাস্তব চিঠি এল না। একটায় ভাঁটা শুরু হয়ে গেলে আর জাহাজ ছাড়া সম্ভব হবে না।

অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন উপায়ন্তর না দেখে জাহাজ ছাড়ার আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই একটা খাম দাঁতে চেপে রহস্য সঞ্চারকারী কুকুরটা চাপা গর্জন করতে করতে সেখানে হাজির হল। চিঠি এসেছে! বহু প্রতিক্রি়ত চিঠি এসেছে।

ডা. ক্লুবোনি চিঠিটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতোই কুকুরটা অদ্ভুত কৌশলে তাকে ডিঙিয়ে গেল। রিচার্ড শ্যানডনের কাছে গিয়ে তার পায়ের কাছে চিঠিটা ফেলে দিল। তারপর গঞ্জীর স্বরে পর পর তিনবার ডেকে উঠল।

রিচার্ড শ্যানডন ব্যস্তহাতে চিঠিটা তুলে নিয়ে খামটার গায়ে চোক বুলিয়ে দেখলেন, কেবল রিচার্ড শ্যানডনের নাম লেখা। কোনো তারিখ বা ডাকঘরের সিলমোহর নেই।

খামের মুখটা ছিঁড়তেই ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ উঁকি মারল। তাতে কে. জেডের নির্দেশ—জাহাজের নোঙর তুলুন। ফেরাওয়েল অন্তরীক্ষ অভিযুক্ত জাহাজ চালান।

২০ এপ্রিল সে-বন্দরে জাহাজ ভেড়াবেন। সেখানেও যদি ক্যাপ্টেন হাজির না হন তবে ডেভিস প্রণালী ডিঙিয়ে কফিন উপসাগরে পড়বেন। তারপর সেখান থেকে মেলভিল উপসাগর দিয়ে জাহাজ চালাবেন। চিঠির শেষে কে. জেডের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর।

রিচার্ড শ্যানডন এবার স্বস্তি পেলেন। জাহাজ ছাড়ার আর কোনো বাধাই রইল না।

নোঙর তুলে জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে নাবিকদের মধ্যে ক্রমে স্বাভাবিকতা ফিরে আসতে লাগল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নেচে নেচে হেলে দুলে এগিয়ে চলল অতিকায় জাহাজ ফরোয়ার্ড।

ডা. ক্লুবোনি পায়রার চেয়ে সামান্য বড় একটা প্যাফিন পাখিগুলি করে মারলেন। সামুদ্রিক পাখি খেতে মোটেই সুখাদু নয়। আশটে গন্ধ। কিন্তু তিনি নিজ হাতে হরেক রকম মশলাসহযোগে এমন খোল রান্না করলেন যা খেয়ে সিম্পসন হাত না চেটে পারল না।

১৪ এপ্রিল। সেদিন ফরোয়ার্ড জাহাজ গলফ স্ট্রীমে হাজির হল। এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে গ্রিনল্যান্ডের সঙ্কীর্ণ প্রান্তটা অবস্থিত।

জাহাজ ভরতর করে এগিয়ে চলল। এক সময় জলের ওপর বরফের চাই ভাসতে দেখা গেল।

রিচার্ড শ্যানডনের কপালের চামড়ায় বিশ্বয়ের ছাপ ফুটে উঠল। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তর মেরু রইল সেই কোন প্রান্তে পড়ে আর এখনই জলের ওপর বরফ ভেসে বেড়াচ্ছে!

রিচার্ড শ্যানডনের বিশ্বয়ের কারণ জানতে পেরে ডা. ক্লুবোনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে কয়েকটা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সমুদ্র অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সাল তারিখসহ ব্যক্ত করলেন, সুমেরু থেকে চল্লিশ বিয়াল্লিশ

ডিজি দূরবর্তী অঞ্চলে কবে, কোনস্থানে ভাসমান হিমশৈল লক্ষিত হয়েছিল। অতএব সমুদ্রের জলে ভাসমান বরফের চাঁই দেখে চমকে যাবার কোনোই কারণ নেই।

ডা. কুবোনির অগাধ পাণ্ডিত্যে রিচার্ড শ্যানডন বিশ্বয়ে অভিভূত না হয়ে পারলেন না।

সমুদ্রের একটা বিশেষ রহস্যভেদ করতে কিন্তু ডা. কুবোনিও ব্যর্থ হলেন। তিনি শিকারী হারপুনবীর সিম্পসনের চোখেও ঘটনাটা ধরা পড়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার বেগ কমে গেলে সমুদ্রের বুকে আকাশচুম্বি ঢেউয়ের উদ্ভব হয়। আবার যখন মুঘলধারে বৃষ্টি ঝরতে থাকে তখন সমুদ্র শান্ত সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। রহস্যটা কী?

হাওয়ার বেগ বেড়েই চলেছে। কেবল পালের ওপর নির্ভর করলে বিশেষ এপ্রিল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে ফরোয়ার্ডকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র বাষ্প তৈরি করে ইঞ্জিন চালালেই তা সম্ভব হতে পারে।

রিচার্ড শ্যানডন ওয়ারেনকে হুকুম দিলেন বয়লারে কয়লা জোগান দেওয়ার জন্য। পর্যাপ্ত বাষ্প সৃষ্টি করা হল। ইঞ্জিন চালু হল। তীব্রগতিতে ব্রেক ঘুরতে লাগল। ব্যাস, উল্কার বেগে জাহাজ এগিয়ে চলল ফেয়ারওয়েল অন্তরীপের দিকে।

নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ বিশেষ এপ্রিল ফরোয়ার্ড জাহাজ ফেয়ারওয়েল অন্তরীপে হাজির হল।

চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই গ্রিনল্যান্ডকে অস্পষ্ট দেখা গেল। ডা. কুবোনি রং-তুলি দিয়ে চমৎকার একটা বরফ পাহাড়ের স্কেচ ক্যানভাসের গায়ে ফুটিয়ে তুললেন। অদ্ভুতদর্শন এ-বরফের পাহাড়টাকে পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরাও চাক্ষুষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ডা. কুবোনি ডেকের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলেন, ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন ডিস্কোরি গ্রীপ অতিক্রম করে এ-রহস্যাবৃত অঞ্চলে উপস্থিত হয়েই দু-দুটো জাহাজসহ যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলেন। রহস্য গভীর রহস্যজনক ব্যাপারই বটে।

২১ এপ্রিল। সেদিন ক্যাম্প যেন একেবারে জমাট বেঁধে রয়েছে। তারই মধ্যে দিয়ে কেপ ডেজেলসনকে অস্পষ্ট হলেও দেখা গেল বটে। সারা বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ এখানে সবুজ একটা আভা লক্ষিত হয়। ব্যাস, তারপর বছরের বাকি দিনগুলো কেবল বরফের একাধিপত্য চলে।

ডা. কুবোনি বললেন, 'দশ শতকে গ্রিনল্যান্ড সত্য সত্যই 'গ্রিন' ছিল বটে। আইল্যান্ডের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আট বা নয় শতকে এখানে মানুষের বাস ছিল। আদিকাল থেকে শুরু করে আজ অবধি কতই-না অভিযাত্রী এখানে এসেছে। বাস্তবিকই দুঃখ-যন্ত্রণা-মৃত্যুরহস্য কত এখানে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর শেষ নেই। এখানকার প্রত্যেকটা নামের সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। এবার বিরাট একটা নামের তালিকা যেন এক নিঃশ্বাসে অদ্রলোক আওড়ে গেলেন। আবার প্রত্যেকটা নামের তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে ভুললেন না।

এরপর কদিন ধরে এমন দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে তাদের চলতে হল যা বুঝিয়ে বলা সত্যই দুঃসাধ্য। ইয়া বড় সব বরফের চাঁই তাদের জাহাজ ফরোয়ার্ডকে ঘিরে ফেলল। ক্রমে এগিয়ে আসতে শুরু করল। কোনোক্রমে পাশ কাটিয়ে জাহাজটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হল। অবশেষে পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে উঠল যে, ভাসমান বরফের চাঁইকে লগি দিয়ে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে না দিলে আর রক্ষা ছিল না। কোনোক্রমে ধাক্কা লেগে গেলে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যেত।

২৭ এপ্রিল। মেরুবৃত্ত তখনো অনেক দূরে। এদিকে অনবরত হিমশৈলের সঙ্গে লড়াই করে করে নাবিকরা কাহিল হয়ে পড়ল। মানুষের শরীর তো বটে। দিনরাত্রি এমন অমানুষিক পরিশ্রম, শরীর আর কতক্ষণ বরদাস্ত করতে পারে?

ডা. কুবোনির পাণ্ডিত্য একটা ব্যাপারে ভোঁতা প্রমাণিত হল। সমুদ্রেরজলে ভাসমান হিমশৈলের দূরত্ব নির্ণয় করতে তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হলেন। একটা হিমশৈলকে দেখলে মনে হয় খুবই কাছে রয়েছে। সামান্য এগিয়ে গেলেই বুঝি হাতের নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে। আসলে কিন্তু তার দূরত্ব কম করেও দশ-বারো মাইল। এটাকে একপ্রকার মরিচিকা ছাড়া আর কী-ই বা আখ্যা দেয়া যেতে পারে? শুধু কি এই? সেই সঙ্গে চোখ-ধাঁধানো আলোকচ্ছটা তো রয়েছেই। অত্যাঙ্ক আলোকোচ্ছটায় চোখের সমস্যা দেখা দেয়ার আশঙ্কা ড. কুবোনি চোখে সবুজ কাচের চশমা ব্যবহার করতে লাগলেন।

পরিস্থিতি ক্রমে আরো খারাপ হয়ে আসতে লাগল। বরফের চাঁইগুলো একত্রিম হয়ে ফরোয়ার্ডের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ব্যাপার দেখে নাবিকদের নার্ভ শিথিল হয়ে আসার জোগার হল। কতসব গুজব উঠতে লাগল। ক্যাপ্টেন এখনও চোখের আড়ালেই রয়ে গেছেন। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, এও কারোরই জানা নেই। কিন্তু জাহাজ ঠিকই এগিয়ে চলেছে—কিন্তু কোন লক্ষ্যে?

নাবিকদের মধ্যে জটিলার শেষ নেই। কেউ বলতে লাগল, ক্যাপ্টেন আছে, অবশ্যই আছে, নিজের বন্ধ কেবিনেই অবস্থান করেছেন। দুম করে একদিন কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হয়ত বলবেন, 'এই যে, 'এই তো আমি।' কেউ বা মন্তব্য করল, 'ওই কুকুরটাই ক্যাপ্টেন। গভীর মুখে, দুলকি চালে সে কেমন জাহাজের বুকে চক্কর মারে, কল্লনা করা যায়।' একদিন তো হালের চাকা ধরে এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যে, হঠাৎ করে দেখলে কে বলবে, ওই ক্যাপ্টেন নয়?

রহস্য সম্ভারকারী কুকুরটাকে নিয়ে কুসংস্কারে অন্ধ নাবিকদের মধ্যে জটিলার শেষ নেই। এমন সব অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস ঘটনা তাদের স্মৃতিতে এক-এক করে ভেসে উঠতে লাগল যার কিনারা করা সম্ভব হয় নি। কুকুরটাকে খাবার দিলে তেমন পড়ে থাকে। সে কোথেকে আসে খায়ই বা কী? তবে—?

আর প্রায়ই জাহাজ থেকে নেমে বরফের চাঁইয়ের ওপর দিয়ে চক্কর মেরে আসে, উদ্দেশ্য কি? ভালুকের কবলে পড়ার ভয়ভরও কি নেই? আর কেনই-বা সে বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকে হঠাৎ রহস্যজনক স্বরে ডাকাডাকি করে? এসব নিয়ে অন্ধ অজ্ঞ মানুষগুলোর মন ক্রমেই গভীর আতঙ্কের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটতে লাগল।

ইতিমধ্যে বরফের চাঁইগুলো অস্ত্রোপাশের মতো ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে যেমন করে আঁকড়ে ধরছে মনে একটু জুল বার্ন-৯(ক)

বাদেই বুঝি এটাকে চিড়ে চ্যাপটা করে ফেলবে। কিন্তু অসহায়ভাবে মরা সম্ভব নয়। বরফ কাটার করাত নিয়ে নাবিকরা তৈরি হল। সুতীক্ষ্ণ লোহার লগি দিয়েই বরফের চাইকে কাবু করা গেল না। অনন্যোপায় হয়ে রাতে নোঙর করা হল।

শনিবার। পূর্বদিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হতে শুরু করলে তাপমাত্রা আরো নেমে গেল। সকাল সাড়টায় '৮°'-তে নেমে গেল।

মধ্যরাতে স্থলভূমি থেকে মাইল ত্রিশেক দূরবর্তী অঞ্চলে ফরোয়ার্ড পৌঁছে গেল। এবার বিপদ নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। বরফের চাইগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ভাসতে লাগল। যে-কোনো সময় ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে জাহাজ চালানোর কাজে সবচেয়ে অভিজ্ঞ গ্যারি হালের চাকা শক্ত করে ধরল। সংঘর্ষ এড়িয়ে কোনরকমে জাহাজ তিরতির করে এগোতে লাগল।

আরো কিছুটা পথ যেতে না যেতেই বিশালায়তন হিমশৈল দুদিক থেকে ফরোয়ার্ডকে ঘিরে ধরল। সঙ্গীর্ণ পথ দিয়ে জাহাজটা কোনরকমে গা বাঁচিয়ে বেরিয়ে যেতে পারল। ঠিক তখনই বিশালায়তন একটা হিমশৈল পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল। শুধু কি এই? থেকে থেকে তার গা থেকে বরফের চাই বিকট আওয়াজ করে আছাড় খেয়ে জলে পড়তে লাগল। সর্বনাশ এখন উপায়? এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ। ধার দিয়ে কেটে পড়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। শ-খানেক ফুট বরফের একটা চাঙড় জাহাজের ওপর ভেঙে পড়ার জোগার হল। নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক শুরু হয়ে গেল। অকস্মাৎ গম্ভীর স্বরে কে যেন গর্জে উঠে—‘খবরদার! একটা কথাও নয়!’

গ্যারি নিজেকে সংযত রাখল। হাত মুঠো করে হালের চাকা চেপে ধরে রইল। সে যেন ভাঙবে তবু মচকাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে ভোজবাজার খেলার মতোই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ভাসমান বরফের চাই উধাও হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল রৌদ্রোজ্জ্বল সমুদ্র, বলমল করতে লাগল।

ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে বলে উঠলেন, ‘ডা. ক্রুবোনি এ কেমন ব্যাপার হল?’

ডা. ক্রুবোনি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, ‘খুবই সহজ সরল ব্যাপার। বরফের পাহাড় থেকে বরফের চাঙর ভাঙতে ভাঙতে পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, ভারকেন্দ্র ক্রমেই সরে আসতে লাগল। অবশেষে এমন হল যে বরফের পাহাড়ের পক্ষে মাথা খাড়া রাখা সম্ভব হল না। দুম করে উল্টে গেল। ব্যাস, ব্যাপারটা এই। তবে কাত হয়ে পড়তে আর মিনিট দুই দেরি করলেই আমাদের নিশ্চিত সলিল সমাধি হত, কেউ ঠেকাতে পারত না।’ কথা বলতে বলতে তিনি চোখের মণি দুটোকে অত্যাশ্চর্য সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। ফরোয়ার্ড জাহাজ এগিয়ে চলল সামনের দিকে।

ফরোয়ার্ড জাহাজ হাজার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, জাহাজের উদ্ধৃতন কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ নাবিক পর্যন্ত কেউই এখনও জানে না তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে তারা এমন বিপদসঙ্কুল অভিযানে চলেছে।

ফরোয়ার্ড জাহাজ এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কোথায় এ চলার শেষ? একসময় ফরোয়ার্ড মেরুবৃত্ত অতিক্রম করল। এ অঞ্চলের সমুদ্রে বরফের লেশমাত্রও নেই।

৩০ এপ্রিল। সকাল ছয়টা। রিচার্ড শ্যানডন একটা চিঠি পেলেন। খামের ওপরে বড় বড় হরফে তাঁর নাম লেখা। প্রেরকের নামধাম বা ডাকঘরের সীলমোহর কিছুই নেই। ডা. ক্রুবোনি ও ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনকে সদ্য প্রাপ্ত চিঠিটা দেখালেন। খামটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জনসন গম্ভীরমুখে বলে উঠলেন, ‘রহস্য কিন্তু ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতরই হয়ে উঠছে।’ ডা. ক্রুবোনি নির্বিকার। তিনি সোলাসেই বলে উঠলেন, ‘বাঃ! বেশ! বেশ!’

খামটার মুখ ছিড়ে ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে আনা হল। গ্রিশে এপ্রিলের তারিখে ফরোয়ার্ডের ক্যাপ্টেন কে. জেডের লেখা কয়েক ছত্রের একটা চিঠি। তিনি লিখেছেন, ফরোয়ার্ড জাহাজের ক্যাপ্টেন নাবিক ও অফিসারদের সাহস দেখে অভিভূত। তিনি যেন নাবিকদের কাছে ক্যাপ্টেনের গুণেচ্ছা ধন্যবাদটুকু পৌঁছে দেন। আরো উত্তরে এগিয়ে মেলভিল উপসাগরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেখানে পৌঁছে যেন স্থিতি সাউন্ডে প্রবেশ করার প্রয়াস চালানো হয়।

চিঠির বক্তব্য শোনার পর সবার মুখেই দুশ্চিন্তা ও গম্ভীরের ছাপ ফুটে উঠল। তবে সবাই নিঃসন্দেহ যে, ক্যাপ্টেন পদাধিকারী অদৃশ্য প্রাণীটি জাহাজেই অবস্থান করছে, কিন্তু একজন বাদে। তিনি হচ্ছেন, রিচার্ড শ্যানডন। কারণ, জাহাজের প্রতিটি কর্মী তাঁর খুবই চেনা। তাই যদি হয় তবে চলন্ত জাহাজে চিঠিটি এলই বা কী করে?

রিচার্ড শ্যানডন নাবিকদের ডেকে ক্যাপ্টেনের সন্তুষ্টির কথা এবং তার শুভেচ্ছা জানিয়ে দিলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! ক্যাপ্টেন খুশি হয়ে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন শুনেও তারা গুণ গুণ করে নিজদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ‘এ কার কর্ম? কে লিখেছে রহস্য সঞ্চারকারী চিঠিটা? কুকুরটার কাজ নয় তো?’

রাত্রের আবহা অন্ধকারে বহু দূরবর্তী ডিস্কো দ্বীপের আকাশচুম্বি পাহাড়কে ছায়ামূর্তির মতো নজরে পড়ল। ডিস্কো দ্বীপ ‘ভিমি দ্বীপ’ নামেও কারো কারো কাছে পরিচিত। আঠারো শো পঁয়তাল্লিশের ১২ জুলাই স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন এখান থেকেই তাঁর শেষ চিঠিটা লিখেছিলেন।

৩ মে। ডা. ক্রুবোনি এই প্রথম লক্ষ করলেন, সূর্য আর অস্তমিত হচ্ছে না। দিগন্তরেখা বরাবর একধারে সরে যাচ্ছে।

৩১ জানুয়ারি। এখন থেকে দিন পলে পলে বড় হচ্ছে। এখন সূর্য মোটেই ডুবে যাচ্ছে না। একনাগাড়ে দিন দেখে সবাই প্রথম বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে পড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত চোখে নেমে এল ক্রান্তি—অবসাদ। এবার তাদের কাছে একটা ব্যাপার একেবারে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। অন্ধকারের অস্তিত্বের জন্য আলোকে এমন মধুর বোধ হয়।

অত্যাঙ্ক আলোকরশ্মি অনবরত বরফে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে এমন আঘাত হানলে কতক্ষণই বা বরদাস্ত করা সম্ভব?

৬ মে। সর্বাধিক উত্তর সীমান্তবর্তী ড্যানিম উপনিবেশে ফরোয়ার্ড জাহাজ হাজির হল। জাহাজ নোঙর করতেই রিচার্ড শ্যানডন, ডা. ক্লুবোনি আর কয়েকজন নাবিককে সঙ্গে করে নেমে গেলেন। এক্সিমো-গভর্নর সহধর্মিণী ও পাঁচটি পুত্র কন্যাকে নিয়ে এগিয়ে এলেন তাদের অভ্যর্থনা জানাতে।

একমাত্র গভর্নরের আবাসস্থলটি কাঠের আর বাকি সবই ইগলু বরফের তৈরি গম্বুজাকৃতি বাসগৃহ। ঘরের ভেতরে সিলমাহের মাংসের, মাছের আর মানুষের গায়ের আস্টে গন্ধ মিলে অস্বাভাবিক উৎকট গন্ধের সৃষ্টি করেছে।

আমাদের ফরোয়ার্ড জাহাজের দোভাষী অত্যাবশ্যক কুড়িটা এক্সিমো শব্দ রপ্ত করেছে। সেগুলো ব্যবহার করে কোনোরকমে তাদের সঙ্গে মনের ভাব আদান-প্রদান করা সম্ভব হল।

এক্সিমোদের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে জানা গেল, আজ পর্যন্ত কেউ-ই এখানে আসে নি। এমন কি কোনো তিমি শিকারের জাহাজও এখানে ভুলেও কোনোদিন ঢু-মারে নি।

সন্ধ্যার কিছু আগে ষ্টং খুঁজে পেতে কয়েকটা আইডার হাঁসের ডিম নিয়ে এল। লবণ-জড়ানো মাংস খেয়ে খেয়ে অভক্তি ধরে গেছে। ডিমের ওমলেট দিয়ে জিভটাকে একটু ঝালিয়ে নেওয়া গেল।

৮ মে। ফরোয়ার্ড জাহাজের পালে বাতাস লেগে ফুলে ফেঁপে উঠল। ধীরমস্থুর গতিতে এগিয়ে চলল আমাদের সাধের জাহাজটা।

বরফের ওপর প্রতিফলিত অত্যাঙ্ক সূর্যরশ্মি অনবরত চোখে এসে আঘাত হানায় জাহাজের অনেকেরই চোখের ব্যামো দেখা দিল। ডা. ক্লুবোনি সবুজ কোনো বস্তু দিয়ে চোখ ঢেকে রাখতে পরামর্শ দিলেন।

রিচার্ড শ্যানডন এক্সিমোদের কাছ থেকে বিশটা লোমশ কুকুর আর একটা স্নেজগাড়ি কিনে জাহাজে তুলে নিয়েছিলেন।

এবার থেকেই আমরা আবার বরফবন্দি হয়ে পড়লাম। চারদিকের জল জমে বরফে পরিণত হয়ে গেছে। সামনে তো দূরের ব্যাপার, পিছনে বা ডাইনে বাঁয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ। আগামী বসন্তের আগে বরফগলার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার দাঁড়িয়ে পড়লেও বিপদ চরম রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

জাহাজের কর্মীদের মনে প্রথমে হতাশা, পরে তা অসন্তোষের রূপ নিল। আসলে কুসংস্কারই তাদের বেশি করে উত্তেজিত করে তুলেছে। ছ-সাত ফুট পুরু বরফ। করাত চালিয়ে টুকরো করা সম্ভব হল না। কোনোরকমে গুণ টেনে তিলে তিলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল ফরোয়ার্ডকে।

১৬ মে। প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ইতিমধ্যে মাত্র দুমাইল উত্তরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেছে বিশালায়তন জাহাজটাকে। ডা. ক্লুবোনি জাহাজ থেকে নেমে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বরফের ওপর আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে যে মায়াজাল সৃষ্টি করেছে তার দৌলতে তিনি কয়েকবার দমাদম আছাড় খেয়ে কোনোরকমে জাহাজে উঠে এলেন। ফিরে এসে তিনি অদ্ভুত এক কথা শোনালেন, 'বৈজ্ঞানিকগণের বোধগম্য হচ্ছে না এখানে যুগযুগান্তর ধরে কী সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে চলেছে। আঠারো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে বরফের একাধিপত্য ছিল। অকস্মাৎ এক অভাবনীয় প্রলয় কাণ্ডে বরফ স্থানচ্যুত হয়। তিমি শিকারিরা তৎপর হয়ে ওঠে। গত বছর থেকে আবার বরফ জমতে আরম্ভ করে। নতুন করে হিমযুগের সূত্রপাত ঘটে।'।

রিচার্ড শ্যানডন পড়লেন মহা কাঁপড়ে। এত কষ্ট স্বীকার করে এতদূর এসে তবে কি ফিরেই যেতে হবে? নাবিকদের মধ্য থেকে গ্যারি তাকে আশ্বাস দিল, যে করেই হোক জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

গ্যারির দৃঢ় মনোবোল রিচার্ড শ্যানডনের মনে আশার সঞ্চার করল। তিনি এবার ডা. ক্লুবোনি ও গ্যারিকে নিয়ে বরফের পরিস্থিতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য জাহাজ ছেড়ে নেমে পড়লেন।

কুসংস্কারাঙ্কন নাবিকরা দেখল এই সুযোগ। তারা খুঁজে খুঁজে অপয়া কুকুরটাকে বের করল। বেচারী তার কামরায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ফলে তাকে বেকায়দায় ফেলে কজা করতে অসুবিধা হল না। তার মুখ ও পাগুলো চেপে ধরে কামরার বাইরে নিয়ে এল। সিলমাহ বরফ ভেদ করে ওপরে উঠে এসেছে এমন একটা গর্ত আগেই তারা দেখে রেখেছিল। কুকুরটাকে সে গর্তটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বরফ চাপা দিয়ে সমাধিস্থ করে দিল।

রিচার্ড শ্যানডন তো দূরের কথা এমন কি ডেকের নাবিকদের অফিসার জনসন পর্যন্ত কুকুরের সমাধির ব্যাপারটার বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না।

রিচার্ড শ্যানডন দেখলেন, নাবিকদের মন থেকে হঠাৎ অসন্তোষ নিশ্চিহ্ন দূর হয়ে গেছে। তারা নিজে থেকে কোমর বেঁধে কুড়ল, শাবল ও গাঁইতি প্রভৃতি নিয়ে বরফ কেটে রাস্তা তৈরি করতে লেগে গেল। রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। এর মধ্যে ফুট পাঁচেক বরফ কাটতেই নাবিকদের জিভ বেরিয়ে যাওয়ার জোগার হল।

১৮ মে। কুয়াশায় মোড়া বরফের রাজ্যে পাহাড়ের অদ্ভুত দর্শন একটা চূড়া সবার নজরে পড়ল। তারা এটার নামকরণ করলেন শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলি। সভ্যই সেটা এমনই কুদর্শন যে, দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে।

শনিবার ভোর হতে না হতেই জাহাজের প্রায় সবাই আর্তানাদ শুরু করে দিল, 'শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলি জাহাজের ওপর আছাড়ি খেয়ে পড়ল বটে! পাহাড়টার চূড়ার ওই ঝুলন্ত বরফের চাঁইটা হুড়মুড় করে জাহাজের ওপর পড়লে এক সঙ্গে সবার বরফ-সমাধি হয়ে যাবে!'

ডা. ক্লুবোনি অনুসন্ধিৎসু নজরে ঝুলন্ত বরফের চাঁইটাকে দেখে নিয়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগলেন, 'চুপ করুন, ফ্লান্ড হোন সবাই। আমি বলছি, ভয়ের কিছু নেই। ওটা নিছকই বরফের ওপর আলোর প্রতিসরণের ব্যাপার। আমার কথা বিশ্বাস করুন—চুপ করুন!'

আবার পুরোদমে বরফ কাটার কাজ শুরু হল। বরফের ওপর ঘন ঘন কুড়ুল, শাবল আর গাইতি আঘাত হানতে লাগল। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? এক সময় আবার হৈ হুটগোল চিৎকার চোঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কিত চোখে নাবিকদের অঙ্গুলি-নির্দেশিত পথে তাকানো মাত্র সবাই কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'ভালুক! শ্বেত ভালুক! না, ড্রাগন—অতিকায় ড্রাগন!'

পরমুহূর্তেই এতগুলো লোককে বেকুব বানিয়ে কুয়াশা ভেদ করে সবার চোখের সামনে অতিকায় একটা কুকুরের ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। হ্যাঁ, সেই কুকুরটাই বটে। বরফের গর্তে নাবিকেরা যাকে সমাধিস্থ করে এসেছিল সেই কুকুরটা বরফের ওপর দিয়ে দিবাি হেঁটে আসছে। আলোর প্রতিসরণের জন্যই কুকুরটা অতিকায় ডাইনোসর বলে ভ্রম হয়েছিল। কুকুরটাকে দেখেই কুসংস্কারে বিশ্বাসী নাবিকরা আতঙ্কে উঠে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল কুকুররূপী সাক্ষাৎ শয়তানটা আবার আমাদের কাঁধে চাপল! তার ওপর অন্তত শয়তানের বৃদ্ধাঙ্গুলির ব্যাপারটা তো রইলই। সর্বনাশের চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত এদের হাত থেকে আর নিস্তার নেই।

ফরোয়ার্ড জাহাজ এবার বরফের ছোট ছোট টুকরোগুলোকে দুধারে সরিয়ে দিয়ে বাষ্পশক্তির সাহায্যে এগিয়ে চলল। নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। কুকুরটা তখনো জাহাজের দিকে ছুটছে। কে যেন শিশু দিচ্ছে। আর শিসের স্বর অনুসরণ করে কুকুরটা এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। কিন্তু কে যে শিশু দিচ্ছে তাকে খুঁজে বের করা কিছুতেই সম্ভব হল না।

ব্যস, নাবিকদের অসন্তোষ চরম রূপ নিল। অজানা অচেনা স্থানে, মৃত্যুর আশঙ্কা থাকায় আর এক কদমও এগোতে তারা রাজি নয়।

নাবিকরা যখন বিদ্রোহে সোচ্চার ঠিক সে-মুহূর্তেই আঠারো শো ফুট ব্যাসের অতিকায় একটা হিমশৈলে ফরোয়ার্ড জাহাজ বন্দি হয়ে পড়তে লাগল। অস্থিরচিত্ত রিচার্ড শ্যানডন কয়েদখানা থেকে অব্যাহতি পাবার পথ খুঁজে বের করতে সবে দূরবীণটাকে চোখের কাছে তুলে নিয়েছেন ঠিক তখনই নাবিক বোর্ডন তার পিছনে এসে দাঁড়াল। শ্লেষাজড়িত ভাঙা গলায় উদ্ভাষণ করল, 'কমান্ডার, আমরা আর এক ইঞ্চিও অগ্রসর হতে পারنا। আমাদের সবার এটাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।'

হাতের দূরবীণটা বাট করে চোখের সামনে তেকে নামিয়ে এনে রিচার্ড শ্যানডন রাগে ফেটে পড়ার জোগার হলেন। ঠিক সে মুহূর্তেই ব্যস্তপায়ে কাছে আসতে আসতে সেকেন্ড মেট জেমস উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'স্যার, আর এক মিনিট দেরি করলেই চূড়ান্ত সর্বনাশ ঘটে যাবে। আমাদের পক্ষে কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না।' কথা বলতে বলতে আকাশচুম্বী হিমশৈলটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

গুলিবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠলেন রিচার্ড শ্যানডন, 'তোমরা নিজের নিজের কাজে যাও। ঝামেলা বাঁধাবার শাস্তি সময় মতো দেয়া হবে।'

ফরোয়ার্ড জাহাজ এবার সোজা দক্ষিণ দিকে ধেয়ে চলল। না, ফয়দা কিছুই হল না। এর চেয়ে তীব্রবেগে ছুটে গিয়ে হিমশৈলটা বেরোবার পথটাকে আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রিচার্ড শ্যানডন হতাশায় নিজের হাত নিজেই কামড়াতে লাগলেন।

নাবিকরা সমস্বরে বলে উঠল, 'পথ পুরোপুরি বন্ধ। সব রাস্তা বন্ধ। দেরি নয়, ঝটপট নৌকো নামিয়ে দাও। শুদাম লুঠ করে সব মদে বোতল লুট করে নিয়ে এসো সব শেষ!'

মুহূর্তে হৈ হুটগোল, রীতিমতো ধুকুস্বর কাণ্ড শুরু হয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে রিচার্ড শ্যানডনের মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ার জোগার হল। অকস্মাৎ বাকশক্তি যেন হারিয়ে ফেললেন। নাবিকরা হঠাৎ এমন করে ভরাডুবি করে দেবে এ যে স্বপ্নেরও অতীত। ডা. ক্রুবোনিও বাজপড়া রোগীর মত নীরবে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগলেন।

এতগুলো লোকের চিৎকার চোঁচামেচি ভেদ করে এক গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সবাই নিজের নিজের কাজে যাও। ফরোয়ার্ডের মুখ ঘোরাও।'

অদৃশ্য কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন শরীরের সর্বশক্তি নিঙড়ে দিয়ে হালের চাকা ঘোরাতে লাগলেন। ব্যস, জাহাজের মুখ ঘুরতে ঘুরতে কোনরকমে চরমতম বিপদটাকে এড়াতে পারল। আর একটু দেরি হলেই পাথরের মতশক্ত হিমশৈলের গায়ে আছড়ে পড়ে ফরোয়ার্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

মুহূর্তের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের কেবিনের দরজা খুলে গেল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন সুঠামদেহী এক যুবাণুরুষ। পোশাক আশাকে রীতিমত ফিটফাট। হ্যাঁ, সন্দেহের কিছুমাত্র কারণ নেই। ইনিই ক্যাপ্টেন, ফরোয়ার্ডের সর্বময় কর্তৃত্ব এরই ওপর ন্যস্ত। তিনি দুটো আঙুল মুখের ভেতরে চালান দিয়ে শিশু দিতেই কুকুরটা ছুটে এসে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে লেজা লাড়তে লাগল।

রিচার্ড শ্যানডন আকস্মিক পরিস্থিতিতে রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন। আচমকা কাঁপা কাঁপা গলায় উদ্ভাষণ করলেন, 'স্যার! পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠলেন—'এ কী গ্যারি—নাবিক গ্যারি!'

হ্যাঁ, রিচার্ড শ্যানডন ঠিকই চিনতে পেরেছেন। গ্যারিই বটে। এতদিন মাথার কোঁকড়ানো, লম্বা চুলগুলো দিয়ে তিনি কপাল ও মুখের বেশ কিছুটা অংশ ঢেকে রেখেছিলেন, তাঁর সুগঠিত চেহারা ও বুদ্ধিদীপ্ত মুখই প্রমাণ দেয়, হুকুম পালন নয়, হুকুম দিতেই সে অভ্যস্ত। গ্যারি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন, জাহাজের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর ন্যস্ত।

অকস্মাৎ নাবিকদের মধ্যে খুশির জোয়ার বয়ে গেল। তারা উল্লসিত হয়ে ক্যাপ্টেন গ্যারির নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

ক্যাপ্টেন গ্যারি এবার জাহাজের সবাইকে উদ্দেশ্য করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, 'আপনারা সবাই শুনুন, আপনি জাতিতে একজন ইংরেজ। তাই আমি এমন এক জায়গায় পদচিহ্ন আঁকতে চাই যেখানে ইতিমধ্যে কেউ পদার্পণ করে নি। আমার একমাত্র দৃঢ় সঙ্গী, আমার হাতের এই স্বদেশের পতাকাটাকেসবার আগে সুমরুতে গেঁথে আসব। আমার

অগাধ টাকা আছে, অভাব কাকে বলে আমার জানা নেই। কথা দিচ্ছি, এখন থেকে প্রতি ডিগ্রি উত্তরে অগ্রসর হওয়ার জন্য আপনাদের এক হাজার পাউণ্ড করে পুরস্কার প্রদান করব। তবে এও খুবই সত্য বটে, কেবল টাকার জোরে সব কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হয় না, এর জন্য অকৃত্রিম দেশপ্রেম অপরিহার্য, এ ব্যাপারে আমার নামেই কার্য সিদ্ধি হবে। কারণ, আমি আমি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। আর একটা কথা সবার জানা দরকার, আমরা এ মুহূর্তে বাহাভর ডিগ্রিতে অবস্থান করছি।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। হ্যাঁ, যে-কোনো ইংরেজ ও নামটার সঙ্গে পরিচিত। নতুন করে তাঁর পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজদের সবার কাছে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, সুপরিচিত হলেও কে তিনি? তাঁর সম্পূর্ণ নাম জন হ্যাটেরাস। টাকার কুমীর। অভিযান প্রিয় এক নির্ভীক ইংরেজ পুরুষ। তাঁর বাবা ছিলেন লণ্ডনের নামকরা এক মদ্য ব্যবসায়ী। ছেলের জন্য নগদ ষাট লক্ষ পাউণ্ড গচ্ছিত রেখে পরলোক গমন করেন। তারপর থেকে অকৃতোভয় জন হ্যাটেরাস বিভিন্ন দুঃসাহসিক অভিযানে দুহাতে ডলার ব্যয় করেছেন। তাঁর একমাত্র বাগ্মী, ইংরেজরা অজ্ঞাত স্থান আবিষ্কারের ব্যাপারে অন্যান্যদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে, সে কলঙ্ক ঘুচাতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কলঙ্কশা আমেরিকা আবিষ্কার করে জগতে অনন্যকীর্তি স্থাপন করে গেছেন। কিন্তু তিনি জাতিতে 'জিওনিজ'। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করে খ্যাত হয়েছেন। তিনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগিজ। চীন দেশের আবিষ্কারক ফার্নান্দো ডা আলম্বাডা, জাতিতে 'পর্তুগিজ', কানাডা আবিষ্কার করেন জ্যাকুইজ কার্টিয়ার। তিনি ছিলেন ফ্রান্সের অধিবাসী। ইংরেজরা এরকম কোন মহৎ কীর্তি স্থাপন করতে পারে নি। কেবল কজির জোরে তারা ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় ছড়ি ঘুরিয়ে চলেছে।

ইতোপূর্বে হ্যাটেরাস বহুবার দক্ষিণ সাগরে অভিযান করেন। অবশেষে আঠারো শো হেচগ্রিঙ্গে বাফিন উপসাগরে যাওয়ার জন্য হ্যালিফেক্স জাহাজে করে অভিযান করেছিলেন। নাবিকদের অমানুষিক কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। ব্যাস, তারপর থেকে নাবিকরা ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের অভিযানের কথা শুনে দূর থেকে অভিবাদন করে।

এতকিছুর পরও অভিযানপ্রিয় দুর্ধর্ষ হ্যাটেরাস আঠারো শো পঞ্চাশে ফেয়ারওয়েল জাহাজ নিয়ে উত্তরাঞ্চলের দিকে রওনা হন। ডা. ক্রুবানি সঙ্গদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু স্থানাভাবে তাঁকে হতাশ হতে হয়েছিল।

দীর্ঘপথ পাড়ি দেয়ার পর, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে এক সময় তিনি চরম বিপদে পড়লেন। বরফ সাগরে ফেয়ারওয়েল ধ্বংস হয়ে গেল। তার সঙ্গী সাথীরা নির্মমভাবে প্রাণ হারাল। অনন্যোপায় নিঃসঙ্গ হ্যাটেরাস জমাটবাঁধা বরফের ওপর দিয়ে দুশো মাইল পথ পাড়ি দিলেন। শেষপর্যন্ত একটা তিমি শিকারের ড্যানিশ জাহাজে চেপে নিজের দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।

এবার নিজের নাম গোপন করে নাবিকের পরিচয়ে লিভারপুলে দুবছর কাটালেন। রিচার্ড শ্যানডনের সঙ্গে পরিচয় হল। মনে ধরে গেল তাকে। ছদ্মনামে চিঠি লিখে তাঁকে দিয়ে বিশালায়তন 'ফরোয়ার্ড' নামক জাহাজটাকে তৈরি করালেন। তখনই মনস্থ করেছিলেন, চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করবেন না। ইতোমধ্যে ফরোয়ার্ডের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাণ্টা গেছে, নাবিকরা বঁকে বসেছে। তবু ধৈর্য ধরে নিজেকে গোপনই রেখেছেন, আত্মপ্রকাশ করেন নি। এখন পরিস্থিতি চরমতম হয়ে ওঠায় অনন্যোপায় হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।

এতদিন যে গ্যারি সামান্য নাবিকের কাজে ফরোয়ার্ড জাহাজে কাজে লিপ্ত ছিলেন এখন তিনিই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের পরিচয়ে সর্বজন-সমক্ষে হাজির হলেন। এতে জাহাজের কর্মীদের কেউ যারপরনাই খুশি হল, কেউ-বা মুখ ব্যাজার করে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাঁকে সবাই রগচটা একগুঁয়ে লোক বলেই জানে। প্রতিবাদ করা বা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

পরদিনটা ছিল রবিবার। ছুটির দিন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, রিচার্ড শ্যানডন, ড. ক্রুবানি, জনসন প্রভৃতিকে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নির্ধারণের জন্য সভায় বসলেন। ক্যাপ্টেন বললেন, পূর্ববর্তী অভিযানকারীরা উত্তর মেরুর অভ্যন্তরভাগে হাজির হতে না পারলেও বরফমুক্ত চমৎকার সমুদ্র দেখে এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে ক্যাপ্টেন নামধা, খ্রিস্টাব্দ ও তারিখ পর্যন্ত গড়গড় করে বলে দিলেন। সুমেরুশ কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছে তাঁর কথিত বরফ মুক্ত সমুদ্রটা।

এত কিছু শোনার পরেও রিচার্ড শ্যানডন গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমি কিছু বলব এটা কেবলমাত্র অনুমান নির্ভর তথ্য। অতএব এতে কতখানি নির্ভর করা চলে বুঝি না।'

ডা. ক্রুবানি চোখে-মুখে চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে তুলে বললেন, পৃথিবীর মধ্যে শীতলতম স্থান হিসেবে যে স্থানদুটোকে চিহ্নিত করা হয় তাদের একটা এশিয়ায় (৭৩°—৩° উত্তর ও ১২০° পূর্ব) আর দ্বিতীয়টা আমেরিকায় (৭৮° উত্তর ও ৯৭° পশ্চিম) অবস্থিত। সম্প্রতি আমরা অবস্থান করছি মেরুবিন্দু থেকে ১২০° নিচে। অতএব এ-অঞ্চলে বরফমুক্ত সমুদ্রের অবস্থান কেন অসম্ভব, বলতে পারেন? তাই স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সুমেরুর ঠিক কেন্দ্রস্থলে বরফমুক্ত সমুদ্র বিরাজ করছে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস মুচকি হেসে বললেন, 'তারপরও আমি বলব, বরফমুক্ত সমুদ্র যতি না-ই পাই তবে আমরা না হয় ২০০ মাইল বরফাবৃত পথ স্নেজগাড়ি চেপে অতিক্রম করে ফেলব।'

২০০ মাইল বরফের ওপর দিয়ে অতিক্রম করার কথা শুনে রিচার্ড শ্যানডন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। 'চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন, 'বলছেন কী ক্যাপ্টেন, ২০০ মাইল পাড়ি দেবেন গুরুর করে স্নেজগাড়িতে চেপে!'

ডা. ক্রুবানি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললেন, 'কেন? অ্যালেক্সি মারকফ নামে এক কশাক কি স্নেজ গাড়িতে ৮০০ মাইল পাড়ি দেয় নি?'

সকাল হল। ক্যাপ্টেন জাহাজ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বরফের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখে এলেন। এবার কর্মীদের উচ্ক্ষমতা সম্পন্ন মাইন পৌঁতার নির্দেশ দিলেন। তার পলতেটাকে তুলে আনা হল জাহাজের ওপর। পরের দিন কাকডাকা সকালে দেওয়া হল পলতেতে আশুন ধরিয়ে। আধঘণ্টা বাদে দূর থেকে চাপা একটা শব্দ ভেসে এল। বরফের চাই জাহাজের ধারে কাছেও ছিটকে এল। কিন্তু জাহাজ যাওয়ার মতো পথ তৈরি হল না।

এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ঠেসে ঠেসে বারুদ পুরে কামান দাগলেন। বিচ্ছিন্ন বরফের টুকরোগুলো চারদিকে সরে গিয়ে চমৎকার রাস্তা করে দিল। ব্যস, দুর্বীর গতিতে ফরোয়ার্ড জাহাজ এগিয়ে চলল। কিছু দূর যেতেই আবার তাঁকে থমকে যেতে হল। জাহাজ থামিয়ে দুশ্চিন্তার জট ছাড়াতে লাগলেন। বরফের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে করতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফরোয়ার্ড জাহাজকে নিয়ে সাতাশে মে রবিবার লিওপোল্ড বন্দরে হাজির হলেন। জাহাজ থেকে নেমে হাঁটাচাটি করতে গিয়ে পূর্বসূরী অভিযাত্রীদের বহু নিদর্শন দেখতে পেলেন। বরফের তলায় অভিযাত্রীদের সমাধিস্তম্ভ করা হয়েছে এমন ছয়টা সমাধিক্ষেত্র চাক্ষুষ করলেন। উপস্থিত হলেন জেমস রসের তৈরি শরণার্থী শিবিরে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন। ভবিষ্যতে কোন অভিযাত্রী বা অভিযাত্রীদল এখানে এলে তাদের জন্য খাবারদাবার, গুণ্ধপত্র এবং অন্যান্য অত্যাাবশ্যকীয় সামগ্রী এখানে রাখা আছে। অভিযাত্রী ফ্রাঙ্কলিন এপর্যন্ত আসতে পারেন নি। এলে তিনি সদলবলে প্রাণে বেঁচে যেতে পারতেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এখান থেকে অত্যাাবশ্যকীয় সামগ্রী জাহাজে তুলে নিলেন। ডা. ক্লুবোনির অত্যাগ্র অগ্রহ ছিল এখানে তাদের অভিযানের কোন নজীর রেখে যান। কিন্তু ক্যাপ্টেনের আপগতি থাকায় তার সে সাধ পূরণ করা সম্ভব হল না। কারণ, এতে প্রতিদ্বন্দীদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই। ফরোয়ার্ড জাহাজ আবার এগিয়ে চলল। এবার অদ্ভুত একটা নতুনতর ঘটবার মুখোমুখি হল তাঁরা। দেখলেন, অদ্ভুত একটা অতুজ্জ্বল বলয় সূর্যকে ঘিরে অবস্থান করছে। নকল সূর্য ভাবলেও ভুল হবে না। জ্যোতির্বিদ্যাটির চমৎকার একটা বর্ণনা দিয়েছেন টমাস ইয়ং। তিনি বলেন, বরফ প্রিজম যখন মেঘের আকারে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে তখনই সূর্যালোকের ম্যাজিক চোখে পড়ে।

এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বাস্তবিকই প্রমাদ গুলেন। বুঝলেন, জাহাজের সাধারণ নাবিক থেকে শুরু করে অফিসাররা অবধি সবাই তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ। তাদের ক্ষোভের সবচেয়ে বড় কারণ তার একত্রেই মী।

এগিয়ে চলার সবরকম পথ বন্ধ। তবু তিনি থামতে পারেন। যে করেই হোক এগিয়ে তিনি যাবেনই।

বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফরোয়ার্ড জাহাজকে টেনে হিচড়ে ভূমিগালায় হাজির হলেন। জেমস রস এখানেই চুষক পাহাড়ের হদিস পেয়েছিলেন। ডা. ক্লুবোনিও লক্ষ করলেন, কম্পাস যন্ত্রের কাঁটা এখানে কিছুতেই ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল থাকছে না। লম্বভাবে অবস্থান করছে। তবে? তবে চুষক পাহাড় সম্বন্ধে এতদিন যত গল্পকথা রচিত হয়েছে সবই ভুলো, কল্পনামাত্র! তার গায়ে জাহাজ গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, জাহাজের গা থেকে দমাদম পেরেক খুলে তীরের ফলার মত ছুটে যায় প্রভৃতি যে সব কাহিনী এতদিন মানুষকে মুগ্ধ করেছে, সবই কি তবে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পিত কাহিনী? এক মাইল প্রশস্ত এ চুষক পাহাড় থাকায় নাবিকদের কম্পাসের কাঁটা সর্বদা উত্তর দিকে মুখ করে অবস্থান করে—এ কথা তো তবে নিছকই কল্পনা।

মুখলধারে বৃষ্টি আর প্রবল ঝড়ের বাঁধা অগ্রাহ্য করে ফরোয়ার্ড জাহাজ মেলভিল উপসাগরে পড়ল।

ডা. ক্লুবোনি লক্ষ করলেন, এ সমুদ্রের নীল জলে কোথায় যেন সবুজ আভা উঁকি দিচ্ছে। তিনি হারপুনবীর সিম্পসনকে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন, 'নীল জলে জেলিফিস না থাকায় এমনটা হয়।'

সিম্পসন বলল, 'কেবল জেলিফিসের জন্যই নয়, একটু আগেড় এখান দিয়ে তিনি চলে গেছে বলে এমনটা হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে মাস্তুলের ডগা থেকে জানান দেওয়া হল, দূরে তিনি নজরে আসছে। তিনি! অতিকায় তিনি!

বাস, আর দেরি নয়। জাহাজ থেকে নৌকো নামিয়ে অভিযাত্রীরা তিনি শিকারে রওনা হল। মাত্র মুহূর্তের জন্য সবার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। অতিকায় দুটো বরফের ঠাঁই ভেসে এসে প্রায় একশো ত্রিশফুট লম্বা তিমিটাকে একেবারে খেঁতলে দিল।

৩ জুলাই। ফরোয়ার্ড বিচি দীপে নোঙর করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্ত পায়ে নেমে গেলেন।

আঠারো শো তিল্পান্নতে জাহাজ বোঝাই করে খাবার দাবার ও জ্বালানী এনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। মরু অভিযাত্রীরা যাতে অনাহারে শুকিয়ে না মরে তারই জন্য এ আয়োজন। বরফের রাজ্যে খাবার পচার আশঙ্কা নেই।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কয়েকম বছরের খাবার মজুদ আছে। কিন্তু চাই জ্বালানী। তিনি একটা কালো পাথরের স্মৃতিসৌধ দেখতে পেলেন। ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কারের আকাজক্ষা বুকে নিয়ে সদলবলে এখানেই বেপান্তা হয়ে গিয়েছিলেন। পাথরটার গায়ে সে কথাই খোদাই করা রয়েছে। এর মাধ্যমে পরবর্তী অভিযাত্রীরা ফ্রাঙ্কলিনের অমর কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। কয়লা আর খাবার খোঁজ করতে গিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ফ্রাঙ্কলিনের তিন সহযোগীর সমাধি আবিষ্কার করলেন। কিন্তু বাস্তবিক বস্তুগুলোর হদিস পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি অনুমান করলেন, সঞ্চিত মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রীর সন্ধান পেয়ে এক্সিমোরা সেগুলো আত্মসাত করেছে।

কিছু জাহাজে যে পরিমাণ কয়লা রয়েছে তা দিয়ে টেনেটেনে মাত্র দুমাস চলতে পারে।

২৪ জুলাই। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পারদ বাইশ ডিগ্রিতে নেমে গেছে। সমুদ্রের বুকে বরফ উঁকি দিতে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রের জল জমে গেলে কেলেকারী হয়ে যাবে, পুরো শীতকালটা এখানে পড়ে থাকা ছাড়া গতান্তর থাকবে না। জাহাজের অফিসার আর নাবিকরা প্রভৃতি চৌদজনই ক্ষুব্ধ। কেবল ডা. ক্লুবোনি, কাঠমিস্ত্রী বেল আর নাবিকদের অফিসার জনসন ক্যাপ্টেনের দলে।

শীতের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার আগেই উত্তরদিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে হবে। ক্ষুব্ধ কর্মীদের দাঁড় টানানোর কাজে রাজি করানো যাবে না। অতএব বাষ্পশক্তিকেই কাজে লাগাতে হবে।

কয়লা খরচ করে বাষ্প তৈরির কথা শুনে নাবিকদের তো মাথাখ হাত। শুভামে যেটুকু কয়লা রয়েছে তা দিয়ে কোনোরকমে দুমাস কাজ চালানো সম্ভব। অতএব এরকম চিন্তা নিছকই পাগলামি।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চিফ ইঞ্জিনিয়ার ব্রানটনকে আগুন বাষ্প তৈরির হুকুম দিলেন। তাঁর কথাটা শেষ হতে না হতেই নাবিক পেন প্রতিবাদ করে উঠল, 'না, আগুন জ্বালা হবে না। আমরা আর উত্তরদিকে কিছুতেই এগাতে রাজি নই।'

সামান্য এক নাবিকের এমন স্পর্ধা দেখে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলেন। আচমকা চোঁচিয়ে উঠলেন, 'একে খাঁচায় ঢোকাও। কয়েদখানার অন্ধকারে পড়ে কাতরে মরুকগে। নিয়ে যাও, খাঁচায় পুরে দাও একে।'

আমতা আমতা করে রিচার্ড শ্যানডন বললেন, 'কথা হচ্ছে কি ক্যাপ্টেন, ব্রানটন যা বলছে—'

ততোধিক কর্কশ স্বরে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস গর্জে উঠলেন, 'দেখুন মি. শ্যানডন, প্রয়োজন হলে আপনাকেও খাঁচায় পুরতে দ্বিধা করব না।'

নাবিক পেন একটা লোহার দণ্ড মাথার ওপর তুলে তীব্র গতিতে, ঘোরাতে ঘোরাতে গলা ছেড়ে চোঁচাতে লাগল, 'হুশিয়ার! হুশিয়ার বলে দিচ্ছি!' অন্যান্য নাবিক বেল, সিম্পসন প্রভৃতি তাকে সমর্থন করে তীব্রস্বরে চোঁচাতে লাগল।

ক্রোধান্বিত ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ঝট করে কোর্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করে বুক কাঁপানো স্বরে গর্জে উঠলেন, 'হাত থেকে রড ফেল, নইলে গুলি চালাতে বাধ্য হব, বলে দিচ্ছি।'

পেন থতমত খেয়ে হাতের লোহার দণ্ডটা ফেলে দিয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। নাবিকরা তাকে ধরে জাহাজের খোলে নিয়ে চলে গেল।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে বয়লারে আগুন জ্বলল। তৈরি হল পর্যাপ্ত বাষ্প। জাহাজ আবার চলতে আরম্ভ করল। এক নাগাড়ে দুদিন জাহাজ চালিয়ে বিচ পয়েন্টে পৌঁছানো গেল। কিন্তু বরফমুক্ত সমুদ্রের দেখা মিলল না। ক্যাপ্টেন নিজে মাছুলের ওপর উঠে দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখলেন। ব্যাজারমুখে নেমে এলেন। নির্বাক রইলেন।

এল ঘোঁলি অক্টোবর। সেদিন সূর্য প্রথম অস্ত গেল। এক নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে দিনের আলোর উপস্থিতির অবসান ঘটল।

আরও দুদিন কাটার পর এল আঠারো তারিখ। এবার ব্রিটানিয়া পাহাড়কে ছায়ামূর্তির মতো দেখা যেতে লাগল।

উনিশ অক্টোবর বরফবন্দি হয়ে ফরোয়ার্ড থমকে দাঁড়িয়ে রইল।

স্যার এডোয়ার্ড বেলচাল এখানে অত্যন্ত এক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এর দক্ষিণ পূর্বদিকে বরফের একাধিপত্য, উত্তর পশ্চিমে দিগন্ত প্রসারিত উন্মুক্ত সমুদ্র বিরাজ করছে লক্ষ করেছিলেন।

২০ আগস্ট ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হতাশ হয়ে পড়লেন, কই, স্যার এডোয়ার্ড বেলচারের উন্মুক্ত সমুদ্রের চিহ্নও তো নজরে পড়ছে না। তিনি একটু মুষড়েই পড়লেন। যেদিকে তাকানো যায় শুধুই বরফের আচ্ছাদন দেখলে কার না বুক কাঁপন ধরে।

ক্যাপ্টেন জাহাজের নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন। প্রতিবাদ করা বা আদেশ অমান্য করার মত বুকের পাটা কারই বা আছে। ধীর গতিতে জাহাজ এগিয়ে পেনী প্রণালীতে পৌঁছল। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার নাবিকদের নজরে পড়ল—দক্ষিণদিকের চেয়ে বরং উত্তর দিকের সমুদ্রের পরিস্থিতিই জাহাজ চালানোর পক্ষে অনুকূল।

নাবিক পেনের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতেই থাকল। সে তাব প্রতিশোধস্পৃহা কথ্য একদিন তো রিচার্ড শ্যানডনের কাছে বলেই ফেলল।

এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও জাহাজের গতি সব মিলিয়ে আশাপ্রদই বটে। পূর্বসূরীরা যে পথ পাড়ি দিতে দুতিন বছর লাগিয়ে ছিল ফরোয়ার্ড তাই মাত্র পাঁচ মাসে অতিক্রম করেছে।

সেদিনটা ছিল আটই সেপ্টেম্বর। জমাটবাঁধা বরফ করাত দিয়ে কাটতে গিয়ে হতাশ হয়ে শেষপর্যন্ত বারুদ চোঙ ফাটিয়ে বরফ সরাতে হল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই তুমুল ঝড় উঠল। ঝড়ের ধাক্কায় বিশালায়তন একটা হিমশৈল এগিয়ে এসে ফরোয়ার্ডের গায়ে ধাক্কা মারার উপক্রম করল। আতঙ্কে নাবিকদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগার হল। হিমশৈলটা ভাসতে ভাসতে এসে আচমকা গলুইয়ের ওপর ছমড়ি খেয়ে পড়ল।

এমন ভয়ঙ্কর বিপদেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন দেখে সবাই যারপরনাই অবাক হল। এবার বিকট আওয়াজ ভুলে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই বরফের চাণ্ড জাহাজের মাথার ওপর আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। ভারে জাহাজটা ডুবে যাওয়ার জোগাড় হল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস প্রায় আতঙ্কিত হলেন। জাহাজ বরফচাপা হয়ে পড়ে রইল। বেরনোর কোনো উপায়ই নেই। হঠাৎ পরিস্থিতির উন্নতি হতে দেখা গেল। ভারকেন্দ্র অকস্মাৎ স্থানান্তরিত হওয়ায় হিমশৈলও ক্রমেই সরতে লাগল। দুম করে জাহাজটা জলের ওপর ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্তপায়ে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, জাহাজের কোন ক্ষতিই হয় নি।

১৫ সেপ্টেম্বর ফরোয়ার্ড জাহাজ পৃথিবীর শীতলতম স্থানে উপস্থিত হল। ভূগোলবিদগণ এখানে আসতে সক্ষম না হওয়ায় অনুমানের ওপর নির্ভর করেই এ স্থানটিকে মানচিত্রের গায়ে শীতলতম স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

শীতঋতু দুয়ারে আঘাত হানতে চলেছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এ ঋতুকের শীতকাল সম্বন্ধে অভিহিত। ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনেরও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। তাই উভয়ে শীতের কোমাবিলার জন্য তৈরি হতে

লাগলেন। এক্ষিমোদের বাসস্থল ইগলুর মতো জাহাজটাকে বরফের চাওড় ঘিরে দেয়া হল। তাবু খাটিয়ে দেওয়া হল ডেকের ওপর। কেবল বরফের ছাদে একটা ছিদ্র রাখা হল। বড় একটা স্টোভ দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বরফের ঘরের মধ্যে জ্বলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল।

১০ অক্টোবরের মধ্যে শীতের সঙ্গে মোকাবেলার প্রকৃতি সেরে নেয়া হল।

খাবার জোগাড়ের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। উনিশে অক্টোবর নয় ফুট দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বুলডগের মতো ইয়া লম্বা দাঁত ওয়ালা একটা তিমি মাছকে সিম্পসন গুলি করে ঘায়েল করলেন। ডা. ক্রুবোনি সেটাকে বরফের গর্তে ঢুকিয়ে রাখলেন। উদ্দেশ্য ওটার চামড়া আর মাথাটাকে নিজের সংগ্রহশালায় রেখে দেবেন। আটদিনের মধ্যেই ওর গা থেকে চামড়া আর মাথা আলাদা করে ফেলতে পারলেন।

একসময় মাস্তুলটার অগ্রভাগ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড জাহাজ বরফের তলার চাপা পড়ে গেল।

কড়া সাবধানতার মধ্যেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রতি নাবিকদের ক্ষোভ ঘৃণা ভেতরে ভেতরে ঠিকই জাগ্রত রইল। একদিন ভালুক শিকার করতে বেরিয়ে জাহাজের কর্মীরা অদ্ভুত একটা শেয়ালকে ঘায়েল করল। তার গলায় একটা কলার বুলছে। তাতে অস্পষ্ট হরফে কি যেন লেখা রয়েছে। কলারের ব্যাপারটা ডা. ক্রুবোনির জানা আছে। জেমস রস নাকি আঠারো শো আটচল্লিশে কয়েকটা শেয়ালের গলায় কলার বেঁধে দিয়েছিলেন। আজ রস আর পৃথিবীতে নেই—কিন্তু বারো বছর পর শেয়ালদের একটা ঠিকই ধরা পড়ল।

শীত ক্রমে জেকে পড়ল। শীতের প্রকোপে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার জোগার হল। ডা. ক্রুবোনি কিন্তু শীতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মহা স্ফুর্তিতেই দিন কাটাচ্ছেন। শেয়াল শিকার করতে গিয়ে উজ্জাপাতের অভ্যাসচর্য দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করলেন। মেরুজ্যোতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য তাকে যারপরনাই মুগ্ধ করল। এ মনোরম দৃশ্য যে নিজের চোখে দেখে নি তাকে প্রকৃতির ও শোভা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। আর চাঁদ? আধমরা চাঁদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। বরফের রাজ্যে একটা চাঁদ হয়ে যায় অগণিত নকল চাঁদ।

নাবিক পেন আর অন্যান্য নাবিকরা ইদানিং ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের হুকুম ঠিকঠিক পালন করছে না। তারা সারাদিন বুকে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে থাকায় দাবাই কটিন কার্টি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এমন মর্মান্তিক দৃশ্য কারোর পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। সর্বাস্থে নীল কালো সাগ আর হাতপা ফুল ঢোল হয়ে গেল সবায়।

৮ ডিসেম্বর। এমন অকল্পনীয় কষ্টের মধ্যে লক্ষ করা হল, ভয়ানক ঠাণ্ডায় থার্মোমিটারের পারদ পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের চ্যুয়াল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে যাওয়ায় ডা. ক্রুবোনিও মুগ্ধে পড়লেন।

বিশে ডিসেম্বর। পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নিল। অতিকায় স্টোভটা নিভে গেল। ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত নাবিকরা ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে নিয়ে পড়ল। ব্যস্তপায়ে এগিয়ে এসে রিচার্ড শ্যানডন ক্যাপ্টেনকে জানালেন, কয়লা ফুরিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল-নিখরভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। নাবিক পেন বলল, জাহাজের কার্ট দিয়ে বয়লার চালাতে। তার কথা শোনামাত্র ক্যাপ্টেনের মাথায় রক্ত উঠে যাবার জোগার হল। তিনি ক্রোধোদ্ভূত বাঘের মত কুতুলটা টেনে নিয়ে পেনের মাথা বরাবর চালিয়ে দিলেন। ডা. ক্রুবোনি তাঁকে আচমকা ধাক্কা মারায় পেনের মাথায় না লেগে কুতুলটা কাঠের গায়ে সজোরে আছড়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কোনোক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে চেষ্টা করে উঠলেন, 'মদ! জাহাজে পিপা পিপা মদ রয়েছে। তা জ্বলে বয়লার চালাও, বাষ্প তৈরি কর।' নাবিকরা মহানন্দে ছুটোছুটি করে গুদাম থেকে পিপা পিপা মদ বের করে নিয়ে এল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কাউকেই বিশ্বাস করেন না। সতর্কতাস্বরূপ কোমরে রিডলভার বুলিয়ে জাহাজে পায়চারি করতে লাগলেন। কুকুরটা তার সর্বক্ষণের সঙ্গী।

২৫ ডিসেম্বর ডা. ক্রুবোনি কার্ট দিয়ে আগুন জ্বালার পরামর্শ দিলেন। তা না হলে সবার প্রাণ যাওয়ার সম্ভাবনা।

ক্রোধোদ্ভূত ক্যাপ্টেন গর্জে উঠল, 'আমি এতে মত দিতে পারব না। আপনারা যা ভালো মনে করেন করতে পারেন।'

বাস, আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে নাবিকরা হৈ হৈ করে কুড়ুল শাবল আর গাঁইতি নিয়ে ছুটল জাহাজের পাটাতন ভেঙে বয়লার দেবার জন্য।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস নিষ্পলক চোখে উল্লসিত নাবিকদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলেন। তার চোখ দুটো জলে ছলছল করতে লাগল।

জানুয়ারির প্রথম দিন। ডা. ক্রুবোনি স্যার বেলচারের লেখা একটা বই নিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কেবিনে ছুটে এলেন। বইয়ের কয়েকটা ছত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'দেখুন, এখানে লেখা, এখান থেকে একশো মাইল উত্তরে কয়লা রয়েছে। সভ্য মানুষরা সে কয়লা লুকিয়ে রেখেছে। স্যার বেলচার তা নিজের চোখে দেখতে পেয়েছেন।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের মুখে হাল্কা হাসির রেখাও ফুটে উঠল না। স্ফ্যাকাশে মুখে, গলা নামিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা ফাঁস করবেন না। বরফ প্রান্তর আগের চেয়ে দুই ডিগ্রি উত্তরে চলে এসেছে। আর অন্তত তিন শ' মাইল দূরে রয়েছে কয়লা।' কথাটা শেষ করার পর তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন। ক্রমে তাঁর মুখে নেমে এল হাল্কা হাসির ছোপ। এই প্রথম তাঁর মুখে হাসি দেখা গেল।

জাহাজ ধীরগতিতে এগোতে এগোতে আরো কিছুটা পথ অতিক্রম করল। কয়লার স্তূপ এখনও প্রায় আড়াই শো মাইল দূরে। স্নেজগাড়িতে সেখানে পৌঁছাতে চল্লিশ দিনের মত লাগবে।

ডক নাবিকদের অফিসার জনসনের নেতৃত্বে চব্বিশ ফুট লম্বা এবং পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি চওড়া স্নেজ গাড়িতে খাবার দাবার মদ, বন্দুক ও বারুদ, গুদুপত্র, ও অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্রী তুলে নেওয়া হল। ছয়টা কুকুর গাড়িটা টানবে। দুহাজার পাউন্ড ওজনে টেনে নেয়া তাদের পক্ষে কোনো সমস্যাই নয়।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের চিন্তা সম্পূর্ণ অন্য। যারা সঙ্গে যাচ্ছে তাদের জন্য নয়, যারা ফরোয়ার্ডে থেকে যাচ্ছে তাদের নিয়ে তাঁর চিন্তার শেষ নেই। তাঁর অনুপস্থিতিতে তারা যে কী কলেঙ্কারী কাণ্ড বাধিয়ে বসবে তাই বা কেন জানে? তাই একান্ত বিশ্বস্ত জনসনকে জাহাজের পুরো দায়িত্বে রেখে গেলেন। যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁকে নির্দেশ দিতে গিয়ে বললেন, 'তোমাকে অধিকার দিলাম, আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি জাহাজের কর্মীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে। চার পাঁচ সপ্তাহ পরেও যদি আমি ফিরে না আসি তবে তুমি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে ইংল্যান্ডের দিকে যাত্রা করবে।

জনসন ঘাড় কাত করে তাঁর কথায় সম্মতি জানাল।

ছয় তারিখে স্নেজ গাড়ি যাত্রা করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের সঙ্গী হলেন ডা. ক্লুবোনি, হারপুনবীর সিম্পসন ও কাঠমিস্ত্রী বেল। আর তাঁর সর্বক্ষণের কুকুর ডাক তো থাকছেই।

স্নেজগাড়ি প্রথম দিন বিশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করল। বরফের চাঙড় তৈরি করে ইগলুর মত গল্পজাকৃতি ঘর তৈরি করে মাথা গোঁজা হল। সকাল হতেই আবার যাত্রা শুরু হল। গাড়ির তলায় ফসাফরাসের অত্যাঙ্কুল আলোকরশ্মি ঝকঝক করতে লাগল। তারই ফুলকি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক যেন স্বর্গীয় শোভার সৃষ্টি করতে লাগল।

১৫ জানুয়ারি আবহাওয়া মোটামুটি স্বচ্ছই দেখা গেল। অভিযাত্রীরা এক মাইল পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হলেন। সেদিনই অবিস্মাশ্ব এক কাণ্ড অভিযাত্রীদের চোখের সামনে ঘটে গেল। হঠাৎ বরফ থেকে বরফ বাষ্প প্রবল বেগে আকাশের দিকে উঠে গেল, প্রায় নব্বইয় ফুট উর্ধ্বাকাশে উঠে নিশ্চল নিথর হয়ে গেল। হাতের নাগালের মধ্যে যে রয়েছে তাকেও দেখা যাচ্ছে না। বিস্ময় বিমূঢ় চারজনই একে অন্যের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন। কেউ গুনতেও পেলেন না। আসলে রহস্যসম্পন্নকারী বাষ্প সে শব্দতরঙ্গও বহন করছে না, তাই তো কারো কথা কেউ গুনতে পাচ্ছে না।

প্রায় পাঁচ মিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ডা. ক্লুবোনি আচমকা বন্দুকের ঘোড়ায় চাপ দিলেন। কামানের গর্জনের মত শব্দটা বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। বুঝা গেল পায়ের নিচের বরফ যেন ক্রমে ওপরে উঠে যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা সবিস্ময়ে ভাবলেন, হিমশৈলের ওপরে উঠে যাচ্ছেন। তাঁরা আশি ফুট ওপরে উঠে যেতেই একে অন্যকে দেখতে পেলেন। আর আশি ফুট তলা থেকে কুকুরেরা ডাক দিয়ে চিৎকার চিচামেচি করতে লাগল। অন্য কুকুরগুলোও ডাকাডাকি করতে লাগল। মনে হল তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

একটু বাদে ঘন বাষ্প আরও নিচের দিকেনামতে লাগল। এবার পাঁচটা ভালুক ও শেয়াল মিলে প্রায় ত্রিশটা জন্তুকে আমাদের খাবার দাবার লুট করে খেতে দেখা গেল। ব্যাপার দেখে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পিস্তল থেকে গুলি ছুড়ে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। ক্ষুধার্ত হতছাড়া শেয়ালগুলো মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটেই খাবারদাবার খেয়ে যে সর্বনাশ করল তাতেই ক্যাপ্টেনের মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড় হল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এক অদ্ভুত ধাতের মানুষ। ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

আঠারোই জানুয়ারি অভিযাত্রীরা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে মাত্র ফুট দশকে স্নেজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলেন। শরীর ক্লান্ত, ইগলু তৈরি করে রাত্রি কাটানোর ব্যবস্থা করার মত শরীর ও মন কারোরই সতেজ নয়। বাধ্য হয়ে মোষের চামড়ার তাবু টাঙিয়ে সবাই রাত্রি কাটিয়ে দিলেন।

ডা. ক্লুবোনি থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, পারদ আবার শূন্য তাপাঙ্কের চুয়াল্লিশ ডিগ্রি নিচে গেছে। পারদ আর তরল নয়, কঠিন পদার্থের রূপ নিয়েছে।

বিশে জানুয়ারি সকালেই প্রকৃতি আরও রুদ্ররূপ ধারণ করল। স্নেজ গাড়িটা ঝড়ের দাপটে পাথরের মত কঠিন বরফের গায়ে গায়ে ধাক্কা মারল। সেটার সামনের অংশ তুবড়ে—গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। সারাই করে সেটাকে ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে কেটে গেল বেশকিছু সময়।

সিম্পসনের স্কার্ভি রোগ চরম রূপ মিল। ডা. ক্লুবোনি তার শিয়রে বসে সারারাত তার সেবায় লিপ্ত রইলেন।

সিম্পসন তার একার জন্য এতগুলো লোক যাতে চরমতম বিপদে না পড়ে সেজন্য ক্যাপ্টেনকে অনুরোধ করল তাকে বরফের ওপর ফেলে চলে যেতে। এতে সেও শান্তিতে মরতে পারবে, এতগুলো লোকের প্রাণও বাঁচবে।

ক্যাপ্টেন তার প্রস্তাবে রাজি হতে পারলেন না। তাকে স্নেজে গাড়িতে তুলে নিয়ে আবার এগোতো লাগলেন।

এক সময় কুকুরের ডাক শুনে ছুটে গিয়ে একটা বরফের স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে চোঁচাতে লাগল। গাঁইতি আর শাবল দিয়ে স্তূপটা ভাঙতেই তার ভেতর থেকে পাওয়া গেল ভিজো ন্যাভা হয়ে যাওয়া এক চিলতে কাগজ। তার গায়ে একটামাত্র ছত্র লেখা 'অ্যালটা—পরপয়েজ—তেরোই ডিসেম্বর ১২৬০' ১২° লঙ্গি—৮—৩৫ মিনিট ল্যাটি—'

কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ঐকে ডা. ক্লুবোনি প্রায় স্বগতোক্তি করলেন, 'কই, পরপয়েজ নামে কোন জাহাজের নাম ইতিপূর্বে শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

ডা. ক্লুবোনি, আপনি শোনেন নি বটে, কিন্তু মাস দুই আগে যে জাহাজটা ডুবে গেছে, এপথেই সেটা পাড়ি দিয়েছিল।

এদিকে সিম্পসনের পরিস্থিতি ক্রমে সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। আবার স্নেজগাড়িটাকে কাঁধে নিয়ে অভিযাত্রীদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দেড় হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে চড়ে যেতে হল। সবাই ক্লান্ত। শরীর আর চলতে চায় না।

মাঝরাত্ত্রে ঘুমের মধ্যে ইগলুর ছাদ ধরে পড়ে কেউ কেউ চোট পেল। তবে তেমন জখমটখম হল না। পরদিনও ঝড়ের তাণ্ডব সমানভাবে চলল।

২৬ জানুয়ারি বরফের ওপর একটা বন্দুক পাওয়া গেল। ২৭ জানুয়ারি একটা ফ্লাক আর সেক্সটেন্ট পড়ে থাকতে দেখা গেল। এসব দিকে ক্যাপ্টেনের মোটেই খেয়াল নেই। তাঁর মুখে কেবলমাত্র এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ। সন্ধ্যার পর দেখা গেল বোচার সিম্পসনের আখাটা খড় ছেড়ে বেরিয়ে যাবার মুহূর্ত আগত প্রায়। তার পর মুহূর্তেই ঝড় অধিকতর রম্যরূপ ধারণ করল। তিন তিনবার তাঁবু কাটাবার চেষ্টা করে হতাশ হতে হল। প্রতিবারেই তাঁবু উড়ে গেল। অনন্যোপায় হয়ে খোলা আকাশের গায়ে, বরফের ওপর মৃত্যুপথযাত্রী সিম্পসনকে সারারাত্রি শুইয়ে রাখতে হল। গভীর রাতে সে মুহূর্তের জন্য ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের দিকে তর্জনিটা তুলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় সে যেন ইচ্ছিতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকেই দায়ী করে গেল। আঠারো জনের একজন দল ছেড়ে চিরদিনের মত চলে গেল। পাথরের মত কঠিন হৃদয় ক্যাপ্টেনের চোখের কোল বেয়ে একফোটা জল বরফের ওপর পড়ল।

সকাল হল। দুর্বোঁগ কেটে গিয়ে সূর্যের আলো বরফের ওপর পড়ে প্রতিফলিত হতে লাগল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বিষণ্ণমুখে বললেন, 'বন্ধুগণ, কয়লার ছুপ এখন থেকে আরও ষাট মাইল দক্ষিণে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আর এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার অর্থই বৈজ্ঞানিক মৃত্যুকে বরণ করে নেয়া। উপায় নেই, ফিরেই যাওয়া যাক।

ডা. ক্লুবোনি এতে খুশিই হলেন। তবে দুদিন বিশ্রাম করে ফিরে যেতে চাইলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

ত্রিশে জানুয়ারি সকালে কুকুরটাকে খুবই অস্থিরভাবে চোঁচামেচি করতে দেখা গেল। ছুটে গিয়ে দেখা গেল সে সিম্পসনের মৃতদেহের গায়ে বসে অনবরত চোঁচাচ্ছে। সবাই ধরেই নিল মৃত সিম্পসনকে কবরস্থ করার জন্যই তার এমন অস্থিরতা।

ডা. ক্লুবোনি গাঁহি ডালিয়ে বরফ খোঁড়ার চেষ্টা করতেই হুঁ করে একটা গম্ভীর আওয়াজ হল। ব্যস্ত-হাতে বরফ সরিয়ে তিনি একটা বোতল বের করে আনলেন। এবার বেশ বড় একটা থলে তুলে আনলেন। থলটাকে বিস্কুট বোঝাই। তিনি স্বগতোক্তি করলেন 'হায় ঈশ্বর! খাবারের লুকানো গুদামের খোজ দিল।'

এবার ব্যস্ত-হাতে গাঁহি ডালিয়ে লাগলেন। কয়েক ঘা মেরে কিছু বরফ সরাতেই মানুষের এক জোড়া পা উঁকি দিল। বেশ টানটানি করে বছর ত্রিশেক বয়সের এক যুবকের মৃতদেহ ওপরে উঠে এল। আর একটা মৃতদেহ উদ্ধার করা হল। এবারেরটার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। উভয়ের গায়েই মেরু অভিযাত্রী পোশাক। কিছুক্ষণ পরে আরও একটা উদ্ধার করা সম্ভব হল। মরে নি তখনো। প্রাণের লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা খাম পাওয়া গেল। আধগোড়া। তার গায়ের লেখা যেটুকু পড়া যাচ্ছে—ট্যামন্ট পয়েজ ইয়র্ক—আলটামন্ট-পরপয়েজ—নিউইয়র্ক!

ডা. ক্লুবোনি খামের গায়ের শব্দগুলো পড়ে উচ্ছ্বাসে প্রকাশ করলেন, 'তবে দেখা যাচ্ছে, নিউইয়র্কের পরপয়েজ জাহাজের আলটামন্ট! কী আশ্চর্য ব্যাপার!'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস গম্ভীর মুখে শুধু বললেন, 'লোকটা তবে আমেরিকান।'

'হ্যাঁ, যে দেশেরই হোক, আমেরিকান হলেও আমি একে বাঁচিয়ে তুলতে চাই।'

অভিযাত্রীরা আমেরিকান আলটামন্টকে স্নেজে তুলে নিলেন। তার জায়গায় মৃত সিম্পসনকে সমাধিস্থ করে আবার এগিয়ে চললেন।

অভিযাত্রীরা উনিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই পথ পাড়ি দিলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চব্বিশে ফেব্রুয়ারি লক্ষ করলেন, আকাশের একপ্রান্ত টকটকে লাল, তার ভেতর থেকে ঘন কালো ধোঁয়া উঠছে। ক্যাপ্টেন কাঁপা কাঁপা গলায় আর্তনাদ করে উঠলেন—আগুন! ধোঁয়া! হতভাগ্যের ফরোয়ার্ডের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দাঁউ দাঁউ করে ফরোয়ার্ড পুড়ছে!

সত্যিই ক্ষুদ্র নাবিকরা ফরোয়ার্ড জাহাজটাকে পুড়িয়ে ফেলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজের বারুদঘরে প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে বিস্ফোরণ ঘটল। ব্যস, সব শেষ। আগুনের তাপে বরফ পর্যন্ত গলে যেতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবার বিষণ্ণমুখে বললেন, 'ফরোয়ার্ড ধ্বংস হয়ে গেছে বটে, কিন্তু আমরা তো এখনও শেষ হই নি। আমাদের মনোবল অটুট। ডা. ক্লুবোনির ভেতরে রয়েছে বিজ্ঞান মনস্কতা, আর আমার রয়েছে অন্তহীন সাহস আর আত্মবিশ্বাস। আমরা যে কজন রয়েছি সবাই মিলে দৃঢ় মনোবল নিয়ে চলুন সুমেরুর দিকে এগিয়ে যাই। অন্তহীন সাহস, অটুট মনোবল, ধৈর্য আর অধ্যবসায়ই আমাদের এনে দেবে সাফল্য। চলুন, এগিয়ে যাই।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সহ-অভিযাত্রীদের নিয়ে সোজা উত্তরদিকে এগিয়ে চললেন। পথের বাঁধা-বিঘ্ন তাঁর অটুট মনোবলকে এতটুকুও নরম করতে পারে নি কোনদিন—আজও নয়। সুমেরুর অজানা-অচেনা সমুদ্র আবিষ্কার করে পৃথিবীতে একন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। দু-হাতে পাউন্ড খরচ করে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তাঁর স্বপ্ন সাধের জাহাজ ফরোয়ার্ডকে। পথের কোনো বাধাই তাঁর পথ রোধ করতে পারে নি। চরমতম বিপদের মুহূর্তেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে দৃঢ় মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছেন। কিন্তু হায় বিক্ষুব্ধ নাবিকরা তাঁর একমাত্র অবলম্বন ফরোয়ার্ড জাহাজকে ধ্বংস করে দিয়ে তার আশা-আকাঙ্ক্ষায় নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করেছে। আঠারোজন মিলে যে-অভিযান তিনি শুরু করেছিলেন আজ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র চারজন। একজন বরফের তলায় পরম শান্তিতে চিরনিদ্রায় সমাহিত। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলেছে বন্ধুর পথলাভ আর প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে মরণপণ লড়াই। এতকিছু সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আজও অন্তরের অন্তঃস্থলে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করেন, সাফল্যলাভ তিনি করবেনই।

হৃদয় থেকে পঁচিশ হাজার মাইল দূরে আশ্রয়হীন, খাদ্যহীন—নিঃস্বপ্ন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বরফ সমুদ্রের ওপর দিয়ে মাত্র তিনজন সঙ্গী নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

এদিকে ডেক নাবিকদের অফিসার জনসন ধ্বংসস্থলের মাঝখানে হতাশা জর্জরিত মন নিয়ে নির্বাক নিশ্পন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কয়েক শো গজ বরফের এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ফরোয়ার্ড জাহাজের আধ-পোড়া, ভাঙা টুকরো। আর এখানে-ওখানে পড়ে থাকা পোড়া কাঠের গা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। বিক্ষুব্ধ বিশ্বাসঘাতক নাবিকরা জাহাজের একমাত্র নৌকাটাকেও পালিয়ে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। বরফের ওপর অতিকায় কামানটা মুখ খুঁড়ে পড়ে রয়েছে।

জনসন সাধাভীত চেষ্টা করেছিলেন বিক্ষুব্ধ নাবিকদের নিরস্ত করতে। কিন্তু পারেন নি। তার ব্যর্থতার বড় কারণ বিশ্বাসঘাতক রিচার্ড শ্যানডন। তাঁর উকানিতেই নাবিকরা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছতে সাহস পেয়েছে।

একসময় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সদলবলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজটার কাছে হাজির হলেন। সিম্পসন আর ইহলোকে নেই। তার পরিবর্তে একজন আমেরিকানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা হয়েছে। নাম তার আলটামন্ট। যার জন্য এতকিছু সেই কয়লাও আনা সম্ভব হয় নি। জাহাজ ধ্বংস হয়েছে। কয়লা পাওয়া যায় নি—ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার চিন্তা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

জনসনের মনোবল এখনও অটুট রয়েছে। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজ থেকে কী কী উদ্ধার করা যায় সে আশা বুকে নিয়ে।

এদিকে স্নেজগাড়িতে আলটামন্ট এখনো সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়ে রয়েছে।

ডা. ক্রুবোনি হাঁটাইটি করতে করতে ধ্বংসক্ষেত্র থেকে একটা স্টোভ উদ্ধার করে নিয়ে এলেন। অক্ষত। তেলও রয়েছে ট্যাঙ্করে। ইতিমধ্যেই বেল আর জনসন বরফের চাই সাজিয়ে সাজিয়ে ছোট্ট একটা ইগল বানিয়ে ফেলেছে। তার ভেতরে স্টোভটা জ্বালিয়ে দেয়া হল।

ডা. ক্রুবোনি আবার জনসনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ধ্বংসস্থলে ঘুরে ঘুরে অত্যাশ্চর্য্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে। সেখানে পৌঁছে হাঁটাইটি করতে গিয়ে দেখলেন, ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কিছুই অক্ষত নেই। প্রপেলার, ব্রড, ইঞ্জিন, বয়লার কিছুই ব্যবহারোপযোগী নেই। খুঁজে পেতে খান্যবস্ত্র কিছু পেলেন। হিসেব করে দেখলেন জনা পাঁচেক লোকের কোনরকমে তিন সপ্তাহ চালিয়ে নেয়া যাবে, তারপর দেখা যাক, পরিস্থিতি কীরকম থাকে।

রাত বেড়ে চলল। আটটার কাছাকাছি আকাশ একটু পরিষ্কার হয়ে এল।

সকাল হল। আবার দমকা বাতাস আর তুষারবৃষ্টি শুরু হল। সকালে কফি পান করতে করতে জনসন বললেন, আত্মজরী স্বাধীনচেতা ও ক্ষমতালোভী রিচার্ড শ্যানডন কীভাবে বিক্ষুব্ধ নাবিকদের ধ্বংসলীলায় উৎসাহিত করে তুলেছিলেন।

সেটা ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি। জাহাজ থেকে নৌকাটা নামিয়ে নিয়ে সবাই জাহাজ ছাড়ল। এবার দুর্ধর্ষ নাবিক পেন নিজেহাতে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের স্বপ্ন সাধের জাহাজ ফরোয়ার্ডের গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে আগুনের শিখা সম্পূর্ণ জাহাজে ছড়িয়ে পড়ল। বারুদের গুদামে আগুন লাগতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। পুরো দুদিন ধরে আগুন জ্বলেছে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যখন হাজির হয়েছেন তার আগেই সর্বনাশ যা ঘটান ঘটে গেছে। তবে এও ঠিক তিনি আগে না আসায় খুবই মঙ্গল হয়েছে। সে মুহুর্তে তাঁকে কাছে পেলে বিক্ষুব্ধরা তাঁকে হয়ত খুনই করে ফেলত।

বিক্ষুব্ধ নাবিকদের সর্বনেশে কাণ্ডের কথা শেষ করে জনসন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তাঁরা একন সমুদ্র থেকে ৬০০ মাইল দূরে অবস্থান করছেন। আর সেটা পশ্চিমদিকে।

ডা. ক্রুবোনি পশ্চিমে রয়েছেন শুনে, উত্তরে না গিয়ে পশ্চিমদিকে যাওয়ার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু পথ একেবারেই অজানা অচেনা বলে পশ্চিমে অগ্রসর হতে ক্যাপ্টেন রাজি হলেন না।

ডা. ক্রুবোনি যুক্তি দেখালেন, সঙ্গে স্নেজগাড়ি রয়েছে। ৬০০ মাইল পাড়ি দেওয়া কষ্টকর হলেও অসম্ভব নয়। প্রতি দিন কুড়ি মাইল পথ যেতে পারলে ২৬ মার্চের মধ্যে সমুদ্রের পাড়ে হাজির হয়ে যাওয়া যাবে। জনসনও ডা. ক্রুবোনির কথায় সম্মতি দিলেন।

কিন্তু ক্যাপ্টেন আরো অন্তত একটা দিন সেখানে অবস্থান করতে চাইলেন। এর কারণ কী, তিনি নিজেও জানেন না।

ডা. ক্রুবোনি তাঁর কথা শুনে বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার আপনার! মৃত্যু অবশ্যজ্ঞানী জেনে আর একটা দিনও এখানে কাটাতে আমি উৎসাহী হতে পারছি না।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সামান্যতম উত্তেজনা প্রকাশ না করেই বললেন, 'ডা. ক্রুবোনি, মাথা ঠাণ্ডা করুন। এত সহজে ভেঙে পড়লে বিপদ আমাদের চারদিক থেকে অস্ত্রোপাসের মত আঁকড়ে ধরবে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার বললেন, 'আমি নিঃসন্দেহ যে, উত্তরদিকে যেতে বললে আপনারা কেউই সম্মত হবেন না। কিন্তু উত্তরেই আমাদের বাঁচার উপায় রয়েছে। আরও অনেক, অনেক উত্তরে এন্ট্রিমোরা বেঁচে রয়েছে। সেদিকে স্থিতি প্রণালী আর বরফমুক্ত সমুদ্র অবস্থান করছে। প্রকৃতিকে নির্মম নির্মম ভাবলে তার প্রতি অবিচারই করা হবে। শীতের প্রকোপ হ্রাস পেলে আবার প্রকৃতির কোলে সবুজ গাছপালা গজাবে, হবে আমাদের বাঁচার উপায়।

ডা. ক্রুবোনি তাঁর কতায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। ডেক নাবিকদের অফিসার জনসনও আশান্বিত হতে না পেয়ে নাবিক বেলকে নিয়ে স্নেজের দিকে হাঁটতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'জনসন, তুমিও—আমাকে ফেলে চলে যেতে চাইছ?

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের শেষ স্বল কুকুর ডাক তাঁর পায়ের কাছে শুয়ে মুখে কুঁৎ কুঁৎ আওয়াজ করে লেজ নাড়তে লাগল।

ইতিমধ্যে আলটামন্ট স্নেজগাড়ি থেকে নেমে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এসে পিছনদিক তেকে জনসনের একটা হাত চেপে ধরল। জনসন অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, তার ঠোঁট দুটো তিরতির করে কাঁপছে। কিছু সে বলতে চাইছে, সামর্থ্যে কুলোচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে সে কোনোরকমে একটা মাত্র শব্দই উচ্চারণ করতে সক্ষম হল, 'পরপয়েজ!'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ব্যস্তগায়ে তার কাছে এগিয়ে এসে অতুঃপ্রাণ অগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরপয়েজ? কোথায় পরপয়েজ? ঠিকানা জানা আছে আপনার?'

আলটামন্ট ঘাড় কাত করে তাঁর কথার জবাব দিল। ক্যাপ্টেন ততোধিক অগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 'ঠিক আছে, কথা বলতে কষ্ট হলে আপনি ঘাড় কাৎ করে বা ঝাঁকিয়েই আমার কথার জবাব দেবেন। আমি অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে বলে যাচ্ছি আপনি ঘাড় কাত করে বা ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দেবেন কোনটা ঠিক।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বহু চেষ্টার মাধ্যমে আলটামন্টের কাছ থেকে পরপয়েজের অবস্থান জানতে পারলেন। তার কথায় ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি না ফুটে বরং বিষাদের কালোছায়াই নেমে এল। কারণ, পরপয়েজ আরও তিন ডিগ্রি উত্তরে পৌঁছতে পেরেছে। কিন্তু তিনি সে পর্যন্ত যেতেই পারেন নি। একটা প্রশ্ন তাঁর বকের মধ্যে বার বার চক্রর মারতে লাগল, পরপয়েজের উদ্দেশ্য কী ছিল? কেন জাহাজের ক্যাপ্টেন এত কষ্ট স্বীকার করে সেখানে হাজির হয়েছিল? কী ছিল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য?

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস হিসাব কষে দেখলেন, পরপয়েজ জাহাজটা যেখানে অবস্থান করছে সেখানে যেতে কম হলেও ৪০০ মাইল বরফ পথ পাড়ি দিতে হবে।

আলটামন্টকে জিজ্ঞাসা করে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এও জানতে পারলেন, পরপয়েজ নামক জাহাজটা আমেরিকা থেকে এসেছে। আর এও জানতে পারলেন, পরপয়েজ নিজের ইচ্ছাতে সেখানে যায় নি। ভাসমান হিমশৈলের কয়েদ হয়েই সেখানে যেতে বাধ্য হয়েছে। স্থিৎ প্রণালীর দিকে প্রায় দুই মাস আগে আলটামন্ট সঙ্গীদের নিয়ে যাত্রা করেছিল। সবাই এক-এক করে পরপাড়ে পাড়ি জমিয়েছে।

আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ডা. ক্রুবোনি বললেন, 'আগামীকাল ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমরা পরপয়েজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে ১৫ মার্চ পৌঁছে যেতে পারব। তা না হলে সদলবলে বরফরাজ্যে প্রাণ দিতে হবে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আমতা আমতা করে হলেও তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে এবার বললেন, 'কিন্তু একটা কথা, পরপয়েজ যদি সভাই হিমশৈলের চাপে পড়ে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে থাকে তবে কি সেটা এখনও সেখানে অবস্থান করছে? একইরকমভাবে আরও এগিয়ে যায় নি তো? এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই নেয়া যাচ্ছে না।'

আলটামন্ট ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'না, এগিয়ে সে যেতে পারে না, এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। কারণ, জাহাজটা পাথুরে জমিতে কাত হয়ে পড়েছে। আটকা পড়ে রয়েছে।'

ক্যাপ্টেন এবার প্রশ্ন করলেন, 'আর একটা কথা, তিরিশি ডিগ্রিতে কি উন্মুক্ত সমুদ্র আপনার চোখে পড়েছিল?'

'না।' আলটামন্টের সংক্ষিপ্ত জবাব।

পরের দিন অভিযাত্রীরা পরপয়েজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তারা দশদিন ধরে অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে পথ পাড়ি দিল। সবচেয়ে বড় কথা, নয় দিন তুষারবৃষ্টি মাথায় নিয়েই পথ চলতে হয়েছে। আবার অন্তত ত্রিশ চল্লিশ ফুট পুরু বরফের ওপর দিয়ে হাঁটাইটি করেছে।

৫ মার্চ। সেদিন একটা অত্যাস্চর্য দৃশ্য দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আকাশ পরিষ্কার, আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে, তবু প্রায় দুই ঘন্টা ধরে অনবরত তুষারবৃষ্টি হল কেন? অভিযাত্রীরা এর কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

আমেরিকান আলটামন্টের সম্বন্ধে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের নজর থেকে সন্দেহ কিছুতেই দূর হচ্ছে না। সে এতগুলো লোককে বিপথে চালনা করে পরম বিপদের মুখে ঠেলে দেবে না তো? এ ভাবনা তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪ মার্চ এল। এখনও একশো মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। শরীর অবশ। বন্দুকের গুলিও শেষ। ছয়টা মাত্র গুলি, আর যে পরিমাণ বারুদ আছে তা দিয়ে বড় জোর বন্দুক সাতবার ছোড়া যাবে। আধপেটা খেয়ে কি আর পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব? কয়েকটা খরগোঁস আর শেয়ার দেখা গেলেও গুলি করে খায়েল করতে পারা গেল না।

১৫ মার্চ ডা. ক্রুবোনি বরফের ওপর একটা সিলমাছ দেখতে পেলেন। গুলি করে খায়েল করলেন বটে। কিন্তু তার সামান্য মাংস এতগুলো লোকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হল না। এক্সিমোরা অবশ্য সিলমাছের তেল খায়। কিন্তু এদের পক্ষে তা সম্ভব হল না। ডা. ক্রুবোনি সিলের চামড়াটাকে স্নেজ-গাড়িতে চাপিয়ে দিলেন।

পরের দিন শনিবার। অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। খাবার শেষ। ডা. ক্রুবোনি বন্দুক নিয়ে চারদিকে হেন্যে হয়ে ঘুরে এলেন। শিকার জুটল না। কাজ যেটুকু হল আলোর প্রতিসরণ দেখে বিভ্রান্তিবশত এলোপাখাড়ি গুলি চালিয়ে কটা গুলি বৃথাই খরচ হল।

ডা. ক্রুবোনিকে খালি হাতে ফিরে আসতে দেখে সহযাত্রীরা বিস্ময় মনে চুপটি করে শুয়ে পড়লেন। কেউ কোনো কথাই বললেন না। সামান্য খাবার আছে, আধপেটা খেলেও দুদিনের বেশি চলবে না। সবার মনেই একই হতাশা।

পরের দিন পরিস্থিতি আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। কুফরগুলো সিলমাছের নাড়িভুড়িগুলি পর্যন্ত খেয়ে সাবাড় হয়ে দিয়েছে। এখন চামড়াটা কামড়ে চলেছে। দু-একটা শেয়াল দেখা গেলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় গুলিটা খরচ করতে ডা. ক্রুবোনি উৎসাহী হলেন না।

রবিবার রাতে শেষবারের মতো তারা খাওয়া দাওয়া সেরে নিল। ডা. ক্রুবোনি ছাড়া অন্য সবাই হতাশায় ভেঙে পড়েছেন।

রাতে জনসন ফাঁদ পাতল। কিন্তু তাতে একটা শেয়ালও পড়ল না। তবে শেষরাতে একটা বিশালাকায় ভালুককে স্নেজগাড়িটা শুকতে দেখা গেল। হাতে গ্রাভস। ট্রিগারে টিপতে অসুবিধা হচ্ছে। ঝট করে দস্তানাটা খুলে ফেলে ট্রিগার চাপ দিতে গিয়ে জনসন বিকট আর্তনাদ করে উঠল। ডা. ক্রুবোনি নৌড়ে গিয়ে তাকে নিয়ে এলেন। জল গরম করে জনসনের আঙুলটাকে ডুবিয়ে দিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার আঙুলের ছোঁয়া লাগামাত্র জল জমে বরফে পরিণত হয়ে গেল। ডা. ক্রুবোনি বললেন, 'আর একটু দেরি হলেই কেলেঙ্কারী চূড়ান্ত হয়ে যেত! আঙুলটা কেটে বাদ দেয়া ছাড়া উপায় থাকত না। আসলে বন্দুকের লোহার ট্রিগার আঙুলের চামড়ায় ঠেকামাত্র ঠাণ্ডায় আঙুলটা অসাড় হয়ে ট্রিগার আটকে যায়।

ডা. ক্রুবোনি গরম জল থেকে আঙুলটাকে তুলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে উদাভলি করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে তুললেন। জনসনের বোকামির জন্যই বুলেটটা বৃথা ব্যয় হয়ে গেল। এদিকে ক্ষিধেয় পেটে জ্বালা ধরে গেছে। উপস্থিতিতে ডা. ক্রুবোনিই একমাত্র ভরসা। সবাই গুলতে থুঁকতে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন।

সারাদিন হেঁটে মাত্র তিন মাইল পাড়ি দেওয়া গেল। নিরস্ত্র উপবাসের মধ্যে রাত্রি কাটল। ক্ষিধের জ্বালায় কুকুরগুলো পর্যন্ত কাতরাতে লাগল।



মঙ্গলবারের সকাল। আবার শুরু হল দুঃসহ অভিযান। এ অক্ষরেখায় গলা পর্যন্ত খাবার ঠেসে না রাখলে মানুষের পক্ষে জীবন ধারণা সম্ভব নয়। কিন্তু দীর্ঘ ছত্রিশ ঘন্টার কারো পেটে এক টুকরো খাবারও পড়ে নি। দুঘণ্টা মতো হাঁটতে না হাঁটতে পেটে হাত দিয়ে সবাই বরফের ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও সহযাত্রীদের পরিস্থিতি দেখে তিনি দমে গেলেন। বাধ্য হয়ে জনসনের সহযোগিতায় ইগলু তৈরি করে ফেললেন। ব্যাপারটা যেন সবার জন্য কবর তৈরি করলেন। পাঁচ পাঁচটা মানুষ দিনভর মরার মত ইগলুটার মধ্যে কাটালেন।

রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে জনসন, 'ভালুক! ভালুক!' বলে চিৎকার করে উঠলেন। ঘুম ভাঙলে ডা. ক্রুবোনিকে বললেন, 'একটা ভালুক নাকি দুদিন ধরে তাদের অনুসরণ করে চলেছে।' কথাটা শুনে ডা. ক্রুবোনি আক্ষেপ করে বললেন, 'ব্যাপারটা গোপন রেখেছিল কেন? বন্দুকের গুলি ফুরিয়েছে তাতে হয়েছে কী? সিনা তো সঙ্গে রয়েছে। গুলি তৈরি করে নেয়া যেত। কালই ভালুকটাকে আমি এটা দিয়ে শেষ করব।'

ডা. ক্রুবোনির কথায় সন্নিহনে তার মুখের দিকে তাকালেন।

ডা. ক্রুবোনি হাতের ধার্মেমিটারটাকে বাইরে, বরফের ওপর রেখে এলেন। ইগলুর বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের পঞ্চাশ ডিগ্রি নিচে অবস্থান করছে। সে জন্য মুহূর্তের মধ্যেই ধার্মেমিটারের পারা জমে শক্ত হয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই ডা. ক্রুবোনি ধার্মেমিটারটা ভেঙে পারদটুকু বের করে বন্দুকে পুরতে পুরতে বললেন, 'জনসন ক্যাপ্টেন রস মেরু অভিযানে বেরিয়ে জমাটবাঁধা পারদের বুলেট বানিয়ে কাঠ ফুটো করেছিলেন। জমাটবাঁধা বাদাম ডেলের বুলেট দিয়েও তিনি কাঠ ফুটো করেছিলেন। কাঠের তক্তা ফুটো হয়ে ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। আর বুলেটটা ছিটকে পড়েছিল। আস্তই রয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাসযোগ্য না হলেও ঘটনাটা একদম সত্য।

এখন সমস্যা হচ্ছে, ভালুকের কাছাকাছি না যেতে পারলে বুলেটটা লক্ষ্যভেদী হয়ে যেতে পারে। এবার সে সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সিলমাছের চামড়াকে গায়ে জড়িয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলেন। ভালুক সিলমাছ দেখলে ভয়ে পালায় না। ভালুকটা সিলমাছটাকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে সাবধানে এগোতে লাগলেন। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান যখন মাত্র তিন হাত ঠিক সে মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস দিলেন বন্দুকের ট্রিগার টিপ। ব্যস, কাজ হাসিল। অতিকায় ভালুকটা বরফের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। গলগল করে রক্ত ঝরল। বার কয়েক পাগুতো ছোড়াছুড়ি করে একসময় নিশ্চল নিখরভাবে এলিয়ে পড়ল। ইয়া তাগড়াই ভালুকটা নয় ফুট লম্বা আর পেটের পরিধি ছয় ফুট। কাটাকাটির পর তার পেট থেকে গলগলিয়ে জল বের হল। বেচারা কদিন কেবল জল দিয়ে পেটের জ্বালা জুড়িয়েছে। আজ তারই মাংসে অভিযাত্রীরা পেটের জ্বালা নেই। অভিযাত্রীরা কাঁচা মাংস ছিড়ে ছিড়ে খাবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ডা. ক্রুবোনি কোনোরকমে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন। মাংস না সেকঁকে খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

হায় অদৃষ্ট! মাংস সেকঁবেন কী করে? ভালুক শিকার নিয়ে সবাই মেতে থাকায় তেলের অভাবে স্টোভটা নিভে গেছে। জনসন নিজের চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগলেন। তারই জন্য এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটে গেছে।

ডা. ক্রুবোনি পকেট হাতড়ে চকমকি পাথরটা বের করলেন। জনসন ইস্পাতের টুকরোর খোঁজে সবগুলো পকেট হাতাল। এ কী, সেটা গোল কোথায়? কখন যে পকেট থেকে সেটা পড়ে গেছে টেরও পান নি। ইগলুর ভেতরে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করেও সেটার হদিস মিলল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, 'আমাদের সঙ্গে টেলিস্কোপ তো দূরের ব্যাপার লেসের কোন যন্ত্রও নেই। একটা লেন্স হলেই আগুন জ্বেলে নেয়া যেত।'

শেষপর্যন্ত কাঁচা মাংস খাওয়াই স্থির হল। ডা. ক্রুবোনি কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ঐকে কী যেন ভেবে চলেছেন। হঠাৎ মুখ খুললেন, 'লেন্স? লেন্স নাই বা থাকল। একটা লেন্স তৈরি করে নিলেই কাজ মিটে যেতে পারে।'

জনসন চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন 'সে কী! লেন্স তৈরি করে নেবেন? কী দিয়ে লেন্স তৈরি করতে চাচ্ছেন?'

ডা. ক্রুবোনি ইতিমধ্যেই বরফ কাটতে শুরু করে দিয়েছেন। কাজ করতে করতে তিনি বললেন, 'সূক্ষ্ম কৃষ্ণাাল হলেই রৌদ্রকে কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব। বরফের টুকরো দিয়েও সে কাজ হাসিল করা যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, বরফে লবণ থাকলে কিছুতেই লেন্স তৈরি সম্ভব নয়।

ডা. ক্রুবোনি কুড়ুল দিয়ে বরফের টুকরো কেটে কেটে তাকে লেসের আকারে নিয়ে এলেন। এবার সেটাকে ছুরি দিয়ে খুবই সতর্কতার সঙ্গে মসৃণ ও চকচকে করে নিলেন। শেষপর্যন্ত সেটা যেন স্বচ্ছ একটা কৃষ্টাঙ্গে পরিণত হয়ে গেল।

সদ্য তৈরি বরফের লেসটাকে রৌদ্রে পাতলা কাঠের টুকরোর ওপর ধরতেই সূর্যালোক কেন্দ্রীভূত হয়ে একসময় সেটা অদ্ভুতভাবে জ্বলে উঠল। সৃষ্টি হল আগুন। স্টোভটিকে ধরিয়ে ক্ষুধার্ত অভিযাত্রীরা এবার ব্যস্তহাতে ভল্লকের মাংসগুলো সেকে নিতে লাগল।

ভাল্লকের মাংস দিয়ে পেটের জ্বালা নেভাতে নেভাতে আলটামন্ট বলল, আর দুদিন কষ্ট করে হাঁটতে পারলেই আমার পরপয়েজ পৌঁছে যেতে পারব। আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউই আজ পর্যন্ত সেখানে যেতে পারে নি।

ডা. ক্রুবোনি কদিন ধরে বিশেষ একটা ভাবনার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। আসলে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের হাবভাব দেখেই তার মধ্যে ভাবনাটার উদয় হয়েছে। তিনি বাধ্য হয়ে জনসনকে ডেকে গোপনে বললেন, 'হ্যাটেরাস আর আলটামন্টকে নিয়ে আমাদের সমস্যা দেখা দিতে পারে। হয়ত নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে, তাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ। ক্যাপ্টেন তাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারছেন না। আলটামন্ট মেরুর এত কাছে গিয়েছিল কোন উদ্দেশ্যে বলতে পারেন? অবশ্য বলেছে হিমশৈল ঠেলে ধাক্কা পরপয়েজ কে সেখানে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু সেটা ডাঁহা মিথ্যা কথা।'

'তবে, তবে কেন আলটামন্ট বরফরাজ্যে আসতে উৎসাহী হয়েছে? এ ব্যাপারে আপনার কী ধারণা?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলটামন্ট অবশ্যই মেরু অভিযানে বেরিয়েছে। তাই তারা একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের সংঘাত কী করে যে ঠেকানো যাবে, ভেবে পাচ্ছি না।'

পথে আর কোনো সমস্যা দেখা দিল না। শনিবার সকালে চোখে পড়ল, ভূমির চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। স্বাদু জলের বরফও দেখা গেল। কাছাকাছি উপকূল আছে বলেই মনে হল। ডা. ক্রুবোনি আর ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস—উভয়ের মনেই আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল।

পরের দিন আলটামন্ট আচমকা স্নেজগাড়িটার ওপর লাফিয়ে উঠে পড়ল। চোখের কাছে হাত নিয়ে চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে এক সময় সোপানাসে বলে উঠল, 'পরপয়েজ! পরপয়েজ! ওই যে পরপয়েজ!'

২৪ মার্চ। এদিনটা ইউরোপবাসীদের কাছে উৎসবের দিন। বাড়িঘর, পথঘাট ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হয়। গির্জায় ঘণ্টা বাজে। জনসমাগম হয়। আজ সেই শুভ চব্বিশে মার্চ। বরফরাজ্যে হাড়কাঁপানো শীতেও অভিযাত্রীরা প্রাণোচ্ছ্বাসে লম্বা লম্বা পায়ে এগিয়ে চললেন।

পরপয়েজ। হ্যাঁ, পরপয়েজের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন সবাই। বরফে সম্পূর্ণরূপে চাপা পড়ে গেছে বিশালায়তন জাহাজটা। আচমকা দেখলে এটাকে হিমশৈল বলে মনে হয়। কাণ্ড হয়ে পড়ে থাকা বরফের পাহাড়। কুড়ুল, শাবল আর গাঁইতি দিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বরফ কাটা চলতে লাগল। জাহাজের তলাটা ফেঁসে গেছে। জনসন আর ডা. ক্রুবোনি কোনোরকমে ভেতরে ঢুকে গেলেন। গেলেন ভাঁড়ারে। জ্বালানী আর খাবারদাবারের পরিমাণ যথেষ্টই রয়েছে। অন্তত বহুর দুই তো চলবেই। তবে তলা ফাঁসা জাহাজে বাস করা সম্ভব নয়। বড়সড় একটা ইগলু তৈরি করে নিতে হবে। পাঁচদিন ধরে বরফ সরিয়ে গ্রানাইট পাথরের স্তর বের করা হল। সেখানেই তৈরি করা হল প্রাসাদের কায়দায় বিশাল এক ইগলু। পরপয়েজ জাহাজ থেকে আসবাসপত্র নিয়ে আসা হল। ধারে কাছে এগ্নিমোদের বাস নেই। এঁরা পাঁচজনই এখানে প্রথম পদচিহ্ন আঁকলেন।

আলটামন্ট আর হ্যাটেরাস দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ধাতের মানুষ। আলটামন্ট কথা বেশি বলে। কাজের চেয়ে অকাজের কথাই বেশি বলে। আর ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কথা খুবই কম বলেন। কাজের কথা ছাড়া তিনি মুখই খোলেন না। আর যা বলেন, সবই অন্তর থেকেই বলেন।

আমেরিকানদের আচার-ব্যবহার ও চরিত্র সম্বন্ধে ডা. ক্রুবোনির খুবই ভালো ধারণা রয়েছে। তাই তো আলটামন্টের আচরণে তিনি মোটেই অবাক হন নি। তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছেন, আলটামন্ট এ পর্যন্ত যা কিছু বলেছে সবই সত্য নয়। তার বক্তব্যে আসলের চেয়ে খাদই বেশি। আমেরিকার কয়েকজন বিদ্বান নাকি তাকে পরপয়েজ জাহাজে সমুদ্র-অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের বিশ্বাস কিন্তু অন্যরকম। সে দুর্গম মেরু-অভিযানে বেরিয়েছে।

তারা উভয়েই জাহাজের ক্যাপ্টেন। কেউ কারো ধার ধারে না। এখন একজন জাহাজের মালিক, অন্যজন জনবলে বলীয়ান। ডা. ক্রুবোনি দুই ক্যাপ্টেনের মধ্যে সংঘাতের সম্বন্ধে দেখতে পেয়েছেন। যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে তারা দ্বন্দ্ব লিপ্ত হতে পারে।

১৪ এপ্রিল। ডা. ক্রুবোনির ধারণাই বাস্তব রূপ নিল। ব্যাপারটার সূত্রপাত হল জায়গাটার নামকরণ করতে গিয়ে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, এখানে এর আগে কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি। অতএব এর নাম দেয়া হোক—'

তাকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই আলটামন্ট বলে উঠল, 'এ জায়গার নাম আগেই ঠিক করা হয়ে গেছে। আমিই নামকরণটা করেছি। স্বীকার করতেই হবে, আমি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের আগেই এখানে এসেছি।'

'হতে পারে। কিন্তু আমি দলবল নিয়ে না এলে আপনার পরপয়েজ যে বিশৃঙ্খল বরফচাপা হয়ে এখনও পড়ে থাকত, মানছেন তো জনাব?'

ডা. ক্রুবোনি পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ছে দেখে জট করে উভয়ে মাঝখানে হাজির হলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, কথটা তো মিথ্যে নয়। ইনি জায়গাটার নামকরণ করে থাকলে মেনে নিতে আপত্তির কীই বা থাকতে পারে! বদল তে, আপনি এর কোনো নামকরণ করেছেন?'

'নিউ আমেরিকা।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ইনি কেবল দেশটার নামকরণ করেছেন 'নিউ আমেরিকা। আমি ওই উপসাগরটার নামকরণ করছি 'ভিক্টোরিয়া উপসাগর'।

ডা. ক্লুবানি বললেন, 'তাঁলো কথা, ওই অন্তরীপটার নাম দিচ্ছি, 'ওয়াশিংটন অন্তরীপ'। আর ওই দ্বীপটার নামকরণ করছি 'জনসন দ্বীপ'। আর 'বেলমাউন্ট' নাম দিচ্ছি ওই পশ্চিমের পাহাড়টার।

এভাবে কথা কাটাকাটি আর মন কষাকষির মধ্য দিয়ে নামকরণ পর্ব কানোরকমে সম্পন্ন হল।

ডা. ক্লুবানি একদিন পাহাড়ের ওপরে উঠে দেখলেন, তার চূড়াটা মোটামুটি সমতল। সেখানে একটা লাইট হাউস তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন। এর ফলে দূর থেকে আলো দেখে ইগলুতে ফিরে আসা সহজ হবে। তেল বা কয়লা দিয়ে আলো জ্বালাবেন না। পরপয়েজ জাহাজে বুনসেন ব্যাটারি রয়েছে। তা দিয়ে লাইট হাউসের আলো জ্বালানো হবে। পাহাড়টার চূড়ায় একটা লঠন বসিয়ে দিলেন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডায় যাতে অ্যাসিড জমে যেতে না পারে সেজন্য ইগলুর ভেতরে ব্যাটারি রেখে তারের মাধ্যমে লঠন আর ব্যাটারির সংযোগ সাধন করা হল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই লঠনের কালি পেলিস দুটো পরস্পরের সান্নিধ্যে আনতেই লঠনটা জ্বলে উঠল। আলোকের শিস বরফের ওপরে বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। বহু দূর থেকে সেটাকে দেখা যেতে লাগল। তিন শো গ্যাস জেট বা তিন হাজার মোমবাতি জ্বলে এ পরিমাণ আলো সৃষ্টি করা সম্ভব।

ডা. ক্লুবানি তিনজনকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস উপকূলের পরিস্থিতি দেখার জন্য একাই বেরিয়ে পড়লেন।

ডা. ক্লুবানি তিন ঘণ্টা হেঁটে পনেরো মাইল পথ পাড়ি দিলেন। শেয়াল বা খরগোস কিছুই নজরে পড়ল না। জমাটবাঁধা বরফের ছিদ্র দিয়ে সীলমাছ বাইরে বেরিয়ে এসে নিশ্বাস নিয়ে আবার একই পথে ভেতরে ঢুকে গেছে, বরফের ওপর পায়ের ছাপ দেখে বুঝতে পারলেন। ইউরোপিয়ানরা চামড়া আর চর্বির জন্য সিলমাছ মারে। আর এক্সিমোরা দুর্গন্ধযুক্ত হলেও এর মাংস খায়। তারা প্রত্যেকে প্রতিদিন পনেরো পাউন্ড মাংস অনায়াসে খেয়ে ফেলে। মেরু অঞ্চলে বেশি পরিমাণ না খেলে শরীর গরম থাকে না। স্যার জন রস লিখেছেন, বৃটিয়াল্যান্ডের অধিবাসী গাইডরা নাকি ঘাঁড়ের মাংস টুকরো টুকরো করে কাটত আর অল্প অল্প করে মাংস মুখে ঠেসে দিত। অজগর যেমন অল্প অল্প করে ঘাঁড়কে গেলে, ব্যাপারটা প্রায় সেরকমই। অবশিষ্ট মাংস বরফের ওপর বুলিয়ে রাখত।

হঠাৎ বরফের ওপর কী যেন একটা সচল বস্তুকে দেখা গেল। সিন্ধুঘোটক। হ্যাঁ, সিন্ধুঘোটকই বটে। আচমকা তিনজনই একসঙ্গে গুলি ছুড়লেন। গুলিবিদ্ধ সিন্ধুঘোটকটা গর্জন করতে করতে ছুটেতে লাগল। শিকারিরা তিনদিক থেকে ধেয়ে গেল। আলটামন্ট হাতের কুড়ুল দিয়ে তার ডানা দুটোকে ধড় থেকে আলাদা করে দিল। ব্যস, হতভাগ্য জানোয়ারটা বরফের ওপর পড়ে কাতরাতে লাগল। পনেরো ফুট লম্বা সেটা। ডা. ক্লুবানি কুড়ুল আর ছুরি দিয়ে আর গা থেকে মাংসটুকু আলাদা করে পোটলা বেঁধে নিলেন। তার চর্বী, চামড়া ও হাড়পোড় দাড় কাকের জন্য বরফের ওপরে ফেলে রাখলেন।

প্রকৃতির বৃকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এসেছে। লাইট হাউসের আলোর নিশানা অনুকরণ করে অভিযাত্রীরা তাদের ইগলুতে ফিরে এলেন।

ডা. ক্লুবানি নিজ-হাতে মাংস রান্না করলেন। চমৎকার তার স্বাদ হয়েছে। খাওয়া শেষ হলে তিনি প্রত্যেকের কাপে ফুটন্ত কফি ঢেলে দিলেন। তাঁর কাণ্ড দেখে আলটামন্ট তো অবাক। তার মনের কথা বুঝতে পেরে ডা. ক্লুবানি বললেন, 'আপনাদের হয়ত জানা নেই, তালু ও জিভের চেয়ে হাতের অনুভূতিশক্তি বেশি। এমন মানুষের অভাব নেই যে এক শো ত্রিশ ডিগ্রি গরম কফি দিব্যি চুমুক দিয়ে খেতে পারে।' কথা বলতে বলতে তিনি ফুটন্ত কফির ভেতরে থার্মোমিটার ডুবিয়ে দিয়ে দেখেন একশো একত্রিশ ডিগ্রিতে পারা পৌঁছেছে। এবার কফিন কাপে চুমুক দিলেন।

আলটামন্ট জিজ্ঞাসা করল, 'মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশি কতটা উত্তাপ সহ্য করা সম্ভব?'

ডা. ক্লুবানি বললেন, 'কয়েকটা ঘটনা বলছি তবেই তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে। ফরাসিদের এক পাঁউকটির কারখানায় এক মেয়ে-কর্মী একশো ত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপে দশ মিনিট কাল দিব্যি দাঁড়িয়েছিল। একশো ত্রিশ ডিগ্রি মানে জলের ফুটনাঙ্কের চেয়ে উন্নতবর্গে ডিগ্রি বেশি। মাংস আর আপেল আশেপাশে সিদ্ধ হয়ে গেছে।

এবার বলছি, সতের শো চুয়ারত্তর সালের এক ঘটনা। আমরার মত কয়েকজন অভিযাত্রী সে বছর দুশো পঁচানব্বই ডিগ্রি উত্তাপ সহ্য করে দেহ অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু তাদের পাশে রক্ষিত মাংস ও ডিম একেবারে ঝলসে যায়।

এবার বলছি, জন্তু জানোয়ারদের কথা। তাদের মধ্যে পাখিরাই সবচেয়ে বেশি উত্তাপ সহ্য করতে সক্ষম। একশো দশ ডিগ্রি দেহতাপ থাকে মুরগী ও হাঁসে। পঁচার দেহ কিন্তু একশো দশ ডিগ্রির বেশি নয়। মানুষের দেহতাপ একশো এক ডিগ্রি, অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের দেহতাপ মানুষের চেয়ে কিছু বেশি। মানুষের দেহতাপের প্রায় কাছাকাছি ঘোড়া, বাঘ, হাতি, শুক এবং খরগোসের দেহতাপ। আবার একশো তিন ডিগ্রি দেহতাপ ধারণ করে ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বানর, বেড়াল, প্যাঁহা, ইঁদুর, কাঠবিড়ালি প্রভৃতি। এবং একশো চার ডিগ্রি দেহতাপ শূয়ারের। জলচর প্রাণীদের দেহতাপ জলের প্রকৃতি অনুসারে কম-বেশি হয়। যেমন—ব্যাঙের সত্তর ডিগ্রি, সাপের ছিয়াশি ডিগ্রির ও কম, সাড়ে আটষষ্ঠি ডিগ্রি দেহতাপ হাঙরের। জলজ কীটের দেহতাপ জলের দেহতাপে মোটামুটি সমান থাকে।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবার মুখ খুললেন, 'ডা. ক্লুবানি, গরমের ব্যাপারে তো অনেক কিছুই শোনালেন। এবার ঠাণ্ডার কথা কিছু বলুন তো।'

'জুন, থার্মোমিটারের পারদ কোনো সময়েই শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের নিচে নামে না। আজ পর্যন্ত যা কোনো মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব হয় নি আমরা তাই করেছি—সত্তর ডিগ্রি তাপমাত্রা পর্যন্ত আমরা সহ্য করেছি। একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, অত্যধিক শৈতে হাত-পা একেবারে শীতল হয়ে গেলেও আন্তনের আঁচের সাহায্য নেয়া উচিত নয়, বরফের টুকরো দিয়ে ঘষলে ফল পাওয়া যায়। আন্তনের আঁচে হাতপা পুড়ে যায়। কিছু বোকাই যাবে না। সে অবস্থায় পোড়া অংশ কেটে বাদ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

বরফের মুল্লুকে কাজকর্ম তেমন নেই। অধিকাংশ সময়েই হাতপা গুটিয়ে স্থবিরের মতো বসে থাকতে হয়।

এদিকে এলোমেলো বাতাসে জাহাজটা অল্প অল্প করে ভেঙে পড়তে লাগল। ভাগ্য ভালো যে, জাহাজের জিনিসপত্র আগেভাগেই বের করে আনা হয়েছিল। মায় তক্তাগুলো পর্যন্ত বের করে এনে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছে। ডা. ক্লুবানির ইচ্ছা শীতের প্রকোপ কমলে সেগুলো জোড়াতালি দিয়ে বড়সড় একটা নৌকা তৈরি করে ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করবেন।

এদিকে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এবং আলটামন্ট এর দ্বন্দ্ব চরমরূপ নিতে চলেছে। ডা. ক্লুবানি বুঝতে পারছেন, অচিরেই তারা একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পাশাপাশি দু-দজন ক্যাপ্টেন—মানে এক মনে দু-সিংহের বাস।

তাছাড়া একজন আমেরিকার আর অন্যজন ইউরোপের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বন্ধপরিকর। ইংরেজ আর আমেরিকার মধ্যে জাত্যাভিমান ও বিদ্বেষ, এ তো আর আজ নতুন নয়।

একদিন ডা. ক্লুবানি আলটামন্টকে পরামর্শ দিলেন সংবাদপত্র প্রকাশ করতে, না হয় নাটক অভিনয়ে মন দিতে। এতে এক খেয়েমি কেটে মন প্রফুল্ল হবে। পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা চটকদার সংবাদ সম্বলিত সংবাদপত্র প্রকাশ করতেন। আর প্রায়ই নাটক অভিনয়ে মেতে যেত। আলটামন্ট তাঁর কথাটার গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার অজুহাতে সেখানে থেকে কেটে পড়ল।

চম্বিশে আর ছাব্বিশে এপ্রিল জড়ের তাণ্ডব অস্বাভাবিক রূপ নিয়ে দেখা দিল। সে কী গর্জন! ডা. ক্লুবানির মনে আনন্দের জোয়ার। আর বড় জোর মাস দেড়েক পরেই শীত বিদায় নিয়ে বসন্তের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবে।

এদিকে অবিরাম তুষারবৃষ্টি হয়েই চলেছে। ভাঁড়ার থেকে ঝটপট কিছু খাদদ্রব্য নিয়ে আসা হল। কিছু কাঁচামাংস জোগাড় না করলেই নয়।

ডা. ক্লুবানি তাই আলটামন্ট ও বেলকে নিয়ে শিকারে বেরোলেন। পর পর দুদিন বরফের ওপর দিয়ে হনো হয়ে ঘোরাফেরা করেও ভাল্লুকের দেখাও পেলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে আসতেই হল।

এদিকে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সহযাত্রীদের নিয়ে থানাইট হাউসে হাজির হলেন। আমেরিকান আলটামন্টের অনুপস্থিতির সুযোগের সম্ভাবহার করতে গিয়ে তিনি অন্যান্যদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে নিতে চাইলেন। দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে, শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হল উত্তরেই যাওয়া হবে। এবার ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তাঁর আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে বললেন, ‘হতচ্ছাড়া আমেরিকানটা যদি আমার কর্তৃত্ব মেনে নিতে না চায়? তবে?’ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। আর এও স্থির হল, পরপরয়ের তক্তা দিয়ে নৌকা তৈরি করে উপকূল ঘেঁসে অগ্রসর হওয়া যাবে। কিন্তু এতে প্রবল আপত্তি তুললেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। আমেরিকান জাহাজের কাঠ দিয়ে নৌকা তৈরি করে কিছুতেই অভিযানে যাওয়া হবেনা। এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই আলটামন্ট সেখানে এসে যাওয়ায় তখনকার মতো আলোচনা স্থগিত রইল।

পরের দিন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, বেল এবং আলটামন্ট বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরোলেন। কিছুক্ষণ পরেই দমাদম বন্দুকের আওয়াজ বাতাস বাহিত হয়ে ইগলুতে অবস্থানকারী জনসনের কানে এল। প্রথমে সে খুশিই হল। ভাল, আজ ভাল্লুকের কাঁচামাংসে জিভটাকে পাশ্টো নেয়া যাবে। খুশিতে ডগমড হয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড়ের শিখরে উঠে গেলেন। ব্যাপার দেখেই তার কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগার হল। দেখলেন, শিকারিরা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছেন আর থেকে থেকে পিছন ফিরে গুলি চালাচ্ছেন। আর তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছে পাঁচটা অতিকায় হিংস্র ভাল্লুক।

একটু বাদেই শিকারিরা ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে ইগলুর মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। জনসন দুম্ব করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ব্যস, নিরাপদ। মুহূর্তের মধ্যেই ক্রোধান্বিত পাঁচ-পাঁচটা ভাল্লুক ইগলুর দেয়ালের বাইরের দেয়ালে থাকা দিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে আর আক্রোশে গর্জন করতে লাগল।

এখন সবচেয়ে বেশি ভয় হচ্ছে ডা. ক্লুবানিকে নিয়ে। তিনি ধীপে গেছেন। আগে থেকে সতর্ক না হলে হিংস্র ভাল্লুকগুলো তাঁকে ছিড়ে-ফেড়ে ছাড়বে। আশ্চর্য ব্যাপার! ভাল্লুকগুলো দরজায় টহল দিতে দিতে হরদম তর্জন গর্জন করেই চলেছে।

দুঘন্টা কেটে গেল। হতচ্ছাড়া ভাল্লুকগুলো তবুও দরজা ছেড়ে নড়ল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী লোহার লম্বা শিক আঙনে তাড়িয়ে টকটকে লাল করে আনা হল। বরফের দেওয়াল ফুটো করে সেটার একটা প্রান্ত বাইরে বের করে দেয়া হল।

হ্যাঁ, মতলব অনুযায়ীই কাজ হয়েছে বাটে। তীব্র আক্রোশে ভাল্লুকেরা গরম শিকটাকে জাপ্টে ধরতেই বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে দমাদম বন্দুকের গুলি ছুড়তে লাগল। পরমুহূর্তেই ভাল্লুকরা অভ্যাশ্চর্য অবিস্ময় এক কাজ করে বসল। বরফ দিয়ে ইগলুর দেওয়ালের ছিদ্রগুলো বন্ধ করে দিল। তা দিয়ে বন্দুকের গুলিও বাইরে যেতে পারল না।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস স্থির করলেন, রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে ইগলুর ছাদ ফুটো করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দরকার হলে সামনাসামনি লড়াই করবেন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। হতচ্ছাড়া ভাল্লুকগুলোর তড়পানি সমান তালেই চলতে লাগল। এদিকে অভিযাত্রীরা ইগলুর ছাদ ফুটো করার কাজে লেগে গেলেন। কেউ বা গুরু করলেন বন্দুকে গুলি বারন্দ ভরে তৈরি হয়ে নিতে।

একটু বাদেই শোবার ঘরে কিসের যেন খসখস আওয়াজ হতে লাগল। জনসন ছুটে গিয়ে দেখলেন, ভাল্লুকগুলো যুদ্ধের কৌশল পাশ্টেছে। সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়ে তারা বরফের দেওয়াল ফুটো করছে। অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কুড়ুল আর ছুরি হাতে দেওয়াল ঘেঁষে দাড়িয়ে পড়লেন। সে সঙ্গে কাঁধে বন্দুক তো রয়েছেই আলটামন্টও তৈরি হয়ে পড়লেন।

একটু বাদে আলটামন্ট হাভের কুড়লটা বাগিয়ে ধরে যেই না কোপ বসাতে যাবেন, অমনি ডা. ক্লুবোনি চিল্লিয়ে উঠলেন, 'আরে, করছেন কী জনাব! করছেন কী! আমি—আমি ডা. ক্লুবোনি!'

ডা. ক্লুবোনি পরপয়েজের ধ্বংসাবশেষের কাছে পৌঁছেই বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন। দ্রুত টিলার ওপরে উঠে ভান্নুকদের দেখতে পান। স্বাদু মাংসের লোভে তারা ইগলুর দরজায় টহল দিচ্ছে। এবার টিলা থেকে নেমে শুদামে ঢুকে একটা ছুরি নিয়ে এলেন। তারপর দরজার বিপরীত প্রান্তের দেয়াল কাটতে লেগে গেলেন। তিন ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে বরফ কেটে ভেতরে ঢুকতে পারলেন।

ডা. ক্লুবোনি সন্ধ্যাে বললেন, 'নন্ডাড ভান্নুকগুলো দেখছি আমাদের পিছনে ঐটিলির মতো লেগে রয়েছে। উচিত শিক্ষা না দিলে দেখছি আর চলছে না। এখনি বোমা ফাটিয়ে হতচ্ছাডাদের যমের দক্ষিণ দূয়ারে পাঠিয়ে ছাড়ব। তাই তো আমি শুদামধর হতে বারুদ নিয়ে এসেছি। রাত্রের মধ্যে একশো ফুট সুড়ঙ্গ কেটে টোপ দিয়ে হিংস্র ভান্নুকগুলোকে কাছে টেনে আনব। কথা বলতে বলতে সুড়ঙ্গপথে একটা মরা শেয়াল টানাটানি করে ভেতরে আনতে গিয়ে বললেন, 'এটাকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করব।'

সবাই মিলে ঘণ্টা দশেকের মধ্যে একশো ফুট সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেললেন। এবার সুড়ঙ্গের মুখে মরা শেয়ালটাকে রেখে দিলেন। আর তারই ঠিক তলায় রাখলেন বারুদের স্থপ। একশো পাউন্ড বারুদ। বারুদের স্থপ থেকে পলতে নয়, একশো ফুট বৈদ্যুতিক তার টেনে আনা হল। বারুদের মধ্যে রইল তার দুটোর এক প্রান্তের মুখ দুটো। স্পার্ক হওয়ামাত্র বারুদে আগুন লেগে যাবে। তার দুটোর অন্য প্রান্ত বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। ডা. ক্লুবোনি ব্যাটারির বিদ্যুৎপ্রবাহ চালু করে দিলেন। প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। বারুদের আগুন চারদিকে ছিটকে পড়ল। ক্ষত বিক্ষত দেহে ভান্নুকগুলো বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে পালাতে লাগল। ডাক ও অন্যান্য কুকুরগুলো তর্জন গর্জন করতে করতে তাদের পিছু নিলেন।

পরের দিন আচমকা পারদস্তুপ পনের ডিম্বি ওপরে উঠে গেল। কয়েক দিন ধরে পারদস্তুপ একই জায়গায় স্থির হয়ে রইল। মেরু বসন্ত এসে গেল। বরফ গলতে শুরু করেছে। জানা অজানা পাখি ডাকাডাকি করতে লাগল। জলে প্রাণীর চাঞ্চল্য, জমির ওপরেও বিভিন্ন আকৃতি আর বর্ণের প্রাণীরা চলাফেরা করতে শুরু করল। নিরীহ নম্র প্রাণীদের ওপর নেকড়েয়া আক্রমণ চালাতে লাগল। অভিযাত্রীরা সাবধানতা অবলম্বন করলেন। ক্যাপ্টেন প্রিয় কুকুর ডাকও নিজের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল।

টাটকা মাংসের অভাব নেই। একটু চেষ্টা করতেই জন্তু-জানোয়ার ঘায়েল করা যায়। পনের দিন ধরে সবাই গলা পর্যন্ত ঠেসে মাংস খেয়ে জিভকে তুষ্ট করতে সক্ষম হলেন।

আশ্চর্য ব্যাপার! হঠাৎ করে তাপমাত্রা শূন্য ডিম্বি তাপমাত্রা থেকে আট ডিম্বি নিচে নেমে গেল। যাদুমন্ত্রের মতো পশু পাখিরা বেপাতা হয়ে গেল। ডা. ক্লুবোনি ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'এর জন্য আতঙ্কের কোন কারণই নেই।' প্রতি বছর এগারো, বারো এবং তেরোই মে দ্রুত শীত ফিরে আসে। তারপর আবার চলেও যায়। এমনই হঠাৎ করেই।

২৫ মে পর্যন্ত কনকনে ঠাণ্ডা বিরাজ করল। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ডা. ক্লুবোনিকে আমেরিকান জাহাজের তত্ত্বা ব্যবহার করে নৌকা তৈরি করার অনুমতি দিলেন।

মে মাসের শেষের দিকে তাপমাত্রা বেড়ে আবার শুন্য ডিম্বির ওপরে উঠে গেল। আবার বরফের গায়ে ফাটল দেখা দিল। বরফ গলতে শুরু হয়ে গেল। পশু-পাখির দল আবার ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অভিযান প্রসঙ্গে কথা উঠতেই আলটামন্ট মন্তব্য করলেন—'আমাদের গতি যদিদিকে, যেকোনই হোক না কেন ফিরে আসার ব্যাপারটাকেও মাথায় রাখতে হবে।'

'কিন্তু কোথায় চলছি?' ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বলে উঠলেন।

'আমাদের পক্ষে, কিন্তু ফিরতে হবে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজ অবলম্বন করে। সেটা আজ অবধি অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে।'

তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, 'যা জানা নেই তা নিয়ে আগ বাড়িয়ে কথা বলার দরকার কী, বুঝছি না তো!'

'আপনিই জানেন না জনাব। আরো শুনে রাখুন, যে নর্থওয়েস্ট প্যাসেজে আজ পর্যন্ত কেউই যেতে পারে নি একমাত্র আমিই সেখানে যেতে সক্ষম হব। শুনে রাখুন জনাব!' ক্রমেই উভয়ের বক্তব্য উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। আলটামন্ট ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের বক্তব্যকে আলম না দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

২৯ মার্চ। জনসন আর বেল ডা. ক্লুবোনির তত্ত্বাবধানে জোর কদমে নৌকা তৈরির কাজ করে চলেছেন। আর সুযোগ পেলেই জনসন এক্সিমোদের কায়দায় বন্যা হরিণ শিকারে মেতে যায়। এক অনাস্বাদিত আনন্দের মধ্যে ডুবে রইলেন অভিযাত্রীরা।

একসকালে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, ডা. ক্লুবোনি এবং আলটামন্ট বন্দুক নিয়ে শিকারে বের হলেন, সামান্য এগোতেই দুটো কস্তুরী হরিণ দেখেন। হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় বুঝি-বা হরিণ আর ঝাড়ের সংমিশ্রণে এদের সৃষ্টি। যেমন দেখতে অতিকায়, স্বভাবও খুবই হিংস্র। শিকারি তিনজন পরামর্শ করে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে তাদের ঘায়েল করার চেষ্টা করলেন। কার্যত ফল হল বিপরীত। কস্তুরী হরিণ দুটোর একটা হ্যাটেরাসকে সামনে দেখে ভাবল, একটামাত্রই মানুষ রয়েছে। তাই সে ঘাড় কাত করে, শিং বাঁকিয়ে তাঁর দিকে তেড়ে গেল। হ্যাটেরাস গুলি করলেন। হিংস্র জানোয়ারটা গুলিবিদ্ধ হল। এবার অধিকতর আক্রোশে তাঁর দিকে ধেয়ে যেতে লাগল। গুলির আওয়াজ শোনামাত্র দ্বিতীয় কস্তুরী হরিণটাও তার দিকে ক্রোধে তর্জন গর্জন করতে করতে এগোতে লাগল। সেটা হ্যাটেরাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিং করে ফেলে দিয়ে শিং বাগিয়ে আখাত হানার জন্য তৈরি হয়ে গেল।

আলটামন্ট ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে ভাবতে লাগল, আমার চরমতম শত্রু যদি নিপাত যায়, ক্ষতি কী? পরমুহূর্তেই তিনি মনের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া সেরে বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল ঠেকিয়ে দিলেন টান। ব্যস, চোখের পলকে বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গিয়ে একটা হিংস্র জানোয়ারকে ঘায়েল করে দিল। আর একটু হলেই সেটা ক্যান্টেন হ্যাটেরাসের ভুড়িতে শিং গেঁথে দিত।

আকস্মিক ভীতিটুকু কাটিয়ে ক্যান্টেন হ্যাটেরাস হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতে করতে আলটামন্টকে বললেন, 'জনাব, আপনার জন্যই আজ আমার প্রাণরক্ষা হল।'

ডা. ক্লুবানি ছুটে এসে বললেন, 'ক্যান্টেন হ্যাটেরাস, আলটামন্ট আপনারই মতো এক নির্ভীক ও বিবেকবান পুরুষ।'

ক্যান্টেন হ্যাটেরাস আবেগে অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন, 'তিনিও আমার মতোই একই পথের যাত্রী। একই গৌরবের অংশীদারও বটে।'

'একই পথের? একই গৌরবের অংশীদার? কিসের গৌরবের ইঙ্গিত দিচ্ছেন ক্যান্টেন হ্যাটেরাস? আপনি কি সুমেরু অভিযানের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, সুমেরু অভিযানের কথাই বটে।'

'তবে তো আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম দেখছি! আমি কিন্তু নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজের খোঁজে ছুটে চলেছি।'

ক্যান্টেন হ্যাটেরাস করমর্দন করতে করতে বললেন, 'ভাই, বন্ধু আলটামন্ট জনাব, আসুন আমরা মনের গ্রানিটুকু মুছে ফেলে একই সঙ্গে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সুমেরু অভিযানে যাই। উভয়ে বিজয় গৌরবটুকু ভাগাভাগি করে নিই।'

আবেগে উচ্চাসে অভিভূত ডা. ক্লুবানি বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ আর আমেরিকান বিভেদটুকু মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে চলুন আমরা অসম সাহস আর অটুট মনোবল নিয়ে এগিয়ে যাই অজানাকে জানতে, অচেনাকে চিনতে আর অসম্ভবকে সম্ভাবনায় করে তুলতে।'

সেরায়ে আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সবাই মিলে কস্তুরী হরিণের মাংস দিয়ে ভোজ সারলেন। একজন আমেরিকান ও একজন ইংরেজকে দু-পাশে বসিয়ে ডা. ক্লুবানি ভোজের আনন্দটুকু পুরোপুরি আবাদন করলেন।

এদিকে নৌকা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ। ২৫ জুন নতুন করে যাত্রা করার দিন ধার্য হল। স্নেজগাড়ীটাকে সারাই করে তাতে অত্যাব্যসিক সামগ্রী দিয়ে বোঝাই করা হল। চারটে কুকুর বোঝাসহ স্নেজটাকে টানবে। প্রতিদিন বারো মাইল হিসাবে ৩৬০ ঘাট মাইল যেতে এক মাস লেগে যাবে।

২৫ জুনের জন্য অপেক্ষা না করে চব্বিশে জুন কাকডাকা ভোরে অভিযাত্রীরা পথে নামলেন।

সমতল পথ ও আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে ডা. ক্লুবানি অদ্ভুত একটা ব্যবস্থার মাধ্যমে বার বার দিকদর্শন যন্ত্রটা ব্যবহারের ঝামেলা এড়াতে লাগলেন। উত্তরের দূরবর্তী কোনো একটি বিশেষ বস্তুকে একবার দেখে নিয়ে তারপর সেটাকে নজরে নজরে রেখে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন।

দুদিন পথ চলার পর তৃতীয় দিনে একটা হ্রদ পথে পড়ল। এখানকার বরফ বছরের মধ্যে কোনোদিনই গলে না। এখানকার ভূপ্রকৃতি দেখে ডা. ক্লুবানি নিঃসন্দেহ হলেন, নিউ আমেরিকা একটা দ্বীপমাত্র। এটা অবশ্যই মেরুবিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। আর ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে। আঠাশে জুন থার্মোমিটারের পারদ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রিতে উঠে স্থির হল। এবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল।

২৯ জুনও আবহাওয়া অপরিবর্তিত রইল। ত্রিশে জুন প্রবল তুষানল উঠল। বরফ টুকরো টুকরো হয়ে সচল হয়ে উঠল। আশ্চর্য ব্যাপার এত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও কোনো অঘটন তো ঘটলই না এমনকি অভিযাত্রীদের মধ্যে ত্রাসের স্বপ্নের পর্যন্ত হল না।

৩ জুলাই বরফের রং দেখে অভিযাত্রীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। এমন টকটকে লাল বরফ যে কল্পনাভীত ব্যাপার। ডা. ক্লুবানি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে নিতে গিয়ে বললেন—'প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার বরফে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার বিশেষ প্রজাতির ছত্রাকের উপস্থিতির জন্য বরফ এমন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। কয়েক মাইল অঞ্চল জুড়ে সিঁদুরের মতো লাল বরফের বিচিত্র সমারোহ ঘটেছে।

৬ জুলাই পর্যন্ত প্রকৃতি বিরুদ্ধাচারণ করেছে। পুরো অঞ্চলটা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবার কুয়াশার দাপট নিশ্চিহ্ন হয়ে পরিবেশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ডা. ক্লুবানি হিসেব করে বুঝলেন, প্রতিদিন আট মাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হয় নি। কুয়াশাই এর জন্য দায়ী।

পথ চলতে চলতে বেল আর আলটামন্ট আচমকা উপড় হয়ে ভূমিতে কী যেন দেখলেন। ডা. ক্লুবানি সেটা লক্ষ করে সেখানে ছুটে গেলেন। তিনি যা দেখলেন তাতেই তার আশ্চর্যম্বিত হয়ে যাবার জোগাড় হল। ভূমিতে একজোড়া বুটের ছাপের সারি। ইউরোপীয় বুটের ছাপ। ব্যাপার দেখে ব্যাটেরাস আপন মনে বলতে লাগলেন, 'এমন নির্জন-নিরাল প্রান্তরে বুটের ছাপ! আমার আগে কে এখানে এসেছে?' ব্যাপারটা অন্যান্য অভিযাত্রীদের যাবপনাই বিশ্বাসের কারণ হল। বুটের ছাপগুলো অনুসরণ করে অগ্রসর হতে হতে প্রায় এক মাইল এগিয়ে এক সময় সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দেখলেন, বুটের ছাপ এবার পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেছে। ক্যান্টেন হ্যাটেরাস চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সামনে, সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। সোজা উত্তরমুখে অগ্রসর হইলেন।

আরও কয়েক পা এগিয়েই ডা. ক্লুবানি চিৎকার করে উঠলেন, 'এ কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার! একটা পকেট দূরবীনের লেন্স বরফের ওপর পড়ে রয়েছে!'

জনসন কণ্ঠস্বরে হতাশার ছাপ ফুটিয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা মেরুবিন্দুতে পৌঁছে হয়ত দেখতে পাব আর কেউ আমাদের আগেই সেখানে বসে রয়েছে। এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ডের বাবা।'

এবার পথ চলার গতি অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই অভিযাত্রীরা উন্মুক্ত সমুদ্রের তীরে হাজির

হলেন। একেবারেই উদ্ভুক্ত সমুদ্র। দ্বীপ বা স্থলভূমির নামগন্ধও দূর দিগন্তে নজরে পড়ছে না। উত্তরদিকে যতদূর চোখ যায় নজরে পড়ে কেবল জল আর জল। গামলার মত গহ্বর সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ডান আর বাঁয়ে দুটো অন্তরীপ অবস্থান করছে। ক্রমে সরু হয়ে সমুদ্রে পড়ে অস্তিত্ব হারিয়েছে। অন্তরীপ দুটোর মধ্যবর্তী অংশের জলনিস্তরস। মনে হল একটা উপসাগর ছাড়া কিছু নয়।

অভিযাত্রীদের নৌকাটাকে জলে ভাসাতে সারাটা দিন কেটে গেল। স্নেজ গাড়িটাকেও নৌকায় তুলে নেওয়া হল। প্রকৃতি সৃষ্ট পাথরের জেটিটার নামকরণ করা হল, 'আলটামন্ট বন্দর'।

পরের দিন সকাল আটটায় ডা. কুবোনি টিলার ওপরে উঠে কুড়িয়ে পাওয়া পকেট দূরবীনের লেন্সটা চোখের সামনে ধরেই চিৎকার করে উঠলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! টিলা থেকে তরতর করে নেমে এসে কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলতে লাগলেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, কদিন আগে আমরা যে পকেট দূরবীনের লেন্স আর বুটের ছাপ দেখেছিলাম, মনে আছে তো। আসলে বুটটা বেলের আর পকেট-দূরবীনের লেন্সটা আমার নিজের। আসলে কুয়াশার মধ্যে পথ হারিয়ে আমরাই বরফের ওপর দিয়ে এক পাক মেরে এসেছিলাম। তখনই আমার পকেট-দূরবীনের লেন্সটা অসতর্কতার জন্য খসে পড়ে আর বেলের বুটের ছাপ পড়ে বরফের ওপর।' কথাটা বলেই তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন।

১০ জুলাই। অভিযাত্রীরা যেখানে অবস্থান করছেন সেখান থেকে মেরুবিন্দু ১৭৫ মাইল দূরে।

নৌকার নোঙর তোলা হল। এখানকার সমুদ্র ছোট হলে কি হবে তার রূপ অতুলনীয়।

নৌকার ওপর দিয়ে অতিক্রম পেঙ্গুইন ও অ্যালবট্রেস উড়ে যেতে দেখা গেল। তারপর তারা জল থেকে ঠুকরে ঠুকরে খুবই সুস্বাদু জেলিফিস খেতে লাগল। আর অসংখ্য তিমির মাথার ছিদ্র দিয়ে থেকে থেকে ফোয়ারা ছুটতে লাগল। সব মিলিয়ে সে এক অত্যাশ্চর্য শোভা সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযাত্রীদের নৌকা এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। পরের দিন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস চোখে দূরবীণ লাগিয়ে নৌকার গলুইয়ে দাঁড়িয়ে উত্তরদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলতে লাগলেন। এক সময় তিনি ডান্ডা ডান্ডা বলে চৈচিয়ে উঠলেন।

ডা. কুবোনি চোখের সামনে দূরবীণটা ধরে প্রায় আতর্জন করে উঠলেন—'এ কী সর্বনাশ ব্যাপার! ডান্ডা নয়। আগ্নেয়গিরি। তারই ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে!'

চোখের সামনে থেকে দূরবীণটা নামিয়ে রেখে তিনি এবার বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। জেমস রস তো কুমেরুতে গিয়ে টেরর ও এরেরাস নামক দুটো আগ্নেয়গিরি, আবিষ্কার করেছিলেন বটে।

সারারাত জেগে থাকার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও ডা. কুবোনি ও অন্যান্যরা শেষপর্যন্ত এক এক করে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে প্রবল ঝড় তুফান শুরু হয়ে গেল। সারাদিন ধরে চলল জল ঝড়ের তাণ্ডব। বুক কাঁপানো তর্জন গর্জন। সন্ধ্যার কিছু পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। অত্যাশ্চর্য এক আলোকরশ্মির উদ্ভব হল। আসলে এ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র হওয়ার জন্যই হয়ত-বা এখানে সমুদ্রে এমন আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। সমুদ্রের সে উন্মাদনা অনুপস্থিত।

বাতাস কমে গেছে। পাল একেজো হয়ে পড়ায় অভিযাত্রীরা দাঁড় টেনে নৌকাটাকে আরো উত্তরে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। একটা বাদলই আবার ঝড় উঠল। পাল ফুলে উঠে নৌকাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। দাঁড় টানা বন্ধ হল।

কুয়াশার আড়াল দিয়ে লকলকে আগ্নেয়গিরি মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই আবার কুয়াশায় সবকিছু ঢাকা পড়ে গেল।

উপকূলের চিহ্ন এবার নজরে পড়ল। হঠাৎ ভয়ংকর একটা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অভিযাত্রীদের বুক কঁপে উঠল। প্রায় এক হাজার ফাদম দূরের একটা হিমশৈলই তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সেটা ঢেউয়ের তালে তালে অনবরত নাচছে, দুলছে, ওঠানামা করছে বারবার। যে-কোনো সময় নৌকাটাকে ধাক্কা মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারে। হিমশৈলটাকে দেখে অভিযাত্রীরা যত না ভীত হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি আতঙ্কিত হয়েছে তার মাথায় অবস্থানরত একদল ভালুককে দেখে। তাদের তর্জন গর্জন ঝড়ের গর্জনকেও ছাপিয়ে গেছে। হিমশৈলটা আচমকা নৌকাটাকে ধাক্কা না মেরে ডুবে গেলেও সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ক্রোধোন্মত্ত ক্ষুধার্ত ভালুকেরা দল সাতরে নৌকা উঠে আসবে। তার পরের দৃশ্য ভাবলেই অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে উঠতে লাগল।

এক-এক সময় হিমশৈলটা নাচতে নাচতে নৌকার এত কাছে চলে আসতে লাগল যে গর্জনরত ভালুকগুলো বুকি লাফ দিয়ে নৌকায় পড়বে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের প্রিয় কুকুর ডাক ছাড়া গ্রিনল্যান্ডের কুকুরগুলো পর্যন্ত বয়ে জড়োসড়ো হয়ে এককোণে পড়ে রইল। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে চলল এমন ভয়ংকর ব্যাপার, বুক কাঁপাকাঁপি ব্যাপার।

একসময় আতঙ্কের আধার হিমশৈলটা অল্প অল্প করে অভিযাত্রীদের নৌকাটার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। অভিযাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

প্রকৃতির এমন বিরুদ্ধতা, একের পর এক এমন প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে কাহাতক স্রাব্য শক্তি রেখে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করে যায়? মুহূর্তের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় উঠল। সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে পড়ে নৌকাটা লাফের মতো চক্কর খেতে লাগল। নৌকাটা এত জোরে পাকা খাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে অতল গহ্বর থেকে প্রবলতম একটা শক্তি যেন অভিযাত্রীসহ নৌকাটাকে ক্রমেই ডুবিয়ে দিচ্ছে। নৌকাটা বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে আচমকা কেন্দ্র থেকে কামানের গোলায় মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল। ডা. কুবোনি, আল্টামন্ট, বেল আর জনসন দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়ে দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাশে নেই। রাত্রি তখন দুটোর কাছাকাছি। অন্ধকারে ক্যাপ্টেনের হদিস করা সম্ভব নয়।

বিধাতার এ কী নির্মম পরিহাস! বছরের পর বছর নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম, কষ্ট, আতঙ্ক আর হতাশার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে শেষপর্যন্ত এত কাছে, ধরতে গেলে হাতের নাগালের মধ্যে এসে বেচারী ক্যাপ্টেন জলে তলিয়ে গেলেন। সহযাত্রীরা

তার নাম ধরে পলা ছেড়ে ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু টেউ আর বড়ের গর্জনে তাঁদের কঠোর চাপা পড়ে গেল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। প্রভুভক্ত কুকুর ডাকও কম চিরাচিহ্নি করল না।

অন্যোপায় হয়ে ডা. ক্লুবোনি বন্দুক ছুড়ে আওয়াজ করলেন। না, কোনো প্রত্যন্তরই পেলেন না। সবার মনেই বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল।

দলপতি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কোনো হিন্দসই পাওয়া গেল না।

১১ জুলাই। সেদিন সকাল পাঁচটা। প্রায় তিন মাইল দূরে নতুন দেশ চোখের সামনে ভেসে উঠল। না, এটাকে দেশ ভেবে ভুলই করেছেন অভিযাত্রীরা। বড়সড় একটা দ্বীপ। দ্বীপ যদি নাও হয় তবে আগ্নেয়গিরিও হতে পারে। সমুদ্র থেকে ঠেলে উঠে এসেছে আগ্নেয়গিরিটা। উত্তাল-উদ্দাম জলরাশির ওপর সদস্তে মাথা উচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অতিকায় দৈত্যের মতো অনবরত আগুনের হুঙ্কার আর উত্তপ্ত বায়ু সবেগে ওপরে ছুড়ে দিচ্ছে। উত্তপ্ত গলিত লাভা পাহাড়টার গা বেয়ে নেমে আসছে। অনেকগুলো লাভাস্রোত একসঙ্গে মিলিত হয়ে সবেগে সমুদ্রে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। উত্তপ্ত লাভাস্রোতের ছোঁয়া পেয়ে সমুদ্রের জল অনবরত টগবগ করে ফুটছে। আকাশের গায়েও লাল আর কালোর সংমিশ্রণে অত্যাশ্চর্য এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে আগ্নেয়গিরির প্রাণোচ্ছ্বাস। দ্বীপটার আয়তন খুব বেশি হলেও দশ বর্গমাইল। হয়তো বা উত্তর মেরুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এই আগ্নেয় পাহাড়টা ভূগোলকের অক্ষরেখা ছেদ করে ওপরে উঠে গেছে।

নৌকাটাকে পাহাড়ের দিকে আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া হল। ব্যস, আর দেরি নয়। কুকুর ডাক ঝপাং করে লাফিয়ে ডাঙায় নেমেই বিকট চিৎকার করে ভেতরের দিকে ছুটে চলল। অভিযাত্রীদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত উত্তর মেরুতে সবার আগে পদচিহ্ন আঁকল ডাক।

এবার অভিযাত্রীরা এক এক করে লাফিয়ে ভীরে নেমে ডাকের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। দূর থেকে ডাকের কঠোর শোনা যেতে লাগল। তবে সে এখন আর কর্কশ স্বরে ডাকাডাকি করছে না। কেমন একটা অক্ষুট প্রায় কুৎকুৎ শব্দ শোনা যেতে লাগল। অভিযাত্রীরা তার কঠোর অনুসরণ করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে লাগলেন। কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে তারা আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একেবারেই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যটার মুখোমুখি হয়ে তারা রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। বাকশক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছেন। অভিযাত্রীরা এমন কি দেখলেন যার ফলে অভিযাত্রীরা এমন বিস্মিত? দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের সংজ্ঞাহীন শরীর পাথরের ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে। আর তার শিরের বসে অস্থির চিত্ত ডাক অনবরত কুঁই কুঁই করছে।

ডা. ক্লুবোনি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের দেহটা স্পর্শ করেই সোজাসে চিৎকার করে উঠলেন—আছে! শরীরে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস এখনও জীবিত।

ডা. ক্লুবোনির সেবাযত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস ধীরে ধীরে চোখ দুটো মেললেন। ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছি বটে। তবে শুধু যে বেঁচে আছি তাই নয়, আমিই উত্তর মেরুতে পদচিহ্ন আঁকেছি ডা. ক্লুবোনি।

সত্যই, একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বটে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস কি করে অক্ষত দেহে দ্বীপে হাজির হলেন? ব্যাপারটা একরম—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস নৌকা থেকে আছাড় খেয়ে জলে পড়ামাত্র ঘূর্ণিজলের টানে ঝট করে তলিয়ে গেলেন। পরমুহুর্তেই জলের চাপে আবার ভুস্ করে উঠলেন ভেসে। এভাবে পালা করে ডোবা-ভাসার মাধ্যমে চলতে চলতে আচমকা একটা পাথরের খাঁজ তাঁর হাতে ঠেকল। সজোরে আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে। সামান্য বিশ্রাম নেবার পর ধীরে ধীরে নিরাপদ আশ্রয়ে উঠে এলেন তিনি। অনাবিল আনন্দ-উচ্ছ্বাস সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা হারিয়ে এলিয়ে পড়লেন।

ডা. ক্লুবোনি ব্যস্ত হাতে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি বের করে মাপজোক শুরু করলেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, প্রায় পৌনে এক মাইল দূরবর্তী আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখের ভেতর দিয়েই গেছে অক্ষরেখা, নব্বই ডিগ্রি। বিবরণটাকে ডা. ক্লুবোনি সঙ্গে সঙ্গে লিখে পাহাড়টায় গিয়ে আটকে দিলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বিবরণপত্রে স্বাক্ষর করে উত্তরকালের অভিযাত্রীদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ সেটাকে রেখে দিলেন। আশ্চর্য! অত্যাশ্চর্য—অবিশ্বাস্যও বটে।

অভিযাত্রীরা অভাবনীয় দৃংখ কষ্ট স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত ভাষা হারিয়ে যেন একেবারে বোবা হয়ে গেছেন। কিন্তু ডা. ক্লুবোনি পক্ষে দীর্ঘ সময় মুখ বুজে থাকা সম্ভব হল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি সাধ্যমত জ্ঞানদানে ব্রতী হলেন। তিনি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'জনসন একটা মজার ব্যাপার কী জান? তুমি কিন্তু এখন আর ঘুরছ না, নড়ছও না। পৃথিবীটা তো অনবরত লাফুর মতো চক্কর খাচ্ছে। তার সঙ্গে পৃথিবীবাসী ও অন্যান্য সবকিছুও ঘুরছে, ঠিক কি না? তবে এখানকার সবকিছু ছাড়া। এর কারণ কি জানো? কারণ একটাই, পৃথিবীটা এখানে মোটেই চক্কর খাচ্ছে না।'

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আগ বাড়িয়ে বলে উঠলেন, 'আমরা না ঘুরলেও সামান্য নড়ছি বটে। একেবারে উত্তরমেরু বলাতে যে জায়গাতে বুঝায় তা এখান থেকে পৌনে এক মাইল দূরে।'

ডা. ক্লুবোনি বললেন, 'হ্যাঁ, কথা প্রায় একই। কেউ কেউ বলতেন, দক্ষিণ মেরু আর উত্তর মেরুতে দুটো দণ্ড রেখে পৃথিবীটাকে ঘোরানো সম্ভব, হচ্ছেও নাই। আবার প্রেটো যে আটলান্টিকাবাসীদের কথা বলেছেন, তারা নকি এখানকারই বাসিন্দা। আবার কেউ এমন কথাও বলেছেন, মেরুবিন্দুতে বিশালায়তন হ্রদ রয়েছে, যা দিয়েই মেরুজ্যোতি আবর্তিত হয়। আবার কারো কারো মতে মেরুবিন্দুর হ্রদপথ ধরে নাকি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়ে যাওয়া যায়। আর পথে পড়বে প্রোসারপিন ও প্রটো নামে দুটো গ্রহ।' মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরুবিন্দুই ভেতরের দিকে সামান্য চাপা, পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে পাঁচ লিগ এগিয়ে রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, নিরক্ষ রেখার বরাবর কেন্দ্রের দিকে এগোতে থাকলে পাঁচ লিগ বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু যদি এখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যায় তবে পাঁচ লিগ কম হাঁটতে হবে।'

সকাল হল। অভিযাত্রীরা দেখলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস অনুপস্থিত। তাঁরা ব্যাপারটা নিয়ে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়লেন। বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তিনি আগ্নেয়গিরিটার জ্বালামুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছেন তিনি।

ডা. ক্লুবোনির ডাকে এক সময় সখিৎ ফিরে পেয়ে ভাবাপ্রসূত কণ্ঠে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আজকের এ অভাবনীয় জয়ের গৌরব আপনাদেরও প্রাপ্য, স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধু কি আপনারাই। না, যারা আমাদের ছেড়ে গেছে তারাও। তারা যদি ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে পারে তেব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের পাওনা টাকা অবশ্যই দিয়ে দেওয়া হবে।' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমরা মেরুদ্বীপে হাজির হয়েছি, অবস্থান করছি খুবই সত্য বটে। কিন্তু এখনও আমাদের পক্ষে মেরুবিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ইংল্যান্ড ছেড়ে বেরোবার মুহূর্তে সঙ্কল্প ছিল একজন ইংরেজ পৃথিবীর মেরু বিন্দুতে প্রথম পদচিহ্ন আঁকবে। আজ অবধি তা কিন্তু সম্ভব হয় নি। এখান থেকে দূরে রয়েছে আমার সে ব্যক্তি স্থান। সেটা যে দেখতে কেমন তা এখনও আমার কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। তাই আমাকে সেখানে পদচিহ্ন আঁকতেই হবে। বাধা যতই কঠিন কঠোর হোক, আমি যাবই—যেতে আমাকে হবেই।'

ডা. ক্লুবোনি তাকে বহুভাবে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, 'কিন্তু সে যে একেবারেই অলীক কল্পনামাত্র। ভালো কথা, বলুন তো, আপনি পদচিহ্ন কোথায় আঁকবেন আগ্নেয়গিরির শীর্ষদেশে? সে পাহাড়ে ওঠাও সম্ভব নয়। লাভাস্রোত বইছে তার গা-বেয়ে। আর জ্বালামুখ দিয়ে লেলিহান আগুনের শিখা প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে, চোখের সামনেই তো দেখতে পাচ্ছেন।'

ডা. ক্লুবোনি বুঝলেন, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের মধ্যে উত্তেজনা চরমরূপ নিয়ে চেপে বসেছে। তাকে এখন শান্ত করার চেষ্টা পাগলের খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে অভিযাত্রীরা তাঁর কথায় সম্মত হল।

অভিযাত্রীরা পাহাড়ে উঠতে লাগলেন। সবার সামনে কুকুর ডাক এগিয়ে চলেছে। আর অন্য সবাই ধীর-পায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলেন। ডাকের প্রায় পা-খঁষেই হাটছেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস। ভূতত্ত্ববিদরা পাহাড়টাকে এক নজরে দেখেই বলে দিতেন, এটা একটা নবীন পাহাড়। এর গায়ে গাছগাছালি তো দূরের ব্যাপার, সামান্য ঘাস বা শ্যাওলার অস্তিত্বও নেই। কীটপতঙ্গের কথা তো ভাবাই যায় না। জল ও মাছ আর কীটহীন। জলের হাইড্রোজেন সঙ্গে আগ্নেয় পর্বত নিঃসৃত কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিলন অথবা মেঘের অ্যামোনিয়ার মিলনের মাধ্যমে, সূর্যরশ্মির সহযোগিতায় জৈব পদার্থের সৃষ্টি অবশ্যই হতে পারত। হয়ত সে সময় পায় নি। পৃথিবীর ওপর যত পর্বতের অবস্থিতি দেখা যায় তাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত লাভা ও গ্যাস কোনো ফাটল দিয়ে নির্গত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে সেগুলো সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। মাউন্ট এটনা থেকে দীর্ঘদিন ধরে যে পরিমাণ লাভা নির্গত হয়েছিল তার আয়তন মাউন্ট এটনা থেকেও বেশি। কেবলমাত্র লাভার ছাই জমে জমে নেপলসের নিকটবর্তী মনুয়োভার সৃষ্টি হয়। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস আগেই মেরু দ্বীপের 'রানার দ্বীপ' নামকরণ করেছেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ একটা ফুটন্ত সমুদ্র বিশেষ। গলিত লাভা ও উত্তপ্ত বাষ্প নিরবচ্ছিন্নভাবে ভূত্বকের ওপর ভেতর থেকে ওপরের দিকে চাপ দিচ্ছে। ভূত্বকের দুর্বল স্থান সে চাপ সহ্য করতে না পারার ফলে এক সময় বিদীর্ণ হয়ে ফুটন্ত গলিত লাভা ও উত্তপ্ত বাষ্প ওপরে উঠিত হয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেত। লাভা ও বাষ্প নির্গমনের মুখগুলিই আগ্নেয় পর্বত নামে পরিচিত। লাভা ও বাষ্পের ঘাটতি পড়লে মুখ বন্ধ হয়ে যায়, আগ্নেয় পাহাড় যায় নিবে। আবার অন্য এক জায়গায় গড়ে ওঠে আগ্নেয় পাহাড়। মেরু অঞ্চলে বাষ্পের চাপে আগ্নেয় পাহাড় সৃষ্টি স্বাভাবিক হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানকার ভূত্বক সবই পাতলা।

রানার দ্বীপের জন্যও অতি সাম্প্রতিক কালেই ঘটেছে। সেজন্যই এখানে মাটির স্তর অনুপস্থিত। এমনকি জলের অস্তিত্বও নেই। এর বয়স কয়েকশো বছর হলে অবশ্যই গরম জলের ফোয়ারা দেখা যেত। আগ্নেয় পাহাড়ের নিকটবর্তী অঞ্চলে এমন ফোয়ারা ভূত্বক ভেদ করে উঠে আসে। এখানে তার নামগন্ধও নেই। শুধু কি এই? তরল লাভাস্রোতের ওপরে ভাসমান বাষ্পের মধ্যে জলের চিহ্নমাত্রও নেই। ডা. ক্লুবোনি পাহাড় বেয়ে উঠতে উঠতে এমন বহু ব্যাপার স্যাপার সম্বন্ধে আপন মনে ভেবে চললেন।

পর্বতারোহণ ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগল। সে সঙ্গে একেবেরঁকে নেমে আসা লাভা স্রোত তো রয়েছেই। পথের বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করেই ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে ক্রমে ওপরে উঠতে লাগলেন।

কাছে—খুবই কাছে মেরুবিন্দু—মাত্র আর ৬০০ ফুট দূরে। আসলে সেখানে যেতে হলে ১৫ ফুট চড়াই অতিক্রম করতে হবে।

ডা. ক্লুবোনি নিঃসন্দেহ যে, আগুনে ঘেরা, লাভায় ঢাকা মেরু বিন্দুতে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ফিরে যেতেই হবে। তিন ঘণ্টা ধরে পথ অতিক্রম করার সময় তিনি ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে একথা যতবারই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন ততবারই ক্যাপ্টেন পাগলের মতো অস্থিরতা প্রকাশ করে তাঁকে দমিয়ে দিয়েছেন।

ডা. ক্লুবোনির সঙ্গে কথা আর বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সজোরে একলাফ দিয়ে লাভা স্রোতটা পাড় হলেন। ব্যস্তপায়ে সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের চোখের আড়ালে চলে গেলেন। প্রিয় কুকুর ডাক তাকে অনুসরণ করতে লাগল। অন্য অভিযাত্রীদের পক্ষে তাঁর পিছন নেয়া সম্ভব হল না। একে আগুনের উত্তাপ তার ওপর লাভাস্রোত তো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেই।

ডা. ক্লুবোনি প্রায় আত্নন্যাদ করে উঠলেন, 'ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস!' কোনো উত্তরই পেলেন না। বিধ্বংসী ধোঁয়া আর তুষারের মতো অনবরত ঝরেপড়া ছাইয়ের আড়ালে হারিয়ে গেলেন তিনি।

সম্পূর্ণ পাহাড়টা বিশালায়তন চূড়ির মতো তিরতির করে কাঁপছে আর চাপা গর্জন করে অনবরত ফুঁসে চলেছে।

যে লাঠিটায় ভর দিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাহাড়ে উঠে চলেছেন তার মাথায় ইংল্যান্ডের পতাকা বাঁধা।

অমানুষিক কষ্ট আর পরিশ্রমের মাধ্যমে এক সময় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পৌঁছে গেলেন পাহাড়টার শীর্ষদেশে—আগ্নেয় পাহাড়টার জ্বালামুখে। তার প্রায় গায়েঁষে অগণিত জ্বলন্ত শিলা পড়ছে। অকুতোভয় উন্মাদপ্রায় ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস তবু ঝুলন্ত একটা পাথর বেয়ে এগিয়ে চলেছেন। গাণিতিক মেরুবিন্দু সম্বন্ধে তার মনে এখনও সন্দেহ দ্বিধা, ঠিক যে স্থানটায় দ্রাঘিমার মিলনস্থল, বহু আকর্ষিত বিন্দুটা যেন এখনও তাঁর ধরা-ছোয়ার বাইরে রয়ে গেছে। তাইতো টলতে টলতে অত্যাশ্চর্য অগ্রহ নিয়ে তিনি সে-বিন্দুটার ওপর পদচিহ্ন আঁকতে এগোচ্ছেন। তাঁর শরীর টলছে। পা দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করতে চাইছে। প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁর চোখ-মুখ—সর্বত্র ঝলসে গেছে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে পা হড়কে পড়ে যাচ্ছেন। সর্বানিশা কাণ্ডটা প্রত্যক্ষ করামাত্র ডা. ক্লুবানির চোখ দুটো আতঙ্কে বন্ধ হয়ে এল। কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন—‘ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ক্যাপ্টেন—ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস! ব্যস, সব শেষ। চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল।’

আতঙ্কিত চোখ দুটোকে মেলে ওপরের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই ডা. ক্লুবানির চোখের সামনে ভেসে উঠল, একেবারেই অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য এক দৃশ্য। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসের কোটের এক প্রান্ত আলটামন্ট মুঠো করে ধরে আছে আর অন্য প্রান্তটা তাঁর প্রিয় কুকুর ডাক দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রেখেছে।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস সংজ্ঞা হারিয়ে উত্তপ্ত পাথরের ওপর এলিয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে দেখা গেল তাঁর চোখের মণি আর চোখের পাতা পাতা নিশ্চল। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন। পাগল!—হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস পাগলই হয়ে গেছেন।

তিন ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম করে অভিযাত্রীরা পাগল ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাসকে নিয়ে পর্বতগুহায় ফিরে এলেন।

ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস যেখানে সমুদ্র থেকে পাহাড়ের গায়ে নেমেছিলেন ঠিক সেখানেই তৈরি করা হল একটা টিবি। তার গায়ে খোদাই করে দেওয়া হল—“জন হ্যাটেরাস”। আঠারো শ’ একষট্টি”। টিবিটার ভেতরে একটা টিনের বাস্স রেখে দেওয়া হল যার ভেতরে রক্ষিত মেরু বিজয়ের পূর্ণ বর্ণনা।

১৩ জুলাই। অভিযাত্রীরা পাগল হ্যাটেরাসকে নিয়ে নৌকায় চড়ে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। আলটামন্ট বন্দরে হাজির হলেন। মাত্র সাত দিনের মধ্যে পনেরো দিনের পথ অতিক্রম করে তারা ভিক্টোরিয়া উপসাগরে পড়লেন। দৈবদুর্গে পৌঁছেই তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। ডক্টর হাউস, গুদামঘর, যাদুঘর, সব বরফ গলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হিংস্র জন্তুর জানোয়ার আর পাখিরা সব ভাগ বাটোয়ারা করে আত্মসাৎ করেছে। এখন বাঁচার ফিকির কি করা যাবে?

২৪ জুলাই অভিযাত্রীরা আবার নৌকা ছাড়লেন। তাপমাত্রা কমতে লাগল। জল জমে বরফে পরিণত হল। নৌকা গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হল। কোনোরকমে রক্ষা করলেন নৌকাটিকে।

পনেরোই আগস্ট। শ্লেপ গাড়িতে চেপে সবাই এগিয়ে চললেন। পথের ধারে বীভৎস দৃশ্য দেখে সবাই চমকে উঠলেন। দেখলেন, রিচার্ড শ্যানডন, পেন আর অকৃতজ্ঞ সঙ্গীদের মৃতদেহ বরফের ওপর পড়ে রয়েছে।

৯ সেপ্টেম্বর। অভিযাত্রীরা ডেভন দ্বীপের কিনারায় হাজির হলেন। আর কিছুটা পথ পাড়ি দিলেই বাফিন উপসাগর। পরের দিন আলটামন্ট দূরসমুদ্রে একটা জাহাজকে দেখতে পেলেন। অভিযাত্রীরা ব্যস্তপায়ে বরফের ওপর দিয়ে ছুটোছুটি করে সমুদ্রের পাড়ে হাজির হলেন। ডা. ক্লুবানি হাত তুলে ডাকাডাকি করলেন। কিন্তু হয় জাহাজটা ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে একটা হিমশৈলে চেপে গেলেন সবাই। শ্লেপ গাড়ির লোহার পাত খুলে হিমশৈলের মাথায় মাস্তুলের মতো গেঁথে দিলেন। তাঁবুর টুকরো দিয়ে বানিয়ে নিলেন পাল। পালে হাওয়া লাগায় হিমশৈলটা এগিয়ে চলল নৌকের মতো। এক সময় সেটা গিয়ে পড়ল সমুদ্রে।

একনাগাড়ে দুঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের মাধ্যমে অভিযাত্রীরা এক ড্যানিশ জাহাজে উঠতে পারলেন।

অভিযাত্রীরা লন্ডনে ফিরতে পারলেন তেরো দিন পর। ডা. ক্লুবানি সবাই আগে রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে গেলেন। সেখানে দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাসের সুমেরুতে পদক্ষেপের বর্ণনা দিলেন।

ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাস কেবলমাত্র পাগলই হন নি, বাকশক্তিও হারিয়ে ফেলেছেন। ডা. ক্লুবানি তাঁকে লিভারপুলের এক মানসিক চিকিৎসালয়ে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর প্রিয়সঙ্গী ডাক সর্বক্ষণ তাঁর কাছে কাছেই থাকে। ক্যাপ্টেন রোজ গলির মোড়ে গিয়ে আবার একটু বাদেই ফিরে আসেন। আর আকাশের দিকে আঙুল তুলে কি যেন দেখান। ডা. ক্লুবানি একদিন এর রহস্যভেদ করতে সক্ষম হলেন, চুষকের আকর্ষণে লোহা যেমন ছুটে যায় ঠিক তেমনি ক্যাপ্টেন জন হ্যাটেরাস যেন আজও উত্তর দিকেই চলেছেন।

ক্লিপার অব দ্য ক্লাউডস

মাঠে একটা গরু পরম ভূষিতে ঘাস খাচ্ছে। আচমকা পিস্তল গর্জে উঠল—দ্রুত! দ্রুত! মাত্র গজ পঞ্চাশেক দূর থেকে পিস্তলের সিসার গুলি ছুটে এসে অসহায় নিরাপরাধ গরুটার গায়ে আঘাত করল। একটা নয়, দু-দুটো গুলির আঘাত তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হ'ল না। বিকট আর্তনাদ করে অসহায় জীবটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। তার রক্তমাখা দেহটা বার-কয়েক মাটিতে আছাড়ি-পিছাড়ি করে এক সময় নিখরভাবে শাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ব্যস। সব শেষ।

কিন্তু কে গুলি ছুঁড়ল? কেন? কেনই বা অসহায় নিরাপরাধ গরুটাকে অকালে প্রাণ হারাতে হল? কে? কারা এরা?

হ্যাঁ, একজন তো নয়। দুজন। ওই তো ক্রোধোন্মত্ত দুজন যুবককে দেখা যাচ্ছে। কারা এরা? কি-ই বা এদের পরিচয়? হ্যাঁ, পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আপাতত চেহারা দেখে যেটুকু অনুমান করা যাচ্ছে এদের একজন ইংরেজ যুবক আর দ্বিতীয়জন আমেরিকান।

নায়েথ্রা জলপ্রপাতের বাঁ-পাড়ে দুই ভিনদেশী যুবকের মধ্যে এ গুলি বিনিময়-গুলিযুদ্ধ। যে সেতুটা আমেরিকা আর কানাডার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে তারই কাছাকাছি এ-দ্বন্দ্ব-গুলিযুদ্ধ। জায়গাটা নায়েথ্রা জলপ্রপাত থেকে খুব বেশি হলেও মাইল তিনে দূরে। ক্রোধোন্মত্ত ইংরেজ যুবকটা আমেরিকান ভদ্রলোকের দিয়ে এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়াল। কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করল, 'পরোয়া নেই—গুলি ফসকেছে বলে পরোয়া করি না। আর একটু অন্তত জেনে রাখুন মশাই—এটা যে-সে পিস্তল নয়। আসলি মাল! 'রুল ব্রিটানিয়া'।'

'আরে রাখুন সাহেব। এটাও কোনো অংশে কমতি নয়। 'ইয়াক্সি ডুডল'। পিস্তলের রাজা।'

বাকযুদ্ধ চলতে চলতে আবার গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি শুরু হয় আর কি।

মুহূর্তের মধ্যে যুদ্ধোন্মাদদের সহযোগীদের মধ্যে একজন পরিণাম সম্বন্ধে আঁচ করতে পেরে আতঙ্কে উঠে বলল, 'কেন বুটমুট দ্বন্দ্বের মধ্যে যাচ্ছেন। তার চেয়ে বরং মেনে নিন, 'রুল ব্রিটানিয়া' আর 'ইয়াক্সি ডুডল' দুই সমান। কেউ কারো চেয়ে কমতি নয়।'

হ্যাঁ, প্রস্তাবটা তো চমৎকারই বটে। চমৎকার শান্তিপ্ৰস্তাব। এতে তো আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন উভয়েরই সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকছে। আর অবসান ঘটছে রক্তক্ষয়! গুলিযুদ্ধের।

যোদ্ধারা যুদ্ধ থেকে বিরত হয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল।

সবই তো হল। যুদ্ধ মিটল। দু-দুটো তাজা প্রাণনিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেল।

যুদ্ধের কারণটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তা নাই হ'বে তবে দু-দল এমন ভয়ঙ্কর মুখোমুখি সংগ্রামে লিপ্ত হ'বে কেন? তাই নির্দিধায় বলা যায় তাদের মারণাস্ত্র নিয়ে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার আড়ালে একটা গভীর রহস্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কি রহস্যজনক যার ফলে আকাশটা এমন তোলপাড় হচ্ছে? আর এরই ফলে বারুদের উগ্র গন্ধে আকাশ-বাতাস বিষময় হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রথম আবির্ভাব তো আর আজ হয় নি। সেই আদি্যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ তো কোনোদিনই এমন করে আকাশের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে নি। কেন? এর পিছনে এমন কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে?

রহস্যজনক ব্যাপারটা বেশিদিন আগে ঘটে নি। গত রাত্রে-গতরাত্রেই, চব্বিশ ঘণ্টা পেরোয় নি এখনো। রাতের অন্ধকার আকাশ থেকে ট্র্যাপেস্ট সংগীতলহরি ভেসে আসতে শোনা গেছে। অত্যাশ্চর্য সংগীত।

রাত্রির অন্ধকারে খোলা-আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মানুষ উৎকর্ষ হয়ে লক্ষ্য করেছে, সেটা কি আদৌ ট্র্যাপেস্ট সংগীতলহরি, না কি অন্য কোনো রহস্যজনক শব্দ তাদের বিভ্রান্ত করেছে? শোনার ভুল না, শোনার ভুল অবশ্যই নয়। হাজার হাজার মানুষ তো আর ভুল শুনতে পারে না। তারা স্পষ্ট শুনেছে, লেক ওস্টারিয়ো ও লেক হরির মধ্যবর্তী অঞ্চলের আকাশ থেকে ভেসে এসেছে অত্যাশ্চর্য সে সংগীতলহরি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দুই যোদ্ধার মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল কি নিয়ে? দ্বন্দ্বের কারণ, সংগীতটা কোন দেশের?

তখনকার মতো কোনোরকমে ধামা চাপা দিয়ে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করা গেছে, সত্য বটে। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্থলে দ্বন্দ্বের রেশ কিন্তু থেকেই গেল।

আসল রহস্যটা কি? কিসের শব্দ অন্ধকার আকাশ থেকে বাতাস বাহিত হয়ে হাজার হাজার মানুষের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে! তবে কি অন্ধকারে উদ্ভ্রাণে কোনো নভোচারি পানের মজলিশ বসিয়েছেন?

না, তেমন কিছু তো মনে হয় নি। অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে চারদিকে তাকিয়ে কোনো বেলুনচারিকেই তো দেখা যায় নি। তবে?

সত্যি ব্যাপারটা খুবই বিচিত্র, একবারেই অবিদ্বাস্য।

ওই-আবার ওই শোনা যাচ্ছে অত্যাশ্চর্য সে সংগীতলহরি। ওই-ওই যে শোনা যাচ্ছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা পর রহস্য সম্ভারকারী অত্যাশ্চর্য সংগীতলহরি আবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে! সে মিষ্টি মধুর-সুর ইউরোপের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে চলেছে। ওই যে—ওই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। এ সপ্তাহ পরে আবার রহস্যজনক সংগীতলহরিটা শুনতে পেল এশিয়াবাসীরা। বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য সংগীতই বটে।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়াবাসীরাই কেবল নয়, ক্রমে সমগ্র পৃথিবীর আকাশ জুড়ে রহস্য সঞ্চার করে বেড়াল অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য সে সংগীত। অতি প্রাকৃতিক গানের সুর। সমগ্র বিশ্বে অভাবনীয়, একেবারেই অবিশ্বাস্য আলোড়ন সৃষ্টি করল অতি প্রাকৃতিক সে আকাশ-সংগীত।

পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ আজ কৌতূহলের শিকার হয়ে পড়েছে। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড দিনের পর দিন মাথার ওপর ঘটতে থাকলে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কৌতূহলের উদ্বেগ তো ঘটতে বাধ্য।

ব্যাপারটা আরো অত্যাশ্চর্য যে, বাতাস কম থাকলে অতি প্রাকৃতিক সে সংগীতলহরি আর শোনা যায় না। বাতাস-তরঙ্গের দ্বারা শব্দপ্রবাহ স্থানান্তরিত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় দু-মাইল অঞ্চল জুড়ে বায়ুস্তরের বিস্তৃতি। অতএব সংগীতলহরি বাতাস বাহিত হয়ে আমাদের কানে আছে অবশ্যই উক্ত দু-মাইলের মধ্যস্থ কোনো না কোনো উৎস থেকে। মহাশূন্য থেকে অবশ্যই তা আসা সম্ভব নয়। এই যদি সত্য হয় তবে রহস্যজনক উৎসটা কেনই বা কারো নজরে আসছে না?

খবরের কাগজওয়ালাদের এটা রীতিমতো মওকা। এমন আকর্ষণীয় চটকদারী একটা খবর পেয়ে মহাউল্লাসে তারা খবরের কাগজের পাতা ভরতে মেতে গেল শুধু কি এই। আসলের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য মিশিয়ে কেউ কেউ বাজার মাং করতেও ছাড়ল না।

খবরের কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে ছাপা হল, মানমন্দিরগুলো করছে কি? পৃথিবী জুড়ে এমন তোলপাড় হচ্ছে আর তারা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে নাকি? তাদের প্রথম ও প্রধান কাজই তো হচ্ছে দেশবাসীর কাছে আকাশ-রহস্যের খবর পৌঁছে দেওয়া। এতে যদি তারা ব্যর্থ হয় তবে আর তাদের দরকারই বা কি?

মানমন্দিরের কথাই বা শুধু বলি কেন? প্রখ্যাত সব জ্যোতির্বিদ? তারা ই বা কোন চুলোয় গেছে। একেবারে যাচ্ছে তাই ব্যাপার! গ্যুৎ, জাহান্নামে যাক সব।

জিওডেটিক? জিওডেটিক সংক্রান্ত বিষয়ে যারা লিপ্ত, তাঁরা? তাঁদের অবশ্য আকাশে কিছু চোখে পড়ে নি। আবহাওয়া দপ্তরও একই বক্তব্য প্রকাশ করল।

তবে হ্যাঁ, নিজেদের মুখ রক্ষা করতে প্যারিস মানমন্দির শেষমেশ মতামত ব্যক্ত করল—তাদের গণিত বিভাগ অগ্রয়োজনীয় বোধে আকাশের রহস্যের ব্যাপার-স্বাপার মাখামাখিতে উৎসাহী হয় নি।

এবার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব খবর এসে পৌঁছেছে সে সবার মূল বক্তব্য মেটামুটি একই। মে মাসের পাঁচ তারিখের গভীর রাত্রে একটা হাক্সা আলোকরশ্মিকে ফ্লাশ লাইটের মতো জ্বলে উঠতে দেখা গিয়েছিল। রহস্যজনক অত্যাশ্চর্য আলোকরশ্মিটার অস্তিত্ব মাত্র বিশ সেকেন্ড ছিল।

নয়ই বা দশই মে কি পিক ডুর লক্ষ লক্ষ মানুষ বিচিরা সে অত্যাশ্চর্য আলোকরশ্মিটা চাক্ষুস করেছিল? আশ্চর্য! সত্যই ব্যাপারটা আশ্চর্যজনকই বটে। এতগুলো মানুষের দেখা ব্যাপারটাকে তো আর কাল্পনিক বা খোসগল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

আর একটা ব্যাপার, সবাই নির্দিধায় ব্যক্ত করল, অন্তত ঘটায় একশ' মাইল বেগে রহস্য সঞ্চারকারী অত্যাশ্চর্য আলোটা ছুটে গিয়েছিল।

আলোরশ্মির ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে গ্রেট ব্রুটনে রীতিমতো বিতর্কের ঝড় বয়ে যেতে লাগল। গ্রিনউইচ পত্রিকা যে মন্তব্য করল তার ঠিক বিপরীত মন্তব্য করে বলল অস্ট্রফোর্ড। তবে শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা হল সবই ভুলো ভেঁ ভেঁ। মানুষের চোখের ভ্রম ছাড়া এটা কিছুই নয়।

না, এত সহজে কিন্তু ঝড় থামল না। বার্লিন আর ভিয়েনা মানমন্দির এমনই তৎপর হয়ে উঠল যে, তাদের উৎসাহে ঘটনাটা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে হাজির করা হল। পৃথিবীবাসী ব্যাপারটা নিয়ে যারপরনাই বিভ্রান্ত, আতঙ্কিত, সন্ত্রস্ত।

শেষপর্যন্ত রাশিয়া আর দূরে সরে থাকতে পারল না, ব্যাপারটায় নাক গলাতে হলই। তারা মধ্যস্থতা করার জন্য তৎপর হল। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী উভয় পক্ষের পিঠ চাপড়ে মন্তব্য করল, 'উভয় পক্ষের উক্তিই ঠিক। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কল্পনা করা না গেলেও বাস্তবে সম্ভব হতে পারে।'

এবার উৎসাহিত সুবিধা করতে না পেরে মুখ গোমড়া করে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। তারা ব্যাপারটাকে খেয়ালী প্রকৃতির রহস্য বলে চাউর করে দিলেন। আর এ পথ অবলম্বন করে তাঁরা পৃথিবীকে উৎকণ্ঠা মুক্ত করতে প্রয়াসী হলেন।

যখন এমন দোটানায় পড়ে সবাই রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠল তখন স্পিট বার্জেন আর ফিনমার্কের মানমন্দির ঘোষণা করল—হাক্শিশ, সাভাশ, আঠাশ এবং উনত্রিশে মে—এই চারদিন মেরুজ্যোতির মধ্যে আকাশের গায়ে অতিকায় একটা পাখির ছায়ামূর্তি দেখা গেছে। প্রাণীটাকে ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব না হলেও তার দেহ থেকে অগণিত আলোকবিন্দু ছিটকে এসে ভয়ঙ্কর শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল। আরে বাস! কী সাংঘাতিক খবর রে বাবা! পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করে ছাড়ল!

নরওয়ে ও সুইডেনের জ্যোতির্বিদ ও উল্কাবিদগণের এরকম অবিশ্বাস্য মন্তব্য শুনে ইউরোপের পণ্ডিতগণ মোটেই অবাক হন নি। কোনো প্রসঙ্গেই যে দুটো দেশ কোনোদিনই একামত পোষণ করতে পারে নি আজ তারা একই মত ব্যক্ত করছে, এটাই সবচেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াল।

অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলো মানমন্দির তাদের মন্তব্যটা শুনে ঠোঁট টিপে হেসে পরিহাস-করল। আকাশে সংগীতলহরির ব্যাপারটা নিয়ে তর্কবিতর্ক ইউরোপের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই বেশি হতে লাগল। কেন এমন তর্কবিতর্কের উদ্ভব? সংগীতলহরি বা বাদ্যকরদের নিয়ে? না, অবশ্যই নয়। তবে? যত তর্কবিতর্কের উদ্ভব সবই সমস্যাটা নিয়ে। উভয় দেশের মানুষ নাকি একই সময়ে রহস্য সৃষ্টিকারী আকাশচারীকে চাক্ষুস করেছে।

এ কী অদ্ভুত কথা রে বাবা! নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে কলম্বিয়া আবার ম্যাসাচুসেটস থেকে আরম্ভ করে মিচিগান

পর্বন্ত যাবতীয় অঞ্চলের মানুষ একই সময় আকাশে অত্যাঙ্ক আলোটাকে দেখেছে এবং আকাশ বাদ্যকরদের সংগীতলহরি শুনেছে। ধূৎ, যন্তসব আজগুবি গল্প!

ব্যাপারটা নিয়ে মিলিটারি একাডেমিও কম মাথা ঘামায় নি। তারা দীর্ঘ নিরলস গবেষণা চালিয়ে বলল, 'আসলে বিসমিল্ল্যই গলদ। আমাদের হিসেবটাই ভুল হয়েছে। ভুল হিসেব প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্তির মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা এবার গবেষণায় মত্ত হলেন। গবেষণার ফল প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা মন্তব্য করলেন, 'বহুটা মূলত এ্যারোলাইট অর্থাৎ সিলিকেটের সমন্বয়ে গঠিত একটা উচ্চ পাথর ছাড়া কিছুই নয়।' বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে মাঝ-পথে থেমে গিয়ে আবার বলল, 'কিন্তু আকাশবাদ্য? উচ্চ-পাথরের পক্ষে ট্রান্সমিট বাজানো কি করে সম্ভব? একে যে পাগলের প্রলাপ ছাড়া অন্য কোনো আখ্যাই দেওয়া যায় না। ধূৎ, পুরো ব্যাপারটাই গোলমালে।'

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠতে লাগল। এক সময় দেখা গেল, ইয়েন্ড কলেজের ও শেফিল্ড বিজ্ঞান স্কুলের কিছু অত্যাৎসাহী ছাত্র মিলে আকাশ-সংগীতটার স্বরলিপি পর্বন্ত তৈরি করে ফেলল। বাজার ক্রমেই গরম হতে লাগল। বয়ে চলল আলোড়নের তুমুল ঝড়। বারই এবং তেরোই মে অমরাত্রির অন্ধকারে সুরলোকের সংগীতলহরির মতো সদ্য তৈরি করা স্বরলিপির মাধ্যমে বাজাতে লাগল উৎসাহী ছাত্রের দল। শেষমেষ মিলিয়ে দেখা গেল, সেটা ডি. মেজরের কোরাস ছাড়া কিছুই নয়।

এক জাত ইয়াক্সি স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'ফ্রেশ ব্রেনের কাজ ছাড়া অন্য কিছুই এটা হতে পারে না। ফরাসিরা দলে দলে আকাশে উঠে গিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে মেতে গেছে।'

এবার বোষ্টন মানমন্দির মুখ না খুলে আর পারল না। বলল, 'ঠাট্টা তামাশার সময় এটা নয়। ব্যাপারটা খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।'

সিনসিনাটি মানমন্দিরের অধ্যক্ষ মি. কিলগোর অনেক ভেবে চিন্তে বললেন 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। আকাশের গায়ে অস্পষ্ট কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে।'

তিনি মাইক্রোমিটারের সাহায্যে নক্ষত্র পরিমাপ করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন।

বেগম রাগিমারার দুই উত্তরাধিকারীর শত্রুতার ব্যাপারটা অবশ্যই জনগণের মধ্যে থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায় নি। স্টিলটাউন ও ফ্রাঙ্কভিল নামে বিচিত্র এই শহর দুটোর মধ্যে যে শত্রুতা তার কথা বলতে চাইছি। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক সারাসিন, যিনি ফ্রাঙ্কভিল শহরের প্রতিষ্ঠাতা বলে পরিচিত আর জার্মান ইঞ্জিনিয়ার হেরসুলেৎস, স্টিল টাউনের প্রতিষ্ঠাতা তাদের সে স্বার্থগুণ্ন মনোভাব ও জঘন্য ঘটনার কথা কি এত সহজে মন থেকে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব? হবেই বা কি করে? উভয়ের শত্রুতার ফলে একসময় যে তুমুল লড়াইয়ের উপক্রম হয়ে গিয়েছিল।

জার্মান ইঞ্জিনিয়ার হের সুলেৎস ভয়ঙ্কর একটা ইঞ্জিন আবিষ্কারও করে ফেলেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, সেটা দিয়ে ফ্রাঙ্কভিল শহরকে উড়িয়ে দেবেন। সেটার প্রাথমিক গতি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক, অনেক বেশিই হয়ে পড়েছিল। আসলে হিসাবের ভুলের জন্য দানবাকৃতি কামানটা থেকে সাধারণ গোলার চেয়ে ষোলোগুণ বেশি গতিবেগ প্রাপ্ত হয়। তাই কামান থেকে চার শ' মাইল বেগে বেরিয়ে আসা গোলাটা আর ভূমিতে পড়তে পারল না। উচ্চ-পাথরের মতো অনন্ত কাল ধরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে বলে মহাশূন্যে উড়ে গেছে।

কি ব্যাপার? ওই গোলাটাই আকাশ-রহস্যের মূলে কাজ করে পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করছে না তো? নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা এভাবেই তার গালগল্প জনসাধারণকে উপহার দিল। এটা তো নিছকই একটা কল্পনার ব্যাপার। কল্পনা আর বাস্তবে যে বিস্তর ফারাক। কল্পনা কোনোদিনই বাস্তবে পরিণত হয় না। যদি হয়ও তবে বলতেই হয়—ওই কামানের গোলাটার গায়ে কি ট্রান্সমিট আটকে দেওয়া ছিল?

ডিন আর কতদিন মুখ বুজে থাকতে পারে? একজন হোমড়া চোমড়া চীনাওয়ান মোন্দা কথাটা বলে ফেললেন, 'অবাক হবার মতো ব্যাপার মোটেই নয়। হয়তো বা বহুটা একটা ব্যোময়ান-ফ্লাইং মেশিন।' মন্তব্যটা জি. কাবের ডিরেকটরের মুখ থেকে না বেরিয়ে অন্য যে কেউ বললে তাকে সবাই মাথায় তুলে নাচত।

জল অনেকই ঘোলা হয় বটে। কিন্তু আসলে পাকা কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা গেল না। কাজ যা হল—একের পর এক উল্টোপাল্টা মন্তব্য আর কথার ফুলঝুরির মাধ্যমে মনের ঝাল মিটিয়ে নেবার ব্যাপারটা চলতে লাগল।

দিন কয়েক নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটার পর এল দোসরা জুন। দোসরা থেকে নয়ই জুনের মধ্যে এমন এক অবিস্ম্যাস-অকল্পনীয় ব্যাপার ঘটল যাতে ভূচ্ছতাচ্ছল্য করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তুরস্কের সেন্ট সোফিয়া মিনারের চূড়ায়, হামবুর্গ সেন্ট মাইকেল টাওয়ারের মাথায়, ট্রান্সবার্গের আশ্রমের মাথায়, রোমের গির্জার ধাতবদণ্ডে, বোষ্টনের বান্ধার হিলমন্স্টের চূড়ায়, আমেরিকার লিবার্টি মূর্তির মাথায়, চীনমুন্স্কের ফোর হানড্রেড জেনি মন্দিরের মাথায়, তাঞ্জোরের মন্দির পিরামিডের ষোলো তলায়, লন্ডনের সেন্ট পলসের ক্রুশে, রোমের সেন্টপিটারের ক্রুশে, মিশরের পিরামিডের চূড়ায়, আঠারো শ' উননবই—এ বিশ্বমেলা উপলক্ষে তৈরি সুউচ্চলোহার টাওয়ারের মাথায়—কমসে কম এক হাজার ফুট উচ্চাকাশ দিয়ে একই রকমের পতাকাতে দ্রুতবেগে উড়ে যেতে দেখা গেল।

হ্যাঁ, একই রকমের কালো একটা পতাকা। তার কালো কাপড়ের ওপর অসংখ্য তারা আর ঠিক মাঝখানে সোনালি রং দিয়ে সূর্য আঁকা ছিল। অকল্পনীয় ব্যাপারটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। একেবারে পৃথিবীর তোলপাড় হতে লাগল উদ্ভূত ব্যাপারটাকে নিয়ে। কিন্তু বাকযন্ত্র, লাফালাফি দাপাদাপি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হল না। উদ্ভূত সমস্যাটার সমাধান না, কিছু হল না।

ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের হলঘরে সভ্যদের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ বাকযুদ্ধের তুমুল ঝড় বয়ে চলল। তাদের আলোচনার বিষয়বস্তু বেবুলনের গতিপথ।

কেবলমাত্র তর্কাতর্কির মাধ্যমেই উদ্ভূত সমস্যাটার সমাধান হল না। শেষপর্যন্ত হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। তারা শব্দের বেবুল বাজমাত্র। হ্যাঁ, তারা যদি ইঞ্জিনিয়ার হত তবু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলে মনে নেওয়া চলত।

জুল বার্ন—১০(ক)

বাতাসের চেয়ে ভারি কোনো বস্তুকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। উড়ন্ত কোনো যন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে। আকাশে আসতে সক্ষম এমন কোনো যন্ত্রকে কল্পনার সমগ্রী না ভেবে তা যে বাস্তবে পরিণত হতে পারে—এরকম কোনো বস্তুকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করা মাত্র হলঘরে উপস্থিত শ'খানেক সদস্য যেন যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে উঠে তীব্রতর প্রতীবাদ করে উঠল। প্রতিবাদে মুখের হয়ে উঠল।

ক্লাবের সভাপতি আঙ্কল ফ্রেডেন্ট খুবই বদরাগী হলেও বিপদের সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারেন। আর বুদ্ধিও রাখেন যথেষ্টই। বুদ্ধি খরচ করে, বহু কায়দা কসরতের মাধ্যমে তিনি সভ্যদের কোনোরকমে সংযত রাখলেন।

সভাপতি আঙ্কল ফ্রেডেন্ট একজন টাকার কুমীর। জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তিনি বছরে ত্রিশ কোটি টাকা মুনাফা অর্জনের পরিকল্পনা করেছেন। তাঁর নায়েগা জলপ্রপাতের বড় শেয়ার রয়েছে। অকৃতদার তিনি। অতএব পোষ্যের পিছনে খরচাপাতির প্রশ্নই ওঠে না। পৃথিবীটা কিসের বশ? টাকার। টাকা থাকলে বন্ধু-বান্ধব চারদিকে ঘুরঘুর করে। আঙ্কল ফ্রেডেন্টের ক্ষেত্রেও এর কিছুমাত্রও ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নি। তবে হ্যাঁ, কেবলমাত্র বন্ধুই নয়, তার শত্রুর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তার শত্রুদের মধ্যে পহেলা নম্বরের হচ্ছেন ধনকুবের ফিল ইভান্স। হুইলটন ঘড়ি কোম্পানির ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট আর ফিল ইভান্সের মধ্যে সবচেয়ে চারিত্রিক বিভেদ মাত্র একটা ব্যাপারে। ব্যাপারটা হচ্ছে, আঙ্কল ফ্রেডেন্ট অতিমাত্রায় বদমেজাজী আর ফিল ইভান্স একজন অভাবনীয় ঠাণ্ডা মাথার মানুষ।

মেজাজ মর্জির ব্যাপারটুকু ছেড়ে দিলে দেখা যাবে তারা উভয়েই সমান। কেউ কারো চেয়ে কোনোনাদিক থেকে কমতি নন। এই যদি সত্য হয় তবে ফিল ইভান্সের সভাপতি হওয়ার অন্তরায় কোন জায়গায়?

সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন হল। এবারও এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘট গেল। উভয়েই সমান সংখ্যক ভোট পেলেন। সর্বনাশ! এখন উপায়? অচলাবস্থার সমাধান কি করে সম্ভব? ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ জেম টিপ তৎপর হলেন। তিনি অভিনব একটা পন্থা অবলম্বন করে সঙ্কট মুক্তির ব্যবস্থা করে ফেললেন। সাদা বোর্ড নিয়ে তাদের উভয়ের কেন্দ্রস্থলে একটা করে কালো সরলরেখা টেনে দিলেন। আঙ্কল ফ্রেডেন্ট এবং ফিল ইভান্স উভয়েরই হাতে একটা করে সূঁচ দিলেন। এবার উভয়কেই বললেন নিজ নিজ বোর্ডের কালো সরলরেখাটার ওপরে প্রথমবারেই যিনি সূঁচ ফোঁটাতে সক্ষম হবেন তিনিই বিজয়ী হবে, সভাপতির পদ লাভ করবেন।

হায়! সমস্যা যে রয়েই গেল! অচলাবস্থার অবসান তো এতেও ঘটল না। উভয়েই প্রথমবারেই একই জায়গায় সূঁচ গেঁথে দিলেন।

সদস্যরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এখন উপায়? সঙ্কট থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি? না, হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে তো আর এমনি এমনি সমস্যার সমাধান হবে না। অচলাবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এবার নিয়ে আসা হল মাইক্রোমিটার যন্ত্র। এর সাহায্যে এক মিলিমিটারের দেড় হাজার ভাগের এক ভাগও পরিমাপ করা সম্ভব। এবার যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ ও হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেল। ব্যস, জিতে গেছেন। আঙ্কল ফ্রেডেন্ট জিতে গেছেন তার সূঁচটা দেড় হাজার ভাগের ছয় ভাগ দূরে এবং ফিল ইভান্সের সূঁচটা নয় ভাগ দূরে গাঁথা রয়েছে দেখা গেল, অভিনব এ-বিচারের মাধ্যমে আঙ্কল ফ্রেডেন্ট সভাপতি এবং ফিল ইভান্সকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হতে হলেন। ব্যস, ফিল ইভান্স সে ঘটনার পর থেকেই আঙ্কল ফ্রেডেন্টের ওপর ভেতরে ভেতরে দারুণ চটে রয়েছেন।

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে, বিশেষ করে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বেলুনে মেশিন লাগিয়ে সেটাকে আকাশে ওড়ানো সম্ভব কিনা তা নিয়ে কম চেষ্টা করা হয় নি।

আঠারো শো বাহান্ন সালে দোলনার সঙ্গে প্রেলার লাগিয়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেন হেনরি গিফার্ড। আঠারো শো বাহান্ন সালে একই প্রয়াসে লিগু হন লোমে।

আঠারো শ' তিরিশি সালে তিনসানদিয়ার ব্রাদার্স বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে সাধ্যাতীত প্রয়াস চালান। এবার এল আঠারো শ' চুরাশি সাল। সে বছর রেনার্ড এবং ক্যাপ্টেন ক্রেবস অত্যাশ্চর্য এক যন্ত্র তৈরি করে অন্য যেসব বেলুনবাজ আকাশে ওড়ার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন তাঁদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিলেন।

সদ্য আবিষ্কৃত এসব যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বাতাসের প্রতিকূলে উড়ে গিয়ে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসাও সম্ভব হয়। তবে হ্যাঁ, ঝড়ের মুখে পড়লে অবশ্য পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যেত। তখন বেলুনটা খড়-কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে দূরবর্তী স্থানের উদ্দেশ্যে উড়ে যেত।

ঘূর্ণিঝড়, অথবা ঝড় যখন ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রলয়ঙ্করের মতো রূপ নিত তখন বেলুনটা ঘণ্টায় ঘাট মাইল বেগে ছুটে যেত। এলোমেলো ঝড়ের প্রকোপে বেলুন স্রমেত যন্ত্রটা তুবড়ে-ডেঙে একাকার হয়ে যেত। তাই বেলুন চেপে আকাশে ওড়ার ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে যা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে সবই ভেঙে গেল। হতাশা আর হাহাকারই কেবল সম্ভব হল।

তবে বেলুন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে লাভ যে কিছুই হয় নি এরকম কথা অতিবড় শত্রুও বলতে পারবে না। লোমের আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং হেনরি গিফার্ডের তৈরি ইঞ্জিনের কথা বাদ দিলে নব আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক মোটর আশার সম্ভার করেছে, অস্বীকার করা যাবে না।

তিনসানদিয়ার ব্রাদার্স যে পটাসিয়াম বাইক্রেমেট ব্যাটারি আবিষ্কার করেছেন সেটা ব্যবহার করে সেকেন্ডে চার গজ পর্যন্ত ওপরে বেলুন তোলা সম্ভব হয়েছে। রেনার্ড এবং ক্যাপ্টেন ক্রেবসের তৈরি ডায়নামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্র বারো অশ্বশক্তি সম্পন্ন। সেটা ব্যবহারের মাধ্যমে সেকেন্ডে সাড়ে বারো গজ গতিবেগেও বেলুন চালানো সম্ভব হয়েছে।

এবার ইঞ্জিনিয়ার ও ইলেকট্রিসিয়ানরা দীর্ঘ নিরলস গবেষণায় লিপ্ত থেকে এমন এক যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেললেন যেটা ডায়নামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্রের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। বেলুনে চেপে আকাশে ওড়ার ব্যাপার নিয়ে এত গবেষণা

এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত উন্নতি সত্ত্বেও অতিকায় একটা বেলুনের পক্ষে আকাশে ওড়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতিকায় বেলুনটার ওপর বাতাস অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এত বাধা দূর করে বেলুনের অগ্রগতি রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার।

এবার আসরে নামলেন, বোষ্টনের এক অজ্ঞাতনামা রসায়নবিদ। বেলুন-যন্ত্র তৈরি করে তিনি অন্য সবার মুখ একেবারে চুণ করে দেন। আশ্চর্য এক ডায়ানামো-বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন।

এবার বেলুনবাজ পাইলের আবিষ্কৃত বেলুনটা প্রতি সেকেন্ডে বিশ থেকে বাইশ গজ গতিতে উড়ে গিয়ে বিস্ময় উৎপাদন করল। তাঁর অবিশ্বাস্য আবিষ্কারের দিকে আকুল ফ্রেডস্টের নজর পড়ল। সেটাকে ঝট করে এক লক্ষ ডলারের বিনিময়ে তিনি কিনে নিলেন। মাত্র একলক্ষ ডলার দিকে এমন অবিশ্বাস্য একটা আবিষ্কার কিনতে পারায় অনেকেই বিস্মিত হলেন।

এবার ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের সভারা আদ্য-জল খেয়ে লেগে গেলেন। মহৎ প্রয়াস সার্থক করতে অর্থের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হল না। চারদিক থেকে অর্থ সাহায্য আসতে লাগল। দেখতে দেখতে তহবিলে তিন লক্ষ ডলার জমা পড়ে গেল। এরকম একটা মহৎ প্রচেষ্টাকে সার্থকতায় পরিপূর্ণ করার জন্য হেনরি টিভার নামে এক নভোচারিকেও অনায়াসেই জোগাড় করা সম্ভব হল। তার কীর্তি হচ্ছে, সর্বপ্রথম ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফুট ওপরে ভ্রমণ। তিনি নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত বেলুনে চেপে আকাশ পথে উড়ে গিয়ে বিস্ময়ের কারণ হয়েছেন।

ওয়াইজ কেবলমাত্র সাড়ে এগারো শ' মাইল অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

এ তো গেল দ্বিতীয় কীর্তির কথা। তৃতীয় কীর্তিটা সত্যিই অবিশ্বাস্য বাটে। সেটা হচ্ছে, পনের শ' ফুট ওপর থেকে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে যাওয়া। কিন্তু রোজিয়ার বেলুনবাজ মাত্র সাত ফুট ওপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছিলেন।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের বেলুনবাজদের বেলুনটা বিশালায়তনই বাটে। সেটার মোট আয়তন চল্লিশ হাজার কিউবিক মিটার। অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বাটে। এর আগের, নাদারের বেলুনটার আয়তন ছিল দু' হাজার কিউবিক মিটার। ফ্ল্যাডের বেলুনটা ছিল পঁচিশ হাজার কিউবিক মিটার এবং বিশ হাজার কিউবিক মিটার ছিল জন ওয়াইজের বেলুনটার আয়তন।

হ্যাঁ, বিশালায়তন বেলুনটার খুটিনাটি যেটুকু কাজ বাকি ছিল তাও প্রায় সেরে ফেলা হয়েছে। আর মাত্র হুগা দুয়ের মধ্যেই সেটা অভিযান শুরু করবে।

সব প্রায় শেষ করেও জরুরি কাজটা এখনো বাকি রয়ে গেল যে! প্রপেলার। কোন মাপের প্রপেলার এতে ব্যবহার করা হবে? দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে প্রপেলারের আয়তনের ব্যাপারটা তো কোনোরকমে নিষ্পত্তি করা গেল, কিন্তু সেটাকে সামনে, নাকি পিছনে বসানো হবে তা নিয়ে নতুন বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল। একশজন বেলুনবাজ পরিস্থিতিটাকে এমন ঘোলা করে তুললেন যে, শেষপর্যন্ত হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। ক্লাবের সদস্যরা ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে দুটো দলে বিভক্ত হয়ে গেলেন। আকুল ফ্রেডস্টের পক্ষে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটানো কি করেই বা সম্ভব? কারণ, তিনি নিজেও যে একটা দলের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

বাস, মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি চরম রূপ নিয়ে নিল। ঘন ঘন পিস্তল গর্জে উঠতে লাগল। তবে কেউ-ই হতাহত হল না। সবই ফাঁকা আওয়াজ একটুকুই যা ভরসা।

ঠিক সে মুহূর্তেই ক্লাবের দারোয়ান একটা ভিজিটিং কার্ড এনে সভাপতি ফ্রেডস্টের হাতে দিল। উদ্দেশ্য অজ্ঞাত পরিচয় এক আগন্তুক সভায় যোগ দিতে ইচ্ছুক। গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সম্বন্ধে ক্লাবের সদস্যদের অবহিত করাই তাঁর ইচ্ছা।

আগন্তুকের নাম রোবার।

সভাপতির অনুমতি পেয়ে আগন্তুক হলঘরে ঢুকলেন। তিনি ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় নাগরিকরা, দয়া করে আমার কথা শুনুন, আমার নাম রোবার। আমার চেহারা দেখে আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছেন, অসীম শক্তির অধিকারী আমি। আর সাহসও আমার কম নয়। বলতে পারেন আমি এক অকুতোভয়া পুরুষ আর আমার ইচ্ছাশক্তি তেমনই প্রবল। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি, পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমার পথ রোধ করতে পারবে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন, আত্মপ্রচারই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য তাতেও আমার আক্ষেপের কিছু নেই। আর যদি আন্তরিক ইচ্ছা থাকে তবে আমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শুনুন। আমি যা কিছু বললাম ও বলব সবকিছু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করুন।'

আগন্তুক পূর্বস্বর অনুসরণ করেই আবার বলতে লাগলেন, 'ধৈর্য ধরে, মন দিয়ে শুনুন—দীর্ঘ এক শ' বছর ধরে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি। এর জন্য ধৈর্য, সময় ও অর্থও কম ব্যয় হয় নি। আজ আমি মানসিক বিকারের শিকার হয়ে পড়েছি। আজকের যুগেও মানুষ অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে চলেছে, প্রপেলার ব্যবহার করে আকাশে বেলুন ওড়ানো সম্ভব! এখানে আপনারা প্রায় এক শ' জন বেলুনবাজ উপস্থিত রয়েছেন, আমার কথা শুনে রাখুন, এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে না—কিছুতেই না। আপনারা মরীচিকার পিছনে ছুটে গিয়ে হাজার হাজার ডলার জলে নয়, শূন্য-মহাশূন্যে উড়িয়ে দিচ্ছেন। ধৈর্য, সময়ও অর্থ চলে চলে নিঃস্ব-নিভ হয়ে পড়ছেন। দয়া করে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

কি, বেলুনে চেপে বাতাসের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনা! দু-পাউন্ড ওজনের কোনো বস্তুকে যেখানে এক কিউবিক গ্যাস প্রয়োগ করতে হয়, বাতাসের ওপর ভর দিয়ে যাকে শূন্যে ভাসতে হয়, তার পক্ষে কি করে বাতাসের বিরুদ্ধে চলা সম্ভব? সামান্য বাতাস নৌকার পালে যে চাপ প্রয়োগ করে থাকে তার শক্তি চার শ' অশ্বশক্তির সমান। আমাদের কি স্বপ্ন নেই 'টে ব্রিজ দুর্ঘটনা'র সময় বাতাস প্রতি বর্গগজ যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করেছিল তা ছিল এইট

হানড্রেড ওয়েন্টের সমান। তাই এখন বলতেই হয়, বেলুনের ক্ষমতা কি খেয়ালির প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যেতে পারবে? তাই বলছি, শূন্যে ভেসে বেড়াতে হলে অবশ্যই একজোড়া ডানার প্রয়োজন রয়েছে।

এত কথাই পরও আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগছে, আমরা কী তবে আকাশে ওড়ার চিন্তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেব? আমি বলব, না অবশ্যই না। আমরা কি চাকা, প্রপেলার, দাঁড় আর পাল ব্যবহারের মাধ্যমে চমৎকার একটা জলযান জাহাজ তৈরি করি নি? করছি। ঠিক সেরকমই আমরা আকাশেও অবশ্যই উড়তে পারব। এর জন্য চাই বাতাসের চেয়ে ভারি অথচ অধিকতর শক্তিশালী কোনোকিছু, যা বাতাসকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অনায়াসে উড়ে যেতে পারে।

মুহূর্তের জন্য উপস্থিত সবার মুখের ওপর একবারটি চোখেরমণি দুটো বুলিয়ে নিয়ে আগন্তুক রোবার এবার বললেন, 'আমার বক্তব্য-এ-মুহূর্তে হাস্যকর মনে হলেও এতে সম্পূর্ণ বাস্তবতার ছোঁয়া রয়েছে।'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙায় উপস্থিত বেলুনবাজরা উত্তেজনায় সমস্তই গর্জে উঠলেন।

অকুতোভয় রোবার কিন্তু এতগুলো লোকের আফলনেও এতটুকু ঘাবড়ালেন না। এবং নিজ কর্তব্যে অবিচল থেকে এবার বললেন, 'আপনারা যাই ভাবুন না কেন, অদূর ভবিষ্যতে কিন্তু 'ফ্লাইং মেশিন'-ই আসছে। আচ্ছা, আপনারাই বলুন তো, পাখি কি করে আকাশে উড়ে বেড়ায়? আমি বলব, বেলুন নয় বলেই। তারা প্রত্যেকেই এক একটা যন্ত্রবিশেষ। আর মানুষের মধ্যে এই যে আকাশে ওড়ার প্রেরণা জেগেছে তা কিন্তু পাখিদের ওড়া দেখেই। প্রকৃতির যন্ত্রবিদ্যাকে অনুকরণ করেই আপনাদের আকাশে উড়তে হবে। তাই আমি বলছি কি, অসম্ভবকে সম্ভব করার আবাস্তব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়ে বাস্তবকে আঁকড়ে ধরুন। অতিকায় অ্যালবট্টস প্রতি মিনিটে দশবার ডানা ঝাপটায়, পেলিক্যান প্রতি মিনিটে সত্তরবার। আর মৌমাছি? তারা মিনিটে এক' শ' বিরানব্বইবার আর মাছি ডানা ঝাপটায় মিনিটে তিন শ' ত্রিশবার। আরো আছে, লুপি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, একটা ফড়িং-এর ওজন মাত্র দু-গ্রাম হলেও সে কিন্তু অনায়াসেই চারগ্রাম ওজন বয়ে নিয়ে উড়ে যেতে পারে। এবার আপনারাই বলুন তো, শূন্যে ওড়ার সমস্যার সমাধান কি সেদিনই হয়ে যায় নি? আর আমাদের জানাই আছে, ডানার দৈর্ঘ্য প্রস্থ যা হবে সে অনুপাতে জীবটার আয়তন কম হবেই। এই হচ্ছে প্রকৃতির কলকজা, প্রকৃতির সৃষ্ট ব্যবস্থা, ঠিক কিনা?'

'আবার আমি বলছি এ প্রকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্রই হচ্ছে, অর্থটাস, স্ট্রিওফোর্স আর হেলিকপটস।'

এবার পেলড কী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, বলছি, অবিকল শিশুয়ের মতোই পাখি লাফিয়ে ওঠে, হেলিকপটরের মতোই খাড়াভাবে লাফিয়ে ওঠে। আমাদের ভুললে চলবে না। কেবল আমেরিকাই নয় বিদেশী ইঞ্জিনিয়ারগণও একের পর এক ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনাগুলোকে লক্ষ করে শূন্যে ওড়ার পরিকল্পনাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে।

এবার কী বলছি শুনুন, বেলুনে চেপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে অন্তত দশ বছর সময় লেগে যাবে। আর কেবল একসপ্তাহে উড়ন্ত যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীটাকে একবার চক্কর মেরে আসা সম্ভব।'

ক্রাবের সেক্রেটারি ইভান্স এবার আর মুখ না খুলে পারলেন না। তিনি কষ্টস্বরে উচ্চা প্রকাশ করেই বললেন, 'আকাশযান নিয়ে তো অনেক বক্তৃতা ঝাড়লেন। এখন জিজ্ঞাসা, আসলে কী সেটা কোনোদিন চাক্ষুষ করেছেন? নাকি কোনোদিন তাতে চেপেছেন? আকাশ জয় করেছেন কি জনাব?' আপন সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেই রোবার এবার জ্ঞান হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, চেপেছি? আকাশযানে অবশ্যই আমি চেপেছি। আর আকাশজয়? তাও আমি অবশ্যই করব।'

উপস্থিত সদস্যগণসমস্তই বলে উঠলেন 'সাবাস রোবার! জয় আকাশ বিজয়ী রোবারের জয়!'

'হ্যাঁ, একদম ঠিক কথা বলেছেন, 'আকাশ-বিজয়ী', 'আকাশ-বিজয়ী' যথাযোগ্য উপাধিই বাটে।'

রোবার সরবে বিন্দুপাত্তক হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে এবার বললেন, 'হিঃ! আপনারা না নিজেদের আমেরিকান বলে গর্ব করেন।'

রোবার তাঁর পিস্তল দুটো থেকে পর পর পাঁচ-ছয়টা ফাঁকা আওয়াজ করলেন। কেউ হতাহত হলেন না বটে, কিন্তু দৌঁয়ায় ঘরটা প্রায় ঢেকে গেল।

হলঘরের সবাই যখন পরিস্থিতিটার মোকাবেলা করতে, দৌঁয়ার কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছেন ঠিক তখনই রোবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করে ফেললেন। চোখের পলকে সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়ে দিলেন। কী করে যে কী ঘটে গেল সদস্যদের কেউ টেরও পেলেন না।

বেলুনবাজগণ আজই প্রথম যে হামলা হুজ্জতি করছে তাই নয়। বরং তাদের নিত্য নিয়ত হৈ হল্লোড়ের ফলে পথচারীরা মহা সমস্যায় পড়ে গেল। যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হল। প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হল। পুলিশ লাঠিচার্জ করে তবে শান্তি ফিরিয়ে আনে।

ক্রাবের সম্পাদক রীতিমতো ভড়পাতে লাগলেন, 'যন্তসব বে-আক্কেল কাজ। আমি ক্রাবের সভাপতি হলে এমন ন্যাক্কারজনক একটা কাজ কিছুতেই হতে দিতাম না। উটকো একটা ভূঁইফোড় আপদ এসে এতগুলো শিক্ষিত লোকের মাথার ওপর বোমালুম ছড়ি ঘুরিয়ে গেল। আর আমরা তা মুখবুজে হজম করলাম!'

'হতচ্ছাড়া শয়তানটাকে মুখই খুলতে দিতাম না।'

তর্কাতর্কি করতে করতে তাঁরা দুজনে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল আঙ্গল ফ্রডেস্টের ভতা ফ্রাইকোলিন। তাঁরা বেঁচুন হয়ে বিবাদ করতে করতে বাড়ি ফিরছেন। ফ্রাইকোলিন আচমকা পিছন ফিরে তাকাতেই রীতিমতো চমকে উঠল। দেখল, পাঁচ-পাঁচটা ছায়ামূর্তি তাঁদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে ব্যাপারটা দেখে আতঙ্কিত হলেও বিবাদে লিপ্ত প্রভুকে কিছু বলার সুযোগই পেল না। তবুও সে বিপদাশঙ্কায় তার প্রভুকে ছায়ামূর্তির মতো মানুষগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়েছে। তাঁদের তর্কাতর্কি তখন তুঙ্গে উঠে গেছে। ছায়ামূর্তিগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। উভয় দলের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। ফ্রাইকোলিন প্রমাদ গুলল। অনিশ্চিত ভয়ে তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে আসতে লাগল।

অস্থিরচিত্ত ফ্রাইকোলিন কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'মাষ্টার আঙ্কল! মাষ্টার আঙ্কল!' আঙ্কল ফ্রেডেন্ট গর্জে উঠলেন, 'এ কী বেয়াদপি! যাঁড়ের মতো এমন চিল্লাচিল্লি—' কথাটা আর শেষ করতে পারলেন না তিনি। অকস্মাৎ ঘাড় ঘুরাতেই পিছনে সার্চ লাইটের আলোয় তাঁর চোখ ঝলসে যাবার অবস্থা। আর সঙ্গে সঙ্গে পাশের মাঠ থেকে বাঁশি বেজে উঠল। বাঁশি আর সার্চ লাইটের মধ্যে ইঙ্গিতে কিসের যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল মনে হল।

মুহূর্তের মধ্যেই ষণ্মার্কী ছয় জন লোক তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাঁদের মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। এবার পাল্লা আঁটা ছোট ছোট তিনটা আলমারির মধ্যে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি এঁটে দেয়া হল।

তাঁরা কিছুই বুঝতে পারলেন না, বন্দি করে কোথায় তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফিলাডেলফিয়া শহর তোলপাড় করে নিখোঁজ ক্লাব সভাপতি আঙ্কল ফ্রেডেন্ট এবং সম্পাদক ফিল ইভালের খোঁজ করা হল। না, কোনো হদিসই মিলল না। ব্যাপারটা রহস্যজনকই বটে।

এদিকে চোখ মুখ ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় অদৃষ্টবিড়ম্বিত তিনটি প্রাণী প্রায় অন্ধকার একটা কামরার মেঝেতে পড়ে গোড়াচ্ছেন। ফ্রাইকোলিন তো এমনতেই আধমরা হয়ে পড়েছিল। তার ওপর এমন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়ায় কোনোরকমে তার ধড়ে প্রাণটুকু আছে। ব্যাস, এটুকুই।

ফিল ইভাল কিন্তু এত সহজে অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিচ্ছেই হয়ে বসে থাকতে রাজি নন। তিনি হামাগুড়ি দিয়ে আলগা করার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগলেন। দীর্ঘ নিরবস্থিতির পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি হাত দুটোকে বাঁধন মুক্ত করতে সক্ষম হলেন। এবার চোখ ও মুখের বাঁধন খুলতে দেরি হল না। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেওয়ালের তাকে একটা ছুরি খুঁজে পেলেন। ব্যাস, পায়ের বাঁধন কেটে তিনি নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত করে নিলেন।

এবার তিনি চির প্রতিদ্বন্দ্বী সভাপতি সাহেবেরও যাবতীয় বাঁধন কেটে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাদ বটে, কিন্তু তাঁকে জব্দ করার বা শত্রুতাচরণ করার সময় এটা নয়।

বাঁধনমুক্ত হয়ে আঙ্কল ফ্রেডেন্ট যন্ত্রচালিতের মতো একলাফে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিল ইভালকে বুকে জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ফিল ইভাল! আমরা কিন্তু এ মুহূর্তে আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউশনের সভাপতি আর সম্পাদক নই। এখন আমাদের একমাত্র পরিচয় অজ্ঞাত শত্রুর হাতে উভয়ে বন্দি। এ শত্রু আমাদের চরমতম শত্রু!'

'রোবার! রোবার! আমাদের চরমতম শত্রু অজ্ঞাত পরিচয় সেই রোবার!' ফিল ইভাল দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠলেন।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে এবার বললেন, 'মি. ইভাল, আগে আমাদের জরুরি কথাগুলো সেরে নেয়া দরকার। প্রাণে বাঁচার চিন্তা! অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করার পরিকল্পনা করে নিতে হবে।'

'আমরা যখন ভাগ্যগুণে বাঁধনমুক্ত হতে পেরেছি তখন আর এখানে, ঘাঘের খপ্পরে পড়ে না থেকে চলুন, পালানোর পথ খুঁজি।' ফিল ইভাল বললেন।

ফিল ইভাল ব্যস্তহাতে ফ্রাইকোলিনের বাঁধন খুলে দিলেন। এবার দরজা খুলে পালানোর চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ প্রয়াস। বাইরে থেকে তালো দেয়া। এবার ছুরির ফলটা দিয়ে দেয়ালে দাগ কেটে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে চেষ্টা করলেন। এবারও হতাশ হতে হল। দেয়াল-কাটা বা ছিদ্র হওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্য আঁচড় পর্যন্ত পড়ল না।

চাপা আর্তস্বরে ফিল ইভাল এবার বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর। এ কি বিপাকে ফেললে! আমাদের কোথায় এনে বন্দি করলে!'

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট হতাশার স্বরে বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! তবে কিলোহার চাদর দিয়ে দেয়ালটা—'

'লোহার চাদর হলে অবশ্যই ঠকঠক আওয়াজ হত। লোহা বা কাঠ কোনোটাই নয়। ইম্পাতও এর কাছে হার মানতে বাধ্য।'

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট উন্মাদের মতো দেয়ালটার গায়ে অনবরত কিল চড় লাগি মেরে চাপা গর্জন করতে লাগলেন।

ফিল ইভাল এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরে বললেন, 'এ কী করছেন মি. ফ্রেডেন্ট। মাথা গরম করার সময় এটা নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে আমাদের পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে।'

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট এবার ফিল ইভালের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে উন্মাদের মতো কয়েকবার দাগ কেটে হতাশার স্বরে বললেন, 'মি. ইভাল, আজব ব্যাপার তো! দেয়ালটা কৃষ্ণালের তৈরি নাকি?'

ফ্রাইকোলিনের পক্ষে মাথা ঠাণ্ডা রাখা সম্ভব হল না। সে গলা ছেড়ে রোবারের পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করতে লাগল। সে যেন রীতিমতো ফেপা কুকুরের মতো দাপাদপি জুড়ে দিল।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট ও ফিল ইভাল উভয়েই নিঃশব্দেই হলেন, দরজা দিয়ে বেরোনো ছাড়া কয়েদখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। কারণ, কেবল দেয়ালই নয় এমনকি কামরার মেঝেটাও এমন অদ্ভুত একটা ধাতু দিয়ে তৈরি তাও তাঁরা বুঝতে পারলেন না। বার কয়েক পা ঠুকে আরো বুঝলেন, মেঝেটা ফাঁপা। ধপধপ আওয়াজ হচ্ছে। আর বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো মেঝে ও দেয়ালের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা তাঁদের কাছে আরো রহস্যজনক মনে হতে লাগল। মনে হল, কয়েদখানা যেন এখন আর আগের মতো নিশ্চল নিখর নয়—চলমান।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট ফুসফুস নিঃসৃত ঘরময় দীর্ঘশ্বাস চড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'মি. ইভাল, মনে হচ্ছে, কামরাবন্দি অবস্থায় আমরা চরতে শুরু করেছি। আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না? তবে কি আমাদের শয়তান রোবারের কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

ফ্রাইকোলিনের কাঁধে চেপে জায়গাটা সম্বন্ধে আঁচ করে নেয়ার চেষ্টা করলেন। একঝলক দেখে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'মি. ফ্রেডেন্ট এ যে সাধারণ ব্যাপার নয়! জাহাজের পোর্টহোলে পেট মোটা যে বিশেষ কৌশলে তৈরি কাচ ব্যবহার করা হয়, দেখলাম সে-রকম কাচ এতে ব্যবহার করা হয়েছে।'

ফিল ইভান্স ছুরির বাঁট দিয়ে কাচটার গায়ে আঘাত করতে লাগলেন। বৃথা চেষ্টা। সেটা ভাঙা বা চিড় খাওয়া তো দূরের ব্যাপার তার গায়ে সামান্য আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। কেবল কয়েকবার খটখট আওয়াজ হল। এ যেন সিমেন্ট পদ্ধতিতে তৈরি বিচিত্র ধরনের কাচ।

ফিল ইভান্স এবার কাচের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'মি. ফ্রেডেন্ট, কী আশ্চর্য ব্যাপার! ক্রমেই যে আমরা রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ছি! এটা দিয়ে যে বাইরের কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হতচ্ছাড়াটা আমাদের যে-কোনো ভাগাড়ে এনে ফেলেছে ঈশ্বরই জানেন!'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই সশব্দে দরজা খুলে বিশালদেহী এ পুরুষমূর্তি কামরার দরজা আগলে দাঁড়াল। নির্বাক নিষ্পন্দ ও নিশ্চল-নিথর পুরুষমূর্তিটার চোখ মুখের গাঠির্মের ছাপটুকু আঙ্কল ফ্রেডেন্ট ও ফিল ইভান্সের নজরে এড়াল না।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট আঁতকে উঠে বললেন, 'রোবার! হ্যাঁ, রোবারই তো!'

রোবারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'মাননীয় বেলুনবাজরা, অনুগ্রহ করে শুনুন, আপনারা মুক্ত। যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিন্তু মনে রাখবেন, অ্যালবের্টস ছেড়ে যাবার চেষ্টা অবশ্যই যেন করবেন না। অবশ্য এর বাইরে যাবার চেষ্টা করে লাভ কিছুই হবে না। হতশ্রা হাওয়া ছাড়া—'

তাঁকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই আঙ্কল ফ্রেডেন্ট সোপান্সে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'মুক্ত! আমরা মুক্ত!'

উদ্ভাস করতে করতে তাঁরা তিন বন্দি ছুটোছুটি করে কামরাটা থেকে বাইরে বেরিয়েই ধমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট ভীতসন্ত্রস্ত মুখে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'হায় ঈশ্বর! রোবার আমাদের এ কোথায় এনে ফেলেছেন। এ যে মনে হচ্ছে, সমতল ভূমি থেকে অন্তত চার হাজার ফুট উঁচু কোনো এক অজানা অচেনা অঞ্চলে নিয়ে এসেছেন।'

একসময় বিজ্ঞানী ক্যামিল ফ্রাম্যালিওন প্রশ্ন করেছিলেন, 'মানুষ কবে পৃথিবীর বুকে এমন করে হামাগুড়ি দেয়া ছেড়ে আকাশের বুকে শান্তিতে বিচরণ করতে পারবে, বলুন তো?'

তিনি প্রশ্নটার উত্তর শুনেছিলেন, 'যেদিন মানুষ যন্ত্রবিদ্যার ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করে শূন্যে ওড়ার বিদ্যা আয়ত্তে আনতে পারবে, সেদিন।'

১৭৮৩ সাল। সে বছর ম্যালফিয়ের ব্রাদার্সের আবিষ্কৃত ফায়ার বেলুন শূন্যে ওড়ার অনেক আগেই চার্লস নামে এক চিকিৎসক পাখির মতো শূন্যে উড়ে বেড়াতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এটাকেই প্রথম যান্ত্রিক প্রচেষ্টা বলে স্বীকার করা হয়েছে।

এ পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাপার। সম্প্রতিকালে পেরুগিয়ার দাস্তে, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও উইডট্রি শূন্যে ওড়ার ব্যাপারে যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ করেন।

এরও আগে ঘোলা শো বিরানবই সালে মার্কুইস দ্য ব্যাকুইভিল পাখা লাগিয়ে সিমের ওপর দিয়ে ওড়ার চেষ্টা করে হাত-পা ভাঙেন।

সতের শো আটশটি সালে পকট্রন দুটো প্রপেলার যুক্ত একটা যন্ত্রের পরিকল্পনা করলেন। তাদের একটার কাজ হবে শূন্যে ভাসতে সাহায্য করা আর দ্বিতীয়টা আকাশযানটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যাবে।

সেটা ছিল সতের শো একাশি খ্রিস্টাব্দ। সে বছর প্রিন্স অব ব্রুঅডেনের মি. বেন অত্যাধুনিক ও অবিশ্বাস্য ধরনের আকাশযান গড়ে তুললেন।

সতের শো চুরাশিতে বেনভেনু এবং মলয় উদ্ভাবন করলেন হেলিকপ্টার।

তারপর আঠারো শো আট সালে অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকুইস ডেগেন আকাশে ওড়ার প্রয়াসে লিপ্ত হন। আঠারো শো দশে বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র বাতাসে ওড়বার সূত্র ব্যাখ্যা করে ইস্তাহার ছাপিয়ে প্রচার করেন নামাতেনের ভেলে।

এর পর আঠারো শো দশ সাল থেকে শুরু করে আঠারো শো চল্লিশ পর্যন্ত কয়েক বছরের মধ্যে বহুকীর্তির স্বাক্ষর রাখেন ডারব্রিনগার, ডুগেটেট, ভিভায়াল আর সার্তিকা গনিয়াট্র দ্র ল্যাটুর।

আঠারো শো বিয়াল্লিশে বাস্পচালিত প্রপেলারের সাহায্যে শূন্যে ওড়ার কাজে মাতলেন ইংল্যান্ডের হেসনস।

বিজ্ঞানী কমাস প্রপেলার উদ্ভাবন করেন আঠারো শো পঁয়তাল্লিশ সালে।

আঠারো শ' সাতচল্লিশে ব্যামিল ভঁট অবিকল পাখির ডানার মতো ডানায়ুক্ত হেলিকপ্টার তৈরি করে আলোড়ন সৃষ্টি করলেন।

১৮৫২ সালে দুদুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ল্যাটুর যন্ত্রচালিত প্যারাসুটে চেপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে আত্মহত্যা দিলেন। আর চারটে ঘূর্ণায়মান ডানা সঞ্চলিত যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে শূন্যে ভ্রমণে প্রয়াসী হলেন।

এবার প্রয়াসী হলেন রোবার। তিনি অ্যালবের্টসের মতো একটা অত্যাশ্চর্য ওড়ার ইঞ্জিন তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। এটা কেবল বাতাসের অনুকূলেই নয়, প্রতিকূলেও অনায়াসেই যেতে পারে। দীর্ঘগবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—(ক) হেলিকপ্টার বা স্পাইরালিফারের প্রপেলার দণ্ডের ওপর নির্ভর করে ঘুরবে; (খ) অরথপ্টার-পাখির মতো শূন্যে ওড়ার এক যন্ত্র বিশেষ এবং (গ) এরাপ্লেন প্রপেলারের শক্তির ওপর নির্ভর করে চ্যাপটা এমন একটা যন্ত্র যার সাহায্যে শূন্যে উড়বে।

দীর্ঘ নিরলস ভাবনা চিন্তার ফলস্বরূপ রোবার প্রথম দুটো যন্ত্র মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। নিঃসন্দেহ হলেন, এদের পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়।

খুবই সত্য বটে—এরোগ্রেনের সুবিধা যথেষ্ট। প্রপেলারকে হাওয়ায় কাত করে ঘোরাতে পারলেই কাজ হাসিল। ব্যাস, এবার বাতাসই তার গায়ে চাপ প্রয়োগ করে তাকে আকাশে উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন রোবার। দুই মিরিজ প্রপেলার হাতে ব্যহার করেছেন। একটা আকাশযানটাকে স্বাভাবিক গতিবেগে চালিয়ে নিয়ে চলেছে আর অন্যটা অ্যালব্রেটসকে শূন্য ভেসে থাকতে সাহায্য করছে।

রোবার তার অত্যাশ্চর্য গুড়ার যন্ত্রটাকে তৈরি করতে গিয়ে দুটো কৌশল প্রয়োগ করেছেন—পাখির মতো ডানা মেলে অ্যালব্রেটস আকাশে উড়ছে। আর হেলিকপ্টার ডানার সাহায্যে কোণাকুনি বাতাস কেটে শূন্যে উড়ছে।

সত্যি বলতে কি, অ্যালব্রেটস যন্ত্রবিজ্ঞানের এক অবিদ্যাস্য আবিষ্কার। যন্ত্রটা মোটামুটি তিনটি অংশে বিভক্ত। কলকজা, প্রাটফর্ম ও ভেসে থাকা ও চলার যন্ত্র।

কিছু স্থির খোলের নিচে সারিবদ্ধভাবে আটকে দেয়া হয়েছে। এদের কাজ হচ্ছে ভূমি স্পর্শ করার সময় যেন খুব আটকানো রয়েছে। ডেকের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রপেলারগুলো অনবরত ঘুরে চলেছে। এক-একদিকে এক-একটা খুঁটির জোড়ায় প্রপেলার ঘুরছে। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই, সংঘর্ষের প্রশ্নই ওঠে না। এ ডেকে চ্যাম্বরটা প্রপেলার পুরোদমে হরদম ঘুরেই চলেছে। সামনে পিছনে অ্যালব্রেটসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য টেবিলপাখার মতো ঘুরছে।

রোবার তাঁর তিনজন পুসুসূরী লানডেলি, পকট্রন এবং কমান্ডের পদ্ধতির একক সমাবেশ ঘটিয়ে অ্যালব্রেটসকে তৈরি করেছেন। তিনি অতিক্রিয়া এ-যন্ত্রটাকে বিদ্যুতের সাহায্যে চালাচ্ছেন। আবাক হাবার মতো ব্যাপারই বটে। অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন বিদ্যুৎই শিল্পজগতের প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। ইলেকট্রোমোটরের সাহায্যে রোবার তার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ তৈরি করে নিয়েছেন। তিনি এমন কিছু ব্যাটারি ও অ্যাকুমুলেটর তৈরি করেছেন যার গোপন রহস্য তিনি কারোর কাছেই ফাঁস করেন নি। অমিত শক্তিশালী ব্যাটারিতে তিনি কোনো অ্যাসিড ব্যবহার করেছেন, আর অ্যাকুমুলেটর পজিটিভ ও নেগেটিভ প্লেটে কোনো ধাতু ব্যবহার করেছেন—কোনো তথ্যই কারোর কাছে ব্যক্ত করেন নি।

ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সম্পাদক যদি বিদ্যুৎ তৈরি রহস্য উদ্ঘাটন করতে না পারেন তবে অত্যাশ্চর্য এ আবিষ্কারের পদ্ধতি চিরদিন গোপন অন্তরালেই থেকে যাবে।

এমন কোনো ধাতব প্লেট ব্যবহার করে রোবার তাঁর অ্যালব্রেটসকে গড়েছেন যে, পিল ইভালের ইস্পাতের ছুরির ফলা পর্যন্ত দুমড়ে মুচড়ে একেবারে ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। তবে কি সেটা ধাতু না, কাগজ? কয়েক বছর ধরে তো বিজ্ঞানীগণ ইস্পাতের চেয়ে সুদৃঢ় কাগজ তৈরির জন্য নিরলস গবেষণায় লিপ্ত। তবে কি তাঁদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে? সে-রকম অবিদ্যাস্য কাগজ তৈরি করে ফেলেছেন? তারা কি তবে ছেঁড়া-ফাটা টুকরো টুকরো কাগজ স্টার্চ আর ভেজট্রিন দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে, জলের চাপে নিঙড়ে নিয়ে ইস্পাতের চেয়েও সুদৃঢ় কাগজ তৈরি করে বিশ্বায়ের কারণ হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রোবার তাঁর আকাশ যানটাকে তৈরি করতে এরকম অত্যাশ্চর্য জিনিস কেন ব্যবহার করলেন? এর একটাই উত্তর—হাঙ্গা ও অধিকতর সুদৃঢ় বলে। সত্যিই আবিষ্কারটা অত্যাশ্চর্যই বটে। এটা এমনই এক জিনিস যা ভাঙা বা কাটা তো যায়ই না, এমনকি আগুনেও পোড়ে না। শুধু কি এই? প্রপেলারের বিভিন্ন অংশ আর ইঞ্জিন পর্যন্ত জিলেটিন মিশ্রিত ধাতু দিয়ে তৈরি। খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করলে বৈকি দুমড়ে যাবে কিন্তু ভাঙবে না কিছুতেই। তরল কোনো পদার্থ বা গ্যাস, এমনকি এসেল বা অ্যাসিডও একে গলিয়ে দিতে সক্ষম নয়। এটা প্রথম শ্রেণীর বিদ্যুৎরোধক অন্তরায়।

উডোজাহাজ অ্যালব্রেটসে মাত্র আটজন যাত্রী। রোবার নিজে, তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী মেট টম টার্নার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, দুজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার, দুজন চালক এবং একজন পাচক।

যুদ্ধের জন্য যে-সব অন্ত্রশস্ত্র দরকার অ্যালব্রেটসে সবকিছুরই ব্যবস্থা রয়েছে। বৈদ্যুতিক বাতি, স্যাক্সট্যান্ট, কম্পাস, স্ট্র-গ্রাস, সার্ভোমিটার, ব্যারোমিটার, মাছ ধরার সরঞ্জামাদি, টেলিস্কোপ, ছাপাখানা, তিন ইঞ্জিন বিশিষ্ট কামান, ডিনামাইট, কার্তুজ, গোলাবারুদ, বৈদ্যুতিক উনুন আর কয়েকমাস চলার মতো খাবারদাবার জমা করে রাখা হয়েছে। আর? আছে বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ট্রাম্পেট।

কোনো আকস্মিক কারণে যদি একটা প্রপেলার ভেঙে পড়ে বা বিকল হয়ে যায় তবু অ্যালব্রেটস মুখ খুবড়ে পড়বে না। অনায়াসে শূন্যে ভেসে থাকতে সক্ষম হবে। এগিয়ে চলার কাজও অব্যাহত থাকবে।

অতিথিদের কাছে সবকিছু খোলাখুলি আলোচনা করতে গিয়ে রোবার বললেন, 'গুনুন, সুবিশাল বায়ুসমুদ্রে রয়েছে আমার একাধিপত্য। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে ইকারিয়ান বায়ুস্তর। এখানকার অধিপতি আমিই। আর আমার অ্যালব্রেটস, আমার পঞ্জীরাজ—আমার নির্ভরযোগ্য বাহন।'

অ্যালব্রেটস ঘণ্টায় এগার 'নট' গতিতে ধেয়ে চলেছে। পায়ের তলার মরু নদীটাকে মনে হচ্ছে ফিতের মতো সরু একটা বস্তু। সূর্যের কিরণ পড়ে হৃদটার জল চকচক করছে। পাহাড়ের সারি দ্রুত ছুটে গিয়ে দিশন্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

ফিল ইভাল বিশ্বায় বিস্ফারিত চোখে পাহাড়ের সারির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'মি. রোবার আমরা কি পৃথিবী প্রদক্ষিণে লিপ্ত?'

মান হেসে রোবার জবাব দিলেন, 'তার চেয়েও বেশি কিছু মনে করতে পারেন।'

কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ একে অক্ষল ফ্রডেন্ট বললেন, 'আপনার উদ্দেশ্যটা কী? আমাদের যদি ভালো না লাগে তবুও কি আপনার সঙ্গে যেতে হবে?'

'ভালো লাগছে না! ভালো না লাগলেও যেতেই হবে, কোনোই উপায় নেই।'

রোবার মুখে তাঁদের অতিথি বলে সম্মোদন করেছেন সত্যি, কিন্তু কার্যত তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন মতো আচরণ করে চলেছেন।

কয়েকমুহূর্ত নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে এক সময় ঠোঁটের কোণে বিন্দুপাত্তক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'এখন কী বুঝছেন? বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো যন্ত্রকে কি শূন্যে ওড়ানো সম্ভব?'

অ্যালবের্টস এবার মন্ট্রিয়েল শহর অতিক্রম করে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। একটু আগেই কুইবেক শহর ছাড়িয়ে এসেছে। এখন এর গতি ঘণ্টায় পঁচাত্তর মাইল।

মন্ট্রিয়েল শহর চোখের আড়ালে চলে গেলে ক্রমে এগিয়ে আসতে লাগল ওটাল জলপ্রপাত। সফেন জলপ্রপাতটাকে এত উঁচু থেকে দেখে মনে হতে লাগল, কড়াইয়ে বুঝি টগবগ করে জল ফুটছে।

পার্লামেন্ট হাউস, যার পলিক্রোম স্থাপত্য উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

এবার অ্যালবের্টস মুখ ঘুরিয়ে উদ্ধার বেগে ছুটে চলল। অধিকতর দ্রুতগতিতে ঘুরতে লাগল। এমন অবিস্বাস্য গতির কথা আকাশচারীরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। এখন তার গতিবেগ ঘণ্টায় বাইশ নট।

রেলগাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ষট্টি থেকে আশি মাইল। এবং জার্সিসিটির লোকোমোটিভ ঘণ্টায় চুরাশি মাইল পর্যন্ত ছুটেতে পারে। ট্রেনটন-এর গতিবেগও এরই সমান। আর আইসবোর্ট ছুটেতে পারে ঘণ্টায় আশি মাইল বেগে।

বাস্তবিকই রোবারের অহঙ্কার করা অসঙ্গত নয়।

৬০০ মাইল বেগে ছুটে অ্যালবের্টস আটদিনেরও কম সময়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার ক্ষমতা রাখে, যে-সে ব্যাপার নয়।

রোবারের সহযোগী মেট টম টার্নার পৃথিবীবাসীকে ট্রান্স্পেট শুনিয়ে আনন্দদান করছে। রোবারের কীর্তিও কম নয়। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মনুমেন্টগুলোর শীর্ষে পতাকা উড়িয়েছেন।

রোবার এতদিন সবার অলঙ্ঘ্য নিজেকে, নিজের সৃষ্ট অ্যালবের্টসকে রেখেছেন। দিনে মেঘের আড়ালে চলেছেন, রাতে আলো না জ্বালিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছেন। কিন্তু এখন তো আর এর দরকার নেই। কারণ, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের বেলুনবাজদের সঙ্গে-বাজিধরা আর সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে টেকা দেয়ার চেষ্টায় ব্রতী হওয়া একই কথা।

রোবার এবার আঙ্কল ফ্রেডেন্ট এবং ফিল ইভালের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমি বাতাসে ভর দিতে দাঁড়াতে চেয়েছিলাম, পেরেছি কি না নিজের চোখের সামনেই তো আপনারা দেখলেন। আর এও স্বীকার করতে দ্বিধা থাকার কথা নয় যে, বাতাসের চেয়ে হাল্কা বস্তুর পক্ষে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়, কী বলেন?'

এবার দেখুন, অ্যালবের্টস বেলুনের মতো সোজা ওপরে উঠে আপনারদের নতুন করে চমক লাগিয়ে দিচ্ছে।

রোবারের কথা শেষ হতে না হতেই অ্যালবের্টস বিকট আওয়াজ করে সোজা ওপরের দিকে উঠতে লাগল। চোখের পলকেই যেন সেটা ৮,৭০০ ফুট ওপরে উঠে গেল। ব্যারোমিটারের পারদ ৪৮০ মিলিমিটার নেমে গেল।

রোবার বেশিক্ষণ এত ওপরে থাকার ঝুঁকি নিতে উৎসাহী হলেন না। কারণ বেশি ওপরে অক্সিজেনের অভাব।

অ্যালবের্টস নিচে নেমে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাকুনি ধেয়ে চলল।

কয়েকবার টোক গিলে একটু শক্তি সংরক্ষণ করে বেশ একটু রাগত্বরেই আঙ্কল ফ্রেডেন্ট বললেন, 'ইঞ্জিনিয়ার রোবার আপনি কোন বিশেষ তত্ত্বের প্রতি আশ্রয়ী তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। তবে কোন অধিকারে আপনি আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিলেন? কোনো অধিকারেই বা আমাদের এখানে কয়েদ করে রেখেছেন, জানতে পারি কি?'

'আপনারাই বা কোন অধিকারে আপনারদের ক্লাবের হলঘরে সবাই মিলে আমাকে আক্রমণ করেছিলেন, দয়া করে বলবেন কি?'

ফিল ইভাল এবার মুখ খুললেন, 'আমরা আপনার কাছ থেকে আমাদের প্রশ্নের জবাব চেয়েছি। পাস্টা প্রশ্ন অবশ্যই নয়! কোন অধিকারে আপনি আমাদের ওপর একের পর এক জুলুম চালাচ্ছেন, জবাব দিন?'

'জবাব? জবাব চাচ্ছেন? আমি যদি বলি বলপূর্বক, তবে?'

'বল? এ তো রীতিমতো মানববিদ্বেষের ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, এরকম মনে করলেও আপনারদের অনুমানকে নিছক ভ্রান্ত বলে উড়িয়ে দিতে পারব না সম্পাদক সাহেব।'

অস্তিরচিণ্ড আঙ্কল ফ্রেডেন্ট বলে উঠলেন, 'আপনার বল দেখছি জুলুমের ব্যাপার! আপনার অধিকারটা আর কতক্ষণ আমাদের ওপর চালাবেন, দয়া করে বলবেন কি?'

তার কথাটা শেষ হতে না হতেই অকস্মাৎ বুক কাঁপানো গর্জন শোনা গেল। আচমকা প্রবল ঝড় উঠলে যেমন তীব্র গর্জন হতে থাকে ঠিক তেমনি একটা শব্দ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার জোগাড় করল। পায়ের তলায় শুধুই জল আর জল। এ জলের যেন কুলকিনারা নেই।

জলপ্রপাত। জলপ্রপাতের ওপরে তিন মাইল লম্বা সেতু। তার ওপর দিয়ে সরীসৃপের মতো রেলগাড়ি চলেছে কানাডা থেকে আমেরিকার তীরে।

ফিল ইভাল উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'ওই ন্যেগ্রা!—ন্যেগ্রা জলপ্রপাত!'

দানবাকৃতি আকাশযানটা উদ্ধার বেগে বাতাস কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট ও ফিল ইভালের মনে একই ভাবনা বারবার উঁকি দিচ্ছে, 'রোবারের প্রকৃত ইচ্ছাটা কী? তাদের দিয়ে কী করতে চাচ্ছেন?'

১৪ জুন। অ্যালবের্টস আকাশচুম্বী পাহাড়ের ওপর দিয়ে ধেয়ে চলেছে। এবার আকাশযানটা বিশালায়তন একটা সরোবরের দক্ষিণ তীরে অতিক্রম করল।

রাতের অন্ধকারে হিরি পেরিয়ে এবার লেকমিটিগান ডিভিজে শিকাগো শহরের ওপরে হাজির হয়েছে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙ্কল ফ্রেডেন্ট বললেন, 'মি. ইভাল, ওটা যদি শিকাগো শহরই হয়ে থাকে তবে আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের এমন এক জায়গায় টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে আমরা সহজে সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারি।'

কিন্তু আর্চার ব্যাপার! দীর্ঘসময় রোবারের দেখা নেই। কোথায় তিনি? কাজে ব্যস্ত, নাকি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন?

অ্যালবেট্রস ছুটেছে তো ছুটেছেই। প্রতি সত্তর মিটার ওপরে উঠলে তাপমাত্রা একডিম্বি করে কমতে থাকে। প্রায় দু-ঘণ্টার মধ্যেই অ্যালবেট্রস ওহামার ওপর দিয়ে উষ্কার বেগে উড়ে গেল। পেসিফিক রেলপথের সদর কার্যালয় ওহামা। সাড়ে চার হাজার মাইল রেলপথ নিইউয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত বিস্তৃত। অদ্ভুতদর্শন আকাশযান অ্যালবেট্রসকে দেখে ওহামাবাসীরা তাজব বনে গেল। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কত জল্পনা কল্পনাই করল।

বাস, আর কথা নয়। আমেরিকার খবরের কাগজওয়ালারা উঠে পড়ে লেগে গেল। এতদিন তাদের কাছে অ্যালবেট্রস ছিল প্রহেলিকামাত্র। আজ চোখের সামনে তাকে দেখতে পেয়ে কৌতূহলের অবসান ঘটে গেল। তাঁরা ব্যাপারটাকে ফলাও করে খবরের কাগজের পাতায় ছাপাল।

প্যারিস রেলপথ চোখের সামনে ভেসে ওঠামাত্র আঙ্কল ফ্রেডেট আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। তাঁর মাথায় খুন চাপার জোগাড় হল। তিনি রাগে ফাঁস ফাঁস করতে করতে ফিল ইভালকে বললেন, 'শয়তান রোবারের স্পর্ধা তো কম নয় দেখছি। আমাদের কয়েদ করে কোন মূল্যকে নিয়ে চলেছেন! অ্যালবেট্রস যে একেবারে বিপরীত মুখে ছুটে চলেছে!'

ফিল ইভালও বেশ রাগতস্বরেই বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দামই তিনি দিচ্ছেন না!'

বিকাল পাঁচটা। ব্ল্যাকমন্ডস্টেনের ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রস দ্রুতগতিতে ছুটে চলল।

রাত্রিটা নির্বিঘ্নেই কেটে গেল।

অ্যালবেট্রস এবার পুরো আড়াই ঘণ্টা উড়ে রকি পর্বতমালা অতিক্রম করল। এখন ঘণ্টায় বাষট্টি মাইল বেগে আকাশযানটা সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বরাবর চলেছে।

আমাদের পায়ের তলায় তীব্রগতিতে একটা ট্রেনকে ছুটে যেতে দেখলাম। অ্যালবেট্রস এবার বিচিত্র এক খেয়ালে মেতে গেল।

নিচে নেমে গিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

ট্রেনের যাত্রীরা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে কৌতূহলমিশ্রিত যে-সব কথাবার্তা বলছে তাও অ্যালবেট্রস থেকে শানা যেতে লাগল।

বেলুনবাজার এমন অপূর্ব একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ। তারা গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'আমি ফিলাডেলফিয়ার আঙ্কল ফ্রেডেট!'

'আমিফিল ইভাল ফিল ইভাল!'

কিছু ব্যর্থপ্রয়াস। গলা ফাটানো চেষ্টামেচিই সার হল। ট্রেন যাত্রীদের উল্লাসে তাঁদের কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

মুহূর্তকাল পরেই অ্যালবেট্রস গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। এবার শূন্যোপাকার মতো অগ্রসরমান ট্রেনটা ক্রমেই দূরে সরে গিয়ে একসময় নজরের বাইরে চলে গেল।

এবার আমরা মনোরম রাজধানী সল্টলেক সিটির ওপর দিয়ে উড়ে গেলাম। আমাদের যা সবচেয়ে বেশি বিষয় উৎপাদন করল তা হল অবতল কাচের তৈরি গয়জযুক্ত ট্যাবপুনাকানের ছাদ।

অ্যালবেট্রস এবার ১৮০ মাইল রেললাইন পেরিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী সানফ্রান্সিসকোর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

এবার অক্সাং রোবারের আবির্ভাব ঘটল। তাঁকে দেখেই আঙ্কল ফ্রেডেট উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'ইঞ্জিনিয়ার! এ কী রসিকতায় মেতেছেন, বলুন তো! এবার আপনার রসিকতা ক্ষান্ত দিলে হয় না?'

রোবার কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে বললেন, 'দেখুন জনাব রসিকতার ধার আমি ধারি না। যখন যা করছি মুখ বুজে দেখাই আপনাদের একমাত্র কাজ বলে আমি মনে করি।' কথাটা আঙ্কল ফ্রেডেট ও ফিল ইভালের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দিয়ে গটগট করে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অ্যালবেট্রস দ্রুত নিচে নামতে শুরু করল। একসময় সেটা সামান্য দূলে ভূমি স্পর্শ করল। রোবার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থাস্বরূপ অতিথিদের কামরাবন্দি করে রাখলেন। শত চেষ্টা করেও যাতে তাঁরা উড়েজাহাজটা থেকে বাইরে বেরোতে বা চম্পট দিতে না পারে।

আঙ্কল ফ্রেডেট ও ফিল ইভাল ভেতরে ভেতরে গজরাতে লাগলেন। তাঁদের একটাই চিন্তা, যে-কোনো উপায়েই এ মরণফাঁদ থেকে পালাতেই হবে।

অ্যালবেট্রস এবার উত্তর মহাসাগরের ওপর দিকে ছুটতে লাগল। বিচিত্র আবার রাত্রিহীন অঞ্চল। দিন এখানে দীঘস্থায়ী। প্রকৃতির বিচিত্র সব খেয়াল মানুষের বোধগম্যের বাইরে।

রোবার ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ এঁকে আপনমনে চুরুট টেনে চলেছেন। বেলুনবাজার কামরাবন্দি অবস্থাতেই প্রহর গুণে চলেছেন।

রোবারের নির্দেশে অ্যালবেট্রসের অধিকাংশ প্রপেলার বন্ধ করে দেয়া হল। ফলে আকাশযানটার গতি অনেকাংশে মধুর হয়ে এল।

অ্যালবেট্রস এবার ধীরগতি যানোর মতো প্রায় ধুকতে ধুকতে সমুদ্রের ওপর দিয়ে এগোতে লাগল।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সমুদ্র দানবদের মতো অতিকায় তিমিরা দলে দলে নাক উঁচিয়ে জলের ওপর অলসভাবে ভেসে বেড়াতে লাগল। অ্যালবেট্রসে তিমি শিকারের হারপুন ও বর্শা সবই রয়েছে।

রোবার যদিও অহেতুক প্রাণী নিধনের পক্ষপাতী নন, তবুও অ্যালবেট্রসে ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে হারপুনবিদ্ধ করে তিমি মারার ছুকুম জারি করলেন।

তিমির নাকের সুবিশাল ছিদ্র পথে ফোয়ার মতো তীব্র বেগে জল ওপরে উঠে যেতে লাগল।

অ্যালব্রেটস থেকে ছুড়ে দেয়া দড়ির প্রান্তে বেঁধে দেওয়া হকের সঙ্গে একটা তিমি আশ্চর্যকমভাবে গাঁথে গেল। এবার আরো মজার ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। তিমিটা ছুটোছুটি দাপাদপি শুরু করে দিল। অ্যালব্রেটসও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেড়াতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অবিস্থাস্য এককাণ্ড ঘটে গেল। ক্রান্ত পরিশ্রান্ত তিমিটা ঝট করে উল্টে একেবারে কাছাকাছি চলে গেল। পরমহুঁর্তেই দানবটা জলে ডুব দিল। আধঘণ্টায় ছয় মাইল বেগে ছুটে চলল। অ্যালব্রেটসও তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে লাগল। সে এক রোমহর্ষক ব্যাপার!

একসময় পরিশ্রান্ত তিমিটা এলিয়ে পড়ল। রোবার এবার দড়িটাকে গোটাবার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় নিস্তেজ তিমিটা অ্যালব্রেটসের কাছাকাছি, প্রায় পঁচিশ ফুট তলায় চলে এল। এবার আচমকা তিমিটা ডিগবাজি খাওয়ায় অ্যালব্রেটসে অস্বাভাবিকরকম ঝাঁকুনি খেল। বাধ্য হয়ে দড়িটাকে কেটে দেয়া হল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেলে অ্যালব্রেটস এক ধাক্কায় অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। মৃত তিমিটা ডেউয়ের তালে তালে নাচতে লাগল।

১৭ জুন। অ্যালব্রেটস এবার অ্যালুইসিয়ান ও আলাস্কা তীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল। এখানে আমেরিকানরা সিলমাছের কারবার ফেঁদেছে। ছয় সাত ফুট সিলের চামড়া তিন চারশো পাউন্ড দামে বিক্রি হয়।

আকাশযান অ্যালব্রেটস একনাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা ছুটে ১২০০ মাইল পথ পাড়ি দিল। এবার কামচাটকা উপদ্বীপের ওপর দিয়ে ধেয়ে চলল।

রোবারের অতিথি বেলুনবাজরা ভাবলেন, রোবার বুধি চীন ও জাপানের পথে চলেছেন।

১৮ জানুয়ারি আকাশযানটা অ্যালব্রেটস কামচাটকা উপদ্বীপ পেরিয়ে রুটসু আল্গেগিরির দিকে ধেয়ে চলল।

১৯ তারিখ আকাশযান উত্তর ও দক্ষিণ জাপানের মধ্যবর্তী উপত্যকা অতিক্রম করে চলল। এবার সাইবেরিয়ার আমুর নদী আকাশচাটরী বেলুনবাজদের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

এবার অ্যালব্রেটস এক মহাসমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৩০০ ফুট ঘনকুয়াশার স্তরের মধ্যে হাজির হয়েছে। বহু চেষ্টা চরিত্রের পর কোনোরকমে কুয়াশার স্তরটা অতিক্রম করতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ঝলমলে রোদের কিরণ।

বেলুনবাজগণ যাও পালাবার ক্ষীণ আশা পোষণ করছিলেন এখন তা মন থেকে নিঃশেষে মুছে না ফেলার উপায় দেখলেন না।

রোবার বিদ্রূপাত্মক স্বরেই উচ্চারণ করলেন, 'মি. ফ্রেডেট, কী বুঝলেন? দেখলেন তো, আমার পক্ষীরাজ অ্যালব্রেটস কেমন কুয়াশার ঘন আন্তরণকে তছনছ করে অনায়াসে উপরে উঠে এল? এর গতিরোধ করার ক্ষমতা কার আছে, বলুন?'

রোবার বিদ্রূপাত্মক মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বিদায় নিতেই ফিল ইভাল দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন, 'ইতচ্ছাড়াটার দন্ত আক্ষালন অসম্ভব। তাঁর সবকিছুর মধ্যেই বেপরোয়াভাবে প্রকাশ পায়।'

আঙ্কল ফ্রেডেটও ফাঁস করে উঠেন, 'পরিস্থিতি শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় দেখাই যাক না মি. ইভাল।'

আরো কিছু দূর এগোতেই আচমকা উৎকট একটা গন্ধ নাকে এল। নাড়িভুড়ি—অনুগ্রাহনের ভাত পর্যন্ত ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে রে বাবা!

উৎকট গন্ধটাই শহরটার নাম স্মরণ করিয়ে দেয়, টোকিও জাপানের রাজধানী।

রোবার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আপনমনে চুরুট টেনে চলেছেন। একসময় ঠোট থেকে চুরুটটা নামিয়ে, বিতৃষ্ণায় চোখ মুখ বিকৃত করে আচমকা বলে উঠলেন, 'আরে বাবা, ব্যাপারটাকে চেপে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে কী-ই বা লাভ, মাথায় আসছে না।'

বিশালায়তন আকাশযান অ্যালব্রেটস এবার সোজা পূর্বমুখী ধেয়ে চলল।

আকাশচাটরীরা হঠাৎ প্রমাদ গুললেন। ঝড়, প্রলয়ঙ্কর ঝড় আসছে। ঘূর্ণিঝড়, টাইফুন। পৃথিবীটাকে যেন চোখের পলকে দলে, মুচড়ে পিষে একাকার করে ছাড়বে।

ব্যারোমিটারের পাদর চৌ চৌ করে নিচের দিকে নামতে শুরু করল।

ভাণ্ডার জোর ভালো। টাইফুন সোজা দক্ষিণ দিকে হামলা হুজুতি চালাবার জন্য ধেয়ে চলল। তবে হ্যাঁ, টাইফুন আকাশচাটরীদের স্বায়ুর ওপর কিছু সময়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তার পরিবর্তে কিছু সুবিধা অবশ্যই দিয়ে গেল। কুয়াশার স্তরটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে আকাশকে নির্মল, একেবারে স্বচ্ছ করে দিয়ে গেল।

বাইশ চব্বিশ তারিখ পর্যন্ত তিনদিনে অ্যালব্রেটস এক-এক করে পিছো উপত্যকা ও পিটিলি উপসাগর অতিক্রম করে দুর্বীর গতিতে সিলসটিয়াল এম্পায়ারের দিকে এগিয়ে চলল।

মাঙ্গু নগরের কেন্দ্রস্থলে আঠারো শো একর অর্থাৎ তিন মাইল এলাকা জুড়ে পীত শহরটা আকাশচাটরীদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

আকাশ জুড়ে কয়েক শো ঘুড়ি উড়তে দেখা গেল। তালপাতার ঘুড়ি। প্রত্যেকের মাথায় একটা করে মিহি কক্ষি দিয়ে ঘুড়ি বাঁধা। ঘুড়ি যত ওপরে উঠছে ধনুকগুলো ততই বাঁশির মতো বিচিত্র সুর সৃষ্টি করে চলেছে। ব্যাপারটা এমন মনে হল, ঘুড়িগুলো যেন নির্মল অস্ত্রিজন সেবন করে মনের সুখে গলা ছেড়ে গান গাইছে।

রোবারের মাথায় হঠাৎ কী যেন এক কৌতূহল চাপল। অ্যালব্রেটসকে সোজা নিচের দিকে নামিয়ে ঘুড়িগুলোর কাছাকাছি এনে স্থির রাখলেন।

ব্যস, আর দেখতে হল না। শহরবাসীরা হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে যাওয়ার জোগাড় হল। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার

বন্দুকের নল উর্ধ্বমুখী হয়ে দমাদম গুলি ছুড়তে মেতে গেল। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আকাশযানটাকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যই তাদের এত তোড়জোড়।

ব্যাপারটা এবার চৈনিক জ্যোতির্বিদগণের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এতদিনে রহস্যসৃষ্টিকারী সশরীরে হাজির হয়েছে। এতদিন তবে এ হতচ্ছাড়াটাই পৃথিবীবাসীগণকে ধোঁকা দিচ্ছিল। আর এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত বিশ্বয়! জনসাধারণের দোষই বা কী? বাঘা বাঘা রাজকর্মচারীরা পর্যন্ত ফ্যাকাশে মুখে ভেবেছেন, আকাশপথে এক অলুক্ষণে উপদেবতার আবির্ভাব ঘটছে। কী সর্বনেশে কাণ্ডের বাবা। ঈশ্বর বুদ্ধের দেশে এ কী অপদেবতার নিরবস্থিতি তাওব শুরু হয়েছে। চারদিকে মারমার রব উঠল, 'বন্দুকের গুলি ছোড়ো! কামান নাগো! শিগগিরই আপদটাকে দেশের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দাও !!'

নিচে অবস্থানরত মানুষগুলোর কাণ্ডকারখানা নিয়ে আকাশচারীরা মোটেই ভাবিত নন। তাঁরা কৌতূহলবশত অ্যালবেট্রসকে বারবার নামা ওঠা করিয়ে, গাঁত্তা মারিয়ে ঘূড়িগুলোর সূতো কাটার কাজে মেতে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ ঘূড়ি মুক্ত হল। তাদের বাজনা গেল থেমে। এবার ট্র্যাপ্পেস্ট বাজনায় আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিকট আওয়াজ তুলে কামানের একটা গোলা উর্ধ্বাকাশের দিকে উঠে গেল। রোবার আর বিপদের ঝুঁকি নিতে নারাজ। আচমকা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার সাধের অ্যালবেট্রসকে সোজা ওপরে, অনেক ওপরে তুলে নিল।

অ্যালবেট্রস ক্রমেই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ধেয়ে চলল। বেলুনবাজদের বুঝতে অসুবিধা হল না, রোবার এবার ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

অ্যালবেট্রস উদ্ধার বেগে পিকিং শহরকে অতিক্রম করে চীনের ইতিহাস বিজড়িত প্রাচীরটাকে ডিঙিয়ে তিব্বতের সীমান্তে হাজির হল। চারদিকে শুভ্র সমুজ্জ্বল পাহাড়ের চূড়া ও তিব্বতের সমভূমি বেলুনবাজগণের চোখ ও মনকে ভুগু করল।

ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের দিকে চোখ পড়তেই বোঝা গেল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তেরো হাজার ফুট ওপরে দিয়ে অ্যালবেট্রস ধেয়ে চলেছে। তাপমাত্রা ক্রমেই নামতে লাগল। আর একটু নামলেই জল জমে বরফ হয়ে যাবে।

শীত একেবারে হাড়ে গিয়ে আঘাত হানছে। বেগতিক দেখে বেলুনবাজগণ ব্যস্তপায়ে কেবিনে ঢুকে গেলেন।

এ অঞ্চলে বাতাসের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ফলে প্রপেলারগুলোর ঘূর্ণনগতি অস্বাভাবিকরকম বাড়িয়ে দিতেই ফল।

২৬ জুন। আকাশচুম্বী একটা বাধার প্রাচীর বেলুনবাজগণের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সফেন দুধের মতো সাদা বরফে ঢাকা পর্বতচূড়া, এভারেস্ট তাঁদের চোখ ও মনের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল।

২৮ জুন অ্যালবেট্রস জাঙ প্রদেশের মাধ্যম হাজির হল। একদিকে নেপালের সারিবদ্ধ পাহাড়ের চূড়া আর অন্যদিকে ভারতবর্ষের প্রবেশপথ। দুটো পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথ ব্যবহার করে অ্যালবেট্রস বাতাস কেটে কেটে অগ্রসর হচ্ছে।

আঙ্কল প্রুডেন্ট বিম্বিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন, দুশো বা বেশিসংখ্যক পর্বত যেন কাঁধ ধরাধরি করে সদৃশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে সতেরটা চূড়া একেবারে আকাশছোঁয়া, উচ্চতা পঁচিশ হাজারেরও বেশি ছাড়া কম নয়। আর মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা উনত্রিশ হাজারেরও বেশি। তারই ডানদিকে সদৃশে আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ধবধবে সাধা ধবলগিরি। উচ্চতার বিচারে এভারেস্টের পরেই এর স্থান—ছাব্বিশ হাজার আট শো ফুট।

রোবার কিন্তু মোটেই অপরিণামদর্শী খামখেয়ালি প্রকৃতির নন। পর্বতগুলো ডিঙেবার পথেও গেলেন না। তিনি অ্যালবেট্রসকে বাইশ হাজার ফুট উঁচু ইবাগানিম গিরিপথ ধরে উড়িয়ে নিয়ে চললেন। এখন এর গতিবেগ অবিস্থাস্য। বাতাস কেটে কেটে তেইশ হাজার ফুট ওপরে দিয়ে রোবারের পঞ্জীরাজ উড়ে চলেছে।

একসময় রোবার এসে মুচকি হেসে বেলুনবাজগণের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। উচ্ছসিত আবেগের সঙ্গে বললেন, 'মাননীয় অতিথিগণ, এবার রূপসী ভারতবর্ষকে চাক্ষুষ করে চোখ ও মনকে ভুগু করুন।'

রোবারের কিন্তু রূপ সৌন্দর্যের আকর হিন্দুস্থানের প্রতি কোনো আকর্ষণই নেই। তাই যদি সত্য হয় তবে কি অহেতুকই আকাশচুম্বী হিমালয়কে ডিঙেবার ঝুঁকি নিতেন? নাকি তাঁর সৃষ্ট বাতাসের চেয়ে ভারী আকাশযান অ্যালবেট্রসের কৃতিত্ব প্রদর্শনই একমাত্র উদ্দেশ্য? তবে? তবে তার অক্লান্ত পরিশ্রম প্রয়াস মাঠে মারা যাচ্ছে না তো? কারণ, এত দিনের মধ্যে বেলুনবাজরা কিন্তু একটিবারের জন্যও মুখ ফুটে তার কৃতিত্ব, তাঁর আকাশযান অ্যালবেট্রসের প্রশংসা করলেন না। তবে হ্যাঁ, মনে মনে তাঁরা প্রশংসা করছেন কিনা তা অবশ্য রোবারের জানা নেই। করবেনই বা কী করে? যারা আকাশযানটা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য প্রতিনিয়ত ব্যস্ত তাঁদের মুখ থেকে তাঁর অনন্য কীর্তির প্রশংসা পাওয়া পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

অ্যালবেট্রস এবার পাঞ্জাবের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপরে দিয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রগতিতে এগিয়ে চলল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চীন ও তুর্কিস্থানের মধ্যবর্তী আকাশপথে সেটা ধেয়ে চলল।

২৯ জুন। বেলুনবাজগণ রূপসী তব্বী যুবতী ভূস্বর্ণ কাশ্মীরের রূপসৌন্দর্য দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হলেন। এ যেন পাহাড়ে ঢাকা, সবুজে মোড়া একটা স্বর্গোদ্যান।

এবার কলকল্লোলিনী হিড্যাসলেম নদীর ক্ষীণরেখা আকাশচারীদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। একসময় গ্রিকদেশ আর ভারতবর্ষ এ অববাহিকায় তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। দুর্ধর্ষ যুদ্ধোন্মাদ গ্রিকবীর আলেকজান্ডার আর স্বাধীনতাপূজারী দেশমাতৃকার সুযোগ্য সন্তান পুরুরাজ একসময় এখানেই সম্মুখসমরে লিপ্ত হয়েছিলেন।

ম্যাসিডোনিয়ারাজ যে দুটো বিজয়নগরী স্থাপন করেছিলেন আজ তারা নিশ্চিহ্ন। তারা আজ ইতিহাস।

সকাল আটটার কাছাকাছি অ্যালবেট্টস শ্রীনগরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলল।

বেলুনবাজগণ পালাবার ধাক্কায় যতই মশগুল হয়ে থাকুন না কেন, রূপসী কাশ্মীর যে তাঁদের চোখ ও মনকে মুগ্ধ করেছে এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। নইলে ফিল ইভান্স আবেগে উচ্চাঙ্গে অভিজ্ঞতায় কিছুতেই বলতে পারতেন না, 'শ্রীনগর আর ভেনিস যেন একই ছাঁচে গড়া! দুটো পৃথক স্থান হলেও উভয়ের মধ্যে মিল বাস্তবিকই অবিস্ফাস্য!'

এবার একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা বেলুনবাজগণের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

তারা লক্ষ করলেন, টম টার্নার ইয়া লম্বা একটা রবারের নলকে নিচের দিকে, একেবারে নদীর জল পর্যন্ত নামিয়ে দিয়েছে। তখন অবশ্য নদী আর অ্যালবেট্টসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র ফুট ত্রিশেক।

ব্যাপারটা এবার বেলুনবাজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বৈদ্যুতিক পাশ্প চালিয়ে নদী থেকে অ্যালবেট্টসে জল তোলা হচ্ছে।

আঙ্কল ফ্রেডেন্ট আর ফিল ইভান্সের মধ্যে আশার আলো উঁকি মারল। ত্রিশ ফুট উচ্চতা কোনো সমস্যাই নয়। কোনোরকমে ইষ্টনাম স্রবণ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলেই হল। ব্যস, চিরদিনের মতো কারামুক্তি।

মুক্তির চিন্তা বেলুনবাজদের অস্থির করে তুলল। অত্যাশ্চর্য আশা নিয়ে তারা তিনজনই রেলিঙের দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু হায়! মনের অদম্য আশাকে বাস্তব রূপ দেয়া কিছুতেই সম্ভব হল না। চোখ বন্ধ করে আঙ্কল ফ্রেডেন্ট যেই না জলে ঝাঁপ দিতে যাবেন অমনি পিছন দিক থেকে দুটো সুদৃঢ় হাত অতর্কিতে তাকে জাস্টে ধরে ফেলল।

কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রোবার এতক্ষণ ব্যাপারটা লক্ষ করছিলেন। এবার ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বিদ্যপাত্তক স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'মহামায়া অতিথিগণ, আপনারা কি জানতেন না আট জোড়া চোখ প্রতিনিয়ত আপনারদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে?'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে রোবার আবার একই স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'মি. ফ্রেডেন্ট, আমাকে 'আকাশরাজা' উপাধিটা কে দিয়েছে বলুন তো? আপনারা। হ্যাঁ, আপনারদেরই দেয়া এ উপাধিটা। শুনে রাখুন, যে একবার আকাশরাজার সঙ্গে ভ্রমণের সুযোগ পায় তাকে আমৃত্যু এখানে, এ আকাশযানেই কাটাতে হয়। ইচ্ছা করলেই কিন্তু এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।'

রোবারের কথায় আঙ্কল ফ্রেডেন্ট গুলিবিদ্ধ পশুর মতো গর্জে উঠতে চাইলেন। তাঁর পরিণাম চিন্তা করে ফিল ইভান্স তাঁকে জাস্টে ধরে ফেললেন। অনেক কায়দা কসরত করে তাঁকে সে মুহূর্তের জন্য অন্তত শান্ত করলেন।

জল সংগ্রহের কাজ মিটিয়ে অ্যালবেট্টস আবার সোজা ওপরে উঠে গেল। এবার তার গতি পশ্চিমমুখী।

ভূবর্ণ কাশ্মীরকে পিছনে ফেলে অ্যালবেট্টস এবার কামুলিস্তানকেও অতিক্রম করল।

ভারতবর্ষ অফুরন্ত সম্পদের আকর। তাই তো ক্ষমতা ও অর্থলোভী ইংরেজরা জবরদখল করে এখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

বাতাসবাহিত দূরগত কামানের বিকট আওয়াজ আকাশচারীদের কানে বাজতে লাগল। এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে রোবার মোটেই ভাবিত নন। তাঁর সময়ই বা কোথায়? সবচেয়ে বড় কথা, যার সঙ্গে তাঁর নিজের আত্মমর্যাদা বা মানবিকতার তিলমাত্র সম্পর্কও নেই, আর আকাশকেই যিনি চিরদিনের মতো একমাত্র অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি মর্তের ভালো মন্দ নিয়ে ভেবে শরীর ও মন খারাপ করতে যাবেনই বা কেন? অতএব কোন্ দেশ ইংরেজদের পদানত বা রাশিয়ার কৃষ্ণিগত হলে তাতে তার কী-ই বা থাকতে পারে?

চোখের পলকে বালির ঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রবল ঝড়। শুধুই বালি আর বালি প্রকৃতির বুকে তুলকালাম কাও বাঁধিয়ে দিল। স্থানীয় অধিবাসীরা একে 'তেবাদ' বলে।

অকস্মাৎ উদ্ভূত সমস্যাটা নিয়ে অ্যালবেট্টসের কর্তা রোবারও কম ভাবিত নন। বালির অত্যাচারের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তিনি অ্যালবেট্টসকে বিপদসীমার ওপরে তুলে নিয়ে গেলেন।

অ্যালবেট্টস এবার দুহাজার ফুট ওপর দিয়ে দুর্বীর গতিতে উড়ে যেতে লাগল।

এবার আকাশযানের গতিবেগ অনেকাংশে কমিয়ে নেয়া হল। এবার এটা পারস্যসীমানা ডিঙিয়ে গেল। ২২,০০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট এলবুর্জ পর্বতের চূড়া ও তার পাদভূমি অতিক্রম করে অ্যালবেট্টস এগিয়ে চলল।

২ জুলাই। আকাশচারীরা এবার পায়ের তলার সুবিশাল ও ইতিহাস বিজড়িত শাহ প্রাসাদটা চাক্ষুষ করে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করল।

আকাশযান অ্যালবেট্টসের মুখ এখন উত্তর দিকে। আকাশচারীরা এবার পারস্য সীমান্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে দ্বিধা বিভক্তকারী কাস্পিয়ান সাগরের অফুরন্ত সৌন্দর্য্যরাসিক নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন।

রোবারের মতিগতি আদৌ সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না তো। চোখের পলকে ঘুড়ির মত গোল্ডা মেরে একেবারে সমুদ্রজলের কাছাকাছি নেমে এল। পর মুহূর্তেই সন্ধ্যার আলো-আঁধারীর মধ্য দিয়ে উপকূলবর্তী অঞ্চল দিয়ে উড়ে চলল। পায়ের তলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা এতদিন তুর্কিস্তানের কজায় ছিল। সম্প্রতি এটা রাশিয়ার দখলে।

সেটা ছিল ৩ জুলাই। সেদিন আকাশযান অ্যালবেট্টস কাস্পিয়ান সাগরের প্রায় ৩০০ ফুট ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। এটা ২০০ মাইল দীর্ঘ এবং ২০০ মাইল প্রশস্ত।

এবার কারামুক্তির জন্য ফিল ইভান্স হেনো হয়ে লেগে গেলেন। তিনি পা টিপে টিপে আঙ্কল ফ্রেডেন্টের কাছে হাজির হলেন। সাধ্যমত গলা নামিয়ে তিনি বললেন, 'মি. ফ্রেডেন্ট রোবারের আন্তরিক ইচ্ছার কথা তো আর আমার অজানা নয়। আমৃত্যু আকাশযানেই আমাদের বন্দি করে রাখবেন। যাকে বলা চলে নিষ্ঠুর নির্বাসন দণ্ড। তাই বুঝতেই পারছেন,

আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়। তাই বলছি, এখান থেকে মুক্তির উপায় আমাদের কর্তেই হবে। আর এখনই আমাদের তৎপর হতে হবে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঙ্কল ফ্রুডেন্ট বললেন, 'মি. ইভাল, আমিও যে তার মনোভাবের কথা বুঝতে পারছি না তা নয়। কিন্তু দীর্ঘ পর্যালোচনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হয়েছে, আমাদের মুক্তি নিভান্তই তাঁর ব্যাপার। আর পরিস্থিতি বলছে, রোবার কাশ্পিয়ান সাগর ডিঙিয়ে উত্তর রাশিয়ার ভেতর দিয়ে নয়তো দক্ষিণ দেশ ডিঙিয়ে ইউরোপ মহাদেশে হাজির হবেন। আমাদের যদি পালাতেই হয় তবে অ্যালব্রেটস আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে হাজির হওয়ার আগেই পরিকল্পনাটাকে বাস্তব রূপ দিতে হবে। ডেকে দড়ি পাঁজা করে রাখা দেখছি। আমরা দড়ি ধরে ঝুলে নিচে নেবে যাব, পরিকল্পনাটা গ্রহণযোগ্য তো, কী বলেন?'

'চমৎকার পরিকল্পনা? কিন্তু রাতের অন্ধকারেও আমাদের ওপরে নজরদারি করার জন্য একজন গাট্টাগোষ্ঠী লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে, জানেন অবশ্যই?'

'জানি। কার্যোদ্ধার করতে গেলে একটু-আধটু ঝুঁকি তো নিজেই হবে।'

এদিকে নিশ্চো সন্তান ফ্রাইকোলিন মুক্তির জন্য বন্ধপাগল হয়ে গেছে। সে মনিব আঙ্কল ফ্রুডেন্টের পায়ের কাছে পড়ে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছে। আকাশযান থেকে যে-কোনো মূল্যে মুক্তি পেয়ে মাটির ছোঁয়া পাওয়ার জন্য সে প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়েছে।

ফ্রাইকোলিনের ব্যাপার স্যাপার রোবারের নজর এড়াল না। তিনি ক্ষেপে গিয়ে যে পস্থা অবলম্বন করলেন তাতে কেবল নিশ্চো সন্তান ফ্রাইকোলিনই নয়, তার মনিব আঙ্কল ফ্রুডেন্ট, পিল ইভাল পযন্ত কেউ-ই খুশি হতে পারলেন না। তাকে ছোট্ট একটা কামরায় ঢুকিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।

এবার অ্যালব্রেটস উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। রোবারের নির্দেশে এটাকে জল থেকে মাত্র বিশ ফুট উপরে রাখা হল। সমুদ্রের বুকে কয়েকটা জাহাজ ধীরমধুর গতিতে গন্তব্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপরে এমন একটা কিছুতকিমারকার, একবারে অত্যাশ্চর্য সামগ্রীকে উড়ে যেতে দেখে জাহাজের নাবিকদের আশ্চর্যমুখের ঝাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। ক্যাপ্টেন দ্রুতগতিতে জাহাজ ছুটিয়ে দিলেন। বলা তো যায় না, দানবাকৃতি বস্তুটা কোনো অসং উদ্দেশ্য নিয়ে মাথার ওপরে রহস্যজনকভাবে চক্রের মেরে বেড়াচ্ছে।

অ্যালব্রেটসকে নিচে নামানোর আগেই রোবার তার সহকর্মীদের ওপর কড়া নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, কয়েদিদের ওপর যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

আর একটা অপূর্ব সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় আঙ্কল ফ্রুডেন্ট ও ফিল ইভাল রাগে-দুঃখে নিজেদের চুল নিজেরাই ছিঁড়তে লাগলেন। আর নিশ্চো সন্তান ফ্রাইকোলিন তো মাটিতে পড়ে বাক চাপড়াতে লাগল।

ভূতবৃত্তিগণের মতে আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের ফলে কাশ্পিয়ান সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। আর ভল্গা, উড়াল, কৌর এবং কৌমার প্রাকৃতিক জলরাশি এর সঙ্গে মিলিত হয়ে নিজ নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে বসেছে। দক্ষিণ দিকের প্রস্রবণের প্রচুর পরিমাণ জলরাশি এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে জলের স্বাদ খুব তেতো।

অ্যালব্রেটস আবার গতিবেগ বাড়িয়ে সোজা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল।

ক্রোধোন্মত্ত নিশ্চো সন্তান ফ্রাইকোলিন তালাবদ্ধ ছোট্ট কামরাতার মেঝেতে পড়ে রীতিমতো দাপাদপি করতে লাগল। আর আবোধ্য ভাষায় রোবারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

ফ্রাইকোলিনের চিৎকার চোঁচামেচি ও লাফলাফি দাপাদাপিতে রোবারের মত ঠাণ্ডামাথার মানুষেরও ধৈর্যমু্যতি ঘটার জোগাড় হল। তিনি আর তিষ্ঠাতে না পেরে বিরক্তির বলে উঠলেন, হতচ্ছাড়াটাকে কয়েদ করেও তো দেখছি মহা ফাঁপড়ে পড়া গেল।

রোবার এবার গুলিখাওয়া বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, 'দাও, ঝুলিয়ে দাও!'

ব্যাস, তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই টম টার্নার রাগে গজগজ করতে করতে দরজা খুলে ফ্রাইকোলিনকে জন্তু জানোয়ারের মতো টেনে হিচড়ে কামরটার বাইরে নিয়ে এল। বড় একটা গামলাল তাকে বসিয়ে দেয়া হল। এবার দড়ি দিয়ে বেঁধে গামলাসমেত তাকে একশো ফুট নিচে নামিয়ে দিল। ঘন্টা ঘন্টা মাইল বেগে অ্যালব্রেটস উড়ে চলেছে আর গামলাটা স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী পিছনের দিকে হেলে ঝুলতে লাগল।

মৃত্যুভয়ে ভীত, ফ্রাইকোলিন যে এ-অবস্থায় হার্টফেল করে নি এটাই আশ্চর্য ব্যাপার।

জখমি বিষধর সাপের মত আঙ্কল ফ্রুডেন্ট গর্জে উঠলেন, 'রোবার, আপনার এ বর্বরোচিত কাজের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব। এ কী পাশবিক অত্যাচার শুরু করেছেন আপনি! সুযোগ পেলে আমি এর প্রতিশোধ...'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চৌঁটের কোণে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে রোবার তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'তাই বুঝি? প্রতিশোধ? আপনি যখন খুশি প্রতিশোধ নিতে পারেন, আমি প্রস্তুত।'

ফিল ইভাল অনেক ভুঝিয়ে শুনিয়ে তাঁকে শান্ত করলেন।

রোবার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উদ্ভা প্রকাশ করে বলে উঠলেন, 'মি. ফ্রুডেন্ট, আপনার ঔদ্ধত্যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমার শেষ কথা শুনে রাখুন, যদি বেশি হজ্জতি পাকানোর চেষ্টা করেন তবে আপনার চাকরের সঙ্গে আপনাকেও ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হব।'

আঙ্কল ফ্রুডেন্ট রাগে কাঁপতে কাঁপতে কী যেন বলার চেষ্টা করলেন। মুখ খোলার সুযোগ না দিয়েই ফিল ইভাল তাকে জাপটে ধরে কেবিনে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

অকস্মাৎ বায়ুমণ্ডল থমথমে হয়ে গেল। ইথারে চাপা অস্থিরতা লক্ষিত হতে লাগল। আকাশচাঙ্গীরগণের বুঝতে দেরি হল না, নির্ঘাত ঝড়ের সঙ্কেত।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুতের অকল্পনীয় খেলা শুরু হয়ে গেল। একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এমন অদ্ভুত দৃশ্য ইতিপূর্বে আর কেউ প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায় নি। রহস্যময় অত্যাশ্চর্য এক বাষ্প কুণ্ডলী পাকিয়ে কুমোরের চাকার মতো চক্রর খেতে খেতে মহাশূন্যের দিকে উঠে গেল। আকাশে ঘন মেঘে ঘর্ষণজনিত কারণে ইলেকট্রিক চার্জ হচ্ছে। উদ্ভূত অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ধেয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেন আকাশের গায়ে আলোর প্রদর্শনী চলছে।

আকাশযান অ্যালব্রেটসকে এবার প্রবল ঝড়ের মুখোমুখি হতে হল। রোবার থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিল। সবাই যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এদিকে ঝড়ের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সমুদ্রও উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করেছে। যেন প্রচণ্ড আক্রোশে অনবরত ফুঁসে চলেছে।

অদৃষ্টবিড়ম্বিত ফ্রাইকোলিন প্রাকৃতিক তাগবের মধ্যে গামলাটায় বসে দড়ি দোলনায় ঝুলছে। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতির মধ্যে বেচারাকে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাতে হচ্ছে, ভাবলে গণ্ডি দিয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগাড়।

হায়! এ কী সর্বনাশা কাণ্ড! ডেকে আশুন লেগে গেছে! বাতাস পেয়ে আশুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বেচারী ফ্রাইকোলিনের অবস্থা অনুমান করে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে রোবারের কেবিনে ছুটে গেলেন। ফ্রাইকোলিনকে ওপরে তুলে আনার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঁচ পেয়েই রোবার তাঁর কর্মচারীদের আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। তারা দ্রুত দড়ি গুটিয়ে মৃতপ্রায় ফ্রাইকোলিনকে ওপরে তুলে নিল।

হায়! এ যে আবার এক নতুন উপদ্রব রে বাবা! হঠাৎ প্রপেলারের ঘূর্ণনগতি অনেকাংশে লাঘব হয়ে এল যে। এ কী কেলঙ্কারী কাণ্ড! একটা বা দুটো নয়। একসঙ্গে চ্যুন্তরটা প্রপেলারই বিধ্বাঘাতকতা করছে। সেগুলো মুমূর্ষুরোগীর মতো ঝুঁকছে। নেহাত চরতে হবে বলেই যেন তিরতির করে ঘুরে চলেছে।

পাওয়ার দরকার। প্রচুর পাওয়ার না হলে অ্যালব্রেটসকে কিছুতেই ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এদিকে পাওয়ার বৃদ্ধি কী করে সম্ভব? পর্যাণ্ড পরিমাণ কারেন্ট কোথায় যে পাওয়ার বৃদ্ধি করা যাবে?

হায়! এবার সর্বনাশ চরম রূপ নিল। অ্যালব্রেটস দ্রুত নিচে নেমে যেতে লাগল। যে-কোনো মুহূর্তে অ্যালব্রেটস ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

রোবার শত বিপদেও মাথা গরম করার বা মুখড়ে পড়ার পাত্র নন। তিনি কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, 'ঘাবড়াবেন না! দৃঢ় মানোবল নিয়ে যন্ত্র চালনা করো। যত শীঘ্র সম্ভব অ্যালব্রেটসকে বৈদ্যুতিক সীমানা অতিক্রম করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।'

ডেকের গায়ে কোনো অদৃশ্য হাত যেন অনবরত আতসবাজি জ্বালাচ্ছে। সে যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি নিজের চোখে না দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

একের পর এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে। চোখের পলকে ফুটো বেলুনের মতো অ্যালব্রেটস কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অনেক নিচে নেমে এসেছে। পরিস্থিতির উন্নতি হওয়া তো দূরের ব্যাপার বরং দ্রুত অবনতি হয়ে চলেছে। পায়ের তলায় ক্রোধোন্মত্ত অনবরত ফুঁসছে। আর অ্যালব্রেটস দ্রুত সমুদ্রের দিকেই নেমে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হয়তো অতিকায় আকাশযানটা সমুদ্রের বুকে আচাড় কেয়ে পড়বে। কোনোক্রমে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে তাকে সহসা আর সক্রিয় করে তোলা সম্ভব নয়। ফলে সলিল সমাধি ছাড়া আর গতাস্তর নেই।

অকস্মাৎ আকাশের গায়ে, একেবারে অ্যালব্রেটসের মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক মেঘের কুণ্ডলীর আবির্ভাব ঘটল।

এদিকে আবার অ্যালব্রেটস ক্রমে নিচে নামতে নামতে সমুদ্র থেকে মাত্র ষাট ফুট ওপরে নেমে এল। আর একটু হলেই ডেকটা আর একটু হলেই ডেকটা জলের তলায় তলিয়ে যাবে। বাস, সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটে যাবে।

রোবার কিন্তু এতটুকুও মাথা গরম করলেন না, মুখড়ে পড়ে হাত ছেড়ে দিলেন না। তিনি একলাফে এগিয়ে গিয়ে দৃঢ়হাতে লিভার চেপে ধরলেন। এতক্ষণ ইলেকট্রিক চার্জের জন্য অ্যাকুমুলেটর নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

হ্যাঁ, এবার অত্যাশ্চর্য এককাণ্ড ঘটে গেল। এতক্ষণ যে বৈদ্যুতিক মেঘ আভঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই এখন প্রাণরক্ষক হয়ে দাঁড়াল। অ্যাকুমুলেটর যেন অকস্মাৎ জীবনীশক্তি ফিরে গেল। রোবার লিভারের চাপ প্রয়োগ করামাত্র তীব্রবেগে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লগাল। বাস, অ্যালব্রেটসের নিম্নমুখী গতি বন্ধ হয়ে গেল। এবার চোখের পলকে সেটা জড়ের এলাকার বাইরে চলে গেল।

৪ জুলাই। এদিন কম্পিয়ান সাগরের উত্তর সীমানা ডিঙিয়ে অ্যালব্রেটস দ্রুত এগিয়ে চলল।

রোবার ভালোই জানেন, বেলুনবাজগণ একটু সুযোগ পেলেই চম্পট দেবেন। তবুও দিনের পর দিন তিন তিনজন লোকের উপর শ্যেনদৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাদের ওপর থেকে পাহারার ব্যাপারটাকে অনেকাংশে শিথিল করে নিলেন।

বেলুনবাজগণ পালিয়ে যাবার জন্য উদগ্রীব খুবই সত্য। কিন্তু চাইলেই কি আর তা যাওয়া সম্ভব? এক্সপ্রেস ট্রেনের গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল। সেটা থেকে লাফ দেবার চিন্তা করলেই ফুসফুসের গত স্তব্ধ হয়ে আসার জোগাড় হয়। আর অ্যালব্রেটসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ মাইলের বেশি। অতএব এটা থেকে পালাবার ধান্দা তো পাগলের খেলায়মাত্র।

এখন অ্যালব্রেটসের গতিবেগ সোয়ালো পাখির গতিবেগের চেয়েও অনেক বেশি। সোয়ালো পাখি ঘণ্টায় একশো বারো মাইল আর অ্যালব্রেটস এখন ছুটেছে সোয়ালো পাখির চেয়ে বেশি গতিবেগে। এরকম প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যেও বেলুনবাজগণ ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে চালক চমকে উঠে অ্যালার্মের তাঁদের সতেনন করে দিলেন। তবু

তাদের কেবিনে যাওয়ার নামটি নেই দেখে কজন কর্মচারী হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে এসে তাঁদের ঠেলে ধাক্কিয়ে কেবিনে ঢুকিয়ে দিল।

এমন দানবাকৃতি একটা যন্ত্র যা উষ্ণতার বেগে ছুটেতে সক্ষম, তার দেহখাঁচাটা যে অবশ্যই হীনকো কোন বস্তু দিয়ে তৈরি নয় তা তো আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। তাই সম্ভব কারণেই ঝড় যত তীব্রই হোক অ্যালাবেট্রিসের কোনো ক্ষতিই করতে পারল না।

কাম্পিয়ান সাগরের উত্তর তীরে দুঃস্থানন্দন প্রাচীন শহর আত্মমান শহর চোখে পড়ল। কেউ কেউ একে 'মরু নক্ষত্র' নামেও অভিহিত করে। ঐতিহাসিকগণের মতে এটা পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের সম্মানলাভের অধিকারী।

এবার বেলুনবাজগনের চোখের সামনে ভেসে উঠল ফিতার মতো ভল্লা নদী। সেটি একেবেঁকে হেলদুলে চলেছে। সাগরে গিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আসলে ভল্লা নদীটা এক মাইলেরও বেশি চওড়া।

অ্যালাবেট্রিস, এবার মস্কো শহরকে পিছনে ফেলে দূর্বীর গতিতে এগিয়ে চলেছে তো চলেছেই।

মস্কো থেকে শুরু করে প্রায় সাড়ে ৭০০ মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করছে সেট পিটার্সবার্গ রেলপথ।

পুরো আটদিনের যাত্রাপথ পাড়ি দিয়ে আকাশযান অ্যালাবেট্রিস সেট পিটার্সবার্গে হাজির হল।

নরওয়েতে পৌঁছে অবশ্য অ্যালাবেট্রিস এক অকস্মাৎ থমকে যেতে হয়েছিল। তার গতি মন্থর করার কারণ ছিল একটাই, টেলারমার কেনেরগোষ্ঠী পর্বতের আকাশছোঁয়া চূড়া নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বার কয়েক এদিক ওদিক গোত্তা মেরে এবং ওপরের দিকে ওঠাওঠি করে সে তার চরার পথ ঠিক বের করে নিল।

মুক্তিপাগল নিগ্রো সম্ভান ফ্রাইকোলিন কেন্দে কেন্দে চোখ দুটো ফুলিয়ে ঢোল করে পেলেছে।

এদিকে আঙ্কল ফ্রডেন্ট এবং পিল ইভাল এবার নিঃসন্দেহ হয়েছেন, শতচেষ্টা করেও রোবারের শ্যোনদৃষ্টি এড়িয়ে অ্যালাবেট্রিস থেকে পালিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাঁরা বহু ভাবনা চিন্তার পর চমৎকার একটা মতলব বের করলেন। ভাবলেন, যে-কোনোক্রমে পৃথিবীবাসীর কাছে তাদের বিড়ম্বিত অদৃষ্টের কথা জানাবেনই। কিন্তু উপায়? কোন দুরারার বেলুনবাজগণকে হাফিস করেছেন, পৃথিবীবাসীদের জানাবার উপায় কী? জাহাজ হলে না হয় যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখে বোতলের ভেতরে ঢুকিয়ে, ছিপি এঁট জলে ভাসিয়ে দেয়া যেন। আর একদিন না একদিন বোতলটা কারো নজরে পড়তই। তবে এত ভাবনা চিন্তাকে ফলপ্রসূ করার উপায়? আবার পাথরে বা শক্ত মাটিতে পাছাড় খেয়ে বোতল যাবে ভেঙে। ভেতরের চিঠিটা ভাসতে ভাসতে একেবারে বেপাক্ত হয়ে যাবে।

আঙ্কল ফ্রডেন্ট অন্যমনস্কভাবে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

আঙ্কল ফ্রডেন্টের চুপুট এবং নস্য দুরকম নেশাই রয়েছে। নস্য ফুরিয়ে গেছে সেই কবে। কিন্তু কৌটাটা ফেলতে তাঁর মন সরে নি। তাই খালি কৌটাটা পকেটের কোণাতেই পড়ে রয়েছে। তিনি নিজেদের বিড়ম্বিত অদৃষ্ট, রোবার এবং তাঁর অত্যাচার্য আকাশযান অ্যালাবেট্রিসের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করে লম্বা একটা চিঠি লিখে ফেললেন। এবার সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে নস্যর কৌটাটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সবশেষে এ-ও লিখতে ভুললেন না, চিঠিটা যার হাতেই পড়ুক না কেন দয়া করে যেন সেটাকে চিঠিতে বর্ণিত ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।

অ্যালাবেট্রিস এবার ফরাসি উপকূল পেরিয়ে প্যারিসের স্থলভূমির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। এর আগে কৌটাটাকে ফেলতে গিয়েও আঙ্কল ফ্রডেন্ট থমকে গেছেন। দু-দুবারই পায়ের তলায় সমুদ্র ছিল। কৌটাটা জলে পড়লে এত পরিকল্পনা ও প্রয়াস ভেঙে যেত যে। এবার নিচে বিস্তীর্ণ সমভূমি দেখে তিনি আশান্ত হয়ে কপালে ঠুকে দিলেন হাতের কৌটাটা শূন্যে ফেলে।

প্যারিস শহরে কৌটাটা ফেলে দিতে পেরে আঙ্কল ফ্রডেন্ট যেন পরম স্বস্তি পেলেন। শহরবাসীর যার হাতেই চিঠি সমেত কৌটাটা পড়ুক না কেন পুলিশের কাছে আর ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সদস্যদের কাছে খবরট পৌছাবেই।

সকাল প্রায় ছয়টায় অ্যালাবেট্রিস সম্পূর্ণ ফ্রান্সের এলাকা ডিঙিয়ে গেল। নয়টায় হাজির হল রোমের আকাশে। আকাশযান অনেকক্ষণ ধরেই মাটির কাছাকাছি দিয়ে উড়ে চলেছে। ফলেসেট পিটার্স গির্জার ছাদে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী বেশ কয়েক জোড়া চোখ আকাশদাম্বরের অবিস্বাস্য কাণ্ড দেখতে লাগল।

আকাশযানকে নেলসন উপসাগর পাড়ি দিতে আরো দুই ঘণ্টা সময় লেগে গেল। এবার মুহূর্তের জন্য বিসুবিয়াস আগ্নেয়গিরি আকাশচরীগণের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই আবার সেটা মিলিয়েও গেল। এবার সেটা ভূমধ্য সাগরকে আড়া আড়িভাবে ডিঙিয়ে হাজির হল তিউনিসিয়ার উপকূলের আকাশে।

অ্যালাবেট্রিস আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের আকাশপথে যখন উড়ে যাচ্ছিল তখন তেইশ দিন ক্রমাগত উড়ান হয়ে গেছে। আর সে পাড়ি দিয়েছে মোট আঠারো শো হাজার মাইলেরও বেশি পথ।

এদিকে আঙ্কল ফ্রডেন্টের মাথায় এমন একটা চিন্তাই দানা বেধেছে। চিঠিসহ ফেলা নস্যর কৌটাটার কী গতি হল? সেটা কি আদৌ কারো হাতে পড়েছে, নাকি অভাবিত উপায়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

পাওয়া গেছে! হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। চিঠি সমেত নস্যর কৌটাটা দুশো নম্বর বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার ওপর মুখ খুবড়ে পড়েছে। আর বরাত খুবই ভালো যে, সেটা একেবারে দারোগা সাহেবের হাতেই পড়েছে।

প্রবীণ দারোগা কৌতূহলবশত ব্যস্ত-হাতে দোমড়ানো কৌটা খুলে চিরকুটটা বের করে চোখের সামনে ধরতেই তাঁর চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। কপালের চামড়ায় পর পর কয়েকটা চিন্তার ভাঁজ একে দুতিনবার চিঠিটার বক্তব্য পড়লেন। একসময় চমকে উঠে বলে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর! ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি আঙ্কল ফ্রডেন্ট এবং সম্পাদক ফিল ইভাল কারাবন্দি আকাশকারায় বন্দি। ইঞ্জিনিয়ার রোবার তাঁর আকাশযান অ্যালাবেট্রিস এ উভয়কে বন্দি করে রেখেছেন।' এ কী অবিস্বাস্য কাণ্ড!

চিঠির শেষে বিশেষ অনুরোধ রাখা হয়েছে, খবরটা যেন তাঁদের বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিত মহলে পৌঁছে দেয়া হয়। চিঠির শেষে আঙ্কল ফ্রুডেট ও ফিল ইভালের স্পষ্টাক্ষরে স্বাক্ষরে রয়েছে।

আরে বাস! মানমন্দিরে কর্মরত বৈজ্ঞানিকগণ আর মহাকাশবিজ্ঞানীগণের দৃষ্টিভ্রমের অবসান ঘটল। দীর্ঘদিনের জমটবাধা আকাশ রহস্যের সমাধান ঘটল এক সম্পূর্ণ অভাবিত উপায়ে। তাদের অবস্থিতির কথা জানতে পেরে সবাই কিছুটা শান্তি পেলেও পুরোপুরি স্বস্তি পাওয়া গেল না। সবার মনেই একটামাত্র প্রশ্নই চক্কর মারতে লাগলকে? কে এ মহাকাশচারী রোবার? কোন দেশীয়? কী-ই বা তাঁর প্রকৃত পরিচয়? আর তাঁর বছরের পর বছর ধরে আকাশবিহারে উদ্দেশ্যই বা কী? তিনি কি আমৃত্যু আকাশপথেই কাটিয়ে দিতে ইচ্ছুক?

রোবার কি তবে তাঁর আকাশযান অ্যালবেট্রেসে চেপে নিশ্চিন্তে নিরালায় বিশ্রাম গ্রহণে মগ্ন? কিন্তু যত কৃতী আকাশচারী হোন না কেন, জরুরি প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে তো ভূপৃষ্ঠে নামার দরকার অবশ্যই পড়ার কথা। কিন্তু বছরের পর বছর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে হিঁস্র করে অসম্ভব! পাখিরা যে ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায় তাদেরও খাবার সংগ্রহের জন্য ভূপৃষ্ঠে এবং ক্রান্তি দূর করার জন্য রাত্রে বাসায় ফেরে। আর যান্ত্রিক ডানাধারী অ্যালবেট্রেসেরও তো কম-বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন অবশ্যই থাকার কথা। তবে? এই 'তবে'র উত্তর বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকগণ মাথা খাটিয়ে বের করতে পারলেন না।

হাজারো জল্পনা কল্পনার পর আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সবার মধ্যে স্থায়ী আসনলাভ করল। রোবার কী করে ওয়েল্ডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি এবং সম্পাদককে তাঁর মহাকাশযান অ্যালবেট্রেসে নিয়ে গিয়ে কামরাবন্দি করলেন? আর এ কাজে তাঁর প্রকৃতি উদ্দেশ্যই বা কী? তাঁদের দিনের পর দিন কয়েদ করে রেখে তিনি কোনো ফায়দা লুটতে চান্ধেন? তবে কি এটা বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত হতে হবে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইউরোপ, ভারত ও ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চল আর আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর ও পৃথিবীর আকাশচুম্বী পর্বত চূড়াগুলো রোবার তাঁদের চাক্ষুষ করিয়ে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেই এরকম একটা অবিশ্বাসী কাজে উৎসাহী হয়েছেন?

আকাশযান অ্যালবেট্রেস এবার উল্কার বেগে সাহারা মরুভূমির ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। মরুসুন্দরী সাহারা। বালির ওপর সূর্যের অত্যাঙ্ক আলোকরশ্মি পড়ে তাকে বাস্তবিকই এক রূপসী ভবী যুবতীর মতো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

বেলুনবাজদের চোখের সমানে মরুদ্বীপ ওয়েসিস তার রূপ সৌন্দর্যের ডালি মেলে ধরল।

হায়! এ কী সর্বনাশা কাণ্ডের বাবা! অকস্মাৎ এ কী অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। চোখের পলকে কয়েক শো ইয়া দশাসই চেহারাধারী শকুন অ্যালবেট্রেসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারণ কী? কারণ অবশ্যই আছে। আকাশ তাদের একাধিপত্য। অন্যের উপস্থিতি তাদের কাছে অবশ্যই কাম্য নয়। রোবার কর্মীদের হুকুম দিলেন বন্দুক ছুড়ে অ্যালবেট্রেসের গতিপথ কণ্টকমুক্ত করতে। বাস, দ্রুম দ্রুম দ্রুম করে বন্দুক ও কামান গর্জে উঠতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যে কিছুসংখ্যক শকুনগুলিতে প্রাণ দিল আর কিছু প্রাণ ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বাঁচল।

অ্যালবেট্রেস এবার নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে উল্কার বেগে এগিয়ে চলেছে। সাহারা মরুভূমির উত্তর সীমান্ত প্রায় ৬০০ মাইল ভিতরের এক স্থানে ১৮৪৬ সালে মেজর লেইভ প্রাণ দেন।

সমস্যা! আবারও সমস্যার সম্মুখীন হল অ্যালবেট্রেস। রীতিমতো কঠিন সমস্যা! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপাল আকাশের গায়ে যেন কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করে ফেলেছে। অ্যালবেট্রেসের সাধ্য কি তাদের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যায়। উপায়ন্তর না দেখে রোবারের নির্দেশে বিষাক্ত গ্রাস ছেড়ে হতছাড়া পঙ্গপালগুলো কবল থেকে কোনোরকমে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

সুদানের উত্তর সীমান্তে অ্যালবেট্রেস এবার হাজির হল। এবার সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে নাইসার নদী আকাশচারীগণের চোখে ধরা দিল। টিমবাকটু শহরও কম মুগ্ধ করল না। অদূর অতীতে শিল্পবিজ্ঞান সাধনার কেন্দ্র হিসাবে এর পৃথিবী জোড়া খ্যাতি ছিল।

আঙ্কল ফ্রুডেট হটাৎ ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'ইজিনিয়ার রোবার আপনার হয়তো জানা নেই মুক্তির পথে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। ইউরোপের পথে আপনা আকাশযান যখন খুবই নিচু দিয়ে, ধীর মন্থর গতিতে এগোচ্ছিল তখন চিঠি ফেলা কি খুবই সমস্যার ব্যাপার ছিল? আর নস্যর কৌটোয় করে আমি সে কাজ সেরেও রেখেছি, শুনে রাখুন।'

আঘাত প্রাপ্ত বিষধরের মতো ফুঁসতে ফুঁসতে রোবার বললেন, 'সে কী মশাই! এবার সন্যর কৌটোর মতো আপনার ব্যবস্থাও যদি করে দেওয়া হয়, তবে?'

'আপনার হাতে পুতুল বনে গিয়ে ধুকছি, জানেনই তো? আপনি এখন আমাদের যা খুশি করতে পারেন। আপনার কোনো কাজেই অবাধ হবার কিছু নেই মশাই।'

ক্রোধে অপমানে রোবার ভেতরে ভেতরে ফুলতে লাগলেন। তার ইচ্ছা হচ্ছে, সত্য সত্যই হাজার কয়েক শো ফুট ওপর থেকে বেলুনবাজদের ছুড়ে ফেলে দেন। তবু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

১১ তারিখের ভোর। অ্যালবেট্রেস এবার উত্তর গিনি উপকূল অঞ্চলের ওপর দিয়ে উল্কার বেগে উড়ে চলল। অদূরবর্তী দাহোমের রাজ্যকে ঝাঁপসা দেখা যেতে লাগল। রোবার নির্যাত আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করতে চাইছেন। নইলে আকাশযানটাকে সেই থেকে সোজা উত্তরমুখী চালাবেন কেন? ছোট রাজ্য দাহোমে নরবলি দেয়ার প্রথা প্রচলন রয়েছে। কতিত রক্তমাখা নরমুণ্ড রাজা ও রাজকর্মচারীদের উপটোকনস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়া হয়। নতুন রাজার সম্মানার্থে নরবলি দেয়ার প্রথাও বহুদিনের।

আকাশযান অ্যালব্রেটস যখন দাহোম রাজ্যের আকাশের ওপর দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছে ঠিক তখন রাজ্যের বৃদ্ধ রাজা পরলোক গমন করলেন। নতুন রাজার অভিষেকের চিন্তা ভাবনা চলতে লাগল। মাত্র কয়েকদিন আগেই এ লুটেরার দলকে ধরে এনে কয়েদ করে রাখা হয়েছিল। আজ তাদের বলি দিয়েই নতুন রাজার অভিষেকপর্ব সম্পন্ন করা হবে।

কয়েদিদের বধ্যভূমিতে এনে হাজির করা হল। অচিরেই বধ্যভূমি মানুষের তাজা রক্তে রান্ধা হয়ে উঠল। একজন মানুষের রক্তপাতের মাধ্যমে দেশের রাজারা অভিষেক হবে। কী অমানবিক কাণ্ড! কী নৃশংস ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে! এমন মর্মান্তিক প্রথার কথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। হৃদপিণ্ড শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসার জোগাড়।

মুহুর্তের মধ্যেই এক অবভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। দ্রুম... দ্রুম! কামান গর্জে উঠল। অ্যালব্রেটস থেকে কামানের গোলা নিচের দিকে ছুটে চলল। আর দেরি নয়, চোখের পলকে বিচারপতি মিস্তানের ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহের রক্তাণুত টুকরো মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগল। রোবার তাঁর গোলন্দাজকে কৃতিত্বের জন্য বারবার পিঠ চাপড়ে ধন্যবাদ জানানেন।

বেলুনবাজরা এতক্ষণ যা আশঙ্কা করেছিলেন রোবার কার্যত করলেনও তাই। তিনি এবার অ্যালব্রেটসকে সত্যসত্যই আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চললেন।

বেলুনবাজরা চোখ দুটো কপালে তুলে আটলান্টিকের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, 'হতচ্ছাড়া রোবারের উদ্দেশ্যটা কী? তিনি একবার অবশ্য বলে ফেলেছিলেন, পৃথিবী প্রদক্ষিণের চেয়েও বড় কিছু অ্যালব্রেটসের পক্ষে করা সম্ভব। কিন্তু তার সে বড় কিছু কী? কোনো কোনোদিন রোবারকে তো মাটিতে নামতে হয়েছিলই। পানীয় জল, খাবারদাবার, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি গোলাবারুদ প্রভৃতি সংগ্রহ তো তাঁকে করতেই হয়েছে। তিনি তবে কোথায় নেমেছেন, বা নামেন? কোথায়ই বা তাঁর সে গোপন আস্তানা? কোন কারণে রোবার মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশপথকে আঁকড়ে ধরতে পারেন সত্য, কিন্তু মাটির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করা তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। অতএব তাঁর গোপন আস্তানাটা কোথায়, কোন দেশে?'

রোবারকে কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই। কোনো উত্তরই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। তবে কি তার রহস্যজনক কাণ্ডকারখানার কথা কোনোদিনই সভ্যসমাজের কাছে ফাঁস হবে না।

বেলুনবাজরা রোবারের রহস্যজনক কার্যকলাপের উদ্দেশ্য জানার জন্য সাধ্যাতীত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। এ অনিশ্চিত যাত্রাপথ কোথায়, কবে শেষ হবে এটা জানাই এখন তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

পৃথিবীর মোট আয়তনের একটা বড় ভগ্নাংশই জল। এ বিপুল জলরাশি অতিক্রম করতে যে অমিতশক্তির প্রয়োজন তা অ্যালব্রেটসের কোথায়?

অ্যালব্রেটস যখন ইউরোপ মহাদেশ অতিক্রম করে তখন তার গতিবেগ ছিল মিনিটে দুই মাইল। এখন গতিবেগ মিনিটে এক মাইলে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার এ নিয়ে রোবারের কোন উৎকণ্ঠা বা ব্যস্ততা কোনোটাই নেই। কেন? কেন তাঁর এমন অদ্ভুত আচরণ? কেউ, কোনোদিনই এ রহস্যভেদ করতে পারবে না?

১৮ জুলাই। সমুদ্রের বুকে অকল্পনীয়, একেবারে অবিশ্বাস্য একদৃশ্য লক্ষিত হল। আলোকরশ্মি বিজরিত ডেউ ঘাট মাইল বেগে ধেয়ে যেতে দেখা গেল। প্রায় আশি ফুট দূর থেকে আর একটা ডেউ যেন তাকে তাড়া করছে। ব্যাপারটা এমন মনে হয় দুটো সচল অতাজ্জ্বল পরিখা সমুদ্রের বুকে বিরাজ করছে। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য রোবারও এর আগে কোনোদিনই দেখেন নি। ফসফরাসের আলোকচ্ছটা সমুদ্রের বুকে আলোক সৃষ্টি করে সত্য। কিন্তু তার আলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের।

অ্যালব্রেটস সাতচল্লিশ সমাক্ষ রেখা অতিক্রম করলে দিনের দৈর্ঘ্য কমে মাত্র সাত ঘণ্টায় দাঁড়াল। ফলে রাত্রি অবশ্যই সুদীর্ঘ। মেরু অঞ্চলে আরো অবাক হতে হবে। কারণ, সেখানে দিন আরো ছোট।

দুপুর একটা। সূর্য মাথার ওপরে অবতান করছে। অ্যালব্রেটস আর সমুদ্রের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক শো ফুট। সমুদ্রক্রমে অশান্ত হতে হতে একসময় যেন রক্তমূর্তি ধারণ করল। অকস্মাৎ এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। মনে হল অ্যালব্রেটস বুঝি সমুদ্রের ডেউয়ে তলিয়ে গেছে।

অ্যালব্রেটস সত্যিই অমিত ক্ষমতার অধিকারী। তার ৭৪ প্রপেলার তীব্র বেগে হরদম পাক খেয়ে চলেছে।

একসময় রোবার উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কামান! কামান! কামান দাগ! ঘন ঘন কামান দাগ!'

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অভিজ্ঞ গোলন্দাজ মুহূর্তেই কামান দাগতে লাগল।

পর পর কয়েকবার কামান দাগার পর অবিশ্বাস্য এক ঘটনার মুখোমুখি হলেন আকাশচারীরা। কামানের গোলার আঘাতে পর্বতপ্রমাণ ডেউগুলি ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে লাগল।

বীকার না করে উপায় নেই, অ্যালব্রেটস অমিত শক্তির অফুরন্ত শক্তির অধিকারী। তার গঠন প্রণালী অদ্ভুত এবং অশাভাবিক মজবুত।

থার্মোমিটার, ক্রনোমিটার এবং ব্যারোমিটার অধিকাংশ সময়েই রোবারের হাতের কাছে মজুত থাকে। আর একটা মানচিত্র তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। এদের সাহায্যে তিনি যে কোনো বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে তাঁর পঞ্জীরাজ্যটিকে দুর্বীর গতিতে সঠিক পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হন।

ফ্রাইকোলিন পালিয়ে অব্যাহতি পাবার জন্য সাধ্যমত সবরকম প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত সে প্রবীণ পাচকের শরণাপন্ন হতেও দ্বিধা করল না। সে পাঁচকের সামনে দাঁড়িয়ে রোবারের ব্যাপারে বহু অবাস্তব কথা বলতে লাগল।

পাচকও কম বুদ্ধি রাখে না। সেও পাগলের মতো অসংলগ্ন কথার ফুলঝুরি ফোটাতে লাগল, 'রোবার সাহেব নাকি একসময় আর্জেন্টিনা গণতন্ত্রের মন্ত্রী ছিলেন। তবে আসলে কি জান ভায়া, তিনি নৌবাহিনীর একজন জাঁপরেশ সেনাপতি ছিলেন।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে দিয়ে ফ্রাইকোলিনের মুখের ভাব বুঝে নিয়ে পাচক বলল, 'রোবার সাহেব আসলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ছিলেন।' এরকম পরস্পর বিরোধী ও অসংলগ্ন কথাবার্তায় ফ্রাইকোলিনের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলই না, বরং আরো বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে সে রীতিমতো মুগ্ধে পড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পরে পাচক নিজে থেকেই আবার বলতে শুরু করল, 'টাকার কুমীর ভাই, টাকার কুমীর! রোবার সাহেব একজন সত্যিকারের টাকার কুমীর। অগাধ ধন দৌলৎ না থাকলে কারো পক্ষে এমন একটা আকাশযান তৈরি করা সম্ভব, তুমিই বল? দেশ বিদেশে টাকার পাহাড় তৈরি করে রেখেছেন। প্রয়োজনের সময় কেবল হাত বাড়িয়ে নিতে পারলেই হল। তবে অ্যালবের্টসকে তৈরি করতে এবং দিনের পর দিন এর খরচ যোগাতে মি. রোবার এখন প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। পাওনাদাররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। মাটিতে পা দেয়া-মাত্র সবাই পঙ্গপালের মতো একেবারে ছেকে ধরবে। তবে হ্যাঁ, মাটির ছোঁয়া পেতে মন উতলা হয়ে উঠলে চাঁদের মাটিতে নেমে সে-সাধ পূরণ করতে পারেন।'

পাচকের মুখে এসব কথাবার্তা মনে ফ্রাইকোলিন ছুটে ছুটে তার প্রভু আঙ্কল ফ্রুডেন্টের কাছে হাজির হল। পাচকের মুখে শোনা কথাগুলো হুবহু ব্যক্ত করল।

অ্যালবের্টস ছেড়ে পালিয়ে মুক্তি পাওয়ার চিন্তা বেলুনবাজার মাথাথেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। আবার রোবার স্বেচ্ছায় তাঁদের কোনোদিন যদি মুক্তি দেন, এরকম আশা অনেক আগেই তারা ছেড়ে দিয়েছেন। এ মুহূর্তে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, নিজেদের জান যাদি যায়ও যে-করেই হোক অ্যালবের্টসকে ধ্বংস করে দেন। তবে মতলবটা ফ্রাইকোলিনের কাছে তারা খুবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখলেন।

তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করল। একসময় দুই ডিম্বিরও নিচে নেমে গেল।

অ্যালবের্টস এবার পোর্ট ফেমিনকে অতিক্রম করে হাজির হল 'আগুন দেশ' অর্থাৎ ফুরেগেতে।

আরো দুমাসে অ্যালবের্টস পাহাড় পর্বত, নদী-নালা আর বন-জঙ্গল ডিঙিয়ে হাজির হল গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে।

অ্যালবের্টস এবার ক্রমাগত উত্তরদিকে এগিয়ে উলাস্টন দ্বীপকে পিছনে ফেলে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। এরপর রূপ-সৌন্দর্যের আকর হর্ন অন্তরীপের আকাশ পাড়ি দিতে লাগল।

২৪ জুলাই। দক্ষিণ গোলার্ধে যখন চব্বিশে জুলাই তখন উত্তর গোলার্ধে হয় চব্বিশে জানুয়ারি। দিনের বেরায় উত্তাপ ও আলো ক্রমে কমতে কমতে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে আসতে লাগল আর ঠাণ্ডাও বেড়ে চলল।

অ্যালবের্টসের কামরাগুলোকে যান্ত্রিক উপায়ে গরম রাখার ব্যবস্থা করা হল।

বেলুনবাজার আতকে উঠলেন, 'রোবার এ কী কেলেকারী কাণ্ড ঘটাতে চলেছেন! শীতে দক্ষিণ মেরুতে যাওয়া আর যমপুরীর দক্ষিণ দুয়ারে হাজির হওয়া যে একই ব্যাপার। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।'

তবে আঙ্কল ফ্রুডেন্টের মনে এটুকুই আশা যে, রোবার ইতিমধ্যে দু-তিন দিনে কয়েকবার ভাড়ারের খাবারদাবারের খোঁজ নিয়েছেন। অতএব তিনি আশা করছেন, খাদ্যবস্তু জোগাড় করতে তিনি অচিরেই কোথাও না কোথাও নামবেন। ব্যস, তখন সুযোগ বুঝে কয়েদিরা চম্পট দেবেন।

এবার মনে হল রোবারের গোপন আস্তানা আর খুব দূরে নয়। কারণ, তিনি অ্যালবের্টসকে মস্তুর গতিতে পশ্চিম দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। মনে হল প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক অখ্যাত অজ্ঞাত দ্বীপের দিকে তাঁর নজর।

এবার দুধ সাগর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। এর জল দুধের মতো ধবধবে সাদা। এর গোপন রহস্য, কোটি কোটি দ্যুতিময় সূক্ষ্ম কণিকার একত্র সমাবেশ ঘটেছে এ সাগরের জলে।

বেলা বারোটায় টম টার্নার হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে রোবারকে জিজ্ঞাসা করল, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো। ওই ওই ওটা কী? ওই যে সমুদ্রের বুকে কালো বিন্দুর মতো কী একটা দেখা যাচ্ছে, ওটা কি পাহাড়, নাকি অন্য কিছু?'

রোবার স্বাভাবিকস্বরেই তার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'না, পাহাড় নয়। ওদিকে ডাঙার চিহ্নমাত্রও নেই। একটা ডিঙি নৌকাকেই তুমি পাহাড় বা ডাঙা বলে ভুল করছ। জাহাজডুবি নৌকা। জাহাজ ডুবে যাওয়ায় নাবিকরা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মরণপণ লাড়ুই করে চলেছে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আকাশযান নিচে নামতে নামতে সমুদ্রের কাছাকাছি চলে গেল।

হ্যাঁ, একটা ডিঙি নৌকায় ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর কয়েকজন অদৃষ্ট বিড়খিত নাবিককে শুয়ে বসে ঝুঁকতে দেখা গেল। এখন নৌকা আর অ্যালবের্টসের মধ্যে ব্যবধান মাত্র আশি ফুট।

টম টার্নার চিৎকার করে নৌকারোহীদের ডাকাডাকি করল। কিন্তু নৌকারোহীরা নির্বিকার।

রোবার এবার কামানের সাহায্যে ফাঁকা আওয়াজ করার নির্দেশ দিলেন। একবার কামান দাগতেই ফল পাওয়া গেল। মুমূর্ষু নাবিকরা নড়ে চড়ে উঠল। আচমকা বাঘ দেখার ভাব নিয়ে তারা কোটেরবসা চোখের মণি দুটোকে তুলে ওপরের দিকে তাকাল।

নৌকা থেকে বাতাসবাহিত অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'সবাই জাঁনেত জাহাজের নাবিক। আমি এদের মেট। জল আর খাবার দুইয়ের অভাবেই আমরা মরণাপন্ন। দয়া করে আমাদের প্রাণে বাঁচান।'

নৌকারোহীরা সবাই হাত দুটো ওপরে তুলে কাতর মিনতি জানাতে লাগল 'বাঁচান! আমাদের বাঁচান। জল আর খাবার দিয়ে আমাদের প্রাণ বাঁচান।'

আকাশচরীর কর্মীরা রোবারের নির্দেশে দড়ি দিয়ে জলের বালতি আর খাবারের প্যাকেট নৌকাটায় নামিয়ে দিল। গোঁগ্রাসে খাবারগুলোর সদ্যবহার করে নৌকারোহীরা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। তাদের একজন গলা ছেড়ে চিৎকার করে বলল, 'ধন্যবাদ! আমরা এখন কোথায়, দয়া করে বলবেন কি?'

রোবার তেমনি তারস্বরে জবাব দিলেন, 'কোনেস ও চিলি দ্বীপুঞ্জের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ভাববেন না, আমি গুণ টেনে আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি।'

রোবার নৌকারোহীদের কাছে নিজের পরিচয় গোপন রেখে গুণ টেনে নৌকাটাকে এগিয়ে নিয়ে চললেন। কোনেস দ্বীপপুঞ্জের তীরে নৌকাটাকে পৌঁছে দিয়ে দড়ির বাঁধন আলগা করে দিলেন।

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কয়েকজন হতভাগার প্রাণ বাঁচিয়ে রোবার তাঁর পঞ্জীরাজ অ্যালবেট্রসকে এবার দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

মাঝরাত সবে পেরিয়েছে। এমন সময় তুমুল ঝড় উঠল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। সৃষ্টি ধ্বংস করে দেয়ার জন্য প্রকৃতি দেবী বদ্বপরিকর। সামুদ্রিক ঝড়কে পৃথিবীর এক-এক অঞ্চলের মানুষ আলাদা আলাদা নামে অভিহিত করে। চীন সাগরের ঝড় 'টাইফুন' নামে পরিচিত। আটলান্টিকের ঝড়কে বলে 'হারিকেন'। সাহারা মরুভূমিতে একেই বলে 'সিমুম' আর 'টর্নেডো' বলে পশ্চিম উপকূলের ঝড়কে। যে নামেই সম্বোধন করা হোক, আসলে সবার চরিত্র মূলত একই।

মৃত্যু শিয়ারে। তাই আর একমুহূর্তে দেরি না করে রোবার তার আকাশযানকে দ্রুত ওপরে, একেবারে ঘূর্ণিঝড়ের এন্ড্রিয়ারের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

আচমকা ব্যারোমিটারের পারদ নামতে নামতে একেবারে নিচে নেমে গেল। ব্যাস, অ্যালবেট্রসও একদম থমকে গেল। চুয়াস্তরটা প্রপেলার একই সঙ্গে দ্রুততম গতিতে ঘুরতে লাগল। দমকা হাওয়া তার গতিরুদ্ধ করল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড়ের দাপট কি অ্যালবেট্রস কাটিয়ে উঠতে পারবে?

হ্যাঁ, যেই কথা সেই কাজ। অ্যালবেট্রস চরমতম সঙ্কটের সম্মুখীন হল। অবাধ্য ঝড় সেটাকে প্রবল শক্তিবলে দ্রুত ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঝড়ের গতি যদি একই হারে ক্রমে বেড়েই চলে তবে যে-কোনো সময় কেলেঙ্কারী ঘটতে পারে।

অঙ্কল ফ্রডেন্ট আর ফিল ইভাল ঝড়ের ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত তো নন, বরং খুশিতে ভরপুর। কারণ, তাদের বাঙ্কা অনুযায়ী অ্যালবেট্রস যদি ধ্বংস হয়ে যায় যাক।

এ মুহূর্তে রোবার ভাবছেন, অ্যালবেট্রসকে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে যেতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু কাজটা খুবই সমস্যাসঙ্কুল।

আর এক সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। ঘন-কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। রোবার ভেবে পাচ্ছেন না, হঠাৎ প্রকৃতি কেন এমন বিরুদ্ধ রূপ ধারণ করল? সাইক্লোন জাতীয় ঝড়ের তাণ্ডব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষিণ অক্ষাংশের ছাব্বিশ সমাঙ্ক রেখা ও উত্তর অক্ষাংশের ত্রিশ সমাঙ্ক রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। কিন্তু এ তো সে এলাকার একেবারেই বহির্ভূত, তবে? কেন তবে প্রকৃতি হঠাৎ এমন রুদ্র রূপ ধারণ করল?

এ পরিস্থিতির কবল থেকে অ্যালবেট্রসকে রক্ষা করার দুটোমাত্র পথই খোলা। হয় সেটাকে আলতোভাবে ঝড়ের সঙ্গে ভেসে বেড়ানোর জন্য বরাত ঠুঁকে ছেড়ে দিতে হবে, নতুবা প্রচণ্ড বেগে চালিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ঝড়ের এলাকার বাইরে নিয়ে চলে যেতে হবে। ব্যস, এর বেশি কোনোরকম পায়তারা কষতে গেলে ধ্বংস অনিবার্য।

উপায়ত্তর না দেখে রোবার অ্যালবেট্রসকে আলতোভাবে বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। যে দক্ষিণ মেরু পেরিয়ে এসেছেন ঝড়ের খেয়ালে তাঁকে আবার সেদিকেই দ্রুত এগোতে হচ্ছে।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। অ্যালবেট্রস হর্ন অন্তরীপের পনেরো ডিগ্রি নিচে হাজির হয়ে গেল।

এখানে জুলাই মাসে দিনে সাড়ে উনিশ ঘণ্টা রাত।

আর মাত্র ১২০০ মাইল এগোতে পারলেই অ্যালবেট্রস দক্ষিণ মেরু বলয় ডিঙিয়ে যাবে।

রোবারের পঞ্জীরাজকে এখানে খুব হান্ধা বলে মনে হতে লাগল। এর কারণ, দক্ষিণ মেরু কমলালেবুর মতো সামান্য চাপা। এ পরিস্থিতিতে সব কটা, অর্থাৎ চুয়াস্তরটা প্রপেলারকেই চালাতে হল না।

দক্ষিণ মেরু কমলালেবুর মতো সামান্য চাপা, স্বীকার করলাম। কিন্তু সে জায়গাটা আসলে কেমন? আসলেই কি সেটা একটা মহাদেশ, নাকি আদিকালের কোনো সমুদ্র? এ কী অদ্ভুত দেশ রে বাবা! প্রচণ্ড গরমের দিনেও সেখানকার বরফ গলে জল হয়ে যায় না! কেবল এটুকুই আজ পর্যন্ত জানা গেছে উত্তর মেরুর চেয়ে সেখানে শৈত্যের প্রাবল্য বেশি। এদিকটা বিবেচনা করেই হয়তো উত্তর মেরুর নামকরণ করা হয়েছে সুমেরু আর দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তর মেরুর ভাগ্যে জুটেছে 'সু' আর দক্ষিণ মেরুর বরাতে 'কু'।

ক্রমেই রাত বড় আর দিন ছোট হয়ে আসতে লাগল। ফলে রাতের আকাশে চাঁদ আর মেরুজ্যোতি ছাড়া আলোর সঙ্কেত দেয়ার মতো কোনো মাধ্যমের অস্তিত্বই এ অঞ্চলে নেই। আবার এখানে চাঁদ খুবই সুরু। এটা এমনই এক অভিশপ্ত স্থান যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষের পদচিহ্ন পড়ে নি।

নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারের জন্য দক্ষিণ মেরুর ওপর দিয়ে অ্যালবেট্রস উড়ে গেলেও এখানকার ভূপ্রকৃতিকে চাক্ষুষ করা ভাগ্যে জুটেছে না।

তখনো মাঝরাত পেরোয় নি। তখনই অপরূপ রূপ সৌন্দর্য নিয়ে বরফের রাজ্য দক্ষিণমেরু আকাশচরীদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। জমাটবাঁধা অন্ধকার ভেদ করে মেরুজ্যোতি উঁকি দিল। চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়ার জোগাড়। গুজ্র সমুজ্জল রূপালি আলোকচ্ছটায় সাদার ক্রসের চারটে অতুজ্জল নক্ষত্র অধিকতর ঝলমলিয়ে উঠল। এমন স্বর্গশোভা চোখ ও মনকে সমানভাবে আনন্দ দিতে লাগল।

এ কী ঝকঝকিয়েই না পড়া গেল! দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দু যত এগিয়ে আসছে কম্পাসের কাঁটা ততই বাগড়া

বাঁধাতে শুরু করেছে। এ কী হেঁয়ালিতে মেতেছে! ফলে অ্যালব্রেটস যে কোনদিকে, কোনপথে ধেয়ে চলেছে তা বোঝাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীর্ঘ সময় ধরে কাগজ পেসিল নিয়ে আঁক কষে আর অঙ্ক কষে রোবার একসময় উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে চিঠিয়ে উঠলেন, 'এগোছি! আমরা দক্ষিণ মেরুর কেন্দ্রবিন্দুর দিকেই এগোছি!'

আঙ্ক ফ্রেডেট আর ফিল ইভাল ভাবছেন, এ সুযোগে আপদ অ্যালব্রেটসটাকে ধ্বংস করে দিতে পারলে গায়ের জ্বালা জুড়োতো।

আবার রোবারের মুখ শুকিয়ে গেল। চোখে মুখে হতাশার কালো ছায়া নেমে এল। অ্যালব্রেটস মূল মধ্যরেখা অতিক্রম করে পূর্বদিকে মোড় ঘুরলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সামনেই দু-দুটো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হাঁ করে রয়েছে। যে শত সহস্র আগুনের শিখা লকলক করে জ্বলতে দেখেছে অ্যালব্রেটস বুঝি তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে জ্বলে পুড়ে ঝাঁক হয়ে যাবে, আত্মহতী দেবে।

না, ভাগ্য খুবই ভালো। অ্যালব্রেটস নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল। ঘূর্ণিঝড়-হ্যার, ঘূর্ণিঝড়ই অ্যালব্রেটসকে এবারের মতো রক্ষা করল। আর এতগুলো প্রাণীও নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে অব্যাহতি পেল।

অ্যালব্রেটস এবার এক অদ্ভুত জায়গার ওপর দিয়ে ধেয়ে চলল। রাত দুটোর সময় ডিসকভারি ল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী কলোনি দ্বীপের কাছে হাজির হল। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জমাটবাঁধা বরফ সংযোগস্থাপন করে রেখেছে বলে সনাক্ত করাই সম্ভব হল না, কোনটা দ্বীপ আর কোনটা মেইন ল্যান্ড।

অ্যালব্রেটস ছুটছে তো ছুটছেই। একসময় সেটা মেরুবৃত্ত ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল। এবার তার গতি উত্তরমুখী। প্রপেলার আবার পূর্ণশক্তিতে ঘোরার মত সামর্থ্য ফিরে পেয়েছে।

অ্যাব্রেটস দক্ষিণ মেরু ডিঙাবার সময় তিন মাইল বেগে ছুটেছে।

অ্যালব্রেটস ঝড়ের কবলে পড়ে এখন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে হাজির হয়েছে। এরকম দিকভ্রম হওয়ার কারণও রয়েছে যথেষ্টই। ম্যাগনেটিক সোলার ওপর দিয়ে আসার সময় কম্পাস কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলেই এমনটা ঘটে গেছে। দিকভ্রম হয়েছে।

আরো এক বিপত্তি ঘটেছে। যে দুটো প্রপেলারের ওপর নির্ভর করে অ্যালব্রেটস সামনে আর পিছনে যেতে পারে সে দুটোই অকেজো হয়ে পড়েছে। ঝড়ের তাগবে দুমড়ে মুচড়ে একাকার হয়ে গেছে।

রোবার অসম্ভবকৈ সন্তুষ্ট হয়ে তুললেন। শূন্যে ভাসমান অবস্থাতেই প্রপেলার দুটোকে মেরামত করে ফেললেন।

২৭ জুলাই। উত্তরদিকে কালো-মতো কী দেখা গেল। ডাঙার চিহ্ন। ওটা কি কোনো দ্বীপ, নাকি মহাদেশ? আরো কিছুটা এগোতেই বোঝা গেল, মহাদেশ নয়, দ্বীপ। বেশ বড়সড় একটা দ্বীপ। আর রয়েছে পাহাড়ের সারি। দ্বীপটার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের এক জায়গার ওপর দিয়ে অ্যালব্রেটস যাওয়ার সময় বেলুনবাজরা রোবার আর টম টার্নারের কথোপকথন শুনতে পেলেন। টম টার্নার বলল, 'স্যার, আমরা কি কাছাকাছি পৌঁছে গেছি?'

রোবার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, 'হ্যাঁ, পৌঁছে তো গেছিই, আমরা এখন এক্স আয়ারল্যান্ড থেকে মাত্র ছেচল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণে অবস্থান করছি। মাত্র আটশ মাইল পাড়ি দিলেই..'

'খাবার প্রায় নিঃশেষ।'

আঙ্কল ফ্রেডেট, ফিল ইভাল আর ফ্রাইকোলিনের প্রসঙ্গ উঠলে রোবার টম টার্নারকে বললেন, 'ওরাও আমাদের সঙ্গেই যাবেন। তাছাড়া উপায়ও তো কিছু নেই।'

এদিকে বেলুনবাজরা গোপন পরামর্শে লিপ্ত হলেন। মুক্তির আশা তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। যে-কোনো উপায়ে অ্যালব্রেটসকে ধ্বংস করে ফেলাই তাঁদের এমুহূর্তে একমাত্র লক্ষ্য। রাতের আঁধার কাটার আগেই কাজ সেরে ফেলার জন্য তারা বদ্ধপরিকর। কিছুতেই ভোর হতে দিতে রাজি নন। জখম হওয়া অ্যালব্রেটসকে নিয়ে রোবার ও তাঁর শিষ্যরা যখন ব্যস্ত থাকেবন, তখনই ফিল ইভাল গুটিগুটি বারুদখানায় ঢুকে মতলবটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলবেন। ডিনামাইটের একটা কার্তুজ তো ইতিমধ্যেই সরিয়ে ফেলেছেন। চিন্তা কী?

ষড়যন্ত্র! সর্বনাশা ষড়যন্ত্র! আত্মঘাতী ষড়যন্ত্রও একেবলা চলে।

বারুদখানায় বিস্ফোরণের যা-কিছু প্রতীতি সবই সেরে ফেলা হয়েছে।

আঙ্কল ফ্রেডেট রীতিমতো আতর্জনাদ করে উঠলেন, 'মি. ইভাল, আসল ব্যাপারটা যে আমাদেরই কারো মাথায় আসে নি! পলতে? পলতে কোথায়? পলতে ছাড়া ডিনামাইট চার্জ কী করে সম্ভব?'

হ্যাঁ, ফ্রাইকোলিন পলতের ব্যবস্থা করে ফেলল। পলতেতে আগ্নি সংযোগও করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রোবার এখনো মেরামত কাজ শেষ করতে পারেন নি। চারদিকে তাঁর নজর। এ অবস্থার তাঁদের হাত গুটিয়ে বসে হা পিতোশ করতেই হল।

এবার তারা ডিনামাইট চার্জ করে অ্যালব্রেটসকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ধান্ডা করলেন। একশো গজেরও কম। দড়ি বেয়ে নেমে যেতে পারবেন। তবে সমস্যা হচ্ছে রোবারকে নিয়ে। ঈশ্বরের চোখে ধুলো দেয়া যায় কিন্তু তাঁর চোখে ধুলো দেয়া কঠিন ব্যাপার। বেলুনবাজরা অনেক শলাপরামর্শের পর স্থির করলেন, রোবারকে খুন করে হলেও চম্পট দেবেন।

ফ্রাইকোলিন একটু আগেও তাঁদের পিছনেই বসেছিল। কিন্তু এখন আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। তাঁরা ছুটেতে ছুটেতে কামরায় গেলেন। না, এখানেও নেই। তবে? তবে কি এরই মধ্যে মুক্তিপাগল ফ্রাইকোলিন চম্পট দিয়েছে। তাই হয়তো হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ওপরে, অ্যালবের্টসের সবাই হৈ হুটগোল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে, বেরুনবাজদের কানে এল। তবে কি তাঁদের অতর্কিতে পলায়নের ব্যাপারটা তাদের নজরে পড়ে গেছে? রোবার উদ্ভাস্তের মতো ছুটোছুটে শুরু করে দিলেন। নিচের দিককার সার্চ লাইট জ্বলে বেলুনবাজদের জোর তল্লাশি চালাতে লাগলেন।

আলো চারদিকে অস্থিরভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে থমকে গেল। আকাশচারীর সমন্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই-ওই যে কালো, সচল ছায়ামূর্তির মতো কী দেখা যাচ্ছে।'

অ্যালবের্টস এবার তিরতির করে নিচে নামতে লাগল।

ফিল ইভান্স হাত নেড়ে গলা ছেড়ে বলতে লাগলেন, 'মি. রোবার, এ ধীপে আমাদের মুক্তি দিয়ে যান। আমাদের কয়েদ করে রেখে দয়া করে নিজের সর্বনাশের প্রথ প্রশস্ত করবেন না। আমাদের বাঁচতে দিন, আর নিজেরাও প্রাণে বাঁচুন।' রোবার গুলিবিদ্ধ পশুর মতো ফুঁসতে লাগলেন।

দ্বিধাদিকজ্ঞানশূন্য আঙ্কল প্রভেট দড়িটার কাছে ছুটে গেলেন। এটা দিয়ে রোবার অ্যালবের্টসকে একসময় বেঁধে রেখেছিলেন। কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছোরাটা বের করে তিনি দড়িটা কেটে দিলেন। সূতো ছেঁড়া গুড়িতে দমকা বাতাস লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনিভাবে অ্যালবের্টস ঝট করে অনেক খানি ওপরে উঠে গেল।

অ্যালবের্টস থেকে মুহূর্মুহ বন্দুকের গুলি ছুটে আসতে লাগল। ইতিমধ্যে বেলুনবাজরা বিশালায়তন একটা পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দিতে পেরেছেন।

অত্যাচারী পরপীড়নকারী নিষ্ঠুর রোবারের কবল থেকে বেলুনবাজরা আজ মুক্ত। জনমানবশূন্য ধীপের ভীতির চেয়ে মুক্তির আনন্দ এ মুহূর্তে, তাঁদের কাছে অনেক অনেক বেশি।

ক্রোধোন্মত্ত রোবার ডেকের ওপর অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে মতলব ভাজতে লাগলেন। বেলুনবাজদের পাকড়াও করে আবার কামরাবন্দি করার আশা এখনো তিনি ছাড়তে পারেন নি। উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'পালাবে? রোবারের কবল থেকে পারিয়ে বাঁচবে—অসম্ভব! সুযোগ মতো আবার তোমাদের পিছনের কয়েদখানায় ঢুকিয়ে তবে আমার নিষ্ঠার। নির্জন-নিরালা পিট আয়ারল্যান্ড থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? ধরা তোমাদের দিতে হবেই। তোমাদের বন্দি আমি করবই করব।'

অ্যালবের্টস মাটি থেকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। রোবার প্রপেলার মেরামত করে আবার পিট আয়ারল্যান্ডের দিকে ছুটবেন মনস্থ করলেন।

সকাল হল। বেলুনবাজরা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা হায় হায় করতে লাগলেন, পলতের আগুন তিরতির করে এগিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ ঘটিয়ে কীভাবে অ্যালবের্টসকে ধ্বংস করে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়—সে দৃশ্যটা চোখে দেখতে পেলেন না বলে তাদের আক্ষেপের সীমা নেই।

ডিনামাইট সংলগ্ন পলতের গা বেয়ে আগুন গুটিগুটি এগিয়ে চলেছে। আকাশচারীদের চোখের আড়ালে ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কাজটা ঘটে চলেছে। সবাই প্রপেলার মেরামতের কাজে ডুবে না থাকলে হয়তো ব্যাপারটা কারো না কারো চোখে পড়ে যেত। এতগুলো লোক অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচত, আকাশযান অ্যালবের্টসও রক্ষা পেয়ে যেত। পলতের গা থেকে মৃদু পটপট আওয়াজ হচ্ছে বটে, হাল্কা গন্ধও বেরোচ্ছে। কিন্তু রোবার ও তাঁর সহকর্মীদের এদিকে মন কোথায় যে, শব্দ ও গন্ধ অনুভব করবে? যত শীঘ্র সম্ভব অ্যালবের্টসকে মেরামতি করে নিয়ে তার পিট আয়ারল্যান্ডের দিকে ঘোরাতেই হবে। পলাতক বেলুনবাজদের মুক্তির সঙ্গে রোবার এর চূড়ান্ত সর্বনাশ জড়িয়ে রয়েছে। পিট আয়ারল্যান্ডেই পলাতকদের আবার কয়েদ করতে হবে।

এমন সময় বাতাসবাহিত বারুদের গন্ধ নাকে এল। উগ্র গন্ধ। আকাশচারীরা উন্মাদের মতো ছুটোছুটি দাপাদপি শুরু করে দিল। টম টার্নার চেঁচিয়ে উঠল, 'সর্বনাশা কাও! হতচ্ছাড়া বেলুনবাজরা বারুদের গুদামে আগুন ধরিয়ে দেয় নি তো?'

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই আকস্মিক আকাশ কাঁপানো শব্দে সবকিছু ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। বিকট শব্দে কেবিনটা ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে গেল। চোখের পলকে বৈদ্যুতিক বাতিগুলো গেল নিভে। ডেকের পিছনের দিকে, যেখানে প্রপেলারের ইঞ্জিন থাকে সেদিক থেকেই ধ্বংসাত্মক কাজটা শুরু হল। প্রপেলারগুলোও ঘূর্ণন বন্ধ করে থেমে গেল।

আকাশযান অ্যালবের্টস তীব্র গতিতে নিচের দিকে নামতে লাগল। আশ্চর্য, ডেকটার বেশ বড় একটা ভগ্নাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে শুকনো পাতার মত বাতাসে ভাসতে লাগল।

রোবার থেকে শুরু করে আকাশচারীদের সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ়। যারপরনাই হতভম্ব। রোবার শক্তহাতে লিভার চেপে ধরে তাঁর সাধের অ্যালবের্টসকে রক্ষা করা জন্য মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে লাগলেন।

না, রোবারের এত চেষ্টা বিফলে গেল। এক সময় বিকট আওয়াজ হল। ব্যাস, উত্তাল, উদ্‌গম সমুদ্রের বুকে অ্যালবের্টসের ধ্বংসাব শেষটুকু মুখ খুবড়ে পড়ে গেল। শেষ! সব শেষ! ইঞ্জিনিয়ার রোবার এবং তাঁর অনন্য সৃষ্টি একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গেল।

সেদিনটা ছিল ১৩ জুন। ফিলাডেলফিয়া শহরে তুমুল কাণ্ড ঘটে চলেছে। সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগল ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের অবিশ্বাস্য কাণ্ডটার কথা। এমন একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড যে কোনোদিন ঘটতে পারে তা তো কারোর ধারণা করার কথাও নয়।

রোবার নামধারী এক অজ্ঞা পরিচয় লোক নাকি ইঞ্জিনিয়ার বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তিনিই নাকি এমন অভাবনীয় কাণ্ডটার নায়ক।

ব্যাপারটা ছেলে বুড়ো সবার মধ্যেই গভীর আতঙ্কের সঞ্চার করল।

দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ চলে গেল। চারদিকে চিরশনি চল্লিশি চালিয়েও ইনস্টিটিউটের সভাপতি, সম্পাদক ও ফ্রাইকোলিনের খোঁজ পাওয়া গেল না। তাঁদের নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে যে আকাশ রহস্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক রয়েছে এমন কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারেন নি।

ব্যাপারটা অচিরেই সবার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশ রহস্যের সঙ্গে গ্রহ নক্ষত্রের কোনোই যোগসাজেশ নেই। আসলে ওটা কোনো প্রাকৃতিক ব্যাপারই নয়। যান্ত্রিকশক্তির কাঁধে ভর করে কোনো কিছু আকাশপথে রহস্য সঞ্চারণের ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভালো কথা, তবে অবিশ্বাস্য যন্ত্রটার আবিস্কর্তা কে? তবেই কি সে লোকটাই যে মাত্র কদিন আগে ভুঁইফোড়ের মতো ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে হাজির হয়ে হুজুতি পাকিয়ে কেটে পাড়েছিল? রহস্য্য সঞ্চারণকারী ব্যক্তিটাই কি রোবার নামে পরিচিত? তবে ক্লাবের তিনজনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে রোবারের কিছুমাত্র হাত থাকতে পারে, একথা কেউ কল্পনাও করতে পারলেন না।

একদিন আচমকা একটা টেলিগ্রাম পেয়ে ক্লাবের সদস্যরা রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। আঙ্কল ফ্রুডেন্ট নস্যর কৌটোয় ভরে অ্যালবট্রেস থেকে যে চিঠিটা ফেলে দিয়েছিলেন টেলিগ্রামে সে-সব কথাই লেখা রয়েছে। ১৩ জুলাই। ঘড়িতে তখন সকাল ১১.৩৭।

এতদিন ধরে যে যন্ত্রণায় ক্লাবের সদস্যরা ভুগছিলেন, যে রহস্যের জালে জড়িয়ে ছটফট করছিলেন, আজ আঙ্কল ফ্রুডেন্টই মুহূর্তের মধ্যে সবকিছুর অবসান ঘটিয়ে দিলেন।

একবারেই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য খবরটা বাতাসে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল।

শহরের মানুষ কিন্তু এমন একটা ব্যাপারকে কিছুতেই সত্য বলে মেনে নিতে নারাজ। কী করেই বা বিশ্বাস করবে? এমন কোনো যন্ত্র থাকতে পারে যে তিন তিনজন মানুষকে তুলে নিয়ে চোখের পলকে একেবারে বোপান্ত হয়ে যাবে?

মাত্র সাতদিন-সাতদিনের মধ্যে অবিশ্বাসীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল। ফরাসি জাহাজ ডাক 'ওয়েলডন ইনস্টিটিউট'-এনস্যর কৌটাটা পৌঁছে দিল। এর মালিক যে আঙ্কল ফ্রুডেন্ট অনেকেই জানে, বহবারই তাঁর হাতে দেখেছে।

মিস ম্যাট এবং মিস ডল কৌটাটা দেখেই মুগ্ধা যাওয়ার জোগাড় হলেন। আর টুকরো টুকরো কাগজে লেখা হলেও, এ যে আঙ্কল ফ্রুডেন্টেরই লেখা তা তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তিনি নায়েশা জলপ্রপাত কোম্পানির বড় অংশীদার।

জুলাই চলে গেল। আগস্টও শেষ হল।

সেপ্টেম্বরের ২৮ তারিখে বেলুনবাজরা বাড়ি ফিরে এলেন। কিন্তু রোবার বা তাঁর অ্যালবট্রেস এবং পালিয়ে পিট আয়ারল্যান্ডের দিন যাপন, তারপর সেখান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে তারা কোনো কথাই বললেন না।

সন্ধ্যায় ওয়েলডন ইনস্টিটিউটে সভা বসল।

পলতের সাহায্যে ডিনামাইটে অগ্নি সংযোগ করে বেলুনবাজরা দড়ি বেয়ে দ্বীপের মাটিতে নেমেছিলেন। দ্বীপটা আসলে জনমানবহীন নয়। অদ্ভুত দর্শন আকাশযান থেকে তিনজনকে নামতে দেখে জনা পঞ্চাশেক দ্বীপবাসী ছোটোছুটি করে কাছে এর। তাদের দেবজ্ঞানে ভক্তি ও আদর যত্ন করতে লাগল। তাদের আশ্রয় ও খাবার দাবার দিল।

এদিকে ডিনামাইট বিস্ফোরণে আকাশযান অ্যালবট্রেস টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে মোচার খোলার মতো ভাসতে লাগল। সে দ্বীপ দিয়ে কদাচিত জাহাজ যাওয়া আসা করে। দ্বীপবাসীদের আতিথ্য গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর একদিন সত্য সভাই জাহাজ ভিড়ল। বেলুনবাজদের দুর্ভাগ্যের কথা শুনে জাহাজের ক্যাপ্টেনের দয়া হল। তিনি তাদের নিউজিল্যান্ডে পৌঁছে দিলেন। তারপর সেখান থেকে তাঁরা নিজের দেশ সানফ্রান্সিসকোতে হাজির হল।

১৯ এপ্রিল। আঙ্কল ফ্রুডেন্ট ও ফিল উভাল ফিরে আসার পর সাত মাস পেরিয়ে গেছে।

ফিলাডেলফিয়া শহর জুড়ে আনন্দের জোয়ার বইছে। দীর্ঘদিনের প্রয়াস এতদিনে পূর্ণ হতে চলেছে। অতিকায় গ্রাস বেলুনটা আজ আকাশে উড়বে। মর্তের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সেটা শূন্যে ভেসে চলবে। একমাত্র হ্যারিটিডেন্ট নামে এক ব্যক্তি বেলুনের সঙ্গে আকাশে উড়বেন। না, তিনিই একমাত্র নন, সভাপতি ও সম্পাদকও অবশ্যই সঙ্গে থাকছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য, 'গো-এহেডের' চেয়ে উন্নত কোনো যন্ত্র যে হতে পারে তা পৃথিবীবাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তার আগেই যদি রোবারের আবিস্কৃত আকাশযান অ্যালবট্রেসের কথা সবাই জেনে যায় তবে তাদের আবিস্কৃত বেলুনটাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না। তাই রোবার এর ব্যাপার স্যাপার ইচ্ছাকরেই বেলুনবাজরা অতিকষ্টে-হলেও চেপে গেছেন। আর সুযোগও তো যথেষ্টই রয়েছেন। কত দিন রাত গুণে আবিষ্কার অ্যালবট্রেসও ধ্বংস হয়ে গেছে। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি এমন বিশালায়তন একটা বেলুন 'গো এহেড', যাকে যথাচিত সম্মান না দিয়ে উপায় নেই। অদ্ভুত কৌশলে তৈরি বেলুনটা ইঞ্জিনের সঙ্গে আটকানো প্রপেলারের সাহায্যে চলবে।

ইঞ্জিনের শক্তিতে প্রপেলার ঘুরে ঘুরে বেলুনটাকে সামনে পিছনে নিয়ে যেতেও সাহায্য করবে। আর ডাইনে বাঁয়েও ঘোরানো যাবে। আর তাকে শক্তি যোগাবে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন অ্যাকুমুলেটর ও ব্যাটারি। এবার সবচেয়ে হাল্কা গ্যাস নিয়ে গো-এহেডকে পূর্ণ করে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা হল। বিশেষ গ্রাসটার নাম হাইড্রোজেন। বৈজ্ঞানিক হেনরি গিফোর্ড এ গ্রাস তৈরির পদ্ধতির আবিষ্কারক।

সেদিনটা ছিল ২৯ এপ্রিল। ফেয়ারমেন্ট পার্কের সুবিশাল প্রান্তরে কৌতূহলী জনতার মেলা বসে গেছে। আঙ্কল ফ্রুডেন্ট আর ফিল উভাল মঞ্চে উঠে আমেরিকার পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

এগারোটা বেজে বিশ। তোপধ্বনি হল। দ্বিতীয় তোপধ্বনি হল এগারোটা পঁচিশে।

আঙ্কল ফ্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্স বাঁ হাত বুকে রাখলেন। আর ডান হাত মাথার ওপর দিয়ে আকাশের দিকে সোজাভাবে তুলে নিলেন।

'গো এহেড' এবার হেলেদুলে আকাশের দিকে উঠে যেতে লাগল।

আঠাশ ফুট উঠেই গো-এহেড থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'ব্যাপার দেখেসবার তো চক্ষু স্থির। 'গো-এহেড' বিকল হয়ে যায় নি তো? না, কিছুই হয় নি। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে যাতায়াত করে বেলুনটার অভ্যাস্য ক্ষমতার পরিচয় দেয়ার উদ্দেশ্যেই আচমকা এমন থমকে যাওয়া, যাকে বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ধাক্কা।

সতাই বেলুনটার গঠন প্রণালী অভ্যাস্য। দরকার হলে ভালব খুলে দিয়ে অনায়াসেই মাটিতেও নামিয়ে আনা সম্ভব। ওপরে উঠতে উঠতে বেলুনটা একসময় হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। ঠিক যেন একটা সচল বিন্দু। ক্রমেই বিন্দুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।

অকস্মাৎ একেবারেই অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্য জনতার চোখে পড়ল। অন্য আর একটা কালো বিন্দু যেন ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। অবিশ্বাস্য তার গতিবেগ। সবাই ভাবছে, তবে কি অন্য একটা বেলুন দ্রুত এগিয়ে আসছে।

রহস্য সঞ্চারকারী কালো বস্তুটা অচিরেই জনতার মাথার ওপরে হাজির হল।

এবার রহস্যসঞ্চারকারী আগন্তুককে গো-এহেডের অবস্থানরত আকাশচাষীরাও দেখতে পেলেন।

উদ্বেগও উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্য থেকে একজন কাঁপা কাঁপা গলায় চিিলিয়ে উঠল, 'অ্যালবেটস! অ্যালবেটস!'

ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। হ্যাঁ, মাথার ওপরে অ্যালবেটসই ভেসে বেড়াচ্ছে বটে।

রোবার। ইঞ্জিনিয়ার রোবারের প্রতিশোধস্পৃহা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড আক্রোশে তিনি বেলুনটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আঙ্কল ফ্রুডেন্ট আর ফিল ইভান্সের ওপর প্রতিশোধ না নিতে পারলে যেন তিনি মরেও শান্তি পানেন না।

কিন্তু একেবারেই অসম্ভব একটা ব্যাপার কি করে সম্ভাবনাময় হলে উঠল। মাত্র নয় মাস আগে তাঁর স্বপ্ন, সাধের অ্যালবেটসের শেষ ভাগ্য অংশটুকু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। রোবার প্রশান্ত মহাসাগর থেকে কি করে জীবন ফিরে পেয়ে আবার আকাশপথে উড়তে পারলেন?

রোবার এবং তাঁর সহকর্মীরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রাণপণ লড়াই করে যাক্ষিলেন। এমন সময় একটা জাহাজ তাঁদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন মৃত্যুপথযাত্রীদের জাহাজে তুলে নিলেন। আর খুঁজে খুঁজে অ্যালবেটসের টুকরোগুলোকেও সাধ্যমত উদ্ধার করলেন।

সেই জাহাজে চেপেই রোবার অষ্ট্রেলিয়ায় হাজির হলেন। অ্যালবেটসের ধ্বংসাবশেষ তাঁর সঙ্গেই রয়েছে। আলমারি থেকে নোটের বান্ডিল নিয়ে আবার এক্স অয়ার্ল্যাণ্ডে হাজির হলেন। এক নাগাড়ে আটমাস কঠোর পরিশ্রমের ফলে অ্যালবেটসকে নতুন করে গড়ে নিলেন। আবার আকাশে উড়লেন। জ্বলন্ত আক্রোশ আর প্রতিশোধস্পৃহা বুকে নিয়ে হাজির হলেন উত্তর আমেরিকায়। খোঁজ খবর নিয়ে গো-এহেডের বৃত্তান্ত জানতে পারলেন। আর জানতে পারলেন, তাঁর চরমতম শত্রু আঙ্কল ফ্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সও রয়েছেন বেলুনে। আকাশে উড়ছেন। ব্যস, আর এক মুহূর্তও নয়। দুর্বীর গতি অ্যালবেটসকে ছুটিয়ে দিলেন। 'গো-এহেড'কে ধরাশায়ী করার জন্য।

'গো-এহেড'র যাত্রী আঙ্কল ফ্রুডেন্ট এবং ফিল ইভান্সের বুঝতে দেরি হল না যে অগ্রসরমান কালো বিন্দুটা কি হতে পারে। তাঁরা এবার মরিয়া হয়ে গো-এহেডের গতি সাধ্যমত বাড়িয়ে দিলেন।

'গো-এহেডকে কেন্দ্র করে অ্যালবেটস দ্রুত চক্রর মারতে লাগল।

গো-এহেডের ধ্বংস অনিবার্য।

এক সময় গো-এহেডের গ্রাস ফুরিয়ে গেল। ব্যস, চোখের পলকে একটা ঝাঁকড়া গাছের ওপর সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

রোবার চোখেমুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'মি. ফ্রুডেন্ট ও মি. ইভান্স, আপনাদের আবার কয়েদ খানায় ফের যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা আমার যে আছে আশা কিরি তা অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন। তবে আমি অবশ্যই তা করব না। বিদায় নেবার আগে আপনাদের একটা কথাই শুধু বলে যাচ্ছি, বিপ্লবাত্মক আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে আকাশ-বিহার সম্পন্ন হবে। আশা করি আপনারা উভয়েই নিজেদের মনকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে তৈরি করে নেবেন।'

বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে রোবার এবার আমেরিকার জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমরা এখনো হাজার বছর পিছিয়ে রয়েছি। অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে অস্বীকার করছি। আমার আবিষ্কার, গোপন রহস্য আমার অন্তরের অন্তঃস্থলেই জমা থাকবে। আমি সে শুভ মুহূর্তের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকব, যেদিন পৃথিবীর মানুষ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে হাসিমুখে স্বাগত জানাতে উৎসাহী হবে।'

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের চৌঠা এপ্রিল আমার সহোদর ভাইমার্ক ডাইডাল এর লেখা একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে, সে আমার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে। আমি যেন পত্র পাওয়ামাত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ওখানে চলে যাই। জায়গাটা অতি মনোরম। মনকে দোলা দেয়। সে জেলায় এমন বহু সম্পদ রয়েছে যা যে-কোনো ইঞ্জিনিয়ারকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। কেবল এটুকু বিচার বিবেচনা করলেই নাকি পথশ্রম মোটেই আমার কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না। আর হা পিতোশও করতে হবে না। এভাবেই চিঠিটা শেষ করা হয়েছে। আসলে এরকম কোনো আকস্মিক চিঠির জন্য আমি মনের দিক থেকে আদৌ তৈরি ছিলাম না।

সত্য বলতে কি, চিঠিটা খোলার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনপ্রাণ বাস্তবিকই শান্ত ছিল। ঠাণ্ডা মাথায়ই শুরু থেকে শেষপর্যন্ত চিঠিটা পড়েছিলাম। এমন কি শেষ লাইনকটা পড়ার সময়ও আমার সামান্যতম চিন্তাচাক্ষুণ্য ঘটে নি। কিন্তু এ শেষ ছত্র কটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল অসাধারণ ব্যাপার স্যাপারের বীজ যার সঙ্গে দুদিন বাদেই আমি নিজেই আক্টেপুঠে জড়িয়ে ফেলতে অগ্রহাশ্রিত হয়ে পড়েছিলাম।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এমন বিদ্যুটে একটা কাহিনী বিশ্বাস করতে কেউ উৎসাহী হবে কি?

জাগা ঠুকে ঝুলে তো পড়ি। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপারটা তো পুরোপুরি আপনার ওপর নির্ভর করছে।

আমার অনুজ মার্ক-এর বয়স তখন আঠাশ চলছে। এ বয়সেই সে যে-কোনো মানুষকে সামনে বসিয়ে ছবি আঁকার ব্যাপারে খুবই খ্যাতি অর্জন করে ফেলেছে। মার্ক আমার চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুবই সম্প্রীতি। খুবই অল্প বয়সে আমাদের মা-বাবাকে হারাতে হয়। ফলে সেই থেকেই ছোট ভাইয়ের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বভার আমাদেরই বহিতে হয়। তখনই তার ছবি আঁকার ব্যাপারে অসামান্য প্রবণতা লক্ষ্য করে আমি তাকে তাতেই প্রেরণা দান করি। ফল তো হাতে নাতেই পাওয়া গেছে। ছবি আঁকাতেই তার অর্থ ও খ্যাতি সবই আসবে, আমি নিঃসন্দেহ।

দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ হাঙ্গেরির নাম করা রাগ শহরে মার্ক-বাস করছে। ইদানীং কিছুদিন ধরে তার মাথায় বিয়ের পোকা ঢুকছে। একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠিত পরিবারগুলির মধ্যে সবার আগে ডা. রোডরিখ-এর নাম করতে হয়। হাঙ্গেরিতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন দাঁতের ডাক্তার খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাদেরই একজন। পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া অগাধ ধন-সম্পদ তো ছিলই, তার ওপর কেবলমাত্র চিকিৎসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। প্রতি বছরই দেশভ্রমণে যেতেন। তখন ধনকুবের অথচ অর্থব পঙ্ক লোকেরা তাঁর ফিরে আসার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকত, তার অবর্তমানে কেবলমাত্র ধনকুবেররাই নয়, পথের ভিখারীরাও মনমরা হয়ে পড়তো। কারণ রোগীর পকেটে একটা ফুটো পয়সা না থাকলেও ডা. রোডরিখ কাউকে হতাশ করে ফিরিয়ে দিতেন না। তার ওপর অমায়িক ব্যবহারের তো তুলনাই হয় না।

ডা. রোডরিখ-এর স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান। তার পুত্রের নাম ক্যাপ্টেন হারালান আর কন্যা মায়রা। আমার অনুজ মার্ক ডাক্তারের বাড়িতে যতবার গেছে যুবতী মায়রার রূপ সৌন্দর্য দেখে যারপরনাই মুগ্ধ হয়েছে। আবার আদর যত্ন পেয়েছে যথেষ্টই। তাই রাগ শহর ছেড়ে আসা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হয় নি। তবে মায়রার রূপে মার্ক যেমন মজে গেছে তেমনি মায়রাও তার প্রতি কম আকৃষ্ট হয়ে পড়ে নি। এমনটা ঘটা কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। আসলে মার্ক-এর মতো আকর্ষণীয় রূপবান যুবক তো সচরাচর চোখে পড়ে না। আর তার মিতকে স্বভাবও যে অতুলনীয়। অল্পেতেই কথাবার্তার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে যেতে তার জুড়ি নেই। মোদ্দা কথা, একজন শিল্পীর পক্ষে যা দরকার, সে রূপ-সৌন্দর্যের পূজা করার প্রবণতাকে তার মধ্যে উপস্থিত।

রূপসী মায়রাকে একবারটি চান্ধুষ করার জন্য আমি নিজেই মানসিক চাক্ষুণ্য অনুভব করছিলাম। মায়রার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আমার অনুজ মার্কও কম উদ্বিগ্ন ছিল না। দায়িত্ব নিয়ে বিয়ের পাট চুকিয়ে দেবার জন্য আমি যেন অন্তত এক মাসের জন্য রাগ শহরে গিয়ে মাথা গুঁজি। আমি গেলে তবেই বিয়ের তারিখ পাকা করা হবে। তবে তার আগে মায়রা নাকি তার ভাবী ভাসুরকে একবারটি চান্ধুষ করতেও অগ্রহী। কারণ, আমার সম্বন্ধে সে নাকি খুবই উঁচু ধারণা পোষণ করে। মার্কের চিঠিপত্রের মাধ্যমেই আমি মায়রার সম্বন্ধে যে টুকু জানা দরকার ও সম্ভব জেনে নিয়েছিলাম। আরও ভালো হলে আমার ভাইটি যদি তার প্রিয়তমার একটা প্রতিকৃতি এঁকে পাঠিয়ে দিত। সে নামি মায়রাকে ছবি আঁকার মডেল হয়ে বসার জন্য প্রস্তাবও দিয়েছিল। সে সম্মত হয় নি। মার্ক-এর চিঠিতে জানতে পেরেছি, মায়রা নাকি আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে চমকে দিতে অগ্রহী, ছবিতে নয়।

অনন্যোপায় হয়ে রাগ শহরে যাত্রা করার জন্য মন স্থির করে ফেললাম।

এপ্রিলের তেরো তারিখ। সেদিন যাত্রা করার কথা। সেদিনই সন্ধ্যার দিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে পুলিশ লেফটেন্যান্ট-এর দপ্তরে গেলাম। আর আমার পাশপোর্টটাও নিয়ে আসার ইচ্ছা। পুলিশ-লেফটেন্যান্ট আমার বন্ধু। পাশপোর্টটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে তিনি আমার অনুজের প্রশংসায় একেবারে পঙ্কমুখ হয়ে পড়লেন। কারণ, আমার অনুজকে তিনি বহুদিন ধরেই চেনেন।

পুলিশ লেফটেন্যান্ট বন্ধু সংক্ষেপে শুভ বার্তাদি বিনিময়ের পর কি যেন বলতে গিয়ে আমতা আমতা করতে

লাগলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে সুবিধার মনে হল না। আমি জোর করে চেপে ধরলে সে যা বলল তা মোটামুটি এরকম—আমার অনুজ মার্ক রাগ শহরে পৌছোনের কয়েক মাস আগেকার কথা। তাঁর বিশ্বাস, মার্ক হয়তোবা ব্যাপারটা জানে আর তাঁর মতে মিস মায়রা যেমন রূপে অনন্যা, গুণের দিকে থেকেও জুড়ি পাওয়া বার। অতএব তার শিখের জন্য সুপাত্রের অভাব হবে না, খুবই স্বাভাবিক। একটা লোক নাকি তার ভালোবাসা পাবার জন্য, বিয়ে করে ঘর-সংসার পাতার জন্য কিছুদিন হলো হয়ে যোরাফেরা করেছে। লোকটা কিন্তু তেমন সুবিধার নয়। সপ্তাহ পাঁচ আগে ব্যাপারটা ঘটেছিল। আমার লেফটেন্যান্ট বন্ধুর তার এক অফিসার বন্ধুর মুখে ঘটনাটা শুনেছিলেন। তিনি এও বললেন ডা. রোডরিখ নাকি তাকে যাচ্ছেতাই বলে অপমান করে বাড়ি থেকে বেরও করে দিয়েছেন। তবে এও ভাবা দরকার, মিস মায়রাকে বিয়ে করতে অত্যাশঙ্কী সে যুবকটাকে কেন্দ্র করে শহরের মানুষ যেভাবে নানা জল্পনা-কল্পনা ও রঙ্গ রসিকতায় মেতেছে, তাকে তো আর হেসে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

আমি তবুও ব্যাপারটাকে পাগু না দিয়ে বললাম—‘ব্যাপারটা জানতে পারায় একদিক থেকে ভালোই হল। আর এও ঠিক গুজব নিয়ে মাথা না ঘামানোই উচিত।’

আমার মুখে ‘গুজব’ শব্দটা শোনামাত্র বন্ধুর লেফটেন্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—‘আরে ভাই গুজব বলে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবেন না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই গুরুত্বপূর্ণ।’

আমি দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘাড় ঘুড়িয়ে বললাম—‘ভালো কথা, আমার ভাই মার্ক-এর প্রতিদ্বন্দ্বী সে যুবকের নামটাই তো শোনা হল না। কি নাম তার, বলুন তো?’

উইলহেম স্টোরিজ। তার বাবা—’

আমি তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলাম—‘তবে যাকে কেমিস্টের পরিবর্তে ‘আলকেমিস্ট বলে সম্বোধন করা উচিত, তাঁর ছেলে কি? তিনি মন্তব্যও এক রসায়নবিদ। আবিষ্কার কম করেন নি তিনি, নামডাকও খুবই।’

‘অবশ্যই। সমগ্র জার্মান জাতির তিনি গর্ব ছিলেন। বছর কয়েক আগে তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্রটি আজও পৃথিবীর বুকে রয়ে গেছেন। মুহূর্তকাল নীরবে থেকে তিনি এবার অপেক্ষাকৃত গলা নামিয়ে বললেন—‘বন্ধু, ভাই ভালো উইলহেম স্টোরিজ ছেলোটা কিন্তু একেবারেই সুবিধার নয়। মোদা কথা, অন্য দশটা ছেলে সাধারণত যেমন হয়ে থাকে উইলিয়াম স্টোরিজ মোটেই সে ধরনের নয়। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতির তো কিছুই থাকতে পারে না।’

আমি তার হাত চেপে ধরে করমর্দন সারতে সারতে বললাম—‘আপনার আন্তরিক ও সৎ পরামর্শের কথা অবশ্যই মনে রাখব। মিস মায়রা যতদিন না আমার ভ্রাতৃবধূ হয়ে ঘরে আসছে ততদিন অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করবই।’ কথা বলতে বলতে আমি পুলিশ লেফটেন্যান্ট-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় নামলাম।

দশই এপ্রিলের কথা। সেদিন আমি প্যারিস থেকে যাত্রা করলাম। অস্ত্রিয়ার রাজধানীতে পৌছাতে দশদিন লেগে গেল। তারপর অল্প সময়েই বুদাপেস্ট শহরে হাজির হলাম। সেখানে দিন কয়েক থেকে পশ্চিম দূর করে একটু চাঙা হয়ে নিলাম। সেখান থেকে যাত্রা করার আগের সন্ধ্যায় এক নামকরা রেস্টোরাঁয় বসে দেশী মদের সন্ধ্যাবহার করতে করতে সংবাদপত্রের পাতায় অলসভাবে চোখ বুলাতে গিয়ে এক জায়গায় আচমকা থমকে গেলাম। দেখি, বড় বড় হরফে ‘স্টোরিজ বার্ষিকী উদযাপন’ শব্দে তিনটি ছাপা রয়েছে।

আচমকা যেন একটা হোঁচট খেলাম। স্মৃতির পাতা উল্টে নিঃসন্দেহ হলাম, ‘স্টোরিজ’ নামটাই বন্ধুর পুলিশ লেফটেন্যান্টের মুখে শুনেছিলাম। হ্যাঁ, ইনিই তবে সেই জার্মান যুবক যিনি মায়রা রোডরিখকে বিয়ে করার জন্য অত্যাশঙ্কী আশ্রয়ী। সংবাদপত্রের বক্তব্যটুকু এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিঃসন্দেহ হলাম। সংবাদপত্রের বক্তব্য আর প্রায় তিন সপ্তাহের ভেতরে মে-র পঁচিশ তারিখে শ্রেমবর্গে অটোস্টোরিজ এর বার্ষিকী উৎসব উদযাপন করা হবে। এ উপলক্ষে এখানে, পণ্ডিত প্রবরের জন্মস্থানে বিপুল জনসমাগম প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

অন্যান্যসাধারণ এ বৈজ্ঞানিকের মহামূল্য আবিষ্কার জার্মানের মুখ উজ্জ্বল করেছে, আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথকেও প্রশস্ত করেছে।

না, প্রবন্ধকার একতিলও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলেন নি। অটোস্টোরিজ-এর বার্ষিকী উৎসব বৈজ্ঞানিক মহলে এমন করেই উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, খুবই সত্য বটে।

প্রাবন্ধিক মহাশয়ের পরের বক্তব্যটুকু আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম অটোস্টোরিজ-এর জীবদ্দশায় সবাই তাকে যে একজন কৃতী যাদুকার বলে ভাবত, তা কার না জানা আছে? তবে হ্যাঁ, এরকম ধারণা যারা আত্মভাজন তারা অলৌকিক ও অতি প্রাকৃত ব্যাপারেও খুবই বিশ্বাসী ছিল। যদি দু-এক শতক আগে হত, তাকে এ অপরাধের জন্য গারদে পোরা হত আর বাজারের খোলা প্রান্তরে জ্যাণ্ড পুড়িয়ে কৃতকর্মের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হত। আরও বলা যায়, অটোস্টোরিজ পরলোক গমন করলেও এ ব্যাপারটা অনেকের মধ্যে বেশি পাকা হয়েছে যারা অলৌকিক ব্যাপার-সাপারের প্রতি খুবই আস্থাশীল। সেজন্য বলতেই হয় অটোস্টোরিজ যে কেবলমাত্র একজন যাদুকার তা-ই নয়, অলৌকিক ক্ষমতাবান। তিনি কিন্তু তাঁর যাদুমন্ত্র এবং অতি প্রাকৃত ক্ষমতা কাউকে দান করে যান নি। তাই তাঁর গুণগ্রাহী অনুরাগীরা কিছুটা অন্ততঃ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। তিনি লব্ধ বিদ্যা নিয়ে সমাধিস্থ হওয়ার পরও তার অনুরাগীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে একজন কুহক মন্ত্রের গুরু এবং যাদুকার হিসেবে চিরজাগরুক থাকবেন।

সংবাদপত্রের পাতায় এ খবরটা দেখে অন্য যে যা-ই মনে করুক আমি কেবলমাত্র একটা ব্যাপারই ভাবছি, বরাত খুবই ভালো যে ডা. রোডরিখ অটোস্টোরিজ-এর গুণবান ছেলেকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। নইলে খবরটা পড়তে গিয়েই আমার গায়ের রক্ত হিম হতে শুরু করত।

শেষের দিকটা এভাবে শেষ করা হয়েছে—তাই সমাধি প্রাঙ্গণে যে দলে দলে লোক এসে জড়ো হবে এতে জল ভান-১১(ক)

কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। অন্যান্য বার্ষিকী উৎসবে যা ঘটে এক্ষেত্রেও তা-ই ঘটবে। আসলে অটোষ্টোরিজ-এর হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুগামীরা সংখ্যায় কম নয়। তাদের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি তার অভ্যাস ও বিচিত্র কার্যকলাপের মধ্যে এখনও জীবিত রয়েছেন। এতে আরও একটা চিন্তা মনে জাগা কিছুমাত্রও আশ্চর্যের নয়। চিন্তাটা হচ্ছে শ্রেমবার্গের কুসংস্কারশ্রমী মানুষগুলোর জন্য।

বার্ষিকী উৎসবের দিন তারা আশায় আশায় থাকবে খুবই অদ্ভুত কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্য। শহরের পথে-ঘাটে, হোটেল-রেস্তোরায়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই হয়ে চলেছে। একেবারে অভ্যাস ও অবিশ্বাস্য কিছু ঘটনা নাকি সমাধি প্রাপ্তনেই ঘটতে দেখা যাবে। সবাইকে চমকে দিয়ে অকস্মাৎ সমাধির পাথর ঠেলেঠেলে বিজ্ঞ ব্যক্তিটি যদি মানবদেহ নিয়ে ওপরে উঠে আসেন, আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, তবে মনে হয় না কেউ তেমন অবাক হবেন।

কেউ কেউ এমনও মনে করেন, অটোষ্টোরিজ-এর মৃত্যু হয় নি, কিছুতেই তিনি মরতে পারেন না। তাঁর কবরটারও পারলৌকিক কার্যাদি নাকি শ্রেফ একটা ধাঙ্গাবাজি। বাজে ব্যাপার-স্বাভাবিক নিয়ে খুটমুট সময় নষ্ট করার ভিলমাত্র ইচ্ছাও তাদের নেই। কুসংস্কারকে তো আর যুক্তি বুদ্ধির গম্বীর মধ্যে আগলে রাখা সম্ভব নয়, ডাঁহা মিথ্যা কথা। ব্যাপারটা এতই মিথ্যা যে, এ নিয়ে ভাবনা চিন্তার অর্থই হচ্ছে সময়ের অপব্যবহার করা। তবে এও ঠিক যে, বাপের মৃত্যু হয়েছে এটা যেমন সত্য, তেমনি সত্য, ছেলের বেঁচে থাকার ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তাঁর ছেলে উইলিয়াম ষ্টোরিজ বেঁচে রয়েছেন। বাপ অটোষ্টোরিজ মরে পরপারে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর গুণধর ছেলেটা তো মর্ত্যলোকেই রয়ে গেছে। আর তাকেই তার বাবা পইপই করে বারণ করে গেছে সে যেন ভুলেও রোডরিখ পরিবারের বাড়ির ত্রি-সীমানা না যায়। যত ভয় তো এজন্যই। ক্রোধ আর হিংসার শিকার হয়ে তিনি মার্ক-এর সর্বনাশ করবে না তো? বিয়েটা ভেঙে দেবে না তো? ক্রোধ আর হিংসার যে অসাধা কিছুই নেই। তবে? তা-ই যদি হয়-তবে?

বাস, আর দেরি নয়। 'অনুজ মার্ককে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম পরের দিনই বুদাপেস্ট থেকে আমি রওনা হচ্ছি। এক শ' পঁচানব্বই মাইল দূরবর্তী রাগ শহরে এগারোই মে বিকালে পৌঁছে যাব।

পরেরদিন সকাল আটটায় 'রোথি' জাহাজ বন্দর ছেড়ে গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। অস্ট্রিয়ার রাজধানী থেকে একেবারে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত যাবে মাত্র পাঁচ-ছ-জন। তাদের মধ্যে একজন ইংরেজ যাত্রীও চলেছেন ডেকের ওপর একজন বিচিত্র দর্শন লোকের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। তার বয়েস পঁয়ত্রিশ তো হবেই। রুক্ষ-রুট লিকলিকে চেহারা। কণ্ঠস্বরও রীতিমতো কর্কশ। তার চালচলন কথাবার্তার মাধ্যমে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জাহাজের যাত্রীদের ব্যাপারে ভিলমাত্র অগ্রহ বা কৌতুহলও তার নেই। সে আমাকে আকর্ষণ করেছিল বলেই তার সম্বন্ধে আমার মনে নানা ভাবনার উদয় হচ্ছিল। ভাবলাম, লোকটা কোন জাতের? চেহারার ছিঁরি দেখে তো মনে হচ্ছে জার্মান। প্রুশিয়ার অধিবাসী হওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশি।

এবার খুবই সাধারণ একটা ঘটনা ঘটল। আমার বাস্ফটার কাছে তখন আমি দাঁড়িয়ে। আমার নাম, ঠিকানা ও পদমর্যাদা লেখা কাগজ বাস্ফটার গায়ে সাঁটা রয়েছে। আমি রেলিঙে ভর দিয়ে দূরের পাহাড় ও গাছগাছালির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ সময় হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার পিছনে দাঁড়িয়ে ঝট করে পিছন ফিরতেই অবাক হতে হল। কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবে আমাকে চোখে চোখে রাখার ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। তাই পিছনে কাউকে দেখতে না পেয়ে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার জোগাড় হল। স্তম্ভিত আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। একসময় লক্ষ্য করলাম, সবচেয়ে কাছের লোকটার সঙ্গে আমার ব্যবধান কম হলেও হাত চল্লিশেক তো হবেই। নিজের ব্যবহারের জন্য নিজেকেই দায়ী করতেই হল। নিজের ভীত প্রকৃতির জন্য অবাকও কম হলো না। এমন অতি সামান্য একটা ব্যাপার মনের কোণে গোঁথে রাখার মতোও নয়। তাই সহজেই সেটাকে মন থেকে ঝেড়ে দিয়ে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনলাম। ব্যাপার যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মনে গোঁথেই রইল। কারণ, এরপর যা ঘটল তা আমি ভুলেও ভাবতে পারি নি।

পরের দিন আমাকে কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় নি।

নয়ই মে সকাল নয়টার কাছাকাছি ঘটনাটা ঘটল। আমি কেবিনে ঢুকছি ঠিক তখনই জার্মান সহযাত্রীটা কেবিনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। উভয়ের সামনা-সামনি ধাক্কা লাগার জোগাড়। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে পাশ কাটানো সম্ভব হল। লোকটার চাহনি বাস্তবিকই অস্বাভাবিক। তার চোখের মণি দুটোতে জুলন্ত ঘৃণার ছাপটুকু আমার নজড় এড়ায় নি। এই প্রথম আমি তার সামনা-সামনি হয়েছি।

আমি তো তার হাবভাব দেখে রীতিমতো স্তম্ভিত। আমার ওপর তার এত ক্ষোভ কেন? এত ঘৃণারই বা কি থাকতে পারে? তবে কি আমি ফরাসি বলেই তার এত ক্ষোভ ও বিদ্বেষ? আমার বাস্ফটার গায়ে লেখা নাম-ঠিকানা দেখেই কি সে এমন রেগে মেগে লাল হয়ে উঠেছে?

দশই মে। সেদিন লোকটা পর পর বেশ কয়েকবারই আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। প্রত্যেকবারই এমন চোখ গরম করে তাকিয়ে চলে গেল যাতে আমার মেজাজ একেবারে পঞ্চমে চড়ে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! তার কোনো বক্তব্য থাকলে সামনা-সামনি বলে ফেললেই তো ল্যাটা চুকে যায়। ফরাসি ভাষা সে যদি না-ও জানে কোনো সমস্যা নেই। জার্মান ভাষাও তো আমার ভালোই রপ্ত রয়েছে।

আমি মনস্থ করে ফেললাম বাস্তবিকতার সুযোগ আসুক আর না-ই আসুক সবার আগে আমাকে টিউটন লোকটা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে হবে। আমি সরাসরি জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করায় ভুরু কঁচকে বললেন, তিনি নাকি তাকে এ-জাহাজে এবারই প্রথম দেখছেন। লোকটা জার্মান, এছাড়া তার সম্বন্ধে আর কোনোই উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না।

আমাদের জাহাজ ডরোথি, ভুকোভার বন্দরে নোঙর তোলার পর অদ্ভুত চরিত্রের লোকটাকে আর নজরে পড়ল না। তাই ধরেই নিলাম, সে ভুকোভার বন্দরেই নেমে গেছে। যাক, বাঁচা গেল। আমার দিকে বড় বড় চোখ করে, ক্রোধপূর্ণ

দৃষ্টিতে তাকাবার ব্যাপারটা নিয়ে আর কথা বা জিজ্ঞাসাবাদ করার দরকার পড়ল না। তখন বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি। কতগুলো গির্জার চূড়া আমার বাঁ দিকে উঁকি দিল। রাগ শহরের গির্জা। এবার পুরো শহরটাই চোখের সামনে ভেসে উঠল। আর দেখা দিল হাসেরির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন কেল্লা।

জাহাজ জেটি স্পর্শ করল। বাস, ঠিক সে মুহূর্তেই ঘটে গেল দ্বিতীয় ঘটনাটা। নৌকায় ওঠা-নামার পথেরপাশে ঘাটের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে আমি দাঁড়িয়ে। কিছু লোক জেটির শেষ প্রান্তে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমার অনুজ মার্ক যে তাদেরই একজন এতে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি এদিক-ওদিক হেলেদুলে তার মুখটা খুঁজে চলছি। ঠিক তখনই আমার ঠিক পিছন থেকে কঠরুটার ভেসে এল—‘মার্ক যদি মায়রাকে বিয়ে করে তবে তার সর্বনাশ অনিবার্য, জেনে রাখবেন।’

অতর্কিতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকলাম। দেখি, ভোঁ-ভোঁ, ফাঁকা। পিছনে তো দূরের কথা ধারে কাছেও কেউ নেই। আমি একদম একা। তবু কে যেন আমাকে সতর্ক করে দিয়ে গেল। কঠরুটার মোটেই আমার অপরিচিত নয়, ও অশ্রুতপূর্ব নয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! আমার কাছাকাছি কেউ-ই নেই। হক চকিয়ে গেলাম। চোখের মণি দুটোকে চারদিকে শেষবারের মতো বুলিয়ে নিলাম। অনন্যোপায় হয়ে পাড়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টায় মন দিতেই হল। একে-ওকে গোত্তা মেয়ে, বার কয়েক ঠেলাধাক্কা খেয়ে মার্ক-এর দিকে এগিয়ে চললাম।

হ্যাঁ, আমার অনুমান ভ্রান্ত। দেখি, অনুজ মার্ক আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছটফট করছে।

মার্ক-এর ঠিক পিছনে, প্রায় গা-ঘেঁষে সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে।

মার্ক তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তার ভাবী শ্যালক। বয়স বেশি হলেও আটাশ। মিলিটারি অফিসার, ক্যাপ্টেন। তার চোখ-মুখের গর্ভীয় ও হাবভাব দেখলে স্পষ্ট মনে হয়, যেন হুকুম তামিল করা নয়, হুকুম করার জন্যই তার জন্ম। পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে মার্ক বলল—‘ইনি ক্যাপ্টেন হারালান রোডলিস। আমার ভাবী শ্যালক।’

সে করমর্দন সারতে সারতে বলল—‘আপনাকে কাছে পেয়ে আমার পরিবারের সবাই খুবই খুশি হবে। সত্য বলতে কি, সবাই আপনার প্রতীক্ষায় বসে।’

সামান্য অলীপ পরিচয়ের মাধ্যমেই জানতে পারলাম, ক্যাপ্টেন হারালান ফরাসি ভাষায় কথা বলতে খুবই পটু। তার পরিবারের সবার এ ভাষাটা রপ্ত করা আছে। ফ্রান্সে তারা গেছেও বেশ কয়েক বার। আর আমার এবং অনুজ মার্ক-এরও জার্মান ভাষা ভালো রপ্ত রয়েছে। ঠেকা কাজ চালানোর মতো হাসেরিও একটু আধটু জানা আছে।

গাড়িতে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে মার্ক এক সময় বলল, প্যারিস ছেড়ে আসার পর সে কীভাবে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এ শহরে এসে নোঙর ফেলেছে। শ্রেমবার্গ আর ভিয়েনাতে চিত্র শিল্পী হিসেবে সে আকাশছোঁয়া সম্মান খাতির পেয়েছে। মোদা কথা, তার মুখে যা কিছু শুনলাম তাতে আমি মোটেই অবাক হই নি। তার স্বাক্ষর যুক্ত শিল্পকর্ম নিয়ে ধনকুবের ম্যাগিয়ার আর অস্ট্রিয়ানরা যে কাড়াকাড়ি করবে এ বিশ্বাসটুকু আমার রয়েছে। তার মুখ থেকে এও শুনলাম, চারদিক থেকে এত বায়না আসছে যে, কিছুতেই সে চাহিদা মিটিয়ে উঠতে পারছে না। সে নিজের কাজের অগ্রগতির কথা এক নিঃশ্বাসে বলে যেতে লাগল।

আমি একসময় দুম্ব করে বলেই ফেললাম—‘ভাই, বিয়েটা কবে হচ্ছে, বল তো?’

কথাটা শেষ হতে না হতেই গাড়িটা সজোরে একধাক্কা দিয়ে থেমে গেল।

আহারাতি সেরে চুকট মুখে দুভাই দানিয়ুব নদীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। একটু বাদেই নদীর পাড়ে হাজির হলাম। নদীর পাড় বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ডেরোথি জাহাজ থেকে নৌকায় নামার পূর্বমূহর্তে যে সতর্ক বাণীটা শুনে ছিলাম সেটা আমার বুকের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। ব্যাপারটাকে আমি এখনও নিছকই ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করছি। আর যদি সত্যতা কিছু থেকেই থাকে তবে কার ওপর দোষারোপ করব? যে আত্মজরী জার্মান যুবক বুদা পেস্ট থেকে জাহাজে উঠে ভূকোভারে নেমে গিয়েছিলেন তার ওপর? হ্যাঁ, করলেও করা যেতে পারে বটে। সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে একটা গাঁজাখুরি ব্যাপার বলেই মনে হল। তাই আমার অনুজ মার্ক-এর কাছে ব্যাপারটা চেপেই গেলাম। ঠিক করলাম, তার চেয়ে বরং উইলহেম স্টোরিজ সম্বন্ধে দু-চার কথা যা শুনেছি সে প্রসঙ্গেই কিছু আলোচনা করি।

মার্ক খুবই হাক্কাভাবে বলল—‘লোকটার ব্যাপারে হারালান-এর মুখে আমি আগেই কিছু কিছু শুনেছি। সে নাকি সর্বজন পরিচিত সুপণ্ডিত অটো স্টোরিজ-এর একমাত্র পুত্র। জার্মানির সবার কাছে অটোস্টোরিজ-এর পরিচয় একজন কৃতী যাদুকর। তা ছাড়া পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যাতে খুবই মূল্যবান কিছু আবিষ্কার করে তিনি আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।’ মুহূর্তকাল থেমে তাজিল্যের সঙ্গে সে এবার বলল—‘তবুও তাঁর একমাত্র ছেলটাকে রোডরিখ পরিবার প্রত্যাখ্যান করেছে।’

এবার মার্ক যা বলল তা হল—‘রোডরিখ পরিবার তার প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দানের চার-পাঁচ বছর আগেই বৈজ্ঞানিক অটোস্টোরিজ-এর ছেলের প্রস্তাবকে নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। উভয় ঘটনার মধ্যে কিছুমাত্র সম্পর্কও নেই। মিস মায়রা হয়তো জানতই না যে, উইলহেম স্টোরিজ তাকে বিয়ে করার জন্য ঘুরঘুর করছে। কোনো আশাই নেই নিঃসন্দেহ হাওয়ায় উইলহেম জল ঘোলা না করে মুখ বুজে ব্যাপারটাকে হজম করে নিয়েছিল।’

আমি অত্যন্ত অগ্ন্যহ প্রকাশ করে বললাম—‘আশা নেই? কেন? আশা না থাকার কারণ কি, জান কিছু?’

‘কারণ একটাই, উইলহেম স্টোরিজ আসলে একবিচিত্র চরিত্রের যুবক। কারো সামনেই যায় না। কেউ দেখা করতে চাইলেও তার দেখা পায় না। বুলেভার্ড টেকেলির নির্জন-নিরলা বাড়িতে সে বাস করে। পাড়া ছাড়িয়ে বাড়িটা। ভুলেও কেউ সে পথে যায় না। আর একটা কথা, জাতিতে জার্মান তাকে ডা. রোডরিখ যে দুচোখ পেতে দেখতে পারবেন না, আশ্চর্য কি? বাসলে টিউটনিক জাতিকে হাসেরিয়ানরা মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না। আমি দু-চার-দিন উইলহেমকে দেখেছিমাত্র। বাসে, একটু-ই। তবে সে আমাকে দেখতে পায় নি। ক্যাপ্টেন হারালান আমাকে একদিন দূর থেকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।’

আমি অগ্রহাশ্রিত হয়ে বললাম—‘আর একটা কথা, উইলহেম কি এখনও রাগ শহরে অবস্থান করছে?’

‘বলা মুশকিল। তবে দু-তিন সপ্তাহ তাকে চোখে পড়ে নি।’ এবার রীতিমতো দৃঢ়তার সঙ্গে মার্ক বলল—‘আমার কথা শোন, উইলহেম যোগানেই থাক না কেন সে কোনোদিনই মায়রাকে সহধর্মিণী হিসেবে পাবে না, নিশ্চিত জেনো।’

আমি জেটির ওপর দিয়ে হাঁটাচলা চালিয়ে যেতে লাগলাম। উদ্দেশ্য বিহীনভাবে অবশ্যই নয়। একটু বাড়েই একটা রহস্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে হতেই হল। আমার স্পষ্ট মনে হল, কে যেন আমাদের পিছন পিছন হাঁটাচলা করছে। নীরবে অনুসরণ করে চলেছে। আমাদের মধ্যে সন্দেহজনক কোনো কথা আলোচনা করছি কিনা জানার জন্যই তার এ তৎপরতা।

আমার মানসিক পরিস্থিতির কথা মার্ক-এর কাছে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখতে গিয়ে বললাম—‘তোমার বিয়ের জন্য অত্যাৱশ্যক যা কিছু কাগজপত্রের কথা লিখেছিলে সবই আমি সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।’

টুকরো টুকরো আরও কিছু কথা বলতে বলতে আমরা হোটেলের সদর-দরজায় ফিরে এলাম। হোটেলে ঢোকান মুখে ভাবলাম, কে যেন আমার পিছন পিছন এতক্ষণ হেঁটে এসে আমার প্রায় গা-ঘোঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে আমার পিছনে ঐটুলির মতো লেগে রয়েছে। ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন ফিরলাম। না, রাস্তা একেবারেই ভোঁ-ভোঁ-জন মানব শূন্য। একটা কাকপক্ষীও চোখে পড়ল না।

আমি আর অনুজ মার্ক বৈশভোজ সেরে শুয়ে পড়লাম। আমি দু-চোখের পাতা এক করতে না পারায় বিছানায় শুনে নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটাতে লাগলাম। জাহাজ থেকে নামার পূর্ব মুহূর্তে ডেকের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মার্ক-এর খোঁজ করার সময় যে ভাষায় ও শব্দে আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিল আচমকা ঠিক তা-ই শুনতে পেলাম। তদ্রাশ্রন অবস্থায় হুবহু সেই একই কথা আমার কানে এল। বাকি রাত্রিটুকু আর দু-চোখের পাতা এক রাখতে পারলাম না।

সকাল হল। বিছানা ছেড়ে ওঠে পড়লাম। সেদিন সকালেই রোডরিখ-এর সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক আলাপ পরিচয় ঘটল।

আমি অনুজ মার্ক-এর সঙ্গে গ্যালারির ধার দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, একটা ইজোলে অসমাপ্ত একটা প্রতিকৃতি। মিস মায়রার প্রতিকৃতি। তার তলায় আমার অনুজের স্বাক্ষরটা জ্বলজ্বল করছে।

ডা. রোডরিখ-এর সঙ্গে মার্ক আমার পরিচয় করিয়ে দিল। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চালচলন ও চেহারা দেখলে কিন্তু এত বয়স মনেই হয় না। আর মিসেস রোডরিখ? তার বয়স ‘পঁয়তাল্লিশ হবে হয়তো। একজন আদর্শ ঘরপীর যা কিছু গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় সবগুলিই তাঁর মধ্যে বর্তমান।

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম, মার্ক মায়রার রূপলাবণ্যের ব্যাপারে যা বলেছিল এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলেনি। একটু আগে ক্যানভাসের গায়ে আলো তার প্রতিকৃতি দেখে রূপ-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলাম। এখন চাক্ষুস করেও একইভাবে প্রশংসা না করে পারলাম না।

তখন ক্যান্টেন হারালানও সেখানে উপস্থিত ছিল। হাত বাড়িয়ে ভ্রাতৃত্বাবে করমর্দন করল। একে একে পুরো পরিবারটার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল। গড়ে উঠল হৃদ্যতার সম্পর্ক। রাতে এক টেবিলে বসে আমরা ভোজ সারলাম। মায়রা মিষ্টি-মধুর গলায় হাসেরিয়ান সঙ্গীত পরিবেশন করে আমাকে আপ্যায়ন করল।

হোটেল ফিরতে ফিরতে বেশ রাত্রি হয়ে গেল। মার্ক আমার ঘরে এসে মুচকি হেসে বলল—‘মায়রার রূপ লাবণ্যের ব্যাপারে যে বলেছিলাম, হুবহু মিলে গেছে তো? পৃথিবী ঘুরে এলে তার জুড়ি আর কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় কি?’

‘কী বলছ তুমি! জুড়িদার? অসম্ভব।’

পাখির ডাকে সকাল হল। ক্যান্টেন হারালান হোটেলের আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। চা-পর্ব সেরে সে আমাকে রাগ শহর দেখাতে নিয়ে গেল।

জাহাজের জেটিতে এবং রাতে ঘুমের ঘোরে শোনা সতর্ক বাণীর কথা অনুজ মার্ককে বললেও তার ভাবী শ্যালক হারালানকে কিছুই বলি নি।

রাগ শহরের বিভিন্ন দৃষ্টবস্থান দেখতে দেখতে এক সময় হারালান আমাকে নিয়ে বিশালায়তন একটা বাড়ির সদর দরজায় হাজির হল। সেটা প্যালেস। তিন সপ্তাহের ভেতরে মার্ক আর মায়রাকে আসতে হবে। এখানে গভর্নরের কাছ থেকে বিয়ের অনুমতি নিয়ে তবে গির্জায় যেতে হবে বিয়ের পাট মেটাতে। এটা বহু পুরনো প্রচলিত স্থানীয় প্রথা। তার অনুমতি না পেলে বিয়ে কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়। এখন সমস্যা হচ্ছে, গভর্নর যদি কোনো কারণে বৈকে দাঁড়ান তবে তাদের কেউ অন্য কাউকেও বিয়ে করতে পারবে না।

বিয়ের অবিশ্বাস্য প্রথার কথা শোনাতে শোনাতে ক্যান্টেন হারালান সেন্ট মাইকেল গির্জার দিকে যেতে গিয়ে বাজারের ধারে পৌছেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখলাম, এক জায়গায় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে চিৎকার চোঁচামেচি করছে। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, এক সজ্জি বিক্রেতা বুড়ো আচমকা একজনের ঘাড়ে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে হৈ হুটগোল। বুড়োটা বার বার কান্দো কান্দো শব্দে বলছে—‘আমি নিজের ইচ্ছাতে তার ঘাড়ে পড়ি নি। কে যেন আমচকা আমাকে এমন এক ধাক্কা মেরেছে যার ফলে আমি নিজেকে সামাল দিতে না পেরে তার ঘাড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছি।’

ক্যান্টেন হারালান এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে বুড়োটার মুখ থেকে যা শুনল তা বাস্তবিকই রহস্যজনক এক ঘটনা। বুড়োটা ধাক্কা খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে পিছনে অনুসন্ধিস্ন নজরে দৃষ্টিপাত করে ধারে-কাছে কাউকেই নাকি দেখতে পায় নি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কিন্তু কি করে এমন একটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটা সম্ভব? দুটো কারণে বুড়োটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। হয় নির্ধাৎ কেউ না কেউ তাকে ধাক্কা মেরেছে, নতুবা ঝড়ো বাতাসের চাপ সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু ঝড় তো দূরের ব্যাপার, দমকা

বাতাস পর্যন্ত ছিল না যখন বুড়োটা হুমড়ি খেয়ে লোকটার ঘাড়ের গিয়ে পড়েছে। এমনও তো হতে পারে বুড়োটা যে কাহিনীর অবতারণা করছে তাতে আসলের চেয়ে খাদের পরিমাণই বেশি। আবার চাষিটা এও স্বীকার করছে না যে, সে মদ বা অন্য কোনো মাদক দ্রব্য সেবন করে এরকম কাণ্ডটা বাঁধিয়েছে। রহস্যজনক ব্যাপারটার নিষ্পত্তি কিছুতেই হল না।

আমি ক্যাপ্টেন হারালান-এর পাশাপাশি আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সে আমাকে পূর্ব প্রসঙ্গ, তাদের দেশের প্রচলিত বিয়ে প্রথার ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল। তারপর প্রসঙ্গান্তরে যেতে গিয়ে বলল—‘আমাদের দেশের মানুষ খুবই কুসংস্কারের প্রতি আস্থাবান। ভূত-প্রেত ও দৈত্য-দানো প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারে খুবই বিশ্বাসী। এসব ব্যাপার-স্বাভাবিক নিয়ে অভ্যাস ও মুখরোচক বহুকাহিনী এখানকার মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়।’

আমি তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম। মনে মনে বললাম—‘এ যে কী দুর্বলত, কতখানি মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তা আমি নিজেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি!’ আমরা হাঁটতে হাঁটতে আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করে বাগানের ধারের একটা নির্জন-নিরালা বাড়ির সামনে হাজির হলাম। এক নজর দেখলেই মনে হয় বাড়িটা নির্ধাৎ পরিত্যক্ত।

হারালান বলল—‘অদ্ভুত একটা লোকের বাড়ি ওটা। এক জার্মান ভদ্রলোক এর মালিক। ফ্রিশিয়ান।’

হঠাৎ বাড়িটার দরজা খুলে দুজন লোক বাইরে এসে দাঁড়াল। তাদের একজনের বয়স ষাট, আর দ্বিতীয় জনের অনেক কম। তাদের দেখেই ক্যাপ্টেন হারালান বলে উঠল—‘এ কেমন হল! আমি ভেবেছিলাম, লোকটা এখান থেকে কেটে পড়েছে!’ দ্বিতীয় ব্যক্তিটা উঠোন পেরিয়ে মুখ তুলে তাকানো মাত্র মনে হল সে এবং ক্যাপ্টেন হারালান পরস্পরের পরিচিত। লোকটাকে দেখে আমিও চিনে ফেললাম। বুদাপেস্ট থেকে আসার সময় ডেরোথি জাহাজে তাকে দেখে ছিলাম বটে।

ক্যাপ্টেন হারালান বলল—‘লোকটা এখানে না থাকলে খুব ভালো হত। আমার সঙ্গে তার সাপে-নেউলে সম্পর্ক। তার স্পর্শ গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। আমার বোনকে সে বিয়ে করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগেছিল। আমি আর বাবা ধরতে গেলে ঘাড়খান্না দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম।’

আমি আপনমনে সন্মানে বললাম—‘হ্যাঁ, সে লোকটাই তো বটে! এর নাম উইলহেম স্টোরিজ। শ্রেমবার্গে বাড়ি। বিখ্যাত কেমিস্ট অটো স্টোরিজ-এর গুণধর পুত্র।’ জানতে পারলাম, হারমান নামে তার একটা ভূত্যা আছে।

এবার আমার মনে ধারণাটা পাকা হল, নদীর ধারে বেড়ানোর সময় এ লোকটাই আমার পিছু নিয়েছিল। রাগ শহরে যেদিন পা দিলাম সেদিনই ঘটনাটা ঘটেছিল।

আমি মনস্তির করে ফেললাম, উইলহেম স্টোরিজ-এর সঙ্গে আমার আর হারালান-এর সাক্ষাতের ব্যাপারটা আমার অনুজ মার্ক-এর কাছে ফাঁস করব না। হোটলে ফিরে গেলাম। অন্য বহু প্রসঙ্গ নিয়ে মার্ক-এর সঙ্গে কথা হল। কিন্তু জুলেও উইলহেম স্টোরিজ-এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম না।

সকালে সবে চায়ের টেবিলে বসেছি, ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হারালান এসে জানাল, তার বাবা বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আমি তাঁর মুখোমুখি হতেই ডা. রোডরিখ বললেন—‘আমার ছেলে হারালান এর সামনেই আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনার ভাই আর আমার মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গে। যে-কথা আমি বলতে চাইছি তা আমার স্ত্রী, আমার কন্যা এবং আপনার অনুজ কিছুই জানেন না। সবকিছু শুনলে বিচার বুদ্ধি দিয়ে আপনিই পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে এবং আমার বক্তব্যের সভ্যাসত্যও যাচাই করতে পারবেন।’

তাঁর কথার ধাঁচ দেখে বুঝলাম, টেকেনিতে উইলহেম-এর সঙ্গে আমার আর ক্যাপ্টেন হারালান-এর সংঘর্ষের সম্পর্ক বিদ্যমান।

ডা. রোডরিখ যা বললেন তা হল—গতকাল বিকালে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা বেড়াতে বেরিয়েছিল। তিনি নিজে রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। চাকর এসে জানাল, এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ঘরে ঢুকেই নমস্কার জানিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। উইলহেম স্টোরিজ তাঁর নাম।

আমি বললাম—‘হ্যাঁ, নামটা আমার পূর্বপরিচিত।’

ডা. রোডরিখ এবার বললেন—‘গত মাস ছয় আগে উইলহেম স্টোরিজ যে আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে এসেছিল এও অবশ্যই জানেন, কি বলেন? আপনার অনুজ আমার কন্যা মায়রাকে বিয়ে করার অগ্রহ প্রকাশ করার আগেই ব্যাপারটা ঘটেছিল, আমার স্ত্রী ও পুত্র উইলহেমকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারে না ফলে তাকে পরিকার জবাব দিয়ে দিলাম। সে ইদানীং আবার নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এর। এবারও আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি।’

আমি বললাম—‘আমার অনুজ মার্ক তো এখানে এসেছে উইলহেম স্টোরিজ প্রথমবার প্রত্যাখ্যান হওয়ার পর। অতএব মার্ককে হাতের কাছে পেয়ে উইলহেম স্টোরিজকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে একরম মনে করার কিছুমাত্র অবকাশ নেই।’

ডা. রোডরিখ বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন—‘অবশ্যই। মার্ক এর মাঝখানে না এলেও এ-বিষয়ে কিছুতেই হত না। তবে উইলহেম-এর সামাজিক অবস্থা উল্লেখযোগ্য। উত্তরাধিকারসূত্রে ধন-দৌলতও কম পায় নি। সেসব আবিষ্কার সমাজসেবামূলক কার্যোপযোগী হওয়ায় অগাধ অর্থ প্রাপ্তি যে ঘটবে তাতে আর আশ্চর্য কি?’

এবার ডা. রোডরিখকে ডেরোথি জাহাজে আমার সঙ্গে উইলহেম স্টোরিজ-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ার কথা বললাম।—‘ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে কাল বাড়ির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। এক বলক দেখেই চিনে ফেললাম, এ-ই উইলহেম স্টোরিজ।’

ক্যাপ্টেন হারালান আগ বাড়িয়ে বলল—‘ক-দিন সে শহরে ছিল না বলেই তো ডেরোথি জাহাজে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। আবার শহরে ফিরে এসেছে।’

ডা. রোডরিখ বিতৃষ্ণার সঙ্গে এবার বললেন—‘উইলহেম স্টোরিজ-এর সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা তো সবই শুনলেন।’

কিন্তু আয় উপার্জনের ব্যাপারটা কতখানি সত্য আর কতখানি খাদ মেশানো তা স্বয়ং ঈশ্বরও বুঝি বলতে পারবেন না। আমি বলব, সে সভ্যসমাজ বহির্ভূত অদ্ভুত চরিত্রের এক মানুষ। আর তার বংশ পরিচয়ই তো রীতিমতো বিদ্যুৎ জ্বলবে! তার বাবা ছিলেন একজন যাদুকর, অলৌকিক শক্তির পূজারী। আমি মুচকি হেসে বললাম—‘ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছেন না তো?’

‘হ্যাঁ, তা একটু-আধটু হয়েও যেতে পারে। তার বাবা অটোমোবিল-এর কাণ্ডকারখানার কথা বুদাপেস্ট থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রের পাতায় পড়লাম।’

‘দেখুন জনাব, অটোমোবিল-এর এত খ্যাতিই যদি বুদাপেস্টের মানুষের কাছে থেকে, থাকে তবে এ-শহর রাগ-এ তার ছেলে উইলহেম-এর কী অবস্থা আপনি ভাবতে পারবেন না! ভাবলে আপনার গায়ে জ্বালা ধরে যাবে। এ-নম্ভারটাই আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বায়না ধরেছিল! শেষমেশ এসে রীতিমতো শাসিয়ে গেছে, আমার মেয়েকে যেন তেন প্রকারে বিয়ে সে করবেই। বলিহারি আন্দার!’

এবার আমার মুখের দিকে অধিকক্ষণ তর্কিয়ে হারালান দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—‘তুনুন জনাব, মোদো কথা বলছি—তার সুখ্যাতি যা কিছু শুনেছি সব যদি মিথ্যাও হয় তবু আমি নম্ভারটার হাতে আমার বোনকে তুলে দিচ্ছি না।’

আমার বুঝতে অসুবিধা হল না, জার্মান-বিদ্বেষ বশতই ক্যাপ্টেন হারালান অন্তরে এমন প্রকট বিদ্বেষ পোষণ করছেন।

ডা. রোডরিখ, বললেন, ‘হতচ্ছাড়াটা কালও এসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল, বললামই তো। কাল এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি যে ভুলেও সে আর কোনোদিন আমার বাড়িমুখো হবে না। তবে কিছু একটা সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে আশঙ্কায় আমি আর বেশি চট্যাচটি করি নি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজটা সারতে হয়েছে।’

উইলহেম স্টোরিজ বদমেজাজি। খুবই তিরস্কি মেজাজের মানুষ। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে সে বলে গেছে, সে যদি মিস মায়রাকে স্ত্রী হিসেবে নাই পায় তবে অন্য কারো গলায় তাকে বরমালা পরাতে দেবে না।

ডা. রোডরিখ-এর শেষ কথাটা শোনামাত্র আমার মাথায় যেন রক্ত উঠে যাওয়ার উপক্রম হল। কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উদ্ভা প্রকাশ করে জবাব দিলাম, ‘বিয়ে যখন পাকা হয়েছে তখন কয়েক দিনের মধ্যেই। এ-বিয়ে হবে।’

রোডরিখ বলে চললেন—‘নম্ভারটা ততোধিক গলা চড়িয়ে আমার কথার সাফ জবাব দিল—‘কয়েকদিনের মধ্যে তো হবেই না এমনকি কোনোদিনই এ-বিয়ে হবে না।’ সে এমন চিৎকার চোঁচামেচি শুরু করে দিল যে, আমার পক্ষে ইজ্জৎ রাখাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। তবু বরাত ভালো যে, আমার স্ত্রী ও কন্যা তখন বাড়ির বাইরে ছিল। শেষমেশ অবশ্য বিদায় নিতেই হল নম্ভারটাকে। ঘর ছেড়ে যাবার আগে এমন হুমকি সে আমাকে দিয়ে গেল যাতে আমি মনের দিকে থেকে একটু দুর্বলই হয়ে পড়েছি। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, চোখে-মুখে হতাশার ছাপ ঐকো তিনি এবার বললেন—‘তুনুন, আমি এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনার ভাই মার্ক আর মায়রার বিয়ে হবার নয়। এমন কঠিন-কঠোর বাধা আসবে যে বিয়ে হবেই না। মাঝখান থেকে সবাইকে নাজেহাল হতে হবে। স্টোরিজ পরিবার এমন অদ্ভুত সব কায়দা কৌশল অবলম্বন করবে যার জন্য পুরো রোডরিখ পরিবারকেই হয়রান হতে হবে।’

আমি গম্ভীর স্বরে বললাম—‘আপনি আগেই আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এসব কথা যেন আপনার স্ত্রী, মিস মায়রা আর আমার অন্তরের কাছে ফাঁস না করি। ভালো কথা, আমি কারো কাছেই মুখ খুলব না। কিন্তু নম্ভারটা যদি আমার বা আমার ভাই মার্ক-এর ওপর হামলা হুজুতি শুরু করে, তবে?’

উইলহেম যতই শাস্যক না কেন, তার কি করার হিম্মৎ আছে? মার্ক আর মায়রার বিয়ে বন্ধ করে দেবে কিন্তু কোনো উপায় অবলম্বন করে? গায়ের জোরে? মার্ককে হনুযুদ্ধে আহ্বান করবে? তাকে অপমান অপদস্থ করবে? যে বাড়ির খ্রি-সীমানায় তার যাওয়া বারণ সেখানে গায়ের জোরে ঢুকতে গেলে ডা. রোডরিখ নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। ওপর মহলে জানিয়ে নম্ভার জার্মানকে কী করে শাস্যস্ত করতে হয় তা তাঁর ভালোই জানা আছে।

সারাদিন হোটেলের কাটলাম। বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে আমি একটু গম্ভীরভাবেই পথ চলছিলাম। আসলে উইলহেম ডা. রোডরিখকে হুমকি দিয়ে গেছে সে কথাটাই আমার মনে বার বার উঁকি দিতে লাগল। আবার তার সঙ্গে পথে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ও আমাকে কম আতঙ্কিত করে তোলে নি। আবার ডা. রোডরিখ যে বললেন স্টোরিজ পরিবার এমনকৌশল জানে যা মানুষের পক্ষে কিছুতেই প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। এতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন তিনি? মনস্থ করলাম, ডা. রোডরিখকে কখনও নিভুতে পেলে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব।

পর পর দুদিন পেরিয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজকে শহরের কোথাও আর নজরে পড়ল না। বাড়িতে আছে বলেও মনে হল না। তবে হারমান নামে তার চাকরটাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখা দিয়েছিল। শেষমেশ একদিন ডা. রোডরিখ-এর বাড়ির কাছাকাছি মুহূর্তের জন্য দেখা গিয়েছিল।

সতেরোই মে। সে দিনই ঘটনাটা ঘটল। গির্জার দরজা বন্ধ ছিল। মার্ক আর মায়রার বিয়ের বিজ্ঞপ্তিটা কে যেন বোর্ড থেকে ছিড়ে ফেলে দিয়ে গেল। অন্যান্য বিয়ের বিজ্ঞপ্তিগুলো যথারীতি টাঙানো রয়েছে।

আবার আর একটা বিয়ের বিজ্ঞপ্তি আগের জায়গাতেই টাঙিয়ে দেয়া হল। এক ঘণ্টা পেরোবার আগেই এটারও আগের বিজ্ঞপ্তিটার মতো অবস্থা হল। দিনের আলোতেই ব্যাপারটা ঘটে গেল।

আঠারোই মে। সেদিন পরপর তিনবার মার্ক আর মায়রার বিয়ের নোটিশ টাঙানো হল। তিনবারই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কিন্তু বদমাইশটার হদিসও পাওয়া গেল না। বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার ব্যাপারটা নিয়ে শহরের আনাচে কানাচে বহু জল্পনা-কল্পনা ও রহস্য জনক গল্প পরিবেশিত হল। ব্যস, তারপরই ব্যাপারটা সবার মন থেকে মুছে গেল।

ডা. রোডরিখ, তাঁর পুত্র ক্যাপ্টেন হারালান আর আমি কিন্তু বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার ঘটনাটাকে এত সহজে মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। কারণ, সে যেভাবে শাসিয়ে গেছে তা-তো এত সহজে ভুলবার নয়।

বিজ্ঞপ্তি ছেঁড়ার রহস্যভেদ করা সম্ভব হল না। কিন্তু কোনো দৃষ্টকারীর দ্বারা যে এমন নস্টারজনক কাজটা হয়েছে

তা বুঝতে বাকি রইল না। তবে কি এটাই রোডরিথ পরিবারে ওপর তার প্রথম হামলা? ডা. রোডরিথ ব্যাপারটা শুনে রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি সাবাস্ত করলেন, যে করেই হোক হতচ্ছাড়াটার এরকম জঘন্যতম কাজ বন্ধ করতাই হবে।

ক্যাপ্টেন হারালান রীতিমতো হষিত্তি শুরু করে দিল। সে তাকে খুন করে পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলার জন্য হষিত্তি শুরু করে দিল। আমি তাকে নিরস্ত করতে গিয়ে বলল—‘ক্যাপ্টেন, মা আর বোনের কথা ভেবে হঠাৎ করে বড় রকমের কিছু না করাই ভালো। প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।’

‘পুলিশ? গির্জার বোর্ড থেকে বার বার নোটিশ ছিড়ে ফেলার ব্যাপারটা পুলিশের কানে যাবে না?’

‘নির্বিশেষে বিয়েটা মিটিয়ে ফেলাই এ মুহূর্তে আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ক্যাপ্টেন।’

‘বিয়ে হবে? ভালো কথা, বিয়ের পাট চুকিয়ে ফেলার আগেই যদি বড় রকমের কোনো অঘটন ঘটিয়ে দেয়, তখন?’

‘বিয়ের কাজ যথারীতি এগিয়ে চলল। সেদিনই বিয়ের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেওয়া হবে।

মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ডা. রোডরিথ প্রচুর লোককে নিমন্ত্রণ করলেন।

সারাদিন ধরে বিয়ের আয়োজন চলল। বিকালে প্রস্তুতি পূর্ব সম্পন্ন হল।

মহিলারা তখনও বিশ্রাম করছেন। আমি রাস্তার দিকে মুখ করে জানালায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ উইলহেম স্টোরিজকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেল। সে আচমকা ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

আমার অনুজ মার্ক ধীর পায়ে ঘরে ঢুকল। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বলল—‘ওই নচ্ছারটাই উইলহেম স্টোরিজ। তোমাকে ওর কথাই বলেছিলাম। আমার তো ধারণা ছিল ও রাগ শহর ছেড়ে পালিয়েছে। গেলেও আবার ফিরে এসে ঘুর ঘুর শুরু করেছে।’

রাত্রি হল। ক্রমে নটা বাজল। ডা. রোডরিথ-এর বাড়ির সদর-দরজায় এক এক করে ঘোড়ার গাড়ি ডিঙিতে লাগল। বিয়ের বাজনা বেজে উঠল।

এদিকে বিয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করানোর প্রস্তুতি চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষেরই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করা হয়ে গেল। শুভ কাজ নির্বিশেষেই সম্পন্ন হল।

সবাই যখন কথাবার্তা গল্পগুজবে মশগুল ঠিক তখনই গ্যালারির দিক থেকে অবাক্তিত কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল। কোনো হাঁক ডাক বা তড়পানি নয়, গান। কে যেন বিদঘুটে, একেবারেই কর্কশ সুরে অর্থহীন গান গাইছে।

ক্যাপ্টেন কণ্ঠস্বরে উদ্ভা প্রকাশ করে আমার দিকে উত্তরটা ঝুঁড়ে দিল—‘কি জানি। কোনো হতচ্ছাড়ার এমন উদ্ভট খেলালে মেতেছে, বুঝছি না তো?’ মনে হল, যে গান গাইছে সে বাগানের দিকে থেকে গ্যালারির দিকে এগিয়ে আসছে।

আমি আর ক্যাপ্টেন ব্যস্ত-পায়ে গ্যালারির দিকে ছুটে গেলাম। না, কাউকেই দেখতে পেলাম না। রহস্যজনক ব্যাপারটা আমাদের রীতিমতো হষিত্তি করে দিল। ক্রমে ডা. রোডরিথ ও তাঁর স্ত্রী আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। উদ্ভট গানটা তখনও শোনা যাচ্ছে কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। আর সেটা ক্রমে কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হারালান হতদস্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বলল—‘ঠিক আছে, আমিই দেখছি কোনো হতচ্ছাড়া এমন বে-রসিকের মতো কাজে মেতেছে?’

ডা. রোডরিথ তাকে অনুসরণ করলেন। কয়েকজন চাকর বাকরকে সঙ্গে নিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। বাগানে গিয়ে সবাই মিলে চিরুনি তল্লাশি চাললাম। না কাউকেই নজরে পড়ল না।

অন্যোপায় হয়ে আবার গ্যালারিতে ফিরে এলাম।

আবার! আবারও হেড়ে গলার গান শুরু হল। এবারও সেই একই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। উদভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি দাপাদাপি করারও কে যে গাইছে হদিস পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যেও আতঙ্কের সৃষ্টি করল। ক্ষোভ আর বিভ্রাট মন ভরে উঠল। গানটা হচ্ছে-জুলন্ত ঘৃণা বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ—‘হিম অব হেট’।

এবার বৈঠকখানার ঠিক মাঝখান থেকে গানটা ভেসে আসতে লাগল। এবারও কেউই গায়কের হদিস পেল না। এমন কি তার কায় তা দূরের ব্যাপার তার ছায়া পর্যন্ত কারো নজরে ধরা পড়ল না। মেয়েরা তো অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কা ও আতঙ্কে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে রইল। উদভ্রান্তের মতো ক্যাপ্টেন হারালান বৈঠকখানায় ঢুকে বার কয়েক ছুটোছুটি দাপাদাপি করে যাকে মোটেই নজরে পড়ছে না এমন একজনকে দু-হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু কাকে ধরবে? সব যে ভোঁ-ভাঁ। অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন নিজের কাজের জন্য ক্ষুব্ধ হলেন।

এবার কেবল আমিই নই, বৈঠকখানায় প্রায় একশ’ লোক একই অবিশ্বাস্য দৃশ্য চোখের সামনে দেখলেন। ফুলের তোড়াটা আমকা কোনো অদৃশ্য হাতের টানে যেন শূন্যে উঠে গেল। মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘরময় ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল। সবশেষে কে যেন পা দিয়ে সেগুলো পিষে দিয়ে গেল। পর মুহূর্তে বর-কনের স্বাক্ষর সম্বলিত বিয়ের চুক্তিপত্রটা হঠাৎ উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। অথচ বাতাস তেমন নেই।

আতঙ্কে বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ভয়ে আঁতকে উঠে সবাই বৈঠকখানা ছেড়ে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলাম—এই যে একের পর এক রহস্যজনক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে চলেছে তা কি আমি বিশ্বাস করি, নাকি করা উচিত?

অস্থিরচিত্ত ক্যাপ্টেন হারালান লম্বা লম্বা পায়ে আমার কাছে আসতে আসতে উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল—‘নির্বাণ নচ্ছার উইলহেম স্টোরিজ এসেছে! এটা তারই কাজ। এমন নাক্ষত্রজনক কাজ কিছুতেই আর বরদাস্ত করা যায় না। আমি স্পষ্ট দেখলাম, কনের মুকুটটা শুন্যে উঠে গেল। তারপর বৈঠকখানা হয়ে বাগানে গিয়ে কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল। একী ভুতুড়ে কাণ্ড-রে বাবা! না, আর বরদাস্ত করা যায় না!’ কথা বলতে বলতে দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে

সে সোজা বুলেভার্ড টেকেলির দিকে যেতে লাগল।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। প্রায় ছুটে ছুটে আমরা উইলহেম স্টোরিজ-এর বাড়ির সদর-দরজায় হাজির হলাম। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখি একটা জানালা খোলা। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। উভয়ে এবার সদর দরজাটা খোলার চেষ্টা করলাম। এক চুল ও নাড়াতে পারলাম না। অবাক হতেই হল।

আমরা যখন দরজা খুলতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একসার হচ্ছি ঠিক তখনই উইলহেম স্টোরিজ নিজে দরজাটা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়াল। নিজের কাজের জন্য লজ্জিত হলাম। শুধু শুধু লোকটার ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছি।

নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্ক ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটল। ভোরের আলো ফুটেতে না ফুটেই গতরাতে অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে শহরে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হল। হ্যাঁ, আমার আশঙ্কাই সত্য। শহরবাসীরা ব্যাপারটাকে নিছক এক মামুলি ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে পারল না। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যা কিছু ঘটেছে সবই লৌকিক, অলৌকিক অবশ্যই নয়। তবে এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডের বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যাও তো অবশ্যই চাই।

ব্রাপারটা নিয়ে মার্ক আর মায়রাও কম উত্তেজিত হল না। বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে একের পর এক এমন রহস্যজনক অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটলে উদভ্রান্ত হবারই তো কথা।

সকাল আটটায় ডা. রোডরিখ আর ক্যাপ্টেন হারালানকে নিয়ে অনুজ মার্ক আমার ঘরে এল। মায়রারও তার মায়ের সামনে এসব কথা আলোচনা সম্ভব না ভেবেই তারা আমার এখানে ছুটে এসেছে। প্রয়োজনে প্রতিকারের উপদ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে।

আমার ভাইয়ের অবস্থা দেখে আমি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। মাথার চুল উসকো-খুসকো, চোখ দুটো লাল, চোখের মণি দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। গত সন্ধ্যার সে হাসিখুশি ভাব অন্তর্হিত, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তার ভেতরটাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে, তার চোখ-মুখই তার প্রমাণ দিচ্ছে।

ডা. রোডরিখ নিজেকে সামলে রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন—‘জনাব, ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা বলুন শুনি?’

আমি নাস্তিকের অভিনয় করাই মনস্থ করলাম। ব্যাপারটা যেন নিছকই মামুলি এমন ভান করে বললাম—‘কাল রাতে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নি যা নিয়ে আমাদের সময় নষ্ট করতে হবে। ব্যাপারটা তো এমনও হতে পারে যে, কেউ হাঙ্গা রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে। যারা লোকের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করতে উৎসাহী এমন কেউ হয়তো বিয়ের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। অনাবিল আনন্দের মধ্যে যাদুমন্ত্র তুকতাক প্রভৃতির মাধ্যমে আর একটু-আধটু আনন্দ দান করে গেছে।

ক্যাপ্টেন হারালান কণ্ঠস্বরে একটু উদ্ভা প্রকাশ করেই বলে উঠলেন—‘শুনুন, ছেলেভুলানো স্তোকবাক্য শুনেও আমরা এখানে ছুটে আসিনি। যাদুমন্ত্র বা তুকতাকের প্রতি আমার তিলমাত্র আস্থাও নেই।’

‘কিন্তু ভক্তারবাবু, অন্য কোনো কিছু যে আমি ভাবতে উৎসাহ পাচ্ছিনে। অলৌকিক কাণ্ড, এরকম বিশ্বাসকে যে আমি মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি।’

ক্যাপ্টেন হারালান সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—‘না জনাব, অলৌকিক অবশ্যই নয়, তার চেয়ে বরং বলুন সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। কিন্তু এতে অত্যন্ত কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যা আমাদের মাথায় কিছুতেই আসছে না। ফলে আমি গোড়া থেকে ব্যাপারটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি।’

আমি জেদ ধরেই রইলাম। বললাম—‘কাল রাতে যে গান শুনেছি, তা মানুষের কণ্ঠস্বর ছাড়া অলৌকিক কোনো ব্যাপার অবশ্যই নয়। অতএব তা যাদুমন্ত্র তুকতাক হওয়ার কারণ কি, বলুন?’

যাদুমন্ত্র বা অলৌকিক কাণ্ডকারখানার প্রতি ডা. রোডরিখ-এর কিছুমাত্রও বিশ্বাস নেই তার কথাবার্তায় এবং হাবভাবে স্পষ্ট বুঝা গেল।

আমি পূর্ব বক্তব্যের সমর্থনে আবার বললাম—‘শুনুন উৎসব-অনুষ্ঠানের বাড়ি ভিড়ের মধ্যে কোনো উদ্ভট লোকের ঢুকে পড়া কিছুমাত্রও আশ্চর্যের নয়।’

ডা. রোডরিখ খোলা-মনের মানুষ। মন খোলসা করেই জবাব দিলেন—‘আপনার বক্তব্যকে স্বীকার করে নিলেও কিন্তু রহস্যটা একইরকম রহস্যজনক থেকেই যাচ্ছে। কে গান গাইল? ফুলের তোড়া কে ছিড়ে পায়ে পিষল আর কে-ইবা ফুলের মুকুটটা উড়িয়ে একান্তে নিয়ে গিয়ে ব্যতাসে মিলিয়ে দিল? বিয়ের চুক্তিপত্র উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকেও কি আপনি সম্ভা ভেলকি বলতে চাইছেন? নাকি আপনার অভিমত, এতগুলো লোকের সবারই চোখের ভুল? আর যাদুমন্ত্র, ভেলকি বা তুকতাক যা-ই বলুন না কেন—মেনে নিয়ে ভয়ে সবাই কঁকড়ে রয়েছে।’

ডা. রোডরিখ এবার আরও খোলসা করে বললেন—‘দেখুন, ব্যাপারগুলো যে দুশ্চিন্তা থেকেই বিচার করুন না কেন—আমি কিন্তু বলব, আমার সঙ্গে চরমতম শত্রুতা করতে গিয়ে কেউ না কেউ বিভিন্ন অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়েছে। বলতে পারেন প্রতিশোধ নিয়ে গেছে।’

মার্ক এবার মুখ খুলল—‘প্রতিশোধ? শত্রুতা? কার শত্রু ডা. রোডরিখ? সে কী আপনার পরিচিত?’

‘অবশ্যই। উইলহেম স্টোরিজ তার নাম।’

এবার মার্ক-এর কাছে আর কিছু গোপন না রেখে সবই খোলসা করে বলা হ’ল। সব কিছু শুনে সে-ও নিশ্চিত হ’ল, অবিশ্বাস্য ঘটনাগুলোর সঙ্গে উইলহেম স্টোরিজ-এর যোগসাজেস থাকা খুবই স্বাভাবিক। তবে ব্যাপারটা গোপন রাখার জন্য মার্ক খুবই ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ করল।

শেষপর্যন্ত সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হ’ল টাউন হলে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা পুলিশ-প্রধানের কানে দেওয়া হবে। তার কাছে আদ্যোপাঙ্গ খোলসা করে বলা দরকার। আর সে যে বিয়ে ভুল্ল করার জন্য শাসিয়ে গেছে তা-ও তাঁর কানে

তোলা হবে। সব কিছু শোনার পর তিনি যা প্রয়োজনবোধ করবেন সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করবেন।

মার্ককে ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি, ডা. রোডরিখ ও তাঁর ছেলে ক্যাপ্টেন হারালান গেলাম টাউন হলে পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক-এর সঙ্গে দেখা করতে।

ডা. রোডরিখ-এর মুখে উইলহেম স্টোরিজ-এর নামটা শুনে পুলিশ প্রধান কিছু অবাক তো হলেনই না, বরং এমন একটা ভাব করলেন, যেন ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এবার মুখ খুললেন—‘দেখুন, লোকটার বিরুদ্ধে কেউ অভিযোগ করলেও আমরা তাকে নানা কারণে সন্দেহ করছি। নজরও রাখছি। সে সবার অগোচরে লুকিয়ে চুরিয়ে চলাফেরা করে। তার জন্মস্থল স্প্রেমবার্গ। সেখান থেকে কেন যে এখানে এসে মাথা গুঁজেছে ভাববার বিষয়ই বটে। এখানে তার দেশওয়ালি ভাইরা তাকে মোটেই সুনজরে দেখে না, ধারে-কাছেও যায় না। তার বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ির দরজা-জানালা সর্বক্ষণ কেনই বা বন্ধ থাকে? তার বাড়ির ত্রি-সীমানায়ও কেউ যায় না কেন? মোদা কথা, তার প্রতিটা কাজকর্মই সন্দেহের উদ্দেশ্য করে।’

ক্যাপ্টেন হারালান বলল, ‘মি. স্টোপার্ক এখন বলুন, আপনি কোনো পথ নিতে চাইছেন?’

‘ভাবছি তার বাড়িতে এখনই, আচমকা হানা দিলে নিশ্চয়ই কিছু দলিল দস্তাবেজ, কিছু না কিছু সূত্র মিলবেই।’

ডা. রোডরিখ বললেন—‘এর জন্য তো গভর্নরের অনুমতি চাই, তাই না?’

‘হ্যাঁ, তা অবশ্য চাই। তবে আপনাকে বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছে, গভর্নরের অনুমতি পেতে অসুবিধে হবে না বলেই মনে করি।’

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক আধ ঘণ্টার মধ্যেই গভর্নরের আদেশপত্র নিয়ে ফিরে এলেন। তারপর সবাইকে নিয়ে চললেন উইলহেম স্টোরিজ-এর বুলেভার্ড টেকেলির বাড়ির দিকে। একজনকে দেখা গেল, নিজের বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে নির্বিকারচিত্তে পায়চারি করছে, এমন ভাব যেন ভাড়া মাছটাও উল্টে খেতে জানে না।

মুহূর্তের মধ্যে সাদাপোষাকে ছ’জন পুলিশ সেখানে হাজির হল।

বাড়িটার দরজা-জানালা বন্ধ। মনে হল ভেতরে কেউ-ই নেই। না-ই বা থাকল, চাকরটা থাকলেও কাজ চলে যাবে।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর নির্দেশে পুলিশরা সদর-দরজার তালাটা ভেঙে ফেলল। আমি পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এবং ক্যাপ্টেন হারালান ব্যস্ত-পায়ে ভেতরে ঢুকে গেলাম। পুলিশ প্রধান হাতের ছড়িটা দিয়ে একটা ঘরের বন্ধ দরজায় বার-কয়েক ঠুকলেন। ভেতরে থেকে কোনো সাড়াই এল না। এবার তাঁর নির্দেশে পুলিশরা চাবির গোছা থেকে চাবি বের করে তালার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিলে সবগুলো ঘরের তালা খুলে ফেলল। পুলিশ প্রধান ব্যস্ত-পায়ে গলির পথ দিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছন পিছন চললাম। একজন পুলিশ সিঁড়িটা সাহারা দিতে লাগল।

পুলিশ-প্রধান চিৎকার করে বললেন—‘ভেতরে কে আছেন? কে আছেন ভেতরে, সাড়া দিন?’ কিন্তু হায়! কোনো সাড়াই এল না। তবে আচমকা কি যেন একটা বস্তু এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল। তবে চোখ বা কানের ভুল হওয়াও অসম্ভব নয়।

আমরা বাড়ি ছেড়ে বাগানের পথ ধরলাম। পথের ওপর কার যেন সদ্য হেঁটে যাওয়া পায়ের ছাপ নজরে পড়ল। কিন্তু বাগানটায় চিকুনি তল্লাশি চালিয়েও কারো টিকির নাগাল পাওয়া গেল না।

বাড়ির চিমনিটা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল। আমি পুলিশ প্রধান স্টোপার্ককে বললাম—‘চিমনি দিয়ে ধোঁয়া যখন বেরোচ্ছে, তখন নির্ধাৎ কোথাও আগুন জ্বালানো হয়েছে।’

আগুনের উৎস স্থলটা খোঁজা শুরু হল। এবার রান্নাঘরে থেকে তল্লাশি শুরু করা হল। খুবই সামান্য বাসনকোসন আর আসবাবপত্র রান্নাঘরে দেখা গেল। রান্না করা খাবার রয়েছে বটে। কিন্তু পাচক নেই। ঘরের একদিকের দেওয়ালে জানলার দিকে মুখ করে একটা ছবি টাঙানো। আর জড়িয়ে রাখা একটা কাগজে বড় বড় হরফে লেখা ‘অটো স্টোরিজ’। ছবিটাও অটো স্টোরিজ-এরই। তাঁর বলিষ্ঠ চেহারা আর গম্ভীর মুখ আমার অন্তরে গঁথে গেল। অটো স্টোরিজ আর তাঁর পুত্র উইলহেম স্টোরিজ-এর মুখের অবিকল চোদ দেখে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক তো রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমার দিকে তাকিয়ে এবার তিনি মুখ খুললেন—‘জানাব, আশ্চর্য ব্যাপার তো। বাপের পৈশাচিক মুখের আদল ছেলেরও মুখেও লক্ষিত হচ্ছে।’

পাশের ঘরে গিয়ে দেখা গেল, খাটের ওপর বিছানাপত্র অগোছাল অবস্থায় পড়ে। তবে দেখে মনে হল রাতে কেউ না কেউ এখানে শুয়েছে। এবার প্রসাধন টেবিল পরীক্ষা করে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক আমাকে বললেন—‘বেসিনে জল আর সাবানের বুদবুদ দেখে নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কেউ না কেউ এটা ব্যবহার করেছে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সাবানের বুদবুদ আশা করা যায় না। তাই ভাবতেই হচ্ছে, লোকটা বাড়ি থেকে সরে পড়ার আগে বেসিনে সাবান দিয়ে মুখ ধুয়েছে। তবে মনে হয় না সে নিজে থেকে ধরা দেবে।’

ঠিক তখনই পাশের ঘর থেকে রহস্যজনক একটা মচমচ আওয়াজ ভেসে এল। কাঠের পাটাতনের ওপর দিকে কেউ হেঁটে গেলে যেমন আওয়াজ হয় এটাও ঠিক সেরকমই। এক ছুটে পাশের ঘরে গেলাম। কিন্তু ভোঁ-ভাঁ! কেউ-ই নেই। হতাশ হয়েই ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হল। এবার যে ঘরটায় গেলাম সেটায় চাকর হারমান থাকে। জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বেরকম ছিল সেরকমই রয়েছে মনে হল।

আমি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ‘মি. স্টোপার্ক, আমাদের হানা দেওয়ার কথা হতচ্ছাড়াটা আগেভাগেই জেনে যায় নি তো?’

‘অসম্ভব! আমি গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করার সময় যথা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষে এসব কথা কিছুতেই শোনা সম্ভব নয়।’

এমন সময় একটা চাপা শব্দ কানে এল। মনে হল কে যেন সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে পড়ল। দৌড়ে গেলাম আমরা। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পুলিশটা যা বলল তাতে পড়ে যাওয়ার কারণটা কেমন যেন সন্দেহজনক বলেই মনে হল। অকারণে কেউ কি পড়ে যেতে পারে?

ব্যাপারটাতে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর চোখে মুখে কেমন যেন গাভীরের ছাপ ফুটে উঠল।

বাড়িটার ছাড় থেকে উঠোন অবধি একটা দড়ি ঝুলে থাকতে দেখা গেল। পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক দড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় উঠে গেলেন। ক্যাপ্টেন হারালান আর আমি তাকে অনুসরণ করে চিলে কোঠায় গেলাম। সেখানে গিয়েও হতাশ হতে হল। কেউ লুকিয়ে নেই। এবার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। খোলা-দরজার পাল্লাটা হাওয়ায় বারবার ধাক্কা খাচ্ছে, খুলছে-বন্ধ হচ্ছে। এবার বুঝলাম, একটু আগে তবে এরই শব্দ হচ্ছিল।

না, রহস্যের কোনো সমাধানই করা সম্ভব হল না। পুরো ব্যাপারটা আগের মতো ঘোলাটেই রয়ে গেল।

আমরা যখন চিলেকোঠা ছেড়ে বেরিয়ে আসার চিন্তা করছি ঠিক তখনই বিকট একটা চিৎকার শুনে আমরা রীতিমতো থতমত খেয়ে গলাম। স্পষ্ট মনে হল ক্ষোভ আর বিশ্বয় মিশ্রিত সে চিৎকার। তখন ক্যাপ্টেন হারালান তাক থেকে একটা ছোট কাঠের বাক্স খুলছিল। ডালাটা খুলতেই বেরিয়ে এল গভরাহে ডা. রোডরিখ-এর বাড়ি থেকে হাফিস হয়ে যাওয়া কনের মুকুট যেটা চেপেচুপে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে।

বাস, পুরো ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজ-ই যে রহস্যজনক ব্যাপারগুলোর নায়ক এতে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই রইল না।

আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম। পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর নির্দেশে বাড়িটার সদর-দরজায় তালা দিয়ে একেবারে সীলমোহর করে দেওয়া হল। দুজন পুলিশকে সেখানে পাহারায় নিযুক্ত করে আমরা হাঁটতে লাগলাম।

আমরা পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর দপ্তরে যাওয়ার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে ডা. রোডরিখ-এর কাছে তুলে ধরলাম। সবকিছু শুনে তিনিও ক্যাপ্টেন হারালান-এর মতোই কেসটা আদালতে ওঠার আগে উইলহেম স্টোরিজকে ছারপোকান মতো পিষে মারতে চাইলেন।

ক্ষোভে-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, ব্যাপারটা তিনি রাগ শহরের লাটসাহেবের কানে তুলবেন। সবকিছু শুনে তিনি অবশ্যই বিদেশি উইলহেম স্টোরিজকে দেশছাড়া করতে দেরি করবেন না। আর আমাদের সতর্ক করে দিলেন, তাঁর স্ত্রী আর কা ন্যা মায়রা যেন এসবের বিন্দু বিসর্গও জানতে না পারে।

আমরা আবার টাউন হলে গিয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর কাছ থেকে কনের মুকুটটা চেয়ে নিয়ে এলাম।

সে রাহেই মার্ক মুকুটটাকে কৌশল মায়রার কাছে নিয়ে গেল। তাকে বলল, বাগানে ঝোপের আড়ালে পড়েছিল। কেউ হয়তো রসিকতা করে একাজ করেছে। মায়রা মুকুটটা ফিরে পেয়ে যারপরনাই খুশি হল। মার্ক কিন্তু ভুলেও আসল ব্যাপারটা, উইলহেম স্টোরিজ-এর কাণ্ডকারখানার কথা তার কাছে ফাঁস করল না।

তারপর কদিন আর কোনো ঘটনাই ঘটল না।

এদিকে পঁচিশে মে মহাধুমধামের মধ্য দিয়ে অটোস্টোরিজ-এর মৃত্যুবার্ষিকী শ্রেমবার্গে উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। শহরের হাজার হাজার মানুষ রহস্যজনক ভোজবাজির খেল দেখার আশা নিয়ে সেখানে জড়ো হল। কবর থেকে মহাপণ্ডিত অটোস্টোরিজ উঠে আসেন নি বা এমন কোনো রহস্যজনক ঘটনা ঘটল না যা সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করার অতুল্য আশা নিয়ে কবরখানায় জড়ো হয়েছিল। আরও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হল তার গুণধর পুত্র উইলহেম স্টোরিজ পর্যন্ত উৎসবস্থলে উপস্থিত হল না। এতে সবার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল, সে অবশ্যই রাগ শহরে নেই।

দুপুরের দিকে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক লাট সাহেবের সঙ্গে দেখা করে রোডরিখ-পরিবারের সমস্যার কথা তাঁর কানে তুলে দিলেন এবং এর পিছনে উইলহেম স্টোরিজ-এর কাণ্ডা হাত যে কাজ করছে একথা বলতেও ভুল করলেন না।

সবকিছু শুনে গভর্নর উত্তেজিত হয়ে বললেন—‘কেবলমাত্র রাগ শহর থেকেই নয়, জনাব শয়তানটাকে একবারে অস্ত্রোহাঙ্গারি থেকে বহিষ্কারের হুকুম জারি করে দিচ্ছি। সেই মুহূর্তেই আদেশনামা লিখে তাতে স্বাক্ষর করে সেটা গভর্নর পুলিশ-প্রধানের হাতে দিয়ে বললেন—‘সীমান্ত রক্ষীদের হাতে আদেশপত্রটা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করুন।’ ডা. রোডরিখ ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তার জন্যই এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কিন্তু অবিশ্বাস্য কাণ্ডগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হল না, গোপন অন্তরালেই রয়ে গেল।

তারপর যা ঘটল তা আমরা এ-মুহূর্তে ভাবতেও পারছি না। সে যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, ভাবলে এখনও গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে।

পয়লা জুন বিয়ের দিন পাকা হয়ে গেল। সবাইকে সামলে সুমলে রাখাই এ মুহূর্তে সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আর আমরা মনই আশান্ত, অন্যকে প্রবোধ দেব কি করে? আর আমার যে কী হয়েছে ছাই রোজই একবার করে বুলেভার্ড টেকেলিতে চক্কর না মারলে নিদারুণ মানসিক অস্বস্তি বোধ করি।

এদিকে রাগ শহরের মানুষের মন থেকে অলৌকিক ব্যাপারসমূহের আতঙ্ক ক্রমে মুছে যেতে লাগল। কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ ডা. রোডরিখ, ক্যাপ্টেন হারালান, আমার অনুজ মার্ক আর আমার মধ্যে আতঙ্ক দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। আমার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে উইলহেম-এর প্রেত বৃদ্ধি প্রতিনিয়ত আমার পিছনে ধাওয়া করছে। মে-র ত্রিশ তারিখ বিকালের দিকে আমরা ডা. রোডরিখ-এর বাড়ির বৈঠকখানায় উপস্থিত হলাম। ঘোড়ার গাড়িতে চেপে গভর্নরের বাড়িতে যাওয়ার কথা। সেদিন বিয়ে হবে না। বিয়ে হবে তার পরের দিন। বলা যেতে পারে গ্রাক বিয়ে। বিয়ের প্রস্তুতি পর্বের অনুষ্ঠান সেটা। আক্ষরিক অর্থে বিয়ে না হলেও, উভয়ের মাধ্যমে বন্ধন গড়ে উঠবে তাতে করে কোনো কারণে বিয়ে যদি না-ও হয় তবে উভয়কে সারাজীবন অবিবাহিত থাকতে হবে।

যথা সময়ে গভর্নর উৎসব-প্রাসঙ্গে হাজির হলেন। তিনি প্রথা অনুযায়ী মায়রার বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মার্ক-এর সঙ্গে তাঁদের মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি আছেন কিনা। তাঁদের সম্মতি পাওয়ার পর মার্ক শপথ করলেন মায়রারকে

সহধর্মী হিসেবে গ্রহণ করবে। মায়রাও শপথ করল মার্ককে পতি হিসেবে গ্রহণ করবে।

এবার গভর্নর সর্বজন সমক্ষে মার্ক ও মায়রার বিয়ের লাইসেন্স প্রদান করলেন। এবার তিনি উভয় পক্ষকে নির্দেশ দিলেন, আগামী কালই যেন গির্জায় গিয়ে পাদরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে শুভকাজ সম্পন্ন করে ফেলা হয়।

সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল।

উপস্থিত সবাই বলাবলি করতে লাগল গভর্নরের উপস্থিতিতে বর-কনে বিয়ের যে দলিলে স্বাক্ষর দান করেছে সেটা কেউ কেড়ে নিল না। অতএব উইলহেম স্টোরিজ অবশ্যই রাগ শহরে উপস্থিত নেই। আর যদি কোনোদিন সে ফিরে এসে ঝামেলা বাধায় তবু সে আর মায়রাকে বিয়ে করতে পারছে না।

পয়লা জুন। মার্ক আর মায়রার বিয়ের তারিখে উভয় পক্ষের আত্মীয়-বান্ধবদের নিয়ে সুজ্জিত গাড়িতে চেপে গির্জায় হাজির হল। এখানেই পাদরি সাহেবের তত্ত্বাবধানে তাদের শুভবিবাহ সম্পন্ন হবে।

পাদরি সাহেব যথাসময়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হলেন। এবার মার্ককে বললেন।

‘তুমি বল, আমি মার্ক ডাইডাল, আমি মায়রা রোডরিখকে সহধর্মীরূপে গ্রহণ করতে রাজি আছি।’

মার্ক এবার পাদরি সাহেব শেখানো বুলি গড়গড় করে আওড়ে গেল। তারপর মায়রা পাদরি সাহেবের শেখানো বুলি আওড়াল—‘আমি মায়রা রোডরিখ, মার্ক ডাইডালকে স্বেচ্ছায় স্বামীরূপে বরণ করে নিচ্ছি।’

মায়রার শপথব্যাক্য পাঠ সম্পন্ন হতে না হতেই এক বিকট চিৎকারে গির্জাটাও যেন ধরধরিয়ে কঁপে উঠল।

চোখের পলকে পাদরি সাহেবের মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। আতঙ্কে চোখেরমণি দুটো অস্থির হয়ে উঠল। তাঁর ভাব দেখে মনে হল তিনি বৃষ্টি প্রেতের সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করেছেন। কেউ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার অনুজ মার্ক আর তার স্ত্রী মায়রা চোখমুখ বিকৃত করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল। আমি যখন দূর দূর বৃকে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ভাবছি ঠিক তখনই বিরাশি শিক্কার একটা ঘূষি আমার মুখে এসে লাগল। মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

বাস, মুহূর্তের মধ্যে বৃক-কাঁপানো কণ্ঠ আমি এবং উপস্থিত সবাই শুনল। উইলহেম স্টোরিজ-এর কর্কশ কণ্ঠ-‘জাহান্নামে যাক! নবদম্পতি জাহান্নামে যাক! উল্লে যাক!’ কণ্ঠস্বরটার সঙ্গে আমার সবাই পরিচিত।

কণ্ঠস্বরটা শোনামাত্র এক ঘর লোক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধুক্ধুমার কাণ্ড বাধিয়ে বসল। কে যে কোনদিকে ছুটে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পারবে তা ঠিক করে উঠতে না পেরে রীতিমতো ঠেলাঠেলি গুতোভর্তি শুরু করে দিল। ফলে কারোর পক্ষেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। গির্জার তুলকালাম কাণ্ড আর দু’চারদিন আগে ঘটনা রোডরিখ ভবনের অঘটনের মধ্যে কিছুমাত্রও পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই উইলহেম স্টোরিজ-এর কালা হাত অন্তরাল থেকে কাজ করে চলেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু একের পর এক ঘটে যাওয়া ঘটনার সবগুলোকেই যাদুমন্ত্র বা তুচ্ছতাকের ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আমার দৃঢ়বিশ্বাস হতচ্ছাড়া জার্মানিটা নির্ধাৎ তার বাপের কাছ থেকে শেখা বৈজ্ঞানিক গুণবিদ্যা রপ্ত করেছে যার রহস্য আজও আমাদের কাছে অন্ধকারের অতল গহ্বরেই রয়েছে। এ বিদ্যা প্রয়োগ করে চোখের পলকে হাজার লোকের মাঝখান থেকে নিজেকে হাফিস করে দেওয়া সম্ভব। এটা নিছক এমন অত্যাশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য আবিষ্কার যার উপায় ও ফল আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাত। ভাললাম এ-কী উল্টোপাল্টা ভেবে আমি নিজের মনকে দুর্বল করে তুলছি।

মায়রা সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে এলিয়ে পড়ে রয়েছে। এ-অবস্থাতেই তাকে ধরাধরি করে রোডরিখ ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তারকে নিয়ে আশা হল। ভদ্রলোক নিজের বিদ্যা-অভিজ্ঞতা নিগ্ৰশে নিঙড়ে তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। ব্যথা চেষ্টা। কিছুতেই তার সংজ্ঞা ফিরল না। তবে স্বাস্থ্যক্রিয়া অব্যাহত রইল। ডা. রোডরিখ-এর বহু বন্ধু-ডাক্তার ছুটেছুটি করে এলেন। সবাই মিলে ফ্যাকাশে মুখে পরামর্শ করলেন রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

আমার উৎকণ্ঠিত ভাই মার্ক তাঁর প্রাণপ্রতীমার নাম ধরে বহু ডাকাডাকি করল। কিন্তু সে জবাব দেওয়া তো দূরের ব্যাপার, চোখ পর্যন্ত খুলল না।

এক সময় মায়রা যদিও চোখ মেলে তাকাল কিন্তু তার চোখের মণি দুটো স্থির, দৃষ্টি শূন্য। মার্ক-এর পক্ষে এরকম চাহনির অর্থ বুঝা অসম্ভব হল না। উম্মাদ-উম্মাদদশা প্রাপ্ত হলে মানুষের দৃষ্টি এমন হয়।

এবার পাগলের ডাক্তাররা মায়রার চিকিৎসার জন্য এক এক করে আসতে লাগল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হরেকরকম বিধানও দিলেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। বরং মায়রার উম্মাদদশা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল।

ক্যাপ্টেন হায়ালান তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল।

আসলে শিক্ষিত সমাজ যারা অলৌকিক ব্যাপার-স্বাপারে বিশ্বাসী নয় তারা রাসায়নিক বা পদার্থবিদ্যা বিষয়ের নতুন কোনো আবিষ্কার আখ্যা দেবেন। কিন্তু অশিক্ষিত মানুষরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলবে, এটা নির্ধাৎ শয়তানের কারসাজি। আর সে শয়তান উইলহেম স্টোরিজ নিজে।

ডা. রোডরিখ পরিবারের ঘটে যাওয়া আকস্মিক ঘটনাটাকে নিয়ে রাগ শহরে তেলপাড় হতে লাগল। হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে আর হোটেল-রেস্তোরায একই ঘটনা নিয়ে মানুষ মেতে রইল। আসলের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত খাদ মিশিয়ে ঘটনাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অধিকতর রহস্যজনক ও রসসিক্ত করে তুলতেও কেউ কেউ দ্বিধা করল না। তবে একটা ব্যাপার সবার মধ্যেই লক্ষিত হতে লাগল সীমাহীন ঘৃণা ও ক্রোধে সবাই যেন ফেটে পড়তে চাইল। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা বৃকে নিয়ে দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ ছুটে চলল বুলেভার্ড অঞ্চলে উইলহেম স্টোরিজের জীব বাড়িটার দিকে। সবার মধ্যেই যেন প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র বাসনা বহুমূল।

ব্যাপারটা রীতিমতো রহস্যজনকই বটে। উইলহেম স্টোরিজ শহরে অবস্থান করছে অথচ কেউ তাকে দেখতে পায় না। প্রেটো তার লিখিত ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থের এক জায়গায় চমৎকার এক ঘটনার অবতারণা করেছেন। জিজিস নামে এক

রাখাল ছেলে এক দৈত্যের কবল থেকে একটা আংটি পায়। সেটা হাতে নিয়ে ঘোরালে ফেরালেই একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া যায়। সে উপায়ে অদৃশ্য হয়ে জিজিস রাজা ক্যানডলকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা হাতিয়ে নেয়। জিজিস-এর মতো ক্ষমতার অধিকারী সভ্যসভাই যদি কেউ হতে পারে তবে মানুষের নিরাপত্তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

উইলহেম স্টোরিজ নির্ধাৎ গুপ্তবিদ্যাটা তার বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। এ বিদ্যা প্রয়োগ করে যে-কোনো বাড়িতে যখন তখন ঢুকে মানুষের জীবনদুর্বিষহ করে তুলতে পারে। এমন জঘন্যতম অন্যায় অত্যাচার বন্ধ করার উপায় কি? কেউ-ই জোর গলায় বলতে পারবে না তার বাড়ি, যে ঘরে সে বসে আছে সে ঘরেই কেউ ঘাপটি মেরে নেই, আড়িপেতে সবকিছু গুনে ও দেখছে না আর সর্বক্ষণ অদৃশ্য অবয়ব তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করছে একথা কারো পক্ষে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। হামলা হুজুতি প্রতিরোধের উপায় কি? ঠিক তখনই আমার মনের কোণে ভেসে উঠল বাজারের সে-ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার কথা, আচমকা একটা লোক অহেতুক হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। কোনো অদৃশ্য শক্তি নাকি তাকে সজোরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল। কারো মুখ থেকে শোনা কথা না, আমি আর হারালান চোখের সামনে অবশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটতে দেখেছিলাম। তাই আতঙ্কিত হতেই হচ্ছে, যত সতর্কতা অবলম্বনই করি না কেন, অদৃশ্য দেহের গুঁতো খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই হবে। আর কত সব অত্যাচার, একেবারে অবিশ্বাস্য ঘটনা আমার মন-প্রাণকে বিধিয়ে তুলতে লাগল-গির্জার বোর্ড থেকে বিজ্ঞপ্তি ছেড়া, বিয়ের আংটি হাফিস হয়ে যাওয়া, গির্জার ঘর তছনছ করা, মায়রার মুকুট হাফিস এবং নম্ভার উইলহেম স্টোরিজ-এর ঘর থেকে সেটা উদ্ধার করা, তার বাড়ির পাশের ঘরে মানুষের চলাফেরা করার আওয়াজ শোনা, বিনা কারণে একটা শিশি পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া, উনুনে আগুন, বেসিনে সাবান জলের বুদবুদ আবার একই শক্তিবলে সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া। তারও আগে ডরোথি জাহাজ থেকে নম্ভারটা নেমে গেছে ভেবেছিলাম, আসলে সে অদৃশ্য অবয়ব নিয়ে জাহাজেই ছিল। যাদুকের যেমন যাদুবলে অদৃশ্য হতে পারে ঠিক তেমনি করেই উইলহেম স্টোরিজও যে-কোনো সময় সেখানে অবস্থান করেও লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে পারে।

এতকিছু সত্ত্বেও আমি কিন্তু ব্যাপারগুলোকে যাদুর কারসাজি বা ভোজবাজির খেলা বলে মনে নিতে মনের দিক থেকে উৎসাহ পাচ্ছি না। সবই বস্তুজগতের আওতায় পড়ে। তবে কোন্ সে শক্তি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উইলহেম স্টোরিজ এমন কোনো রসায়নের সূত্র আবিষ্কার করেছে বা সন্ধান পেয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেকে যে-কোনো মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের কাছে অদৃশ্য করে তুলতে সক্ষম। কোনো কোনো তরল পদার্থ মিশিয়ে এমন একটা অত্যাচার্য মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভব আমরা তা জানি না, হয়তো বা কোনোদিন জানা সম্ভবও হবে না।

কোনো অবয়ব অদৃশ্য এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে কখন হয়, যখন জৈতিক দেহ ধারণ করে।

কোনোক্রমে যদি তার হাত, পা, গর্দান বা মাথার চুল চেপে ধরা সম্ভব হয় তবে অদৃশ্য হলেও তাকে জাপটে ধরে রাখা তো সম্ভব হবেই। কয়েদখানার গারদ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য তার অবশ্যই নেই।

কিন্তু মনকে যত প্রবোধ দিই, যতই নিজেকে শক্ত করার অপচেষ্টা চালাই না কেন বুকের ভেতরে ধুকপুকানি ঠিকই আছে, অস্বীকার করলে সত্য গোপন করাই হবে।

ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে জোরদার পুলিশী পাহারা চলছে। কিন্তু অদৃশ্য শক্তিকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তাদের কোথায়? আমাদের শত্রু এখন কোথায় জানা না থাকলেও পরপর দুটো ভয়ঙ্কর ঘটনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, হতচ্ছাড়াটা শহরেই অবস্থান করছে। কিন্তু ধরা-ছোঁয়া বা শাস্তি বহির্ভূত।

জুনের চার তারিখের ভয়ঙ্কর ঘটনা দুটোর মধ্যে একটা-আমার ভাই ও রোডরিখ পরিবারের সবাই যখন গাড়ি-বারান্দায় হাসি গল্পটুঙজবে মগ্ন ঠিক তখনই কে যেন আমাদের একেবারে কানের কাছে বিকট শব্দ করে হেসে উঠল। শয়তানের হাঙ্গামে যেভাবে অট্রহাসিতে ফেটে পড়ার জোগাড় হয় ঠিক তেমনি বিশ্রী স্বরেই হাসি। ঠিক তখনই সূতীক্ষ্ম একটা ছুরি ফলা ঝলমলিয়ে উঠল। এগিয়ে গেল অনুজ মার্ক এর দিকে। ক্যান্টেন হারালান তাকে জাপটে ধরে ফেলল। আমিও ছুটে গেলাম। ঠিক তখনই ক্রোধোন্মত্ত তীব্র একটা গর্জন কানে এল—‘মায়রা কোনোদিনই মার্ক এর স্ত্রী হতে পারবে না। কোনোদিনই নয়।’ ব্যস, মোমবাতির শিখাটা কাঁপতে লাগল। আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কেটে পড়ল বুঝতে পারলাম।

চৌদ্দপুরুষের বরাতের জোর ছুরিটা আমার অনুজের পিঠের হাড় ছুঁয়ে নেমে গেছে। রক্তক্ষরণ ঘটছে। আর একটু হলেই বোধহয় তার ভবলীলা সঙ্গ হয়ে যেত। তখন শত চেষ্টা করেও কিছুই দেখতে পাই নি। কেবল ঘরময় রজনপোড়া গন্ধ আর একটা নিভে-যাওয়া মশাল মেঝেতে পড়েছি।

বলতে লজ্জা বা দ্বিধার কিছুই নেই, আমরা তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেও এক তিলও সফল হই নি। বুঝা গেল, দাশ্যপদার্থ ব্যবহার করে পুরো বাড়িটাকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঝাঁক করে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। বুদ্ধি দিয়ে তার কাণ্ডকারখানার বিচার করে মীমাংসায় আসা সম্ভব হল না।

পরের দিন ৫ জুন। সেদিন আরও ভয়ঙ্কর একটা অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে শহরবাসীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে দশটা বাজে। আচমকা এক সঙ্গে অনেকগুলো ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠল। নারকীয় ঘণ্টাধ্বনি শুনে সবার বুকের মধ্যে কাঁপন ধরে গেল। মৃতদেহ গোর দেওয়ার সময় এমন সুর করে ঘণ্টা বাজানো হয়।

এবারের ব্যাপারটা আরও বেশি রহস্য সৃষ্টি করল। এতগুলো ঘণ্টা একজনের পক্ষে একই সঙ্গে বাজানো সম্ভব নয়। নারকীয় কাণ্ডগুলোর নায়ক উইলহেম স্টোরিজ হলেও সম্পূর্ণ কাজটা সে একা সম্পন্ন করছে না। তবে তো সে একা নয়! তবে?

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে কৌতূহলী ও সাহসী কিছু যুবক দৌড়োদৌড়ি করে টাওয়ারের ওপরে, ঘণ্টা-ঘরে হাজির হল। কিন্তু ভোঁ-ভা। কারো টিকির নাগালও পেল না।

নম্ভার উইলহেম স্টোরিজ তবে শহরেই অবস্থান করছে? তার ঘুরির ফলাটা ফসকে গেলেও সে অবশ্যই হাল ছেড়ে দেবে না। নতুন পথে পরবর্তী হামলা হুজ্জতি করবে, ধরে নেওয়া চলে। শয়তানটাকে প্রতিরোধ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে লাগলাম।

পরের দিন হয়ই জুন ডা. রোডরিথ-এর বাড়িতে, মায়রার ঠিক পাশের ঘরেই অনুজ মার্ক-এর থাকার ব্যবস্থা করলাম। এবার আমার পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে প্রয়াসী হলাম। বাড়িটার সর্বত্র, এমন কি আনাচে কানাচে পর্যন্ত চিরুনি তল্লাশি চালানলাম। তারপর সব কটা ঘরে ইয়া বড় বড় তালো তুলিয়ে দিলাম। চাবিগুলো নিজের কোটের পকেটে রেখে দিলাম। এবার থেকে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলেই আমি ডা. রোডরিথ ও মার্ক এক সঙ্গে ব্যস্ত পায়ে ছুটে যাই। আমাদের পরিচিত লোক ছাড়া কাকপক্ষীকেও ঢুকতে দিই না। বাড়ি তো নয় ঠিক যেন একটা দুর্গে আমরা বাস করছি।

অটো স্টোরিজ খুব সম্ভবত শক্তিশালী আলোকরশ্মির আবিষ্কারক। আর তার সঙ্গে এমন রসায়নের ফরমুলা আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন যা জীবিত প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তা বেরিয়ে চামড়ার ওপর হাজির হয়ে সৌর বর্ণালীর রশ্মিগুলোর ধর্মকে পরিবর্তিত করে ফেলে।

সে দেহাভ্যন্তরে এমন সব রশ্মি প্রবেশ করেছে আর তা চামড়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। বাইরের আলোকরশ্মি সে দেহের সংস্পর্শে আসা মাত্র ভেঙে গিয়ে উপরোক্ত অজ্ঞাত রশ্মিতে পরিণত হবে এবং সেগুলো অস্বচ্ছ দেহের মধ্য দিয়ে অনায়াসে গলে যাবে। আর দেহের অন্যদিক দিয়ে ফুঁড়ে বেরোবে। ঠিক তখনই এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পূর্বের আলোকে পরিণত হবে। এরই ফলে অস্বচ্ছ দেহটাকে আর চোখে দেখা যাবে না। একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

এখন একটা ব্যাপার আমার কাছে একেবারেই বিস্ময়কর বলে মনে হতে লাগল। উইলহেম স্টোরিজ-এর দেহ বা পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু তার হাতের অঙ্গশস্ত্র বা অন্যান্য দ্রব্য পরিষ্কার দেখা যায়। কেন? ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যের আড়ালেই রয়ে যায়। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে অত্যাশ্চর্য রসায়ণ পদার্থটার নামটা কিছুতেই জানতে পারলাম না। যদি কোনোক্রমে নামটা জানতে পারতাম তবে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে হতচ্ছাড়া উইলহেম-এর সঙ্গে এক চোট ধাক্কা ধাক্কা করে নিতাম। অজ্ঞাত রসায়ন পদার্থটির নাম যা-ই হোক না কেন তার ত্রিায়া ক্ষণস্থায়ী, নাকি দীর্ঘস্থায়ী তা-ও জানতে পারলাম না। তবে কি একটু বাদে বাদেই উইলহেম স্টোরিজকে বিশেষ রসায়ন পদার্থ খেতে হয়? আর যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবুও হ্যাণ্ডা কম নয়। অদৃশ্য দেহকে প্রয়োজনবোধে দৃশ্য করতে হলে ফের অন্য কোনো রসায়ন পদার্থ খেতে হবে। আবার বেশি পরিমাণে, রসায়ণ পদার্থ সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে বেড়ানোও খুবই সমস্যার ব্যাপার। এটুকু না হয় জোড়াতাল্পি দিয়ে কোনোরকমে দাঁড় করানো গেল। কিন্তু দুটো ব্যাপার, ঘণ্টাধর্মি আর মশালের নাচনকোদন? এগুলো কি করে সম্ভব হল? নিজের মনের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কোনো উত্তর পেলাম না।

আমি এলোমেলো চিন্তা মাথায় নিয়ে পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক-এর দপ্তরে গেলাম। দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, উইলহেম স্টোরিজ-এর বুলেটার্ড টেকেলির বাড়িটাকে সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হবে। হতচ্ছাড়া উইলহেম স্টোরিজ যেন কিছুতেই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ফলে সে তার অত্যাশ্চর্য রসায়ণ পদার্থের ভাণ্ডার থেকে তা সংগ্রহ করতে পারবে না। এর ফলে তাকে হয় রসায়ণ পদার্থের গুণ ফুরিয়ে গেলে দৃশ্যমান হতেই হবে নতুবা সর্বদা অদৃশ্যই থেকে যেতেই হবে। বাছাধনকে এর মাধ্যমেই জব্দ করা সম্ভব হবে। আর যদি তার মস্তিষ্ক বিকৃতির ব্যাপার থেকেই থাকে তবে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকতে না পারায় বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবে। তখন আর তাকে গারদে পোরার কাজটা মোটেই সমস্যার হবে না।

আমাদের পরিকল্পনামাফিক পুলিশপ্রধান স্টোপার্ক উইলহেম স্টোরিজ-এর বাড়ির চারদিকে পুলিশ মোতায়েন করলেন।

উইলহেম স্টোরিজ-এর অসাধ্য কিছুই নেই। সে নিজেই তো সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে রাগ শহর ছেড়ে যায় নি, শহরের বুকেই সে বুকে টোকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এদিকে মায়রার পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মুখে কোনো কথা নেই। শূন্য দৃষ্টি। কাউকেই দেখতে পায় না। কানেও শোনে না। তার মা বা মার্ক-কে পর্যন্ত সে চিনতেই পারে না। মিসেস রোডরিথ প্রায়ই স্বপ্ন দেখে গুমড়ে ওঠেন। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পান উইলহেম স্টোরিজ পাহারাদারদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাওব করে বেড়াচ্ছে।

শহরের নামকরা চিকিৎসক রোজ এসে মায়রাকে পরীক্ষা করে বিধান দিয়ে যান। ক্রমে তার রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যাপারে তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন।

তিনিদিন এক নাগাড়ে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকার পর আমার অনুজ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। এবার থেকে সে সর্বক্ষণ মায়রার মাথার কাছে বিমর্ষমুখে বসে থাকে।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর মুখে শুনলাম, শহরের মানুষগুলো নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্য দিয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে।

এদিকে ক্যাপ্টেন হারালান একদম একা রাগ শহরে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটাবার আশঙ্কায় আমাকে পর্যন্ত সঙ্গে নেয় না। তার একটাই উদ্দেশ্য নম্ভার উইলহেম স্টোরিজকে খুঁজে বেড়ানো আর শহরবাসী কেউ দেখে থাকলে সবার আগে তাকে ধরে ফেলা।

এগারোই জুন। সেদিন বিকালের দিকে অনুজ মার্ক-এর সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলে আমি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তার শরীর ক্রমে অবনতির দিকে যাচ্ছে। ভাবলাম, কিছুদিনের জন্য পাহাড় বা সমুদ্রের ধার থেকে ঘুরিয়ে আনতে পারলে হয়তো উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু তাকে মায়রার কাছ ছাড়া করা সম্ভব নয়। এও ভাবলাম, কেবলমাত্র মার্ক-ই নয়, রোডরিথ পরিবারের সবাইকে কিছুদিনের জন্য ঘুরিয়ে নিয়ে এলেই বা মন্দ কি?

আমার অনুজ মার্ক-এর মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে যে, সে যেন প্রতিমুহূর্তেই শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এর পদধ্বনি শুনতে পায়। সর্বক্ষণ আতঙ্কে জড়োসড়া হয়ে থাকে। ভয় তার নিজের জন্য নয়, মায়ারার জন্যই তার যত ভয়। আসলে মায়ারার জন্য তেমন ভয়ের কিছু নেই। আজ না হোক কাল সে স্বাভাবিকতা ফিরে পাবেই। অন্ততঃ প্রাণনাশের সম্ভাবনা নেই।

একটা কথা মাঝে-মধ্যেই আমার মনে জাগে, অটো স্টোরিজ কেন এমন একটা অশুভ আবিষ্কারে উৎসাহী হয়েছিলেন। আবার কেনই বা অশুভ কৌশলটা তাঁর বংশধরকে দিয়ে গেলেন?

তবে কদিনের মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনাই ঘটে নি। তবু শহরবাসী যেন ভুলুড়ে উৎপাতের আশঙ্কায় নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছে। শহরবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক কীভাবে কাজ করে চলেছে এরকম প্রায় 'এক শ' ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনার কথা বললেই কিছুটা অন্ততঃ ধারণা করা যাবে।

সেদিনটা ছিল বারো তারিখ। সকালে আমি ব্যস্ত হয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক এর কাছে যাচ্ছিলাম। পথে ক্যাপ্টেন হারালান-এর সঙ্গে দেখা। আমার সঙ্গে সে যাবে কি না জানতে চাইলাম। কোনো জবাব না দিয়ে বিষণ্ণমুখে সে আমাকে অনুসরণ করতে লাগল। আচমকা পিলে-কাঁপানো চিৎকার শোনা গেল। ব্যস, পথচারীরা ছুটোছুটি দাপাদাপি জুড়ে দিল। যে, যেদিকে পারল ছুটে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে লাগল। টিক তখনই একটা ঘোড়ার গাড়িকে বাতাসের বেগে ছুটে আসতে দেখা গেল। পথচারীদের কি করে যে বিশ্বাস হল ঘোড়ার গাড়িটার লড়োয়া এটাই স্বয়ং উইলহেম স্টোরিজ, মাথায় এল না। তাই পথচারীরা পালাবার সময় গলা ছেড়ে আতর্জনাদ করছিল- 'উইলহেম স্টোরিজ! উইলহেম স্টোরিজ!'

ব্যাপারটা ঘটামাত্র ক্যাপ্টেন হারালান ঘোড়ার গাড়িটার দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেতে লাগল। বুঝলাম, তার মোকাবেলা করার তীব্র বাসনা নিয়েই তার এরকম অত্যাশ্রয়।

পথচারীদের উত্তেজনা যে চরম রূপ নিয়েছে তা পরিষ্কার হল পর পর ক'বার গাদা বন্দুক গর্জে ওঠার ফলে। ক্যাপ্টেন হারালান-কে এগিয়ে যেতে দেখে কয়েকজন যুবক সাহসে ভর করে তার পিছু নিল। সবাই মিলে হৈ হৈ করে এগিয়ে গিয়ে গাড়িটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েকজোড়া হাত এগিয়ে গেল গাড়োয়ান উইলহেম স্টোরিজকে ধরার জন্য, কিন্তু কার্যত দেখা গেল সবাই নিজের নিজের হাত দুটো চোকাঠুকি করছে। অদৃশ্য বাতাস ছাড়া কিছুই ধরা পড়ল না। তার আগেই গাড়িটা উল্টে পড়েছিল। পরে আসল রহস্য জানা গেল। কৃষক গাড়োয়ান রাস্তার ধারে গাড়িটা রেখে ব্যস্ত হয়ে বাজারে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে উৎপাতের সময় তার গোড়া নিজেকে মুক্ত করে দৌড়ে পালিয়েছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমরা দৌড়ে মাঝখানে গিয়ে না দাঁড়ালে বেচারি গাড়োয়ানকে উত্তেজিত জনতা হয়তো ছিড়ে-ফেঁড়েই ফেলত।

১৪ জুন। বেলা এগারোটার কাছাকাছি নদীর দিকে হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ সমবেত আতর্জনাদ শুনতে পেলাম— 'হায়! ফিরে এসেছে! শয়তানটা ফিরে এসেছে!'

কে ফিরে এসেছে জানতে চাইলে ভিড়ের মধ্য থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় কে যেন বলল— 'খোঁয়া! ওই যে, চিমনি থেকে খোঁয়া বেরোচ্ছে!'

অন্য একজন আগ বাড়িয়ে বলল— 'পর্দার আড়াল থেকে তার মুখ অবধি দেখা গেছে!'

লম্বা লম্বা পায়ে বুলেভার্ড টেকেলিতে গিয়ে দেখি, হাজার খানেক লোক বাড়িটাকে ঘেরাও করে উত্তেজনা প্রকাশ করছে। সবার একই বক্তব্য, একদল অদৃশ্য সাক্ষরদকে নিয়ে নম্বারটা বাড়ির মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে। পুলিশ হন্যে হয়ে উত্তেজিত জনতাকে ঠেকাতে বুঝা চেষ্টা করে চলেছে।

উত্তেজিত জনতা যেভাবে বাড়িটাকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে একটা মাছিও বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না। বাড়িটার আনাচে কানাচে-সর্বত্র তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু বুঝা চেষ্টা। বাড়ির যাবতীয় জিনিষপত্র লুণ্ঠও করেও তার টিকির নাগাল পাওয়া গেল না। এমন কি আশুন ধরিয়ে বাড়িটার দেওয়াল কটা ছাড়া দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র যা কিছু ছিল পুড়িয়ে হারখার করে দেওয়া হল। এবার জনতার উত্তেজনা স্তিমিত হল।

শহরবাসীরা এবার একটু আশ্বস্ত হল। সবারই দৃঢ় বিশ্বাস, বাড়িটায় আশুন দেওয়ার সময় চরমতম শত্রু উইলহেম স্টোরিজ বাড়ির ভেতরেই ছিল। সে আশুনে পুড়েই নম্বারটা ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ছাই পর্যন্ত ওলট পালট করেও ভস্মীভূত মানুষের সামান্যতম চিহ্নও পাওয়া গেল না।

শহরের মানুষের মনে কিছুটা অন্ততঃ স্বস্তি ফিরে এলেও রোডরিখ-ভবনের পরিস্থিতি প্রায় অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। মায়ারার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা না থাকলেও সর্বক্ষণ বিধানা আঁকড়েই পড়ে থাকে। চেতনা এখনও লুপ্ত। মুখে রা নেই। দৃষ্টি শূন্য। থেকে থেকে আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

জুনের ১৬ তারিখ। সে দিন বিকালের দিকে আমি এবং পুলিশপ্রধান হাঁটতে হাঁটতে সেতুটা পেরিয়ে দানিয়ুব নদীর বিপরীত তীরে হাজির হলাম। সাড়ে আটটার কাছাকাছি আবার সেতুটার ওপরে ফিরে এলাম। তার মাঝামাঝি এসে আমরা দীপটায় নেমে গেলাম। হেঁটে দীপের উত্তরদিকে গেলাম। কুঁড়ে ঘরগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। হেঁটে ফেব্রার সময় টুকরো টুকরো কয়েকটা কথা কানে এল, স্টোপার্ক-এর হাত চেপে ধরে দাঁড় করলাম। বললাম— 'মনে হচ্ছে উইলহেম স্টোরিজ-এর কণ্ঠস্বর। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। হয়তো তার চাকরটা সঙ্গে রয়েছে।' আমরা একটা মোটাসোটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কণ্ঠস্বরটা আমাদের খুবই কাছে চলে এল। তাদের কথাপকথনের মূল বক্তব্য— 'আমরা কালই সেখানে যাচ্ছি তো? কাল সকালে রাগ শহরে ফিরব। ভুয়ো একটা নামে বাড়িটা ভাড়া নেওয়া হয়েছে। সে বাড়িতে আমাদের কেউ চিনতেও পারবে না।' আমার মনটা বিষিয়ে উঠল এজন্য যে, উইলহেম কোন্ শহরে গিয়ে আত্মপোষণ করছে, জানতে পারলাম না। তবে এটুকুই আশ্বাস পেলাম, উইলহেম মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করতে

চলেছে।

আবার কণ্ঠস্বর কানে এল। মনে হল উইলহেম-এর চাকর হারমান এবার কথা বলছে—‘এ ছদ্মনাম ধারণ করলে রাগ শহরের পুলিশ আমাদের টিকির নাগালও পাবে না।’

কণ্ঠস্বরটা দূরে সরে গেল। পুলিশ-প্রধান বলে উঠলেন—‘এখন সবার আগে আমাদের কাজ হবে কোন্ শহরে এবং কোন্ ছদ্মনাম ধারণ করে উইলহেম বাস করতে চাইছে বের করা।’

আবার। আবার উইলহেম-এর কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে এল—‘শ্রেমবার্গে না গেলে চলবেই না। সেখানকার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রয়েছে। অবশ্য এখানকার ব্যাঙ্কেও টাকা রয়েছে। কিন্তু মনুষ্যদেহ ধারণ করার উপায় যে নেই। চেহারাটা অন্তত না দেখতে পেলো কে টাকা দেবে! কি যে করি ভেবে পাচ্ছি। নচ্ছারগুলো আমার রসায়নগারটা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাতে অত্যাবশ্যক দু'নম্বর দ্রবণটাও বরবাদ হয়ে গেছে। তবু দেখছি, বরাতেসের জোর আছে। বাগানের গোপন জায়গাটার প্রতি নচ্ছারগুলোর চোখ যায় নি। আগামী পরশু দশটার সময় এসে বাগানের ওই বিশেষ জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। কালই যেতাম। কিন্তু কাল আর একটা ভেলকি দেখাবার পরিকল্পনা নিয়েছি। মতলবটা আমাদের পরিচিত একজনের কাছে আকর্ষণীয় হবে কি না জানে? আমার সাফ কথা শোন, রাগ শহর কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছি না। মায়রার সঙ্গে ওই হতচ্ছাড়া ফরাসিটা যতদিন থাকবে ততদিন ওই পরিবারটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়।’

এবার চাকর হারমান-এর কণ্ঠ শোনা গেল—‘রাগ শহরেই ছোট-বড় প্রতিটা মানুষই জেনে গেছে অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা আমাদের কজা করা আছে। তবে কীভাবে তা সম্ভব করি তার হিন্দিস আজ অবধি কেউ-ই পায় নি।’

‘পাবেও না কোনোদিন। রাগ শহরে সবে তো উৎপাত শুরু করেছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে কিছুতেই আমি ক্ষান্ত দিচ্ছি। মূর্খের দল ভেবেছে, আমার বাড়ি পুড়িয়ে ছারখার করেই আমার সর্ব্ব ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি তার সর্ব্বনাশ না করে রেহাই দিচ্ছি না, কিছুতেই না।’ শয়তান উইলহেম গর্জে উঠল।

পুলিশ-প্রধান উদ্ভাসের মতো ছুটে গিয়ে হাত বাড়িয়ে জাপ্টে ধরার ভঙ্গিমা করে চিৎকার করে উঠলেন ‘মি. ডাইডল, একটা শয়তানকে ধরে ফেলেছি! অন্যটাকে আপনি ধরুন আচ্ছা করে!’ হ্যাঁ, কোনো একটা দেহের ওপর পুলিশ-প্রধানের হাত পড়েছিল ঠিকই।

আমার ধারণা ছিল, অদৃশ্য শক্তি আমাদের ওপর জোর হুজুতি শুরু করবে। কিন্তু বিকট স্বরে বুক-কাঁপানো হাসি ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক একটা ব্যাপারে অন্তত নিঃসন্দেহ হলেন, চেষ্টা করলে অদৃশ্য দেহকেও জড়িয়ে ধরা সম্ভব। তাদের প্রায় কজির মধ্যে পেয়ে গেছি। আগামী পরশু তাদের পোড়া বাড়িটাতে আসতেই হবে। দুটোকে, দুটোকে সম্ভব না হলেও অন্ততঃ একজনকে হলেও ধরার মওকা পাওয়া যাবে।’

বাড়ি ফিরে ডা. রোডরিককে নিয়ে গোপন-আলোচনায় বসলাম। দ্বীপে যা কিছু ঘটেছে, যা-যা শুনেছি সবিস্তারে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। রোডরিক-পরিবারের প্রতি শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এর ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার কথা এবং প্রতিশোধ নিতে সে যে বদ্ধপরিকর তা-ও বলতে বাদ দিলাম না।

আলোচনার মাধ্যমে স্থির হল, রাগ শহর ছেড়ে রোডরিক পরিবার গোপনে এমন এক জায়গায় চলে যাবে যার খোঁজ উইলহেম পাবে না। ক্যাপ্টেন হারালানও প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সে নিজে রাগ শহর ছেড়ে অন্যত্র যেতে কিছুতেই রাজি নয়। আসলে উইলহেম স্টোরিজের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্যই তার এরকম সিদ্ধান্ত।

সকাল আটটার কাছাকাছি দুটো গাড়ি এল। ঠিক হল, একটা গাড়িতে আমি অনুজ মার্ককে নিয়ে একটা পথে যাব আর অন্য গাড়িতে থাকবেন ডা. রোডরিক ও তার স্ত্রী-কন্যা। গাড়ি দুটো আলাদা আলাদা পথ ধরে এগোলো কেউ ব্যাপারটা নিয়ে কৌতূহলী হবে না।

অবিশ্বাস্য, রীতিমতো রোমহর্ষক ব্যাপারটা তখনই ঘটে গেল। ডাক্তার আমার অনুজ মার্ককে নিয়ে মায়রার ঘরে গেলেন তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসার জন্য। ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েই উভয়ে থমকে গেলেন। উভয়ের শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন এক সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড়। খাট ফাঁকা। মায়রা বিছানায় নেই।

আধ ঘণ্টা আগেও ডা. রোডরিক ও তাঁর স্ত্রী মায়রার ঘরে ছিলেন। মায়রাকে ভালো পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মার্ক নিজ হাতে জলখাবার খাইয়ে দিয়ে গেছে। ডা. রোডরিককে নিয়ে তাকে গাড়িতে তোলার জন্য ঘর থেকে বের করতে গিয়েই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি হল। সে এবার উজ্জান্তের মতো সারা বাড়ি ছুটোছুটি করতে করতে মায়রার নাম ধরে ডাকতে লাগল। না, কেউ-ই জবাব দিল না। মায়রা বাড়ির খ্রিস্টীয়মানায় থাকলে তো জবাব দেবে!

অপ্রত্যাশিত খবরটা শুনে মিসেস রোডরিক সংজ্ঞা হারিয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন। ক্যাপ্টেন হারালান-এর মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে। চোখের তারা লাল। শূন্যদৃষ্টি।

ক্যাপ্টেন হারালান-এর কথাটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমরা পালিয়ে যাওয়ার প্রকৃতি নেওয়ার সময় পাহারা একটু-আধটু শিথিল করে দিয়েছিলাম। এই সুযোগে শয়তানটা চুপিসারে বাড়ির মধ্যে ঢুক গেছে। সে নির্ধাৎ বহুদিন যাবৎ এর জন্য সুযোগের সন্ধান ছিল।

সবই না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু মায়রা হঠাৎ কোথায় ও কীভাবে উধাও হল, মাথায় আসছে না। দরজার সামনে, গাড়ির কাছে আমি মোতায়েন ছিলাম। আমার চোখে ধুলো দিয়ে কি করে মায়রা হাফিস হয়ে গেল? মেনে নিচ্ছি উইলহেম স্টোরিজ অদৃশ্য। কিন্তু মায়রা? সে তো আর বাতাসে মিলিয়ে গিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে যেতে পারে নি।

বাড়ির সর্ব্ব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। বাগানটাও বাদ দিলাম না। ভোঁ-ভোঁ। অনুজ মার্ক-এর কাছে গিয়ে দেখি, কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল করে ফেলেছে।

টাইন হলে গিয়ে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ককে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি সার্জেনকে এক ব্রাটেলিয়ান পুলিশ দিয়ে ডা. রোডরিক-এর বাড়ি খেরাও করে রাখার হুকুম দিলেন। তারপর তিনি নিজে গাড়ি নিয়ে

সেখানে এলেন। পুলিশ দিয়ে এবং পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক নিজে পুরো বাড়িটায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালালেন। বৃথা চেষ্টা, ভয়ে ঘি ঢালা ছাড়া কিছুই হল না। চিলেকোঠার দিক থেকে আসতে গিয়ে মি. স্টোপার্ক হঠাৎ ধমকে গিয়ে মুহূর্তকাল নীরবে লক্ষ্য করে বললেন—‘কিসের একটা উৎকট গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না? উইলহেম স্টোরিজ-এর রসায়নাগারে এরকম উৎকট গন্ধ পেয়েছিলাম, মনে পড়ছে? একটা শিশি ভেঙে তরল পদার্থ মেঝেতে পড়ে গিয়ে সে গন্ধটা বেরোচ্ছিল!’

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম—‘তবে শয়তানটা মায়রাকে একই রাসায়নিক তরল পদার্থ খাইয়ে অদৃশ্য করে নিয়েছে। তারপরই আমার চোখের সামনে দিয়ে তাকে নিয়ে হাফিস হয়ে গেছে।’

মিসেস, রোডরিখ আর মার্ককে নিয়ে এক অভিজ্ঞ ডাক্তার, ডাক্তার রোডরিখ নিজে, ক্যাপ্টেন হারালান এবং আমি নিদারুণ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে রাত্রি কাটলাম। আর পুলিশ-প্রধান আর সার্জেন তাঁদের নবাহিনী নিয়ে পাহারায় নিযুক্ত রইলেন।

সকালে পুলিশ-প্রধান রেসিডেন্সিতে রিপোর্ট করার জন্য যাওয়ার আগে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে, প্রায় ফিসফিসিয়ে এমন এক কথা বললেন যার তাৎপর্য আমার কাছে পরিষ্কার হল না। একেবারে দুর্বোধ্যই বলা চলে। তিনি বললেন—‘আমার কাজে যদি ফাঁকি না থাকে, বড় রকম ভুল না হয়ে থাকে তবে হয়তো শীঘ্রই আপনারদের ওপর থেকে সর্বনাশা মেঘ কেটে যাবে।’

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে বোকার মতো বড় বড় চোখ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

এবার যা ঘটল তার পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়ার ভাষা আমার নেই।

সকাল নয়টার কিছু আগে লেফটেন্যান্ট আর্মগার্ড ডা. রোডরিখ-এর বাড়িতে এলেন। ক্যাপ্টেন-বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইলেন।

অফিসার দু-জন ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমি তাদের পিছু নিলাম। সেদিন দ্বীপে উইলহেম আর তার ভৃত্যের আলোচনার মাধ্যমে জেনেছিলাম, সকাল দশটায় উইলহেম রাসায়নিক তরল পদার্থের খোঁজে তার বুলেভাদের পোড়াবাড়িতে আসবে। তাই প্রায় দশটায় আমরা তিনজন তার বাড়ির এককোণে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তিনজোড়া চোখ ধ্বংসস্তূপের দিকে নিবদ্ধ রাখলাম। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা। ব্যাপারটা এক পলকে দেখেই গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল। আমরা এমন একদৃশ্যের মুখোমুখি হলাম যার জন্য মুহূর্তের মধ্যে আমাদের এমন অবভাবনীয় ভাবান্তর ঘটল, তাই না। দেখলাম, কোনো হাতের ছোঁয়া নেই, এমন কি প্রবল বাতাসও নেই-অথচ ধ্বংসস্তূপের ছাই এবং পোড়াকার্ত প্রভৃতি ঘাটীঘাটী হচ্ছে, ঠিক যেন কেউ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে হান্য হয়ে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর পাথর, কাঠ ও লোহালঙ্কারগুলো যেন কোনো অদৃশ্য হাত এক পাশে সরিয়ে সরিয়ে রাখছে।

আমরা দূর দূর বৃকে, আতঙ্কিত চোখে একে অন্যের মুখের দিকে নীরব চাহনি মেলে তাকাতে লাগলাম। মুহূর্তে আমাদের সবার মুখের রক্ত যেন নিঃশেষে উধাও হয়ে গেছে। আর চোখের মণিগুলো কোটরে ঢুকে গেছে।

শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এরই কাজ আমাদের বুঝতে দেরি হল না। কাজের নায়ক অদৃশ্য বটে। কিন্তু কাজ পুরোদমে ঘটে চলেছে।

আচমকা বিকট একটা আর্তনাদে আমার বৃকের ভেতরে কলিজাটা দারুণভাবে নাচানাচি দাপাদপি শুরু করে দিল। এক সময় ক্যাপ্টেন হারালান-এর কণ্ঠস্বর কানে এল। গলা ছেড়ে আমাদের ডাকাডাকি করছে। আমি ও আর্মগার্ড দৌড়ে তার কাছে গেলাম। মুহূর্তকাল আগে সে আচমকা এক হোঁচট খেয়েছে। অদৃশ্য দেহের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছমড়ি খেয়ে পড়ার জোগাড় হয়েছিল। তারপরই সে ঝট করে জাপটে ধরেছে অদৃশ্য দেহটাকে। আমাদের বলছে, শয়তানটাকে অস্ত্রোপাশের মতো আঁকড়ে ধরে তাকে সাহায্য করার জন্য?

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক ঠিকই বলেছিলেন, অদৃশ্য হলেও দেহ খাঁচাটা তো আর বাতাসে মিলিয়ে যাবে না, সেটার অস্তিত্ব থাকবেই।

আমি অদৃশ্য দেহ খাঁচাটাকে আঁকড়ে ধরবার জন্য হাত বাড়তেই আচমকা এক ধাক্কা খেয়ে ছাইয়ের গাদায় ছমড়ি খেয়ে পড়লাম। হ্যাঁ, আমাদের পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হল। আমি আর ক্যাপ্টেন হারালান একটা হাত চেপে ধরলাম আর অন্য হাতটা আর্মগার্ড সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরলেন। ব্যস, বাহাদুর খাঁচাকলে আটকা পড়ে গেল। শয়তানটা কিন্তু অববরত মৌচড়াঁমুচড়ি দিয়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগল।

ক্যাপ্টেন হারালান তীব্র ক্রোধে বার বার তর্জন গর্জন করতে লাগল—‘মায়রা কোথায়? বল শয়তান, মায়রা কোথায়? বার-কয়েক হাতে মৌচড় মেরে মেরে হস্তিভ্রি করার পর শেষপর্যন্ত ওনতে পেলাম—‘বলব না। কিছুতেই বলব না।’

পর মুহূর্তেই চোখের পলকে আর্মগার্ড ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। শয়তানটা একটা হাত ছাড়া পেয়ে গেল। ব্যস, এবার আমি আচমকা এমন একটা ধাক্কা খেলাম যে, টাল সামলাতে না পেরে কয়েক হাত দূরে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম। ঠিক তখনই ক্যাপ্টেন হারালান-এর মুখের ওপর আচমকা এক ঝাপ্পার পড়ল। সে মাটিতে পড়ে চিল্লিয়ে উঠল—‘পালাচ্ছে! পালাচ্ছে! শয়তানটা পালিয়ে যাচ্ছে!’

ইতিমধ্যে প্রায় একশো লোক হেঁ হেঁ করতে করতে পাঁচিল টপকে স্টোরিজ ভবনে ঢুকে গেল। ক্যাপ্টেন হারালান-ই এ ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে ঝটপট একটা বৃত্ত তৈরি করে ফেলল। আমি উল্লসিত হলাম। শয়তান উইলহেম স্টোরিজ এবার ইঁদুরের মতো খাঁচাকলে আটকা পড়েছে। বাহাদুরকে এবার ধরা দিতেই হবে।

এমন সময় চোখের পলকে একটা রীতিমতো অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটে গেল। বেচারি আর্মগার্ড কোমরে হাত দিয়ে, চোখ-মুখ বিকৃত করে কোনো রকমে খাড়া হবার চেষ্টা করছেন, ঠিক তখনই অদৃশ্য একটা হাত তাঁর কোমর থেকে

তরবারটা হেঁচটা টানে খুলে নিয়ে বনবন করে শূন্য ঘোরাতে লাগল।

এমন একটা অভাবনীয় কাণ্ড দেখে ক্যাপ্টেন হারালান মুখড়ে না পড়ে নিজের তরবারটাকে কোষমুক্ত করে সামনের দিকে ছুটে গেল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল দৃশ্য আর অদৃশ্য হাতের তরবারির দন্দযুদ্ধ-তুমুল দন্দযুদ্ধ-অবিশ্বাস্য দন্দযুদ্ধ।

একসময় পর্বত প্রমাণ দশাসই একলাশ মাটিতে আছাড় খেয়ে ধরাশায়ী হল। তার বুকের ওপর চেপে বসে ক্যাপ্টেন হারালান গর্জে চলেছে—‘মায়রা কোথায়? আমার বোন মায়রা কোথায়? বল শয়তান, মায়রাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল?’

কোনো জবাব নেই। ধ্বংসস্থলের ওপর এলিয়ে পড়ে রইল নিশ্চল একটা লাশ। উইলহেম স্টোরিজ-এর লাশ। তার মুখটা যারপরনাই বিকৃত। ইয়া বড় বড় চোখের মণিদুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সব মিলিয়ে সেটা এক পলকে দেখলেই বুকের ভেতর ধড়ফড়নি শুরু হয়ে যায়।

গেল! সব গেল! মায়রাকে উদ্ধার করার সব আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। হতচ্ছাড়াটা বেঁচে থাকলে তাকে উদ্ধার করার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল এখন তা-ও গেল। ইতিমধ্যে পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক সেখানে পৌঁছে গেছেন। তিনি অপলক চোখে এক সময়ে মূর্তিমান আতঙ্ক উইলহেম স্টোরিজ-এর নিঃসার দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখের তারায় বিষ্ময়, মুখে টু-শব্দটিও নেই। তার পিতার সমাধির অন্তত শক্তি তাকে শেষপর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না।

পুলিশপ্রধান স্টোপার্ক-এর হুকুমে তাঁর বাহিনী ধ্বংস্রূপ ঘাটাঘাটি করতে করতে ছোট্ট একটি ধাতব পাত আবিষ্কার করল। সেটা ভুলে ফেলতেই সম্বন্ধী সিঁড়িটার পর পর কয়েকটা ধাপ চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি সব পা-ব্যাড়াতে যাব অমনি কে যেন আচমকা আমার একটা হাত চেপে ধরল। করুন স্বরে প্রার্থনা জানাতে লাগল ‘অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন! একটু অনুগ্রহ করুন!’

কার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারলাম না। তাই হতাশ মনে খালি হাতটা দিয়ে শূন্য হাতড়াতে লাগলাম। ভেজা একটা মুখ হাতে ঠেকল। চোখের জলে ভেজামুখ। আমার পায়ের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে অদৃশ্য এক মানুষ অব্যাহতের কোঁদে চলেছে বুঝতে পালাম। কাদো কাদো স্বরে সে এবার বলল—‘আমি হারমান। উইলহেম স্টোরিজ-এর চাকর।’

পুলিশ প্রধান স্টোপার্ক একটু আগে যে বলেছেন, ভূগর্ভে যা কিছু আছে সবই আমি ধ্বংস করে দেব তা শুনেই হারমান-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগার হয়েছে। কারণ, তার মনুষ্যদেহ ফিরে পাওয়ার আশা চিরদিনের মতো নস্যাৎ হয়ে গেলে লোকালয় থেকে দূরে, বহুদূরে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাটাতে হবে।

স্টোপার্ক তাকে রক্ষা করার ভরসা খিনে বলল—‘আমাকে সঙ্গে করে পাতাল পুরীতে গিয়ে আগে সবকিছু দেখিয়ে দিতে হবে। তারপর তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট হলে তবেই তুমি মুক্তি পাবে।’

হারমান এবার স্টোপার্ককে নিয়ে সিঁড়িভেঙে পাতাল পুরীতে হাজির হল। তাক থেকে ‘এক’ নম্বর লেবেলযুক্ত একটা বড়সড় শিশি, ‘বি’ লেবেলযুক্ত একটা মাঝারি শিশি, আর ‘দুই’ নম্বর লেবেল লাগানো একটা শিশি নামিয়ে হারমান যন্ত্রচালিতের মতো একটা শিশির ছিপি খুলে ঢক ঢক করে ভেতরের রাসায়নিক পদার্থটুকু পান করে ফেল। এবার অজুতভাবে শূন্যের মধ্য দিয়ে হারমান-এর অদৃশ্যদেহ ক্রমে দৃশ্য হয়ে উঠতে লাগল।

স্টোপার্ক-এর নির্দেশে বাকি শিশি কটা ভেঙে ভেতরের রাসায়নিক পদার্থটুকু মাটিতে ফেলে দেওয়া হল।

আমরা এবার উইলহেম স্টোরিজ-এর লাশটার সদগতির কথা ভাবতে লাগলাম। কথা উঠতেই আমি বললাম—‘ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মধ্যযুগে যাদুকর, ডাকিনী সাধক প্রভৃতির লাশ কবরস্থ না করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে শয়তান উইলহেম স্টোরিজ-এর লাশটা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হোক।’

আমি ডা. রোডরিখ-এর বাড়ি ফিরে এলাম। আর পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক সদ্য মনুষ্যদেহ লাভ করা হারমানকে নিয়ে টাউন হলের দিকে যাত্রা করলেন।

আমার আগেই ক্যাপ্টেন হারালান বাড়ি পৌঁছে তার বাবা ডা. রোডরিখ-এর কাছে বিস্তারিত ভাবে শয়তান উইলহেম স্টোরিজকে হত্যা এবং তার চাকর হারমানকে বন্দি করার কাহিনী ব্যক্ত করেছে।

মার্ক উইলহেম স্টোরিজ-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে খুশি তো হতেই পার না, বরং তার মুখে নেমে এল বিষণ্ণতার কালো ছায়া। সে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—‘আমাদের নিজেদের স্বার্থের ভাগিদেই শয়তানটাকে জিইয়ে রাখা দরকার ছিল। সে জীবিত থাকলে মায়রার খোঁজ পাওয়ার তবুও কিছুটা অন্ততঃ আশা ছিল। এখন তাকে পাওয়ার আশা আমাদের মন থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে। আমি বললাম—‘উইলহেম স্টোরিজ-এর চাকর হারমান এখনও জীবিত। তার মুখ থেকে মায়রার হিন্দিস মিলতে পারে। সে অবশ্যই মায়রার খোঁজ জানে। ছলে-বলে কৌশলে আমরা তার মুখ থেকে মায়রার খবর বের করবই।’

পুলিশ-প্রধান স্টোপার্ক-এর একান্ত আগ্রহে উইলহেম স্টোরিজ-এর মৃতদেহ শহরের সর্বত্র মিছিল করে ঘোরানো হল।

এদিকে ক্যাপ্টেন হারালান টাউন হল থেকে ফিরে এল। তার চোখে-মুখে হতাশার ছাপ, বৃকে বার্থতার জ্বালা। কিসের বার্থতা? হতাশাই বা কেন? সে উইলহেম স্টোরিজ-এর চাকর হারমান-এর সঙ্গে দেখা করেছিল। তাকে অনুরোধ করে, ভয় দেখিয়ে এবং সবশেষে মারধোর করতেও দ্বিধা করে নি তার মুখ থেকে মায়রার খোঁজ পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোনো ওষুধেই কাজ হয় নি। তার শয়তান প্রভুটি নাকি এ ব্যাপারে ভুলেও মুখ খোলে নি।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। ডা. রোডরিখ, আমি, মার্ক আর দুজন অফিসার বৈঠকখানায় বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে গভীর আলোচনায় মগ্ন। ঠিক তখনই অব্যাহত ঘটনাটা ঘটে গেল। অভাবিত উপায়ে গ্যালারির দরজাটা দুম করে খুলে গেল। আমরা এতগুলো প্রাণী আরও অবাক হলাম যখন দেখলাম, দরজাটা আবার আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক তখনই এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা ঘটে গেল যা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমার বৃকে গাঁথা থাকবে। পরিষ্কার

শুনলাম—‘আমি মায়রা, মায়রা রোডরিখ বলছি।

মার্ক চিৎকার করে উঠল—‘মায়রা, আমার প্রাণাধিকা মায়রা সুস্থ হয়ে উঠেছে!’ পরিষ্কার তার কণ্ঠস্বর। কোনোরকম জড়তা নেই তার কণ্ঠস্বরে। মায়রা স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

কিন্তু কোথায় মায়রা? সে যে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে-অদৃশ্য।

হ্যাঁ, শয়তান উইলহেম স্টোরিজ রসায়ন পদার্থ সেবন করিয়ে তাকে অদৃশ্য করে রেখে দিয়েছে। সে আমাদের মাঝে অবস্থান করে চলাফেরা করছে, কথা বলছে। কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না।

মায়রা নিজে তার অবস্থা সম্বন্ধে মোটেই অবহিত নয়। তাই সে সবিস্ময়ে বলল, ‘কী ব্যাপার তোমাদের, বল দেখি? তোমরা সবাই কাঠের পুতলের মতো বসে রয়েছ যে বড়! সবাই মুখে কলুপ এঁটে বসে, ব্যাপার কী!’ মার্ককে লক্ষ করে বলল, ‘কী ব্যাপার বল তো? এমন অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, হয়েছে কি তোমার, বল তো?’

মার্ক এবার দুহাত বাড়িয়ে মায়রার একটা হাত ধরে ফেলে। নিজের মুখোমুখি চেয়ারে বসালো। কিন্তু যে অদৃশ্য। হাতের স্পর্শে বুঝতে পারল, মায়রা তার সামনে বসে।

মায়রার অদৃশ্য শরীরকে দৃশ্য করতে যে পারত কেবলমাত্র সে হচ্ছে স্বয়ং উইলহেম স্টোরিজ। কিন্তু সে তো অনেক আগেই পরপারে পৌঁছে গেছে। তার চাকর মোটেই গুপ্তরহস্য অবহিত নয়, থাকার কথাও নয়। কারণ, চাকর যতই বিশ্বস্ত হোক না কেন তার কাছে গুপ্তরহস্য ফাঁস করে না। কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে তার পক্ষে কারামুক্তিও সম্ভব হল না। কারারক্ষী তাকে খালাস করতে এসে দেখল, মারে সে একেবারে শক্ত কাঠ হয়ে রয়েছে। পরবর্তী কালে ময়না তদন্তের ফলে জানা যায়, তার শিরায় রক্ত অকস্মাৎ জমাট বেঁধে যাওয়াই তার মৃত্যু ঘটছে।

মায়রা সম্বন্ধে যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল তা-ও অদৃষ্ট বিড়ম্বিত হারমান-এর মৃত্যুর ফলে নিঃশেষ হয়ে গেল। উইলহেম স্টোরিজ-এর অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারটা চিরকালের জন্য রহস্যবৃত্তই রয়ে গেল।

স্টোরিজ-ভবন থেকে যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেও রাসায়নিক তরল পদার্থের ফরমুলার সম্বন্ধে মিলল না।

২০ জুন। সেদিন সকালে আমার সঙ্গে অনুজ মার্ক দেখা করতে এল। তাকে বেশ শান্তই মনে হল। তার কথাবার্তা বুঝতে পারলাম, সে বলতে চাইছে তাদের বিয়েতে ধর্মীয় অনুশাসনের ফাঁকটা থেকে গেছে। মন্ত্রপাঠ তো এখনও হয় নি। মায়রার মুখের দিকে তাকিয়ে ও সে নিরবচ্ছিন্ন অস্থিরতার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে আগ্রহী।

গির্জায় গিয়ে আমরা পাদরি সাহেবকে সব খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি মতামত ব্যক্ত করলেন—‘এতে আপত্তি কিছু নেই। হলই বা মায়রা অদৃশ্য। কিন্তু সে তো কথা বলতে সক্ষম। অতএব বিয়ের মন্ত্রপাঠও সে করতে পারবে।’

পরের দিন সকালে আমি, মার্ক আর রোডরিখ-দম্পতি গির্জার প্রধান পাদরির সামনে হাজির হলাম। ব্যাপারটা মায়রাকে আগে ভাগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল।

ফলে সে অদৃশ্য অবয়ব নিয়েই সেখানে উপস্থিত হল। সেখানে প্রধান পাদরি শুভ বিবাহের পবিত্র বিধি অনুযায়ী তাদের আনুষ্ঠানিক বিয়ের ব্যাপারটা সম্পন্ন করলেন। মায়রা যে-হাতে বিয়ের দলিলে স্বাক্ষর দান করল তা আর কোনোদিনই কারো দৃষ্টিগোচর হবে না, আজও হয় নি।

আমার অনুজ মার্ক-এর বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেল। তারপরও পুরো একটা সপ্তাহ আমি রাগ শহরে অবস্থান করেছিলাম।

জানুয়ারি মাস পড়ল।

একটা ব্যাপার কয়েকদিন ধরেই আমার মাথায় চক্কর মারছে। উইলহেম স্টোরিজ-এর মৃত্যুর কথা বলতে চাইছি। ক্যাপ্টেন হারালানোর তরবারির আঘাতে তার দেহে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল সেখান থেকে ফিনিকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল। রক্তের সঙ্গে তার দেহের রাসায়নিক তরল পদার্থটুকু দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। আর এরই ফলে তার অদৃশ্য দেহ দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। অতএব মায়রার অদৃশ্য দেহকেও তো একই উপায়ে দৃশ্য করে তোলা সম্ভব। এর জন্য চাই কেবলমাত্র কিছু রক্তপাত। মায়রার দেহ থেকে কিছুটা রক্ত বের করে দেয়া। চিকিৎসকের অস্ত্রের ধারাই তা অনায়াসে সম্ভব।

আমি যখন অনুজ মার্ককে চিঠি লিখে সবকিছু জানাতে যাব টিক তখনই তার একটা চিঠি পেলাম। সে লিখেছে, “মায়রা মা হতে চলেছে।” অতএব এ পরিস্থিতিতে তার দেহ থেকে সামান্যতম রক্তও বের করা সমীচীন নয়। তাই অনন্যোপায় হয়ে তখনকার মতো ব্যাপারটা চেপেই যেতে হল।

চিকিৎসকের মতে মায়রার প্রসবের সময় নিষ্কর্তিত হয়েছিল মে মাসের শেষের দিকে। তাই পনেরো তারিখে আমি রাগ শহরে উপস্থিত হলাম।

২৭ মে। সেদিনের স্মৃতি আমৃত্যু আমার অন্তরে চির জাগরুক থাকবে। অবিস্মাস্য দৈব ঘটনাটা সেদিনই ঘটল। মায়রা যেন ল্যাজারস-এর মতো অকস্মাৎ সমাধি ভেদ করে উঠে এল। দু-দুটো প্রাণীর জন্য হল সবার চোখের সামনে। তাদের একটা আমার ভাই-বোঁ আর দ্বিতীয়টা তার গর্ভধারিণী মায়রার। দীর্ঘদিন আমাদের চোখের আড়ালে অদৃশ্য থাকার জন্যই হয়তো বা তাকে আরও বেশি সুন্দর লাগছিল।

ভিলেজ ইন দ্য ট্রি টপস

ছয়টা ঘাড় অক্লান্ত পরিশ্রম করে পাথরের চার চাকাওয়ালা গাড়টিকে একনাগাড়ে টেনে নিয়ে চলেছে। এবড়োখেবড়ো পথ। কখনও খানাখন্দ পেরিয়ে, আবার কখনো বা প্রায় সমতল পথে এগোতে হচ্ছে বোবা, প্রাণী ছয়টাকে। ইতিমধ্যেই তিন মাস কেটেছে। আরো নয়-দশ সপ্তাহ গাড়ি চেপে পথ পাড়ি দিতে হবে। গাড়িটার দুটো কামরা। প্রথমটায় রয়েছে পঞ্চাশ বছর বয়স্ক শক্ত সাবুত এক পর্ভুগিজ বণিক। নাম তাঁর উর্দা। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বছর পঁয়ত্রিশেক বয়স্ক নিগ্রো ঘামিশ। তার কাজ চলার পথে গাছগাছালি ঝোপঝাড় পড়লে কেটে কুটে পরিষ্কার করে গাড়ি চালাবার মতো জায়গা করে দেওয়া। আর দ্বিতীয় কামরাটায় যাত্রী দুজন যুবক। উভয়েরই বছর পঁচিশেক বয়স। তাদের একজন ম্যাক্স হিউবার নামে এক ফরাসি, আর অন্যজন জন কট, আমেরিকান।

ফরাসি কস্টার রাজধানী লিভারভিল থেকে তিনমাস আগে এরা যাত্রা শুরু করেছে। হাতি শিকার করা এদের উদ্দেশ্য। প্রচুর হাতি ইতিমধ্যেই ঘায়েল করেছে। হাতির দাঁতই তাদের কাম্য। সারা পৃথিবীর পিয়ানোর রীড তা দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। হাতির দাঁতের বোঝা-মাথায় একজন গাট্টাগোট্টা লোক তাঁদের অনুসরণ করে চলেছে। তাদের সঙ্গে আনন্দ করতে করতে চলেছে লাস্কা নামে প্রায় দশ বছরের এক বালক। একে জন আর ম্যাক্স-এর পোষ্যপুত্র জ্ঞান করা যেতে পারে। জঙ্গলি মানুষখেকাদের হাত থেকে তাকে জোর করে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। কেবলমাত্র যে মানুষখেকোই তাই নয়, শিশুখেকোও বটে। নিজের শিশুকে দিয়েও পেটের জ্বালা এরা নেভাতে ইতস্তত করে না। যেদিন শিশু না জোটে সেদিন বড়দের গায়ে হাত দেয়। এমনই ভয়ঙ্কর সে-জাত।

শিকার করে হাতির দাঁত অনেকই জোগাড় হয়েছে। এবার ফেরার চিন্তা। বাড়ি ফিরতে আরও অন্তত নয়-দশ সপ্তাহ লেগে যাবে।

ফেরার পথে এক জঙ্গল পড়ল। পর্ভুগিজ বণিক উর্দা বললেন—‘জঙ্গলের মাঝ বরাবর যাওয়া ঠিক হবে না। জঙ্গলের ধার দিয়ে দিয়ে আমাদের যেতে হবে।’

ফরাসি যুবক ম্যাক্স সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করে উঠল—‘একী অদ্ভুত কথা বলছেন। মাঝ বরাবর গেলে পথ অনেক কম হবে। শীঘ্র পৌঁছে যাওয়া যাবে। তবুও যেতে চাইছেন না?’

‘যাওয়া সম্ভব নয় বলেই তো আপত্তি করছি। আজ অবধি ওখান দিয়ে কেউ যায়ও নি। মোন্দা কথা হচ্ছে, গাছগাছালি এমন ঘন, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে, তাদের ফাঁক দিয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।’

আমেরিকান যুবক জন কট উর্দাকে সমর্থন করতে গিয়ে বলল, ‘গাছগাছালির চক্রে গিয়ে হয়রান হওয়ার দরকারই বা কী? বাদ দিন তো—’

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স বলে উঠল, ‘সে কী! জঙ্গলটার ভেতরে কি রয়েছে জানার আর্থহও নেই?’

জন তাক্ষিল্যের সঙ্গে জবাব দিল, ‘জেনে কী-ই বা লাভ? জঙ্গলের ভেতরে অবশ্যই বিচিত্র শহর, দুর্গ আর অদ্ভুত দর্শন মানুষ ও জানোয়ার নেই।’

বাস, ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। আসলে ম্যাক্স-এর বক্তব্য হচ্ছে, এতদিন বনে ঘোরানুঘরি করে নতুন কিছুই দর্শন মিলল না। ব্যাপারটা অবশ্যই পরিতাপের। আশ্চর্য কিছু আবিষ্কার না হলে মন ভরবে কেন, বল তো?’

একে পথ কম হবে, নতুনতর কোনোকিছু চাক্ষুষ করা যাবে, উপরি পাওনা অভিজ্ঞতালাভ হবে। এ লোভের বশবর্তী হয়েই ম্যাক্স বনের মাঝ বরাবর পাড়ি দিতে আগ্রহী। উর্দা কিন্তু এতে নিতান্তই অনাগ্রহী। আবার জন কটও যেতে চাইল না।

কথা কাটাকাটি করতে করতেই রাত্রি সাতটা বেজে গেল। ফলে সেদিন আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। অনন্যোপায় হয়ে রাত্রিটা তাদের সেখানেই কাটাতে হল।

রাত্রি তখন দশটার কাছাকাছি। গভীর বনে কতগুলো আগুন জ্বলে উঠল। অভিযাত্রীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ব্যাপারটা তারা কেউ টেরও পেল না।

রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা। হঠাৎ নিগ্রো বালক লাস্কার ঘুম ভেঙে গেল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট আলোক-বিন্দু তার নজরে পড়ল। অনুসন্ধিৎসু নজরে আলোটার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, হেলেদুলে একেবেঁকে এগিয়ে চলেছে কতগুলো আলো। ভাবল, মশাল নাকি? দূরত্ব দেড় মাইল হবে হয়ত। ব্যাপারটা লাস্কার সুবিধের মনে হল না। আপন মনে বলে উঠল—‘মানুষখেকো জঙ্গলিরা নয় তো? আফ্রিকার গভীর বনে এদের চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছুই নেই। সাউথ সী আইল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার মানুষখেকোরা এদের কাছে নিছকই শিশু। দশ-পনের বছরের বালক বা কিশোরের মাংস পেলে তো আর কতাই নেই। দলপতির নির্দেশে সামান্য কারণেই ভৃত্যদের গর্দান নেওয়া হয়। তারপর তাদের মাংস দিয়ে—উঃ! লাস্কা আর ভাবতে পারছে না। অনিশ্চিত আতঙ্কে তার শরীরের স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসতে লাগল। পরমুহূর্তেই নিজের মনকে শক্ত করে আবার তাকাল চলন্ত আগুনের শিখার দিকে।

তাদের সংখ্যা খুব বেশিনয় বটে। দশটা তো হবেই। প্রায় দুশো গজ দূরে এবার সেগুলো কাছাকাছি গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়াল। লাস্কা ভাবল, এরা সকালের আলোর অপেক্ষায় রয়েছে।

লাস্কা এবার খুবই সতর্কতার সঙ্গে, সামান্যতমও শব্দ না করে প্রথম গাড়িটার ওপরে উঠে গিয়ে পর্তুগিজ শ্রৌট উর্দাকে ডেকে তুলল।

লাস্কা-র ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে উর্দা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে চলন্ত আঙনের শিখা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলন। অন্যান্যরাও ইতিমধ্যে ঘুম থেকে উঠে রহস্যসম্মারকালী আঙনের শিখাগুলো দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। কারোর মুখে টু-শব্দটিও নেই। একটা বা দুটো নয় গোটা পঞ্চাশেক আঙনের শিখা অনবরত চলছে—দুলছে—নাচছে।

জন কট নিঃসন্দেহ, সেগুলো অবশ্যই আলোয়ার আলো বা মেঘের বিদ্যুতের ঝলকানি নয়। রজন ব্যবহার করে আঙন জ্বালানো হয়েছে।

গাড়িতে দশ-বারোটা রাইফেল রয়েছে। কার্তুজ ও বারুদও প্রচুরই মজুদ রয়েছে। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যে বা যারাই আক্রমণ করুন না কেন অন্তত মোকাবেলা তো করতে পারবে।

উত্তর ও পূর্ব-পশ্চিমে বিরাজ করছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে রয়েছে রহস্যসম্মারকারী আঙনের শিখাগুলো। এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

রাতি প্রায় এগারোটা বাজে। এমন অস্ত্রহীন ও অনিশ্চিত আতঙ্কের মধ্যে আর কতক্ষণ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা সম্ভব? অনন্যোপায় হয়ে অস্থিরচিত্তে ম্যাক্স এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে চাইল। দু-চার কথার মাধ্যমে স্থির হল ম্যাক্স নিম্নো সন্তান ঘামিশ-কে নিয়ে ঘাস আর ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখে আসবে। রাইফেল আর গোলাবারুদ সঙ্গেই নিয়ে যাবে।

কিছুদূর যেতে না যেতেই ম্যাক্স দেখতে পেল, নিম্নো বালক লাস্কাও গুটিগুটি তাদের সঙ্গে চলেছে। সে মনে মনে বলল—‘লাস্কা সঙ্গে থাকলে উপকারই হবে। সে রাতের অন্ধকারে বেড়ালের মতো দেখতে পায়।’

চলন্ত আঙনের শিখাগুলির কখনও ঝোপের আড়ালে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আবার কখনও বা একেবারে স্পষ্ট হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সেগুলো অনবরত চলাফেরা করছে, দুলছে, নাচছে এবং লাফাচ্ছে। তারা এক পা দু-পা করে আরও কাছে, প্রায় দু-শ’ গজদূর থেকেও কিছুই দেখতে পেল না। আঙনের শিখাগুলো আগের মতোই চলছে, দুলছে আর লাফালাফি করছে বটে। কিন্তু অভিযাত্রীরা আঙনের শিখাগুলোর উৎসের সন্ধান কিছুতেই পেল না। কারা যে ওগুলো নিয়ে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে তা অনুমানও করতে পারল না।

অস্থিরচিত্ত ম্যাক্স আরও এগিয়ে গিয়ে রহস্যটা আবিষ্কার করার আগ্রহ প্রকাশ করল। ঘামিশ আর লাস্কা তাকে বাধা দিল, পথ আগলে দাঁড়াল। হঠাৎ পরিস্থিতি অধিকতর রহস্যজনক হয়ে উঠল। আগের মশালগুলো তো নাচানাচি করছেই, আরও প্রায় কুড়িটা মশাল নতুন করে আবির্ভূত হল। সেগুলো আর মাটির ওপরে বা মাটির কাছাকাছি রইল না। প্রায় শ’ দেড়েক ফুট লম্বা গাছের ডগায় নাচন কোদন জুড়ে দিল। ব্যাপারটা আরও রহস্যের উদ্দেশ্যে ঘটাল যখন দেখা গেল, গাছের মাথায় অবস্থানরত মশালগুলো কাণ্ড হয়ে, হেলেদুলে নিচের মশালগুলোকে কি যেন বলতে চাইছে।

না, অস্থিরচিত্ত ম্যাক্সকে আর দমিয়ে রাখাসম্ভব হল না। সে এক ঝটকায় ঘামিশ আর লাস্কা-র কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ব্যস্ত পায় সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

ম্যাক্স সামান্য এগিয়ে যেতেই কে যেন ফুঁ দিয়ে ঝটপট মশালগুলো নিভিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যেই জমাটবাঁধা অন্ধকারে তলিয়ে গেল সমগ্র বনভূমি। ঠিক তখনই রহস্যজনক গর্জন শোনা গেল। গভীর ঘূমে আচ্ছন্ন কেউ ঘোং-ঘোং করে নাক ডাকলে যেমন চাপা গর্জন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনিই আওয়াজ বহু দূর থেকে ভেবে আসতে লাগল। ম্যাক্স উৎকর্ষ হয়ে আওয়াজটা লক্ষ্য করে নিঃসন্দেহ হল, ঝড়ের গর্জন এটা নয়। আকাশ নির্মেষ। মেঘের গর্জনও অবশ্যই নয়। সবেচেয়ে বড় কথা, আওয়াজটা ভেসে আসছে মাটির কাছাকাছি কোনো না কোনো স্থান থেকে। আর সেটা যেন ক্রমশ তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ঘামিশ কণ্ঠস্বরে আতঙ্কমিশ্রিত ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে—‘হুজুর, এখনও সময় আছে, পালান!’

ই্যা, অনুমান অজ্ঞাত। দূর থেকে যেন মাদলের আওয়াজ ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে— আরও কাছে এগিয়ে এল রহস্যজনক আওয়াজটা।

বাস, আর দেরি নয়, ঘামিশ মুহূর্তে পিছন ফিরে ছুটতে ছুটতে বলল—‘হুজুর, যদি প্রাণে বাঁচতে চান পালান! এখনও সময় আছে, পালান!’

ম্যাক্স আর নিম্নো বালক লাস্কা ঘামিশকে অনুসরণ করতে লাগল। গাড়ির কাছাকাছি এসে বণিক উর্দার সঙ্গে দেখা। তিনিও উর্দ্ধাশ্বাসে ছুটতে লাগলেন।

মালবাহী কুলিরা আগেই চম্পট দিয়েছে। হাতে সময় আর মোটেই নেই। বড়জোর পনের মিনিট। এরই মধ্যে তারা এসে পড়ল বলে। মাইল দেড়েক দূরে তাদের আসতে দেখা গেল। তারা সংখ্যায় পাঁচ শ’—সাত শ’—নাকি এক হাজার কিছুই অনুমান করা গেল না। হাতি, ইঁদুর, হাতির পায়ের আঘাতে বনভূমির মাটি থরথরিয়ে কাঁপছে। ঝাঁড়গুলো পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে অনেক আগেই বাঁধন ছিড়ে চম্পট দিয়েছে। অদূরবর্তী অন্ধকার থেকে একটা ঝাঁড়ের অন্তিম আর্তস্বর ভেসে আসছে। হয়ত বা হাতির পায়ের তলায় পড়ে থেঁথলে মরেছে। গাড়িটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য উর্দা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কে, কার গাড়ি লুকোবে? নিজের নিজের জান রক্ষার তাগিদে সবাই ঝটপট গাছে উঠে পড়ল। তবে ই্যা, গুলি আর রাইফেল সঙ্গে নিতে তুলল না।

অভিযাত্রীরা গাছে উঠতে না উঠতেই হাতির পাল সেখানে হাজির হয়ে গেল। চোখের পলকে গাড়টাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। এবার পুরো দলটা গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু ত্রিশ ফুট ওপরের মগডালে অবস্থানরত উর্দা, ম্যাক্স, ঘামিশ ও লাস্কাকে গুঁড় দিয়ে নাগাল পেল না।

উর্দা যেন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। তিনি হাতির পালের ওপর দমাদম গুলি চালাতে লাগলেন। ঘামিশ তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা, উর্দা উম্মাদের মতো গুলি ছুঁড়েই চললেন। এদিকে পর্বতপ্রমাণ হাতিগুলো তীব্র আক্রোশে গাছটার গুঁড়িতে অনবরত ধাক্কা মারতে লাগল। সে যে কী আক্রোশ আর গগনভৈরী গর্জন বলে বুঝানো সম্ভব নয়। ইয়া মোটা গাছটা আর বেশিক্ষণ খাড়াভাবে থাকতে পারল না। একটু একটু করে হেলে পড়তে লাগল। ইতিমধ্যেই ম্যাক্স হিউবার, জন কর্ট, ঘামিশ ও লাস্কাকে নিয়ে গাছের ডাল বেয়ে বেয়ে অন্য একটা অপেক্ষাকৃত মোটা গাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। উম্মত্তপ্রায় হাতির দল এবার এ-গাছটার ওপর চড়াও হল। গায়ের সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা একের পর এক ধাক্কা মরতে লাগল গাছটার গায়ে। গাছটা হেলে পড়তেই ম্যাক্স লাস্কাকে কাঁধে তুলে নিয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে উল্লসাসে ছুটেতে লাগল। জন কর্ট ও ঘামিশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। হাতিগুলোও উম্মাদের মতো তাদের পিছন পিছন ছুটেতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দাঁতাল একটা হাতি ম্যাক্স—এর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গেল। এমন কি নিঃশ্বাসও যেন তার গায়ে লাগতে লাগল। চোখের পলকে বন্দুক উঠিয়ে ধরে ক্রোধোন্মত্ত হাতিটার দুচোখের মাঝখানে গুলি করল। বিকট আত্ননাদ তুলে সেটা দুম করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সুযোগ বুঝে অভিযাত্রীরা গভীর বনে ঢুকে গেল। এমন ঘন বন যে কোনোরকমে মানুষ যাতায়াত করতে পারে বটে, কিন্তু হাতির পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। ফলে উপায়ন্তর না দেখে হাতির দল হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু মশালবাহী মানুষখেকাদের চিহ্নও আর দেখা গেল না।

রীতিমতো এক আতঙ্কের ব্যাপারই বটে। জঙ্গলের কিনারায় ক্রোধোন্মত্ত হাতির দল আর জঙ্গলের ভেতরে মশালবাহী হিংস্র মানুষখেকার দাপাদাপি। অধীর প্রতীক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন আতঙ্কের মধ্যে অভিযাত্রীদের সারাটা রাত্রি কাটল। রাতজাগা মানুষখেকো মশালবাহীরা কোথায়? তারা কি ঝোপঝাড় বা গাছের গুঁড়ির আড়ালে ঘাপটি মেরে রয়েছে, নাকি গাছের ওপরে উঠে গেছে তাই বা কে জানে।

পূর্ব-আকাশে ভোরের আলো ঊর্কি দিল। ভোর হল। অভিযাত্রীরা গাছের তলায় পোড়াকাঠ ও ছাই দেখে নিঃসন্দেহ হল। হিংস্র মানুষখেকো জঙ্গলিরা এখানেই রাত কাটিয়েছে। এখন তারা ধারে কাছে নেই, কিন্তু এখন তারা কোথায়? হয়ত বা হাতের ভয়ে নিজেদের ঝুপড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। হাতির দল কিন্তু এ তল্লাট ছেড়ে যায় নি। তীব্র আক্রোশে ধারে কাছেই ঘুরঘুর করছে।

ম্যাক্স ভাবছে, একবারটি গাড়িটার কাছে যাওয়া দরকার। উর্দার পরিস্থিতি যে কি হল দেখতে হয়। আর কিছু কার্ভুজ ও বারুদ নিয়ে আসাও একান্ত দরকার। বণিক উর্দার হয়ে হাতির দাঁতের খোঁজে এরা বাড়িঘর ছেড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়চ্ছে। তিনিই এখন কাছে নেই। কুলিরা হাতির দাঁতের বোঝা নিয়ে ভয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাতেই তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হবার জোগার হয়েছিল। তা না হলে এমন কোনো পাগল আছে যে হাতির পালের ওপর গুলি চালিয়ে তাদের প্রতিরোধ করতে উৎসাহী হয়?

ম্যাক্স আর জন-এর বাবারা লিভারপুলের এক আমেরিকান কারখানার অংশীদার। ফলে এদের সময় ও অর্থ দু-ই অটেল। তাই তিন মাস আগে অভিযাত্রীর দল হাতির দাঁতের খোঁজে উবাসীর জঙ্গলে যাচ্ছে শুনে পিছু নিয়েছিল। ম্যাক্স আর জন এমনিতে অভিনুহুদয় বন্ধু হলেও প্রকৃতিগতভাবে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত মেলের। জন বাস্তববাদী, কল্পনা-টল্পনার প্রতি নামমাত্র উৎসাহও তার নেই। ম্যাক্স ঠিক তার বিপরীতধর্মী, কল্পনার জাল বুনতেই তার যত উৎসাহ। জন-এর জন্ম বোস্টনে বটে। ভূ-বিদ্যা ও নৃতত্ত্ব বিদ্যার দিকে তার প্রবণতা খুবই বেশি। ম্যাক্স যে ফরাসি। বাস্তবের চেয়ে কল্পনার জাল বোনার সুযোগ পেলে আর কথা নেই।

উর্দা কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার ব্যাপারে গোড়া থেকেই আপত্তি করেছিলেন। অভিযানের লোভে অজনা-অচেনা জঙ্গলে ঢুকে কোন ফাঁসাদে জড়িয়ে পড়তে হবে, কে জানে। তাই তো প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি পথ পাড়ি দিতে।

ফ্রেঞ্চ-কঙ্গোর দক্ষিণে অবস্থিত জঙ্গলটা আয়তনে নেহাৎ কম নয়। অন্যান্যরা কিন্তু জঙ্গলের বাইরের ঘুরপথে না গিয়ে তাড়াতাড়ি হওয়ার অজুহাতে উর্দাকে জঙ্গলের ভেতরের আড়াআড়ি পথ পাড়ি দিতে বাধ্য করে। সবাই এমন কথাও বলেছিল, জঙ্গলিরা এ-জঙ্গলে ঢোকে না। আসলে তারা সাহসই পায় না। অতএব ভয়ের কি থাকতে পারে? এবার এরকম যুক্তি তারা দেখিয়েছে, এমন বিশাল জঙ্গলে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো নদী পাওয়া যাবেই। আর সেটা অবশ্যই উবাসীতে গিয়ে মিশেছে। সোজা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে থাকলে, পথে নদী পড়লে অল্প সময়ের মধ্যেই উবাসীতে পৌঁছনো যাবে।

নদী আর নৌকার কথা শুনেই জন কর্ট তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলেছিল—‘আরে ক্বাস! আফ্রিকার নদীতে নৌকো! কার এমন দুঃসাহস যে এখানকার জলে নৌকো নামাতে যাবে।’

কিন্তু অন্যান্যদের অভ্যর্থনা গ্রহণের কাছে জন-এর কোনো যুক্তিই টেকেনি। বাধ্য হয়ে সে-ও মতো দিয়েছিল।

ক্ষিদিতে পেটের ভেতরে জ্বালা করতে শুরু করেছে। যা হোক কিছু পেটে না দিলে এ-জ্বালা নেভার নয়। তাই অভিযাত্রীরা কায়দা কসরৎ করে কোনোরকমে একটা হরিণ শিকার করল। আঙনে ঝলসে তা দিয়ে এতগুলো প্রাণী উদরপূর্তি করল।

জঙ্গলের বুকে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। সবাই অতিকায় দুটো গাছের আড়ালে শুয়ে পড়ল। স্থির হল পালা করে এক এক জন জেগে পাহারা দেবে। প্রথম গ্রহণে ম্যাক্স-এর পালা পড়ল। বন্দুক নিয়ে টহল দিতে গিয়ে সে কত কল্পনাই

না করতে লাগল। প্রখ্যাত পর্যটক স্ট্যানলি আফ্রিকার গভীর অরণ্যে তিন ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট পিগমি নামক উপজাতির দেখা পেয়েছিলেন। আর ওজন? আশি পাউন্ড মাত্র। বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি সামর্থ্যে সভ্য মানুষদের চেয়ে কোনোদিক থেকেই পিছিয়ে নেই তারা। তা সত্ত্বেও গাছের উঁচু ডালে ঝুপড়ি তৈরি করে তারা বাস করে। ম্যান্স ভাবছে, তাদের মতো জীবন হলে কী মজাটাই না হবে। অজানা-অচেনা এ গভীর বনে যদি ল্যাংগুয়ালা মানুষ, হাতির শৃঙ্গের মতো নাকযুক্ত বিচিত্র কোনো প্রাণী অথবা পৌরাণিক কাহিনীর সাইক্লোপদের মতো এক চোখওয়ালা প্রাণীর দেখা পেলে সভ্যভাব্য মানুষদের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি হ'ত।

ম্যান্স গভীর ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে পাহারা দেবার কর্তব্যের কথা ভুলে যায়। ব্যস, আচমকা পিছন দিক থেকে কাঁধে হাতের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র ভূত দেখার মতো ভড়কে গিয়ে সে তোৎলাতে তোৎলাতে বলে উঠল—‘কে? কে? কে তুমি?’

জন কট সরবে হেসে বলল, ‘এবার তুমি ঘুমোও গে ম্যান্স। এবার আমার পালা, জেগে পাহারা দেব।’

সকাল হল। ১১ মার্চের সকাল। অভিযাত্রীরা ঝলসানো হরিণের মাংস দিয়ে উদর পূর্তি করে আবার হাঁটতে শুরু করল।

পথ পাড়ি দিতে গিয়ে এখনও কোনো নদী তাদের সামনে পড়ে নি। সূর্যই পথের নিশানা স্থির করার একমাত্র অবলম্বন। চারজন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে। গাছের ডালে বিচিত্র রঙ ও চঙের বহু বানর চোখে পড়ল। তাদের কারোর গায়ের রঙ আরবদের মতো হলুদ, কারোর বা রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লালচে আবার কারোর গায়ের রঙ আফ্রিকানদের মতো কুচকুচে কালো।

রাত্রি গভীর হলে জলহস্তীর ডাকাডাকি কানে এল। তবে কি ধারে-কাছে নদী বা অন্য কোনো বড়সড় জলাশয় রয়েছে? ক’দিন বৃষ্টির নামগন্ধও নেই। পাথরের গর্তে বা গাছের কোটরে জমে থাকা জল দিয়ে কোনোরকমে তৃষ্ণা নিবারণ করা হচ্ছে। তবে আকাশ ভেঙে মুঘলধারে বৃষ্টি পড়তে সমস্যারই সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।

অভিযাত্রীরা হঠাৎ দুটো গগারের খপ্পড়ে পড়ল। সামনেই পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা বাওবাব গাছে চড়ে যাওয়া সম্ভব হল। মৃত্যু অবশ্যরিত। কিন্তু পরমপিতা স্নায় বলে কোনোরকমে তাদের প্রাণ বাঁচল। আচমকা ক্রোধোদ্ভূত গগারের খাড়া খড়্গ বাওবাব গাছের গুঁড়িতে গাঁথে গেল। তীব্র আক্রোশে ঠেলাধাক্কা করতে করতে খড়্গ আরও বেশি করে গুঁড়িতে ঢুকে গেল।

ঘামিশ-এর পরামর্শে অভিযাত্রী চারজন উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে লাগল। এক নাগাড়ে দীর্ঘ সময় ধরে ছুটে তারা একটা নদীর কিনারায় হাজির হল। নদীটা বেশ চওড়া। স্রোতও যথেষ্টই দেখা যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা ভাবল, বড়সড় একটা ভেলা তৈরি করে নিতে পারলেই কাজ হাসিল করে ফেলা যাবে। অনায়াসেই তারা উবাসীতে পৌঁছে যেতে পারবে। জলহস্তী আর কুমীরের উপদ্রব থাকতেই পারে। আফ্রিকার সব নদীনালায় তাদের দৌরাখ খুবই বেশি। জলপথে যাতায়াত করা সম্ভব না?

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু একটু করে নামতে শুরু করেছে। ঘামিশ খোঁজাখুঁজি করে রাত্রি কাটানোর উপযোগী একটা গুহা বের করে ফেলল।

সামান্য কিছু খাবার উদরকে কোনোরকমে বুঝ দিয়ে গুহাটার ভেতরে অভিযাত্রী চারজনই শুয়ে পড়ল। জন বন্দুক কাঁধে একা রাত্রি জেগে পাহারা দিতে লাগল।

রাত্রি ক্রমে গভীর হল। অত্যাশ্চর্য এক কণ্ঠস্বর জন-এর কানে এল। কে যেন ‘অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা’ বলে সম্বোধন করে কাকে ডাকছে। প্রথমে ভাবল, এটা নির্ধাৎ দুর্বল মনের ব্যাপার-সাপার ছাড়া কিছু নয়। উৎকর্ণ হয়ে কয়েক মুহূর্ত শুনে নিঃসন্দেহ হল। হ্যাঁ, কোনো শিশুর কণ্ঠস্বর। এখানকার জঙ্গলিরা মাকে ‘অ্যাংগোরা’ বলে সম্বোধন করে। কোনো শিশু যেন আকুল হয়ে তার মা-কে ডাকাডাকি করছে। কিন্তু যে জঙ্গলে কোনোদিন মানুষের পায়ের ছাপ পড়ে নি সেখানে কে এমন আকুল হয়ে অ্যাংগোরা অর্থাৎ মা-কে ডাকবে?

সকাল হল। অভিযাত্রীরা ভাবল, গুহাটায় বেশ নিশ্চিন্তেই ভেলা তৈরি না হওয়া পর্যন্ত ক’দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জন কট একা কিছুটা পথ হাঁটাইটি করে দেখে এল। না, গত রাত্রে যে ‘অ্যাংগোরা’ অর্থাৎ মা মা বলে ডাকাডাকি করেছিল তার দেখা পেল না। ভাবল, তবে নির্ধাৎ মনের ভুল। এবার আরও কিছুটা এগিয়ে নদীটাকে ভালভাবে দেখে নিতে লাগল।

খাবার ফুরিয়ে গেছে। ম্যান্স বন্দুক-কাঁধে লাঙ্গাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে পড়ল শিকারের খোঁজে। জন কট ও ঘামিশ ভেলা তৈরির উপকরণ খুঁজতে লাগল। কিছু শুকনো ডালপালা হলোই নৌকা তৈরির কাজে লেগে যেতে পারবে। একটা কুড়ুল আর বড়সড় কয়েকটা ছুরি সম্বল। কুড়ুল দিয়ে মোটামোটা গুঁড়ি কাটা সম্ভব হলেও চেড়াইয়ের সমস্যা মিটেবে কি দিয়ে? তবে ভেলা একটা তৈরি করতে পারলে অনায়াসে আড়াই মাইল পথ পাড়ি দিয়ে উবাসীতে পৌঁছে যাওয়া কোনো সমস্যাই নয়। তারা যখন শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই দূর করে বন্দুক গর্জে উঠল। ম্যান্স-এর কাজ। নির্ধাৎ শিকার পেয়েছে। বন্দুকের গুলির আওয়াজটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই হঠাৎ বাতাসবাহিত চঁচামেচির শব্দ তাদের কানে এল। ম্যান্স আর লাঙ্গার কণ্ঠস্বর। তবে এটুকু বুঝল, কণ্ঠস্বর অবশ্যই ভয়ানক নয়। হঠাৎ কোনো কিছু দেখে বিষ্ময়ে অভিভূত হলে কণ্ঠস্বর ঠিক যেমনটি হয় এ যেন ঠিক সেরকমই।

জন কট আর ঘামিশ কণ্ঠস্বরটা অনুসরণ করে উর্ধ্বাঙ্গে ছুটে ছুটে তাদের কাছে যেতেই ম্যান্স সোল্লাসে বলে উঠল, ‘তোমাদের আর অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে ভেলা তৈরি করতে হবে না। ভেলা পেয়েছি।’

জন কট সচকিত হয়ে নজর ফেরাতেই জলে বেশ বড়সড় একটা ভেলা দেখতে পেল। সচকিত হয়ে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ম্যান্স-এর মুখের দিকে তাকাল। তারা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিঃসন্দেহ হল, কেউ না কেউ এ জঙ্গলে

এসেছিল। তারা ব্যস্ত-পায়ে এগিয়ে গিয়ে দেখল, একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা ভাঙাচোরা একটা ভেলা। দড়ির অবস্থাও সঙ্গীন। কাঠগুলো পচে গেছে। জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে।

নিম্নো বালক লাসা আনন্দে নাচতে নাচতে নদীর পাড় বরাবর কিছুটা চলে গিয়েছিল। এক সময় মাটি থেকে একটা তালু কুড়িয়ে নিয়ে গলা ছেড়ে চোঁচাতে লাগল। জং পড়া তালু। কাজের অনুপযুক্ত। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। অজানা-অচেনা গভীর অরণ্যে ভেলা আর তালু দেখলে তো অবাক হবারই কথা। তাদের মনে প্রশ্ন জাগল—‘তবে কি এখানে কোনো সভ্য মানুষের আগমন ঘটেছে?’

অভিযাত্রীরা ভেলাটায় চেপে এবার এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে প্রয়াসী হল। কিছুদূর যেতেই ম্যাক্স একটা খাঁচা দেখে চমকে উঠল। ছোটখাটো একটা ঘরের মতো দেখতে খাঁচাটা কাঠের দেওয়াল, সামনের দিকের দেওয়ালে লোহার শিক লাগানো। খাঁচার দরজার গায়েই ঘরের দরজা। ম্যাক্স দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখল, ছোঁড়া ও পোকায় কাটা একটা তেলচিটে পড়া কম্বল, কালিঝুলি মাথা সামান্য কিছু বাসনপত্র, একটা ছেঁড়াফাঁটা কাপড়ের গাম্ভী, জংপড়া একটা কুড়ুল চশমার খাপ আর কয়েকটা খালি বোতল এখানে-ওখানে পড়ে রয়েছে। আর ঘরের এক ধারে একটা ডালা লাগানো তামার বাস্ন। ডালার ফাঁক দিয়ে একটা ছুরির ডগা ঢুকিয়ে জোরে চাপ দিতেই সেটা খুলে গেল। বাস্নের ভেতর থেকে একটা খাতা বের করে সে চোখের সামনে ধরল। খাতাটার মলাটে একটা নাম লেখা ‘ড. জোহোসেন’।

ড. জোহোসেন-এর নামটা কানে যেতেই জন কট, ম্যাক্স আর ঘামিশ উল্লসিত হল। খুবই পরিচিত এ-নামটা। তাঁর নামটার সঙ্গে একটা ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে।

অধ্যাপক গার্নার ছিলেন একজন আমেরিকান। তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল, যারা স্তন্যপায়ী তারা অবশ্যই কথা বলতে সক্ষম। এ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে তিনি ওয়াশিংটন চিড়িয়াখানার বানরের খাঁচার ভেতরে একটা ফোনোগ্রাফ যন্ত্র বসিয়ে রাখেন। এভাবে তিনি বানরের কথা রেকর্ড করেন।

দীর্ঘ গবেষণায় লিগু থেকে তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছান, বানর ও কুকুরের স্বরযন্ত্র প্রায় মানুষের স্বরযন্ত্রের মতোই। মানুষই ভাবনাচিন্তা করতে পারে বলে অনর্গল কথা বলতে সক্ষম। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের ভাবনা চিন্তার ক্ষমতা নেই বলে তারা বাক্যলাপে অক্ষম। মনের ভাবনা-চিন্তাই তো কথা বলার প্রেরণা যোগায়। ভাবনার প্রকাশ করার তাগিদেই মানুষ ভাষার সৃষ্টি করতে উৎসাহী হয়েছিল। জন্তু-জানোয়ারদের সৃষ্টিকর্তা চিন্তাশক্তি দান করেন নি। কাকাতুয়ার পক্ষে নিজের ইচ্ছামত মনের ভাব ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সেখানেই বুলিই সে কেবল বলে থাকে।

অধ্যাপক গার্নার ভাবলেন, আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে গিয়ে বানরের কাছাকাছি বাস করবেন। শিম্পাঞ্জি আর গরিলার কথাবার্তা লিখে নেবেন। তারপর আমেরিকায় ফিরে ‘বানরভাষা’-র একটা অভিধান আর ব্যাকরণ লিখে প্রকাশ করবেন।

অধ্যাপক গার্নার আঠারো শ’ বিরানব্বইয়ে আমেরিকা থেকে কঙ্গোতে হাজির হলেন। সেখান থেকে লিভারপুলের কারখানা-বাড়ি হয়ে, জাহাজে চেপে হাজির হলেন বনের ভেতরের ক্যাথেলিক মাঠে। সঙ্গে করে একটা বড়সড় লোহার খাঁচা নিয়ে আসেন। খাঁচাটার ভেতরে কয়েক রাত্রি বাস করেই পালিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ইয়া বড় বড় মশার সঙ্গে সমঝোতা করা কিছুতেই সম্ভব হল না। ব্যস, বানরভাষার অভিধান লেখার কাজ শিকিয়ে উঠল। তবে যে কয়দিন তিনি সেখানে ছিলেন তাতেই বানরদের ব্যবহৃত কয়েকটা শব্দ জানতে পেরেছিলেন। শব্দ বলা ঠিক হবে না, হরেকরকম উচ্চারণ বলাই সম্ভব। মানুষের পূর্বপুরুষরা নাকি এভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করত। ব্যস, এখানেই তাঁর গবেষণার ইতি হল, অসম্পূর্ণ রইল।

আবার ড. জোহোসেন উৎসাহী হলেন। কাজে লিগু হলেন। বৈজ্ঞানিক, জীব বিজ্ঞানী, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষাতেও মাতৃভাষার মতো চোস্ত। টাকার কুমীর, অকৃতদার। তার অর্থ ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে ব্যয় করার মতো বলতে কেউ-ই নেই। আত্মীয় পরিজনও কেউ নেই। কেবলমাত্র একটা নিম্নো-যুবক সর্বদা তাঁর কাছে কাছে থাকে।

জার্মান থেকে একটা পোস্ত খাঁ তৈরি করিয়ে বহু হাস্যমা সহ্য করে সেখানাকে উবাসীর পড়ে এনে হাজির করলেন। স্থানীয় লোকজনকে নিয়ে একটা ভেলা তৈরি করে একমাত্র সঙ্গীকে নিয়ে নদী বেয়ে চলতে লাগলেন। ব্যস, তারপরই একেবারে বে-পাতা। তাঁর হৃদিস কারোরই জানা নেই। তাঁরই নামটা খাতার মলাটের গায়ে-জন কট, ম্যাক্স ও ঘামিশ যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। তারা ড. জোহোসেন-এর কথা এ পর্যন্তই জানে। তারপর এখানে তাঁর হৃদিশ মিলল। জানা গেছে। তিনি এখানে খাঁচাটা বসিয়ে বানরদের ভাষা কিছু রপ্ত করার চেষ্টা করেন। আর এ-ও জানা গেছে ড. জোহোসেন-এর মাথার কলকজা নাকি একটু ঢিলে। তা হোক গে, খাঁচাটা ফেলে পালিয়ে যাওয়ার মতো পাগল অবশ্যই তিনি নন।

ড. জোহোসেন-এর দিনলিপির সামনের দিককার কয়েকটা পাতায় লেখাবোকা রয়েছে বটে। অবশিষ্ট পাতাগুলো একেবারে সাদা।

আঠারো শ’ ছিয়ানব্বই খ্রিষ্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই থেকে দিনলিপিটা লেখা আরম্ভ করেছেন, শেষ কয়েকদিন পঁচিশে আগস্ট। ভেলা তৈরি, জলে ভাসানো, সাতদিন চলার পর পছন্দ মতফিক জায়গায় ভেলা বাঁধা, শিম্পাঞ্জি, গরিলা আর বানরের মেলা। নদীর জলে মাছের প্রাচুর্য। খাবারও প্রচুর। অসভ্য জঙ্গলিরা মোটেই নেই। পঁচিশে আগস্টে লেখা হয়েছে জলহস্তী ও প্রচুর বানর, তাদের নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করতে দেখা গেল। তারা যেন সত্যই কথা বলতে সক্ষম। অ্যাংগোরা শব্দটার অর্থ পরিষ্কার বোঝা গেল। মা-কে এদের ভাষায় ‘অ্যাংগোরা’ বলে।

‘অ্যাংগোরা’ শব্দটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জন সচকিত হয়ে ভাবতে লাগল, গতরাতে সে তো অ্যাংগোরা শব্দটাই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল।

খাঁচাটার ধারে-কাছে তনুতনু করে ডা. জোহোসেন-এর কঙ্কাল বা হাড়গোড় খোঁজাখুঁজি করা হল। বৃথা চেষ্টা হাড়ের একটা টুকরোও পাওয়া গেল না।

খাঁচাটার ভেতরে, মাটির তলা থেকে একটা টিনের বাস্ক উদ্ধার করা হল। সবাই আশাষিত, ড. জোহোসেন-এর রহস্য হারিয়ে যাওয়ায় তা অবশ্যই টিনের বাস্কবন্দি করে রাখা হয়েছে। ঘামিশ তড়িঘড়ি বাস্কটা ভাঙতেই ভেতর থেকে এক শ'টা বন্দুকের গুলি বেরিয়ে এল। এটা অভিযাত্রীদের কাছে কম লাভের ব্যাপার নয়। তাদের মজুদ গুলি বারুদ আজ না হোক কাল ফুরাবেই। তখন এগুলো অশেষ উপকারে লাগবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত সবাই মিলে হাত চালিয়ে কাজ করে কোনোরকমে ভাঙাচোরা ভেলাটাকে সারাই করে ব্যবহারোপযোগী করে তুলল।

সদ্য প্রাপ্ত সসপ্যানে করে মাংস সিদ্ধ করা হল। এতদিনঝলসানো মাংসে উদরপূর্তি করে করে অভিযাত্রীদের অভক্তি জন্মে গেছে। আজ সিদ্ধ মাংসে জিভটাকে একটু পাল্টে নেওয়া গেল; মহানন্দে ভোজ সেরে তারা ড. জোহোসেন-এর নামটাকে অমর করে রাখার উদ্দেশ্যে নদীটার নামকরণ করল 'রিও জোহোসেন'।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই অভিযাত্রীরা সদ্য মেরামত করা ভেলাটার ওপর সসপ্যান, গুলি বারুদের বাস্ক, বন্দুক, কাপ, মগ ও অন্যান্য খুঁটিনাটি কিছু জিনিস তুলে নিয়ে রিও জোহোসেন নদীপথ ধরে চলতে আরম্ভ করল। ভেলার গতিবেগ ঘণ্টায় আধ মাইল। এভাবে চলতে পারলে কুড়ি থেকে ত্রিশ দিনে দু-শ' পঞ্চাশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে দেওয়া যাবে। নদীর দু-ধারে বন। শিকারের অভাব নেই। নদীতে মাছও আছে প্রচুর।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতেই ভেলা থামানো হল। রান্নাবান্না শুরু করল। নৈশভোজ সেরে ঘুমিয়ে ক্লান্তি অপনোদনে মগ্ন হল তারা। একজন করে পালা করে প্রহরায় নিযুক্ত রইল।

ভোর হতেই অভিযাত্রীরা আবার ভেলার বাঁধন খুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করল। কিছু দূর এগোতেই নদীটাকে ক্রমে সরু হয়ে যেতে দেখা গেল। তবে নদীর দু-ধারের দৃশ্য ধরতে গেলে অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। এখানকার বনভূমির গাছগাছালি অপেক্ষাকৃত লম্বা, ঝাঁকড়াও বটে। ডালগুলো নদীর ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। বানরের সংখ্যাই যে এখানে বেড়েছে তা-ই নয়, তাদের আকৃতি-প্রকৃতিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। বানর ছাড়া প্রচুর সংখ্যক গরিলা, শিম্পানজি, গিবন ও বেবুন প্রভৃতি জানোয়ারও দলবেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখা গেল। মধ্য আফ্রিকা ছাড়া এত বানর অন্য কোথাও বাস করে বলে জানা নেই।

বানরগুলোর চিংকার চোঁচামেচি আর দাপাদাপি দেখে ঘামিশ আতঙ্কিত হয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিল। অভিযাত্রীদের কোনোরকম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়েই হতচ্ছাড়া বানরগুলো আচমকা তীব্র আক্রমণ শুরু করল। হাতের কাছে যা গেল তা-ই দেয় ভেলাটা লক্ষ্য করে ছুঁড়তে লাগল পাথর, মাটির ঢেলা আর গাছের ফল। অনবরত ভেলাটার ওপর ছুঁড়ে মেরে তারা অভিযাত্রীদের একেবারে নাজেহাল করে দিতে লাগল।

উপায়ন্তর না দেখে ম্যাক্স এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল। গুলিবিদ্ধ হয়ে একটা রক্তাপ্লুত বানর বিকট স্বরে আর্তনাদ করতে করতে গাছ থেকে দড়াম করে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গুলির তুলনায় বানরের সংখ্যা অনেক, অনেক বেশি। এক সময় গুলি শেষ হয়ে যাবে, বানর কিন্তু খতম হবেনা।

নদী এখানে চওড়ায় অনেক কম। গাছগুলো যেন দু'দিক থেকে হুমড়ি খেয়ে নদীর ওপর পড়েছে। ব্যাপারটা নজরে পড়তেই গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল। দেখা গেল, ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে তিনটা যমরাজের দূত ইয়া তাগড়াই তিনটা শিম্পানজি ভেলাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ওৎপেতে রয়েছে।

ব্যস, আর একমুহূর্তও দেরি নয়। তিনটা বন্দুক থেকে তিন-তিনটা উত্তপ্ত সীসার গুলি বেরিয়ে তিনটা গরিলাকেই কুপোকাং করল। বিকট আর্তনাদ করে ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। বার কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করতে করতে জল তোলপাড় করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব খতম হয়ে গেল। ব্যাপার দেখে আরও গোটা কুড়ি গরিলা তর্জন গর্জন করতে করতে গাছের ডাল বেয়ে তেড়ে এলো প্রায় মাটির কাছাকাছি। তাদের লড়াইকু ভাব দেখে অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল। আবার তিনটে বন্দুক বার বার গর্জে উঠতে লাগল। গুলিবিদ্ধ হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় কয়েকটা লাশ জলে আছাড় খেয়ে পড়ল। বাকিরা পড়ি কি মরি করে জান নিয়ে পালল।

এদিকে বিপদ নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। নদীর জল ঘূর্ণিপাকের মতো বার বার চক্কর খাচ্ছে। এর মধ্যে ভেলাটা পড়লে আর দেখতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে গোস্তা খেয়ে অতলে তলিয়ে যাবে লোকজন আর জিনিসপত্র নিয়ে। অভিযাত্রীদের মাথায় বজ্রাঘাত হবার জোগাড়। জলে আপদ ঘূর্ণিপাক আর বনে হতচ্ছাড়া বানরের উৎপাতে প্রাণ ওঁঠাগত করে তুলল। ঘামিশ অভিভূত হাতে লগি দিয়ে ঠেলে ধাক্কে ভেলাটাকে ঘূর্ণিপাক থেকে দূরে রাখার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগল।

অকস্মাৎ আকাশ থেকে মেঘের গুরুগুরু শব্দ ভেসে আসতে লাগল। মেঘের ডাক কানে যাওয়া মাত্র বন্য জন্তু-জানোয়াররা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নদীর পাড়ের গাছগুলি ফাঁকা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ভেলাটা ঘূর্ণিপাকের এলাকা ছাড়িয়ে দূরে সরে গেছে, জন্তু-জানোয়ারের উৎপাতও কমে গেছে। অভিযাত্রীরা এবার নিশ্চিন্তে ভেলাটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

রাত্রি তিনটার কাছাকাছি ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব কমল। এবার অভিযাত্রীরা ভেলাটাকে তীরে নিয়ে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে বাকি রাষ্ট্রটুকু কাটাল।

ভোর হল। এখন আর বানরদের চিহ্নও নজরে পড়ল না। বাঁধন খুলে অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করল। মাংস ফুরিয়ে যাওয়ায় হরিণ শিকার করা হল। অভিযান যতই বিপদ সঙ্কুল হোক না কেন পেটে তেঁা কিছু দিতে হবেই।

এ আবার কোন উৎপাত রে বাবা! হঠাৎ দেখা গেল, নদীর জলকণা শূন্যে উঠে হাওয়ার টানে উড়ে যাচ্ছে। অভিযাত্রীরা আবার ঘূর্ণির চক্রে পড়েছে ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। ঘামিশ বলল, এটা ঘূর্ণির ব্যাপার অবশ্যই নয়। চোখের পলকে দশফুট উঁচুতে দুটো জলের ফোয়ারাকে উঠে যেতে দেখে তারা এবার ধরে নিল এটা নির্ধাৎ তিমির কাণ্ড। কিন্তু আফ্রিকার নদীতে তিমি? এ যে নিতান্তই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পর মুহূর্তেই তাদের ভুল ভেঙে গেল। জলভেদ করে ইয়া পেল্লাই হাঁ করা একটা মুখ, মুলোর মতো দাঁতের সারি, জলের ওপরে ভেসে উঠল।

জলের আতঙ্ক এবার অভিযাত্রীদের মনে নতুন করে আতঙ্কের সঞ্চার করল। তারা নিরীহ-নম্র সন্দেহ নেই, কিন্তু চটে গেলে জান খতম করে ছাড়ে।

ঘামিশ-এর পরামর্শে সবাই ভেলার ওপর এমনভাবে টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল যাতে জলহস্তীরা তাদের মোটেই দেখতে না পায়। এছাড়া তো উপায়ও কিছু নেই। বন্দুক নিয়ে কেরামতি দেখাতে গেলে অবশ্যজ্ঞাবী সলিল সমাধি।

জলহস্তীরা খেলায় মেতেই রইল। ভেলা বা অভিযাত্রীদের দিকে তাদের সামান্যতম খেয়ালও নেই।

সন্ধ্যা সাতটা। অভিযাত্রীরা গাছের সঙ্গে ভেলা বেঁধে শোবার বন্দোবস্ত করতে লাগল। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। গত দিনের ঝড়ে ভেঙেপড়া একটা ডাল স্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। তারই ডালপালার ফাঁক থেকে কার যেন আর্তহর ভেসে আসতে লাগল। ঠিক যেন মানব শিশুর কান্না। পরমুহূর্তেই ছোট্ট একটা প্রাণী গাছের ডালটা থেকে লাফিয়ে ঝপ করে জলে পড়ল। লাফিয়ে ডাঙায় পড়ার চেষ্টাই সে করেছিল, পারে নি। সে ডুবছে—ভাসছে। আবার ডুবছে—ভাসছে।

নিম্নোঃ বালক লাস্পা চৈঁচিয়ে উঠল—‘ছেলে! একটা ছেলে! ডুবে যাচ্ছে!’

ছেলে? আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ছেলে? এখানে ছেলে আসবে কোথেকে? অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা নিয়ে অভিযাত্রীরা রীতিমতো বিস্মিত হল। ইতিমধ্যে লাস্পা ঝপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এল। আলোর সামনে ধরতেই দেখা গেল, মানুষের নয়, বানরের বাচ্চা একটা।

লাস্পা কিছুতেই সেটাকে কোল থেকে নামাল না। রাত্রি এগারোটা নাগাদ বানরের বাচ্চাটা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—‘অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা!’ বুঝা গেল বানরের বাচ্চাটা আকুল হয়ে তার মাকে খুঁজছে।

লাস্পা ব্যাপারটা কারো কাছেই ফাঁস করল না। এমনও হতে পারে, সে ভুল শুনছে বা ভুল বুঝছে। বানরের পক্ষে কথা বলা বাস্তবিকই সম্ভব কিনা নিশ্চিত না হয়ে কারো কাছে মুখ না খোলাই সম্ভব।

পরের দিন ভোর হতেই ভেলার বাঁধন খুলে অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করল। লাস্পা জুরে বিভোর বানরের বাচ্চাটাকে বুক জড়িয়ে ধরে এক ধারে চুপটি করে বসে থাকল। জলে ঘাস চুবিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল মাঝে মাঝে তার মুখে দিতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সেব্যাক্ত করার পর বানরের বাচ্চাটা একটু সুস্থ হল। এবার সে আবার একই স্বরে ‘অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা’ বলে ডাকাডাকি জুড়ে দিল। না, লাস্পার এবার আর শুনতে বা বুঝতে ভুল হল না। বানরের বাচ্চাটা সত্য সত্যই কথা বলছে।

ম্যাস্স একটু পরে বানরের বাচ্চাটার খবর জানতে চাইলে লাস্পা বলল—‘কাল রাত্রি থেকে এ আকুল হয়ে মাকে ডাকডাকি করছে।’

ম্যাস্স তার দিকে সবিস্ময়ে তাকাল।

লাস্পা এবার বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলল—‘হ্যাঁ, ‘অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা’ বলে ডাকাডাকি করছে।’

‘অ্যাংগোরা’ শব্দটা কানে যেতেই জন সচকিত হয়ে সোজা হয়ে বসে পড়ল। এ শব্দটা তার পূর্ব পরিচিত। ব্যাপারটা জন আর ম্যাস্স-এর মধ্যে কৌতূহলের উদ্বেক করল। তারা উভয়েই অত্যুগ্র আগ্রহের সঙ্গে বানরের বাচ্চাটাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সেটাকে এক পলকে দেখেই তারা চমকে উঠল। এক কোন জাতের বানর রে বাবা! কানের লতি দুটো মনে হল রীতিমতো মাংসল, তুলতুলে। নাকটাও মানুষের নাকের মতোই। মাথায় কাফিরের চুলের মতো কৌকড়ানো এক রাশ চুল। মুখ মসৃণ। লোমের লেশমাত্রও নেই। উরু আর বুকের লোমের সমারোহ। পায়ের পাতা দুটোও বানরের পায়ের পাতার সঙ্গে সাদৃশ্য নেই, বরং মানুষের পায়ের মতোই দেখতে। পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হাঁটাচলা করে। আর বয়স বেশি হলেও পাঁচ-ছয় বছর। দেহের আদল কিছুমাত্রও বানরের মতো নয়। কিন্তু চোখ দুটো বন্ধ বলে চোখের তারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ আদৌ আছে কিনা বুঝা গেল না। আর বুঝা গেল না সে মানুষের মতো ভাবনা চিন্তার ক্ষমতার অধিকারী কিনা। তার গলায় সূতোদিয়ে বাঁধা একটা নিকেল করা পদকের মতো বস্তু দেখে জন আরও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। পদকের গায়ে ড. জোহৌসেন-এর নাম লেখা।

জন যখন পদকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা চিন্তায় মগ্ন ঠিক তখনই বানরের বাচ্চাটা আবার ‘অ্যাংগোরা—অ্যাংগোরা’ বলে গুণ্ডিয়ে উঠল।

জন আর ম্যাস্স রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাজটা কে করেছে? ড. জোহৌসেন, নাকি কথা-বলা বানরের দ্বারাই কাজটা ঘটেছে? পরিত্যক্ত খাচাটা থেকে জোহৌসেন-এর পদকটা লুট করা সহজ বটে। কিন্তু সেটাকেসূতো দিয়ে গলায় বুলিয়ে দেওয়া?

হঠাৎ দুর্বীর বেগে জল ছুটে আসার আওয়াজ শোনা গেল। অতর্কিতে ভেলাটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পাথরে সজোরে আছাড় মারল। চোখের পলকে ভেলাটা জলের তোড়ে ভেসে গেল। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ঘামিশ বন্দুক আর গোলা বারুদের বাস্ত্য়টা কোনোক্রমে রক্ষা করে পাথরের ওপর ছুড়ে মারল। ব্যস, অভিযাত্রীদের নিয়েই নৌকাটা তরতর করে এগিয়ে চলল। লাস্পা কিন্তু বানরের বাচ্চাটাকে বুক থেকে এক চুলও সরতে দিল না।

জমাটবাঁধা অন্ধকারে ঘাসের বিছানার ওপর টান টান হয়ে পড়ে রয়েছে ম্যাস্স, জন আর ঘামিশ। প্রায় সংজ্ঞাহীন।

গতদিনে তারা একটা মোষ মেরেছিল গুলি করে। তারই কিছু মাংস তাদের শিয়রে, ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে। বন্দুক গোলা বারুদের ব্যস্ত বা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই নেই। লাস্কা বা তার বানরের বাচ্চাটা কেউ-ই নেই। লাস্কা কি জলে ডুবেই গেল? তাই যদি হয় তবে এরা তিনজন কি করে প্রাণে বাঁচল? সামনে-পিছনে চারদিকে জমাটবাঁধা অন্ধকার। এখন কি সত্যই রাত্রি? দিন বা রাত্রি যা-ই হোক না কেন বনের ভেতরে এমন সৃষ্টিভেদ্য অন্ধকারই বা কি করে সম্ভব?

জন সবার আগে চোঁখ মেলে তাকাল। দেখল, আগুন নিভে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাতে শুকনো ঘাস-পাতা ফেলে আগুনটাকে জ্বিঁয়ে রাখার ব্যবস্থা করল। ভালপালা পোড়ার পটপট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাওয়া দু-জনও ব্যস্ত হয়ে উঠে বসল। জ্বলন্ত আগুনের আলায়ে দেখতে পেল মাথার ওপরে প্রায় দেড়শ ফুট উঁচু ছাদ। গাছের ওপরের ভালপালা গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার দেখে তারা তিনজনই রীতিমতো স্তম্ভিত। একে অন্যের মুখের দিকে নীরবে বিষ্ময় মাখানো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। সবার মনেই একই জিজ্ঞাসা, এ আবার কোন রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়া গেল রে বাবা! এরা যে কতক্ষণ, কতদিন ঘুমিয়েছে বুঝতে পারছে না। ভেলাটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে। লাস্কা? লাস্কা কি তবে বানরের বাচ্চাটাকে নিয়ে জলেই তলিয়ে গেল? তবে তাদেরই বা জল থেকে উদ্ধার করে কে এখানে ফেলে গেছে?

জন কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ ঝাঁক বলল—‘আমি জলে একেবারে তলিয়ে যাবার পূর্ব গৃহীতে দশ-বারোটা ছায়ামূর্তিকে নদীর পাড়ে দেখতে পেয়েছিলাম। হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলাবলি করতে করতে তিন-চারজন ঝপ করে জলে পড়ে গেল। ব্যস, তারপরের ঘটনা কিছু আমি আর বলতে পারব না।’

ম্যাক্স তার কথা সমর্থন করে বলল, সেও নাকি কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেয়েছিল। তারা জল থেকে উদ্ধার করে নদী থেকে কতদূরে যে এদের এনে ফেলে রেখেছে তাই বা কে জানে! আগুন জ্বলে হাত-পায়ে স্নেহ দিয়ে সুস্থ করে তুলেছে। ফ্রির্দে নিবৃত্ত করার জন্য ঘাসের ওপর মোষের মাংস রেখে গেছে। উপকারের বিনিময়ে প্রত্যাশার চায় না বলেই তারা সে জায়গা ছেড়ে নিজেদের কাজে চলে গেছে। এবার তারা ভাগাভাগি করে কিছু মাংস খেয়ে পেটের জ্বালা নেভাল। বন্দুক সঙ্গে নেই। কেবলমাত্র কুড়ল আর ছুরি তেমনি কোমরেই বাঁধা রয়েছে। বুনা জন্তু-জানোয়ারের মাংস জোগাড় করা সম্ভব নয়। ফলমূলই একমাত্র স্বপ্ন। কিন্তু ক্লান? নদী বা ঝর্ণা ছাড়া জল পাওয়া সম্ভব নয়। নদী যে কতদূরে এবং কোনদিকে কিছুই তাদের জানা নেই।

ঘামিশ ইতিমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ধার-কাছ দিয়ে এক চক্রের মেরে এসেছে। আবছা আলায়ে এক-পেয়ে রাস্তা একটা আবিষ্কার করতে পেরেছে। জন আর ম্যাক্স-এর কাছে ব্যাপারটা বলল। তারা হাত-পা গুটিয়ে এখানে পড়ে না থেকে এক পেয়ে পথটা ধরে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল। এমন সময় হঠাৎ দূরবর্তী একটা আলোর দিকে তাদের নজর পড়ল। চমকে উঠে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ঐটা কি সত্যি-কারের আগুন? অসম্ভব হিংস্র জঙ্গলিদের আলো, নাকি আলোয়ার আলো তাদের বিভ্রান্তিতে ফেলেছে?

শেষপর্যন্ত অকুতোভয় ঘামিশ সাহস দেওয়ায় জন ও ম্যাক্স এগিয়ে চলতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাদের সঙ্গে সঙ্গে আলোটাও সচল হয়ে উঠল। একই দূরত্ব বজায় রেখে সেটাও এগিয়ে চলতে লাগল। তারা ধামলে আলোটাও খেমে যায়। আবার তারা এগোতে আরম্ভ করলে আলোটাও সচল হয়ে পড়ে।

অভিযাত্রীদের কাছে ব্যাপারটাকে এমন মনে হল, অজ্ঞাত আলোটা যেন পথপ্রদর্শকের মতো আগে আগে চলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। জন জোর করে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল—‘ব্যাপারটা মন্দ নয়। জঙ্গলিদের বা আলোয়ার আলো যা-ই হোক না কেন এমনও তো হতে পারে আলোটা পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর মতো আমাদের পথ দেখিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিচ্ছে।’

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই রহস্য সৃষ্টিকারী আলোটা হঠাৎ নিভে গেল। অভিযাত্রীরা ভাবল, আলোটা তাদের বিশ্রাম করে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ। গাছের তলায়, শুকনো পাতার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সবাই।

যখন ঘুম ভাঙল তখন জঙ্গলের জমাটবাঁধা অন্ধকার কেটে গিয়ে অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। জন কট সবার আগে হুড়মুড় করে উঠে দেখল, ম্যাক্স আর ঘামিশ নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। আচমকা তাদের শিয়রের দিকে চোঁখ যেতেই তার নজরে পড়ল, কিছু হরিণের মাংস আর এক পাত্র জল কে যেন রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি রেখে গেছে। তার বুঝতে দেরি হল না, এ নির্যাস হিতাকাঙ্ক্ষী মশালবাহীরই কাজ। সে ব্যস্ত হয়ে ঠেলেধাক্কা ম্যাক্স আর ঘামিশকে তুলল। তারাও হরিণের মাংস আর জলপূর্ণ পাত্রটা দেখে কম অবাক হল না।

অভিযাত্রীরা ঝলসানো হরিণের মাংস আর জল দিয়ে উদরপূর্তি করে নিল।

আহার সম্পন্ন হতে না হতেই রহস্যজনক আলোটা আবার জ্বলে উঠল। এগিয়ে যেতে গিয়ে অভিযাত্রীদের নির্দেশ করল তাকে অনুসরণ করতে।

তিনদিন পথ পাড়ি দেবার পর অভিযাত্রীরা হিসাব করে দেখল, ইতিমধ্যে তারা রিও জোহোসেন নদী থেকে তিনদিনে প্রায় মোট চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে। এতক্ষণ তারা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু যাওয়ার কথা দক্ষিণদিকে। এদিককার গাছপাছালির আগেকার ঠাসা বুনন আর নেই। অনেক হালকা। পাতার ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো আকাশ নজরে পড়ছে।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মশালের আলো এবার অদৃশ্য হয়ে গেল। অভিযাত্রীরা ক্লান্ত-দেহে গাছের তলায় গুতেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই অভিযাত্রীরা অভ্যাশ্রয়, একেবারেই অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। ডালে, প্রায় এক শ' ফুট ওপরে একটা মাচা দেখতে পেল। তলা থেকে নিচের মাচা আর লতাপাতা ছাউনির সামান্যমাত্র অংশ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর মাচাটার দিক থেকে একটু বাদে বাদে কেমন যেন গভীর আওয়াজ ভেসে আসছে। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের মধ্যে রহস্যের সঞ্চার করল।

অভিযাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে ভাবতে লাগল, এ কোথায় এলাম বে বাবা! রহস্যজনক আলোটাও নিকিহ হয়ে গেছে। খাবার বা জলও নেই। তবে কি এবার অনাহারে তকিয়ে মরার পালা? ব্যাপারটা ম্যান্স-কে খুবই ভাবিয়ে তুলল, হতাশায় ভেঙে পড়ল।

ঘামিশ তাকে অভয় দিতে গিয়ে বলল—‘জ্বর, এমন করে ভেঙে পড়বেন না। মশালধারী আমাদের যেখানে নিয়ে আসতে চেয়েছে আমরা ঠিক সে জায়গাটোতেই পৌঁছে গেছি।’

ব্যাপারটা খোলসা হল না। একনাগারে ষাট ঘণ্টা হাঁটিয়ে মশালধারী তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে? কেনই বা তাদের এখানে এনেছে?

ভোরের মৃদু আলোয় ছায়ামূর্তির মতো একটা খর্বাকায় প্রাণীকে আচমকা দেখতে পেয়ে ঘামিশ হকচকিয়ে গেল। ছায়ামূর্তিটা এদকি-ওদিক ছুটোছুটি করছে। তবে কি লাস্সা জীবিত? আর তার বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা প্রাণী কি সেই বানরের বাচ্চাটা?

ব্যাপারটার দিকে জন-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সে সামান্য এগিয়ে নিঃসন্দেহ হল, লাস্সা আর বানরের বাচ্চাটাই বটে। তার মধ্যে একটা মতলব এল। ডেলায় থাকাকালে বানরের বাচ্চাটার গলায় সূতোবীধা পদকটা দেখেই টুক করে সেটাকে কেটে নিজের কোটের পকেটে চালান দিয়ে দিয়েছিল। সেটাকে বের করে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সূতো ধরে দোলাতে লাগল। সেটার দিকে নজর পরতেই ঠিক যেন মানুষের বাচ্চার মতো বানরের বাচ্চাটা দৌড়ে তার কাছে চলে এল।

জন খপ করে তার হাত চেপে ধরতেই আতর্নাদ করে উঠল—‘লি-মাদ্দি! লি-মাদ্দি! অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা!’

জন শব্দগুলোর অর্থ নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে থাকলে চোখের পলকে আরও কয়েকটা অস্থিরচিহ্ন বানর ছুটে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের আকৃতি একই রকম হলেও অনেক বড়। মুহূর্তে অভিযাত্রীদের জাপ্টে ধরে ঠেলে ধাক্কিয়ে টেনে হিঁচড়ে সামনের দিকে নিয়ে চলল। এবার এমন এক জায়গায় তাদের নিয়ে গেল যেখানে গাছের ডালগুলো হাত খানেক ব্যবধানে সিঁড়ির ধাপের মতো ওপরের দিকে উঠে গেছে। বানরগুলো অভিযাত্রীদের নিয়ে প্রাকৃতিক সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে করে প্রায় এক শ' ফুট ওপরে উঠে গেল। সেখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ডালপালা দিয়ে প্রায় সমতল ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়েছে। আর প্রায় একই আয়তন ও আকৃতি বিশিষ্ট পাশাপাশি অনেকগুলো জুপুড়ি ঘর তৈরি করে ছোটখাটো একটা পাড়া গড়ে তোলা হয়েছে। অনেকগুলো বানর সেখানে ঘোরাফেরা করছে। অবিকল মানুষের মতো তাদের হাঁটার ধরণ, বানরের মতো মোটেই নয়। ড. ইউবিন ডুবয় জাঁভার গভীর অরণ্যে ‘পিথিকানথ্রোপাস’-কে দেখে তার নামকরণ করেছিলেন ‘ইরেকটাস’।

ড. ইউবিন ডুবয়-এর বক্তব্য শুনে জীববিজ্ঞানীরা তখন তাঁর কথার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানী ডারউইন-এর তত্ত্বের মাধ্যমে জানা যায় না, মানুষ আর বানরের মাঝখানে আর কেউ কোনদিন ছিল কিনা। এখন জানা গেল মানুষ আর বানরের মধ্যবর্তী প্রাণী পিথিকানথ্রোপাস।

জন, ম্যান্স আর ঘামিশ—তিনটে দূ-পেয়ে প্রাণীর আকস্মিক আগমনের ব্যাপারটা বানরগুলোর মধ্যে কিছুমাত্রও কৌতূহলের উদ্বেক ঘটিয়েছে বলে মনে হল না। আসলে তাদের ওঁদাসিন্যই মানুষ তিনজনকে এরকম ভাবতে উৎসাহী করছে।

এখানকার বানরগুলো সাধারণ বানরের চেয়ে আকারে অনেক বড়। শিম্পানজি, বেনিগর ওয়াং এবং গ্রাবুনেরা গরিলার চেয়ে অনেক, অনেক উন্নত প্রাণী এরা। গ্রাম গড়ে বসবাস, আগুনের ব্যবহার এবং কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করতে এরা জানে। এবার সে মশালের রহস্যভেদ করা সম্ভব হল। হাতির জন্য এ আয়োজন। তারপর হাতি দেখামাত্র লেজ তুলে চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়েছে।

ওরাং বলতে বুঝায় মানুষ—বনমানুষ; এ নামটা কেবলমাত্র এদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এক সময় দুম্ব করে দরজা খুলে নিম্নো বালক লাস্সা রীতিমতো উল্লাসে লাফাতে লাফাতে এসে আগন্তুক তিনজনের সামনে দাঁড়াল। লাস্সা যা বলল তাতে করে বুঝা গেল, এরা জঙ্ঘু-জানোয়ার অবশ্যই নয়—মানুষ। এদের ‘ওয়াগদিস’ বলা হয়। আর গাছের ওপরে গড়ে তোলা গ্রামটার নামকরণ করা হয়েছে আস্সালা। আর সে বানরের বাচ্চাটার নাম লি-মাদ্দি। লি-মাদ্দি দলছাড়া হয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গিয়েছিল। আর গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক তার তল্লাশে বেরিয়েছিল। জলের স্রোত ভেসে যেতে দেখে গ্রামবাসীরা তাকে উদ্ধার করে। লাস্সাকে অতিথি জ্ঞানে সেবায়ত্ত্ব করে।

লাস্সা-র সঙ্গে কথাবার্তা বলে অভিযাত্রীরা জানতে পারল, সে-পাড়ায় অনেক ওয়াগদিস-এর বাস। অবোধা ভাষায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে। ফলমূল সংগ্রহের জন্য গাছের আশ্রয় ছেড়ে মাঝে মাঝে জমিতে নেমে আসে। পান্ডার মোড়লও একজন আছে। তার নাম মসেলো ট্যালা ট্যালা। নামটা কানে যেতেই ঘামিশ চমকে উঠে বলল—‘সে কী! এ যে আমাদের মুল্লুকের ভাষা! ‘মসেলো ট্যালা ট্যালা’-র অর্থ ‘ফাদার লুকিং গ্লাস’। কঙ্গোবাসীরা চশমাধারীদের এ নামেই সম্বোধন করে।’

অভ্যাশ্রয় কোনো কিছু অবিকার করার জন্য ম্যান্স যাত্রার শুরু থেকেই হুঁক হুঁক করছিল। এবার তার সে সাধ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হল। সে যে জাতিতে ফরাসি। একটু বেশি মাত্রায়ই কল্পনাবিলাসী। রহস্যময় উবাসীর বনে নতুন ধরণের

মনুষ্যজাতি, অত্যাশ্চর্য-অদ্ভুত কোনো প্রাণীর মুখোমুখি হওয়ার অদম্য আশ্রয় তার মধ্যে ছিল, তারা ওয়াদিসদের দলপতি মসেলো ট্যাম্প ট্যালার পল্লীতে এসে। এত কিছু পর অভিযাত্রীরা বুঝতে পারল না, তারা কি মুক্ত, নাকি খাঁচায় বন্দি অবস্থায় রয়েছে। যদি মুক্তই হয়ে থাকে তবে তো ওয়াদিসদের পল্লীটা ঘুরে ঘুরে দেখে কৌতূহল সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করা সম্ভব। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। সেনাপতি মসেলো ট্যালা ট্যালা যেন তাদের মনের কথা বুঝতে পেয়েই খাঁচার দরজা খুলে তাদের মুক্ত করে দিতে ছকুম দিয়েছে।

দরজা খুলতে ম্যাক্স সঙ্গীদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলে। কৌতূহলমিশ্রিত অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে পল্লীর চারদিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার তাদের পাত্তা দেওয়া তো দূরের কথা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কেউ তাদের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। গ্রামটা চতুর্ভুজাকৃতি গাছের ডালের ওপরের মাচা, যার ওপরে গ্রামটা বেড়ে উঠেছে সেটা সবই মজবুত। গ্রামবাসীরা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। আবোধ্য তাদের ভাষা। তবে কথাবার্তায় মাঝে-মাঝে 'অ্যাংগোরা' শব্দটা ব্যবহার করতে শোনা গেল। আর কয়েকটা জার্মান শব্দ আর বঙ্গো শব্দও তারা ব্যবহার করল। যেমন 'ভ্যাটার' শব্দ যার মানে 'বাবা' সেটাও কয়েকবারই তারা উচ্চারণ করল। বানরের মুখে নিজের দেশের, জার্মান শব্দ শুনে জন তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল।

আরও কিছু ব্যাপার অভিযাত্রীদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করল, তারা কেউ-ই উলঙ্গ নয়। কয়েদীদের মতো গাছের ছাল খুলিয়ে দিয়ে লজ্জা নিবারণ করেছে। তাদের মাথার কুলি আকারে ছোট হলেও গড়ন অনেকটা মানুষের মাথার খুলির মতোই। আচমকা মুখের দিকে তাকালে মানুষ বলেই মনে হয়, অধিকাংশ বানরের মতো ভুরু নয়। চিবুকে দাড়ির মতো রোম রয়েছে। আফ্রিকান কাক্রিদের মতোই এদের গায়েও খুব লোম রয়েছে। পায়ের পাতাও বানরের মতো নয়। বরং মানুষের পায়ের পাতার মতোই দেখতে, বানরের পায়ের পাতা মাটিতে সমানভাবে পেতে চলতে পারে না। সেগুলোর গড়ন গাছের ডাল আঁকড়ে ধরার উপযোগী। তাই শিম্পাঞ্জি, ওরাং ওটাং ও গরিলারা আঙুলের ওপর ভর দিয়ে তারা দুলকি চালে চলে। কিন্তু ওয়াদিসরা যেন একেবারে মানুষের মতো হাঁটছে। আর? এমনকি অন্যান্য বানরের মতো এদের লেজও নেই, তবে উন্নত শ্রেণীর বানরদের সঙ্গে ওয়াদিসদের সাদৃশ্য আছে যতটাই। সে-সব বানর মেরুদণ্ড সোজা করে হাঁটে, কথা কম বলে। খুবই গম্ভীর প্রকৃতির। ওয়াদিসরাও ঠিক সেরকমই, চলাফেরা, ভাবভঙ্গিমা, সবকিছুতেই গম্ভীর লক্ষিত হয়।

জীববিজ্ঞানী ভট—এর মতে মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে নিমিটাস। গরিলারা শ্বেতাঙ্গদের পূর্বপুরুষ। আর নিমিটাসের পূর্বপুরুষ হচ্ছে শিম্পাঞ্জি ও ওরাং ওটার। কিন্তু জীববিজ্ঞানী ভট—এর এমন আশ্চর্য তত্ত্বকে অনেকেই স্বীকৃতি দিতে উৎসাহী হন নি। মানুষের মগজ এক কোটি বিশ লক্ষ কোষের সমন্বয়ে গঠিত। বানরের মগজে এত কোষের উপস্থিতি অবশ্যই নেই, ওয়াদিসদের মগজে মানুষের মতো এত বেশি কোষ না থাকলেও মানুষের মগজের গড়নের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। তারা শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতিতে মানুষের সমগোত্রীয় না হলেও তাদের একেবারে দূরে ঠেলে ফেলা যায় না।

ওয়াদিসদের মস্তিষ্ক বর্তমান। তাতে স্মৃতিগাঁথা থাকে। সঞ্চিত স্মৃতি নির্ভর করেই কথার সৃষ্টি।

অভিযাত্রীরা হাঁটতে হাঁটতে পল্লীর একান্তে একটা বেশ বড়সড় ও সুদৃশ্য ঝুপড়ির সামনে হাজির হল। ম্যাক্স দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার উদ্যোগ নিতেই লি-মাস্ট্র একলাফে এগিয়ে এসে তার দুপথ আগলে দাঁড়াল। আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল—'মসেলো ট্যালা ট্যালা! মসেলো ট্যালা ট্যালা! মসেলো ট্যালা ট্যালা!'

বুঝতে অসুবিধা হল না, ওয়াদিসদের দলপতির প্রাসাদ এটা। সঙ্গে সঙ্গে দু'দিক থেকে দু-জন প্রহরী এগিয়ে এসে পথরোধ করে দাঁড়াল।

অভিযাত্রীরা আবার আরও কয়েকটা ঝুপড়ি ডিঙিয়ে অন্য একটাতে হাজির হল। দরজা থেকে ভেতরে উঁকি দিতেই একজন বানর-মানব ও বানর-মানবী ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। লি-মাস্ট্র আনন্দে—উচ্ছ্বাসে চোঁচিয়ে উঠল—'লো-মাস্ট্র! অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা! লো-মাস্ট্র।' সে বলতে চাইছে আমার মা-বাবা। জন আর ম্যাক্স অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে লি-মাস্ট্র-এর মা-বাবাকে দেখতে লাগল। উভয়ের গলাই শোভা পাচ্ছে ড. জোহোসেন-এর নাম ও মূর্তি খোদাই করা একটা করে পদক।

জন তাদের সঙ্গে একটু আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। সুবিধা করতে পারল না। আসলে তাদের কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারল না, আলাপ জমবে কি করে?

বেশ কিছু সংখ্যক জার্মান ও কঙ্গো শব্দ আর আমুগ, আঙুগা ও আম্‌স তিনটা ধ্বনি সহযোগে তাদের সম্পূর্ণ ভাষা গঠিত।

মিনিট পনের অবস্থান করার পর অভিযাত্রীরা লি-মাস্ট্র-এর মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিল।

ম্যাক্স-এর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। এখানে আর একদণ্ড ও থাকতে রাজি নয়। এখানে বানর-মানবদের সঙ্গে যদি বাকি জীবটা কাটাতে হয় তবে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। আবিষ্কারের মোহ তার টুটে গেছে। কিন্তু জন এত সহজে এ-পল্লী ছেড়ে যেতে রাজি নয়। তাদের সান্নিধ্যে আরও কিছু দিন থেকে তাদের জীবনযাত্রার সবকিছু ভালভাবে দেখে যেতে চায়। ম্যাক্স-এর ওই এক কথা—'আমরা তো আর জীববিজ্ঞানী গার্নার বা জোহোসেন নই। তবে আমরা কেন খাঁচায় বন্দি হয়ে জীবন কাটাব?'

হ্যাঁ, ওয়াদিসরা তাদের খাঁচায় বন্দি করে রেখেছে খুবই সত্য বটে। তবে তারা তাদের বন্দুক আর গুলি—বারুদের বাস্তাটা ফিরিয়ে দিয়েছে। জলের ধাক্কায় ভেলাটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবার পূর্বমুহূর্তে বন্দুক আর গুলি বারুদের বাস্তাটা পাথরের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছিল। ওয়াদিসরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে রেখে দিয়েছিল। অভিযাত্রীদের এখানে নিয়ে আসার পর তারা তাদের জিনিস ফিরিয়ে দেয়।

একের পর এক দিন পেরিয়ে যেতে লাগল, অভিযাত্রীরা পালাবার ধান্দায় রয়েছে। কিন্তু ইয়া তাগড়াই এক ওয়াগদিস তার চেলাচামুগাদের নিয়ে খাঁচার দরজায় মোতায়ন। কড়া পাহারা দিচ্ছে। পুরো পল্লীটার পাহারার দায়িত্ব তার ওপরেই পরেছে।

ওয়াগদিসরা চাষাবাদের সঙ্গে পরিচিত নয়। বনের ফল-মূলই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন, আবার কখনও বা শিকারে বেরিয়ে মাছ-মাংস সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। দুটো চকমকি পাথর ঠুকে ঠুকে আগুন জ্বালে। মাছ-মাংস কখন ঝলসে আবার কখন বা জলে সিদ্ধ করে নেয়। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে মহল্লার এক প্রান্তে, বনের ধারে একটা নদী দেখেছিল ম্যাক্স আর ঘামিশ। পাহারাদার মণ্ডমার্কি র্যাকি না থাকলে একবার চেষ্টা করে দেখত কোনোক্রমে পালিয়ে গিয়ে নদী দিয়ে আপদগুলোর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় কিনা।

একদিন অবিস্থাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল। পাহারাদার র্যাকি তার চেলাচামুগাদের নিয়ে সর সর করে নিচে নেমে গেল। দূর থেকে কুড়ুল আর টাঙ্গি দিয়ে চোখের পলকে রক্তনদী বইয়ে দিতে লাগল। পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে জলজ প্রাণীরা ঝপাঝপ জলে পড়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জন ভাবল, একবার গুলি বারুন্দের খেল দেখায়, কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। আগ্নেয়াস্ত্রের খেল এখন নয়, দেখাবে শেষ। ম্যাক্স তাকে সমর্থন করল। চরম মুহূর্তে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে দলপতি মসেলো ট্যালা ট্যালা ও তার সাগরেদদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া করে দেবার জন্য। এগুলির পনের তারিখ। সেদিন বিকালের দিকে লি-মাই তার মা-বাবাকে নিয়ে অভিযাত্রীদের খাঁচার দরজায় এসে দাঁড়াল। ম্যাক্স জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকানো মাত্র সে সোল্লাসে বলে উঠল—‘মসেলো ট্যালা ট্যালা। মসেলো ট্যালা ট্যালা।’ সে বুঝতে চাইছে, তাদের নিয়ে দলপতি মসেলো ট্যালা ট্যালা-র প্রাসাদে যাবে। পরিচয় করিয়ে দেবে তাঁর সঙ্গে। চশমাওয়ালা আজ তাদের দর্শন দিতে চেয়েছে। তাদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝা যায় না। ব্যাপার কি? প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ডারউইন-এর তত্ত্ব অনুযায়ী বুঝা গেছে, বানর আর মানুষের মাঝামাঝি এক প্রাণী ওয়াগদিসরা, একথা সভ্যবদ্ মানুষের কাছে পৌছে দিতে হলে লিভারপুলে যেতে হবে।

ওয়াগদিসরা উৎসবে মেতেছে। দলপতি আজ দর্শন দেবে, ভাগ্যের ব্যাপার। মহল্লার নারী, পুরুষ ও শিশু কেউ আর ঘরের কোণে নেই। সবাই এসে জড়ো হয়েছে দলপতির প্রসাদের সামনে। গাঁজিয়ে ওঠা রসের সঙ্গে ট্যামারিক্স গাছের রস মিশিয়ে মদের মতো তরল পদার্থ তৈরি করে সবাই গলা পর্যন্ত পান করেছে। নেশায় মাতোয়ারা। মাটির পাত্রের মুখে চামড়া এঁটে ঢোল তৈরি করেছে। দু-হাতের আঙুল-দিয়ে চাটি মেরে মেরে অদ্ভুত বাজনা বাজাচ্ছে কয়েক জন মিলে। আর কিছু ওয়াগদিস নারী-পুরুষ কোমর ধরে, সামনে-পিছনে হেলদুলে বাজনার তালে তালে নাচছে। আবার কেউ বা ফাঁপা একটা নলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সানাইয়ের মতো সুর করে বাঁশি বাজাচ্ছে। এবার একজন অর্গান বাজাতে লাগল, জানা গেল এটা নাকি জোহোসেন-এর ছিল।

বাজনার আওয়াজ ভেদ করে ওয়াগদিসরা সমবেত কণ্ঠে সোল্লাসে চিল্লিয়ে উঠল—‘মসেলো ট্যালা।’ মসেলো ট্যালা, মুহূর্তের মধ্যেই ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুন্দর একটা সিংহাসন। তার ওপর গম্বীর মুখে দলপতি রসে। সিংহাসন বাহকরা অভিযাত্রীদের সামনে দিয়ে দলপতিকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের প্রতি দলপতির কিছুমাত্রও আগ্রহ বা কৌতুহল লক্ষিত হল না। চারজন মানব সন্তান যে তার এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে এ-কথা অবশ্যই তার অজানা নয়। তবু তাকে নির্বিকারই দেখা দেল।

দলপতির উপেক্ষায় ম্যাক্স রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেল, তাকে খামিয়ে দিয়ে জন গর্জে উঠল, ‘তখন কী করছিলো? বোকা হাঁদা, তিনিই তো ডা. জোহোসেন, চিনতে পার নি? যখন আমাদের সামনে দিয়ে গেলেন তখন কি চোখে ঠুলি পড়ে ছিল নাকি?’

হ্যাঁ, জনের কথাই ঠিক। সে ড. জোহোসেন-কে ঠিকই চিনতে পেরেছে। আসলে তাঁর সঙ্গে জন-এর পরিচয় ছিল। ব্যাপারটা এখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, দিনলিপির পাতায় চকিবে আগষ্ট পর্যন্ত বিবরণ লেখা রয়েছে। তারপর খাঁচা ছেড়ে তিনি কোথায় বেপান্তা হয়ে গেলেন, এতদিনে রহস্যটা জানা গেল। তিনি ওয়াগদিসদের হাতে পড়ে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর তাঁর নিত্যসঙ্গী চাকরটা? সে সুযোগ বুঝে গা-ঢাকা দিতে পেরেছিল। তা নইলে সে নির্ধাৎ দলপতির প্রধান পার্শ্বচর হিসাবে পাশে পাশে থাকত। অভিযাত্রীরা রিও জোহোসেন নদীতে ভ্রমণ করার সময় রহস্য সম্ভারকারী মশালগুলো দেখতে পেয়েছিল সেগুলো সে ওয়াগদিসদেরই কারসাজি এখন আর তা বুঝতে কারো বাকি নেই। ড. জোহোসেনকে তারা ধরে এনে নিজেদের মহল্লায় বন্দি করে রেখেছিল। তাঁর কাছ থেকেই তারা খালা-বাসন তৈরির কায়দা, অর্গান বাজানোর কৌশল, আর কিছু জার্মান ও বঙ্গো শব্দ আয়ত্ত্ব করেছে।

জন বেশ একটু অভিমান প্রকাশ করেছে বলল, ‘আমরা যে এখানে রয়েছি তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। তাঁর অবশ্যই উচিত ছিল, আমাদের ডেকে নিয়ে কথাবার্তা বলা।’

ঘামিশ বলল, ‘আমার কিন্তু বিশ্বাস, আমাদের কথা তাঁকে জানানোই হয় নি।’

‘হ্যাঁ, এ-ও অসম্ভব নয়। আমাদের কথা হতচ্ছাড়ারা তার কাছে নির্খাত চেপে গেছে।’

অভিযাত্রীরা পরামর্শ করে পথে নামল। তারা আজ রাতেই তাঁর প্রাসাদে হাজির হবে। বন্দুক আর গুলি সঙ্গেই রয়েছে। তারা দরজা ঠেলে ভেতরে যেতেই দেখতে পেল ড. জোহোসেন কদরায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে তন্ত্রাচ্ছন্ন অবস্থায় বসে।

তাদের পায়ের শব্দ ড. জোহোসেন চোখ মেলে তাকালেন। অভিযাত্রীরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল—‘ড.

জোহোসেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আমরা পরদেশী। আমাদের ধরে এনে আঙ্গলা গ্রামে কয়েদ করে রাখা হয়েছে।

ড. জোহোসেন নির্বিকার। হ্যা-হঁ বা ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না। তাঁর ব্যাপার দেখে ম্যাক্স-এর মাথার রক্ত ওঠার উপক্রম হল। সে নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে ড. জোহোসেনের ওপর জাঁপিয়ে পরে তার কাঁধ ধরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল।

ড. জোহোসেন জিত বের করে, দাঁত মুখ খিচিয়ে ভেঙচি কাটলেন। কিন্তু কোনো কথাই বললেন না।

জন কট হকচকিয়ে গেল। আতঙ্কিত স্বরে বলে উঠল 'ব্যাপার কী? ভদ্রলোক পাগল হয়ে গেলেন, নাকি বানরের সঙ্গে বাস করার ফলে বানরের স্বভাব তাঁর মধ্যে ভর করেছে।'

অভিযাত্রীরা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করল, ড. জোহোসেন-কে সঙ্গে নিয়ে তবে পালাবে। শেষপর্যন্ত করলও তা-ই। তাঁকে জাস্টে ধরে জোর করে বাইরে নিয়ে এল। বরাভের জোর আছে বটে। দলপতির রক্ষীরা ধারে-কাছে কেউ ছিল না। ড. জোহোসেন-কে নিয়ে তারা পালাতে গিয়ে নামার সিঁড়ি না পেয়ে নাজেহাল হতে লাগল, টিক তখনই ছুটেতে ছুটেতে সেখানে হাজির হল লো-মাস্ত ও লি-মাস্ত। তারা অভিযাত্রীদের নিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি যেতেই ষগমার্ক প্রহরী র্যাকিকে তেড়ে আসতে দেখল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ম্যাক্স তাকে গুলি করে কুপোকাৎ করে দিল। অভিযাত্রীরা গাছের ডাল উপক উপক জমিনে নামল। ছুটল নদীর দিকে। লো-মাস্ত আর লি-মাস্ত তাদের পথ দেখিয়ে আগে আগে চলল। বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনে ওয়াগদিসরা মশাল জ্বেলে উর্কুস্বাসে ছুটে আসতে লাগল। জন আর ম্যাক্স উপাউপ গুলি করে দুটোকে ধরাশায়ী করে দিল। নদীর ঘাটে একটা ক্যানো বাঁধা দেখতে পেয়ে অভিযাত্রীরা তাতে চেপেই দড়ির বাঁধান খুলে দাঁড় বাইতে লাগল। লো-মাস্ত ছেলের হাত ধরে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে অতিথিদের বিদায় সম্বাষণ জানাল। বিদায় মুহূর্তে লাঙ্গা লি-মাস্ত-কে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলে সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলেছিল, 'অ্যাংগোরা! অ্যাংগোরা।' অর্থাৎ আঙ্গলা পত্নীতে যে আমার মা রয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফিরে যেতে হবে। তাদের মূর্তি এক সময় অভিযাত্রীদের চোখের আড়াল হয়ে গেল।

২০ মে, সেদিন অভিযাত্রীরা ড. জোহোসেনকে নিয়ে লিভারপুর্ কারখানায় ফিরে এল। এমনও তো হতে পারে জার্মানিরা একদিন ডা. জোহোসেন-এর নিজে হাতে গড়া আঙ্গলা পত্নীর দখল নিয়ে নেবে। কিন্তু ইংরেজরা? তারা হয়ত এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে নির্বিবাদে ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না।

=== ০ ===

প্রপেলার আইল্যান্ড

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে পাহাড়ের চূড়ায়, পাদদেশে আর জঙ্গলে—সর্বত্র। পাহাড়ের গা-বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলতে গিয়ে বাদ্যকরদের ঘোড়ার গাড়িটা আচমকা গড়িয়ে পড়ল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে সেটা গড়ালে ভাগ্যে যে কী ঘটত তা আর বলার না।

ভাগ্যের জোরে একটুর জন্য রক্ষা পাওয়া গেছে। ঘোড়া দুটোর অবস্থা সঙ্গীন, গাড়োয়ান বেচারাও ওঠার ক্ষমতা হারিয়ে বসেছে।

তবে বাদ্যকর চারজন তেমন জখম হয়নি।

একদিন বাদেই তাদের সানডিয়েগোতে গানের আসরে যোগদান করার কথা। প্যারিসের বাদ্যকররা কালিফোর্নিয়ার সংগীতরসিকদের বাজনা শোনাবে। খইয়ের মতো ডলার ছিটিয়ে শহরবাসীরা রুচি পান্টাবার জন্য পৃথিবীর নামকরা বাদ্যকরদের তলব করে নিয়ে আসছে নিজেদের শহরে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে চার বাদ্যকর সেই কালিফোর্নিয়া থেকে ছুটে এসেছে। চারজন বাদ্যকরেরই চেয়ার মিউজিকে বেশ নামডাক হয়েছে। অর্কেস্ট্রার বাজনা শুনে শুনে যখন মানুষের মনপ্রাণ অস্থির হওয়ায় জোগাড় হয়েছে, ঠিক তখনই এরা আসরে নামার জন্য কোমর বাঁধতে লেগেছে।

বাদ্যকর চারজনের মধ্যে দলের পাগা পঞ্চাশ বছর বয়স্ক সিরাসিয়ান জর্ন। সে ভায়োলেনসেলো বাজানোতেও খুবই দক্ষ। তাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম পিঙ্কিনাট। সাতাশ বছরের যুবকমাত্র। ভায়োলেনসেলোও তার হাত খুবই ভালো। বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। অবশিষ্ট দুজনের মধ্যে একজন বত্রিশ বছর বয়স্ক ইভারনেস ফার্স্ট। ভায়োলিনে পটু। আর অন্যজন তিরিশ বছর বয়স্ক ফ্রাসকোলিন। সে সেকেন্ড ভায়োলিন বাজায়। তার একটা পরিচয়ও রয়েছে—কোষাধ্যক্ষ। খুবই হিসেবি বলেই তার ভাগ্যে এ পদটা জুটেছে। আর সে সদাশাসন্য আর মিস্তকও বটে।

গাড়ি ভেঙে পড়ামাত্র তারা চারদিকে ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গাঝড়া দিয়ে উঠে বাজনাগুলো অক্ষত আছে কি না দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

না, বাজনাগুলোর কোনো ক্ষতিই হয়নি।

গাড়িটার পরিস্থিতি দেখে সবাই যারপরনাই ভাবিত। এখন উপায়? গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আশানুরূপ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

বাদ্যকররা তখন শহর থেকে দূরে পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করছে। জায়গাটা ফ্রেসচেল থেকে মাইলপাঁচেক দূরে। এমনকি কাছে পিঠে কোনো রেলস্টেশন পর্যন্ত নেই। সমুদ্রের পাড়ে লোকবসতি রয়েছে। হোটেল রেস্তোরাঁও সেখানে আছে।

গাড়োয়ানের সঙ্গে কথাবার্তার মাধ্যমে বাদ্যকররা এও জানতে পারল, গ্রামটায়ে গেলে চার-চাকার গাড়ি মিলে যাবে। আর মালবাহী দুচাকার গাড়িও পাওয়া যাবে।

গাড়োয়ান নিরুপায়। তাকে সেখানেই পড়ে থাকতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি আর জখমি ঘোড়া দুটোকে ফেলে তার পক্ষে অন্য কোথাও যাওয়া কী করে সম্ভব, তার ওপর নিজেও চোট পেয়েছে। সে তাদের অনুরোধ করল, গ্রামে পৌছে যেন লোকজন জোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়।

বাদ্যকররা ফ্লাক থেকে সামান্য মদ গাড়োয়ানের গলায় ঢেলে দিয়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

কালিফোর্নিয়ার জঙ্গল বড়ই বিপদসঙ্কুল। অন্তত পিস্তল ছাড়া খালি হাতে জঙ্গলের পথে হাঁটতে যাওয়া মোটেই উচিত নয়। কিন্তু বাজনাদার চারজনেব সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রগুলো ছাড়া অস্ত্র বলতে কিছুই নেই।

বাদ্যযন্ত্র কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথে কিছুদূর যেতে না যেতেই কালোমতো একটা চলমান ছায়া দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গা ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। গা যেন কেমন ভারী হয়ে আসতে লাগল। পথের ধারে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে ছায়াটা তাদের অনুসরণ করে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেটা তাদের পিছনে, মাত্র দশ বারো গজ ব্যবধানে চলে এল। তার মতলব মোটেই সুবিধের মনে হল না। এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কালো ছায়ামূর্তিটা অতিকায় নাদুসনুদুস একটা ভালুক। লম্বা লম্বা পায়ে সেটা বাদ্যকরদের অনুসরণ করে চলেছে।

ব্যাপার দেখে বাদ্যকরদের তো আচার্য্যাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়। দৌড়ে পলাবার চিন্তা পাগলের খেয়ালমাত্র। গাছে উঠলেও রেহাই পাওয়া যাবে না। হতচ্ছাড়াটা সেখানেও হামলা হুজ্জত চালাবে।

এমন ভয়ংকর বিপদের মুহূর্তে বেহালার মিষ্টি-মধুর সুর মনকে উতলা করে তুলল। ইভারনেসের মাথা থেকে চমৎকার এ মতলবটা ঝট করে বেরিয়ে এসেছে। ব্যাস, আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সে বাস্র থেকে বেহালাটা বের করে উনাদের মতো ছড় টেনে চলেছে। পাকা বাদ্যকরের বেহালার সুর ভালুকটার মধ্যে ভাবোন্মাদনার সঞ্চার করল। এতক্ষণ সে এগোচ্ছিল নখের ধার আর কক্তির জোর পরীক্ষা করে দেখতে। এখন বেহালার সুর তাকে টেনে আনছে।

বেহালার সুরের তালে তালে হেলেদুলে নাচতে নাচতে বনের একেবারে কিনারায় এসে ভালুকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কয়েকবার সামনের দুপায়ের থাথা দুটো দিয়ে করতালি দিয়ে বাদ্যকরদের বিদায় সন্মুখণ জানাল।

বনের এলাকা ছেড়ে বাইরে আসতেই পিঙ্কিনাটের মাথায় একটা দুর্ভিক্ষ ভর করল। সে বলল, 'ভায়া, এক কাজ করো, জোরে জোরে ছড় টেনে ভালুক-নাচানোর সুর বাজাও।'

ব্যাস, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ইভারনেস অভিজ্ঞ হাতে বেহালায় ভালুকনাচানো সুর তুলে চলল। আর যাবে কোথায়! ভালুকমশাই কোমর দুলিয়ে, শরীর বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে বাজনার তালে তালে নাচতে শুরু করল।

ভালুকটা যখন নাচে একেবারে বিভোর হয়ে পড়ল তখন সুযোগ বুঝে বাজনাদাররা চোখের পলকে গা ঢাকা দিয়ে দিল।

চার বাদ্যকর যখন ফ্রেসচেল গ্রামে হাজির হল তখন ঘড়িতে রাত নটা বাজে। এইই মধ্যে চারদিকে অন্ধকার, অথও নীরবতা নেমে এসেছে দেখে তারা খুবই অবাক হল। তারা এ দরজায় ও-দরজায় কয়েকবার ঝাঁকুনি দিল। খাঙ্কাখাঙ্কি করল। নিশ্চল প্রয়াস। দরজা খোলা তো দূরের ব্যাপার। সামান্য সাড়াও দিল না কেউ।

ব্যাপার দেখে ইভারনেস রেগেমেগে বলল, 'ধুর ছাই! এ কি গ্রাম, নাকি গোরস্থানে হাজির হয়েছি! বাড়ি তো নয়, যেন কবরখানা!'

পিঙ্কিনাটের মাথায় আর একটা বেড়ে মতলব খেলে গেল। সে বলে উঠল, 'বাজাও বাজাও বাজনা। বাজনা শুনিয়ে কবরখানার ভুতের ভেতরেও উন্মাদনা সৃষ্টি করা সম্ভব। অতএব বাজাও বাজনা।'

এমন মিষ্টিমধুর সুরে বাজনা বাজাতে লাগল যা শুনলে ভূতও কবর ছেড়ে বেরিয়ে আসত, মড়াও খিলখিলিয়ে হেসে উঠত। এমনকি কঙ্কালও কোমর দুলিয়ে নাচানাচিতে মেতে যেত।

হায়! এমন চমৎকার পরিকল্পনা, এত কায়দা কসরত করে বাজনা বাজানো বিলকুল ভেস্তে গেল। গ্রামের কোনো দরজা খোলা তো দূরের ব্যাপার, কেউ দরজা সামান্য ফাঁকও পর্যন্ত করল না। রাগে জর্নের মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ার জোগাড়। ব্যাস, মুহূর্তের মধ্যে তুমুল বাজনা শুরু হয়ে গেল। সমস্তের চার চারটে বাদ্যযন্ত্র জোরসে বেজে উঠল।

হ্যাঁ, কাজ হয়েছে বটে। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামবাসীরা একে একে বিছানা ছেড়ে উঠে আলো জ্বালতে লেগে গেল।

এদিকে বাদ্যকররা অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। ঘরে ঘরে ঝটপট আলো জ্বলে উঠতে দেখামাত্র তারা সঙ্গে সঙ্গে বাজনার সুর দিল বদলে। আগের মতোই মিষ্টি মধুর সুর বেরোতে লাগল বাদ্যযন্ত্রগুলো দিয়ে।

গ্রামবাসীদের একজন হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, 'সাহেব, আপনাদের তাল সুর মাত্রাহীন বাজনা শুনেই আপনাদের উদ্দেশ্য সফলকর আঁচ করে নিতে পেরেছি। আশ্রয়ের প্রত্যাশী, ঠিক না? আপনাদের মুশকিল আসান করার জন্যই আমি হস্তদন্ত হয়ে হাজির হয়েছি। ভালো কথা, আপনারাই তো আমেরিকার সে নামকরা বাদ্যকর, ঠিক বলি নি?' অস্ত্রিচিন্ত পিঙ্কিনাট কোনোরকম ভনিতা না করেই গভীর স্বরে বলে উঠল, 'সাহেব, সুখ্যাতি শোনার মতো শরীর ও মন কোনোটাই সুস্থ নয়। এখন তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন তো, আমরা কোথায় রাত কাটাব?'

গ্রামবাসীরা বলল, 'এখান থেকে দু-মাইল দূরে একটা শহর আছে।'

চোখ দুটো কপালে তুলে পিঙ্কিনাট এবার বলে উঠল, 'সে কী সাহেব, শহর বলছেন কী! তার চেয়ে বরং বলুন সমুদ্রের ধারে একটা গ্রাম। গাড়োয়ান তো এরকমই বলে দিয়েছে।'

'ঠিক বলে নি। আমার সঙ্গে চলুন, দেখাবেন আপনাদের মতো কৃতী সংগীতজ্ঞদের আদর যত্ন ঠিকঠাক করতে পারি কি না।'

'আমাদের যে রবিবারই মধ্যাহ্নের শো-তে সানডিয়াগোতে বাজানোর কথা। রবিবার থেকেই আমাদের বাজনার শো শুরু হচ্ছে।'

রবিবার যথা সময়ে সানডিয়াগোতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামবাসীটা তাদের চার বাদ্যকরকে গাড়িতে চাপিয়ে যাত্রা করল। ফ্রেসচেল গ্রামবাসীরাও আবার নিশ্চিন্তে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

মিনিট পনের পরেই বাদ্যকরদের নিয়ে এক জলাশয়ের ধারে গাড়িটা দাঁড়াল। একটা নদী। নদীর ওপারেই সে শহর।

গাড়িসহ যাত্রীরা একটা ফেরি নৌকায় চেপে নদী পেরিয়ে গেল। আবার গাড়ি ছুটল উন্মার বেগে। একসময় বাগানের সফ একফালি রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা হোটেলের সামনে গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হোটেলের চৌপায়ায় শুয়ে বাদ্যকররা গভীর ঘুমের মধ্য দিয়ে রাত কাটল। সারারাত ঘুম ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্য হাঁপ পর্যন্ত কারো ছিল না।

সকাল সাড়টা বাজতে না বাজতেই পিঙ্কিনাট বাজখাই গলায় চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল, 'আরে, তোমরা এখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছ যে বড়! ঝটপট, শহরটা আজ দুপুরের মধ্যে দেখে নিতে হবে। কালই সানডিয়াগোতে পৌঁছতে হবে যে—উঠে পড়ো।'

বাথরুমে ঢুকতেই ব্যবস্থাদি দেখে বাদ্যকর চারজনের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড়। ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা আর গরম জলের বর্নাসহ চমৎকার সব ব্যবস্থা। সবকিছুই যন্ত্রের দ্বারা চলছে।

বাথরুমের কাজকর্ম সেরে ঘরে ঢুকতেই ক্রিং-ক্রিং করে ফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। গতরাতের সে অদ্ভুত লোকটার কণ্ঠস্বর টেলিফোনের তার বেয়ে ভেসে এল। তাঁর নামটা জানা গেল, ক্যালিস্টার মুনবার। সুপ্রভাত জানিয়ে সে এক্সেলসিয়ার হোটলে প্রাতরাশের আমন্ত্রণ জানাল।

প্রাতরাশের পাট চুকলেই অদ্ভুত সে লোকটা বাদ্যকর চারজনকে নিয়ে শহরটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য পথে নামল।

শহরটাকে বাস্তবিকই পরিকল্পনামাফিক গড়ে তোলা হয়েছে। রাস্তার দুধারে চওড়া ফুটপাথ। আর বাড়িগুলোও একই চওড়া তৈরি দেখলে সে চোখ ও মন হাঁপিয়ে ওঠে। একটার আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে অন্যটার কিছুমাত্রও সাদৃশ্য নেই।

বাদ্যকরদের নিয়ে প্রায় বিশ মিনিট ধরে হাঁটার পর ক্যারিস্টার মুনবার মুখ খুলল, 'এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, এখানকার খার্ড এভিনিউ। এরকম ত্রিশ ত্রিশটা এভিনিউ এ-শহরে রয়েছে।'

এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য চলেছে টেলিটোগ্রাফের মাধ্যমে। বুঝতে পারলেন না তো? এ যন্ত্রের মাধ্যমে হাতের লেখাকে দূরে পাঠানো সম্ভব হয়। মুখের ভাষা পৌছে দেয় টেলিফোন, টরে উদ্ধার মাধ্যমে টেলিগ্রাফ বার্তা পাঠায়, মুখ ও হাতনাড়া ধরা পড়ে সিলেমাটোগ্রাফ যন্ত্রে, আর আপনার ছবি পাঠিয়ে দেয় টেলিপ্রিন্টার, আরো আছে টেলিটোগ্রাফ যন্ত্রের মাধ্যমে আপনার হাতের লেখাকে যেখানে খুশি পাঠিয়ে দিতে পারবেন। কেবল একটা সুইচ টেপার মামলা। টেলিটোগ্রাফই আপনার জিনিসপত্তর খরিদ করার ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়। এমনকি বিয়ের ব্যবস্থাপত্তর অবধি চুকিয়ে দিতে পারে এ যন্ত্রটা।

আরো কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে উনিশ নম্বর এডিনিউতে কেবল ধনীদেব বাড়ি। অ্যালুমিনিয়ামের রেলিং লাগানো চোখধাঁধানো সব বাড়িগুলো দেখে বাদ্যকর চারজনই বিষ্ময়ে ভিমরি খাওয়ার জোগাড়।

ক্যালিস্টার বলল, 'এটাই হচ্ছে শহরের সবচেয়ে ধনীর আবাস। ট্যান্ডারডন তাঁর নাম। ইলিনয়ের বেশকিছু তেলের খনির মালিক। কোটি কোটি টাকার বিষয়সম্পত্তি তাঁর রয়েছে। এখানকার মানুষগুলোও কম ধনী নয়। তাই তো ছোটখাটো ব্যবসায়ীদের রমরমা অবস্থা। কোনো কারখানা নেই, পাইকারি ব্যবসাও কাউকে করতে দেয়া হয় না। কুলিমজুরের দরকার হলে বাইরে থেকে আনিয়ে নেয়া হয়। কাজ মিটে গেলে আবার যে যার জায়গায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। এখানকার আর একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। ভিখারির দেখা এ শহরে মিলবে না। চোর-ঠগবাজ-ছিনতাইকারীও এখানে নেই। কয়েকদখানা নেই, গর্দান দেয়ার ব্যাপার-সাপারও নেই। ওসব যুক্তরাষ্ট্রে পাবেন। এখানে নেই।

'আপনার কথা শুনে মালুম হচ্ছে, আমরা যেন আমেরিকাতে রয়েছি', বাদ্যকর সেবাটিয়ান সবিষ্ময়ে বলল।

'আজ নয়। কাল অবশ্যই ছিলেন, আজ নয়। পৃথিবীর একটা স্বাধীন শহরে আপনারা আজ অবস্থান করছেন—যুক্তরাষ্ট্রের খবরদারি এখানে ঘটে না সাহেব।'

'শহরটার নাম বলবেন কি?'

'অবশ্যই। তবে এখন নয়, পরে বলব। এখানকার সবকিছু দেশাশোনা হয়ে গেলে তবে বলব।'

বিচিত্র উত্তরটা শুনে বাদ্যকর চারজন আর কথা না বাড়িয়ে তার পিছন পিছন এবার গরিবদের মহল্লায় হাজির হল। বাড়ির তেমন বড় নয়। অধিবাসীদের উপার্জন নাকি মাত্র এককোটি ডলার। বাদ্যকর পিছনটি বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'তবে ভিখারি বলা চলে, কী বলেন?'

ক্যালিস্টার মুনবার বলল, 'হ্যাঁ, ভিখারিই বলতে পারেন। দশকোটি উপার্জন, তার কাছে দশলাখ উপার্জনকারী ভিখারি ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে।'

এ পাড়াতেই প্রোটেষ্ট্যান্টদের সাধারণ গির্জাটা চোখে পড়ল।

এগারোটার কাছাকাছি সবাই ক্ষিদের কাতর হয়ে পড়ল। ট্রাম ধরে মিনিট কয়েকের মধ্যেই তারা হোটেল ফিরে এল।

খাবার টেবিলে বসেও লোকটার বকবকানি খামল না। কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে লোকের মনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে বটে। কোনো ফন্দি কি আঁটছে? সানডিয়োগোর ট্রেন মিস করিয়ে দেয়ার ধান্ডায় আছে নাকি?

আহারাতে প্রেটে চাটনি দেয়ার সময় আচমকা টেবিলের বাসনপত্র তিরতির করে কেঁপে উঠল। মনে হল, কোথাও বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বাদ্যকরদের মনের ভাব বুঝতে পেরে ক্যালিস্টার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ভয়ের কিছু নেই। মানমন্দিরে কামান দাগা হয়েছে। তারই আওয়াজ।'

বাদ্যকর জর্ন বেশ রাগতস্বরেই বলে উঠল, 'সানডিয়োগোর ট্রেন কয়টায়, খোলসা করে বলুন তো শনি?'

'আরে সাহেব, এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, বলুন তো? শহরের অর্ধেকটা তো এখনো দেখার বাকি রয়ে গেছে।'

চার বাদ্যকরকে সঙ্গে করে আবার রহস্যজনক লোকটা পথ চলতে শুরু করল। পথ চলতে গিয়ে সবাই মনে হল ফুটপাথ যেন তিরতির করে কাঁপছে। কিন্তু এতো আর চলন্ত ফুটপাথ নয়! ব্যাপার কী?

শহরের বাকি অর্ধেক যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। রাস্তাঘাট, বাজার, দোকান সবজায়গায় লোকে গিজগিজ করছে। এটা যেন একেবারেই অন্য একটা শহর।

সামনে বিশালায়তন একটা বাড়ির দিকে আঙুল-নির্দেশ করে ক্যালিস্টার মুনবার বলল, 'ওইটা ন্যাট কোভারলির প্রাসাদ। জেম ট্যান্ডারডনের মতোই ধনকুবের। উভয়েরই একান্ত ইচ্ছা একাই এ শহরের ওপর ছড়ি ঘোরাবেন।'

প্রায় দুঘণ্টা বাদে তারা শহরের শেষপ্রান্তে পৌছতে পারল।

এখানে অত্যাস্চর্য একটা ব্যাপার ফ্রাসকোলিনের নজরে পড়ল। মুখ ফুটে কারো কাছেই কিছু বলল না। বেলা তখন দুটো। এমন দক্ষিণ পশ্চিম আকাশে সূর্যের অবস্থান হওয়ার কথা নয়। অথচ দক্ষিণ পশ্চিমে সূর্য অবস্থান করছে।

ফ্রাসকোলিন অবিস্থাস্য ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করামাত্র ক্যালিস্টার তাড়া দিয়ে উঠল, ট্রাম! শিগগির ট্রামে উঠুন। এখন আপনারদের বন্দর দেখাতে নিয়ে যাব।'

বাগান আর চাষের জমির ভেতর দিয়ে ট্রাম ছুটে চলল। ক্যালিস্টার মুনবারের বকবকানি আবার শুরু হল, 'শুনুন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের তাগিদে কারখানাটা গড়ে তোলা হয়েছে। শহরের যাবতীয় টেলিফোন, টেলিগ্রাম, আলো, যন্ত্রপাতি, রান্না আর আলুমিনিয়াম চাঁদ এবং জলে তলার ডুবোতার চালু রাখতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় সবই এ-কারখানা সরবরাহ করে। আর কারখানাটা তৈলশক্তির সাহায্যে চলে।'

ফ্রাসকোলিন কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বলল, 'ডুবো তার? ডুবো তার বলতে কী বোঝাচ্ছে খোলসা করে বলুন তো সাহেব?'

'ডুবো তারের মাধ্যমে আমেরিকার উপকূলগুলোর সঙ্গে শহরের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।'

ফ্রাসকোলিন এখানে আর একটা অত্যাস্চর্য ব্যাপার চাক্ষুষ করল যার রহস্যটার কিনারা করতে পারল না। ব্যাপারটা হচ্ছে, চলন্ত জাহাজের পা-বেয়ে জলশ্রোত খেয়ে চলেছে।

আবার সানডিয়েগোর ট্রেন ধরার ব্যাপারটা জর্নের মাথায় এল। রহস্যজনক লোকটার কাছে প্রসঙ্গটা পাড়তেই এমন এক জবাব পেল যাতে চার বাদ্যকর রীতিমতো ধক্কে পড়ে গেল। লোকটা তার কথার জবাবে বলল, 'বলছি তো, আপনি যেখানে রয়েছেন কাল ভোরে আর সেখানে থাকছেন না।

তার কাছ থেকে সদুত্তর পাওয়া যাবে না অনুমান করে সে মুখে কলূপ এঁটে দিল।

ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবার সবাইকে নিয়ে ঝট করে আর একটা ট্রামে চেপে পড়ল। কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে বোতামে টিপ দিতেই ঘড়িটা কথা বলে উঠল, 'চারটা বেজে তেরো মিনিট।' ট্রামটা ছুটেই চলছে।

ট্রামটা দেড় শো ফুট উঁচু একটা টাওয়ারের ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতিকায় একটা ঘড়ি টাওয়ারটার মাথায় তার চারদিকে মানমন্দিরের আকাশচুম্বী সব বাড়ি।

ক্যালিফোর্নিয়ার চারজনকে নিয়ে লিফটে চাপল। বাদ্যকর চারজন মুখে কলূপ এঁটে দিয়েছে। লিফট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড বাদে চুড়ায় পৌঁছে থেমে গেল। বিশালায়তন একটা পতাকা বাতাসে পতপত করে উড়ছে। বোধহয় আমেরিকার পতাকা। তবে সাতঘণ্টা তারার পরিবর্তে তাতে একটামাত্র বিশাল সোনার তারা আঁকা রয়েছে দেখা গেল। সমগ্র আমেরিকা যেন একাকার হয়ে গেছে। পতাকাটা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

যেদিকে তাকানো যায় কেবলই জল আর জল। ডাঙার চিহ্নমাত্রও নজরে পড়ল না। বাদ্যকর চারজন একটা দ্বীপে দাঁড়িয়ে, টাওয়ারটার চুড়ায়।

কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, গতরাতে ফ্রেসচেল গ্রাম থেকে এখানে আসতে তারা দুমাইলের বেশি পথ পাড়ি দেয় নি। নদী ডিঙিয়েই শহরে ঢুকেছে। তবুও ঘোলা মাইলের ভেতরে ডাঙার চিহ্নও নেই, ব্যাপার কী? একটা রেকাবির মতো বিশাল ভূগণ্টি সাগরের জলে ভাসছে।

ফ্রান্সকোলিন রেগে মেগে বলে উঠল— 'সাহেব, সত্যি করে বলুন তো, এটা কি একটা দ্বীপ, নাকি? যদি তাই হয় কী এর নাম?'

'হ্যাঁ, দ্বীপই বটে। এর নাম স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড। আর শহরটার নাম মিলিয়ার্ড সিটি।'

প্রপেলারের সাহায্যে জাহাজ চলে। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডও চলছে প্রপেলারের সাহায্যেই। যেহেতু লাখপতি ছাড়া এ শহরে বাস করার সুযোগ পায় না তাই শহরটার নামকরণ করা হয়েছে 'মিলিয়ার্ড সিটি'। এ শহরে রথচাইন্ডের মতো ধনকুবের অসংখ্য রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার আর লোহার কারিগররা অসম্ভবকে সম্ভবনাময় করে তুলেছে। দ্বীপটা যে কেবল নকল তাই নয়, চলন্তও বটে।

উনিশ শতকের শেষের দিকের আমেরিকার বেশ কিছুসংখ্যক টাকার কুমীরের মাথায় খেয়াল চাপল সমুদ্রে ভাসমান হোটেল রেস্টুরেন্টে খানাপিনা সারবে। মঙ্গরঞ্জে নাটক দেখবে, ক্লাবে চুটিয়ে আড্ডা দেবে, ভ্রমণাধীরা একঘেয়েমির হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। অবশ্য ভেলার মতো বিশালায়তন কিছু তৈরি করে নিলেই তো আশা পূরণ করা যেতে। কিন্তু আমেরিকানরা চিরদিনই সবকিছু বড়সড় মাপেরই করতে অগ্রহী। সেজন্যই তো শেষেমেঘ মনস্থ করল, ভাসমান দ্বীপটাকে চলন্তও করে তুলতে হবে। মোদ্দা ব্যাপার, চলন্ত একটা দ্বীপ গড়ে তুলতে হবে। সচল দ্বীপ।

বাস, কাজ শুরু করে দেয়া হল। চার বছর পর কাজটা শেষ হল। ইয়াংসিকিয়াংয়ে ভাসমান গ্রাম নজরে পড়ে। দানিয়ুব আর আমাজনের বৃকেও গ্রামকে ভেসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু সে তো অস্থায়ী গ্রাম। অতিকায় কাঠের ওপরে তৈরি গ্রাম ভাসতে ভাসতে এক জায়গা থেকে অন্যত্র গিয়ে হাজির হয়। তারপর ভেলা ভেঙে বাড়িগুলোকে পাড়ে তুলে আনে। এটা আসলে এরকম কোনো দ্বীপ নয়। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নামে দ্বীপের কাঠামোটাকে এমনভাবে তৈরি করা হল যাতে স্থায়ীভাবে জলে ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারে। ঝাঁটি ইম্পাত ব্যবহার করে সেটাকে তৈরি করা হল। মূল দ্বীপটাকে গড়ে তোলা হল দু লক্ষ সত্তর হাজার জলনিরুদ্ধ কামরাকে পাশাপাশি সাজিয়ে। প্রতিটা কামরার আরতন দশ গজ দৈর্ঘ্য, দশ গজ প্রস্থ আর আঠারো গজ উচ্চাবিশিষ্ট। তবে দাঁড়াচ্ছে—প্রতিটি কামরার ওপরের দিকের ফ্লোরফল হচ্ছে এ শো বর্গগজ। নাটবল্টু রিভেটের সাহায্যে কামরাগুলোকে জুড়ে দেয়া দুই কোটি সত্তর লক্ষ বর্গগজবিশিষ্ট একটা ভাসমান দ্বীপ গড়ে উঠল। ডিহাকৃতি একটা দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার মাইল আর প্রস্থে তিন মাইল। কিনারা ধরে একপাক মেরে এলে হবে এগারো মাইল।

দ্বীপটা জলে ভাসমান অবস্থায় ত্রিশ ফুট জলে নিচে তলিয়ে থাকে। জলের ওপরে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে বিশ ফুট। ম্যাডেলান উপসাগরে দ্বীপটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। মেরামতির যন্ত্রপাতি এতে থাকে।

এবার লোহার দ্বীপটাকে মাটি চাপা দিয়ে ঢেকে দেয়ার বন্দোবস্ত করা হল। মাটিতে চাষ করা হল শাকসজি ও ফলমূল প্রভৃতি। ইলেকট্রো কালচারের ব্যবস্থাপনায় গাছগাছালি দ্রুত বেড়ে যেতে লাগল।

দ্বীপের মাটিতে গম চাষের ব্যবস্থা করা হল না।

মোট আয়তনের সত্তর ভাগের একভাগে গড়ে তোলা হল অবিশ্বাস্য এই মিলিয়ার্ড শহরকে। আমেরিকার অন্তর্গত অন্যসব শহরে যাত্রিক সুখস্বচ্ছন্দ্য প্রচুর থাকলেও কেবল শিল্প দিয়ে চোখ ও মনকে আনন্দ দেয়ার নেই। মিলিয়ার্ড শহরে এসবের কিছুমাত্রও ঘাটতি নেই। ডিহাকৃতি শহরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে ফাস্ট এভিনিউ। একধারে শহর আর অন্য ধারে রয়েছে মানমন্দির। আর এখানের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছে স্কুল, হাসপাতাল, পুলিশ দপ্তর, কাস্টম অফিস, কবরখানা আর বিজ্ঞান ও চারুশিল্পের কেন্দ্র।

মোট দশ হাজার মানুষের বসতি স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড। সবাই আমেরিকান নাগরিক।

আইল্যান্ড কোম্পানিই চলন্ত দ্বীপের সবকিছুর মালিক। বাড়িঘর জায়গা জমি কলকারখানা সবকিছুর মালিকানাধীন কোম্পানিরই ওপর। কোম্পানির মূল আয় হচ্ছে ভাড়ার টাকা।

এখানে ডাক্তারের প্রয়োজন হয়ই না। কারণ সামুদ্রিক আবহাওয়া এমন সুন্দর যে রোগব্যাধির প্রশ্নই ওঠে না। রোগ জীবাণুই নেই, রোগ কী করে? জরাগ্রস্ত না হওয়া পর্যন্ত মরতে চাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে না।

সমুদ্রের জলসদ্যদের ঠেকানোর জন্য কর্নেল স্ট্র্যাট পাঁচ শো সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে দিন রাত দ্বীপটাকে কড়া পাহারা দিয়ে আগলে রাখেন। এক একজন সেনানী ইউরোপের যে-কোনো সৈন্যাব্যাহারের সমান বেতন পায়। আভ্যন্তরীণ ব্যাপার-সাপারের জন্য পুলিশও কম নিযুক্ত নেই।

চলন্ত দ্বীপটা কিন্তু অকারণে, উদ্দেশ্যহীনভাবে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায় না। আইল্যান্ড কোম্পানির আবহাওয়া দপ্তর পরামর্শ দেবে কখন, সমুদ্রের কোন অঞ্চল দিয়ে সমুদ্র অতিক্রম করবে।

আইল্যান্ড সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ালেও পানযোগ্য মিষ্টি জলের অভাব এখানে হয় না। কারণ সমুদ্রের জলে লবণটুকু আলাদা করে নিয়ে তবে মিষ্টি জল শহরের সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। পাইপের মাধ্যমে চালান দেয়া হয় শহরের সর্বত্র। এমনকি চাষের ক্ষেত্রেও।

কয়েকটা দানবাকৃতি জেনারেটর এবং বৈদ্যুতিক কারখানার কয়েকটা বয়লার থেকে দু হাজার ডোন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের দু-ধারে দুটো বন্দর অবস্থান করছে। তাদের একটার নাম ‘পারবোর্ড’ আর দ্বিতীয়টার নাম ‘স্টারবোর্ড’। তাদের প্রত্যেকটাতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন দুটো ইঞ্জিন আছে। প্রত্যেকটা পঞ্চাশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন। কারখানার উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে নকল চাঁদ থেকে শুরু করে প্রতিটা যন্ত্রপাতি পর্যন্ত চলছে। এক একটা নকল চাঁদ পাঁচ হাজার মোমবাতির সমান আলো দানের ক্ষমতা সম্পন্ন।

অত্যাশ্চর্য দ্বীপটার অন্য আর একটা নামকরণ করা হয়েছে—‘প্রশান্তের মুক্তা’। প্রশান্ত মহাসাগরে দ্বীপটার এখন দ্বিতীয় সফল চলছে।

বাদ্যকর চারজনকে তুলে নেয়ার জন্যই গতরাত্রে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলের কাছে নোঙর করেছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবার একজন পয়লা নম্বরের-খাল্লাবাজ। আমেরিকার হুলভূমি থেকে চলন্ত দ্বীপে আসার সময় সমুদ্রের খাড়িকে নদী বলে ধাপ্পা দিয়েছে।

এদিকে ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবারের কথাবার্তা ও রকম-সকম দেখে বাদ্যকর চারজন তো তার ওপর রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। তারা জেল ফাঁসির বন্দোবস্ত করার কথা বলাবলি করে ক্রোধ প্রকাশ করতেও ছাড়ল না।

কিন্তু কোথায় ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবার? কাকে জেলে ঢোকাবে? কাকেই বা ফাঁসিকাঠে ঝুলাবে বাদ্যকররা? সুচতুর লোকটা তাদের ছাড়ের ওপর রেখে অনেক আগেই লিফটে চেপে সোজা নিচে চম্পট দিয়েছে। অতএব তাদের ফাঁকা ছাদে দাঁড়িয়ে হিম্মত করাই সার হল। নিচে নামার কোনো ফিরিকই নেই। পথ বন্ধ। সিঁড়ির ব্যবস্থাও নেই। সেটা বেয়ে অতি কষ্টে হলেও কোনোরকমে তারা নিচে নামতে পারত। গুলিবিদ্ধ ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো বাদ্যকর চারজন ফুঁসতে লাগল।

জর্ন অল্পেতেই মাথাগরম করে ফেলে। সে কোমর থেকে হেঁচকা টানে ছুরিটা হাতে নিয়ে উড়ন্ত পতাকাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য উদ্যত হল। অনেক কায়দা কসরত করে তাকে কোনোরকমে সামলে সুমলে রাখা হল। তারই দ্বীপে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব লিপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা, নিতান্তই বোকামি।

অনন্যোপায় হয়েছে ক্রোধমিশ্রিত হতাশায় জর্জরিত চার বাদ্যকর বন্ধু রেলিঙ ধরে ঝুঁকে দেড় শো ফুট নিচে অবস্থানরত মানুষদের গলা ছেড়ে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিল।

হ্যাঁ, শুনেছে, অনেকেই তাদের কণ্ঠস্বর শুনেছে বটে। কিন্তু এ পর্যন্তই তারা বিভিন্ন কথার মাধ্যমে কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞেস করল। ব্যস, আর কোনোই ফল হল না। ব্যাপারটা এমন হল, তাদের কাছে যেন এটা নিছক একটা তামাশামাত্র। তারা রাগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। হতজ্ঞাড়া মুনবার শয়তানের শিরোমণি। চারজনকে ছাদে তুলে দিয়ে লিফটটা নিয়ে বেমালুম চম্পট দিয়েছে। এদিকে ক্ষিদেতে তাদের পেটে জ্বালা শুরু হয়ে গেছে।

আচমকা গুড়গুড় আওয়াজ শোনা গেল। হ্যাঁ, লিফটই উঠে এসেছে। বাদ্যকর চারজন ব্যস্ত পায়ে ভেতরে দিয়ে দাঁড়ানো মাত্র সেটা নিজে থেকেই নিচে নামতে লাগল।

লিফটের ঝাঁচ থেকে বেরিয়েই তারা সামনে সোজা রাস্তা পেয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গে ছুটতে লাগল। যাকে বলে একেবারে উন্মাদের মতো ছোট। মনে হল পথে ভ্রমণার্থীদের সংখ্যাই বেশি। অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষিত হল। তাদের এভাবে উন্মাদের মতো ছুটতে দেখে কেউ এতটুকুও অবাক হল না।

ছুটতে ছুটতে বাদ্যকর চারজনেরই কেমন সন্দেহ হল ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবার বুঝি তাদের ওপর কড়া নজর রেখে চলেছে।

তারা উজ্জ্বলতার মতো ছুটতে ছুটতে ফার্স্ট এভিনিউতে একটা রেইনব্রিজ দেখে ঝটপট ভেতরে ঢুকে গেল। আহরন্তে তারা বিল মেটাতে বাবে ঠিক সে মুহূর্তেই পিছনের থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, ‘ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের কিছুই দবার দরকার নেই।

চার বাদ্যকর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ক্যালিফোর্নিয়ার মুনবার দাঁড়িয়ে।

ব্যস, যন্ত্রচালিতের মতো চার বাদ্যকর চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্রোধোন্মত্ত জর্ন গর্জে উঠল, ‘বাহাদুর, এতক্ষণে তোমাকে বাগে পেয়েছি! বদলা নিয়ে ছাড়ব! সুদে আসলে আদায় করে ছাড়ব। তোমার গর্দান নিয়ে—’

‘তার চেয়ে বরং বলুন, বিপরীত কাজই করবেন। কোটের পকেট থেকে চুরকট বের করে অগ্নিসংযোগ করলেন। একগাল খোঁয়া ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে শুরু করলেন নিজের অত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য কাহিনী—

‘অদ্রমহোদয়গণ, আমার নাম তো আপনারা আগেই জেনেছেন। এ দ্বীপের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ আমি। ছবি আঁকা ও মূর্তি তৈরি প্রভৃতি ব্যাপার স্যাপার নিয়ে চর্চায় লিপ্ত থাকাই আমার কর্তব্য। আমি কেবল বাজনার ব্যাপারে আপনারদের সঙ্গে আলোচনা করব। যন্ত্রসংগীত শুনে শুনে দ্বীপের মানুষগুলোর কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। ধুং, ফোনেগ্রাফের বাজনাকে আবার বাজানোর পর্যায়ে ফেলা যায় নাকি!’

‘তাজা মাছ আর কৌটার গুঁটকি মাছের মধ্যে যে পার্থক্য, কানে শোনা আর চোখে দেখা বাজনার সঙ্গে ফোনেগ্রাফের একই পার্থক্য।’ বাদ্যকর ইভারনেস বিতুষ্টার সঙ্গে বলে উঠল।

আমাদের ফোনেগ্রাফের নামকরণ করেছি ‘থিয়েট্রোফোম’। সে যে কী জিনিস আপনারা অনুমানও করতে পারছেন না সাহেব! ইউরোপ বা আমেরিকার যে-কোনো মধ্যে বসে বাজনা বাজান আমাদের ‘ক্যাসিনো’ এখানে বসে হুবহু তাই শোনাতে। ম্যাডেনলিন উপসাগরে ডুবোজাহাজের একটা প্রান্ত রক্ষিত আছে। আর প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিভিন্ন জায়গায় বয়ান মাধ্যমে সে তারের মুখ ভাসিয়ে রাখা আছে। যে-কোনো একটা তারের মুখের সঙ্গে আমাদের তারের সংযোগ স্যানক করে আমরা আপনারদের বাজনা দিবি শুনতে পাই। আর বাজনার তালে তালে আমাদের করতালি-ধ্বনি ওই ডুবোতারের মাধ্যমেই আপনারদের মধ্যে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু তারবাহিত বাজনা যন্ত্রের মাধ্যমে শুনে শুনে মিলিয়ার্ড শহরের মানুষগুলোর অভক্তি ধরে গেছে। তাই তো আপনারদের চার বন্ধুর বাজনা শুনতে ও চাক্ষুষ করার জন্য তারা উদ্দগ্ন। আপনারাই প্রথম এখানে তাদের বাজনা শোনাতে এলেন। তবে বলপূর্বক অবশ্যই নয়।’ কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে এবার বলল, ‘বারো মাসের কন্ট্রাষ্ট ফর্ম। চারজনই স্বাক্ষর করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। ঠিক বারোমাস পরে এ-দ্বীপটা ম্যাডেনলিন উপসাগরে হাজির হবে। ব্যস, সেখান থেকে আপনারা সানডিয়েগোতে চলে যাবেন। ভালো কপ্পা, আপনারদের দক্ষিণার ব্যাপারটাও কন্ট্রাষ্ট ফর্মে উল্লেখ করা আছে-বারো মাসে মাথাপিছু দু লক্ষ ডলার। তিন মাসের অর্থ অগ্রিম হিসেবে পেয়ে যাবেন। কষ্টস্বরে বেশ একটু উদ্ধা প্রকাশ করেই জর্ন বলে উঠল, ‘আরে সাহেব, এখানকার জিনিসপত্রের দাম যেমন আকাশছোঁয়া তাতে তো আপনার ডলারগুলো খইয়ের মতো উড়ে যাবে!’

ঠোন্টের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে ক্যালিস্টার মুনবার বলে উঠলেন, ‘সাহেব, কী যে বলেন, এখানে আপনারদের অর্থ ব্যয় করতে দেয়া হবে ভেবেছেন! ভাগ্য ভালো যে, আপনারদের কাছে পেয়েছি।’

চার বাদ্যকর বন্ধুর রাগ-দেহ মুহূর্তের মধ্যে কর্পূরের মতো উবে গেল। সবার ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে দেখা দিল হাসির প্রলেপ। এরপর আর কারোর ভেতরে ফোন্ডের লেশমাত্র থাকারও কথা নয়।

বৈদ্যুতিক হরফে চার বাদ্যকর বন্ধুর অন্তঃকানের বিজ্ঞপনের ব্যবস্থা করা হল। প্রতি টিকিটের দাম দুশো ডলার। তাও টিকিট পাওয়া দুস্কর। হবে নাই বা কেন? আসন সংখ্যা যে মাত্র একশো। বাস্তবিকই থিয়েট্রোফোম আর ফোনেগ্রাফ মানুষের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নইলে এত দামের টিকিট নিয়ে এমন কাড়াকাড়ি পড়ে কখনো। চার বাদ্যকরের প্রাপ্য মিটিয়েও আইল্যান্ড কোম্পানির প্রচুর লাভ থেকে গেল।

সেটা ছিল ১১ জুন। চার বাদ্যকর সেদিনই প্রথম শহরবাসীদের বাজনা শোনা। বাজনা শোনার জন্য গভর্নরও ক্যাসিনোতে হাজির হয়েছিলেন। ফাস্ট এভিনিউর দ্বারে দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ তাদের একবারটি চোখে দেখে জীবন সার্থক করার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

৯ জুলাই। সেদিনই স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডের আসল রূপ চোখে পড়ল। সশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে কর্নেল স্টুয়ার্ট তৈরি। চলন্ত দ্বীপের সর্বত্র হৈ হুটগগোল শুরু হয়ে গেল। দ্বীপটা ওয়াছ থেকে শ্রায় একশো গজ দূরে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। এটা ইতিপূর্বে আরো একবার হনলুলুতে এসেছিল। এবার এখানে চলন্ত দ্বীপটা দশ দিন অবস্থান করল। দ্বীপের ধনকুবের অধিবাসীরা দ্বীপের বাইরে গিয়ে আনন্দ স্ফূর্তি রঙ্গ তামাশা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। স্থলভূমি থেকে নৌকো চেপে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ দ্বীপে উঠে আসার জন্য এগিয়ে এল। কাস্টম পুলিশ পথ রুখে দাঁড়াল, কাউকেই ওপরে উঠতে দিল না।

ঠিক তখনই বিচিত্র ধরনের একটা নৌকাকে দেখা গেল। দ্বীপের চারদিকে সেটা চক্রর মেরে বেড়াচ্ছে। বারোজন মাঝিমাল্লা মিলে ছোট নৌকাটাকে অনবরত চালিয়ে নিয়ে চলেছে। নৌকার প্রধান মাঝি যেন অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে বারবার দ্বীপটাকে দেখেছে। দ্বীপের বন্দোবস্তের দিকেই ছিল তার কড়া নজর। রহস্যজনক নৌকা। নৌকার লোকগুলোর হাবভাব তেমন সুবিধার নয় বুঝেও কেউ সেটাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করল না।

একমাত্র ধনকুবেররাই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে থাকে।

ধনীদেব মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে জেম ট্যাঙ্কারডন। কিছুসংখ্যক অন্যান্য বিত্তবান তাকে সমর্থন করেছে। তাদের বক্তব্য, এমন সুন্দর একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। অহেতুক সাগরের বুকে চক্রর মারছে। তার চেয়ে বরং মাল আমদানি রপ্তানি করলে প্রচুর অর্থাগম হত। জেম ট্যাঙ্কারডনের জোয়ান ছেলের নাম ওয়াস্টার ট্যাঙ্কারডন।

ন্যাট কোভারলি তেলের কারবারি না হলেও ধনসম্পদের দিক থেকে ট্যাঙ্কারডন থেকে কোনো অংশে কমতি নয়। শিল্প ও ব্যাঙ্ক ব্যবসা তার অর্থাগমের উৎস। তবে তার বক্তব্য হচ্ছে, হাতে প্রচুর ধনসম্পদ এসে যাওয়ার পর অর্থোপার্জনের লালসা ত্যাগ করাই ভালো। ধনকুবের ন্যাট কোভারলির ডায়না নামে বছর বিশের এক মেয়ে আছে। রূপে ওপে ঈনন্যা। তবে সে ছাড়া আর দুটো মেয়েও আছে। ডায়না বড়। দ্বীপের যুবকরা তার এক টুকরো মুচকি হাসি দেখার জন্য পাগল। আর কোনোক্রমে তার সঙ্গে যদি কথা বলতে পারে তবে যেন আকাশের চাঁদকে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেল।

দ্বীপের অধিবাসীদের অনেকেই ধারণা, ওয়াস্টার ট্যাঙ্কারডনের সঙ্গে রূপসী যুবতী ডায়নার বিয়ে হলে চমৎকার মান্যত। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তারা উভয়ে উভয়কে মনে মনে কামনা করলেও আজ পর্যন্ত বাক্যলাপ পর্যন্তও হয় নি। কাছে আসতে পর্যন্ত সাহসে কুলোয় নি। দূর থেকে একে অন্যকে দেখাই সার।

কয়েকদিন পর দ্বীপ জুড়ে গানবাজনা আর আনন্দ স্ফূর্তির জোয়ার বয়ে চলল। দ্বীপের বাসিন্দারা কেন এমন অনাবিল

আনন্দে মেতেছে? কারণ একটাই—সেদিন রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলন্ত নিরক্ষবৃত্ত অতিক্রম করে এগিয়ে যাবে। এ কাল্পনিক রেখাটাই ভূগোলকে সমন্বিত করেছে। দ্বীপের কিনারা ঘেঁসে একটা কামান বসানো হয়েছে। একটা বৈদ্যুতিক বোতাম তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আগেভাগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে শহরের সবচেয়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ঘড়িতে ঠিক দশটা পর্যন্ত বাজলে বোতাম টিপে ভূরুদ্ধানি করবে।

সমস্যা কামানের বোতাম টেপার ব্যাপারটা নিয়েই জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হল। বোতাম টেপার সময় হতেই দুজনেই বোতামের দিকে হাত এগিয়ে দিলেন। ব্যাস, তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই বিপরীত দিক থেকে সমুদ্রের বুকে বিকটস্বরে কামান গর্জে উঠল। পরমুহূর্তেই বন্দর থেকে টেলিগ্রাম এল। দ্বীপ থেকে দূরে একটা জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। কামান দেগে সাহায্য প্রার্থনা করছে। ব্যাস, স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড থেকে একটা লঞ্চ ছুটে গেল ডুবন্ত জাহাজটার দিকে। হে হট্টগোলের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নিরক্ষবৃত্ত পেরিয়ে গেল। চলন্ত দ্বীপে লঞ্চটা সে জাহাজটার অসহায় মানুষগুলোকে নিয়ে দ্বীপে ফিরে এল। সবাই জাহাজ ছাড়তে না ছাড়তেই জাহাজটা সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল।

রহস্যজনক যে মালয় নৌকাটাকে স্যাডউইচ দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপটাকে চক্রর মারতে দেখা গিয়েছিল সেটা এইমাত্র ক্রোধান্ডু সমুদ্রের বুকে তলিয়ে গেল। নৌকার লোকগুলো কোনোরকমে সাঁতারে চলন্ত দ্বীপে উঠে আসতে পারল।

এদিকে কোন্দল নতুন রূপ নিল। লোকের মুখে মুখে ঘুরছে, লারবোডের ধনকুবেররা শুয়োরের মাংসের কারখানা খুলতে চায়। শুয়োর কেটে লবণ মাখিয়ে টাটকা রেখে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে আগ্রহী।

দুর্ভে যাওয়া জাহাজটার ক্যান্টন স্যারোল এবং তাঁর মালয় লঙ্কররা স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। তাদের গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে তারা যেন ভেতরে ভেতরে কিসের মতলব এঁটে চলেছে। এখানে যে-সব জিনিস দেখছে সবকিছু স্বচ্ছ পাকা ধারণা করে নিতেই তারা অত্যন্ত আগ্রহী।

বাদ্যকরদের হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার গোড়ার দিকে ব্যাপারটা নিয়ে আমেরিকার মানুষগুলো দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। পরে অবশ্য খবরটা কানাঘুষার মাধ্যমে প্রচার হয়ে যাওয়ার উদ্বেগের অবসান ঘটেছে। বাদ্যকররাও ফরাসি দেশের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। এতেও পুরো ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেছে।

পোসাতু দ্বীপপুঞ্জ প্রায় ৭০০ ছোট বড় দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত। কমান্ডোর ঠিক করলেন, দ্বীপপুঞ্জের মাঝখান দিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে নিয়ে যাবেন। কাজটা খুবই ঝুঁকির, বিপদ পায়ে পায়ে। দ্বীপের লোহার কাঠামো চোরা পাহাড়ে লেগে ঘায়েল হলেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

এখনকার সমুদ্র স্বচ্ছ কমান্ডোরের ধারণা পাকা। ছোট ছোট দ্বীপগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে চলন্ত দ্বীপটাকে নির্বিবাদে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড সাতাশে সেপ্টেম্বর আনান নামে একটা দ্বীপ ঘেঁসে যাবার সময় দাঁড়িয়ে পড়ল। হুড়মুড় করে অনেকই নেমে গেল দ্বীপটাতে। দ্বীপের মাটিতে আনন্দে লাফালাফি ছুটোছুটি করল অনেকক্ষণ ধরে। বাদ্যকররা দ্বীপটার নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে থেকে আনন্দ উপভোগ করল।

গতবারের মতো এবারও তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের পাপেতি দ্বীপে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড দাঁড়াল। কোভারলি আর ট্যান্ডারডন পরিবারের বাড়ি এখানেই। ফলে অন্যান্যদের সঙ্গে তারাও পাপেতি দ্বীপে নেমে গেল। কয়েকদিন তারা এখানেই কাটাবে।

কোভারলির বাড়িতে গানবাজনার মজলিশ পুরোদমে জমে উঠেছে। মিসেস কোভারলি চমৎকার পিয়ানো বাজালেন। ডায়না উদাস্ত কণ্ঠে গান জুড়ল। তার সঙ্গে ইভারনসেসও গলা মেলাল।

পিঙ্কিট বলল, 'আজ সকালে একটা ব্যাপার নজরে পড়ল। ওয়াল্টারকে দেখলাম, এবাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে।'

১৫ নভেম্বর। সেদিন চলন্ত দ্বীপে ভারী একটা ঘটনা ঘটে গেল। তাহিতির রাজা রানীকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য পার্ক আর টাউন হলে খানাপিনা ও নাচগানের আয়োজন করল ক্যালিস্টার মুনবার। খানাপিনা, নাচগান, বাজি পোড়ানো আরও কত কী মজার ব্যাপার যে হল তার শেষ নেই।

তাহিতি দ্বীপে দুদিন কাটানোর পর স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড আবার যাত্রা শুরু করল। এবার তার গতি দক্ষিণ পশ্চিম কোণ বরাবর।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এবার কুক দ্বীপপুঞ্জে হাজির হল। ক্যালিস্টার মুনবার মহা খড়িবাজ লোক! ওয়াল্টার আর ডায়নাকে পরস্পরের কাছে এনে দিয়ে নিজে টুক করে সরে পড়লেন। চলে গেলেন আড়ালে। তারই গোপন মতলব চিরশত্রু পরিবার দুটোকে কাছাকাছি এনে দিল। তাঁদের ছেলে আর বড় মেয়েকে কেন্দ্র করেই তার পক্ষে এমন একটা কাজকে বাস্তবায়িত করতে অসুবিধা হয় নি।

এবার থেকে ডায়না বা তার মা মিসেস কোভারলির মুখোমুখি হেলই বিনম্র বিনয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায়। মা মেয়েও মুচকি হেসে অভিবাদনের জবাব দেয়।

এবার উভয় পক্ষই ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তৎপর হল। ডায়না মেয়ে হিসেবেও যথেষ্ট ভালই। রূপসৌন্দর্যও অতুলনীয়। তার ওপর অর্থকড়ির দিক থেকেও জেম ট্যান্ডারডন এবং কোভারলি কেউই কোনো অংশে কমতি নয়। গোড়ার দিকে অবশ্য উভয় পরিবারই বিয়ের ব্যাপারটায় একটু আধটু অমত করেছিল। দীর্ঘদিনের বিবাদ বিসম্বাদই এর একমাত্র কারণ। শেষপর্যন্ত পাত্রপাত্রীর আগ্রহের কাছে তাদের বাবা মায়ের ওজর আপত্তি ধোঁপে টিকল না।

এদিকে নতুন দ্বীপটাকে ঘুরে ফিরে দেখতে গিয়ে বাদ্যকরদের সময় দ্রুত কেটে যেতে লাগল।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানির আলোচনা-সভা বসল। আলোচ্য বিষয়—চলন্ত দ্বীপের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ। এবার নতুন পথ ধরে এগোবে, নাকি পুরনো পথই ধরবে?

ব্যাপারটা নিয়ে ক্যান্টন স্যারোল খুবই ভাবিত। কারণ, পুরনো পথ ধরলে কয়েক মাসের মধ্যেই চলন্ত দ্বীপটা নিউ হেব্রাইড দ্বীপে পৌঁছে যাবে। ডুবে যাওয়া জাহাজের লোকজনদের নিয়ে সে দ্বীপে ওঠার পর তাকে কথা দেওয়া হয়েছিল তাদের নিউ হেব্রাইড দ্বীপে পৌঁছে দেবে। কিন্তু অন্য পথ ধরলে পথে নিউ হেব্রাইড দ্বীপ পড়বে না। তার ভাবনাটা এখানেই। তাইতো কাণ্ডেন স্যারোলকে নিরবচ্ছিন্ন উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটাতে হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত তার উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। আশ্বস্ত হল। দীর্ঘ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে পুরনো পথেই নিয়ে যাওয়া হবে। অতএব নিউ হেব্রাইড দ্বীপ হয়েই যাচ্ছে।

বিনা পয়সায় এমন সুন্দর একটা দ্বীপে থাকার, ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ পেয়েও কাণ্ডেন স্যারোল এতদিন ওই একটা ব্যাপারেই মনমরা হয়ে কাটিয়েছে। আজ তার মুখে দেখা দিল হাসির রেখা।

কাণ্ডেন স্যারোল কি সত্যিই বিপদে পড়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছে?

কে এই কাণ্ডেন স্যারোল? কীই বা তার প্রকৃত পরিচয়? না, বিপদে পড়ে অবশ্যই নয়। বরং বলা চলে ইচ্ছাকৃতভাবে বিপদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কাণ্ডেন স্যারোল আসলে একজন মালয় জলদস্যু। উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই সে চলন্ত-দ্বীপে উঠে এসেছে। ইতিপূর্বে একাধিক বার প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অঞ্চলে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছে। জাহাজ লুণ্ঠ করে বিস্তার ধন সম্পদ হাতিয়েছে। আর তার দুই মাস্তুলের জাহাজটা নিয়ে চলন্ত দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে অহেতুক সে রহস্যজনকভাবে বার বার চক্রর মারে নি। বরং বলা চলে তার এ কাজের মধ্যে গভীর চক্রান্ত রয়েছে। কাজ করে চলেছে পরিকল্পনা স্যাপিক রীতিমতো ছক করে। চলন্ত দ্বীপটার চারদিকে চক্রর মেরে দ্বীপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতখানি জোয়দার যাচাই করে নিয়েছে। তারপর যখন কোভারলি এবং ট্যান্ডারডন কমানের বোতাম টোপার ব্যাপার নিয়ে কোন্ডল শুরু করে দেয় ঠিক তখনই কাণ্ডেন স্যারোল তার জাহাজ থেকে দুম করে কামান দেপে ফেলল। বাস, এবার পরিকল্পনামাফিক জাহাজটাকে ডুবিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করল। তারপরের ব্যাপারটাও পরিকল্পনা মাফিকই হল। চলন্ত দ্বীপ থেকে নৌকা ছুটে গিয়ে তাকে এবং তার সাকরেনদের দ্বীপে নিয়ে এল। এমন পরিস্থিতিতে তার গোপন চক্রান্ত সম্বন্ধে কারো পক্ষে কিছুমাত্রও সন্দেহ করা কি সম্ভব, নাকি উচিত?

জলদস্যু স্যারোলের ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। না, এ-পথ অবলম্বন করা ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তরই ছিল না।

এবার ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় পর্বের কাজ জলদস্যু স্যারোল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করে চলেছে। এখন তার প্রথম ও প্রধান কাজ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো সেখানে পূজ্যানুপূজ্যরূপে জেমে নেয়া। তারপর ষড়যন্ত্রের তৃতীয় বা শেষপর্ব ধ্বংস—ধ্বংসের কাজে মেতে ওঠা। আর তা সে সম্পন্ন করতে চাইছে হেব্রাইড দ্বীপপুঞ্জে। চলন্ত দ্বীপটাকে অসভ্য জঙ্গল আর ভয়ঙ্কর হিংস্র মানুষগুলো হুড়মুড় করে চলন্ত দ্বীপে উঠে নির্বিচারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে। দেখতে দেখতে দ্বীপবাসীদের কচুকাটা করে সাবাড় করে দেবে। দ্বীপের ধনদৌলত লুণ্ঠ হয়ে যাবে চোখের পলকে। চলমান কুবেরের ধন ভাণ্ডার লুণ্ঠ করার এমন চমৎকার পরিকল্পনা এর আগে কারো মগজে আসে নি।

জলদস্যু স্যারোল চারমাস ধরে দ্বীপে অবস্থান করে সংগোপনে তার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দেয়ার মতলব ভাঁজতে লাগল।

২৬ ডিসেম্বর। সেদিন চলন্ত দ্বীপ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের খবরের কাগজের পাতায় চমৎকার একটা খবর ছাপা হল। ম্যালকালির রাজা নাকি টাউন হয়ে গিয়ে দ্বীপের গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ যে একেবারেই অভিস্যস্য ব্যাপার। যিনি মুহূর্তের জন্যও বাড়ির জিঙ্গীমানা ছেড়ে বেরোন না তিনিই কি না গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন!

এবার আসল ব্যাপারটা জানা গেল। ম্যালকালির রাজা গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে মানমন্দিরের জ্যোতির্বিদের চাকরিটা পাকা করেছেন।

রাজার চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সবাই খুশিই হয়েছে। মানুষ হিসেবে তাঁর তুলনাই হয় না। ইউরোপের ছোট্ট একটা ভূখণ্ডের অধিপতি ছিলেন তিনি। তাঁর কোনো সম্ভানসম্পত্তি হয় নি।

রাজার দূরদর্শিতাও অতুলনীয়। তিনি অনেক আগেই যেন দিব্যচোখে দেখতে পেয়েছিলেন দেশে রাজার যুগের অবসান হতে চলেছে। এবার প্রজারাই হয়ে উঠবে দেশের সর্বময় কর্তা। তাই সময় থাকতে সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে বেরিয়ে পড়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

হাসিমুখে প্রজাদের হাতে রাজ্য রাজধানী তুলে দিয়ে রানীর হাত ধরে রাজ্য ছেড়ে চলে এলেন, রক্তপাতের তো প্রশ্নই উঠে না।

বাদ্যকর চারজন খেয়ারের বশীভূত। মাথায় একবার যে খেয়াল চাপে অবলীলাক্রমে তাই তারা করে বসবে। সেদিন খেয়ালের শিকার হয়ে তারা বৃদ্ধা রানীকে বাজনা শোনাতে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে বাদ্যকররা রাজার সঙ্গে দেখা করল। চেহারা ও পোশাক কোনোদিন থেকেই রাজাসুলভ জৌলুস নেই। যেন কোন তপস্বীর মুখোমুখি তারা দাঁড়িয়ে। রানীও গাঢ় রঙের একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জানালায় বসে।

রাজা একগাল হেসে বাদ্যকরদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন, 'একটা কথা কি জানেন? চেয়ার মিউজিক বড়ই সূক্ষ্ম বাজনা। একদমল লোকের হৈ হট্টগলের মধ্যে বসে উপভোগ করবার মতো বাজনা এটা নয়।'

বাদ্যকর চারজন বাড়ি বয়ে বাজনা শোনাতে এসেছে শুনে রাজা ও রানী যারপরনাই খুশি হলেন।

বাদ্যকর চারজন এবার মনগ্রাণ ঢেলে বাজনা বাজাতে শুরু করল। মনের সুখে দীর্ঘ সময় ধরে বাজনা বাজিয়েও যেন তারা পুরোপুরি তৃপ্ত হতে পারল না।

৩০ ডিসেম্বর। সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাতের অন্ধকার নামতে না নামতেই নতুনতর এক হাস্যামা দেখা দিল। কেমন যেন একটা রহস্যজনক চাপা শব্দ আকাশের এক কোণ থেকে ভেসে আসতে লাগল। দীর্ঘসময় ধরে একটু বাদে বাদে রহস্যজনক শব্দ চলন্ত ধীপের অধিবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার করল। একসময় ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। সবাই নিঃসন্দেহ হল, কামান দাগা হচ্ছে। রাত দুটোর কাছাকাছি বিকট শব্দ ভেসে এর। মনে হল খুবই কাছে কোথাও শক্তিশালী বোমা ফাটানো হচ্ছে।

সকাল হলেও কামানের গর্জন বন্ধ হল না, কমেডোর সিসকো মানমন্দিরের শীর্ষে উঠে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলেন। নিষ্ফল প্রয়াস। লক্ষণীয় কিছুই তাঁর নজরে পড়ল না। রাত হলে পরিস্থিতি নতুনতর রূপ নিল। বুক-কাঁপানো গর্জনের সঙ্গে আগুনের হুঙ্কার ও জমাটবাঁধা কালো ধোঁয়া বাতাসে ভর দিয়ে চলন্ত ধীপে ভাসতে লাগল।

ধীপবাসীরা বিভিন্ন প্রান্তে জমায়েত হয়ে রহস্য সঞ্চারকারী ব্যাপারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে সাধ্যমতো চেষ্টায় মগ্ন হল। কিন্তু এ পর্যন্ত আসল ব্যাপারটার ধারে কাছেও কারো কল্পনা পৌছতে পারল না।

চলন্ত ধীপের এতগুলো মূনঘের উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটতে ম্যালকালির রাজা এবার তৎপর হলেন। তিনি রহস্যটা দ্রুত করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, কোথাও না কোথাও আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত করছে। তারই বিকট আওয়াজ ভেসে আসছে।

হ্যাঁ, রাজার কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই বটে। টোঙ্গা ধীপের এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথা কারোরই অজানা নয়। কাকাতোয়া আর তুফায়ার ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথাও জানা নেই এমন লোক খুব কমই মেলে।

সকাল হল। দিনভর মুহূর্তে বুক কাঁপানো গর্জন আর অগ্নিবৃষ্টি অব্যাহতই রইল। বিকেল চারটের কাছাকাছি ধীপময় নেমে এল জমাটবাঁধা অন্ধকার।

রাত তিনটা বাজল। আবহা অন্ধকারে হারা উদ্দেশ্যে এগোতে এগোতে আচমকা গিয়ে অতিকায় কোনো বস্তুর গায়ে মারল সজোর এক ধাক্কা।

গভর্নর ছুটে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজ নিলেন। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড বিশালায়তন একটা জাহাজের গায়ে ধাক্কা মেরেছে। বহুভাবে সতর্ক করেও জাহাজটাকে রক্ষা করা যায় নি। চলন্ত ধীপের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও লাগে নি। আর এস জাহাজটার যে কী সর্বনাশ হয়েছে তার কিছুই জানা সম্ভব হল না।

রাত গিয়ে আবার সকাল হল। নববর্ষের সকাল।

স্ট্যান্ডার্ড ধীপ থেকে নৌকা নামিয়ে সাগরের বুক জাহাজটাকে বের করার জন্য চিকুনি তত্ত্বাশি চালানো হল। না, সেটার কোনো হিনসই পাওয়া গেল না।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। তবু খোঁজাখুঁজির বিরাম নেই। হঠাৎ দূর সমুদ্রের বুক হাঙ্কা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা গেল। মূহূর্ত কয়েকের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা জাহাজ। চলন্ত ধীপকে লক্ষ করে দুর্বীর গতিতে এগিয়ে আসছে।

এবার ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল, অগ্রসরমান জাহাজটা ব্রিটিশ জাহাজ। ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ।

উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে ধীপবাসীদের রাত কাটল। সকাল হতে না হতেই যুদ্ধজাহাজটা থেকে একটা নৌকা এসে ভিড়ল চলন্ত ধীপের বুক। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মাতব্বরগোছের একজন লোক নৌকা থেকে নেমে ধীপে উঠে এসে বলল, 'আমার নাম কাগুনে টার্নার। জরুরি দরকারে গভর্নরের সঙ্গে এখনই দেখা করতে চাই।'

গভর্নরের মুখোমুখি হতেই কাগুনে এক নিশ্বাসে ইয়া লম্বা একটা মাত্র বাক্য উচ্চারণ করল। দাড়ি, কমা ও যদি চিহ্ন প্রভৃতি বালাই নেই। তিন শো শব্দের সমন্বয়ে তার ব্যবহৃত বাক্যটি গঠিত।

কাগুনের মূল বক্তব্য—গভরত্রে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড একটা ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজকে সমুদ্রে তলিয়ে দিয়েছে। জাহাজটায় আলো থাকা সত্ত্বেও তাকে ধাক্কা মেরেছে। তাই ষাট লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। অনাদায়ে বলপূর্বক ক্ষতির অর্থ আদায় করে নেয়া হবে। হুমকিও দিল।

কাগুনে টার্নারের বক্তব্যকে সামান্যমাত্রও পাত্তা না দিয়েই গভর্নর জানালেন স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডেও পর্যাপ্ত আলো ছিল। কিন্তু আগ্নেয়গিরির ভস্মচূর্ণ চারদিক ছেয়ে রেখেছিল। তাই পরস্পর পরস্পরকে দেখতে পায় নি। অতএব ক্ষতিপূরণের কোনো ব্যাপারই এর মধ্যে আসতে পারে না। সবচেয়ে বড় কথা আইল্যান্ড কোম্পানির নির্দেশ ছাড়া তাঁর পক্ষে কোনোরকম দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতিই দেয়া সম্ভব নয়।

কাগুনে টার্নার বললেন, 'আমার সাফ কথা শুনে রাখুন, আপনাদের চলন্ত ধীপ ভ্রাম্যমাণ যান। এর কোনো নির্দিষ্ট ঠিক ঠিকানা নেই। সমুদ্রের বুক যে-কোনো সময় এটা ভয়ঙ্কর সব দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। আপনার হয়ত জানা আছে, বৃটিশরা গোড়া থেকেই এর বিরুদ্ধাচারণ করে আসছে। আর এও জেনে রাখুন, জাহাজকে ধাক্কা মারলে কোনোই ক্ষমা নেই। তারপর এটাকে কোনোমতেই জাহাজের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাই বলছি কি, ক্ষতিপূরণ না দিলে হাস্যামা বাধবেই।'

গভর্নর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হাস্যামা হুজ্জতির কথায় পাত্তা না দিয়ে কাগুনে টার্নারকে বিদায় দিলেন।

কাগুনে টার্নার রাগে গজগজ করতে করতে চলন্ত ধীপ ছেড়ে নৌকায় উঠল। বেলা পোনে দশটায় স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে লক্ষ্য করে যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দাগা হল। একটা গোলা ছিটকে এসে ধীপের কাছাকাছি সমুদ্রের বুক আছাড় খেয়ে পড়ল।

প্রথম—হ্যাঁ, এই প্রথম ন্যাট কোভারলি আর জেম ট্যান্ডারডন একমত হতে পারলেন। অনন্যোপায় হয়ে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজকে কাগুনে টার্নারকে ডেকে আনা হল। ক্ষতিপূরণের পাই পয়সা পর্যন্ত বুঝে নিয়ে টার্নার সমুদ্রের বুক অদ্রশ্য হয়ে গেলেন। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড এগিয়ে চলল তার নির্দিষ্ট পথে।

পথের দুধারে ছোট বড় বহু দীপকে পাশ কাটিয়ে বহু দীপে থামতে থামতে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড এগিয়ে চলেছে তো চলেইছে। তার এ চলার শেষ কোথায়, কে জানে? একসময় বেশ বড়সড় দীপের গায়ে চলন্ত দীপটা ভিড়ল।

সকাল হল। জলদস্যু স্যারোল গভর্নরের কাছে হাজির হল। নাকে কান্না কান্দতে কান্দতে বলল, 'আমার শতকথানেক মালয়বন্ধু এ-দীপে আটকা পড়ে রয়েছে। কোনোরকমে জানে টিকে রয়েছে। অনুগ্রহ করে তাদের যদি এ দীপে তুলে নেয়ার হুকুম দেন তবে খুবই উপকৃত হব। বিপদগ্রস্ত অসহায় মানুষগুলোর জীবনরক্ষা হতে পারে। তাছাড়া মাত্র পাঁচ সপ্তাহ পরেই তো স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড নিউ হেব্রাইডে অ্যারোম্যানগাতে পৌঁছে যাচ্ছে। বাস, সবাই সেখানে নেমে পড়বে। মাত্র তো কয়েকটা দিনের ব্যাপার—'

গভর্নর তার প্রার্থনাটাকে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করলেন না। তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছেন তবে তুলেই নিন।'

গভর্নর ঘৃণাক্ষরেও ভাবতে পারলেন না, তাঁর এ অনুমতিদানের মাধ্যমে কী সর্বনাশই না করে ফেলেছেন। কুচক্রী জলদস্যু স্যারোলে অচিরেই চলন্ত দীপের বুকে রক্তবন্যা বইয়ে দেয়ার জন্য তলে তলে প্রত্তুতি নিচ্ছে।

টোঙ্গা ট্যাবো দীপে একদিন ভারী মজার একটা ঘটনা ঘটে গেল। আধা জঙ্গলিরা কোমর ধরাখরি করে মনের সুখে নাচের আসর বসিয়েছে। মজার ঠিক বলা চলে না, বরং অত্যাশ্চর্য কাণ্ডটা এবারই ঘটে গেল। নাচ থামিয়ে জঙ্গীদের একজন গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল, 'ট্যাবো—ট্যাবো—ট্যাবো!' বাস, পরমুহূর্তেই জর্ন—এর চেলোটা কেড়ে নিয়ে কয়েকজনের মাথার ওপর দিয়ে একলাফ দিল। তার পরেই 'ট্যাবো—ট্যাবো—ট্যাবো!' রব করে চিল্লাতে চিল্লাতে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

'ট্যাবো' পলিনেশিয়ান শব্দ। এর অর্থ 'পবিত্র বস্তু'। সবার সামনে এর ব্যবহার অসঙ্গত।

বাদ্যযন্ত্র চেলা নিয়ে ভেগে যাবে মামদোবাজি নাকি? জর্ন তার পিছনে ধাওয়া করল। চোখের পলকে সে একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

ক্রোধোন্মত্ত জর্ন গভর্নরের শরণাপন্ন হল। টোঙ্গাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তাব দিল। ইতিহাসে নজির আছে, চেলোর চেয়েও তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর জন্য যুদ্ধ হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে যুদ্ধ না হওয়ারই বা কী কারণ থাকতে পারে?

চলন্ত দীপের কর্তৃপক্ষ চেষ্টাচরিত্র করে জঙ্গলিদের সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করে জর্নকে তার বাদ্যযন্ত্র চেলোটা ফিরিয়ে দিলেন। ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ উভয় পক্ষের বোঝাপড়ার মাধ্যমে এড়ানো গেল।

ব্যাপারটার ফয়সালা কিন্তু এত সহজে হল না। ট্যাবো ভাঙার প্রায়চিত্তবরূপ চলন্ত দীপের কর্তৃপক্ষকে কিছু অনুষ্ঠান করতেই হল। তবে তেমন কিছু নয়। একপাল শুয়োরকে জবাই করে রান্না করা হল। রান্না করা মাংস রাখা হল একটা পাথরভর্তি গর্তে। সবাই মৌজ করে খেল। জঙ্গলিরা খুশিতে ডগমগ হয়ে ট্যাবো তুলে নিল।

এতে জর্ন মোটেই খুশি হতে পারল না।

আইল্যান্ডের গতি এবার ফিজি দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে।

জলদস্যু স্যারোলে তার একশো জন সাগরদেহকে চলন্ত দীপে তুলে নিয়েছে। চলন্ত দীপের দুধারের বন্দর দুটোতে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গির্জার বুড়ো পাদরী একশো জন মালয়ীকে খ্রিস্টান করে দেয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে গভর্নরের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি কিছুতেই মত দিলেন না।

চলন্ত দীপবাসীরা তো ঘৃণাক্ষরেও টের পাচ্ছে না, যাদের খাইয়ে দাইয়ে গায়ে গতরে চর্বি জমিয়ে তুলেছে তারাই বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়ার সুযোগের সন্ধানে রয়েছে। তারা যে প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়ঙ্কর জলদস্যু। মানুষের রক্তের জন্য আট গ্রহের ছোক ছোক করে বেড়ায়।

১৫ জানুয়ারি। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে। বিকেলের দিকে সমুদ্রের বুকে, দক্ষিণ পূর্ব কোণে অতিকায় একটা জাহাজ দেখা গেল। জাহাজের মাথায় পাতাকা না থাকায় কোন দেশের জাহাজ বোঝা গেল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই জাহাজটা উধাও হয়ে গেল।

রাত এগারোটা। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলল। চাঁদের আলো যেটুকু পাওয়া যাচ্ছিল মেঘের দৌলতে তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রাত তিনটে। বেশ কয়েকবার চলন্ত দীপের চারদিক থেকে চাপা গর্জন ভেসে এল।

সকাল হল। শহর জুড়ে আতঙ্কের ছায়া নেমে এল। অত্যাশ্চর্য খবর মুখে মুখে শহরের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠার মতো খবরই বটে।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার মতো ঘটনাই বটে। এ কী অবিস্বাস্য কাণ্ড! মিলিয়ার্ড শহরে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এল কোথেকে। কিন্তু রাতে অন্ধকারে তারা কোথেকে এসে হানা দিল! এমন এক নৃশংস কাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে গেল। তবে কি টোঙ্গা ট্যাবো দীপের গায়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড অবস্থান করার সময়ে দীপ থেকে সাতরে তারা এসে উঠে গিয়েছিল?

অদ্ভুত সব খবর আসতে লাগল। মাঠে ময়দানে নাকি দলে দলে সিংহ, বাঘ, চিতা ও বুনা শুয়োর প্রভৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে অঞ্চলের লোকজন প্রাণভয়ে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল।

মিলিটারি নামিয়ে দেয়া হল।

সবার মনেই একই প্রশ্ন, এত সব হিংস্র জানোয়ার কোথেকে, কীভাবে এসে দীপে জড়ো হয়েছে?

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা নিয়ে দীপের কর্তৃপক্ষ জরুরি সভা ডাকলেন। গভর্নর রীতিমত চিন্তিত। যে করেই হোক যতশীঘ্র সম্ভব এর একটা বিহিত করতেই হবে।

সভার শেষের দিকে এক ফরাসি ভদ্রলোক আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করলেন।

জন্তু জানোয়ারের আসল রহস্যটা হচ্ছে, গতকাল বিকেলে অজানা অচেনা একটা জাহাজের দেখা মিলেছিল। এমনকি তাতে পাতাকাও ছিল না যার সাহায্যে বোঝা যেতে পারত কোন দেশের জাহাজ। সেই গোপনে জন্তু জানোয়ারগুলোকে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে নামিয়ে দিয়ে জাহাজ নিয়ে চম্পট দিয়েছিল।

এ কী রসিকতা, নাকি শত্রুতারই অদ্ভুত একটা পন্থা?

কে? কে এই রহস্যজনক লোক যে চলন্ত দ্বীপটাকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারে ভরে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে? হ্যাঁ, জানা গেছে, তার নামও জানা গেছে। এক ইংরেজ। জন বুল তার নাম। হতচ্ছাড়া ইংরেজটা প্রথম থেকেই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের বিরুদ্ধে কলকাতা নেড়ে চলেছে। এমন সরাসরি শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে। চলন্ত দ্বীপের লোকজন যাতে প্রাণভয়ে দ্বীপ ছেড়ে পালায় সেই অভিসন্ধিতেই এমন কাজটা করেছে।

ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের শত্রুতা আজ প্রথম নয়। ফরাসি বদলোক বললেন—ইংরেজরা ফরাসিদের প্রতি এমন জঘন্য আচরণ আগেও করেছে। তারা ফ্রান্সের হাতে অ্যানটিলসকে তুলে দেয়ার আগে সেখানে অসংখ্য বিষধর সাপ ছেড়ে দিয়েছিল। যেখানে আগ কোনদিন সাপের চিহ্নও দেখা যায় নি আজ সেখানে বিষধর সাপ কিলবিল করেছে।

সকাল হতে জলদস্যু স্যারোল তার সাগরেনদের নিয়ে দুটো কুমিরকে ঘায়েল করার জন্য আদা জল খেয়ে লেগে পড়ল। অনেক তল্লাশি চালিয়ে দুটো জায়গায় বারোটা ইয়া পেত্রাই কুমিরের দেখা মিলল।

দ্বীপবাসীরা চারদিকে বন্দুক হাতে ছুটোছুটি করতে লাগল। হিংস্র জন্তুগুলো মারাও পড়ল কম না।

ওয়াল্টার একটা বাঘের কবলে পড়ে জান খোয়াতে বসেছিল।

জেম ট্যাক্সারডন জখমি ক্রোধোন্মত্ত বাঘটাকে লক্ষ করে গুলি ছুড়ল। বাস, চোখের পলকে সেটা তীব্র আত্ননাদ করে শূন্যে এক চক্কর খেল। তারপর মাটিতে পড়ে কয়েকবার আছাড়ি পিছাড়ি করে শেষপর্যন্ত এলিয়ে পড়ল।

কেবল বাঘটাই যে ঘায়েল হল তাই নয়, অভাবনীয় একটা ফলও হল। ন্যাট কোভারলি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসায় তার বাবা জেম ট্যাক্সারডনের হাত দুটো চেপে ধরে বারবার ধন্যবাদ জানাতে লাগল। আর এ ঘটনার মাধ্যমেই উভয় পরিবারের দর্শিদিনের বিবাদ বিসম্বাদের অবসান ঘটে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

বিলিয়ার্ড শহরের যাদুঘরে মরা বাঘটার পেটে খড় ভরে সাজিয়ে রাখা হল।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কেরো সাগরের বুকের ওপর দিয়ে ধীরমস্থর গতিতে চলতে লাগল। কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা। একদিন ন্যাট কোভারলির বাড়ি জেম ট্যাক্সারডন হাজির হলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে তার কাছে রূপসী ডায়নাকে পুত্রবধূ করে ঘরে নেয়ার প্রস্তাব রাখলেন। ন্যাট কোভারলিও নিজের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করতে গিয়ে বললেন, ‘আমারও ইচ্ছা আপনার ছেলে ওয়াল্টারকে জামাই হিসেবে পাই।’

উভয়ে সোয়ান্সে উভয়ের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো। বিয়ের পাওনাগঞ্জর কথাবার্তাও পাকা হয়ে গেল। ওয়াল্টার ও ডায়না উভয়েই বিশ ডলার করে পাবে। গভর্নরও এতে কম খুশি হলেন না।

ছাব্বিশে জানুয়ারি। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড ভিটি-লেবু দ্বীপের গায়ে থামল। বাদ্যকর চারজন দ্বীপে নামল। পিঙ্কিনাটের অনেক দিনের শখ সত্যিকারের মানুষথেকো জঙ্গলি দেখে জীবন সার্থক করবে। তারা দ্বীপের কাঠ লতা পাতার ঝুপড়িগুলোতে তন্নতন্ন করে মানুষথেকো হিংস্র মানুষগুলোর খোঁজ করল। কিন্তু ঝুপড়িগুলো চামচিকে, আরশোলা, উইপোকা আর মশা, মাছির ঘাঁটি। এরকম ব্যাপার দেখে তারা চোঁ-চোঁ দৌড় দিল।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে পাহাড় নেই বলে চলন্ত দ্বীপের বাসিন্দারা ফিজি দ্বীপপুঞ্জের গায়ে পৌঁছেই হুড়মুড় করে পাহাড় দেখতে ছুটল। ট্যাক্সারডন আর কোভারলি পরিবারও ব্যস্ত হয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড থেকে নেমে গেলেন। ওয়াল্টার আর ডায়নাও নতুন কিছু দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করার জন্য সবার পিছু নিল। ব্যাপার দেখে ক্যালিষ্টার মুনবার বিষণ্ণ মনে ভাবতে লাগল, ‘সবাই নতুনতর কিছুর জন্য পাগল।’ বহুৎ আচ্ছা—স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে একটা পাহাড় বসিয়ে সবার সাধ পূরণ করব।

নিছকই একটা সাধারণ পাহাড় বা পর্বত নয়। আগ্নেয়পর্বত। বাইরের দিকটা গড়া হবে অ্যান্টিমিনিয়াম আর ইস্পাত দিয়ে। ভেতরে রেখে দেয়া হবে তুবড়ি বাজির মশলা।

জলদস্যু স্যারোল ফিজি দ্বীপের পাহাড় দেখতে গেল না। সাকরেনদের নিয়ে চলন্ত দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো দেখার কাজ সেরে নেয়ার জন্য ব্যস্ত রইল। বাদ্যকর চারজনের সঙ্গেও তার কম ভাব জমে নি।

গভর্নর বাদ্যকরদের ইচ্ছা পূরণ করতে একটা বৈদ্যুতিক লঞ্চের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেটায় চেপে তারা রেওয়ান নদী ধরে ফিজি দ্বীপপুঞ্জের ভেতরের দিকটা ভালো করে দেখে নেয়ার জন্য রওনা হল।

কিছুদূর যাওয়ার পর লঞ্চের ফিজি পাইলট নদীর ধারে একটা গাছের দিকে বাদ্যকরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করল। সেদিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, ‘গাছের গুঁড়িতে ওই যে কতগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছেন, ওগুলো কী বলতে পারেন? গুঁড়ির গায়ে মানুষ বেঁধে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটার চিহ্ন ওগুলো। যতগুলো দাগ দেখতে পাচ্ছেন ততগুলো মানুষকে কুপিয়ে কাটা হয়েছে। গাছের তলাতেই তাদের ঝলসে খাওয়া হয়েছে। এখানকার জঙ্গলি নরহাদকেরা গরু, শুয়ার বা ভেড়ার মাংসের চেয়ে মানুষের মাংসই বেশি তৃপ্তি করে খায়। তাদের এক সর্দার ছিল রা আন্দ্রেনুদ। সে সারা জীবনে নাকি আট শো বাইশটা মানুষ জবাই করে মাংস খেয়েছিল। কী নৃশংস ব্যাপার। শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।’

বেলা দশটার কাছাকাছি নাইলিলি গির্জার পাদরির সঙ্গে বাদ্যকরদের দেখা হল। পাদরি সাহেব তাদের পইপই করে সতর্ক করে দিলেন। অসভ্য জঙ্গলিদের বিশ্বাস করলে তাদের হাতে নির্ঘাত জান খোয়াতে হবে।

দুপুরের দিকে সবাই হৈ হৈ করে টেমপু গা দেখতে গেল। গ্রামের সর্দার আগভুকদের দেখেই হেঁচট খেয়ে পড়ার জোগাড় হল। গায়ের লোক ধারে কাছে যত ছিল সবাই ধুমধুম করে শুয়ে পড়ল। এ না করলে সর্দারকে নাকি অসম্মান করা হবে।

ফিজি পাইলট আগভুকদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে সর্দারকে বলল, ‘পরদেশী মেহমানরা তোমাদের গাঁ দেখতে এসেছেন। এঁদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবকিছু দেখালে খুশি হবে।’

সর্দার ওজর আপত্তি করল না। আবার তেমন উৎসাহও প্রদর্শনও করল না। শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে তার ভিলমাট্র উৎসাহও নেই। নিঃশব্দে নিজের কামরায় ঢুকে গেল।

তার চোখ মুখের ভাব দেখে মনে হল, আগন্তুকদের দেখে সে মোটেই খুশি নয়।

এবার পিঙ্কিটা বাদে বাকি তিন বাদ্যকর ভাঙা একটা মন্দির দেখতে এগিয়ে গেল। একা গেল পাশের কলাবাগানটা দেখতে। বাস, সে আর ফিরল না।

বাদ্যকর তিনজন পিঙ্কিটাটির অপেক্ষায় কলাবাগানের ধারকাছ দিয়ে বেশ কয়েকবার চক্রের মেরে মেরে হন্যে হয়ে তার খোঁজ করল। না, তার কোনো হদিশই পেল না। অনন্যোপায় হয়ে তারা অস্থির হয়ে গভর্নরের শরণাপন্ন হল। ব্যাপারটা তার কানে দিল। গভর্নর জঙ্গলিরা সর্দারকে ব্যাপারটা জানালেন। সর্দারজি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে অসহায়ভাবে জানাল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সর্দার বটে; কিন্তু টেমপু গায়ের জঙ্গলি আমাকে পান্ডা দেয় না। হুকুম টুকুম গ্রহাই করে না।'

গভর্নরের হুকুমে কর্নেল স্ট্রাইট এবার সৈন্যসামান্য নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। বীরদর্পে সৈন্যরা সামান্য এগোতেই কলাগাছের ফাঁক দিয়ে আঙন দেখতে পেল। হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে যেতেই তারা ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি হল।

তারা ভয়ালদর্শন জঙ্গলি-সর্দারকে বাকবাকি কুড়ল কাঁধে এগিয়ে যেতে দেখল। গাছের তলায় লকলকে আঙন জুড়ে। তাতে কড়াই চাপানো। টগবগ করে তেল ফুটেছে।

উলঙ্গ পিঙ্কিটা গাছের সঙ্গে পিঠমোড়া করে বাঁধা। অসহায় দৃষ্টি মেলে কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে দিকে তাকিয়ে। শুধু শুধু গুলি খরচ করতে হল না। সৈন্যরা তীব্র হুঙ্কার ছাড়তেই জঙ্গলিরা মুহূর্তের মধ্যেই পড়ি কি মরি করে প্রাণ নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

কর্নেল স্ট্রাইট পিঙ্কিটাটিকে উদ্ধার করে সৈন্য সামন্তসহ স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে ফিরে এল। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড আবার সমুদ্রের বুকে ভেসে চলল। এবার তার গন্তব্যস্থল হেবাইড দ্বীপ।

জলদস্যু স্যারোলের দীর্ঘদিনের বাসনা এবার পূর্ণ প্রাপ্ত হতে চলেছে। এদিকে ওয়াল্টার ডায়নার বিয়ের তারিখ পাকা হয়ে গেছে। জাহাজে করে হীরা জহরতের গহনাপত্র থেকে শুরু করে পৃথিবীর সেরা সেরা দানসামগ্রী আসবে।

১০ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও দৃষ্টিভ্রমের অবসান ঘটিয়ে অর্ধনমিত পতাকাসহ একটা জাহাজ এসে ভিড়ল চলন্ত দ্বীপের বন্দরে। পতাকাটিকে অর্ধনমিত দেখে সবাই প্রমাদ শুনল, জাহাজটা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর কোনো দুঃসংবাদ বয়ে এনেছে।

এক পদস্থ অফিসার জাহাজ থেকে নেমে সোজা টাউন হলে গিয়ে উঠলেন। কাউন্সিলের সদস্যদের জরুরি তলব দিলেন।

ঘড়িতে তখন আটটা বিশ বাজে। আগন্তুক অফিসার ভদ্রলোক গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন, 'আপনারা শুনুন, স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছে। পাওনাদারদের যাবতীয় প্রাপ্য পরিশোধ করার জন্য লিকুইডেটর বসেছে। আমার নাম উইলিয়াম পোমেরে। আমি লিকুইডেটর হয়ে এখানে হাজির হয়েছি। মূল্যবান সম্পদ যা কিছু আছে সব বিক্রিবাটা করে দেনার অর্থ শোধ করার জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।'

ব্যাপারটা ফয়সালা হতে দেরি হল না। রাত নয়টা সাতচল্লিশ মিনিটে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড কোম্পানির মালিকানা হস্তান্তর হয়ে গেল। ন্যাট কোভারলির এবং জেম ট্যান্ডারডন নগদ অর্থের বিনিময়ে আইল্যান্ড কোম্পানির মালিকানা ক্রয় করে নিল। উইলিয়াম পোমেরে প্রাপ্য অর্থ টাকে শুজ আবার জাহাজে উঠল।

চলন্ত দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে চলল। এতদিনে সত্যিকারের স্বাধীনতায় শান্তি সুখ পাওয়া গেল।

ম্যাডেলিন উপসাগরের সঙ্গে একমাত্র ভূবোতাবের মাধ্যমে এতদিন যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছিল। এখন সেটাকে কেটে যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হল।

দ্বীপের অধিবাসীরা পঞ্চমুখে কোভারলি ও ট্যান্ডারডন পরিবারের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

এত আনন্দের মধ্যেও কোভারলি ও ট্যান্ডারডন পরিবারের মানুষগুলোর মনে শান্তি বা স্বস্তি কিছুই নেই। গহনাপাতি ও বহুমূল্য আসবাবপত্র নিয়ে যে জাহাজটার আসার কথা ছিল তার কোনো পাত্তাই নেই। এদিকে বিয়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে।

১৯ ফেব্রুয়ারি। তখন সকাল নয়টা বাজে। বহু আকাজক্ষিত জাহাজটা চলন্ত দ্বীপের বন্দরে নোঙর করল। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল। দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী দ্বীপবাসী বন্দরে ছুটে এল বিয়ের দানসামগ্রী দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করার প্রত্যাশা নিয়ে।

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের মালিকানা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বহু পরিবর্তন ঘটল। জলদস্যু স্যারোলের ওপর চলন্ত দ্বীপটাকে চালাবার দায়িত্ব দেয়া হল। এখানকার সমুদ্রের চরিত্র তার নবদর্পণে।

চলন্ত দ্বীপটা ধীর-মস্থুর গতিতে, সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে নাচতে নাচতে দুলকি চালে এগিয়ে চলেছে। দ্বীপের চলার গতি কমিয়ে দেয়ার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি যে নেই তাও নয়। ওয়াল্টার আর ডায়নার বিয়ের তারিখ সাতাশে ফেব্রুয়ারি। বিয়েতে সবাই যাতে চুটিয়ে আনন্দ স্মৃতি করতে পারে সে জন্য পুলিশ বিভাগের পর্যন্ত ছুটি থাকবে। জলদস্যু স্যারোলের শিষ্যরা তখন আদম উল্লাসে মেতে উঠবে। দ্বীপের মানুষগুলোকে কচুকাটা করে রক্তনদী বইয়ে দেবে। অনেকদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটেবে, পূর্ণ হবে সাধ।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ তুমুল হৈ হুটগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ করল—বন্দরের দিক থেকে আগুাজটা ভেসে আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই শোভাযাত্রার পাশ দিয়ে বিকট আত্ননাদ করতে করতে জখম, রক্তাপ্লুত কয়েকজন অফিসার ও জোয়ান দৌড়ে গেল।

গভর্নর উদ্দেশ্যে উৎকর্ষাটুকু কোনোরকমে সামলে নিয়ে কমান্ডারের সিমকোকে জরুরি তলব পাঠালেন। কমান্ডারের হৃদয় হয়ে উঠে এসে গভর্নরকে আকস্মিক রাজস্বের কারণে সঙ্কটে জানাতে গিয়ে বলল, 'স্যার, তিন চার হাজার ভয়ঙ্কর প্রকৃতির দ্বীপবাসী চলন্ত দ্বীপে উঠে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ভয়ঙ্কর কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। নাটের গুরু কাণ্ডে স্যারোল। তারই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হয়েছে।'

ভয়ঙ্কর সে জাহাজডুবির পর জলদস্যু স্যারোল 'ক্যাণ্ডেন স্যারোল' পরিচয় দিয়ে তার শিষ্যদের নিয়ে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন সে ডাকাতি করে তাদের ধন সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য বন্যাহীন তাণ্ডব চালাচ্ছে। বেইমানি আর কাকে বলে।

জলদস্যু স্যারোলের ব্যাপার-সাপারে মিলিয়ার্ড শহরের ধনকুবেররা যারপরনাই বিম্বিত। নিউ হেব্রাইড দ্বীপপুঞ্জের আধা জঙ্গলিদের মধ্যে দক্ষিণের চেয়ে উত্তরের লোকগুলো অপেক্ষাকৃত সভ্য। দক্ষিণের লোকগুলোর মধ্যে বিবেক মানবিকতা তিমলাম্রণ নেই।

দশ হাজার লোক অ্যারোম্যানগোতো বাস করে। এদের অর্ধেক খ্রিস্টান। বাকিরাই আতঙ্কের কারণ। জলদস্যু স্যারোল অমানুষ ও নিমর্ম প্রকৃতির এসব লোকদের কজা করে কৌশলে দল তৈরি করেছে। ধনসম্পদের লোভে দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে নির্মম নিষ্ঠুর প্রকৃতির অসভ্যগুলো জলদস্যু স্যারোলের দলে নাম লিখিয়েছিল। দ্বীপপুঞ্জের উত্তরাঞ্চলের মধ্য আদি দ্বীপে আঠারো হাজার অসভ্য জঙ্গলি বাস করত। কয়েদিদের খলসানো মাংসের ওপর তাদের খুবই লোভ।

চলন্ত দ্বীপটা অ্যারোম্যানগোর কাছাকাছি যেতেই জলদস্যু স্যারোল তার শিষ্যদের তৈরি হতে বলেছিল। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। বর্বার জঙ্গলিগুলো বর্শা আর বিষমখা তীর নিয়ে মিলিয়ার্ড শহরের বুকে তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ব্লাইডার বন্দুকও সঙ্গে রয়েছে। সেখানকার দশ হাজার মানুষকে খতম করতে মোটেই সময় লাগবে না।

বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের সবাই মিলিয়ার্ড শহরে এসে ভিড় জমিয়েছে। বাইরে থেকে কেউ যাতে শহরে ঢুকতে না পারে, তাই শহরের প্রধান ফটকটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কর্নেল স্ট্র্যাট পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ইতিমধ্যেই সৈন্যদের তৈরি করে নিয়েছেন। ম্যালকালির রাজাও তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

এরই মধ্যে বিদ্যুৎ কারখানার কর্মচারীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে যাওয়ায় টাউন হলসহ পুরো শহরটাই অন্ধকার যক্ষপূরীতে পরিণত হয়ে গেছে। জলদস্যু স্যারোল খুবই অভিজ্ঞ। গোড়াতেই ইঞ্জিনঘর বিকল করে দিয়েছে। এবার স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড যদি নিজে থেকেই এরোম্যানগোর দিকে ভেসে যায় তবে তো জলদস্যু স্যারোলের ভাগ্য খুলে যাবে।

সবে ভোরের আলো ফুটেতে শুরু করেছে। ভোর চারটে, কমান্ডারের সিমকো সেনাদল নিয়ে তৈরি হয়ে সার্ভে অবস্থান করছে। হঠাৎ হামলা শুরু হয়ে গেল। ঝাঁকঝাঁক গুলি বিনিময় হতে লাগল। জেম ট্যাঙ্কারডন আহত হল। ম্যালকালির রাজা জলদস্যু স্যারোলকে ঘায়েল করার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হলেন।

শেষ লড়াই। টাউন হল থেকে এবার লড়াই। কমান্ডারের সিমকো লড়াই চালাতে লাগলেন। জলদস্যু স্যারোল দু-ঘণ্টা লড়াই চালিয়েও টাউন হলে ঢুকতে পারল না। ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের গুলির মধ্যেও তার গায়ে সামান্য কাঁটার আঁচড়ও লাগল না।

এবার উন্মাদার মতো জঙ্গলিরা টাউনহলের দরজাগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উদ্ভূত পরিস্থিতি ম্যালকালির রাজার মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তুলল। তিনি আচমকা দরজা খুলে গুলি আর বর্শা বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বরাত তাকে জলদস্যু ঘায়েল হয়েছে। বিকট আত্নবাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। আহত বাঘের মতো আছাড়পিছাড়ি করতে লাগল রক্তাশ্রুত দেহটা।

ফাস্ট এভিনিউর দিক থেকে ঘন ঘন বন্দুক আর কামানের গর্জন বেসে আসতে লাগল। গোলন্দাজরা কি তবে জঙ্গলিদের তাড়া করেছে?

হঠাৎ ক্যালিষ্টার মুনবারের গলা শোনা গেল, 'ওই-ওই বর্বার শয়তান জঙ্গলিগুলো পালাচ্ছে! পালাচ্ছে—ওই পালাচ্ছে! হাতভাতেগুলো জান নিয়ে পালাচ্ছে!'

বেকায়দার পড়ে কাণ্ডাঙ্গান হারিয়ে ফেলেছে। এখন তাদের একমাত্র চিন্তা জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচা। জলদস্যু স্যারোলের শিষ্যরা ইঞ্জিন বিকল করে দেয়ার পর স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ড শ্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে এরোম্যানগোর দিকে না গিয়ে ফরাসি উপনিবেশের দিকে ধেয়ে চলল।

চলন্ত দ্বীপটা ফরাসি অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি পৌঁছতেই হাজারখানেক সশস্ত্র রক্ষী হুড়মুড় করে চলন্তদ্বীপে উঠে এল। মাত্র ঘণ্টা দু-একের মধ্যেই অসভ্য জঙ্গলিরা ঝাড়বংশে খতম হয়ে গেল। নতুনতর সঙ্কটজনক এক পরিস্থিতির উদ্ভব হল। নির্বাচনের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের নতুন কর্ণধার নিযুক্ত করতে হবে।

চলন্ত দ্বীপ স্যান্ডউইচ দ্বীপের গায়ে কদিন অবস্থান করার পর ৩ মার্চ আবার স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে যাত্রা শুরু করল। এদিকে গভর্নর নির্বাচনের কাজ জোর কদমে চলতে লাগল। গভর্নরের পদের জন্য প্রার্থী মাত্র দুজন। তাদের একজন ন্যাট কোভারলি আর দ্বিতীয়জন জেম ট্যাঙ্কারডন। তারা ছাড়া আর আছেই বা কে?

স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডে ভোটের উত্তেজনা ক্রমে বেড়ে চলল। উভয় পক্ষই জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে গভর্নরের পদটা লাভ করার জন্য। রেঘাণেও কম হতে লাগল না।

চলন্ত দ্বীপের পরিস্থিতি যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই অবিস্বাস্য খবরটা শুনে দ্বীপবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ওয়াস্টার আর ডায়নার বিয়ে ভেঙে গেছে। এতদূর এগিয়েও তাদের বাবা দুম করে এমন একটা অবিস্বাস্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। ব্যাপারটায় দ্বীপের মানুষগুলো মোটেই খুশি হতে পারল না।

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দ্বীপের উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলল। স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে তারা ম্যালকালির রাজাকে গভর্নরের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন।

অনেক উত্তেজনা, রেষারেষির পর শেষপর্যন্ত ১৫ মার্চ কোনোরকমে গভর্নর নির্বাচনের পাট চুকানো গেল। ভোটদান পর্ব মিটল বটে। কিন্তু সমস্যার কিনারা হল না। উভয়েই সমানসংখ্যক ভোট পেলেন। অতএব পুরো ব্যাপারটাই বাতিল হয়ে গেল।

পিঙ্কিনাট অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার অদ্ভুত একটা ফিকির বাতলে দিল 'স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে দু-টুকরো করে দিলেই তো ল্যাটা চুক যায়। তার কথা শুনে সবাই তো হেসে অস্থির। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল তার কথাই বাস্তব রূপ নিতে চলেছে।

এল ১৯ মার্চ। কমাডোর সিমকো একই সঙ্গে দুটো টেলিফোন পেল। সে স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে মহুরগতিতে ম্যানেলিন উপসাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ টেলিফোনে ট্যাক্সারডনের হুকুম হল চলন্ত দ্বীপকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যেতে। তার ইচ্ছা, চলন্ত দ্বীপকে ব্যবসায় খাটানোর চেষ্টা করবে। কোভারলির আদেশ, একে গিলবার্ট আইল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে।

কমাডোর সিমকো ম্যালকালির রাজার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে মতামত উভয়কে জানিয়ে দিল, তাদের কারো হুকুম তামিল করাই তার পক্ষে সম্ভব নয়। চলন্ত দ্বীপ যেদিকে চলেছে, সেদিকেই যাবে।

ব্যাস, ঘটনাক্রমের মধ্যে কোনো দিক থেকেই আর কোনো উদ্ধাব্য এল না। কর্তব্যাক্তিরা যেন হুকুম তামিল না হওয়ার জন্য থমকে গেছে।

ট্যাক্সারডন এবং কোভারলি লারবোর্ড বন্দর আর স্টারবোর্ড বন্দরের ইঞ্জিনিয়ারদের হুকুম দিল চলন্ত আইল্যান্ডটাকে দুদিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে। ব্যাস, দ্বিধাবিভক্ত আইল্যান্ডের টুকরো দুটো দুদিকে ছোটার চেষ্টা করল। আচমকা হেঁচকা টান সামলাতে না পেরে সে দুটো চাকার মত বনবন করে চক্রর মারতে লাগল।

শহরের লোকজন কিছুই টের পেল না, কী কেলেক্সারী ব্যাপার ঘটতে চলেছে। সাতদিন অনবরত চক্রর মারতে মারতে ইয়া বড় বড় নাটবলুগুলো খুলে গেল। লোহার পাতগুলো খুলে গেল। রীতিমত প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড।

বিপদ মাথার ওপরে বুকে ওয়াল্টার ডায়নাকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলেছে।

এত চাপ সহ্য করতে না পেরে লারবোর্ড বন্দরের বয়লারটা বিকট আওয়াজ তুলে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আধখানা দ্বীপে জমাটবাধা অঙ্ককার নেমে এল।

হায়! দু-দুটো ডায়নামো বিকল হয়ে গেছে।

শিরে সংক্রান্তি বুকে বিবাদ বিসম্বাদ ভুলে ন্যাট কোভারলি আর জেম ট্যাক্সারডন জরুরি আলোচনায় বসেছে। প্রাণই যদি না বাঁচে, তবে কে, কার সঙ্গে বিবাদ করবে!

আলোচনার মাধ্যমে তারা স্থির করল, এবার থেকে কমাডোর সিমকোর ওপর দ্বীপের যাবতীয় আর অর্পণ করা হবে। কারিগরদের লাগিয়ে দেয়া হবে বিকল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডকে যত তাড়াতড়ি সম্ভব মেরামত করে কাজ চালাবার উপযোগী করে তোলার জন্য।

৩ এপ্রিল। প্রকৃতি রুদ্ধরূপ ধারণ করল। হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়ে গেল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। কিছু বাড়ি ঘর ধসে পড়ল। কিছু কাত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত। বন্দরের দিকটায় আইল্যান্ডের ওপর আরো একফুট জল উঠে এসেছে। স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের অবস্থা ভুবুঝু হয়ে পড়ছে।

চলন্ত দ্বীপের পরিস্থিতি আরো সঙ্গীন হয়ে পড়ল রাত বারোটার কাছাকাছি। ঝড়ের তাগুব ভয়ঙ্কর রূপ নিল। বিকট আওয়াজ করে স্টিলের কাঠামো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল। চলন্ত দ্বীপের তলদেশ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে পরিষ্কার বোঝা যেতে লাগল স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের বিশালায়তন একটা টুকরো, প্রায় অর্ধেকটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। কাঠামোটো পর্যন্ত টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কাঠামের টুকরোগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে নারী, পুরুষ ও শিশু প্রাণভয়ে আতঁনাদ করতে লাগল।

এমন কয়েকটা ছোট বড় টুকরো ছাড়া স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঝড়ের তাগুব নিশিহ্ন হয়ে গেল। তিন হাজার ধনকুবের বড়সড় একটা টুকরোর ওপর দাঁড়িয়ে অনবরত আতঁনাদ করে চলেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার তো! ওয়াল্টার আর ডায়না কোথায়? তাদের তো কোনো দ্বীপেই দেখা যাচ্ছে না। স্টারবোর্ডের টুকরোগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও দূরে সরে যায় নি। বরং স্টারবোর্ড আবার ফিরে আসছে।

পাকা কারিগর স্টারবোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার। ইতিমধ্যে বিকল হয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতি মেরামত করে সেটাকে নিয়ে এগিয়ে আসছে দুর্দশাগ্রস্ত লোকগুলোকে উদ্ধার করার জন্য।

সমস্যা নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। জায়গা তো মাত্র আধমাইলখানেক। এর মধ্যে এতগুলো লোকের স্থান সঙ্কুলান কী করে সম্ভব? ম্যালকালির রাজার পরামর্শে শেকল দিয়ে বিচ্ছিন্ন টুকরোগুলোকে জুড়ে দেয়া হল।

৫ এপ্রিল সামনে মাটি দেখা গেল। নিউজিল্যান্ডের মাটি।

সবাই আইল্যান্ড দ্বীপে আশ্রয় নিল। ওয়াল্টার তাদের বিয়ের ব্যাপারটাকে আর ঝুলিয়ে রাখতে রাজি নয়। এবার বিনা আড়ম্বরেই ডায়নার সঙ্গে তার বিয়ের পাটটা চুকিয়ে ফেলল। ধনকুবের ন্যাট কোভারলি এবং জেম ট্যাক্সারডন-এর মতো ব্যক্তিদের খুব সামান্য অর্থই স্ট্যান্ডার্ড আইল্যান্ডের ধ্বংসের মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে তাদের যে অগাধ অর্থ সংরক্ষিত রয়েছে তা খরচ করে জীবনের বাকি দিনগুলো সুখ স্বাস্থ্যের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

এবার বাদ্যকর চারজন খুশিমনে গন্তব্যস্থল সানডিয়াগোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

স্টিম হাউস

দেয়ালে সাঁটা পোষ্টারটাকে এক হেঁচকা টানে ছিড়ে ফেলে দিয়ে বিচিত্র চরিত্রের এক ফেরারি-ফকির ভিড়ের মধ্যে মিশে মুহূর্তে একেবারে বে-পাক্সা হয়ে গেল।

গাট্রাগোস্তা তার দৈহিক গঠন। গায়ে হাতির শক্তি ধরে। বয়স বছর চল্লিশেক। তাকে হঠাৎ করে চেনার একটাই উপায়, বাঁ-হাতের একটা আঙুল অনুপস্থিত। কাটা গেছে। এরকম বেশ কিছু সংখ্যক পোষ্টার ঔরঙ্গাবাদের সব কটা পথের ধারে ধারে স্টেটে দেওয়া হয়েছে। পথের বাঁকে বাঁকে ঢোল পিটিয়ে পোষ্টারের বক্তব্য জনগণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। ব্যবস্থার কোনোই ত্রুটি নেই। নানা সাহেবকে যে বা-যারা ধরিয়ে দিতে পারবে, মোটা পুরস্কার প্রদান করা হবে। জীবিত বা মৃত যে কোনো অবস্থাতে তাকে ধরিয়ে দিতে পারলেই এ পুরস্কার দেওয়া হবে।

পোষ্টারের বক্তব্য নিয়ে হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে এবং নদীর ঘাটে সর্বত্র একই আলোচনা চলতে লাগল। পুরস্কারের অর্থের গোড়টাই আসল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আঠারো শ' সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর পুরো দশ দশটা বছর কেটে গেল। সিপাহী বিদ্রোহের কর্তৃদ্বার নাকি নেপালে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল। এখন ঔরঙ্গাবাদেই এসে মাথা গুঁজেছে, নানাসাহেব। ইংরেজদের চোখে ধূলো দিয়ে তিনি অশরীরী ছায়ামূর্তির মতোই এ-বিশাল উপমহাদেশের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে দিবা চলাফেরা করছেন। শত্রু নিপাত করাই বিদেশী শাসকের একান্ত ইচ্ছা। বলা তো যায় না, চীনের সঙ্গে জোট বেঁধে হয়তো আবার দেশের বুকো বিদ্রোহের জোয়ার বইয়ে দিতেও পারে।

পথ চলতে গিয়ে কিছু লোককে পথের ধারে ভিড় করে কথাবার্তা বলতে দেখে ফকির থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, কে একজন হুঁহু-তথি করে কি সব বলছে। দীর্ঘদিন সে নানা সাহেবের শিবিরে বন্দি ছিল। সে সুবাদে নানা সাহেব তার পরিচিত। এখন বাদলা নেবার সুযোগ এসেছে। যে করেই হোক, নানা সাহেবকে ধরে ইংরেজদের হাতে সে তুলে দেবেই।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন মস্তব্য করল, নানা সাহেব খতম হয়ে গেছে। আঙুল-কাটা একটা মৃতদেহও পাওয়া গেছে। তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল বদলা নিতে ইচ্ছুক সেই লোকটা—না, অবশ্যই না। একটা মৃতদেহের আঙুল কেটে বাদ দিয়ে পুলিশের দরবারে আনা হয়েছিল। নানা সাহেব জীবিত, অবশ্যই জীবিত। প্রমাণ সে করবেই করবে।

কথাটা কানে যেতেই সচকিত হয়ে ফকির বাট করে তার কাটা-আঙুল সমেত হাতটাকে আলখাল্লার ভেতরে চালান দিয়ে দিলেন। ক্রোধে ফেটে পড়ার জোগাড় হল। তবে লুকোবার চেষ্টা না করে লোকটার প্রতি সর্বক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। দেখতে পেলেন, সে নদীর ধারে গিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়ল। ওইটাই তার মাথাগোজার অবলম্বন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই ফকির হঠাৎ তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটাকে তার বুকো গাঁথে দিলেন। মুহূর্তে সব শেষ হয়ে গেল। তার দেহ থেকে আত্মাটা বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে সে ফকিরকে চিনতে পারল।

ফকির এবার শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য তৎপর হলেন। শহরের প্রধান ফটকে পাহারা জোরদার করা হয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একটা বটগাছের খুরি বেয়ে তিনি দ্রুত প্রাচীরের ওপর উঠে গেলেন। প্রায় ফুট ত্রিশেক তলায় জমিন। গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে তিনি এগুতে লাগলেন।

অকস্মাৎ পর পর কয়েকটা বন্দুকের গুলি এসে গাছের ডালটাকে ভেঙে দিল। ডালটা সমেত এত উঁচু থেকে আছাড় খেয়ে জমিনে পড়েও তিনি মোটেই আহত হলেন না। অত্যন্ত এক কায়দায় মাটিতে পড়েই ইংরেজ সৈন্যদের শিবিরের পাশ দিয়ে কায়দা-কসরৎ করে এগিয়ে গিয়ে জমিটাবাড়া অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে দিলেন। ঔরঙ্গাবাদ ছেড়ে দূর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন।

মসিয়ে মস্কের ডাইরির ছেড়া পাতায় লেখা রয়েছে—ইজিনিয়ার ব্যাক্স-এর সাহচর্যে কয়েকদিন কাটিয়ে পল্লভব করে কাটানোর উদ্দেশ্যেই আমার ভারতে আসা। প্যারিসে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তারপর ভারতে রেলপথ স্থাপনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে সে এদেশে চলে আসেন।

আঠারো শ' সাতষষ্ঠিতে আমার ভারতে আসার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাঁর সাহচর্যে কয়েকদিন থেকে চুটিয়ে ঘুরে বেড়াব আর মজলিশ করে কাটিয়ে দেব। আর ভারতের পুরনো শহরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখার সাধও কম ছিল না। আমি ভারতে বেড়াতে আসছি শুনে ব্যাক্স তো খুশিতে একেবারে ডগমগ। কলকাতায় পা দিতেই তার কয়েকজন অভিনুহুদয় বন্ধুর পরিচয় হয়ে গেল। তাঁদের মধ্যে সবার আগে কর্নেল মুনরো আর ক্যাপ্টেন হুড-এর নাম করতে হয়।

কলকাতার একান্ত নিরিবিলা এক ফিরিঙ্গি পাড়ায় কর্নেল মুনরোর বাসস্থান।

তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ম্যাকনিল তার সমবয়স্ক। তাঁর সর্বস্বপ্নের সঙ্গী। একই সঙ্গে সেনা বিভাগ থেকে অবসর নিয়ে একই বাড়িতে বাস করছে। এক সঙ্গেই যুদ্ধও করেছে। কাজ থেকে অবসর নেবার পর আর নিজের দেশে চলে যেতে কারোরই মন সরে নি। তবে বিশেষ এক কারণে সে দেশে ফেরে নি। স্যার হেকটর মুনরো নামে তার এক নিষ্ঠুর ও রগচটা পূর্বসূরী এক শ' বছর আগে ভারতে এসেছিলেন। তিনি এক বিদ্রোহ দমন করার সময় কামান দেগে জনা ত্রিশেক বিদ্রোহীকে ঘায়েল করেন।

কর্নেল মুনরো তাঁর উত্তরসূরী। সিপাহী বিদ্রোহে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তুমুল যুদ্ধ করেন। কিন্তু কানপুরে এসে তাঁকে স্ত্রীকে হারাতে হয়। বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করে। তারপর থেকেই নানাসাহেবের নামটা কানে যেতেই

কর্নেল মুনরোর মাথায় রক্ত উঠে যায়। তল্লাশী চালিয়ে নানাসাহেবকে বের করে তাঁকে নিজ হাতে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেনাবিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। নানাসাহেব সবার চোখে ধুলো দিয়ে দিবি টিকে রইলেন। শেষমেষ একদিন খবর এল নানাসাহেব নেপালে খুন হয়েছেন। বাস, এবার তার কলিজা ঠাণ্ডা হল। এতেও তার রাগ কমল না। নানাসাহেব বা সিপাহী বিদ্রোহের নাম শুনেলেই তিনি দপ করে তেলে বেত্তনে জ্বলে ওঠেন। তাই কেউ ভুলেও তাঁর সামনে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে না। শুধু কি এ-ই? নানাসাহেব যে বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছেন এ খবরটাও তাঁর কাছে খুবই সত্যকর্তার সঙ্গে গোপন রাখা হয়েছে।

এমন চরিত্রের কর্নেল মুনরোর কলকাতার বাসস্থলে এক সন্ধ্যায় আমরা, ক্যাপ্টেন হুড, কর্নেল মুনরো, ব্যাক্স এবং আমি ছুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছি। ক্যাপ্টেন হুড কম বয়স্ক। বানু শিকারী। বাঘ মারায় একেবারে সিদ্ধহস্ত। আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু দেশভ্রমণ। কথা প্রসঙ্গে কর্নেল মুনরো বললেন— 'নিজের বাড়িতে অবস্থান করে দেশভ্রমণের আনন্দ কিন্তু অন্য কোনো কিছুতেই নেই।'

একেবারেই উদ্ভট মন্তব্য। যারপরনাই আজব প্রস্তাব। উপস্থিত সবাই সররে হেসে তাঁর উদ্ভট প্রস্তাবটাকে উপভোগ করলেন। বাড়িতে অবস্থান করেই দেশভ্রমণ? বাড়িটাকে কি গরু, নাকি ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যাবে?

ব্যাক্স একজন ঘাঘু ও অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। বলল, 'এর চেয়ে বাম্পিয় হাতি জুড়ে দিলে কেমন হয়? তাতে বহুদিক থেকে সুবিধে। ঋণ্যাবার সমস্যা নেই, স্নান করানোর হাস্যামাও পোহাতে হবে না, অন্যান্য যত্নাতির তো বালাই-ই নেই। জঙ্গল জানোয়ারের ভয়েও কুকুড়ে থাকতে হবে না। যন্ত্রটাকে সচল রাখতে কেবলমাত্র কিছু তেল আর কয়লা বা কাঠ, এ তো ভারতের জঙ্গল থেকেই প্রচুর জোগাড় হয়ে যাবে।'

হুড ভাঙ্সল্যের সঙ্গে হেসে বললেন— 'বাম্পিয় হাতি। সে না হয় আর পঞ্চাশ বছর পরে—'
ব্যাক্স বলল— 'খ্যৎ, পঞ্চাশ বছর বলছেন কি মশাই! আমি বাম্প-হাতি তৈরি করেই ফেলেছি। এবার ভাবছি, চলন্ত বাড়িতে বসেই ভারত-দর্শনে বেরকরোই। কর্নেল মুনরোকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়া যাবে কিনা জানতে চাইলেন।'

নেহাৎই সহজ সরল শাস্ত্র সৌম্য প্রকৃতির নিরীহ গোবেচারার, ফকিরের ভেকধারী দুর্ধর্ষ নানাসাহেব রাত্রির অন্ধকারে সবার নজর এগিয়ে এগিয়ে চলেছেন। মারাঠা রাজপরিবারের জলন্ত-অগ্নিশিখা, অকুতোভয় নানাসাহেব। শিবাজীর মতো তাঁর চোখেও স্বপ্ন জড়িয়ে রয়েছে। বিদ্রোহকে এবার কেবলমাত্র সিপাহীদের গম্ভীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ভারতের সব শ্রেণীর মানুষ এতে কাঁধে কাঁধ মেলাবে। সমগ্র ভারতে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবার অত্যাশ্রয় বাসনাকে চরিতার্থ করতেই তো নানাসাহেব নেপাল থেকে গা-চাকা দিয়ে বোম্বাইয়ে হাজির হয়েছেন। দেশের রাজা আর সিপাহীদেরকে পরদেশী জানোয়ারগুলো নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে, তাদের নিজের হাতে খতম না করা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। কর্নেল মুনরো তাদেরই দলের। তার বুকের রক্ত হাত ধুতে নানাসাহেব কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করতেও দ্বিধা করবেন না।

নানাসাহেব এক সময় রাত্রির অন্ধকারে ইলোরার পর্বতগুহায় হাজির হলেন। গভীর জঙ্গলে জনমানবহীন পরিত্যক্ত এক মন্দির। মুখে দুটো আঙুল চালান দিয়ে সজোরে সিটি বাজাতেই নানাসাহেব-এর ভাই ও একান্ত সহচর দূর থেকে আলোর নিশানা দিলেন। দ্রুতপায়ে ছুটে কাছে এলেন।

গুহায় বসে দু ভাই অনুচ্চকণ্ঠে পরামর্শ সেরে নিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে উভয়ে জঙ্গলের ধারে হাজির হলেন। সেখানে নানাসাহেব-এর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কালাগনি ঘোড়া নিয়ে অধীর-প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

উষ্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা হাজির হলেন অজান্তার প্রসিদ্ধ পার্বত্য উপত্যকায়। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়ামাত্র কালো ছায়ামূর্তির মতো বহু মানুষ অস্ত্রপাতি সহ গাছের ডাল থেকে ঝপাঝপ লাফিয়ে মাটিতে পড়ল।

নানাসাহেব গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিলেন— 'চল। এগিয়ে চল।' তাদের সংখ্যা বেশি না হলেও তিনি নিশ্চিত যে, হাসিমুখে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে অকুতোভয় মানুষগুলো কুণ্ঠিত নয়।

মিসিয়ে মক্কের ডাইরির ছেঁড়া পাতায় লেখা রয়েছে— যন্ত্রহাতিটানা গাড়িটাকে সদর রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে দেখে কলকাতার কৌতুহলসম্পন্ন মানুষগুলো রাস্তার দু-ধারে ভিড় করে বিম্বিত হল। অদ্ভুত ও অতিকায় এক যন্ত্রহাতি দিবি দু-দুটো বাড়িকে টেনে নিয়ে চলেছে। অল্প সময়ের মধ্যেই চলন্ত বাড়ি দুটো কলকাতার সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে চলল ফরাসি-শাসিত নগর চন্দননগর অভিমুখে।

যন্ত্র-হাতিটার গঠনপ্রণালী সত্যই অদ্ভুত। দোদুল্যমান গুঁড়টা দিয়ে অনর্গল গলগলিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা গুঁড়ের আকৃতির বিশিষ্ট একটা চিমনি মাত্র। এর বিশালায়তন পিঠে গম্বুজাকৃতি আকৃতিতে গড়া কাচের জানালাযুক্ত একটা ঘরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বসে যন্ত্র-হাতির চালক শকটটাকে চালিয়ে নিয়ে যায়। যন্ত্র-হাতি চালাতে মাহুত লাগবে কেন? কাঁচের হাওয়া ঘরে বসে বোতাম টেপা মাত্র হাতির পেটে রাখা যন্ত্রপাতি সক্রিয় হয়ে কাজ করতে লেগে যাবে। কয়লা বা কাঠ জ্বলবে, বয়লারের জল টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করবে, বাষ্প বিকট আওয়াজ তুলে করতলে পালনে রত হবে, পিস্টন সশব্দে চলতে থাকবে। বাস, এবার বয়লারের স্ট্রট বাষ্প সিলিভারে গিয়ে ভিড় জমাবে। এর ষ্টিম ইঞ্জিন কম শক্তিশালী নয়। প্রায় দেড়শ' অশ্বশক্তি তো হবেই। উদ্ভূত বাষ্প যতই চাপ প্রয়োগ করুক না কেন ইম্পাতের পাতে তৈরি শকটটার ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা কিছুমাত্রও নেই।

বাষ্প ইঞ্জিনের টানে চাকা লাগানো, শেকলে বাঁধা বাড়ি দুটো দিবি গুড়গুড় করে এগিয়ে যাবে। দু-দুটো বাড়ির গঠন বৈচিত্র্য অনেকটা মন্দিরের মতো। সামনে ও পিছনে, উভয় দিকে দুটো চওড়া বারান্দা। যাত্রীরা অনায়াসে এখানে দাঁড়িয়ে পথের ধারের দৃশ্য দিবি প্রত্যক্ষ করতে পারে।

ব্যাক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে অবশ্যই কৃতিত্বের দাবিদার। কেবলমাত্র ডাঙাতেই নয় যন্ত্র-হাতিটা জলেও দিবি চলতে পারে। জলে নামলে ষ্টিমারের প্রপেলারের মতো এর পা-চাকা বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি দুটো সমেত যন্ত্র-

হাতিটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আর তার নিচে যেন নৌকো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ওপর নির্ভর করে অনায়াসে জলের ওপর ভাসতে পারবে।

ইঞ্জিনিয়ার ব্যাক্সস এমন একটা শকট তৈরি করতে উৎসাহী হলেন। কেবলমাত্র খেয়ালের শিকার হয়েই কি তিনি এমন একটা পরিকল্পনাকে মাথা থেকে বের করেছেন? না, এটা নিছকই একটা খেয়ালের ব্যাপার অবশ্যই নয়। পরিকল্পনাটা ঠিক তাঁর মাথা থেকে বেরিয়ে নি। ভূটানের রাজা মাথা খাটিয়ে এটাকে বের করেছেন। তার ঝাঁক চেপেছিল যন্ত্র-হাতিতে চেপে শিকার করবেন। এদিক ব্যাক্সস-ও নতুনত্ব কিছু করার জন্য সর্বদা অস্থির থাকেন। ভূটানের রাজামশাইয়ের কাছ থেকে নির্দেশটা পেয়ে তিনি যেন বর্তে গেলেন। ব্যস, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাক্সস এবার আদাজল খেয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লেগে গেলেন যন্ত্র-হাতিটার কাজ সম্পন্ন করতে। বারবার কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও তিনি হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন নি। বরং অধিকতর নিষ্ঠা, উদ্যোগ ও উৎসাহ স্বপ্ন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে ব্রতী হয়েছেন।

যন্ত্র-হাতিটা তৈরির কাজ সম্পন্ন হতে না হতেই ভূটানরাজ দেহ রাখলেন। ব্যস, রাজপুত্ররা অপয়া হাতিটাকে রাজবাড়িতে ঢোকাতে দিলেন না। ফলে ইঞ্জিনিয়ার ব্যাক্সস খুবই সামান্য অর্থে কর্নেল মুনরোর নামে যন্ত্র হাতিটাকে কিনে নেন। এখন কর্নেলই এর একমাত্র সত্ত্বাধিকারী।

কর্নেল মুনরো গাড়িটাকে দেখে পত্নী-বিয়োগের শোকও দিবা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন।

যন্ত্র-হাতিটা চলতে শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে কর্নেল মুনরো সামনের বাড়িটার চড়লেন। আমি, হুড আর ব্যাক্সস তাঁকে সঙ্গদান করার জন্য একই বাড়িতে চড়ে বসলাম।

স্টার বসল হাওয়াঘরে। ইঞ্জিন চালানোর দায়িত্ব তার ওপরই বর্তাল।

দ্বিতীয় অর্থাৎ পিছনের বাড়িটার চড়লেন সার্জেন্ট ম্যাকনিল। তাকে দেখে ভালো করার জন্য সেখানে রইল ভারতীয় ফায়ারম্যান ক্যালোথ। আর ফরাসি পাচক প্যারজার্ড ও কর্নেল মুনরোর পরিচারক গৌমি তো রইলই।

যন্ত্র-হাতিটার চমৎকার এক নামকরণ করা হয়েছে—‘বেহেমথ’। তখনতেও ভালো লাগে। নামটা সত্যিই শ্রুতিমধুর। নিজের বাড়িতে অবস্থানকালে যেটুকু আরাম বা সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় বেহেমথ-এ চেপে ভ্রমণে বেরিয়েও তার কোনো অংশে কম আরাম উপভোগ হয় না। খাবার ঘর, শোবার ঘর আর লাইব্রেরি কোনোটারই অভাব ছিল না। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা ভাবতেও পারি নি কোনোদিন। খাওয়াদাওয়া, ঘুমনো আর বইপড়া প্রভৃতি সবই চলছে অবস্থায় দিব্যি চলতে লাগল।

আমরাও আয়েশের মধ্যে গুড় গুড় করে চলতে চলতে হাজির হলাম বর্ধমান শহরে।

যন্ত্র-হাতিটা আমাদের নিয়ে আরো কিছুটা এগুতেই কর্নেল মুনরো মুখে কুলুপ এঁটে দিলেন। সার্জেন্ট ম্যাকনিলও ধীরে ধীরে কথা বলা কমিয়ে গম্বীর হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না। দশ বছর আগেকার স্মৃতি ক্যাপ্টেন মুনরো ও তার পরিচারকের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে। সিপাহী বিদ্রোহ যেখানেই সবচেয়ে ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল বেহেমথের গতি সেদিকেই।

বেহেমথ গয়া শহরে পৌছতেই আমরা উদ্ভূত একটা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলাম। উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, বেহেমথ-এর সামনে, পথের ওপর দলে দলে সাধুসন্তরা শুয়ে পড়েছে। পূণ্যার্থীরা হত্যা দিয়েছে। তাদের এরকম আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করে দিল হুড। ইতিপূর্বে তারা যে হাতি দেখেছে তাদের তুলনায় বেহেমথ চেড়ে চেড়ে বড়। তাই তাদের বিশ্বাস, এমন অতিকায় হাতি নির্ধাৎ স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। তাই তো পূণ্যলাভের প্রত্যাশায় হত্যা দিয়েছে।

ব্যাপারটা ব্যাক্সস-এর মধ্যে আভঙ্কের সঞ্চার করল। দীর্ঘ সময় এভাবে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকলেই সমস্যা, বেহেমথকে স্থবিরের মতো দাঁড়িয়েই থাকতে হবে। আবার সাধুসন্তদের গায়ে আঘাত লাগলেও প্রমাদ ঘটে যাবে। এরকম চিন্তা করে তিনি ফায়ারম্যান ক্যালোথকে নির্দেশ দিলেন, বয়লারে ঠেসে ঠেসে কাঠ দিয়ে বেশি পরিমাণে বাষ্প তৈরি করতে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাষ্পের পরিমাণ এক বেড়ে গেল যে, যন্ত্র-হাতিটা থর থর করে কাঁপতে লাগল। খুবই সতর্কতার সঙ্গে বেহেমথকে বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবে কারো গায়ে একটা কাঁটার আঁচড়ও লাগলে চলবে না। লাগলে কারো গর্দনে আর মুণ্ড থাকবে না।

ব্যাক্সস অকস্মাৎ গলা ছেড়ে চিল্লাচিল্লি জুড়ে দিল—‘সর! সর! তাড়াতাড়ি সরে যাও! নিশ্চল প্রয়াস! তার নির্দেশ কারো কর্ণে গেছে বলেও মনে হল না। এবার বেহেমথ তীব্র গর্জন করে সিটি দিল। প্রপেলার বিকট আওয়াজ তুলল। বনবন করে চাকা ঘুরল, গুঁড় দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরলো।

ফায়দা যেটুকু হল সাধুসন্তরা জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মথিত করল। হায় ঈশ্বর! এরা যে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে আত্মহত্যা দিতে চায়।

সাধুসন্তদের কাণ্ড দেখে হুড একেবারে ক্ষেপে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়ে বললেন—‘হতচ্ছাড়াদের কী অদ্ভুত খেয়াল। স্বর্গের হাতি তো, পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে সশরীরে স্বর্গে যেতে চায়!’

ব্যাক্সস অনন্যোপায় হয়ে বেহেমথ-এর পেটের তলদেশের অতিরিক্ত নলগুলো দিয়ে গলগল করে গরম বাষ্প ছেড়ে দিল। কাজ হয়েছে। বোধহয় তারা ভেবেছে, হাতির পায়ের তলায় জান দিলে পূণ্য সঞ্চয় ও স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতির সম্ভাবনা থাকলেও গরম বাষ্পে শরীরটা ঝলসে গেলে কিছুমাত্রও ফায়দা হবার নয়। এই গরম-বাষ্পে অতিষ্ঠ হয়ে সবাই গুড়গুড় করে উঠে, যে যেদিকে পারল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে লাগল। বেহেমথ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। তীব্র গতিতে ছুটে চলল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একেবারে সাধুবাবাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল।

কাশীতে পৌছেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, আমাদের পিছনে টিকটিকি লেগেছে। ঐটুলির মতো আমাদের পিছনে ধাওয়া করছে। ব্যাপারটা হল—কাশী ভারতের প্রাচীন নগর। দেবতার-পীঠস্থান। বহু পুরনো মন্দির, মসজিদ,

কাশীর পবিত্র গঙ্গার ঘাট, আর অলিগলি ঘুরে দেখতে গিয়ে সময় যে কি করে কেটে গেল টেরই পেলাম না। সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে নিয়ে কর্নেল মুনরো গঙ্গার পাড়ে হাওয়া খেতে ব্যস্ত, পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হুড় চলে গেলেন। অতএব আমি অনন্যোপায় হয়ে ব্যাঙ্কসকে নিয়ে শহর থেকে বেড়াতে লাগলাম।

একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বার কয়েক কর্নেল মুনরোর নামটা জোরে জোরেই উচ্চারণ করে ফেলেছিলাম। ব্যস, তাঁর নামটা কানে যেতেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা লোককে হঠাৎ সচকিত হয়ে পড়তে লক্ষ্য করলাম। চেহারা ও বেশভূষায় জানান দিচ্ছিল, লোকটা বাড়লি।

অদ্ভুত লোকটার রহস্যভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। কেন সে অকস্মাৎ এমন সচকিত হয়ে উঠল? কি তার উদ্দেশ্য? কর্নেল মুনরোর হিন্দস কেন জানতে চায়? কেনই বা সে আমাদের পিছন নিয়েছে?

ব্যাপারটা ব্যাঙ্কস-এরও নজর এড়ায়নি। তবে তাকে ভালো করে দেখার সুযোগ আমাদের হয়নি। লম্বা লম্বা পায়ে ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে সে ডিঙিতে উঠে পড়ল। মুহূর্তে নৌকা আর ডিঙির ভিড়ে হাকিস হয়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামার মুখে আমরা বেহেমথ-এ ফিরে এলাম। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে সতর্ক করে দিলাম। লোকটার উদ্দেশ্য কি তা-ই বা কে বলতে পারে? সবচেয়ে বড় কথা, কর্নেল মুনরোর নাম শুনে লোকটা কেন এমন করে আঁতকে উঠেছিল?

বেহেমথ এলাহাবাদে পৌছল। এখানে আর একটা ঘটনার মুখোমুখি আমাদের হতে হল।

আমরা প্রত্যেকে, যে যার মতো ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। কর্নেল মুনরো সার্জেন্ট ম্যাকনিলকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। ফিরে এসে দেখি, তাঁর চোখে-মুখে গাঞ্জীরের ছাপ। মুখের হাসি একেবারেই নির্বাসিত। খুব দরকারি কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে খুবই সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দায় সারেন।

খাবার টেবিল থেকে উঠে কর্নেল মুনরো একটা ব্যাপার দেখাবেন বলে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে পথের ধারে অবস্থিত পিলারের গায়ে সাঁটা একটা পোষ্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তাতে দেখা ইংরেজ সরকার নানাসাহেব-এর মাথার জন্য প্রচুর ইনাম ঘোষণা করেছেন।

পোষ্টারটা দেখে আমরা আঁতকে উঠি নি দেখে তিনি ধরে নিলে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমরা অনেক আগে থেকেই ওয়াকিববাল। আর আমরা সতর্কতার সঙ্গে তাঁর কাছে তা গোপন রেখেছি। বার বার জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে স্বীকার না করে পারলাম না।

আমার কথা শুনে কর্নেল মুনরোর মধ্যে অভাবনীয় গাঞ্জীর নেমে এল। এক সময় গাঞ্জীর স্বরেই বললেন—‘ম্যাকনিল গভর্নরের সঙ্গে কথা বলতে গেছেন। সত্য সত্যই নানাসাহেব বোম্বাই এসেছে কিনা, অবস্থান করছে কিনা এবং যদি সেখানে থাকে তবে আজ রাত্রের ট্রেন ধরেই আমি যেন বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।’

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ম্যাকনিল এসে একটা সংবাদপত্র বাড়িয়ে ধরে বললেন—‘বোম্বাইয়ে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। গভর্নর এটা আমাকে পড়তে বলেছেন।

আমরা সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলাতেই দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে—‘ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে সাতপুরার অদূরবর্তী কোনো স্থানে আঙুলকাটা নানাসাহেব প্রাণ দিয়েছেন।’

আমাদের বাপ্পিয় শকট বেহেমথ কানপুরে হাজির হল। কর্নেল মুনরো পুরো দিনটা দুটো ভগ্নস্থূপের আশপাশ দিয়ে বার বার চক্কর মেরে কাটিয়ে দিলেন। তাদের একটায় তার মৃত স্ত্রীর শৈশব কেটেছিল। আর অন্যটাকে সিপাইরা ইংরেজ শিশু আর মহিলাদের কয়েদ করে রেখেছিল। কয়দিন পর কর্নেল মুনরো কানপুরে এসেই কয়েদখানায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর আর শাওড়ির পাস্তা লাগান। সেখানে তাঁদের পেলেন না।

তখন থেকে প্রতিহিংসার আগুন বুকে নিয়ে কর্নেল মুনরো হন্যে হয়ে নানাসাহেবের তল্লাশ করছেন। বদলা তাঁকে নিতেই হবে। আমরা কোনোদিকম অস্থিরচিও মুনরোকে বেহেমথ-এ ফিরিয়ে নিয়ে আসি। মনস্থ করলাম, যত শীঘ্র সম্ভব কানপুর ছেড়ে চলে যাব।

হুড় সবার নিষেধ অগ্রাহ্য করে গৌমিকে আর কালৌথকে নিয়ে জঙ্গলে গেল শিকার করতে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল তবু হুড় তাদের নিয়ে বেহেমথে ফিরল না। এদিকে মুহূর্তের মধ্যে জমাটবাঁধা কালোমেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। দেখতে দেখতে প্রচণ্ড ঝড় উঠল। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বুকে নিয়ে আমরা বারাদায় জঙ্গলের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝড়ের বেগ ক্রমশ বাড়তে বাড়তে তা ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিল। কড়াং কাড়ং শব্দে বাজ পড়তে লাগল। একটা তো প্রায় আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথকে ছুঁড়ে কাছের একটা গাছের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি, দাঁউ দাঁউ করে আগুন জ্বলছে। গাছটায় আগুন লেগেছে। ক্রমে সে আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের রূপ নিল। একটু বাদেই আতঙ্কে শিউরে উঠতে হল। ঝড়ের তাগবে দাবানল ক্রমেই বেহেমথ-এর দিকে ধেয়ে আসছে।

আমরা প্রমাদ গুণলাম কোথায় গেল হুড় আর তার সহযাত্রীরা। তাদের ফিরে আসার নামটিও নেই। এদিকে দাবানলের অগ্রগতি লক্ষ্য করে ব্যাঙ্কস হাওয়া ঘরে গেল। ঠাঁরও সেখানে ঢুকল। স্থির হল, ঘড়ি ধরে তিন মিনিট হুড় ও অন্যান্যদের জন্য অপেক্ষা করা হবে। এর মধ্যে দাবানল বেহেমথ অবধি ধেয়ে এলেও পালিয়ে যেতে অসুবিধা হবে না।

ব্যাঙ্কস তীব্র স্বরে ঘন ঘন সিটি দিল। না, কারো ফেরার নামটিও নেই। হাতির চোখে লাগানো সার্চ লাইটের আলো ছড়িয়ে দেওয়া হল। না, তবু হুড় ফিরল না।

ব্যাঙ্কস বাপ্প ছাড়ার জন্য বোতামের দিকে হাত বাড়াল। এমন সময় দেখা গেল, উজ্জান্তের মতো ছুটতে ছুটতে হুড় ও অন্য দুজন ঝোড়ো কাকের মতো ধুকতে ধুকতে বেহেমথ-এর দিকে আসছে।

বেহেমথ থেকে তীব্রস্বরে সিটি না বাজালে অবশ্যই তাদের আর ফিরে পাওয়া যেত না।

এবার প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে বেহেমথ ছুটন্ত আগুনের বিপরীত দিকে ধেয়ে চলল। বেহেমথ ছুটছে, দাবানল তাকে তাড়া করছে। যন্ত্র-হাতি বেহেমথ আর দাবানলের দৌড় প্রতিযোগিতা যেন পুরোদমে চলেছে।

এবার একটা ব্যাপার আমার মনের কোণে ঊঁকি দিল। একটা বাজ যেন আমাদের যন্ত্র-হাতিটার দিকে ওপরেই পড়ল। কিন্তু তারপর? তারপর সেটার পরিণতি কি হল? ব্যাপারটা সহজেই পরিষ্কার হয়ে গেল। যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর কান দুটো, এমনকি পুরো দেহটাই ইম্পাতের পাত দিয়ে মোড়া ছিল। ইম্পাতের সেই কান দুটো বাজটাকে টেনে নিয়ে ইম্পাতের দেহের মাধ্যমে ঝট করে মাটিতে চালান করে দিয়েছে।

এক সময় হিমেল বাতাস সর্বাস্থে লেগে মনে পুলকের সঞ্চার করল। বুঝলাম, বেহেমথ জঙ্গল ছেড়ে, জুলন্ত ফার্নেসের এলাকা পেরিয়ে এসেছে। এবারের মতো কোনোরকমে আমাদের পিতৃদত্ত প্রাণটা রক্ষা পেয়ে গেল।

বেহেমথ রেওয়ার দিকে যাওয়ার সময় রোমহর্ষক হলেও মজার একটা ঘটনা ঘটে গেল। যন্ত্র-হাতিটার ওপরে অতর্কিতে একটা চিতাবাঘ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল। আদতে হাতি মনে করে বারবার তার গায়ে নখরযুক্ত থাবা মারতে লাগল। বার কয়েক তীব্র আক্রোশে থাবা মেরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ইম্পাতের কান ধরে ঝুলে পড়ে তীব্র আক্রোশে রীতিমত ফুঁসতে লাগল।

শিকারপ্রিয় হুড নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল। ঠিক তখনই ফস্ক একটা বন্দুক এনে আমার হাতে তুলে দিল। ব্যস, চোখের পলকে দিলাম বন্দুকের ঘোড়া টিপে। তীব্র আক্রোশে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হিংস্র জানোয়ারটা জঙ্গলের দিকে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হুড নিজেকে সামাল দিতে না পেরে বন্দুক হাতে দুম করে বেহেমথ থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল। জানোয়ারটার তল্লাশে জঙ্গলের দিকে ছুটে লাগল।

ফস্কই সর্বনাশটা করেছে। বন্দুকের গুলি না ঢুকিয়ে ছররা পুরে দিয়েছিল। ছররায় কি আর বাঘকে ঘায়েল করা যায়।

এবারই রোমাঞ্চকর-মজার অথচ ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। পাচক জানাল ভাড়ার শূন্য। খাদ্য আহরণ করতে হুড এবার আমাকে ও গৌমিকে নিয়ে বন্দুক হাতে জঙ্গলে ঢুকল। শিকার করে মাংস না নিয়ে এলে এতগুলো প্রাণীকে উপোষ করে কাটাতে হবে।

পাখি মারার ছররা নিয়ে তিন জোড়া চোখ গাছের ডালে ডালে চক্কর মারতে লাগল। একটা ঝোপের ধারে যেতেই একেবারে বাঘের মুখোমুখি হতে হল। ইয়া দশাসই তার চেহারা। তার হিংস্র চোখের মণি দুটো দিয়ে আক্রোশ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু কোনোরকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে দুলকি চালে হুড-এর দিকে এগুতে লাগল।

উপায়ন্তর না দেখে হুড হাতের ছররা ভরা বন্দুকটাকে বাঘটার দিকে উঁচিয়ে ধরল। তার উদ্দেশ্য বাঘটার চোখ দুটোকে ঘায়েল করে দেওয়া। নইলে ছররা দিয়ে ভাগ কাবু করা সম্ভব নয়।

হ্যাঁ, হুড-এর হায়া আর কলিজা অস্বাভাবিক শক্ত বটে। বাঘ আর তার মাঝখানে আর মাত্র হাত তিনেকের দূরত্ব। কোনোরকম কাঁপুনি তো দূরের ব্যাপার, সে বরং বাঘটার দিকে এক পা এগিয়েই গেল। বাঘটা হয়তো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হুড-এর সঙ্গে একটু রসিকতা করতে চাইল।

ব্যস, আর দেরি নয়, হুড বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল। আরো একবার। ইয়া দশাসই চেহারাটা নিয়ে বিকট হুঙ্কার তুলে বাঘটা বার কয়েক শূন্য চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি করতে লাগল। ব্যাপারটা ঝট করে হুড-এর মাথায় গেল না। পরমুহূর্তেই সে সোপানসে চিল্লিয়ে উঠল—বরাং ভালো যে ফস্ক তুল করে ছররার পরিবর্তে সিসার গুলি পুরে দিয়েছিল। নইলে আমাদের আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না।

হুড ফস্ককে একটা সোনার গিনি দিয়ে বলল—‘আগে একটা ভুল করেছিলে, আজ আবার করলে আর একটা ভুল। দুটো ভুলের জন্য এটা তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হল।’

যন্ত্র-হাতি বেহেমথ এবার নেপালের দিকে ধেয়ে চলল। পথের দু-ধারে এখন পাহাড় আর জঙ্গলে বিচিত্র সমাবেশ, এমন দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যাবলি ভারত ছাড়া অন্য কোনো দেশে আশাই করা যায় না।

পার্বতা বনভূমির ভেতর দিয়ে চলতে গিয়ে আর একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। জঙ্গল থেকে ইয়া পেলাই তিনটে রক্ত-মাংসে গড়া হাতি লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে এসে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

পথের ধারে এক সরাইখানায় এক বণিক মাথা ঝুঁজেছে। গুরু সিং নামে এক রাজপুত্রও সরাইখানায় বিশ্রাম গ্রহণের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। হাতি, ঘোড়া ও উট ছাড়াও কয়েকজন পার্শ্বচর তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

এক সময় কয়েকজন সজ্জা ব্যক্তি বেহেমথ-এর গা-ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। আত্মত্তরী রাজকুমার গুরু সিং-ও তাদের সঙ্গে রয়েছেন। ইংরেজ-টিংরেজকেও পাল্লা দেয় না। তিনি যন্ত্র-হাতি আর ভুটানের রাজার বিচিত্র খেলালের ব্যাপার নিয়ে রসিকতা করতে লাগলেন। প্রাণবন্ত হাতির মতো অমিত শক্তি যখন বেহেমথ ধরে না, তখন অহেতুক ধাতুর পাত আর কলকাতা জুড়ে জুড়ে এমন অতিকায় একটা যন্ত্র-হাতি সৃষ্টির প্রয়োজন কি ছিল?

আত্মত্তরী রাজপুত্রের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়ে ব্যাঙ্কস বলল—‘জ্যন্ত, রক্তমাংসে গড়া হাতিকে কুপোকাং করার হিংস্র যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর অবশ্যই আছে!’

ব্যস, আর দেবি নয়, আত্মত্তরী রাজপুত্র ঝট করে বাজি ধরে বসলেন। কর্ণেল মুনরোও বাজিতে মত দিয়ে বসলেন।

পাহাড় সমান তিনটে হাতিকে ঘটনাস্থলে হাজির করা হল। ব্যস, ঠেলাধাক্কা শুরু হয়ে গেল। ব্যাঙ্কস ব্রেক কষে বেহেমথকে মাটি কামড়ে ধরার ব্যবস্থা করল। রাজপুত্রের অমিত শক্তির আধার হাতি তিনটে বেহেমথকে আছাড় মারা বা কাৎ করে ফেলে দেওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্য নড়াতে পর্যন্ত পারল না। হাতি তিনটে যেন ক্ষেপে গিয়ে বিকট স্বরে ডাকাডাকি করতে করতে দদামদ আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। বৃথা হয়রানি।

বেহেমথ এবার সক্রিয় হয়ে উঠল। হঠাৎ ধাক্কা খাওয়ায় টাল সামলাতে না পেরে পাহাড়ের মতো দুটো হাতি হুমড়ি

খেয়ে পথের ওপর পড়ে গিয়ে অসহায়ভাবে কাৎরাতে লাগল। রাজপুত্র গুরু সিং চোখের ওপর এ দৃশ্য দেখতে না পেয়ে ইয়ার দোস্তদের নিয়ে সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। রাজাকে পকেট থেকে কড়কড়ে নোট বের করে কর্নেল মুনরোকে বাজির টাকা মেটাতে হল। কর্নেল টাকাগুলো পকেটে না ঢুকিয়ে রাজকুমারের পার্শ্বদলের দিকে বকশিশস্বরূপ ছুঁড়ে দিয়ে হনহন করে বেহেমথ-এর দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেহেমথ আবার সচল হল। আমরা ধবলগিরির পাদদেশে হাজির হলাম। সামনে নেপালের সীমানা, গভীর পার্বত্য বনভূমি। নানাসাহেবকে ধরাই একমাত্র লক্ষ্য।

মঁসিয়ে মক্কের ডাইরির বক্তব্য এখানেই শেষ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাত্রির জমটবাধা অন্ধকারে ঘোড়া হাঁকিয়ে নানাসাহেব-এর সঙ্গে যে পাগলিটা সাতপুরা পর্বতের দিকে যাচ্ছিল, কে সে? তাঁর অনুজ বালাজি রাও আর ভৃত্য কালাগনিও সঙ্গে ছিল। নানাসাহেব যাঁর সঙ্গে ইলোরা পর্বতের গুহায় গিয়ে দেখা করেছিলেন, তিনিই বালাজি রাও।

তীব্র বেগে সারা রাত্রি ঘোড়া হাঁকিয়ে নানাসাহেব বিক্ষয় পর্বতের নিরালা-নিরাপদ আশ্রয়ে হাজির হলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভের সঞ্চার করে আবার বিদ্রোহের আশুন জ্বালিয়ে তোলা।

শেবেমেশ ভূপালে এসে পথের ধারে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মিছিল দেখতে গিয়ে এক অকুতোভয় দুর্ধর্ষ প্রকৃতির বাঙালির দেখা পেলাম। কর্নেল মুনরো যে কাশীতে অবস্থান করছিলেন সে গোপন খবরই সে বয়ে এনেছে। নানাসাহেব উত্তেজনায ক্ষেপে বাঘের মতো হয়ে উঠেছেন। কর্নেল মুনরোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন। কালাগনিকে পাঠিয়ে দিলেন, ছলে-বলে কৌশলে কর্নেল মুনরোর দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্য।

নানাসাহেব লুকিয়ে, নিজেকে সামলে-সুমলে অনুগতদের নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছোট্ট একটা নদীর পাড়ে পৌছতেই হঠাৎ বন্দুক গর্জে উঠল। ইংরেজ সৈন্য ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়তে লাগল। মুহূর্তে কয়েকজন বিকট আত্ননাদ করে রক্তপ্লুত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। অন্যান্যরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একজন গলা ছেড়ে ইংরেজ সৈন্যদের উদ্দেশ্যে তর্জনগর্জন করতে লাগল।

দুজন ইংরেজ সৈন্য নানাসাহেবকে চিনিয়ে দিল।

এমন সময় ঝোপের ভেতর থেকে ঝট করে পাগলি বেরিয়ে এল। কেউ তার প্রকৃত পরিচয় জানে না। তার অতীত-জীবন কেমন ছিল, সে যে আজ জুলন্ত একটা মশাল হাতে করে মাঠে-ময়দানে, ঝোপেঝাড়ে ছুটে বেড়ায়? কেন? কেন সে অনবরত নানাসাহেব-এর নাম করতে করতে ছুটে চলেছে তো চলেছেই?

পাগলি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পথের ধারে এলিয়ে পড়ে থাকা প্রাণহীন দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে? ব্যস্তহাতে তাঁর বুকের রক্ত আঙুলে করে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে মেখে নিল। পরমুহূর্তেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গভীর জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই সে চোখের আড়ালে চলে গেল।

স্থানীয় অধিবাসীরা তার চমৎকার ও মানানসই একটা নামকরণ করল—‘চলমান অগ্নিশিখা।’

আবার মঁসিয়ে মক্কের ডাইরির পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ধবলগিরির পার্বত্য বনে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ দাঁড়িয়ে পড়ল। অদ্ভুত একটা ব্যাপার নজরে পড়ল। যে বেহেমথকে এতদিন পর্বতপ্রমাণ মনে হত আজ হিমালয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সামান্য একটা মাছি বলে মনে হল। কর্নেল মুনরো উভয়ের দিকে চোখের মণি দুটো মুহূর্তের জন্য বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন—‘মনে হচ্ছে, গির্জার গায়ে বুঝি মাছি বসেছে।’

চমৎকার—চমৎকার উপমা! সৃষ্টিকর্তার নিজের হাতে সৃষ্ট পর্বতমালা যেন তাঁরই উপাসনাগার। তার পাশে কর্দর বেহেমথ, নিছক একটা মাছির মতোই বটে।

একনাগড়ে দুমাস চলার পর বেহেমথ এই প্রথম বিশ্রামের জন্য দাঁড়িয়েছে। এর আগে মাঝে-মাঝে দাঁড়ালেও বড় জোর ঘণ্টা দু-এর জন্য। রাএর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ব্যাক্সস এবার হুড়কে শিকারের কাজ মিটিয়ে আসতে বলল।

কলকাতা থেকে যাত্রা করার পর কলকজাগুলোর সঙ্গে আর তেলের সম্পর্ক ঘটেনি। এখন স্টার আর কলৌথ-এর ওপর সে দায়িত্ব বর্তাল। অন্য সবাই শিকারে বা বেড়াতে, যার যেখানে খুশি যেতে পারে।

হুড় আর ফল্ল বাঘ শিকারের প্রসঙ্গ নিয়ে জোর আলোচনা করতে লাগল। ফল্ল বলল—‘এবার তবে আমাদের আটচল্লিশ নম্বর বাঘটাকে ঘায়েল করতে পারব।’

জঙ্গলে গিয়ে বাঘের পিছনে ধাওয়া করার জন্য তাদের যেন আর তর সইছে না। তাদের অগ্রহে আমরা বন্দুক নিয়ে ঝাপাঝপ বেহেমথ থেকে নেমে গেলাম।

গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আমাদের আচমকা দাঁড়িয়ে পড়তেই হল। গাছেল স্থলকায় কিছু কাণ্ড সাজিয়ে ঠিক যেন মাচার মতো একটা বস্তু গড়ে তোলা হয়েছে। হাতলের মতো লম্বা একটা গুঁড়ি ছাদ থেকে নিচের দিকে নেমে এসেছে। মাচাটার ছাদে আর হাতলের মাথায় শক্ত লতা জড়িয়ে রাখা হয়েছে।

হুড়কে জঙ্গলের পোকাও বলা চলে। অতি সন্তর্পণে পা চালিয়ে কাছে যেতেই ব্যাক্সস সরবে হেসে বলল—‘আরে এই জানোয়ার ধরার খাঁচাকল। ইঁদুর ধরার ফাঁদের কায়দায় তৈরি। ওই দেখ, ভেতরে লতার এক প্রান্তে খাবার বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যপ্রান্তে পাখর দিয়ে ওজন বুলিয়ে দেওয়া আছে। খাবার খেতে গিয়ে কাঠের দণ্ডে টান পড়লেই হুড়কোট পড়ে গিয়ে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ব্যস, জানোয়ার বাবাজি ফাঁদে আটকে গিয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে থাকবে।’

সেটা আমরাও বুঝতে পারলাম এবং নিজেদের বোকামির জন্য না হেসে পারলাম না। ইঁদুর ধরার ফাঁদেরই মতো একটা বড়সড় রূপ।

ফাঁদের দরজাটা বন্ধ দেখলাম। ভেতরে কোনো জন্তু জানোয়ার আটকা পড়েছে কি না দেখার জন্য আমাদের কৌতূহল হল। গৌমি লাফিয়ে মাচাকুতি বকুটার মাথায় উঠে পড়ল। ফাঁদটার দৈর্ঘ্য বারো ফুট, আর প্রস্থ ছয় ফুট। লতার শ্রান্তটা টানাটানি করে কাঠের দণ্ডটা সামান্য উঁচু করার জন্য আমি, কর্নেল মুনরো, ব্যাক্সস আর ফল্ল শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে লতাটা ধরে টানতে লাগলাম। আর হুড় বন্দুকের ঘোড়ায় আঙুল লাগিয়ে তৈরি হয়ে শুভমুহূর্তের অপেক্ষায় রয়েছি।

ফাঁদের পাল্লাটা ফুট খানেক উঠেছে। ভেতরে বাঘ থাকলে বেরিয়ে না আসলেও নির্ধাৎ মুখ বাড়িয়ে হাঁক-ডাক জুড়ে দিত। কিন্তু কিছুই বেরুতে দেখা গেল না। তবে অদ্ভুত একটা চাপা আওয়াজ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। অস্থিরচিত্ত হুড় বন্দুকের নলটাকে দরজা ব্যবার বাগিয়ে ধরল। দরজা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পরিষ্কার দেখতে পেলাম, কি যেন নড়াচড়া করছে।

ঠিক তখনই মনুষ্যকণ্ঠ কানে এল—“গুলি করবেন না! গুলি করবেন না স্যার! আমি জন্তু-জানোয়ার নই, মানুষ! আমি মানুষ! দয়া করে গুলি করবেন না।”

কিন্তু তকিমাকার একটা লোক প্রায় শুয়ে শুয়ে ফাঁদের আধ-খোলা দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল।

ব্যাক্সস নাম জানতে চাইলেন। সে বলল—“স্যার, আমি প্রকৃতিবিদ ম্যাথিয়াস ভান ওইট। এবার যন্ত্রচালিতের মতো বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান ও জন্তু-জানোয়ারের নাম আওড়ে গেল। হামবুর্গ আর লন্ডন শহরে তার জ্যান্ত জন্তু-জানোয়ার বিক্রির প্রতিষ্ঠান।

নিজের কথা বলতে গিয়ে ম্যাথিয়াস বলল—“স্যার, এক সময় শিক্ষকতা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার কিন্তুতকিমাকার চেহারা দেখে ছাত্ররা পিছনে লাগত। ফলে শিক্ষকতা ছেড়ে জন্তু-জানোয়ার জঙ্গল থেকে জ্যান্ত ধরে চিড়িয়াখানা চালান দিচ্ছি।” ব্যক্তিগত ব্যবসা নয়, তবে ইউরোপের দুটো প্রতিষ্ঠানের হয়ে সে কাজ করছে।

গতকাল ফাঁদে বাঘ পড়েছে কি না দেখতে এসেছিলাম। বাইরে বেরিয়ে আসার সময় আচমকা তার একটা হাত ওপরে উঠে যাওয়ায় দণ্ডের বিপরীত প্রান্তে ওজন সরে গিয়ে দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। জন্তু-জানোয়ারের পরিবর্তে সে নিজেই ফাঁদে আটকা পড়ে গেল। ব্যস, হা-ছত্যাশ করতে করতে সে এক সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

আচমকা তীব্র আর্তনাদ কানে এল। ছুটে গিয়ে দেখি একটা ইয়া লম্বা বিষধর সাপ একটা জঙ্গলির বুকে সজোরে কামড়ে ধরে রয়েছে। মরণ-যন্ত্রণায় লোকটা হরদম চিল্লিয়ে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যেই ম্যাথিয়াস-এর এক সাকরেন্দ উদ্ধার বেগে ছুটে এল। একটা কুড়ুল দিয়ে চোখের পলকে সাপটাকে দু-টুকরো করে ফেলল। লোকটা ভারতীয় হিন্দু। নাম তার কালাগনি।

ম্যাথিয়াস আমাদের নিমন্ত্রণ করে তার ডেরায় নিয়ে গেল।

কালাগনির জঙ্গলের ব্যাপার-সাপ্যার সম্বন্ধে খুবই অভিজ্ঞ। জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখে তাদের সনাক্তকরণ তো সামান্য ব্যাপার, পায়ের ছাপ দেখে সে পরিষ্কার বলে দেয় কার গতিবেগ ঘন্টায় কত, কোন উদ্দেশ্যে চলেছে আর কোথায়ই বা চলেছে।

না, তরাই বনভূমিতে আরো কিছু সময় থাকার সাধ থাকলেও মনের দিক থেকে মোটেই উৎসাহ পেলাম না। এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশি। প্রকৃতিবিদ ম্যাথিয়াস-এর সঙ্গে হয়তো ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী মশাগুলোর সাথে বোঝাপড়া রয়েছে। আমরা ব্যস্ত পায়ের বেহেমখে ফিরে এলাম।

ছাঝির্শে জুন। বেহেমখ আবার সচল হল। তার পর তিন-তিনটে দিন আমরা আর মাটি স্পর্শ কর্তে পারলাম না। এক নাগাড়ে পিটপিট করে বৃষ্টি হয়ই চলেছে। আকাশ পরিষ্কার হল ত্রিশে জুন। বেলা একটু বাড়লে, বাপিয়ায় শকট বেহেমথকে দেখার জন্য কয়েকজন কৌতূহলী তিব্বতী চারদিকে ভিড় করল। কর্নেল মুনরো তিব্বতিদের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন। তাই তাদের আদর করে বসতে দিলেন। কথা প্রসঙ্গে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাসাহেব-এর খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিব্বতিরা আমাদের মতো শোনা-খবর ছাড়া কিছুই জানে না। নানাসাহেব ইহলোক ত্যাগ করেছেন এরকম খবর তারাও শুনেছে বটে। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়। আসলে তিনি সত্যি মারা গেছেন, নাকি তিব্বতেরই কোন প্রভাব্ত অঞ্চলে ঘাপটি মেরে রয়েছেন, নিশ্চিত করে কারো পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হল না।

তেইশে জুলাই কয়েকজন পাহাড়ি আমাদের কাছে এল। একটা বাঘিনী নাকি গায়ে জোর উৎপাত চালাচ্ছে। তাই সাহেবরা যদি হিংস্র জানোয়ারটাকে মেরে বিপদের হাত থেকে তাদের অব্যাহতি দেন, সে ভরসাতেই তারা ছুটে এসেছে।

বাঘিনীর খবরটা শোনামাত্র হুড় তো বন্দুক-হাতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল।

কর্নেল মুনরো, ম্যাকনিল আর গৌমিকে স্টিম হাউস রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রেখে আমরা ঝপপট তৈরি হয়ে পাহাড়িদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কালাগনিকেও সঙ্গে নিলাম। তা ছাড়া আরো তিজন শিকারী আমাদের সঙ্গদান করতে চলল।

রোমহর্ষক সে অভিজ্ঞতাটা এখানেই ঘটল। খবর পেলাম, জঙ্গলের ধারে একটা আধ-খাওয়া মোষকে পাওয়া গেছে। সবাইএকমত হলাম, বাঘটা সময়-সুযোগ মতো মোষটার বাকি অর্ধেকটা খাওয়ার জন্য আবার এখানে আসবেই। আমরা ঝোপের ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। দূর থেকে তাকে তর্জন-গর্জন করতে শুনলাম। কিন্তু তাকে চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য আমাদের হল না।

অভিজ্ঞ কালাগনি বলল—‘স্যার, আগুন জ্বাললে, ধোঁয়া দিলে জানোয়ারটা বেরুতে পারে বটে। তা নইলে সে কিছুতেই বাইরে আসবে না। আগুন জ্বালানো হল। লতাপাতা দিয়ে গলগলে ধোঁয়া সৃষ্টি করা হল। আমাদেরই দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড় আবার ঝোপের ভেতর থেকে গলা খঁকিয়ে বাঘিনীটা নিজের উপস্থিতির কথা জানান দিল। বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব হল না। অস্থির হয়ে সুবিশাল বপুটা এক লাফে ঝোপের বাইরে বেরিয়ে এল।

দশটা বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। দশ-দশটা তণ্ডু সিসার গুলি একসঙ্গে দশদিকে ছুটে গেল। হায়! ক্রোধোন্মত্ত বাঘিনীটার গায়ে লাগল না।

সব শেষে ক্যান্টেন হুড বন্দুকের ষোড়া টিপে দিল। গুলিটা তার কাঁধে আঘাত হানল। সে আচমকা এক লাফ দিয়ে হুড-এর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। হুড-এর পাঁজর লক্ষ্য করে হিংস্র জানোয়ারটা থাবা তুলতেই কালাগনি তার ওপর লাফিয়ে পড়ে এক হাতে সজোরে তার টুটিটা চেপে ধরে অন্য হাতের ছুরিটা বুকে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতেই বাঘিনী এক ঝটকায় ছুরিসমেত তাকে ছিটকে ফেলে দিল। হুড এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা তুলে এনে চোখের পলকে জানোয়ারটার বুকে আমূল গেঁথে দিল।

বাঘিনীর নখের সামান্য আঁচড় লাগায় কালাগনির কাঁধ থেকে তিরতির করে রক্ত ঝরতে লাগল। চারদিন পর আমরা সদবলে বেহেমথ-এ ফিরে এলাম। কর্নেল মুনরো একটা চিঠি লিখে রেখে ম্যাকনিলকে সঙ্গে করে নেপাল সীমান্তে গেছেন। নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদের সভ্য-মিথ্যা সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়ার অতুঃপ্রাণ অগ্রহেই তিনি বেহেমথ ছেড়ে গেছেন।

আমরা কর্নেল মুনরোর চিঠি ও নানাসাহেব-এর কথাবার্তা শুরু করতেই কালাগনির মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। চোখে-মুখে কেমন যেন হতাশা আর হাহাকারের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। কিন্তু কেন? বাঘ শিকারের মোহে মুগ্ধ হয়ে আমরা তার ব্যাপার-স্যাপার ভুলে গেছি। নানাসাহেব-এর সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা আমরা একেবারে ভুলে গেছি।

আগষ্ট মাসের পনের তারিখ এসে গেল। কর্নেল মুনরো এখনো ফিরে এলেন না।

আগষ্ট মাস শেষ হতে চলল। মাসের শেষের দিকে ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সে রাতে চাঁদের-আলোয় শিকারে বেরুবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম।

আচমকা খাঁচাবন্দি জানোয়ারগুলো এক সঙ্গে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। পর মুহূর্তেই কলিজা-কাপানো গর্জন বাইরে থেকে ভেসে এল। বাঘের পাল যেন তর্জন গর্জন করছে। সবায় ঘুম ছুটে গেল। কালাগনি উঁচুতে উঠে ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বলল—‘স্যার, দশটা বাঘ আর বারোটা চিতা বাঘ হানা দিয়েছে।’

কথাটা কানে যেতেই আমাদের কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। যাদের শিকার করতে যাওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিছি তারাই যে আমাদের ওপর হানা দিয়েছে।

চোখের পলকে ক্রাল-এর দরজাটা খুলে গেল। এ কী ভৌতিক কাণ্ড রে বাবা! কালাগনি নিজে হাতে দরজাটা বন্ধ করেছিল। আন সেটা আপনা থেকেই খুলে গেল কি করে? এ কী রহস্য!

আমাদের কিছুমাত্র ভাববার অবসর না দিয়েই বাইশটা হিংস্র জানোয়ার তীব্র গর্জন করে ক্রাল-এর মধ্যে ঢুকে এল। আমরাও পড়ি কি মরি করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম। আমি আর হুড দিবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খালি-খাঁচাটার ভেতরে ঢুকে ছিটকিনি এঁটে দিলাম। কালাগনি সুড় সুড় করে গাছে চড়ল আর কুটিরের মাথায় আশ্রয় নিল ম্যাথিয়াস।

হায় ঈশ্বর! এ কী নৃশংস হত্যাকাণ্ড! তিনজন পাহাড়ি প্রাণ খোয়াল। বাঘের কামড়ে প্রাণ দিল পাঁচ পাঁচটা মোষ। বাকি মোষগুলো উর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলে পালাবার সময় আমাদের খাঁচাটাকে উল্টে দিয়ে গেল। আমাদের নিয়েই সেটা দু-তিনটে পাক খেল। বরাত ভালো যে, দরজাটা খুলে যায় নি।

হুড-এর বাহাদুরি আছে বটে। খাঁচার ভেতরে অবস্থান করেই সে একটা বাঘকে ঘায়েল করে দিল। কুটিরের ভেতর থেকে শিকারীরা গুলির ঘায়ে একটা বাঘ আর দু-দুটো চিতাবাঘকে চিং পটাং করে দিল। মাত্র পনের মিনিটে রক্তনদী বইয়ে দিয়ে হিংস্র বাঘ আর চিতা বাঘের দল ক্রাল ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাতাশে আগষ্ট সকাল হতে না হতেই চিল্লাচিল্লিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আসলে কর্নেল মুনরো ফিরে আসার সবাই উল্লসিত। বিমর্ষমুখে তিনি ফিরে এসেছেন। নানাসাহেব-এর দেখা পাওয়া তো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো ষোঁজখবরও পান নি। ব্যস, এর বেশি কিছু বলতে তিনি নারাজ।

তেসরা সেপ্টেম্বর আমাদের বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যাত্রা করার পরিকল্পনা নেওয়া হল। এ-ও ঠিক করা হল পশ্বে আর কোথাও বেহেমথকে থামানো হবে না। আসলে যেসব জায়গায় সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটেছিল সেখানে থাকলে বা খোরাকেরা করলে কর্নেল মুনরো খুবই মনমরা হয়ে পড়েন।

ম্যাথিয়াস এবার কর্নেল মুনরোকে অনুরোধ করে বললেন, বেহেমথকে দিয়ে তাঁর জানোয়ার খাঁচাগুলোকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্য। আসলে জানোয়ারগুলোকে বিশেষ সেপ্টেম্বর বোম্বাইতে পৌঁছে দেবার কথা। মাঝে আর মাত্র আঠারোটা দিন বাকি। কর্নেল আমতা আমতা করে হলেও শেষপর্যন্ত খাঁচাগুলোকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

দশই সেপ্টেম্বর জানোয়ারের খাঁচাগুলো মালগাড়ির ওয়াগনে চাপল। এবার কালাগনির চাকরিটা গেল। জানোয়ার নেই, তার চাকরিও নেই। কর্নেল মুনরো তাঁর সঙ্গে বোম্বাইয়ে যাবার প্রস্তাব দিতেই কালাগনি রাজি হয়ে গেল।

বেহেমথ ফের সচল হল। প্রাণীতত্ত্ববিদ ম্যাথিয়াস ভ্যান ওইট হাত নেড়ে নেড়ে আমাদের বিদায়-অভিনন্দন জানালেন।

আঠারোই সেপ্টেম্বর। দুপুরে আহারাতি সেরে বিশ্রাম নেওয়ার সময় কর্নেল তার কামরায় কালাগনিকে ডেকে পাঠালেন।

কর্নেল মুনরো কথা প্রসঙ্গে কালাগনির কাছে জানতে চাইলেন, এ সব অঞ্চলের পথঘাটের সঙ্গে তার এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় কি করে হল? কালাগনি জানায় যে বহুবার যাতায়াত করতে করতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পথঘাট তার নখদর্পণ হয়ে গেছে।

কালাগনি নানাসাহেব-এর মৃত্যু-সংবাদ পায় নি। খবরটা যদি পেল সেদিন তার মুখটা শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেল।

এক সময়, কালাগনি ব্যাক্সকে দক্ষ্য করে বলল—‘স্যার, একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। দেশের যেসব জায়গায় স্বাধীনতার লড়াই হয়েছে সে সব জায়গাগুলো আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?’

ব্যাক্স কর্নেল মুনরোর মানসিক পরিস্থিতির কথা পাড়তেই সে বাধা দিয়ে বলল—‘স্যার, আপনারা মিছেই ভয়ে এমন কুকড়ে যাচ্ছেন। আসলে নানাসাহেব ভারতেই নেই।’

ব্যাক্স মুচকি হেসে বললেন—‘তুমি কোনো খবরই রাখনা কালাগনি! চারমাস আগে পঁচিশে মে নানাসাহেব সাতপুরা পর্বতে মারা গেছেন তুমি কি কিছুই শোন নি!’

নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ কালাগনির মুখে যেন অকস্মাৎ কালি ঢেলে দিল। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে নানাসাহেব-এর প্রসঙ্গে কয়েকটা জরুরি প্রশ্ন করল। উত্তরে যা শুুনল, খুশি হতে পারল না বোঝা গেল।

কালাগনির আচরণ আমার মধ্যে রহস্যের-সম্ভার করল। ভাবলাম, সে কী তবে সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে লিপ্ত ছিল? আর ‘সিপাহী বিদ্রোহকে সে স্বাধীনতার যুদ্ধই বা কেন বলবে? আর নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ শুনে সে আঁতকেই বা উঠেছে কেন?’

তেইশে সেপ্টেম্বর আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথ ঝাঁসি পেরিয়ে এগিয়ে চলল। রাণী লক্ষ্মী বাঈ-এর সঙ্গে কর্নেল মুনরোর সঙ্গে ভ্রমকের লড়াই হয়েছিল। তারপর থেকে নানাসাহেবের ওপর একেবারে হাড়ে চটা।

পঁচিশে সেপ্টেম্বর আমাদের যন্ত্র-হাতি জঙ্গলের পথে এগিয়ে চলল। সে রাতে চাঁদের আলোয় আমরা অত্যাশ্চর্য এক ব্যাপারের মুখোমুখি হলাম। দেখলাম, পাত্থের বৃষ্টিভেজা মাটিতে পরপর কিছু পদচিহ্ন রয়েছে। মানুষের পদচিহ্ন। আচমকা কারা যেন চক করে ঝোপের আড়ালে চলে গেল দেখলাম। সরাসরি কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলল।

সকাল হতেই আমরা নদী পেরোবার উদ্যোগ নিলাম। ঠিক তখনই গঁতরাএর রহস্য সৃষ্টিকারীদের দেখা গেল। তারা সংখ্যায় কম সে কম শ’ খানেক তো হবেই। ইয়া গোদা গোদা হনুমান। মুখপোড়া হনুমান। তারা বেহেমথকে যেতে দেখেই ঝপাঝপ গাছ থেকে লাফিয়ে পথে নামল। বেহেমথ নদীতে নামামাত্র তারা লাফালাফি করে তার মাথায় পিঠে আর শূড়ের ওপর চেপে বসল। বেহেমথ হিম্মৎ রাখে বটে। নিজের এবং আমাদের ওজন ছাড়াও একশ’টা হনুমানের অতিরিক্ত ওজন নিয়েও সেটা দিবি নৌকার মতো জল অতিক্রম করে চলল।

হনুমান হিন্দুদের কাছে ভগবান। রামচন্দ্রের ভক্ত। তাদের হত্যা করতে আমরাও উৎসাহী হলাম না। কম-বেশি অত্যাচার তো তারা আমাদের ওপর করলই না। তাবু উত্তেজিত হয়ে কারো গায়ে হাত দিলাম না।

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর। বেহেমথ বৃন্দেলখণ্ডের সবচেয়ে খারাপ জায়গা দিয়ে কোনোরকমে পথ পাড়ি দিতে লাগল।

পাহাড় আর জঙ্গল একাকার হয়ে গেছে এখানে। কালাগনি বারবার নেমে নেমে রাস্তার অবস্থা দেখে এসে চালককে বলছে, তবেই বেহেমথকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তবে একটা কথা খুবই সত্য যে, এখন পর্যন্ত আমাদের ওপর ডাকাতদের হামলা হুজ্জতি হয় নি। এখানকার ডাকাতরা সারা ভারতের আতঙ্ক।

আমরা অবশ্য যে কোনো পরিস্থিতির মোবাকেল করা জন্যই তৈরি। বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সবই মজুদ আছে। প্রয়োজনে ব্যবহার করব।

কিন্তু ত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হল। ডাকাতদের পরিবর্তে অন্য ধরনের আক্রমণ। সত্যিই খুবই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। দুটো পর্বত প্রমাণ হাতি আমাদের বেহেমথ-এর পিছন পিছন চলতে লাগল। একটু বাদেই আর একটা হাতি তাদের দলে মিলিত হল। এবার একটা একটা করে হাতি দলে বাড়তেই লাগল। তারা যে পিছন িছন চলতে চলতে কি ফন্দি আঁটছে তা-ই বা কে জানে? হঠাৎ করে সবাই যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর সামনে এসে পথ অ’গলে দাঁড়ালেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হুদ, হাতিদের বুদ্ধির প্রশংসায় একেবারে গদগদ হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। হাতিগুলো তাবু বেহেমথ-এর পিছন ছাড়ল না। এমন সময় আচমকা একটা বিচিত্র আওয়াজ শোনা গেল। একেবারেই অত্যাশ্চর্য সে আওয়াজটা। গম্ভীর আওয়াজ। একমাত্র মেঘের ডাকের সঙ্গেই আরে তুলনা চলতে পারে।

কালাগনির চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠল। সে প্রায় কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—‘সর্বনাশ! হাতিগুলো যন্ত্র-পাতি বেহেমথকে চরমতম শত্রু জ্ঞান করছে! শত্রুর মুখোমুখি হলে তারা এমন গম্ভীর অদ্ভুত আওয়াজ করে হাঁক দেয়।

আতঙ্কে আমাদের গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার উপক্রম হল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তারা ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি থামিয়ে চুপ হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর সার্চ লাইট জ্বলে দেওয়া হল। তীব্র আলোয় দেখতে পেলাম, হাতির দল বেহেমথকে ঘিরে শুয়ে পড়েছে। আলো জ্বলতেই তারা সমস্তরে তীব্র তর্জন-গর্জন জুড়ে দিল। সে কী গর্জন, কলিজা ঠাণ্ড হয়ে যাবার জোগাড়।

হায়! এ পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাবার উপায়?

সকালে বেহেমথ-এর শুঁড় দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া ছাড়লে তো আরো প্রমাদ ঘটবে। তারা ক্ষেপে গিয়ে কী যে কেলেকারি ঘটাবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। গুচ্ছের খানেক দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে সার্চ লাইটের আলো নিভিয়ে, অদৃষ্ট স্বপ্ন করে আমরা শুয়ে পড়লাম।

আমরা যদি কোনো সুযোগে পালিয়ে যাই এ আশঙ্কায় হাতির দল সারারাত্রি আমাদের পাহারা দিল।

সকাল হতেই আমরা মরিয়া হয়ে উঠলাম। এবার যে করেই হোক এ জায়গা ছেড়ে এগুতেই হবে।

গল গল করে গরম বাষ্প আর কানে তালিলাগা ঘন ঘন সিটি মারায় কয়েকটা হাতি হকচকিয়ে পথ থেকে উঠে সরে দাঁড়াল। বাস, ব্যাক্স সুযোগের সন্ধ্যাবহারে মেতে গেল। বেহেমথ দ্রুত ছুটে চলল। হাতির দলও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তাদের মধ্যে ব্যস্ততা নেই। ক্ষোভের বর্ধিতপ্রকাশ নেই। মোদা কথা, সামান্য ডাকাডাকিও করল না।

আমাদের যন্ত্র-হাতি বেহেমথ লেক পুটিয়ারির কাছাকাছি এগুতেই চরম সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলাম। দু-ধারে পাহাড় মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পর্বত প্রমাণ একটা রক্ত-মাংস গড়া হাতি পথ আগলে দাঁড়িয়ে অনবরত শুঁড়টাকে নাচিয়ে চলেছে। দাঁতহীন হাতি।

আচমকা কালাগনি চিল্লিয়ে উঠল—‘খবরদার! খবরদার! ওর গায়ে আঘাত হানবেন না। গণেশ! ওটা গণেশ!’

এদেশের মানুষ এক দাঁতওয়ালা হাতিকে গণেশ জ্ঞানে সমীহ করে। এক কথায় ডাকাতে হাতি। অসীম সাহসী। অমিত শক্তিরও বটে।

ব্যাক্স তবু দমল না। আচমকা তীব্রগতিতে বেহেমথকে ছুটিয়ে দিল। গণেশ বিকট আওয়াজ তুলে ধড়াস করে খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ল। যুদ্ধ। ভুলল যুদ্ধ বেঁধে গেল। যন্ত্র-হাতি আর রক্ত-মাংসের হাতির মধ্যে এমন যুদ্ধ বাঁধল যে, কেউ তা কল্পনাও করতে পারবে না। এবার শুরু হয়ে গেল দশ-দশটা বন্দুকের গর্জন। হুড় পরামর্শ দিল হাতির কপালে গুলি চালাবার জন্য।

বিপদ এবার নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। হঠাৎ বেহেমথ-এর পিছনের বাড়িটা থেকে আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে সে বাড়িটাকে পাহাড়ের গায়ে ঠেসে ধরে ভেঙে শুঁড়িয়ে দেবার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

এবার শেকল খুলে পিছনের বাড়িটাকে বেহেমথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। বাস, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উন্মত্তপ্রায় হাতিগুলো শুঁড় আর পায়ের চাপে দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে দিল বাড়িটাকে।

বেহেমথ এবার ভাঙা ছেড়ে লেক পুটিয়ারির জলে ঝাঁপ দিল। সঙ্গে কয়েকটা হাতিও ঝপাঝপ জলে পড়ে গেল। কিন্তু বন্দুকের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তারা রক্তাপ্রসৃত দেহে কোনোরকমে পাড়ে উঠে জান বাঁচাল।

সমস্যা! আমরা একের পর এক সমস্যার মুখোমুখি হতে লাগলাম। বয়লার বন্ধ। স্টিম ফুরিয়ে গেছে। বেহেমথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। গুদামে কাঠ নেই, বয়লার চলবে কি দিয়ে?

অনন্যোপায় হয়ে ব্যাক্স বেহেমথকে দাঁড় করিয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে রইল।

জায়গাটার খুবই অখ্যাতি রয়েছে। বুদ্ধদেবের সবচেয়ে ভয়ংকর জায়গা এটা। তাই ঝপাঝপ বেহেমথ-এর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। কেউ যেন আমাদের উপস্থিতির কথা টের না পায়, তাই এ-পথ অবলম্বন করা।

ব্যাক্স কালাগনিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারল, এখান থেকে জব্বলপুর প্রায় দেড় মাইল। কালাগনি জমটবাধা কুয়াশা আর কনকনে ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কেটে জব্বলপুরে গিয়ে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী জোগাড় করে নিয়ে আসতে রাজি হল। ব্যাক্স থেকে শুরু করে কর্নেল মুনরো পর্যন্ত সবাই তার কথায় চমকে উঠলেও শেষপর্যন্ত সম্মতি দিতে বাধ্য হলেন। গোমিও সঁাতারে পটু। কর্নেল মুনরোর নির্দেশে সে-ও কালাগনির সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিল।

আমিও তব্বে তব্বে ছিলাম। কর্নেল মুনরোকে একা পেয়ে আমি কোনোরকমে ভনিতা না করেই সরাসরি প্রশ্ন করলাম—‘একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় আসছে না। কালাগনিকে আপনি কিছুতেই একা জব্বলপুরে যেতে দিতে চাইলেন না কেন, দয়া করে বলবেন?’

কর্নেল মুনরো নির্বিকার জবাব দিলেন—‘আমার মনে হয় তার কথাবার্তায় সত্যতার অভাব যথেষ্টই রয়েছে।’

‘আমি কপালের চামড়ায় বিশ্বাসের ছাপ এঁকে বলে উঠলাম, ‘একী বলছেন আপনি! যে লোকটা দু-দুবার আপনাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছে, তাকে অবিশ্বাস করছেন! এমন কি হুড়-কেও তো সে একবার বাঘের কবল থেকে ছিনিয়ে—’

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই কর্নেল মুনরো আবার বলতে লাগলেন—‘মানুষের মুখেই তার মনের ছবি ফুটে ওঠে। মিথ্যে কথা বলার সময় কালো ভারতীয়দের মুখ আরো অনেক বেশি কালো হয়ে যায়। সৈন্য বিভাগে কাজ করার সময় আমি সিপাইদের সত্য-মিথ্যার যাচাই এভাবেই করতাম। কোনো ক্ষেত্রেই আমার ভুল হয় নি। কালাগনির শেষ কথাটাকেও আমি একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিশ্বাস করতে পারলাম না, তাই তো আগেভাগে একটু সতর্কতা অবলম্বন করলাম। বাস, এর বেশি কিছু নয়।’

কর্নেল মুনরোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে বিছানা আশ্রয় করলাম। দূরের জঙ্গল থেকে বাঘের-ছড়ার কানে আসতে লাগল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পঞ্চাশ নম্বর বাঘটাকে খতম করার জন্য হুড় অস্থির হয়ে পড়লেও কার্যত কিছুই করার ছিল না। হাঁকডাক শোনা ছাড়া লাভ কিছুই হল না।

সকাল হল। ছয়টার কাছাকাছি বাতাসে ভাসতে ভাসতে বেহেমথ লেকের তীরের দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। আমরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাড়ে নামার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রইলাম। লেকের ধারে-কাছেই প্রচুর শুকনো কাঠ দেখা যাচ্ছে।

বেহেমথ তীরের দিকে আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই আমরা ঝপাঝপ লাফিয়ে নেমে গেলাম।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইয়া মোটা মোটা শুকনো ডাল টানাটানি করে বেহেমথ এ তুলে নিলাম। বাষ্প তৈরি না করলে বেহেমথ থামের মতো পায়ে ভর দিয়ে জল থেকে উঠে আসবে কি করে?

বাষ্প তৈরি করা হল। বাষ্পের বাপ বৃদ্ধি পেল। ব্যস, বেহেমথ গুড়গুড় করে লেকের জল ছেড়ে ডাঙার পাথুরে মাটিতে উঠে এল।

বেহেমথ ডাঙায় উঠতে না উঠতেই চোখের পলকে অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একদল ভারতীয় অস্ত্র হাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সবাই সশস্ত্র। কুড়ুল, বর্শা আর শাবল নিয়ে তারা আমাদের মন্দিরাকৃতি বাড়িটার ওপর সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমরা কিছু বোঝার আগেই দমাদম কুড়ুলের আঘাত হেনে বাড়িটাকে খণ্ডখণ্ড করে আগুন জ্বালিয়ে দিল।

দৈত্যাকৃতি মানুষগুলো শরীরের শক্তি নিঃশেষে নিঙড়ে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর গায়ে ঘন ঘন কুড়ুল আর শাবলের ঘা মারতে লাগল। কিন্তু অচিরেই তাদের হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হল। বেহেমথ-এর ইস্পাতের পাতের গায়ে সজোরে আঘাত লাগায় তাদের অস্ত্রগুলো দুমড়ে-মুচড়ে গেল।

দৈত্যাকৃতি মানুষগুলো যখন হতাশ হয়ে বেহেমথকে ধ্বংস করার আশা ছেড়ে দিয়ে কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই তীব্র-হুংকার দিয়ে দুজন ষড়মারী লোক জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তাদের দেখেই দৈত্যাকৃতি লোকগুলো তাঁর সামনে সারিবদ্ধভাবে মাথা নিচু করে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই দ্বিতীয় জনের ওপর চোখ পড়তেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকল না।

সে দৃঢ় পায়ে কর্নেল মুনরোর দিকে সামান্য এগিয়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠল—‘এর কথাই বলছিলাম। এ-ই সেই লোক।’

ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে দৈত্যাকৃতি একশত ডাকাত সমন্বরে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে কর্নেল মুনরোকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল।

ব্যাপার কি? কর্নেল মুনরোর ওপর কালাগনির এমন জ্বলন্ত ক্রোধের কারণ কি? তবে কি সে নানাসাহেব-এর হুকুম তামিল করতাই এমন ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটাতে উৎসাহী হয়েছে?

মিসিয়ে মক্কের ডাইরির পাতায় এর পরের ঘটনা কিছুই লেখাজোকা নেই। তবে ঘটনাগুলোকে একত্রিত করলে উপসংহার হিসেবে আরো কিছু না বললে বক্তব্য অসমাপ্ত রয়ে যায়।

ঠগী-ডাকাতদের তীর্থক্ষেত্র, নিশ্চিত কর্মক্ষেত্র ভারতভূমি। তবে হ্যাঁ, এরা কালীর উপাসক। শক্তির উপাসক। ভবতারিণীকে খুশি করার জন্য পাঁচাবলির মতো এরা গলায় দড়ির ফাঁস দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে পরপারে পাঠিয়েছে।

তবে ব্যাপারটা কি? কালাগনি কি তবে প্রথম থেকেই নীরবে মতলব আঁটছিল? এখন সুযোগ হাতে পেয়ে সম্ভাবহার করেছে? পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে সে কানপুর থেকেই যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর আশপাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করেছে। একই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ম্যাথিয়াস-এর এবং কার্ল-এ জানোয়ারগুলোর পরিচর্যার দায়িত্ব নিয়েছে? তারপর নিজের জীবনের মায়ী বিসর্জন দিয়েও তাঁদের আত্মভাজন হতে দু’ দু’-বার কর্নেল মুনরোর জীবন রক্ষা করেছে।

কালাগনি মতলব আঁটেছিল যে করেই হোক কোনো এক বিপদের মুহূর্তে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর রক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। তবেই লোকগুলোকে নিজের কজির মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে। তাই তো অভিজ্ঞ অভিনেতার মতো প্রতি মুহূর্তে সে এতগুলো শিক্ষিত লোকের সঙ্গে অভিনয় করে গেছে।

নানাসাহেব-এর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্র তার চোখে-মুখে নেমে এসেছিল বিষাদের কালোছায়া। তবু হতাশ হয়ে সে হাল ছাড়ে নি কিছুতেই। শেষপর্যন্ত পথ দেখিয়ে বেহেমথকে এনে হাজির করেছে বিশালায়তন পুটুরিয়ার হ্রদে।

এবারের কাজও তার পরিকল্পনা মাফিকই হয়েছে। গৌমিকে নিয়ে লেকের বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে দেড় মাইল খানেক সাঁতরে গিয়ে এগিয়ে চলল পাড়ের উদ্দেশ্যে। পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে কোমার থেকে ঝকঝকে ছুরির ফলাটা বের করে তার বুকে যেই না গেঁথে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে অমনি জঙ্গলের দিক থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল—‘কে গো, কালাগনি? কালাগনি এসেছে?’

‘হ্যাঁ, আমি কালাগনিই বটে। নাসিম, আমি এসে গেছি।’ ব্যস, এবার হাত দুটোকে মুখের কাছে তুলে নিয়ে সে ভয়ংকর চিৎকারে বনবাদাড় কাপিয়ে তুলল।

সুযোগ বুঝে গৌমি অন্ধকারে গা-ঢাকা দিল। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কর্নেল মুনরো বা যন্ত্র-হাতি বেহেমথ-এর কথা ভেবেই সে চম্পট দিল।

কালাগনি আর নাসিম ডাকাডাকি হাকাহাকি করে ডাকাতদের তলব করল। দেখতে দেখতে দেড়শ ডাকাত কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জড়ো হয়ে গেল। গৌমির খোঁজ করল। পেল না।

তারপরের ঘটনা তো আমাদের অবশ্যই জানা আছে।

সকাল ছয়টায় কর্নেল মুনরো ডাকাতদের হাতে ধরা পড়লেন। নাসিম তাঁকে নিয়ে রায়পুর দুর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দুর্গটা বিক্ষা পর্বতের একধারে। সাতপুরা পাহাড় থেকে প্রায় দু’শ মাইল দূরবর্তী এক স্থানে।

এক সময় রায়পুর দুর্গের খুবই খ্যাতি ছিল। সারি সারি কামান ছিল দুর্গের চারিদিকে। এখন একটা মাত্র সম্বল। আসলে আয়তন ও ওজন এতই বেশি যে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। শোনা যায় ভিলসার বিখ্যাত ব্রোঞ্জ কামানের চেয়েও নাকি এটা অনেক বড়। এমন কি বিজাপুরের কামানও এর কাছে শিশু। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে এটাকে তৈরি করা হয়।

যজ্ঞমার্কা লোকটা গভীর মুখে এগিয়ে আসতেই কালাগনি দু-পা এগিয়ে তাকে নতজানু হয়ে প্রণাম করল। বোঝা গেল, লোকটা তার মনিব—দলপতি।

সঙ্গত কারণেই মনে প্রশ্নের উদয় হল—লোকটা কে? নানাসাহেব? না, তা তো হতে পারে না। নানাসাহেব তো কবেই মরে ভূত হয়ে গেছেন। তবে এ কে?

ক্রোধোন্মত্ত বাঘ যেমন শিকারের দিকে এগিয়ে যায় ঠিক তেমনি বীরদর্পে লোকটা এক পা-দু-পা করে এগুতে লাগল। চোখে তার প্রতিশোধের আগুন জ্বল জ্বল করছে।

আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই কর্নেল মুনরো সন্নিহনে বলে উঠলেন—‘আরে, এ যে বালাও রাও!’

দলপতি গোছের লোকটা এবার মুখ খুললেন—‘ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না;’

‘তবে? তবে কি নানাসাহেব?’ সচকিত হয়ে ঝট করে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল মুনরো। আগের মতো বিশ্বাসের সঙ্গে এবার বললেন—‘নানাসাহেব! তিনি তবে আজো জীবিত? কিন্তু সাতপুরা পাহাড়ে কে মারা গিয়েছিল?’

‘সাতপুরায় মারা গিয়েছিল নানাসাহেবের অনুজ। উভয়ে একই রকম দেখতে। যেন একই ছাঁচে গড়া দুটো মানুষ। কানপুর আর লক্ষ্মীয়ের সৈন্যরা একই ভুল করেছিল। ইংরেজ সরকার ভুল করেছে। নানাসাহেব তাদের সে ভুল ভাঙান নি। কর্নেল মুনরোর প্রতীক্ষায় তিনি চার-চারটে মাস অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন।

নানাসাহেব-এর ভয় একটাই ছিল, তাঁর মৃত্যুর ভূয়া খবরটা ছড়িয়ে পড়লে তা শুনে কালাগনি মুষ্ণু পড়ে হাল ছেড়ে না দেয়। তাই নাসিমকে পাঠিয়েছিলেন পোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে। নাসিমই কালাগনিকে জানিয়েছিল, রায়পুর দুর্গে নানাসাহেব তারই জন্য অধীর-প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

কর্নেল মুনরো! অগলক চোখে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী লেডি মুনরোর মুখটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। অতর্কিতে কানপুরের ইংরেজ নিধনকারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন। নানাসাহেব নীরবে খুবই ক্ষীপ্রতার সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে গেলেন।

বাস, চোখের পলকে নানাসাহেব-এর অনুগামীরা ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো চারদিক থেকে ঝাপিয়ে পড়ল। নানাসাহেব তাদের নিরস্ত না করলে তাকে মুহূর্তে টুকরো টুকরোই করে ফেলত।

বজ্রগভীর স্বরে নানাসাহেব উচ্চারণ করলেন—‘কর্নেল মুনরো, মনে পড়ে আপনি পেশোয়ারে এক শ’ বিশজন কয়েদিকে কামান দেগে হত্যা করেছিলেন? পরবর্তীকালে আবার বার শ’ সিপাইকেও কামানের মুখেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আপনার অনুগত সৈন্যরা নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে সিপাইদের খতম করেছিল। দিল্লি দখল করার পর আপনার উল্লসিত সৈন্যরা তিনজন রাজপুত্র সমেত রাজপরিবারের উনত্রিশজনকে হত্যা করে রক্তনদী বইয়ে দিয়েছিল, ঠিক কিনা? পাঞ্জাবে খতম করেছিল তিন হাজার আর লক্ষ্মীয়ে ছয় হাজার, মনে পড়ে? আপনারা স্বাধীনতার-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার আপনারা এক লক্ষ বিশ হাজার সিপাই আর দুই লক্ষ ভারতবাসীকে নির্মমভাবে খুন করেছিলেন। সত্য তো?’

নানাসাহেব-এর অনুগামীরা জিগির দিয়ে উঠল ‘খুনকা বদলা খুন! রক্তের বদলে রক্ত চাই!’

নানাসাহেব হাত তুলে অনুগামীদের থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে লাগলেন—‘ঝাঁসীর রাণী আমার অভিনুহয় বান্ধবী। আপনার নিষ্ঠুরতার বলি হতে হয়েছিল তাঁকে। নিজেহাতে খুন করেছিলেন আপনি। তার বদলা আজো নেওয়া হয় নি। মাস চারেক আগে আপনি আমার অনুজ বালাও রাও-এর বৃকের রক্তে আপনার হাতকে রাঙিয়ে ছিলেন, তার বদলাও তো নেওয়া হয় ওঠে নি।’

তাঁর অনুগামীরা সমস্থরে সক্রোধে গর্জে উঠল। নানাসাহেব গর্জে উঠে তাদের দমন করলেন। আবার প্রতিহিংসার আগুন বলসে উঠল—‘কর্নেল মুনরো, আপনার পূর্বসূরী ছিলেন হেক্টর মুনরো। তিনি মানুষকে হত্যা করার অদ্ভুত একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। আঠারো শ সাতান্নর যুদ্ধে যে-কৌশল অবলম্বন করে আপনি জ্যান্ত মানুষকে পিঠমোড়া করে বেঁধে কামান দেগে হাসিমুখে হত্যা করেছিলেন, সত্য তো? আপনাকেও ঠিক একই উপায়ে খতম করা হবে। ভোর হলেই আপনাকেও কামানের গোলায় সঙ্গে উড়ে যেতে হবে, শুনে রাখুন।’

আচর্য ব্যাপার! কর্নেল মুনরোর শরীরের স্নায়ুগুলো এতই সবল যে, তিনি হাসিমুখে কামানের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন, নির্ভিক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—‘বহুৎ আশ্চর্য! তবে তা-ই হোক!’

বাস, চোখের পলকে নানাসাহেব-এর অনুচররা তাঁকে ঝটপট বেঁধে ফেলল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মহা উল্লাসে ডাকাতরা ব্যস্ত-পায়ে দুর্গে ফিরে গেল। ভোরের আলো ফুটে উঠলেই কামান গর্জে উঠবে। দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে কর্নেল মুনরোর মৃত্যু সংবাদ।

নিঃসঙ্গ কর্নেল মুনরো কামানের সঙ্গে আঁটেপুটে বাঁধা অবস্থায় মৃত্যুর-প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগলেন।

এদিকে অতিরিক্ত পানাহারের জন্য সৈন্যরা প্রায় অচেতন্য অবস্থায় রাত্রি কাটাতে লাগল।

কর্নেল মুনরো বাস্তবিকই অসম সাহসী। ভয় কাকে বলে তাঁর আদৌ জানা নেই। অবিশ্বাস্য তাঁর মনোবল। তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে বার বার ভেসে উঠতে লাগল তাঁর সহধর্মিণী লেডি মুনরোর স্মৃতি।

নানাসাহেব। তিনি ছিলেন একাধিক মানুষ নৃশংস নিধন যজ্ঞের নায়ক। দু-শ’ শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে ইদারার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে কী মর্মান্তিক দৃশ্য!

কর্নেল যার খোঁজে কলকাতা ছেড়ে বেড়িয়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চষে ফেলেছেন তিনি আজ তার হাতের নাগালের মধ্যে। মাত্র কয়েক গজ দুর্গের ভেতরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। চরমতম শত্রুকে এত কাছে পেয়েও তিনি প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে পারছেন না। তিনি নিতান্তই অসহায়, হাত-পা বাঁধা।

পূর্ব আকাশের গায়ে রক্তিম ছোপ উঁকি দিল। ভোরের পূর্বাভাস। দুর্গের প্রহরী সকাল চারটের ঘণ্টা বাজাল। এমন সময় এক অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন ক্যান্টেন মুনরো। জ্বল জ্বলে একটা আলোক শিখা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। নিশ্চল নিথর ভাবে আলোকশিখাটা কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই। চলমান আলোকশিখা। চারমাস আগে সাতপুরা

পাহাড়ের গায়ে যে আলোকশিখাটাকে দেখা গিয়েছিল তাই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যা পর্বতের গা-বেয়ে আজ রাণপুর দুর্গে হাজির হয়েছে। কেউ তার পথ আগলে দাঁড়ায় নি। নানাসাহেবও তার গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ান নি। আসলে তিনি তো জানতেন না একে অনুসরণ করেই ইংরেজ সৈন্য সাতপুরা পাহাড়ে গিয়ে আক্রমণ চালিয়েছে। চলমান এ-অগ্নিশিখার কথা কর্নেল মুনরোও কোনদিন শোনেন নি। তাই তো বিষয় মাথানো দৃষ্টিতে তিনি চলমান অগ্নিশিখাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেটা এগুতে এগুতে এক সময় কামানটার গা-যেঁষে দাঁড়াল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বোরখার মতো লম্বা জামায় মোড়া। ওড়নার মতো কাপড় দিয়ে মুখটাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। পাগলি মশাল-হাতে চলমান পাগলি। আচমকা তার মুখের কাপড়টা খসে পড়ল। শূন্য দৃষ্টিতে সে কর্নেল মুনরোর দিকে তাকিয়ে রইল। নিষ্পলক তার চাহনি।

‘পরিচিত মুখ। খুবই পরিচিত। দীর্ঘ নয় বছরেও এ মুখটা তার স্মৃতি থেকে এতটুকুও ভ্রান হয়নি। তিনি চাপা আত্নানন্দ করে উঠলেন—‘তুমি লরা! লরা! তুমি এসেছ! তুমি আজো বেঁচে আছ লরা!’

লরারি বটে। তিনি ঠিকই চিনতে পেরেছেন। চরম সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী লরারি এসেছেন আলোকশিখা হাতে। না, কানপুরের সে-নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তিনি মরা যান নি। নানাসাহেবের সিপাইরা অন্যান্য হতাহতদের সঙ্গে তাঁকে ইদারায় নিষ্ক্ষেপ করেছিল। সেখানে আধো আলো আধো অন্ধকারে লাশের স্থূপের মধ্যে রক্তাপ্লাবিত অবস্থায় পড়েছিলেন তিনি। ব্যস, সেই থেকে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। তখন থেকেই তিনি প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখা হাতে পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে আর মাঠে-ময়দানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

নির্বাক লরা এবার কয়েক পা এগিয়ে কামানের গায়ে হাতের জ্বলন্ত অগ্নিশিখাটা বুলিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে কি যেন দেখতে লাগলেন।

তাঁর ব্যাপার-স্যাপার দেখে কর্নেল মুনরো চমকে উঠলেন। আগুনের একটা ফুলকি ছিটকে পড়লে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। কামান বিকট আওয়াজ তুলে গর্জে উঠবে। কর্নেল মুনরো আত্নানন্দ করে উঠলেন—‘হায় ঈশ্বর তবে কি স্ত্রীর হাতেই আমার মৃত্যু লিখে রেখেছে! আর সে জন্যই কি অতীতে এত বিপদের হাত থেকে আমাকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছিল?’

এমন সময় কামানের ভেতর থেকে, মৃত্যু-গহ্বর থেকে দুটো হাত ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। কর্নেল মুনরো আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। পরমুহূর্তেই হাত দুটোর মালিকের সম্পূর্ণ দেহটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কর্নেল গলা নামিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন—‘গৌমি! গৌমি, তুমি কি করে এখানে, কামানের নলের মধ্যে এলে?’

গৌমি সেদিন কালাগনির সঙ্গে সাততরে হুদ পেরিয়ে ডাঙায় উঠেছিল। কালাগনি তার কাছ থেকে সরে গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝতে পেরে সে অন্ধকারে গা-ঢাকা দেয়। কোপের আড়াল থেকে ডাকাতদের পরিকল্পনা শুনতে পায়। তার প্রভু কর্নেল মুনরোকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে শুনে সে গোপনে এখানে ছুটে আসে। সবার অগোচরে কামানের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। কর্নেল মুনরোকে যদি সে রক্ষা করতে পারে তবে তো কথাই নেই, নইলে নিজেই তোপের মুখে উড়ে যাবে।

কর্নেল মুনরো বললেন—‘গৌমি ভোরের আলো ফুটে উঠতে আর দেরি নেই। লরাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।’

আর এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় নেই। কারণ, হঠাৎ মশালের আলো থেকে এক টুকরো আগুন কামানের পলতের গায়ে পড়েছে। বলতেটা তিরতির করে পুড়তে পুড়তে ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বিকট আওয়াজ তুলে গর্জে উঠবে। পুরো বিদ্যাপর্বতটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠবে। চমকে উঠবে মানুষগুলো।

হ্যাঁ, ঘটলও তা-ই। কামান গর্জে ওঠা মাত্র লেডি মুনরো স্বামীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

আওয়াজে প্রহরীর ঘুম ভেঙে গেল। সে হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে এলে গৌমি হাতের ছোরাটা অতর্কিতে তার বুকে গাঁথে দিল।

আর এক মুহূর্তও দেরি না করে গৌমি কর্নেল মুনরো আর লেডি মুনরোকে নিয়ে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে দ্রুত নিচে নেমে যেতে লাগল।

কিন্তু হায়! একী সর্বনেশে কাণ্ড! সশস্ত্র ডাকাতরা তাদের পিছু নিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে কর্নেল মুনরো আরো অবাক হলেন। স্বয়ং নানাসাহেব পথ আগলে দাঁড়িয়ে। সামনে-পিছনে মৃত্যুদূত, আর তিনজন অসহায় মানুষ। গৌমি ছুটে গিয়ে ছুরিটা নানাসাহেব-এর বুকে গাঁথে দেবার জন্য হাত তুলতেই তিনি এক ঝটকায় সেটাকে ছিটকে ফেলে দিলেন। গৌমি এবার দু-হাতে তাঁকে জাপ্টে ধরে ফেলল। মনিবকে চিল্লিয়ে বলল—‘স্যার, আপনি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে পালিয়ে যান। আমি—’

তার মুখের কথা শেষ না হতেই মাত্র কয়েক হাত দূর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—‘কর্নেল মুনরো। কর্নেল মুনরো। আমরা এসে গেছি। এই যে—হেঁ যে আমরা।’

কর্নেল মুনরো অতর্কিতে ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখলেন—‘হুদ, মক্কে, ব্যাক্স, ফর্র ও ম্যাকনিল প্রভৃতি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছুটে তাঁর দিকেই এগোচ্ছেন। আর তাদেরই পিছনে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ দাঁড়িয়ে। ডাকাতরা বেহেমথকে ধ্বংস করতে পারে নি। বাড়ি দুটো ধ্বংস করেছে বটে, কিন্তু যন্ত্র-হাতি বেহেমথকে অক্ষত রেখেই পালিয়ে গিয়েছিল।

জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টের দিকে যন্ত্র-হাতি বেহেমথ তীব্র গতিতে ছুটে চলল।

কিছুদূর এগুতেই সমস্যা বাঁধল। সামনে খাড়া পার্বত্য পথ। আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ডাকাতরা দূর থেকে বেহেমথ-এর সমস্যার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গুলিগোলা নিয়ে ছুটে গেল। শুরু হয়ে গেল গুলিবৃষ্টি।

কালাগনি ভালোই জানে, বেহেমথ-এর আরোহীদের গুলির সংখ্যা সীমিত। লড়াইকে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারলেই জয় অবশ্যজ্ঞাবী। তাই কয়েকজন ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেও সে মাথা ঠাণ্ডা রেখেই লড়াই চালাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কী যে দুর্ভাগ্য তার মাথায় চেপেছিল নিজেই জানত না। নইলে সে আচমকা এক লাফে সামনে এগিয়ে আসতে যাবে কেন? সে সামনে এগুতেই হুড-এর বন্দুক থেকে একটা গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে তার বুকে গুঁথে গেল। ব্যস, সব শেষ। কালাগনির রক্তাপুত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্তে এলিয়ে পড়ল।

হায়! বেহেমথ যে অক্ষমতা ঘোষণা করছে। তিরতির করে অনবরত কাঁপছে। তার দম বুঝি নিঃশেষ।

অনন্যোপায় হয়ে সবাই ঝটপট বেহেমথ থেকে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। দৌড়ে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি যেতে পারলেই কোনোরকমে তাদের জ্ঞান রক্ষা হতে পারে।

বেহেমথ কাণ্ডাতে কাণ্ডাতে আরো কিছুটা পথ পাড়ি দিয়ে এক সময় পাহাড়ের গায়ে হেলে পড়ল। বাষ্পের চাপ চরমে উঠে গেছে। এদিকে গতিরুদ্ধ হওয়ায় সে চাপ গেল আরো বেড়ে। ব্যস, চোখের পলকে বিকট আওয়াজ করে বয়লারটা ফেলে গেল। সে কী আওয়াজ! পাহাড়টাও যেন থরথরিয়ে কেঁপে উঠল।

বেহেমথ-এর বয়লার ফাঁটার পূর্ব মুহূর্তে নানাসাহেবকে মুক্ত করার জন্য জনা পাঁচেক ডাকাত তার ছাদে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল। কিন্তু আচমকা বয়লার ফেটে যাওয়ায় তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

সাবাস! সাবাস বেহেমথ। নিজে ধ্বংস হয়েও সে স্রষ্টাদের প্রাণে বাঁচিয়ে গেল।

বেহেমথ-এর বয়লার ফাঁটার বিকট আওয়াজ শুনে ক্যান্টনমেন্ট থেকে গোরা সৈন্যরা ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এল। তাদের দেখে ডাকাতরা পড়ি কি মরি করে জানি নিয়ে সেখানে থেকে চম্পট দিল।

জব্বলপুর শহরের সেরা চিকিৎসক কর্নেল মুনরোর স্ত্রীকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরামর্শ দিলেন, বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে।

পরের দিন চৌঠা অক্টোবর।

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে নিয়ে বোম্বাই যাত্রা করার আগে শেষ বারের মতো বেহেমথকে—বেহেমথ-এর ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য সদলবলে ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। সেখানে গোটা পাঁচেক লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেল। কিন্তু নানাসাহেব-এর লাশ পাওয়া গেল না।

মধ্য ভারতের মানুষ কানামুখে করতে লাগল, তবে নানাসাহেব এখনো জীবিত। তিনি বহাল তব্বিয়তই আছেন!

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে প্রখ্যাত এক চিকিৎসককে দিয়ে তাঁর চিকিৎসা করালেন। স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন তিনি। স্বামীকে চিনতে পেরে বুক জড়িয়ে ধরলেন।

কর্নেল মুনরো স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে নতুন করে সংসার পাতলেন। ক্যান্টন হুড মাদ্রাজে ফিরে গেলেন।

কলকাতা ছাড়ার মুহূর্তে কর্নেল মুনরো রসিকতা করে বললেন—‘আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ হল না ক্যান্টন! ঊনপঞ্চাশটা বাঘ মেরেই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল, কি বলেন? পঞ্চাশ নম্বরটা আর মারা হল না।’

চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপ এঁকে ক্যান্টন হুড তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন ‘কেন? পঞ্চাশ নম্বর যে মারলাম তার সাক্ষী তো আপনি নিজেই। আমার সে পঞ্চাশ নম্বর বাঘ তো কালাগনিই। মানুষ-বাঘ। কেন, মারি নি তাকে?’

অ্যাড্রিফট ইন দ্য প্যাসিফিক

উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুকে মোচার খোলার মতো একটা কেনো ডেউয়ের তালে তালে ভেসে চলেছে। কেনোর যাত্রীদের মধ্যে বয়স্ক একজনও নেই, সবার বয়সই কম। কেনোটা আচমকা একটা দ্বীপের গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। সর্বনাশ! এখন উপায়?

মাত্র জনাকয়েক অল্প বয়স্ক ছেলে দুটো মাতুলযুক্ত কেনোটাকে চালাচ্ছে। ক্রোধান্বিত সমুদ্রের ডেউয়ের চাপে কেনোটা বারবার ডুবে যেতে গিয়েও বারবার ভেসে উঠেছে। জাহাজের চালকরা অল্পবয়স্ক মাওয়ালী ছেলে। মাওয়ালীদের ডাঙার চেয়ে উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গেই বেশি মিতালি। যে পিছনে শক্তভাবে মুঠো করে হাল ধরে বসে সেও বছর তেরোর এক মাওয়ালী ছেলে। নাম তার মোকো। নিউজিল্যান্ডে বাড়ি।

কেনোর সামনের দিকে যে তিনটে ছেলে চোখের তারায় হতাশার ছাপ এঁকে বিবর্ণ মুখে বসে রয়েছে তাদের মধ্যে বেশি বয়স্ক তার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর, নাম ব্রান্ট। আর বাকি দুজনের একজন ডোনাগান অন্য জনের নাম গর্ডন।

মাথা সমান এক একটা ডেউ এসে আছাড় খেয়ে কেনোটার গায়ে পড়ছে, তাই চোখের পলকে চারজনই ডেকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। মোকো কিন্তু কিছুতেই হাল থেকে হাত সরাসে না, হাতের-মুঠো শিখিল পর্যন্তও করছে না। দাঁতে দাঁত চেপে হাল ধরে রেখে মরিয়া হয়ে কেনোটাকে রক্ষা করে চলেছে। একমাত্র তার আন্তরিক প্রয়াসের জন্যই কেনোটা এমন অক্ষত রয়েছে আর চার-চারটে ছেলেও প্রাণে বেঁচে রয়েছে। কেনোটা ডুবু ডুবু হয়েও বারবারই রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে।

আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড একটা ডেউয়ের ধাক্কায় ডেকের কামরার একটা দরজা দুম্ব করে খুলে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুর গর্জে উঠল। আতঙ্কে সবার কলিজা শুকিয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। ধমকে-ধামকে ব্রান্ট আবার তাকে কামরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

এবার আচমকা আর একটা দরজা খুলে একটা ছেলে বেরিয়ে এসে ব্রান্টের কাছে বলল, 'আমি কি তোমার কোন সাহায্যে লাগতে পারি?'

'না, তোমাকে এদিকে কিছুই করতে হবে না। তুমি বাস্কাবাস্কাগুলো দেখাশোনা কর। আশ্চর্য ব্যাপার তো—ওয়েব, সার্ভিস আর ক্রম করছে কি! জরা থাকতে বাস্কাগুলো কেঁদে সারা হচ্ছে, ব্যাপার কী?

ব্রান্ট সবাইকে ধমকে ও ঠেলে ধাক্কিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। আগের চারজনই কেবল বাইরে, ডেকে থেকে গেল।

এবার আর একটা প্রকাণ্ড-ডেউ এসে কেনোটাকে একেবারে লগ্নভণ্ড করে দিল। একটা মাতুলও হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে। তার পালটা ছিঁড়ে একেবারে ফাঁসাফাঁসা হয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ছোট মাতুলটার পালও ছিঁড়ে গেল। চরম সঙ্কট। কেনোটা আরো অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়ে গেল।

আবার একটা ডেউ তীব্র-গর্জন করতে করতে কেনোটার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। এমন সময়, তীব্র আর্তনাদ শুনে ব্রান্ট হৃদদন্ত হয়ে এগিয়ে এল। দেখল, মোকো জাহাজের সামনের গলুইয়ের ফাঁকে, অতিকায় একটা পিপের তলায় পড়ে কাণ্ডাচ্ছে। বেরিয়ে আসার সাধ্য তার নেই।

মোকোকে টানাটানি করে বের করে আনা হল। সারা রাত্রি ক্রোধান্বিত সমুদ্রের সঙ্গে চারটে ছেলে মরিয়া হয়ে লড়াই করে কোনোরকমে কেনোটাকে রক্ষা করতে পারল।

পূর্ব-আকাশে ফুটে উঠল ভোরের আলো। সে আলোকরশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট একটা কালো রেখা দেখা গেল। ছেলে চারটির বুঝতে ভুল হল না, ডাঙা দেখা যাচ্ছে।

হায়! এ কী হল। এত চেষ্টা-চরিত্র সবই বিফলে যাবে নাকি! ডাঙার সিকি মাইল দূরে বালির চরায় কেনোটা আটকে গেল।

ছেলেদের দলের পাণ্ডা ব্রান্ট। সেই বয়সে সবার চেয়ে বড়। ব্রান্ট আর তার ভাই জ্যাক ফরাসি। আর অন্য সবাই ইংরেজ। তারা সংখ্যায় পনেরো জন। তবে গর্ডন ছাড়া, সে আমেরিকান।

ডোনাগানের নেতৃত্বে একদল ছেলে কেনোর একমাত্র ডিঙিটা নিয়ে জলে নামার উদ্যোগ নিতে লাগল। ব্রান্টের খবরদারির ধার তারা ধারে না। আসলে ইংরেজ বলেই ফরাসি কিশোর ব্রান্টের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করতে নারাজ। শেষপর্যন্ত ব্রান্ট ধমক-ধামক দিয়ে সবাইকে নিরস্ত করল।

ব্রান্ট উপায়ন্তর না দেখে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কোমরে রশি বেঁধে তীরের দিকে সাঁতরে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করল। তার পরিকল্পনা, ডাঙায় উঠে রশি টেনে কেনোটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে নাজেহাল হয়ে সে কোনোরকমে কেনোতে উঠে আসতে ব্যর্থ হল।

বরাত ভালো যে, কেনোটার তলা ফেঁসে যায় নি। বালির ওপর চোরাপাথরের ফাঁকে আটকা পড়ে গেছে, বেশি কিছু নয়।

কেনোর সবাই দ্বীপটার দিকে হতাশ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এত কাছে এসেও ডাঙা স্পর্শ করতে পারছে না, কম আপশোষের কথা?

আচমকা আকাশচুম্বী একটা ডেউ এসে অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল। চোখের পলকে মোচার খোলার মতো কেনোটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে দ্বীপের ওপর আছাড় মেলে ফেলে দিল।

এতগুলো ছেলে একটা কেনোয় চেপে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রে এলই বা কি করে? আচমকা জাহাজের দড়ি ছিড়ে যাওয়ায়ই তাদের এ বিপত্তি। ছেলেরা সবাই স্কুলের পড়ুয়া। স্কুলের দীর্ঘ অবকাশে ছেলেরা কেনো নিয়ে সমুদ্র-ভ্রমণে বেরোনের পরিকল্পনা করেছিল। তাদের বাবাদেরও সঙ্গে থাকার কথা ছিল। কাপ্তেন ও লঙ্কর প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই থাকার কথা ছিল। বিধাতার নিমর্ত পরিহাসের ফলেই আচমকা অভাবনীয় ব্যাপারট ঘটবে। অত্যাশঙ্কী ছেলের দল আগের রাতে কেনোতে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে জাহাজ ছাড়ার কথা। রাত্রি একটু গভীর হলে প্রচণ্ড বড় ঊঠল। দমকা ঝড়ের বেগ সামলাতে না পেরে নোঙরের দড়ি ছিড়ে গিয়ে সেটা উদ্ধার বেগে মাঝ সমুদ্রের দিকে ধেয়ে চলল। ছেলেদের বাবারা ও কাপ্তেন প্রভৃতি কেউই কেনোতে ওঠার সুযোগ পেল না।

ঝড়ের-তাণ্ডব বাড়তেই কেনোটা অস্বাভাবিক রকম দোল খেতে লাগল। হঠাৎ মোকোর ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার দেখে তার আশ্রমার কাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হল। সে ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি করে অন্যান্যদের ঘুম ভাঙাল।

পরিস্থিতি দেখে ব্রাউন্টের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। তাদের পরিকল্পনা ছিল কেনোটা নিয়ে নিউজিল্যান্ডের ধার কাছ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু এ যে দেখাচ্ছে তারা প্রায় মাঝ দলিয়ায় হাজির হয়েছে। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখা ব্রাউন্টের মস্ত বড় একটা ক্ষমতা। সে ঝটপট একটা চিঠি লিখে ফেলল। এবার সেটাকে একটা বোতলে ভরে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দিল। উত্তাল সমুদ্রের বুকে ফেলে-দেওয়া বোতলটা কোনোদিন কারো হাতে পড়বে কিনা তার কিছু মাত্রও নিশ্চলতা নেই। তবুও চেষ্টা করতেই হবে।

শেষপর্যন্ত সারারাত্রি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে মোকাবেলা করে কেনোটা এক সময় অজানা-অচেনা একটা দ্বীপের কাছে এসে বলির ওপর আটকা পড়ে গেল। দ্বীপের পাহাড়-বন সবই দেখা যাচ্ছে।

বলির চরাটা পেরোলেই নদীর-মোহনা। দ্বীপই বটে। কিন্তু কেনোয় দাঁড়িয়ে দারা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দ্বীপটার যত দূরে দৃষ্টি যায় খুঁজে দেখতে লাগল মানুষজন কাউকে দেখা যায় কিনা। না, মানুষের চিহ্নও নজরে পড়ল না।

ছেলের দল এবার সতর্ক হল। অজানা দ্বীপে হঠাৎ করে নেমে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। দরকার হলে কেনোতেই থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, জল আর খাবার-দাবার কোনো কিছুই অভাব নেই। সেগুলো খেয়ে কাৎ হয়ে তাদের কেনোতেই পড়ে থাকতে হবে ভাগ্যের চাকা না ঘোরা পর্যন্ত।

মেকো রান্নার দায়িত্ব নিল। আহারাদিও মিলল। রাত্রিটা কেনোতেই তারা কাটিয়ে দিল।

ব্রাউন্টের পরামর্শে ছেলেরা মজুদ খাবার-দাবার খরচ না করার সিদ্ধান্ত নিল। আগে থেকে সাবধান হওয়া ভালো। বরাত্রে কিশল্যা আছে কে জানে? সমুদ্রের পাড় থেকে ঝিনুক কুড়িয়ে এনে ঝোল রান্না করে খেল। আর সামুদ্রিক মাছ তো আছেই। ছিপ-বড়শি কেনোতেই রয়েছে। সমস্যা কিছুই নেই।

ডোনাগান, ব্রান্ট আর গার্ডন অন্যদের চেয়ে বয়সে একটু বড়। তারা সবাইকে সামলে-সুমলে রাখতে লাগল।

ছেলের দল দ্বীপে নেমে প্রতিদিন খাবারের খোঁজে বেরোয়।

একটা ব্যাপার ছেলেদের মাথায় কিছুতেই আসছে না। গভীর রহস্যের ব্যাপার তাদের মনের কোণে দানা বাদল। আসলে তারা এখন কোথায় অবস্থান করছে? কোন মহাদেশ, নাকি কোনো একটা বিশালায়তন দ্বীপ? যদি দ্বীপই হয় তবে খুবই সমস্যা। তবে তো এর চারদিক জলদ্বারা বেষ্টিত থাকবে। তবে এখন থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর যদি মহাদেশই হয়ে থাকে তবে মুশকিল কিছুই নেই।

ছেলেরা মনস্থ করল, পাহাড়টার উঁচুতে, হৃড়োয় উঠে দেখে আসবে আসলে এটা একটা দ্বীপ, নাকি মহাদেশ।

এবার একটা মজার ব্যাপার ঘটল ছেলেরা। তারা নদীতে মাছ ধরছিল। হঠাৎ অতিকায় একটা কচ্ছপ দেখে ফোঁটার ও ইভারসন টপ করে তার পিঠে চাপল। অন্য সবাই তার মুখের দু-ধারে রশি বেঁধে টেনে ধরে রাখল। অবিশ্বাস্য শক্তির সামুদ্রিক প্রাণীটা। তাদের টেনে হিচড়ে নিয়েই জলের দিকে এগোতে লাগল। সার্ভিস আর মেকো কেনো থেকে লাঠি নিয়ে এলে ব্রান্ট সেটা দিয়ে চাড় দিয়ে কচ্ছপটাকে দিল উল্টে। ব্যাস, তার সব কেরামতি খতম হয়ে গেল।

এবার কচ্ছপটাকে খুঁচিয়ে নুন মাখিয়ে এক কোণে রেখে দিল। বেশ কয়েকদিন ধরে তার মাংস দিয়ে উদরপূর্তি করল।

এপ্রিলের প্রথম দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্রান্ট, ডোনাগান, উইলকিন্স ও সার্ভিস বন্দুককাঁধে অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। তাদের শ্রিয় কুকুর ফ্রানকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। কিছু কচ্ছপের মাংস নিল উদরপূর্তি জন্য।

জঙ্গল দিয়ে সামান্য এগোতেই সামনে নদী পড়ল। জল হাঁটুর তলায়। অদ্ভুত ব্যাপার তো! নদী পেরোবার সুবিধার জন্য কে যেন গুচ্ছের খানে পাথরকে পাশাপাশি, প্রায় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে সাজিয়ে রেখেছে। ব্যাপারটা স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেদের মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। এমনটা হওয়ার তো কথা নয়। কাজটা নির্ধাৎ কোনো না কোনো মানুষ করেছে?

কচ্ছপের মাংসে উদরপূর্তি করে অভিযাত্রী ছেলের দল গাছের ফাঁকে, একটা লতাপাতায় ঢাকা জায়গায় রাত্রি কাটাল। ভোরে চোখ মেলে তাকিয়েই সার্ভিস চমকে উঠল, কী আশ্চর্য ব্যাপার! এ যে রীতিমতো একটা জুপড়ি ঘর!

সার্ভিসের ডাকে বাকিরা হুড়মুড় করে ঘুম থেকে উঠে ব্যাপারটা দেখে বিশ্বাসে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোগাড় হল। ঝুপড়ি ঘরই বটে। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানদের ঝুপড়ির কায়দার তৈরি। তারা একে 'এ্যাজুপা' বলে। বেড়া বা দেওয়াল থাকে না। কেবল একটা চালকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়।

অভিযাত্রী ছেলেরা ব্যাপারটা দেখে যারপন্নাই অবাক হল। ঝুপড়ি খান রয়েছে তবে মানুষও অবশ্যই আছে।

দ্বীপটায় এক চক্কর ঘুরে তারা নিঃসন্দেহই হল, এটা সত্যই একটা দ্বীপ বটে। আর চারদিকে সমুদ্র বেষ্টিত।

ব্যাপারটা তাদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। খাবার খাওয়া হলে ফ্যান আশ্চর্যজনক একটা কাজ করল। এক ছুটে সমুদ্রে গেল। গভুষ ভরে জল খেল। সে অবাক না হয়ে পারল না। এ যে রীতিমতো স্বাদু জল। সমুদ্রের জল হলে তো অবশ্যই নোনতা হত। তবে?

এটা আসলে সমুদ্র নয়, বিশালায়তন একটা হ্রদ। আর এটা এমনই বিশালায়তন যে, সমুদ্র বলে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

সকাল হলে অভিযাত্রীরা একটা ভাঙাচোরা নৌকো দেখতে পেল। এটাকে নৌকো না বলে নৌবোর কয়েকটা টুকরো বলাই ভালো। নৌকোটা তাদের মনে আরো কৌতূহল মিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার করল। নৌকো আছে, কিন্তু নৌকোর মালিক?

আর দু-পা এগোতেই তারা অতিক্রম্য একটা বিচগাছের গায়ে ইংরেজি দুটো বর্ণ ও চারটে সংখ্যা দেখে পন্থকে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছটার গুঁড়িতে লেখা রয়েছে, 'এফ. বি. ১৮২৭'।

এবার অভিযাত্রী ছেলেদের, বিশেষ করে ফ্যানের মাথায় পোকা ঢুকল। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি আর ডাকডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দিল।

হ্যাঁ, ছুটোছুটিতে কাজ হয়েছে বটে। তারা একটা গুহার খোঁজ পেল। গুহাটার ভেতরে একটা কাঠের চৌপায়া, অতিক্রম্য একটা কাঠের সিঁদুক ছেড়া-ফাঁটা ও ময়লা কিছু জামাকাপড়, আর কিছু বাসনকোসন দেখতে পেল। চৌপায়াটার বিছানা-চাদর পাতা আছে বটে, কিন্তু মানুষটাই শুধু নেই।

এবার ফ্যান একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। সে ঘেউ ঘেউ করতে করতে মনিবকে একটা ওক গাছের তলায় নিয়ে গেল।

গাছের গুঁড়িটার দিকে চোখ পড়তেই চার অভিযাত্রী সচকিত হয়ে আতঙ্ক উঠল। একটা মানুষের-কঙ্কাল চার হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রয়েছে। দাঁতগুলো বের করা। আর হাড়গোড় ধবধবে সাদা।

তবে? তবে গুহা আর তার ভেতরের জিনিসপত্রের মালিক এ লোকটাই ছিল? নৌকোর মালিকও এই ছিল। গাছের গায়ে খোদাই করা অক্ষর ও সংখ্যাগুলো বলে দিচ্ছে ত্রিশ বছর আগেও অভাগাটা জীবিত ছিল।

কে? কে সে? কি তার নাম? বাড়িই বা কোন্‌ মল্লুক ছিল?

অভিযাত্রী চারজন এবার গুহার ভেতরে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে এক এক করে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরে গেল।

সিন্দুকের ভেতরে সোনার কাঁটায়ুক্ত রূপোর একটা ঘড়ি পাওয়া গেল। তার ঢাকনার ভেতরের দিকে এক ফরাসি ঘড়ি বিক্রেতার নাম খোদাই করা। এবার হাতড়ে হাতড়ে একটা ছেঁড়া ডাইরি বের করল। তার ছেঁড়াপাতার গায়ে স্পষ্টস্বরে নাম লেখা, 'ফ্রাঁসোয়া বাদোয়া'।

লোকটা তবে ফরাসি। জাহাজচুবির ফলে এ দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আর মাথা গোঁজার জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছিল এ-গুহাটাকে।

ফ্রাঁসোয়ার আঁকা খুবই বাজে ধরনের একটা মানচিত্র সিন্দুক থেকে বের করা হল। পাতার কন্ড দিয়ে গাছের ছালের গায়ে কোনোরকমে আঁকা কয়েক কয়েক মানচিত্রটা তৈরি করা হয়েছে। সেটা থেকে জানা গেল প্রায় পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এটি একটি দ্বীপ। আর প্রায় পঁচিশ মাইলের কাছাকাছি। দ্বীপটার কেন্দ্রস্থলে বিশালায়তন, প্রায় পনের মাইল দীর্ঘ একটা হ্রদ রয়েছে। আর, প্রায় সাত-আট মাইল হবে। এর আয়তন এমন বিশাল বলেই একে সমুদ্র বলে ভ্রম হয়।

মানচিত্র দেখে ধারণা করা সম্ভব হল না। দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত। তবে-তবে দক্ষিণ মেরুতে অবস্থিত নয় তো? কোথায়? কোন্‌ মহাদেশে এটা সমুদ্র জলের ওপরে মাথা-উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে?

একটা ছুরি। ব্যস, সিন্দুকে অস্ত্র বলতে আর কিছুই হ'ল মিলল না। বন্দুক পিস্তলের তো প্রশ্নই ওঠে না।

বিচিত্র দুটো বস্তু ব্যবহার করে বন্দুকের কাজ চমৎকার চলিয়ে নিল। একটা লম্বা রশির দু-প্রান্তে দুটো লোহার গোলক বাঁধা। এরকম গোলক নিক্ষেপ করে আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান জঙ্গলি জানোয়ারকে বন্দি করে ফেলে। আর ল্যাসো নামে রশির ফাঁস হচ্ছে দ্বিতীয় বস্তুটা। আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা শিকার ধরতে এটাকেও ব্যবহার করে।

গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে ফ্রাঁসোয়াকে গোঁর দিয়ে তারা কেনোতে ফিরে এল।

ব্রান্ড পরামর্শ দিল শীতের প্রকোপ শুরু হওয়ার আগেই কেনো ছেড়ে কোনো গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

এখন সমস্যা হচ্ছে কেনোর পর্বত প্রমাণ লটবহর বয়ে গুহায় নিয়ে যাওয়া। এ তো আর দু-চারটে জিনিস নয় যে, সবাই মিলে হাতাহাতি বয়ে নিয়ে যাবে।

বহু আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হল কেনো থেকে তক্তা খুলে বড়সড় একটা ভেলা তৈরি করে নেমে গেলে মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। ব্যস, যে কথা সেই কাজ। ছেলের দল কেনোটা থেকে তক্তা খোলার জন্য প্রাণান্ত-প্রয়াস চালাতে লাগল।

প্রায় মাসের শেষের দিকে তুমুল ঝড় উঠল। যাকে বলে প্রলয়ঙ্কর ঝড়। বরাত ভালো যে, কেনো ভাঙার সুবিধার জন্য ছেলের দল আগে ভাগেই তাঁবু খাটিয়ে ডাঙায় উঠে গিয়েছিল। সারাদিন বেনোটা ভেঙে ভেলা তৈরির কাজে মেতে থাকত, আর রাত্রি কাটাতে তাঁবুর তলায়।

সকাল হল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে ছেলের দল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার জোঁগাড়। দেখল, ঝড়ের তাণ্ডবে কেনোটা টুকরো টুকরো হয়ে বালির ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। ঝড়ের সময় সবাই জাহাজে থাকলে কি কলেঙ্কারীই না ঘটে যেত।

কয়েক দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা ত্রিশ ফুট লম্বা ও পনের ফুট চওড়া চমৎকার একটা ভেলা তৈরি করে ফেলল। এবার লটবহর যা ছিল সব তাতে চাপিয়ে অনায়াসে গুহায় নিয়ে এল। একজন ফরাসি নাবিক এখানে জান খুঁয়েছেন বলে গুহাটার নামকরণ করা হল 'ফরাসি-গুহা'।

দূর-সমুদ্র দিয়ে জাহাজ যাওয়ার সময় যাতে দেখতে পায় সে উদ্দেশ্যে সমুদ্র-সৈকতে কেনোর মাস্তুল পুঁতে তার মাথায় পতাকাটা বেঁধে দেওয়া হল।

ছেলেরা দ্বীপের মধ্যে গুহা-জীবন মহানন্দে কাটাতে লাগল। এক্ষেয়েমি থেকে এমন খোলামেলা বন্য পরিবেশ তো খারাপ লাগার কথাও নয়। এ যে রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের ব্যাপার।

একদিন দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ছেলেরা অত্যাচার্য্য একটা দৃশ্যের মুখোমুখি হল। এক জব্ব ফাঁদে আটকা পড়েছিল কোনো এক সময়ে। ফাঁদে আটকাপড়া অবস্থায় খাদ্যের অভাবে সে প্রাণ দিয়েছে। তার দাঁতগুলোর দিকে নজর পড়লেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। কঙ্কালটা এখনো ফাঁদে আটকা পড়ে রয়েছে।

কঙ্কালটাকে ফাঁদ থেকে খুলে দূরে ফেলে দিয়ে ছেলের দল আবার শিকারের প্রত্যাশায় ফাঁদ পেতে রাখল। পরদিন একটা পাখিকে ফাঁদে আটকা পড়ে থাকতে দেখা গেল। এমু পাখি। সেটা অনেকটা উটপাখির মতো দেখতে। অতিকায় মুরগির মতো মুখ। আর গায়ে অসীম শক্তি ধরে।

উজ্জ্বল প্রকাশ করে সার্ভিস বলে উঠল, 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' নামক বই পড়ে উটপাখির বিষয়ে জানতে পেরেছি। খুবই তাড়াতাড়ি এরা পোষ মানে। আমি একে পুষব। পোষ মানিয়ে এর পিঠে চেপে আমিও ঘুরে ঘুরে বেড়াব।'

উইলকক্স এক লাফে গর্তটার ভেতর নেমে গা থেকে কোট খুলে এমু পাখিটার মুখে চাপা দেওয়া মাত্র সে থমকে গেল। এবার গলা আর পায়ে দড়ির ফাঁস পরিয়ে টানটানি করে গুহায় তাকে এনে হাজির করা হল।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখা গেল গুহাটায় এতগুলো ছেলের ঠিকমত স্থান সঙ্কলান হচ্ছে না। তাই ছুরি দিয়ে চূণাপাথরের দেওয়াল কেটে জায়গা বাড়ানোর চেষ্টা পুরোদমে চলতে লাগল।

কদিন যেতে না যেতেই দেখা দিল নতুনতর সমস্যা। ভূতের উৎপাত শুরু হল। গুহাটার ফুট চারেক দৈর্ঘ্য বাড়ানো গেল। কাজ সমান তালেই চলেছে। ব্রান্ট গাঁইতি চালাতে চালাতে আচমকা থমকে গেল। গায়ে রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় বিচিত্র এক কান্নার স্বর-শব্দে গায়ের রোমগুলো কাঁটা দিয়ে উঠল। অবিশ্বাস্য কাণ্ড! দেওয়ালের ভেতরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। গুহায় ঢুকে উৎকর্ণ হয়ে লক্ষ্য করল তারা। হ্যাঁ, দেওয়ালের ভেতরে কে যেন কাঁদছে। ফ্যাকাসে-বিবর্ণমুখে এক ছুটে তারা বাইরে বেরিয়ে এল।

দলের পনেরোটা ছেলের সবাই সে-কান্নার স্বর স্পষ্ট শুনতে গেল। সবার বুকের ভেতরে অনবরত কে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। সবাই ভীত-সম্রপ্ত হয়ে নির্ধুম রাত্রি কাটাল। অত্যাচার্য্য-একেবারেই অবিশ্বাস্য ব্যাপার যেন। রাত্রি বাড়তে ভূতগুলোও যেন ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সকাল হতে না হতেই আবার কঁকিয়ে কঁকিয়ে কান্না জুড়ে দিল। এ কী রহস্যজনক, রোমহর্ষক ব্যাপার রে বাবা!

গর্ভনের পরামর্শে সবাই ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে পাহাড়টার গায়ে কোন ফাটলটাটল আছে কিনা খুঁজে দেখে এল। কোনরকম ফাঁক-ফোকড় বা বর্ণাও নজরে এল না।

বিকেলের দিকে ফিরে এসে দেখা গেল, ফ্যান বে-পাতা। রাত্রি দুটো। দেওয়ালের ভেতর থেকে আবার কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ব্যস, পরমুহূর্তেই কান্না বন্ধ। একেবারে নিরুঝ-নিস্তব্ধ। দলের সবার গায়ের লোম, মাথার চুল কাড়া হয়ে গেল গভীর রাত্রের সে কান্নার স্বর শব্দে।

ভোর হতেই ব্রান্ট শাবল দিয়ে গুহাটা বাড়ানোর কাজে লেগে গেল। আচমকা বিরাট একটা পাথরের টুকরো দুম করে দেওয়াল থেকে খসে পড়ল।

ব্রান্ট এক লাফে দুকদম সরে গেল। শাবলটা হাত থেকে খসে ছিদ্রপথে গলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দেওয়ালের খোঁদল থেকে একটা জানোয়ার বেরিয়ে এল। বান্দারা সমস্তরে গলা ছেড়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিল।

এদিকে জানোয়ারটা এক লাফে খোঁদল থেকে বেরিয়ে এসে জলের পাথ থেকে চৌ চৌ করে জল খেতে লেগে গেল।

জানোয়ারটাকে এতক্ষণে চেনা গেল। আরে এ যে তাদেরই কুকুর ফ্যান। ব্যাপারটা সবার মধ্যে বিশ্বাসের সঞ্চার করল।

হায়! এ কী গভীর রহস্যের বাবা! ফ্যান দেওয়াল ভেদ করে কি করে ভেতরে ঢুকে গেল। তবে কি এখানে কোনো গোপন সুড়ঙ্গ রয়েছে? নাইলে—

ব্রান্ট লঠন জেলে খোদলটার ভেতরে ঢুকল। অন্যসব ছেলেরা দুক দুক বকে তাকে অনুসরণ করল। উইলকক্স আমকা যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা মৃত দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। সে সচকিত হয়ে পা-টা এক ঝটকায় সরিয়ে নিল। লঠনটা কাছে নিয়ে দেখা গেল একটা মরা শেয়াল। টুটিটা ছিঁড়ে ফেড়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। শব্দ কাঠ। বরফের মতো ঠাণ্ডা তার গা। দেওয়ালের ভেতর থেকে ভেসে আসা কঁকিয়ে কঁকিয়ে কান্নার সে রহস্যটা এতক্ষণে ভেদ করা গেল।

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে শেষমেশ নিশ্চিত হওয়া গে, সুড়ঙ্গটা থেকে যাতায়াতের কোন না কোন পথ অবশ্যই রয়েছে। সেদিক দিয়েই বাতাস আসছে। সেজন্যই লঠনটা সহজেই জ্বলতে পারছে। আর যদি বিষাক্ত গ্যাস থাকত তবে সেটা অবশ্যই নিতে যেত। বাইরের দমকা বাতাস সুড়ঙ্গপথে ঢুকে বাঁশির মতো শব্দ সৃষ্টি করত। আর সেটাই দেয়ালের বাইরে থেকে ভূতের কান্না বলে ভ্রম হত। এ সুড়ঙ্গটা দিয়ে ফ্যান এসে রাত দুটো নাগাদ এখানে ঢুকে শেয়ালটার টুটি ছিঁড়ে হত্যা করেছে। ব্যস, আর বাইরে আসতে পারে নি। হয়ত-বা বেরোবার রাস্তাটা পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। তেঁয়াল তার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। তাই তো মুক্তি পাওয়ার পর জলের গামলায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল।

ঝোঁঝুখি করে দেখা গেল একটা লতাপাতার ঝোপের আড়ালে সুড়ঙ্গের মুখটা। ঠিকই, পাথরচাপা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে।

সার্ভিস উটপাখিটার পিঠে চড়ে শখ মেটাবার চেষ্টা করতে গিয়েই বামেলা বাঁধাল। সেটা উদ্ধার বেগে চৌঁচৌঁ দৌড় জুড়ল। দুম করে ছিটকে পড়ল সার্ভিস। হাত পা ভাঙেনি বটে। চোট যা পেয়েছে তাতেই দীর্ঘদিন তাকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে হয়েছে।

নভেম্বর মাস এসে গেল। রবারের একটা ফেল্ডিং নৌকা নিয়ে পাঁচজন দ্বীপটাকে ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়ল। ছোরা, বন্দুক ছাড়াও রেড ইন্ডিয়ানদের অদ্ভুত অস্ত্র ল্যাসো আর বোলা তারা সঙ্গে নিয়ে নিল।

খুব করে পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেরিয়ে দুটো পাহাড়ী ছাগলছানা আর একটা গুয়োনাকো নামে ঘোড়ার মতো শাস্তিশিষ্ট একটা জানোয়ার তারা বন্দি করে নিয়ে এল।

দিনের পর দিন শিকার করতে গিয়ে বন্দুক ব্যবহার করা হচ্ছে। বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা এবার কয়েকটা তীর-ধনুক বানিয়ে ফেলল।

শীতকাল দুয়ারে হানা দিল বলে। প্রদীপ জ্বলে গুহা গরম রাখতে হবে। প্রচুর তেল দরকার। ব্যাপারটা প্রথম ডোনাপানের মাথায় এল। কাঠ দিয়ে চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি করে ফেলল। চারটে চাকাও লাগিয়ে দেওয়া হল তাতে। গুয়োনাকোর ঘারা টানা সেই গাড়িটা দিবা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল। উপসাগরের তীরে এক দল বিশালায়তন সিল মাছ রোদে পিঠ দিয়ে বালির ওপর পড়েছিল। বন্দুক আর পিস্তলের গুলিতে ত্রিশটা সিল মাছ ঘায়েল হল। বাকিরা ঝপাঝপ জলে পড়ে হাফিস হয়ে গেল।

সিল মাছগুলো থেকে বারো পিপে তেল বের করা সম্ভব হল। শীতের তৈয়্যাকি আর কে করে, লড়াই করার মতো অস্ত্র তো প্রচুরই মজুদ।

ডিসেম্বর মাস এলে। ক্রমে একদিন-দুদিন করে মাস প্রায় শেষ হল। বড়দিন এল। দশ দশটা মাস ছেলেরা দ্বীপে কাটিয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। এতদিনের মধ্যে একটা জাহাজের চিহ্নও নজরে পড়ল না। ভবিষ্যতেও কোনোদিন আসবে কিনা তাই বা কে জানে?

শীত জাঁকিয়ে আসার আগে ব্রান্ট গর্ভনের কাছে বলল, ‘ফ্যাসোয়ার ম্যাপে দেখা যায় পূর্বদিক জুড়ে সমুদ্র রয়েছে। আমি চাই নিজের চোখে ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে। তোমার মত আছে তো?’

ব্রান্টের প্রস্তাবে গর্ভন সোন্সাসে মত দিয়ে দিল। ব্যাস, আর দেরি নয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম হুগায় মোকো ও তার ভাই জ্যাককে নিয়ে নৌকা চেপে কিছুটা এগিয়েই হুদে হাজির হল। তারপর পূর্বদিকে এগিয়ে আর একটা নদীতে গিয়ে পড়ল। এবার হাজির হল উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রে। সমুদ্রের গা-ঘেঁষে সারিবদ্ধ বেশ কয়েকটা গুহা তাদের নজরে পড়ল। পাহাড় আর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ছোট-বড় পাথরের চাঁই ছাড়া এদিকে আর কিছু দেখতে পেল না।

চারদিকে চোখের মণি দুটোকে বুলোতে গিয়ে এক সময় জ্যাকের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আচমকা চিল্লিয়ে উঠল, ‘ধোঁয়া! ধোঁয়া!’

ব্রান্ট সচকিত হয়ে দূরবীণটাকে চোখের সমনে ধরে রেখেই বলল, ‘আকাশ আর সমুদ্র যেখানে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে সেখানে ধোঁয়ার মতোই কিছু একটা দেখা যাচ্ছে বটে। তবে ধোঁয়া অবশ্যই নয়।

রাতের আহার কোনোরকমে সারা হল। কিন্তু দুভাইকে ধারে কাছে দেখা গেল না। মোকোর মনটা মোঁচড় মেরে উঠল। হঠাৎ কার যেন কান্নার স্বর শোনা গেল। কে যেন কেঁদে আকুল হচ্ছে। সে সন্তর্পণে এগিয়ে একটা গাছের কাছাকাছি যেতেই থমকে গেল। দেখল গাছটার তলায় বসে ব্রান্ট বিষণ্ণ মুখে বসে। আর জ্যাক তার পায়ের কাছে বসে হাপুস নয়নে কাঁদছে।

সামান্য কথোপকথনের মাধ্যমে কান্নার রহস্যটা উদ্ধার করা গেল। মোকো আবার তেমনি সন্তর্পণে নিজের জায়গায় ফিরে এল।

ওরা দুজনে ফিরে এলে মোকো এবার ব্রান্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, ‘তোমাদের কথোপকথন আমি শুনতে পেয়েছি। জ্যাককে মার্জনা করে দাও ব্রান্ট।

ব্রান্ট সচকিত হয়ে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ‘আমি যদি মার্জনা করিই তবু অন্যরা তো মার্জনা করবে না মোকো।’

‘কাউকে না জানালেই তো হল। আমি কারো কাছে মুখ খুলব না, কথা দিচ্ছি।’

দ্বীপবাসী ছেলেদের মধ্যে এবার দলাদলির সূত্রপাত হল। একজনকে নেতা না বানালে তো আর চলছে না। ভোটভুটি হল। ডোনাপান মাত্র তিনজনের সমর্থন পেল। সে তলে তলে ফুঁসতে লাগল। ব্যাস, এবার থেকে সে তিনজনকে নিয়ে দল থেকে সটকে পড়ার মতলব আটতে লাগল। কারণ-অকারণে ব্রান্টের সঙ্গে তার খিটখিটেরি চলতেই থাকল।

এবার দ্বীপে ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেল। শীত রীতিমতো জাঁকিয়ে পড়েছে। পুরো দ্বীপটা বরফে ডেকে গেল। যেদিকেই তাকানো যায় কেবল বরফ আর বরফ। কেনোতে স্টেটিংয়ের জিনিসপত্র ছিল। এ খেলায় জ্যাকই সবচেয়ে দক্ষ। ডোনাপান আর ক্রসও কোনো অংশে কমতি নয়। স্টেটিং খেলা শুরু হল। ছুটোছুটি করতে করতে ডোনাপান, ক্রস আর জ্যাক জমাটবাঁধা কুয়াশার অন্ধকারে বে-পাতা হয়ে গেল। বুনা হাঁস কোঁজ করার জন্য ডোনাপান কিছুটা এগিয়ে ক্রসকে বিপরীত দিকে টানাটানি করে নিয়ে অন্ধকারে হাফিস হয়ে গেল। জাগুয়ার কবলে পড়ে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও সে দমল না।

কিছুক্ষণ পর জ্যাক একা ফিরে এল। ডোনাপান আর ক্রসের হৃদিস নেই। তাদের কাউকে না দেখে জ্যাক বাঁশি বাজাতে বাজাতে আবার তাদের খোঁজে ছুটতে লাগল।

ব্যাপারটা সবার মধ্যেই আতঙ্কের সঞ্চার করল। কামান দাগা হল। নিশ্ফল প্রয়াস। কেউ-ই ফিরল না। মিনিট দশেক বাদে আবার কামান দাগা হল। বিপরীত দিক থেকে বন্দুক ছোঁড়ার শব্দ বাতাসে ভেসে এল। একটু বাদই ক্রস

আর ডোনাগান ফিরে এল। জ্যাক? জ্যাকের পাভা নেই। ছোট ভাই জ্যাককে খুঁজতে যাওয়ার জন্য ব্রান্ট ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গর্জন তার পথ রুখে দাঁড়াল। সে আগুন জ্বলে দিল তাদের উপস্থিতি জানানোর জন্য।

একটু বাদেই দেখা গেল, জ্যাক উদ্ভাসের মতো ছুটে আসছে আগুনের নিশানটো লক্ষ্য করে। আর তার ঠিক পিছনে জানোয়ারের মতো কি যেন দুটো প্রাণী তেড়ে আসছে।

জাওয়ার? না ভানুক? বিশাল দেহী একটা ভানুক তাকে তাড়া করেছে। ডোনাগান উদ্ভার-বেগে খেয়ে গিয়ে পিস্তলের দুটো গুলিতেই হিংস্র জানোয়ার দুটোকে ঘায়েল করে দিল।

ছোট ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ব্রান্ট তাকে বার বার ধন্যবাদ জানাল।

ব্যস, এবারই তার চারজন দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ডোনাগানের বহুদিনের গোপন পরিকল্পনা এটা। আজ বাস্তবে পরিণত করল। সে ইতিমধ্যে চুপিচুপি ফ্রাসোয়ার মানচিত্রটাকে নকল করে কোটের ভেতরে পকেটে সবত্রে রেখে দিয়েছিল।

৯ অক্টোবর ভানুকের তাড়া খাওয়ার পরই তারা চারজন দল ছেড়ে দিল। পরিকল্পনা আগেই করে রাখা হয়েছিল। দ্বীপটার পূর্ব প্রান্তে ডোনাগান ওয়েব, ক্রস ও ইউলবার বসাবাস করবে। নদীর পাড়ের জঙ্গলে শিকারের অভাব হবে না। অসময়ে বনের ফলমূল দিয়েও প্রয়োজনে দু-চারদিন ক্ষিদে মেটানো যাবে। সেদিকেই আমেরিকা। এ পথে জাহাজ যাওয়াও বিচিত্র নয়। আর জাহাজ দেখলেই কায়দা কৌশলের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দিতে পারবে।

ফরাসি শুয়ায় আশ্রয় নেবার পর ছেলেরা দ্বীপের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামকরণ করেছিল। পূর্বদিকের নদী ইস্ট রিভার, পশ্চিম দিকের নদী জিলাড রিভার আর হুদটার নামকরণ করেছিল ফ্যামিলি হুদ। আর সম্পূর্ণ দ্বীপটার নামকরণ করেছিল 'চারম্যান আইল্যান্ড'। কারণ, তারা যে চারম্যান বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করত।

বিকালের দিকে তারা সমুদ্রের কিনারা ঘেঁষে এগোবার সময় ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। সে সঙ্গে মেঘের কড়কড়ানি আর বৃষ্টি তো রয়েছেই।

বিদ্যুৎ বালসে উঠতে তার আলোয় অতিকায় একটা জানোয়ারকে জল থেকে তীরের দিকে আসতে দেখা গেল। প্রথমে তারা ভেবেছিল সমুদ্রের কোনো দানবটানব হবে হয়তো। শেষমেশ তাদের ভুল ভাঙল। দৈত্য-দানব নয়, বিশালায়তন একটা নৌকো! প্রবল ভড় আর জলোচ্ছ্বাসে ডাঙায় উঠে এসেছে। একটু বাদেই ফের বিদ্যুৎ চমকালে দেখল, নৌকোটার একধারে দুটো মড়া মানুষ পড়ে রয়েছে। তারা ব্যাপারটা নিয়ে কিছু ভাবার অবসর পেল না। বিকট আওয়াজে বাজ পড়ল। আওয়াজ শুনে সবার কলিজার ধুকধুকানি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উর্ধ্বশ্বাশে ছুটে লাগল।

সকালের দিকে প্রলয়ঙ্কর তুফানের তাণ্ডব বন্ধ হল। প্রকৃতি শান্ত হল। ছেলেরা দল লম্বা লম্বা পায়ে নৌকোটার কাছে ফিরে এর। ভাবল, লাশ দুটোকে কবর দেবে।

নৌকোটার কাছে এসেই তারা থমকে গেল। হায়! কোথায় মড়া! মড়া দুটো যে হাফিস হয়ে গেছে!

নৌকার ভেতরে একটা পেতলের ফলকের গায়ের লেখা পড়ে ডোনাগার আঁখকে উঠল। আপন মনে বলল এটা আমেরিকান নৌকো। সানফ্রান্সিসকো থেকে জলে ভেসেছিল। হতভাগা দুটো কি জীবিত, নাকি সমুদ্রের জলে ভেসে গেছে?

ডোনাগান দলত্যাগ করে যাওয়ায় ব্রান্ট আর গর্জন উভয়েই মুষড়ে পড়েছে। ব্রান্ট নিজেকে কোনোরকমে সামলে রেখে গর্জনকে প্রবোধ দিল, দুদিন বাদেই ডোনাগান ফিরে আসতে বাধ্য হবে।

এদিকে ব্রান্ট সমুদ্রগামী জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বালিতে মাতুল গাঁথে তার মাথায় পতাকা বেঁধে দিল। তারপর আরো আকর্ষণীয় ব্যবস্থা করল পতাকার পাশাপাশি একটা বেলুন বেঁধে দিয়ে। সবশেষে একই উদ্দেশ্যে একটা ঘুড়িও বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থা করল। কেনোতে ক্যানভাস ছিল। জঙ্গল থেকে পাকা বেত এনে বিশালায়তন একটা ঘুড়ি বানিয়ে মাতুলটার ডগায় বাঁধতেই শুণু বাকি।

কুকুর ফ্যান হঠাৎ তীব্র স্বরে ডাকডাকি শুরু করে দিল। তার কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে ছেলেরা পড়ি কিমরি করে ছুটে গিয়ে দেখল, একটা গাছের তলায় এক মহিলা বালির ওপর এলিয়ে পড়ে আছে। তার মাথার কাছে বসে ফ্যান অনবরত চিন্তাচ্ছে। সংজ্ঞাহীন মহিলা। তবে দেখে প্রাণের-অস্তিত্ব রয়েছে বটে।

সবাই মিলে অকৃত্রিম সেবায়ত্বের মাধ্যমে মহিলাটির সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনল। আমেরিকান, নাম তাঁর কেট। জাহাজে করে সানফ্রান্সিসকো থেকে চিলি যাচ্ছিলেন। হঠাৎ জাহাজেরই আট জনজলদস্যু যাত্রী কাণ্ডেকের খুন করে জাহাজটাকে কজা করে ফেলল। তাদের দলের পাণ্ডা দুর্ধর্ষ ওয়ালস্টোন। কেট ছাড়া বাকি সবাইকে তারা নিমর্মভাবে হত্যা করল। আর জাহাজ চালাবার জন্য ইভান্সকেও বাঁচিয়ে রাখল। নইলে জাহাজ যে অচল হয়ে যাবে। আফ্রিকার জাহাজ নিয়ে গিয়ে চড়া নামে বিক্রি করে দু-হাতে পয়সা রোজগার করাই ছিল দস্যুগুলোর উদ্দেশ্য।

মাঝপথে যেতে না যেতেই প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। আচমকা জাহাজে আগুন লেগে গেল। উপায়ন্তর না দেখে জলদস্যুরা নৌকা নামিয়ে কেটকে নিয়ে তাতে চেপে বসল।

টেড আর টেডয়ের তাণ্ডব সহ্য করতে না পেরে চোরা-পাথরে ধাক্কা লেগে নৌকার আটজনের পাঁচজন জলে ছিটকে পড়ল। একজনকে হাঙরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছিড়ে ফেঁড়ে খেয়ে ফেলল। এখন বাকি রইল দুজন জলদস্যু। তারা আছাড় খেয়ে ডাঙায় পড়ল। উল্টে-নৌকার আড়ালে পড়ল কেট। ব্যস, সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে জানতে পারল, সাতজন জলদস্যু দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। তারা ইভান্সকে বে-কায়দায় পেয়ে বন্দি করেছে। তাদের সঙ্গে বন্দুক, পিস্তল আর গোলাবর্ষদ যা কিছু ছিল, কোনো কিছুই নষ্ট হতে দেয় নি। সুযোগ বুঝে কেট সরে পড়েছে।

কেটের মুখে ভয়ঙ্কর খবরটা শুনেই ব্রান্ট মোকোকে নিয়ে ছুটল ডোনাগানদের তল্লাসে।

হৃদের জল দিয়ে নৌকা ছুটল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রের অন্ধকার নানতেই তারা ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে আস্ত-জ্বলতে দেখল।

ব্রান্ট নৌকা থেকে সত্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে দেখল, আগুনের ধারে কবল জড়িয়ে কে যেন শুয়ে। অতিকায় একটা জাগুয়ার লকলকে জিব বের করে সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছে।

ব্রান্ট উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে কুড়ল দিয়ে পেছন থেকে হিংস্র জানোয়ারটার মাথায় সজোরে আঘাত হানল।

ইতিমধ্যে অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে এসেছে ওয়েব, উইলকক্স আর ক্রস। কবলে মোড়া লোকটা এবার লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে হচ্ছে ডোনোগান।

ডোনোগান এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে অন্যাব্যদের নিয়ে ব্রান্টের সঙ্গে ফরাসি গুহায় ফিরে এল।

ব্রান্ট বুদ্ধি করে মাস্কুলের মাথা থেকে বেলুনটাকে নামিয়ে আনল। বলা যায় না, বেলুনের নিশানা অনুযায়ী জলদস্যুরা এসে তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে।

ব্রান্ট এবার অদ্ভুত একটা মতলব আটল। অতিকায় ঘুড়িটার সঙ্গে একটা ঝুড়ি বেঁধে শূন্যে, অনেক উঁচুতে উঠে জলদস্যুদের দেখা যায় কিনা দেখবে। সে শুনেছে, কোনো ইংরেজ যুবতী নাকি ঝুড়িতে বসে, ঘুড়ির সাহায্যে আকাশে উড়েছিল। তাই যদি হয় তবে সেই বা পারবে না কেন?

ব্রান্টের ব্যাপার-সাপার দেখে তার ছোট ভাই জ্যাক হাউ-মাউ করে কঁদে উঠল। কঁদতে কঁদতে বলল, তারই জন্য-একমাত্র তারই জন্য, এতগুলো ছেলেকে দুবছর ধরে এ দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। সে রাত্রে ঝড়ের সময় মজা দেখার জন্য কৌতুহল বশত সেই জাহাজের কাছি কেটে দিয়েছিল। তারপরই অঘটনটা ঘটেছিল। তখন থেকেই এতগুলো ছেলের জীবনে নেমে এল চরমতম দুর্ভোগ। ব্যাপারটা এতদিন সে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখেছিল। আজ তার দাদাকে এমন একটা ভয়ঙ্কর কাজ করতে দেখে সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না।

যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এটা নিয়ে এখন আর অন্তর্জালীয় নম্বে মরা নিছকই পাগলামি—ডোনোগান জ্যাককে প্ররোধ দিল।

ব্রান্ট ঝুড়িতে বসে ঘুড়ির টানে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। এক সময় কি যেন দেখে সে তীব্র স্বরে চিল্লিয়ে উঠল, 'আছে! আছে! জলদস্যুরা ধীপেই আছে!'

ব্রান্টসহ ঘুড়িটাকে নিচে নামিয়ে আনতে গিয়েই ঘটে গেল ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা। তারটা ছিঁড়ে গিয়ে ঘুড়ি ব্রান্টকে নিয়ে উড়ে গেল। এক সময় সেটা গিয়ে পড়ল হৃদের জলে। অনেক কষ্টে সাঁতরে সে পাড়ে উঠতে পারল।

এক সকালে ফরাসি-গুহার কান্ডাকাছি এক জায়গায় একটা তামাক খাওয়ার পাইপ দেখতে পেয়ে দ্বীপবাসী ছেলেরা চমকে উঠল। জলদস্যুরা তাবে কাছাকাছিই ঘুর ঘুর করছে।

২৭ নভেম্বর। প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল। ছেলেরা গুহার দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে রইল। হঠাৎ বাইরে ঘনঘন বন্দুকের আওয়াজ শুনে পেল। ভয়ে তাদের আশ্রয়-খাঁচা ছাড়া হয়ে যাওয়ার জোগার হল।

জলদস্যুরা গুহার ওপর চড়াও হয়েছে। পরিস্থিতি সঙ্গীন অনুমান করে ব্রান্ট দরজার আড়ালে বন্দুক-হাতে তৈরি দাঁড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ কে যেন দমদম দরজায় ধাক্কা মেরে আর্তনাদ করতে লাগল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! ভেতরে কে আছে—বাঁচাও!'

কেট উৎকর্ণ হয়ে আর্তস্বরটা শুনেই ছেলের দরজা খুলে দিতে বলল।

দরজা খুলতেই বিধ্বস্ত এক ফরাসি ভেতরে ঢুকে গেল। ফরাসি নাবিক। কোঁ যে জাহাজে ছিল তারই ফাস্ট মেট ছিল লোকটা। নাম তার ইভাস।

ইভাস একটু দম নিয়ে তার চমকপ্রদ পরিস্থিতির কথা বলল। দ্বীপের পূর্বদিকের একটা গুহায় জলদস্যুরা তাকে কয়েদ করে রেখেছিল।

জলদস্যুদের ভয়ে ছেলেরা কঁকড়ে গেল। ধরা পড়ে জান খোয়াবার আশঙ্কায় তারা জঙ্গলে বেরোনে পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। বন্দুক ছোড়াও বন্ধ। আওয়াজ অনুসরণ করে ফরাসি-গুহায় তাদের হানা দেবের সম্ভাবনা তো রয়েছেই। এত সতর্কতা সত্ত্বেও হৃদের ধারের একটা গাছের ডালে বিচিত্র একটা ঘুড়িকে লটকে থাকতে দেখে তারা আশাবিহীন হল।

ওয়ালস্টোন একটা সাক্ষাৎ পরিপাশ। সে ছেলেরদের খোঁজে হনো হয়ে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে ফরাসি-গুহার দরজার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর রেখা দেখে অদূরবর্তী জঙ্গলে বসে তাদের কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছিল।

শয়তান ওয়ালস্টোন পনেরোটা কচি ছেলেকে খুন করে তাদের যন্ত্রপাতিও অন্যান্য জিনিসপত্র হাতানোর চেষ্টায় রয়েছে।

গর্জন এবার নৌকাটা মেরামত করার কথা ভাল। ইভাস ছেলেরদের আশাবিহীন করল। পূর্বদিকে মাইল-ত্রিশেক পাড়ি দিতে পারলেই দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছে যাওয়া যাবে। আর এও বলল, তারা যেখানে আছে সেটা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপের মধ্যে একটা। এর নাম হ্যানোভার আইল্যান্ড। সে এও বলল, সে আর কেট যে ছেলেরদের আশ্রয়ে রয়েছে তা জলদস্যুরা জানে না।

ছেলেরা কিন্তু ইভাসকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না। তাই কেট আর তাকে দক্ষিণ দিকের একটা গুহায় থাকতে দিল। আর সামনের ফরাসি-গুহায় বাকি দুজনের ঝাঁকর ব্যবস্থা করা হল।

ছেলেরা অনুমান করেছিল, জলদস্যুরা ধারে-কাছের জঙ্গলেই লুকিয়ে রয়েছে। সুযোগ বুঝে বন্দুক হুঁড়তে আরম্ভ করবে। কার্যত করলেও তাই।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে ছেলেরা আড়ষ্ট হয়ে গুহার ভেতর পড়ে রইল। ভোরে গুটিগুটি বাইরে বেরিয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখল, এক জায়গায় একটা কাঠের টুকরো খিঁখি করে জ্বলছে। তারা বুঝল, জলদস্যুরা এখানে রাত্রি কাটিয়েছে। ছেলেরদের কথাবার্তা শুনে চম্পট দিয়েছে।

আচমকা বন্দুক গর্জে উঠল। একটা গুলি তো ব্রান্টের একেবারে কানে ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজ লক্ষ্য করে ডোনাগান উন্মাদের মতো ছুটে ছুটে অনবরত বন্দুক ছুঁড়ে লাগল। তার গুলির আঘাতে একজন জলদস্যু প্রাণ খোঁয়াল।

ব্রান্ট প্রাণের মায়ী তুচ্ছ করে পিছন দিক থেকে আচমকা একটা জলদস্যুকে দুহাতে অষ্টোপাশের মতো আঁকড়ে ধরে ফেলল। এক ঝটকায় ব্রান্টকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চেপে বসে জলদস্যুটা তার বুকে ছুরি গেঁথে দিতে উদ্যত হল। ডোনাগান ব্রান্টের সাহায্যার্থে ছুটে গেল। জলদস্যুটা ব্রান্টকে ছেড়ে আচমকা ডোনাগানের পিঠে হাতের ছুরিটা গেঁথে দিল।

ইভান্স দৌড়ে আসতেই জলদস্যুটা ঝোপের ভেতরে ঢুকে মুহূর্তে হাফিস হয়ে গেল।

আহত ডোনাগানকে ধরাধরি করে সবাই ফরাসি গুহার কাছাকাছি আনতেই তারা ভয়ঙ্কর একটা ঘটনার মুখোমুখি হল। এ কী সর্বনশে কাণ্ড! দুজন গাট্টাগোটা জলদস্যুকে নিয়ে ওয়ালস্টোন ফরাসি-গুহার ওপর চড়াও হয়েছে। দেখা গেল, কোন্টার আর জ্যাকের গর্দান চেপে ধরে দুজন জলদস্যু গুহা থেকে বের করে আনছে। আর অন্য এক জলদস্যু নৌকো নিয়ে তৈরি। তাদের নৌকোয় চাপিয়ে দ্বীপের পূর্বদিকে নিয়ে গিয়ে তারা অত্যাচার চালাবে।

ছেলোরা এবার নৌকোর দিকে ছুটল। এমন সময় তাদের পোষা কুকুর ফ্যান গর্জন করতে করতে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গর্দানে সজোরে কামড় বসাল। ওয়ালস্টোন বেগতিক দেখে কোন্টার ও জ্যাককে ছেড়ে দিয়ে ফ্যানকে নিরস্ত করতে ছুটে গেল। ব্রান্ট, ইভান্স ও অন্যান্যরা, কোন্টার ও জ্যাক আহত হতে পারে ভেবে বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। এবার তারা বেধড়ক গুলি চালাতে লাগল। ঠিক তখনই ফরাসি-গুহা থেকে জলদস্যু ফোবর্স দৌড়ে বেরিয়ে এল। সে একেবারে অপ্রত্যাশিত এক কাজ করে বস। জলদস্যু হয়েও সে তার সহকর্মী ওয়ালস্টোনকে সাহায্যনা করে বরং তার ওপরই চড়াও হল। তাকে দমাদম কিল-চড়-লাথি মেরে ঘায়েল করে জ্যাককে উদ্ধার করল। জলদস্যু হলেও তার মধ্যে মমত্ববোধ মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠেছে।

ফোবর্সের ব্যাপার-স্বাপার দেখে জলদস্যু ওয়ালস্টোন প্রথমটায় একটু খতমত খেল। এত সহজে সে যে তার সঙ্গে বেইমানী করবে ভাবতেই পারে নি। সে ঝট করে কোমর থেকে ছুরিটা টেনে নিয়ে ফোবর্সের বুকে গেঁথে দিয়ে বেইমানের প্রতিশোধ নিল।

জ্যাক এবার পিস্ত চাুলিয়ে ওয়ালস্টোনকে ভূপতিত করল।

ইতিমধ্যে জলদস্যুরা নৌকোয় উঠে পড়েছিল। ওয়ালস্টোন ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে কাথড়ে কাথড়ে নৌকোয় উঠতেই তারা নৌকো ছেড়ে দিল।

চোখের পরকে কামান গর্জে উঠল। খরখরিয়ে কেঁপে উঠল সমগ্র দ্বীপটা। একের পর এক কামানের গোলা চলল। নৌকাটার কাছাকাছি গোলাগুলি পড়ল। জল লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই নৌকাটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিন-তিনজন জলদস্যু নিমর্মভাবে প্রাণ খোঁয়াল।

চারম্যান আইল্যান্ড থেকে মোকো এবার একাই কামান দেগে চরমতম শত্রুদের খতম করে দিল।

ভয়ানক আহত ডোনাগান ও ফোবর্সকে ফরাসি গুহার নিয়ে একে গুপ্তাশ্রয় শুরু করা হল। ডোনাগানকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হল। ফোবর্স চিরবিদায় গ্রহণ করল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজের কৃতকর্মের জন্য সবার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে গেল।

রকের অন্তর্ধানের রহস্যটা দুদিন বাতাই জানা গেল। তার নশ্বর দেহটা জানোয়ারদের ধরার জন্য পাতা ফাঁদে পাওয়া গেল। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে গিয়ে সে ফাঁদের মধ্যে পড়ে আটকে গিয়েছিল।

দ্বীপের পূর্বদিক থেকে জলদস্যুদের নিয়ে আসা সুবিশাল নৌকাটার মেরামতির কাজে ইভান্স মেতে গেল।

নৌকাটার মেরামতির কাজ মিটলে ফরাসি-গুহা থেকে যাবতীয় জিনিসপত্র, মায় খোয়াড়ের জঙ্ঘ-জানোয়ারদের পর্যন্ত নৌকায় তোলা হল।

এতদিনের বাসস্থল ফরাসি গুহা ও দ্বীপটাকে ছেড়ে যেতে ছেলেদের কলিজা ফেটে যাওয়ার জোগাড় হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই সমুদ্রের বুকে বহু দূরে একটা কালো মতো কী যেন দেখা দিল। আরো এগিয়ে আসতে বোঝা গেল সেটা একটা জাহাজ। ছেলের দল পতাকা নেড়ে, কেউ-বা হাত নেড়ে জাহাজের লোকজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই জাহাজের লোকজন নৌকারোহী ছেলেদের দেখে মোটেই অবাক হয় নি। দু-বছর আগে ঘটে যাওয়া অত্যাচার্য্য সে কাহিনী কাণ্ডেন খুব ভালোই জানতেন। খবরের কাগজগুলোর পাতায়ও ছেলেদের নিখোঁজের ব্যাপার নিয়ে কম লেখালেখি হয় নি।

জাহাজটা এগিয়ে এসে সতেরো জন আরোহীকে ভুলে নিল। এবার এতগুলো ছেলের নিখোঁজের রহস্যটার কিনারা করা সম্ভব হল।

এ ফ্লোটিং সিটি

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ মার্চ।

লিভারপুলে গিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন জাহাজের একটা বার্থ বুক করে ফেললাম। আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা কয়েকদিনের মধ্যেই পূর্ণ হতে চলেছে। জাহাজে করে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে পৌঁছে যাব নিউইয়র্ক সিটিতে।

সত্যি বলতে কি, গ্রেট ইস্টার্ন যে নিছকই একটা জাহাজমাত্র, তা তো নয়। বরং একে ছোটখাটো একটা পৃথিবী বলা চলে। দূর থেকে দেখলে একে রীতিমতো সমুদ্রের বুকে ভাসমান একটা দ্বীপ বলে মনে হয়।

জাহাজ ছাড়ার পূর্বমুহূর্তের চাক্ষুশ টুকু চাক্ষুশ করার জন্য কাগুনকে অনুরোধ করে জাহাজ ছাড়ার একদিন আগে অর্থাৎ উনিশে মার্চ, জাহাজে চাপার ব্যবস্থা করলাম। পরদিন, অর্থাৎ বিশে মার্চে জাহাজ ছাড়বে।

মালপত্র নিয়ে জেটিতে পা দিতেই এক যুবকের মুখোমুখি হলাম। অদ্ভলোকের মুখটা খুবই পরিচিত মনে হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমার এক দোস্ত আছে। সেও ঠিক এরকমই দেখতে। এখন সে বোম্বাইয়ে। আর সে তো খুবই আমুদে প্রকৃতির। কিন্তু এ অদ্ভলোকটিকে খুবই মনমরা দেখাচ্ছে। মনে হয়ে শোক জ্বালায় জর্জরিত।

শেষপর্যন্ত ভাসমান শহর গ্রেট ইস্টার্নে পৌঁছতে পারলাম জেটি থেকে তিন মাইল পথ নৌকায় পাড়ি দিয়ে।

মালপত্র লটবহরসহ জাহাজে উঠে গেলাম। জাহাজে ওঠার পর চুপটি করে বসে থাকা সম্ভব হল না। জাহাজে উঠে গিয়ে প্যাডল-বাল্লটাকে দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। বার ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট কেবলমাত্র প্যাডল-বাল্লটারই ওজন নব্বই টন, ভাবা যায়!

জাহাজের ভেতরের অবিস্থাস্য ব্যাপারসাপর দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। মায় ইঞ্জিন ঘরের লাগোয়া একটা হোটেল পর্যন্ত রয়েছে দেখতে পেলাম।

জানতে পারলাম, বিশে মার্চ গ্রেট ইস্টার্ন-এর নোঙর তোলার কথা থাকলেও ছাড়তে কিছু দেরি হবে। জোর কদমে সারাইয়ের কাজকর্ম চলছে।

গ্রেট ইস্টার্ন মোট বিশবার আটলান্টিক অতিক্রম করেছে। কিন্তু শেষের দিকে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনার ফলে জাহাজটা বাতিল হয়ে যায়। এটা যাত্রীবাহী জাহাজ হলেও এতে আর পা দিতে কেউ উৎসাহী হত না। শেষ অবধি পরিস্থিতি এমন হল যে, এমন বিশালায়তন একটা জাহাজ নষ্ট হয়ে যাবার জোগার হল।

সে সময়ে আটলান্টিকের তলদেশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তার টানার ব্যাপার নিয়ে মহা মুশকিল দেখা দিল। ছোট জাহাজে তার পাততেই ইঞ্জিনিয়াররা রীতিমতো ফাঁপড়ে পড়ে যায়। কিন্তু গ্রেট ইস্টার্নকে অন্য সব কাজ থেকে বাতিল করে দেওয়ার পর দেখা গেল একাজে এটাই অভুলনীয়। একুশ শ' মাইল দীর্ঘ এবং পঁয়তাল্লিশ শ' টন ওজন বিশিষ্ট ধাতব তার গ্রেট ইস্টার্ন ছাড়া আর কোনো জাহাজই বা বহিতে সক্ষম?

এমন বিপুল পরিমাণ ওজন বহিতে হলে বিশেষ বন্দোবস্ত করতেই হবে। সে জন্যই তো বিশালায়তন তিনটে ফানেলের মধ্য থেকে একটাকে, অতিকায় ছটা বয়লারের মধ্য থেকে দুটোকে তুলে নেওয়া হল। সেখানে একটা জলের ট্যাঙ্কে স্থান দেওয়া হল। জলীয় বাষ্প যাতে তারগুলোকে বরবাদ করে না দেয় সে জন্য সেগুলোকে ট্যাঙ্কের জলে ডুবিয়ে রাখা হল।

তার পাতার কাজ মিটে গেলে বিশালায়তন জাহাজটা বন্দরে পড়ে রইল। ফ্রান্সের একটা প্রতিষ্ঠান এবার এতে উৎসাহী হল। তারা কাড়িকাড়ি অর্থ ব্যয় করে গ্রেট ইস্টার্নকে যাত্রী বহনযোগ্য করে তোলার মতলব আঁল। লিভারপুলের একটা প্রতিষ্ঠানকে কনট্রাক্ট দিল, কাজ সম্পন্ন করার জন্য অন্য একটা প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল। তাই তো পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে জাহাজ নোঙর তুলতে পারছে না।

দিনরাত পুরোদমে কাজ করে ঠিক হল গ্রেট ইস্টার্ন ছাব্বিশে মার্চ ফের নোঙর তুলবে।

খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলাম, জাহাজে বার শ' থেকে তেরো শ' যাত্রী যাত্রা করবে।

ভাসমান-শহরটার অত্যাশ্চর্য ব্যাপার-সাপার, মেরামতি কাজকর্ম অতুল্য অগ্রহের সঙ্গে দেখে বেড়াতে লাগলাম।

তাকে দেখে এবার ঠিকই চিনতে পারলাম। জেটিতে সেদিন একেই দেখেছিলাম বটে। তার নাম ফেবিয়ান। আমেরিকা চলেছে এক মাসের ছুটির দিনগুলো উপভোগ করতে। ভারত থেকেই এসেছে। গোদাবরি জাহাজে চেপে এ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিষণ্ণ মুখে ফেবিয়ান কথাটা হুঁড়ে দিল, 'মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য দেশ পর্যটনে বেরোতেই হল।

নোঙর তুলতে গিয়েই প্রথম দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। এ কাজের জন্য জাহাজের গলুইতে ছেষ্টি অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন বসানো ছিল। সিলিভারের মাধ্যমে বয়লার থেকে বাষ্প চালান দিলে তার চাপে তীব্র গতিতে সেটা ঘুরতে আরম্ভ

করে। চাকার গায়ে শেকল জড়িয়ে নোঙরটাকে দিবা তুলে আনে। সময় মতো দেখা গেল, ইঞ্জিনটা কর্তব্য পালন করতে অক্ষমতা প্রকাশ করল। তাই অনন্যোপায় হয়ে পঞ্চাশজন খালসি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাতে চাকাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নোঙরটাকে তুলে আনতে লাগল।

ধীরগতিতে কাজ হচ্ছে দেখে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মান্ন-বয়সী একজন লোক ঠাঠা ভাষাশা করতে লাগল। মোন্দা কথা, পথচলার সঙ্গী হিসেবে অলোকটিকে আমার খারাপ মনে হল না।

আচমকা চারদিকে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেল। যাকে বলে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড বেঁধে গেল। যারা যারা ক্যান্টিনবার ধরেছিল তারা সবাই দমাদম ছিটকে জলে পড়ে যেতে লাগল। আসলে যন্ত্রের একটা দণ্ড হঠাৎ ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েই এ-প্রমাদ ঘটেছে। ফলে চাকাটা বিপরীত দিকে চক্র মারতে শুরু করেছে। 'আর ক্যান্টিনটাকে শেকলের ভায়ে দমিয়ে রাখতে পারছে না। ফলে দণ্ডটার আঘাতে কেউ মারা গেল, কারোর মাথা ফাটল, হাত-পা ভাঙল আর কেউ হুমড়ি খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল।

তিব্বক দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সহযাত্রীটা বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে উঠল, 'সমুদ্রযাত্রায় শুরুটা দেখছি চমৎকারই হল!'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, বলেছেন ঠিকই, খুব খারাপই বটে। চোখ তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে এবার বললাম, 'আপনার নামটা—'

'ড. পিটফার্স।'

আঠাশে মার্চ। সেদিন সাকালে কাণ্ডেন ফেব্রুয়ারি-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে আর একজন সৈন্যবিভাগের অফিসারও রয়েছেন। পেঁটা চেহারা। ইয়া লম্বা গাঁফ। চোখে-মুখে সাহসিকতার ছাপ সুস্পষ্ট। ফেব্রুয়ারি পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ইনি ক্যাপ্টেন কর্শিকান। আমার বন্ধু। ভারতীয় সৈনিক।'

গ্রেট ইস্টার্নকে দেখে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর খোলটা তৈরি করতেই দশ হাজার টন লোহা ব্যবহার করা হয়েছে। জল-নিরোধক কামরা রয়েছে ভেতরে ও সামনের দিকে। জল বা আগুন কোনো কিছুই এটার ক্ষতি করতে পারবে না। ত্রিশ লাখ নাটবল্ট ব্যবহার করে লোহার পাত্তললোকে জোড়া হয়েছে। দশ হাজার যাত্রী বহন করাও এর পক্ষে সমস্যা নয়।

সর্বমোট ছ'টা মাফুল আর পাঁচটা ফানেল ডেকের ওপর বসানো রয়েছে। পাঁচ হাজার চারশ' বর্গফুট ক্যানভাস ব্যবহার করা হয়েছে। দু-শ' সাত ফুট লম্বা মাফুলটা খাড়াভাবে অবস্থান করছে। আকাশচুম্বী এ-মাফুলটার তুলনায় নোটারডামের বিখ্যাত গির্জাটাও যেন অনুচ্চ স্বীকার করতেই হবে।

গ্রেট ইস্টার্ন অনবরত চলার পর ক্ষুদ্র সমুদ্র এক সময় শান্ত হয়ে এল। বিশালায়তন জাহাজটাও সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রকাপে মোচার-খোলার মতো দুলতে লাগল। চোখের সামনে দূরবীণ লাগিয়েও কোনো ফল পাওয়া গেল না। প্রয়াস একেবারেই নিষ্ফল হল। ডাক্তার চিকুমাও নজরে প'ড়ল না।

দূরবীণ হাতে ডেকের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় ড. পিটফার্স ফ্যাকাশে-বিবর্ণমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন তীতি ও অস্থিরতাটুকু লক্ষ্য করে বলে উঠলাম, 'ড. পিটফার্স। এতই যখন ভয় তবে খামাখা এলেন কেন?'

বিষণ্ণমুখেই ড. পিটফার্স জবাব দিলেন, 'জাহাজডুবি দেখার শখ মেটাতে। এর আগেও বেশ কয়েকবার এতে চেপছি। গ্রেট ইস্টার্ন-এর ধ্বংস স্বচক্ষু প্রত্যক্ষ করার জন্যই বারবার এতে চাপছি।'

'কম হলেও বিশবার ভো হবেই এই জাহাজটা আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেছে। আরও অনেকবারই পারাপার করার ক্ষমতাও এর আছে।'

ড. পিটফার্স দৃঢ়তার সঙ্গেই মন্তব্য করলেন, 'বাদ দিন তো মশাই! এ জাহাজের ওপর অভিশাপ রয়েছে। নোঙর তোলা থেকে কেমন হ্যাপা পোহাতে হচ্ছে, দেখেছেন তো? এর সৃষ্টিকর্তা ব্রানেল ও ইঞ্জিনিয়ারকেও মর্মান্তিক-মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। আর এর মালিকানা লাভ করে বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের মালিককে সর্বস্ব খোয়াতে হয়েছে। উদাহরণের অস্ট্রেলিয়ার পার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একে তৈরি করা হয়েছিল। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, আজ অবধি এটা অস্ট্রেলিয়ার বন্দরের মুখ দেখতে পায়নি। গতিবেগে, কথা যদি বলেন তবে আমি বলব, অন্য জাহাজের তুলনায় এর গতি নিছকই খুব নগণ্য। একজন সুদক্ষ কাণ্ডেন এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরই নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হয়ে পড়েন। বহু চটকদার গল্পকথা গ্রেট ইস্টার্নকে কেন্দ্র করে লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। এমন কথাও শোনা যায়, যে লোক কোনোদিন আমেরিকার বনবাদাড়ে পথ হারায় নি সে গ্রেট ইস্টার্নে উঠে পথ হারিয়ে নাজেহাল হয়েছে। মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে সবার আগ্রহ সম্বন্ধে অনুমান করে নিয়ে পুনরায় বললেন, 'এমন কথাও শোনা যায় গ্রেট ইস্টার্ন-এর বয়লারে নাকি এক ইঞ্জিনিয়ার পড়ে গিয়ে সেদ্ধ হয়েছিলেন। লিভারপুল থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে যাওয়ার সময় এমন ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটেছিল। সেটা ছিল এর উনিশতম যাত্রা।'

'তাই বুঝি! কই, শুনিনি তো!'

ডা. পিটফার্স এবার এমন ভয়ঙ্কর এক কাহিনীর অবতারণা করলেন যা শোনার সময় গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে যায়, রক্ত হিম হয়ে আসে। একদিন প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কবলে পড়ে কোনোরকমে নিশ্চিন্ত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। আসলে প্যাডেল বেকে গিয়েই এমন বিপত্তিটা ঘটতে চলেছিল।

জাহাজ প্রচণ্ড দোল খাওয়ায় তিন টন ওজন বিশিষ্ট একটা ট্যাঙ্ক স্থানচ্যুত হয়ে রেলিংটা একেবারে ভেঙেচুরে একসার হয়ে গিয়েছিল। মাছুল টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পাল ছিড়ে ফেঁসে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ইঞ্জিনটাও ঘায়েল হয়। আরও কত যে অঘটন ঘটেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। সাতদিন ধরে অনবরত একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মোন্সো কথা, ড. পিটফার্জ রসিকতা করুন আর যা-ই করুন না কেন গ্রেট ইস্টার্নের ধ্বংস সম্বন্ধে তাঁর মনে এতটুকুও দ্বিধা আছে বলে মনে হল না। অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।

সকাল হল। কিন্তু তবুও সমুদ্র শান্ত হল না। সকাল নটার কাছাকাছি সমুদ্রের বুকে মাইল তিন-চার দূরে কালো মতো কি যেন একটা দেখা গেল। জাহাজ? নাকি কোনো মরা ভিড়ি জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন কি ডুবে-যাওয়া কোনো জাহাজের তলদেশ হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ব্যাপারটা নিয়ে গ্রেট ইস্টার্নের যাত্রীদের মধ্যে বাজি ধরার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

গ্রেট ইস্টার্ন তার কাছাকাছি যেতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, যে কালো বস্তুটাকে নিয়ে এত জল্পনাকল্পনা সেটা আসলে একটা উল্টানো জাহাজের তলদেশ।

ড. পিটফার্জ-এর বক্তব্য থেকে গ্রেট ইস্টার্ন-এর বহু অদ্ভুত যাত্রীর কথা জানতে পারলাম। এক রসায়নবিদ নাকি একটা গরুর দেহের যাবতীয় পুষ্টিটুকু নিঙড়ে নিয়ে চমৎকার একটা মাংস-বড়ি তৈরি ফর্মুলা বের করেছেন। মাত্র পাঁচটা শিলিং-এর বিনিময়ে একটা বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। অন্য আর একজন একটা বাপ্পীয় ঘোড়া তৈরি করেছেন। ঘোড়াটার কলকজা নাকি ঘোড়ার ডালার ভেতরে রক্ষিত থাকবে। চাবি ঘুরিয়ে দম দেওয়া মাত্র চলতে আরম্ভ করবে। আর এক ফরাসি ভদ্রলোক এমন বিশেষ এক ধরনের খ্রিশ হাজার পুতুল নিয়ে আমেরিকায় চলেছেন, যে ইয়াক্সি ভাষায় 'বাবা' কথ্যটাকে স্পষ্ট ও মিষ্টি-মধুর স্বরে উচ্চারণ করতে পারে।

চব্বিশ ঘণ্টায় তিন শ' মাইল পথ যে-কোনো জাহাজই অতিক্রম করতে সক্ষম। কিন্তু গ্রেট ইস্টার্ন? ছত্রিশ ঘণ্টায় মাত্র তিনশ বিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে।

আমি ড. পিটফার্জ-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফেবিয়ান-এর কাছে এলাম। ডেকে দাঁড়িয়ে তিনি সমুদ্রের ঢেউ দেখছেন। আমি বিরক্ত না করে পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁকে দেখতে লাগলাম।

এক সময় সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি বললেন, 'লক্ষ্য করে দেখ, ঢেউগুলো যেন ঠিক ইংরেজি 'এল' আর 'ই'-এর মতো দেখতে।'

আমি তার কথার মাথামুণ্ডে কিছুই ঠাঁহর করতে পারলাম না। সে কেন যে হঠাৎ এমন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে আমার বোধগম্য হল না।

আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'ফেবিয়ান, তোমার কি হয়েছে, বল তো?'

'বুকের ব্যামো! বাঁচার কোনো উপায়ই নেই। এ ব্যামো সারাবার মতো ওষুধ আজও আবিষ্কার হয় নি'। প্রসঙ্গটাকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে সে গুটিগুটি নিজের কেবিনের দিকে হাঁটতে লাগল।

পরদিন ছিল খ্রিশে মার্চ। সেদিন সন্ধ্যায় কাণ্ডেন কর্সিকান-এর সঙ্গে কথা বলে ফেবিয়ান-এর বুকের ব্যামোর ব্যাপারটা জানতে পারলাম। খুবই মর্মান্তিক কাহিনী। বোম্বাইয়ে এলে হজেন নামে এক যুবতীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উভয়েরই ইচ্ছে ছিল বিয়ে-থা করে সংসার করে। কিন্তু মেয়েটার বাবা কলকাতার এক ব্যবসায়ীর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে পাকা করে ফেলে। এর ফলে নাকি তার ব্যবসার ক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধে হবে। তাই মেয়ের মতামতের কোনো মূল্যই দিল না। বাস, ফেবিয়ান তারপর আর কোনোদিন মিস হজেনকে দেখতে পায় নি।

'এলেন হজেন? হয়তো সেজন্যই সমুদ্রের ঢেউগুলোর মধ্যে সে 'ই' আর 'এল'-এর কল্পনা করছিল। ভালো কথা, এলেন—এর স্বামীর নাম কি, বলুন তো?' আমি কাণ্ডেনকে প্রশ্ন করলাম।

'তাঁর স্বামীর নাম হ্যারি—হ্যারি ড্রেক।'

'হ্যারি ড্রেক? আরে সে তো এ জাহাজেরই যাত্রী!' কাণ্ডেন কর্সিকান আথকে উঠে বললেন, 'সে কী! বলছেন কী মশাই!'

তাঁর মুখের কথাসেহ হবার আগেই আমাদের সামনে দিয়ে হ্যারি ড্রেককে যেতে দেখলাম। আমি তার দিকে অস্বলি-নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতেই কাণ্ডেন কর্সিকানের চোখ দুটো হঠাৎ জ্বল-জ্বল করে উঠল। পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'লক্ষ্য রাখতে হবে তারা কেউ যেন কাউকে চিনতে না পারে। চিনে ফেললেই কলেক্টারী হয়ে যাবে কিন্তু। হ্যারির-ওপরে পাগলা কুকুরের মতো ফেবিয়ান জাঁপিয়ে পড়বে। খুন করে তবে ছাড়বে। ধন্দ্বুদ্ধে অবতীর্ণ হ্যারি-র মৃত্যু অবধারিত। এ তো আর আপনার অজানা নয়, মেয়েরা স্বামীকে যতই ঘৃণা করুক না কেন স্বামীর হত্যাকারীকে কখনই বিয়ে করে ঘরসংসার পাততে রাজি হয় না।'

পরদিন ড. পিটফার্জের সঙ্গে কাণ্ডেন কর্সিকান-এর আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম। পিটফার্জের মুখ থেকে গ্রেট ইস্টার্ন-এর প্রসঙ্গ-কাহিনী কাণ্ডেন কর্সিকানকেও শুনতে হল।

কথা প্রসঙ্গে বেশ রাগত স্বরেই ড. পিটফার্জ বলে উঠলেন, 'কাণ্ডেন, এ জাহাজে যে প্রতি রাতি ভূত ঘুরে বেড়ায় আপনার জানা আছে কি ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাণ্ডেন জবাব দিলেন, 'কি বললেন, ভূত? আপনি কি ভূত-প্রেত বিশ্বাস করেন ?'

'করি। অবশ্যই বিশ্বাস করি। এতগুলো লোক কি আর মিথ্যা কথা বলছে মশাই ? অফিসার থেকে খালাসি পর্যন্ত সবাই দেখেছে। অন্ধকার নেমে এলেই জাহাজে একটা ছায়ামূর্তি চলাফেরা করে। এক সময় হঠাৎ হাফিস হয়ে যায়। ব্যস, আর দেখা যায় না।'

কাণ্ডেন কর্সিকান উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে, আজ রাতেই তবে ভূত দেখা যাক, কি বলেন ?'

পরদিন পয়লা এপ্রিল। কাণ্ডেন কর্সিকান-এর মুখে শুনতে পেলাম—গত রাতি ড. পিটফার্জকে হতাশ হতে হয়েছে। ভূত দেখার চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভূত দেখা দেয় নি। তিনি একদম অগ্রস্থতে পড়ে গেছেন।

হতাশার প্রতিমূর্তি ফেবিয়ানকে ডেকের ওপর পাশাপাশি করতে দেখলাম। শূন্য দৃষ্টি। মুখে টু-শব্দটিও নেই। তার ভাবনার ছেদ না ঘটিয়ে মুখবুজে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম।

ঠিক তখনই হ্যারি ড্রেককে বার কয়েক পাশ দিয়ে ঘুরে যেতে দেখলাম। জানি না আমার দেখার ভুল কি না, হ্যারি ড্রেক যেন প্রতিবারেই ফেবিয়ান-এর দিকে বিদ্রোহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গেল।

হ্যারি ড্রেক-এর চাহনির বিশেষত্বটুকু ফেবিয়ান-এরও নজর এড়ায় নি। তাই সে আর একবার তার দিকে চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বলল, 'লোকটা কে, বলতে পারেন ? চাহনি মোটেই ভালো লাগল না।'

আমি তাকে চিনি না বলে কথাটাকে চাপা দিয়ে দিলাম।

তেসরা এপ্রিল। আমি আর কাণ্ডেন কর্সিকান ডেকের ওপর পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম। হ্যারি আর ফেবিয়ান-এর মধ্যে বিবাদ তখনও শুরু হয় নি। কাণ্ডেনের সঙ্গে এ-প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলতে বলতে তাঁর জাহাজ চালানোর সতর্কতার ব্যাপারসমূহের গুলো লক্ষ্য করতে লাগলাম। কয়েকদিন আগেই ভাসমান হিমশৈলের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে একটা জাহাজ মারাত্মক রকম ঘায়েল হয়েছে। তাই প্রতি আধঘণ্টা বাদে বাদে সমুদ্র থেকে বালতি দিয়ে জল তুলে তুলে তাপমাত্রা মেপে চলেছেন। জলের তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রিও কমে যায় তবে পথ পাশ্চিমে তিনি অন্য পথ ধরবেন।

এবার জাহাজের পিছন দিকে, অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। চেহারা দেখেই কাণ্ডেন কর্সিকান ঠিক চিনে ফেললেন। বললেন, 'ফেবিয়ান'।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি তাঁর ধরণা অস্বাভাবিক। জাহাজের ওপরের ডেকের দিকে নিম্পলক চোখে তাকিয়ে তিনি। আমি তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ধরে ডাকলাম। নিরুত্তর। আমার ডাক তাঁর কানে গেল না।

কাণ্ডেন কর্সিকান ডাক দিল।

ফেবিয়ান চমকে উঠে মুখের কাছে আঙুল নিয়ে গলা নামিয়ে বলে উঠল 'চুপ! চুপ করুন!' কথাটা বলতে বলতে ওপরের ডেকের একান্তে অস্পষ্ট চলন্ত ছায়ামূর্তির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, 'ব্ল্যাক লেডি! ওই দেখুন ব্ল্যাক লেডি।'

মুখ তুলে ছায়ামূর্তিটার দিকে চোখ ফিরিয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিটা দেখেই বুঝতে পারলাম, এক মহিলা। বোরখার কায়দায় তৈরি একটা জামা তার পরনে, ওড়নার মতো এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে রাখা।

ফেবিয়ান অনুচ্চকণ্ঠে এবার বলল, 'পাগল! পাগল ছাড়া কিছু নয়!' সে আগের মতোই আগ্রহী-নজর মেলে অগ্রসরমান ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহিলাটির দিকে এক পা দু-পা করে এগিয়ে যেতে লাগল।

ব্ল্যাক লেডি অত্যুজ্জ্বল চোখের-মণি দুটো মেলে ফেবিয়ান-এর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ নিজের বুকের ওপর একটা হাত রাখল। মনে হল হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করে নিল। পর মুহূর্তেই ঘুরে দাঁড়াল। লম্বা-লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফেবিয়ান আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'এসেছে! সে এসেছে! এসেছে....এসেছে!' পরমুহূর্তেই সম্মিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, 'ভুল! বিলকুল ভুল ! দেখার ভুল!'

কাণ্ডেন কর্সিকান তাকে জাস্টে ধরে সেখান থেকে নিয়ে চলে গেলেন।

হ্যাঁ, ফেবিয়ান ঠিকই দেখেছে। এতটুকুও দেখার ভুল তার হয়নি। বরাতগুণে তারা উভয়ে, ফেবিয়ান ও এলেন আবার কাছাকাছি এসেছে। সে আর একটা কথা একদম ঠিক বলেছে, এলেন-এর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। সে এখন রীতিমতো এক উন্মাদিনী। লম্পট চরিত্রহীন হ্যারি ড্রেক-এর গৃহিণী হওয়ার পর নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার আর দুঃখ-যন্ত্রণা তার মনের ওপর কঠোর আঘাত হেনেছে। আজ সে একজন বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া কিছুই নয়।

আমরা উভয়ে ফেবিয়ানকে খুব করে বোঝালাম। তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম, তাকে আর এলেন-এর কাছাকাছি যেতে দেওয়া হবে না।

কিন্তু আমাদের কথায় ভগবান বোধ হয় নির্ভূত আড়াল থেকে মুচকি হাসলেন। আমাদের পরিকল্পনাকে ভেঙে দিয়ে যা আশঙ্কা করেছিলাম বাস্তবে ঘটলও তা-ই।

বিকেল চারটেতে ডেকের ওপর এক নকল রেসের ব্যবস্থা করা হল। জাহাজের বারজনের মতো নকল ঘোড়া সেজে দৌড়োতে অগ্রহ প্রকাশ করল। তাদের বারজনের ওপর বাজি। বাজিও ধরল অনেকেই। আমি লক্ষ্য করলাম, হ্যারি ড্রেক অনর্গল অপ্রয়োজনীয় কথা বলে চলেছে। তাকে কিছু কেউ মোটেই আমল দিচ্ছে না। বাজি ফেবিয়ানও ধরেছে। তবে নিতান্তই নিষ্পৃহ-নির্লিপ্তভাবে।

রেস হল। এক স্কচ থালাসি জয়ী হল।

রেস শেষ হতেই হ্যারি ড্রেক চিল্লিয়ে উঠল, 'না, এ কিছুতেই মানা যায় না, রেস ঠিকঠাক হয় নি। রেস আবার হোক।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ফেবিয়ান ঠাণ্ডা মাথায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'না, রেস আর হবে না, কিছুতেই হবে না। রেসে কোনোরকম কারচুপি ছিল না। পরাজিত আমিও। তবুও—'

'আপনি? আগ বাড়িয়ে মাতব্বির করতে এসেছেন, রেস কাকে বলে আমাদের শেখাতে চাইছেন?'

তাদের বিবাদ ক্রমেই তুমুল থেকে তুমুলতর হতে চলেছে। ঠিক সে মুহূর্তেই কাণ্ডের কর্সিকান উভয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ফেবিয়ানকে জাপ্টে ধরে সেখান থেকে নিয়ে যেতে লাগলেন। যেতে যেতে সে তর্জন-গর্জন করতে লাগল, 'সুযোগ একবার যদি পাই, তোমার সব কয়টা দাঁত ফেলে তবে আমি ক্ষান্ত হব।'

পাঁচই এপ্রিল। সকালে আমি ফেবিয়ান-এর কেবিনে গেলাম। সে নেই। আচমকা যেন একটা হৌচট খেলাম। ভাবলাম, এলেন-এর কাছে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক এক করে সব কয়টা কেবিনের সামনে দিয়ে চক্কর মারলাম। না, কোনো কেবিনের দরজার গায়েই হ্যারি ড্রেক-এর নাম লেখা দেখতে পেলাম না। খুবই হতাশ হলাম। স্টুয়ার্টকে জিজ্ঞেস করেও হ্যারি ড্রেক-এর ঠিকানা জানা সম্ভব হল না। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির ধার দিয়ে এগোতে গিয়ে একটা ছোট্ট কেবিন দেখে ভাবলাম, এলেনকে লুকিয়ে রাখার উপযুক্ত জায়গাই বটে। এখানে তাকে পাওয়া যাবেই।

সিঁড়ি-বেয়ে নামতে গিয়ে গানের মিষ্টি-মধুর কলি কানে এল। আমি ঝট করে আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে গানটা শুনতে লাগলাম। পরক্ষণেই মনটা বিধিয়ে উঠল। ভাবলাম, হ্যারি ড্রেক একজন পাষাণ ও চরম নিষ্ঠুর ব্যক্তি। আড়াল থেকে তার গৃহিণীর গান শুনছি, কোনোক্রমে তার কানে গেলে একেবারে জ্যান্ত কবর দিয়ে ছাড়বে।

একটু বাদেই ফেবিয়ানকে হাঁটতে হাঁটতে উৎকর্ণ হয়ে গানটা শুনতে দেখলাম। সে এক পা-দু-পা করে দরজার বাইরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়েই নীরবে গান শুনতে লাগল। এলেন-এর কেবিনের দরজা সেটা। কি চায় সে? মহিলাটির কেবিনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে চায় নাকি?

আমি ত্রুণপায়ে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে হেঁচকা টান দিতেই সে শূন্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'কার গান বলতে পার?' সেই যে পাগলিনী, তার গান। তার পাগলামি সারাবার দাওয়াই আমার ভালোই জানা আছে। এক টুকরো প্রেম-ভালোবাসা পেলেই সে ফের সুস্থ-স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে।'

তার হাত ধরে ডেকে নিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড় করলাম।

রাত্রি একটু বাড়তেই, তুফান-তুমুল তুফান আরম্ভ হল। আমাদের ভাসমান শহরটা ডেউয়ের তালে তালে মোচার খেলার মতো অনবরত দুলতে লাগল।

সারারাত্রি তুফান আর ডেউয়ের সম্মিলিত দাপাদাপি চলল। সকাল হতেই রেলিং ধরে ধরে বহু কষ্টে কোনোরকমে ডেকে গিয়ে দেখি ড. পিটফার্জ দাঁড়িয়ে। তাঁর কাছে যেতেই তিনি তুফানের আওয়াজ থেকেও তীব্রতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'কি মশাই, কেমন বুঝছেন? আমার কথার সত্যতা এখন পাচ্ছেন তো? আগেই তো বলেছিলাম, গ্রেট ইস্টার্ন একটা অভিশপ্ত জাহাজ, বলি নি? এখন তীরে এসে তরী ডোবে কি না শুধু দেখে যান। ঘূর্ণিঝড় ভয়ঙ্কর জিনিস। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরাবার মাত্র দুটো উপায়ই রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, কাণ্ডের তাদের কোনোটাকেই অবলম্বন করবেন না।'

আমি কপালের চামড়ায় দুশ্চিন্তার ভাঁজ একে বললাম, 'কেন? কেন করবেন না তিনি, জানতে পারি কি?'

'আসলে সামনেই একটা সম্ভটজনক পরিস্থিতি, কপালের লিখন রয়েছে যে মশাই!'

ঝড়ের দৌলতে জাহাজের অবস্থা একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। পুরো জাহাজটা জলে খই খই করছে। পাম্প চালিয়ে জল বের করার প্রাণান্ত-প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বাইরে থেকেই আমি চিৎকার চোঁচামেচি আর দারুণ হই-চই শুনতে পেলাম। বুঝতে অসুবিধা হল না, হ্যারি আর ফেবিয়ান গলাছেড়ে বাকযুদ্ধে লিপ্ত। দৌড়ে ভেতরে যেতেই দেখলাম, কর্সিকান ইতিমধ্যেই হাজির হয়ে গেছেন। উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মরিয়া হয়ে পরিস্থিতিটা সামাল দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ক্রোধোদ্ভূত হ্যারি ড্রেক কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তার সামনে মেলে ধরে গর্জে উঠল, 'এই যে আমার কার্ড। যদি হিন্দুত থাকে—'

কার্ডটার দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে ফেবিয়ান বলে উঠল, 'আপনি হ্যারি ড্রেক ? আপনিই—আপনিই হ্যারি ড্রেক!'

'হ্যাঁ। আমিই হ্যারি ড্রেক। কাণ্ডেন ফেবিয়ান, আমার নামই হ্যারি ড্রেক।'

ব্যাপারটা এবার ফাঁস হয়ে গেল। জাহাজে উঠেই হ্যারি ড্রেক জানতে পেরেছিল কাণ্ডেন ফেবিয়ান এ-জাহাজেই উঠেছে। তখন থেকেই পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়ে ডুয়েল লড়ার ধাক্কায় সে হোক হোক করে বেড়াচ্ছিল।

পরদিন হ্যারি ড্রেক-এর এক দোস্ত এসে বলল, 'ডুয়েল লড়া ছাড়া যখন গতান্তর নেই তখন স্কুটমুট ব্যাপারটাকে বুলিয়ে না রেখে ফয়সালা করে নেওয়াই সঙ্গত। হ্যারি ড্রেক নিউ ইয়র্কে পৌছনো অবধি ধৈর্য ধরতে উৎসাহী নয়।' যাবার সময় সে বলে গেল, 'সেদিনই বিকালে ওপরের ডেকের পিছনে তরবারি নিয়ে কাণ্ডেন ফেবিয়ান-এর জন্য অপেক্ষা করবে।'

বিকাল পাঁচটা দশ। আমি, ড. পিটফার্স আর কাণ্ডেন কর্সিকান ওপরের ডেকের পিছন দিকে ফেবিয়ানকে নিয়ে হাজির হলাম।

তার মিনিট দশেক পর হ্যারি ড্রেক এক জিগরী দোস্তকে নিয়ে সেখানে হাজির হল।

কাণ্ডেন কর্সিকান দুটো তরবারি থেকে একটা বেছে নিতেই ফেবিয়ান সেটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে হৃদযুদ্ধের জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়াল। হ্যারি ড্রেক দ্বিতীয় তরবারিটা ঝট করে হাতে নিয়ে ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো তার সামনে লাফিয়ে পড়ল।

শুরু হল হৃদযুদ্ধ। যুদ্ধের পরিস্থিতি যখন তুঙ্গে উঠেছে ঠিক তখনই আচমকা ফেবিয়ান-এর হাত থেকে তরবারিটা ফসকে বেরিয়ে পড়ে গেল। সে বিপরীত দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। খাড়া ঘুরিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করতেই আমার চোখে পড়ল, ব্ল্যাক লেডিকে। আগের মতোই বোরখার মতো জামা গায়ে, মুখ ঢাকা এলেন। হ্যাঁ, এলেন ধীর-পায়ে হৃদযুদ্ধ স্থলের দিকে এগোচ্ছে।

হ্যারি গর্জে উঠল, 'কি ব্যাপার এলেন। তুমি যে এখানে! কেন এখানে এলে এলেন?'

আমি হঠাৎ পা হড়কে পড়ে যাবার জোয়ার হলাম। বিশ্বয়ের বোরটুকু কাটতেই বাতাসবাহিত উগ্র গন্ধকের গন্ধ আমার নাকে এল। এলেন এগিয়ে গিয়ে ফেবিয়ান-এর প্রায় গা-গোঁষে দাঁড়াল। পর মুহূর্তেই সেখান থেকে হ্যারি-র দিকে পা-বাড়াল। হ্যারি হাতের সুতীক্ষ্ম তরবারিটা মাথার ওপরে তুলেই থমকে গেল। এলেন এগিয়ে তার কাঁধটা ছুঁতে না ছুঁতেই দুর্বল আতঙ্কিত হ্যারি মুখ খুবড়ে হুমকি খেয়ে পড়ে গেল। ব্যস, খতম।

গ্রেট ইস্টার্ন-রই এপ্রিল নোঙর করল। ষোলোই এপ্রিল নোঙর তুলে ফের যাত্রা করবে। এখানে কয়দিন থেকে জাহাজের মেরামতি কাজ শেষ নেওয়া হবে।

বিকাল তিনটায় নিউইয়র্কে নামলাম। ছোট জাহাজ ভাড়া করে শহর দেখলাম। ফেবিয়ার আর এলেনকে নিয়ে কর্সিকান কয়দিন আগে যাত্রা করেছেন।

নায়েগ্রা বন্দরে গেলাম বারই এপ্রিল। তেরোই এপ্রিল ড. পিটফার্স-কে নিয়ে কানাডায় পৌঁছোতে পারলাম। পথে আচমকা কর্সিকান-এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। তাঁর মুখ থেকে জানতে পারলাম এলেন এখনও তার প্রেমিক ফেবিয়ান-কে চিনতে পারে নি।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কাছাকাছি একটা সমতল পাথরের ওপর এলেনকে বিমর্ষমুখে বসে থাকতে দেখলাম। আর তারই পিছনে, সামান্য তফাতে ফেবিয়ান দাঁড়িয়ে, অপলক চোখে সে এলেন-এর দিকে তাকিয়ে।

নায়েগ্রা শব্দটার অভিধানগত অর্থ বজ্রধনি। একন'গাড়ে লক্ষ লক্ষ বজ্র যেন গর্জেই চলেছে। পাথর ক্ষয় হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। ভূগোলবিদগণের মতে প্রতি বছর নাকি নায়েগ্রা জলপ্রপাত এক গজ করে পিছিয়ে আসছে। অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের আধার নায়েগ্রার দিকে এলেন-এর অপলক চাহনি স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ দুর্বল পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে সে নোনারকমে দাঁড়াল। পা দুটোকে টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। এবারই অবিস্মাশ্য নাটকীয় ঘটনাটা ধরতে গেলে চোখের পলকেই ঘটে গেল।

নায়েগ্রার দিকে এলেন গুটি গুটি এগিয়ে যেতে থাকলে ফেবিয়ান গোপনে, পা টিপে টিপে তাফে অনুসরণ করতে লাগল। এলেন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খাড়া ঘুরিয়ে ফেবিয়ানকে দেখা মাত্র অন্ধকারে কে যেন তার চোখের সামনে অত্যাশ্চর্য আলো জ্বলে দিল। উন্মাদিনীর মতো সে ছুটে গিয়ে ফেবিয়ান-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার বুকে মুখ লুকিয়ে আবেগে-উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। পরমুহূর্তেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। দার্য ঘুমের মাধ্যমে সে প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে ফেল।

টিকিট কাটতে গিয়ে ড. পিটফার্সকে দেখে চমকে উঠলাম। তিনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, 'গ্রেট ইস্টার্ন-এর ধ্বংসটা যে দেখতেই হবে।'

বেগমস ফরচুন

ব্রাইটন হোটেলের বৈঠকস্থানায় ডক্টর সারাসিন আরাম কেন্দ্রায় শরীর এলিয়ে দিয়ে একটা খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। ‘রক্তকণিকার গণকয়ত্র’ নামে তাঁর লেখা একটা প্রবন্ধ খবরের কাগজটার পাতায় ছাপা হয়েছে। সেটার ওপরেই তিনি আগ্রহ ভরে চোখের মণি দুটো বুলাচ্ছেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এক নজরে দেখলেই মনে হয় তিনি মানুষ হিসাবে একদম সাদা।

রক্তকণিকার গণকযন্ত্র ড. সারাসিন-এরই সদ্য আবিষ্কৃত একটা যন্ত্র।

ড. সারাসিন যখন খবরের কাগজের পাতায় মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে তন্ময় হয়ে আছেন ঠিক তখনই হোটেলের এক বয় এসে তাঁর হাতে একটা ভিজিটিং কার্ড দিল। কার্ডটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। তাতে ছাপা রয়েছে, 'ডব্লিউ. এইচ. শার্প জুনিয়র, সলিসিটর, চুরানকই সাদামটন রো, লন্ডন।'

ড. সারাসিন-এর অনুমতি পেয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক তরুণ ঘরে ঢুকে নমস্কার জানাল। শীর্ণ চেহারা। এক কথায় বলা চলে চলন্ত একটা কঙ্কাল ঘরে ঢুকল। আগন্তুক তরুণ নমস্কার জানিয়ে মাথার টুপি আর হাতের ব্যাগটা মেঝেতে রাখল। ড. সারাসিন বসতে বলার আগেই সে চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল। কোনোরকম ভূমিকার অবতারণা না করেই তার বক্তব্য শুরু করল, 'আমার নাম উইলিয়ম হেনরি শার্প জুনিয়র। বিলাজ গ্রিন শার্প অ্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে এসেছি। ভালো কথা, আমি ডা. ব্রাঁসোয়া সারাসিন-এর সঙ্গেই কথা বলছি তো? আর আপনি তো দোয়াই-এর অধিবাসী, ঠিক কিনা?'

ড. সারাসিন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, দু-ই সত্য। আমিই ডা. সারাসিন।'

‘আর আপনার বাবা ইসিদের সারাসিন, ঠিক কিনা?’

‘হ্যাঁ, এ-ও ঠিক।’

আগভুক্ত উইলিয়ম হেনরি কোটের ভেতরের পকেট থেকে এক চিলতে কাগজ বের করে গলা ছেড়ে পড়তে লাগল—“আঠারো শ’ সাতান্ন খ্রিষ্টাব্দে ইসিদোর সারাসিন ‘ইকোডেস’ নামে প্যারিসের এক হোটলে মারা গিয়েছিলেন। সে হোটেলটা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেনাবিভাগে ছিলেন অ্যারোনডিসেমেন্ট, রু-টাবানি, নম্বর চ্যুন্ন।”

ড. সারাসিন হকচকিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক বটে। অনুগ্রহ করে বলুন তো—'

আগন্তুক তরুণ উইলিয়াম হেনরি তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে পড়ে চলল, ‘জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল ছিল আপনার পিতামহীর ভ্রাতার নাম। ড্রাম মেজর ছিলেন সেনাবিভাগের ছত্রিশ নম্বর লাইট—’

তাকে ছুঁটা শেষ করতে না দিয়েই ড. সারাসিন বলে উঠলেন, ‘মশাই আমার বাপ-ঠাকুরদার নাম আপনি যা কিছু জানেন আমার তা-ও জানা নেই। কেবলমাত্র একটুকুই জানি যে, আমার ঠাকুরমার বংশের পদবী ‘ল্যাপ্লেভল’ ছিল।’

উইলিয়ম হেনরি পড়ে চলেন, 'আপনার পিতামহী আঠারো শ' সাত খ্রিস্টাব্দে আপনার পিতামহকে নিয়ে বালিদুক নগরে ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সতের শ' নিরানব্বই-এ জাঁ সারাসিন-এর সঙ্গে আপনার পিতামহীর বিয়ে হয়। মেলুন নগরে আপনার পিতামহ টিনের মিস্ত্রীর কাজ আরম্ভ করেন। সে নগরেই আঠারো শ' এগারোতে আপনার পিতা ইসিদোর সারাসিনকে রেখে আপনার পিতামহী পরলোক গমন করেন। তার পর থেকেই আপনার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত কোনো খবরই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই ড. সারাসিন বললেন, 'আমার কাছ থেকে খবরটা শুনুন।' বংশপঞ্জীর নির্ভুল বক্তব্য শুনে চমকে ওঠা সন্তোষে বলতে লাগলেন, 'আমার পিতামহ আমার পিতাকে চিকিৎসাবিদ্যা পড়াবার সুবাদে প্যারিসে বসবাস করতে লাগলেন। তিনি আঠারো শ' বত্রিশে পরলোক গমন করেন। আমার বাবার ডাক্তারি ব্যবসা রমরমা হয়ে উঠল। তার মৃত্যুস্থান, প্যালেসু নগরে। আঠারো শ' বাইশে আমি সেখানেই জন্মগ্রহণ করি।'

উইলিয়ম হেনরি বললেন, আমি আপনার সন্ধানই করছি। আপনার কোনো ভাই-বোন—’

তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই ড. সারাসিন বলে উঠলেন, 'না, কেউ-ই নেই। মা বাবার একমাত্র সন্তান আমি। আমি দু-বছরের তখনই মা স্বর্গে চলে যান।' মূহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে উইলিয়াম হেনরি বললেন 'আপনাকে খুঁজে পাওয়ায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনাকে অভিনন্দন জানাতেই হচ্ছে।'

ড. সারাসিন ভাবলেন, আগন্তুক নির্ধাৎ হিট্রিস্ত। এরকম চোয়ালভাঙা কাঠখোটা মানুষগুলো একটু-আধটু হিটলেই হয়ে থাকে।

সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি যেন ডাক্তারের মুখ দেখেই তাঁর মনের কথা বুঝে নিলেন। হাসিমাখা মুখেই বললেন, ‘মশাই আমি আদৌ পাগল বা ছিটেল-টিটেল নই। রাজা ব্রায়াজবাহির মথুরানাথ—রাজা উপাধির একমাত্র উত্তরাধিকারী আপনিই। আঠারো শ’ উনিশে আপনার পিতামহীর ভ্রাতা জাঁ জ্যাকুইল ল্যাস্কেভল বৃষ্টিশ নাগরিকত্ব লাভের পর এ-উপাধি লাভ করেছিলেন। আঠারো শ’ চৌদ্দতে তাঁর স্ত্রী বেগম গোকুল পরলোক গমন করেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান অল্পবুদ্ধি পুত্র পরোপারে চলে যান আঠারো শ’ উনসত্তরে। তাই বাংলার গভর্ণর জেনারেল আপনার পিতামহীর ভ্রাতা রাজা জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভলকে বেগম গোকুল-এর যাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। গত ত্রিশ বছরে সে-সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে পঞ্চাশ পাউন্ড স্টার্লিং-এ পরিণত হয়েছে। আর তা বিশেষ হেফাজতে রাখা হয় এবং

তা সুদে মূলে বৃদ্ধি পেয়ে তার মূল্য প্রচুর হয়ে ওঠে, আর তা হয় জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল-এর অল্পবুদ্ধি পুত্র জীবিত থাকাকালীনই।

আঠারো শ' সত্তরে সম্পত্তির মোট মূল্য হয় দুকোটি দশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং, জাঁ-র হিসাবে বাহান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ।

আগা কোর্টের আদেশে, দিল্লির স্বাক্ষর নিয়ে প্রিভি কাউন্সিলের অনুমতি পেয়ে যাবতীয় স্থাবর-আস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যান্ডে জমা রাখা হয়। বর্তমানে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে বাহান্ন কোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ। আপনি যে জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল-এর একমাত্র বংশধর ও উত্তরাধিকারী তা কোর্ট অব চান্সারিতে প্রমাণ করে দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারেন। আর এর মধ্যে যদি আপনার আগাম অর্থ প্রয়োজন হয় তাতেও কোনোই অসুবিধে নেই, পেয়ে যাবেন। ব্যাঙ্কার মেসার্স টল্ল, স্মিথ অ্যান্ড কোম্পানি আমার ওপর সে ক্ষমতা অর্পণ করে রেখেছে।

দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে নীরবে কাটিয়ে ডা. সারাসীন এক সময় ভাবলেন—চমৎকার কাহানী বটে! তবে একেবারেই অবাস্তব।

এক সময় স্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'প্রামাণ্য কি, বলুন তো? আমাকে সনাক্তই বা কি করে করবে বলুন তো মশাই?'

'প্রামাণ্য?' পাশে রক্ষিত ব্যাগটার দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন, 'প্রামাণ্য এর মধ্যেই রয়েছে। মশাই, আপনাকে সনাক্ত করা তো কোনো সমস্যাই নয়, খুবই সহজ। যে কোম্পানির ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অগণিত বে-ওয়ারিশ সম্পত্তির ওয়ারিশ তত্ত্বাশ বের করার দায়িত্ব বর্তেছে, আমি তাদের হয়ে পাঁচ-পাঁচটা বছর আপনার তত্ত্বাশে লিপ্ত রয়েছি। হাজার হাজার পরিবারের বংশপঞ্জী নাড়াচাড়া করেছিল। কিন্তু ইসিদের সারাসীন-এর সন্ধান পেলাম না। শেষপর্যন্ত যখন নিশ্চিত হলাম ফরাসি দেশে এ নামে কোনো ব্যক্তির অস্তিত্বই নেই ঠিক তখনই 'ডেইলি নিউজ' সংবাদপত্রের পাতায় একটা সংবাদের দিকে চোখ পড়ল। গতকালের সংবাদপত্রের পাতায় স্বাস্থ্য-সংস্থার যে বিবরণী ছাপা হয়, তাতে সদস্যদের নামের তালিকাও ছাপা হয়। তাতে অন্যান্যদের সঙ্গে ড. সারাসীন-এর নাম দেখলাম, যা এর আগে কোনোদিনই শুনি নি বা কোথাও চোখেও পড়ে নি।

বাস, আমি এবার দলিলপত্র নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলাম। হাজার হাজার সারাসীন বংশের বংশপঞ্জী ঘাটতে ঘাটতে এক সময় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, যখন দেখলাম, এত পরিশ্রম করেছি কিন্তু উল্লেখযোগ্য আমাদের নজরে পড়ে নি।

সত্যি এবার খোঁজ পাওয়া গেল। বাস, ব্রাইটনের ট্রেন ধরলাম।

সভার শেষে আপনাকে দরজা দিয়ে বেরোতে চাক্ষুষ করে বুঝতে পারলাম, আমাদের এতদিনের খোঁজাখুঁজির পাট চূকে গেছে। আপনি-ই যে আপনার পূর্বপুরুষের ল্যাস্কেভল বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী তাতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশও আর রইল। না। ভারতীয়-চিত্রশিল্পীর আঁকা একটা প্রতিকৃতি আমার কাছে রয়েছে। তাই আপনাকে দেখেই সনাক্ত করে ফেলেছি। এতটুকুও ভুল আমার হয় নি।' কথা বলতে বলতে সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি ডা. সারাসীন-এর হাতে একটা প্রতিকৃতি তুলে দিল।

রাজবেশে ভূষিত দীর্ঘদেহী পুরুষের প্রতিকৃতি। গলাপর্যন্ত চমৎকার দাড়ি তার মুখমণ্ডলে। সেনাপতির গাভীর নিয়ে চেয়ারে উপবিষ্ট। আর পিছনে যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য। অস্পষ্ট কিছু অশ্বারোহী সৈন্যও দেখা যাচ্ছে।

উইলিয়ম হেনরি কিছু কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দয়া করে এগুলো পড়ুন। আমার মুখের কথার চেয়ে ডেড বেশি তত্ত্ব এগুলোর মধ্যে পেয়ে যাবেন। দু-ঘণ্টা বাদে আমি ফের আসব। আপনার আদেশ পালন করার জন্য।' কিছু ছাপানো ও কিছু পাণ্ডুলিপির বাড়িলটা ডা. সারাসীন-এর হাতে দিয়ে সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি চৌকাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় পা দিল। বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'রাজা ব্রায়াজবাহির মথুরানাথকে শুভেচ্ছা জানাতে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।'

ড. সারাসীন দলিলপত্রের শক্তিলটা হাতে নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে লাগলেন। ধীরে ধীরে কাগজগুলো খুলে চোখ বুলাতে গিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন। হাতে লেখা ও ছাপানো কাগজগুলোতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, সলিসিটার উইলিয়ম হেনরি সামান্যতম মিথ্যা বা মনগড়া কাথা বলে নি। ছাপানো একটা দলিলে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ রয়েছে, 'আঠারো শ' সত্তরের পাঁচই জানুয়ারি মহারাণী প্রিভি কাউন্সিলের মহামান্য লর্ডদের সামনে বেগম গোকুল-এর ওয়ারিশ সম্পর্কিত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয়। তিনি বাংলা মুন্সুকের রাগিনারার বেগম। প্রচুর পরিমাণে জমি, বহু অট্টালিকা, বহু গ্রাম, বহু ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অগাধ ধনসম্পত্তি ও অল্পপাতি প্রভৃতি তাঁর সম্পত্তি।

দিল্লি আর আগ্রার কোর্টে প্রমাণিত হয়েছে যে, বেগম গোকুল রাজা লক্ষী সুর-এর বিধবা স্ত্রী। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা লাভের পর তিনি জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল নামে এক ফরাসিকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাতেন।

জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল ফরাসি অশ্বারোহীর বাহিনীর ড্রাম মেজর হিসাবে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি নানতের থেকে ফরাসি বাণিজ্য-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কলকাতায় হাজির হন। এবার তিনি রাজা লক্ষী সুর-এর দেশীয় সৈন্যবিভাগের সামরিক উপদেষ্টার পদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। রাজা পরলোক গমন করলে তাঁর বিধবা বেগমকে বিয়ে করেন। অগ্রহাতে অবস্থানকারী বহু ইংরেজ ল্যাস্কেভল-এর দ্বারা উপকৃত হন। তার কৃতজ্ঞতাবন্ধন বৃটিশ সরকার তাঁকে বৃটিশ নাগরিকত্ব প্রদান করেন। আর তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদানে ভূষিত করেন।

আঠারো শ' উনচল্লিশে বেগম পরলোক গমন করেন। তাঁরই দু-বছর বাদে ল্যাস্কেভল পৃথিবী থেকে বিদায় নেন।

উত্তরাধিকার বলে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাদের অল্পবুদ্ধি, বোকাহাঁদা একমাত্র পুত্র, জন্মাবধিই একরকম ছিল। তাই

বিষয়-সম্পত্তির দেখা ভালো করার জন্য অছি নিযুক্ত হল। বোকাহাঁদা ছেলেটা আঠারো শ' উনসত্তরে মারা যায়। এবার অগাধ সম্পত্তি বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে। দিল্লি ও আত্মা আদালতের হুকুমনামা অনুযায়ী এবং স্থানীয় সরকারের অনুমোদন লাভের মাধ্যমে প্রিভি কাউন্সিলের কাছে যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বেঁচে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করা হচ্ছে।

দিল্লি ও আত্মা আদালতের কাগজপত্র, বিক্রির দলিলদস্তাবেজ আর উত্তরাধিকার খোজ করতে গিয়ে সমগ্র ফরাসি মুল্লুক চষে ফেলা হয়েছে। এ সমস্ত বিশ্বয়কর বিবরণ পড়ার পর ড. সারাসিন-এর মধ্যে সামান্যতম সন্দেহও অবশিষ্ট থাকল না।

ব্যাক্ষ অব ইংল্যান্ডের ষ্ট্রংরুমে বাহান্ন কোটি সত্তর লক্ষ ফ্রাঁ সঞ্চিত আছে। কয়েকটা মাত্র জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেখাতে পারলেই তাঁর হাতে ফ্রাঁ-র পাহাড় এসে যাবে। বরাত এভাবে হঠাৎ ঘুরে গেলে যে কোনো মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগার হবে। ডা. সারাসিন-এর মধ্যে অস্থিরতা ভর করল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুললেন। চেয়ারে বসে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলেন। যেন একটা সৎ ও মহৎ চিন্তা তাঁর মধ্যে ভর করল। ভাবনায় তলিয়ে গেলেন তিনি।

তিনি যখন আপন ভাবনায় বিভোর হয়ে পড়েছেন ঠিক তখনই দরজার কড়া প্রচণ্ড শব্দে বেজে উঠল। সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি ফিরে এসেছেন।

দরজা খুলেই ড. সারাসিন অনুশোচনার স্বরে বললেন, 'মি. শার্প, আপনার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করেছ বলে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমার মন থেকে সন্দেহ নিগ্গশেষে উবে গেছে। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই জন্য যে, আমাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট আপনাকে ভোগ করতে হয়েছে।'

'একী বলছেন। এটা যে আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আশা করব, মহামান্য রাজা সাহেবও আমাদের মঞ্চল থাকছেন?'

'একী আর স্বীকারের অপেক্ষা রাখে মি. শার্প। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ব্যবস্থাদি করার ভার আপনাদের ওপরই অর্পণ করলাম। তবে আমার একটা মাত্রই অনুরোধ থাকছে, অনুগ্রহ করে আমাকে ওই 'অদ্ভুত উপাধি'-তে সম্বোধন করবেন না।'

'সে কী! দু-কোটি পাউন্ড ষ্টার্লিং মূল্যের উপাধিকে আপনি 'অদ্ভুত' বলছেন!'

উইলিয়ম হেনরি যাবতীয় কাগজপত্র ড. সারাসিন-এর কাছে রেখেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। তার কাছে এগুলোর নকল রয়েছে, অসুবিধা হবে না।

উইলিয়ম হেনরি কাজের দায়িত্ব বুঝে নিয়ে বিদায় নিলে ড. সারাসিন হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে লাগলেন। ব্রাইটন, আটশে অক্টোবর, আঠারো শ' একাত্তর সালের তারিখ উল্লেখ করে চিঠি লেখা শুরু করলেন চিঠির শুরুতেই তিনি লিখলেন পরম স্নেহভাজনে—

আমি সবে মাত্র অবিশ্বাস্য রকমের অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে গেলাম। তাই বলে মনে করো না আমার মাথার দোষ দেখা দিয়েছে। ছাপানো কাগজপত্র সঙ্গেই দিয়ে দিলাম। এগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে যে, আমি ভারতীয় একটা উপাধির উত্তরাধিকারী হয়েছি। আর ইংল্যান্ডের ব্যাঙ্কে আমার নামে বহুকোটি ফ্রাঁ সঞ্চিত আছে।

স্বরটা শোনার পর তোমার মানসিক পরিস্থিতি কেমন হবে সে ব্যাপারে সহজেই অনুমান করতে পারছি। তবে স্মরণ রেখো, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ায় আমাদের ওপর অনেক কর্তব্য বর্তে গেল। আর তার সঙ্গে অনেক বিপদও সামনে অপেক্ষা করছে। ওই বিপুল অর্থের সচিবহার করতে না পারলেই বিপদ আমাদের আঙ্গুষ্ঠে চেপে ধরবে। প্রায় এক ঘণ্টা আগে আমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। গোড়াতে আনন্দে মনটা নাচানাচি করছিল। বিরাট দায়িত্বের বোঝা ঘাড় চাপছে ভেবে আনন্দটুকু ক্রমেই মিইয়ে আসছে। এ ধনসম্পদ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন না করে দুর্ভাগ্যের মুখেও ঠেলে দিতে পারে। এ অগাধ অর্থ যদি আমাদের হাতে শক্তিশালী যন্ত্র রূপান্তরিত হয় তবে সভ্যতাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। সভ্যতার অগ্রগতিতে অতিকায় যন্ত্ররূপে অর্থ যদি নিযুক্ত হয় তবেই চরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে বিশদভাবে আলোচনা করব। পত্র মারফৎ তোমার মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা আমাকে জানাবে। এ স্বরটা তোমার মাকে তুমি জানাবে। তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। আমি জানি, তিনি অবশ্যই বিচলিত হয়ে পড়বেন না।

ম্যাক্সকে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানাবে। ভবিষ্যৎ কালের জন্য যা কিছু পরিকল্পনাই করি না কেন, সব কিছুর সঙ্গেই ম্যাক্স জড়িয়ে থাকবে।

ইতি—

তোমার শুভানুধ্যায়ী পিতা

ফ্রান্সোয়া সারাসিন

প্রাপকের ঠিকানা লেখা হল—

মিসিয়ে অক্টোভিয়াস সাবাসিন

ছাত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বক্রিশ, রু ডু রয় সিসিলি, প্যারিস।

চিঠিটা লেখা শেষ করেই ডা. সারাসিন সম্মেলনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। মিনিট পনেরের মধ্যেই অগাধ অর্থসম্পদের কথা ভুলে গেলেন।

ঠিক ন্যাকাবোকা বলতে যা বুঝায় ড. সারাসিন-এর ছেলে অক্টোভিয়াস আদৌ তা নয়। সে বাকা হাঁদা নয়, আবার ঢালাকচতুর বলতে যা বুঝায় তা-ও নয়। আর চেহারা ছবি ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলেই অনুমান করা যায় মাধ্যবিত্ত

পরিবারের সন্তান। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গোড়ার দিকটা বিফলে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ফল করতে না পারলেও কোনোরকমে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

সে এমনই এক চরিত্রের ছেলে যে, হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। ড. সারাসিন ছেলের চরিত্র সম্বন্ধে যদি সম্পূর্ণ অবহিত থাকতেন তবে এমন চিঠি লিখতে উৎসাহী হতেন না। আর ছেলের নিজের চেষ্টায় কিছু করার ক্ষমতার অভাব আছে বলে মনে করতেন। তবে চিঠিটা লেখার আগে অবশ্যই একটু ভেবে নিতেন। কিন্তু এমনও তো দেখা যায় পুত্র স্নেহে জ্ঞানী-বুদ্ধিমান পিতাও অন্ধ হয়ে পড়েন। ডা. সারাসিনও তার ব্যতিক্রম নয়।

একদিক থেকে বিচার করলে অস্ট্রোভিয়াস-এর বরাত খুব ভালো। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় সে এমন এক দুষ্টির সংস্রবে এসে পড়েছিল যার শাসন নির্মমভাবেই করা হয়েছিল। তবে তার হিতসাধনের জন্যই সেটা করা হয়েছিল। তার বন্ধুটার নাম ম্যাক্স ব্রাকম্যান। বয়সের দিক থেকে সে অস্ট্রোভিয়াস-এর এক বছরের ছোট। কিন্তু তার বিদ্যা ও জ্ঞান-বুদ্ধি এমন কি দৈহিক শক্তি প্রভৃতিও ছিল অনেক বেশি।

বার বছর বয়সে ম্যাক্স অনাথ হয়। তখন থেকে সে ডা. সারাসিন-এর বাড়িতে আশ্রয় নেয় ও ছেলের মতো হয়ে যায়। সে আগে অ্যালসেশ-এ থাকত। সে ড. সারাসিন ও তাঁর সহধর্মিনীকে দেবজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তাঁদের ফুলের মতো টুকটুক মেয়েটাকে সে ভালোবাসত। কলেজে পড়তে গিয়ে পড়াশুনা ও খেলাধুলায় প্রথম স্থান লাভ করা তার কাছে সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে। প্রতি বছর একগাথা করে পুরস্কার না আনতে পারলে সে জীবনের সার্থকতাই যেন খুঁজে পেত না। অস্ট্রোভিয়াস যে বছর কলেজে ভর্তি হয় ম্যাক্সও সে বছরেই কলেজে পা দেয়। ম্যাক্সই সর্বক্ষণ পিছনে লেগে থাকে। ঠেলে ধাক্কিয়ে বন্ধুকে সাফল্য লাভের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে।

আঠারো শ' সত্তরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। তখন তারা পড়াশুনার পাট সবে শেষ করেছে। ম্যাক্স দেশপ্রেমের তাগিদে সামরিক বাহিনীর খাতায় নাম লেখাল। তার সঙ্গে অস্ট্রোভিয়াসও যুদ্ধে যোগদান করল।

যুদ্ধ মিটে গেল দুই বন্ধু আবার লেখাপড়া আরম্ভ করল। কলেজের লাগোয়া একটা সাধারণ ঘর ভাড়া করে পড়াশুনায়ে যেতে গেল। এখানেও ম্যাক্স বন্ধুর পিছনে লেগে থেকে তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টার ত্রুটি করল না।

সেদিনটা ছিল আঠারো শ' একাত্তরের উনত্রিশে অক্টোবর। সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় দুই বন্ধু একই টেবিলের দু-দিকে বসে ব্যবহারিক গণিতের কঠিন একটা সমস্যার সমাধানে ডুবেছিল। ঠিক সে মুহূর্তেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। ডাক-পিওন একটা চিঠি দিয়ে গেল। খামের ওপরে মসিমে অস্ট্রোভিয়াস সারাসিন-এর নাম লেখা। চিঠিটার ওপরে একবার মাত্র চোখ বুলাতেই তার মুখে বিষণ্ণতার কালো ছায়া নেমে এল। চিঠিটা ও খামের ভেতরের ছাপানো দলিলগুলো ম্যাক্স-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'বাবার চিঠি। নাও, পড়ে দেখ।'

ম্যাক্স ব্যস্ত চোখের মণি দুটোকে চিঠিটা ও দলিলগুলোর ওপর বুলিয়ে নিল।

অস্ট্রোভিয়াস জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ম্যাক্স-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই কি ব্যাপারটার মধ্যে সত্যতার আভাস পাচ্ছিস?'

'সত্যি মানে, সম্পূর্ণ সত্যি। তোর বাবা খুবই বুদ্ধি রাখেন। হঠাৎ করে এমন একটা চিঠি লেখার মানুষ তিনি অবশ্যই নন।'

পাথরের মূর্তির মতো বসে থেকে চিন্তাক্রান্ত মুখে অস্ট্রোভিয়াস কেটে কেটে উচ্চারণ করল, 'কিন্তু ম্যাক্স, এ একেবারেই অসম্ভব—অবাস্তব! এত কোটি ফ্রাঁ—ভাবাই যে সম্ভব নয়।'

'কথাটা ঠিকই বটে। এত কোটি ফ্রাঁ-র মালিক ফ্রান্সে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংল্যান্ডে সর্বসাকুল্যে পাঁচ-ছ' জন আর আমেরিকায় কয়েকজন মাত্র রয়েছেন। সারা পৃথিবীতে পনের-বিশজনের বেশি কিছুতেই নেই।'

'আরে ভাই, কেবলমাত্র অর্থই তো নয়, অর্থের উপরিবন্ধ উপাধিও মিলেছে। বিদেশী উপাধি, কি যেন বলে? হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে 'রাজা'। একবারটি ভেবে দেখ তো শুধুমাত্র 'সারাসিন'-এর বদলে 'রাজা সারাসিন' শুনতে কত ভালো শোনাচ্ছে, ভেবে দেখ তো?'

ম্যাক্স অন্যমনস্কভাবে নিতান্ত তাক্ষিল্যের সঙ্গে বলল, 'ধ্যুৎ! ভালো না ছাই!'

'উত্তরাধিকার সূত্রে যদি ভারতবর্ষের রাজা-বাদশার সম্মান যদি মেলে—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স আগের মতোই তাক্ষিল্যের সঙ্গে বলে উঠল—'ধ্যুৎ! ধ্যুৎ!' কথাটা অস্ট্রোভিয়াস-এর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই সে আবার অন্ধ খাতায় মুখ গুঁজল।

এদিকে অস্ট্রোভিয়াস-এর মন-প্রাণ জুড়ে বসল ফ্রাঁ-র চিন্তা। তার অস্থিরতটুকু লক্ষ্য করে ম্যাক্স মুচকি হাসে বলল, 'বাইরে গিয়ে মুক্ত বাতাসে একটু পায়চারি করে আয়। অস্থিরতটুকু কাটবে। মাথা ঠাণ্ডা হবে।'

অস্ট্রোভিয়াস জামাটা গায়ে চাপাতে চাপাতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পথের ধারের গ্যাসের আলোয় তার বাবার চিঠিটার ওপর আর একবার চোখ বুলালো। পড়া শেষ করে আপন মনে বলে উঠল, 'স্বপ্ন মোটেই নয়! বরং সম্পূর্ণ সত্যি!—পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ! তা থেকে সুদ মিলবে আড়াই কোটি। তা থেকে আমাকে দশ লক্ষ দিলেই তো রাজা-বাদশার মেজাজে দিন কাটানো যাবে।'

ভাবতে ভাবতে অস্ট্রোভিয়াস জমকালো অঞ্চল বুলেভার্ডে হাজির হল। পকেট ফাঁকা বলে এতদিন সেসব বহুমূল্য জিনিসের দিকে তুলেও মুহূর্তের জন্যও তাকাই নি। এখন সেগুলোই দেখে ভাবছে অন্যায়সেই সেগুলো খরিদ করে মালিক বনে যাওয়া সম্ভব। চাইলেই পুরো প্যারিসটাই আমার হয়ে যেতে পারে। তবে কি দোয়াহি যাত্রা করব? কিন্তু কলেজে যাওয়ার ব্যাপারটা যে থেকে যাচ্ছে। ধ্যুৎ! জাহান্নামে যাক কলেজ। কলেজে যাওয়ার আর দরকারই বা কি?

তবে হ্যাঁ, ম্যাক্সকে খবরটা দেওয়া দরকার। তাকে জানানো দরকার, এ পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে সামলে সুমলে রাখতে না পেরে মা-বোনকে সুখবরটা পৌছে দিতে চললাম।

পোস্ট-অফিসে ঢুকে অক্টোভিয়াস ঝটপট একটা টেলিগ্রাম করে দিল, কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরব। ব্যস, এবার একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে সোজা রেল স্টেশনের দিকে ছুটল।

অদ্ভুত চিন্তাটা মাথায় নিয়ে রাত্রি দুটোয় বাড়ি পৌঁছাল। দীর্ঘ সময় ধরে কড়া নাড়ানাড়ি করে তবে সদর-দরজা খোলাতে পারল।

গভীর রাত্রে অক্টোভিয়াস বাড়িতে ফেরায় তার মা-বোন যারপরনাই উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ল। চিঠিটা পড়ার পর তাদের ব্যাপারটা পরিষ্কার হল।

চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে তার মা মিসেস সারাসিন হতভম্ব হয়ে পড়লেন। ফলে মা ওদেশে পঞ্চাশ কোটি ফ্রাঁ-এর চিন্তায় রাত্রিটুকু মেতে রইল।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে অক্টোভিয়াস বলল, 'ম্যাক্স চিঠিটা পড়ে তেমন উৎসাহই দেখায় নি। দার্শনিকের মতো ভালো-মন্দ আর সুখ-দুঃখ সবই তার কাছে সমান। তার মতে এরকম অগাধ অর্থের মালিক হলে আমাদের সর্বনাশই হয়ে যাবে'।

'হয়তো বা ম্যাক্স-এর কথাই ঠিক। হঠাৎ কাঁড়ি কাঁড়ি ফ্রাঁ হাতে এলে খারাপ অনেক কিছু কাঁখে চাপে।'

মিসেস সারাসিন-এর কথাটা শেষ হতে না হতেই তাঁর মেয়ে জেনেট-এর ঘুম চটে গেল। সে মায়ের ঘরের দরজায় এসে ঘুমজড়িত গলায় বলতে লাগল, 'মা একদিন ভূমিই তো বলেছিলে, ম্যাক্স কোনো ব্যাপারেই ভুল করে না। ম্যাক্স-এর বক্তব্য আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি।' এই কথা বলে সে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

এদিকে অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন ড. সারাসিন। স্বাস্থ্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়েই তিনি লক্ষ্য করলেন, উপস্থিত সবাই তাকে একটু বেশি রকমই তোয়াজ করতে শুরু করেছে। সম্মেলনের যে প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান রাইট লর্ড গ্ল্যানডোভার ইতিপূর্বে তাকে মোটেই আমল দিতেন না, তিনিই আজ ডাক্তারকে খোসামোদ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। 'মোন্দা কথা, এক সময় যিনি ছিলেন খুবই নগন্য, আজ তিনিই যেন বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন

আকস্মিক উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ড. সারাসিন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এতদিন পর তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্মেলনের সভ্যরা সচেতন হয়েছেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই লর্ড গ্ল্যানডোভার-এর বক্তব্য শোনার পর তাঁর ধারণা পাল্টে গেল। তিনি ড. সারাসিন-এর দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ এনে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'খবরটা শুনেছি। এখন থেকে আপনার দাম দুকোটি দশ লক্ষ পাউন্ড স্টার্লিং। চমৎকার! চমৎকার খবর!'

ড. সারাসিন যেন আচমকা আকাশ থেকে পড়লেন। এমন কি গত সভায়ও তিনি কারো কাছে বলেন নি যে, তিনি অগাধ অর্থের মালিক। তাঁর পকেট ফাঁকা বলেই তো কেউ তাঁকে পাত্তা দিত না। কিন্তু খবরটা কে ছড়াল?

তখনই বার্লিনের অধিবাসী ড. ওভিভিয়াস ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আপনি তো রথচাইল্ডদের সমকক্ষ হয়ে গেলেন মশাই, ডেইলি টেলিগ্রাফ চমৎকার লিখেছে। শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।' কথা বলতে বলতে ডেইলি টেলিগ্রাফ সংবাদপত্রটা ড. সারাসিন-এর দিকে এগিয়ে দিলেন।

ড. সারাসিন সংবাদটুকুর ওপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সাংবাদিক খুঁটিনাটি কোনো কিছুই বাদ দেন নি দেখা যাচ্ছে।

ব্যাপারটা সবার জানাজানি হয়ে যাওয়ায় তাঁর মনটা অস্বাভাবিক রকম বিষিয়ে উঠল। ভাবলেন, এখন থেকে প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়, ধনকুবের রূপেই সবাই সমীহ করবে তাঁকে। কথাটা মনে জাগতেই তিনি একদম ভেঙে পড়লেন। অচিরেই তাঁর মনের কোণে ঝাঁক মারল, কোটি কোটি ফ্রাঁ-কে কাজে লাগানোর যে পরিকল্পনা তিনি করে ফেলেছিলেন।

গ্রাসগোর ড. স্টিনেনসন তখন তাঁর গবেষণার বক্তব্য পাঠ করে চলেছেন।

এবার ড. সারাসিন অল্প কথায় বহু কোটি ফ্রাঁ-এর মালিক। আইনবলে এ অর্থের মালিক আমি হলেও আসলে আমি একজন বাহকমাত্র। মনে করতে পারেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এ-অর্থ ব্যয় করার ভার আমার ওপর দেওয়া হয়েছে। এই অর্থের মালিক আমি নই, মানুষের কল্যাণের জন্য আমি এই অগাধ অর্থ উৎসর্গ করেছি।' তাঁর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই সভাকক্ষ যেন সদস্যদের হাসি, উচ্ছ্বাস আর করতালিতে ফেটে পড়তে লাগল।

ড. সারাসিন চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটিয়ে তুলে বলে উঠলেন, 'আমাকে করতালি দিয়ে মিথ্যা সম্ভাষণের প্রয়োজন নেই আমি না হয়ে অন্য যে কোনো বিজ্ঞানমনস্ক ও বিজ্ঞানপ্রেমী হলেও এ-পথই অবলম্বন করতেন। আমি নির্দিধায় ব্যস্ত করছি, এ-অর্থ আমার নয়, বিজ্ঞানের। এর যথাযথ ব্যবহারের দায়িত্বভার আপনারা কি গ্রহণ করতে অগ্রহী বলুন? এরকম অগাধ অর্থের ব্যাপারে আমি আমার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল নই। তাই আপনাদের অধিকরণে নিযুক্ত করতে অগ্রহী। এ-অগাধ অর্থকে কীভাবে ব্যয় করবেন আপনারাই সাবাস্ত করুন।'

তাঁর বক্তব্য শেষ হতে না হতেই ঘনঘন করতালি আর হর্ষধ্বনিতে হলঘরটা যেন ফেটে পড়তে লাগল। নেপলসের ড. সিকোনগনার আর গ্রাসগোর প্রফেসর টার্নবুল তো উল্লাসে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলার মতোন হলেন। কেবলমাত্র গ্ল্যানডোভারই স্বাভাবিকতা বজায় রেখে অবচল রইলেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, ড. সারাসিন রসিকতায় মেতেছেন।

ড. সারাসিন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'আমি একটা পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছি। আপনারা তো জানেন, রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি অনেক কারণেই মানুষের মৃত্যু হয়ে থাকে। সবচেয়ে আগে যে ব্যাপারে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা উচিত তা হচ্ছে নগর পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যবিধির ব্যবস্থার অভাব। জল ও বাতাসের অব্যবস্থার জন্যই লক্ষ লক্ষ নগরবাসী ব্যাধির শিকার হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিছানা নিচ্ছে। যারা জীবিত তারাও অর্থ-পত্র হয়ে সমাজের সমস্যা হয়ে উঠছে। কেন মানুষের এমন ভোগাভি? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, স্বাস্থ্যবিধির অপপ্রয়োগই এর একমাত্র কারণ।

সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে মুক্তবায়ু এবং বিস্তৃত জল একান্ত অপরিহার্য। আসুন, আমরা এগিয়ে গিয়ে সবার আগে নগরের মানুষের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় ব্রতী হই।

তাঁর বক্তব্যের মাঝখানেই উপস্থিত সদস্যরা তাঁকে বার বার বাহবা দিতে লাগলেন।

ড. সারাসিন বলে চললেন, 'আসুন, আমাদের সবার মিলিত প্রয়াসে এমন একটা আদর্শ নগর গড়ে তুলি, যার চারদিকে অনুরূপ নগর প্রতিষ্ঠায় সবাইকে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

উপস্থিত সবাই করতালির মাধ্যমে তাঁকে এমন সাধুবাদ জানাতে লাগলেন যে হলঘরটা যেন ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হল।

পরিস্থিতি শান্ত হলে ড. সারাসিন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আদর্শ নগরীর ছবি কল্পনা করা খুব সমস্যার ব্যাপার নয়, আর সে কল্পনা অদূর ভবিষ্যতে বাস্তব রূপ নেবে। আদর্শ নগরীতে থাকবে শান্তি, সুখ, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি। আদর্শ নগরীর বর্ণনা পৃথিবীর সব ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রচারিত হবে। পৃথিবীর সব অঞ্চলের, সব শ্রেণীর মানুষকে সাদর আহ্বান জানাব আদর্শ নগরীতে। পৃথিবীর বহু অঞ্চলের মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা মেলে না, সেসব জায়গায় কোটি কোটি মানুষ গিজগিজ করছে। সেসব অদৃষ্ট বিড়ম্বিত মানুষ বিদেশী শত্রুর আক্রমণে পরাজিত হয়ে নির্বাসিত হয়েছে তারাও এসে আশ্রয় নিক আদর্শ নগরীতে। তাদের কেবলমাত্র মাথা গোঁজার ঠাই-ই নয়, কর্মসংস্থানও করে দেব। তাদের বলশক্তি আর বিদ্যাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আদর্শ নগরীকে যথাযথভাবে গড়ে তুলব। তাদের বুদ্ধিমত্তাকে ঠিকঠাকভাবে কাজে লাগাব। এসব মানুষের আত্মজ্ঞান ও আত্মশক্তি সোনা-রূপা আর হীরে জহরতের চেয়ে ঢেড়, ঢেড় বেশি দামি।

এ নগরীর বৃক্কে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলব। দেশের যুবসমাজকে প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে শিক্ষাদান করব, তাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞান সঞ্চার করব। তাদের উত্তরসূরীরা যাতে অর্থহীন পশু না হয় সেভাবে তাদের দেহ-সত্তা ও বুদ্ধিসত্তার বিকাশ সাধন করব।'

ড. সারাসিন-এর সারগর্ভ উদ্বেজনাপূর্ণ ভাষণ শেষ হতে না হতেই হর্ষধ্বনি ও করতালিতে হলঘরটা মুখরিত হয়ে উঠল।

মিনিট পনের ধরে চলল করতালি আর হর্ষধ্বনি। পরিস্থিতি শান্ত হলে লর্ড গ্ল্যানডোভার তাঁর দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন, 'মশাই, বেড়ে মতলব এঁটেছেন। বাড়িভাড়া ব্যাপারটা একবারটি ভেবে দেখুন তো। ভালো কথা, আমাকে একটা ভালো বাড়ি দিতে হবে কিন্তু, মনে থাকে যেন।'

হায় ড. সারাসিন! তাঁর এমন আদর্শ চিন্তাধারাকে কেউ স্বার্থপরতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করবেন, এ যে তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি।

মানবদরদী ড. সারাসিন-এর পরিপ্লনাকে সাধুবাদ জানাতে গিয়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে ভাবাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'এরকম উচ্চাদর্শ ও মহৎ পরিকল্পনার জন্য অনন্তকাল ধরে ব্রাইটন সম্মেলন সম্মানিত হল। কী অবাক কাণ্ড, এতদিন আমাদের কারোর মাধ্যমে এমন একটা ভাবাদর্শের কথা উদ্ভূত হয় নি!'

রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আর বিপদে কোটি কোটি মৃত্যুর অপচয় ঘটছে। সেগুলোকে যদি এরকম মানব কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হত তবে কি মানব সভ্যতার আরও উন্নতি হত না? এ কী কম আনন্দের কথা, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য টাকা ব্যয় না করে মানুষের হিতকর কাজের জন্য এই প্রথম পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থ ব্যয় হতে চলেছে! সবশেষে তিনি অধিকতর ভাবাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, 'মানব কল্যাণকর যে আদর্শ নগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা আমরা করছি তার নামকরণ করা হোক, 'সারাসিন নগরী'।'

প্রস্তাবটা করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে গৃহীত হওয়ার আগেই ড. সারাসিন প্রবল আপত্তি জানাতে গিয়ে বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! কিছুতেই হতে পারে না। পরিকল্পনার সঙ্গে আমার নামটাকে ব্যবহার করা চলবে না। গ্রীক বা ল্যাটিন পুরাণের কোনো নামকেও আমরা ব্যবহার করব না। নতুন ভাবাদর্শে গঠিত আদর্শ নগরীর নামকরণ করা হোক আমার দেশের নামানুসারে 'ফ্রান্সভিল' নগরী।'

উপস্থিত সবাই ড. সারাসিন-এর প্রস্তাবটি এক বাক্যে মেনে নিলেন। সবাই এবার আদর্শ নগরীটির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনায় মন দিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে, 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এ প্রকাশিত সংবাদটা অনুদিত হয়ে ছাপা হতে লাগল।

তেসরা নভেম্বর। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক সুলৎস-এর কাছে সংবাদটা পৌঁছলো। তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেতাল্লিশ। উঁচু লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। তবে চোখ, মুখ, দাঁত ও চুল প্রভৃতি মিলে তাঁর চেহারাটা প্রথম দর্শনেই মনে বিরক্তি সঞ্চার করে।

অধ্যাপক সুলৎস লেখার টেবিলে বসে ঘড়িটার দিকে মুহূর্তের জন্য চোখের মণি দুটোকে ঘুরিয়ে বিরক্তিতে স্বপ্নতোক্তি করলেন, 'ছয়টা পঞ্চান্ন! খবরের কাগজ আর চিঠিপত্র আসার কথা ছিল ছটা ত্রিশে। পঁচিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে! আবারও যদি দেরি করে তবে ভাগিয়ে দেব। ঠিক সাড়ে ছটায় আমার চিঠিপত্র আর খবরের কাগজ চাই-ই চাই।'

আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে কাগজ-কলম নিয়ে মেতে গেলেন। 'ফিজিওলজিক্যাল রেকর্ড' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা লেখার কাজে। পরের দিনের পত্রিকার পাতাতেই এটা চাপা হবে। উক্ত প্রবন্ধটার শিরোনাম হবে, 'প্রত্যেক ফরাসির ভেতরেই বিভিন্ন পরিমাণে পরমাণুক্রমিক অবক্ষয় কেন হয়ে চলেছে?'

প্রবন্ধটা লেখা শেষ হতে মাঝরাাত্রি পেরিয়ে গেল।

খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে অধ্যাপক মশাই শুয়ে পড়লেন। ঘুম জড়ানো চোখের মণিদুটোকে আলতোভাবে খবরের কাগজটার গায়ে বুলাতে লাগলেন। কয়েকটা শব্দের ওপর তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হল—'সোনার খনির উত্তরাধিকারী'

এবং 'ল্যাস্কেভল'। 'ল্যাস্কেভল' নামটা বিদেশী হলেও তাঁর কাছে কেমন যেন পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই স্বরণ করতে না পারায় হাতের কাগজটা রেখে, আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অধ্যাপক সুলৎস স্বপ্নের মধ্যেও 'ল্যাস্কেভল' নামটা দেখতে পেলেন ও গভীরভাবে ভাবলেন।

সকাল হল। ঘুম থেকে উঠেও অধ্যাপক সাহেব 'ল্যাস্কেভল' নামটা আপন মনে বার বার উচ্চারণ করে চললেন।

আচমকা সংবাদপত্রটা টেনে নিয়ে গতরাত্রের প্রবন্ধটাকে বার বার পড়লেন। মানসিক চাক্ষুয জেগে উঠল। এক লাফে দেওয়াল থেকে ছোট্ট প্রতিকৃতিটা নামিয়ে আনলেন। তার পিছনের দিককার ধুলোর আন্তরণ মুছে ফেলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ফরাসি ভাষায় লেখা একটা ছত্র। যার তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'থেরেসা সুলৎস (ল্যাস্কেভল)'।

বাস, আর এক মুহূর্ত দেরি না করে সন্ধ্যার ট্রেন ধরেই অধ্যাপক সুলৎস যাত্রা করলেন।

শেষ ট্রেনের কামরায় বসেও 'ল্যাস্কেভল' শব্দটা অধ্যাপক মশাইয়ের মাথায় বার বার চক্কর মারতে লাগল।

৬ নভেম্বর। সকাল সাতটায় শ্যারিংক্রস স্টেশনে ট্রেন থামল। অধ্যাপক সুলৎস ট্রেন থেকে নামলেন।

চুরানবই নম্বর সামামটন রো-তে পৌছোতে দুপুর হয়ে এল।

সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি নিজের পড়ার গরের টেবিলে বসে জরুরি কিছু কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছেন।

অধ্যাপক সুলৎস দরজায় দাঁড়িয়ে নীরব চাহনি মেলে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উইলিয়াম হেনরি কাজের ফাঁকে বললেন, 'আমার হাতে প্রচুর কাজ জমে রয়েছে, খুবই ব্যস্ত। সময়ের অভাব। আপনার যা কিছু বক্তব্য সংক্ষেপে বলুন।'

অধ্যাপক সুলৎস বললেন, 'সময়ের অভাব হলেও আমি যে কথা বলতে এসেছি তা যদি শোনেন তবে আরও কয়েক মিনিট শোনার জন্য আপনাকে কিছু উদযীব হতেই হবে।'

যন্ত্রচালিতের মতো মুখ তুলে আগন্তুক অধ্যাপক সুলৎস-এর দিকে তাকিয়ে আগের মতোই ব্যস্ততা প্রকাশ করে সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি বলে উঠলেন, 'বলুন, যা বলবার সংক্ষেপে বলুন।'

'বলিডুক জাঁ জ্যাকুইস ল্যাস্কেভল-এর উত্তরাধিকারের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি। আমি তাঁর বড় বোন থ্যারেসা ল্যাস্কেভল-এর নাতি। সতের শ' বিরানবইয়ে আমার দাদু মার্টিন সুলৎস-এর সঙ্গে আমার দিদিমা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। আমার দাদু তখন ব্রামউইক-এর সামরিক বাহিনীতে সার্জেনের পদে চাকরি করতেন। আঠারো শ' চৌদ্দতে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার দিদিমাকে তাঁর ভাই যে তিনটে চিঠি লিখেছিলেন তা আমার জিম্মায় এখনও রয়েছে। আর আমার জন্ম আর বংশপঞ্জী সম্পর্কেও বহু আইনসিদ্ধ দলিল আমার কাছে রয়েছে।'

অধ্যাপক মশাইয়ের বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু জার্মান জাতি যে সবার মাথায় অবস্থান করছে তা প্রমাণ করা। একজন ফরাসি এমন বিপুল অর্থ নিয়ে গিয়ে নিজের দেশের উন্নতি বিধানে ব্রতী হবে এটা তো কিছুতেই বরদাস্ত করা চলে না। বিপুল অর্থের দাবিদার কোনো একজন জার্মান হলে তিনি মোটেই ফাঁ-ফাঁ করতেন না। তাই বলে একজন ফরাসি ? কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

হিসাব অনুযায়ী ড. সারাসিন ল্যাস্কেভল-এর অনেক কাছের আত্মীয়। সে দিক থেকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা রয়েছে অধ্যাপক সুলৎস-এর সঙ্গে। তাই তাঁর দাবি তেমন জোড়ালো নয়। ঘাঘু সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি সহজেই ব্যাপারটা উপলব্ধি করে নিলেন। তবে মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মাথায় চমৎকার একটা ফন্দি খেলে গেল। দাবিদার দুজনের কাছ থেকে কায়দাকানুন করে দু-পয়সা বেশি খিচে নেওয়া কোনো সমস্যাই নয়। তাই কৌশলে ফন্দি মাফিক বক্তব্য রাখলেন, অধ্যাপক মশাই যদি তাঁর দাবিকে সঙ্গত প্রমাণ করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হন তবে আদালত অবশ্যই তা নস্যাত্ত করে দেবে।

উইলিয়াম হেনরির কথার মারপ্যাচ বোঝার মতো বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি অধ্যাপক মশাইয়ের যথেষ্টই আছে। তাই মুচকি হেসে বললেন, 'মিছে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার দরকার কিছু আছে কি ? আপনি একজন বিচক্ষণ সলিসিটর। আপনি একটু আধুট কৌশল অবলম্বন করলেই তো অনায়াসেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেতে পারে।'

সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতির স্বরে বললেন যে সময় সুযোগ মতো সে অধ্যাপক সুলৎস-এর ব্যাপারটা ভেবে দেখবেন।

অধ্যাপক সুলৎস বিদায় নিলেন। সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি পরের দিনই ড. সারাসিনকে জরুরি তলব দিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। ছুটে এলেন তিনি। আলোচনা হল। ড. ব্যাপারটা নির্ব্বিধায় মেনে নিলেন। উইলিয়াম হেনরি তাঁর বক্তব্য শুনে বিশ্বয়-বিস্ফারিত চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ড. সারাসিন-এর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর বংশের দু-এক পুরুষ আগেকার একজন জার্মান মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তবে এ মুহূর্তে তাঁর নামটা মনে করতে পারছেন না।

বিপুল অর্থের নিজে একজন দাবিদার হয়ে অন্য একজনের দাবিকে অনায়াসে মেনে নেওয়ায় সলিসিটর উইলিয়াম হেনরি যারপরনাই বিস্মিত হলেন। ঘাঘু সলিসিটর তবু হাল ছাড়লেন না। তিনি তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, জার্মান দাবিদার যদি আদালতের শরণাপন্ন হয় তবে তার পরিণাম কী ভয়ঙ্করই না হতে পারে। এর নজীর হিসাবে বললেন, 'এরকম একটা মামলা ত্রিশ বছর চলেছিল। তবু নিষ্পত্তি হয় নি। শেষপর্যন্ত টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মামলার ব্যয়ভার বহন করতে পুরো সম্পত্তিটাই জলের দামে বিক্রি হয়ে যায়। আর এ মোকদ্দমও তো কম হলেও বছর দশেক চলবে।' ইতিমধ্যে কোটি কোটি ফ্রাঁ ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে।'

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরির বক্তব্য শুনে ড. সারাসিন মনের দিক থেকে একেবারে মুম্বড়ে পড়লেন। ভাবলেন, শেষপর্যন্ত তাঁর আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা বুঝি ভেঙে যেতে বসেছে।

ড. সারাসিন বিষণ্ণমুখে সলিসিটরের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। তিনি সার কথা বুঝলেন—তাঁর সামনে দুটো মাত্র পথ খোলা রয়েছে। আদালতের শরণাপন্ন হওয়া নতুবা আদর্শ নগরী পত্তনের পরিকল্পনাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলতে হবে।

ড. সারাসিন বিদায় নিলে সলিসিটর উইলিয়ম হেনরি অধ্যাপক সুলৎসকে ডাকিয়ে আনালেন। তাঁর কাছে সত্য-মিথ্যা মিলে পাঁচালি জুড়ে দিলেন। সব শেষে বললেন, 'আরে মশাই, ড. সারাসিন তো সরাসরি বলেই ফেললেন, আপনার দিদিমাকে চেনা তো দূরের কথা, তাঁর নামই নাকি তিনি কোনোদিন শোনেন নি।'

অধ্যাপক সুলৎস বিচক্ষণ ব্যক্তি আর বুদ্ধিও রাখেন যথেষ্ট। তিনি কোনোরকম ভূমিকা না করেই সরাসরি বললেন, 'ব্যাপারটা একটু খোলাসা করে বলুন তো মশাই। ফরাসি ডক্টরেট সারাসিন-এর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে গেলে আমাকে ট্যাক থেকে কত খসাতে হবে?'

সলিসিটর তখনকার মতো নিজেকে সামলে রাখলেন। তাঁর প্রস্তাবের জবাবে কিছুই বললেন না। অধ্যাপক বিদায় নেবার মুহূর্তে বুঝে নিলেন, দাবি তেমন জোরদার নয়। তবে এ-ও নিঃসন্দেহ যে, সলিসিটর উইলিয়ম-এর ওপরই তার পাণ্ডার ব্যাপারটা নির্ভর করছে।

আবার খবর পেয়ে ড. সারাসিন ছুটে এলেন। তার ফ্যাকাসে মুখ দেখে সলিসিটর ভড়কে গেলেন। ভাবলেন, চাপাচাপি করতে গিয়ে বুঝি ব্যাপারটা ভেঙে যায়। তাই কোনোরকম ভণিভা না করেই সরাসরি বললেন, 'ডক্টর সারাসিন, জার্মান অধ্যাপক সমঝোতায় আসতে রাজি হয়েছেন। আপনি যদি রাজি থাকেন তবে বলুন।'

'আপনি যা ভালো বুঝবেন, করতে পারেন। আপনার ওপরই পুরো দায়িত্ব অর্পণ করছি।' ড. সারাসিন এদিন এরকমই চিন্তা করেছেন, সলিসিটর নির্মাণ রফার প্রস্তাব দেবেন।

সলিসিটর উইলিয়ম হেনরিও তো মনে মনে এরকমটাই চাচ্ছিলেন। উল্লসিত হয়ে তিনি তখনই ব্যাপারটা ফয়সালা করলেন না। আরও সাতদিন ড. সারাসিন আর অধ্যাপক সুলৎসকে নাচিয়ে নিয়ে নিজের দাম আরও একটু চড়িয়ে নিলেন। দিন সাতেক পরে মওকা বুঝে ড. সারাসিনকে পত্রমারফৎ জানালেন অধ্যাপক সুলৎস সমঝোতায় আসতে রাজি হয়েছেন।

শেষমেষ ষ্টিবলিং নামক একজন ব্যাঙ্কারকে খবর দিয়ে আনলেন। সে উভয় দাবিদারের প্রত্যেককে এক কোটি পাউন্ড ষ্টার্লিং করে দিতে সম্মত হল। অতিরিক্ত দশ লক্ষ রেখে দিল নিজের দালালি বাবদ।

উভয় দাবিদার সইসাবুত করে এক কোটি ফ্রাঁ-এর এক-একটা করে চেক পেয়ে গেলেন।

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হল বটে, কিন্তু উইলিয়ম হেনরির অন্তরঙ্গ বন্ধু ষ্টিবলিং কিন্তু এতে খুশি হতে পারল না। মোদা ব্যাপারটা হল, আশানুরূপ অর্থ আদায় করতে না পারার জন্য বন্ধুবর উইলিয়ম হেনরির ওপর সে ক্ষুণ্ণ। তার বক্তব্য হচ্ছে, এমন অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোয় পেয়ে ড. সারাসিনকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধমানের কাজ হয় নি।

এদিকে ড. সারাসিন-এর আদর্শ নগরী পত্তনের অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা অধ্যাপক ইতিমধ্যেই শুনেছেন। তাঁর মতো হচ্ছে এরকম একটা নগরীর কথা কল্পনা করা সহজ বটে, কিন্তু তাকে বাস্তব রূপ দেওয়া একেবারেই অলীক কল্পনা।

অধ্যাপক সুলৎস একজন কৃতি রসায়নবিদ। তিনি ইতিমধ্যেই বহু প্রবন্ধের মাধ্যমে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, জার্মানরা বিশ্বের অন্য সব ছোট ছোট দেশ ও জাতিকে গ্রাস কলে ফেলবে। 'তার দিদিমার সঙ্গে দাদুর বিয়ের ব্যাপারটা দিয়েই তার বক্তব্যের ইঙ্গিত নজরে পড়েছিল। অর্থাৎ ফরাসি ও জার্মানরা ভবিষ্যতে ড. সারাসিন ও অধ্যাপক সুলৎস-এর মাধ্যমে মুখোমুখি হবে। ফরাসিদের জার্মানরা একেবারে ধ্বংস করে ছাড়বে। ড. সারাসিন-এর অর্ধেক অর্থ হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এখন তা দিয়েই তার সর্বনাশ সাধন শুরু করা যাক।

অধ্যাপক সুলৎস এবার থেকে ড. সারাসিন-এর পিছন পিছন ঘুরঘুর শুরু করলেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা জানার জন্য তাঁর সব কয়টা অধিবেশনেই তিনি উপস্থিত হতে লাগলেন।

একদিন অধিবেশনের শেষে ড. সারাসিন হলঘর থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে বেরিয়ে আসার সময় অধ্যাপক ভয়ঙ্কর একটা পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন, উল্টো নগরী ফ্রাঙ্কভিল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও এমন একটা আদর্শ ও দুর্ভেদ্য নগরীর পত্তন করবেন যা ড. সারাসিন-এর নগরীকে ধূলিসাৎ করে দেবে। অধ্যাপকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ নতুন এক নজীর সৃষ্টি করবে।

ড. সারাসিন যথার্থই একজন বিশ্বপ্রেমিক। তবে এ-ও জানেন তার সতীর্থদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম ছিটেফোঁটাও নেই। তাই তো অধ্যাপকের চোখ-রাঙানিকে তিনি মন থেকে মুছলেন না।

ড. সারাসিন কয়দিন বাদে ম্যাস্ককে একটা চিঠি লিখে অধ্যাপকের হুমকির কথা জানালেন। তাঁর চেহারা ও চরিত্র সম্বন্ধেও সাধ্যমত লিখলেন। সব শেষে তিনি এ-ও লিখলেন, শুধুমাত্র আদর্শ নগরী প্রতিষ্ঠা করলেই চলবে না। তাকে রক্ষা করার জন্যও অসমসাহসী, অমিত শক্তির এবং বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন কিছু যুবকের প্রয়োজন।

ম্যাস্ক চিঠিটা পড়ে বুঝল, অধ্যাপক মশাইয়ের হুমকিটা নেহাৎই ফাঁকা আওয়াজ নয়। বিরুদ্ধ শক্তি ভয়ঙ্করই বটে। তাই চিঠির জবাবে ড. সারাসিনকে জানাল, এ মুহূর্তে তাঁকে সাহায্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সে অধ্যাপক সুলৎসকে সর্বদা নজরে নজরে রাখবে। আর দীর্ঘদিন তার দেখা বা খোঁজখবর না পেলেও যেন তিনি ব্যস্ত হয়ে না পড়েন। সে চিরদিনই তাঁর অনুগত থাকবে এবং যথা সময়ে ঠিক হাজির হয়ে যাবে।

এদিকে বেগম গোকুল-এর অগাধ ধন সম্পদ দুই উত্তরাধিকারীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর পাঁচ-পাঁচটা বছর

পেরিয়ে গেল। পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা অঞ্চলটা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অরিগো-এর উত্তর দিকে অবস্থিত। আলস পর্বতের শীর্ষদেশে মনে হলেও এখানকার মাটির নিচে রয়েছে কেবল লোহা আর কয়লার অন্তরণ। পথের ধারে কোথাও কয়লার স্থপ, আবার কোথাও বা জমানো রয়েছে ধাতুর গাঁদ, পাহাড় সমান উঁচু করে ফেলে রাখা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরের মধ্যেই অনূর্বর এ অঞ্চলে এক-এক আঠারোটা গ্রাম গড়ে উঠেছে। বাড়িগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি। শিকাগোতে তৈরি করে এখানে এনে খনি-শ্রমিকদের বসবাসের জন্য বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামগুলোর কেন্দ্রস্থলে কতকগুলো অতিকায় অট্টালিকা তৈরি করা হয়েছে। কতকগুলো আকাশচুম্বী চিমনি তাদের ঘিরে রেখেছে। তাদের প্রত্যেকটার মুখ দিয়ে অনবরত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আর মাঝে মাঝে আন্তনের শিখা বেরিয়ে চারদিক আলোকিত করে দিচ্ছে। তাছাড়া অনবরত বিকট শব্দ তো রয়েছেই। হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় বঝি দূরে কোথাও মেঘ ডাকছে।

এ-ই হচ্ছে অধ্যাপক সুলতস-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'ইম্পাত নগরী'। কারো কারো কাছে এটা 'জার্মান সিটি' নামেও পরিচিত। জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রসায়নের অধ্যাপক, বেগম গোকুল-এর অর্ধেক সম্পত্তিকে লোহার কারখানায় নিয়োগ করেছিলেন।

কয়েক বছরের মধ্যে এখানকার তৈরি কামান সারা পৃথিবীতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। জাপান, রাশিয়া, তুরস্ক, চীন, ইতালি, কমানিয়া এবং বিশেষ করে জার্মানিতে বিভিন্ন আকৃতির কামান এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। অধ্যাপক নিজের খনি থেকে লোহা আর কয়লা তুলে নিয়ে আগে কারখানায় ইম্পাত তৈরি করেন। তারপর তা দিয়ে বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট কামান তৈরি করেন।

অধ্যাপক কামান তৈরির এমন কিছু গুপ্ত কৌশল আয়ত্ত্ব করে প্রয়োগ করেছেন যা অন্যের পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। অতএব তিনি একচেটিয়া কারবার ফাঁদবেন, আশ্চর্য কি? তার কামান তৈরির গোপন বিদ্যাটাকে রাত্রি-দিন প্রতিটা মুহূর্ত 'কড়া পাহারার মাধ্যমে আগলে আগলে রাখা হয়। ইম্পাত নগরীর আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে শ্রমিক বা উর্ধ্বতন কর্মী কারো কোনো স্বাধীনতা নেই। পুরো শহরটার চারদিকে নালা কেটে দেওয়া হয়েছে। তার ওপরে সর্বক্ষণ কড়া পাহারা। তাদের জেরা-তল্লাশির পর ছাড়া পেলে শিলমোহর ও দস্তখৎ সমেত হুকুমনামা প্রদর্শন করাতে হবে।

তখন নভেম্বর মাস চলছে। এক ভোরে এক যুবক শ্রমিক ইম্পাত নগরীর সদর-দরজায় এসে দাঁড়াল। নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যা কিছু দরকার এক এক করে সবই প্রধান রক্ষীর সামনে মেলে ধরল। সন্তুষ্ট হয়ে প্রধানরক্ষী তাকে ভেতরে ঢোকান অনুমতি দিল। আর গম্ভীর স্বরে বলল, 'সেকশন 'কে', নয় নম্বর পথ, সাতশ' তেতাল্লিশ নম্বর কারখানা। সেখানে ফোরম্যান সেলিগম্যানের সঙ্গে দেখা করবে। খেয়াল থাকে যেন, নিজের সেকশন ছাড়া অন্য কোনো সেকশনে হাজির হলে কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে।'

প্রধানরক্ষীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি পেয়ে যুবক শ্রমিক এগিয়ে চলল ভেতরের দিকে।

সাতশ' তেতাল্লিশ নম্বর কারখানার ফোরম্যানের দপ্তরের দরজায় যুবক শ্রমিকটি গিয়ে দাঁড়াল ফোরম্যান সেলিগম্যান।

ফোরম্যানের ইঙ্গিত পেয়ে সে গুটিগুটি গিয়ে তার টেবিলের সামনে দাঁড়াল। ফোরম্যান তার হাত থেকে অনুমতি-পত্রটি নিয়ে শিলমোহর ও স্বাক্ষর প্রভৃতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। তারপর পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। বুল, আগন্তুক যুবক সুইজারল্যান্ডের অধিবাসী। এবার অনুমতিপত্র থেকে জোহান নামটা লিখে নিল। তারপর তার হাতে ধরিয়ে দিল একটা নীল কার্ড। তার গায়ে নাম এবং ক্রমিক সংখ্যা পাঁচ হাজার ন' শ' আটত্রিশ সংখ্যাটা লিখে দিল। সব শেষে বলল, 'তোমার কাজ হবে লোহাপেটা।'

জোহান সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'হোক না। সাত মাস ধরে লোহা পেটার পর সন্তুষ্ট হয়ে তবেই তো নিউইয়র্কের হেড ওভারসিয়ার সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আমার কাজের ব্যাপারে আপনাকে কিছুই ভাবতে হবে না স্যার।'

ফোরম্যান সেলিগম্যান মুচকি হেসে তাকে তখনকার মতো তার দপ্তরে পাঠিয়ে দিল।

দরজা দিয়ে বেরোবার সময় পিছন ফিরে যুবকটা বলল, 'স্যার, আমি শহরেই থাকব তো?'

'না বাইরে কোথাও মাথাগোঁজার জায়গা করে নিও।'

যুবক শ্রমিকটা ফোরম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

যুবক-শ্রমিকটার সকালে খাওয়া হয়ে ওঠেনি। অথবা প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার জন্য ঘণ্টা দু-তিনের মধ্যেই সে কাহিল হয়ে পড়ল। সর্দার চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ব্যাপারটা জানাল। একটু বাদেই তাঁর ঘরে ডাক পড়ল।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার তার কাগজপত্র নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল।

বার কয়েক ঢোক গিলে যুবক শ্রমিকটা এবার বলল, 'স্যার, তবে সত্যি কথাটা হলি—ক্রকলিনে আমি ঢালাইয়ের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। এখানে বেশি বেতনের লোভে পাডলারের কাজ নিয়েছিলাম।'

'পর্যাপ্ত বছরেও যে কাজ করার মতো হিম্মৎ হয় না, তা কি তুমি পঁচিশ বছর বয়সে করতে পারবে? ঢালাইয়ের কাজ কিছু জান কি?'

'ফার্স্ট ক্লাসে দু-মাস কাজ করেছিলাম।'

'ঠিক আছে, এখানে থার্ড ক্লাস থেকে আরম্ভ কর। তোমার তো বরাত ভালো হে, সহজেই সেকশান পাণ্টে ফেলতে পারলে।'

চিফ ইঞ্জিনিয়ার এবার তার অনুমতিপত্রের ওপর কয়েক ছত্র লিখে টেলিফোন করে দিল। একটু বাদে টেলিফোনে কথা সেয়ে বলল, 'শোন, তুমি 'কে' সেকশন থেকে 'ও' সেকশনে চলে গেছে।' অনুমতি পত্রটা তার হাতে তুলে দিয়ে এবার বলল, 'ওখানে ছোট্ট কামান তৈরি করা হয়। ফার্স্ট ক্লাস শ্রমিকরা বড় বড় কামান ঢালাই করে। এটা নিয়ে 'ও' সেকশনে ইঞ্জিনিয়ারকে দেখালেই তোমাকে কাজে লাগিয়ে দেবে।'

যুবক-শ্রমিকটি এবার 'ও' সেকশনে হাজির হল। সেখানে মাত্র দু-তিন ঘণ্টা কাজ করতে না করতেই ছুটি পেয়ে গেল।

ছুটির পর সহজেই মাথা পোঁজার জায়গা পেয়ে গেল। রাতে আহারাতি সেরে দরজা বন্ধ করে কোটের পকেট থেকে এক টুকরো লোহা বের করল। কারখানা থেকে নিয়ে এসেছে। সেটালে লঠনের আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। এবার ঝোলা থেকে একটা খাতা বের করল। তার অর্ধেকটাই অঙ্ক আর বিভিন্ন সূত্র লিখে বোঝাই করা। সে এবার সাক্ষেতিক হরফে দিনপঞ্জী লিখতে আরম্ভ করল—দশই নভেম্বর, স্টিল টাউন। পাডলিঙের বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্রও নেই। কেবলমাত্র দুরকম তাপমাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যস, এর বেশি কিছুই নয়। তবে ঢালাইয়ের ব্যাপারে চমৎকার তুপ-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এখন অবধি রহস্যসম্বলিতকারী কোনো কিছুই নজরে পড়ে নি। লোহার টুকরোটা খুবই সাধারণ। যে কোনো ভালো কারখানাই এমন লোহা তৈরি করতে সক্ষম। এতে অতি মিহি কয়লায় ধাতব গুণ বর্তমান। তবু এর মধ্যে রহস্যসম্বলিতকারী কিছুই নেই, স্বীকার করতেই হয়।

তবে একটা ব্যাপারে সামান্যতমও সন্দেহের অবকাশ নেই, এ-কারখানায় যে-কোন আকরিক ধাতুকে সম্পূর্ণরূপে শোধন করে নেওয়া হয়। বারি রহস্যটা উদঘাটন করতে হলে আমাদের সবার আগে জানতে হবে যে বিশেষ ধরনের মাটি দিয়ে ফানেল তৈরি করা হয়েছে তা কোনো কোনো উপাদানের মিশ্রণ। এটা জানা সম্ভব হলেই শ্রমিকদের তৈরি এখানকার গুণসম্পন্ন লোহা আমরাও অনায়াসেই তৈরি করে ফেলতে পারব। তবে এ-ও সত্য যে, ছাব্বিশটা সেকশনের মধ্যে আমার সবে তো মাত্র দুটো দেখা সম্ভব হয়েছে। এখনও চক্ৰিশটা বাকিই রয়ে গেছে। গুপ্ত-গহবরে যে কি রকম বিপজ্জনক মন্ত্রণা প্রতি মুহূর্তে দানা বাঁধছে তা-ই বা কে জানে! অধ্যাপক সুলৎস, যিনি বেগম গোকুল-এর অর্ধেক শ্বশুরসম্পদের মালিক হয়ে শাসিয়েছিলেন, তাঁর আয়োজন সম্পন্ন হল কি না তা-ই বা কে জানে?" ব্যাস, সেদিন এ পর্যন্ত লিখে যুবক-শ্রমিকটি লঠন নিভিয়ে শুনে পড়ল।

মেঝেতে বিছানা পেতে শুয়ে অলসভাবে পা নাচাতে নাচাতে এক সময় সে স্বগতোক্তি করল, 'মানুষ তো দূরের কথা, মর্ত্তমান শয়তান পথ আগলে দাঁড়ালেও আমি অধ্যাপক সুলৎস-এর কামান তৈরির গোপন রহস্য আয়ত্ত করবই করব। আর রক্ষা করব আদর্শ নগর গ্রাফিক্সকে।'

ম্যাক্স নিরলস কর্মী। উপস্থিত বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা সম্বল করে সে কারখানায় কাজে দ্রুত পদোন্নতি করতে লাগল। তিন মাসের মধ্যে সে থার্ড ক্লাশ থেকে সেকেন্ড ক্লাশ এবং তারপর ফার্স্ট ক্লাশ শ্রমিকের পদে উন্নীত হয়ে গেল। ইঞ্জিনিয়ার তার সম্বন্ধে লিখতে বাধ্য হলেন, ছাব্বিশ বছরের যুবক ফার্স্ট ক্লাশ ঢালাই শ্রমিক। তাকে পরিচালক মঞ্জুরী নজরে আনতে চাই। পুণ্ডিত বিদ্যা, হাতে কলমে কাজের দক্ষতা এবং সৃজনমূলক প্রতিভা—তিন-তিনটি দিক দিয়েই যুবকটি অন্য শ্রমিকদের তুলনায় অনেক, অনেক উর্ধ্বে।

তবে এতেই পরিচালকমঞ্জুরী সুনজরে আসা সম্ভব নয়। আরও কিছু গুণাবলী তাকে প্রদর্শন করতেই হবে। তা-ও অচিরেই সম্ভব হয়ে গেল। তবে তাকে তা সম্ভব করতে হল এক মর্মভূদ ঘটনার মাধ্যমে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটি। ম্যাক্স-এর বিধবা বাড়িউলির একমাত্র যুবক ছেলে কার্লকে না দেখে সে তার মায়ের কাছে খোঁজ নিতে গেল। দু-ঘণ্টা আগেই তার খনি থেকে ফেরার সময় পেরিয়ে গেছে।

বেলা তখন দশটা। কার্ল-এর মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম্যাক্স বিষণ্ণমনে খনির প্রবেশ-পথের দিকে হাঁটতে লাগল। পথে এর-ওর কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোনোই ফল হল না।

ম্যাক্স আলত্রেক খনির মুখে যখন পৌঁছল তখন বেলা এগারোটা। ওভারসিয়ারকে সমস্যাটার কথা জানাল। ভদ্রলোকের মধ্যে দয়ামায়া রয়েছে। তিনি ম্যাক্সকে নিয়ে খনি-গহবরে গিয়ে কার্ল-এর খোঁজ করতে যেতে রাজি হলেন। তারা পিঠে বাতাসে থলি বেঁধে নিল। যেখানে শ্বাসক্রিয়া চালাবার মতো বাতাসের অভাব সেখানে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি অক্সিজেন ব্যবহার করতে হয়।

ওভারসিয়ার ও ম্যাক্স অত্যাৱশ্যক সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে খাঁচায় চাপল। দু-ঘণ্টা ধরে খনি-গহবরে কার্ল-এর খোঁজ করা হল। ইতিমধ্যে তাদের সঙ্গে দুজন পাহারাদারও যোগ দিয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে এবার তারা এমন এক জায়গায় হাজির হল যেখানে পা দিতেই তাদের গা বমিবমি আর মাথা বিমবিম করতে লাগল। ওভারসিয়ারের নির্দেশে ম্যাক্স দেশলাই জ্বলল। চোখের পলকে কাটিটা নিভে গেল।

ওভারসিয়ার বললেন, 'হ্যাঁ, অনুমান ভ্রান্তই বটে। আমাদের পায়ের কাছাকাছি বাতাসের চেয়ে ভারি গ্যাসটা জমে রয়েছে। যাদের সঙ্গে গিলবার্ট অ্যাপারেটাস নেই, খবরদার তারা এগিও না।'

ঘাড় ঘুরিয়েই ম্যাক্স দেখতে পেল দূরবর্তী একটা জায়গায় মিটমিট করে বৈদ্যুতিক লঠন জ্বলছে। লঠনের আলোটা লক্ষ্য করে তারা দুজনে ছুটল। কাছে যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্স। দেখল, কার্ল-এর নিঃসাড় দেহটা এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ঠোঁট দুটো নীল। চোখের মণি দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কার্ল-এর আত্মা বহু আগেই দেহখাঁচা ছেড়ে গেছে। চোক ড্যাম্প তার শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়ে এ হাল করেছে।

প্রায় দশ ঘণ্টা পরের ঘটনা। ম্যাক্স ব্যারাকে পৌঁছে তার টোকেন নিতে গিয়ে দেখতে পেল, টোকেনের সঙ্গে একটা আদেশনামাও ঝুলছে। সে ব্যস্ত হয়ে তার গায়ে চোখটা বুলাতে লাগল। তাতে লেখা রয়েছে, 'জোহান, আজ দশটায় ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে উপস্থিত হবে। কেন্দ্রীয় ভবন—এ' ফটক, 'এ' পথ।'

ম্যাক্স ছত্র দুটো পড়ে ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারল না। এর পরিণতি ভালো, নাকি মন্দ কিছুই অনুমানও করতে

পারল না। তবুও ওপরওয়ালার হুকুম শিরোধার্যজ্ঞানে সে দুরূহ দুরূহ বুকে ঠিকানা অনুযায়ী ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে হাজির হল।

ম্যাক্স ঘরে ঢুকতেই দুজন সুপুরুষ অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তাদের একজন কোনোরকম ভণিতা না করেই সরাসরি ম্যাক্সকে লক্ষ্য করে বলল, 'শোন, কোনো ক্ষমতা বলে তুমি দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছ তা যাচাই করার জন্যই তোমাকে এখানে তলব করা হয়েছে। তুমি যদি বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারছ তবে তোমাকে মডেল ডিভিশনে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে।'।

দু-দুজন পরীক্ষক এবার তাকে পর্যায়ক্রমে জ্যামিতি, বীজগণিত এবং রসায়ন-শাস্ত্রের বহু সমস্যার সমাধান করতে বললেন। আশ্চর্য ব্যাপার! ম্যাক্স এক-এক করে সব কয়টা প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করল।

এবার তারা তাকে একটা ডিজাইন দিয়ে দু-ঘণ্টার মধ্যে এঁকে দিতে বললেন।—সেটা হচ্ছে স্টিম-ইঞ্জিনের জটিল একটা ডিজাইন।

ম্যাক্স এবারও অসাধ্য সাধন করে পরীক্ষকদের তাক লাগিয়ে দিয়ে। তারা বলতে বাধ্য হলেন, এমন ডিজাইনার আমাদের মধ্যে দ্বিতীয় আর একজনও নেই।

ম্যাক্সকে এবার ডিরেক্টর জেনারেলের সামনে হাজির করা হল। তিনি তাকে বললেন, 'তুমি আজ থেকে মডেল ডিভিশনের স্টুডিওতে বহাল হলে। তবে অন্য কোথাও যাওয়া চলবে না। স্টুডিওর ভেতরেই তোমাকে সর্বক্ষণ থাকতে হবে। আর মনে রাখবে, এ-ডিভিশনের কথা কারো কাছেই ফাঁস করতে পারবে না। আরও আছে, তুমি যেসব চিঠি দেবে বা যেসব চিঠি তোমার কাছে আসবে সবই খুলে পরীক্ষা করা হবে। একমাত্র আত্মজনের কাছে চিঠি লিখতে পারবে। আর তাদের চিঠি এলে তবেই তোমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, অন্য কারোই নয়।'।

ম্যাক্স মুচকি হেসে বলল, 'মোদা কথা, আমাকে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই তো? তবে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনার কথিত নিয়মকানুন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।'।

ডিরেক্টর জেনারেল এবাষ বললেন, 'তোমাকে আর মালপত্র আনার জন্য বাইরে যেতে হবে না। রক্ষীদের কাউকে পাঠিয়ে এখানে আনানোর ব্যবস্থা করছি।'।

ম্যাক্স আপন মনে বলে উঠল, 'বরাতের জোর আছে বটে! সাক্ষেতিক ভাষায় দিনলিপি না লিখলে আমার যে কি গতি হত তা এখন অনুমানও করতে পারছি না।'।

ম্যাক্স সারা শীতকালটা কাজ আর লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে রইল। প্রত্যেকটা ব্যাপারে জানার অভূতপ্রাপ্তি এবং অন্যান্য অগ্রগতি দেখে তার সহকর্মীরাও এক বাক্যে স্বীকার করে নিল, তার মতো ডিজাইনার সমগ্র ইম্পাত নগরীতে, দ্বিতীয় আর একজনও নেই।

ম্যাক্স মডেল ডিভিশনে কাজ করতে এসে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে সত্য। কিন্তু তার মনে এতটুকুও শান্তি নেই। কারণ, ইম্পাত নগরীর আসল রহস্যের সন্ধান পাওয়া যে তার পক্ষে আজও সম্ভব হল না।

ম্যাক্স স্টিম-ইঞ্জিনের নকসা আঁকা ছাড়া প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার এমন সুযোগ অন্য কোথাও পেল না। কামান, যুদ্ধজাহাজ, বিভিন্ন রকম মেশিনপত্র এবং ছাপাখানা প্রভৃতি অনেক কিছুই নক্সা ম্যাক্স নিশ্চুতভাবে এঁকে দিতে লাগল।

সেকশন 'এ'-তে ম্যাক্স চারমাস কাজে নিযুক্ত থাকল। কিন্তু ইম্পাত নগরীর নক্সা সম্পর্কে তার পক্ষে নতুন কিছুই জানা সম্ভব হল না। ডিভিশনের মধ্যে কয়েদির মতো আটকা পড়ে থাকলে সম্পূর্ণ ইম্পাত নগরীর রহস্য কি করে সে ভেদ করবে? তবে ক্যান্টিনে যেতে বসে এর-ওর মুখে টুকরো টুকরো যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তাহল ইম্পাত নগরীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে এক গুপ্তকক্ষে স্বয়ং অধ্যাপক হের সুলৎস অবস্থান করছেন। কক্ষটা এমন কৌশলে তৈরি যে, বাইরে থেকে কোনো শক্তি, এমন কি আগুন দিয়েও তার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ইম্পাত নগরীর প্রায় সবাই জানে, অধ্যাপক হের সুলৎস ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধ-ইঞ্জিন তৈরির কাজে ব্যস্ত। এ-অস্ত্রটা অকল্পনীয় শক্তির আধার হয়ে উঠবে যার ফলে সমগ্র পৃথিবী জার্মানির বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

ম্যাক্স বহুবীর ভেবেছে, গোপনে তাঁর গুপ্তকক্ষে হানা দেবে। ছদ্মবেশ ধারণ করে কাজ হাসিল করার মতলবও এঁটেছিল। কিন্তু সুউচ্চ ও মজবুত প্রাচীরের গায়ে সশস্ত্র প্রহরী সর্বদা মোতায়েন থাকে। তাই ভেতরে ঢুকে মূল রহস্য ভেদ করা ম্যাক্স-এর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

মার্চ মাস। ম্যাক্স অন্য বহু বারের মতো সেদিন সকালেও গুপ্ত-শপথ উচ্চারণ করেছে। এমন সময় এক কর্মচারী এসে তাকে ডিরেক্টর জেনারেলের দপ্তরে ডেকে নিয়ে গেল। ম্যাক্স হাজির হতেই তিনি বললেন, 'অধ্যাপক হের সুলৎস সবচেয়ে ভালো ডিজাইনারকে তলব করেছেন। এক কাজ কর, তুমি-ই যাও। আজ থেকে তুমি লেফটেন্যান্ট পদে বহাল হলে। তোমার পদোন্নতি হল।'।

ম্যাক্স-এর বুকের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। তার এতদিনের অধীর প্রতীক্ষা আজ তবে বাস্তবায়িত হতে চলেছে।

ম্যাক্স তার ব্যবহার্য জিনিসপত্র নিয়ে গুপ্তকক্ষের দরজায় হাজির হল। বিষয়ভেদা চোখে সে চারদিকে তাকিয়ে সবকিছু দেখতে লাগল। এক রক্ষী তাকে নিয়ে কক্ষের ভেতরে দাঁড় করাল। ইম্পাত সম্রাট হের সুলৎস বজ্রগম্বীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'তুমিই কি সেই ডিজাইনার? তোমার আঁকা নক্সা আমি দেখেছি। চমৎকার! ভালো কথা, স্টিম-ইঞ্জিন ছাড়া আর কোনো কিছুর নক্সা মাথায় নেই বুঝি?'

ম্যাক্স হাত কচলে নিবেদন করল, 'আর কিছু আঁকার সুযোগ আসেনি।'।

'ক্ষেপাশ্রয়! ক্ষেপাশ্রয় সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি?'

'সামান্য। অবসর সময়ে একটু-আধটু পড়াশোনা করেছিলাম। বাস, এর বেশি কিছু নয়।'।

'কামানের নক্সা! বড়সড় কামানের নক্সা আঁকতে পারবে তো? যত চেষ্টাই কর না কেন শোন-এর সমকক্ষ হতে

পারবে না। সে সত্যিকারের একজন কৃতী কর্মী ছিল বটে। ডিনামাইট নিয়ে ছেলমানুষী করতে গিয়ে তার ভবলীলা সাদ হ হয়েছে। আর একটু হলেই বাড়িসুদ্ধ সবাই উড়ে যেত। আহাশ্বক কাহিকা! জাহান্নামে গেছে!

তার কথাবার্তার ধরন দেখে রাগে ম্যাক্স-এর পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বালা ধরে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! একটা লোক মারা গেল, অথচ কষ্টে সহমর্মিতার লেশমাত্রও নেই!

ম্যাক্স সুচতুর। সে অসাধারণ উপস্থিতি বুদ্ধি ধরে। ফলে সহজেই হের সুলৎস-এর মন জয় করে ফেলল। হের সুলৎস-এর বক্তব্য, এমন সহকারী ইতিপূর্বে তার মুখ থেকে বেরোবার আগেই সে বুঝে ফেলে। তাই তো হের সুলৎস তার ওপর যারপরনাই সন্তুষ্ট।

প্রকৃত ব্যাপারটা হল, ম্যাক্স সুচতুর অধীকার করার উপায় নেই। তবে আসল রহস্যটা হচ্ছে, সে তার ভয়ঙ্কর মনিবের চরিত্রটাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে ছবির মতো একে নিতে পেরেছে। সে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দিকটা, আত্মস্তরী-এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তাই তাঁর অহঙ্কারকে উল্টে দেওয়ার মতলব সে এঁটেছিল।

হ্যাঁ, ম্যাক্স-এর মতলব বাস্তবায়িত হতে চলেছে। মনিবকে মাত্রাতিরিক্ত ভোয়াজ করে করে সে অচিরেই তার একেবারে কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে।

ম্যাক্স-এর কৌশলটা এরকম—সে মনিবের ফরমাস মাফিক কোনো কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করলেও দু-এক জায়গায় একটু-আধটু খুঁত রেখে দেয়। ব্যস, হের সুলৎস কাজের ভুল ধরতে পেরে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। একটা বছর পেরিয়ে গেল। মনিবের সঙ্গে এত মেলামেশা, এমন গভীর হৃদযাত্রার সম্পর্ক, তবু ম্যাক্স আসল রহস্যটা উদ্ধার করতে পারছে না। হের সুলৎস মন খোলাসা করে অন্যসব কথা বলেন কিন্তু ইম্পাত নগরীর গুপ্ত রহস্যটা কিছুতেই ভাঙেন না। অতি শক্তিশালী ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধাঙ্গ তিনি আবিষ্কার করেছেন। অত্যাশ্চর্য, অভিনব এ দৈত্যাকৃতি মারণাঙ্গটাই বুল-টাওয়ালের একমাত্র গুপ্ত রহস্য।

এল পাঁচই সেপ্টেম্বর। নেশভোজ সারতে সারতে ম্যাক্স উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে ফেলল।

‘আহার শেষ করে গ্লাসে বিয়ার ঢালতে ঢালতে হের সুলৎস প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেললেন, ‘আমি ভাবছি, জার্মানির কাছাকাছি দু-একটা দ্বীপ নিয়ে নিতে পারলেই ইয়া লফা ল্যাফ দিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে চক্রর মেরে আসতে পারব। তবে হ্যাঁ, ‘পৃথিবী জয়’ কথাটার ওপর আমার আস্থা কিছু তিলমাত্রও নেই। ভালো কথা, জার্মানদের পৃথিবী জয়ের ব্যাপারটাকে তুমি কি বিশ্বাস কর না?’

ম্যাক্স নির্বিধায় ব্যস্ত করল, ‘না, মোটেই না।’

‘তাই বুঝি? আশ্চর্য ব্যাপার তো! তোমার এমন সংশয়ের কারণ বলবে কি?’

‘শেষমেশ দেখা যাবে ফরাসি যুদ্ধবাজরা জার্মানদের পিটিয়ে ভূমিস্যাৎ করে দেবে বলে। আঠারো শ’ সত্তরে তারা যে-শিক্ষা পেয়েছে যুগ-যুগান্তর ধরে মনে থাকবে। বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দেবে যাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে তাদেরই কি করে ঘায়েল করতে হয়।’

ম্যাক্স-এর কথাটা শোনামাত্র হের সুলৎস-এর চোখ-মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠল। তিনি পারলে তাকে যেন চিবিয়ে খান। তবু নিজেকে সংযত রাখলেন।

ম্যাক্স কথার মোড় ঘুরাতে গিয়ে বলল, ‘দেখুন, কথাটা অগ্রিয় হলেও সত্য বটে। আপনার কি ধরণা শত্রুপক্ষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে? গত যুদ্ধের পর তারা আজ অবধি কিছুই আবিষ্কার করে নি? আমরা কেবল কামানের ওজন ও দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে ভাবছি বিরাট কিছু করে ফেলেছি। ওদিকে শত্রুপক্ষ হয়ত এমন মারাত্মক কোনো অস্ত্র তৈরি করে ফেলেছে যা প্রয়োগ করলে আমাদের জীবন সংশয় হয়ে উঠবে।’

‘নতুন কোনো অস্ত্র? মারাত্মক কোনো অস্ত্র?’ স্কোভে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে হের সুলৎস এবার বললেন, ‘ওহে আমরাও হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই, শুনে রাখ।’

ম্যাক্স বুঝল, ওষুধে কাজ হতে শুরু করেছে। সে আগের মতোই তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, ‘আসলে কামানের সাইজ ও পাল্লাকে দ্বিগুণ করতে পেরেই আমরা উল্লসিত। ভাবছি, মারাত্মক কিছু করে ফেলেছি।’

‘সে কী হে, দ্বিগুণ বলছ কি! দ্বিগুণের চেয়ে অনেক, অনেক বেশি—’

তাঁকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ম্যাক্স বলতে লাগল—‘মোদ্দা কথা, আমরা চুরিবিদ্যাটা খুবই ভালো রপ্ত করেছে। অন্যের জিনিস দেখে সঙ্গে সঙ্গে সেটা বানিয়ে ফেলি। মৌলিক কোনো কিছু আবিষ্কারের দিকে আমাদের প্রবণতা নেই, বললেই চলে। ফরাসিরা কিন্তু অনবরত নতুন অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করছে। আরও নতুনতর কিছু তৈরি করার জন্যও তারা নিরলস গভেষণায় লিপ্ত।’

হের সুলৎস গুলি-খাওয়া বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, ‘তুমি বলছ কী হে! হের সুলৎস-এর মৌলিক কোনো কিছু আবিষ্কারের হিম্মৎ নেই!’ যন্ত্রচালিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে এবার বললেন, ‘চল, হের সুলৎস-এর মৌলিক প্রতিভার দৌড় চাক্ষুষ করবে?’

ম্যাক্স-এর ভেতরটা খুশিতে সমুদ্রের মতো উথালপাথাল করতে লাগল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল, যাতে তার ভেতরের কথা হের সুলৎস কিছুই টের না পান।

ইম্পাত-সম্রাট হের সুলৎস আলমারি খুলে ছোট্ট একটা চাবি বের করে কোটের পকেটে চালান করে দিলেন। ব্যাপারটা দেখেই অনুমান করা গেল, কিছুতেই চাবিটাকে তিনি হাত ছাড়া করবেন না। এবার ম্যাক্সকে নিয়ে তিনি পুর পর তিনটে দরজা পেরিয়ে একটা লোহার সিঁড়ির সামনে হাজির হলেন। সিঁড়িটার শ’ দুই ধাপ ডিঙিয়ে ছাদে হাজির হলেন। সেখানে কামান সাজানোর বিশালায়তন একটা কামারা। এমন কৌশলে তৈরি এর দেওয়ালগুলো যে কামান

দেগেও ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম ফাঁটল ধরানোও সম্ভব নয়। কামরাটার ঠিক মাঝখানে একটা ইস্পাতের তৈরি কামান রক্ষিত আছে।

কামানটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হের সুলৎস বললেন, 'ওটার দিকে তাকাও, বুঝতে পারবে কী জিনিস আমি তৈরি করেছি।'

এত বড় কামান হতে পারে ম্যাক্স স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবতে পারে নি। এর ওজন অন্তত তিন শ'টন তো হবেই। ব্যস পাঁচ ফুট। ইয়া বড় তার মুখের ফাঁকটা। ইস্পাতের গাড়ির ওপর সেটাকে বসানো। ইস্পাতের লাইনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। দানবিক কামানটা দাগার পর পিছনে যাতে প্রচণ্ড ধাক্কা না মারতে পারে তার জন্য মজবুত একটা শিশু লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হের সুলৎস এবার গর্ব ভরে বলতে লাগলেন, 'এর ঘায়েল করার ক্ষমতার কথা শুনে তোমার পিলে চমকে যাবে। কুড়ি হাজার গজ দূরে থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে চল্লিশ ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের পাতকেও তা অনায়াসে ছেঁদা করে দেবে। একটু আগেই তো তুমি বলছিলে, আদিয়ালের কামানের কাছে দাঁড়ানোর হিংস্র আমার কামানের নেই, ঠিক কিনা? শোন, এটার পাল্লা ত্রিশ মাইল। গোলা সামান্য দিক পরিবর্তন না করে সোজা গিয়ে লক্ষস্থলে আঘাত হানে।

ত্রিশ মাইল পাল্লার কথা শুনে ম্যাক্স রীতিমতো চমকে উঠল। শোন, তোমাকে যখন এখানে নিয়েই এসেছি তখন আর আমার আবিষ্কারের রহস্য তোমার কাছে গোপন থাকবে না। বড় দানার গান-পাউডারের দিন গেছে। এখন বারুদ তৈরি করতে আমি মিহি দানার গান-পাউডার ব্যবহার করেছি, যা কিনা সাধারণ বারুদের চেয়ে চারগুণ ক্ষমতা রাখে। দশভাগের আট ভাগ হিসাবে নাইট্রেট অব পটাশ মিশিয়ে আমি সে-চারগুণ ক্ষমতাকে আরও চারগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি।'

'কিন্তু আপনার কামানটা থেকে পাঁচবারের বেশি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব নয়, কি বলেন?'

'পাঁচবারেরই বা দরকার কি? একটামাত্র গোলা নিক্ষেপ করতে পারলেই তো যথেষ্ট হে। এর জন্য দশলক্ষ মুদ্রা খরচ পড়বে। কামানটারও মূল্য ঠিক তা-ই দাঁড়িয়েছে। একটা গোলা ব্যবহারের মাধ্যমে যদি দশ লক্ষের হাজার গুণ মানুষও নিহত করা সম্ভব হয় তবে তো আর খরচটা বেশি বলে মনে হবে না।'

অত্যাধুনিক মারগারটার ক্ষমতার কথা শুনে আতঙ্কে ম্যাক্স-এর হৃদপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে আসার জোগাড় হ'ল। অনেক কষ্টে হের সুলৎস-এর কাছ থেকে সে নিজেকে গোপন রেখে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, 'কামান আগেও ছিল। আপনি তার সংস্কার করে শক্তি বাড়িয়েছেন। এর বেশি কিছু নয়। এটাকে কিন্তু আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা যায় না।'

'আবিষ্কারের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আমার যা কিছু গোপন সবই তোমাকে আজ দেখাব বলে এখানে নিয়ে এসেছি। আমার সঙ্গে চল।' কথা বলতে বলতে তিনি ম্যাক্সকে নিয়ে জলচাপে চালিত লিফটে চেপে নিচের তলায় হাজির হলেন। সেখানে রাশিকৃত ক্ষেপণাস্ত্র সাজানো। দেখতে যেন অবিকল চোঙা এক-একটা কামানের গোলা। এক একটা ছয় ফুট দৈর্ঘ্য, ব্যস তিন ফুট। বন্দুকের টোটার মতো সারা গায়ে সিসার আন্তরণ। সামনে ইস্পাতের টুপি। আঘাত পেলেই যাতে বারুদ জ্বলে যায় সেরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিছনে রয়েছে ইস্পাতের পাত।

ম্যাক্স আমতা আমতা করে বলল, 'কামানের গোলাকে এমন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ও ভারি করে তোলার কোনো দরকার ছিল কি? শুধু শুধু—'

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হের সুলৎস বললেন, 'সাধারণ লোককে ধোঁকা দেবার জন্য। এ মাপের একটা সাধারণ গোলার যে ওজন এর ওজনও ঠিক তা-ই। মোদা ব্যাপার হচ্ছে একটা কাঁচের খোলস আর বাইরের দিকে ওক কাঠের ঢাকনা। কাঁচের খোলসে তরল কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি। তাকে বায়ুর সাধারণ চাপের সত্তর গুণ বেশি চাপ প্রয়োগ করে কাঁচের খোলসটাতে ভরা হয়েছে। আঘাত পেলেই কাঁচের খোলস ফেটে কাঠের ঢাকনা ভেদ করে তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আকারে সবগো বেরিয়ে আসবে। প্রচুর পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস বাতাস দ্বারা বাহিত হবে। ফলে তাপমাত্রা শূন্য তাপাঙ্কের এক শ' ডিগ্রি নিচে নেমে যাবে। এতে বিস্ফোরণের স্থান থেকে ত্রিশ গজের মধ্যে প্রতিটা মানুষ বা অন্য যে কোনো জীবন্ত প্রাণী মুহূর্তের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। ত্রিশ গজের কথা কিন্তু কমিয়েই বললাম। আসলে তা এক শ' গজ এমন কি দু শ'ও হতে পারে। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দীর্ঘসময়ধরে এর দ্বারা মানুষ মারা যাবে। ধ্বংসস্থলের মধ্যে দীর্ঘ সময় পরেও যে আসবে তারও প্রাণান্ত ঘটবে। আমার পরিকল্পনা জখম অর্থাৎ পশু করা নয়, প্রাণে মেরে ফেলবে আমার আবিষ্কৃত গোলাটা। এরকম হাজার খানেক কামানের বৈদ্যুতিক সুইচ টিপলেই সাড়ে সাত হাজার বিঘের একটা শহরকে অনায়াসেই ধ্বংস করে দেবে। কার্বনিক-অ্যাসিড-সমৃদ্ধ সৃষ্টি হবে সমগ্র শহরটা জুড়ে। পরিকল্পনাটা আমার মাথায় কি করে এল, ভাবহ? একবার ডাক্তারের রিপোর্টে জানতে পেরেছিলাম, আলব্রেক খনিতে একটা শিশু কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে নাক ঢুকিয়ে প্রাণ খুইয়েছে। তবে নেপলনের ডগ গ্রটো নামক জায়গাটা দেখার পর থেকেই ব্যাপারটা আমার মাথায় চক্কর মারছিল। মতলব এল, কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছড়িয়ে দিতে পারলেই কাজ হাসিল। বায়ুতে যদি তার এক পঞ্চমাংশও মিশে যায় তবেই বাজিমাৎ।' মুহূর্তকাল নীরবে থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'একটা সমস্যার সমাধান কিছুতেই করতে পারছি না। এর আওয়াজ সাধারণ কামানের চেয়ে ঢের বেশি। আওয়াজটা সাধারণ কামানের মতো বা শব্দহীন করতে পারলে শহরশুদ্ধ মানুষকে নিঃশব্দে মারা সম্ভব হত।'

ম্যাক্স জোর করে নিজেকে সংযত রেখেই এবার বলল, 'তবু আমি বলব, কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ কামানের গোলা কিন্তু মোটেই নতুন কিছু নয়। দম বন্ধ করে মারার জন্য এর আগেও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করা হত। আর আপনার কামানের গোলাটা কিন্তু নিখুঁত নয় মোটেই। যে বিশাল বপু এর ত্রিশ মাইলও—'

'না। ওটা যাবে দু-মাইল। আর ওই ইস্পাতের গোলাটা ত্রিশ মাইল তো যাবেই। এর ভেতরে একশ'টা ছোট ছোট কামান ঢুকিয়ে রাখা আছে যারা শূন্য পথে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে নামার আগে ঘন ঘন গোলাবর্ষণ করতে আরম্ভ করবে। শহরের

সর্বত্র আগুন-বোমা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে। তাতে সমগ্র শহরে লঙ্কাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। শুরু হবে মৃত্যুলাীলা। মাত্র কয়দিনের মধ্যেই উড়ন্ত কামানের মহড়া দেব, স্থির করেছি। ইচ্ছে করলে নিজের চোখেই দেখে আসতে পারবে কেমন দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। লাশ সরিয়ে সরিয়ে পাহাড় সাজানোর কাজেও নিজেদের লিপ্ত করতে পারবে', কথাগুলো শেষ করেই হের সুলৎস পিশাচের মতো বিকট হাসিতে ফেটে পড়ার উপক্রম হলেন। তাঁর পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে ম্যাক্স-এর ইচ্ছা করছে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে তার মুখে একটা ঘুরি মেরে দাঁত কয়টা ফেলে দেয়।

মুখের বিকট হাসি থামিয়ে এবার বলল, 'বুঝলে হে, মনস্থ করেছি আমার অদ্ভুত ক্ষেপণাস্ত্রের মহড়া দেব। যাবে নাকি দেখতে? কাসকেড পাহাড়টার পিছনে একটা শহর আছে। এখান থেকে পাক্সা গ্রিশ মাইল পথ। কামানের গোলাটা ওই পাহাড়টা ডিঙিয়ে শহরটার ওপর আছড়ে পড়ে রীতিমতো নারকীয় দৃশ্য সৃষ্টি করবে। কবে? কখন, তাই না? আজ তো পাঁচই সেপ্টেম্বর। তের তারিখে রাত্রি পৌনে বারটার ফ্রাঙ্কভিল নগরটা আমেরিকার মানচিত্র থেকে চিরদিনের মতো মুছে যাবে।'

কথাটা শোনামাত্র ম্যাক্স—এর কলিজা স্তব্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হল।

অধ্যাপক সুলৎস এবার প্রায় স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করলেন, 'একটা কথা কি জান? ফ্রাঙ্কভিল নগরের ড. সারাসিন আর আমার পথ সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি চান মানুষের জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে আর আমার একান্ত ইচ্ছা তাকে কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে কমিয়ে আনা। তবে এ-ও সত্য যে, আমার পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে সহজতর করতে আমারই গম্ভীর মধ্যে ফ্রাঙ্কভিল নগরটাকে গড়ে তোলা হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে ড. সারাসিনকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়।'

ম্যাক্স বার-কয়েক ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'কিন্তু ফ্রাঙ্কভিল নগরের অধিবাসীরা তো আপনার সামান্যতম অনিষ্টও করেনি। আমার এ-ও জানা আছে, তাদের সঙ্গে আপনার কিছুমাত্রও বিবাদ বিসম্বাদ—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, 'তুনে রাখ, পাপ-পুণ্য আর ন্যায়-অন্যায় নিছকই ছেদো কথা। আসল হচ্ছে প্রাণে বাঁচা। আগে নিজে বাঁচা। বিপরীত চিন্তা নিছকই বোকামি। তাই তো মনস্থ করেছি, সারাসিন-এর পরিকল্পনা, স্বপ্নসাধকে ধ্বংস করতে ফ্রাঙ্কভিল নগরটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। এটাই নিয়মবিধির বিধান।'

অধ্যাপক সুলৎস গুপ্তকক্ষের দরজা বন্ধ করে ম্যাক্সকে নিয়ে খাবার ঘরে হাজির হলেন।

ম্যাক্স দুরূহ দুরূহ বুকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'আপনি এতক্ষণ যা কিছু বললেন, কার্যতও তা-ই করবেন নাকি?'

'অবশ্যই। ফ্রাঙ্কভিল নগরের প্রাথমিক আর লঘিমা আমার জানা আছে। সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখে রাত্রি পৌনে বারটার পৃথিবীর মানচিত্র থেকে ফ্রাঙ্কভিল নামটা চিরদিনের মতো হারিয়ে যাবে।'

'তাই যদি সত্য হয় তবে কিন্তু পরিকল্পনাটা গোপান রাখাই উচিত ছিল।'

সুলৎস ভ্রান হেসে জবাব দিলেন, 'তাই তো মনটা বিধিয়ে উঠছে, যে তোমার মতো একজন অল্পবয়স্ক যুবকের মৃত্যু আমাকে চোখের সামনে দেখতে হবে।'

কথাটা কানে যেতেই ম্যাক্স-এর শরীরের সব কয়টা স্নায়ু এক সঙ্গে ঝনঝনিয়ে উঠল। 'ভূমি কি মোটেই বুঝতে পার নি আমি যার কাছে গুপ্তরহস্য ব্যক্ত করি— চিরদিনের মতো তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থাও অবশ্যই করি।'

তার মুখের কথা শেষ হতেই কর্কশ আওয়াজ তুলে ঘণ্টা বেজে উঠল। সিগিমার ও আমিনিয়াস নামে দুজন যন্ত্রমার্কী লোক এসে দরজায় দাঁড়াল।

অধ্যাপক সুলৎস গম্ভীর স্বরে বললেন, 'গুপ্ততত্ত্ব জানতে অগ্রহী ছিলে, জানতে পেরেছ! এবার তোমার জন্য একটামাত্রই পথ খোলা রয়েছে, সেটা হচ্ছে মৃত্যু—নির্মম নিষ্ঠুর মৃত্যু।'

ম্যাক্স পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে উচ্চারণ করল, 'কখন আর কীভাবে আমার মৃত্যু হবে?'

'হবে, শীঘ্রই হবে। তবে কথা দিচ্ছি মৃত্যু যন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করতে দেব না। একদিন ভোরে তোমার আর ঘুম ভাঙবেনা। ব্যস, খতম হয়ে যাবে।'

ম্যাক্স নিজের মৃত্যুর জন্য যে মোটেই ভাবিত বা ভীত কোনোটাই নয়। ফ্রাঙ্ক নগরটাকে কীভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে চিন্তাতেই তার মাথা খরাপ হয়ে যাবার জোগাড় হল।

দানবাকৃতি পাহারাদার দুজন ম্যাক্সকে সর্বক্ষণ নজরে নজরে রাখে। তাদের প্রত্যেকের কোমরে একটা করে ছুরি আর পিস্তল গুলিভরা। তবে তারা দুজনই বোবা! কোনো কথাই বলতে পারে না। এক নাগাড়ে পনেরটা ঘণ্টা যন্ত্রমার্কী লোক দুটোকে দেখে ম্যাক্স তাদের বিশেষ একটা দুর্বলতা ধরে ফেলল। একটু বাদে বাদেই তামাক টানে। ম্যাক্স ভাবতে লাগল এদের তামাকের নেশটাকেই কাজে লাগিয়েই তাদের ঘায়েল করার কথা ভাবতে লাগল।

পরের দিন ভোরে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে তামাকের মতো মাদক শ্রেণীর একটা গাছকে ঝোপের মধ্যে দেখতে পেল। সে উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিল। ফলে সেটাকে সনাক্ত করতে অসুবিধা হল না। সর্বাধিক সক্রিয় মাদক বেলেডোনা।

ম্যাক্স এবার হাঁটতে হাঁটতে একটা লেকের ধারে হাজির হল। তারই গায়ে একটা জলপ্রপাত। জল বাইরে যাচ্ছে। অতএব কোনো না কোনো পথ আছেই। চেষ্টা করলে কোনোরকমে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এখন সমস্যা হচ্ছে যন্ত্রমার্কী গ্রহরী দুজনকে নিয়ে। আচমকা বিস্মৃতিচমকের মতো একটা চমৎকার মতলব তার মাথায় খেলে গেল।

ম্যাক্স হাঁটতে হাঁটতে আবার বেলেডোনার ঝোপটার কাছে এল। যন্ত্রমার্কী বোকাহাঁদা গ্রহরী দুটোকে দেখিয়ে সে বেলেডোনার পাতা ছিঁড়ে জামার পকেট বোকাই করল।

আরও ছ'টা দিন পেরিয়ে গেল। এক—দুই—তিন করে তার পরমাণু বাড়তে লাগল।

এক ভোরে ম্যাক্স কৌশলে দানব দুটোকে বেলেডোনা মেশানো তামাক খাইয়ে নেশায় বঁদ করে দিল। ম্যাক্স খাইয়েছে বললে ঠিক বলা হবে না, তারা নিজেরাই বেলেডোনা পাতার গুঁড়ো মেশানো তামাক খেয়ে নেশায় এলিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, পরিকল্পনা মাফিকই কাজটা হয়েছে।

ম্যাক্স এবার লম্বা লম্বা পায়ে কারখানায় গেল। যন্ত্রপাতির তাক থেকে ছোট্ট একটা ইস্পাতের করাত কোটের তলায় ঢুকিয়ে নিল। এটা লোহা কাটার কাজে ব্যবহৃত হয়। এবার কিছু সংখ্যক কাঠের মডেল আর ডিজাইনের কাগজ জড়ো করে আশুন ধরিয়ে দিল। মিউজিয়ামটা দাহ্য পাদার্থে ঠাসা। আশুন ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। দেখতে দেখতে পুরো বাড়িটাই আগুনের কবলে দাউ দাউ করে জ্বল গেল। বেজে উঠল পাগলা ঘন্টা। বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে আশুন লাগার খবর সমগ্র ইস্পাত নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল। দমকল বাহিনী গাড়ি নিয়ে হাজির হল।

শয়তানের পার্শ্বচর অধ্যাপক সুলৎস উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলেন। মিউজিয়ামের মডেলগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আশঙ্কা করে আতঙ্কিত সুলৎস উমাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তিন হাজার এক শ' পঁচাত্তর মডেলটা যে উদ্ধার করে আনতে পারবে তাকে দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেব। মডেলটা ঘরের মাঝখানে কাঁচের আলমারির মধ্যে রয়েছে।'।

অধ্যাপক সুলৎস-এর বুকের পাঁজরের সমান কামানটার মডেল সেটা। যে কোনো উপায়ে সেটাকে রক্ষা তাকে করতেই হবে। কিন্তু ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে কে যাবে দশ হাজার ডলারের লোভে প্রাণ দিতে?

উপস্থিত সবার মধ্যে কেবলমাত্র একজনই প্রাণের মায়ী অগ্রাহ্য করে ভিড় চলে অধ্যাপক সুলৎস-এর সামনে এগিয়ে এল। ম্যাক্স। ম্যাক্সকে দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মুহূর্তের মধ্যেই কয়েকটা এলিবর্ট অ্যাপারেস্টাস এসে গেল। এগুলো আশুন, বিশেষ করে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া কাজে বিশেষ সহায়ক। এক বছর আগে অ্যালব্রেক খনি থেকে কিশোর কার্ল-এর মৃতদেহ আবিষ্কার করতে ম্যাক্স ব্যবহার করেছিল। ফলে এদের ব্যবহার পদ্ধতি তার জানা। ম্যাক্স পিঠে বায়ু থলি বেঁধে বাতাসবাহী নলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আশুন আর ধোঁয়ার কুণ্ডে জাঁপিয়ে পড়ল।

ম্যাক্স ধোঁয়ার সমুদ্রো জাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ভেবে নিল, মাত্র পনের মিনিট সময়। এর মধ্যে যা কিছু সেরে ফেলতে হবে। এর বাতাস পনের মিনিট থাকবে।

মডেল আনার ব্যাপারটা ম্যাক্স-এর একটা অভ্যুত্থাত মাত্র। মডেলের জন্য সে মোটেই ভাবিত নয়।

ধোঁয়ার সমুদ্রের ভেতর দিয়ে সাধ্যাতীত দ্রুতবেগে ছুটে ম্যাক্স প্রশস্ত আঙ্গিনায় হাজির হল। এবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে হাজির হল লেকটার ধারে। পাশেই তীব্রবেগে জলপ্রপাতের জল পড়ছে। লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডুব দিয়ে সাত-আট ফুট জলের তলায় চলে গেল। সামনেই একটা ইয়া মোটা জলের পাইপ। ম্যাক্স মুহূর্তের জন্য ভেবে নিল। পাইপটা কত লম্বা কে জানে? পনের মিনিটের মধ্যে যদি এর অন্য প্রান্তে বেরনো না যায় তবে বাতাস ফুরিয়ে যাবে, দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে।

ম্যাক্স মন শক্ত করল। ঢুকে গেল পাইপটার ভেতরে। শ্রোতের টানে সে দ্রুত এগিয়ে চলল।

ইতিমধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। তবু সে শ্রোতের টানে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সে একটা কঠিন বাধার মুখোমুখি হল। জল যাচ্ছে বটে, কিন্তু সে আটকা পড়ে গেছে। হাতড়ে হাতড়ে বুঝল, পাইপের মুখ লোহার শিক দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। একটা পাল্লা। ছোট্ট দুটো বজা দিয়ে আটকানো। বিপরীত লোহাটা কাটতে লাগল। প্রায় পাঁচ মিনিট জোরে জোরে করাত চালিয়েও সে শিটকিনির লোহাটা কেটে খতম করতে পারল না।

ম্যাক্স-এর শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়ে গেছে। বুঝল অচিরেই সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। বরাত আরও মন্দ। করাতটা হাত ফস্কে জলে পড়ে গেল। উপায়ভর না দেখে সে এবার শরীরের সবটুকুশক্তি নিঃসরণে নিঙড়ে পাল্লাটাকে দরে উমাদের মতো টানাটানি করতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাল্লাটা আলগা হয়ে গেল। আধ-কাটা শিটকিনিটা ভেঙে গেছে।

এদিকে সারারাত্রি ধরে ইস্পাত-নগরীর মিউজিয়ামে আশুন জ্বল। বেলা বাড়লে অধ্যাপক লোকজন নিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরালেন। কিন্তু হায়! ম্যাক্স-এর মৃতদেহ পেলেন না। নিঃসন্দেহ হলেন, অপদার্থটা হাড়গোড় পুড়ে একেবারে ছাইয়ের সঙ্গে মিশে গেছে।

অধ্যাপক সুলৎস-এর বুকের পাঁজরের সমান মডেলটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আতঙ্কের কিছুই নেই। যে মডেলের রহস্য, গুপ্তত্ব জানত সে-ও তো মডেলের সঙ্গেই পরপারে চলে গেছে। অধ্যাপক সুলৎস হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর গুপ্তত্ব ফাঁস হবার কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ রইল না।

এদিকে প্রায় একমাস আগেকার কথা। তখন জার্মান সাময়িক পত্রিকায় 'এ শতকে' নাম দিয়ে 'ফ্রাঙ্কভিল' নগরকে কেন্দ্র করে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। সেটার বক্তব্য—কোন যাদুকরের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় যেন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে একটা দৃষ্টিনন্দন নগর গড়ে উঠেছে। অদ্ভুত এ নগরটা নাকি এক জার্মান গড়ে তোলেন। তিনি নাকি ইস্পাত-সম্রাট সুলৎস-এর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। শিরা-উপশিরাই যদি জার্মান-রক্ত প্রবাহিত হয় তবে অবিশ্বাস্য কোনো কাণ্ড ঘটতে পারেন। অবাধ হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে নতুনত্ব যা কিছু হয়েছে সব তাতেই তো জার্মানদের হাতের ছোঁয়া রয়েছে।

সমুদ্রের একেবারে গা-ঘেঁষে নগরটা গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পর্বতশ্রেণী। ছোট্ট একটা নদী সাগরে এসে মিলিত হয়েছে। চমৎকার একটা প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ও আছে। মধ্যে বহু বাতুর খনি রয়েছে যেখান থেকে বহু মূল্যবান আকরিক উত্তোলন করা সম্ভব। কেওলিন আর শ্বেত পাথরের স্তর রয়েছেই। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, ফ্রাঙ্কভিল নগর সুবাস্ত্য রক্ষার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। নগরের প্রতিষ্ঠাতা

ভাই লিখেছেন, যদিও খুব বেশি আশা রাখি না, তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ মিটে গেলে অভূতপূর্ব ফলাফল নাকি পাওয়া যাবে। এখানকার গাছপালা ও জীবজন্তুর মতোই মানুষও নাকি নব্বই থেকে এক শ' বছর পরমায়ু পাবে। একমাত্র বার্ষিক্য পা দিলেই মৃত্যুর শিকার হবে। গত এক বছরে এখানে মৃত্যু হয়েছে শতকরা সোওয়া এক ভাগ। কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপে প্রতি বছর শতকরা তিন ভাগ লোক মারা যায়। পরিকল্পনাটা সফল হবে আশা করা যেতে পারে। তবে একটা ক্রুটি লক্ষণীয় যে, কমিটিতে যারা রয়েছেন সবাই ফরাসি, একজনও জার্মান নেই। কিন্তু পৃথিবীর যেখানেই কোনো মৌলিক জিনিস সৃষ্টি হয়েছে দেখা গেছে সেখানেই জার্মানদের হাতের ছোঁয়া রয়েছে। ফ্রাঙ্কভিল নগরের মাতব্বরদেরও একদিন না একদিন মরে যেতে হবে। আমেরিকাতে যদি না-ও হয় যুদ্ধক্ষেত্রে তো অবশ্যই। যথার্থ নগরী বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু সেদিনই গড়ে উঠবে।

তেরোই সেপ্টেম্বর এল। মাত্র আর কয়ঘণ্টা বাদেই অধ্যাপক সুলৎস-এর উদ্ভূত কামান উড়ে এসে ফ্রাঙ্কভিল নগরের ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে। ফ্রাঙ্কভিল নগরের গভর্ণর থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত কেউ-ই ভুলেও ভাবতে পারে নি যে, নগরটার পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে, ভয়ঙ্কর বিপদ আছাড় খেয়ে পড়ছে নগরের ওপর।

ড. সারাসিন খবরের কাগজের প্রথম পাতার প্রথম অনুচ্ছেদে চোখ বোলাতে বোলাতে এক জায়গায় এসে থমকে গেলেন। জুলস্ত ঘণ্টা আর বিভ্রাট তার মন-প্রাণ ভরে উঠল। খবরের কাগজের বক্তব্য মোটামুটি এরকম—বিশেষ সূত্রে জানা গেছে ফরাসি প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কভিল নগরের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা নিয়ে ইম্পাত নগরের ভয়ঙ্কর তোড়জোড় চলছে। স্যান্সন ও ল্যাটিনদের এ-যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এগিয়ে আসবেন কিনা ঠিক বলা যাচ্ছে না, তবে যে কোনো সুবিবেচক মানুষের সঙ্গে আমরাও বলব ক্ষমতার এ কী অপব্যবহার! কী জঘন্য মানসিকতা। এখনও সময়-সুযোগ আছে, ফ্রাঙ্কভিল যেন প্রতিরক্ষার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে।

অধ্যাপক সুলৎস ড. সারাসিনকে ভয়ানক বিবেচ্য আর ঘণা করেন তা আজ আর কারোরই অজানা নয়। ইম্পাত নগরী যে ফ্রাঙ্কভিল-এর প্রতিদ্বন্দী নগর সবাই ভালোই জানে। কিন্তু ইম্পাত নগরী যে সুখ-শান্তির নীড় একটা নগরে রক্তদী বইয়ে দেওয়ার জন্য তলেতলে প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ার পর এ-ব্যাপারে আর কারোর মনে এতটুকুও সন্দেহ রইল না। সংবাদদাতা সবাইকে সতর্ক করে দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'পরিস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, আর একটা ঘণ্টাও নষ্ট করা সম্ভব নয়।'

ড. সারাসিন কাউন্সিলের জরুরি সভা ডাকার চিন্তা করলেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ডাকাডাকি করে অল্প সময়ের মধ্যে সবাইকে একত্রিত করা সম্ভব নয়। তাই অন্যোপায় হয়ে তিনি অভিনব এক পন্থা গ্রহণ করলেন। টেলিফোনের মাধ্যমে কাউন্সিলের সভা সেরে ফেললেন। সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, আক্রমণের জন্য অপেক্ষা না করে যাতে মোটেই আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে সচেষ্ট হতে হবে। শত্রুপক্ষ যদি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে হানা দেয় তবে টর্পেডো দিয়ে তাকে ঘায়েল করা হবে। হিসাব করে দেখা গেল, প্রতিরক্ষার জন্য দেড় থেকে দুকোটি ডলার ব্যয় হবে। আর এ ব্যাপারটা নাগরিক সংঘকে যত শীঘ্র সম্ভব জানাতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া—হল বাঘা বাঘা গোলন্দাজ ও রসায়নবিদদের অবগত করা হবে, কর্ণেল হেনডন-এর পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য কী? সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় কাউন্সিলের মাত্র আঠারো মিনিটের এ-সভা শেষ হল।

ড. সারাসিন কাউন্সিলের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত টাউন হলে ঘোষণা করে দিলেন। পার্কের সুউচ্চ থাণ্ডার মাথায় অবস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টাগুলো এক-সঙ্গে বেজে উঠে জনসাধারণকে জরুরি তলব জানাল। আর থাণ্ডারের প্রত্যেকটার মাথায় ঘণ্টার পাশে ডায়াল প্রেটের কাঁটা সাড়ে আটটার ঘরে দাঁড়িয়েছিল। অতএব বুঝতে অসুবিধা হল না, সাড়ে আটটায় টাউন হলে সবাইকে জমায়েত হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

ড. সারাসিন তাঁর বিশেষ আসনে উপবিষ্ট। তাঁকে ঘিরে বসেছেন কাউন্সিলের সদস্যরা। সভার উদ্দেশ্যের কথা অধিকাংশ নাগরিকই ইতিমধ্যে জেনে গেছে। আর টেলিফোনে সব কয়টা দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ ছাপা হয়ে যায় আর সেগুলো শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে স্টেটে দেওয়া হয়।

সভাপতি ড. সারাসিন ঠিক সাড়ে আটটায় ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে সভার কাজ শুরু করলেন। সভার শুরুতে কর্ণেল হেনডন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি জনসাধারণকে আহ্বান জানান, 'যে সুমহান উদ্দেশ্য নিয়ে এ নগরীকে গড়ে তোলা হয়েছে সে আদর্শকে রক্ষা করার ব্রত পালন করতে সবাইকে আত্মনিয়োগ করতে হবে।'

ড. সারাসিন প্রস্তাব দিলেন, শীঘ্রই একটা প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করার জন্য আর ওই কমিটির ওপরই সামরিক ব্যবস্থার যাবতীয় ভার অর্পণ করার প্রস্তাবও দিলেন। উপস্থিত সবাই তাঁর প্রস্তাবকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করলেন। প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য পঞ্চাশ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করার জন্য সদস্যদের একজন প্রস্তাব দিলেন। এ-প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

ঘড়িতে তখন দশটা পঁচিশ। সভার কাজ সাক্ষর করা হল। সভাকক্ষ ছেড়ে সবাই যখন বেরোবার উদ্যোগ নিচ্ছে ঠিক তখনই একেবারে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেল। একেবারেই কুদর্শণ একজন লোক দূর করে মঞ্চে উঠে এল। তার চোখ-মুখ কিন্তু খুবই শান্ত। ভাবভঙ্গি সংযত। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ছেঁড়া ফাঁটা, কালিঝুলি ও কাদামাখা। আর কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। একনজরে দেখেই অনুমান করা যায়, খুবই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে। আগতুক দেখেই ঘরতর সবাই হকচকিয়ে গেল আর পরিচয় কি, কোথেকে ও কেন এখানে ছুটে এসেছে, তা জিজ্ঞাসা করার মতো বুকের পাটা কারোর নেই। এমনকি ড. সারাসিনও ঘাবড়ে গিয়ে মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলেন।

অদ্ভুত দর্শন লোকটা বজ্রগম্বীর স্বরে বলে উঠল, 'আমি একটু আগেই ইম্পাত নগরী-থেকে পালিয়ে এসেছি। হের সুলৎস আমাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণা, এ-নগরের মানুষগুলো রক্ষা করার জন্যই আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। আমার এরকম পোশাক-পরিচ্ছদ, রক্ত ও কাদামাখা গা দেখে আপনারা আমাকে চিনতে পারছেন না

বটে, তবে আসলে কিছু আমি আপনাদের অনেকেরই পরিচিত। তবে ম্যাক্স ব্রাকমান-এর ওপর তাঁর আস্থা এখনও অক্ষুণ্ণ রয়েছে, সম্পূর্ণ সত্য।

আগন্তুকের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ড. সারাসিন আর অ্যাস্টোভিয়াস সমন্বরে চোঁচিয়ে উঠলেন, 'ম্যাক্স! ম্যাক্স ব্রাকমান!'

ম্যাক্স ব্রাকমান-ই টাউনহলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়েছে। জলের তলদেশের পাইপের ভেতর দিয়ে অগসর হয়ে প্রায় সঙ্গীহীন অবস্থায় ইস্পাত নগরীর বাইরে এসে পড়ে। তিলমাত্র বাতাস অবশিষ্ট থাকায় প্রাণে মরতে মরতে সে বেঁচে গেছে। তারপর ক্লান্ত-আসন্ন দেহে পাহাড় ডিঙিয়ে, মরুভূমি পেরিয়ে কোনোরকমে ফ্রান্সভিল নগরে হাজির হতে পেরেছে। ফ্রান্সভিল নগর ও জনগণকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই তার একমাত্র স্বপ্ন। তাই তো আশমুখী অবস্থায়ও সে ত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পেরেছে। রাত্রি দশটায় সে এখানে হাজির হয়েছে।

ম্যাক্স আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করতে গিয়ে বলল, 'মাত্রা আর ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে যাবে। আকাশ থেকে শহরের বুকে কৃষ্টির মতো লোহা আর আগুন ঝড়তে শুরু করবে। শয়তানের সাক্ষাৎ চর সুলৎস এমন ভয়ঙ্কর একটা মারণাস্ত্র তৈরি করেছেন যা আমাদের ফ্রান্সভিল শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্ভূত, নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ভয়ঙ্কর সে মারণাস্ত্রটাকে আমি স্বচক্ষে চাক্ষুষ করে এসেছি। আগুন নেভানোর জন্য যতশীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি নিন। শয়তান সুলৎস যে কী ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী তা আপনাদের জানা নেই। তাঁর পরিকল্পনা মাফিক কাজ যদি নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে নগরের বুকে এক শ'টা আগুনের গোলা ছড়িয়ে পড়বে। তাই আগুন নেভানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ হবে জনগণকে রক্ষা করা।

ম্যাক্স যদি এরকম বক্তব্য ইউরোপে রাখত তবে তাকে বন্ধ পাগল আখ্যা দেওয়া হত। কিন্তু আবিষ্কারকে কিছুতেই হেয়জ্ঞান করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ড. সারাসিন-এর পরামর্শে সবাই ম্যাক্স-এর বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিল।

জনগণ মুহূর্তমাত্র মনুষ্য নষ্ট না করে বাড়ির নিচের পাতাল-কক্ষে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তৎপর হল। কারণ, বোমা যত শক্তিশালীই হোক না কেন মাটির নিচে ধ্বংসের তাণ্ডব চালাতে পারবে না। আবার কেউ কেউ দলবেঁধে কাসকেড পাহাড়ের দিকে ধাওয়া করল। যদি অগ্নিবৃষ্টিও শুরু হয় তবে জল, পাথর আর বালি দিয়ে তার মোকাবেলা করতে পারবে।

এদিকে নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তির টাউন হলে উপস্থিত থেকে নানা জল্পনা কল্পনা ও পরিকল্পনা মগ্ন রইলেন।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলল। রাত্রি পৌনে বারটা বাজল। ভয়ঙ্কর এক আবিষ্কারের মাধ্যমে শয়তান সুলৎস কি সত্যই এতবড় একটা শহরকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হবে?

ম্যাক্স হঠাৎ কোটের পকেট থেকে ছোট্ট একটা খাতা বের করে কয়েক মুহূর্ত নিবিষ্ট মনে অঙ্ক কষতে লাগল। তারপর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বলল, 'হায়! সমাধানটা এক মুহূর্ত আগে আমার মাথার এল না! এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক এমন একটা ভুল করতে পারেন স্বপ্নেও যে ভাবা যায় নি! তাঁর কামানের শক্তিশালী গোলা ফ্রান্সভিল নগরের মাথার ওপর দিয়ে ধেয়ে যাবে। মোটেই ফাটবে না। আর যদি ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে তবে তা আজ নয় ঘটবে ভবিষ্যতে।

ড. সারাসিন ও অন্যান্যরা বিস্ময়মিশ্রিত জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে ম্যাক্স-এর মুখের দিকে তাকাল। ম্যাক্স খাতাটা এগিয়ে ধরে সদ্য-কথা অঙ্কটা দেখিয়ে বলল, 'মারণাস্ত্রটা কেবলমাত্র ফ্রান্সভিল নগরকেই নয়, বিশ্বের কোনো অঞ্চলের গায়েই আঁচড় কাটতে পারবে না। মহাশূন্য চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

ড. সারাসিন কয়েক মুহূর্ত খাতার পাতার অঙ্কটার দিকে তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল।

তিন মিনিট, মাত্র আর তিন মিনিট বাকি। কার ভুল, হের সুলৎস নাকি ম্যাক্স-এর ভুল তা আর তিন মিনিট বাদেই হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রুদ্ধশ্বাসে সবাই প্রতীক্ষা করতে লাগল। ঘড়ির কাঁটা এগোতে এগোতে পৌনে বারটা সূচিত করল। আকাশের একটা গোলা বিদ্যুৎ গতিতে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই সেটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সোঁ সোঁ শব্দটাও অচিরে মিলিয়ে গেল।

সোল্লাসে ম্যাক্স বলে উঠল, 'ওর যাত্রা শুভ হোক, এভাবে যদি গোলাটা ধেয়ে যায় তবে কোনোদিনই সেটা আর পৃথিবীর বুকে ফিরে আসছে না।'

ঠিক দু-মিনিট বাদে দূর থেকে বাতাসে ভর দিয়ে চাপা অথচ গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। ক্ষেপণাস্ত্রটা ঘণ্টায় সাড়ে চারশ' মাইল বেগে ধেয়ে গিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার পর এক শতেরো সেকেন্ড বাদে ফ্রান্সভিল নগরে ভেসে এল।

চৌদ্দই সেকেন্ডেরের তারিখসহ ফ্রান্সভিল থেকে ম্যাক্স ব্রাকমান ইস্পাত নগরের অধ্যাপক সুলৎসকে চিঠি লিখতে লাগল। সে লিখল, 'খবরটা ইস্পাত-সম্রাটকে দেওয়া প্রয়োজনবোধ করায় এ চিঠি লিখতেই হচ্ছে। জ্বলন্ত আগুন থেকে মডেলটা উদ্ধার করার চেয়ে আমার প্রাণের দাম ঢেঁড় ঢেঁড় বেশি ছিল। তাই গত পরশ রাত্রি অন্ধকারে আমি তার এলাকা ছেড়ে এসেছি। আমার পরিচয় অর্থাৎ আমি কে সে পরিচয় আপনার কাছে প্রকাশ করা আমি কর্তব্য বলে মনে করেছি। ভাববেন না, আমার গোপন পরিচয় জানার অপরাধে আপনার গর্দান নেওয়ার আদেশ দেব না। আমার প্রকৃত নাম 'জোহান' না। আমি জাতিতে 'সুইশ' না। অ্যালসেসে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। ম্যাক্স ব্রাকমান আমার নাম।

একটা কথা, আপনার বক্তব্যকে সমর্থন করলে বলতে হয়, আমি একজন ভালো প্রযুক্তিবিদ। তবে আমি তো ফরাসি। আমার দেশ ও দেশবাসীর কাছে আপনি চরমতম শত্রু। আমাদের ধ্বংস করাই আপনার লক্ষ্য। আপনার কুমতলব আমি জানতে, আমি জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হই নি। আর তা ভেঙে দিতে আমি আবারও প্রাণের মায়া তুচ্ছ করতে দ্বিধা করব না।

সবার আগে বলছি, আপনার কামানের গোলার কৌশল তেমন উৎকৃষ্ট নয়। কামানটা অবশ্য উৎকৃষ্ট বটে। কিন্তু সেটা থেকে উৎক্ষিপ্ত গোলা কোনোদিনই কারো সামান্যতম ক্ষতিও করতে সক্ষম হবে না। আগেই তার কারিগরী ক্ষমতা

নিয়মে দ্বিধাপ্রস্তু ছিলাম। এখন কোনোই সন্দেহ রইল না। চমৎকার এমন একটা কামান সৃষ্টি করেছেন যা থেকে কারো ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। আপনি শুনে আনন্দিত হতে পারেন যে, রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত পলিট চার সেকেন্ডে শহরের ওপর দিয়ে কামানের গোলাটাকে উড়ে যেতে দেখা গেছে, সেটা পশ্চিমদিকে গিয়ে ভূ-প্রদক্ষিণ করতে লেগেছে। সৃষ্টির অন্তিম মুহূর্ত অবধি অনবরত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেই চলবে, কারোর ওপরেই আছাড় খেয়ে পড়বে না। যার প্রাথমিক গতিবেগ সেকেন্ডে দশ হাজার গজ সে-ক্ষেপনাস্ত্র কার মাথায়ই পড়বে না, পড়তে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি এ-গতিবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাই তো আপনার সৃষ্ট কামানের গোলাটার বরাতে ছিল ভূ-প্রদক্ষিণ করা। এ তথ্যটা আপনার জানা উচিত ছিল বৈ কি।

হ্যাঁ, দু-লক্ষ ডলার ব্যয় করে যদি গ্রহলোকে নতুন একটা নক্ষত্র সংযোজন সম্ভব হয়, আর পৃথিবীকে দ্বিতীয় একটা উপগ্রহ উপহার স্বরূপ দান করা সম্ভব তবে এর চেয়ে ভালো আর কি-ই বা হতে পারে?

হ্যাঁ, ম্যাক্স-এর বক্তব্যই ঠিক, কামানের উড়ন্ত গোলাটা পৃথিবীর মাটিকে কোনোদিনই ছোঁবে না। আর একটা বার মাত্র কামান দাগার পরই অধ্যাপক সুলৎস-এর অতিকায় অস্ত্রটা নষ্ট হয়ে যায়।

ম্যাক্স-এর চিঠিটা পড়ে সুলৎস বড়ই অস্বস্তিতে ভুগতে লাগলেন। যুবকটা তার অহঙ্কারে মারাত্মক যা মেরেছে। স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার পর শ্রহরী সিগিমার আর আর্মিনিয়াস-এর ওপর যারপরনাই হস্তিষি করতে লাগলেন।

না, পরাজয়স্বীকার করা সুলৎস-এর পক্ষে সম্ভব নয়। ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। এবার থেকে আহুতা ম্যাক্স-এর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অব্যাহত থাকবে। তাঁর অস্ত্রাগারে তো প্রচুর সংখ্যক কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ গোলা মজুত আছে। তিনি আবার কাজে মেতে গেলেন। মনে হচ্ছে, ফ্রাঙ্কভিল নগরকে কিছুতেই রেহাই দেবেন না। যেন তেন একারে তার ধ্বংস অনিবার্য।

ম্যাক্স ড. সারাসিন ও তাঁর সঙ্গীদের বুঝিয়ে বলল, সাময়িকভাবে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেলেও পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক সুলৎস-এর ভয়ঙ্কর যন্ত্রণেলোর গঠন ও কার্যকারিতা যা কিছু নিজের চোখে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখে এসেছে, তা প্রতিরক্ষা কমিটির কাছে ব্যক্ত করল।

ফ্রাঙ্কভিল নগরকে ধ্বংস করার জন্য অধ্যাপক সুলৎস যে কার্মকাণ্ড শুরু করেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা শুনে সেদিন প্রতিরক্ষা কমিটি জরুরি সভায় মিলিত হল। তাঁর ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনাকে বাতিল করা না গেলেও কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব তার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দীর্ঘ আলোচনা হল। তবে সবকিছুই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখা হল। কেবলমাত্র সভায় গৃহীত মূল সিদ্ধান্ত ও উদ্দেশ্যটা সংবাদপত্রের পাতায় ছেপে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তবে কারো জানতে বাকি নেই ম্যাক্সই পর্দার আড়ালে থেকে পুরো ব্যাপারটাকে পরিচালনা করে চলেছে।

ম্যাক্স নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'সুলৎস-এর কামানের আকৃতি, গঠনবৈচিত্র্য এবং ক্ষমতা, সবই আমি জেনে এসেছি। অতএব সেসব দিক বিবেচনা করে আমাদের প্রতিরক্ষার জন্য তৈরি হওয়া উচিত।'

সিদ্ধান্ত নেওয়া হল স্থল আর জলপথে সুলৎস-এর অস্ত্র যাতে ফ্রাঙ্কভিলের ধারের কাছেও ঘেঁষতে না পারে সেরকমই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পুরোদমে কাজসুরু হয়ে গেল। পর্যাপ্ত কয়লা ও লোহা সংগ্রহ করা হল। দু-বছরের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু মজুদ করা হল।

ফ্রাঙ্কভিল নগরের যুবকদের নিয়ে সেনাদল গঠন করা হল। বন্দুক কাঁধে কুচকাওয়াজ চলতে লাগল মাঠে-ময়দানে। মাটির পুরু ও উঁচু দেওয়াল তোলা হল গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়গুলোতে। আর পথের ধারে ধারে সুগভীর পরিখা খনন করা হল।

জানা গেছে সুলৎস নাকি কামান বহন করে নিয়ে আসার জন্য জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছেন। এমনও শোনা গেল, তাঁর যুদ্ধ-জাহাজ ফ্রাঙ্কভিল-এর উপকূলের কাছাকাছি চলে এসেছে। গুজব! গুজব! চারদিকে এমন গুজব শোনা গেল শূন্যপথে এসে নাকি স্যাকরামেন্টো রেলপথকে অবধি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুজব বেশি করে হড়াল খবরের কাগজওয়ালারা। আবার এমনও শোনা গেল, ইম্পাত-নগরী আদৌ অক্ষত আছে বলে সন্দেহ রয়েছে। আসলে এমন কর্মচঞ্চল নগরীটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। আর সুলৎস সর্বশেষ খুঁয়ে সত্যি সত্যিই গা-ঢাকা দিয়েছে।

এক সময় মনে হল যেন ফ্রাঙ্কভিল নগরের আকাশ থেকে দুর্যোগের মেঘ কেটে গেছে। জনগণ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অন্য সবাই যাই-ই ভাবুন না কেন, ম্যাক্স কিন্তু কিছুতেই-নিশ্চিত হতে পারল না। ইম্পাত নগরীতে গিয়ে নিজের চোখে সবকিছু না দেখা অবধি সে কিছুতেই নিশ্চিত হতে পারছে না। রহস্যের শেষ দেখে তবেই সে ফিরবে।

ড. সারাসিন বললেন, 'কাজটা ভয়ঙ্কর বিপদজনক, বাঘের গলায় মাথা গলাতে গিয়ে নতুন করে বিপদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সুলৎস মরণ-কামড় না দিয়ে কিছুতেই সরে যাবে না।'

সকাল হল। নীরব-নিস্তব্ধ গ্রামের তেতর দিয়ে উষ্কার বেগে ছুটে গেল একটা জীপগাড়ি। সেটা থেকে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস নেমে এল। উভয়ের মনেই কঠিন প্রতিজ্ঞা—রহস্য ভেদ না করা অবধি ফিরবে না।

ইম্পাত নগরী যেন শূণ্যানে পরিণত হয়ে গেছে। মানুষের চিহ্নও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সবাই পালিয়েছে। এক সময় যেসব অঞ্চল মানুষের ভিড়ে গম গম করত, আজ সেসব অঞ্চলে বিরাজ করছে শূণ্যানের নিস্তব্ধতা!

কিছুদূর এগিয়ে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস ডিনামাইট বসানোর কাজে মেতে গেল। কাজ সেরে পলতেতে আগুন দিয়ে তারা দ্রুত তফাতে চলে গেল। অকস্মাৎ যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। সে কী বিকট আওয়াজ করে ডিনামাইটটা ফাটল! বাড়ি-ঘর আর কারখানা হুড়মুড়িয়ে পড়তে লাগল। আর প্রাচীরগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। ম্যাক্স একদিন সুলৎস-এর যে স্কুডিও দেখে বিষয়ে হতবাক হওয়ার জোগার হয়েছিল, আজ তা-ই ধ্বংসস্থল পরিণত হল।

অমিত মনোবলে ম্যাক্স আর অক্টোভিয়াস এবার একের পর এক দরজা ভেঙে এগোতে লাগল। আর একটামাত্র

দরজা ভাঙতে পারলেই সুলৎস-এর কামরা। এর জন্য আর ডিনামাইট খরচ না করে কুড়ুলের আঘাতেই কাজ হাসিল করে ফেলল। এবার দরজা দিয়ে ভেতরের দিকে পা বাড়াতেই আচমকা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছে?'

এমন কোনো অপ্রত্যাশিত ঘটনার মুখোমুখি হয়ে ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস উভয়েই রীতিমতো ভড়কে গেল।

আবার। আবারও সে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছে? জোহান? জোহান নাকি? ফিরে এসেছ?'

ব্যাপারটা এমন মনে হল যে, তার পালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ফিরে আসার ব্যাপারটা সুলৎসকে আরও অনেক বেশি আতঙ্কিতও বিস্মিত করেছে।

সিগিমার ম্যাক্স-এর পথ আগলে দাঁড়াল। মনিবের হুকুম ছাড়া তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে সে নারাজ। ম্যাক্স বলল, 'ঠিক আছে। তাকে আমার আগমনবার্তা পৌঁছে দাও। তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

সিগিমার তাতেও যেন খুশি নয়। অক্টোভিয়াস জোর করে ভেতরে ঢোকার পরামর্শ দিল। ঠিক তখনই গম্ভীর ও অদৃশ্য কণ্ঠ শোনা গেল, 'কে? কে যাচ্ছে?'

আর্মিনিয়াস। আর্মিনিয়াস-এর কণ্ঠস্বর। ম্যাক্স গলা চড়িয়েই বলে উঠল, 'আর্মিনিয়াস, মোদা কথা শুনতে চাই, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেবে, কিনা?' তার দিক থেকে আশাব্যঞ্জক কোনো সাড়া না পেয়ে সে ডিনামাইট চার্জ করার সিদ্ধান্ত নিল। তার আগেই বন্দুক গর্জে উঠল। এক লাফে জঙ্গলে ঢুকে গিয়ে দুই বন্ধু প্রাণ বাঁচাল। আবারও গুলি চালাবার আশঙ্কা নিয়ে তারা ঝটপট নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেল।

ম্যাক্স অনুচক্কে অক্টোভিয়াসকে বলল, 'এক কাজ কর, অনবরত গুলি চালিয়ে যা। ফলে তারা তোর দিকেই নজর রাখবে। আর আমি ঝোপের আড়াল দিয়ে পিছন দিকে গিয়ে অক্রমণ করব।'

ম্যাক্স অনবরত গুলি চালাতে লাগল। বিপরীত দিক থেকেও সমান তালে গুলি আসতে লাগল। একনাগাড়ে বিশটা গুলি বিনিময়ের পর গুলির আওয়াজ থেমে গেল।

কাচের জানালা দিয়ে অক্টোভিয়াস ঘরের ভেতর লাফিয়ে পড়েই দেখল, ম্যাক্স আর সিগিমার মনুষ্যদ্বন্দ্ব লিপ্ত। মরণপণ লড়াই। অক্টোভিয়াস এবার ম্যাক্সকে সাহায্য করতে লাগল। সিগিমার অমিত শক্তিদ্বার হলেও উভয়ের মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। দুই বন্ধু এবার দড়ি দিয়ে পিঠমোড় করে বেঁধে তাকে মেঝেতে ফেলে রাখল। আর এক শত্রু আর্মিনিয়াস রক্তপ্লুত অবস্থায় বারান্দার বেঞ্চে এলিয়ে পড়ে। অক্টোভিয়াস-এর গুলিতে আগেই সে প্রাণ দিয়েছে।

ম্যাক্স উল্লাস প্রকাশ করে বলল, 'বাস, এখন আমরাই এখানকার সবকিছুর মালিক।' দুই বন্ধু এবার আনন্দে ডগমগ হয়ে হের সুলৎস-এর ব্যক্তিগত কামরার দিকে এগিয়ে চলল।

ম্যাক্স ভেবেছিল, কামরায় ঢুকে অভ্যাচার্য কিছু চাকুস করবে। কিন্তু কার্যত যা দেখল তাতেই তার চক্ষুস্থির। দেখল, কামরার সর্বত্র রাশি রাশি চিঠি ছড়িয়ে পরে রয়েছে। কেবল চিঠি আর চিঠি-চিঠির পাহাড়। পার্কের চিঠির বাজ্রে যত চিঠি ছিল সবই ষণ্ডামার্কী লোকদুটো এনে ঘরময় ছড়িয়ে দিয়েছে। কোনোটাই খোলা হয় নি। কে খুলবে? কতসব অসহায় মানুষের চোখের জল যে এদের গায়ে লেখা রয়েছে ঠিক ঠিকানা নেই।

সেখানে আর সময় নষ্ট না করে ম্যাক্স এবার অক্টোভিয়াসকে নিয়ে ল্যাবরেটরির গুপ্তদরজার জন্য হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। ম্যাক্স নিশ্চিত ছিল স্তূপাকৃতি বইয়ের আড়ালে গুপ্তদরজাটা পাবে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে দুই বন্ধু পর্বতপ্রমাণ বই সরিয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। সেখানে দরজার কোনো চিহ্ন নেই। ম্যাক্স ভাবল, শয়তান হের সুলৎস হয়ত বা দেওয়ালের সঙ্গে সুড়ঙ্গের দরজাটাকে মিশিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু আর্মিনিয়াস সিগিমার প্রতিদিন যে চিঠির পাজা বয়ে আনত সেগুলো পড়তে তিনি নির্ধাৎ গুপ্তকক্ষ থেকে এ-ঘরটায় আসতেন। কিন্তু কোনো দিক দিয়ে, কোনো পথে? ম্যাক্স এবার ভাবল, গুপ্তদরজাটা হয়ত বা কার্পেটের তলায় রয়েছে। কঠোর পরিশ্রম করে সে কার্পেটের পেরেক খুলে খুলে কার্পেটটাকে সরিয়ে ফেলল। কিন্তু এবারও তাকে হতাশ হতে হল।

এবার বাকি কামরার ছাদটা দেখা গেল। ছাদের কড়িকাঠ হাতাতে হাতাতে ম্যাক্স এবার কড়িকাঠের গায়ের একটা টুকরো দূরে হেঁচকা টান দিতেই ইম্পাতের একটা পাতলা ও হালকা সিঁড়ি সুড় সুড় করে নেমে এল।

ইম্পাতের সিঁড়িটার বিপরীত প্রান্তটা দিয়ে ম্যাক্স ঝটপট মই বেয়ে বৃত্তাকার একটা কামরায় হাজির হল। লেসের মতো পুরু কাঁচ দিয়ে বৃত্তাকার কামরাটার আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাইরে থেকে কোনোরকম শব্দ কামরার ভেতরে আসার উপায় নেই, আবার ভেতরের শব্দও বাইরে যেতে পারে না। সেই কামরাটার ভেতরে শৃঙ্গানের স্তম্ভতা বিরাজ করছে।

কামরাটার ভেতরে ইটাইটি করতে করতে এক সম্মান ম্যাক্স থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য দৃশ্যের মুখোমুখি হল সে। ঘরের মেঝেতে সাধারণ কাঁচ নয়, আতস কাঁচ, কনভেক্স লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে নিচের কামরাটার দিকে এক নজরে তাকিয়েই সে একেবারে হকচকিয়ে গেল। স্বদগিও স্তম্ভ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। যে-রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্য দীর্ঘদিন সে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে তা আজ তার হাতের মুঠোয়। হের সলিৎস-এর গবেষণাগার-তার গুপ্তগবেষণাগার। কামানের গোলায় ভাঙা টুকরো ইতস্তত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

সে দেখল, কামরাটায় নিশ্চয়-নিখর এক মনুষ্যমূর্তি চেয়ারে উপবিষ্ট। লেসের প্রতিসরণের কৌশলে তাকে মার্বেল পাথরের একটা টুকরো বলেই মনে হচ্ছে। এক নজরে দেখেই ম্যাক্স নিঃসন্দেহ হল, নিজেরই আবিষ্কৃত বিস্ফোরক পদার্থে তিনি প্রাণদিয়েছেন। ভয়ঙ্কর বিস্ফংসী গোলা নিজে থেকেই ফেঁটে গিয়ে তাকে যমের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে।

গোলায় বারুদ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিণত হয়ে নিদারুণ শৈত্যের সৃষ্টি করেছে। তাতেই হের সুলৎস জমে কাঠ হয়ে গেছেন। দুই বন্ধু কাঁচের জানালা দিয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা দেখতে লাগল। কাঁচের জানালা না থাকলে তারা ইতিমধ্যেই ঘরে ঢুকে যেত। ব্যস, শৈত্য জমে মার্বেল পাথরের মূর্তি বনে যেত।

কাঁচের খোলসটাকে তৈরি করা হত এমন পদ্ধতিতে যা সাধারণ কাঁচের চেয়েও দশগুণ পোক্তা এবং সহজে যাতে ভেঙে না যায়। একরম সতর্কতা অবলম্বনে তৈরি মারণাস্ত্রটারও কিছু দোষত্রুটি রয়ে গিয়েছিল যার ফলে তা কেঁটে গিয়ে প্রমাদ ঘটিয়েছে। ত্রুটিটুকু হের সুলৎস নিজে জানতেন না বলেই তো এমনটা ঘটতে পেরেছে। হয়ত বা বাতাসের চেয়েও বহুগুণ বেশি চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড কাঁচের খোলসে ভরে রাখায় অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, যা খোলসটার পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি। আর তা নিমেষের মধ্যে শূন্য ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে নেমে গিয়ে শরতান অধ্যাপক সুলৎসকে পাথরের মূর্তির মতো জমিয়ে দিয়েছে।

ম্যাক্স অনুসন্ধিৎসু সুনজর মেলে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারল, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে অধ্যাপক কি যেন লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। কি? কি লিখছিলেন জানার জন্য সে অবর্ণনীয় মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করতে লাগল। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কাঁচের জানালা ভেঙে কামরাটায় ঢোকার চিন্তা পাগলেও করতে পারবে না। ভেতরে ঢোকা তো দূরের ব্যাপার। মাথা গলাতে না গলাতেই মারণগ্যাস ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ করে দেবে। ম্যাক্স লেখাটা পড়ার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কনভেক্স লেসে হরফগুলোকে অনেকাংশে বড় করে চোখের সামনে হাজির করায় তার প্রয়াস সার্থক হল।

নির্দেশ নয়, হুকুম। ইম্পাত-সম্রাট হের সুলৎস নির্দেশ নয়, হুকুম দিতেই ব্যস্ত ছিলেন। তার হুকুমনামাটা হচ্ছে, পনের দিনের মধ্যে যেন ফ্রাঙ্কভিল নগরের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অভিযান শুরু করা হয়—আমার হুকুম হস্তগত হলেই আমার উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুযায়ী সংগ্রহের কাজে লেগে যাও। এবার আর ভুল ত্রুটি হচ্ছে না, কারোর প্রাণই রক্ষা পাবে না। আমার হুকুমের যেন সামান্যতমও এদিক-ওদিক না হয়। আমি চাই, ফ্রাঙ্কভিলে কোনো প্রাণীই যেন জীবন্ত না থাকে। আর তা করতে হবে এক পক্ষকালের মধ্যেই

ড. সারাসিন ও ম্যাক্স ব্রাকমান-এর মৃতদেহ দুটো আমার চাই-ই চাই, পাঠিয়ে দিতে যেন ভুল না হয়।
স্বাক্ষরটা পরিপূর্ণ নয়। শেষ-টানটা দেওয়ার আগেই নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তাঁকে নিচল-নিখর পাথরের মূর্তি করে দিয়েছে।

না, আর এক মুহূর্তও দেরি করা সম্ভব না ভেবে বন্ধু দুজন ইম্পাতের মইটা বেয়ে নিচের কামরায় নেমে গেল। অচিরেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে অধ্যাপক হের সুলৎস-এর নিষ্প্রাণ দেহকে ঘিরে ধরবে। মনে হবে যেন মিশরের ফ্যারাওরা হাজার হাজার বছরের মমিরূপে সমাধি-কঙ্কের গ্রহরায় নিযুক্ত।

ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস ঘণ্টা খানেক বাদে সিগমার-এর বাঁধন খুলে মুক্তি দিল। কিন্তু এ-স্বাধীনতা যে তার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন। এ-স্বাধীনতাকে সে কীভাবে কাজে লাগাবে জানে না। আদৌ কোনো কাজে লাগবে কিনা তা-ই বা কে জানে?

সেদিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নামতে না নামতে ম্যাক্স ও অক্টোভিয়াস ফ্রাঙ্কভিল নগরে গিয়ে অধ্যাপক হের সুলৎস-এর মৃত্যু-সংবাদটা দিল। আর বলল, 'যে গোলা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আমাদের ধ্বংস করার হুকুম দিয়েছিলেন ভয়ঙ্কর সে-গোলাটাই আপনা থেকে ফেটে গিয়ে স্বাক্ষরটা সম্পূর্ণ করার আগেই তাঁকে পরোপারে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে একটু দম নিয়ে ম্যাক্স এবার বলল, 'ড. সারাসিন, অধ্যাপক হের সুলৎসের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একমাত্র আপনিই আজ ইহলোকে রয়েছেন। শিল্প-নগরীকে পুনর্জীবন দান করার দায়িত্বভার আমার ওপর অর্পণ করুন। আমি এ-মহান ব্রত উদযাপনে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই।'

এদিকে ফ্রাঙ্কভিল নগরের দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। আর সেটা পরিণত হতে লাগল এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখের নীড়ে। কিন্তু ইম্পাত-নগর? ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র তৈরি কারখানায় পরিণত হল। এতে ম্যাক্স ব্রাকমান-এর অবদান অপরিমিত। এক বছর আগে ম্যাক্স আর জেনেট-এর বিয়ে হয়েছিল। জেনেট আজ এক সন্তানের জননী। ম্যাক্স ও জেনেট সন্তানকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করতে লাগল।

ইটারন্যাল অ্যাডাম

জারটগ।

মাথার ভেতরে জটপাকানো চিন্তা নিয়ে অস্থিরচিত্ত জারটগ একা পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। কিসের চিন্তা? মনুষ্যজাতির অতীতের কথা নিয়ে তিনি ভাবনায় ডুবে রয়েছেন। তিনি একজন মহা পণ্ডিত। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর নখদর্পণে। তা ছাড়াও বহু বিষয়েই তার পাণ্ডিত্য রয়েছে। এতকিছু সন্তোষ বহু বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন ভদ্রলোক।

তাঁর সমসাময়িককালের ইতিহাস তিনি খুব ভালোই রঙ করেছেন। আট হাজার বছরের অতীত কাহিনীর কথা বলতে চাইছি। কিছু সংখ্যক মানুষের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে মরার ইতিহাস। ছোট্ট এক এক চিলতে জায়গায় অনেক মানুষ বসবাস করতে গেলে যা হয় সে কথা বলতে চাইছি। কেপহর্ন ও বার্লিনের মধ্যবর্তী ছোট্ট ভূখণ্ডটুকুকে কেন্দ্র করে আট হাজার বছর ধরে কম মারামারি কাটাকাটি হয়নি, কম রক্তপাত ঘটে নি। কেবলমাত্র এ অংশটুকুই ভূখণ্ড, অবশিষ্টাংশে তো কেবল জল আর জল। সম্পূর্ণ পৃথিবীকে জল বেষ্টন করে রেখেছে। তাই তো আট হাজার বছরের ইতিহাসেই পাতায় কেবল রক্ত আর রক্ত ছড়িয়ে রয়েছে। জারটগ যে সাম্রাজ্যের নাগরিক তার এক শ' পঁচানব্বইতম বার্ষিকী উৎসব, এই তো সবে উদযাপন করা হল। সাম্রাজ্যটার বিচিত্র এক নামকরণ করা হয়েছে।

এর চারদিকে সমুদ্র অবস্থান করছে বলে এর নামকরণ করা হয়েছে 'চার সাগরের দেশ'। আট-আটটা হাজার বছর ধরে এখানকার মানুষ অনবরত লড়াই-ই করে এসেছে। আট হাজার বছরের লড়াইয়ের কাহিনীকে চারটে ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। শেষের দিকে তিনটে সম্প্রদায় একটু বেশি করে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছিল। শেষপর্যন্ত দুটো সম্প্রদায়কে পরাজিত করে একটা সম্প্রদায় চাড়া হয়ে উঠল।

প্রায় দু-শ' বছর আগে এক ভয়ঙ্কর রক্তপাতের মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে জারটগদের সাম্রাজ্য 'চার সমুদ্রের দেশ'র জন্ম হয়।

আট হাজার বছর ধরে মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রথমে তারা শিখল লিখতে। তারপর একরকম লেখার ছাঁচ তৈরি করল। তা থেকে বহু সংখ্যক কপি করার পদ্ধতি মাথা খাটিয়ে বের করল। একজনের চিন্তা-ভাবনাকে অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উপায় রপ্ত করল।

এবার এক এক করে কয়লা, বাষ্পশক্তি ও যান্ত্রিকশক্তি উদ্ভাবন করা হল। মাত্র পাঁচ শ' বছর আগে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। জারটগদের পূর্বপুরুষরা আকাশের বিদ্যুৎকে নিজ বশে নিয়ে এল।

আসল প্রশ্ন তো এটা নয়। তার সমাধানতো এখনো হল না। এ দুনিয়ার মালিক যে মানুষ, তার প্রকৃত পরিচয় কি? কে এই মানুষ? কোথা থেকে আসে এ-মানুষ? যায়-ই বা কোথায়?

ভূতত্ত্ববিদরা ভূত্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন পৃথিবীর বয়স চার শ' হাজার বছর। চার সাগরে ঘেরা এদেশ, মহাদেশ বললেও অতুষ্টি হবে না। গোড়াতে এটা জলের নিচে অবস্থান করছিল। এর মাটির প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে এদেশ জলের নিচ থেকে উঠে এসেছে। সে না হয় হল, কিন্তু কি করে তা সম্ভব হয়েছে? এত বড় একটা দেশকে কোনো শক্তি ঠেলে ওপরে তুলে দিয়েছে? পাহাড় সংলগ্ন সামুদ্রিক পলিমাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এমন অনেক তত্ত্ব জানা সম্ভব হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি প্রভৃতি কি সমুদ্রের বুক থেকে উঠে এসেছে? তবে এদের উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হল? মানুষের উত্তরসূরীদের নিয়েই তো সে-জিজ্ঞাসা।

ভূতত্ত্ববিদদের মতে বিশ্ব সংসারের যাবতীয় স্থলভূমিই এক সময় জলের নিচে ছিল। সবই জল থেকে সৃষ্টি হয়েছে।

তবে? তবে বিচিত্র এসব মাথার খুলিগুলো কোথেকে এল? তাদের অবস্থানও কি জলের নিচেই ছিল? জারটগ মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করার সময় খুলিগুলো উদ্ধার করেছেন। এগুলো যে মানুষেরই মাথার খুলি কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এগুলো বিভিন্ন মাগের। ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন রকম। ছোট খুলিগুলো দু-তিন বছর আগেকার, সে তুলনায় শরীরের হাড়ের কাঠামোটা অনেক বড়। আরো পিছিয়ে গেলে, অতীতের খুলির মাগ ক্রমেই বড় হয়ে গেছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে কি আজকের মানুষের তুলনায় অতীতের মানুষ খুবই বেশি বুদ্ধিমান ছিল। অবশ্যই না, সন্দেহের নামমাত্র অবকাশও নেই। অতীতের মানুষ অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল? তাদের কাছে জারটগদের শিশু বললেও কিছুমাত্রও বাড়িয়ে বলা হবে না।

এ তো অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যাচ্ছে, বিবর্তনবাদ কি তবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে? পুরানো খুলিগুলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও হিসাব-নিকাশ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেগুলো বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার বছরেরও আগের খুলি। তখনকার মানুষের মধ্যে সভ্যতার আলো কতখানি বিস্তার লাভ করেছিল তা-তো কোথাও লেখা-বোখা নেই। বিশ হাজার বছর পুরনো কথা ভাবলেও রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়।

বিশ হাজার বছর আগের মানুষ জারটগদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ঢের উন্নত ছিল একথা শুনলেও লোকের হাসির উদ্বেক ঘটবে। তবে কোথায় সে সভ্যতা? চল্লিশ হাজার বছর আগে যারা পৃথিবী জুড়ে আধিপত্য ঘটিয়েছিল,

কোথায় কীভাবে মিলিয়ে গেল তাদের কীর্তির নিদর্শন ? কোথায় সে অট্টালিকা, যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য উন্নত সভ্যতার নিদর্শন ? সবই কি নিশ্চিহ্ন হয়েছে ? তাইতে কি জারটগদের পূর্বসূরীরা নতুন করে লিখতে শিখেছে, বাষ্পীয় শকট উদ্ভাবন করেছে, কারখানায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছে ? আর সেদিন থেকেই কি নতুন করে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে ?

অত্যাশ্চর্য! একেবারেই অবিশ্বাস্য! তার চেয়ে সহজে অলৌকিক শক্তিতত্ত্ব বিশ্বাস করা সম্ভব।

যে মারাত্মক শক্তির বশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ষাট হাজার বছর আগে প্রথম পুরুষ 'হেডম' আর নারী 'হিভা'কে সৃষ্টি করেছিল। আজ পৃথিবীর বাসিন্দা তাদেরই উত্তরসূরীরা। কিন্তু জারটগদের ভাষায় তো 'হেডম' ও 'হিভা' শব্দ দুটোর উল্লেখ তো দেখা যায় না। তবে তারা কীভাবে এল ?

এমন কত অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য ব্যাপারই না মাটি খোঁড়াখুড়ির ফলে পাওয়া গেছে। সামুদ্রিক মাটির নিচের বিশ্বয় জারটগদের চমকে দিয়েছে। ভিনু ভিনু যুগের ভিনু ভিনু বিশ্বয়ের নিদর্শণ মাটির তলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এরকমটা কি করে হতে পারে ? একই স্থানে এতগুলো সভ্যতার ভাঙা-গড়া কি করে হতে পারে ? বিশ হাজার থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার বছর আগে তবে এ মাটির ওপরেই মানুষ সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু এ দেশ তো জলের নিচে অবস্থান করছিল। তবে ?

ব্যাপারটা নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন ভাবনায় তলিয়ে থাকায় জারটগ-এর মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। চিন্তার জট ছাড়াতে ছাড়াতে সে বাগানের পিছন দিকে হাজির হল। এখানটায় মাটি খোঁড়া হচ্ছে। এখানে বিশাল অট্টালিকা গড়ে তোলা হবে। এখন যে ল্যাবরেটরিটা রয়েছে তার দ্বিগুণ একটা ল্যাবরেটরি এ বাড়িতে তৈরি করা হবে।

হাঁটাচাঁটা করতে গিয়ে জারটগ বিশাল একটা গর্ত দেখতে পেলেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হলেন। গর্তটা দেখে অবশ্যই তাঁর মধ্যে এমন আশ্রয়ের সপ্নের ঘটে নি। গর্তের ভেতরে অবস্থানরত অর্ধেকটায় বিচিত্র বস্তু দেখতে পাওয়ার ফলেই তিনি এমন আগ্রহান্বিত হলেন। ব্যস্ত-হাতে তিনি বস্তুটাকে গর্তটার ভেতর থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনলেন। অদ্ভুত ধাতু দিয়ে তৈরি একটা পাত্র। ইতিপূর্বে এরকম ধাতু আর চোখে দেখেন নি। ছাই রঙের পাত্রটা। দীর্ঘদিন মাটির সংস্পর্শে থাকায় তেমন ঝকঝকে ভাব আজ আর নেই। পাত্রটার এক জায়গায় ফেঁটে গেছে। ফাঁটা জায়গা দিয়ে ভেতরে আর একটা পাত্র নজরে পড়ছে। বড় একটা পাত্রের ভেতরে অপেক্ষাকৃত ছোট পাত্র ঢুকিয়ে রাখলে যেমনটা দেখা যায়। গায়ের জোরে পাত্রটা খুলতে গিয়ে তিনি সেটাকে গুঁড়োগুঁড়ো করে ফেললেন। বহু পুরনো। তার ওপর মাটির সংস্পর্শে দীর্ঘদিন থাকায় তার ধাতুত্ব বলে কিছু ছিল না। ভেতরের পাত্রটা থেকে অদ্ভুত, কদাকার একটা বস্তু বেরিয়ে এল। পাত্রটার মধ্যে থেকে থেকে বস্তুটা অক্ষতই রয়ে গেছে। বেশ কিছু সংখ্যক পাতলা বস্তু গুটিয়ে রাখা হয়েছে। ছোট ছোট হরফের দ্বারা আঁকাজোঁকা করা রয়েছে পাত্রটার গায়ে। জারটগ ভাবলেন আজ বাজে আকিঙ্কি নম, কিছু একটা লেখা। এমন বিচিত্র ধরনের হরফ তিনি এর আগে দেখেন নি কোনোদিন।

আবিষ্কারের আনন্দে-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জারটগ বহুমূল্য বস্তুটাকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে হাজির হলেন। এক-দুই করে অনেকগুলো বছর অভিযান্ত্রিক হয়ে গেল। তার একনিষ্ঠ প্রয়াস ব্যর্থ হল না। অতীতের ভাষার সূত্র। সূত্রটো তিনি ধরতে সক্ষম হলেন। এবার দলিলটা পড়তে তাঁকে আর মোটেই বেগ বেতে হল না। সে রোমাঞ্চকর কাহিনীটাকে নিজের ভাষায় অনুবাদ করে ফেললেন।

কাহিনীটা হল—

চব্বিশে মে, দুই-সাল, যোজারিও—ঘটনাটা কীভাবে আরম্ভ করব ভেবে ঠিক করতে পারছি না। আসলে তো অনেক আগেই শুরু করেছে। এতদিন মাথায় এলোমেলাভাবে ছিল। এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি লিখে রাখব। কিন্তু কীভাবে লিখব ? তবে এক কাজ করা যাক, ডাইরি লেখার পদ্ধতি অনুসরণ করি। আর কোনো ভাষা ব্যবহার করব ? স্প্যানিস আর ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে পারি বটে। তবে মাতৃভাষা মানে ফরাসি ভাষাতেই কাহিনীটা লিখতে শ্রেয় জ্ঞান করছি।

আমি ফরাসি। অর্থোপার্জনের তাগিদে ম্যাক্সিকোতে এসে মাথা গুঁজেছি। আমি একটা রূপোর খনির স্বত্বাধিকারী, একমাত্র মালিক। অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছি। ঠিক করে রেখেছি, শেষ বয়সে অর্থের পাহাড় নিয়ে নিজের দেশের মাটিতে বসবাস করে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেব।

সমুদ্রের লাগোয়া রোজারিও জায়গাটার অবস্থান। আমার অপূর্ব সুন্দর বাড়িটা পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত। পাহাড়ের গা-বেয়ে সমুদ্রের কিনারা অবধি আমার আঙুর ক্ষেতটা নেমে গেছে। ওপর থেকে এক শ' গজ নিচের উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রকে দেখতে চমৎকার লাগে। পাহাড়ের দেড় হাজার ফুট ওপরের চূড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা। পুরোদমে মোটরগাড়ি চালিয়ে চূড়ায় যে কতবার উঠেছি তার ইয়ত্তা নেই। পর্যট্রিশ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন বসানো দামি মোটর গাড়ি। ফ্রেঞ্চ মোটরগাড়ি। এতে চড়ার মজাই আলাদা।

আমার পঁচিশ বছর বয়স্ক পুত্র জঁ, পালিতা কন্যা হেলেন আর পরিচারক পরিচারিকা নিয়ে বাড়িটাতে বাস করি। সাধ ছিল, যথা সময়ে হেলেনকে পুত্রবধূ করে নেব।

চব্বিশে জুন। সেদিন ইলেক্ট্রোজেনিক আলোর নিচে কয়েকজন মেক্সিকান ও কয়েকজন অ্যাংলো স্যাকসন—মোট পাঁচজন অভিযাত্রী অভ্যাগতকে নিয়ে বাগানে বসে গল্পগুজব করছিলেন।

ড. বামুন্ট অ্যাংলো স্যাক্সন আর ড. মোরেনো মেক্সিকান। উভয়ের মনে মিল যথেষ্ট থাকলেও মতের মিল মোটেই নেই। সেদিন দুই পক্ষিৎ ঘোরতর তর্কযুদ্ধে মেতেছিলেন। ড. বামুন্ট একজন মহাদার্শনিক ব্যক্তি। তিনি বললেন, ঈশ্বর আদম আর ইভকে সৃষ্টি করেছেন। ঐ দুজন থেকেই বাকি মানুষ সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গুর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের কথা শুনে ড. মোরেনো ঠাট্টা করতে ছাড়লেন না।

ড. বামুর্চ রেগেমেগে বলে উঠলেন, 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি যতই হোক না কেন, মহানশক্তিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। তবে আদম আর ইভ আজকের পৃথিবীকে দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেত। সাক্ষ্য মজলিশটা মাঠে মারা যাওয়ার আশঙ্কায় আমি প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করতে গিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা পাড়লাম। বিজ্ঞান যে এমন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে সৃষ্টির গোড়াতে মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। হয়তো একেই উন্নতির চরম শিখরে বুঝায়।'

সভাপতি মেনডোজা বলে উঠলেন, 'না, বক্তব্যটা সত্য নয়। ইতিপূর্বেও চরম উন্নতি হয়েছিল। তবে তা লোপ পেয়ে গেছে। ব্যাবিলন। ব্যাবিলনের সভ্যতার কথা বলতে চাইছি।'

উপস্থিত সবাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে উঠলেন, 'কী যে বলেন, বিশ শতকের সভ্যতার সঙ্গে ব্যাবিলনের সভ্যতার তুলনা? অসম্ভব—একেবারেই অবাস্তব।'

সভাপতি মশাই দমবার পাএ নন। তিনি তেমন দৃঢ়তার সঙ্গেই বললেন, 'মিশরিয়রাও কোনো অংশে কমতি ছিল না।' আমাদের হাস্যহাসিকের আলম না দিয়ে তিনি বলে চললেন, 'আটলান্টিয়ানদের কাহিনীকে কিন্তু রূপকথার কাহিনী বলে নস্যাত্ন করে দেওয়াটা সম্ভব নয়। আটলান্টিস সভ্যতা যেমন চরম শিখরে আরোহণ করে এক সময় তা আটলান্টিকের অতল গহ্বরে চলে যায়।' অন্য আর কোনো কোনো সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেও মাটির নিচে চাপা পড়ে গেছে কিনা কে তার হদিস রাখি? আমাদের অজানা বলেই কি তার অতীত কাহিনীকে অস্বীকার করতে হবে?'

ড. বামুর্চ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'হতেই পারে না মশাই। সাম্প্রতিককালের সভ্যতার কথাই যদি ধরা যায় তবে বলব, সমগ্র পৃথিবীটা জলের নিচের চলে গেলেও কোনোদিনই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না। সভ্যতার কোনো না কোনো নজির থেকেই যাবে। অতীতে এরকম সভ্যতার অস্তিত্ব থাকলে, কোনো না কোনো নিদর্শন অবশ্যই থাকত।'

সভাপতি মেনডোজা ভাববেন, কিন্তু মচকাবেন না। গলা চড়িয়ে এবার জবাব দিলেন, 'কেউ কি বলতে পারে যে সমগ্র পৃথিবীটাই অকস্মাৎ জলে তলিয়ে যাবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো অসম্ভবও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।'

আমরা এক সঙ্গে চিল্লিয়ে ওঠলাম, 'খ্যৎ! বাজে কথা!—বাজে কথা!'

আমাদের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই জমি তির তির করে কাঁপতে লাগল। বাড়িটা অবধি কেঁপে কেঁপে উঠল। ব্যস, আমরা কিছু বুঝতে না বুঝতেই চোখের পলকে বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। সভাপতি মেনডোজা এবং আমার ভৃত্য জার্মেন পাথরও লোহালক্করের ভিতর চাপা পড়ে গেল।

ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতেই ভয়ঙ্কর সে দৃশ্যটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সমুদ্র বাগানে চলে এসেছে। এ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য রে বাবা! হতভম্ব হয়ে গেলাম। প্রবল বিক্রমে ফুঁসতে ফুঁসতে সমুদ্র ক্রমেই এগোচ্ছে।

ব্যাপার কি? সমুদ্র কি সত্যি সত্যিই উঠে আসছে? মুহূর্তে আমার ভুল ভেঙে গেল। সমুদ্র তো ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। তবে? আসলে বাগানটাই দ্রুত জলের তলায় চলে যাচ্ছে। কী যে সর্বনাশ ঘটতে চলেছে বুঝতে বাকি রইল না। সমুদ্র ওপরে উঠছে না, ভূভাগ জলের ভিতর নেমে যাচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে ছয় ফুট বা ঘণ্টায় ছয় মাইল করে জল এগোচ্ছে। মাত্র তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের ওপর জলরাশি আছাড় খেয়ে পড়বে।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে চিল্লিয়ে উঠলাম, 'গাড়ি! শীঘ্র গাড়ি বের কর।'

চোখের পলকে গাড়ি বের করা হল। ব্যস্ত-হাতে পেট্রোল পুরে ফেললাম। উদ্ধার বেগে গাড়ি ছুটে চলল। ভূতর র্যালো গেটা খুলে দিয়েই সে এক লাফে স্থিৎ ধরে বুলে পড়ল।

এবার শুরু হল জল আর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। জল আমাদের ধরার জন্য তৎপর, আর আমরা তৎপরতার সঙ্গে জলের এলাকা ছাড়িয়ে যেতে। গাড়িটা এত দ্রুত ছুটছে তবু মনে হচ্ছে ওটা বুথি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আসলে সমুদ্রের গতিবেগ যে তার সমান। দামি গাড়ি না হলে এতগুলো লোক নিয়ে ওপরে ওঠা সহজ হত না। হঠাৎ গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পুরো একটা ঘণ্টা একনাগাড়ে ছোট কী যে সে ব্যাপার? মুহূর্তের মধ্যে গাড়ির ঠিক পিছনে জল চলে এল। পর মুহূর্তেই অর্ধেকটা চাকা জলের তলায় চলে গেল। ভাবলাম, ব্যস—খতম। আচমকা গাড়িটা ঝপৎ করে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভূতের বৌ আয়নের—চোঁচামেচি শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। র্যালো পেছন থেকে ঝপৎ করে জলে পড়ে গেছে। আচমকা ওজন হ্রাস পাওয়ায় গাড়িটা তিড়িং করে লাফিয়ে আবার ছুটতে শুরু করেছে। সিমোনাট অভিজ্ঞ চালক। এভাবে আরো ঘণ্টাখানেক ছুটতে পারলে পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া যাবে। হঠাৎ সজোরে একটা ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিমোনাট তর্জনি তুলে দেখার, দশ গজ মতো সামনে রাস্তার চিহ্নও নেই। ছুরি চালিয়ে আলতো করে যেন সামনের জমি কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে। আবার পিছন দিক থেকে জল কিন্তু সমান তালে ধেয়ে আসছেই।

না, জল আর উঠছে না। তবে আর জ্যস্ত সলিল সমাধিও হচ্ছে না। সামনের দিকে খাদ, আর পিছনে জল। উভয়ের মাঝখানে পড়ে রয়েছে আমরা জনা কয়েক প্রাণী। বুঝতে পারলাম, ভূভাগ নিচে নামতে নামতে কোথাও ধাক্কা খেয়ে থমকে গেছে। তাই সমুদ্র স্থির হয়ে গেছে। ঘাসের ওপর শুয়ে অপেক্ষা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, বুঝতেই পারি নি। বরাতে যে কি আছে ইস্ট দেবতাই জানেন।

বিবর্ত আওয়াজ কানে যেতেই ঘুম চটে গেল। রাস্তা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে জলোচ্ছ্বাসের শব্দ কানে এল। ছিটকে আসা জলে সর্বশরীর ভিজিয়ে জবজবে করে দিচ্ছে। তারপর ক্রমে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশ নির্মম্ব হয়ে উঠল। পূর্ব-আকাশে রক্তিম ছোপ ফুটে উঠল।

পঁচিশে জুনের ভোর। আলোর ছোপ ফুটে উঠতেই বুঝতে পারলাম আমরা একটা দ্বীপে বন্দী হয়ে পড়েছি। দ্বীপটার দৈর্ঘ্য দেড় হাজার গজ আর প্রস্থ পঁচিশ গজ। এক সময় উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং দক্ষিণ দিকে পাহাড় ছাড়া কিছুই নজরে পড়ত না। আর এখন দেখা যাচ্ছে কেবল জল আর জল। গতকালও পূর্বদিকে পাহাড়ের দিকে মেক্সিকোকে দেখতে পেয়েছিলাম, এখন তা একেবারে ধুয়ে-মুছে গেছে। এখন কেবল শুধু জলের বিচিত্র সমাবেশ।

ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর হয়ে পড়েছিলাম। এখন হতাশা-মন প্রাণ জুড়ে বসেছে। আবার তেষ্টার জল নেই। বাঁচার পথ রুদ্ধ। তবে পিতৃদত্ত প্রাণটা যাবেই!

চৌঠা জুলাই-এ ভার্জিনিয়ার ডেকে দাঁড়িয়ে। প্রায় এক মাস আগে ভার্জিনিয়া জাহাজটা মেলবোর্ণ থেকে নোঙর তুলেছিল। চব্বিশে মে কেবলমাত্র আকাশ ছোঁয়া ডেউ আর ঝড়ের তাগুব কাণ্ডেন দেখতে পেলেন। বাস, এটুকুই। ঠিক সে মুহূর্তে পৃথিবী জুড়ে কী যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল তিনি তিলমাত্রও অনুমান করতে পারেন নি। জাহাজ মেক্সিকোর কাছাকাছি পৌছোলে দেখতে পেলেন জলের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে। এ জলের যেন শেষ নেই, নেই তল বলে কিছু।

এগিয়ে যেতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ছোট্ট দ্বীপটার ওপর এলিয়ে পড়ে রয়েছে এগারোটা নিস্তর-নিখর দেহ। ক্ষিদে আর তেষ্টায় কাতর হয়ে দুজনের দেহাবসান ঘটে। আর বাকি নয় জন ধুকছে, মরো মরো অবস্থা। এ দশটা দিন যে আমাদের কি করে কেটেছে একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। একমাত্র পরমায়া ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। ভার্জিনিয়া জাহাজের কাণ্ডেন আমাদের তুলে নেন।

আট-আটটা মাস জলে ভেসে চলেছি। বার-তারিখ সময়ের হিসাব ভুলে গেছি। জানুয়ারি, নাকি ফেব্রুয়ারি তার হিসেব জেনেই বা ফায়দা কি? আমাদের জাহাজে তুলে নিয়ে কাণ্ডেন মেক্সিকোর খোঁজে জাহাজ চালাচ্ছিলেন। কিন্তু হায়! একনাগাড়ে দীর্ঘদিন জাহাজ চালিয়েও ডাঙা নজরে পড়ল না। জল ছাড়া কিছু নজরে এল না। তবু জাহাজ এগিয়েই চলেছে। চৌদ্দই জুন কয়লা ফুরিয়ে যাওয়ায় পাল তোলা ছাড়া গতান্তর রইল না। খাবারের ভাড়াতে টান পড়েছে। নামমাত্র খাবারে দিন কাটাতে হচ্ছে।

তুমুল ঝড় উঠলো। জাহাজ এবার তুমুল ঝড়ের মোকাবেলা করতে লাগল।

দীর্ঘ দিন একনাগাড়ে ঝড়ের তাগুব চলল আমাদের ওপরে।

উনিশে আগস্ট। আকাশ পরিষ্কার হল। রোদ দেখা দেওয়ামাত্র কাণ্ডেন কম্পাস হাতে নিয়ে বসে গেলেন। দ্রাঘিমা নির্ণয় করার পর ফ্যাকাসে মুখে যে—কথা উচ্চরণ করলেন তা শুনেই আমাদের চোখ হানাবড়া হয়ে গেল। এক সময় যেখানে পিকিং শহর ছিল জাহাজ এখন সেখানেই অবস্থান করছে।

ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হয়ে গেল, এশিয়ার হাল আমেরিকার মতোই হয়ে গেছে। দু-দুটো মহাদেশই অতল জলে তলিয়ে গেছে। আরো দক্ষিণে জাহাজ এগোতেই হাতে নাতে প্রমাণ পেলাম, হিমালয়, তিব্বত ও ভারত সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আমরা এগিয়েই চলেছি। কোনো প্রত্যাশা যে বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি তার ঠিক নেই। একের পর এক মহাদেশের সলিল সমাধি দেখেও এখন আর বিস্মিত হচ্ছি না। উরাল পর্বতমালার চিহ্নও নেই, আফ্রিকা মহাদেশও অতলে তলিয়ে গেছে। একের পর এক অভাবনীয় দৃশ্য দেখে এখন আর মোটেই অবাক হই না। আসলে এখন চোখ ও মন সব কিছুকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিক কণ্ঠই ক্রমে ক্রমে বলতে লাগলাম—এখানে মস্কো—ওয়ারশ—বার্লিন—ভিয়েনা—রোম—ট্রিয়ার—সেন্টুলুই—মাদ্রিদ—এখানেই তো ছিল! সমগ্র ইউরোপ মহাদেশটা অতল জলে তলিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি? তারপর আমার মাতৃভূমি প্যারিসও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

এবার চারদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলতে গিয়ে চারদিন বাদে লক্ষ্য করলাম এডিনবরা—লন্ডন—সবই অনন্ত জলরাশি গ্রাস করেছে।

বাস, জাহাজে খাবার আর নেই। এমন কি বিকুটও ফুরিয়ে গেছে। এবার থেকে পেটে কিল মেরে দিন কাটানো শুরু করলাম। ক্ষিদেয় জ্বালা যে কী মর্মান্তিক তা এই প্রথম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম। জাহাজের সবাই গা ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিনটা হয়তো আটই জানুয়ারি ছিল। হঠাৎ ডাঙার মতো ঝাপসা কিছু একটা দেখতে পেলাম।

আচমকা কক্কর আর্তনাদ শুনে আধমরা মানুষগুলো যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে লাফিয়ে ডেকের ধারে গিয়ে চমকে উঠলাম। একী অদ্ভুত দৃশ্য! আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে তো ডাঙার চিহ্নও কোনোদিন ছিল না। তবে স্থলভূমি এল কোথেকে!

হ্যাঁ, স্থলভূমিই বটে। তবে কোনো প্রাণীর অস্তিত্বও নজরে পড়ল না। কালো পাথরের ন্যাড়া পাহাড়। গাছগাছালি তো দূরের ব্যাপার সামান্য ঘাস বা শ্যাওলা পর্যন্ত নেই। জাহাজ ভিড়ল। আমরা ঝট করে নেমে গেলাম। স্বাদু জলের স্নান কোথাও পেলাম না। কেবলই লোনা জল। জমির শুকনো কাঁদা-মাটি দেখে নিঃসন্দেহ হলাম, এক সময় স্থলভূমিটা আটলান্টিকের অতলে ছিল। পাথরের খানা-গহবরে কচ্ছপ, শামুক, কঁকড়া আর মাছ প্রভৃতি সামুদ্রিক প্রাণী প্রচুর সংখ্যকই নজরে পড়ল। এটুকুই ভরসা, উপোষ করে অন্তত মরতে হচ্ছে না।

একনাগাড়ে আট-আটটা মাস জলে ভাসার পর জাহাজ ডাঙার খোঁজ পেয়েছে। নোঙর করতে পারল। আমরা মাত্র কয়জন নতুন করে বাঁচার লড়াই শুরু করলাম। স্বল্প পরিসর ডাঙায় শেষপর্যন্ত টিকে থাকা সম্ভব কিনা, কিছুই জানা নেই। তবু উত্তরসূরীদের জন্য আমার যা কিছু কথা লিখে রাখছি। আর এও জানি না, কোনোদিন তারা এটা পাবে কিনা।

ধাতুর পায়ে দিনের পর দিন থাকার পর পাণ্ডুলিপিটার-এর পরের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। তবে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ যা উদ্ধার করা গেছে তো মোটামুটি এরকম—ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। জনমানবহীন মুহুর্তকে কয়দিন পড়ে রয়েছে, জানা নেই।

ড. মোরেনো কপালের চামড়ায় ভাঁজ এঁকে বললেন, ‘এখানে আমরা অন্তত ছয় মাস তো কাটিয়েছি। ছয়টা মাস কেবল পেটের জোগাড়ের ধাক্কা কাটাতে হয়েছে। জাহাজের পাল নামিয়ে এনে তাঁবু খাটিয়ে নিয়েছি। প্রচুর মাছ থাকলেও ধরার সমস্যা। ফলে কচ্ছপের ডিম আর সামুদ্রিক গাছাছালির ওপরই বেশি করে নির্ভর করতে হল।’

তবে কখন কখনও বন্দুক দিয়ে দু-চারটে পাখিও শিকার করা যায়।

বরাতের জোর আছে বলতে হবে। জাহাজের খোলে পান্ডা লাগিয়ে এক বস্তা গম পাওয়া গেল। অনেকেই ইচ্ছা ছিল, সব গমই পেয়াই করে রুটি তৈরি করে খেয়ে নেবে। আমরা কয়জন বেগড়া দিলাম। অর্ধেক বস্তা গম ছিটিয়ে চাষ করলাম। আর বাকি অর্ধেক দিয়ে পেটের জ্বালা নেভলাম। গোড়ার দিকে জমি খুবই লবণাক্ত ছিল সত্য। কিন্তু দিনের পর দিন বৃষ্টির জল লবণ অনেকাংশে ধুয়ে নিয়ে গেছে। ফলে গমের ফলন খারাপ হবার কথা নয়। আবার বৃষ্টির জলে জমে জমে স্বাদু জলের অভাব মিটেছে। বছর পেরিয়ে গেল। গম ভালোই ফলছে। পাখিরাও খাবার পেয়ে সংখ্যা বাড়তে লাগল। দুটো খরগোসও একদিন চোখে পড়ল।

আগেই বলেছি, আমাদের কয়জন সহযাত্রী মারা গেছে। তবে আমরা সংখ্যা কিছু কমি নি, বেড়ে গেছে। কীভাবে, তাই না? আমার ছেলে আর হেলেন—এর ছেলে-মেয়ে মিলেই তো তিনজন বেড়ে গেছে। আমরা ছাড়া আরো তিনটে পরিবারের ছেলে-মেয়ের সংখ্যা একই রকম।

এক-দুই করে দশ-দশটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু নতুন মহাদেশটা আদৌ চোখে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আমাদের মধ্যে অভিযানের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। কাণ্ডেনও এবার এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী হয়ে পড়লেন। জাহাজ মোরামত করা হল। এবার বেরিয়ে পড়লাম নতুন মহাদেশটা দেখার অত্যাশ্র আগ্রহ নিয়ে।

ভেবেছিলাম ভেতরের দিকে এগিয়ে গেলে অবশ্যই আগ্নেয়গিরি চোখে পড়বে। কিন্তু হতাশ হতে হল। মাড়িয়া ও অ্যাজোরস কোনো এক সময়ে কম সমস্যার করণ ছিল না। অগ্নি উদ্গিরন করে আটলান্টিক মহাসাগরকে একেবারে তছনছ করে ছাড়ত। সাগরের জল উঠে আসার ফলে তাদের দেখতে পাব আশা ছিল। আশা পূরণ হল না। লাভার স্তর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। আগ্নেয়গিরি নিশ্চিহ্ন। আগ্নেয়শিলা ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্ব নেই। এক নজরে দেখলেই মালুম হয় এক সময় আগ্নেয়গিরির উৎপাত খুবই ছিল।

বাস্তবিকই এখানেই চরমতম বিশ্বয়ের মুখোমুখি হয়েছিলাম। অত্যাশ্র্য অবিশ্বাস্য এক আবিষ্কার সম্ভব হল। ইয়া মোটা মোটা পিলার, থালা-বাটি আর কিছু পাথরের মূর্তি ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারলাম না। এখানে তবে অতীত সভ্যতা লোপ পেয়েছে। আমাদের আমলের সভ্যতার চেয়ে অনেক, অনেক প্রাচীন এ সভ্যতা। লস্ট আটলান্টিস। বহু প্রাচীন সভ্যতা। ড. মোরেনোর অনুমান অভ্রান্ত। সুদূর অতীতের মহাদেশ আটলান্টিস বাস্তবিকই অত্যাশ্র্য সভ্যতা হিসাবে গড়ে উঠেছিল আর তার পরবর্তীকালে সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আজ তাই আবার চাপের ফলে সাগরের তলদেশ থেকে ওপরে উঠে এসেছে। একই স্থানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সভ্যতার সৃষ্টি, ভাবলে অবাক হতেই হয়।

আটলান্টিস সভ্যতা সম্বন্ধে যেসব কাহিনী শোনা তবে তা অবশ্যই রূপকথার গল্পের মতো কাল্পনিক কাহিনী নয়। অ্যাজোরস-এর অগ্নি উদ্গিরন ফলে আজ আবার তা জলের নিচ থেকে ওপরে উঠে এসেছে।

অতীতের কথা ভেবে ওধু সময় নষ্ট করার ইচ্ছা নেই, উচিতও নেই। এমন একটা চিন্তাই আমাদের সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে—বাঁচার চিন্তা। বোধ করি পাখিরা ফল খেয়ে বীজ এনে দ্বীপে ফেলেছে, তা থেকে দ্বীপটা ক্রমেই সবুজ হয়ে উঠছে। বৃষ্টির জল জমে জমে মিষ্টি জলের জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে। দ্বীপের পরিবর্তনটা খুবই দ্রুত তালে হয়ে চলেছে। কেবলমাত্র পশু-পাখিই নয়, মাছের মধ্যেও পরিবর্তনের জোয়ার বইছে। আজ বহু উড্ডুকু মাছ ডাঙায় উঠে আসছে। তাদের কি মাছই বলবে? না, তার চেয়ে বরং প্রাণী বললেই যথার্থ আখ্যা দেওয়া হবে।

আমরা যারা দ্বীপের প্রথম মানুষ বলে গণ্য হই, তারা সবাই আজ বুড়োর খাতায় নাম লিখিয়েছি। আজই কাণ্ডেন মরিস দেহত্যাগ করলেন। আমরাও দিন গুণে চলছি। আমার বয়স এখন আটষষ্ঠি। ড. বামুর্স্টের পয়ষষ্ঠি, ড. মোরেনোর ষাট বছর চলছে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে জরুরি কিছু কাজ সেরে যেতে চাই। যেকোন উপায়েই হোক আমাদের তা করতেই হবে।

কিন্তু এসব লিখে ফায়দা কি হবে? কার জন্য লিখব? কে পড়বে? উত্তরসূরীরা?

হায় ঈশ্বর! এরকম দৃশ্যও চোখের সামনে দেখতে হবে, স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলে-মেয়ে মিলে একেবারে গিসগিস করছে। মুক্ত বায়ু। স্বাস্থ্যকর স্থান। হিংস্রপ্রাণীর উৎপাত নেই। অতএব জরা ছাড়া রোগ ব্যাধিতেও মৃত্যু নাই। ফলে দ্বীপের জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলল।

আমরা জনা কয়েকই শিক্ষিত মানুষ। মানে আমি ও আমার ছেলে, ড. মোরেনো আর ড. বামুর্স্ট। আমরা যারা বিদ্যা

ও বুদ্ধিমত্তাকে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছি তাদের মধ্যে কাণ্ডেন মরিস তো আগেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। পেটের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা আমাদের নেই। সভ্য-শিক্ষিত মনুষ্য শ্রেণীর মধ্যে আমরা কয়েকজন টিকে আছি। কিন্তু আমরাও যে ক্রমে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুর স্বভাব লাভ করছি। পশু থেকে মানুষের উদ্ভব। এখন ঠিক উল্টোটা ঘটতে চলেছে। মানুষ থেকে পশুত্ব লাভ করছি। আসলে মানসিক চর্চা আমাদের ঘুচে গেছে। নাবিকদের কথা তো একেবারেই আলাদা। তারা চিরদিনই রুম্ফ, রুস্ট ও পাশবিক প্রকৃতির। তাদেরই বা বলি কি, আমাদেরই মস্তিষ্কের অপমৃত্যু ঘটছে ধীরে ধীরে—সজীব আছে কেবলমাত্র উদর। ড. বামুন্ট ও মোরেনো মস্তিষ্ককে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছেন।

তবুও ভালো যে, বেশ কয়েক বছর আগে মাহদেশ ঘুরে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এখন সে মনের জোর অন্তর্হিত, খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাদের জাহাজ ভার্জিনিয়াও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

আমাদের সঙ্গে যেসব পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল অনেক আগেই সেসব ছিড়ে গেছে। তারপর থেকে সামুদ্রিক শ্যাওলা জুড়ে জুড়ে লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা করছি। এখন তাও বাদ দিয়ে দিয়েছি, মন চায় না। নির্বিকারচিত্তে একেবারে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াই। অসভ্য-জঙ্গলি-বর্বররা যা করে।

আজ আমাদের একমাত্র কাজ খাওয়া। জীবনের লক্ষ্যও একটাই—উদরকে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করা। তবে দু-এক জনের মধ্যে স্নেহ-ভালোবাসা এখনো ছিটেফোঁটা রয়েছে। জন আমার ছেলে এখন নাতি-নাতনি নিয়ে সুখেই আছে। আমাকে সে এখনো বাবার সম্মান দেয়। আর সম্মান খাতির করে সিমোনাট, আমার প্রিয় পুরনো ড্রাইভার।

মেন্দা কথা, আমাদের মধ্য থেকে ক্রমেই মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হচ্ছে। এখনই যদি এই হয় তবে তো উত্তরসূরীরা পুরোপুরি পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করবে। শিশুদের তো দেখছিই, জঙ্গলিদের মতো বেড়ে উঠছে। লেখাপড়া তো জানেই না। ভালোভাবে শুছিয়ে কথা বলতেও অক্ষম। আসলে খাওয়া ছাড়া কিছু জানে না, বোঝে না। পশুত্ব প্রাপ্তির ঠিক পূর্বাবস্থা যাকে বলে। চিন্তাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বলে কিছু থাকবে না। কেউ-ই জানতে পারবে না তাদের পূর্বসূরীরা পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কতই না ভোজবাজির খেল দেখিয়েছে। তাদের গা ভর্তি লোম গজাবে, ইয়া লম্বা লম্বা লোম। কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। মস্তিষ্ক হ্রাস পাবে। জঙ্গলে জঙ্গলে খাবারে খোঁজে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। আমরা, বুড়েরা? আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এ লিপি রেখে যাওয়ার। আমাদের কথা তাদের কাছে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করব। আমাদের মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার আগেই মানবজাতির ইতিকথা, অগ্রগতির ইতিকথা আর বিজ্ঞানের ভয়যাত্রার ইতিকথা লিপিবদ্ধ করে ফেলব। তাই তো এ কাজে প্রয়াসী হয়েছি। জাহাজ ছেড়ে আসার সময় অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সঙ্গে কাগজ, কলম আর কালিও নিয়ে এসেছিলাম। সেগুলোর সাহায্যেই এই—পাণ্ডুলিপিটা লেখা সম্ভব হয়েছে।

ইতিমধ্যে দীর্ঘ পনেরটা বছর পেরিয়ে গেছে। ড. মোরেনো ইহলোক ছেড়ে গেছেন। ড. বামুন্টও আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমি একা, একদম একা মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছি। হাত-পা নিস্তেজ হতে চলেছে। সময় আর বেশি নেই। তবু যে কয়দিন আছি—

জাহাজ ছেড়ে আসার সাঁয় একটা লোহার সিন্দুক নিয়ে এসেছিলাম। মাটি গর্ত করে লুকিয়ে রেখেছিলাম। মানুষের যাবতীয় লব্ধ জ্ঞান সবকিছু লিপিবদ্ধ করে তার মধ্যে গচ্ছিত রেখেছি। একটা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রের মধ্যে এ পাণ্ডুলিপিটা পুরে সিন্দুকটার পাশেই মাটির তলায় রেখে দেব। বিদায়! মনুষ্যজাতি বিদায়! বিদায়!

বাড়ির ভিত খোঁড়ার সময় জারটগ মিস্ত্রিদের দিয়ে মাটি গুলটপালট করালেন। না, বাঞ্ছিত সে সিন্দুকটার হদিশ কিছুতেই পাওয়া গেল না। হয়তো দীর্ঘদিন মাটি চাপা পড়ে থাকায় মরচে পড়ে লোহা ক্ষয় হতে হতে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। মনুষ্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিকথা—অমূল্য সম্পদও ধ্বংস হয়ে গেছে।

তবে? পাণ্ডুলিপির পাত্রটা? অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি বলে পাত্রটা নষ্ট হতে পারে নি। জারটগ গালে হাত দিয়ে বসে ভাবতে লাগলেন, বহু বহু বছর আগে ঘরা এসব থাম, পাকাবাড়ি আর পাখরের মূর্তি তৈরি করেছিলে তারা অবশ্যই সভ্য মানুষ ছিল। তাদের পরিচয় তো পাণ্ডুলিপিটাতেই লেখা রয়েছে। আটলান্টিয়ান। সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যাওয়া মহাদেশ আটলান্টিসের মানুষ, সভ্য মানুষ তারা।

বর্তমানে সেখানেই জারটগদের পত্নী গড়ে উঠেছে। একদিন এখানেই অতল জলে তলিয়ে যাওয়া সভ্যতার অবশিষ্ট মানুষগুলো জাহাজ থেকে নেমেছিলেন। আজ ‘হেদম’ নামের রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হল। ‘এদেম’ হচ্ছে ‘হেদমের’ উৎস। আর ‘এদেমের’ উৎস ‘আদম’। অর্থাৎ আদম থেকে এদেম এসেছে।

অতল জলে তলিয়ে যাওয়া প্রথম মানব—আদম। আবার এমনটাও তো হতে পারে ঠিক তার পূর্ববর্তী অতল জলে তলিয়ে সভ্যতা থেকে ‘আদম’ নামটা এসেছে। হয়তো সে সভ্যতার প্রথম মানুষের নাম ছিল ‘উদম’। তার আগেও যে কোনো সভ্যতা জলের তলায় তলিয়ে যায় নি তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ডোবা-ভাসা, সৃষ্টি-ধ্বংসের খেলার চক্রের পড়ে কি তবে একদিন জারটগদের ‘চার সমুদ্রের দেশ’ ও একদিন জলের নিচে চলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? সে সঙ্গে একটা ইতিহাসও জলের তলায় তলিয়ে যাবে? পাণ্ডুলিপির লেখকদের সভ্যতা যদি জলের তলায় চলে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে তবে জারটগরাই বা কেন হবে না?

ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তখন তুমুল গৃহযুদ্ধ চলছে। ঠিক তখনই মেরিল্যান্ডের অন্তর্গত বাল্টিমোর শহরের বৃকে একটা নতুন ধরনের গান-ক্লাব গজিয়ে উঠল। আমেরিকানরা কোনোক্রমে একবার যুদ্ধের খবর পেলে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। যুদ্ধ সম্বন্ধে যন্ত্রবিদ থেকে শুরু করে কারবারী ও জাহাজ-ব্যবসায়ী পর্যন্ত সবাই সমান উৎসাহী। দু-হাতে অর্থ ব্যয় করে গোলা-বারুদের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে সে-মুল্লুকেন সবারই সমান উৎসাহ।

আমেরিকানরা একটা ব্যাপারে ইউরোপিয়ানদের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কামান, বন্দুক তৈরির শিল্পে তারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। তবে কামান-বন্দুক ছোঁড়ার ব্যাপারে ইংরেজ, ফরাসি আর প্রশিয়ানদের নতুন করে আর কিছুই প্রশিক্ষণ নেবার দরকার ছিল না। তবে হ্যাঁ, তাদের তৈরি কামান, মর্টার ও হাউটজার আমেরিকানদের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে নিতান্তই খেলনা-পিস্তলের সামিল।

তবে হ্যাঁ, এতে বিশ্বশান্তিভূত হবার কোনোই কারণ নেই। কারণ, আমেরিকানরা যে পৃথিবীর সেরা কারিগর এ তো আর অস্বীকার করা যাবে না। তারা জন্মসূত্রেই যন্ত্রবিদ। তাই তারা নিজেদের কারিগরী-প্রতিভাকে কামান তৈরির কাজে নিয়োগ করবে এতে তো অবাক হবার কিছুই নেই।

কোনোক্রমে কোনো আমেরিকানের মাথায় নতুন কোনো পরিকল্পনা দেখা দিলে, আর কোনোক্রমে তিনজন আমেরিকান এ-ব্যাপারে একমত হতে পারলেই একটা ক্লাব গজিয়ে উঠবে। তাদের একজন হবেন প্রেসিডেন্ট ও অন্য দুজন সেক্রেটারি বনে যাবেন। বাল্টিমোরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হল না। এক মাসের মধ্যেই ক্লাবের সদস্য সংখ্যা হয়ে গেল আঠারো শ' তেত্রিশজন। আর ত্রিশ হাজার পাঁচ শ' পর্য্যন্ত জন ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে লাগল।

কামানের নক্সা আবিষ্কারের ক্ষমতা থাকলে তবেই ক্লাবের সদস্য হওয়া যাবে—এ একটাই শর্ত। তবে অন্য কোনো যন্ত্রাংশ আবিষ্কারের ক্ষমতা থাকলেও সুযোগ পাবে। কিন্তু পিস্তলের মতো ছোট ও মামুলি অস্ত্রশস্ত্র এ হিসাবে আসবে না।

তেসরা অক্টোবর সন্ধ্যায় আমেরিকার নামকরা সেই গান-ক্লাবের বিশালায়তন হলঘরে কয়েকজন জড়ো হল। সবাই কোনো না কোনোদিন 'থেকে অঙ্গহীন। হাত-পা-চোখ প্রভৃতি সবকটা অঙ্গই বর্তমান, এমন কেউই সভাকক্ষে উপস্থিত নেই।

গান-ক্লাবের সদস্যদের একটাই কাজ, বন্দুক, কামান আর গোলাবারুদ তৈরি করা। তাই তো সংস্থাটার 'গান-ক্লাব' নামকরণ হয়েছে। সবাই এক-একজন ঘাঘু গোলন্দাজ। এজন্যই তো তাদের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। গান-ক্লাবের প্রতিটা সদস্যের একটামাত্রই চিন্তা—কীভাবে দূরপাল্লার, উন্নত মানের কামান তৈরি করে সবকিছু হারখার করে দেওয়া যায়, আর হাজার হাজার মানুষকে পরপাড়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এরকম নিত্যনতুন ধ্বংসাত্মক চিন্তা মাঝে-মধ্যেই তাদের মাথায় আসত। আর তার বাস্তব রূপদান করতে পারলেই তারা যেন বর্তে যেত, জীবন ধন্য জ্ঞান করত।

হায়! গান-ক্লাবের সদস্যদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার যোগাড় হল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব টুকরো টুকরো লড়াই চলছিল সেগুলো হঠাৎ এক এক করে খেমে গেল। এ কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! গান-ক্লাবের সদস্যদের বরাতে এ কী দুঃসময় নেমে এল! আমেরিকার মানুষ লড়াই করে, রক্ত ঝরিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তো দেশের মানুষের মুখে আজ একই কথা, 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।' অদ্ভুত ব্যাপার তো! সত্যসত্যই একদিন সবরকম শক্তি পরীক্ষা খেমে গিয়ে দেশে শান্তি নেমে এল। এতে গান-ক্লাবের সদস্যদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। এবার থেকে আর শোন! গেল না, তারা নতুন কোনো অস্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছে। ক্লাবের সদস্যদের আনাগোনাও দিন দিন কমতে লাগল। দরকারই বা কী?

হাটীর চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বরাত খুবই মন্দ দেখছি! একদিন কামানের গর্জন শুনে আমরা শয্যাভ্যাগ করতাম। আর আজ কী দুঃসহ পরিস্থিতির মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে!'

'হ্যাঁ, অতীতের সেসব দিন আজ আমাদের কাছে নিছকই ৭৫ বলে মনে হচ্ছে। কামান তৈরি, আর পাল্লার পরীক্ষা প্রভৃতি কতই না আমাদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করত! কোনো কামান যদি কোনোদিন বেশি সংখ্যক মানুষকে যমের দুয়ারে পাঠাতে পারত তবে সেদিন আমাদের উল্লাস আর দেখে কে। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিলসবি বলে উঠলেন, 'হায়! সেদিন কি আর আমাদের বরাতে ফিরে আসবে! না, কোনোদিনই আসবে না।'

ম্যাসটনের একটা হাত ইম্পাত দিয়ে তৈরি। তিনি তাঁদের বক্তব্য শুনে, সেটা খুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'ভবিষ্যতে কোনোদিন যে আবার যুদ্ধ বাঁধবে, সেসবকম কোনো লক্ষণই তো আমার নজরে পড়ছে না। যে কয়দিন অলস ভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম, তখন অদ্ভুত একেবারে নতুন একটা কামানের নক্সা আমি তৈরি করেছি। ওজন, আকৃতি প্রভৃতি সবই একদম তৈরি। কোনো লড়াই-এ এটাকে ব্যবহার করা গেলে তবে যুদ্ধের প্রকৃতিই একদম বদলে যেত।'

ম্যাসটনের বক্তব্য শুনে শুনে হাটীর অতীত স্মৃতি মন্থন করতে লাগলেন। ম্যাসটনের একটামাত্র আবিষ্কৃত কামান ব্যবহার করে পরীক্ষার দিনই তিন শ' সাঁইত্রিশ জনকে পরলোকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ম্যাসটন বললেন, 'এত কষ্ট, সময় ও ধৈর্যের বিনিময়ে নতুন আবিষ্কার করছি বা ফায়দা কি? নয়া-পৃথিবী যে শান্তির চিন্তায় ডুবে রয়েছে। কিন্তু ট্রিবিউন পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়েছে, জনসংখ্যা যদি এ-হারে বাড়তেই থাকে তবে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। ফলে অচিরেই ভয়ঙ্কর এক সমস্যার উদ্ভব হবে।'

কর্ণেল ব্রুমসবি এবার মুখ খুললেন, 'চলুন সাহেব, আমরা আমেরিকার মাটি ছেড়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে যাই। সেখানে তাদের উচ্চাঙ্গ দিলে কোনোক্রমে চটিয়ে দিতে পারলেই কাজ হাসিল। ব্যস, যুদ্ধে মেতে উঠবে।'

বিলসবি প্রায় ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'কী সব আবোল তাবোল বকছেন সাহেব! আমেরিকান হয়ে কি না বিদেশীদের জন্য কামান বানাব!'

'ক্ষেপছেন কেন সাহেব! হাত-পা গুটিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে দিন কাটানোর চেয়ে তো এটা ঢের ভালো। যেটুকু জানতাম অলস হয়ে দিন কাটাতে গিয়ে তাও আজ ভুলে যাচ্ছি।'

'বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিন। আর ইউরোপে তো অবশ্যই নয়। ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যে হৃদযাত্রার সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে উঠবার নয়। তারা বিশ্বাস করে, আগে কিছুদিন পতাকাবহন না করে সেনাপতি হওয়া সম্ভব নয়।'

একটু বেশ রাগত স্বরেই হান্টার বললেন, 'হাসালেন সাহেব! তবে তো আর কথাই নেই। চলুন, তামাকের চাষে কোমরবেঁধে লেগে পড়ি, নয়তো তিমি শিকার করে চর্বি জ্বাল দেওয়ার কাজ শুরু করি।'

'আরে ক্ষেপছেন কেন সাহেব! আপনার কি বিশ্বাস, এদেশের মানুষ চিরটা কাল শান্তির বুলিই আওড়াবে? ধ্যৎ! কয়টা দিন অপেক্ষার করুন না। যুদ্ধের দামামা বাজল বলে। আর কিছু না-ই বা হল। ফরাসিরা কি ভুল করে হলেও আমাদের দুটো জাহাজ ভুবিয় দেবে না? ইংল্যান্ড কি দু-চারটে খুনি আমেরিকানের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেবে না? কেবলমাত্র অছিলা দরকার। ব্যস, তুমুল যুদ্ধ দু-দেশ এবার মাতল বলে।'

ব্রুমসবি বলে উঠলেন, 'আসলে আমেরিকানদের চেতনাশক্তি লোপ পেয়ে গেছে। একটু-আধটু চৈতন্য টেঁটন্য থাকলে কবেই তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যেত।'

ম্যাসটন এবার বললেন, 'ভালো কথা, আমেরিকা কি এক সময় ইংরেজদের দখলে ছিল?'

'হ্যাঁ, তা-তো ছিলই।'

'তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইংল্যান্ডেই বা আমাদের আধিপত্য বিস্তার করতে বাধা কোথায়।'

রাগে গস গস করতে করতে বিলসবি বলে উঠলেন, 'জানেন সাহেব, প্রেসিডেন্টের কানে কথাটা একবার তুলেই দেখুন গে। বুঝবেন, ঠাণ্ডা কাকে বলে।'

শেষমেশ গান-ক্লাবের সদস্যরা রেগে গিয়ে সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলেন, আমেরিকার তদানিন্তন প্রেসিডেন্টকে আর ভোট দেবেন না।

একজন বললেন, 'আমার সাফ কথা শুনে রাখুন সাহেব, আমার নতুন মর্টার যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দেখাবার সুযোগ না-ই পাই, তবে কিন্তু আমি সব ছেড়ে দিয়ে চাষের কাজে লেগে যাব।'

সবাই তাঁরই পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরিস্থিতি এমন হয়ে গেল যে, গান-ক্লাব উঠে যাওয়ারই জোগাড় হল। কিন্তু হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটায় ক্লাবটা উঠতে গিয়েও কোনোদিকের খেমে গেল।

ক্লাবের সদস্যরা যখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশাব্যঞ্জক আলোচনায় মগ্ন ঠিক তখনই তাঁদের হাতে একটা বিজ্ঞপ্তি এল। তাতে স্থান ও তারিখের জায়গায় লেখা রয়েছে— বাল্টিমোর, তেসরা অক্টোবর।

বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য—সবার অবগতির জন্য গান-ক্লাবের সভাপতি লিখছেন যে, "আগামী পাঁচই অক্টোবর রাতি আটটায় তিনি ক্লাবের সদস্যদের অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য্য একটা খবর শোনাবেন। আশা করা যাচ্ছে যে, সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাবের প্রত্যেক সদস্য যেন অন্যান্য কাজকর্ম ফেলে সভাকক্ষে উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেককে আবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, সেদিনের উপরোক্ত সভাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।" বিজ্ঞপ্তিটার শেষে স্বাক্ষর রয়েছে—ইম্পে বার্বিকেন। প্রেসিডেন্ট গান-ক্লাব।

দেখতে দেখতে পাঁচই অক্টোবর এসে গেল। সভাকক্ষ লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। গান-ক্লাবের ত্রিশ হাজারেরও বেশি সদস্য। তাই সুবিশাল সভাকক্ষেও সবার স্থান সঙ্কুলাপ না হওয়ায় অধিকাংশ সদস্যই বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সংস্থার সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন প্রতিটা কাজ ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে করেন। যাকে বলে ক্রনোমিটারের কাঁটার মতো কাজ করা। ঘড়িতে তখনো আটটা বাজতে দেড় মিনিট বাকি। সভাপতি বার্বিকেন মঞ্চে উঠে এলেন। ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজামাত্র তিনি দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুরু করলেন, 'আমার বীর সহকর্মীগণ, আজ গান—ক্লাবের সব নামজাদা সদস্যরা যে অসহনীয় কর্মহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তা সত্যি বড়ই দুঃসহ, পীড়াদায়ক। কে-ই বা জানবে বলুন, অকস্মাত সব লড়াই থেমে গিয়ে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে? আবার তা যে এতদিন স্থায়ীভাবে লাভ করবে এও যে ভাবাই যায় না। নতুন লড়াইয়ের খবরের জন্য আমরা প্রতিটা মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছি। ব্যর্থ হয়েছি। হয়েছি হতাশায় জর্জরিত। আর নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, লড়াই বাঁধার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই বলে আমরা নাকে ভেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটাতে? কামান-বন্দুক আর গোলা-গুলির কোনো উন্নতিই কি আর হওয়ার দরকার নেই? আপনারাই বিচার করে বলুন, লড়াই যদি আর না-ই বাঁধল তবে কি আমরা অলসভাবে শুয়ে-বসে কাটিয়ে প্রমাণ করব যে, আমরা উনিশ শতকের অযোগ্য-অকর্মণ্য মানুষ? পৃথিবী জুড়ে যে গান-ক্লাবের প্রচার ও সম্মান-খ্যাতির, তারা তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কোনোভাবেই প্রয়াসী হতে পারবে না?'

সদস্যদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হল, 'গান-ক্লাব নতুনতর কিছু করতে আগ্রহী।'

বার্বিকেন বলে চললেন, 'বন্ধুগণ, আমাদের এমন কিছু করতে হবে যা কেবলমাত্র আমাদের সংস্থারই নয়, সমগ্র আমেরিকার মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের এমন কোনো কাজ করতে হবে যা শুনে বিশ্ববাসীরা বিশেষ হতবাক হয়ে পড়বে। কি সে কাজ, তাই না? পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদকে তো আপনারা সবাই দেখেছেন। যদি না-ও দেখে থাকেন তবে চাঁদের কথা অন্তত শুনেছেন, ঠিক কিনা? আমাদের এবারের অভিযান হবে সেই চাঁদের মুঠুকেই। চন্দ্রলোক

আবিষ্কারের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কলকাস বনে যেতে অগ্রহী। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছত্রিশটি রাজ্য আছে। আমি নিঃসন্দেহ, যে চাঁদ মল্লুকটা আমাদের অধিকারে আসবেই আসবে।’

উপস্থিত সদস্যরা সমবেত কণ্ঠে সভাপতিকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন।

বার্বিকেন পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে ফের বলতে লাগলেন, ‘বন্ধুগণ, চাঁদ মল্লুকটাকে নিয়ে যে বহু কল্পনার জাল বোনা হচ্ছে তা-তো আর আপনাদের অজানা নয়। তার প্রকৃত আকৃতি, গুণ, ঘনত্ব আর গতিবেগ প্রভৃতি সবই আমরা জানি। সৌরমণ্ডলে চাঁদের ভূমিকা কি আমরা যে তা জানি না তাও নয়। চাঁদে পাড়ি জমানোর কাজটা বাস্তবিকই দুষ্কর। এ-দুষ্কর কাজে কেউ-ই আজ অবধি সাহসে ভর করে নামতে পারে নি। তাই তো চাঁদ আজও অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। আর রয়ে গেছে কল্পনার ব্যাপার হয়ে।

কল্পকথার মাধ্যমে যারা আমাদের এ-উপগ্রহটার রহস্য উন্মোচন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাদের মধ্যে সতের শতকের ডেভিড ফ্রেসিয়াস-এর নাম করতেই হয়। তিনি অহমিকা প্রকাশ করে প্রচার করেছেন, চাঁদের অধিবাসীদের নাকি চাক্ষুষ করেছেন।

জাঁ বোদোই নামধারী এক ফরাসি তেরো শো ঊনপঞ্চাশে’ ডোমিনগো গোনজালেজের পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রে অভিযান’ নাম দিয়ে একটা গল্প ছেপেছেন। ডোমিনগো নাকি স্পেনের একজন দুঃসাহসী নওজোয়ান।

সমসাময়িক কালেই ‘জার্নিস ইন দ্য মুন’ নামে সিয়ালে ডি বারজাক একটা গল্প লিখলেন। এরই অব্যবহতিকাল পরে ফনটেনেলি নামে আর এক ফরাসি চাঁদ মল্লুকটাকে নিয়ে কৌতূহল সঞ্চাকারী আর একটা গল্প ফাঁদলেন।

‘নিউইয়র্ক আমেরিকান’ পত্রিকায় আঠারো শ’ পর্য্যগ্রিশে একটা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। উত্তমাশা অন্তরীপে গিয়ে স্যার জন হার্সচ্যাল এক অভিনব দূরবীক্ষণ ব্যবহার করে চাঁদকে নাকি মাত্র আটগজের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন, অতিকায় গুহার মধ্যে দলবর্ধে হিপোপটেমাসরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঠে ময়দানে চরে বেড়াচ্ছে ইয়া লম্বা শিংওয়ালা ভেড়ার দল, শ্বেত হরিণ ছুটোছুটি করছে। আর চাঁদের যথাসর্বস্বের মালিক বাদুড়ের মতো ডানাওয়ালা জীবদেরও তিনি নাকি দেখতে পেয়েছেন।

আপনাদের কাছে আরো একটা কাহিনীর অবতারণা করছি—হ্যাস ফাল নামে রোটারডাম-এর এক অধিবাসী বেপুনে চেপে শূন্যে উড়েছিলেন। নাইট্রোজেন থেকে নিষ্কাশন করা, হাইড্রোজেন থেকে সাঁইগ্রিশণ্ড হাক্সা এক বিশেষ ধরনের গ্যাস তিনি এতে ব্যবহার করেছিলেন। তাই তো মাত্র ঊনত্রিশ ঘণ্টায় বেপুন্টা চাঁদে হাজির হয়ে গিয়েছিল। বিচিত্র এ-কাহিনীটা নিছকই কল্পনাপ্রসূত সন্দেহ নেই। আর এর লেখক আমেরিকার এডগার এ্যালান পো।’

মুহূর্তের জন্য নীরবে একটু দম নিয়ে বার্বিকেন পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে আবার বলতে লাগলেন, ‘এতক্ষণ কাগজ-কলমে পরীক্ষার ব্যাপার-স্যাপার বললাম। এবার বাস্তবের ব্যাপার কিছু বলছি। কয়েক বছর আগে জার্মানির এক জ্যামিতিবিদ সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ পতিত অঞ্চল থেকে এক বৈজ্ঞানিক অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে এমন এক অদ্ভুত কৌশলে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কণ করা হবে যার ওপর আলো প্রতিফলিত হলে তা আরো অতাজ্জ্বল হয়ে উঠবে। চাঁদে যদি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব থেকেই থাকে তবে অনুরূপ নক্সার মাধ্যমে তারা এর জবাব দেবে। এ-পদ্ধতিতে জ্যামিতিক চিত্রের মাধ্যমে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে মনের ভাবের আদান-প্রদান করা সম্ভব হবে। তবে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেয় নি। আর আজ অবধি চাঁদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। আমরা, আমেরিকানরা আমাদের বাস্তব জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে এতদিনের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে অগ্রহী। এটাই আমার বক্তব্যের সারমর্ম। আপনারা কেউ কেউ হয়তো ভেবে থাকতে পারেন অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাদের সামনে কথার ফুলঝুরি ছোটাছি। আসলে কিন্তু অভিযানটা খুবই সহজ হয়ে উঠবে। একটা কথা, গত কয়েক বছরের মধ্যে কামানের পাল্লার কতখানি উন্নতি হয়েছে, কামান থেকে নিষ্ক্ষিপ্ত গোলা কতটা উঁচু অবধি ছুটে যেতে সক্ষম আশা করি আপনাদের কারোরই আজ আর অজানা নয়। এসব দিক বিচার-বিবেচনা করে আমাদের কামান থেকে একটা গোলাকে চাঁদের বুকে যদি ফেলা সম্ভবই হয় আপত্তির কি থাকতে পারে? এতে দু-দিক থেকে ফায়দা হবে। যেমন আমাদের কামানের পাল্লাটা যাচাই করে নেওয়া যাবে আর চাঁদে অধিকার বিস্তারও হয়ে উঠবে অধিকতর সহজ, ঠিক কিনা?’

বার্বিকেনের প্রস্তাব শুনে সদস্যরা সোচ্চারে তাঁকে বহুভাবে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, ‘আমি হিসাবনিকাশ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি—সেকেন্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগে সম্পূর্ণ কোনো গোলাকে যদি চাঁদকে লক্ষ্য করে নিষ্ক্ষেপ করা যায় তবে তা চাঁদের বুকে পৌঁছাবেই পৌঁছাবে। তাই এ-ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য একটু চিন্তা ভাবনা করতে আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি।’

সভাপতি বার্বিকেনের বক্তব্য শেষ হতে না হতেই উপস্থিত সদস্যরা করতালি ও জয়ধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে বারবার অভিনন্দন জানাতে লাগল। সে যেন রীতিমতো এক হলুখুল কাণ্ড। সভাপতি বার্বিকেনের ইচ্ছা ছিল আরো কিছু বক্তব্য রাখেন। কিন্তু সদস্যদের আনন্দ-উল্লাস এমন চরমে উঠল যে, তিনি বার বার হাত তুলে থামতে অনুরোধ করলেন, ঘণ্টাধ্বনি করলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ তাঁকে কাধে তুলে নাচতে নাচতে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমেরিকানরা বাড়িরর ছেড়ে হৈ ছল্লোড় করতে করতে পথে নেমে এল। ইতিমধ্যে আকাশের গায়ে রূপালি চাঁদ আবির্ভূত হয়ে গেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবাই অপলক চোখে তাকে দেখতে লাগল। চাঁদ দেখবার আতস কাঁচ বিক্রি করেই একজন চশমার দোকানি দু-হাতে অর্থোপার্জন করে ধনী বনে গেল।

মাঝ রাত্রিতেও মানুষের আনন্দ-স্বুতিতে এতটুকুও ভাঁটা পড়ল না।

আমেরিকার দৈনিক পত্রিকাগুলো ফলাও করে চাঁদে গোলা পাঠাবার পরিকল্পনার কথা ছাপল। বার্বিকেনের চমক সৃষ্টিকারী অভিনব প্রস্তাবটা নিয়ে বিভিন্ন মহলের মানুষের মধ্যে আলোচনা ও হরেক্ষ রকম জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

সবার মুখেই এক কথা, “বার্বিকেন যা বলেছেন তা মোটেই অসম্ভব নয়। আমেরিকানদের কাছে অসম্ভব বলে কোনো কাজই নেই। আর এখানেই তো ইউরোপের সঙ্গে আমেরিকার পার্থক্য।”

রাত্রি দুটোর কাছাকাছি জনতার উল্লাস স্তিমিত হল। ক্লাস্ত-পরিশ্রান্ত দেহে বার্বিকেন বাড়ি ফিরলেন। তার পরের দিন টেলিগ্রাফের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ শ' সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে খবরটা ছাপা হল। এবার দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, দ্বি-মাসিক এবং ত্রি-মাসিক প্রভৃতি সর্বকম কাগজের পাতাতেই বার্বিকেনের প্রস্তাব শিরোনামায় স্থান পেল। ফলও পাওয়া গেল হাতে নাতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গান-ক্লাবে অভিনন্দনসহ আর্থিক এবং অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতার প্রস্তাব আসতে লাগল।

বাস, ইম্পে বার্বিকেন এবার যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে খ্যাতনামা ও সম্মানীয় ব্যক্তি বনে গেলেন।

আমেরিকানরা যখন নানা জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে অভিনব সব পরিকল্পনা আট্টেছে, তখন বার্বিকেন বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি বসে আর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চাঁদে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটাকে সহজতর করতে প্রয়াসী হতে লাগলেন।

তিনি সবার আগে গান-ক্লাবের বোর্ডরুমে সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, গোড়োতেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের মতামত নিতে হবে। তারপর ভাবলেন, যান্ত্রিক সমস্যার ব্যাপার স্যাপার নিয়ে।

যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে প্রাচীন মানমন্দির রয়েছে ম্যাসাচুসেটসের। কয়েকটা প্রশ্ন সম্বলিত একটা চিঠি তিনি কেমব্রিজ মানমন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। দু-দিন পরেই চিঠির উত্তর এসে গেল। চিঠিটা মোটামুটি এরকম—

‘কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তা গান-ক্লাবের সভাপতিকে লিখছেন।

কেমব্রিজ, সাতই অক্টোবর

আপনি ছয়টা প্রশ্ন রেখেছেন। যেমন—

১. চাঁদে কি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব?
২. পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান কত?
৩. গোলাটা কতদিনে চাঁদে পৌছতে পারবে? কামান দাগতে হবে কখন?
৪. চাঁদ কখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে যাতে গোলাটার পক্ষে সহজেই সেখানে পৌছানো সম্ভব হবে?
৫. আকাশের কোনদিকে তাক করে গোলাটাকে ছুঁড়তে হবে?
৬. গোলাটা যাত্রা করার মুহূর্তে চাঁদ কোনো অবস্থায় অবস্থান করবে?

১ প্রশ্ন। চাঁদে কি গোলা নিক্ষেপ করা সম্ভব?

উত্তর: হ্যাঁ, সম্ভব।

কোনো কামানের গোলা যদি প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তবে তা অনায়াসে চাঁদে পৌছে যাবে। তখন কামানের গোলাটা মহাকর্ষকে অতি সহজেই নস্যাত করে দিতে পারবে। অভিকর্ষ বল তার পর কোনো প্রভাবই ফেলতে সক্ষম হবে না। আর তাকে আবার আকর্ষণ করে পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনতে পারবে না। ধ্যেয়ে যেতে যেতে গোলাটা এমন এক জায়গায় গিয়ে হাজির হবে যেখানে গোলাটার ওপর পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের আকর্ষণ অনেক, অনেক বেশি হবে। সে জন্য গোলায় গতি যাবে বেড়ে। তখন আরো তীব্র বেগে চাঁদের দিকে ছুটে যাবে। সর্বদা সেকেন্ডে বারো হাজার গজ ছুটতে পারলে তার চাঁদে যেতে ঘণ্টা কয়েকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। কিন্তু তা যে হবার নয়। বায়ুর বাধা এবং মহাকর্ষের পিছন টান তো কার্যকরী হবেই। তাতে গোলাটার গতি ক্রমে কমতেই থাকবে। দীর্ঘ সময় ধরে অন্ধ কষে, হিসাব নিকাশ করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করলেন, পৃথিবীর টান যেখানে শেষ হয়েছে, চাঁদের একমাত্র আকর্ষণেই গোলাটা তিরিশি ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে সেখানে যেতে পারবে। সেখান থেকে আরো তেরো ঘণ্টা তিগ্লান্ন মিনিট কুড়ি সেকেন্ড লাগবে চাঁদের বুকে হাজির হতে। তবে হিসাব মতো, যখন চাঁদের বুকে গোলাটাকে ফেলার ইচ্ছা তার চেয়ে সাত ঘণ্টা তেরো মিনিট কুড়ি সেকেন্ড আগে কামান দাগা দরকার।

২ প্রশ্ন। হচ্চে—পৃথিবীর ও চাঁদের মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান কত?

উত্তর: আপনাদের তো জানাই আছে যে, চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে চক্রর মারছে। কিন্তু বৃত্তাকার পথে ঘুরছে না। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চাঁদ পৃথিবী থেকে বেশ কিছুটা দূরে চলে যায়। তখন চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব হয় দুলাক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পাঁচ শ' বাহান্ন মাইল। ফের কাছে চলে আসার সময় উভয়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে দুলাক্ষ আঠারো হাজার দু-শ' সাতান্ন মাইল। তাই তো কামান দাগতে হবে চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে চলে আসে।

৩ প্রশ্ন। গোলাটা কতদিনে চাঁদে পৌছতে পারবে? কামান দাগতে হবে কখন?

উত্তর: প্রথম প্রশ্নের উত্তরের শেষ কয়েকটা ছত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

৪ প্রশ্ন। চাঁদ কখন খুব কাছাকাছি অবস্থান করবে যাতে গোলাটার পক্ষে সহজেই সেখানে পৌছানো সম্ভব?

উত্তর: পৃথিবী ও চাঁদ প্রত্যেক মাসে একবার করে পরস্পরের খুবই কাছাকাছি চলে আসে। কিন্তু প্রত্যেক মাসে জেনিথ অতিক্রম করে না। একটা রেখা যদি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে টানা হয় তবে সেটা মাথার ওপরের আকাশকে যেখানে স্পর্শ করবে তাকেই জেনিথ বলে। বহু বছর বাদে বাদে চাঁদ এভাবে একবার করে পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। আগামী মাসে চৌঠা ডিসেম্বর বহু বছর বাদে চাঁদ এ-অবস্থানে আসবে।

৫ এবং ৬ প্রশ্ন। আকাশের কোনোদিকে তাক করে গোলাটাকে ছুঁতে হবে ? গোলাটা যাত্রা করার মুহূর্তে চাঁদ কোনো অবস্থায় অবস্থান করবে ?

উত্তর : পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তর দেখুন। তারপর গুনুন—এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার আগেই ডিসেম্বরের এক তারিখে রাাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট ছেচল্লিশ সেকেন্ডে চাঁদকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে হবে। তখন নাকি পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ব্যবধান আরো অনেকাংশে হ্রাস পেয়ে যাবে। সে-সময়টার সম্ভাবহার করতে না পারলে পরবর্তী আঠারো বছর এগারো দিন অবশ্যই নিশ্চেষ্ট হয়ে অপেক্ষায় থাকতে হবে। কোথা কামানের গোলা ছুঁতে হবে, তাই না ? উত্তর এবং দক্ষিণ অক্ষরেখার শূন্য ডিগ্রি ও আঠাশ ডিগ্রির মধ্যবর্তী কোনো অংশ থেকে গোলা ছুঁতে হবে। অন্য কোনো জায়গা থেকে কামান দাগা হলে গোলাটা ক্রমে বঁকে গিয়ে চাঁদ থেকে দূরে সরে যাবে। দূরে, বহু দূরে সরে যাবে। বিজ্ঞানীদের মতে চাঁদ প্রতিদিন তেরো ডিগ্রি দশ মিনিট পঁয়ত্রিশ সেকেন্ডে পথ অতিক্রম করে। চাঁদ যখন সু-বিন্দু থেকে চৌষাট্টি ডিগ্রি দূরবর্তীস্থানে অবস্থান করবে ঠিক তখনই চাঁদকে তাক করে গোলাটা ছুঁতে দিতে হবে।

ভক্তজ্ঞা গ্রহণ করবেন।

ইতি—

জে. এম. বেলফাস্ট ; অধিকর্তা,
কেমব্রিজ মানমন্দির।

বার্বিকেনের ঘোষণার পর থেকে চাঁদকে নিয়ে চারদিকে কতই না জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হল। সমগ্র আমেরিকার মানুষ যেন চাঁদ-চাঁদ করে মেতে উঠেছে।

বিজ্ঞান-পত্রিকার পাতায় কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তার চিঠিটা ছেপে দেওয়া হল। তাঁর বক্তব্যকে সবাই নির্বিশেষে মেনে নিল। চারদিকে বাহবা-বাহবা শুরু হয়ে গেল।

জানা গেল, পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দূরত্ব দুলক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশ' সাতচল্লিশ মাইল তো হবেই, তবে সমুদ্র মাইল কম-বেশি হওয়াও অসম্ভব নয়। পৃথিবীর দিকে চাঁদের একটা দিক অবস্থান করে। মনে হয় সেখানে চৌদ্দটা চাঁদের দ্যুতি বুঝি পুঞ্জীভূত হয়েছে। নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত চাঁদের অন্য প্রান্তটা,—সেদিকটা কোনোদিনই মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব হয় নি।

চাঁদ অধিবৃত্তাকারে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করার ফলে সেটা একবার পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। ক্রমে আবার দূরে চলে যায়। কারো কারো মতে কোনো এক সময় চাঁদ নাকি ধূমকেতু ছিল। সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করামাত্র, পৃথিবীর নিকটবর্তী হয়ে যাওয়া মাত্র পৃথিবীর টানে আটকা পড়ে গেছে। তাই তো চাঁদের গায়ে কালো কালো দাগ নজরে পড়ে।

অন্য আর একদল বেজ্ঞানিক তাঁদের বক্তব্যকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করেন। ধূমকেতুতে বায়ুমণ্ডল অস্থান করে। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব নেই। যদি থাকেও তবে তা ধর্তবোর মধ্যে নয়।

আবার কেউ কেউ মন্তব্য করলেন—খলিফাদের আমলে নাকি প্রচার হয়েছিল, চাঁদের গতিবেগ ক্রমে অল্প অল্প করে হ্রাস পাচ্ছে। যদি তা-ই হয়ে থাকে তবে চাঁদ একদিন না একদিন গতিবেগ শূন্য হয়ে ধপাস করে পৃথিবীতে পড়ে যাবে। অন্য দল উপহাসের মাধ্যমে এ মতবাদকে নস্যাত করে দিলেন।

আবার কুসংস্কারে বিশ্বাসীরা বলেছে, চাঁদ নাকি প্রত্যেক পৃথিবীবাসীর প্রাণশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে। প্রত্যেক পৃথিবীবাসী ও প্রত্যেকটা চাঁদের মানুষ নাকি সম্প্রীতির ভাৱে আবদ্ধ। মানুষের অদৃষ্ট এ-গুণ্ডরহস্যের ওপরই নির্ভরশীল।

কেমব্রিজ মানমন্দিরের চিঠির বক্তব্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বক্তব্যে ভরপুর। তখন অবধি যান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের উপায় বের হয় নি।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন সময় নষ্ট করতে নারাজ। একটা কার্যকরী কমিটি গঠন করে কামান, কামানের গোলা নির্মাণ ও ব্যুরদ তৈরির কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পণ করলেন।

বার্বিকেন, মেজর এলফিনস্টোন, জেনারেল মরগ্যান আর জে. সি. ম্যাসটনকে নিয়ে কমিটিটা গঠিত হল। ম্যাসটনকে কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হল।

কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, লোহার ঢালাই গোলা ব্যবহার করা যাবে না। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে গোলা তৈরি করা হলে ওজন হাল্কা হবে। গোলাটার ব্যাস রাখতে হবে এক শ' আশি ইঞ্চি। এর চেয়ে ছোট করা হলে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও সেটা ধরা দেবে না। আর গোলার ভেতরটা হবে ফাঁপা। নয় ফুট ব্যাস যুক্ত গোলাটার ওজন হবে উনিশ হাজার দু-শ' পঞ্চাশ পাউন্ড। অ্যালুমিনিয়ামের বদলে লোহার গোলা হলে তার ওজন হবে সাতষাট হাজার চার শ' চল্লিশ পাউন্ড। সেজন্যই অ্যালুমিনিয়ামের গোলা তৈরির ব্যাপারে সবাই সম্মতি প্রদান করলেন। অল্প কয়েক, দেখা গেল গোলাটা নির্মাণ করতে প্রায় তিয়াত্তর হাজার পঞ্চাশ ডলার ব্যয় হবে। আর গোলাটার অ্যালুমিনিয়ামের চাদরটা বারো ইঞ্চি পুরু থাকবে। অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহারের সুবিধা অনেক—লোহার সমান মজবুত, ঝপ্পোর মতো ঝকঝকে সাদা, সোনার মতো ক্ষয়হীন, কাঁচের মতো হাল্কা আর পিতলের মতোই দ্রাব্য। প্রেসিডেন্ট আরো যুক্তি দেখালেন, লোহার তিন ভাগের এক ভাগ হাল্কা আর ছাঁচের সাহায্যে ঢালাইয়ের সুবিধাও যথেষ্ট।

গান-ক্লাবের বাইরের মানুষ গুনল, চাঁদের উদ্দেশ্যে কুড়ি হাজার পাউন্ড গোলা নিক্ষেপ করা হবে। এরকম কথা শুনে সবাই তো মুগ্ধ যাবার জোগাড় হল। আরে বাস! সে মাপের একটা কামান তৈরি সম্ভব হবে তো ?

এবার কামান তৈরির ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কমিটির সভা বসল। গোলার ওজন, আয়তন সবই যখন নির্ধারণ করা হয়ে গেছে তখন নয় ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বিশালায়তন গোলাটা নিক্ষেপ করার ক্ষমতা সম্পন্ন কামানটার আকৃতি

কেমন হবে এটাই এবারের আলোচ্য বিষয়। আর কীভাবে গোলাটার গতিবেগ সেকেন্ডে বারো হাজার গজ করা যাবে তাও আলোচনার স্থান পেল।

গোলা নিক্ষেপ করার সময় তার ওপর তিনটে শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ, প্রক্ষেপণের ধাক্কা আর বাতাসের প্রদত্ত চাপ। বিষয়গুলোকে এরকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যাক—গোলা ছোড়ার পর শূন্যে চলতে গিয়ে বায়ু আর মহাকর্ষ থেকে বাধা পায়। তবুও বারুদের প্রদত্ত শক্তি সব বাধাকে নস্যাত্ন করে দিয়ে গোলাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে চল্লিশ মাইল ওপরে উঠে গেলে সেখানে বায়ুস্তর অনুপস্থিত। তাই তো গোলাটা সেকেন্ডে বারো হাজার গজ অতিক্রম করতে করতে অল্প কিছু সময়েই বায়ুস্তর অতিক্রম করে ফেলবে। এবার মহাকর্ষের নিয়ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তলিয়ে দেখা যাক। কোনো বস্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে উঠতে থাকবে তার ওজনও ততই হ্রাস পেতে থাকবে। আর সেটা হবে দূরত্বের বর্গের বিপরীত অনুপাতে। অতএব গোলাটার গতিবেগ সেরকমভাবে বৃদ্ধি পেলেই মাধ্যাকর্ষণকে সহজেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। এর জন্য কামানের চোঙ ও বারুদের শক্তির দিকটা বিচার বিবেচনা করা নিতান্তই দরকার। কারণ, এদের ওপরই গতিবেগ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অতএব কামানের চোঙটাকে নয় শ' ফুট দৈর্ঘ্য ও নয় ফুট ব্যাস বিশিষ্ট করে তৈরি করতে হবে। আর তার জন্য ব্যবহার করা হবে ঢালাই লোহা। এটাকে সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী ঢালাই করা যাবে এবং দামও ব্রোঞ্জের চেয়ে এক দশমাংশ কম।

ঢালাই লোহা ভঙ্গুর হলেও এর সেক্রেটারি ম্যাসটন কামানটার ওজনের ব্যাপারে হিসাব-নিকাশ করতে বসলেন। বীজগণিতের সূত্র ধরে তিনি সহজেই হিসাব করে ফেললেন। এবার তিনি মুখ খুললেন, 'কামানটার ওজন বলছি শুনুন—আটঘণ্টা হাজার চল্লিশ টন হবে সেটার ওজন। আর দাম ? প্রতি পাউন্ডের জন্য দু-সেন্ট হিসাবে মোটা দাম হবে, পঁচিশ লক্ষ দশ হাজার সাত শ' এক ডলার। অর্থাৎ অষ্টটা শুনে উপস্থিত সবাই আঁধারে উঠলে বার্বিকেন মুচকি হেসে বললেন, 'অর্থাৎ জন্য ভাবতে হবে না। সময়মত অর্থ ঠিকই এসে যাবে। এবার সভা ভঙ্গ করা হল।'

এখন বাকি রইল বারুদের সমস্যার সমাধান করা। জনসাধারণ সবাইরই একই চিন্তা, এমন পেল্লাই একটা কামানে কী বিপুল পরিমাণ বারুদ প্রয়োজন।

বারুদের ব্যাপারটা ফয়সালা করার জন্য আবার সভা বসল। আলোচনার শুরুতেই হিসাব-নিকাশ করে বার্বিকেন বললেন, 'এর জন্য ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদ প্রয়োজন।' কথাটা শোনামাত্র সবার তো চমক স্থির। কারণ, ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদের জন্য লাগবে বাইশ হাজার ঘনফুট জায়গা। তছাড়াও চাই গোলাটা রাখার জায়গা আর বারুদ জ্বলে যে গ্যাস সৃষ্টি হবে তার জন্যও জায়গা চাই। এরকম গাদাগাদি অবস্থা হলে গোলাটা কি করে ছুটবে, মাথায় আসছে না।

'অবশ্যই। ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদ পুড়লে গ্যাস তৈরি হবে যাট কোটি লিটার। গাছপাছালির কোষ থাকে, এ-কথা তো আর আপনাদের অজানা নয়। তবে তুলোয় থাকে সবচেয়ে বিপুল কোষ উপাদান। তুলোকে ঠাণ্ডা নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু সময় ধরে ভিজিয়ে রেখে তারপর তাকে শুকিয়ে নিলে যে বিস্ফোরক তৈরি হয় তা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী বিস্ফোরক। বারুদ জ্বলতে থাকাকালীন তার তাপমাত্রা থাকে দু-শ' চল্লিশ ডিগ্রী। কিন্তু মাত্র এক শ' সত্তর ডিগ্রি উষ্ণতায় বিস্ফোরক তুলো জ্বলবে। ওই তুলোর মধ্যে সাধারণ বারুদের চারগুণ শক্তি লুকিয়ে থাকবে।'

এখন হিসেবে দেখা যাচ্ছে: ষোলো লক্ষ পাউন্ড বারুদের পরিবর্তে মাত্র চার লক্ষ পাউন্ড তুলোকে খুব চেপে চেপে রাখতে পারলেই মাত্র সাতাশ ঘনফুট পাঁচশ পাউন্ড বারুদ রেখে দেওয়া সম্ভব। অতএব মোট তুলোর জন্য আমাদের চাই এক শ' আশি ঘনফুট জায়গা। তবে নয় শ' ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কামানে যে পরিমাণ গ্যাস প্রয়োজন তার অভাব মোটেই হবে না। অতএব যাট কোটি লিটার গ্যাসের জন্য সাত শ' ঘনফুট জায়গা পাওয়া যাবে। আর একটা কথা, তুলো দিয়ে তৈরি করে নেওয়া বিস্ফোরকটা কিন্তু অনেক গুণে গুণাবিত। 'ফালমিনেটিং' কটন এর নাম। এ-বারুদ অর্ন্ততর সম্পর্কে মিথিয়ে যায় না বলে দীর্ঘ দিন কামানে ঠেসে রাখলেও এর গুণ অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

যাবতীয় সমস্যা মিটে গেলে সভা ভঙ্গ করা হল।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের অত্যাকর্ষ অভিযানের প্রকৃতিপর্ব নিয়ে সমগ্র আমেরিকা যখন তোলপাড় হচ্ছে ঠিক তখনই ঘটল ঘটনাটা। ব্যাপারটা হল—বার্বিকেন সারা দুনিয়ার কেবলমাত্র একজনের সমালোচনার জন্য ভাবিত। তছাড়া আর কে কি বলল আর না বলল মোটেই তিনি তার ধার ধারেন না। এ লোকটার সঙ্গে বার্বিকেনের চিরদিনই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। তবে তিনি তাঁরই মতো আত্মবিশ্বাসী, নির্ভিক, দুঢ়চেতা এবং কঠোর পরিশ্রমী। সে ব্যক্তিটি হচ্ছেন, ক্যান্টেন নিকল। বার্বিকেনকে নিয়ে যখন সমগ্র আমেরিকা তোলপাড় হচ্ছে তখন ক্যান্টেন নিকল ফিলাডেলফিয়ায় অবস্থান করছেন। লোক মুখে আর খবরের কাগজে বার্বিকেনের প্রশস্তি শুনে তার কলিজায় জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেল।

ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যান্টেন নিকল পরস্পরের পরিচিত তো নন-ই, এমন কি কেউ কাউকে দেখেন নি পর্যন্ত। তবুও বার্বিকেন কোনো ব্যাপারে ব্যর্থ হলে নিকল এর বুকটা আনন্দে নেচে ওঠে। বার্বিকেন যদি কোনো অত্যাধুনিক ও অতি শক্তিশালী কামান তৈরি করে ফেলেন তবে ক্যান্টেন নিকল আদাজল থেকে লেগে যান তার চেয়েও দুই কোনো বর্ম তৈরির কাজে। সেটা তৈরি করে তবে তাঁর স্বস্তি। অর্থাৎ বার্বিকেনের পরিকল্পনাকে যেন-তেন প্রকারেণে ভেঙে দেওয়াই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তবে এর ফলে কামান আর বর্ম উভয়েরই পর্বত প্রমাণ উন্নতি হয়েছিল। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা সম্ভব না হলেও নির্দিষ্ট বলা চলে তাঁরা পরস্পরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দী।

যেদিন দুম করে যুদ্ধ থেমে গেল ঠিক সেদিনই ক্যান্টেন নিকল চমৎকার একটা বর্ম তৈরির কাজ শেষ করেছিলেন। ইম্পাতের সে-পাতটা ফুটো করা বার্বিকেনের হিম্মতে কুলোতো না।

যুদ্ধ থেমে গেলে বার্বিকেন যখন নয় শ' ফুট কামান তৈরির জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন তখন সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালেও, একজন—ক্যান্টেন নিকল কেবল মুখ ঘুরিয়ে অপমান ও ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলেন। তিনি

হত্যাশায় এমন ভেঙে পড়লেন, যে হঠাৎ করে কর্তব্য স্থির করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। শেষমেশ মনকে দৃঢ় করে জবতে লাগলেন, অমিত শক্তিশালী একটা বর্ম তৈরি করে তাঁর পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়ন করে দেওয়া সম্ভব কিনা? ব্যস, তবেই তাঁর চন্দ্রলোকে যাত্রার শখ মিটিয়ে দেওয়া যাবে। শেষপর্যন্ত তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, আমৃত্যু গবেষণায় লিপ্ত থেকেও তাঁর গোলার গতিরোধ করা মোটেই সম্ভব নয়।

শেষপর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি অন্ধ কণ্ঠে প্রচার করলেন, বার্বিকেনের উদ্ভট পরিকল্পনাটা পাগলের খোঁয়াব মাত্র। ব্যস, তাঁর বক্তব্য শুনে বার্বিকেন তাঁর পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে আদাজল খেয়ে লেগে গেলেন। বার্বিকেনের উৎসাহে যখন এতেও তাঁটা পড়ল না তখন গভর্নমেন্টকে জানালেন, বার্বিকেন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে চলেছেন। কামান দাগার পর কোনোক্রমে নলটা ফেটে গেলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটীর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেখানে কামানটা ফাটবে সে-বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার চন্দ্রভিযানের অজুহাতে তিনি দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার দুরভিসন্ধি নিয়ে এমন অতিকায় একটা কামান তৈরি করছেন।

ক্যাপ্টেন নিকলকে গভর্নমেন্ট কিছু ভিলমাত্রও পাত্তা দিলেন না। ব্যাপারটা চেপে যাওয়ায় অর্থ দাঁড়াল বার্বিকেনকেই সমর্থন করছে। কোনো ওষুধেই যখন ধরল না তখন অনন্যোপায় হয়ে ক্যাপ্টেন নিকল রিচমন্ডের একটা পত্রিকার মারফৎ বার্বিকেনের সঙ্গে সরাসরি বাজি ধরে বসলেন। বাজির ব্যাপারটা হল—

(ক) গান-ক্লাব-এর অত্যুচ্চর্য পরিকল্পনাটাকে বাস্তবায়িত করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা কোনোদিনই জোগাড় হবে না। বাজির ডলারের পরিমাণ—এক হাজার।

(খ) নয় শ' ফুট লম্বা কামান ঢালাই একেবারেই অসম্ভব। বাজির ডলারের পরিমাণ—দু-হাজার।

(গ) বাঁধাগুলোর পরও যদি কামান তৈরি সম্ভবই হয়, তাতে কিছুতেই বারুদ ঠাসা সম্ভব নয়। বাজির ডলারের পরিমাণ—তিন হাজার।

(ঘ) বারুদে অগ্নি সংযোগ করামাত্র পুরো কামানটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। বাজির ডলারের পরিমাণ—চার হাজার।

(ঙ) যদি কামানটা নেহাৎই টুকরো টুকরো না হয় তবে চাঁদের বুকে হাজির হওয়া তো যেমন তেমন, দু-মাইল পথও কামানের গোলাটা অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না। বাজির ডলারের পরিমাণ—পাঁচ হাজার।

অর্থাৎ দু-মাইল পথও যদি কামানের গোলাটা অতিক্রম করতে সক্ষম হয় তবেই আমি ইম্পে বার্বিকেনকে আইন সম্ভভভাবেই বাজির পনের হাজার ডলার দিতে বাধ্য থাকব।

পত্রিকার পাতায় বাজির ব্যাপারটা ছাপা হবার কয়দিন বাদেই ক্যাপ্টেন নিকল একটা চিঠি পেলেন ৭ খামটার ওপরে গান-ক্লাবের সীলমোহর অঙ্কিত।

তিনি খামটার মুখ ছিঁড়ে তার ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করলেন তাতেমাত্র একটা ছত্রের চিঠি—
“আমি বাজি ধরছি।

বাস্টিমোর, উনিশে অক্টোবর

বার্বিকেন,

সভাপতি, গান-ক্লাব।”

কেমব্রিজ মানমন্দিরের নির্দেশ অনুযায়ী কামান স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

কামান স্থাপনের স্থান নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বার্বিকেন বিশেষ অক্টোবর তারিখে গান-ক্লাবের সাধারণ সভা ডাকলেন।

আমেরিকার সুবিশাল মানচিত্র সামনে খুলে নিয়ে আলোচনা শুরু হল। দীর্ঘ আলোচনা ও কথা কাটাকাটির পর ঠিক হল, টেক্সাস ও ফ্লোরিডার যেকোন একটা স্থান থেকে কামান দাগা হবে। ব্যস, টেক্সাস আর ফ্লোরিডার মধ্যে তুমুল বিবাদ শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রলোকে প্রথম গোলা ফেলার কৃতিত্বটুকু কেউ-ই ছাড়তে নারাজ। না, কিছুতেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে না। উদ্ভূত বিবাদের মীমাংসা করার জন্য বার্বিকেন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, ফ্লোরিডায় মাত্র একটা শহর রয়েছে। আরে ট্রেন্স সে রয়েছে এগারোটা শহর। তাদের কোনো একটাতে কামান দাগার জন্য নির্বাচন করামাত্র এগারোটা শহরের মধ্যে ‘রক্ষক্ষরী যুদ্ধ’ বেধে যাবে। কেউ-ই নিজ নিজ দাবী থেকে সরে যেতে রাজি হবে না।

কামান দাগার স্থান নির্বাচনের ব্যাপারটার ফয়সালা তো কোনোক্রমে করা গেল। এবার অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারটা নিয়ে বার্বিকেন তোড়জোড় শুরু করে দিলেন। তিনদিন পরে হিসাব করে দেখা গেল, কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরাই চাঁদাশ্রুপ চল্লিশ লক্ষ ডলার পাঠিয়েছে। কেবলমাত্র ইংল্যান্ডই একটা কানাকড়িও দিল না ইংল্যান্ড বাদে অন্যান্য দেশ থেকে এসেছে চৌদ্দ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দু-শ’ পঁচাত্তর ডলার। সর্ব সাবুল্যে গান-ক্লাবের হাতে এসেছে চুয়ান্ন লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দু-শ’ পাঁচাত্তর ডলার।

আগামী পনেরোই অক্টোবরের মধ্যে কামান ঢালাই করতে হবে এ-শর্তে নিউইয়র্কের গোন্ডলিঞ্জ কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হল।

ক্যাপ্টেন নিকল তাঁর প্রথম বাজি হেরে গেলেন।

অ্যান্টিমনিয়ামের গোলা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল আলবানির এক প্রতিষ্ঠানের ওপর। আর দূর পাহারার একটা দূরবীক্ষণ তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হল কেমব্রিজ মানমন্দিরকে।

বার্বিকেন এবার এল, ফিলটোন, ম্যাসটন ও গোন্ডলিঞ্জ কোম্পানির ম্যানেজারকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরিডায় হাজির হলেন কামান দাগার স্থান নির্বাচনের জন্য। সেখানের ট্যাম্পা শহর থেকে পনের মাইল দূরবর্তী, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আঠারো শ’ ফুট উঁচু স্টোনসহিল নামক স্থানটাকে নির্বাচন করলেন। সেখানে একনাগাড়ে তিন মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করে তিন শ’ ছত্রিশ ফুট গভীর একটা খাদ কাটা হল। দশই জুন কুয়োটার গভীরতা দাঁড়াল নয় শ’ ফুট।

খাদ তো কাটা হল। এবার শুরু হল ঢালাইয়ের কাজ। পাথরের কুঁচোটার ঠিক কেন্দ্রস্থলে নয় শ' ফুট লম্বা ও নয় ফুট ব্যাসযুক্ত কামানের নলটা তৈরির কাজ শুরু হল। বালি, মাটি, কাদা আর খড় ব্যবহার করা হল এ কাজের জন্য।

দুপুর বারোটায় বার্বিকেন একটা উঁচু জায়গার ওপর দাঁড়িয়ে কামান তৈরির ব্যাপারটা দেখতে লাগলেন।

আটঘণ্টা হাজার টন কয়লা পুড়িয়ে খাট হাজার টন লোহাকে গলিয়ে ফেলা হল। গলিত ধাতু নয় শ' ফুট গভীরে পড়তে লাগল। বাস, ঢালাইয়ের কাজ মিটে গেল। এখন চিন্তা হচ্ছে, কামানটা যদি নিখুঁত না হয় তবে পুরো পরিকল্পনাটাই বরবাদ হয়ে যাবে। মোদা ব্যাপার হচ্ছে, আগামী আঠারো বছরের মধ্যে যে চাঁদ পৃথিবীর এত কাছে আসবে না।

বাইশে সেপ্টেম্বর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেল, কামানটা গোলা নিক্ষেপ করার উপযুক্ত হয়েছে বটে। খবরটা পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি যেন বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যাপারটা ক্যাপ্টেন নিকলের কানে পৌছতেও দেরি হল না।

ক্যাপ্টেন নিকল দ্বিতীয় বাজিটাও হেরে যাওয়ায় মিহিয়ে গেলেন।

বাইশে সেপ্টেম্বর প্রধান ফটক থেকে প্রহরীদের সরিয়ে নেওয়ায় কৌতূহলী জনতা দলবর্ধে অদ্ভুত কামানটাকে দেখতে এল। মাথাপিছু পাঁচ ডলার হিসাবে টিকিট বিক্রি হতে লাগল কামানটাকে দেখার জন্য। এতে গান-ক্লাবের তহবিলে পাঁচ লক্ষ ডলার জমা পড়ল। উল্লসিত দর্শকরা কামানটা দেখে সম্মতে কণ্ঠে গান ক্লাব আর বার্বিকেনের নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল।

ত্রিশে সেপ্টেম্বর বার্বিকেন একটা টেলিগ্রাম পেলেন। টেলিগ্রামটা এসেছে প্যারিস থেকে। ত্রিশে সেপ্টেম্বর ভোরেই সেটা করা হয়েছে।

টেলিগ্রামটার ওপরে লেখা—ইম্পে বার্বিকেন। ট্যাম্পো। ফ্লোরিডা। যুক্তরাষ্ট্র।

টেলিগ্রামের বক্তব্য—

“আপনি যে-গোলাটাকে চাঁদে পাঠাবার উদ্দেশ্যে বানাতে চলেছেন, সেটাকে গোলাকার না করে দয়া করে ছুঁচল চোঙার মতো ফাঁপা করে বানান। আমি এতে চেপে চাঁদে যেতে চাই। আমি আসছি। এস, এস, আটলান্টা জাহাজে আজই লিভারপুর্ থেকে রওনা হচ্ছি।—মাইকেল আর্দা।”

এবারও খবরটা বাতাসের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শহরের সর্বত্র, সবার মুখে একই কথা চাঁদে মানুষ যাবে। কেউ খবরটাকে বিশ্বাস করল, আবার কেউ বা নিছক পাগলামি বলেই প্রসঙ্গটাকে উড়িয়ে দিল। তাদের মতে এটা নাকি ফরাসিদের নতুনতর একটা পাগলামি। পৃথিবী ছেড়ে কারো পক্ষে কি চাঁদে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। চাঁদে কি বাতাস আছে যে নিঃশ্বাস নিতে পারবে? গোলার ভেতরে বসে গোলারই আঙুনে লোকটা জ্বলে পুড়ে থাক হয়ে যাবে। যদি কোনোক্রমে চাঁদে যেতেই পারে তবে ফিরেই বা আসবে কীভাবে?

এসব নিয়ে বার্বিকেনের মাথাব্যথা নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিভারপুলের জাহাজঘাটে টেলিগ্রাম করে জানতে পারলেন; আটলান্টা জাহাজটা প্রায় একঘণ্টা আগে লিভারপুর্ বন্দর ছেড়ে ট্যাম্পার দিকে যাত্রা করেছে। আর যাত্রীদের তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দার নাম রয়েছে।

উল্লসিত বার্বিকেন গোলা তৈরির কারখানায় খবর পাঠালেন। নতুন করে খবর না দেওয়া অবধি গোলা তৈরির কাজ যেন বন্ধ রাখা হয়।

আমেরিকার কেউ কেউ এমন কথাও বলতে লাগল, এতবড় একজন বৈজ্ঞানিকের কি তবে সত্যি মাথা খারাপ হয়ে গেল? বার্বিকেনও পাঁগল হয়ে গেলেন নাকি? নইলে হঠাৎ গোলা তৈরির কাজ বন্ধ করতে যাবেনই বা কেন?

বিশে অক্টোবর আটলান্টা জাহাজ ট্যাম্পা বন্দরে নোঙর করল। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দাকে দেখার জন্য বন্দরে কয়েক হাজার উৎসাহী মানুষ ভিড় জমাল।

বার্বিকেন ইতিপূর্বে বিজ্ঞানী মাইকেল আর্দাকে দেখেন নি। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সাদাসিধে সহজ-সরল মাটির মানুষটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিজের পরিচয় দিতে তাঁর সাথে করমর্দন করলেন।

কথা প্রসঙ্গে বার্বিকেন উচ্ছসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, ‘আপনি অনুগ্রহ করে আমার পাশে এসে যে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি। আর আপনার টেলিগ্রামটা পাওয়ামাত্র আমি গোলা তৈরির কাজও বন্ধ রেখেছি।’

‘ধন্যবাদ। আপনি চন্দ্রলোকে গোলা পাঠাবার উদ্যোগ-আয়োজন করছেন শোনামাত্র ভাবলাম, এ-সুযোগে একবারটি চাঁদ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। ব্যাপারটা এমন কিছু মারাত্মক নয় যে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর একবার যখন ঠিক করেছি যাব তখন আমি অবশ্যই যাচ্ছে। ভালো কথা, আমাব পরিকল্পনার কথা সবাইকে আলাদা আলাদাভাবে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তার চেয়ে বরং একটা সভা ডাকুন, সেখানেই আমি আমার পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করব।’

মাইকেল আর্দাকে নিজে বার্বিকেন তাঁর বাসায় এলেন। রাত্রি বারোটো পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হল।

ট্যাম্পার জাহাজ ঘাটের কাছে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে জনসভার আয়োজন করা হল। তিন লক্ষাধিক শ্রোতার উপস্থিতিতে মাইকেল আর্দা এবার ভাষণ দিতে উঠলেন। উপস্থিত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, ‘আমি কীভাবে চাঁদে পাড়ি জমাতে চাচ্ছি সে কথাই আজ আপনাদের কাছে ব্যক্ত করছি। আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, শীঘ্র চাঁদে পাড়ি জমানোর একটা সুব্যবস্থা হবেই হবে। এ জগৎ পরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানসাধকদের মতে পরিবর্তনশীল জগতের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে প্রগতি। মানুষের ক্ষমতা অসীম। সে নিজের বুদ্ধি সল করে জগতের অনেক কিছুকেই বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। তবে এমন অনেক ব্যাপার আছে বুদ্ধি দিয়ে, এর ব্যাখ্যা আজও মানুষ করে উঠতে পারে নি। আমার এও প্রত্যয় রয়েছে, যত

অত্যাচর্য সৃষ্টি তাদের সবার মূলেই রয়েছে মানুষের অসীম বুদ্ধির হোঁয়া। উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটাকে আরো সহজতর করে দিচ্ছি। বনের পশুকে দিয়ে মানুষ প্রথমে যানবাহনের অভাব মিটিয়েছিল। পরবর্তীকালে এল যন্ত্র। প্রথমে এল গরু গাড়ি, তারপর ঘোড়ার গাড়ি, তারপর এল মোটর গাড়ি ও ট্রেন। এল দাঁড় ও পালের নৌকা। তারপর এল জাহাজ। আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, কামানের গোলায় চেপে যাতায়াত আগামী দিনের মানুষের কাছে খুবই সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। এতে সময় লাগবে কম, কষ্টও তেমন হবে না। আপনাদের মধ্যে হয়তো বা ভাবনার সঞ্চারণ হচ্ছে, উদ্ধার বেগে ধেয়ে যাওয়া কামানের গোলার মধ্যে অবস্থান করাটাই তো সমস্যা সৃষ্টি করবে। আমি বলতে চাই, এরকম ভাবনা কি যুক্তিসঙ্গত? আজ সমগ্র পৃথিবীর ওপরে মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে। অথচ মহাকাশে পৃথিবীটার গতিবেগ তো ঘণ্টায় ত্রিশ হাজার মাইল। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো বলবেন, পৃথিবীর বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা মানুষের কোথায়? গ্রহান্তরে যাওয়ার হিম্মত সে কোনোদিনই অর্জন করতে পারবে না। সত্যি ধারণাটা একেবারেই ভ্রান্ত। আজ তো আমরা দিব্যি মহাসাগর পাড়ি দিয়ে যাচ্ছি। আমি যেন দিব্যি চোখে দেখতে পাচ্ছি, মানুষ নীল আকাশের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করে ফেলছে। এ-গ্রহের অর্ধেক মানুষ বায়ু পরিবর্তনের জন্য চাঁদ নামক মূল্যকে বেড়াতে যাচ্ছে। আমরা অদূর ভবিষ্যতে ক্ষেপণ-বাহনে চেপেই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ধেয়ে যাব। এক্সপ্রেস ট্রেন করে চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে কয়দিন লাগবে, বলতে পারেন? পৃথিবীকে তিনবার চক্কর মেরে আসার যদি সম্ভব হতে পারে তবে মাত্র সাতানব্বই ঘণ্টার যাত্রাপথের ব্যাপারটাকে অসম্ভব কি করে ভাবতে পারি?

আর 'দূরত্ব' শব্দটা কিন্তু মূলত একেবারেই অর্থহীন। কোনো দাতুতে অসংখ্য অণু যেমন পাশাপাশি অবস্থান করে সৌরযন্ত্রের গ্রহগুলোও ঠিক তেমনই পাশাপাশি রয়েছে। আসলে সৌরমণ্ডলটা একটা অখণ্ড জগৎ। অণুতে অণুতে ব্যবধানের মতোই এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহের ব্যবধান।

আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে যে, পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে ব্যবধান তেমন বেশি কিছু নয়। আজ থেকে কুড়ি বছর বাদে পৃথিবীর মানুষ যদি চাঁদ থেকে ঘুরে আসে তবুও আমি বিশ্বাসভিত্তক হব না।

মাইকেল আর্দা থামতে না থামতেই বার্বিকেন প্রশ্ন করলেন, 'একটা কথা, অন্য সব গ্রহে কি জীবের অস্তিত্ব রয়েছে?'

'আছে? অবশ্যই আছে। পৃথিবী নিজেও একটা গ্রহ। এখানে যে কতরকম প্রাণী রয়েছে আজ পর্যন্ত তারই হিসাব কি আমরা করতে পেরেছি? সুইডেনবর্গ, বার্নাডিন এবং প্লটার্ন প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছেন, সব গ্রহেই জন্তু জানোয়ারের অস্তিত্ব রয়েছে। তবে আমি বলব, এ-ব্যাপারে আমার মতো লোকের মন্তব্য করা মানায় না। তবে একটা কথা কি, আছে, কি নেই তা জানার, দেখার উদ্দেশ্যেই তো আমাদের চাঁদে পাড়ি জমানো।'

শ্রোতাদের একজন বলে উঠল, 'অন্যান্য গ্রহে বসবাস করা সম্ভব, কি অসম্ভব এ-ব্যাপারে বিরুদ্ধ মতো যথেষ্টই রয়েছে। ভীষণ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বা মারাত্মক গরমে ঝলসে যাওয়াও তো সম্ভব।'

'প্রকৃতিবিদরা কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসের অগণিত মতবাদ ব্যক্ত করেছেন। মাছ যে পরিবেশে স্বাস্থ্যক্রিয়া চালায় তা কিন্তু অন্য প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। উভচর প্রাণীদের জলে ও ডাঙায় টিকে থাকার প্রসঙ্গটা কিন্তু খুবই কঠিন। জলের এত গভীরে কোনো কোনো সামুদ্রিক জীব বাস করে সেখানে অন্য প্রাণীরা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যেত। আর একটা ব্যাপার জলচর প্রাণীরা মেরু অঞ্চলের গরম জলে যেমন থাকতে পারে ঠিক তেমনই উষ্ণ প্রস্রবনেও টিকে থাকতে সক্ষম।'

'আর একটা কথা, আমি রসায়নবিদ হলে বলতাম, উদ্ধার গায়ে কার্বনের খোঁজ পাওয়া গেছে। উদ্ধার সৃষ্টি কিন্তু পৃথিবীর বাইরে। এতে মনে করা যেতে পারে কোনো এক সময় সেখানে জীব বাস করত। বিজ্ঞানী রাইকেনবাস এটা প্রমাণ করে দিয়ে আমাদের ধন মিটিয়েছেন।

ব্রহ্মজ্ঞরা তো বলেছেনই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রাণীর অস্তিত্ব বর্তমান। ভবিষ্যতেও থাকবে।

আমি কিন্তু রসায়নবিদ, প্রকৃতিবিদ বা ব্রহ্মজ্ঞ কোনোটিই নই। তাইতে অনিশ্চিত জ্ঞানি না পৃথিবীর বাইরে জীবের অস্তিত্ব আছে, কি নেই।'

মাইকেল আর্দা এবার বললেন, 'গ্রহ-উপগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভুরি ভুরি প্রমাণই রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কি, আমি কিন্তু আদৌ তা প্রমাণ করতে এখানে ছুটো আসি নি। কেউ স্টেট মন্তব্য করতে পারেন, সৌরমণ্ডল মনুষ্যবাসের একেবারেই অনুপযুক্ত। পৃথিবীটা যে মনুষ্যবাসের খুবই উপযুক্ত তার কোনো প্রমাণ তাঁরা হাজির করবেন? চাঁদ পৃথিবীরই একটা উপগ্রহ, আমরা তো সেখানেই যাওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করছি। উপগ্রহের সংখ্যা একের চেয়ে বেশি এমন গ্রহের কিন্তু অভাব নেই। তবু সে সব গ্রহে জীবের বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ নেই, কেবলমাত্র পৃথিবীতেই জীবের অস্তিত্ব রয়েছে, কি করে বিশ্বাস করা সম্ভব—আপনারাই বলুন তো? পৃথিবীর বুকে যে অগণিত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় এসব কিন্তু একটা কারণেই সম্ভব তা হল পৃথিবী অক্ষরেখার ওপর বেকে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। বৃহস্পতি গ্রহের কথা একবারটি বিবেচনা করে দেখুন তো? সে মেরুদণ্ডের ওপর সামান্য বেকে অবস্থান করছে। এ-বক্রতা এতই কম যে, সেখানে ঋতু বৈচিত্র্য বলে কোনো কিছুই নেই। রোগ-ব্যাধিও খুবই কম। কিন্তু বিবেচনা করলে স্বীকার করতেই হবে, বৃহস্পতি পৃথিবীর চেয়ে ঢের ঢের ভালো। পৃথিবীও যদি এত বেশি বেকে না থাকত তবে দিন-রাত্রির পার্থক্য, ঋতু বৈচিত্র্য ও অত রোগ ব্যাধি মোটেই থাকত না। আমার ক্ষমতা থাকলে অক্ষরেখাকে সোজা করে দিয়ে পৃথিবীর হাল পাল্টে ফেলতাম।'

তিন লক্ষ শ্রোতার মধ্য থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'সাহেব, অনেক কিছুই তো শোনা হল, এবার একটু ঝেড়ে কাসুন তো। আসল কথাটা বলুন। এমন কিছু বলুন যাতে বাস্তবের হোঁয়া রয়েছে। আমরা পৃথিবীর কথা নয়, চাঁদের কথা বলতে ও শুনতে এসেছি।'

মাইকেল আর্দা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। খেই হারিয়ে আমরা অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম। এবার চাঁদের কথায় আসা যাক।'

জনতার মধ্য থেকে আবার সে-কণ্ঠস্বরটা ভেসে এল, 'তবে আপনার মতে চাঁদে প্রাণীর অস্তিত্ব রয়েছে, তাই তো? যদি থেকেই থাকে তবে তাদের শ্বাসক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। কারণ, চাঁদে তো বাতাস নেই।'

'চাঁদে যে বাতাস নেই এ-কথা কি করে জানলেন?'

'পণ্ডিত ব্যক্তির তো এ-কথাই বলেন।'

'যারা কিছু জেনে মন্তব্য করেন আমার কাছে তাঁরাই পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ বলে শ্রদ্ধা করি। আর যারা না জেনে জানার ভান করে তাদের শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধাই বেশি করি।'

'চাঁদে যে বাতাস নেই এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। প্রমাণও যথেষ্টই আছে। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসার সময় বেকে যায়। কোনো নক্ষত্রকে চাঁদ যখন ঢেকে রাখে তখন চাঁদের পাশ দিয়ে নক্ষত্রটার আলো বেকে না গিয়ে বেরিয়ে আসে। চাঁদে যে বায়ুর অস্তিত্ব নেই এ-ই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'হ্যাঁ, আপনার বক্তব্যকে মেনে নেওয়া সম্ভব হত যদি চাঁদের কৌণিক ব্যাস আমরা জানতাম। কিন্তু আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে তা জানা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এবার বলুন তো, চাঁদে যে মানুষ আছে তা মানে তো? আজ না থাকলেও এক সময় তো ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ, অতীতে ছিল বটে। তখন শ্বাসক্রিয়ার অত্যাব্যবশ্যক অক্সিজেন আগ্নেয়গিরিই যোগান দিত। চাঁদে যে বায়ু ছিল এটাই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'প্রমাণের ব্যাপারে আলোচনা হোক। বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেলি ও লুভিলে সতের শ' পর্য্যন্তের তেরো মে চন্দ্রগ্রহণ দেখার সময় অত্যন্তচর্য্য এক আলোক রশ্মি চাক্ষুষ করেন। চাঁদের বুকে যেন বজ্রের ঝলকানি আর তুফানের তাণ্ডব চলছিল। তাঁরা উজ্জ্বল আলোকেই চাঁদের আলো ধরে নিয়েছিলেন। আরো আছে, মদলার আর বিয়রের মতো এত বড় বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্টায় ব্যস্ত করেছেন, চাঁদে বাতাসের অস্তিত্ব নেই।'

মাইকেল আর্দা চোখে-মুখে গাভীরের ছাপ একে বললেন, 'মসিয়ে লসেনদত—এর মতো এতবড় বিজ্ঞানী চাঁদে বাতাস নেই একথা তো মোটেই বলেন নি। বরং দৃঢ় বিশ্বাসই পোষণ করেন যে, চাঁদে বায়ুমণ্ডলের অস্তিত্ব রয়েছে।'

'খাকলেও থাকতো পারে তবে খুবই সামান্য।'

'কম হলেও তা একজনের শ্বাসক্রিয়ার পক্ষে তো যথেষ্ট। চাঁদে বাতাসের অস্তিত্বের কথা যখন মেনেই নিচ্ছেন তখন আশা করি এও মেনে নেবেন, চাঁদে জলও আছে। জলই যদি না থাকে তবে বাতাস থাকা কি করে সম্ভব?'

লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ সমস্বরে বলে উঠল, 'বাচাল! কেবলই কথার ফুলঝুরি! যা কতক দিয়ে হতচ্ছাড়াটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।'

মাইকেল আর্দা এতে না চটে বা ক্ষুণ্ণ না হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললেন, 'আপনার আর কোনো বক্তব্য আছে কি?'

'বেশি আর দরকার পড়বে না। কামান দাগামাত্রই তো আপনার হাড়গোড় ঠুঁড়ে ঠুঁড়ে হয়ে যাবে। গোলাটা বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে যাওয়ামাত্র বায়ুর ঘর্ষণের মাধ্যমে যে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হবে—'

'প্রচণ্ড সে-তাপে আমি জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাব, ঠিক কিনা? একরম আশঙ্কা করলে কিন্তু মারাত্মক ভুলই করবেন মমাই। গোলাটার আস্তরণ খুবই পুরু করা হবে। তা ছাড়া বায়ুমণ্ডলে পাড়ি দিতে কয় সেকেন্ডই বা লাগবে? চারদিন। চাঁদে পৌঁছতে বড়জোর চারদিন লাগবে। এক বছরের খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে থাকবে। আর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় শ্বাসকার্যের অক্সিজেন তৈরি করে নেব।'

'ভালো কথা, গোলাটা যদি চাঁদে পৌঁছায় তবে তীব্র গতিবেগে চাঁদের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়বে?'

'দেখুন, চাঁদের পরিবর্তে যদি ওভাবে পৃথিবীতে পড়তাম তাতে যে-আঘাত পেতাম তার চেয়ে অন্তত ছয় গুণ কম চাঁদে আঘাত লাগবে। তা ছাড়া আমি চাইলেই গোলাটার গতিবেগ কমিয়ে নিতে সক্ষম হব। কীভাবে, তাই না? আমি সঙ্গে করে কয়েকটা শক্তিশালী হাউই নিয়ে যাবি। হাউই ছেড়ে বিপরীত দিকে গতিবেগ সৃষ্টি করে গোলাটার গতিবেগ অনায়াসে হ্রাস করে নিয়ে তবেই চাঁদের বুকে পড়ব।'

'মনে করা যাক, বহাল তবিরতেই আপনি চাঁদের বুকে হাজির হলেন। ব্যস, তারপর সেখান থেকে ফিরবেন কি করে জানতে পারি কি?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে আর্দা জবাব দিলেন, 'আমি যে ফিরবই অর্থাৎ ফিরে আসতে আগ্রহী আপনি কোথায় শুনেছেন? চাঁদের বুকে ইয়া বড় বড় পাথরের হরফ তৈরি করে পৃথিবীতে খবর পাঠাব। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আপনারা তা পড়বেন, বুঝেছেন?'

'আর একটা ব্যাপার, এত বড় একটা গোলাকে নয় শ' ফুট লম্বা কামানের ভেতর থেকে যখন চাঁদের দিকে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ঝুঁড়ে দেবে তখন যে ধাক্কা লাগবে তাতেই হাড়-মাংস একাকার হয়ে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে যাবেন, ভেবেছেন?'

'দেখুন, তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ইচ্ছা আর সময় কোনোটাই আমার নেই গান-ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ইম্পে বার্বিকেন সাহেব আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন।'

প্রশ্নকর্তা উজ্জ্বল লোকটার ঘ্যানঘ্যানানিতে বার্বিকেন এতক্ষণ রাগে কাঁপছিলেন। তিনি এবার রীতিমতো কাঁপতে কাঁপতে তাকে দরার জন্য পা-বাড়ালেন। ইতিমধ্যেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছুসংখ্যক লোক হৈ হৈ করতে করতে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এসেছে। চোখের পলকে তারা মানুষগুলোসহ মঞ্চটাকে কাঁদে করে জাহাজ ঘাটের দিকে জয়ধ্বনিসহ হৈ হৈ করতে করতে রওনা দিল। এতকিছু সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তা কিন্তু গা-ঢাকা দেন নি।

বার্বিকেন ভিড় ঠেলে অজ্ঞাত পরিচয় লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর নাম-পরিচয় জেনে নিলেন।

অদ্ভুত সে লোকটার নাম ক্যাপ্টেন নিকল। কথা প্রসঙ্গে ক্যাপ্টেন নিকল বললেন 'আমি ইচ্ছে করেই এতসব প্রশ্নের অবতারণা করেছি। মনে করতে পারেন, অপমান করেছি। আর ইচ্ছে করেই সবার সামনেই তা করেছি।'

বার্বিকেন রাগে গস গস করতে করতে বললেন, 'আমি এ-অপমানের বদলা নিয়ে ছাড়ব সাহেব! আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নামতে হবে।'

ক্যাপ্টেন নিকল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মতো দিলেন। পরের দিন ভোর পাঁচটায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের সময় ঠিক হয়ে গেল। আর স্থান? ট্যাশ্পা থেকে মাইল তিনেক দূরবর্তী বনভূমি।

বার্বিকেন নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ি ফিরলেন। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ব্যাপারটা নিয়ে তিনি মোটেই ভাবিত নন। তাঁর মাথায় তখন একটা চিন্তাই বার বার চক্কর মারছে।

বাইশে অক্টোবর। সেদিন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাস্টন হস্তদস্ত হয়ে ছুটে এসে, বার্বিকেন একটু বাদেই যে ক্যাপ্টেন নিকলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চলেছেন, আঁদাকে খবরটা দিলেন। তাঁকে এও বললেন, বার্বিকেন নাকি বলেছেন, পৃথিবীটা এতই ছোট যে, ক্যাপ্টেন নিকল আর তাঁর পক্ষে এক সঙ্গে এখানে থাকা সম্ভব নয়। যে কোনো একজনকে পৃথিবী ছাড়তেই হবে। ম্যাস্টন কিছুতেই বার্বিকেনকে হারাতে রাজি নয়। তাই তো অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় মাইকেল আঁদাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানে হাজির হলেন।

বনের পথ ধরে ভেতরের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হতেই মাইকেল আঁদা গাছের ফাঁক দিয়ে ক্যাপ্টেন নিকলকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে অগ্রসর হতে দেখলেন। লম্বা লম্বা পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকল, আমি আপনাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ছুটে এসেছি। অহেতুক এমন ভয়ঙ্কর একটা কাজে আপনারা বিচক্ষণ লোক হয়েও কেন যে পা বাড়ানো মাথায় আসছে না। এর পরিণাম তো আপনাদের মধ্যে কোনো না কোনো একজনের মৃত্যু সুনিশ্চিত। জেনে শুনে কেন তবে দু-একটা অমূল্য প্রাণনাশের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন, বলুন তো?' মুহূর্তের জন্য খেমে মাইকেল আঁদা এবার বললেন, 'আপনাকে একটা উত্তম প্রস্তাব দেওয়ার জন্য আমি এখানে ছুটে এসেছি। তবে প্রস্তাবটা আমি বার্বিকেনের সামনেই দেব। চলুন, তাকে আগে খুঁজে বের করি।'

সামান্য খোঁজাখুঁজির পরই তাঁরা বার্বিকেনকে খুঁজে বের করতে পারলেন। দেখলেন, বনের একান্তে একটা ফাঁকা জায়গায় বন্ধুকা সামনের জমিনে রেখে নিজেরই আঁকা কয়েকটা জ্যামিতির নক্সার ওপর ঝুঁকে নির্নিমেধ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন। কোনোদিকে সামান্যতম খেয়ালও তাঁর নেই।

মাইকেল আঁদা এগিয়ে গিয়ে বার্বিকেনের কাঁধে আলতো করে চাপ দিতেই তিনি ঘাড় ঘুরিয়েই সোচ্চারে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! চমৎকার! পেয়ে গেছি! আমার সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। কামানের নল থেকে আচমকা গুলিটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় যে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগবে তা সামলাবার উপায় বের করে ফেলেছি। জলকে শিশি-এর ভূমিকায় ব্যবহার করলেই ল্যাটা চুকে যাবে। তার ওপরেই রাখতে হবে বসার আসনটা।'

মাইকেল আঁদা মুচকি হেসে বললেন, 'তবে তো ব্যাপারটার ফয়সালা হয়েছে যাক, ক্যাপ্টেন নিকল অপেক্ষা করছেন।'

বার্বিকেন ক্যাপ্টেন নিকলকে দেখেই লজ্জা-বিনত স্বরে বলে উঠলেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন ক্যাপ্টেন। আরোহীকে রক্ষা করে কীভাবে চাঁদে গোলা পাঠানো যাবে তা নিয়ে আত্মগণ্ড খাকায় আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। চলুন এবার—'

মাইকেল আঁদা তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আমি উপস্থিত থাকতে অন্তত আপনাদের রক্তারক্তি করে প্রাণনাশ করতে দিচ্ছি না। সামান্য খামখেয়ালির জন্য দুদুটো অমূল্য প্রাণ, অনন্য প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে, তাও কি হতে দেওয়া যায়? আরে সাহেব, তর্কাতর্কি আর রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে না মেতে আপনারা উভয়েই চলুন না। চাঁদে পাড়ি জমানো বাস্তবিকই সম্ভব, নাকি একেবারে অসম্ভব হাতেনাতে প্রমাণ নেবেন। আমি আবারও বলছি, কামান দাগার সময়ে কারোরই হাড়-মাংস একাকার হবে না। আর মারা যাবার প্রশ্নই তো ওঠে না।'

ক্যাপ্টেন ও বার্বিকেন আঁদা মতবিরোধ ভুলে, দ্বন্দ্ব মিটিয়ে পরস্পর বন্ধুত্বের ডোরে বাঁধা পড়ার খবরটা সংবাদপত্র এবং অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে সমগ্র আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে কাতারে কাতারে ইয়াকিরা এসে মাইকেল আঁদাকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগল।

মাইকেল আঁদা এবার কথা প্রসঙ্গে বার্বিকেনকে বললেন, 'একটা কথা, আমাদের পৃথিবীর বুকে এই যে হাজারো রোগ-ব্যাদি বিস্তার লাভ করছে তার মূলে রয়েছে চাঁদের, প্রভাব, কথাটা বিশ্বাস করার মতো কি?'

'না। আমি তো অন্তত করি না।'

আমিও বিশ্বাস করি না। ইতিহাসে অবশ্য এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। 'ষোলো শ' তিরানব্বই-এর চন্দ্রগ্রহণে বহু লোকের প্রাণনাশ হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণ চলাকালীন বহু লোক থেকে থেকে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলত। প্রমাণ আছে সতের শ' উনচল্লিশে রাজা ষষ্ঠ চার্লস পূর্ণিমা ও অমাবস্যা আসতেই দু-বার উন্মাদ হয়ে পড়তেন। শুক্রপক্ষে মাসে দুবার করে তার উন্মাদদশা বৃদ্ধি পেত। জ্বর, সর্দি, কাশি, ঘাম আর পাগলামির ওপর চাঁদের প্রভাব নাকি খুবই রয়েছে। গুটীচও একই মতো পোষণ করতেন।'

এবার আমেরিকার মেয়েদের মধ্যে এক নতুন ধরণের পাগলামি দেখা দিয়েছে। মাইকেল-আঁদার একটা ছবি পাবার জন্য তারা একেবারে পাগল। আর তাঁর স্ত্রী হয়ে চাঁদে যাওয়ার জন্য মাঝবয়সী ও অবিবাহিতাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

কামান দাগার সময় যে ধাক্কার সৃষ্টি হবে সেটা তাঁরা সামাল দিতে পারবেন তো!—বার্বিকেনের মাথায় একই চিন্তা জগদল পাখরের মতো চেপে রয়েছে

মানুষের সন্দেহ ঘুচাবার জন্য বার্বিকেন একটা বত্রিশ ইঞ্চি কামান, সংগ্রহ করলেন। তার ভেতরে কুশান দিয়ে শিশু ও একটা গোলা তৈরি করলেন। একটা কাঠবিড়ালী ও একটা বিড়ালকে তার ভেতরে রেখে ক্ষুদ্র দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিলেন। এবার নলটার ভেতরে ঠেসে ঠেসে এক শ' ঘটি পাউন্ড গান-পাউন্ডার ঢুকিয়ে দিলেন। এবার বারুদে অগ্নি সংযোগ করে গোলাটাকে নিষ্কেপ করা হল। সেটা শূন্যে হাজার খানেক ফুট উঠে সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। গোলায় মুখ খুলে দেখা গেল, বিড়াল আর কাঠবিড়ালী উভয়েই অক্ষত রয়েছে।

পরীক্ষা—নিরীক্ষার ব্যাপারে সবাই তো আনন্দে ডগমগ। এবার ম্যান্টন উল্লসিত হয়ে তাকেও চাঁদে নিয়ে যাওয়ার জন্য বার্বিকেনের কাছে আদ্য জানাল। গোলায় ভেতরে এলে লোকের স্থান সঙ্কুলান হবে না বলে তিনি তার আদ্য রক্ষা করতে রাজি হতে পারলেন না।

এদিকে নতুন একটা বিপদের ব্যাপারে আঁদা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তার কাছে হাজার হাজার চিঠি আসতে লাগল। কেউ বা সামনা-সামনি ওই একই আদ্য করতে লাগল। চাঁদে নিয়ে যেতে হবে। স্থানাভাবের যুক্তি দেখিয়ে সবাইকে হতাশ করতেই হল।

দশই নভেম্বর। বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। যে প্রতিষ্ঠান গোলা তৈরির অর্ডার নিয়েছিল তারা বার্বিকেনের কাছে সেটা পৌঁছে দিয়ে গেল।

গোলা তৈরির কাজ মিটেছে খবরটা কাগজে ছাপা হতেই দলে দলে কাতারে কাতারে লোক গোলাটাকে দেখার জন্য ছুটে আসতে লাগল।

বার্বিকেন নিঃসন্দেহ যে, ইম্পাতের শিশু যত ভালোই হোক না কেন, গোলাটার পক্ষে সেটা মোটেই উপকারে আসবে না। তাই তিনি তিন ফুট জলের আধারের ওপর একটা পাটাতনকে এমন কৌশলে স্থাপন করলেন যেন প্রয়োজনের সময় ঝট করে সেটা খুলে ফেলা সম্ভব হয়। পাটাতনটা ওপরেই তৈরি করা হল অভিযাত্রীদের বসার আসন। আর পাটাতনটার ওপরে বসিয়ে দেওয়া হল শক্তিশালী একটা শিশু। এর ফলে গোলা নিষ্কেপ করামাত্র যে-ধাক্কার সৃষ্টি হবে তা আরোহীরা সামলে উঠতে পারবেন।

বার্বিকেনের ব্যবস্থা দেখে মাইকেল আঁদা উল্লসিত হয়ে বললেন, 'এর পরও যদি ধাক্কা লেগে হাড় মাস খেতলে একাকার হয়ে যায়, যাক।'

গোলাটার ওপরের দিকটা ক্রমেই সরু করে তৈরি করা হয়েছে। আর সেদিকেই দরজাটা রাখা হয়েছে। সেটা খোলা ও বন্ধ করার জন্য বৈদ্যুতিক সুইচ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর শিশু-এর আসনের ঠিক নিচে চারটে কাচের জানালা। বাইরের দৃশ্য, মহাকাশ, ফেলে যাওয়া পৃথিবী, সমুখবর্তী চাঁদ, আর তারকামণ্ডলী প্রভৃতি দেখার জন্যই এ-ব্যবস্থা

সঙ্গে করে গোলাটার ভেতরে প্রচুর গ্যাস নেওয়ার ব্যবস্থা রাখা আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যই এ-ব্যবস্থা। আর নেওয়া হল জল ও খাবার দাবার। স্থানাভাব তা নইলে মাইকেল আঁদা পৃথিবীর সব রকম শিল্পকর্মের নিদর্শনও সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।

বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুরটাকেও নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল। তাই পাঁচ-পাঁচটি প্রাণীর শ্বাস ক্রিয়ার জন্য চক্ৰিশ ঘণ্টায় তিন কেজি অক্সিজেন লাগবে। একশু ভাগ অক্সিজেন ও উনআশি ভাগ নাইট্রোজেন মিলিত করলে বাতাস সৃষ্টি হয়। শ্বাসক্রিয়া চালানোর ফলে বাতাসের অক্সিজেন নিঃশেষ হয়ে গিয়ে কার্বনিক গ্যাসের উদ্ভব ঘটে। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করে নেওয়ার পর জমে ওঠা কার্বনিক গ্যাস নষ্ট করে দিতে পারলে গোলাটার ভেতরে বাতাসের আর অভাব ঘটবে না।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কঠিক পটাশ ও পটাশিয়াম ক্লোরেট দিয়ে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হল। পটাশিয়াম ক্লোরেট চার শ' ডিগ্রি উত্তাপে পরিবর্তিত হয়ে গেল ক্লোরিন পটাশে। পটাশিয়াম ক্লোরেটের অক্সিজেন বাইরে বেরিয়ে এল। নয় কেজি পটাশিয়াম ক্লোরেট থেকে সাড়ে তিন কেজি অক্সিজেন তৈরি হয়। তা দিয়েই একজনের চক্ৰিশ ঘণ্টা শ্বাসক্রিয়া চলে যায়। গোলায় ভেতরে প্রচুর পরিমাণে কঠিক ও পটাশিয়াম ক্লোরেট নিয়ে নেওয়া হল। কারণ, পটাশিয়াম ক্লোরেট বাতাসের কার্বনিক গ্যাস শুষে নিতে পারে।

ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ ঠিকঠাক হ-ব কিনা পরীক্ষা করার জন্য ম্যান্টন-কে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে রাখা হল। সাতদিন পরে দরজা খুলে দেখা গেল, সে সুস্থই আছে। শুধু কি এ-ই? কয়দিনে তার ওজনও কিছু বেড়ে গেছে।

বিডউইল কোম্পানির ওপর নতুন নব্বা অনুযায়ী প্রোজেক্টাই অর্থাৎ গোলা তৈরির দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। যথা সময়ে তারা স্টোনস হিলে সেটা পাঠিয়ে দিল।

জল, শিশু আর কাঠের পাটাতন প্রভৃতি ব্যবহার করে প্রাথমিক ধাক্কা সামলাবার ব্যবস্থা তো আগেভাগেই করে রাখা হয়েছে। জাহাজি পোর্টহোলের অনুকরণে চরটে গোলাকার জানলার ব্যবস্থাও করা আছে। তাতে ব্যবহার করা হয়েছে পুরু কাঁচ। কামান দাগলে যাতে গুঁড়ো হয়ে না যায়। আলো ও আশ্রয়ের জন্য গ্যাসের ব্যবস্থাও করা হল। সুইচ টিপলে এক নাপাড়ে ছয় ঘণ্টা উনন জ্বলবে, গোলায় ভেতরটা উষ্ণ থাকবে আর আলো তো পাওয়া যাবেই। আর বাতাস? সে ব্যবস্থা তো আগেই করে নেওয়া আছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাটও ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাতাস নিঃশেষ হয়ে গেলে আবার বাতাস তৈরির ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করা গেল।

সাদা রঙ বিশিষ্ট এক বিশেষ ধরনের কৃষ্ণাল হক্ষে পটাশিয়াম ক্লোরাইড। তাতে চার শ' ডিগ্রি তাপমাত্রা প্রয়োগ করলে কৃষ্ণালগুলো ভেঙে সৃষ্টি হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড। তখন ভেতরের সম্পূর্ণ অক্সিজেন বেরিয়ে আসে। সাত পাউন্ড অক্সিজেনের জন্য আটশ পাউন্ড ক্লোরেট প্রয়োজন। অর্থাৎ অভিযাত্রীদের যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার—আড়াই হাজার

লিটার অক্সিজেন পাওয়া যায়। কার্বন ডাই-অক্সাইড কষ্টিক পটাশের সংস্পর্শে যাওয়া মাত্র তাকে শুষে নেয়। তখন পড়ে থাকে পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট। এদুটাই দুধিত বায়ুকে শোধন করার ক্ষমতা রাখে।

ম্যাস্টিন বায়না ধরল, তাকে যখন চন্দ্র-অভিযানে নিয়ে যাওয়াই হচ্ছে না তখন তাকে গোলাটার মধ্যে সাতদিন থাকার সুযোগ দেওয়া হোক।

তার আশ্রয় রক্ষা করা হল। গোলাটার ভেতরে খাবার, জল, পটাস এবং পটাশিয়াম ক্রোরেট রাখা হল। বারোই নভেম্বর সকাল ছয়টায় সবার সঙ্গে করমর্দন সেরে ম্যাস্টিন গোলায় ভেতরে ঢুকল। গোলাটার ভেতরে ঢোকার আগে সে সবাইকে বারবার বলে গেলে, বিশেষ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টার আগে কেউ যেন সেটার দরজার না খোলে।

বিশেষ নভেম্বর সন্ধ্যা ছয়টায় গোলাটার দরজা খুলে দেখা গেল, ম্যাস্টিন বহাল তব্বিতেই রয়েছে। বরং তার স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়েছে। এতে ম্যাস্টিন নিজেও কম অবাক হয় নি।

গোলাটাকে চাঁদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করার পর সেটাকে যাতে পৃথিবীর থেকে দেখার অসুবিধা না হয় বিজ্ঞানীরা সে-ব্যবস্থারও ক্রটি রাখলেন না।

চাঁদ যদি মাত্র উনচল্লিশ মাইল দূরে থাকত তবে তাকে খালি চোখে যেমন দেখাত, যে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাকে ঠিক সেরকম দেখায় এমন দূরবীণ যন্ত্র পর্যন্ত আজ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মহাকাশের বুক চিরে ধেয়ে-যাওয়া গোলাটাকে দেখা যায় এরকম আরো শক্তিশালী একটা দূরবীণ যন্ত্র তৈরি করা হল। এটার শক্তি আগের দূরবীণের চেয়ে আটচল্লিশ হাজার গুণ বেশি। এর চোঙটাই দু-শ' আশি ফুট লম্বা। দূরের জিনিসকে কাছে ও বড় দেখার জন্য ষোলো ফুট ব্যসযুক্ত একটা কাঁচ এতে ব্যবহার করা হল। সদ্য তৈরী দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে রকি পর্বতের সুউচ্চ চূড়ায় স্থাপন করা হল। স্থানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দশ হাজার ফুট উঁচু। ত্রিশ হাজার পাউন্ড ওজন বিশিষ্ট কাঁচটাকে ওপরে তুলতে এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে যথাস্থানে স্থাপন করতে চার লক্ষ ডলার ব্যয় হল।

দেখতে দেখতে নভেম্বরের বাইশ তারিখ এসে গেল। চাঁদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আর মাত্র দশটা দিন মাঝখানে রয়েছে। এবারের সাম্ভাব্য কাজটার ওপরেই ক্যান্টেন নিকল তৃতীয় বাজি ধরেছেন। ব্যাপারটা হচ্ছে কোলাম্বিয়াডের নলে চার লক্ষ পাউন্ড গান-কটন পোরার ব্যাপারটার কথা বলা হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে পাইরোলক্সিল দিয়ে কামান ঠাসার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি ঠাসা যায়ও খুবই ভারি প্রোজেকটাইলটা বারুদের ওপর চাপামাত্র প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটান সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে।

বার্বিকেন এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করলেন। অতি সন্তর্পণে পাইরোলক্সিলের বস্তাগুলোকে স্টোনহিলে আনালেন। এবার ট্রেনে করে ট্যাম্পা শহর থেকে নিয়ে এসে কুলির মাথায় চাপিয়ে যথাস্থানে তোলা হল। সবশেষে কপিকলের সাহায্যে বস্তাগুলোকে কামানের নলের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। কামানের দু-মাইলের মধ্যে কোনোরকম আশ্রয় জ্বালা নিষিদ্ধ করা হল। বার্বিকেন রুমকর্প যন্ত্রের সাহায্যে আলো জ্বলে রাত্রির অন্ধকারে কাজ করার ব্যবস্থা করলেন। এতে বিস্ফোরণ ঘটান আর সম্ভাবনা রইল না।

সেদিনটা ছিল আঠাশে নভেম্বর। কামানে আট শ' কার্তুজ ঠাসা হল। বার্বিকেন প্রতিটা মুহূর্ত আতঙ্কের মধ্যে কাটাতে লাগলেন। এমন বিপত্তি এলাকার মধ্যে ধূম গান পর্যন্ত বন্ধ করে দেওয়া হল। শেষপর্যন্ত নির্বিঘ্নেই কামানের নলে গান-কটন ভরার কাজটাকে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব হল।

এবার কিছু সংখ্যক ব্যারোমিটার, থার্মোমিটার এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি গোলাটার মধ্যে তোলা হল। আর চাঁদকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার জন্য একটা বোর মোলারের মানচিত্রও গোলায় তোলা হল। এটাকে সবাই 'ম্যাপা-সে-লেনোগ্রাফিকা' নামে জানে। এর গায়ে চাঁদের দৃশ্যাবলি, যেমন—পাহাড়-পর্বত, আগুন-পাহাড়ের জ্বালমুখ, খাদ, হ্রদ ও উপত্যকা প্রভৃতি বিষদভাবে আঁকা রয়েছে। তা ছাড়া তিনটে বন্দুক, বহু বুলেট ও প্রচুর পরিমাণে বারুদও গোলায় তোলা হল।

মাইকেল আর্দার ইচ্ছা ছিল পৃথিবীর বহু জন্তু-জানোয়ার চাঁদে নিয়ে যান। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য কেবলমাত্র দুটো কুকুর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। আর পৃথিবীতে যেসব গাছ জন্মায় কিছু কিছু করে তাদের বেশ কয়েকরকম বীজও সঙ্গে নিয়ে নিলেন। সঙ্গে খাবার-দাবার নিতেও জ্বললেন না। তবে আর্দার অবশ্য এসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই। কারণ, তাঁর কথা হচ্ছে, একবার চাঁদের বুকে পৌঁছতে পারলে খাবার দাবারের যা হোক একটা হিল্লো হয়ে যাবেই।

যাবতীয় বন্দোবস্ত হয়ে গেলে নতুনতর এক সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা হচ্ছে, কামানের ভেতরে গোলাটাকে ঢোকানো নিয়ে। কাজটায় বিপদের ঝুঁকি তো রয়েছেই আর অসুবিধাও কম নয়।

কপিকলের সাহায্যে অতিকায় গোলাটাকে স্টোনহিলের মাথায় তোলা হল। যা আশঙ্কা করা হয়েছিল সেরকম কোনো দুর্ঘটনাই ঘটল না। তারপর নির্বিঘ্নেই পাইরোলক্সিলের গদির ওপর সেটাকে রাখাও অনায়াসেই সম্ভব হল।

কাজ নির্বিঘ্নে মিটিয়ে বার্বিকেন পিছন ফিরতেই দেখলেন, বাজির টাকা হাতে ক্যান্টেন নিকল সলজ্জমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মুচকি হেসে বার্বিকেন বললেন, 'এ কী করছেন সাহেব! বাজির টাকা কি আপনার কাছ থেকে নেওয়া চলে, বলুন? আরে সাহেব, আপনি তো এখন আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।'

মাইকেল আর্দার মুচকি হেসে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলি—আপনার যে দুটো বাজি এখনো বাকি রয়েছে তাও আপনি হেরে যান। তাই যদি হয় তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে, নির্বিঘ্নে আমরা চাঁদের উদ্দেশ্যে গাড়ি জমাতে পারি।'

ক্যান্টেন নিকল সোজাসে হেসে করমর্দনের জন্য মাইকেল আর্দার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

পয়লা ডিসেম্বর। ভোরের আলো ফুটে উঠল। বহু প্রতীক্ষিত দিনটা এল। রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডে কামান দেগে প্রোজেকটাইলকে মহাকাশে নিক্ষেপ করা হবে।

ভোরের আলো ফুটে না ফুটেই হাজার হাজার কৌতূহলী-উৎসাহী দর্শক স্টোনস হিল এবং তার আশেপাশে ভিড় জমাতে লাগল। ট্যাম্পা উটিন অবজারভারের পাতায় খবরটা ছাপা হল—ফ্লোরিডা শহরে পঞ্চাশ হাজার কৌতূহলী দর্শক নাকি জমা হয়।

সন্ধ্যা সাতটার কাছাকাছি আকাশের বুকে চাঁদ উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে চাঁদের নাম ধরে বার বার জয়ধ্বনি হতে লাগল।

যথা সময়ে অকুতোভয় বার্বিকেন, আর্দা আর নিকল কামানটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাদের পিছন পিছন সেখানে হাজির হলেন, ইউরোপে সবগুলো মানমন্দিরের প্রতিনিধি এবং গান-ক্লাবের সদস্যরাও এলেন।

ঘড়ির কাঁটা টিক টিক করে এগিয়ে চলল। রাত্রি দশটা ছেচল্লিশ মিনিট চল্লিশ সেকেন্ড। নির্দেশ অনুযায়ী মার্চিসন বৈদ্যুতিক ব্যাটারির বোতাম টিপে দিল।

সে কী প্রলয়ঙ্কর পরিহিতি! লক্ষ লক্ষ বজ্র যেন এক সঙ্গে গর্জে উঠল। সুপ্ত কোনো আগ্নেয়গিরি আকমকা লাভা উদ্গিরন শুরু করলেও বুঝি এমন বিকট আওয়াজ সৃষ্টি হয় না। আর অত্যাঙ্কল আভনের হক্কা লাফিয়ে যেন আকাশ পর্যন্ত উঠে গেল। ফ্লোরিডার আকাশে যেন নতুন এক সূর্য আচমকা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। দশটা ছেচল্লিশ মিনিটে মাত্র কয়েকজন শক্তিশালী দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখতে পেল বিশালায়তন প্রোজেকটাইলটা আভন আর ধোঁয়ার জাল ভেদ করে দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে।

সমুদ্রের বুকে ভাসমান বেশ কিছু সংখ্যক জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের লগবুকের পাতায় লিখেলেন, “আকাশের গায়ে অতিক্রম একটা উল্কাপিণ্ড দেখা গেছে।”

কামানের আকস্মিক গর্জনে সমগ্র ফ্লোরিডা শহর খরখরিয়ে কেঁপে উঠল। কিছু লোক তো তাল সামলাতে না পেরে ছিটকেই পড়ল। ব্যাস, এবার শুরু হয়ে গেল ছুটোপাটা। ছুটোছুটি করে পালাতে গিয়ে কতলোক যে পায়ের তলায় পড়ে আহত হল তার ইয়ত্তা নেই। কত লোক তো মারাই পড়ল। প্রায় তিনলক্ষ লোক প্রচণ্ড শঙ্ক সহ্য করতে না পেরে কালা হয়ে পড়ল। আর মোহাচ্ছন্ন হয়ে রইল বেশ কিছু লোক।

প্রোজেকটাইলটার চৌঠা ডিসেম্বর চাঁদে পৌঁছাবার কথা। ততদিন হাত-পা গুটিয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকা ছাড়া গতায়ত নেই। প্রবল বেগে ধেয়ে যাওয়া গোলাটাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে পাওয়ার কথা ভাবাই যে নিছক পাগলামি।

চৌঠা ডিসেম্বর থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত আকাশ মেঘলা হয়েই রইল। সাত তারিখে আকাশের গোমড়া ভাব একটু কাটল। নয় তারিখে সূর্যকে আবছা দেখা গেল। ব্যাস, আবারও মেঘের দাপট শুরু হয়ে গেল। দশ তারিখেও আকাশের অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। এগারো তারিখে যেন আচমকা এক বাড়ের দাপটে মেঘ উড়ে গিয়ে আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠল। এবার চল্লিশ প্রোজেকটাইল লঙস পিকের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ল। খবরটা টেলিগ্রাম মারফত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। লঙস পিক থেকে কেমব্রিজ মানমন্দিরের অধিকর্তার কাছে টেলিগ্রাম এল। বারোই ডিসেম্বর টেলিগ্রামটা করা হয়েছে। মানমন্দিরের কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে লেখা: তার বক্তব্য মোটামুটি এরকম—মি. ম্যাসটন এবং মি. বেলফাস্ট আজ রাত্রি আটটা সাতচল্লিশে স্টোনসহিলের কোলারিয়াড থেকে নিক্ষিপ্ত প্রোজেকটাইলটাকে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেনি। চাঁদের দিকে চলে গেছে। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণের আওতায়ই রয়ে গেছে। ভিষাকৃতি কক্ষপথে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অভিযাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন।

তবে এতে দুটো ব্যাপার ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে (ক) প্রোজেকটাইল চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের বুকে নেমে যাবে। অভিযাত্রীরা সাফল্য লাভ করবেন। নইলে (খ) অনাদি অনন্ত কাল ধরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতেই থাকবে। টেলিগ্রামটা করেছে জে. বেলফাস্ট।

অভিযাত্রীদের চিন্তায় সারা পৃথিবী অস্থির হয়ে পড়ল। খাদ্যবস্তু, জল আর যে পরিমাণ বাতাস তাদের সঙ্গে রয়েছে তাতে দুমাস চলে যাবে। তারপর তাদের কি গতি হবে?

সবাই নানারকম ভাবনা চিন্তায় ডুবে থাকলেও ম্যাসটন কিন্তু নির্বিকার ভাবেই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটাকে চোখে লাগিয়ে তিন বন্দুকে বহনকারী প্রোজেকটাইলকে চোখে চোখে রাখতে রাগল। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তারা বিজ্ঞান, চারুবিদ্যা আর প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বিপদকে অগ্রাহ্য করে একদিন না একদিন সাফল্যলাভ করবেনই।

রাউন্ড দ্য মুন

দশটা। মাইকেল আর্দা, নিকল ও ক্যাপ্টেন বার্বিকেন পৃথিবীর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁদের বৃকে কুকুরজাতটার প্রচার করার উদ্দেশ্যে প্রোজেকটাইলের মধ্যে আগেভাগেই কুকুর দুটোকে রাখা হয়েছে।

লোহার বিশালায়তন পাইপটার মুখের কাছে তিনজন গিয়ে দাঁড়ালেন। এবার কপিকলের সাহায্যে তাঁদেরকে পাইপটার গোলাকার মুখটা দিয়ে ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হল। পাইপের ভেতর থেকে দূরবর্তী বৃত্তাকার আকাশটাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। নিকল পাইপের প্রবেশ পথটা ধাতুর পাত দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। ব্যস, তিনজন অভিযাত্রী ধাতব-কারাগারে কয়েদ হয়ে গেলেন।

অকুতোভয় মাইকেল আর্দা কামরাটাকে গোছগাছ করতে গিয়ে জুতোর শুকতলায় দেশলাইয়ের কাঠি ঘষে কোল গ্যাসের বাতিটা জ্বালালেন। উচ্চাচাপে রক্ষিত এ-গ্যাস এক শ' চুয়াল্লিশ ঘণ্টা আলো দান করতে পারে। আর সে সঙ্গে প্রোজেকটাইলটাকেও গরম রাখা সম্ভব হবে।

যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র আর বাসনপত্র সবই প্যাড দিয়ে আটকে দেওয়া আছে। বলা তো যায় না যাত্রার শুরুতে প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাতে না পেরে স্থানচ্যুত হয়ে লগ্ভও হয়ে যেতে পারে। গ্যাসবাতির আলোয় সবকিছু খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে তিনি যারপরনাই খুশি হলেন, কিছুই স্থানচ্যুত হয় নি।

এদিকে বার্বিকেন এবং নিকল যাত্রারস্ত্রের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়ার কাজে মেতে রইলেন। মুহূর্তকাল পরে বার্বিকেন ইঞ্জিনিয়ার মার্টিনসন-এর ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে রাখা নিকলের এনোমিটার ঘড়িটা হাতে তুলে দেখে নিয়ে বললেন, 'দশটা কুড়ি। মার্টিনসন দশটা সাতচল্লিশে বৈদ্যুতিক স্পার্কের মাধ্যমে কলম্বিয়াডের বারুদে অগ্নি সংযোগ করবেন। অর্থাৎ পৃথিবীর মাটির সঙ্গে প্রোজেকটাইল-এর সম্পর্ক ছিন্ন করতে আর মাত্র সাত মিনিট বাকি রয়েছে।

নিকল বললেন, 'ছাব্বিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড'।

উল্লসিত হয়ে আর্দা বললেন, 'ছাব্বিশ মিনিট! ছাব্বিশ মিনিট সময় কিন্তু কম নয়! ছাব্বিশটা বছরে যা করা সম্ভব নয়, ছাব্বিশ মিনিটে তা মিটিয়ে নেওয়া যায়।' এনোমিটারটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই তিনি এবার বললেন, 'আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে।'

দশটা সাতচল্লিশ মিনিটে ক্যাপ্টেন অন্যান্যদের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

ইতিমধ্যেই নিকল ও মাইকেল আর্দা কেন্দ্রস্থলে রাখা আরাম কেদারায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়েছেন। বার্বিকেন তাড়াতাড়ি গ্যাসবাতিটা নিভিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'মাত্র বিশ সেকেন্ড আর বাকি, কথাটা বলেই তিনিও সহযাত্রী দুজনের পাশে শুয়ে পড়লেন।

মুহূর্তের মধ্যে হঠাৎ ভয়ানক একটা ধাক্কা সবাই অনুভব করলেন। প্রোজেকটাইলটা ১,০০০,০০০,০০০ লিটার পোড়া-বারুদের গ্যাসের ভীষণ এক ধাক্কায় মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হল। প্রচণ্ড ধাক্কাটার পর কী ঘটল? অভিযাত্রীরা কি প্রচণ্ড ধাক্কায় সেকেতে বারো হাজার গজ শূন্যে উঠে আসার চাপ সামলাতে পেরেছে? পৃথিবীবাসীদের মাথা থেকে অভিযানের উদ্দেশ্যটা ধুয়ে মুছে গেছে। এসব প্রশ্নের মীমাংসা করতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

জমাটবঁধা অন্ধকারে দৃষ্টি বাধা পড়ে যায়। কিছুই নজরে পড়ছে না। হ্যাঁ, শব্দুর মতো অগ্রভাগ ছুঁচলো পাইপটা ভয়ঙ্কর ধাক্কাটাকে সহ্য করে নিয়েছে। ভাঙা বা টোল খাওয়া তো দূরের ব্যাপার সামান্যতম চিরও খায় নি। অনেকেই যে আশঙ্কা করেছিলেন—খুবই তীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান ফলেও প্রোজেকটাইলটা গরম হয়ে লাল হয়ে পড়েনি, ফেটে গিয়ে অ্যালুমিনিয়াম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে উড়ে যায় নি। তেমন কোনো দক্ষযজ্ঞও বাঁধে নি। কয়েকটা জিনিস আছাড় খেয়ে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল—ব্যস। মোদা কথা, প্রোজেকটাইলটার কোনোই অনিষ্ট হয় নি। কাঠামোটা পর্যন্ত অক্ষতই আছে।

পার্টিনসনটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় আর জলনল দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ফলে গোলার একেবারে তলদেশে কাঠের চাকতিটা লেগে গিয়েছে। নিশ্চল-নিথর তিনটে দেহ তার ওপর এলিয়ে পড়ে। মনে হচ্ছে কারো দেহেই বুঝি প্রাণের চিহ্নমাত্রও নেই। আর্দা, বার্বিকেন আর নিকলের শ্বাসক্রিয়া চলছে তো? নাকি প্রোজেকটাইলটা উড্ডীয়মান কক্ষিণে পরিণত হয়ে তিনটে লাশ বয়ে নিয়ে উদ্ভাস্তের মতো ছুটে চলেছে। যাত্রা শুক্র মিনিট কয়েক পরে একটা দেহ একটু নড়ে উঠল হাত নাড়াচাড়া করল। মাথা উঁচু করল। হাঁটুতে ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে বসল উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন ফরাসি বৈজ্ঞানিক আর্দা। পারলেন না। মাথা কিম্বিকিম করছে, সর্বাস্ টলছে। শরীরের সবটুকু রক্ত যেন নিঃশেষে মাথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

দুর্বল হাতে কপাল মুহুতে মুহুতে তিনি ডাক দিলেন—'নিকল! বার্বিকেন!' না, কোনো সাড়াই পেলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলেও তো মনে করতে পারতেন, দুজনের একজনের দেহে অন্তত প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে। মাইকেল আর্দা এবারও গলাছেড়ে ডাকলেন। না, এবারও কোনোই সাড়া পেলেন না।

আর্দা এবার একটু একটু করে জীবনীশক্তি ফিরে পেতে লাগলেন। মাতালের মতো টলতে টলতে হাঁটার ওপর ভর দিয়ে কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালেন। রক্তের গতি ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। কোটের পকেট থেকে দেশলাই বের করে গ্যাসবাতি জ্বাললেন। চারদিকে অনুসন্ধিৎসু নজরে তাকিয়ে দেখতে পেলেন, বার্নারে মোটেই আঘাত লাগে নি। গ্যাসজারটাও অক্ষতই রয়েছে। নইলে গ্যাসের গন্ধে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে উঠত। আর দেশলাই জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে ঘরভর্তি গ্যাস হঠাৎ করে জ্বলে উঠে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়ত।

গ্যাসের আলোয় আর্দা মেঝেতে এলিয়ে পড়ে-থাকা সহযাত্রী দুজনের কাছে এসে বসলেন। লক্ষ্য করলেন, বার্বিকেনের নিশ্চল-নিথর দেহের ওপর নিকল মড়ার মতো পড়ে। উভয়েই অচৈতন্য, সামান্যতম হাঁসও নেই।

আর্দা সহযাত্রীদের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হলেন। নানাভাবে সেবা শুশ্রূষার মাধ্যমে প্রথম নিকলের এবং তারপর প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকিয়েই প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন নিকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা ছুটে চলেছি তো?'

প্রজেকটাইলটার কথা এতক্ষণ কারো স্মরণই ছিল না। নিকল বার-কয়েক এদিক-ওদিক নজর ফিরিয়ে বলে উঠলেন, 'তাও তো বটে! আমরা কি উঠছি, নাকি ফ্লোরিডার মাটিতেই এখনো পড়ে রয়েছি?'

তার মুখের কথাটা শেষ হতে না হতেই আর্দা বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! আমরা মেক্সিকো উপসাগরের জলে তলিয়ে যাই নি তো! কিছুই তো মালুম হচ্ছে না!'

প্রেসিডেন্ট সবিস্ময়ে বলছেন, 'আপনাদের মুখে তো রীতিমতো আজব কথা শুনছি সাহেব!'

কথাটাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। সামান্য উঠেই প্রজেকটাইলটা আছাড় খেয়ে হুড়মুড়িয়ে সমুদ্রে পড়ে যেতে পারে, ভূমিতে ফিরে আসাও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। আবার সত্য সত্যই মহাশূন্য বরাবর ছুটে যেতে পারে। কোনোটা ঠিক কথা?'

হঠাৎ তাপমাত্রা খুবই বেশি অনুভূত হওয়ায় বার্বিকেন চমকে উঠে থার্মোমিটারের দিকে চোখ ফেরাতেই লক্ষ্য করলেন—পারদন্ত্ত আশি ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠে গেছে। এবার তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা সত্যি ছুটে চলেছি। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে প্রোজেকটাইলের বাইরের দিকটা খুবই উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে। তার কিছুটা উত্তাপ ভেতরেও ঢুকে পড়েছে। তবে এখনই তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে নিদারুণ ঠাণ্ডা শুরু হয়ে যাবে।'

মাইকেল আর্দা অত্যুগ্র আগ্রহাঙ্কিত হয়ে বলে উঠলেন, 'তবে কি আমরা বায়ুমণ্ডলের এলাকা অতিক্রম করে এসেছি?'

'অবশ্যই। এখন বাজে দশটা পঞ্চান্ন। প্রোজেকটাইল আট মিনিট ধরে একনাগাড়ে ছুটে চলেছে। বাতাসের ঘর্ষণ জনিত বাধা না থাকলে দুমিনিটের মধ্যেই অনায়াসে চল্লিশ মাইল পুরু বায়ুমণ্ডলের স্তর অতিক্রম করে ফেলা যেত।'

নিকল জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাতাসের ঘর্ষণের ফলে গতিবেগ কতখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে বলে মনে করছেন?'

'এক তৃতীয়াংশ। প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ গতিবেগে যাত্রারত করে থাকলে প্রোজেকটাইলটা অবশেষে সেকেন্ডে নয় হাজার এক শ' পর্য্যবসি গজ গতিবেগ পাবে।'

আর্দা এবার সোলাসে বলে উঠলেন, 'তবে হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে বন্ধু নিকল আরো দু-দুটো বাজি হারলেন। তাদের একটা, কামানটা ফেটে না যাওয়ার জন্য চার হাজার ডলার আর দ্বিতীয়টা ছয় মাইলেরও বেশি উর্ধ্বাকাশে উঠে যাওয়ার জন্য পাঁচ হাজার ডলার হারলেন।'

'আমি বাজি হারতে পারি, অসম্ভব কিছু নয়, তবে এখন কিন্তু আর একটা সমস্যার উদয় হয়েছে যে। এমনও হতে পারে গান-কটনে আদৌ আগুনই নেই নি, আমরা যাত্রারতই করে উঠতে পারিনি।'

বিস্ময়-বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আর্দা বলে উঠলেন, 'এ কী বলছেন ক্যাপ্টেন! আমার মতোই আপনিও যে বকবকানি জুড়ে দিলেন? যাত্রারতই যদি না করে থাকি তবে বার্বিকেনের কাঁধে রক্তের ছোপ কোথেকে এল, বলুন দেখি?'

কণ্ঠস্বর অস্থিরতা প্রকাশ করে নিকল এবার বললেন, 'কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটল, আমরা ছুটতে লাগলাম। ভালো কথা—কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজ কেউ শুনতে পেয়েছেন কি?'

বার্বিকেন ভুরু কঁচকে বললেন, 'অতি অত্যাস্চর্য অবিস্বাস্য কাণ্ড তো? বিস্ফোরণে আওয়াজ তো কানে আসল না! এমনটা হবার কারণ কি?' কথা বলতে তিনি এবার ক্রু ডিলা করে একটা জানালার প্যান্টে টেনে সরিয়ে ফেললেন। নজরে পড়ল পোর্ট হালের মতো ফ্রেমের গায়ে সাঁটা লেস ধরনের একটা কাঁচ। বিপরীত দিকের দেওয়ালের গায়ে দ্বিতীয় জানালাটা অটকালে। আর গম্বুজাকৃতি ছাদে লাগিয়ে দেওয়া আছে তৃতীয়টা। চতুর্থটা রয়েছে মেঝেতে। চারদিকে জানালা দিয়েই মহাকাশ নিরীক্ষণ করা সম্ভব, পৃথিবী, আর চাঁদও।

'অভিযাত্রীরা খোলা-জানালার ধারে দৌড়ে গেলেন। কিন্তু নিশ্চিন্দ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তাদের নজরে পড়ল না। এক ছিটা তালোও না।

মহাশূন্য। অন্ধকারের অর্থই হচ্ছে মহাশূন্য। পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থান করলে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত পৃথিবীটাকে নজরে পড়ত। এমন জমাটবাধা অন্ধকারের অর্থ তাঁরা বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে এসেছেন।

ক্যাপ্টেন নিকল এবার নয় হাজার ডলারের খলে বের করে প্রেসিডেন্ট-এর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'আমি হেরে গেছি।'

বার্বিকেন প্রান্তি স্বীকার করে রসিদ লিখে দিলেন। মহাশূন্যে দুই আমেরিকানের কাণ্ডকারখানা দেখে ফরাসি আর্দা তো থ বনে গেলেন।

চাঁদ দেখার অত্যুগ্র আগ্রহ নিয়ে অন্য একটা জানালার ঢাকনা সরাতে গিয়ে বার্বিকেন অতিশয় একটা চাকতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার অত্যুজ্জ্বল দিকটা পৃথিবীর দিকে ফেরানো রয়েছে। ব্যাপারটা এমন যে, একটা শিশু-চাঁদ তাঁর জননী-চাঁদের কিরণকে নিজের বুকে প্রতিফলিত করছে বলেই এমনটা দেখাচ্ছে। পৃথিবীর চারদিকে স্বীয় কক্ষপথে পরিক্রমণ করতে করতে উড়ন্ত চাকতিটা যেন দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। প্রোজেকটাইল তার কক্ষপথ ধরেই এগোচ্ছে। অতএব শেষপর্যন্ত সংঘর্ষ বাধবেই।

মাইকেল আর্দা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, 'ব্যাপার কি? ওটা কি অন্য আর একটা প্রোজেকটাইল?'

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন নির্বাক। তাঁর চোখে-মুখে দৃষ্টিভ্রমের ছাপ ফুটে উঠল। প্রোজেকটাইল ওই উড়ন্ত চাকতিটার গায়ে ধাক্কা মারলে তাঁদের অভিযানের শখ জন্মের মতো ঘুচে যাবে। আর তা যদি না-ও হয় চাকতিটার আকর্ষণে এটা তার চারদিকে ভৌঁ ভৌঁ করে চক্র মারতে লেগে যাবে। নতুবা এটা আবার ভূ-পৃষ্ঠে আছাড় খেয়ে পড়বে।

পাগল! এই বুঝি উড়ন্ত চাকতিটার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধল। কোনো উপায়ই নেই শুনে আর্দা ফ্যাকাসে মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'মৃত্যুর নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা ভেবে মুষড়ে পড়ে লাভই বা কি? আমরা তো বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য জান খোয়াতে বসেছি। তাই তো বিষাদ নয়, আমাদের উচিত প্রাণ খুলে আনন্দ করা।' এ-কথা মুখে বললেও তিনি যে মৃত্যুর দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে যেতে ভেতরে ভেতরে খুশি হয়েছেন অন্য দুজনের কাছে তা মোটেই মনে হল না।

বরাভের জোর আছে। সংঘর্ষ বাঁধতে গিয়েও বাঁধল না। অতিকায় গ্রহাণুটা নিশ্চিন্দ অন্ধকারে তলিয়ে গেল।

আর্দা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বার্বিকেন বললেন, 'এটা একটা উদ্ধা। পৃথিবীর আকর্ষণে এটা তার উপগ্রহে পরিণত হয়ে পড়েছে।'

'এ কী অদ্ভুত কথা! এটা কি করে সম্ভব? তবে কি নেপচুনের মতো পৃথিবীর দুটো চাঁদ আছে?'

'অবশ্যই। দুটো চাঁদই বটে। পৃথিবীর চাঁদের সংখ্যা মাত্র একটা মনে করা হলেও দ্বিতীয় চাঁদটা এত ছোট আর গতিবেগ এতই প্রবল যে, সেটা পৃথিবীর মানুষের নজরেই আসে না। এম. পোটটি নামে এক ফরাসি মহাকাশ-বিজ্ঞানী দ্বিতীয় চাঁদটা আবিষ্কার করেন। ছোট চাঁদটা পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে মাত্র তিন ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে-বহু হিসাব নিকাশ করে তিনি সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছিলেন। অতএব ভেবে দেখুন, ছোট চাঁদটা কী প্রবল বেগে চক্রের মেরে চলেছে! তবে দ্বিতীয় চাঁদের অস্তিত্বের কথা সব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নেন নি। তবে আমাদের মতো চাক্ষুষ করলে স্বীকার করতেন।' মুহূর্তকাল পরে আবার বললেন, 'ছোট চাঁদটা কিন্তু আমাদের হিত সাধনই করেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমরা এখন কত ওপরে রয়েছি, জানতে পারছি। আসলে ছোট চাঁদটার দূরত্ব আমাদের জানা থাকায় এটা সম্ভব হচ্ছে। আমরা যখন সেটার মুখোমুখি হয়ে গিয়েছিলাম তখন ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আমাদের দূরত্ব ছিল চার হাজার ছয় শ' পঞ্চাশ মাইল।'

ক্যাপ্টেন নিকল ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'আমরা আমেরিকার মাটি ছেড়ে এসেছি তেরো মিনিট আগে। প্রতি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ ব্যবধান হ্রাস না পেলে তবে প্রতি ঘণ্টায় কুড়ি হাজার মাইল বেগে ধেয়ে যাওয়া যেত।'

বার্বিকেন চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার ছাপ ঝাঁকে বললেন, 'সে না হয় হল। কিন্তু আসল সমস্যা কামানের গর্জনটা কেন আমরা শুনতে পাই নি?'

ক্যাপ্টেন নিকল গ্যাসবাতিটা নিভিয়ে দিল। অকারণে গ্যাস পোড়াতে সে রাজি নয়। এবার আর একটা জানালার পান্না খুলে দিতেই চাঁদের আলোয় ভেতরটা ঝলমলিয়ে উঠল। বায়ুস্তরে আলোর প্রতিসরণ ঘটে না। প্রতিফলন নেই বলেই ঝকঝকে রূপের মতো চাঁদের কিরণ অপূর্ব সৌন্দর্যরাশি নিয়ে তাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়েছে। এটা চাঁদ তো নয়, যেন প্রাচীনামের থালা। কিন্তু হায়! পৃথিবী? পৃথিবী কোথায় গেল? এ যে অতি ক্ষুদ্র এক রূপোলি গ্রহ।

বার্বিকেন বললেন, 'ওইটাই হচ্ছে পৃথিবী।' এবার ব্যাপারটা খোলাসা করে বুঝিয়ে দিলেন। চারদিন বাদে তাঁরা চাঁদে হাজির হবেন। পৃথিবী তখন ছোট আকৃতি নিয়ে দেখা দেবে। তারপর কিছুদিন জমাট বাঁধা অন্ধকারে ঢাকা থাকবে।

বিশ্ময় মাখানো নীরব চাহনি মেলে অভিযাত্রীরা পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু রূপ চাক্ষুষ করতে লাগলেন। ঠিক তখনই গাড় অন্ধকার ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে উদ্ধা পড়তে লাগল পৃথিবীর ওপর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাকি হিনাব নিকাশ করে জানতে পেরেছেন, ডিসেম্বর মাসে ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার উদ্ধা পৃথিবীর আকাশে খসে পড়ে।

দীর্ঘসময় ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকায় অভিযাত্রী তিনজনের চোখেই ক্রান্তি আর অবসাদ ভর করল। তাই ক্রান্তি অপনোদনের জন্য তাঁরা পাশাপাশি গুয়ে পড়লেন। ব্যস, মুহূর্তে গভীর ঘুমে ডুবে গেলেন।

একসময় বার্বিকেন দুই বন্ধুকে ডাকাডাকি করে তুলে সোপাসে বলে উঠলেন, 'পেয়েছি! পেয়েছি!'

যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে উঠে আর্দা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি? কি পেয়েছেন?'

'কামানের আওয়াজ না শোনার কারণ খুঁজে পেয়েছি। প্রোজেকটাইল শব্দের চেয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে বলেই এমনটা হয়েছে।'

যুক্তিটা অদ্ভুত হলেও সত্যি। তিন বন্ধু আবার ঘুমের ঘোরে আশ্চর্য হয়ে পড়লেন।

সকাল সাড়টার কাছাকাছি গোলাটার ভেতরে অভাবনীয় শব্দটা না হলে তাঁরা যে কতক্ষণ ঘুমাতে, পরিণামে কী যে ঘটত বলা মুশকিল।

সেদিনটা ছিল দোসরা ডিসেম্বর। যাত্রা শুরু আট ঘণ্টা পরের ব্যাপার। অভাবনীয় শব্দটা কুকুরের কণ্ঠস্বর।

বার্বিকেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেল কুকুরগুলো?'

এখানে-ওখানে ঘোঁষাখুঁজির পর সোফার তলায় একটা কুকুরের হদিস মিলল। কামানের ধাক্কায় ফলে আতঙ্কে এককোণে ঘাপটি মেরে পড়েছিল। এখন ঝিদেতে কাতর হয়ে হাঁকডাক জুড়ে দিয়েছে। অনেক ডাকাডাকির পর যখন সেটা বেরিয়ে এল দেখা গেল সে কুস্তি, ডায়না তার নাম। বার্বিকেন বললেন, 'ইভ-এর হদিস তো মিলল। কিন্তু আদম গেল কোথায়?'

না, অনেক ডাকাডাকি করেও স্যাটেলাইট-এর হদিস মিলল না। কোথায় গেল? শুরু হল জোর তল্লাশি। শেষপর্যন্ত প্রোজেকটাইলের মাচার ওপরে তার দর্শন পাওয়া গেল। ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি সামলাতে না পেরে সে ছিটকে পড়ে চোট পেয়েছে। অবস্থা সঙ্গীন। মারাত্মক অবস্থা। ধরাধরি করে তাকে নামিয়ে এনে একটা গদির ওপর শুইয়ে দেওয়ার পর মৃত্যু পথযাত্রী বেচারী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অভিযাত্রীরা আবার পৃথিবী ও চাঁদ পর্যবেক্ষণে ডুবে গেলেন। পৃথিবীটাকে যেন মেঘঢাকা একটা গোলাকার চাকতির মতো মনে হচ্ছে। আর চাঁদ? চাঁদটা এখন আরো বড় আকার ধারণ করছে।

মাইকেল আশ্চর্যের সুরে বললেন, 'সূর্যের বিপরীত দিকে যখন পৃথিবীটা পৌছতে তখন যাত্রা করলেই বরং ভালো

হত। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলটা চাক্ষুষ করতে পারতাম, যা আজ পর্যন্ত কারোর পক্ষেই দেখা সম্ভব হয় নি।' অভিযাত্রীরা রীতিমতো মস্করা শুরু করে দিলেন। তবে সবই নিজ নিজ বিজ্ঞান সম্মত মতামত। কথা বলতে বলতে তাঁরা প্রান্তরায় সাহসে লাগলেন।

এরই মধ্যে প্রোজেকটাইল পৃথিবীর ছায়ার গভীর বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তাই তো অভিযাত্রীদের পক্ষে এখন সূর্যকে দেখা সম্ভব হল।

প্রোজেকটাইল এবার ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল। মাথার ওপরে চাঁদ আর নিচে সূর্য। গোলাটা যেন অগ্নিকুণ্ডের ভেতরে দিয়ে ধেয়ে চলল। মাইকেল আর্দী গভীর মুখে বলে উঠলেন, 'উত্তাপ বেড়েই চললে প্রোজেকটাইলের ওপরের আবরণটা আবার গলে না যায়।'

তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে বার্বিকেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে আসার সময় প্রোজেকটাইল অবশ্যই জ্বলন্ত উষ্ণায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গ্লোরিডার মানুষরা অন্তত সেরকমই দেখতে পেয়েছিল। তাতেও যখন এর কিছুই হয় নি তখন আর আতঙ্কের কোনো কারণই নেই মি. আর্দী।'

কথাটা বলেই বার্বিকেন কামরাটিকে গোছ গোছ করার কাজে ডুবে গেলেন। তার ব্যাপার-সাপার দেখে মনে হল, জীবনের বাকি দিনগুলো তিনি এখানেই কাটিয়ে দেবেন।

দেখা গেল, কামান দাগার ফলে খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় জল কোনোটাও নষ্ট হয় নি। সেগুলো দিয়ে অনায়াসে দু-মাস চালিয়ে নেওয়া যাবে। আর, দু-মাস পটাসিয়াম ক্রোরেট দিয়ে অক্সিজেনও তৈরি করে নেওয়া সম্ভব হবে। বারো ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই গোলায় ভেতরে বিষাক্ত কার্বনিক গ্যাস জমে গেছে। এটা বাতাসের চেয়েও গুঞ্জে ভারি। ফলে মেঝেতে জমে থেকে সবার ভয়ানক শ্বাসকষ্টের উদ্বেগ ঘটল। পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেই নিকল পটাসিয়াম ক্রোরেটের পাত্রটার মুখ খুলে মেঝের ওপর ধরলেন। ক্রোরেট মুহূর্তের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে বাতাস পরিষ্কার করে দিল।

দেখা গেল একটা থার্মোমিটার ছাড়া আর কোনো যন্ত্রপাতি ভাঙে নি।

গোলায় বাইরের দৃশ্যের এতটুকুও পরিবর্তন হয় নি। আকাশের সর্বত্র তারার ঝকঝকানি। একদিকে রূপালী চাঁদ আর অন্যদিকে অত্যাশ্চর্য সূর্য বিরাজ করছে। আর সুবিশালায়তন বৃত্তাকার পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে। আর নীহারিকামণ্ডল তারার মতো এখানে ওখানে মিটমিট করছে, ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য নক্ষত্র ছায়াপথ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন অদ্ভুতপূর্ণ দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বারো ঘণ্টার হিসাবেই একটা দিন অভিযাত্রীরা হয়ে গেল। অভিযাত্রীদের সারাটা দিন নির্বিঘ্নেই কাটল। প্রোজেকটাইল প্রবল গতিতে ছুটতে থাকল। আর তার গতিবেগ ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল।

প্রোজেকটাইলের ভেতরে অবস্থানরত অভিযাত্রীদের এখন মনে হতে লাগল ধাতব কামরাটা বৃষ্টি মহাশূন্যে নিশ্চল নিখরভাবে ভেসে রয়েছে।

আসলে তো মোটেই তা নয়। গোলা প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। সে জন্যই তো তাঁদের আকার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তেসরা ডিসেম্বর। মোরগের ডাকে অভিযাত্রীদের ঘুম ভাঙল।

মাইকেল আর্দী যন্ত্রচালিতের মতো উঠে মাচায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উৎকর্ষ হয়ে রইলেন। একটা খোপের ঝাপ বন্ধ করতে গিয়ে ধমক ধামক জুড়ে দিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অন্য দুজন অভিযাত্রীর ঘুম ভেঙে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, এবার বীজগণিত আর সমীকরণ নিয়ে তিনজন তর্কাতর্কি জুড়ে দিলেন। মাইকেল জানতে চাইলেন, বীজগণিতের অঙ্ক করে প্রোজেকটাইলের বর্তমান গতিবেগ বের করা যাবে কিনা। ব্যাস, নিকল অঙ্ক করতে লেগে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে অঙ্ক নিয়ে মেতে থেকে এক সময় মুখ খুললেন, 'বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করার পর মহাকাশের যেখানে পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণ সমান হচ্ছে সেখানে যেতে প্রোজেকটাইলকে সেকেন্ডে বারো হাজার গজ হিসাবে পথ পাড়ি দিতে হবে।'

মাইকেল আর্দী আৎকে উঠে বললেন, 'এ যে কেলেক্সারী কাণ্ড! প্রোজেকটাইলের গতিবেগ যদি ঘর্ষণের ফলে এক তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েই থাকে তবে এর গতিবেগ হওয়ার দরকার ছিল সতেরো হাজার গজ। কেমব্রিজ মানমন্দির কিন্তু বলেছে, বারো হাজার গজ গতিবেগ দিয়েই যাত্রা আরম্ভ করা সম্ভব। আমরা সে-গতিবেগেই তু-পুষ্ঠ থেকে যাত্রা করছি! এখন বুঝতে পারছি তা যথেষ্ট নয়। তাই যদি হয় তবে চাঁদ আর পৃথিবীর আকর্ষণ যেখানে সমান, সেখানে কোনোদিনই আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। এমন কি তার অর্ধেক পথও যেতে পারব না।'

ফ্যাকাসে মুখে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন উচ্চারণ করলেন, 'তবে? আমরা কি তবে পৃথিবীর বুকেই আছাড় খেয়ে পড়ব?'

অভিযাত্রীরা মুখে পড়ার জোগাড় হলেন।

অকস্মাৎ ক্যান্টেনের মাথায় একটা ব্যাপার খেলে গেল। তিনি বললেন, 'ঘড়িতে এখন সকাল সাতটা বাজে। আমরা ইতিমধ্যেই দুই তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দিয়ে ফেলেছি। কই, মনে তো হচ্ছে না আমরা পৃথিবীর দিকে নেমে যাচ্ছি। কথাটা বলেই তিনি কাঁটাকম্পাসটা হাতে তুলে নিলেন। হিসাব কষতে গিয়ে তাঁর গা দিয়ে দড়দড় করে ঘাম ঝরতে লাগল।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এক সময় সোলাসে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! শুভ সংবাদ! আমরা পৃথিবীর দিকে নামছি না, এগিয়েই চলেছি। পৃথিবী ছেড়ে পঞ্চাশ হাজার লিগ উঠে এসেছি। আমাদের গোলাটার গতিবেগ যদি সেকেন্ডে বারো হাজার গজ হত তবে আমাদের নিকট নিখরভাবে দাঁড়িয়ে থাকত হত। আমরা সে স্থান অতিক্রম করে এসেছি।'

'অতএব মনে করা যাচ্ছে, চার লক্ষ পাউন্ড গান-কটনের শক্তি যে গতিবেগ সৃষ্টি করেছে তা সেকেন্ডে বারো হাজার

গজের চেয়ে চেড় বেশি ছিল। তাই তো কামান দাগার মাত্র তেরো মিনিট বাদে উঠে এসে দ্বিতীয় উপগ্রহটাকে দেখতে পেয়েছিলেন।' নিকল বললেন।

'এরও কারণ রয়েছে। পার্টিসন ভেঙে জল বেরিয়ে গেলে প্রোজেকটাইল হান্কা হয়ে যায়। সেজন্যই এমন তীব্র বেগে আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল।' বার্বিকেন বললেন, 'বাস্তবিকই আশার সম্ভার ঘটল।'

আহারাদি সেরে অভিযাত্রীরা দাবা, তাস আর ডেমিনোরের মধ্যে কিছু একটা খেলার কথা ভাবতে লাগলেন। আঁদার ইচ্ছা, চাঁদের বাসিন্দাদের এসব খেলাখুলা শিখিয়ে দেবেন। খেলার যাবতীয় সরঞ্জাম পৃথিবী থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

বার্বিকেন হেসে বললেন, 'বন্ধু, চাঁদে যদি সত্যি সত্যি জীবের অস্তিত্ব থাকে তবে তারা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির বহু আগে থেকেই সেখানে রাজত্ব করছে। অতএব আমাদের কাছ থেকে তাদের কিছুই শেখার নেই। আমাদের বরং তাদের কাছ থেকে অনেক কিছুই শেখার রয়েছে।'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আমাদের র‍্যাফেল ও মাইকেল এঞ্জেলোর মতো চিত্রশিল্পী আর মিলটন, হোমার, হুগো, ম্যাসারটিন ও ভার্জিলের মতো কবিও তাদের আছে কি? কান্ট, প্রেটো ও অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিক? আর নিউটন, ইউক্লিড, আর্কিমিডিস ও প্যাসকলের মতো বৈজ্ঞানিক তাদের আছে কি? শুধু কি এ-ই। অ্যারনল-এর মতো রস-সাহিত্যিক আর নাদার-এর সমতুল্য ফটোগ্রাফার তাদের আছে?'

বার্বিকেন ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'আছে—আছে বন্ধু অবশ্যই আছে।'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'যদি তাই হয় তবে তারা পৃথিবীতে প্রোজেকটাইল কেন পাঠায় নি?'

'পাঠায় নি যে তা-ই বা কি করে বুঝলেন?'

'দুটো দিক থেকে চাঁদ থেকে গোলা পাঠানো সহজ। প্রথমেই বলতে হয় পৃথিবীর চাঁদে পৃথিবীর এক যষ্ঠাংশ আকর্ষণ। আর চাঁদ থেকে গোলা ছুঁড়তে যে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে সে তুলনায় পৃথিবী থেকে তার দশগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছে।' নিকল বললেন।

মাইকেল পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরতে গিয়ে বললেন, 'উত্তম! ইতিমধ্যে চাঁদ থেকে কেউ পৃথিবীতে না আসার কারণ কি?'

'আসে নি যে সে ব্যাপারে আপনি কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন? পৃথিবীর বুকে মানুষের আবির্ভাবের বহু হাজার বছর আগে পাঠাতেও তো পারে?'

'তাই যদি মনে করি তবে প্রোজেকটাইলটা গেল কোথায়?'

'পৃথিবীর দু-ভাগের পাঁচ ভাগই তো জুড়ে রয়েছে সমুদ্র। চাঁদ থেকে যদি কোনোদিন পৃথিবীতে চন্দ্রযান পাঠানোই হয়ে থাকে তবে তা ভূ-পৃষ্ঠের তরল অবস্থার কোনো গহবরে বা সমুদ্রের বুকে পড়তেও তো পারে।'

'আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি চাঁদের মানুষ আর যা-ই করুক গান-পাউডার অবশ্যই আবিষ্কার করতে পারে নি।

তাদের আলোচনার ফাঁকে কুকুর ডায়না ডাকাডাকি জুড়ে দেওয়ায় প্রসঙ্গ অন্যদিকে মোড় নিল। মাইকেল আঁদা বললেন—চাঁদের বুকে গুরু, মোষ, ঘোড়া নাকি গাধা নিয়ে গেলে বেশি উপকারে আসত? তা নিয়ে এবার তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল।

ঠিক তখনই স্যাটেলাইট-এর করুণ আর্তনাদ শুনে সবাই সচকিত হয়ে উঠলেন। সবাই হুটোপাটা করে গিয়ে দেখেন, স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহের পাশে বসে ডায়না বিলাপ করে চলেছে। স্যাটেলাইট মারা গেছে। এর ফলে চাঁদে কুকুর বংশ প্রতিষ্ঠার আশায় ছেদ পড়ল।

এখন স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহ ফেলা নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। জানালার পান্না খুলে সেটা ফেলতে হলে দুটো ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। জানালা খুলতেই অতিরিক্ত পরিমাণে বাতাস গোলার ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে না যেতে পারে। আবার বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ভেতরে ঢুকে আসার সম্ভাবনাও রয়েছে। সূর্য আছে সত্যি। কিন্তু তার পক্ষে তো আর বায়ুমূল্য মহাশূন্যকে উত্তপ্ত করা সম্ভব নয়। সূর্যের অস্তিত্ব না থাকলে পৃথিবীও জলে বরফে পরিণত হয়ে যেত।

মাইকেল বললেন, 'আঠারো শ' একষষ্ঠিতে সেরকমই কিছু ঘটতে চলেছিল। তখন পৃথিবীকে একটা ধূমকেতুর পৃষ্ঠের ভেতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। পৃথিবী ধূমকেতুর আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেই ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া ছাড়া গতান্তর ছিল না ঠিক কি না?'

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন বললেন, 'মারাত্মক কিছু হত না। কারণ, তখন ঠাণ্ডা আর গরম সমপরিমাণ হয়ে যেত। সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে সূর্যের কাছাকাছি দিয়ে পাড়ি দেওয়ার সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা যেত বেড়ে। গ্রীষ্মের তাপমাত্রার আটশ হাজার গুণ বেড়ে যেত। উত্তাপ সমুদ্রে জলকে বাষ্পে পরিণত করে ওপরে তুলে আনত। জমাটবাধা মেঘের সৃষ্টি হয়ে সূর্যের উত্তাপকে বাধা দিত।'

আর মহাশূন্যের তাপমাত্রা সম্বন্ধে নানা মূর্খির নানা মত। কারো মতে শূন্য তাপমাত্রার ছিয়াত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে এমন মতামতও কেউ ব্যক্ত করেন।

এবার একদিকের জানালা খুলে সঙ্গে সঙ্গে স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহ গলিয়ে দেওয়া হল। পুরো ব্যাপারটা এমন ঝটপট সেরে নেওয়া হল যে, খুব সামান্য বাতাসই বেরিয়ে যেতে পারল।

ডিসেম্বরের চার তারিখ। অভিযাত্রীরা হিসাব নিকাশ করে দেখলেন, তাঁরা ক্রমাগত চ্যুয়ান ঘণ্টা উড়ে চলে সাত দশমাংশ পথ পাড়ি দিয়ে দিয়েছেন। জানালা দিয়ে পৃথিবীকে এখন আর ছোট্ট বা মেঘে ঢাকা ঝাপসা আলোর মতো দেখা যাচ্ছে না। গাড়, ঠিক যেন গাড় অন্ধকারে মোড়া একটা বৃত্তাকার বস্তু।

বার্বিকেন আচমকা অত্যাশ্চর্য একটা প্রশ্ন করলেন, 'প্রোজেকটাই প্রবল বেগে উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ যদি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তবে?'

বার্বিকেন তার প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'জুলে-পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যাব। কারণ, উত্তাপ গতির অন্য আর এক রূপ। জলে উত্তাপ প্রয়োগ করলে, জলের অণু-পরমাণুগুলি গতিশীল হয়ে পড়ে। মোদা ব্যাপার, উত্তাপের অর্থই হচ্ছে পরমাণুর গতিশীলতা। নড়াচড়া-লাফলাফি। ট্রেনের ব্রেকের গায়ে তাই তো তৈলাক্ত পদার্থ মাখিয়ে দেওয়া থাকে। আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়া গতি থেকেই জো উত্তাপের সৃষ্টি। ঠিক তেমনি পৃথিবীটা সম আয়তনের ষোলো হাজার কয়লার পিণ্ড পোড়ালে যে পরিমাণ উত্তাপের উদ্ভব ঘটবে সূর্যের ওপর পৃথিবী গিয়ে পড়লে ঠিক সে পরিমাণ উত্তাপই এতে সৃষ্টি হবে। হ্যাঁ, যে-কোনো গতিকে আচমকা স্তব্ধ করে দেওয়া মাত্রই উত্তাপ সৃষ্টি হবে।

হিসাব নিকাশ করে জানা গেছে, সূর্যের ওপর উদ্ধার পতন ঘটলেও উত্তাপ ঠিকের বেরিয়ে আসে। একটা উক্কাতার সম আয়তনের চার হাজার গুন কয়লা পোড়ানোর উত্তাপ সৃষ্টি করছে, মনে রাখবেন।'

মাইকেল আচমকা প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন, 'চাঁদ যে আসলে একটা বৃহদায়তন ধূমকেতু ছাড়া কিছুই নয়, কথটা বার্বিকেন কি মানেন?'

'হ্যাঁ, এ-কথাও শোনা যায় সত্য। আর্কেডিয়ানরা মনে করে, চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহই পরিণত হওয়ার আগে থেকে তাদের পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে বাস করছে। তখন থেকেই বিশ্বাস করছে চাঁদ একটা ধূমকেতু ছাড়া কিছু নয়। মহাশূন্যে ছোট্টার সময় পৃথিবীর আকর্ষণে আটকা পড়ে গেছে। অবশ্য এর কোনো প্রমাণ মেলে না। প্রত্যেক ধূমকেতু যেমন গ্যাসের আবরণে আবৃত থাকে চাঁদের সেরকম কিছু অনুপস্থিত।'

নিকল বললেন, 'এও তো অসম্ভব নয়, চাঁদ নামধারী ধূমকেতুটা পৃথিবীর আকর্ষণে বাঁধা পড়ার আগে সূর্যের একদম কাছাকাছি স্থান দিয়ে অতিক্রম করে এসেছিল। তখনই গ্যাসের আন্তরণটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'

ঠিক তখনই মাইকেল-এর চিককার চোঁচামেচি কানে আসায় প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ছুটে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখলেন মাত্র গজ কয়েক দূরে চ্যাপ্টা একটা ঝোলার মতো কি যেন একটা জিনিস শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। সেটা যেন প্রোজেকটাইলার মতোই গতিশূন্য—নিশ্চল নিথর। অর্থাৎ জিনিসটা অদ্ভুত গতিবেগে চাঁদের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।

অগ্রসরমান বস্তুটাকে নিয়ে তিনজনের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। এক সময় মাইকেল সেটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলে উঠল, 'ওটা গ্রহাণুপুঞ্জ বা উক্কাতা কোনোটাই নয়। ভাগ্যাহত স্যাটেলাইট-এর মৃতদেহ প্রোজেকটাইলার আকর্ষণে এর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে। তার প্রাণহীন দেহটা চিপসে, দুমড়ে মুচড়ে এরকম আকৃতি ধারণ করেছে। বৃহদাকার কোনো বস্তু ক্ষুদ্রাকার কিছুকে আকর্ষণ করবে মহাশূন্যের এ-নিয়ম অনুযায়ী-ই কুকুরের মৃতদেহটাকে প্রোজেকটাইলার বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া মাত্র তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

ভোর হল। অর্থাৎ পাঁচই নভেম্বরের ভোর। হিসাব যদি মিলে যায় তবে সেদিনই রাত্রি বারোটায় চাঁদে হাজির হওয়ার কথা। জানালার কাঁচ দিয়ে নক্ষত্রে পরিপূর্ণ মহাকাশে শুভ সমুজ্জ্বল চাঁদটাকে ক্রমে বড় হয়ে আসতে দেখা গেল।

বার্বিকেনের মাথায় একটা ব্যাপার ঘুরপাক খেতে লাগল। হিসাব অনুযায়ী প্রোজেকটাইলার চাঁদের একেবারে কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু তা না করে সেটা সামান্য সরে গিয়ে উত্তরদিকে ধেয়ে চলল। গতিপথ পরিবর্তন করেছে। সেটা যদি চাঁদের একেবারে কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে অতিক্রম করে তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত। লক্ষ্যচ্যুত হওয়া মাত্রই তার মহাশূন্যের পথ হারিয়ে ফেলা ছাড়া কোনো গত্যন্তরই থাকবে না। বার্বিকেন কিছুতেই বুঝতে পারলেন না প্রোজেকটাইল কেন গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তবে ব্যাপারটা নিজের মনেই রাখলেন। সঙ্গীদের কাছেও প্রকাশ করলেন না। আর একটু বাঁকলেই চাঁদকে পাশ কাটিয়ে সেটাকে আন্তর্গ্রহে হাজির হতে হবে।

প্রবল ঝড় উঠেছে চাঁদের বুকে। পাহাড় পর্বত, উপত্যকা আর খানানখন্দের জন্য চাঁদকে যে ঝাপসা মানুষের মুখের মতো দেখা যায় এখন তা অনেকটা পঙ্কির হয়ে উঠেছে।

মাইকেল প্রাতরাশের আয়োজনে ব্যস্ত হলেন। এদিকে যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ কাজ করছে কিনা, একবারটি চোখ বুলিয়ে নেওয়া হল। রেনটস আর রেইসেট যন্ত্র, কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরমাণুগুলিকে পটাস ঠিকভাবে শুষে নিচ্ছে।

অভিযাত্রীরা চাঁদের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পেরে আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে যাবার জোগাড় হলেন। তাদের সবারই প্রায় একই বক্তব্য, চাঁদের বুকে অবশ্যই নামছেন। কিন্তু সেখান থেকে আর পৃথিবীতে ফিরে আসবেন না। বার্বিকেনের বক্তব্য—প্রোজেকটাইলটা তো সেখানে থেকে যাচ্ছে, একটা কামান ও গোলা বারুদ তৈরি করে নেবেন। চাঁদের বুকে সোরা, কয়লা অবশ্যই পাওয়া যাবে। অতএব এটা কোনো সমস্যাই নয়। কারণ চাঁদের থেকে আট হাজার লিগ মাত্র ওপরে উঠলেই পৃথিবী তাঁদের আকর্ষণ করে নেবে। তবে চাঁদের আকর্ষণে আসতে পৃথিবী থেকে তার দশগুণ পথ তাঁদের উঠে যেতে হয়েছে।

মাইকেল আচমকা সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'অন্য আর একটা গোলায় চেপে গান-ক্রাবের সদস্যদের নিয়ে ম্যাসটন ফ্লোরিডা থেকে চাঁদে চলে আসবেন।' আবেগে উজ্জ্বাসে অভিভূত হয়ে অভিযাত্রীরা এমন হরেক রকম মন্তব্য করতে লাগলেন কিন্তু কেন এ-উজ্জ্বাস, এমন অশুভীনা উত্তেজনা? তিনজনের কেউ-ই জানেন না কেন তাঁদের মধ্যে এমন অভাবনীয় উত্তেজনা ভর করেছে?

নিকল দুম করে বার্বিকেনকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'চাঁদ থেকে যদি আমরা না-ই ফিরি তবে সেখানে আমরা কি করব, বলুন?'

বার্বিকেন স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'আমি জানি না।'

মাইকেল বললেন, 'কিন্তু আমি জানি। তবে জানলেও আমি বলব না।'

বার্বিকেন সক্রোধে গর্জে উঠলেন, 'বলবেন না বললে রেহাই নেই। বলুন, বলতে হবে আপনাকে। আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমরা এতবড় একটা ঝুঁকি মাথায় নিয়েছি। আর এখন কিনা আপনিই ধানাই-পানাই জুড়ে দিয়েছেন!'

মাইকেল এবার বলে উঠলেন, 'চাঁদের বুকে নতুন একটা কলোনি গড়ে তুলব সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে পৃথিবীর শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটাব।'

কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উচ্চা প্রকাশ করে নিকল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চাঁদের বুকে যদি জীবের অস্তিত্ব না-ই থাকে তবে কাদের পৃথিবীর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলবেন, সুনী?'

বার্বিকেন ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'চুপ করুন তো সাহেব! চাঁদের বুকে মানুষের অস্তিত্ব না-ই বা থাকল। সেখানে আমরাই সভ্যতা বিস্তার করব।'

মাইকেল বললেন, 'আমরা চাঁদের বুকে কংগ্রেস গড়ে তুলব। বার্বিকেনকে প্রেসিডেন্ট করব।'

সবাই সমস্বরে উল্লাস প্রকাশ করলেন। তারপর শুরু করলেন উদ্দাম নৃত্য। পরস্পরের কোমর ধরাধরি করে, হেলদুলে সে কী নাচ! কিছুক্ষণ যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন।

তারা কেন হটাৎ এমন পংগলের মতো আচরণে মেতে উঠলেন, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মাইকেল।

বরাতের জোর আছে। সময় পেরোবার আগেই নিকলের মাথায় ব্যাপারটা এসে গিয়েছিল। তা না হলে কেলঙ্কারী চূড়ান্ত হয়ে যেত। ক্যাপ্টেন বেশ কিছুক্ষণ অচেতন হয়ে পড়ে রইলেন। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি খিদের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলেন। মাত্র কয়েক মিনিট আগেই তো গলা পর্যন্ত ঠেসে প্রাতঃরাশ সেরেছেন। তবে এরই মধ্যে খিদেয় এমন কাতর হয়ে পড়লেন কেন? সে সঙ্গে মাথার স্নায়ুগুলোও দারুণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কারণ কী?

মাইকেলও খুবই ক্লান্ত অবসন্ন। অনন্যোপায় হয়ে তিনি নিজেই ষ্টোভ ধরিয়ে খাবার তৈরি করতে লাগলেন। দেশলাই জ্বেলেই তিনি থমকে গেলেন। তীব্র দ্যুতি নিয়ে কাঠিটা জ্বলে উঠল। গ্যাসের উনুনে যে শিখা উঠছে তাও অত্যুজ্জ্বল দ্যুতিময়। সঙ্গে সঙ্গে নিকল বুঝে গেলেন, কেন তাঁদের মধ্যে এমন আকস্মিক উষ্মতার জোয়ার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। খোঁজ করে দেখলেন, মাইকেল ভুল করে অগ্নিজ্বনের সিলিভারের মুখ পুরোপুরি খুলে দিয়েছিলেন। অগ্নিজ্বনের অভাব আমাদের জীবন যেমন সম্ভটাপন্ন হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি সাহায্যবিরহিত অগ্নিজ্বনও আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

নিকল ব্যস্ত-হাতে সিলিভারের চাবিটা ঘুরিয়ে গ্যাস নির্গমণের পথ বন্ধ করে দিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্বিকেন ও মাইকেল স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন। মাইকেল নিজের কাজের জন্য অনুভূত না হয়ে বরং মুচকি হেসে বললেন, 'মন্দ কি, যাত্রাপথের একঘেষেয়ি থেকে কিশি পরিবর্তন তো এতে এল। আরো যুক্তি আছে, মূর্খ রোগীকে অগ্নিজ্বন প্রয়োগ করে কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও তাকে জীবনের পরিপূর্ণ আশ্বাস দান করা সম্ভব। অগ্নিজ্বনপূর্ণ নাট্যশালায় দর্শকদের প্রাণচাঞ্চল্যের কথা ভাব! যাই! যে জাতির জবিনীশক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে অগ্নিজ্বন প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনায়াসেই চাঙা করে তোলা সম্ভব। কেবলমাত্র অগ্নিজ্বন প্রয়োগের মাধ্যমেই ইউরোপের রাষ্ট্রে হত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

এবার প্রোজেকটাইলের এলোমেলো জিনিস কয়টা গোছগাছ করতে অভিযাত্রীরা নতুন এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন। ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে আসার পর থেকেই প্রোজেকটাইলটার ওজন। ভেতরে জিনিসপত্রের ওজন এমন কি তাদের নিজস্বের ওজনও ক্রমেই হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তবে তুল্যদণ্ডে ওজন হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটা ধরা পড়বে না। কারণ যা দিয়ে ওজন নির্ধারণ করা হবে তার ওজনও তো সে অনুপাতেই হ্রাস পাচ্ছে। তবে একমাত্র শিশু ব্যালেন্সের মাধ্যমেই এ-পরিস্থিতিতে যথাযথ ওজন পাওয়া সম্ভব।

আকর্ষণকে অন্য এক নামে অভিহিত করা হয়—আমরা যাকে ওজন বলে থাকি। কোনো জিনিসের ঘনত্ব বেড়ে গেলে আকর্ষণ বেড়ে যায়। আবার দুটো জিনিসের মধ্যে ব্যবধান বাড়লে আকর্ষণ কমে যায়। তাই মহাশূন্যে ধাবমান প্রোজেকটাইলকেও এক সময় ওজন একেবারে হারিয়ে ফেলতেই হবে। গ্রহ ও নক্ষত্রজির কিছু না কিছু আকর্ষণ তো আছেই। আর চাঁদের আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। সে জন্য প্রোজেকটাইল পৃথিবী আর চাঁদের মধ্যবর্তী কোনো এক স্থানে পৌঁছে গেলে তার ভেতরের দ্রব্য সামগ্রীর ওজন শূন্য হবেই হবে। পৃথিবী ও চাঁদের ঘনত্ব সমান হলে সে বিশেষ জায়গাটা হত উভয়ের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে। কিন্তু উভয়ের ঘনত্ব সমান না হওয়ার জন্য সে-জায়গাটার অবস্থান হবে পৃথিবী থেকে আটাত্তর হাজার পাঁচ শ' চৌদ্দ লগি দূরবর্তী স্থানে। এখানে কোনো কিছু হাজির হলে তাকে অনাদি অনন্তকাল ধরে নিশ্চল-নিখরভাবে ভেসে থাকতে হবে। কারণ, সেখানে যে পৃথিবী ও চাঁদ উভয়ের আকর্ষণই একেবারে সমান। যদি হিসাব নিকাশ ঠিক থাকে তবে প্রোজেকটাইল সেখানে হাজির হলে তাকে অবশ্যই তিনটি ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হবে। প্রথমত—সামান্য গতিবেগ থাকলেও প্রোজেকটাইল উপরোক্ত বিপজ্জনক এলাকা অতিক্রম করে চাঁদের আকর্ষণের আওতায় হাজির হওয়ার জন্য সে চাঁদের দিকে নামতে থাকবে। দ্বিতীয়ত—নইলে এটা যদি সেখানে হাজির হওয়ার আগেই গতিবেগশূন্য হয়ে পড়ে তবে পৃথিবী তাঁকে নিজের কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করবে। তখন পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকবে। আর তৃতীয়ত—নইলে কোনোরকমে সেখানে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি এটা গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়ে তবে উভয়ের আকর্ষণের মাঝখানে পরে অনাদি অনন্তকাল ধরে শূন্যে বুলতে থাকবে।

বার্বিকেন পুরো প্রসঙ্গটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে বেলা এগারোটার কাছাকাছি ওজন-শূন্যতার ভয়ঙ্করতার প্রমাণ হাতেনাতেই পাওয়া গেল। নিকলের হাত থেকে একটা গ্লাস পড়ে গিয়ে শূন্যে দিবি ভাসতে লাগল। ভোজবাজির খেল দেখে মাইকেল তো বিস্ময়ে হতভাক হয়ে পড়ার জোগাড় হলেন। এবার কৌতূহল বশত বোতল, বন্দুক ও অন্যান্য বস্তু শূন্যে রেখে দিয়ে তারা মজা দেখতে লাগলেন।

মাইকেল এবার ডায়নাকেও শূন্যে রেখে দিয়ে তামাশা দেখায় মেতে গেলেন। অভিযাত্রীরা বিজ্ঞানের অদ্ভুত এ কাণ্ডের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মোটেই অজ্ঞ নন। সবকিছু স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা যেন অলৌকিক ব্যাপারটাকে চাক্ষুষ করে রীতিমতো থ বনে গেলেন। আকস্মিক ভয়-ভীতি যেন তাঁদের মধ্যে ভর করেছে। তাঁদের হাত-পায়ের কিছুমাত্র ওজনও আছে বলেও তাদের মনে হল না।

আনন্দে ডগমগ হয়ে তারা তিনজনই আচমকা লাফিয়ে সামান্য ওপরে উঠে দিবি শূন্যে ভাসতে লাগলেন। বিস্ময় বিক্ষোভিত চোখে মাইকেল বলে উঠলেন, 'অবিশ্বাস্য! রীতিমতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার!'

বার্বিকেন বললেন, 'নিউট্রাল জোন অতিক্রম করা মাত্রই চাঁদের আকর্ষণ কার্যকরী হতে আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন আমরা আবার শূন্য থেকে মেঝেতে পড়ে যাব।'

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় অভিযাত্রীরা নিজ নিজ ওজন ফিরে পেতে লাগলেন।

'একটা কথা, পৃথিবীতে আমাদের যে ওজন ছিল তার এক ষষ্ঠাংশ ওজন হবে চাঁদে।'

বার্বিকেন বললেন, 'হ্যাঁ, এতে তাদের দৈহিক কোনো পরিবর্তন হবে না। শক্তিও কমবে না। চাঁদের আয়তনের অনুপাত অনুযায়ী, বেঁটে। এক ফুট উচ্চতাও হতে পারে।'

মজাদার লোক আচমকা সোন্নােসে উঠলেন, 'কি মজা! লিলিপুট! তবে আমি সেখানে গ্যালিভার সেজে অভিনয় করব। পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো যে কী মজা একবারটি ভেবে দেখুন তো!'

'গ্যালিভার? গ্যালিভার সাজার এতই যদি শখ তবে মঙ্গল, বুধ বা শুক্র গৃহে গেলেই তো পারেন। আর শনি, বৃহস্পতি, নেপচুন আর ইউরেনাস গ্রহে গেলে কিন্তু ফল হবে বিপরীত। সেখানে আপনাকে লিলিপুটের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। জানেন?'

'ধুৎ! সে সব গ্রহে খোড়াই যাব। যেতেই যদি হয় তবে সূর্যেই যাব।'

'সূর্যে? সেখানে গেলে পৃথিবীর সাতগুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অনুভব করবেন। সূর্যের অধিবাসীরা সে অনুপাতে কম করেও দু-শ' ফুট লম্বা তো হবেই।' বার্বিকেন বলে চললেন, 'পৃথিবীতে যার ওজন এক শ' চল্লিশ পাউন্ড, সূর্যে তিন শ' ষাট পাউন্ড হবে তার ওজন। আর আপনার ওজন হবে পাঁচ হাজার পাউন্ড। বলেন কী এমন বিশাল ওজনের বপু নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে খাড়াই তো হতে পারবেন না!'

'আরে ক্বাস! তবে তো সঙ্গে একটা কপিকল নিয়ে যেতে হবে। এ যে ভাবতে গেলেও মাথা ঝিম ঝিম করে।' মাইকেল আর্দা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন।

এতক্ষণ বার্বিকেন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন। প্রোজেকটাইল ইতিমধ্যেই বিপজ্জনক অঞ্চল অতিক্রম করে চাঁদের সীমানায় হাজির হয়ে গেছে। পৃথিবীর আকর্ষণে ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা নেই। আবার শূন্যেও ঝুলে থাকার ভয় নেই। এ মুহূর্তে চিন্তা একটাই। প্রোজেকটাইল চাঁদের কোনো অঞ্চলে নামবে। পৃথিবীর ভুলনায় এক ষষ্ঠাংশ সেখানে ওজন হতে পারে। কিন্তু আট হাজার দু-শ, ছিয়ানকবি লিগ ওপর থেকে ধপাস করে পড়া যে ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার। এ ভয়ঙ্করতাকে ঠেকাতে হলে দুটো উপায় অবলম্বন করতে হবে। পতনের গতিবেগকে কমাতে হবে এবং আছাড় খেয়ে পড়া পরিস্থিটিকে সামাল দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন এবার আছড়ে পড়লে কীভাবে সামাল দেবেন তারই ব্যবস্থা করতে মেতে গেলেন।

প্রোজেকটাইল চাঁদের এলাকায় হাজির হয়েই উল্টে গিয়ে বিপরীতমুখী হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সরু মুখটা নিচে পৃথিবীর দিকে আর নিচের দিককার ভারি অংশটা উঠে গেছে সোজা ওপরের দিকে, অর্থাৎ চাঁদের বরাবর। স্টিলের প্রাণের ওপর কাঠের পার্টিশনগুলো আটকে দেওয়া হল। সে সঙ্গে চাকতিটাকে ফু দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে স্টিল প্রাণটা যেন পায়ার ওপর একটা টেবিল দাঁড়িয়ে। ধাক্কা লাগলে প্রথম চোটটা লাগবে স্টিলের পায়ার ওপরেই। আছাড় খেয়ে পড়ার বাকি ঝাঁকুনিটুকু চাকতি আর কাঠের পার্টিশন সামলে দেবে।

চাঁদটাকে এবার স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। নিচে পড়ার গতিবেগ স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। চাঁদের দিকে লম্বাভাবে না পড়ে চন্দ্রপৃষ্ঠের সমান্তরাল রেখায় মহাকাশযানটা তীব্র বেগে অগ্রসর হচ্ছে। ব্যাপার দেখে অভিযাত্রীরা ঘাবড়ে গেলেন। এমন পতনের কথা যে ভাবাই যায় না।

নিকলের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, 'চাঁদে পৌছনো যাবে তো?'

চাঁদে পৌছতে পারবেন ধরে নিয়েই তিনি প্রকৃতি নিতে লাগলেন।

ছোট ছোট ইস্পাতের কামানের ভেতরে অতিকায় রকেটগুলোকে রাখা আছে। তলদেশে প্রত্যেকটা কামানের আঠারো ইঞ্চি মতো বের করা রয়েছে। বৃত্তাকারে এরকম কুড়িটা কামান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। পিছন দিককার ধাতব চাকতি ঝুলে পলতের গায়ে অগ্নি সংযোগ করা মাত্র চাকতি বন্ধ করে দিলেই চাঁদের দিকে দারুণ বেগে হাউইগুলো জ্বলে উঠবে। ব্যস, এতে পতনের বেগকে থামিয়ে দেবে।

বার্বিকেনের মধ্যে নতুন চিন্তা এসে ভরে করল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রোজেকটাইলের ওপর কোনো ক্রিয়া করছে না দেখেই তাঁর মধ্যে আকস্মিক চিন্তার উদয় হল। তাঁর মধ্যে তিনটি বিজ্ঞানসম্মত আশঙ্কা আগে থাকতেই ছিল—নিউট্রাল জোনে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকা, চাঁদের দিকে নেমে যাওয়া, আর তা যদি নাই হয় তবে পৃথিবীর দিকে এগিয়ে যাওয়া। এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার হিংস্র কেবলমাত্র এ তিনজন দৃঢ়চেতা অকুতোভয় অভিযাত্রীদেরই রয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আন্তঃগ্রহ পরিভ্রমণ। এর চেয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার মোকাবেলা করার চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কি-ই বা থাকতে পারে?

এ-ব্যাপারটা নিয়ে এবার তাদের মধ্যে কথাবার্তা হতে লাগল। 'আমরা তবে চাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে সরে গিয়েছি, তাই না কিন্তু কেন?'—মাইকেল বললেন।

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নিকল চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বললেন, 'হয়তো বা কলম্বিয়াড কামানের নল যথাযথভাবে তাগ করা হয়ে ওঠে নি।'

'না, এটা ঠিক কারণ নয়। কামান ঠিকই চাঁদকে তাগ করা হয়েছিল। কারণটা রয়েছে অন্য জায়গায়।' বার্বিকেন তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলেন।

প্রোজেকটাইল কাৎ হয়ে ধেয়ে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে চাঁদের বুকে খাড়াভাবে আছাড় খেয়ে পড়ার কোনো ভাবই পরিলক্ষিত হল না।

তিন অভিযাত্রী রাত্রি আটটা অবধি জানালায় ধারেই অবস্থান করলেন। গোলায় ভেতরে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে।

একদিকে সূর্য আর অন্যদিকে চাঁদ। বার্বিকেন অঙ্ক কষে বের করলেন। তখন তাঁরা চাঁদ থেকে মাত্র সাত হাজার লিগ ওপরে অবস্থান করছেন। প্রোজেকটাইল প্রতি সেকেন্ডে প্রায় দু-শ' গজ বেগে ধেয়ে চলেছে। এর ওপর কেন্দ্রগতি আর কেন্দ্রাভিগ দু-দুটো গতি ক্রিয়া করে চলেছে। এর গতিপথ যে-কোনো সময় পরিবর্তিত হয়ে আর সোজাসুজি না থেকে আকাবাঁকা হয়ে যেতে পারে। শেষপর্যন্ত পরিণতি যে কি হবে বলা মুশকিল। ছুটন্ত গোলাটা চাঁদের দিকের পরিবর্তে মহাশূন্যের দিকে ধেয়ে গিয়ে হারিয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

দীর্ঘ সময় ধরে চিন্তা ভাবনা করেও বার্বিকেন সমস্যা থেকে উত্তোরণের কোনো উপায়ই মাথা থেকে বের করতে পারলেন না। চাঁদের কাছাকাছি চলে গিয়েও চাঁদ ঢুকছে না। কোনোদিনই সম্ভব হবে না। আকর্ষণ আর বিকর্ষণের চক্রে পড়ে তার গতিপথ ঝাঁক নিয়ে নিয়েছে।

বার্বিকেন ফ্যাকাসে মুখে ভাবনায় ডুবে থেকে এক সময় বলে উঠলেন, 'বুঝছি, ওই যে গ্রহাণুটা, ওটাই প্রোজেকটাইলের গতিপথকে ঝাঁকিয়ে অন্য পথে চালান দিয়ে দিয়েছে। সেটা আমাদের গোলাটার আয়তনের তুলনায় ঢের, ঢের বড় ছিল। তার টানে এটা গতিপথ বদলে ফেলবে, অবাক হবার কি আছে?' তার টান সামান্য হলেও সামান্যতম সত্রে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে চুরাশি হাজার লিগ পথ অতিক্রম করার পর চাঁদকে পাশে ফেলে মহাশূন্যে বে-পান্তা হয়ে যাওয়া। নিকল, এজন্যই আমাদের পক্ষে চাঁদে পৌছনো সম্ভব হচ্ছে না।'

হ্যাঁ, বার্বিকেনের কথাই ঠিক। চলন্ত উল্কাটাই প্রোজেকটাইলকে তার গতিপথ থেকে সামান্য সরিয়ে দিয়েছিল। তাই চাঁদে নামা সম্ভব হচ্ছে না। চাঁদে না গেলেও তার গাঁ-ঘেঁষে অতিক্রম করলেও তো চাঁদের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো চাক্ষুষ করা যেত।

অভিযাত্রীরা ঘুণাঙ্করেও ভাবতে পারেন নি, তাঁদের বরাতে অত্যাশ্চর্য এক ব্যাপার অপেক্ষা করছে। মহাশূন্যে হারিয়ে যাওয়ার পর চরমতম দূরবস্থার মুখোমুখি হতে হবে। বাতাস, জল আর খাবার দাবার নিঃশেষ হয়ে যাবে। অনাহারে, নিদারুণ ভূক্ষা নিয়ে বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর শিকার হতে হবে।

দু-শ' লিগ ওপর থেকে চাঁদকে পরিষ্কার নজরে আনা সম্ভব হল না। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে লঙ পিকের দূরবীক্ষন যন্ত্র চোখে লাগালে মনে হয় চাঁদে বুঝি মাত্র দু-লিগ দূরে এসে গেছে।

মাইকেল লক্ষ্য করল, প্রোজেকটাইল চাঁদের দিকে তির্যকভাবে ধেয়ে চলেছে। ফলে তাঁর ধারণা জন্মল, চাঁদের বুকে নামতে পারবেনই।

বার্বিকেনের প্রতিটা যুক্তি বার বার তাঁর আমাকে খান খান করে দিচ্ছে। তাঁর বক্তব্য—গোলাটাকে কেন্দ্রাভিগ শক্তিকেন্দ্র চাঁদ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে চাঁদ থেকে দূরে সরে যেতে হবেই।

বার্বিকেন এবার চাঁদের নক্সাটা খুলে চোখের সামনে ধরলেন। মধ্যরাত্রি। চলন্ত উল্কাটা ঝামেলা না বাঁধালে এখন প্রোজেকটাইলের চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার কথা ছিল। কিন্তু এখন সে আশা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। তাই তাঁরা হতাশাজর্জরিত চোখে চাঁদকে দেখতে লাগলেন। ভূ-গোলার্ধের তরো ভাগের এক ভাগ চন্দ্র-গোলার্ধ। তবু জ্যোতির্বিদরা এ সামান্য জায়গাটুকুতেই পনের হাজার জ্বালা-মুখ বের করেছেন।

বার্বিকেন হিসাব কষে দেখলেন, প্রোজেকটাইল চন্দ্রপৃষ্ঠের সাত শ' পঞ্চাশ মাইল ওপর দিয়ে উত্তর গোলার্ধের দিকে ধেয়ে চলেছে। দূরবীক্ষণের নল চোখে লাগিয়ে এমন কিছু দৃশ্য চাক্ষুষ করা গেল যা ইতিপূর্বে পর্যবেক্ষকদের চোখে মোটেই ধরা পড়ে নি।

অভিযাত্রীরা মিলার অ্যাক বোর-এর 'ম্যাপা সেলেনোগ্রাফিকা' নক্সাটা সামনে মেলে ধরে চোখে দূরবীন লাগালেন। এবার তাঁদের পক্ষে চন্দ্রপৃষ্ঠের অনেক কিছু সনাক্ত করা সম্ভব হল। দেখলেন মেঘ-সমুদ্র। আসলে সেটা সত্যি বালির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কিনা এত দূর থেকে সনাক্ত করে উঠতে পারলেন না। বিজ্ঞানী স্ব-র মতে মেঘ-সমুদ্র আসলে গভীর জঙ্গল। তবে তিনি মন্তব্য করেছেন, চাঁদে খুবই ঘন একটা বায়ুশুল অবস্থান করছে। প্রমাণ নেওয়া যাক কোনোটা প্রকৃত ব্যাপার। মহাকাশবিজ্ঞানীদের মতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটা নাকি লাভার স্তর। ডানদিকে অবস্থিত আগ্নেয়গিরিই নাকি ওই লাভার উৎস। মুহূর্তকাল পরে নজরে পড়ল মেঘ-সমুদ্রের উত্তরে সুউচ্চ একটা পাহাড় মাথা উচিয়ে রয়েছে। অত্যুজ্জ্বল সূর্যরশ্মির ছোয়া পেয়ে সেটা অবর্ণনীয় সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এর নাম কোপারনিকাস পাহাড়। উচ্চতা দশ হাজার ছয় শ' ত্রিশ ফুট। এটাকে পৃথিবী থেকে দেখা যায়। রাত্রি একটায় প্রোজেকটাইল পাহাড়টার ঠিক মাথার ওপরে উঠে গেল। প্রায় বাইশ লিগ বৃত্তাকার প্রান্তর ছাই রঙ বিশিষ্ট। কিছু সংখ্যক আগ্নেয় শিলা বৃত্তাকার প্রান্তরটায় বহুমূল্য মণিমুক্তোর মতো বলমল করছে। দক্ষিণ দিকে পাহাড় বা উঁচু টিলা কিছুই নেই। উত্তরদিকে তার ঠিক বিপরীত দৃশ্য। অনেকটা চেউ খেলানো বন্ধুর প্রান্তরের মতো। সবকিছু ডিঙিয়ে আলোকরশ্মি কোপারনিকাসে এসে জড়ো হয়েছে।

বার্বিকেন ওই রশ্মির উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করলেন, 'হার্শেল বলেছেন, রশ্মিরেখাগুলো নাকি ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধা লাভার স্তর। সূর্যের কিরণ পড়ায় এমন চকচক করছে।'

রাত্রি দেড়টার কাছাকাছি অভিযাত্রীদের চোখের সামনে আর একটা পাহাড় ভেসে উঠল। বার্বিকেন নক্সার এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন—এর নাম 'ইরাদোসথেন্স'। নয় হাজার ফুট উঁচু। প্রখ্যাত গণিতবিদ কেপলারের মতে এরকম জ্বালামুখ নাকি মানুষ তৈরি করেছে। ক্রমান্বয়ে পনের দিন ধরে সূর্যের ভেজের প্রকোপ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য চাঁদের মানুষরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এরকমটা তৈরি করেছে।

নিকল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কেপলার-এর ধারণা ভ্রান্ত। স্বর্বাঙ্গী চাঁদের মানুষের পক্ষে এমন বিশালায়তন একটা গর্ত খোঁড়া কি করে সম্ভব হতে পারে, বলুন? চাঁদের ওপরের ওজন পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ হলেও তো সেখানকার মানুষগুলোও ছয়গুণ স্বর্বাঙ্গীতি।'

রাত্রি দুটো বার্বিকেন লক্ষ্য করলেন, প্রোজেকটাইল চাঁদের ছয় শ' মাইল ওপরে হাজির হয়েছে। আর তার এগিয়ে চলা অব্যাহতই রয়েছে।

ঘড়িতে তখন রাত্রি আড়াইটা। এখন চাঁদের পাঁচ শ' মাইল ওপর দিয়ে সমাক্ষ রেখা বরাবর প্রোজেকটাইল ধেয়ে চলেছে। এর গতিবেগ কমছেও না, বাড়ছেও না দেখে বার্বিকেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাঁচ শ' মাইল দূরবর্তী অঞ্চল থেকেই গোলার গতিবেগ বেড়ে যাওয়ার কথা। অভিযাত্রীরা চাঁদের প্রতিমূহূর্তের পরিবর্তিত দৃশ্য দেখে মত্তমুগ্ধ হয়ে গেলেন। চাঁদের বৃকে হাজারো রঙের মেলা। চাঁদের গায়ে লাঙলের আঁচড়ের মতো দাগ দেখে নিকল সচকিত হলেন।

বার্বিকেন ব্যাপারটা খোলসা করে দিতে গিয়ে বললেন, ওগুলো আসলে চাঁদের গায়ের ফাটল। প্রত্যেকটা ফাটলের দৈর্ঘ্য চারশ' থেকে পাঁচ শ' লিগ। আর প্রস্থ এক হাজার থেকে দেড় হাজার গজ। বাস, তাঁর জ্ঞান এ-পর্যন্তই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ফাটলগুলোকে দুর্গের প্রাচীরের মতো দেখাচ্ছে। এক সময় এদের নিয়ে মহাকাশবিজ্ঞানীরা অনেক রকম কল্পনার জাল বুনেছেন।

সতের শ' উননব্বই খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্রোটার গণনা করে মোট সত্তরটা ফাটরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। সেগুলো দুর্গ বা নদী-খাত কোনোটিই নয়।

এখন চাঁদের দূরত্ব মাত্র চার শ' মাইল। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেটা মাত্র চার মাইল দূরে মনে হচ্ছে। এক হাজার পাঁচ শ' কুড়ি মাইল নিচে মাউন্ট হ্যালিক্যানকে দেখা যাচ্ছে।

চাঁদে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কিনা প্রশঙ্গটার সমাধান করতে গিয়ে বার্বিকেন এবার হুন্দু পড়লেন। কিন্তু এতক্ষণ পাহাড় আর বিস্তীর্ণ প্রান্তরই কেবল দেখেছেন। প্রাণীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও তো চোখে পড়ে নি। মানুষ, জন্তু জানোয়ার এমন কি গাছ-গাছালিরও চিহ্ন নজরে পড়ে নি। পৃথিবীতে রয়েছে খনির রাজ্য, জলের রাজ্য আর জীবের রাজ্য। কিন্তু চাঁদে রয়েছে কেবলমাত্র খনির রাজ্য—খনিজ পদার্থের একাধিপত্য।

হঠাৎ তীব্র ঠাণ্ডায় অভিযাত্রীরা জমে যাবার জোগাড় হলেন। জানালার কাছে বরফ থাকতে দেখা গেল। থার্মোমিটারের পারা শূন্য তাপাঙ্কের সতের ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে। বার্বিকেন উপায়ান্তর না দেখে কামরাটা গরম করার জন্য গ্যাস খরচ করে আগুন জ্বালাতে বাধ্য হলেন। তা না হলে মৃত্যুর সম্ভাবনা সুনিশ্চিত।

নিকল বার্বিকেনের তাপাঙ্ক সম্বন্ধে উৎসাহী হলেন। এত ঠাণ্ডায় সাধারণ থার্মোমিটারে পারদ জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বার্বিকেন স্পিরিট থার্মোমিটার ব্যবহার করলেন। এখন সমস্যা হচ্ছে, বাইরে হাত বাড়িয়ে তাপাঙ্ক মাপতে গেলে হাতের রক্ত-মাংস জমে যাওয়ার আশঙ্কায় সূতো বেঁধে থার্মোমিটারটাকে বার্বিকেন জানালা ফাঁক করে বাইরে বুলিয়ে দিলেন। আধ ঘণ্টা পরে থার্মোমিটারটাকে টেনে নিয়ে দেখা গেল, স্পিরিট শূন্য ডিগ্রির চেয়েও এক শ' চল্লিশ ডিগ্রি নিচে নেমে গেছে।

দেখা গেল, ফোরিয়ার-এর হিসাব সঠিক নয়, পাইলেট-ই ঠিককথা বলেছেন। কেবলমাত্র মহাকাশ জুড়েই প্রবল শৈত্য বিরাজ করছে না, সূর্যের তেজহীন চাঁদের অন্ধকার রাজ্যেরও একই হাল।

সেদিনটা ছিল পৃথিবীর হিসাব অনুযায়ী ছয়-ই ডিসেম্বর। চলন্ত যান প্রোজেকটাইল এর ওপর অভিযাত্রীদের এখন আর কোনো আধিপত্যই নেই। যানটার গতিমুখ পরিবর্তন করা বা গতি কমানো-বাড়ানো কোনোকিছুরই ক্ষমতা তাঁদের নেই। তবুও বার্বিকেন আর নিকল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা করার জন্য অঙ্ক কষতে মেতে রইলেন।

এক সময় মাইকেল বললেন, 'বোধ হয় আমাদের যানটা একসময় চাঁদের বৃকে আছাড় খেয়ে পড়বে।'

তাকে পুরোপুরি সমর্থন করতে না পেরে বার্বিকেন মন্তব্য করলেন, 'একথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পৃথিবীর বৃকে যে উল্কাপাত হয় তার চেয়ে ঢের, ঢের বেশি উল্কা বায়ুমণ্ডলে জ্বলতে জ্বলতে মাইল চল্লিশেক ওপর দিয়ে ছুটে মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। আমাদের গোলাটারও যে সে হাল হবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?'

অঙ্ক কষে কষে বার্বিকেন দুটো পথের হদিস পেলেন। অশ্বিনু, না হয় পরাবৃত্তের দিকে চন্দ্রযানটা ধেয়ে যাবে।

বার্বিকেন এবার মুখ খুললেন, 'প্রোজেকটাইল যে-পথ অবলম্বনই করুক না কেন, আমাদের পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, চাঁদের বৃকেও নাযা যাবে না।'

সকাল পাঁচটায় অদ্ভুত একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। চাঁদের দিকে প্রোজেকটাইলের তলদেশ বেঁকে গেছে। চাঁদে পড়ছে না। লাল একটা বিন্দু দেখে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অগ্রসরমান অতুজ্জ্বল লাল আলো নজরে পড়ল। আর চন্দ্রযানটা বৃত্তাকারে ছুটে চলেছে। সে জন্য লাল আলোটার তির্যক রেখা ক্রমে অগ্রসর হয়েছে, কাছে এসে পড়েছে।

নিকল আচমকা 'আগ্নেয়গিরি! আগ্নেয়গিরি' বলে চৈচিয়ে উঠলেন। চাঁদের বৃকেও তবে আগুন জ্বলছে! চাঁদ তবে এখনো মরে যায় নি।

'বাতাস। হ্যাঁ, তবে চাঁদে বাতাসের অস্তিত্বও নির্ধার্য রয়েছে। বাতাস না থাকলে আগুন জ্বালা তো সম্ভব নয়।' মাইকেল বললেন।

বার্বিকেন তাঁদের উৎসাহে জল ছিটিয়ে দিলেন, 'আগ্নেয়গিরির আগুনের জন্য আলাদা অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। সে আগুন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেই অক্সিজেন তৈরি করে নেয়। তাই চাঁদের বৃকে বাতাস আছেই এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়।'

বার্বিকেন সহ-অভিযাত্রীদের ভুল ভাঙিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ওটা কিন্তু চাঁদ নয়, উল্কা। মহাশূন্যে জ্বলন্ত একটা উল্কাপিণ্ড।'

জমাটবান্ধা অন্ধকারে, প্রায় দূশো গজই হবে। সেকেন্ডে দেড় মাইল বেগে ধেয়ে আসছে। ক্রমেই সেটার আকার বড় হয়ে উঠতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রোজেকটাইলের সঙ্গে সেটার ধাক্কা লাগার নিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

নির্ভীক অভিযাত্রীরাও আতঙ্কে কঁকড়ে যাওয়ার জোগার হলেন। জ্বলন্ত আগুনের গোলাটা কাছে, আরো কাছে এগিয়ে

আসছে। ধেয়ে আসছে তাঁদের চন্দ্রযানটার দিকে। তাঁরা অসহায়। চন্দ্রযানটার গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁদের সাধ্যাতিত। মাইকেল ও নিকল ব্যাপার দেখে মুর্ছা যাবার জোগাড় হলেন। বার্বিকেন তাঁদের জাপ্টে ধরে প্রবেশ দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনজনেরই একই আশঙ্কা, আগুনে জুলে পুড়েই তাঁদের খাঁক হতে হবে। চন্দ্রাভিযানের শখ এখানেই মিটে যাবে।

দুটো শতকের মতো দুমিনিট কোনোক্রমে কাটল। এবার অত্যুজ্জ্বল সাদা গোলাটা প্রোজেকটাইল-এ উপর আছড়ে পড়ল বলে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সাদা গোলাটা বিক্ষরিত হল। কোনো আওয়াজ হল না। বাতাসের অভাবে শব্দ শোনা যায় না। কেবলমাত্র অতিকায় গোলাটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। হাজার হাজার আলোর টুকরো অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। না, সবই সাদা নয়— লাল, নীল, হলুদ ও ছাই রঙের অত্যুজ্জ্বল টুকরোতে চারদিক ছেয়ে ফেলল।

কয়েকটা আগুনের টুকরো সবেগে ধেয়ে এসে প্রোজেকটাইলের ওপর পড়ল। প্রবল ধাক্কায় জানালার একটা কাচে চি ধরল।

অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় চাঁদটা আমাদের চোখের সামনে অদ্ভুতরূপ নিয়ে ফুটে উঠল। মাইকেল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে অভিভূত হয়ে চোঁচিয়ে উঠলেন, 'ওই—ওই যে অদৃশ্য চাঁদ দৃশ্য হয়ে উঠেছে!'

অত্যুজ্জ্বল সে-দৃশ্যটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। এরই মধ্যে অভিযাত্রীর চাঁদের রহস্যাবৃত বিপরীত দিকটাকে দেখে জীবন সার্থক করে নিতে পারলেন। পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে আজ পর্যন্ত কেউ চাঁদের এ-অঞ্চলটা দেখার সুযোগ পায় নি। মেঘমালা, পাহাড়-পর্বত, জ্বালামুখ আর হাজারো প্রাকৃতিক বিষয়। সমুদ্র—হ্যাঁ, বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্রপৃষ্ঠে গুরু হয়েছে চোখ ধাঁধানো আলোর তেজবাজির খেল। সবার শেষে চোখের সামনে ফুটে উঠল কুচকুচে কালো মহাদেশ আর গভীর বনানী যা অত্যুজ্জ্বল আলোর দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কি দেখলাম? নিমেষের মধ্যে যা কিছু দেখলাম তা কি বাস্তব, নাকি সবই মরিচিকার মায়া? চোখের ধাঁধা? এত কিছু দেখার পর চাঁদে মানুষের উপস্থিতির ব্যাপারটা যে সত্য নয়, কল্পনামাত্র—এরকম কথা এখন আর অভিযাত্রী তিনজনের পক্ষে জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়।

তীব্র সে আলোরদৃষ্টি ক্রমে স্তিমিত হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ইথার জুড়ে জমাটবাঁধা অন্ধকার নেমে এল। চন্দ্রপৃষ্ঠ আবার অন্ধকারে ডুব দিল। অন্ধকার! যেদিকে তাকানো যায় কেবল নিঃসীম অন্ধকার আর অন্ধকার।

বরাবরের জোর আছে বটে। মারাত্মক রকমের এক বিপদের কবল থেকে প্রোজেকটাইলটা অব্যাহতি পেয়ে গেল। বিপদটা অভাবনীয় হলেও মহাকাশে এরকম ঘটনা মোটেই বিরল নয়। জলন্ত উষ্ণাপিণ্ডের সঙ্গে ধাক্কা লাগার ব্যাপারসাপার অভিযাত্রীদের মাথায়ই আসে নি। মহাকাশযাত্রীদের সবচেয়ে বড় শত্রু হতচ্ছাড়া উষ্ণাগুলো একবার কোনোক্রমে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে নিমেষে ভবলীলা সাস্র করে দেবে। এর জন্য অভিযাত্রীদের কিন্তু তিলমাত্র আক্ষেপ নেই। আচমকা মহাকাশ অত্যুজ্জ্বল আলো দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়েছিল বলেই না চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠের অপরূপ সৌন্দর্য দেখে চোখ ও মনকে সার্বক করে তুলতে পেরেছেন।

একটা রহস্য এখনো অন্ধকারের অতল গহবরেই রয়ে গেল। মহাদেশ, সমুদ্র আর বন জঙ্গল যদি থাকে তবে চাঁদে বাতাসের অস্তিত্ব আছে কি? সাড়ে তিনতায় অব্যাপারটা ঘটল।

বিকালে মাংস-রুটি চিবোতে চিবোতে নিকল কতগুলো কাঁপাকাঁপা আলোকবিন্দু দেখতে পেলেন, উষ্ণা নয়, আগ্নেয়গিরির আলোও নয় এগুলো। সূর্য। হ্যাঁ, সূর্যের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় চাঁদের দক্ষিণ দিকটা ঝলমলিয়ে উঠেছে।

অভিযাত্রীদের মন থেকে অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্তের ভয়-ভীতি কেটে গেছে। তাঁরা এবার উত্তর মেরু অতিক্রম করে দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হয়েছে। তাঁরা এখন উপবৃত্তাকার পথে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন। প্রোজেকটাইল এখন চাঁদের উপগ্রহের ভূমিকা পালন করছে।

সকাল দুটা। প্রোজেকটাইল দক্ষিণ মেরুর চল্লিশ মাইল ওপর দিয়ে ধেয়ে গেল। পথ এখনো উপবৃত্তাকারই আছে। উত্তর মেরু থেকেও প্রোজেকটাইল চল্লিশ মাইল দূরে অবস্থান করছে।

আবারও চোখের সামনে সূর্য ভেসে উঠল, আলো উত্তাপ উভয়ই প্রচণ্ড। প্রোজেকটাইলের কামরা ক্রমে উষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। গ্যাসের আগুন নিভিয়ে দেওয়া হল।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদের দক্ষিণাঞ্চল স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। চাঁদটা যেন চার শ' পঞ্চাশ মাইল কাছে এগিয়ে এসেছে।

সূর্যের আলোয় লিবনিজ পাহাড় তার ডোরফেল পাহাড় ঝলমল করতে লাগল, আলো এতই উজ্জ্বল যে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ মেরুর এই অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা নিয়ে পৃথিবীর মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা কত মতবিরোধ, তর্ক-বিতর্কেই না লিপ্ত হয়েছেন। এখন বার্বিকেন কিন্তু ওই গুহ্র সমুজ্জ্বল আলোকচ্ছটাকে সনাক্ত করতে পারলেন। বরফ। বরফের ওপর সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে।

বরফ। হ্যাঁ, বরফ যখন আছে তখন চাঁদে জলও আছে। জল থাকলে বাতাসও অবশ্যই আছে। খুব সামান্য থাকলেও আছে, থাকতেই হবে। বাতাস যে আছে এটাকে অলীক কল্পনা বলে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

পায়ের তলায় বিস্তীর্ণ ফাঁকা প্রান্তর। গাছ গাছালি, পাহাড়-পর্বত-টিলা, বাড়ি বা প্রাণীর অস্তিত্ব কিছুই নেই। মৃত্যুর চিহ্ন চারিদিকে বিরাজ করছে। উপগ্রহটার মৃত্যু হয়েছে। চাঁদের মৃতদেহ এটা।

প্রোজেকটাইল দীর্ঘপথ পাড়ি দিলে একুশ হাজার তিন শ' ফুট উঁচু নিউটন পাহাড় চোখের সামনে ফুটে উঠল। তার জ্বালামুখটা যেন একেবারে পাতালে গিয়ে ঠেকেছে। সূর্যের আলোর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

এবার ক্রেভিয়াস পর্বতের সুবিশাল জ্বালামুখ দেখা গেল। মৃত আগ্নেয়গিরি। এক সময় কী বিপুল পরিমাণ লোভা উদ্গিরন করত। বিশালায়তন ওই জ্বালামুখ দিয়ে, তা কল্পনাও করা যায় না।

চাঁদের বুকের সবচেয়ে উজ্জ্বল পাহাড় টাইকো অভিযাত্রীদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। টাইকো পাহাড়টা ড্যানিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। টাইকোই হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধের উজ্জ্বলতম অঞ্চল। এটা এতই উজ্জ্বল যে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে দূরবীন ছাড়াই একে দেখা যায়। তবে সহজেই অনুমেয় যে, মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ও তাকে কী অস্বাভাবিক উজ্জ্বলই না দেখাচ্ছে। এর চারদিকে আগ্নেয়গিরির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। এর পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত ডিম্বাকৃতি জ্বালামুখটা ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

বিশালায়তন সে মুক্ত প্রান্তরে দশটা প্রাচীন নগর প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রোজেকটাইল টাইকো পর্বত আর তার সুবিশাল প্রান্তর ছাড়িয়ে এল। তখনও তার কেন্দ্র থেকে বিজুলিত আলোকরশ্মি চারিদিক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। টাইকোর জ্বালামুখ থেকে রশ্মিরেখা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রশ্মিরেখাগুলোর উৎপত্তির কারণ আজও রহস্যের আড়ালে রয়ে গেছে। বিজ্ঞানী হার্সেল এ-ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন, উত্তপ্ত লাভাস্রোত অত্যধিক শৈত্যে জমে গিয়ে শক্ত হয়ে পড়ায় এমন অভ্যুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যাটাকে অন্যান্য জ্যোতির্বিদরা মেনে নিতে উৎসাহ পান নি। তাই তো রহস্যটা আজও পর্দার আড়ালেই রয়ে গেছে। ব্যাপারটা নিয়ে অভিযাত্রীরাও কম মাথা ঘামালেন না। তাই তিনি যা কিছু বললেন—সবই কল্পনার ব্যাপার।

চাঁদ থেকে মাত্র পাঁচ শ' গজ দূরে অবস্থান করেও অভিযাত্রীরা চাঁদের বুকে কোনো প্রাণের চিহ্ন দেখতে পেলেন না। জীবন্ত প্রাণীর ধর্মই হচ্ছে চলাফেরা করা, বিশেষ করে নড়াচড়া করা। তবে? এমনও হতে পারে চাঁদের প্রাণীরা খোদল কেটে তাতে সিঁধিয়ে রয়েছে। তা হলেও তো চাঁদের বুকে চন্দ্রমানবদের গড়া কোনো না কোনো ধ্বংসস্থপ নজরে পড়ত। অভিযাত্রীরা সবাই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, চাঁদের বুকে মানুষের অস্তিত্ব নেই। সেদিনটা ছিল ছয়-ই ডিসেম্বর। বার্বিকেন তার দিনলিপি পর পাঠ্য সিদ্ধান্তটা লিখে নিলেন।

অভিযাত্রীদের এবারের আলোচ্য বিষয়—সম্প্রতি চাঁদে মানুষ বাস করে না বটে। কিন্তু অতীতে কোনোদিন সেখানে মানুষ ছিল কি? দীর্ঘ আলোচনার পর এরও মীমাংসা হল—এক সময় চাঁদে মানুষের অস্তিত্ব ছিল। এখন লোপ পেয়েছে।

মাইকেল প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, 'তবে কি চাঁদের বয়স পৃথিবীর চেয়ে বেশি? পৃথিবীর আগেই চাঁদের সৃষ্টি?'

বার্বিকেন সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'সে কী! তা কি করে সম্ভব? চাঁদ ও পৃথিবী উভয়েই প্রথম অবস্থায় ছিল গ্যাসীয় পিণ্ড মাত্র। পৃথিবীর আগে চাঁদ ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়েছে। তাইতো চাঁদের বুকে আগে জীবের আবির্ভাব ঘটেছে। পৃথিবীতে জীব এসেছে তারও পরে।'

নিকল প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'চাঁদে জীবের আবির্ভাব তো সম্ভব নয়। তিন শ' চুয়ান্ন ঘণ্টা একনাগাড়ে যেখানে দিন বা রাত্রি সেখানে জীব—অসম্ভব!'

মাইকেল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে? সেখানেও তো একটানা ছয় মাস দিন।'

বার্বিকেন বললেন, 'কথাটা উদ্ভট হলেও বলছি, চাঁদের বুকে যখন মানুষের অস্তিত্ব ছিল তখন সেখানে এক নাগাড়ে তিন শ' চুয়ান্ন ঘণ্টা দিন বা রাত্রি ছিল না। চাঁদের কেন্দ্রে তখন তরল পদার্থ ছিল, মেঘ আর বাতাস সবই ছিল। মোদ্রা কথা তখনকার চাঁদ ছিল অন্য রূপে, অন্য অবস্থায়। সে সবই এখন অনুপস্থিত। মহাজাগতিক কিরণের ফলে চন্দ্রপৃষ্ঠ এখন ক্ষত-বিক্ষত রূপ ধারণ করেছে। আর চাঁদের আবর্তন ও ঘূর্ণন গতিবেগও তখন সমান ছিল না। পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে গতিবেগ সমান হয়েছে। চাঁদের আবর্তন ও ঘূর্ণন গতিবেগ দুটো যখন অসমান ছিল তখন পৃথিবী ছিল তরল অবস্থায়। তখন পৃথিবীর আকর্ষণ অত্যধিক ছিল বলেই হয়তো বা চাঁদের ঘূর্ণন বেগ স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল।' মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে তিনি আবার বলতে লাগলেন, 'আসল ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তন ও ঘূর্ণনবেগের মধ্যে পার্থক্য থাকার জন্যই চাঁদে দিন ও রাত্রি বিরাজ করত। আর অন্যান্য পরিস্থিতিও জীবন ধারণের অনুকূল ছিল, সন্দেহ নেই। পরিস্থিতি যতদিন অনুকূল ছিল ততদিন, বহু লক্ষ শতক ধরে চাঁদের বুকে মানব সভ্যতা অব্যাহত ছিল। আজ বায়ুমণ্ডল একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ায় জীবের বেঁচে থাকার অনুকূল অবস্থা অন্তর্হিত হয়েছে। পৃথিবীও শীতল হতে হতে একদিন এ-অবস্থা ধারণ করবে। আজ আমরা মরা-চাঁদ, মরা-উপগ্রহকে দেখতে পাচ্ছি।'

মাইকেল অভ্যুগ্রা অগ্রহাশ্রিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'পৃথিবী কবে নিশ্চায় হবে, হিসাব নিকাশ করে জানা সম্ভব হয়েছে কি?'

'অবশ্যই। আমাদের জানা আছে, এক শ' বছরে পৃথিবীর উত্তাপ কি পরিমাণে হ্রাস পায় তা আমাদের জানা আছে। তার ওপর নির্ভর করে অল্প কয়েক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে, চার লক্ষ বছর পরে পৃথিবী একেবারে শীতল হয়ে শূন্য তাপকে পৌঁছে যাবে।'

মাইকেল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলেন, 'বাঁচালেন সাহেব, আমি তো মনে করেছিলাম আমাদের পৃথিবীর পরমায়ু আর মাত্র পঞ্চাশ হাজার বছর।'

অভিযাত্রীরা যখন চাঁদে মানুষের অস্তিত্ব কোনোদিন ছিল কিনা আর বর্তমানে আছে কিনা প্রসঙ্গটা নিয়ে মেতে রয়েছে তখনই উপগ্রহটা ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

অভিযাত্রীরা বিষাদক্লিষ্ট চাহনি মেলে ক্রমে দূরে সরে যাওয়া অস্পষ্ট চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইল। এত আশা নিয়ে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়েও চাঁদে নামতে না পারার দুঃখ তাদের মনে অবর্ণনীয় হতাশার সঞ্চার করল।

এখন পৃথিবীর দিকে মোড় নিয়েছে প্রোজেকটাইলের তলদেশ। বার্বিকেন এতে বিস্মিত হলেন, উপবৃত্তটার ডিম্বাকৃতি কক্ষ পথে থাকলে চন্দ্রযানের ভারি দিকটা তো চাঁদের দিকেই থাকার কথা। কিন্তু কেন পৃথিবীর দিকে ঘুরে গেছে?

চন্দ্রযান যে-পথ ধরে চাঁদে এসেছিল ফিরেও যাচ্ছে একই পথে। অতএব উপবৃত্ত হলে সেটা অবশ্যই দৈর্ঘ্যে খুবই বেশি। পৃথিবীর আকর্ষণ যেখানে আরম্ভ হয়েছে চাঁদের আকর্ষণ সেখানে শেষ হয়েছে। সে উদাসীন অঞ্চল পর্যন্ত সুদীর্ঘ উপবৃত্তটা বিস্তার লাভ করেছে।

বার্বিকেনের মতে, উদাসীন অঞ্চলটায় প্রোজেকটাইল পৌঁছানোর পর দুটো ব্যাপার ঘটান সজাবনা রয়েছে। তার

গতিবেগ বেশি না থাকলে উভয় আকর্ষণের মাধ্যমাধি গিয়ে সেটা নিচল-নিখর অবস্থায় অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর একটা হতে পারে তার গতিবেগ যথেষ্ট না থাকার জন্য উপবৃত্তাকার কক্ষপথে চন্দ্রযানটা অনন্তকাল ধরে চাঁদকে আবর্তন করতে থাকবে।

মাইকেল চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ ঝাঁক বলে উঠলেন, 'আমাদের এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার অর্থই হচ্ছে অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া। যে-গতিবেগে আমরা চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি তাকে প্রশমিত করতে পারলে—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই বার্বিকেন বলে উঠলেন, 'অসম্ভব! একেবারেই অবাস্তব চিন্তা। প্রোজেকটাইলকে অন্য পথে চালানো বা গতিবেগ কমানো কোনোটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

প্রোজেকটাইল এখন চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সত্য। কিন্তু তার গতিবেগও কমে আসছে। ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে এক সময় গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়বে উপবৃত্তের অন্যদিকে যখন এটা হাজির হবে। এক চক্রের মেরে এলে, চাঁদের দিকে অগ্রসর হবার সময় গতিবেগ বেড়ে যাবে।

বার্বিকেন এবার ভাবতে লাগলেন, প্রোজেকটাইল চাঁদের বিপরীত প্রান্তে যখন গতিবেগ শূন্য হয়ে পড়বে তখন কিছু একটা করা সম্ভব কি না?

মাইকেল ঠিক তখনই আক্ষেপসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বলে উঠলেন, 'প্রোজেকটাইলের গতি-রোধ করার সহজ পদ্ধতিকে ব্যবহার না করে আমরা চরমতম বোকামি করছি। হাউইয়ের বিপরীত ধাক্কাটাকে ব্যবহার করলেই সমস্যা সমাধান করে ফেলা সম্ভব।'

'ভালো কথা। সময়মত রকেটগুলো ছোঁড়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে প্রোজেকটাইল যেভাবে হেলে রয়েছে তাতে করে রকেটের পিছন দিককার ধাক্কা আমাদের চাঁদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। এখন তার মুখ পৃথিবীর দিকে। আশা করা যাচ্ছে, উদাসীন অঞ্চলে হাজির হলে এর মুখ চাঁদের দিকে ঘুরে যাবে। তখন রকেট ছুঁড়লে ধাক্কা ফলে আবার চাঁদের দিকে ধেয়ে যেতে পারবে। সাতই ডিসেম্বর রাত্রি একটায় উদাসীন অঞ্চলে এটা হাজির হবে।'

আলোচনা আর বেশি দূর অগ্রসর হল না। অভিযাত্রী-তিনজনই শুয়ে পড়লেন।

সকাল সাতটায় তিনজনই এক এক করে শয্যা ত্যাগ করলেন। দেখা গেল, প্রোজেকটাইল তখনো ক্রমেই চাঁদ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর তার শঙ্কর মতো মাথাটা চাঁদের দিকে ক্রমে হেলে পড়ছে। অদ্ভুত ব্যাপারই বটে। দেখা গেল, বার্বিকেনের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ হচ্ছে। চন্দ্রযানটা রকেট ছোঁড়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চলেছে।

মাত্র আর সাত ঘণ্টা বাকি। ব্যাস, তারপরই রকেটগুলো হাইয়ের মতো আগুন ছড়িয়ে তীব্রবেগে ছুটে যাবে। অধীর প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিযাত্রীরা সারাটা দিন কাটালেন। রাত্রি বারোটা। আর মাত্র এক ঘণ্টার ব্যাপার। তারপরেই চন্দ্রযানটা গতিবেগ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলবে। বার্বিকেনের হিসাব অনুযায়ী রাত্রি ঠিক একটায় প্রোজেকটাইল গতিশূন্য হয়ে পড়বে। ব্যাস, তখনই শুরু করা হবে রকেট ছোঁড়ার কাজ।

একটা বাজতে মাত্র আর পাঁচ মিনিট বাকি। প্রোজেকটাইল ইতিমধ্যেই উদাসীন অঞ্চলে পৌঁছে গেছে। অভিযাত্রীরা এতে পালকের মতো হাল্কা হয়ে পড়েছেন।

ঠিক একটা। রকেটের সলতেতে বার্বিকেন অগ্নিসংযোগ করে দিলেন। প্রোজেকটাইল বিরাট একটা ধাক্কা খেল, সবাই স্পষ্ট অনুভব করল।

বার্বিকেনের মুখে বিষাদের কালো ছায়া-নেমে এল। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমরা পড়ে যাচ্ছি! পড়ছি! তবে চাঁদের বুকে নয়, পৃথিবীর ওপর!'

মহাশূন্য থেকে ভূপৃষ্ঠে পতন শুরু হল। রকেট ছুঁড়েও তার মোড় ঘুরানো, পতন রোধ করা সম্ভব হল না। এক লক্ষ ষাট হাজার মাইল উল্কাকাশ থেকে উল্কাপিণ্ডের মতো নিচে পড়া যে-সে কথা নয়! প্রোজেকটাইল কামান থেকে যে গতিবেগ নিয়ে উর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল সে গতিবেগেই পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়বে। সেকেন্ডে সেই ১৬০০ গজ গতিবেগেই পৃথিবীর বুকে ধপাস করে পড়বে।

সামকুইথানা জাহাজের লেফটেন্যান্ট আর কাণ্ডেন জল মাপার কাজে ব্যস্ত। আমেরিকার উপকূল থেকে দু-মাইল দূরবর্তী সমুদ্রে তিন হাজার পাঁচ শ' আট ফাদম পর্যন্ত দড়ি ছেড়েও তারা তলের হদিস পাচ্ছেন না দেখে বিস্মিত হলেন। ঠিক তখনই জাহাজ জুড়ে হৈ হউগোল শুরু হয়ে গেল, তিন হাজার ২২৭ ফাদম জলের তলায় সিসার গোলা ঠেকেছে। কাণ্ডেন নিশ্চিত হয়ে নিজের কেবিনে শুতে চলে গেলেন।

এগারোই ডিসেম্বর। রাত্রি দশটা। জাহাজের ডেকে চন্দ্রাভিযানের ব্যাপারটা নিয়ে জোর আলোচনা চলতে লাগল।

একজন অফিসার বলে উঠলেন, 'আজ সেই এগারোই ডিসেম্বর। অনেক আগেই প্রোজেকটাইল চাঁদের বুকে পদার্পন করেছে। পাঁচ তারিখের মধ্যরাতে তার চাঁদের মাটি স্পর্শ করার কথা ছিল। আলোচনা চলতে চলতে রাত্রি এগারোটা বেজে গেল। তখনো দড়ি তোলার কাজ মেটে নি।

রাতে একটা সতেরো মিনিটে লেফটেন্যান্ট নিজের কেবিনে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় তিনি সমুদ্রের বুকে থেকে হুস হুস শব্দ ভেসে আসতে শুনলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, কোথাও না কোথাও দিয়ে বাষ্প বেরিয়ে যাচ্ছে। পরমুহূর্তেই বুঝলেন, জল থেকে নয়, অবাস্তব শব্দটা দূরবর্তী আকাশ থেকে। অকস্মাৎ একটা উল্কাপিণ্ড তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। বাতাসে ঘর্ষণ লেগে লেগে সেটা হ-হ করে জ্বলছে আর প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করছে। চোখের পলকে-সেটা প্রবল বেগে জাহাজের এক প্রান্তে আছাড় খেয়ে পড়ল। ব্যাস, জাহাজের গলুইটা মুহূর্তে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে জলে পড়ে গেল। মাত্র আর ফুট কয়েক কাছে পড়লেই পুরো জাহাজটা ভেঙেচুরে একসার হয়ে যেত।

'ব্যাপার কী? ব্যাপার কী?' বলতে বলতে বিবস্রায় কাণ্ডেন ছুটে এলেন।

ব্যাপারটা কারোর আর বুঝতে বাকি রইল না। গান-ক্লাবের চন্দ্রযান প্রোজেকটাইল ফিরে এসেছে। অভিযাত্রীরা জীবিত, নাকি মৃত অবস্থাতে ফিরেছেন জানার জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত। তবে সবাই একমত, আগে তাঁদের জল থেকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর বিবেচনা করা যাবে জীবিত, নাকি মৃত?

কি করে এমন সুবিশাল একটা গোলাকে জল থেকে উদ্ধার করা যাবে? জাহাজে সেরকম পাকা ডুবুরি আর সরঞ্জামাদি বা কোথায়? উপায়ান্তর না দেখে নিকটতম বন্দরের দিকে সামকুইথানা ছুটে চলল। রাত্রি একটা দশ মিনিটে ছত্রিশ ঘণ্টা একনাগাড়ে ছুটে সাড়ে চার শ' মাইল পথ পাড়ি দিয়ে ভাঙা জাহাজটা সানফ্রান্সিসকো উপসাগরে হাজির হল। নৌ-বিভাগের সেক্রেটারি, গান-ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট, কেমব্রিজ মানমন্দির আর ম্যাসটনের কাছে চারটে টেলিগ্রাম করা হল। টেলিগ্রামের বক্তব্য, 'এগারোই ডিসেম্বর রাত্রি একটা সতের মিনিটে ২০°৭ উত্তর আর ৪১°৩৬ পশ্চিমে কোলাম্বিয়াডের প্রোজেকটাইল প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পড়েছে। নির্দেশ পাঠিয়ে দিন।'

খবরটা মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সমগ্র সানফ্রান্সিসকোতে ছড়িয়ে পড়ল। তারপরই ব্যাপারটা পৃথিবী জুড়ে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করল।

কেমব্রিজ মানমন্দিরের সদস্যরা জানতে পেরেছিলেন, প্রোজেকটাইল চাঁদে উপগ্রহ হয়ে চক্রর খাচ্ছে। পাঁচই ডিসেম্বর সেটাকে চাঁদের বিপরীত দিকে হারিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। ব্যাস তারপর থেকেই একেবারে অদৃশ্য।

আর ম্যাস্টন তো পাহাড়ের শীর্ষদেশে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বসিয়ে তাতে চোখ লাগিয়েই রয়েছেন।

উল্কাপিণ্ড আর প্রোজেকটাইলকে নিয়ে চারদিকে কতই না জল্পনাকল্পনা চলতে লাগল।

গান-ক্লাবের সদস্যরা বলাবলি করতে লাগলেন, সমুদ্রে পড়েছে উল্কা নয়, তাদের প্রোজেকটাইল-ই বটে। পাঁচ তারিখের পর প্রোজেকটাইল তো আর দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে নি। অতএব সেটা প্রোজেকটাইল না হয়েই যায় না।

ম্যাস্টন থেকে শুরু করে গান-ক্লাবের সদস্য পর্যন্ত অনেকেই প্রোজেকটাইলকে উদ্ধার করার জন্য তৎপর হলেন। ইঞ্জিনিয়ার মার্চিসন সানফ্রান্সিসকোতে ছুটলেন অর্ডার দিয়ে বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট স্বয়ংক্রিয় আঁকশি, ডুবুরির পোশাক ও সাজসরঞ্জাম এবং একটা ডাইভিং বেলও কিনে নিলেন। এর অত্যন্তব্য কামরাগুলাতে প্রয়োজন মতো জল ঢুকিয়ে জলের যত তলায় খুশি নেমে যাওয়া সম্ভব হয়। আবার কাজ মিটে গেলে ব্যতাস ঢুকিয়ে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সে জলকে বাইরে বের করে ডুবোকামরা গুলোকে ওপরে তুলে আনা যাবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রোজেকটাইল যদি বিশ হাজার ফুট জলের তলায় চলে গিয়ে থাকে তবে সেটা জলের চাপে অক্ষত থাকবে কি না কে জানে?

একুশে ডিসেম্বর রাত্রি আটটায় মার্চিসন, ম্যাসটন এবং গান-ক্লাবের প্রতিনিধিরা অত্যাবশ্যক সাজসরঞ্জামসহ জাহাজে রওনা হয়ে গেলেন।

তেইশে ডিসেম্বর সকাল আটটায় জাহাজ ভিড়ল। বেলা বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটে হাজির হল ঘটনাস্থলে, বয়াটার ধারে।

একটা পঁচিশ মিনিটে ডাইভিং-বেল ধীরে ধীরে জলে তলিয়ে গেল। ম্যাসটন, মার্চিসন আর রুমসবেরি তার ভেতরে আছেন। প্রতিফলকের সাহায্যে আলো আরো তীব্রতর করে তল্লাশি চালিয়েও প্রোজেকটাইলের হদিস পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত মাইলের পর মাইল তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু না পেয়ে, হতাশ হয়ে ডুবো প্রকোষ্ঠকে ওপরে তুলে আনা হল।

আঠাশ তারিখে সবাই মনমরা হয়ে পড়লেন। সবার মধ্যেই বন্ধমূল ধারণা জন্মাল, ওপর থেকে প্রবল বেগে আহাড় খেয়ে পড়ায় প্রোজেকটাইল নির্ঘাত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বে-পাশা হয়ে গেছে।

একমাত্র ম্যাসটন হতাশ হয়ে পিছিয়ে গেলেন না।

উনত্রিশ তারিখ জাহাজে সানফ্রান্সিসকোর দিকে রওনা হয়ে গেল। সকাল দশটায় এক নাবিক আচমকা চিল্লিয়ে উঠল, 'ওই—ওই যে বয়া ভাসছে! হুঁচল শীর্ষদেশে, জলের উপর-তল থেকে পঁচিশ ফুট ওপরে পতাকা উড়ছে। আমেরিকার পতাকা। অদ্ভুত ব্যাপার। এতগুলো বিজ্ঞ লোকের মধ্যে কারো মাথায় এল না, এত উঁচু থেকে পড়ার জন্য প্রোজেকটাইল তখনকার মতো জলে তলিয়ে গেলেও এক সময় ভেসে উঠবেই। ফাঁপা, গোলকের পক্ষে জলে তলিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যাস, আর দেরি নয়। ম্যাসটন সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দেখলেন, প্রোজেকটাইলের একটা জানালার কাঁচ ভাঙা। আর জানালাটা জল থেকে পাঁচ ফুট ওপরে।

ভাঙা-জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে ম্যাসটন দেখলেন, বার্বিকেন, মাইকেল আর্দা ও নিকল ডোমিনো খেলায় মগ্ন।

ব্যাস বার্বিকেন, মাইকেল আর্দা এবং নিকল মুহূর্তে দেবতা বনে গেলেন। বাপ্টিমোরে ফেরার পর তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হল। নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা বার্বিকেনের দিনলিপিটাকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কিনে নিল। আর 'চন্দ্রাভিযান' নাম নিয়ে কাহিনী ছাপা হতেই পত্রিকাটার বিক্রির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষতে পৌঁছে গেল। এ কাহিনী প্রকাশ হবার পর চাঁদ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন যা কিছু জানত সবই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে গেল। যারা মাত্র পঁচিশ মাইল ওপর থেকে চাঁদকে চাক্ষুস করেছে তাদের কথাকে নস্যাৎ করার সাহস কারোই বা আছে?

এখন কথা হচ্ছে, অকল্পনীয় এ-অভিযানের পরিণতি কি হতে পারে? এখানেই কি এর যবনিকা পতন ঘটে যাবে? নাকি, এ দুঃসাহসিক অভিযানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতের অভিযাত্রীরা সৌরমণ্ডলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন? গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে আর নক্ষত্রে নক্ষত্রে বিজয় নিশান উড়িয়ে দেবে?

ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের প্রয়াসকে আমেরিকানরা যদি কাজে লাগান তবে আঁর্চর্য হবারই বা কি থাকতে পারে।

ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন

১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস। রয়্যাল ভৌগোলিক সমিতির সভাকক্ষ। সমিতির সদস্যরা জরুরি এক সভায় মিলিত হয়েছেন। সভাপতির ভাষণ শেষ হতেই করতালিতে সভাকক্ষ মুখরিত হতে লাগল। তিনি আসন গ্রহণ করার পূর্ব মুহূর্তে বললেন, ‘ইংল্যান্ড ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। ইংল্যান্ডের সে খ্যাতি ড. ফারগুসন বৃদ্ধি করতে চলেছেন। তিনি যদি সাফল্য লাভ করেন—’

তার কথার ফাঁকে শ্রোতাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, ‘অবশ্যই সাফল্য লাভ করবেন।’

পূর্ব কথার জের টেনে সভাপতি বলে চললেন—‘হ্যাঁ, তিনি সাফল্য লাভ করলে আফ্রিকার অসম্পূর্ণ মানচিত্রকে সম্পূর্ণ করে তোলা সম্ভব হবে। আর যদি ব্যর্থ হন তবে প্রমাণিত হবে, মানুষ যে কেবলমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী তাই নন, সাহসিকতার দিক থেকেও তার সমকক্ষ কেউ নেই।’

তার ভাষণ শেষ হতে না হতেই আবার ঘন ঘন করতালি শুরু হয়ে গেল। ব্যাস, চাঁদ ওঠা শুরু হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার অভিযান উপলক্ষ্যে সাইক্লিস্ট হাজার পাঁচ শো পাউন্ড জোগাড় হয়ে গেল।

ডা. ফারগুসন তখন সভাকক্ষে অনুপস্থিত। উপস্থিত সদস্যরা তাঁকে একবারটি চক্ষু দেখার জন্য বায়না ধরল। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করল, আসলে ফারগুসন নামে নাকি কারো অস্তিত্বই নেই। পুরো ব্যাপারটাই ভাঁওতা।

সভাপতির অনুরোধে গম্ভীর প্রকৃতির মাঝবয়সী এক অদ্রলোক সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর বয়স চব্বিশের কাছাকাছি।

আগন্তুক মঞ্চে উঠতেই সবাই লক্ষ্য করল, তিনি পেশীবহুল দীর্ঘাকৃতি একজন সুপুরুষ। পা দুটোর দিকে এক নজরে তাকালেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়, তিনি দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে সক্ষম।

আগন্তুক ডান হাতের তর্জনি উঁচিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, ‘ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!’

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে সভাকক্ষ মুখরিত হয়ে উঠল। মুহূর্তে তিনি উপস্থিত হাজার হাজার শ্রোতার অন্তরের অন্তঃস্থলে স্থায়ী আসন লাভ করে ফেললেন।

ফারগুসনের পিতা ছিলেন, ইংরেজ নৌ-সেনাবিভাগের একজন দুঃসাহসী সেনাপতি। বালক ফারগুসনকে সঙ্গে করে তিনি সাগরে-সাগরে ঘুরে বেড়াতেন, যুদ্ধের সময়েও কাছে কাছে রাখতেন। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন কিছুতেই তাকে কাছছাড়া করতেন না। বাল্যের সে দিনগুলো থেকেই বিপদকে পায়ের ভূতা করতে শিখে ফেললেন। বয়স আর একটু বাড়লে ভ্রমণ কাহিনী পাঠে মন দিলেন। ছেলের ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরে তাঁর বাবা তাকে পদার্থবিজ্ঞান, বলবিদ্যা, জলবিদ্যা, জ্যোতিষবিদ্যা এবং ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানবান করে তোলার জন্য শিক্ষালভের ব্যবস্থা করলেন।

বাবা মারা গেলে ফারগুসন সেনাবিভাগে যোগ দিয়ে বাংলাদেশে হাজির হলেন। কিন্তু যুদ্ধের দামামা তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে পড়ায় তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতবর্ষ পর্যটনে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতা থেকে সুরাটের উদ্দেশ্যে তিনি পায়ে হেঁটে যাত্রা করলেন। তারপর এক এক করে রাশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ সেরে এলেন।

ফারগুসন সভা-সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার চেয়ে ‘ডেইলি টেলিগ্রাফ’ পত্রিকায় নিয়মিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, লিখতেনও। তাই তাঁর নামটার সঙ্গে সবাই পরিচিতি ছিল। আর সভা-সমাবেশে বৃথা সময় নষ্ট না করে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ব্যাপার-সাপার নিয়ে মেতে থাকাকেই তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় একদিন ছাপা হল—আফ্রিকার মৌনব্রত এবার ভঙ্গ হতে চলেছে। দু হাজার বছরেও যে-দেশ অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার রহস্য আজ উদ্ঘাটিত হবে। নীলনদের উৎসস্থল আবিষ্কার এতদিন অসম্ভব বিবেচিত হত। দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াসে রহস্যাবৃত আফ্রিকার তিনটি প্রবেশপথ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে।

ক্লাপার্টন আর ডেনহামের আবিষ্কৃত পথ ধরে ড. বার্ঘ সুদানে হাজির হন। ড. লিভিংস্টোন বহু কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে উত্তরাংশ অন্তরীপ থেকে জাম্বেসি অবধি গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন স্পিক আর ক্যাপ্টেন গ্রান্ট আলাদা পথে অগ্রসর হয়ে ক’টা হ্রদ আবিষ্কার করেন। এ-পথ তিনটের মিলনস্থলই আফ্রিকার কেন্দ্রবিন্দু। ফারগুসন শীঘ্রই আফ্রিকার সে-কেন্দ্রবিন্দুর উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাবেন। আকাশযানে চেপে আফ্রিকার পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছবেন। জাম্বিয়া দ্বীপ থেকে বেলুনের সাহায্যে পশ্চিমদিকে পাড়ি জমাবেন মনস্থ করেছেন। তাঁর এ যাত্রা কোথায় এবং কীভাবে শেষ হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।’

ড. ফারগুসনের খবরটা ডেইলি টেলিগ্রাফের পাতায় ছাপা হতেই দেশজুড়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হল। উড়ো জাহাজ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কেউ কেউ বলতে লাগল—বেলুনে চেপে এমন দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। কেউ বা বলল, ‘আসলে ফারগুসন বলে কারোর কোনো অস্তিত্বই নেই। এটা ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর কারসাজি। ইংল্যান্ডের মানুষগুলোকে বোকা বানানোই তাদের মতলব। আবার ডেইলি টেলিগ্রাফকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অন্যান্য খবরের কাগজগুলো ফলাও করে লেখা ছাপতে লাগল। ব্যাস, ফারগুসন একেবারে চিপসে গেলেন।’

কদিন বাদে শোনা গেল ফারগুসনের বাঙিত বেলুন তৈরি করে দিতে লায়ন কোম্পানি রাজি হয়েছে। ‘রেজলিউট’

নামে একটা জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছেন ইংরেজ সরকার। এবার সবার মনের বিধা-হৃদয় ঘুচে গেল। চারদিকে আবার হে-হট্টগোল শুরু হয়ে গেল।

এবার দেখা দিল এক নতুনতর সমস্যা, অনেকেই ফারগুসনকে ধরেছে সহযাত্রী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য! তিনি সম্মত হলেন না।

ডিক কেনেডি নামে ড. ফারগুসনের এক অভিন্নহৃদয় বন্ধু রয়েছেন। তিনি তিব্বত ভ্রমণ সেয়ে দু বছর বাড়িতে থিতু হয়েছেন দেখে ডিক কেনেডি খুবই আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, বন্ধুবরের দেশভ্রমণের পোকা বুঝি মাথা থেকে নেমে গেছে। তাঁর মুখোমুখি হয়েই তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'বন্ধু, বিজ্ঞানের কল্যাণের জন্য তো অনেক কিছুই করলে, পরিশ্রমও কম কর নি। এবার মন দিয়ে সংসার কর।'

ফারগুসন বন্ধুর কথার জবাব না দিয়ে কেবল নীরবে মুচকি হাসলেন।

ফারগুসন সর্বদা গম্ভীরমুখে আপন মনে কি যেন ভ্রম্য হয়ে ভাবেন।

ডিক কেনেডি একদিন একটা টেলিগ্রাম পেয়ে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। আপন মনে তড়পাতে লাগলেন, 'মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! মাথার দোষ দেখা না দিলে কেউ বেলুনে চেপে আফ্রিকা অভিযানে বেরোয়? দু বছর ঘরে বসে তবে সে এ-মতলবই ভেজেছে?'

ডিক কেনেডি সে রাত্রেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার পূর্ব মুহূর্তে তাঁর সর্বস্বের ভৃত্য সঙ্গীকে বললেন, 'আমি চললাম। ও বড্ড একগুঁয়ে, আমি হাড়ে হাড়ে ওকে চিনি। আমি রুখে না দাঁড়ালে কোনোদিন হয়ত ফারগুসন চাঁদের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করবে।'

হঠাৎ ডিক কেনেডিকে দেখে ফারগুসন যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। ডিক কেনেডি হাতের টেলিগ্রাফটা বাড়িয়ে ধরে, কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উচ্চা প্রকাশ করেই বলে উঠলেন, 'এর মানে কি? তুমি কি সত্যি বেলুনে চেপে—'

তাঁকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই ফারগুসন বললেন, 'সত্যি। শতকরা এক শো ভাগই সত্যি। যাবার পাকাপাকি বন্দোবস্তও করে ফেলেছি।'

'রাখ তো তোমার বন্দোবস্ত। আসলে কাজের ঝামেলার জন্যই তোমাকে আগেভাগে কিছু জানানো সম্ভব হয় নি। তবে তোমাকে না জানিয়ে অবশ্যই যেতাম না জানিয়ে অবশ্যই যেতাম না, এটুকু অন্ততঃ বিশ্বাস করতে পার বন্ধু।'

'সাক্ষাস! চমৎকার কথা শোনাগে! তোমার কথায় বোঝাচ্ছে, এ জন্যই আমি উচ্চা প্রকাশ করছি।'

'এ কথা বলছ কেন বন্ধু? আসলে যে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে।'

'আমাকে? আমাকে তোমার সঙ্গে—মানে সহযাত্রী হতে হবে?' ডিক কেনেডি যেন আচমকা একটা হোঁচট খেলেন।

বাস, এবার উভয়ের জোর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। কথা প্রসঙ্গে ফারগুসন বললেন, 'বন্ধু, ভাগ্যকে আমি মানি। শুধুমাত্র এটুকুই বুঝি, ভাগ্যে যা আছে কেউই রুখতে পারবে না।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত খেয়াল তোমার মাথায় ভর করল কেন, মালুম হচ্ছে না তো? যদি যেতেই চাও তবে সবাই যে-পথে আফ্রিকায় যায়, সে পথে যেতে আপত্তি কোথায়?'

'অন্য সবাই যে পথ অবলম্বন করে তাতে কি আজ পর্যন্ত কেউ সফল হয়েছে, তুমিই বল? আমি তো বলব, সফল হয়নি। মঙ্গোপার্ক থেকে শুরু করে ভোগেল পর্যন্ত কেউ যেতে পারে নি। মঙ্গোপার্ক নাইজারের তীরে গিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন হয়। নতুবা ভোগলে ওয়াদেই-এর জলে ডুবে প্রাণ হারায়।'

ক্যাপটিন সাকাটুতে প্রাণ দেন, মূর্খের প্রাণ হারান আউদনি। অসভ্য জঙ্গলিরা নৃশংসভাবে মৈজান-এর গর্দান নেয়। রোসার আর মেজর ল্যাংও একইভাবে প্রাণ হারান। আরও কত শত অভিযাত্রী যে আফ্রিকায় গিয়ে নিমর্মভাবে জান খুঁয়েছে গোনাগাঁথা নেই কারোর মৃত্যু হয়েছে কিদের জালা সহ্য করতে না পেরে, তীব্র শীতে কেউ মারা গেছে, মারাত্মক জ্বরে ভুগে ভুগে কারোর ভবলীলা সাদা হয়েছে। আবার হিংস্র জানোয়ারের চেয়েও ভয়ঙ্কর প্রকৃতির জঙ্গলিদের বিষমাখা তীরে কারোর প্রাণ গেছে। যে, যে-পথ অবলম্বন করেছে কোনো পথেই নিমর্ম নিষ্ঠুর সত্যকে এড়াতে পারেনি। তাই বলছি কি, সে-সব পথ এড়িয়ে চলাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় বন্ধু? তাই তো আমি জল, জমিন আর জঙ্গল এগিয়ে শূন্য ভেসে যাওয়ার মতলব এঁটেছি।'

বন্ধু, তুমি যদি ভেবে থাক, বেলুনটা পড়ে যাবে, ভুলই করবে। আফ্রিকার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত না গিয়ে আমার বেলুনটা পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না। বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে বেলুন ওপরে উঠে যাবে, শৈত্যে নিচে নেমে যাবে, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত আর জঙ্গল অনায়াসে পাড়ি দিয়ে দেবে। ভ্রমণের ক্লান্তি না থাকার জন্য বিশ্রামের প্রয়োজনও থাকবে না। পায়ের তলায় অজানা-অচেনা আফ্রিকার ভয়ঙ্কর সব দৃশ্য ধীরে ধীরে পিছনে চলে যাবে।'

বিশ্বয়ে আতঙ্কে অভিভূত ডিক কেনেডি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'আসমানে ওড়ার যন্ত্র তো এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তুমি কি তবে বেলুন চালানোর কোনো যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছ নাকি বন্ধু?'

'সে কী বেলুনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে নিছকই স্বপ্নের ব্যাপার! বাণিজ্যবায়ু আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। আমি তাকেই কাজে লাগিয়ে বেলুনের সাহায্যে ভেসে যাব। ইংরেজ সরকার একটা জাহাজ দান করেছে। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে তিন-চারটে জাহাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। সম্ভবত তিন মাসের ভেতরেই জাঞ্জিবারে পৌছে যেতে পারব। সেখান থেকেই গ্যাস বেলুনে চেপে আমরা যাত্রা করব।'

সচকিত হয়ে ডিক কেনেডি বলে উঠলেন, 'আমরা? আমরা বলতে—তুমি আর কে?'

'আমি আর তুমি। কেন? কোনো আপত্তি আছে নাকি তোমার।'

‘অবশ্যই। আপত্তিতে এক শো বারই আছে। আর কথা হচ্ছে, দেশ দেখতে হলে তো তোমাকে বহুবার উঠতে নামতে হবে। বেলুনকে নামাতে গেলে গ্যাস ছাড়তেই হবে। এভাবে বার-কয়েক নামা-ওঠা করতে হলেই কর্ম-ফতে, গ্যাস ফুরিয়ে যাবে।’

‘না বন্ধু। গ্যাস না ছেড়েই আমি বেলুনকে নামিয়ে নেব। এটাই তো আমার গোপন পরিকল্পনা, কৌশল তো এটাই। আমার ওপর আস্থা রাখতে পার বন্ধু। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।’

‘ভালো কথা। ঈশ্বরের ইচ্ছাই তবে পূর্ণ হোক।’

তখনকার মতো প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল বটে। কিন্তু কেনেডি মনের দিক থেকে পিছিয়ে গেলেন না। সময় সুযোগ পেলেই ফারগুসনকে তাঁর চিন্তা ভাবনা থেকে ফেরাবার প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই ফারগুসনকে কজা করতে পারলেন না।

বেলুনের আতঙ্ক কিন্তু ডিক কেনেডির মাথা থেকে নামল না। বেলুন থেকে দুম করে পড়ে গেছেন এমন স্বপ্নও দেখতে লাগলেন। একদিন তো পালঙ্ক থেকে দুম করে পড়েই গেলেন।

বন্ধুবরের স্বপ্ন দেখার হিড়িক ও খাট থেকে পড়ে যাওয়ার কথা শুনে ফারগুসন হাসতে হাসতে বললেন, ‘আরে শ্যুৎ! এমন করে মুখড়ে পড়ার কী আছে! তুমি নির্ভয়ে যাত্রা করতে পার। পড়বে না, কিছুতেই পড়বে না?’

‘সে না হয় হল। কিন্তু নীলনদের উৎসস্থল আবিষ্কার করে আমাদের ফায়দা কি হবে, বলতে পার?’

‘যাঁরা আফ্রিকা অভিযানে যাবেন আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে তাদের অনেক উপকার হবে।’ কথা বলতে বলতে আফ্রিকার একটা মানচিত্র খুলে বন্ধুবরের সামনে মেলে ধরে এবার বললেন, ‘কম্পাসটা হাতে নাও। এর একটা কাঁটা গানাদোকোরার ওপর ধর। আর একটা কাটা রাখ জাঞ্জিবারের ওপর। এবার হিসাব করে দেখ, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব কতটাই। তার আগে আউকেরিউ-হুদ খুঁজে বের কর। এর উত্তর দিক থেকে একটা জলস্রোত নির্গত হয়ে নীলনদে গিয়ে পড়ছে। কম্পাস বসিয়ে দেখ, ব্যবধান দু ডিগ্রি। দু ডিগ্রি মানে দেড় শো মাইলেরও কম। আরও বলছি শোন, ভৌগোলিক সমিতির মতে এ-হুদটায় অভিযান চালানো খুবই দরকার। সম্প্রতি এ-কাজে লেগেছেন ক্যাপ্টেন গ্রান্ট এবং ক্যাপ্টেন স্পোক। একটা স্টিমারে চেপে তাঁরা ঘাটস থেকে গানাদোকোরা পর্যন্ত যাবেন। সেটা তাদের নামিয়ে দিয়ে গান ডোকোরাতেই অপেক্ষা করবে। আর তারা যাবেন হুদটার খোঁজে। তাই বলছি কি বন্ধু, তাঁদের এ অভিযানে সাহায্য করতে হলে যত শীঘ্র সম্ভব আমাদেরও রওনা হতে হবে।’

ডিক কেনেডি আমতা আমতা করে বললেন, ‘একটা কথা, অনেকেই যখন যাচ্ছেন তখন আমাদের না গেলেই বা এমন কি ক্ষতি বৃদ্ধি হবে, ভেবে পাচ্ছিনে?’

ফারগুসন নিরস্তর। তাঁর নীরবতা ডিক কেনেডির আতঙ্ক আরও হাজারগুণ বাড়িয়ে দিল।

জো নামে ফারগুসনের এক ভৃত্য রয়েছে। ভৃত্য না বলে তাকে বরং বাড়ির কর্তা বলাই ভাল। সে ডিক কেনেডিকে বলল, ‘মিচেলের কারখানায় বেলুনটা তৈরি হচ্ছে। আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন তো স্যার?’

‘তাকে নিবৃত্ত না করা বা ফিরিয়ে না আনা অবধি তো তার সঙ্গে থাকতেই হবে। এ কী বদখেয়াল, একবারটি ভেবে দেখ তো জো!’

এমন সময় ফারগুসন সেখানে এসে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, ‘মি. কেনেডি, জোকে নিয়ে একবারটি আমার সঙ্গে আসুন তো। আপনাদের ওজন নেওয়া হবে।’

মিচেলের কারখানার তুলাদণ্ডে পর পর তিনজনের ওজন নেওয়া হল। ফারগুসনের ওজন হল এক শো পয়ত্রিশ পাউন্ড, ডিক কেনেডির এক শো ত্রিশান্ন পাউন্ড আর জোর এক শো কুড়ি পাউন্ড। এবার তিনজনের ওজন যোগ করে দাঁড়াল চার শো পাউন্ডের কিছু বেশি। ফারগুসন নিশ্চিন্ত হলেন।

ফারগুসন দেখলেন, চারশ পাউন্ড ভার বইতে হলে বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস বোঝাই করতে হবে। তাতে দু শো ছিয়াত্তর পাউন্ড গ্যাস ভরা যাবে। কিন্তু চার শো পাউন্ড বিশিষ্ট তিনজনকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে হলে চুয়াল্লিশ হাজার আট শো সাতচল্লিশ ঘনফুট বায়ুর ওজন চার হাজার পাউন্ড। অথচ সমপরিমাণ হাইড্রোজেনের ওজন দু শো ছিয়াত্তর পাউন্ড মাত্র। কিন্তু এ পরিমাণ গ্যাস বোঝাই বেলুনটা সম্পূর্ণরূপে ফুলে ফেঁপে ওঠার পর সেটা যতই ওপরে উঠবে বায়ুমণ্ডলের চাপ ততই হ্রাস পেতে থাকবে। বেলুনটার মধ্যে তখন নিজের ধর্ম অনুযায়ী ক্রমে সম্প্রসারিত হবার প্রবণতা দেখা যাবে। ব্যস, তখনই সেটা ফেটে গিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাবে। এরকম বিবেচনা করে ফারগুসন বেলুনে অর্ধে গ্যাস ভরে নিলেন। ড. ডিক কেনেডি আর একটা চমৎকার ফন্দি করলেন। বেলুনটার মধ্যে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট বেলুন গ্যাসে ভাসিয়ে রাখলেন। এতে দু-দুটো সুবিধা—একটা বেলুন কোনোক্রমে ফেঁসে গেলে অন্যটা অবলম্বন করে শূন্যে ভেসে যাওয়া সম্ভব হবে। আর বড় বেলুনটার মধ্যে ছোট বেলুনের গ্যাস চালান দিয়ে দিলে নামা ওঠা করতে গিয়ে গ্যাস নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে না।

লোহার পাত, বেত আর নল দিয়ে তৈরি ফারগুসন বেলুনের সঙ্গে একটা দোলনা লাগিয়ে দিলেন আরোহীদের থাকার জন্য। আর জুড়ে দিলেন চারটে বাজ্র। তাদের একটায় জল, আর বাকি তিনটায় একটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা সিল্কের দড়ি, তিনটি নোঙর, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার ও ক্রনোমিটার, বন্দুক, গোলা-বারুদ প্রভৃতি ভরে দেওয়া হল। তবে খাবারদাবারের মধ্যে নোনতা মাংস, চা, কফি, বিস্কুট আর কয়েক বোতল ব্রান্ডিও নিয়ে নিলেন। একটা তাঁবু ও কবল নিতেও ফারগুসন ভুল করলেন না। সব মিলে ওজন দাঁড়াল চার শো পাউন্ড। মোদা কথা, ফারগুসন-এ অত্যাস্চর্য বেলুনটাকে চার শো পাউন্ড ওজন বয়ে নিয়ে শূন্য ভেসে যেতে হবে।

ঘোলাই ফ্রেস্‌য়ারি। সেদিন কাক-ডাকা সকালে ইংরেজ সরকারের রেজলিউট জাহাজ নোঙর তুলে জাজ্জিবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেলুনটাকে জাহাজে তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রচুর পরিমাণে লোহা আর সালফিউরিক অ্যাসিডও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে বেলুনে ভরার জন্য।

জাহাজ এগিয়ে চলল। ড. ফারগুসন মাঝে মাঝে গল্পজ্বলে নাবিকদের কাছে পূর্বসূরী অভিযাত্রীদের অভিযানের কাহিনী রসান দিয়ে দিয়ে শোনাতে লাগলেন।

কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন, 'জাজ্জিবার আর মেনেগালের মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি হলেও হাজার চারেক মাইল। বেলুনের সাহায্যে আকাশপথে পাড়ি দিতে সাতদিনের বেশি লাগবে না।'

ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, বেলুনটা ওপরে উঠে গেলে দমকা বাতাস পেয়ে যাবে। বাতাস নাকি দু'শো চল্লিশ মাইল অর্থাৎ ঝড়ের বেগে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এমন প্রবল ঝড়ে আপনার বেলুন আবার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে তো?'

'অবশ্যই পারবে। আঠারো শো চার-এ নেপোলিয়নের সিংহাসন লাভের সময় এক ঘটনা ঘটে। প্যারি থেকে অভিযাত্রী ভার্নারিন রাতি এগারোটায় বেলুনের রশি কাটেন। পরেরদিন ভোরে বেলুনটা ব্রাসিল্যানা হ্রদে গিয়ে পড়ে।'

'প্রবলবেগে দোল খেয়ে বেলুন অক্ষত থাকলেও মানুষের হাড়-মাংস তো একাকার হয়ে যাবে।' ভীত-সন্ত্রস্ত ডিক কেনেডি কোরকমে উচ্চারণ করলেন।

তাঙ্খিল্যের সঙ্গে দুই মাস চলার মতো খাবারদাবার তো আছেই। তাই তাড়াতাড়ি আমরা যাব না, দরকারও নেই।'

এদিকে জো নাবিকদের সঙ্গে বেশ ভাব করে নিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে বলল, 'চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারটা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপারই নয়। বোতলে করে বাতাস আর জল নিয়ে নিলেই তো ল্যাটা চুকে যাবে।

নাবিকরা যখন ওনল চাঁদে জিন মানে মদটদও মেলে না তখন তারা চাঁদের বদলে তারার মুল্লুকে যাওয়ার জন্যই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করল।

তারার মুল্লুকের দিকে জোর আগ্রহ নেই। তাই সে বলল, 'ভাবছি, শনিগ্রহটা থেকে একটা চক্রর মেরে আসব। শনি গ্রহ হচ্ছে, যার চারদিকে আঠারটা মতো বলয় রয়েছে। যাকে আমরা শনির বিয়ের আঠি বলে জানি। তবে তার সহধর্মিনীর হৃদিস আজ অবধি মেলে নি।'

নাবিকটা এবার বলল, 'আরে বাস! এত উঁচুতে—ভালো কথা, শনিগ্রহ থেকে আর কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে?'

'সেখান থেকে একবার বৃহস্পতি গ্রহে যাব ভেবে রেখেছি। চমৎকার, সে দেশটার দিনগুলোর দৈর্ঘ্য মোট সাড়ে নয় ঘণ্টা। আর রাত্রি দীর্ঘ। কী মজা! খাও দাও আর বাকি সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। আমাদের বারোটা বছরের সমান তাদের মাত্র এক বছর। পৃথিবীতে যাদের দুমাসের মধ্যে মৃত্যু হবে বৃহস্পতি গ্রহে গেলে আর কিছুদিন টিকে থাকবে। অতএব সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, তোমাদের এখন যেমন ভাগর ভোগর দেখা যাচ্ছে বৃহস্পতি গ্রহে গেলে এখনও বহুদিন শৈশব-অবস্থায় কাটাতে হবে। এখন পঞ্চাশ বছরে পৌঁছ বৃহস্পতি গ্রহে গেলে তিন-চার বছরের শিশু বনে যাবে। বৃহস্পতি গ্রহ থেকে একটা চক্রর মেরে এলেই আমার কথার সত্যতা যাচাই হয়ে যাবে।'

তার কথায় নাবিকটা মুখে অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়ে তুলেছে বুঝতে পেরে জো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'নেপচুন গ্রহের কথা তোমরা শোন নি বোধ হয়? সেখানে নাবিকদের খুবই খাতির। মঙ্গল গ্রহে গেলে আবার দেখবে সৈন্যরা বেশি খাতির পায়। সে যানে চোর-ডাকাতদের একাধিপত্য। হান্সামা, রাহাজানি লেগেই রয়েছে। চোর আর বণিকরা ধরতে গেলে প্রায় সমাগোত্রীয়।'

জো যখন সহজ-সরল নাবিকদের কাছে আঘাড়ে গল্প ফেঁদে বসেছে ঠিক তখনই ড. ফারগুসন বেলুনের ওঠানামার অদ্ভুত ব্যাপারটা জাহাজের অফিসারদের কাছে ব্যাখ্যা করতে ব্যস্ত। তিনি বলতে লাগলেন, 'আমি বেলুনের নিচের দিককার মুখটা এমন অদ্ভুত কৌশলে বন্ধ করে দিয়েছি যাতে এক ছিটা বাতাসও তার ভেতরে যেতে পারবে না। দুটো নলের মধ্যে হাইড্রোজেনের ওপরের অংশে একটা মুখ খোলা রয়েছে। আর অন্যটা রয়েছে নিচের অংশে। দুটো নলই বেলুনের বাইরে অবস্থিত একটা বাস্তব ওপরের ডালার সঙ্গে আটকে দেওয়া। বাস্তব আসলে গ্যাস গরম করার একটা যন্ত্র বিশেষ। আরও খোলসা করে বলছি, যে নলটা বেলুনের ওপর থেকে বাস্তবে নেমে এসেছে সেটা বাস্তবতার মধ্য দিয়ে স্পিংয়ের মতো পাক খেতে খেতে তার তলদেশে হাজির হয়েছে। পরে সেটাই প্রাটিনামের আন্তরণের ভেতর দিয়ে বাইরের বেরিয়ে এসেছে নলটার ভেতরের হাইড্রোজেন গ্যাসকে উত্তপ্ত করলেই গ্যাসের ধর্ম অনুযায়ী হাল্কা হয়ে যাবে এবং ওপরে উঠতে থাকবে। তখনই ওপরে ঠাণ্ডা ও ভারি গ্যাস নিচে নেমে আসবে। নলের মুখের কাছে আসামাত্র সেটাই আবার গরম হয়ে ওপরে উঠে যাবে। আবার ঠাণ্ডা বাতাস নিচে নেমে আসবে। এভাবে গরম-ঠাণ্ডা গ্যাস চক্রাকারে বেলুনের মধ্যে যাবে ও বেরোবে! এবার গ্যাসের ধর্মের কথা বলছি, 'মাত্র এক ডিগ্রি তাপেই চার শো আশি ভাগের এক ভাগ বিস্তার লাভ করাই গ্যাসের ধর্ম। কথাতাকে আরও সহজ করে বললে—গ্যাসে আঠারো ডিগ্রি তাপ প্রয়োগ করলে বেলুনের ভেতরের গ্যাস চার শো আশি ভাগের আঠারো ভাগ বেশি সম্প্রসারিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তার আয়তন এক হাজার দু'শো চুয়াত্তর ঘনফুট বৃদ্ধি পাবে। তাই বেলুনও সম্প্রসারিত হয়ে ততখানি স্থান দখল করবে। বাস, বেলুনটা তখন দ্রুত ওপরে উঠতে থাকবে।' মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, 'দেখুন, বেলুনের ওজন না কমিয়ে, গ্যাস নষ্ট না করে কিভাবে বেলুন প্রয়োজন অনুযায়ী ওঠানো-নামানো সম্ভব হয় তার প্রয়াস বহুদিন আগে থেকেই চলছে। ইতিপূর্বে বেলজিয়ামের অধিবাসী এক ফরাসি বৈজ্ঞানিক সে-প্রয়াস চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। আমি সে

পথে না গিয়ে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। খুব দরকার না হলে সামান্য ওজনের যা কিছু থাকবে তাদের কিছুই বেলুন থেকে ফেলে দেব না।’

জাহাজের অফিসারদের মধ্য থেকে একজন চোখদুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন, ‘এটা যে একটা বিরাট আবিষ্কার দেখছি!’

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে ফারগুসন এবার বললেন, ‘এটা মোটেই তেমন কোনো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই নয়। বেলুনের গ্যাসকেই আমি তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে হাক্কা করে আয়তন বৃদ্ধি করে নেব। গ্যাস যখন ঠাণ্ডা হয়ে ঘন হবে তখনই বেলুনটা ভারি হবে। আর এরই ফলে ক্রমে নিচে নামতে থাকবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে, তাই না? বায়ুগুলোর একটায় জল থাকবে। জলে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করলেই তো অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি হয়ে যাবে। জলে কিছু পরিমাণ সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলেই তো হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ সমান হবে। একটা বাস্তব গ্যাস তৈরি হয়ে নল বেয়ে অন্য দুটো বাস্তব গ্যাসে জমতে থাকবে। অন্য একটা খালি বাস্তব দু প্রকার গ্যাস নিয়ে এসে মিশিয়ে দেব। ইংল্যান্ডের মানুষ এ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ঘর গরম রাখে। বেলুনের ভেতরের গ্যাসে এক শো আশি ডিগ্রি উত্তাপ প্রয়োগ করলে তা চর শো আশি ভাগের এক শো আশি ভাগ বেশি সম্প্রসারিত হবে। সে জন্য সম্প্রসারিত গ্যাস বেলুনটা ফুলে ফেঁপে যোলাো হাজার সাত শো চল্লিশ ঘনফুট বায়ুর স্থান জুড়ে অবস্থান করবে। ফলে এতে বেলুনটা ওপরে উঠে যাবে, কারণ বেলুনটা অনেক হাক্কা হয়ে যাবে। কতখানি, এই তো? বেলুন থেকে তেরো শো পাউন্ড মাল ফেলে দিলে যতখানি হাক্কা হওয়ার কথা। আর এতে যত দ্রুত ওপরে উঠবার কথা বেলুনটা ঠিক তত দ্রুতই ওপরে উঠবে। আমি তো আগেই বলেছি, বেলুনটার অর্দ্ধাংশ গ্যাস দিয়ে বোঝাই করব। তাই তো গ্যাস উত্তপ্ত না করলে বেলুন কিছুতেই ওপরে উঠবে না, বায়ুগুলে ভাসবে। ঠিক তেমনি উত্তাপ হ্রাস করলেই বেলুনটা ক্রমে নিচে নামতে থাকবে। এভাবেই বেলুনটাকে ওঠানো-নামানো করানো হবে।’

জাজ্জবার বন্দরে রেজলিউট জাহাজ ভিড়ল। জাহাজ ভিড়তে না ভিড়তেই চারদিকে খবরটা চাউর হয়ে গেল, খ্রিস্টানরা আসমানে উঠে সূর্য আর চাঁদের অনিষ্ট সাধন করার মতলব এঁটেছে। ব্যস, এতে কুসংস্কারাঙ্কন কাফিরদের ধর্মবিশ্বাসে ঝা লাগল। চটে গেল। এটাই তো স্বাভাবিক। সূর্য আর চাঁদ যে তাদের উপাস্য। তারা সাব্যস্ত করল, ছলে বলে কৌশলে তাদের অভিযান বানচাল করবেই করবে। অনন্যোপায় হয়ে বেলুনটাকে কুয়েনি দ্বীপে সরিয়ে নিয়ে গ্যাস ভরে যাত্রার উপযোগী করে তোলা হল। বেলুন বাতাসে ভাসতে শুরু করলে তা দেখে কাফিরা তো রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। কিন্তু প্রহরীদের সতর্কতার জন্য তারা বেলুনটার কোনো ক্ষতিই করতে পারল না।

ডিক কেনেডি শেষবারের মতো ফারগুসনকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেও হতাশ হলেন। ফলে বাধ্য হয়ে বেলুন তাঁকে সহযাত্রী হতে সম্মত হতেই হল।

বেলুনের বায়ু উত্তপ্ত করে তোলায় সেটা ফুলে বিশালায়তন ধারণ করল। বেলুনটা শূন্যে ভাসতে লাগল।

যাত্রার পূর্বমুহুর্তে ফারগুসন সহ-অভিযাত্রীদের উপস্থিতিতে বেলুনটার নামকরণ করলেন ‘ভিক্টোরিয়া’। নাবিকরা বেলুনের দড়ির বাঁধন খুলে দিতেই আচমকা এক হেঁচকা টানে সেটা শূন্যে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। রেজলিউট জাহাজ থেকে পরপর চারবার কামান দেগে অভিযাত্রীদের বিদায় সম্বরণ জানানো হল।

ভিক্টোরিয়া শো শো করে শূন্যে উঠে যেতে লাগল। একটু বাদেই সেটা পনের শো ফুট ওপরে উঠে শীতল বায়ুর কাঁধে ভর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

ক্রমে ওপরে উঠতে উঠতে ভিক্টোরিয়া পঁচিশ হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। পায়ের তলায় বিশালায়তন রেজলিউট জাহাজটাকে ছোট্ট একটা ডিঙি নৌকার মতো দেখা যেতে লাগল।

বেলুন দুঘণ্টা পথ পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার সমুদ্র-উপকূলের বরাবর পৌছে গেল। আকাশপথে অত্যাশ্চর্য একটা বস্তুকে উড়ে যেতে দেখে গ্রামবাসীরা প্রথমে আতঙ্কিত ও পরে ক্ষুব্ধ হয়ে সেটাকে লক্ষ্য করে বাকৈ বাকৈ বিষমাখা তীর ছুড়তে লাগল। বৃথা চেষ্টা বেলুনের গায়ে আঘাত হানা তো দূরের কথা তীরগুলো বেলুনের কাছাকাছিও যেতে পারল না।

অভিযাত্রীদের পায়ের তলার দৃশ্যাবলী এবার ঘনঘন বদলাতে লাগল। কখনও দৃষ্টিনন্দন সবুজ শস্যক্ষেত্র আর বনভূমি, আবার কখনও বা রুদ্ধ-রুদ্ধ পাহাড়, অভিযাত্রীদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। দুপুরের কাছাকাছি তাঁরা আউরিজামো রাজ্য অতিক্রম করলেন।

চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে ড. ফারগুসন আউরিজারা পর্বতমালাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। সামনেই ডুথুসি পাহাড়। আরও পাঁচ-ছ হাজার ফুট। ওপরে ভিক্টোরিয়াকে তুলে না নিলে পাহাড়টাকে ভিঙোনো সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ডুথুসির ওপরেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন।

ভিক্টোরিয়া এবার বাওবাব গাছের বনের ওপর দিয়ে এগোতে লাগল। এক-একটা গাছ এমন উঁচু ও ঝাঁকড়া যে, দশ-বারোটা গাছ কাছাকাছি থাকলেই বিশাল একটা বন বলে মনে হয়। গাছের গুঁড়ি কমসে কম এক শোফুট ব্যাসযুক্ত তো হবেই। এবার দূরবর্তী জিলামোরা গ্রামটাকে দেখা গেল। আঠার শো পয়তাল্লিশ ফরাসি পর্যটক সেইজান একা সেখানে যেতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়েন। গ্রামের মোড়ল তাঁকে বাওবাব গাছের গুঁড়ির সঙ্গে পিঠমোড়া করে বেঁধে কপ্টনালী কেটে ফেলে, গর্দান থেকে মুগ্ধা কেটে নামিয়ে দেয়। আর দেহটাকে কুচিকুচি করে কেটে ফেলে। কী বীভৎস আর নারকীয় হত্যা! হতভাগ্য সেইজানকে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন নৃশংস হত্যার শিকার হতে হয়।

ডা. ফারগুসন গ্যাস উত্তপ্ত করে ভিক্টোরিয়াকে চোখের পলকে হাজার আটেক ফুট ওপরে তুলে নেন। এবার অভিযাত্রীরা অনায়াসে পাহাড়টা ডিঙিয়ে গেলেন।

ডুগুসি পাহাড়ের ওপরে গিয়ে ভিক্টোরিয়াকে নিচে নামিয়ে ড. ফারগুসন নোঙর ছুঁড়ে দিয়ে একটা গাছের মোটা ডালের সঙ্গে বেঁধে ফেললেন। সেখানেই তাঁরা রাত্রিবাস করলেন।

সকাল হল। ডিক কেনেডির গায়ে জ্বর। জ্বর দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গেল। এবার নোঙর খুলে দেওয়ায় ভিক্টোরিয়া জাঙ্গোমোরো গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। একটু বাদেই অভিযাত্রীদের নাকে উৎকট গন্ধ ভেসে এল। এখানকার বায়ু এতই বিষাক্ত যে, অনভ্যস্ত ব্যক্তি মাত্রেরই গায়ে জ্বর দেখা দেয়। আসলে জঙ্গলের এখানে-ওখানে মানুষ মরে পড়ে রয়েছে। সেগুলো পচেনেলে বায়ুকে বিষাক্ত করে তুলেছে। ওপরে উঠে বিষাক্ত বায়ুর এলাকা ডিঙিয়ে যেতে না যেতেই ডিক কেনেডির জ্বর কমতে শুরু করল।

ভিক্টোরিয়া এবার আকাশ হোঁয়া ক্যাবেহো পর্বতমালার কাছাকাছি হাজির হল। স্থানীয় লোকেরা তাদের ভাষায় ক্যাবেহোকে বাতাসের গতি বলে। পাহাড়টা সদস্তু এত উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে যে, প্রবাহিত বায়ু এর গায়ে ধাক্কা খেয়ে অন্যদিকে ধেয়ে যেতে থাকে।

ক্যাবেহো পর্বত পেরিয়ে ড. ফারগুসন ভিক্টোরিয়াকে মরুভূমির কাছে একটা গাছের ডালের সঙ্গে নোঙর করলেন।

ডিক কেনেডি আর জো সঙ্গে সঙ্গে গাছ বেয়ে নেমে অদূরবর্তী বনের দিকে চললেন, শিকারের আশা নিয়ে। অল্প আয়াসেই বন্দুকের গুলিতে একটা হরিণকে ধরাশায়ী করে দিল। মহা উল্লাসে জো সেটার ছাল ছাড়িয়ে মাংস ঝলসাতে লেগে গেল।

আচমকা ড. ফারগুসন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে বিপদ সঙ্কেত দিলেন। ব্যস, মুহূর্তমাত্রেরি না করে জো আর ডিক কেনেডি ব্যস্ত-হাতে ঝলসানো মাংসগুলো গোছগাছ করে নিয়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল। কাছাকাছি এসেই তারা প্রমাদ শুনল অসভ্য কাফিরা বেলুন আক্রমণ করেছে। কেউ গাছ বেয়ে ওপরে উঠছে আবার কেউ বা ভিক্টোরিয়ার দড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। ড. ফারগুসন একজনকে লক্ষ্য করে বন্দুক ছুঁড়লেন। সে গুলিবিদ্ধ হল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! হতচ্ছাড়াটা গুলি খেয়েও মাটিতে পড়ল না! লেজ দিয়ে গাছের ডাল জড়িয়ে লটকে রইল। ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল, আক্রমণকারীরা আসলে কান্ডি ট্রাফি নয়, হনুমান। এবার ঘন ঘন বন্দুক আর পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই হনুমানগুলো জান নিয়ে পালাল।

আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। ফারগুসন নোঙর খুলে ভিক্টোরিয়াকে ওপরে তুলে নিলেন।

ভিক্টোরিয়া বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে জিহোলামোরো পর্বতমালার পশ্চিমে হাজির হল। অভিযাত্রীরা সেখানেই রাত্রিবাস করলেন।

ভোর হতে না হতেই ভিক্টোরিয়া আবার যাত্রা শুরু করল। ড. ফারগুসন আফ্রিকার মানচিত্র খুলে দেখলেন সেখান থেকে প্রায় এক শো মাইল দূরে 'কাজে' শহর।

'কাজে' মধ্য আফ্রিকার অন্তর্গত এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ শহর। সওদাগরদের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র। হাতির দাঁত, তুলো আর কাঁচের দ্রব্যসামগ্রী ব্যবসায়িরা বন্দরে পসরা সাজিয়ে বসে। আর ক্রীতদাসের ব্যবসাও এখানে খুবই রমরমা। বড় বড় সওদাগররা এখান থেকে হাতির দাঁত খরিদ করে আরব মুল্লকে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মুনাফা লাটে। 'কাজে' শহরে অকস্মাৎ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। আকাশ থেকে কিছুতকিমাকার একটা বস্তু নেমে আসতে দেখেই শহরবাসীদের মধ্যে নিদারুণ উত্তেজনা ও আতঙ্কের সৃষ্টি হল। কেউ করজোড়ে প্রণাম জানাতে লাগল, কেউবা দুহাত তুলে স্তুতিপাঠ করতে শুরু করল। আবার কেউ হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগল।

এক যাদুকর আরবি ভাষায় অনেক কিছু বকে ফেলল।

ড. ফারগুসন আরবি ভাষা কিছু কিছু বোঝেন। তিনি সহ-অভিযাত্রীদের কৌতুহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে বললেন, 'এখানকার মানুষরা আমাদের বেলুন ভিক্টোরিয়াকে চাঁদ ঠাওরেছে। আর আমাদের মনে করছে, চাঁদের তিনটি সন্তান। সূর্যের মুল্লকে চাঁদের আগমনে তারা নিজেদের ভাগ্যবান ভাবছে। সূর্য এদের আরাধ্য।'

যাদুকর গলা ছেড়ে চিল্লিয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের মহামান্য সুলতান দীর্ঘদিন রোগে ভুগছেন। আপনারা অনুগ্রহ করে নেমে এসে তাঁর রোগ নিরাময় করুন।'

ব্যস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে ড. ফারগুসন নোঙরের দড়ি বেয়ে ওষুধের বাস্কসহ নেমে গেলেন। বেলা তিনটোর কাছাকাছি তিনি সুলতানের কুটিরতুলো প্রাসাদের দরজায় হাজির হলেন। দলে দলে কাতারে কাতারে ধর্মভীরু পুণ্যলোভতার মানুষগুলো পথে টান টান হয়ে শুয়ে তাকে প্রণাম ও স্বাগত জানাল। সুলতানের কামরার পাশেই একটা কামরার ভেতরে দু-দুটা রূপসী যুবতী ফুরৎ ফুরৎ শব্দে তামাক খাচ্ছে। সুলতান পরলোক গমন করলে এঁদেরও তাঁর সঙ্গে কবরস্থ করা হবে। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে সুলতানের যেন সেবায়ত্নের কোনো ক্রটি না হয়, তিনি যাতে অতৃপ্ত না থাকেন সেজন্যই তো এঁদের জীবন্ত সমাধিস্থ করা হবে।

ড. ফারগুসন দেখলেন মৃত্যুপথ্যাত্রী সুলতানের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান এবং অকথ্য অত্যাচারে তার জীবনীশক্তি লোপ পেতে চলেছে। তিনি বাস্ক খুলে এক দাগ ওষুধ তাঁর মুখে ঢেলে দিলেন। একটু সুস্থ হলেন বটে। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহ, অচিরেই রোগীর ভবলীলা সাজ হয়ে যাবে।

সুলতানের ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি লম্বা লম্বা পায়ে সহযাত্রীদের কাছে ফিরে এলেন। ব্যস্ত-হাতে নোঙর খোলার চেষ্টা করতেই সুলতানের প্রাসাদের দিক থেকে মরাকান্নার স্বর ভেসে আসতে শুনলেন। ড. ফারগুসন নিঃসন্দেহ হলেন। সুলতান অক্টো পেয়েছেন। পরক্ষণেই হৈ-হটগোল শুরু হয়ে গেল। মনে হল কিছুলোক দল বেঁধে চৌচামেচি করতে করতে তাঁদের দিকেই ধেয়ে আসছে।

ফারগুসন মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ভিক্টোরিয়ায় চেপে গেলেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে নোঙরটা দিলেন খুলে। মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে ভিক্টোরিয়া এক লাফে অনেকটা ওপরে উঠে গেল। এতক্ষণ যারা বিভিন্নভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে এগোচ্ছিল তারা যাদুকরের কাণ্ডকারখানা দেখে একদম থ বনে গিয়ে অপরক চোখে চলমান বেলুনটার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া বেলুনটা 'কাজে' শহরের সীমানা অতিক্রম করে গেল। এবার ধীরে ধীরে উত্তাপ কমিয়ে সোঁটাকে নিচে নামিয়ে আনলেন। যাদুকর চলন্ত বেলুন থেকে লাফিয়ে 'কাজে' শহরের দিকে উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটে লাগল।

বাতাস প্রবল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। ভিক্টোরিয়া বাতাসের চাপে উদ্ধার বেগে ধেয়ে চলল ফারগুসন কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'আমরা কিন্তু এখন চন্দ্ররাজ্যেই অবস্থান করছি। এখানকার মানুষ চাঁদকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে বলে এর এমন নামকরণ হয়েছে। একদিন হয়ত এখানকার অসভ্য মানুষগুলো তাদের রাজ্যকে এমন সুন্দর করে গড়ে তুলবে যা পৃথিবীতে এক নতুন নজির সৃষ্টি করবে। ইতিহাসে কিন্তু এরকম নিদর্শন ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। এক সময় এশিয়া মহাদেশ সমগ্র মনুষ্যজাতির আদি বাসভূমি ছিল। এশিয়া কি চার শো হাজার বছর ব্যাপি নিজের সন্তানের মতো? মনুষ্যজাতিকে লালন পালন করেনি, বেলুন মি. কেনেডি? তারপর ক্রমে এশিয়ার রূপ বদলাতে লাগল। এশিয়ার মানুষ নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের দিকে ধেয়ে চলল। এখন এশিয়ার মতো ইউরোপের জীবনী শক্তিও ক্ষীণ হয়ে আসছে। মানুষের এবার লক্ষ্য আমেরিকা। একদিন না একদিন এ-মহাদেশও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বে। আমেরিকার মানুষ আবার ছুটে চলবে আফ্রিকার দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। জঙ্গল কেটে গড়ে তোলা হবে নগর, বন্দর আর প্রাসাদোপম সব অট্টালিকা। হয়ত একদিন এখানে এমন সব বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটবে, যার কাছে আমাদের আজকের আবিষ্কার ছেলের হাতের খেলনায় পরিণত হবে।'

এ-মূল্যকে ঝড়-তুফান ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেয়। গাছে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করলে ক্রমাগত আছাড় খেয়ে খেয়ে একদম অকেজো হয়ে পড়বে।

হ্যাঁ, ড. ফারগুসনের অনুমানই সত্যে পরিণত হল। বেলুনটা নিশ্চল-নিখরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রকৃতির এমন অবর্ণনীয় থমথমে ভাব দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, ঝড়ের আবির্ভাবের পূর্বলক্ষণ। মুহূর্তে প্রলয়ঙ্কর ঝড় শুরু হয়ে গেল। আকাশের গায়ে কোনো অদৃশ্য হাত যেন বোতল বোতল কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। সে যে কী গাঢ় অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

ড. ফারগুসন প্রমাদ গুললেন। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে তিনি গ্যাস পাইপে তাপ প্রয়োগ করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই—কড় কড়া—শব্দে বিদ্রূৎ ঝলসে উঠল। নামল মুঘলধারে বৃষ্টি। ফারগুসন আতঙ্কিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'বড় দেরি হয়ে গেছে। আমাদের উচিত ছিল আরও আগেই ওপরে উঠে যাওয়া। এখন তো আকাশ জুড়ে আগুনের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। ভিক্টোরিয়াও দাহ্য পদার্থে কানায় কানায় ভর্তি। যে কোনো পরিস্থিতিতে আগুন লেগে সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারে।'

বাতাসের বেগ ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর হতে লাগল। বাতাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেলুনটা বারবার ওঠানামা করতে লাগল। পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল যে, যে কোনো মুহূর্তে বেলুনটার সিক্কের কাপড়ের আন্তরনটা ফেঁসে গিয়ে ধ্বংস করে দেওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ব্যাস, এবার শিলাবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

ড. ফারগুসনও হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। তিনি ব্যস্ত-হাতে গ্যাসপাইপে উত্তাপ প্রয়োগ করতে লেগে গেলেন। কড় কড় রবে বাজ দশদিক কাঁপিয়ে তুলছে। বেলুনটার চারদিকে হু হু করে আগুন জ্বলতে লাগল। ফারগুসন বার বার ঈশ্বরের নাম নিতে লাগলেন। এমন প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে ডিক কেনেডি আর জো যেন অকস্মাৎ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। শিলাবৃষ্টির ভেতর দিয়ে ভিক্টোরিয়া দ্রুত ওপরে উঠে যেতে লাগল। পনের মিনিট ধরে ক্রমাগত ওপরে উঠতে উঠতে ভিক্টোরিয়া অনায়াসেই ঝড়ের এলাকা অতিক্রম করে গেল। ঝড়-বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় মাথার ওপরের আকাশ ঝকঝকে চকচকে হয়ে উঠল। চাঁদের কিরণে চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিন অভিযাত্রী নিশ্চল-নিখর পাথরের মূর্তির মতো বসে অভাবনীয় দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে একটু একটু করে দিনের আলো উঁকি দিতে লাগল। বায়ুর চাপে ভিক্টোরিয়া প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। উত্তাপ কমিয়ে ভিক্টোরিয়াকে বার-কয়েক গাছের ডালে নোঙর করানো হয়েছে। ডিক কেনেডি চাপা উত্তেজনা ছুটফুট করতে লাগলেন। হাতের কাছে শিকারের এমন ঢালাও সুযোগ পেয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বেলুনে বসে থাকতে কাহাতক মন চায়। কেবল শিকারই তো নয়, খাবার জলও তো সংগ্রহ করা দরকার। আর এখন ড. ফারগুসনের নোঙর আটকাবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অভিযাত্রীরা আচমকা একটা ধাক্কা অনুভব করলেন। পাহাড়ে নোঙর লেগেছে ভেবে ডিক কেনেডি উল্লসিত হয়ে জোকে ভাড়াভাড়ি মই আটকাতে বললেন।

না, জো মই নামাতে গিয়েও থেমে গেল। পর মুহূর্তেই নোঙরসহ বেলুনটা ছুটে চলল। মনে হল বেলুনটাকে নিয়েই পুরো পাহাড়টাই বৃষ্টি ছুটে চলেছে। নিচের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই অভিযাত্রীদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগার হল। পায়ের তলায় কি যেন বারবার নড়াচড়া করছে।

অতিকায় কোনো সাপ ভেবে ডিক কেনেডি গুলি করার জন্য বন্দুকটাকে হাতে নিয়ে নিলেন।

ফারগুসন বলে উঠলেন, ‘খবরদার! গুলি করবে না। সাপ নয়, ওটা হাতি। নোঙরের দড়িটাকে ঝুঁড়ে পেঁচিয়ে পর্বতপ্রমাণ হাতিটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে। তবু বরাত ভাল যে, অভিযাত্রীরা যেদিকে যেতে চাচ্ছে হাতিটাও নোঙরসমত বেলুনটাকে নিয়ে সেদিকেই ছুটেছে। এবার তীব্র আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে অতিকায় দাঁতালো হাতিটা ছুটেছে তো ছুটেছেই। আসলে তার দাঁত দুটোর ফাঁকে নোঙরটা আটকে গেছে। সাপের গলায় ব্যাঙ আটকালে যা হয়। বেলুনসমত নোঙরটাকে নিয়ে তার পক্ষে আর ছুটোছুটি করা সম্ভব নয়, আবার নোঙরটাকেও খুলতে পারছে না। তাইতো সে আফালন, লঞ্চবাল্প আর দাপাদাপির চূড়ান্ত করে বেড়াচ্ছে।

ড. ফারগুসন কিন্তু হাতির ব্যাপারটা নিয়ে মোটেই উৎকণ্ঠিত নন। কুড়ুল হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেগতিক দেখলেই নোঙরের দড়ি কেটে দিয়ে হাতির কবল থেকে ভিক্টোরিয়াকে মুক্ত করে নেবেন।

বেলুনটাকে নিয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা একনাগাড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল দৈত্যাকৃতি হাতিটা। এবার ডিক কেনেডি আর জোর হাতের বন্দুক এক সঙ্গে গর্জে উঠল। দু-দুটো তাজা গুলি হাতির পেটের দুপাশে বিধল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। সে তখন যন্ত্রণায় তীব্র আত্ননাদ করতে করতে উম্মাদের মতো ছুটতে লাগল।

ড. ফারগুসন প্রমাদ গুনলেন। হাতিটা যেভাবে পাগলের মতো ছুটোছুটি দাপাদাপি করছে তাতে যে-কোনো সময় গাছের ডালে লেগে বেলুনটা ফেঁসে যেতে পারে। তাই ডিক কেনেডি ও জোকে দমাদম গুলি চালাতে বললেন।

যন্ত্রণাকাতর হাতিটা ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। গুঁড় আর দাঁত দুটো সমত তার মাথাটার দাপাদাপি দেখে মনে হল, বেলুনের দোলনা বুঝি ছিঁড়ে গেল। মিনিট দু-তিনের মধ্যেই তার দাঁত দুটো ভেঙে গেল। পর্বত প্রমাণ হাতিটা এবার চার পা ছড়িয়ে এলিয়ে পড়ল। বাস, সব শেষ।

অভিযাত্রীরা এবার মই-বেয়ে বেলুন থেকে নেমে হাতির গুঁড়ের নরম মাংস শুকনো লতাপাতা দিয়ে ঝলসে নিয়ে পরম তৃপ্তিতে ভোজ সারলেন।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ফারগুসন পাইপের উত্তাপ বাড়িয়ে ভিক্টোরিয়াকে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। বেলুনটা এবার ঘণ্টায় আঠারো মাইল গতিতে ছুটে লাগল।

ভিক্টোরিয়া এবার রুমেরি পাহাড়ের চূড়া অতিক্রম করে কারাগোরা পর্বতশ্রেণীর পাহাড় টেসার কাছে হাজির হল। নীল হ্রদের প্রথম অংশটুকু টেসা পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে যে আচ্ছাদন করে রয়েছে আগেই ড. ফারগুসনের জানা ছিল।

ভিক্টোরিয়া ভাসতে ভাসতে পৃথিবীর বিখ্যাত আউকেরিউ হ্রদের ওপর দিয়ে উড়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুনটা কারাগোরার প্রধান শহরের ওপর হাজির হল। হ্যাঁ, শহরই বটে। কয়েকটা লতাপাতার কুঁড়েঘর এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শহরের মানুষগুলো চোখের তারায় বিস্ময়ের ছাপ ঝাঁক অতিকায় উড়ন্ত দানব ভিক্টোরিয়াকে দেখতে লাগল। এখানকার মেয়েরা এমন মোটাসোটা যে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় মাংস আর চর্বি অতিকায় একটা পিণ্ড বুঝি পড়ে রয়েছে। ড. ফারগুসন নিচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বললেন, ‘মি. কেনেডি, এ-দেশের মেয়েদের সৌন্দর্যের বিচার হয় দৈহিক আয়তন দিয়ে। অর্থাৎ যে যত মোটা, তত সুন্দর বলে বিবেচিত হয়। আর মোটা হওয়ার জন্য শৈশব থেকেই এদেরকে বিশেষ ধরনের খোল খাওয়ায়।’

ভিক্টোরিয়া নায়াজা হ্রদের দিকে দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলল। দুদিকে কেবল ছোট-বড় গাছের বিচিত্র সমারোহ। গভীর জঙ্গল। মনুষ্য বসতির চিহ্নমাত্রও নেই। হ্রদের জলে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মনের আনন্দে সিক্কুঘোটকরা খেলায় মেতে রয়েছে।

আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর সন্ধ্যার কাছাকাছি ছোট্ট একটা দ্বীপে পঞ্জীরাজ ভিক্টোরিয়ারকে নোঙর করা হল। চারদিকে যত দ্বীপ নজরে পড়ছে সবগুলোই আসলে ডুবো পাহাড়ের শীর্ষদেশ। এমন একটা দ্বীপে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁরা নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করলেন। কারণ, হ্রদের তীরবর্তী জঙ্গলে অসভ্য জঙ্গলিদের আস্তানা। খুবই হিংস্র। নরখাদক বলে তাদের সুখ্যাতি কম নয়।

বাড়িঘর ছেড়ে, এত কষ্ট স্বীকার করে, প্রাণটাকে হাতের মুঠোয় করে যে অপূর্ব সুন্দর দৃশ্যকে চাক্ষুষ করার জন্য চরমতম বিপদের ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে সেই নীলনদের উৎসস্থল প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে চলে এসেছে।

এ নিয়ে কিন্তু ডিক কেনেডি বা জোর এডটুকুও উৎসাহ বা কৌতূহল নেই। তাই তারা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

তখন ভোর চারটে বাজতে চলেছে। ড. ফারগুসন নোঙর তুলে ভিক্টোরিয়াকে আবার সচল করলেন। তীব্র বাতাসের কাঁধে চেপে ভিক্টোরিয়া এবার ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে ছুটতে লাগল। বেলা ন’টার কাছাকাছি অভিযাত্রীরা নায়াজা হ্রদের পশ্চিম পাড়ে পৌঁছে গেলেন। আকাশচুম্বী গাছের গভীর জঙ্গল আর অদূরবর্তী মরুভূমি ছাড়া এ-অঞ্চলে আর কিছুই নজরে পড়ল না।

ভিক্টোরিয়া আরও কিছুটা অগ্রসর হতেই ড. ফারগুসন উচ্ছসিত আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, ‘মি. কেনেডি, আরবদের কথাই দেখা যাচ্ছে শতকরা এক শো ভাগ সত্যি। তারা বলেছে, একটা নদী দিয়ে বিশালায়তন আউকেরিও হ্রদের জল কুলকুল করে বয়ে চলেছে। ওই—ওই যে সেই নদী। আর ওটাই হল আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত নীলনদ।’

‘নীলনদ! নীলনদ ওটা! দেখি দেখি—’ কথা বলতে বলতে ডিক কেনেডি নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে নদীটাকে দেখতে লাগলেন।

নীলনদের ওপর দিয়ে ভিক্টোরিয়া বাতাসের টানে নেচে নেচে হেলদুলে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে বারবার ধাক্কা খাওয়ার তার সে কী ভয়ঙ্কর তর্জন গর্জন, অভিযাত্রীদের কানে তালা লেগে যাওয়ার জোয়ার হল। নদীর জল গতির স্বাভাবিকতা বার বার হারিয়ে ফেলায় ফুলে ফেঁপে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

চোখের তারায় বিশ্বয়ের ছাপটুকু অব্যাহত রেখেই ডক কেনেডি বলে উঠলেন, 'ড. ফারগুসন, এটাই যে নীলনদ এ-ব্যাপারে আপনি কি করে নিঃসন্দেহ হলেন? আপনার ধারণাই যে সত্যতারই বা প্রমাণ কি?'

'নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তো রয়েছেই। কিন্তু জোরদার প্রমাণ দিতে গেলে নীলনদের পাড়ে নামতে হয়। কিন্তু এখানকার মানুষগুলো যেমন হিংস্র ও নরমাংস লোভী, ভাবলেই কলজে চিপসে যায়। দেখছেন না মশাই, আমাদের দেখেই সোল্লাসে কেমন লাফলাফি জুড়ে দিয়েছে। আর তাদের তর্জন গর্জন আশা করি কিছু না কিছু কানে আসছে।'

ডিক কেনেডি বললেন, 'আমি এখানে নামব। আমাকে যে নামতেই হবে।'

'নামলে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না, স্মরণ থাকে যেন।'

'তবুও নামব। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের মনে আতঙ্কের সঞ্চার করে, তাড়িয়ে হলেও আমাকে নামতেই হবে ড. ফারগুসন।'

বাতাস উত্তপ্ত করে ফারগুসন বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিলেন। আড়াই হাজার ফুট ওপর থেকে অভিযাত্রীরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চারদিক থেকে সূতোর মতো নদী নীলনদে মিশে যে স্বর্গীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছে তা মন-প্রাণ ভরে উপভোগ করতে লাগলেন।

একটু বাদেই ড. ফারগুসন সোল্লাসে চৈতন্যে উঠলেন, 'পযর্টক ডিবোনা যে জল-প্রপাতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেই জলপ্রপাত আজ আমাদের চোখের সামনে, ভাবা যায়।'

ড. ফারগুসন আফ্রিকার মানচিত্রটা চোখের সামনে মেলে ধরে ভাবতে লাগলেন, 'যারা উত্তর দিক থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন তাদের আবিস্কৃত জায়গায় তাঁরা পৌছোতে পারেন নি। আরও নব্বই মাইল অগ্রসর হতে পারলে তবে গণডোকোরা মিলতে পারে। তিনি এবার ভিক্টোরিয়াকে ক্রমে নিচে নামাতে লাগলেন। এখানে নীলনদ মাত্র সাত-আট হাত। কিন্তু পার্বত্য গতিপথের জন্য স্রোত খুবই বেশি।'

বেলুনটা যতই এগিয়ে চলেছে নদীও ক্রমেই চওড়া হচ্ছে। কয়েকটা কাফ্রি বিষমাখা তীর-হাতে চলন্ত ভিক্টোরিয়ার দিকে তাকিয়ে জোর হিম্বিত্ত্ব করতে লাগল। ডিক কেনেডি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

ড. ফারগুসন একটু বাদে ভিক্টোরিয়াকে ছোট্ট একটা দ্বীপে নামাতে চেষ্টা করলেন। গাছের ডালে নোঙর করার উদ্যোগ নিতেই দ্বীপের প্রায় কুড়িজন কাফ্রি গাছের ছালের তৈরি টুপি মাড়িয়ে নাচানাচি জুড়ে দিল। ডিক কেনেডি বন্দুকের গুলিতে একজনের মাথার টুপি উড়িয়ে দিতেই সবাই প্রাণ ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। ঝপাঝপ নীলনদের জলে পড়তে লাগল।

অভিযাত্রীরা বেলুন থেকে নামলেন। কয়েক পা এগিয়ে পাথরের গায়ে কিসব উৎকীর্ণ দেখে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দুটোমাত্র ইংরেজি অক্ষর 'এ' এবং 'ডি' লেখা। তিনি এবার মুখ খুললেন, 'মি. কেনেডি, 'এ' অর্থ বুঝাচ্ছে 'আন্ড্রিয়া' আর 'ডি' বুঝাচ্ছে, 'ডিবোনা'। আন্ড্রিয়া ডিবোনোই নীলনদের সবচেয়ে উত্তরসীমা পর্যন্ত পৌছতে পেরেছিলেন।'

সোল্লাসে দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

অভিযাত্রীরা তীর্থক্ষেত্র নীলনদের উৎসস্থল দেখার পর মহানন্দে আবার ভিক্টোরিয়ায় চাপলেন। দুদিন এক নাগাড়ে চলার পর তাঁরা একটা আকাশচুম্বী গাছের দিকে তাকিয়েই বিশ্বয়ে হতবাক হয়ে গেলেন। দেখলেন, গাছের ডালে ডালে অসংখ্য সাদা সাদা নরকঙ্কাল ঝুলছে।

এরা সবাই কোনো না কোনো কারণে পরিবার ও সমাজের চোখে অপরাধী বিবেচিত হয়েছিল। অপরাধীদের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের আহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। তারপর তাদের কঙ্কাল এখানে এনে ঝুলিয়ে রেখে, সমাজের মানুষদের অপরাধ সন্মুখে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই এ-ব্যবস্থা। আফ্রিকার দক্ষিণাংশের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে, অপরাধী ও তার বো-ছেলে-মেয়েদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। যন্ত্রণায় দম্ব হতে হতে তারা তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করে।

এমন নৃশংস নারকীয় বিধানের কথা শুনে ডিক কেনেডি আঁতকে উঠলেন।

একটু বাদে গাছের ডালে ইয়া পেল্লাই কয়েকটা ঈগল পাখি দেখে জো আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। যে-কোনো সময় একটা মানুষকে নিয়ে এরা আকাশপথে উড়ে যেতে পারে। এমন সাক্ষাৎ যমদূতকে সামনা-সামনি দেখলে ভয়ে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ার কথাই তো বটে।

ভিক্টোরিয়া ধীর-মধুর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এমন সময় পায়ের তলায় এক অভাবনীয় দৃশ্যের দিকে অভিযাত্রীদের নজর পড়ল। দুটো দল পরস্পরের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে মেতেছে। আকাশের গায়ে শুধুই বিষমাখা তীরের আনাগোনা। মাথার ওপরে চলমান ভিক্টোরিয়াকে দেখে যুদ্ধবাজরা কর্তব্য স্থির করতে না পেরে গলা ছেড়ে হাত নেড়ে নেড়ে চৈতন্যে লাগল।

গ্যাসে তাপ প্রয়োগ করে ফারগুসন মুহূর্তের মধ্যেই বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিলেন। পায়ের তলায় তুমুল যুদ্ধ চলতে লাগল। ডিক কেনেডি অবশ্য তাদের যুদ্ধে বাধা দান করতে চেয়েছিলেন। বিপদের আশঙ্কায় ফারগুসন বেলুনটাকে যুদ্ধবাজ অসভ্য-দৃশ্যে জঙ্গলিদের বিষমাখা তীরের পাহারার বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

কোনো কোনো যুদ্ধবাজ শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করে তার বাহু থেকে কামড়ে কামড়ে মাংস খেতে লাগল। চোখের সামনে এমন বীভৎস নারকীয় দৃশ্য দেখে ডিক কেনেডি আঁতকে উঠে বললেন, 'দেখছেন! দেখছেন ড. ফারগুসন, জঙ্গলিগুলো কেমন রাফসের মতো মানুষের মাংস চিবোচ্ছে! পিশাচ! একেই বলে নরপিশাচ!'

কথা বলতে বলতে মাংস ভক্ষণরত লোকটাকে তাক করে ডিক কেনেডি তীব্র আক্রোশে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়লেন।

অব্যর্থ লক্ষ্য। এক গুলিতে নরখাদকদের পিশাচ-সর্দারটা বিকট আর্তনাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। মাটিতে পড়ে বার-কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করেই সে এলিয়ে পড়ল। ব্যস, যত হৃদয়ঙ্গম সব খতম। এবার যোদ্ধারা নেতাহীন হয়ে পড়ায় হতাশ হয়ে পালাতে লাগল। অন্য পক্ষ নরমাংসের ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করে দিল।

গাছের ডালে ভিষ্টোরিয়াকে নোঙর করে অভিযাত্রীরা রাাত্রি কাটাতে লাগলেন। জমাটবাঁধা অন্ধকারের জন্য তারা বুঝতে পারছেন না, কোথায় অবস্থান করছেন। অতএব সতর্কতা অবলম্বন করতেই হল। তারা পালা করে ঘুমোতে লাগলেন।

ডিক কেনেডি বন্দুক-হাতে রাাত্রি জেগে প্রহরায় নিযুক্ত। ড. ফারগুসন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন সময় ডিক কেনেডির চোকের সামনে অনুজ্জ্বল একটা আলোকরশ্মি ভেসে উঠল। পর মুহূর্তেই সেটা আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কেনেডি ভাবলেন, একী মরুভূমির মরীচিকা, নাকি অন্য কোনো অলৌকিক ব্যাপার-স্বাপার? এবার তাঁর মনে হল, কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। চাঁদের মৃদু আলোয় অকস্মাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়েকটা ছায়ামূর্তি। রহস্যজনক ছায়ামূর্তিগুলো কিন্তু নিশ্চল নয়, বরং চঞ্চল—হরদম নড়াচড়া করছে।

ব্যস্তকণ্ঠে ফারগুসন আর জোকে ডেকে তুললেন। ঝট করে বন্দুকটা হাতে করে সাধ্যমত কম শব্দ করে জোকে নিয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসলেন।

কয়েকমুহূর্তের মধ্যেই খসখস শব্দ কানে গেল। অব্যাহত সে-শব্দটা ক্রমে ওপরে, তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সাপ, নাকি জন্তু-জানোয়ার?

জো অতর্কিতে গাছের গুঁড়ির দিকে বন্দুক তাক করল। তাতক্ষণে আরও ওপরে উঠে যাওয়ায় দেখতে পেলেন, কয়েকজন কাক্সি সম্ভরণে গাছে উঠছে। আর অনুভব করছে কি যেন বলছে।

ব্যস, আর মুহূর্তমাত্র দেরি না করে জো-এর হাতের বন্দুক গর্জে উঠল। বিকট আর্তনাদ কানে এল। কাক্সিরা তীব্র হুঙ্কারে রাাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগল। এমন সময় কোলাহল ভেদ করে যেন কার কণ্ঠ শোনা গেল। ফরাসি ভাষায় কে যেন আর্তনাদ করছে—'বাঁচাও! বাঁচাও! কে, কোথায় আছ বাঁচাও'। আকুল আবেদনে অভিযাত্রীদের রক্ত হিম হয়ে আসার জোগাড় হল।

উদ্বেগ-উৎকর্ষা বুকে নিয়ে তিন অভিযাত্রী মিলিত হলেন। ডিক কেনেডি অন্ধকার ও অনিশ্চিত বিপদকে অগ্রাহ্য করে বিপদাপন্ন অজ্ঞাতপরিচয় ফরাসি ভ্রমলোকটিকে উদ্ধার করার জন্য যাত্রার উদ্যোগ নিলেন নইলে রাাত্রির অন্ধকারেই জঙ্গলিরা তাকে হত্যা করে ফেলবে। বাধা দিয়ে ড. ফারগুসন বললেন, 'না, এরকমটা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ, তারা দিনের আলো ছাড়া কাউকেই হত্যা করে না। আমরা বরং বেলুনটাকে ফরাসি ভ্রমলোকটার কাছে নিয়ে যাই। তাকে এতে তুলে নিই। অনাহারে আর নির্ধাতনে তাঁর ওজন অবশ্যই ষাট কেজির বেশি হবে না। বেলুন থেকে সে পরিমাণ ওজনের দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দিলেই আমাদের চারজনকে নিয়ে এটা দিবা শূন্যে উড়ে যেতে পারবে।'

ড. ফারগুসনের কথায় সবাই সন্মত হলেন। এবার বেলুনের সামান্য গ্যাস ছেড়ে দিয়ে সেটাকে নিচে নামানো হল সার্চ লাইটের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে ফেলে বিপদগ্রস্ত ফরাসি ভ্রমলোক খোঁজ করতে গিয়ে অভ্যাসার্ঘ্য এক দৃশ্য তাঁরা দেখতে পেলেন, গোটা চল্লিশেক কুঁড়েঘর, চারদিকে আশঙ্কিত। কুঁড়েঘর গুলার মাঝখানে একমাঠের মধ্যে শূল পোতা। শূলের গোড়ায় একটা দেহ পড়ে রয়েছে। প্রায় উল্লস এক ফরাসি পাদরি। বুকের ওপর একটা ক্রশ ধরে রেখেছে। আর শূলটাকে ঘিরে অগণিত কাক্সি দাঁড়িয়ে। সবার চোখেই আতঙ্ক মিশ্রিত কৌতূহলের ছাপ। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত পাদরির শরীর ক্ষত বিক্ষত। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে।

ঠিক তখনই অভ্যাসার্ঘ্য একেবারে অবিশ্বাস্য একদৃশ্য দেখে কাক্সিরা রীতিমতো আতঙ্কিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল, আকাশ থেকে একটা অতিকায় ধূমকেতু নেমে আসছে। তারা পড়ি কি মরি করে ছুটে পালিয়ে প্রাণ বাঁচার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। এ সুযোগে অভিযাত্রীরা মুমূর্ষু ফরাসি পাদরিকে বেলুনে তুলে নিলেন।

ড. ফারগুসন ঝটপট বেলুনের গ্যাস উত্তপ্ত করে বেলুনটাকে শূন্যে গুঁঠার ব্যবস্থা করলেন। না, তবুও বেলুনটা উঠল না, বার-কয়েক নাড়াচাড়া করল মাত্র। একজন কাক্সি বেলুনটাকে নিচে থেকে টেনে ধরে রেখেছে। ড. ফারগুসনের নির্দেশে জরের বাক্সটা ফেলে দিতেই আচমকা বেলুনটা লাফিয়ে, এক ঝটকায় প্রায় তিন শো ফুট ওপরে উঠে গেল। দুঃসাহসী কাক্সিটা হাতের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। হাড়গোড় বেঙ্গে একেবারে থেতলে গেল।

হতভাগা কাফ্রিটা বেলুন ছেড়ে দিতেই সেটা আচমকা এক পাশে হেলে পড়ল। পর মুহূর্তেই আবার সোজা হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। ড. ফারগুসন এবার বৈদ্যুতিক তার বিচ্ছিন্ন করে সাঁচ লাইটের আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

কাফ্রিদের কাছ থেকে উদ্ধার করেও অদৃষ্টবিড়ম্বিত ফরাসি পাদরিকে যমের কবল থেকে উদ্ধার করা গেল না। তিনি শূন্যে, চলন্ত বেলুনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে ফরাসি পাদরি তাঁর অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা যা বলেছিলেন। তা মোটামুটি এরকম, 'তাঁর বাড়ি ব্রিটানি প্রদেশের অখ্যাত-অবজ্ঞাত আবাতান গ্রামে। খুবই গরিব। কুড়ি বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর এ-আফ্রিকায় হাজির হন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও পথ শ্রম অগ্রাহ্য করে রোজ সাধ্য মতো পথ পাড়ি দিয়ে দিয়ে শেষপর্যন্ত আফ্রিকার মাটিতে পা দিতে সক্ষম হন। ন্যামবরা জাতের কাফ্রিরা খুবই নির্মম প্রকৃতির। স্নেহ-মায়ামমতা কি জিনিস তা তাদের অজ্ঞাত। তাদের নিষ্ঠুরতায় তিনি যে কতভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তা বলে শেষ করা যাবে না। তিনি অবশ্য এদেশ ছেড়ে ফিরেও যেতে পারতেন। কিন্তু ধর্ম প্রচারের ব্রত নিয়ে একবার যখন দেশ ছেড়েছেন তখন আর ফেরা সম্ভব নয়। এগিয়েই চললেন। কাফ্রিরা তাকে বন্ধ পাগল বলে ঠাওরাল। এরকম বিশ্বাস যতদিন তাদের মধ্যে ছিল ততদিন তিনি নিরাপদেই ছিলেন। ন্যামবরা জাতের মধ্য সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতি বারাক্রি সম্প্রদায়ের জঙ্গলিরা। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন তিনি কাটান। ক'দিন বাদে তাদের সর্দারের মৃত্যু হয়। তাদের বিশ্বাস, পাদরির তুচ্ছতাকের ফলেই তার মৃত্যু হয়েছে। তাই রাত্রের অন্ধকার থাকতে থাকতে তাকে শুলে চড়িয়ে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়েছিল। তারপরই ঈশ্বরের আশীর্বাদস্বরূপ অভিযাত্রীরা সেখানে উপস্থিত হন এবং হিংস্র আর নৃশংস বারাক্রিদের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করেন।'

ভিক্টোরিয়া আবার বাতাসের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলল। সন্ধ্যা হতে না হতেই অভিযাত্রীরা দেখলেন, পশ্চিম-আকাশের গায়ে আগুনের হুঙ্কা।

ড. ফারগুসন কাঁপ কাঁপা গলায় উদ্ভাষণ করলেন, 'আগুন! আগুন-পাহাড়! আগুন-পাহাড়ের আগুন!'

ডিক কেনেডি প্রায় আত্নানাদ করে উঠলেন, 'হায়!' একী সর্বনেশে কাণ্ড হতে চলেছে। বাতাস যে বেলুনটাকে আগ্নেয়গিরিটার দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

ড. ফারগুসন তাঁকে আশ্বাস দিলেন, আগুন-পাহাড়টার ওপর দিয়েই ভিক্টোরিয়া তাদের নিরাপদে নিয়ে যাবে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে ভিক্টোরিয়া আগুন-পাহাড়টার কাছাকাছি যেতেই ফারগুসন বাতাসের উত্তাপ বাড়িয়ে সেটাকে দু হাজার ফুট ওপরে তুলে নিলেন। ব্যস, দিবা নিরাপদে তাঁরা আগুন-পাহাড়টাকে ডিঙিয়ে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকার কেটে পূর্ব-আকাশে ভোরের আলো উঁকি দিল। সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। ভিক্টোরিয়া প্রথমে একটা পর্বত-চূড়া তারপর মরা-আগুন পাহাড়ের জ্বালামুখ, শুকনো নদীখাত, আর অতিকায় বহু পাথরের টুকরো অতিক্রম করে এগিয়ে চলল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর আসতেই ফারগুসন গ্যাসের উত্তাপ কমাতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য ভিক্টোরিয়াকে নিচে নামিয়ে নিয়ে ফরাসি পাদরির মৃতদেহটা সমাধিস্থ করবেন।

ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করে অভিযাত্রী তিনজন ঝপপট ফরাসি পাদরির মৃতদেহটা সমাধিস্থ করে ফেললেন। জায়গাটা একটা সোনার খনি। চারদিকে বহু পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যাদের মধ্যে রয়েছে অমূল্য খনিজপদার্থ—সোনা।

জো কিছু সোনা সঙ্গে নিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ড. ফারগুসন তার পিঠ চাপড়ে মুচখি হেসে বললেন, 'কেন মিছে ব্যস্ত হচ্ছে জো? ফরাসি পাদরির কথা ভেবেও কি বুঝছ না, সঙ্গে কিছুই যাবে না।' আর আমরা তো আর অর্থের তন্নাশে বেরোই নি। সবচেয়ে বড় কথা পকেট দুটোতে কত সোনাই বা নিয়ে যাওয়া যাবে, বল তো? তার চেয়ে বরং জায়গাটার অবিস্থিতি ভাল করে লক্ষ্য করে নাও। ইংল্যান্ডে গিয়ে সোনার কথা চাউর করে দিও। যার দরকার এখানে এসে বস্তা বোঝাই করে সোনা নিয়ে যাবে।'

জোর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বালির বস্তা ফেলে দিয়ে তার জায়গায় সোনা তুলে নেওয়া হবে। ব্যস, আর দেরি নয় জো ঝটপট সোনা দিয়ে পাটাতনটা বোঝাই করে ফেলল।

গ্যাস গরম করা হল। বেলুন কিন্তু এতটুকুও নড়ল না। সোনার ঢেলা ফেলতে ফেলতে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা ফেলে দিয়ে তবে ভিক্টোরিয়াকে সচল করা গেল। কিন্তু তার গতি খুবই মন্ডুর। দশদিন ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে ভিক্টোরিয়া মাত্র অর্ধেক পাড়ি দিয়েছে। সোনার পাহাড় থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল আসতে পেরেছে। অথচ সংগ্রহে থাকা, জলের পরিমাণ মাত্র ত্রিশ গ্যালন। তা থেকে ভবিষ্যতের জন্য গ্যালন পাঁচেক জল সরিয়ে রেখে যন্ত্রের জন্য রাখলেন বাকিটুকু। দুগ্যালন জল দিয়ে চার শো আশি ফুট গ্যাস, তৈরি করা যায়। প্রতি ঘণ্টার জন্য ভিক্টোরিয়ার চাই ন' ঘনফুট গ্যাস। আর মাত্র চুয়ান্ন ঘণ্টা কোনোরকমে চালিয়ে নেওয়া যাবে। জল চাই-ই চাই। কিন্তু রাতে আর এগোলে নদী বা ঝরণা নজরে পড়বে না। আর পানের জন্যও এখন থেকে যত কম সম্ভব জল খরচ করা দরকার।

রাত্রিটা নিরাপদে কাটিয়ে আবার বেলুনটাকে শূন্যে ওড়ানো হল। সূর্যের তেজ খুবই। ড. ফারগুসন ইচ্ছা করলে বেলুনটাকে অনেক ওপরে তুলে নিতে পারতেন। কিন্তু প্রচুর গ্যাস খরচের সম্ভাবনায় তা আর করলেন না। দুপুর পর্যন্ত মাত্র মাইল বারো পথ পাড়ি দিতে পাল বেলুনটা।

ফরাসি পাদরির জান বাঁচাতে গিয়ে এক পাউন্ড জল ফেলে না দিলে সূর্যের উত্তাপেই হাইড্রোজেন গ্যাস ফুলে উঠে বেলুনটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারত। দিনের শেষে সূর্য অস্ত গেলে দেখা গেল মাত্র কুড়ি মাইল পথ অভিযাত্রীরা পাড়ি দিতে পেরেছেন।

সকাল হতেই আবার প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে সূর্য পূর্ব-আকাশে উদয় হল। পায়ের তলার বালিতে সূর্যের কিরণ পড়ায় সেগুলো হীরার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল।

এক সময় আবার রাত্রির অন্ধকার চারদিক ঢেকে ফেলল।

ড. ফারগুসন-এর মনে হতাশা জেগে উঠল। চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগলেন, “মি. কেনেডি আর জোকে কেন যে সঙ্গী করতে গেলাম। এদের অকাল মৃত্যু আমিই ডেকে আনলাম। ভুল! চরম ভুল করেছি।”

সকাল হলে ড. ফারগুসন দেখলেন, জলের পরিমাণ আর মাত্র পাঁচ পাউন্ড অবশিষ্ট রয়েছে। পাঁচ শো ফুট ওপরে বেলুনটা উঠে গেলেও দেখা গেল বাতাস নেই। ওপরে বা নিচে কোথাও বাতাসের লেশমাত্র নেই।

ড. ফারগুসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমরা এখন মরুভূমির ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করছি। আফ্রিকার এক প্রান্তে জঙ্গল, শস্যক্ষেত্র, আর খাল আর অন্যদিকে বিস্তীর্ণ মরুভূমি। প্রকৃতি দেবীর কী অদ্ভুত খেলা!’

এমন সময় হঠাৎ দৃশ্যন কোণে এক টুকরো মেঘ উঁকি দিল। কিন্তু এ-মেঘের ওপর ভরসা করা যায় না। ডিক কেনেডির পরামর্শে ড. ফারগুসন ভিক্টোরিয়াকে মেঘের কাছাকাছি নিয়ে গেলেন। আশ্চর্য ব্যাপার। সেখানেও বাতাসের লেশমাত্রও নেই। আসলে মেঘের মধ্যে এক ফাঁটা জলও নেই।

এমন সময় জো দূরবর্তী একটা ভাসমান বস্তুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—‘ওই—ওই যে আর একটা বেলুন শূন্যে ভেসে চলেছে!’

ড. ফারগুসন প্রথমে ওটাকে মরীচিকা। চোখের ভুল বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু জো এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সেটাকে একটা বেলুন বলে দাবি করতে লাগল যার ফলে তিনি তাকে পতাকা-সঙ্কেত জানাতে বলতে বাধ্য হলেন।

ডিক কেনেডি পতাকা নেড়ে বেলুনটার উদ্দেশ্যে সঙ্কেত করতেই বিপরীত দিককার বেলুনযাত্রীরা পতাকা নেড়ে জবাব দিল।

ড. ফারগুসন এবার মুচকি হেসে বললেন, ‘মি. কেনেডি, এবার বিশ্বাস হচ্ছে তো, ওটা বেলুন নয় মরীচিকাই বটে। ওটা আসলে আমাদের বেলুনেরই ছায়া ছাড়া কিছুই নয়।’

এবার হাত নেড়ে ইশারা করে দেখা গেল বিপরীত দিককার বেলুন থেকেও একই রকম ইশারা করছে।

জো, এমন কি ডিক কেনেডি পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, ওটা মরীচিকাই বটে।

ড. ফারগুসন বললেন, ‘আসলে বাতাস কমে গেলে মরুভূমিতে এমন কত ভেক্সিই যে দেখা যায় তার ইয়ত্তা নেই।’

এমন সময় এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে অভিযাত্রীরা চমকে উঠলেন। যতদূর নজর চলে কেবল মানুষের কঙ্কাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। কয়েকটা কঙ্কাল একটা পাতকুঁয়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ড. ফারগুসন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘জরের খোঁজে মানুষ হনো হয়ে ছুটে আসে শুকনো পাতকুঁয়ার ধারে। মেঘ পর্যন্ত হতাশ হয়ে জল না পেয়ে তৃষ্ণায় মুহূর্তব্যবরণ করে। আর যারা পাতকুঁয়াটা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি তারা পথেরই মারা গেছে।’

না, জল পাওয়া গেল না। সকাল হলে ফারগুসন আবার ভিক্টোরিয়াকে শূন্যে ওড়ালেন। ফারগুসন বললেন, ‘সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমাদের পক্ষে আর মাত্র ছ’ঘণ্টা যাওয়া সম্ভব হবে তারপরই সব খতম হয়ে যাবে।’ থার্মোমিটারে দেখা গেল, উত্তাপ এক শো তেরো ডিগ্রি; হতাশ হয়ে জো আর কেনেডি গুয়ে পড়লেন। বাঁচার আশা যখন নেই-ই তখন শেষ সময়টুকু আরাম আয়েশের মধ্যেই কাটানো যাক।

বেলা যত বাড়ছে, রোদের তেজও তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে। ফলে থার্মোমিটারের পারদ চৌ-চৌ কৈরে বাড়তে লাগল। তৃষ্ণায় অভিযাত্রীদের কলিজা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল। পায়ের তলায় চলছে মরুভূমির নিরবচ্ছিন্ন চোখ রাঙানি। সঞ্চলমাত্র দু বোতল গরম জল। তবুও তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভিযাত্রীরা অসহায়ভাবে জিত দিয়ে চৌট দুটো চাটতে লাগল। প্রাণ গেলেও সে জলটুকুতে হাত দেওয়ার উপায় নেই।

ড. ফারগুসন অনুশোচনায় দম্বে মরতে লাগ হলেন। গ্যাস তৈরি করতে গিয়ে যে-জলটুকু খরচ করেছেন তা না করলেই ভাল হল। এতে যাট মাইল আসা গেছে বটে। কিন্তু তা না করলে আরও ন’ দিন দিবা চলে যেত। মেঘের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে গিয়েই তিনি প্রমাদটো ঘটিয়েছেন।

ড. ফারগুসন শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে মেশিনে উত্তাপ সৃষ্টি করে বেলুনটাকে তুলে নিতে লাগলেন। ক্রমে সেটা বহু ওপরে উঠে গেল বটে, কিন্তু বাঞ্ছিত বায়ু পেলেন না।

শেষ! জল শেষ! মরুভূমির একমাত্র ভরসা জল, নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। ভিক্টোরিয়া ক্রমে নামতে নামতে যেখান থেকে উঠেছিল সেটা আবার সেখানেই নেমে এল।

সূর্য তখন ঠিক মাথার ওপরে। দুপুর। সেখান থেকে ড. ফারগুসন হিসাব নিকাশ করে দেখলেন, এখান থেকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের দূরত্ব প্রায় চার শো মাইল আর চ্যাড-হ্রদ পাঁচ শো মাইলের কাছাকাছি।

ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ভিক্টোরিয়া মরুভূমির বাসি স্পর্শ করা মাত্র জো আর ডিক কেনেডির তন্দ্রা কেটে গেল। সঙ্গে বিস্কুট রয়েছে বটে। কিন্তু সেগুলো স্পর্শও করলেন না কেউ। কেবলমাত্র এক চোক করে জল দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন।

সকাল হল। ফারগুসন দেখলেন, পানের জন্য ব্যয় করার মতো মাত্র আধ সের খানেক জল রয়েছে। সেটুকু আড়ালে সরিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তাপ বেড়ে এক শো চল্লিশ ডিগ্রিতে দাঁড়াল। জো আকুলি-বিকুলি শুরু করে দিল, 'জ্বলে গেল! গায়ে ফোঁকা পড়ে গেল!'

ডা. ফারগুসন অভয় দিতে গিয়ে বললেন, 'আরে, এত মুষ্ণু পড়লে চলবে কেন! মরুভূমিতে এত গরম পড়ার লক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'

না, তাঁর মিথ্যা প্রবোধে কোনো কাজই হল না। ডিক কেনেডি আর জো কাউকেই তিনি চাঙা করতে পারলেন না। বরং কেনেডির মধ্যে অল্প অল্প করে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল।

দিনের আলো নিভে এল। রাত্রির অন্ধকার চারদিক ছেয়ে ফেলেলে ড. ফারগুসন বহুভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন ডিক কেনেডি আর জোকে একটু হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াতে। তাঁর ধারণা, এতে ডিক কেনেডির বিকারদশা কিছুটা কাটতে পারে। বৃথা চেষ্টা তাঁরা উভয়েই এলিয়ে পড়ে রইলেন। শেষপর্যন্ত ড. ফারগুসন একাই বালির ওপর দিয়ে হাঁটাচলা করতে লাগলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? একটু বাদেই তিনি বালির ওপর দুম করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ব্যস মুহূর্তে সংজ্ঞা লোপ পাওয়ায় চার হাত-পা ছড়িয়ে বালির ওপর পড়ে রইলেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি দেখলেন, জো তার মাথার কাছে বসে। বিষণ্ণ মুখে তাঁর ওপর ঝুঁকে বসে রয়েছে। সে প্রস্তাব দিল, কয়েকটা বিস্কুট নিয়ে জলের খোঁজে যেতে আর্থ্রী। যদি জল পায় তবেই ফিরে আসবে, নতুবা আর কোনোদিনই ফিরবে না। কিন্তু ড. ফারগুসন তার প্রস্তাবে সম্মত হলেন না।

সকাল হল। ব্যারোমিটারের দিকে দৃষ্টিপাত করে ফারগুসন দেখলেন, বায়ুচাপমানযন্ত্র ঝড়ের কোনো পূর্বাভাসই দিচ্ছে না। সূর্য তেমনি রক্তচক্ষু মেলে রয়েছে। বালিও তেমনি উত্তপ্ত, আর আকাশে মেঘের লেশমাত্রও নেই।

ডিক কেনেডি এক ঢোক জলের জন্য যারপরনাই কাতর হয়ে পড়লেন। নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আচমকা নিজেরই একটা আঙুল কামড়ে ধরলেন। হাতের কাছে ছুরি থাকলে হয়ত শিরা কেটেই রক্ত পান করে তৃষ্ণা মেটাতে ইতস্তত করতেন না। কেবলমাত্র ডিক কেনেডিরই নয়, ড. ফারগুসন আর জোয়ের মধ্যেও অল্প-বিস্তর উন্মত্ততা লক্ষিত হল। ডিক কেনেডি ঝিমিয়ে পড়লেন। তাঁর পাশে ড. ফারগুসনও শুয়ে চোখ বন্ধ করে নিঃশাড়া অবস্থায় পড়ে রইলেন। সুযোগ বুঝে জো এক লাফে এগিয়ে গিয়ে জলের বোতলটা বের করে গলায় ঢালার চেষ্টা করলেন। ঠিক সেমুহূর্তে ডিক কেনেডি চোখ মেললেন। বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'জল! একটু জল দাও! তৃষ্ণায় আমার কলিজাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

জো তাঁর হাতে বোতলটা তুলে দিল। দুচোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তিনজনই অচৈতন্য অবস্থায় সারাটা রাত্রি বেলুনের ওপর এলিয়ে পড়ে রইলেন। ভোর হল। গনগনে আগুনের পিণ্ড সূর্যটা আগুনের লুকা ছড়াতে ছড়াতে আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। জো আর কেনেডির সংজ্ঞা ফিরে এল।

ডা. ফারগুসন নিশ্চল-নিখরভাবে বসে। দৃষ্টি দূরে, বহু দূরে—লক্ষ্যহীন।

ডিক কেনেডি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না। আচমকা বন্দুকটা তুলে নিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো তার নলটা নিজের মুখে ঢুকিয়ে দিলেন। ট্রিগারে আঙুল রাখতেই জো ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর হাতটা চেপে ধরল। এবার দুজনের জাণ্টাজাপ্তি শুরু হয়ে গেল।

ড. ফারগুসন তখনও পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল নিখর ও নির্বিকার।

ডিক কেনেডির হাত থেকে হঠাৎ বন্দুকটা পড়ে যেতেই বিকট আওয়াজ করে গুলিটা বেরিয়ে গেল।

ঠিক তখনই দূর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ড. ফারগুসন বলে উঠলেন, 'ওই — ওই দেখ, ঝড় আসছে! প্রবল বেগে ঝড় ছুটে আসছে!'

কিছু সোনা ফেলে বেলুনের ওজন কমানো হল। চোখের পলকে সূর্যটা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কালো মেঘে দ্রুত আকাশটা ছেয়ে গেল।

ঝড় উঠল। প্রলয়ঙ্কর ঝড়। ঝড়ের দাপটে বেলুনটা এক লাফে অনেকটা ওপরে উঠে গেল। ছুটে চলল উল্কার বেগে।

তখন বেলা তিনটের কাছাকাছি। ঝড়ের বেগ কমে গেছে। অভিযাত্রীরা লক্ষ্য করলেন, পায়ের তলায় বালির পরিবর্তে এখন সবুজ বনভূমি বিরাজ করছে। মরুঝড়ের বাহাদুরি আছে বটে। বেলুনটাকে চার ঘণ্টায় দু শো চল্লিশ মাইল পথ নিয়ে চলে গেছে।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে নামিয়ে নিয়ে এলেন। একটা গাছে সেটাকে নোঙর করলেন। ডিক কেনেডি আর জো গাছ বেয়ে নিচে নেমে এলেন। জলের খোঁজে উম্মাদের মতো ছুটতে লাগলেন। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ, জিভ ক্ষতবিক্ষত। মাটির ওপরের ইয়া পেল্লাই বহু পায়ের ছাপ। এদিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিকতা তাদের নেই।

হঠাৎ কিসের যেন গম্ভীর গর্জনে বনভূমি কঁপে উঠল। একবার নয়, বেশ কয়েকবারই ভয়ঙ্কর সে গর্জনটা শোনা গেল। হ্যাঁ, অনুমান অসম্ভব বটে। আরও সামান্য এগোতেই তাঁরা অতিকায় একটা সিংহকে ঘন ঘন লেজ নাড়তে দেখতে পেলেন।

ডিক কেনেডি যন্ত্রচালিতের মতো বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ট্রিগারে চাপ দিতেই সিসার গুলিটা ক্রোধোন্মত্ত সিংহটার গায়ে আঘাত হানল। বিকট আওয়াজ তুলে দশাশই সিংহটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। বার-কয়েক আছাড়ি পিছাড়ি করেই হিংসা জানোয়ারটা নিশ্চল-নিখর হয়ে গেল।

সামনেই একটা জলাশয় দেখে ডিক কেনেডি এক লাফে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঢক ঢক করে গলা পর্যন্ত জল পান করলেন। পরম শান্তিতে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। তাঁর মনে হল এত স্বস্তি বুঝি জীবনে আর কোনোদিন পান নি। তিনি হাতের বোতলটায় জল ভর্তি করে নিয়ে উঠে এলেন।

এমন সময় একটা সিংহী প্রবল হুঙ্কার দিয়ে তাঁদের ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। সেটা ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ নেওয়ার আগেই ডিক কেনেডি তাকে গুলিবদ্ধ করলেন। একটা নয়। পর পর তিন-তিনটা সিসার গুলি ক্রোধোন্মত্ত সিংহীটার গায়ে গেঁথে দিলেন। সিংহীটা এসেছিল তার সঙ্গী সিংহটার হত্যার बदলা নিতে। কিন্তু তাকেও প্রাণ হারাতে হল।

ডিক কেনেডি আর জো মুহূর্তমাত্র দেরি না করে, ছুটে ছুটে বেলুনটার কাছে ফিরে এলেন। জলভর্তি বোতলটা ড. ফারগুসনের হাতে তুলে দিলেন।

বহু আকর্ষিত জল পেয়ে অভিযাত্রীরা অনেকটা সুস্থ-স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। সকাল হল। না অভিযাত্রীরা উপযুক্ত বাতাস না পাওয়ায় বেলুনটাকে হাফা করার জন্য আরও কিছু সোনা ফেলে দিতে বাধ্য হলেন।

পরের দিন ভোর হতে না হতেই আবার প্রবল ঝড় উঠল। ঝড়ের দাপটে বেলুনটা এক লাফে অনেকখানি ওপরে উঠে গেল। মরুভূমি ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। সুবিশাল একটা হ্রদের ওপর দিয়ে ভিক্টোরিয়া উঠে যেতে লাগল।

সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ড. ফারগুসন একটা গাছের সঙ্গে ভিক্টোরিয়াকে নোঙর করলেন। ভোর হতেই আবার নোঙর খুলে নতুন করে যাত্রা শুরু করলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ভিক্টোরিয়া মোসাইয়া শহরের ওপরে হাজির হল। অতি মনোরম শহর মোসাইয়া। শহরের দুদিকে পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে যেন শহরটার প্রহরায় নিযুক্ত। প্রধান শেখকে পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে যেতে দেখা গেল। ড. ফারগুসন কৌতূহল বশত শোভাযাত্রার ওপর ভিক্টোরিয়াকে নামিয়ে আনলেন। মাথার ওপরে কিছুতকিমাকার বেলুনটাকে দেখে আতঙ্কে শেখের অনুগামীরা যে যদিকে পারল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আরম্ভ করল। শেখ সাহেব কিন্তু পালান না। পথের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে ভক্তিবিশালিত কণ্ঠে—‘খোদা মেহেরবান! খোদা মেহেরবান! বলে আকুলি বিকুলি করতে লাগল। তাঁর বিশ্বাস, এটা নির্ঘাৎ খোদাতায়াই ব্যাপার স্যাপার।

ড. ফারগুসন সহ-অভিযাত্রীদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘এক সময় মেজর ডেনহ্যাম এ-দেশে এসেছিলেন। তার সর্বস্ব লুট হয়ে গিয়েছিল। কোনোরকমে পিতৃদত্ত প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পেরেছিলেন তিনি। এবার আমাদের গতি বার্ষিমি রাজ্যের দিকে। কেউ কেউ বলে সে-দেশে এক সময় তিনি নাকি সেখানেই খুন হয়েছিলেন। আবার কারো কারো মতে তিনি সেখানে অমৃত্যু বন্দী জীবন-যাপন করেছিলেন।

ভিক্টোরিয়া এবার ‘সারি’ নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। সামনেই কার্গাক শহর। এখানে পর্যটক টুলির গর্দান নেওয়া হয়। কেউ কেউ একে ‘ইউরোপের সামাথিক্সেত্র’ বলে।

শহরের এক বিশাল প্রান্তরে ক্রীতদাসের বাজার দেখা গেল। ক্রীতদাস কেনাবেচা চলছে।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে বেশ কিছুটা নিচে নামিয়ে আনলেন। সেটাকে দেখেই নগরপাল অস্ত্রহাতে তর্জন গর্জন করতে করতে প্রাসাদের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। উদ্দেশ্য, বেলুনের সঙ্গে এক হাত লড়াই করে শক্তির পরিচয় দেবেন। ড. ফারগুসন বুঝলেন, এরকম যুদ্ধবাজ শয়তানদের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। বাতাস কোথায় যে, বেলুনটাকে ওপরে তুলে নেবেন। মাটি থেকে কিছু ওপরে সেটা নিচল-নিখর ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। নিচে দাঁড়িয়ে ক্রোধোন্মত্ত নিগ্রোরা হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার চোঁচামেচির মাধ্যমে আক্ষালন করতে লাগল। এত লক্ষ্যশ্লেষ ও যশন বেলুনটা পালান না তখন তীর—খুনক হাতে একদল নিগ্রো ছুটে এসে সেটাকে তাক করে তীর ছোঁড়ার উদ্যোগ নিতে লাগল।

ড. ফারগুসন গ্যাস গরম করে খুবই ধীর গতিতে বেলুনটাকে ওপরে তুলে নিতে লাগলেন। নগরপাল কর্তব্যস্থির করতে না পেরে একটা বন্দুক নিয়ে এসে বেলুনটার দিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হলেন। ঠিক সে-মুহূর্তেই ডিক কেনেডির বন্দুক থেকে একটা গুলি ছুটে এসে তার হাতের বন্দুকটাকে দিল বেঙে। বাস, নিগ্রোরা এবার প্রাণের মায়ায় পড়ি কি মরি করে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে লাগল।

মাঝ-রাতে অত্যাচার্য এক দৃশ্য দেখা গেল। রাশি রাশি আগুনের গোলা যেন ভিক্টোরিয়ার দিকে ধেয়ে আসতে দেখা গেল। মুহূর্তের মধ্যেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। নিগ্রোরা অসংখ্য শাদা পায়রার লেজে আগুন ধরিয়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, আকাশ-দানবদের আগুন পুড়িয়ে মেরে ফেলা।

কিন্তু পায়রাগুলো যমদূতাকৃতি অতিকায় বেলুনটাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ফারগুসন বিপদ বুঝে তৎক্ষণাৎ কিছু ওজন ফেলে দিয়ে বেলুনটাকে দ্রুত গতিতে আরও ওপরে তুলে নিলেন। পায়রাগুলো ঘণ্টা দুই এলোমেলোভাবে আকাশে দাবড়ে বেড়িয়ে এক সময় দলবেঁধে নিচে নেমে গেল। বেলুনযাত্রীরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

ড. ফারগুসন ঠোটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন, ‘মি. কেনেডি, আমরা আঠারোই এপ্রিল জাঙ্কিবার থেকে যাত্রা করেছি। আজ বারোই মে। আশা করছি, আর দশ দিনের মধ্যেই আমরা পৌঁছে যেতে পারব।’

অত্যুগ্র আশ্রয় প্রকাশ করে ডিক কেনেডি বললেন, ‘দশ দিনের মধ্যে? কিন্তু কোথায় পৌঁছে যাবার কথা বলছেন?’

ড. ফারগুসন বললেন, ‘তা-তো জানি না।’

বেলা নটার কাছাকাছি সারি নদীর ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিক্টোরিয়া চ্যাড হ্রদের দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হল। সেটার এগিয়ে চলা অব্যাহত রইল। দুপুর একটার কাছাকাছি কৌফা শহরের কাছে হাজির হল। বেলুন এবার চ্যাড হ্রদের ওপর দিয়ে উঠে চলতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অতিকায় এক ঝাঁক বিশেষ জাতের বাজপাখি ভিক্টোরিয়ার কাছাকাছি চলে এল। ডিক কেনেডি বন্দুক বাগিয়ে গুলি করার জন্য তৈরি হয়ে পড়লেন।

ড. ফারগুসন বললেন, 'মি. কেনেডি, লড়াই করার জন্য তাদের বন্দুকের দরকার পড়ে না। কী কর্দর্শ আর অতিকায় চেহারা দেখেছেন! ঠোটগুলো এত লম্বা আর তীক্ষ্ণ যে, লড়াই করার জন্য সেগুলোই যথেষ্ট।' ক্রোধোন্মত্ত পাখির দল ফুঁসতে ফুঁসতে ভিক্টোরিয়াকে ঘিরে বৃত্তাকারে এগোতে লাগল।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে আরও ওপরে তুলে নিলেন। আশ্চর্য! পাখিগুলোও সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল।

ডিক কেনেডি বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রাখতেই ড. ফারগুসন তার হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন, 'ক'টাকে মারবেন মশাই! চৌদ্দটা পাখির মধ্যে একটাও যদি সুতীক্ষ্ণ ঠোট দিয়ে বেলুনের গায়ে আঘাত হানে তবে সিক্কের কাপড়টাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে এক মিনিটও সময় লাগবে না। তবে পরিণামে কি ঘটবে একবারটি ভেবে দেখেছেন কি?'

ড. ফারগুসন—এর কথা শেষ হতে না হতেই একটা পাখি ভিক্টোরিয়ার দিকে তেড়ে এল। অনন্যোপায় হতে তিনি গুলি চালাবার হুকুম দিতে বাধ্য হলেন। সেটা গুলিবিদ্ধ হয়ে বিকট আর্তনাদ করতে করতে, শূন্যে পাক খেতে খেতে নিচে পড়ে গেল। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সঙ্গীন হয়ে পড়ল। ক্রোধোন্মত্ত পাখিরা ঠোট দিয়ে বেলুনটাকে ফাঁসিয়ে দিল। সেটা চোখের পলকে নিচে নামতে লাগল। সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। অভিযাত্রীরা বেলুন থেকে দমাদম ওজন ফেলে দিতে লাগলেন। কিন্তু এতেও বেলুনটার নিম্নগতি রোধ করা সম্ভব হল না।

জো হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাজ করে বসল। অতর্কিতে বেলুন থেকে লাফিয়ে পড়েই উর্দ্ধশ্বাসে হ্রদের দিকে ছুটতে লাগল। জো বেলুন ছাড়তেই হাঙ্কা হাওয়ায় সেটা তড়াক করে লাফিয়ে প্রায় এক হাজার ফুট উঠে গেল। বেলুনের ছেঁড়া রেশমের ভেতর দিয়ে বাতাস ঢুকে সেটাকে উষ্কার বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডিক কেনেডি বললেন, 'প্রভুভক্ত ভৃত্য জো আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেল।'

জোর জন্য ড. ফারগুসন কাতর হয়ে পড়লেন। তাকে ফিরে পাবার জন্য তাঁর মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা দেখা দিল। কিন্তু তাকে তো আর ফিরে পাবার উপায় নেই। সে যে সেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে।

ভিক্টোরিয়া দমকা বাতাসের টানে ঘণ্টায় ষাট মাইল উড়ে এসে হ্রদের উত্তর পাড়ে হাজির হল। ফারগুসন বহু কায়দা কসরৎ করে একটা গাছের সঙ্গে সেটাকে নোঙর করলেন।

সকালের আলো ফুটলে দেখা গেল বহুদূর পর্যন্ত শুধুই কাদা ছড়িয়ে রয়েছে।

দিগন্ত বিস্তৃত হ্রদের জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ডিক কেনেডি বিষণ্ণকণ্ঠে বললেন, 'ড. ফারগুসন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জো মরে নি, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে। সে আমাদের কাছে ফিরে আসবেই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ড. ফারগুসন বললেন, 'স্বপ্নের যেন তাই করেন। তাকে ফেলে রেখে, বেলুনটাকে হাঙ্কা করে ওপরে তুলে বাঁচতে আমি চাই না। মরতে হয় তিনজন এক সঙ্গেই মরবে।'

এবার তাঁরা দীর্ঘ চারঘণ্টা একনাগাড়ে কঠোর পরিশ্রম করে ভিক্টোরিয়ার গা থেকে সিক্কের আবরণটা খুলে ফেললেন। ফলে সাড়ে ছয় শো পাউন্ড ওজন কমে গেল। দেখা গেল হতচ্ছাড়া পাখিগুলো সিক্কের কাপড়টা ফাঁসিয়েছে বটে। কিন্তু বেলুনটা অক্ষতই রয়েছে। এবার দিনের অবশিষ্ট সময়টুকু দুই বন্ধু বিশ্রাম আর জো-এর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

সকাল হল। বরাত ভাল, বাতাস হ্রদের দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে। অতএব ভিক্টোরিয়াকে নিয়ে আবার হ্রদটার দক্ষিণ তীরে, যেখানে জো তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, তাঁরা সেখানে হাজির হলেন। উভয়েরই বিশ্বাস, বেলুনটাকে দেখতে পেলো ছুটে আসবেই। এবার সেটাকে অল্প উঁচুতে রেখে বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগলেন। কিন্তু না, বেচারী জোয়ের দেখা তাঁরা পেলেন না।

দমকা বাতাস পেয়ে কারাম স্বীপের ওপরে ভিক্টোরিয়া হাজির হল। এখানেও বার-কয়েক বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে তাঁরা হতাশ হলেন জোয়ের ফেরার কোনো লক্ষণই দেখতে পেলেন না।

দুপুর গড়িয়ে গেল। দুটো বেজে গেছে। তবুও বাতাসের গতি পরিবর্তিত না হওয়ায় ড. ফারগুসন মহা দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন, তবে কি আবার সেই মরণ-ফাঁদ মরুভূমিতে গিয়ে পড়তে হবে। বেলুনটাকে তুলতে তুলতে তিনি প্রায় হাজার ফুট ওপরে নিয়ে গেলেন।

রাত্রির অন্ধকার নামার আগে এক বাঁশ ঝাড়ের মাথায় বেলুনটাকে নোঙর করলেন। রাত্রি তিনটার কাছাকাছি দমকা বাতাস বইতে লাগল। ফলে বারবার বাঁশগাছের ওপরেই বেলুনটা আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। ব্যাপার দেখে ড. ফারগুসনের রক্ত হিম হয়ে আসার উপক্রম। সিক্কের কাপড়ের আবরণহীন বেলুনটার যে কোনো সময় বাঁশের কঞ্চির আঘাতে ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যস, তবেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

ড. ফারগুসনের নির্দেশে ডিক কেনেডি বেলুনের নোঙর খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক বটকায় সেটা প্রায় তিন শো

ফুট ওপরে উঠে গেল। বাতাসের গতির বিপরীত দিকে সেটাকে সামান্যতমও ফেরানোর ক্ষমতা ড. ফারগুসনের নেই। বাধ্য হয়েই তিনি হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

বেলুনটা ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের মতো উড়ে চলল। উড়তে উড়তে এসে হাজির হল বোনাদ-উল জেরিদ মরুভূমির ওপরে।

সাহারা মরুভূমি। ভিক্টোরিয়াকে আর নোঙর করার উপায় নেই। অকস্মাত ভয়ঙ্কর এক দৃশ্যের মুখোমুখি হলেন অভিযাত্রী দুজন। বিশাল এলাকা জুড়ে মরুভূমির বালি পাক খেয়ে খেয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঘূর্ণিবাত্যা। একদল মরুশ্রমী ঘূর্ণিবাত্যার কবলে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটতে লাগল এক মর্মান্তিক কাণ্ড। বায়ুর দ্বারা সৃষ্টি চিহ্নির মধ্যে বেচারার মরু-পথিকদের জীবন্ত সমাধি হতে লাগল। মর্মান্তিক দৃশ্যটা চাক্ষুষ করে দুই বন্ধু বার বার আঁতকে উঠতে লাগলেন।

মরণফাঁদ সাহারার ওপর দিয়ে বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে অনবরত চক্রর খেতে খেতে বেলুনটা এগিয়ে যেতে লাগল।

ড. ফারগুসন উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'এ কী! যা আশা করেছিলাম, কার্যত তাই যে ঘটতে চলেছে! যে দেশে কোনোদিন যাব না ভেবেছিলাম সেদিকেই যে আমরা এগিয়ে চলেছি! তবে কি ঈশ্বর সত্যিই আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন? জোকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেবার জন্যই সেখানে আবার নিয়ে চলেছেন।

এদিকে জো বেলুন থেকে লাফিয়ে নেমে চ্যাড হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। জল থেকে মাথা তুলে দেখল, ভিক্টোরিয়া তড়াক করে লাফিয়ে ওপরে উঠে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে। খুশীতে তার মনটা নেচে উঠল। প্রভুকে প্রাণে বাঁচাতে পেরে নিজের জীবন ধন্য জ্ঞান করল সে।

এবার জো জুলন্ত অগ্নিপিত্ত সূর্যটার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তা করতে লাগল। একটু আগে বেলুন থেকে যে-দ্বীপটাকে সে দেখতে পেয়েছিল সেদিকেই উম্মাদের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। প্রায় দেড় ঘণ্টা জলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই করে সে দ্বীপটার কাছে আসতে পারল। বেলুন থেকে গাছের গুঁড়ির মতো কয়েকটা কুমিরকে দ্বীপের গায়ে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। সেগুলোর ভয় এখন-তাকে পেয়ে বসল। হঠাৎ কি যেন একটা জলে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার গা-ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কুমির? হ্যাঁ, কুমিরই বটে। সে সেটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল।

জো দুরূহ দুরূহ বুকে উম্মাদের মতো সাঁতার কাটতে লাগল। হটাৎ মনে হল কে যেন তার পা দরে টানছে। ভয়ে কাঁঠ হয়ে যাবার জোয়ার হল। ভাবল, নির্ধাৎ কুমিরের কবলে পড়েছে। মৃত্যু অনিবার্য। মরার আগে মৃত্যুদূতকে একবারটি চাক্ষুস করার জন্য চোখ দুটোকে সামান্য ফাঁক করতেই সে চমকে উঠল। দেখল, গাট্টাগোট্টা কুচকুচে কালো দুটো নিম্রো তাকে তীরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

নিম্রো দুটো জোকে তাদের পল্লীতে নিয়ে গেল। বাঁশ-কাঠের তৈরি একটা কুঁড়ে ঘরে কয়েদ করে রাখল। দীর্ঘ সময় ধরে অমানুষিক পরিশ্রম আর উদ্বেগ-উৎকর্ষায় তার শরীর এলিয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়ল। মাঝরাতে বরফের মতো ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখের পলকে কুঁড়েঘরটা জলে ভরে গেল। মরিয়া হয়ে জো বেড়া ভাঙতে লাগল। অমিত শক্তি যেন তার শরীরে ভর করেছে। বেড়াটা ভেঙে উম্মাদের মতো সাঁতার দিতে লাগল। সামান্য গিয়েই সে গাছের সঙ্গে বাঁধা একটা ডিঙি দেখতে পেল। ভাবল, ঈশ্বরই বুঝি তার জন্য এটাকে এখানে রেখে দিয়েছে। ডিঙিটার বাঁধন খুলতেই প্রবলবেগে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল।

জো প্রমাদ গুনলো। কোনোক্রমে হ্রদের জলে গিয়ে পড়লে জলোচ্ছ্বাসের ফলে চোখের পলকে নৌকা শুদ্ধ সে জলে তলিয়ে যাবে। সাঁতার কাটার সুযোগই পাবে না। ভাসতে ভাসতে একটা গাছের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ঝট করে সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে ফেলল। ঝটপট তার ওপরে উঠে গেল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই জো-এর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হল। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখল, যে-গাছের ডালে সে বসে আছে তার ডালপালা জুড়ে সাপের মেলা। রাত্রের অন্ধকারেও হিস হিস শব্দ শুনতে পেয়েছিল। এখন বুঝল, ব্যাপারটা কি? কেবল সাপই নয়। হাজারে হাজারে লালে লাখে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই জোঁকও কিলবিল করছে। কয়েকটা সাপ ফণা তুলে তার দিকে এগোতে চেষ্টা করতেই সে বরাত চুকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। না, চোখ তেমন লাগেনি। এবার সে চোঁ-চাঁ দৌড় জুড়ল।

সামান্য এগিয়েই জো সতর্ক হয়ে পড়ল। 'অজানা-অচেনা বন'। কোথায়, কোন্ বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে তাই বা কে জানে?

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতেই হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের তর্জন-গর্জন শুরু হয়ে গেল। সাহস করে জো আবার একটা গাছে উঠে রাত্রি কাটাল।

ভোরের আলো ফুটেই জো হাঁটা জুড়ল। কিছু দূর যেতেই একটা ঝোপের ফাঁক দিয়ে কয়েকটা নিম্রোকে তার দিকে বিষমাখা তীর বাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। তার বুকের ভেতরে কোনো অদৃশ্য হাত যেন ঘন ঘন হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। আশ্চর্য ব্যাপার! কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিম্রোগুলো কি যেন ভেবে সেখান থেকে গুটিগুটি সরে পড়ল।

এদিকে চ্যাড হ্রদের মাত্র সত্তর-আশি হাত ওপরে আকাশযান ভিক্টোরিয়া অবস্থান করতে লাগল। সেখান থেকে ড. ফারগুসন আর ডিক কেনেডি অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে জোর যোজ করে চলেছেন।

ভিক্টোরিয়া বাতাসের চাপে ধীর মন্ডর গতিতে পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে। জো সেটাকে দেখেই গলা ছেড়ে চিৎকার

করতে করতে সেটার দিকে নজর রেখেই হরদম ছুটতে লাগল। কিন্তু হায়! বেলুনের আরোহীরা তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন না। তাকে নজরেও পড়ল না।

এদিকে ব্যস্ততা আর অন্যমনস্কতার জন্য তার আর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কখন যে সে হ্রদের কাদার মধ্যে দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে বুঝতেই পারে নি। মুহূর্তের মধ্যেই হাঁটু অবধি কাদার মধ্যে ঢুকে গেল। পরমুহূর্তেই কোমর পর্যন্ত সিমিয়ে গেল। মৃত্যু সুনিশ্চিত ভেবে জো গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিল। কেউ-ই তার কান্না শুনে ছুটে আসা তো দূরের ব্যাপার, সাড়া পর্যন্ত দিল না।

এদিকে ভিষ্টোরিয়া প্রবল বাতাসের চাপে ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই হ্রদ-অঞ্চল ছাড়িয়ে মরুভূমির ওপরে চলে এসেছে। বেলুনযাত্রীরা দেখলেন, আট-ন' মাইল দূরে একদল ঘোড়সওয়ার অন্য একজন ঘোড়সওয়ারকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। না, তাড়িয়ে নিয়ে নয়, তার পিছু নিয়েছে। তারা সংখ্যায় কম হলেও জনা পঞ্চাশেক তো হবেই।

ড. ফারগুসন বেলুনটাকে নিচে নামিয়ে আনতেই চমকে উঠলেন। আতঙ্কে তাঁর সর্বান্তে কাঁটা দিয়ে উঠল। দেখলেন, সবার আগে আগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে তাঁর ভৃত্য ও সহ-অভিযাত্রী জো। বেদুইন দস্যুরা তাকে তাড়া করেছে। তিনি ঝটপট গ্যাসের তাপ কমিয়ে দিয়ে বেলুনটাকে আরও নিচে নামিয়ে আনলেন। ডিক বন্ডুকের ফাঁকা আওয়াজ করতেই বেদুইন দস্যুরা থমকে গেল। আতঙ্কে ওপরের দিকে ঘাড়-ঘুরিয়ে তাকিয়েই কিছুতকিমাকার বেলুনটাকে দেখেই সবাই ভড়কে গিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পালাতে লাগল।

ড. ফারগুসন বেলুন থেকে দড়ির মই নামিয়ে দিলেন। জো ঘোড়ার পিঠে বসেই মইটাকে আঁকড়ে ধরল। সাধ্যমত ব্যস্ততার সঙ্গে মই-বেয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠতে লাগল।

জোর সর্বান্তে অসংখ্য ক্ষত। কোনো কোনোটা থেকে এখনো চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। প্রায় উলঙ্গ দেহে সে প্রভুর সামনে হাজির হল।

জো কোমর সমান কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে যখন নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক তখনই একটা গাছের শেকড়কে ঝুলে থাকতে দেখল। হাত বাড়িয়ে সেটাকে কোনোরকমে আঁকড়ে ধরে গাছটায় উঠে গেল। তার কয়েকটা ডাল হ্রদের জল-কাদা থেকে অনেকটা দূর অবধি ছড়িয়ে ছিল। জো একটা ডাল বেয়ে বেয়ে কাদার এলাকার বাইরে গিয়ে নেমে পড়ল। এবার সে পুনরায় হাঁটতে লাগল। কিছুদূর যেতেই কয়েকটা ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখে এক লাফে তাদের একটার পিঠে চেপে বসল। ব্যস, দিল ঘোড়া হাঁকিয়ে। ঘোড়া চুরি করে পালাতে দেখে বেদুইন দস্যুরা দলবেঁধে তার পিছু নিল।

ভিষ্টোরিয়া আবার এগিয়ে চলল। দুতিন দিন এক নাগাড়ে চলার পর অভিযাত্রীরা টিম্বাকটু শহরের ওপরে হাজির হল। পর্যটক বার্থ-এর আঁকা মানচিত্রটা বের করে ড. ফারগুসন শহরটার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। ত্রিভুজাকৃতি শহরটা বাস্তবিকই ভারি সুন্দর তিনটে সুদৃশ্য মসজিদও তাঁরা দেখতে পেলেন।

ড. ফারগুসন বললেন, 'টিম্বাকটু এক সময় খুবই সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। এগারো শতক থেকে বহু শক্তিমান শাসক একে দখল করে নিজের অধীনে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। আজও সে চেষ্টার বিরাম নেই। এ-অঞ্চল সবচেয়ে উন্মুক্ত করেছিল ষোলো শতকে। প্রমাণ পাওয়া গেছে, সে-আমলের আহম্মদ বালার গ্রন্থাগারে ষোলো শোর বেশি হাতে-লেখা পুঁথি ছিল। আজ সে টিম্বাকটু শহর ধ্বংসভূপের সামিল।'

অত্যধিক গরমের জন্য বেলুনটার জায়গায় জায়গায় সামান্য গলে গেছে। তাই ভিরভির করে গ্যাস বেরোচ্ছে।

তাই বেলুনের কিছু জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে হাঙ্কা করে নেওয়া হল। তবু সেটাকে বেশি ওপরে নিয়ে যাওয়া গেল না। গ্যাস অনবরত বেরিয়েই চলেছে।

ভোরবেলা ভিষ্টোরিয়া টিম্বাকটু শহর থেকে ষাট মাইল দূরবর্তী নাইজার নদীর ধারে হাজির হল। এবার কিছু দরকারি জিনিসও বেলুনটা থেকে ফেলে না দিয়ে পারা গেল না। আবার কিছুটা ওপরে উঠে দুচারটে পাহাড় ডিঙিয়ে সেটা অপেক্ষাকৃত দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

বেলুনটা আবার কেবলই নিচে নামতে লাগল। ডিক কেনেডি আতঙ্কিত হলেন। বেলুনটা বুঝি ফুটোই হয়ে গেছে। তার ওজন আরও কমিয়ে ফেলার জন্য তাঁবুটাকেও ফেলে দেওয়া হল। বেলুনটাকে নামানোর উপায়ও নেই। এখানকার মানুষগুলো জন্তু-জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র।

সামনে আকাশছোঁয়া এক পাহাড়। যে-কোনোভাবে সেটাকে ডিঙাতেই হবে। ফলে বাধ্য হয়ে একদিন চলার মতো জল রেখে বাকি সবটুকু জল ফেলে বেলুনটাকে আরও হাঙ্কা করে ফেলা হল। সামান্য ওপরে ওঠা গেল বটে। বটে। কিন্তু আরও পঞ্চাশ-ষাট ফুট ওঠা দরকার। অনন্যোপায় হয়ে মেশিনের ভেতরের জলটুকুও ফেলে দেওয়া হল। এখন পানীয় জলের পাত্রগুলোকেও এক-এক করে ফেলে দেওয়া হল।

না, এতকিছু করেও বুঝি পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না। বেলুনটা গিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ল বলে।

কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে জো অতর্কিতে বেলুন থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু এবার সে বেলুনের দোলনাটা ছাড়ল না, শক্ত করে ধরে ঝুলতে ঝুলতে বেলুনের সঙ্গেই এগোতে লাগল। অভিযাত্রীরা কোনোরকমে পাহাড়টা ডিঙাতে পারলেন। জো বেলুনে উঠে এল।

সামনেই একটা নদী। নদীটা পেরোতে হলে বেলুনের ওজন আরও অনেক কমাতে হবে। উপায়ন্তর না দেখে সাড়ে ন' শো পাউন্ড গ্যাস গরম করার যন্ত্রটাকেই তারা ফেলে দিতে বাধ্য হলেন।

নদীটা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়া এবার এক গভীর জঙ্গলের গাছের ওপর নোঙর করছে।

রাত্রি তখন দুটোর কাছাকাছি। ড. ফারগুসন ও জো একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। ডিক কেনেডি বন্দুহাতে প্রহরায় নিযুক্ত। হঠাৎ তিনি দেখলেন, পায়ের নিচের জঙ্গল দাউদাউ করে জ্বলছে। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হল না, স্থানীয় অসভ্য জঙ্গলিরা তাঁদের পুড়িয়ে মারার মতলব এঁটেছে।

ডিক কেনেডি ব্যস্ত হয়ে ড. ফারগুসনকে ঘুম থেকে তুললেন। চোখ মেলে তাকিয়েই তিনি ব্যাপারটা সম্বন্ধে আঁচ করে নিতে পারলেন। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে নোঙর তুলে দিয়ে বেলুনটাকে ওপরে নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা বেড়েই চলেছে। দস্যুরা কিছু তখনও বেলুনটাকে নজরে রেখে রেখে ছুটেতে লাগল।

ডিক কেনেডি বন্দুকহাতে জঙ্গলিদের দিকে তাক করে বলে রইলেন। বেলুনটা আর একটু নেমে বন্দুকের আওতার মধ্যে এলেই বরাত ঠুকে দমাদম গুলি চালিয়ে দেবেন। শেষপর্যন্ত করতেও হল তাই। দু-চারটে জঙ্গলিকে খতম করতেই বাকিরা প্রাণভয়ে পড়ি কি মরি করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল।

ভিক্টোরিয়া এবার শুইল জলপ্রপাতের ওপর এসে পড়ল। পাহাড়ের গা-বেয়ে বিপুল জলরাশি এগিয়ে এসে আচমকা বহু নিচে অবস্থিত খাদে আছাড় খেয়ে পড়ছে। জলের সে কী গর্জন! অভিযাত্রীদের কানে তাল লেগে যাওয়ার জোগার হল।

ড. ফারগুসন কোটের পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে বেলুনটার তলদেশে একটা ফুটো করে দিলেন। ব্যস, তার ভেতরে যেটুকু গ্যাস অবশিষ্ট ছিল তাও ভুস ভুস আওয়াজ করে বেরিয়ে গেল। এবার শুকনো ঘাসপাতা দিয়ে আগুন জ্বাললে গরম বাতাস হর হর করে তার ভেতরে ঢুকে সেটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলল।

বিপদ পায়ে পায়ে। জঙ্গলের মধ্যে দস্যুর দল হাঁকডাক করতে লাগল তারা কাছে আসার আগেই আগুনসৃষ্ট গরম বাতাসে বেলুনটা পূর্ণ হয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। অভিযাত্রীরা দড়ির মই বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বেলুনটা তাঁদের নিয়ে বেশ কিছুটা ওপরে, ডাকাতদের একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল। বরাতের জোর আছে বটে। নইলে নির্ধাৎ দুর্ধর্ষ ডাকাতদের হাতে তিন-তিনজন অভিযাত্রীকেই অসহায়ভাবে প্রাণ খোয়াতে হত। মিনিট দশেকের মধ্যেই বেলুনটা কোনোরকম জলপ্রপাতটাকে ডিঙিয়ে এল। এবার পাহাড়ের গা-বেয়ে নেমে আসা জলের কাছাকাছি আসতেই বেলুনটা আলতোভাবে দোল খেতে খেতে জলে নামতে লাগল। ঠিক সে মুহূর্তেই অভিযাত্রীরা তাঁদের বহুদিনের আশ্রয়স্থল বেলুনটা থেকে লাফিয়ে নেমে গেলেন। বেলুনটা ঝপ করে জলে আছড়ে পড়ল। চোখের পলকে এগিয়ে গিয়ে সেটা জলপ্রপাতে হারিয়ে গেল।

কয়েকজন ফরাসি সৈন্য পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্বয়ভরা চোখে অভিযাত্রীদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। এবার ব্যস্তপায়ে তারা পাহাড় বেয়ে করমর্দনের জন্য ফারগুসনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি কি ড. ফারগুসনের সঙ্গে কথা বলছি?'

ডা. ফারগুসন করমর্দন সারতে সারতে মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আপনার অনুমান অদ্ভান্তই বটে। আমিই ড. ফারগুসন।' এবার সহঅভিযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওনারা আমার বেলুন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গী।'

'অনুগ্রহ করে দূর্গে চলুন। খবরের কাগজের পাতায় আপনাদের অভিযানের কথা আমি আগেই পড়েছি।'

ড. ফারগুসন সহ অভিযাত্রীদের নিয়ে লেফটেন্যান্টের সঙ্গে ফরাসি দূর্গের দিকে পা বাড়ালেন।

=== o ===

দ্য পারচেজ অব দ্য নর্থ পোল

জে. টি. ম্যাসটন ও মিসেস স্করবিট তখন নারীর প্রতিভা নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত। ম্যাসটনের মতে পৃথিবীর কোনো কোনো নারী অঙ্কের প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন বটে, তবে রাশিয়ায় এরকম প্রতিভা সম্পন্ন নারীর অস্তিত্ব নেই। তারা আর যা-ই পারুক না কেন, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একেবারেই অচল। কোনো নারীই কেপলার, লাপ্লেস বা ইউক্লিড-এর সমকক্ষ হওয়া তো দূরের ব্যাপার তাঁদের কাছাকাছিই যেতে পারেনি।

মিসেস স্করবিট কিন্তু ম্যাসটনের যুক্তি কিছুতেই মানতে নারাজ। তাঁর মতে অতীতের নারী সমাজের সঙ্গে আজকের নারী সমাজের তুলনা করতে বসলে ভুলই করা হবে। অতীতের মাপকাঠি দিয়ে ভবিষ্যতের বিচার করতে বসার অর্থই হচ্ছে চরমতম ভুলকে আঁকড়ে ধরে থাকা।

মিসেস স্করবিট নিজেকে অবলা ও দুর্বল ভাবতে কিছুতেই রাজি নন। তিনি আমেরিকান। দারুন একটা কঠিন ও সমস্যা সম্বল ব্যাপারে তিনি উৎসাহী হয়েছেন। দুহাতে টাকা খরচ করে পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। তাঁর পরিকল্পনাটা মোটামুটি এরকম—

সেন্ট মার্টিন, মালটি ব্রান এবং রিক্সজ প্রভৃতি ভূগোল-বিশারদদের মতে সুমেরু অঞ্চল ৭৮° অক্ষরেখার ওপর অবস্থিত। আর তার সাত লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জল ও চৌদ্দ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে স্থলভূমি।

একালের অকৃতোভয় অভিযাত্রীরা ৮৪° অক্ষাংশের ওপরেই। কিন্তু ওই হিমশৈল অতিক্রম করার ক্ষমতা কারোরই নেই। সুমেরু অবধি ৬° অক্ষাংশে জল না স্থলভূমি বিরাজ করছে তা আজও মানুষের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকার আঠারো শো খ্রিস্টাব্দে মনস্থ করলেন, সুমেরুর চারদিকে যে-অনাবিষ্কৃত অঞ্চল অবস্থান করছে তা নিলামে বিক্রি করে দেবেন। উত্তরমেরু অঞ্চল ক্রয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা আমেরিকান সংস্থা আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল।

তবে এও সত্য যে, বার্লিনের এক বৈঠকে অন্যের জমিতে হানাদার বৃহৎ শক্তিগুলির জন্য, আলোচনার মাধ্যমে কিছু নিয়মকানুন তৈরি করা হয়। বৃহৎ শক্তিগুলি যেন উপনিবেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে সে সব শর্ত পালন করে এটাই ছিল বৈঠকের উদ্দেশ্য। কিন্তু বার্লিন-বৈঠকে বেশ কিছু সংখ্যক দেশ মোটেই আমল দেয় নি। তাদের মতে, উত্তরমেরুর জমি জায়গা কারোর অধিকারেই থাকতে পারে না, নেইও। সেখানে কোনো বসতিও নেই। অতএব সেখানে সবারই সমান অধিকার।

তাই সদ্য গড়ে ওঠা সংস্থা উত্তরমেরুর দখলই কেবল নয়, অন্যের দখলের প্রতিবন্ধকতাও করতে আগ্রহী।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কোনো মহৎ প্রয়াসে লিপ্ত হলে সেখানে টাকার অভাব হয় না। মাত্র কয়েক বছর আগে বাস্টিমোর গান-ক্লাব চাঁদের উদ্দেশ্যে এক প্রোজেক্টাইল পাঠাতে গিয়ে হাতেনাতে এর প্রমাণ পেয়েছে। তাঁদের লক্ষ্য ছিল—চাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা। অবিস্ফায ঝুঁকিটি নেওয়ার জন্য গান-ক্লাবের সদস্যদের বাহবা দিতেই হয়।

সুমেরুকে নিলামে খরিদ করার পরিকল্পনাটা নিয়ে দেশজুড়ে নানারকম কথাবার্তা উঠল। চাঁদার খাতা না থাকার দরুন বিশেষ জটিলার উদ্ভব হল। সংস্থাটি আগে থাকতে চাঁদা সংগ্রহের প্রয়োজন বোধ করে নি।

প্রচুর পরিমাণ নগদ অর্থ নিয়েই তারা নিলামে উত্তরমেরু ক্রয় করার ইচ্ছার কথা প্রচার করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তরমেরু ক্রয় করে ফয়দা কী হবে? সেটা কোনো উপকারে আসবে কি? না। কোনো কিছুতেই কোনোদিক থেকে ফয়দা লোটা যাবে না। তাই পরিকল্পনার কথাটা শোনামাত্র সবাই বলে উঠল, 'কোন উর্বর মস্তিষ্ক ছাড়া কারো মাথায় এমন উদ্ভট খেয়াল কিছুতেই চাপতে পারে না।'

সংস্থার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার কাজে কিছু তিলমাত্রও গাফিলতি ছিল না। পৃথিবীর সব দেশের খবরের কাগজের পাতায় ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য দুটো বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার খবরের কাগজের জন্য একটা আর অন্যটা ইউরোপের খবরের কাগজের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমেরিকার খবরের কাগজের পাতায় যে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপা হয় তার বক্তব্য হচ্ছে—

“৮৪° ডিগ্রির ওপর অবস্থিত সুমেরু অঞ্চলটি অনাবিষ্কৃত থাকার জন্য এতদিন নিলামে তোলা হয় নি। ১৮৪৮ সালের জুলাইয়ে ৮২°-৪৫° পর্যন্ত ইংরেজ অভিযাত্রী প্যারি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিম দিকে জায়গাটার অবস্থান। অভিযাত্রী স্যার জন জর্জেস নারেস ১৮৬৭-র মে মাসে ৮৩°-২৫'-২৮' পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। তার অবস্থান গ্রিনল্যান্ডের উত্তর দিকে। আমেরিকার অভিযাত্রীরা ১৮৮২-এর মে মাসে লেকটেন্যান্ট শ্রিলির অধিনায়কত্বে ৮৩°-৩৫' অক্ষাংশ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। নারেসল্যান্ডের পশ্চিমদিকে তার অবস্থান।

বাস, কোনো অভিযাত্রীর পক্ষেই এর বেশি অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। ৮৮°-র পর ৬° পরিমাণ অঞ্চল সুমেরুবিন্দু পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ও অখণ্ড এক অঞ্চল। তাই একরম একটা অঞ্চলকে নিলামে কিনে নিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্ভব নয়।

বিশাল অঞ্চলটা কারোর মালিকানাধীন না থাকার জন্য এখানে কোনো বসতি গড়ে ওঠে নি। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সাব্যস্ত করেছে, একটা সিদ্ধান্তে এসে বিশাল অঞ্চলটাকে কাজে লাগাতে হবে। বাস্টিমোরে ‘উত্তরমেরু’

ব্যবহারিক সংস্থা' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তারা আইনের ভিত্তিতেই উত্তরমেরু ক্রয় করতে আগ্রহী। তবেই সেখানকার পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, দ্বীপ আর মহাদেশ প্রভৃতি সবকিছুর ওপর তাদের অধিকার বর্তাবে। আন্তর্জাতিক আইনের বলে এরকম মালিকানা নিয়ে ভবিষ্যতে কোনো হান্সামা বাধার আশঙ্কা থাকবে না।

অতএব ওরা ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বাল্টিমোর শহরের নিলামঘরে উপস্থিত থেকে নিলাম ডেকে যে-কোনো ব্যক্তি উত্তরমেরু ক্রয় করে নিতে পারবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা'র অস্থায়ী প্রতিনিধি ডব্লিউ এস. ফস্টার-এর সঙ্গে পত্র মারফৎ যোগাযোগ করা যেতে পারে। তাঁর ঠিকানা—১৩, হাইস্ট্রিট, বাল্টিমোর।"

খবরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে তো মানুষের চক্ষু স্থির। অধিকাংশ মানুষের বক্তব্য, এটা আকাশকুসুম কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। একদম অবাস্তব একটা চিন্তা। আবার কেউ বা এটাকে বলল আমেরিকার বাহাদুরি, কেনাটা একটা চালমাত্র। কেউ কেউ আবার এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বলল, 'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা তো অর্থের জন্য কারো কাছে চাঁদা বা সাহায্য কিছুই প্রত্যাশা করছে না। জনসাধারণের কাছে কেবলমাত্র অনুমতিই চেয়েছে। নিজেদের অর্থ দিয়েই কিনতে চাচ্ছে। ভাঁওতা দিয়ে টাকা তুলে আশ্রয় করার ধাক্কা আদৌ তাদের নেই। তবে এতসব বাহানা করারই বা কি দরকার ছিল? সুমেরু দখল করে বসতে বাধাই বা কোথায় ছিল?' সমঝদাররা এরকম মন্তব্য করলেন।

বাধা? হ্যাঁ, সরাসরি সুমেরুর দখল নিতে যাওয়ার বাধা তো অবশ্যই রয়েছে। সুমেরু যে তখনও সবার কাছেই নিষিদ্ধ বিবেচিত হচ্ছে। তাই তো উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন একটা দলিল প্রত্যাশা করেছে, যার দ্বারা ভবিষ্যতে কেউ উত্তরমেরু দাবি করলে তারা সেটা নস্যাৎ করে দিতে পারবে।

তবে বিজ্ঞপ্তির একটা অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোনো পরিবর্তনের ওপরই দাবি নির্ভর করবে না। অর্থাৎ সুমেরুর অবস্থান ও আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটলেও জায়গাটাই অধিকারের কোনোরকম পরিবর্তন হবে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অনুচ্ছেদটির এমন সব ব্যাখ্যা হতে লাগল যার ফলে পুরো ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে গেল। সুমেরুর অবস্থান ও আবহাওয়ার পরিবর্তন বলতে আসলে কিসের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে? এর সঙ্গে মালিকানা বা দাবির কি যোগসাজস থাকতে পারে? দূরত্ব লোকেরা অবশ্য বলাবলি করল, এরকম একটা অবাস্তব, একেবারেই অদ্ভুত পরিকল্পনার পিছনে নির্ধার্ত কোনো না কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে।

ফিলাডেলফিয়ার একটা খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল—যারা সুমেরুর মালিকানা স্বত্ব লাভ করার স্বপ্ন দেখছে, তারা অবশ্যই জানতে পেরেছে, অচিরেই অতিকায় একটা শক্ত পাথরের ধুমকেতু পৃথিবীর বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে। ফলে পৃথিবীর গঠন ও বায়ুমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে যাবে। তখন সুমেরু থেকে প্রচুর মুনাফা লাভ করতে পারবে।

বিজ্ঞ লোকেরা শক্ত পাথরের ধুমকেতুর কথা শুনে না হেসে পারলেন না। তবে একটা ব্যাপার পক্ষির হয়ে গেল, সুমেরু ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে কিছু কামিয়ে নেবার ধাক্কা রয়েছে। আসন্ন কোনো ঘটনার কথা তাদের অবশ্যই জানা রয়েছে।

নিউ অর্লিয়েন্সের একটা খবরের কাগজে ছাপা হল—সদ্য গজিয়ে ওঠা সংস্থার অবশ্যই ধারণা রয়েছে বিম্বুরেখা এগিয়ে গিয়ে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে যার ফলে সুমেরুকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে। অন্য আর এক সাংবাদিক লিখলেন, অসম্ভব কি? বিম্বুরেখা যদি স্থান পরিবর্তনই করে তবে এ-গোলকের অক্ষরেখারও তো পরিবর্তন ঘটবে।

প্যারিসের সায়েন্টিফিক রিভিউ-র পাতায় ছাপা হল—অ্যাডহেমার বলেছেন, বিম্বুরেখা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে যদি অক্ষরেখার পরিবর্তন যুক্ত হয়, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটবে। মেরু দুটোর জমাটবাধা বরফও নিক্ষেপ হয়ে যাবে।

এর প্রতিবাদ করে এডিনবরা রিভিউ বলে উঠল, এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ-পরিস্থিতির উদ্ভব হতে দশ হাজার বছর লেগে যাবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন তখনই ঘটবে যখন ভোগা দ্রুতভারায় পরিবর্তিত হবে।

অ্যাডহেমার হয়তো টিকই বলেছেন। তবে নতুন সংস্থাটি হয়তো এরকম কোন চিন্তা করে নি। তবে তাদের অভিসন্ধিটা খবরের কাগজের লেখা পড়ে ধরা গেল না।

তবে হ্যাঁ, সংস্থার সম্পাদক বা সভাপতিকে ধরতে পারলে হয়তো বা ব্যাপারটা খোলসা হয়েই যেত। কিন্তু সংস্থার সম্পাদক, সভাপতি তো দূরের ব্যাপার, কোনো সদস্যের নামধামও কারোর জানা নেই। তবে এরকম উদ্ভট বিজ্ঞপ্তিটা কোথেকেই বা এল। ব্যাপারটা গভীর রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল।

উইলিয়াম এস. ফস্টার নামধারী বাল্টিমোরের এক কডমাছের ব্যাপারী কাগজে বিজ্ঞপ্তিটা ছাপিয়েছে। ব্যাস, আর বাকি সব কিছুই রহস্যবৃত্ত।

সংস্থার সদস্যদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ হেঁয়ালি নয়। বিজ্ঞপ্তিটাতেই তাদের মনের কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। জায়গার পরিমাণ মোটেই কম নয়। ৮৪° থেকে ৯০° পর্যন্ত—৬°। প্রতি ডিগ্রিতে যদি ষাট মাইল হিসাব করা যায় তবে মোট জমির ব্যাসার্ধ হয় ৩৬০ মাইল। আর ব্যাস হয় ৭২০ মাইল। হিসাবমত পরিধি দাঁড়ায় ২,২৬০ মাইল। আর দেখা যাচ্ছে, সমগ্র ইউরোপের দশ ভাগের এক ভাগ।

বিজ্ঞপ্তিটাতে তো খোলসা করেই বলা হয়েছে, জায়গাটা কারোরই মালিকানাধীন নয়। অতএব তার ওপর সবার সমানাধিকার। কারোর আয়ত্বে নেই, তাই যে কেউ অধিকারও করতে পারবে। আর সেখানে কেউ থাকে না বলে নিজের বলেও কেউ দাবি করতে পারবে না। আর অন্যান্য দেশের জমির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তাই দখল নিতে আগ্রহী এমন কেউ নিলাম ডাকতে আসুক। নিলাম-ব্যবস্থায় কারো ওজর আপত্তি থাকার কথা নয়।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, হল্যান্ড, ডেনমার্ক আর সুইডেন-নরওয়ে প্রভৃতি ছ'টি রাষ্ট্রের অধিকার সম্বন্ধে কারোর আপত্তি থাকার তো কথাই নয়। আপত্তি উঠলও না।

কিন্তু জমিতে যাদের প্রকৃত অধিকার রয়েছে সেই অ্যাক্টিমে! এবং অন্যান্য সুমেরুবাসীদের মতামত নেওয়ার কোনো দরকারই কেউ অনুভব করল না।

পৃথিবীর কী আশ্চর্য বিধান, কাজ কারবার! ব্যাপারটা অচিরেই পৃথিবীর সকলের সামনে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল, নতুন সংস্থা সুমেরুর মালিকানা লাভ করে ঘাঁটি গেড়ে বসলে তার সর্বস্বা হয়ে উঠবে আমেরিকা। প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলি মতলবটাকে সুমেরুর দেখতে পারল না। আমেরিকা এমনিতেই আগ্রাসী নজর মেলে সবকিছুর দিকে তাকিয়ে। তার ওপর যদি সুমেরুটা কজা করে নেয় তবে ব্যাপারটা তো ভাববারই বটে।

আসলে কিন্তু দুশ্চিন্তার তিলমাত্র কারণও নেই। সুমেরু নিয়ে কারোর তেমন ফায়দা হচ্ছে কি? অবশ্যই নয়। এরকম চিন্তা করে সুমেরুর সঙ্গে যাদের জমি লাগেয়া নয় তারা উদাসীন রইল। তবে হ্যাঁ, ৮৪°-র লাগেয়া যাদের ভূখণ্ড তারা মনস্থ করল অর্ধদণ্ড হলেও আমেরিকাকে সরিয়ে দিয়ে জমির মালিকানা স্বত্ব রাখা চাই-ই চাই।

ইংরেজরা এমনিতেই বত্য়ারক্তপ্রিয়। এতেও তারা অহমিকা প্রকাশে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হল্যান্ড, রাশিয়া, ডেনমার্ক ও সুইডেন-নরওয়ের প্রতিনিধিরাও বাস্টিমোর কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানাল।

পৃথিবীর মেরু প্রদেশের মূল্য কত হওয়া উচিত, এটা নিয়ে সমস্যার উদ্ভব অবশ্যই হল। যারা নিলামে যোগ দিল তারা সবাই কোনো না কোনো দাবি জানাল। ডেনমার্ক জানাল, সুমেরুতে তাদের উপনিবেশ আছে। তাদের অধীনে আছে, বাফিন সাগরের বেশ কিছু অঞ্চল, ডিস্কো দ্বীপ আর গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম উকূল তাদের অধীনে আছে। সবচেয়ে বড় কথা, তাদের দেশেরই অভিযাত্রী জাঁমুস্ক আর বেরিং সুমেরু অঞ্চলের কাছাকাছি গিয়ে বিজয়-পতাকা উড়িয়ে এসেছে। অতএব ডেনমার্ক তো নিলামে উপস্থিত থাকবেই।

হল্যান্ডেরই মানুষ জাঁমেয়েন ৭২°-র ঠিক নিচে একটা দ্বীপ দখল করেছিল। আর ৮৪°-র কাছাকাছি হল্যান্ডের বহু অভিযাত্রী চলে গিয়েছিল। অতএব সুমেরুর ওপর হল্যান্ডের দাবি থাকা তো সঙ্গতই বটে। রাশিয়ার বহু অভিযাত্রীও সুমেরু-অভিযানে গিয়েছিল। উত্তর মহাসাগরের অর্ধেকটা তো তাদেরই শাসনাধীন। সুমেরু থেকে মাত্র ন' শো মাইল এলাকার মধ্যে ৭৫° অক্ষরেখার বহু দ্বীপ আর নিউ সাইবেরিয়ার বহু অঞ্চল তো আঠারো শতকের প্রথমে দিকে রাশিয়াই আবিষ্কার করেছে। তারপর থেকেই সেটাকে নিজেদের শাসনাধীন রেখেছে। উত্তর-অঞ্চলের ভেতর দিয়ে সরাসরি যাওয়ার রাস্তা বের করার জন্য বহুদিন আগে একজন রাশিয়ানই তো পথে নেমেছিলেন। উদ্দেশ্য, অল্প সময়ে যাতে দুই মহাদেশের মধ্যে যাতায়াত সম্ভব হয়।

আমেরিকানরা সুমেরুর মালিকানা লাভের জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে লেগে গেছে। সুমেরু অভিযানে তাদের দেশের প্রচুর সংখ্যক অসমসাহসী অভিযাত্রী বার-বার পা বাড়িয়েছে। আবার ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বিচার করলে তাদের দেশ সুমেরুর ঠিক নিচে অবস্থান করছে—বেরিং সাগর থেকে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এছাড়াও নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত ভিক্টোরিয়া, ওয়াসটন, মেলভিল, প্রিন্স অ্যালবার্ট, কিং উইলিয়াম, বাফিন আর ব্যাক্স প্রভৃতিদেশ আর দ্বীপগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। তাই তো সুমেরু যদি কোনো দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ই তবে সে দেশ অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র। অতএব দেখা যাচ্ছে, সবার আগে দাবি রয়েছে আমেরিকার। তারপর ইউরোপও এশিয়ার দাবি। অতএব আমেরিকান সংস্থার মাধ্যমে সুমেরুকে ক্রয় না করা অবধি যুক্তরাষ্ট্র সরকার দমবার নয়।

বিচার করে দেখলে, আমেরিকার নতুন দাবিটা সম্বন্ধে কারোরই দ্বিধা থাকা উচিত নয়। ইংল্যান্ডও তার দাবি থেকে একচুল সরতে নারাজ। উত্তরমেরু অঞ্চলের লাগেয়া বহু স্থানের মালিক তারাই, তাদের সাফ কথা। ম্যাকলুর আর উইলোবির মতো ইংরেজ অভিযাত্রীরাই তো সেখানকার বহুদ্বীপ আবিষ্কার করেছেন। আর বাফিন, ডেভিস, হাডসন, হল, নারেস, রস, কুক আর প্যারি প্রভৃতি অভিযাত্রীরাও জাতে অ্যাংলো-ন্যাক্সন। অতএব তাদের নাবিকরা সে-অঞ্চলে এত ঘোরাঘুরি করেছে যে, সে দেশ তো তাদের এজিয়ারেই থাকা দরকার।

তাদের কথার জবাব দিতে গিয়ে আমেরিকার কালিফোর্নিয়া জার্নাল মন্তব্য করল, নাবিকদের অধিকারের ব্যাপারটা নিয়ে যদি এত লাফালাফি তবে এটা কি অস্বীকার করার যে, ইংরেজ অভিযাত্রী মারখাম ৮৩°-২০' অক্ষাংশ পর্যন্ত এগোতে পেরেছিলেন। আর আমেরিকান অভিযাত্রী ব্রেনার্ড ও লকউড এগিয়েছিলেন ৮৩°-৩৫' পর্যন্ত। তাই যদি হয় তবে কোন দেশ সুমেরুর কাছাকাছি যেতে সক্ষম হয়েছিল? আর কোন দেশের দাবি অগ্রগণ্য?

ব্যাপারটা খোলসা হয়ে গেল, শেষপর্যন্ত লড়াই হবে ইংলিশ পাউন্ড-স্টারলিং আর আমেরিকান ডলারের মধ্যে।

বাস্টিমোরে তেসরা ডিসেম্বর নিলামের দিন ধার্য করা হল। নিলাম ডেকেও যারা সুমেরু কিনতে ব্যর্থ হবে তাদের মধ্যে নিলামের টাকা ভাগাভাগি হবে, স্থির হল। তারা টাকার ভাগ বুঝে পেয়ে ভবিষ্যতে সুমেরুর ওপর যাবতীয় স্বত্ত্ব ত্যাগ করবে।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন হল্যান্ডের ৫৩ বছর বয়স্ক জ্যাকুইম জ্যানসেন, ডেনমার্কের এরিক বলডেনিক, সুইডেন-নরওয়ের জাঁ হ্যারাল্ড, রাশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছেন কর্ণেল বরিস কারকফ। ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন মেজর ডোনলান আর তাঁর সচিব ডিন টুড্রিক। ইন্দি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছেন অর্থের লড়াইয়ে আমেরিকাকে কুপোকাং করে উত্তরমেরুর মালিকানা লাভ করবেনই। আর আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার ফর্সটার ছাড়া আর কেউ-ই তখন অবধি এসে পৌছান নি।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা নিজের দেশের জাহাজে করে আলাদা আলাদাভাবে হাজির হয়েছেন। সবাই একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী অতএব কেউ-ই কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় আর হৃদযত্নের সম্পর্ক গড়ে তুলতে নারাজ। কিন্তু বাল্টিমোর উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার দপ্তরের খোঁজ করতে গিয়ে সবার তো চক্ষু স্থির। তাদের দপ্তরটার হৃদসই পেল না। বিজ্ঞপ্তিতে কডমাছের কারবারি যে-ফর্সটারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে তার মুখোমুখি হতেই সবাই হতাশ হয়ে পড়লেন। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সে যা জানে পথের একটা কুলিও সেটুকু জানে। ব্যাস, এর বেশি কিছু নয়। এবার উপায়ান্তর না দেখে বিভিন্ন মন্থকের প্রতিনিধিরা পরস্পরের মুখোমুখি না হয়ে আর পারলেন না। তাঁরা ভূয়ো বিজ্ঞপ্তিটা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললেন। প্রতিনিধির পাঁচজনের মধ্যে থেকে ডিন ট্রিঙ্কি মন্তব্য করলেন, 'আদং ব্যাপার হচ্ছে, আমেরিকা কিছুটা জায়গার দখল নিতে চায়। আসুন আমরা মিলিতভাবে তার পথ আগলে দাঁড়াই, হাত মেলান। আমাদের সবার টাকা এক সাথে জড়ো করলে, আমেরিকার সাধ্য কি যে, আমাদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে আসবে। আমরা যৌথভাবে জায়গাটা খরিদ করার পর সবার সমান অধিকার থাকবে। নতুবা টাকা বুঝে পেয়ে একজনকে ছেড়ে দেওয়া যাবে। মোদ্দা কথা হল, আমেরিকাকে রুখে দেওয়া।'

তার প্রস্তাবটা বাকি চারজন সানন্দে মেনে নিলেন। এবার কথা হল, কে কি পরিমাণ অর্থ যৌথ তহবিলে জমা দেবে? হল্যান্ডের প্রতিনিধি জানালেন তিনি খুব বেশি হলে পঞ্চাশটা রাইকস খেলার খরচ দিতে পারেন। ব্যাস, এর বেশি কিছুতেই নয়। রাশিয়ার প্রতিনিধি জানালেন, তিনি পর্যাপ্ত রুবল পর্যন্ত উঠতে পারেন। ডেনমার্ক পনের ক্রোনে দিতে রাজি হলেন। নরওয়ে-সুইডেন বিশ ক্রোনেনের কথা বললেন। আর ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি দেড় শিলিং-এর বেশি রাজি হলেন না। এভাবেই ইউরোপের প্রতিনিধিদের আলোচনা সাস হল।

তেসরা ডিসেম্বরের নিলামে ব্যাপারটা নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল। যেখানে আসবাবপত্র ও ঘর-সংসারের দ্রব্য সামগ্রী ছাড়া কিছু বিক্রি হয় না সেখানে সুমেরুকে নিলামে ব্যবস্থা করার অর্থ কি? আর এরকম একটা বিক্রির ব্যবস্থা বিচারপতির সামনে হওয়াই সম্ভব নয় কি? ভূ-গোলকের অংশ বিশেষ বিক্রির ব্যাপারটা পাবলিক নিলামওয়ালার মারফৎ হওয়ার কোনো দরকার আছে কি? পৃথিবীর একটা অংশ সুমেরুকে চেয়ার-টেবিলের পর্যায়ে ফেলা কি সম্ভব হয়েছে? আবার বিক্রির ব্যবস্থায় এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কেউ আর টু শব্দটি না করতে পারে। আসল ব্যাপারটা তবে কি? ব্যবহারিক সংস্থা কি এমন কোনো গোপন তথ্য অবগত হয়েছে যে, ভবিষ্যতে উত্তরমেরুকে আসবাবপত্রের মতো স্থানান্তরিত করা যাবে?

তবে হ্যাঁ, এই প্রথম নয়। ভূ-গোলকের অংশ বিক্রির জন্য ইতিপূর্বেও নিলাম ডাকা হয়েছিল। এক ধনকুবেরের কাছে নিলামে ভূ-পৃষ্ঠের কিছুটা অংশ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সানফ্রান্সিসকোয় ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্পেনসর নামে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপ আকাশছোঁয়া দামে বিক্রি হয়ে যায়। নগদ পাঁচ লক্ষ ডলার মিটিয়ে দিয়ে উইলিয়াম ডিউউ কোন্ডরুপ তার প্রতিদ্বন্দ্বী আর টাকিনার-এর নাকে ঝামা ঘষে স্পেনসর দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব লাভ করেন। দ্বীপটার জন্য তাঁর সর্বমোট চল্লিশ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। তবে সেটা উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে। মানুষ বসতি ছিল, চাষ-আবাদও হত।

তবে সুমেরুর অবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র। মানুষ বসতি নেই, চাষ-আবাদের সম্ভাবনা আদৌ নেই। অতএব আকাশছোঁয়া দামের প্রশ্নই ওঠে না। তবু নিলামের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের উদ্বেগ-উত্তেজনা চড় চড় করে বেড়েই চলল।

নিলামের দর নিয়ে বাজি ধরা হতে লাগল। বাজির ব্যাপারটা কেবলমাত্র আমেরিকাতেই নয়, ইউরোপেও সংক্রামক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নিলামে ডেনমার্ক, নরওয়ে-সুইডেন, রাশিয়া মোটেই হালে পানি পাবে না। তবে ইংল্যান্ড সহজে দমবে না, জমির স্বত্ব নাকি তাদেরই। তারা আশ্রয় নীতির বলে সবকিছু কৃষ্ণগত করার ধাক্কায় হেঁক হেঁক করে বেড়াচ্ছে। তাদের টাকারও অভাব নেই। অতএব আসলে লড়াইটা লাগবে আমেরিকা আর গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে।

সকাল হতে না হতেই পিপিডের মতো দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষ এসে উপস্থিত হল নিলামের নির্দিষ্ট স্থানে। ঠিক বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হবে। জানা গেছে গ্রেট ব্রিটেন নাকি মেজর জেনারেলকে ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছে অর্থ যতই লাগুক সুমেরুর স্বত্ব কিনে নিতেই হবে। আবার ব্যবহারিক সংস্থার এত অর্থ না-ও থাকতে পারে, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের তো আছে। অতএব উত্তরমেরুর স্বত্ব তাদের চাই-ই-চাই।

সবাই যখন উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে তখন কেবলমাত্র একজন মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্বস্তিতে রয়েছে। কোনোরকম উদ্বেগ-উৎকর্ষাই তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে না। কে সে? ব্যবহারিক সংস্থার এজেন্ট উইলিয়াম এস ফর্সটার।

নিলাম প্রাক্ষেপে এক তিল জায়গাও নেই। লোক গিসগিস করছে। রেলিঙে ঘেরা প্রাক্ষেপের একধারে, রেলিঙ ঘেঁষে উত্তেজনা বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে হারাল্ড, বলডেনাক, ডেনেলান, ট্রিঙ্কি, কারকফ আর জ্যানসেন। তাঁদের ভাবটা এমন যেন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা যুদ্ধারম্ভের হুকুমের অপেক্ষায় অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে। এদিকে কিন্তু আমেরিকার পক্ষ থেকে উপস্থিত জনতার ভিড়ে গিয়ে চূপচাপ বসে আছেন মিসেস স্করবিট আর ম্যাসটন। ধারে-কাছে গান-ক্লাবের কয়েকজন সদস্যও রয়েছে।

এবার নিলামওয়ালার পক্ষ থেকে একজন সক্রিয় হল। সে ভাষণের শুরুতে বলল, 'যাকে কেন্দ্র করে, যাকে নিলাম করার জন্য এখানে জনসমাগম হয়েছে তাকে অর্থাৎ উত্তরমেরুকে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তার গুণাগুণ, আসল না নকল বা মেকী তা-ও দেখেওনি বিচার করা সম্ভব নয়।'

তবে হ্যাঁ, সুমেরু অঞ্চলকে প্রদর্শনের জন্য সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব না হলেও তার একটি ম্যাপ টেবিলের গায়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। আর তার গায়ের ৮৪° অক্ষরেখাটাকে লাল ও কালো কালি দিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

বিক্রির জায়গাটুকু দেখিয়ে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। সেখানে জল, বরফ নাকি মাটি আছে তা নিয়ে ক্রেতার মাথা ঘামাক। নিলামওয়ালা বিক্রির অঞ্চলটুকু চিহ্নিত করেই দায়মুক্ত।

ঘড়ির কাঁটা দুটো বারোটোর ঘরে গিয়ে মিলিত হতে না হতেই স্বয়ং নিলামওয়ালা মিস্টার গিলমোর মঞ্চে হাজির হলেন। তিনি গম্বীর কণ্ঠে বক্তৃতা শুরু করলেন, 'উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ৮৪° অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত ভূগোলকের সম্পূর্ণ অঞ্চলটা নিলামে বিক্রির উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সেখানে জল, সাগর, মহাসাগর, উপসাগর, দ্বীপ-উপদ্বীপ বা হিমশৈল যা আছে তা আপনারা যাঁরা নিলামে খরিদ করতে আগ্রহী তাদের বিচার্যবিষয়। এবার মানচিত্রের বিশেষ একটি ক্ষেত্রফল ৪,০৭,০০০ বর্গ মাইল। নিলামের সুবিধার জন্য প্রতিবর্গ মাইলের জন্য এক সেন্ট হিসাবে মোট ৪,০৭,০০০ সেন্ট। আর যদি প্রতি বর্গমাইলের জন্য এক ডলার দাম নির্ধারণ করা হয় তবে এর দাম দাঁড়াবে ৪,০৭,০০০ ডলার।'

নিলামওয়ালায় কথার ফাঁকে উপস্থিত কৌতূহলী দর্শকরা পরস্পরের সঙ্গে চাপা গলায় গুনগুনানি জুড়ে দিল। গুনগুনানি ছাপিয়ে ফ্রন্ট গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন।

তাঁর কথায় কান না দিয়ে নিলামওয়ালা আবার তার বক্তৃতা শুরু করলেন, 'একটা কথাই আমার তরফ থেকে বলার আছে—৮৪° অক্ষরেখার ওপারে যা কিছু অবস্থান করছে, ক্রেতা সবকিছুই মালিকানা স্বত্ব লাভ করবেন। ভবিষ্যতে তাঁর মালিকানা নিয়ে কারোরই ট্যা-ফৌ করার কোনোই অধিকার থাকবে না। ভূ-গোলক বা বায়ুমণ্ডল পরিবর্তিত হলেও সুমেরু অঞ্চল যতক্ষণ অবধি ৮৪° অক্ষরেখার বাইরে না আসছে ততক্ষণ এর সর্বস্বত্ব একমাত্র ক্রেতারই থাকবে।'

আবার উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে গুনগুনানি শুরু হয়ে গেল। এরই মধ্যেই নিলামওয়ালা হাঁক দিলেন, 'তবে প্রতি বর্গমাইলের জন্য দশ সেন্ট হিসেবে দর পাওয়া গেল।'

'ব্যাপারটা বোঝা গেল না। আসলে দশ সেন্ট দাম কেউ হেঁকেছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ব্যাপারটা ভাঁওতা কিনা বোঝা গেল না। তবে ব্যাপারটা নিয়ে কারো মাথাব্যথা আছে বলে মনেও হল না। প্রতিবর্গমাইলের জন্য দশ সেন্ট দাম হলে পুরো অঞ্চলটার মোট দাম দাঁড়ায় ৪০,৭০০০ ডলার। তা সত্ত্বেও ডেনমার্কের প্রতিনিধি হাঁক দিল 'কুড়ি সেন্ট।' সুইডেন-নরওয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল, 'ত্রিশ সেন্ট।' রাশিয়া হাঁক দিল—'চল্লিশ সেন্ট।'

পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে মেজর ডোনোর আর তাঁর দলের চারজন মিহিয়ে গেলেন। আসলে এতেই তাদের পকেট ফাঁকা হয়ে গেছে।

ইংল্যান্ড মোটেই মুখ খুলল না। আমেরিকাও মুখে কুলুপ এঁটে নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে বসে রয়েছে।

এদিকে নিলামওয়ালা গিলমোর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতাদের আরও দর হাঁকার জন্য নানাভাবে উত্তেজিত করার চেষ্টায় মেতে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাবনা চিন্তা করে ডেনমার্কের প্রতিনিধি পঞ্চাশ সেন্ট দর হাঁকলেন। আরও দশ সেন্ট বেশি হাঁকলেন হল্যান্ডের প্রতিনিধি। এতে পুরো অঞ্চলটার মোট দাম দাঁড়াল দুলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুশ ডলার।

আবার নিলামওয়ালা গিলমোর ক্রেতাদের উৎসাহ দানের নামে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

জাঁ হারাল্ড এবার গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'সত্তর সেন্ট।' ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল কারকফ আশি সেন্ট হেঁকে বসলেন।

আবারও নিলামওয়ালা গিলমোর প্রতিদ্বন্দ্বী ক্রেতাদের উৎসাহিত করতে প্রয়াসী হলেন।

মেজর ডোনোলান এতক্ষণ ডিন টুট্টিঙ্কের ইস্তিকের অপেক্ষায় ছিলেন। এবার ক্ষেপা বাঘের মতো তিনি গর্জে উঠলেন, 'এক শো-এক শো সেন্ট।' এবার ইংল্যান্ডের এক ডাকে পুরো অঞ্চলটার দাম চার লক্ষ সাত হাজার ডলার দাম উঠে গেল।

ইংল্যান্ডের ব্যাপার দেখে আমেরিকার প্রতিনিধির মুখ চিপসে গেল। বরফ, জল আর তুহিনে ঢাকা একটা অঞ্চলের দাম ক্রমে এমন আকাশছোঁয়া হয়ে উঠতে থাকলে ব্যাপারটা তো ভাবনারই বটে।

নিলামওয়ালা গিলমোর আবার বক্তৃতা শুরু করল। রসিকতা আর টিটকারির মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিদের উত্তেজিত করে দর চড়াবার জোর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল।

উইলিয়াম এস ফর্সটার খবরের কাগজের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেঁকে উঠলেন, 'এক শো দশ সেন্ট। প্রতি বর্গমাইলের জন্য এক শো দশ সেন্ট।'

আমেরিকা সবাইকে ডিঙিয়ে ওপরে উঠে যাওয়ায় উপস্থিত দর্শকদের অধিকাংশের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেল। কারণ, এরা আমেরিকার ওপর বাজি ধরেছিল। অতএব এদের উচ্ছ্বাস-উল্লাস তো হবারই কথা।

ব্যাপার দেখে মেজর ডোনোলান তাজ্জব বনে গেলেন। চোখের তারায় উত্তেজনা মিশ্রিত বিশ্বয়ের ছাপ একে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে উইলিয়াম এস ফর্সটার-এর দিকে তাকালেন।

আমেরিকান প্রতিনিধি উইলিয়াম এস ফর্সটার কিন্তু নির্বিকারচিত্তে খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মুখবুজে বসে রইলেন।

মেজর ডোনোলান উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাঁক দিলেন, 'আমার দর রইল এক শো চল্লিশ সেন্ট।'

উইলিয়াম এস ফর্সটার হাঁকলেন—'আমার দর এক শো ষাট সেন্ট।'

মেজর ডোনোলান হাঁকলেন—'আমার এক শো আশি সেন্ট।'

'এক শো নব্বই সেন্ট' উইলিয়াম এস ফর্সটার হেঁকে উঠলেন।

এক শো নিরানব্বই সেন্ট হেঁকে বসলেন গ্রেটবুটনের প্রতিনিধি। এর মানে পুরো অঞ্চলটার দাম দাঁড়াচ্ছে সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার ডলার। আরে বাস! এ যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

নিলামওয়াল গিলমোর-এর গলা শোনা গেল—‘তবে প্রতি বর্গমাইল এক শো নিরানব্বই সেন্ট হিসেবেই উত্তরমেরু বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।’

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই রীতিমতো ঠাণ্ডা মাথায়, নিচুগলায় ফর্সটার বলে উঠলেন, ‘আমার দর দু শো সেন্ট—পুরো দু শো সেন্ট।’

তার কথাটা উচ্চারিত হওয়া মাত্র উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একটা বড় ভগ্নাংশ উজ্জ্বলিত আবাগের সঙ্গে সমন্বরে বলে উঠল, ‘হিপ—হিপ—হুররে! হিপ—হিপ—হুররে!’ হবে নাই বা কেন? এরা সবাই যে আমেরিকার ওপরেই বাজি ধরেছে। আমেরিকাই দাম হেঁকে সবাইকে টেকা দিয়ে উত্তরমেরুর স্বত্ব কিনে নেবে।

ব্যস, আমেরিকার উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা তাদের এজেন্ট উইলিয়াম এস ফর্সটার-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ দর হেঁকে ৮৪° অক্ষরেখার ওপারের যাবতীয় অঞ্চল কিনে নিতে চলেছে। আর কোনো দেশের প্রতিনিধিই ফোঁ-ফোঁ করলেন না। তাদের তহবিল যে অনেক আগেই ফাঁকা হয়ে গেছে।

উইলিয়াম এস ফর্সটার পরদিন উত্তরমেরু খরিদের নির্ধারিত অর্থ জমা দিতে গিয়ে দলিলপত্রে নিজের নাম ইস্পে বার্বিকেন লেখালেন। আর প্রতিষ্ঠানের নাম লেখালেন ‘বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি’। বার্বিকেন—ইস্পে বার্বিকেন? তবে কি ইনি গান-ক্লাবের সভাপতি ইস্পে বার্বিকেন? ইনিই কি বছর কয়েক আগে কামানের গোলায় চেপে চাঁদে চক্কর মেরে এসেছিলেন? ইনিই কি তবে সেই বার্বিকেন? হ্যাঁ, অনুমান অত্রান্তই বটে। ইনিই গান-ক্লাবের সভাপতি সেই ইস্পে বার্বিকেন। এর সহযোগীও সহগামী ছিলেন, এরই প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাপ্টেন নিকল আর ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আঁদ্রী। তাঁদের গায়ে চক্কর মেরে তিনজন অক্ষত শরীরে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন নিকল এবং ইস্পে বার্বিকেন নিলামের আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কারণ ফরাসি বৈজ্ঞানিক মাইকেল আঁদ্রী পৃথিবীর বুকে ফিরে এসে দেদার অর্থ উপার্জন করে ফুলেফেঁপে একেবারে ঢোল হয়ে যান। ব্যাস, ফিরে যান নিজের দেশে। সেখানে কফির চাষে মেতে যান।

এদিকে কামান দাগার পর ইস্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকল গোমড়া মন নিয়ে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। কারণ, হাত-পা গুটিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আর কতদিন বসে থাকা সম্ভব! টাকার পাহাড় রয়েছে। কিন্তু করার কিছুই নেই। অথচ নতুনতর কিছু করার জন্য উভয়েই সর্বক্ষণ স্বপ্নে ডুবে রয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর জন্য পঞ্চান্ন লক্ষ ডলার জোগাড় হয়েছিল। সম্পূর্ণ অর্থ তাতে ব্যয় হয় নি। দুলক্ষ ডলার হাতে রয়ে গেছে। আবার প্রোজেকটাইলটার দর্শনিস্বরূপ মোটা অর্থ কামিয়েছেন। এভাবে টাকার কুমির বনে গেলেন। ফলে বাকি জীবনটা তাঁরা দিবি বসে আয়েশ করে কাটিয়ে দিতে পারতেন। আসলে তাদের মাথায় যে নতুনতর কিছু করার জন্য প্রতিনিয়ত পোকায় কামড়ায়। সত্য বলতে কি আরাম-আয়েশ তাঁদের কাছে পীড়াদায়ক ব্যাপার। তাই তো যা হোক কিছু করার অ ছিল্যায় উত্তরমেরু কেনার জন্য অত্যাশ্রয়িত হয়ে পড়েছেন।

তবে হ্যাঁ, উত্তরমেরু খরিদ করার সম্পূর্ণ অর্থ জুগিয়েছেন মিসেস স্করবিট। একমাত্র তাঁর অর্থের জন্যই ইউরোপ আমেরিকার কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। তাঁদের বুকে চক্কর মেরে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার পার ইস্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকরকে নিয়ে দেশের মানুষ মাতামাতি জুড়ে দেন। কিন্তু এরা দুজন ছাড়া আরও একজনের সম্মান পাওয়ার কথা ছিল। তিনি হচ্ছেন, জে. টি. ম্যাসটন। গান ক্লাবের সম্পাদক। তিনি অঙ্ক কষে, হিসাব নিকাশের মাধ্যমে চাঁদে গোলায় চেপে পাড়ি জমানোর ব্যাপারটাকে সুগম করে দিয়েছিলেন। তিনি সহযোগিতা না করলে ‘পৃথিবী থেকে চাঁদে’ কাহিনীটি কোনোদিনই সম্ভব হত না। ভয় ভীতির জন্য নয়, যুদ্ধে এমন ভয়ঙ্কর জখম হয়েছিলেন যে, তাঁদের মানুষ আচমকা তাঁর বিকলাঙ্গ চেহারাটিকে দেখলে চমকে উঠত। তার মাথার খুলির পরিবর্তে গাটাপার্চার খুলি আর হাড়-মাংসের হাতের পরিবর্তে লোহার পাত দেখলে চমকে যাওয়ার কথাই তো বটে। এতকিছু সত্ত্বেও তাঁর প্রতিভা কিন্তু এতটুকু মিথিয়ে যায় নি। এমন একটি অনন্য প্রতিভাধরকে মিসেস স্করবিট পছন্দ করবেন এতে অবাক হবার কিছুই নেই। তিনি মনে করলেন জে. টি. ম্যাসটন কেবল একজন মানুষই নন, সত্যকারের একজন অতিমানব। তাই তিনি জে. টি. ম্যাসটনকে বিয়ে করার জন্য অত্যাশ্রয়িতা প্রার্থী।

মিসেস স্করবিট তরুণী নন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স তাঁর। চুলে পাক ধরেছে। তবে সবগুলি দাঁত এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে যথাস্থানে অবস্থান করছে। তার বিয়ে একবার হয়েছিল ঠিকই। কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপন করতই তার স্বামী পৃথিবী ছেড়ে চলে যান—স্করবিট বিধবা হন। ম্যাসটনকে বিয়ে করে স্বামীরূপে না পাওয়া অবধি তাঁর মন-প্রাণ কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। অর্থের অভাব তাঁর নেই। ভ্যানডার, বিল্ট, গোল্ডস আর ম্যাককেনের মতো ধনকুবের না হলেও তাঁকে অবশ্যই ধনীর পর্যায়ে ফেলা যায়। মিসেস কার্পারের মতো বিশ কোটি, মিসেস ক্রকারের মতো আটকোটি অথবা মিসেস স্টুয়ার্টের মতো ত্রিশ কোটি ডলারের মালিক তিনি নন। আবার মিসেস মাফিট, মিসেস হোট গ্রিন বা মিসেস মার্শালের মতো অগাদ ধন-সম্পদের মালিক তিনি নন বটে। তবে পঞ্চাশ লক্ষ ডলার ছাড়া নিউ ইয়র্কের যে হোটেলটিতে কেউ প্রবেশাধিকার পায় না সে হোটেলে মিসেস স্করবিট হরদম যাতায়াত করেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে চল্লিশ লক্ষ ডলার অর্থাৎ দু কোটি ফ্রাঁ তাঁর তহবিলে মজুদ আছে। মিস্টার জন পি স্করবিটের কাছ থেকে এ-বিপুল অর্থ তিনি পেয়েছেন। তাঁর যাবতীয় অর্থ তিনি ম্যাসটনের কাছে লাগাতে উৎসাহী আর বিনিময়ে তাঁকে পেতে চান নিজের করে।

তাই তো মিসেস স্করবিট যখন জানতে পারলেন, ম্যাসটনের কিছু টাকা দরকার তখন আনন্দ-আহ্লাদে ডগমগ হয়ে তিনি উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার হাতে তুলে দিলেন বিপুল অর্থ। এ-অর্থ কোন কাজে ব্যবহার করা হবে ভুলেও মুখ

ফুটে জানতে চাইলেন না। তবে এটুকু বিশ্বাস তাঁর আছে যে, ম্যাসটন যে-সংস্থার সঙ্গে জড়িত সেখানে তার পড়ে থাকা অর্থ নির্ধাৎ মহৎ কাজেই ব্যয় হবে।

এক সময় যখন জানতে পারলেন, প্রতিষ্ঠানটির 'বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি' নামকরণ করা হয়েছে তখনও তিনি ঘাবড়ালেন না। তিনি তো নিশ্চয় যে, প্রতিষ্ঠানটি সবচেয়ে বড় ভাগীদার যখন তিনি তখন সুমেরুর মালিকানার বড়ভাগীদারও তিনিই হবেন।

মিসেস স্করবিট এভাবেই ৮৪°-এর গভীর ওপাশের তুষার রাজ্যের রাণী বনে গেলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বরফের বরফ-রাজ্য নিয়ে কি ফায়দা হবে? অনুর্বর সুমেরু থেকে কি সংস্থাটি ফায়দা কিছু ওঠাতে পারবে? অবহেলিত বরফ-অঞ্চলটিকে নিয়ে সারা পৃথিবী কেনই বা এমন অগ্রহী হয়ে উঠেছে? মানুষের মনে কেন এমন করে হঠাৎ রহস্যের সন্ধার হল? ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে পৃথিবীর মানুষ উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার পাগলামি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে মিসেস স্করবিট এটাকেই সাহুনা বলে মেনে নিয়েছেন।

তবে হ্যাঁ, সময়-সুযোগ মতো মাঝে-মধ্যে মিসেস স্করবিট মিষ্টার ম্যাসটনকে প্রশ্ন করেছেন, 'উত্তরমেরু কিনে ফায়দা কি হল?' তবে এও সত্য তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে বার্বিকেন এবার চন্দ্রবিজয়ের অভিযানের গৌরবকেও ছাপিয়ে যাবেন। তিনি এমন এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করবেন যা অতীতে ছিল না, বর্তমানে নেই আর ভবিষ্যতেও কোনোদিন ঘটবে না। এতকিছু বুঝেও ম্যাসটনকে প্রশ্নটা তিনি করেছিলেন।

ম্যাসটন—'অপেক্ষা করুন, ধৈর্য ধরুন' প্রভৃতি বলে প্রতিবারই তার প্রশ্নটাকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে গেছেন।

ইউরোপের মুখে ঝামা ঘষে আমেরিকা যখন জয়লাভ করে সুমেরুর মালিকানা স্তূভ লাভ করল তখন মিসেস স্করবিট আবারও একই প্রশ্নের অবতারণা করে বলে উঠলেন, 'এখনও কি উদ্দেশ্যটা জানতে পারব না?'

ম্যাসটন আমেরিকান ভদ্রমহিলা মিসেস স্করবিটের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'জানবেন, অবশ্যই জানতে পারবেন।'

কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবী জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা নিজেদের গোপন উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে টাকার জন্য আবেদন করল। পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল নতুন সংস্থাটি উত্তরমেরুর বরফের তলা থেকে কয়লা তোলার ধাক্কা সুমেরু কিনেছে।

সংস্থার ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আবার পৃথিবীর মানুষ মুখ খুলল, 'কয়লা? সুমেরুতে কয়লা? কয়লা আছে কি সেখানে? সুমেরুতে কয়লা কোথেকে আসবে?'

আর একদল পাণ্ডা জবাব দিল, 'কেন থাকবে না? সারা পৃথিবী জুড়েই তো কয়লা রয়েছে, কার না জানা আছে? ইউরোপের বহু জায়গায় কয়লা আছে। আমেরিকাতেও কয়লা আছে। হয়তো বা আমেরিকাতে সর্বোৎকৃষ্ট কয়লা যা আছে, এত কয়লা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। আর অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও আফ্রিকাতে কয়লাখনি আছে। যত দিন যাচ্ছে ততই নিভ্য নতুন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হচ্ছে। সমগ্র পৃথিবীতে অন্তত এক শো বছরের মতো কয়লা সম্বিষ্ট আছে। কলকারখানার সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে কয়লা উত্তোলন বাড়তে থাকবে। বাষ্পের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার শুরু হলেও কয়লার চাহিদা হ্রাস পাবে না। তাই তো কয়লাকে আমাদের আগলে রাখতে হবেই। কয়লা যে কেবলমাত্র আমাদের রান্নার সমস্যা মেটায় তাই নয়। বহুভাবে বহুক্ষেত্রে আমরা কয়লাকে ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কয়লাকে কতভাবে সমাজের মঙ্গল সাধনে লাগানো যেতে পারে। গবেষণার মাধ্যমে তাঁরা কয়লা থেকে উত্তাপ, আলো আর সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি করছেন। কদাকার কয়লাকে হীরে পালিশ করতেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই তো কয়লার সমাদর লোহার মতোই। হয়তো বাতাস চেয়েও বেশি। আমাদের বরাতের জোর আছে যে, পৃথিবীর লোহা কোনোদিনই ফুরাবে না। আসলে পৃথিবীটা যে লোহা দিয়েই গড়া। আমাদের ভূ-গোলকটা যেন অতিকায় একটা লোহার পিণ্ড। তারপর জল আর পাথরের স্থান। তাই কয়লা একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু লোহা কোনোদিনই ফুরাবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে, সুমেরুতে কয়লা আসবে কোথেকে?'

বার্বিকেনের অঙ্ক সমর্থকরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল, 'থাকবে নাই বা কেন? ভূ-প্রকৃতি যখন গঠিত হতে চলেছিল তখন সূর্যের উত্তাপে হয়তো নিরক্ষীয় অঞ্চল আর মরু অঞ্চলে সমানভাবে বর্ষিত হত। মরু অঞ্চল গভীর অরণ্যাবৃত ছিল। পৃথিবীতে মানুষ এসেছে তারও অনেক পরে। তখনই শুরু হয়েছে শৈত্য, উত্তাপ আর আর্দ্রতার ভয়ঙ্কর সব খেলা। একের পর এক ভয়ঙ্কর সব পরিবর্তনের মাধ্যমে পৃথিবী বর্তমান রূপে পরিণত হওয়ার আগেই বিশালায়তন সুগভীর অরণ্য পৃথিবীর উত্তাপ ও নানা প্রাকৃতিক কারণে কয়লায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।'

খবরের কাগজের পাতায় পাতায় যখন উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার বরফের তলা থেকে কয়লা তোলার উদ্দেশ্যের কথা ছাপা হতে লাগল ঠিক তখনই এক বিকেলে ডিন টুড্রিক্স আর মেজর ডোনালান এক রেষ্টোরাঁয় কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হলেন। কথা প্রসঙ্গে মেজর বললেন, 'সুমেরু পর্বত সম্পর্কিত গবেষণায় অধ্যাপক নোরডেনস্কিল বিভিন্ন পাথরের গায়ে প্রচুর সংখ্যক শিলীভূত উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। তবে অনেকটা উত্তর দিক থেকে। অতএব কয়লার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ করা সম্ভব নয়। সেখানে এত কয়লা লুকিয়ে আছে যে, কেবল তুলে নিতে পারলেই হল।'

ডিন টুড্রিক্স তাকে সমর্থন করলেন। তবে তিনি বললেন, 'আপনার কথা মানছি বাটে। কিন্তু এর জন্য ইঞ্জিনিয়ার, অন্তত নৌ-অভিযাত্রী যদি উৎসাহী হত তবুও না হয় সম্ভব বলা যেত, কিন্তু বন্দুকবাজরা এতে উৎসাহী হয়ে পড়লেন কেন?'

কয়েকদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সংবাদপত্রগুলি ব্যাপারটা নিয়ে তোলপাড় জুড়ে দিল। একটি মার্কিন সংবাদপত্র তো

বার্বিকেনের সমর্থন করে লিখল, '১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপেট নারেস ৮২° সমাক্ষরেখায় চক্কর মারার সময় হ্যাজেল পপলার, বিচগাছ ও বহু ফুলগাছ দেখতে পেয়েছিলেন।' তাই যদি হয় তবে কয়লা না থাকার কারণ কী?

নিউইয়র্কের এক সংবাদপত্র প্রায় একই রকম মন্তব্য করল, লেফটেন্যান্ট গ্রিলি লেডি ফ্রাঙ্কলিন উপসাগরে ১৮৮১ এবং ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কয়লার স্তর আবিষ্কার করেন। সুমেরুতে প্রচুর কয়লা আছে এরকম উক্তি উদ্ভূত পেডিও করেছেন।

এরকম সব বক্তব্যকে বার্বিকেনের বিরুদ্ধপক্ষ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারল না। শেষমেশ তারাও মেনে নিতে বাধ্য হল, সুমেরুতে ঐতিহাসিক যুগে যে অরণ্য ছিল আজ তা প্রচুর, প্রচুর কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে।

বার্বিকেনের প্রতিপক্ষ হেরে ভূত-হয়ে গেলেও একেবারে মিইয়ে গেলেন না। একদিন গান-ক্লাবের এক মিটিং-এর শেষে মেজর ডোনেলান গলা হেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ কয়লা আছে। মেনে নিচ্ছি, আপনাদের কিনে নেওয়া বরফ সন্তোজের জমাটবাঁধা বরফের তলায় বিস্তার কয়লা রয়েছে। তবে আর দেরি করছেন কেন মশাই, কাড়িকাড়ি কয়লা তুলে নিয়ে আসুন।'

মুচকি হেসে শান্ত গলায় বার্বিকেন জবাব দিলেন, 'আসব। অবশ্যই আসব। সে উদ্যোগ আয়োজনই তো করছি মশাই।'

মেজর ডোনেলান বক্রোক্তি করলেন, 'স্বপ্ন দেখছেন নাকি মশাই! ৮৪° সমাক্ষ রেখার ওপারে, কোনো অভিযাত্রী আজ পর্যন্ত যেখানে যেতে পারেন নি সেখান থেকে আপনারা কয়লা তুলে আনবেন!'

'কেবলমাত্র সেখানেই নয়। আরও অনেক, অনেক ভেতরে যাব। উত্তরমেরুর একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবশ্যই হাজির হব, শুনে রাখুন মশাই।'

বার্বিকেন এমন শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে কথাগুলো ব্যক্ত করলেন যেন এটা তাঁর কাছে একেবারেই মামুলি এক ব্যাপার।

পৃথিবীতে পরশ্রীকাতর মানুষের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। চারদিকে বার্বিকেনকে নিয়ে মাতামাতি করতে দেখে একদল লোক উঠে পড়ে লেগে গেল, রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যমে তাকে হেসে প্রতিপন্ন করার জন্য। সবচেয়ে বেশি করে তাঁর কৈশ্য গাইতে লাগল ইংরেজরা। তারা বলে বেড়াতে লাগল—ইয়াক্কি বার্বিকেন নাকি যেখানে আজ পর্যন্ত মানুষ পদচিহ্ন আঁকতে পারে নি সেখানে প্রাসাদ তৈরি করে শহর গড়ে তুলবেন। শুধু কি এই, সেখানে দ্বিতীয় হোয়াইট হাউস গড়ে তুলে পৃথিবীতে অনন্য নজির সৃষ্টি করবেন।

শুধু কি এই? একটা কার্টুন ছবি ছাপিয়ে বিলি করল, যার বক্তব্য—ইম্প বার্বিকেন দুই সাহযোগী ম্যাসটন এবং নিকলকে নিয়ে বেলেনে চেষ্টে সুমেরুর আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চলটিতে বহু তল্লাশি চালিয়ে মাত্র আধ পাউন্ড ওজনের একটুকরো কয়লা পেয়েছেন।' এরকম বহু কার্টুন ছবি ছাপিয়ে ইংরেজরা বিলি করতে লাগল।

বার্বিকেন এমনিতেই ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। তার ওপর কোনো প্রেরোচনাতেই কান না দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি সংযত রাখলেন। উত্তরমেরুর মালিকানা স্বত্ব লাভ করার পর থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহের জন্য তৎপর হলেন। সর্বমোট দেড় কোটি ডলার তার চাই। বাজারে এক শো ডলার মূল্যের কোম্পানির কাগজ বাজারে ছাড়তে না ছাড়তেই আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে টাকা যেন উড়ে আসতে লাগল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও বার্বিকেনের সাফল্য নিয়ে সামান্যতম সন্দেহও রইল না। প্রতিটি মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, বার্বিকেনের সাফল্য অনিবার্য।

১৬ই ডিসেম্বর হিসাব করে দেখা গেল ইতিমধ্যেই তিন কোটি ডলার সংগৃহীত হয়ে গেছে। চাঁদে পাড়ি জমানোর ফলে গান ক্লাব যে পরিমাণ ডলার সংগ্রহ করে ছিল এটা তার তিনগুণ। বার্বিকেন অর্থ সংগ্রহের ব্যাপার আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন।

গান-ক্লাবের সভাপতি নিঃসন্দেহ ছিলেন, সুমেরু জয় তিনি করবেনই করবেন। অর্থ সংগৃহীত হওয়ার ফলে বড় রকম একটি প্রতিবন্ধকতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারলেন।

অর্থ সংগ্রহের পর বার্বিকেন এবার প্রকৃতি-পর্বে মন দিলেন। নারেস, কেন, ফ্রাঙ্কলিন ও গ্রিলি ডি-লঙ যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি তাতে সাফল্য লাভ করবেনই। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, ৮৪° অক্ষরেখা অতিক্রম করে তিনি ভেতরে ঢুকতে সক্ষম হবেনই। কেবলমাত্র সেখানকার জমির মালিকানা বুঝে পেয়েই তিনি নিরস্ত হবেন না, আমেরিকার জাতীয় পতাকার উনচল্লিশতম তারকা হবে সুমেরু। একাজে তিনি সফল হবেনই। সাফল্য লাভ তাঁকে করতেই হবে।

এদিকে ইউরোপের মানুষ বার্বিকেনকে পয়লা নম্বর প্রতারণক বলে খিকার দিতে লাগল। এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করার অবকাশ তাঁর নেই।

উত্তরমেরু বিজয়ের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা জে. টি. ম্যাসটনের মাথা থেকে বেরিয়েছে। দিনের পর দিন অল্প কণ্ঠে কণ্ঠে বহু জটিল সমস্যার জট ছাড়িয়ে তবেই তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পেরেছেন। ম্যাসটনের ভিলমাত্র ভুলও হয় নি। ভুল তার হতে পারে না, কিছুতেই হওয়া সম্ভব নয়।

সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর এক মাস আগে বন্ধুদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন উত্তরমেরু বিজয়ের গোপনসূত্র তিনি তাদের কাছে ব্যক্ত করবেন। তারপর তার ১৭৯নং ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিটের ব্যালিস্টিক কন্টেজের এক নিভৃত কক্ষে মাথা গুঁজে অল্প নিয়ে মেতে গেলেন। ফায়ার-ফায়ার নামে তাঁর এক নিম্নো চাকর ছাড়া তাঁর আর কোনো বাড়তি ব্যয়ের বোঝা নেই। তাই তাঁর টাকার দরকারও খুবই কম। গোলন্দাজ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে তিনি কিছু ভাতা পান। আর গান-ক্লাবের সেক্রেটারি পদের জন্যও তাঁকে কিছু ভাতা দেওয়া হয়। তিনি অগ্রহীত হলে দুহাতে টাকা কামাতে পারতেন। আর বিয়ে-থা করে অন্য দশজনের মতো দিবা ঘর-সংসার নিয়ে মেতে থাকারও কিছুমাত্র বাধা ছিল না। কিন্তু

ঘরের নিভৃত কোণে বসে অঙ্কের ভেতরে ডুবে থাকতেই তাঁর যত আনন্দ, যত সুখ। তাঁর মাথা থেকে অঙ্কের এমন সব ভেঙ্কি বেরোয় যা দেখলে আইজ্যাক নিউটন, লা প্লেস আর ইউক্লিডও ঈর্ষান্বিত না হয়ে পারতেনই না।

ম্যাসটনের বাড়ির ঠিক বিপরীত বাড়িতে বাস করেন মিসেস স্করবিট। নিউপার্কের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বাড়ি সেটা। সবাই সেটাকে 'নিউপার্কের প্যালেস' বলে সম্বোধন করে। নিউপার্কের প্যালেস আর ব্যালিস্টিক কটেজের মধ্যে দূরত্ব মাত্র মাইল তিনেক। উভয় ভবনের মধ্যে প্রাইভেট টেলিফোনের লাইন পাতা হয়েছে। তাঁরা মুখোমুখি নাই বা হলেন, চোখের দেখা নাই বা দেখতে পেলেন, কথাবার্তার মাধ্যমে পরস্পরের খোঁজ-খবর তো নেওয়া যায়।

তেসরা ডিসেম্বর। ম্যাসটন বন্ধুদের সঙ্গে জরুরি কিছু আলোচনা সেরে বাড়ি ফিরে অঙ্ক নিয়ে বসার উদ্যোগ নিতে লাগলেন। সে অঙ্কের সমাধানের ওপর নির্ভর করছে বরফাবৃত সুমেরু অঞ্চলের বাঙ্কিত যথোপযুক্ত ব্যবহার। সামান্য ভুলচুক হলেই পুরো ব্যাপারটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই ঠিক হল, সপ্তাহ খানেক কেউ তাঁর বাড়ি যাবেন না, অন্য কোনোভাবেও কেউ বিরক্ত করবেন না।

ম্যাসটন ঘরের কোণে কাগজ-কলম নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাথা গুঁজে অঙ্ক নিয়ে আঁকঝোঁক করার কাজে মেতে থাকার আয়োজন করলেন। চাকর ফায়ার-কায়ার-এর ওপর কড়া হুকুম দিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এলেও যেন দরজা খুলে না দেয়।

গোড়ার দিকে পুরো দুটো দিন তিনি কাগজ-কলমে হাত না দিয়ে অঙ্ক নিয়ে কেবল ভাবনা-চিন্তায় ডুবে রইলেন। তাঁর ভাবনা-চিন্তা মোটামুটি এরকম ছিল, 'পৃথিবী অধিবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে চলেছে। তার সবচেয়ে বড় ব্যাসার্ধ তেষ্টি লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিন শো আটানব্বই মিটার আর সবচেয়ে ছোট ব্যাসার্ধ তেষ্টি লক্ষ ছাপান্ন হাজার আশি মিটার। তার নিরক্ষরেখার বরাবর পৃথিবীর পরিধি হচ্ছে, চার কোটি কি. মি.। পৃথিবীপৃষ্ঠ প্রায় একান্ন কোটি ব. কিমি.। পৃথিবীর ঘনত্ব জলের ঘনত্বের প্রায় পাঁচগুণ বেশি। ম্যাসটন এ-তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে অঙ্ক আরম্ভ করবেন মনস্থ করলেন।

পাঁচই ডিসেম্বর বিকালে ম্যাসটন ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে বিশালায়তন একটি বৃত্ত আঁকলেন। পৃথিবীর প্রতিকৃতি। কেন্দ্রস্থল বরাবর একটা সরলরেখা টেনে তাকে দ্বিধাভিভক্ত করলেন। নিরক্ষরেখা—পরিধি। তার কাছকাছি বড় বড় হরফে লিখে রাখলেন পৃথিবীর পরিধির মাপ—৪০,০০০,০০০ মাইল।

ম্যাসটন এভাবে প্রথম ধাপ শেষ করলেন। এবার সমস্যার সমাধানে মন দিলেন। ডুবে গেলেন অঙ্কের মধ্যে। এমন সময় কর্কশ স্বরে টেলিফোন বেজে উঠল। ম্যাসটনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ এঁটে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিয়ে কর্কশ গলায় প্রায় ঝেঁকিয়ে উঠলেন, 'হ্যালো কে? হ্যালো কে কথা বলছেন?'

বিপরীত দিক থেকে মহিলার কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমি মিসেস স্করবিট। আকাশে দারুণ মেঘ করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকচ্ছে। ঘরের দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করেছেন তো? বাজ পড়ছে। কেলেঙ্কারী ঘটে যেতে কতক্ষণ!'

মিসেস স্করবিটের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই বিকট আওয়াজ করে 'ব্যালিস্টিক কটেজ'র কাছেই বাজ পড়ল। তড়িৎ প্রবাহ টেলিফোনের তারের মধ্য দিয়ে ছুটে এসে গণিত বিশারদ ম্যাসটনকে ঘরের কোণে ছিটকে ফেলে দিল। লোহার আঁকশিটা ঠেকেছে বলেই এরকম ক্যাসান্দ ঘটে গেল। ব্ল্যাকবোর্ডটি আছাড় খেয়ে পড়ল। তারপরই তড়িৎ প্রবাহ অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমে মেঝে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ম্যাসটন কোনোরকমে উঠে ব্ল্যাকবোর্ডটি সোজা করতেই দেখলেন যে-অঙ্কটা নিয়ে এতক্ষণ ডুবেছিলে তার শেষের দিকের কিছু অংশ মুছে গেছে। হাতের চকটা বুলিয়ে আবার নতুন করে মুছে-যাওয়া অংশটুকু লেখার চেষ্টা করতেই আবার তেমনি বিশ্রী স্বরে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে কানের কাছে নিভেই মিসেস স্করবিটের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে এল, 'কী ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বাজ পড়ল। ব্যালিস্টিক হাউসে বাজ পড়ে নি তো? ব্যাখ্যাটাখা পান নি তো?'

অস্থিরচিত্ত ম্যাসটন গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, 'ধন্যবাদ! আপনার আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই আমাকে স্পর্শ করে নি। শুভ ইভিনিং মিসেস স্করবিট!' এক নিঃশ্বাসে কথা কাটি বলেই তিনি রিসিভারটি নামিয়ে রাখলেন। আপন মনে গস গস করতে লাগলেন, 'যতসব আপদ! জ্বালাতনের চূড়ান্ত করে ছাড়ল! আচমকা টেলিফোন না করলে আমাকে এমন আছাড় খেতে হত না, অঙ্কটিও মুছত না।'

ম্যাসটন আবার ব্ল্যাক বোর্ডে ফিরে গিয়ে অঙ্কের মধ্যে ডুবে গেলেন।

এক সপ্তাহ বাদে ম্যাসটন উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার কর্তাদের কাছে অঙ্কের ফলাফল পৌছে দিলেন। অঙ্কের হিসাবে সুমেরু বিজয়ের সুত্রের সন্ধান পেয়েছেন। ব্যস, আর চিন্তা নেই। বাঙ্কিত সূত্র যখন পাওয়া গেছে তখন বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির সাফল্যের পথে আর কোনো প্রতিবন্ধকতাই রইল না।

ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে গান-ক্রাবের সভাকক্ষে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির অংশীদারদের এক সভা ডাকা হল।

নির্দিষ্ট দিনে সভাকক্ষে তিল ধরানোর জায়গা থাকল না। কোম্পানির অংশীদাররা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সভাকক্ষে জড়ো হয়েছে। ইউরোপিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীরাও এসেছেন। বার্বিকেন আজকের সভায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অর্থাৎ কীভাবে সুমেরু অঞ্চলের উদ্দেশ্যে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা যাত্রা করবেন, কীভাবেই বা বরফের রাজ্যের খনি থেকে কয়লা উত্তোলন করবে তা খোলাখুলি আলোচনা করবেন।

তখন রাত্রি আটটা। ইম্পে বার্বিকেন সাগরদেদের নিয়ে মঞ্চ আলো করে বসে। ইম্পে বার্বিকেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, 'উপস্থিত সুধীমগণী, আজ সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী আপনাদের সামনে একটি

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করবেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার উত্তরমেরুর মালিকানা স্বত্ত্ব যে আমাদের দিয়েছেন তা আপনারা অবগত আছেন। আর সেখান থেকে কয়লা উত্তোলনের অর্থও চাঁদা স্বরূপ আপনারা দিয়েছেন। লভ্যাংশ হাতে পেলে অবশ্যই স্বীকার করবেন, এত বড় বাণিজ্যিক সাফল্যের নজির ইতিহাসে বিরল। আমরা এমন প্রমাণও দিতে চলছি, কেবলমাত্র কয়লাই নয় সেখানে শিলীভূত হাতীর দাঁতও মিলতে পারে। আগামী পাঁচ শো বছর বাদে পৃথিবীতে কয়লার অভাব দেখা দেবে। পরিচিত কয়লা খনির জঠরে আর কয়লা পাওয়া যাবে না। আবার এমনও হতে পারে উনিশ শতক শেষ হবার আগেই কয়লা ফুরিয়ে যেতে পারে। তাই বলছি কি এখনই উত্তরমেরুতে হানা দেওয়া যাক।’

মেজর ডোনেলান মাঝপথে গলা-ছেড়ে বলে উঠলেন, ‘সে না হয় যাওয়া যাবে। কিন্তু কীভাবে, জল, স্থল নাকি শূন্য পথে?’

ইম্পে বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, ‘মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করেও আমাদের পূর্বসূরি অভিযাত্রীরা ৮৪° অতিক্রম করতে সক্ষম হন নি। তাঁরা নৌকো নিয়ে হিমশৈলীর ধারে হাজির হয়েছিলেন। তারপর শ্বেজগাড়ি চেপে শক্ত বরফের ওপর দিয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। আমাদেরও এভাবে পথ পাড়ি দিতে গিয়ে নির্ঘাৎ মৃত্যুর কবলে পড়তে হবে। তাই আমরা অন্যভাবে উত্তরমেরুতে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। আপনারদের জিন্ডাস, উত্তরমেরু অঞ্চল আসলে মহাসমুদ্র, নাকি মহাদেশ, তাই না? প্যালিওক্রিসিক মহাসমুদ্র বলে কমাগার নারেশ একে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ এটি একটি সূপ্রাচীন বরফ-সমুদ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর ধারণা ভ্রান্ত ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সুমেরু অঞ্চল আসলে নিরুৎ একটি মহাদেশ। সেটা বরফসমুদ্র নয়। তাই আমি বেশ জোর দিয়েই বলছি, উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার টাকা নষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আবার বলছি, এ মহাদেশের ওপর ইউরোপের আর কোনো রকম অধিকারই রইল না।’

জনতার ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন গলা ছেড়ে বলে উঠল, ‘বাজে কথা! পুরোপুরি একটি বুজরুকি! সেখানে কেবল জল আর জল। এবার বলুন, জল সেঁচে আপনি কয়লা কি করে তুলবেন?’

‘আমি মানি না। সুমেরু, মহাদেশ ছাড়া কিছু নয়। আর সেটা গোবি মরুভূমির মতো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন-চার মিটার ওপরে অবস্থান করছে। সুমেরুর আশেপাশের জমিই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ দেবে।

আর পেরি, নরডেনকয়েড আর মেইগাড-এর অভিযান সেরে যে মন্তব্য করেছিলেন তা হচ্ছে—গ্রিনল্যান্ড ক্রমে উঁচু হতে হতে আরো উত্তর দিকটা সুমেরুতে পরিণত হয়ে গেছে। তাঁরা সে-অভিযানে পাখি, হাতীর দাঁত ও গাছ-গাছালির নমুনা সঙ্গে করে এনে প্রমাণ করেছেন এক সময় সেখানে মনুষ্য বসতি ছিল। গাছগাছালি ও জন্তু-জানোয়ার যখন ছিল এতএব সেখানে কয়লাও অবশ্যই আছে। আপনাদেরা শুনে রাখুন, সে-মহাদেশে অচিরেই আমেরিকার বিজয় পতাকা উড়বে। আর আপনারা যাকে অসম্ভব বলছেন, তাকেই আমি সম্ভব করব। আর এজন্যই তো উত্তরমেরু কিনে নিয়েছি। তবে সেখানে নৌকো বা শ্বেজগাড়ি চালানো অসম্ভব বটে। কিন্তু যাব কীভাবে, তাই না? সেখানকার জমাটবাঁধা বরফ আমরা গলিয়ে দেব। মানে বরফের বাঁধা নিজে থেকে অপসারিত হয়ে গিয়ে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেবে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে তার জন্য একটা মিনিটও আমাদের খরচ হবে না। আর একটা ডলারও লাগবে না। আর্কিমিডিস কেবলমাত্র অতিকায় একটা হ্যাডেল চেয়েছিলেন যার দ্বারা তিনি পৃথিবীটাকে চাড় মেরে উঁচু করে ফেলতে পারবেন বলেছিলেন। উত্তরমেরুকে সরিয়ে আনার হ্যাডেল ইতিমধ্যেই আমরা আবিষ্কার করে ফেলেছি।’

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন কর্কশ গলায় বক্তোক্তি করে উঠল, ‘আরে করেছেন কী মশাই! এমন একটা গৃঢ় রহস্য, একেবারে গোপন কথা, সবার সামনে ফাঁস করে দিচ্ছেন।’

‘বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! তবে বলব না।’ আসলে রহস্যটি ফাঁস করার সামান্যতম ইচ্ছাও বার্বিকেনের ছিল না। কৌশলে শ্রোতাদের দিয়েই এমন কথাটি তিনি বলিয়ে নিলেন। ব্যাপার দেখে ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বীরা রাগে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল।

বার্বিকেন আবার মুখ খুললেন, ‘এবার কি বলছি শুনুন—উত্তরমেরুর গোপন তত্ত্ব আবিষ্কারের সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী জে. টি. ম্যাসটনের। দীর্ঘদিন কঠিন-কঠিন গাণিতিক সূত্রের মধ্যে হ্যাডেল-রহস্য আত্মগোপন করেছিল।’

ম্যাসটনের প্রশংসা শুনে গর্বে মিসেস স্করবিটের বুক ফুলে উঠল। পুলকে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। যাকে মন-প্রাণ সঁপে তিনি দেউলিয়া হয়ে পড়েছেন সভার মাঝখানে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা শুনলে কার মধ্যেই না এমন পুলক-উজ্জ্বলতার সঞ্চার না হয়।

বার্বিকেন আবার বক্তব্য শুরু করলেন, ‘একটি কথা হয়তো আপনারদের স্মরণ থাকতে পারে, চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আগে জে. টি. ম্যাসটন বলেছিলেন, উত্তরমেরুকে সরিয়ে আনার যন্ত্র আমরা উদ্ভাবন করবই। ভূ-গোলকের কোথায় চাপ প্রয়োগ করলে পৃথিবীর সমাক্ষরেখাকে সোজা করা সম্ভব হবে তা আমরা বের করবই করব। শেষপর্যন্ত বাঞ্ছিত সে-যন্ত্রটি আমরা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছি। এর জন্য কোন জায়গায় চাপ প্রয়োগ করতে হবে তা-ও বের করে ফেলেছি। এখন কেবল বাকি হ্যাডেল ঢুকিয়ে চাপ প্রয়োগ করা।’

তার কথা শুনে উপস্থিত সবাই যেন বোবা বনে গেল। কারোর মুখেই রা সরল না।

অখণ্ড নীরবতার মধ্যে এক সময় মেজর ডোনেলান গলা ছেড়ে বলে উঠলেন, ‘আপনার সাহসের তারিফ না করে পারছি না মশাই। ভূ-গোলকের অবস্থানের পরিবর্তন করতে চাইছেন।’

‘হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাই। অবশ্যই পাল্টে দিতে চাই। কিন্তু এতে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগের কোনোই পরিবর্তন হবে না। এখন

যা আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ৬৭° সমাক্ষরেখায় উত্তরমেরু সরে আসবে। বৃহস্পতি সমাক্ষ রেখার সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করার ফলে তার অনেক, অনেক সুবিধে। আমরা যা করতে চলেছি তাতে পৃথিবীর অবস্থা হবে বৃহস্পতিরই মতো। উত্তরমেরুকে যদি ২৩°—২৮° সরিয়ে আনা সম্ভব হয় তবে দেখা যাবে বরফ গলে গিয়ে জলে পরিণত হতে আরম্ভ করেছে। চোখের পলকে হাজার বছর ধরে যে বরফ জমে পাথরের মতো হয়ে রয়েছে তা গলতে আরম্ভ করবে, ব্যাপারটা আপনাদের বোঝাতে পেরেছি কি?’

বার্বিকেনের কথায় শোভারা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। একী ভিকি নাকি? এত সহজে উত্তরমেরুকে গলানো যাবে? যে-অক্ষরেখার ওপর নির্ভর করে পৃথিবী লাট্রের মতো চক্রর খাচ্ছে তা সামান্য হলে আছে। তাকে লম্বাভাবে, সোজা করে দিলেই উত্তরমেরু সরে আসবে?

উত্তরমেরুর বরফকে সূর্যই গলিয়ে দেবে—বার্বিকেনের বক্তব্যের মূল কথা। ব্যস, বরফ গলতে আরম্ভ করবে, মানুষ এতদিন শত চেষ্টাতেও যার কাছে পৌছোতে পারে নি সেই উত্তরমেরু নিজে থেকে মানুষের কাছে এগিয়ে আসবে! একী অসম্ভব কথা শোনান্ধেন ভদ্রলোক! উত্তরমেরু সরে আসবে, এয়ে একবোরেই অলীক কল্পনা!

চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর পূর্বে একটা জনসভায় ম্যাসটন কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ভূ-গোলকের মেরুদণ্ডকে ঠেলাঠেলি করে কোনোক্রমে সোজা করে দেওয়া সম্ভব হলে পৃথিবীর চেহারাটাই পাণ্টে দেওয়া যাবে। ব্যস, তারপর থেকেই ব্যাপারটা তাঁর মাধ্যম জগদ্বল পাথরের মতো চেপে বসেছে। অনেক ভেবেচিন্তে, অন্ধকণ্ঠে তার উপায়ও বের করে দিলেন। তাঁর চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে পারলেই পৃথিবী নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দেবে। তার আবহাওয়ারও পরিবর্তন ঘটবে। পৃথিবীর বৃকে সারা বছর বিরাজ করবে, বৃহস্পতির মতোই একই রকম আবহাওয়া। দিন আর রাত্রি হয়ে যাবে সমান-সমান। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেবে ‘ঋতুভেদ’ বলে কিছু না থাকার জন্য হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা আর গায়ে জ্বালা ধরানো গরমও পৃথিবীর বৃক থেকে উবে যাবে।

এমন এক জায়গায় ভূ-গোলকটি অবস্থান করছে যে স্থানের অধিবাসীরা সূর্যকে দু-দুবার টেরিড জোনে দেখে, আবার এমন স্থানের অস্তিত্বও রয়েছে যে, সূর্য বছরের মধ্যে কোনোদিনই সমানাকারে টেরিড জোনে পৌছাতে পারে না। মেরু অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে ছ’মাস দিন আর ছ’মাস রাত্রি লক্ষিত হয়। তবে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে কতই না বিচিত্র ঘটনা ঘটে চলেছে। এর মূলে রয়েছে ভূ-গোলকের ঝুঁকে-থাকা অবস্থান। গরম, ঠাণ্ডা, অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি যেখানেই যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় সবার মূলেই রয়েছে ভূ-গোলকের ঝুঁকে থাকা অবস্থান।

বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি এরকম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের অবসান ঘটিয়ে বারো ঘণ্টা দিন আর বারো ঘণ্টা রাত্রি বানাবার মতলবে রয়েছে। কারণ, সূর্য সারা বছর ধরেই নিরক্ষরেখার ওপরেই যে অবস্থান করবে। ফলে পৃথিবীর মানুষ ভালো-লাগা আবহাওয়া সারা বছর ধরেই ভোগ করার সুযোগ পাবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিকার পাতায় পাতায় এরকম সব মন্তব্য ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ছাপা হতে লাগল। ব্যস, সবাই পঞ্চমুখে বার্বিকেনের প্রসংশা করতে লাগল। সবার মুখে একই কথা, বার্বিকেনের বাঞ্ছা পূর্ণত্ব লাভ করুক। সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক উত্তরমেরু সম্পর্কিত পরিকল্পনা।

বার্বিকেন মতলব এঁটেছেন, কৌশলে পৃথিবীর ঘূর্ণন বেগ অপরিবর্তিত রেখে রূপ বৈচিত্র্যের পরিবর্তন সাধন করবেন, আবার বছরের দিনের সংখ্যারও হেরফের হবে নাই কিন্তু কোন কৌশল অবলম্বন করে পৃথিবীর মেরুদণ্ডকে সোজা করে দেবেন? এ রহস্যটা সম্বন্ধে কিন্তু ইম্পে বার্বিকেন, ক্যান্টেন নিকল বা জে. টি. ম্যাসটন—কেউই ভুলেও মুখ খুললেন না। সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধল। পৃথিবীর মানুষ হয়তো কোনোদিনই তাঁদের এ-গোপন রহস্যটির কথা এক তিলও জানতে পারবে না। সমালোচকরা খবরের কাগজের পাতায় বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখে মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। হ্যাঁ, পৃথিবীটা যদি নিচল-নিথরভাবে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত তবে ঠেলে-ধাক্কিয়ে তাকে না হয় কোনোক্রমে সোজা করে দেওয়া সম্ভব হত। শেষ অবধি তাঁদের কাজটা অসম্ভব না হয়ে যায়, পরিকল্পনাটিই ভেঙে না যায়।

ঝুঁকে-থাকা পৃথিবীকে হঠাৎ খাড়া করে দিলর পৃথিবীর কি কি খরাপ হতে পারে সেদিকগুলি নিয়ে উদ্যোক্তারা মোটেই মাথা ঘামান নি। পৃথিবীবাসীর উপকার হবে ভাল কথা, কিন্তু তাদের কোন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তা-ও তো সর্বজনসমক্ষে বলা দরকার ছিল। ব্যস, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপিয়ানরা ব্যাপারটাকে নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগে গেল। সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে ইংল্যান্ডের খবরের কাগজগুলি ফলাও করে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার কথা ও তাদের কাজের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল।

উত্তরমেরু বেচা-কেনা নিয়ে ফরাসি দেশ মোটেই আগ্রহী নয়। তবে একজন ফরাসি প্রবীণ ব্যাপারটি নিয়ে যারপরনাই কৌতূহলাপন্ন হয়ে উঠলেন। তিনি খবরের কাগজের পাতায় উত্তরমেরুর খবরটি পড়ামাত্রই সোজা বাল্টিমোরে চলে আসেন। গান-ক্রাবের প্রতিটি কার্যকলাপের ওপর গোপনে নজর রেখে চলতে লাগলেন। ম্যাসটনের মতোই অস্ত্র-শস্ত্রের উপর তাঁরও খুবই দখল। চোখের পলকে জটিল অস্ত্রের সমাধান করতে পারেন। এ গণিতবিদের নাম অ্যালসিড পিয়ের্দোঁ। অকৃতদার। বিয়ে থা করে ঘর-সংসার পাতার ইচ্ছা যে কোনোদিনই ছিল না তা নয়। হাসিখুশি আনন্দোচ্ছল এক মেয়েকে তিনি ভালবাসতেন। কিন্তু মেয়েটির বাবার বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি আশাহত হয়ে চিরকুমার

থাকবেন প্রতিজ্ঞা করেন। আজও সে-প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করে চলেছেন। মেয়েটির বাবার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরই তিনি দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। সম্প্রতি কৌতূহলবশত গান-ক্লাবের কার্যকলাপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন। কেবলমাত্র একটি ব্যাপারের জন্য পৃথিবীর অক্ষরেখা সম্বন্ধে তাঁর মনে অদম্য আত্মহের সঞ্চার ঘটেছে। পৃথিবীকে কীভাবে নাড়াচাড়া করা সম্ভব হবে, ব্যাপারটি তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠেছে। পৃথিবী লাঠির মতো অনবরত ঘুরেই চলেছে। ইম্পে বার্বিকেন তাকে কীভাবে ধাক্কা দিয়ে সোজা করবেন? ম্যাসটন আর বার্বিকেনের আসল ফনিটা কি, এটা জানার জন্যই তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আর কোন সূত্র প্রয়োগ করে তারা এমন একটি নিত্যন্ত অসম্ভবকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে চাইছেন?

এদিকে সদ্য গঠিত প্রতিষ্টানের অংশীদারদের নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর এক মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। অক্ষরেখা পরিবর্তিত হলে কি কি সুবিধা হবে তা নিয়ে এখন আর কারোর কোনো উল্লাস নেই। তাতে কী কী সমস্যার উদ্ভব হবে তাই আজ মানুষের একমাত্র জল্পনা কল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবাই বলাবলি করছে, অক্ষরেখা যে—অবস্থায় রয়েছে তাকে সরাতে হলে প্রয়োজন প্রচণ্ড একটি ধাক্কা। আর তার ফলে পৃথিবীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, অথবা যে অদ্ভুত পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা ভেবেই সবার কলিঙ্গা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগার হল।

ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা মানুষকে উস্কে দিতে লাগল। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি যে-কাজ করতে চাচ্ছে তা যদি সম্ভব হয়, তবে যেটুকু উপকার তাতে হবে তার পুরোটাই পাবে এক্সিমোরা। আবহাওয়ার পরিবর্তন কি না করলেই নয়? তাতে পৃথিবীর যে লণ্ডভণ্ড অবস্থা হবে তা কি মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হবে? এরকম বহু কুফলের কথা উল্লেখ করে ইউরোপিয়ান প্রতিনিধিরা জনসাধারণের ক্ষোভকে চরমে পৌঁছে দেওয়ার ধাক্কা চালাতে লাগল। তারা সাগরের তলা দিয়ে টেলিফোনের তারের মাধ্যমে স্বরাখবর আদান-প্রদান করতে লাগল। কর্ণেল বরিস কারকফ ডিন টুড্রিক্স জাঁ হারাল্ড, মেজর ডেনেলান এবং জ্যাকুইস জনসব প্রভৃতিরা তারের মাধ্যমে যেসব কথাবার্তা আদান-প্রদান করলেন, তার মর্মার্থ হল—প্রচণ্ড একটি ধাক্কা দিয়ে অক্ষরেখাটিকে সোজা করে দিলে সমুদ্রে আচমকা জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে। সমুদ্রের জলরাশি ফুলে ফেঁপে স্থলভাগ তলিয়ে দেবে। আর আবহাওয়ার ঘনত্ব বেড়ে গেলে সর্বনাশ আরও চরম রূপ নিয়ে দেখা দেবে, স্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হবে। এক ধাক্কায় পুরো লন্ডন শহরটি উঠে যাবে পাহাড়ের ওপরে। সবচেয়ে বড় কথা, সমস্যাটি কেবলমাত্র ২৩°—২৮° এরই নয়। ঠাণ্ডা-ধাক্কার চোট মেরু অঞ্চল চ্যান্টা হাওয়া মাত্র সাগর আর মহাসাগরের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ আসতে লাগল বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কর্মপন্থার প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য। প্রতিবাদে প্রতিবাদে সরকার একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ল। প্রতিবাদের ভাষা আলাদা হলেও সবার বক্তব্য প্রায় একই রকম। এমন একটি ভয়ঙ্কর কাজে হাত না দেওয়াই ভাল। যে-কাজের পরিণাম পৃথিবীর অনিবার্য ধ্বংস সে-কাজ করতে এত উৎসাহ-উদ্দীপনা কেন?

অ্যালসিড পিয়ের্দ্দে কিন্তু অন্য মতলবে ঘুর ঘুর করছেন। ম্যাসটন অঙ্ক কষে হিসাব নিকাশের মাধ্যমে ভূ-গোলককে আঘাত হানার জন্য যে জায়গাটিকে বেছে নিয়েছেন সেটা জানাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। কারণ সবচেয়ে বেশি আলোড়ন ও লণ্ডভণ্ড তো সে জায়গাটাই হবে।

ইউরোপের কেউ কেউ এরকম কথাও বলতে লাগল, 'ইম্পে বার্বিকেন আমেরিকান। তিনি অবশ্যই নিজের দেশকে সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে তবেই পৃথিবীর অক্ষরেখার ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছেন। আর তাঁর মাথা থেকেই চাঁদে পাড়ি জমানোর পরিকল্পনাটি বেরিয়েছিল। আমেরিকানরা পৃথিবীটিকে লণ্ডভণ্ড করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবার ধাক্কাই আছে। তারা হয়তো মূল্যবান কোনো অঞ্চল কজা করে নিতেই এরকম একটি দুরভিসন্ধিতে মেতেছে।'

কেউ কেউ এরকম মন্তব্যও করল, 'ইম্পে বার্বিকেন তো আর ভগবান নন। কাজ করতে গিয়ে সামান্য ভুলভ্রান্তি করে ফেললেই কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। সারা পৃথিবীর মানুষকে তাঁর ভুলের মাশুল দিতে হবে, হ্যাঁপা পোহাতে হবে।'

ইউরোপিয়ানরা তো খবরের কাগজের পাতায় নিত্য নতুন মন্তব্য পড়ে ক্রোধে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভার মতো ফুটতে শুরু করল। আর বার্বিকেন ও তাঁর সাগরদেদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করতে লাগল।

ক'দিনের মধ্যেই এমন কি আমেরিকাতেও পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। কয়েকটি খবরের কাগজ পঞ্চমুখে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার প্রশংসা করতে লাগল। আবার কয়েকটি কাগজ বেমালাম ইউরোপের খবরের কাগজের দলে ভিড়ে বার্বিকেন ও তাঁর সহযোগীদের মুণ্ডপাতে মেতে গেল। মিসেস স্করবিট গোছা গোছা ডলার খরচ করে সাংবাদিকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে খবরের কাগজের পাতায় ছাপাতে লাগলেন যাদের প্রত্যেকটির মূল বক্তব্য গণিতবিদ ম্যাসটনের কিছুতেই ভুলচুক হতে পারে না। ফলাফল কিন্তু শূন্য। ক্রমে আমেরিকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক-জ্বর সংক্রমক রোগের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পৃথিবীর সব দেশের মানুষের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মাল, বার্বিকেন ও ম্যাসটন উভয়েই ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। সমগ্র পৃথিবীটিকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলায় মেতেছেন। কিন্তু এমনটি তো হতে দেওয়া যায় না।

ইউরোপিয় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগল, পৃথিবীর সর্বনাশেজুক বার্বিকেন ও

ম্যাসটনকে ডেকে সামান্যসামনি জিজ্ঞাসা করা হোক, তাঁদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? সর্বজনসমক্ষে তাঁরা বলুন, কোনো পদ্ধতিতে তাঁরা পরিকল্পনাটিকে বাস্তবায়িত করতে চাচ্ছেন আর কোন অঙ্ককে তাঁরা বদখোয়ালটি চরিতার্থ করার জন্য নির্বাচন করেছেন?

চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র সরকার গণিতশাস্ত্র, ভূবিদ্যা ও কারুশিল্প প্রভৃতি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করলেন। ইম্পে বার্বিকেন যেহেতু সংস্থার সভাপতি তাই কমিশনের সামনে সবার আগে তাঁকেই হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি করা হল। বার্বিকেন ব্যাপারটিকে আমলই দিলেন না। তাঁর বাড়িতে লোক পাঠানো হল। ভোঁ-ভোঁ—বাড়ি ফাঁকা। ক'দিন আগে এগারোই জানুয়ারি তিনি বাস্টিমোর ছেড়ে গেছেন। ক্যান্টেন নিকলকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন। কেউ তাঁদের খবর বলতে পারল না! নিঃসন্দেহ হল, নির্ঘাৎ সে গোপনে রহস্যজনক স্থানে গেছেন, যেখান থেকে পৃথিবীকে ধাক্কা মারার ধাক্কা করছেন।

অতএব তাঁদের দূরভিসন্ধিকে বানচাল করতে হলে সবার আগে সেই রহস্যজনক গোপন স্থানটির নাম জানতে হবে।

এদিকে ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যান্টেন নিকলের নিরুদ্দেশের খবরটা বাতাসের কাঁধে ভর করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পৃথিবীর মানুষ ক্রোধোন্মত্ত বাঘের মতো তর্জন গর্জন শুরু করে দিল।

সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন তো বে-পাতা। কিন্তু সম্পাদক জে. টি. ম্যাসটন? আসন্ন পৃথিবী ধ্বংসের নায়ক ম্যাসটনের বাড়িতে লোক ছুটল। কমিশনের দূত দরজার কড়া নাড়তেই তাঁর চাকর ফায়ার-ফায়ার তেড়ে এল। তার হস্তিত্ব শুনে স্বয়ং ম্যাসটনও এসে হাজির হলেন সদর-দরজায়।

কমিশনের দূত কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, 'সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যান্টেন নিকল কোথায়? তাঁদের উদ্যোগ-আয়োজন কি সম্পূর্ণ হয়েছে?'

ম্যাসটন নিভীক কণ্ঠে সাফ জবাব দিলেন, 'জানি, কিন্তু বলব না। উদ্যোগ-আয়োজনের কথাও বলব না। আমি এটা গোপন রাখতেই অগ্রহী।'

'আপনার কর্মপদ্ধতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা কি কমিশনের সামনে পেশ করতে রাজি আছেন?'

'অবশ্যই না। কাউকে কিছু যাচাই করতে দিতে আমি নারাজ। প্রয়োজনে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলব তবু উদ্দেশ্য কারোর কাছে ফাঁস করব না। আমার পরিশ্রমের ফসল সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব। স্বাধীন আমেরিকার একজন নাগরিক হিসাবে এটুকু অধিকার আমার অবশ্যই আছে।'

'আপনার যেমন মুখ বন্ধ করার অধিকার আছে ঠিক তেমনি সারা যুক্তরাষ্ট্রেরও তো অধিকার আছে আপনার মুখ খোলানোর, স্বীকার করেন তো? কমিশন জানতে চাইছে, উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা কীভাবে অক্ষরেখার পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা করছেন?'

ম্যাসটন আর কোনো কথা না বলে গম্ভীরমুখে কমিশনের দূতের কাছ থেকে সরে গেলেন। অনন্যোপায় হয়ে আগন্তুক তাঁর বাড়ির দরজা ছেড়ে পথে নামল।

এদিকে ম্যাসটনের গোয়াতির্মির কথা শুনে দেশের মানুষ রেগে ব্যোম হয়ে গেল।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর ক্রমেই জোরদার চাপ আসতে লাগল, যে-কোনো উপায়ে ম্যাসটনের কাছ থেকে গোপন তথ্যাদি বের করার চেষ্টা করা হোক।

এক সন্ধ্যায় ম্যাসটনের বাড়িতে একদল পুলিশ হানা দিল। তারা ম্যাসটনের খাতা-পত্র গোছগাছ করে পোটলা বাঁধতে লাগল। ম্যাসটন পিস্তল বের করে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করলেন। বৃথা চেষ্টা, পুলিশের লোকেরা তাঁর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল। উপায়ান্তর না দেখে তিনি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ঝট করে একটা খাতা হাতে নিয়ে তার শেষ-পাতাটি ছিঁড়ে নিলেন। কেউ কিছু বোঝার আগেই সেটি পুটুলি করে মুখে ঢুকিয়ে চোখের পলকে গিলেও ফেললেন।

পুলিশ ম্যাসটনকে পাকাড়াও করে নিয়ে এসে হাজতে পুরে দিল। কাজটি একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নইলে উত্তীর্ণ জনতার হাতে তাঁর হাড়মাংস এক হয়ে যেত।

পুলিশের কর্তব্যাক্তি ম্যাসটনের গণিতের খাতাটির পাতা উল্টে দেখলেন, পরপর ত্রিশটি পাতা জুড়ে কেবল দুক্লহ অঙ্ক আর অঙ্ক। তাঁদের বিন্দু বিসর্গও উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। তবে এটুকু উপলব্ধি করতে পারলেন, একটি অঙ্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চাঁদকে লক্ষ্য করে পৃথিবী থেকে কামান দাগা হয়েছিল এ-অঙ্কটির ওপর ভিত্তি করেই দেশের বাঘা বাঘা গণিত বিশারদদের তলব করা হল। তাঁরা দীর্ঘ গবেষণার পর মন্তব্য করলেন, অঙ্কগুলি অন্তত ভুল নয়। আর এগুলির ওপর ভিত্তি করে কাজ করলে পৃথিবীর হেলে-থাকা অক্ষরেখাকে সোজা করে দেওয়া সম্ভব।

কমিশন তদন্তের পর রিপোর্ট তৈরি করে খবরের কাগজে ছাপতে পাঠাল। রিপোর্টটির বক্তব্য—

'উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার ফন্দিটি জানা গেল। তাঁরা অক্ষরেখাকে হেলানো অবস্থা থেকে সোজা করার ফন্দি এঁটেছেন। কামানটিকে ভূ-অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিলে গোলাটি বেরিয়ে যাবার সময় পিছনের দিকে প্রবল ধাক্কা মারবে। প্রবল সে ধাক্কা ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল কম্পনের সৃষ্টি করবে। কিন্তু লম্বাভাবে কামান দাগলে কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না। কিন্তু ভূমির সঙ্গে অনুভূমিকভাবে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে কামান দাগার ফলে অক্ষরেখা দূরে সরে যেতে বাধ্য। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি দক্ষিণদিকে কামান দাগার পরিকল্পনা করেছেন। কামানটিকে স্থাপন করা হবে পৃথিবীর কোনো এক স্থানে।

অ্যালসিড পিয়ের্দোও এরকমই একটি মন্তব্য আগেভাগে করে রেখেছিলেন। পৃথিবী নতুন এক অক্ষরেখার ওপর নির্ভর করে আবর্তিত হতে থাকবে। আর এরই ফলে পৃথিবী বৃহস্পতির অবস্থা প্রাপ্ত হবে।

সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের দলক্ষ গুণ বৃহদাকার কোনো কামান থেকে যদি এক লক্ষ আশি হাজার ওজন বিশিষ্ট গোলাকে সেকেন্ডে আটশা হাজার কিলোমিটার বেগে নিক্ষেপ করা যায় তবেই হলে পড়া অক্ষরেখাটি খাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সেরকম তেজি বারুদ কোথায় পাওয়া যাবে?

হ্যাঁ, সে-বারুদও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। মেলিমেনোলাইট নামে শক্তিশালী বারুদ আবিষ্কার করেছেন ক্যাপ্টেন নিকল। ম্যাসটনের খাতা ঘেঁটে ফর্ফুলাটি পাওয়া না গেলেও এটুকু অন্তত বোঝা গেল অ্যাসিটিক অ্যালসিড এবং জৈব বস্তু সেলিমেনোর সংমিশ্রণে তিনি উচ্চশক্তিসম্পন্ন বারুদটি তৈরি করেছেন।

এবার জনসাধারণের জিজ্ঞাস, সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের দশ লক্ষগুণ বড় কোনো কামান তৈরি করা কি যাবে? অবশ্যই নয়। অতএব বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানি লালবাতি জ্বলতে বাধ্য।

কিন্তু ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের হৃদয় নেই। তাদের ঠিকানা জানতে না পারলে তাদের কাজটিকে বরবাদ করে দেওয়ার উপায়ই বা কি?

সবার ক্ষোভ জে. টি. ম্যাসটনের ওপর পড়ল। খাতার পাতাটায় নির্ধাৎ তাঁদের ঠিকানা টোকা ছিল। বন্ধুদের ঠিকানা চেপে রাখার জন্য তিনি তো সেটি গিলে ফেলেছেন।

কামান দাগার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে বাইশে সেপ্টেম্বর। সবই জানতে পারা গেল। কেবল জানা গেল না তাঁদের বর্তমান ঠিকানা, যেখানে ভূ-অভ্যন্তরে অতিকায় কামান বসানোর কাজ জোর কদমে চলেছে।

কিন্তু বার্বিকেন ও নিকলের ঠিকানা জানতে না পারলে তো সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে। যদি তাঁরা কামান দেগেই দেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের কোন অঞ্চল দুম করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে আবার কোন অঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে—এসব কথা ম্যাসটন ছাড়া কারোর জানা নেই। কিন্তু তার খাতায় এর কোনো উল্লেখ নেই। আট হাজার চা শো পনের মিটার ভেতরেই সমুদ্রপৃষ্ঠের সর্বোচ্চ পরিবর্তন ঘটবে। জলাভূমি হবে শুকনো ডাঙা আর ডাঙায় দেখা যাবে অথৈ জলরাশি। কামানদাগার স্থানটি জানা গেলেই বোঝা যেত ঠিক কোন অঞ্চলের এরকম সর্বনাশ পরিবর্তন ঘটবে।

অনন্যোপায় হয়ে খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত কামান ও বারুদ কারখানাগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হল, তারা যেন সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তিকে দেখলেই বাস্টিমোরের তদন্ত কমিটিকে টেলিফোনে জানিয়ে দেন। তা যদি বাইশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় তবে বাঁচোয়া। কারণ কামান দাগার জন্য এ-দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল।

গান-ক্রাবের পাঞ্জরা পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি জমানোর কাজে কামান ব্যবহার করেছেন। এখন ভূ-গোলকের হেলপড়া অক্ষরেখাকে খাড়া করার জন্যও তাঁরা কামান দাগার মতলব এঁটেছেন।

হায় ঈশ্বর! কামান-পাগল গুটি কয়েক মানুষের জন্যই কিভাবে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বার্বিকেন ফ্লোরিডার কলম্বিয়া নামক ক্রামানটি দাগার পর থেকেই আরও অনেক, অনেক বড় কামানের কথা ভাবছিলেন। কামান-নাটকের প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রাভিযানের কাহিনী চাক্ষুষ করা গেছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যাবে হেল-থাকা অক্ষরেখাকে খাড়া করার দৃশ্য। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যের কাহিনী সম্বন্ধেও ধারণা করা যাচ্ছে। পৃথিবীর এক শো চল্লিশ কোটি মানুষ তীব্র আক্রোশে বার্বিকেন আর তার সাগরেনদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেবে।

একী অবিশ্বাস্য কাণ্ডের বাবা! ইম্পে বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকোল—দু-দুটো মানুষ কি কর্পূরের মত উবেই গেলেন! উভয়েই তো নামজাদা মানুষ! তবু তাদের হৃদয় কেউ-ই দিতে পারছে না! এ কী রহস্য রে বাবা!

আমেরিকা আর ইউরোপের সব কটি বারুদের কারখানায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল কেউ-ই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বারুদ কেনে নি, বা কেনার জন্য বায়নাও দেয় নি।

বাস, জনসাধারণের যাবতীয় আক্রোশ গিয়ে পড়ল জে. টি. ম্যাসটনের ওপর। তিনি একা বাস্টিমোরের জেলে পড়ে ঝুঁকছেন।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, কামান আর বারুদ তৈরি করতে যেসব উপকরণ অত্যাৱশ্যক সেগুলি বহন করার জন্য কোনো জাহাজ বা রেলগাড়িও কারোর নজরে পড়ল না। তবে কি সেগুলি শূন্যপথে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে? এ কী রহস্যজনক ব্যাপার রে বাবা!

এদিকে জেলখানার অঙ্কার খুপড়ির মধ্যে বসে ম্যাসটন ভাবছেন, বার্বিকেন কামান তৈরির কাজ বুঝি প্রায় চুকিয়ে ফেলেছেন। ক্যাপ্টেন নিকলের তৈরি অতীব তেজি বারুদ তাতে ঠাসা হচ্ছে। এবার গোলাটা দুনিয়া কাঁপিয়ে দুর্বীর গতিতে শূন্যে ছুটে চলেছে। সেটা এখন কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। তিনি মিসেস স্করবিটের নামানুসারে গোলাটির নামকরণ করলেন 'স্করবেটা'।

ম্যাসটনের কাছ থেকে কথা বের করার জন্য তদন্ত কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা নিয়মিত জেলখানায় হামলা করছেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। ম্যাসটন কিছুতেই মুখ খুলছেন না।

তদন্ত কমিশন এবার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বাঁকা পথ ধরলেন। মিসেস স্করবিটকে দিয়ে ম্যাসটনের পেট থেকে কথা বের করার মতলব আঁটলেন। তাঁর মনে জবর ভয় ধরিয়ে দিল। বার্বিকেন তাঁর পরিকল্পনা বাতিল না করলে ক্রোধোন্মত্ত জনসাধারণ যাকে সামনে পাবে তাকেই কেটে কুচিকুচি করে ফেলবে। অতএব মিসেস স্করবিট ধরে-প্রাণে মারা যাচ্ছেন।

মিসেস স্করবিটও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ম্যাসটনের সঙ্গে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেবেন তবু পরিকল্পনাটি বাতিল হোক এমন কোনো কাজ করতে রাজি হবেন না।

না। ভয়ে ঘি ঢালাই সার হল। মিসেস স্করবিটকে দিয়ে ম্যাসটনের পেট থেকে কোনো কথাই বের করা গেল না।

হায়! তবে কি পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব নয়? অক্ষরেখা পরিবর্তিত হবেই? মহাদেশ জলে তলিয়েই যাবে? কোটি কোটি নিরীহ-নিরপরাধ মানুষ মৃত্যুর শিকার হবেই?

পৃথিবীর সব ক'টি রাষ্ট্র জোট বেঁধে সাব্যস্ত করল বার্বিকেনের পরিকল্পনা বন্ধের ঘোষণা করা হবে। তবে আমেরিকা বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল। পৃথিবীর সব রাষ্ট্রকে অধিকার দিল বার্বিকেনকে শ্রেষ্ঠার করার জন্য। কোনো রাষ্ট্রই তার কথায় আমল দিল না। আর কেউ না থাক ম্যাসটন তো কজির মধ্যেই রয়েছেন। তার ওপর বলপ্রয়োগ করলে, কঠিন-কঠোর দৈহিক নির্যাতন চালালে বাপ বাপ করে ঠিকানা বাতুল দেবে।

তবে মধ্যযুগীয় বর্বরতা উনিশ শতকে অবলম্বন করা সম্ভব নয়। অতএব ম্যাসটন জেলখানায় বহাল তবিয়েতেই দিন কাটাতে লাগলেন।

নিরক্ষ অঞ্চলের সর্বত্র মনুষ্য বসতি রয়েছে। অথচ ম্যাসটনের ডাইরির এক জায়গায় লেখা ছিল, নিরক্ষরেখার কোনো অঞ্চল থেকে কামানের গোলা ছুঁড়তে হবে। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি কোন অঞ্চলই যদি মনুষ্যবসতিশূন্য না হয় তবে এতবড় একটি কামান কোথায়, কীভাবে বা তৈরি করল। তবে কি বার্বিকেন কামানটিকে লোকচক্ষুর আড়ালে তৈরি করেছেন, নাকি হাজার হাজার লোক লাগিয়ে কামান তৈরির কাজটি সম্পন্ন করেছেন?

অ্যালসিড পিয়ের্ডে আনন্দে আত্মহারা এই ভেবে যে, ম্যাসটনের অঙ্কে সামান্যতম ভুলচুকও নেই অতএব তার হিসাব অনুযায়ী কাজ করলে যুঁকে-থাকা অক্ষরেখা খাড়া হতে বাধ্য। তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে জলভূমি পরিণত হবে ভূখণ্ডে, ভূ-খণ্ড জুড়ে দেখা দেবে প্রাবন-জলোচ্ছ্বাস। আগ্নেয়পর্বত অগ্নি উদ্গিরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আগ্নেয় পর্বতের গহ্বরে সমুদ্রের জল প্রবেশ করে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবে। পৃথিবী একেবারে লগ্নভণ্ড হয়ে যাবে। তিনি আবার বিপরীত দিকটিও যে ভাবেন নি তা-ও নয়। হাঁটাচলা ও দাপাদপির ফলে পৃথিবী তো কেঁপে কেঁপে উঠছেই। তাতে যদি কিছু না হয় তবে একটিমাত্র কামানের গোলা নিক্ষেপ করেই পৃথিবীর ভয়ঙ্কর পরিবর্তন সাধন কি সম্ভব?

সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব। অঙ্কের হিসাব অন্তত একথাই প্রমাণ দিচ্ছে।

এক বিজ্ঞজন মন্তব্য করলেন এক সালের প্রথম দিনেও পৃথিবী জুড়ে এমন ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। বাইবেল তো বলেই রেখেছে, হাজার বছরের শেষেই আছে অন্তিমের সে-দিনটি। কিন্তু কোনো প্রলয় কাণ্ডই ঘটে নি, মারা যায় নি একটি প্রাণীও। তবে বার্বিকেনের পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলে ভয়ঙ্কর কিছু না ঘটে যাচ্ছে না।

পৃথিবীর মানুষের বৃকের ভেতরে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা টগবগ করে ফুটতে লাগল। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল ম্যাসটনের ওপর। তারা দলে দলে কাতারে কাতারে গিয়ে জেলখানার সামনে গিয়ে দারুণ হুম্বিত্ব করতে লাগল। এমন ভাব, তাঁকে হাতের নাগালের মধ্যে পেলে কাঁচা চিবিয়ে খাবে।

পরিস্থিতি ক্রমে জটিল থেকে এমন জটিলতর হতে লাগল যে, মিসেস স্করবিট ভাবতে লাগলেন, ম্যাসটনের বিরোধিতা করবেন কিনা। তাঁদের পটিয়ে পাটিয়ে কোনোরকমে কামান দাগা থেকে বিরত করতে পারলেই হুজুতি ঝকমারি বন্ধ হয়ে যায়। জনগণের উত্তেজনার মূল কারণ যিনি সেই ম্যাসটন কিন্তু আগের মতোই নির্বিকার। ক্ষুদ্র জনতাকে ঠেকানো পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে গেল। আর এদিকে আগুনে ঘিয়ের ছিঁটা দিতে লাগল দেশের খবরের কাগজগুলি।

এদিকে ম্যাসটন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, পরিস্থিতি যত প্রতিকূলই হোক না কেন তিনি প্রাণ গেলেও ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যান্টেন নিকলের কাজে প্রতিবন্ধকতা করতে দেবেন না।

এদিকে বিক্ষুব্ধ জনগণ নিজেদের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা ও শেষপর্যন্ত হাতহাতি শুরু করে দিল। জেলখানায় বাইরে রীতিমতো তুলকালাম কাণ্ড জুড়ে দিল।

পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে দেখে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রমাদ গুনলেন।

পাঁচই সেপ্টেম্বর বেলা এগারোটায় তদন্ত কমিশনের সভাপতি জন প্রেসটিস বাস্টিমোর জেলখানায় হাজির হলেন। মিসেস স্করবিটকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তিনি ম্যাসটনের কাছে সরাসরি ইম্পে বার্বিকেনের ঠিকানা জানতে চাইলেন। হতাশ হতে হল তাঁকেও। কোথায় কামান দাগা হবে তারও সঠিক জবাব পেলেন না।

তদন্ত কমিশনের সভাপতি শেষপর্যন্ত ম্যাসটনকে আদালতের কাণ্ডগোড়ায় দাঁড় করাবেন বলে শাসালেন। তাতেও ফল হল না। ফাঁসির ভয় দেখানো হল, তাতেও অকুতোভয় ম্যাসটনকে উলানো গেল না।

মিসেস স্করবিট আর মুখ বুজে থাকতে পরলেন না। ফাঁসির কথা শুনে তিনি আঁৎকে উঠে কাঁপাকাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'মি. ম্যাসটন, করছেন কি?'

ম্যাসটন ভুরুদুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'মিসেস স্করবিট, আপনিও শেষপর্যন্ত এদের দলে ভিড়ে গেলেন নাকি!'

মিসেস স্করবিট মিহিয়ে গিয়ে অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাপতি মশাই বললেন, 'দেখুন, দুই-দুইয়ে চার হয় যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য আপনাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হচ্ছেই।'

'বাজে কথা, দুই-দুইয়ে যে চার হবেই এমন কোনো কথা নেই। অন্যান্য গণিতবিদরা যেমন বোজা কথা বলে এসেছেন আজ আপনিই দেখছি তাই বলছেন মশাই! আপনি বলতে চাইছেন দুটো সংখ্যা যোগ করলে তাদের একটির সমান হবে। যেমন বলছেন, দুই আর দুইয়ে হচ্ছে চার। তবে হ্যাঁ, যদি বলেন এক আর একে দুই হয়, স্বীকার করে নেব। কারণ, তখন তো সেটা সংজ্ঞায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। উপপাদ্য থাকছে না।

সভাপতিমশাই পাটিগণিতে এররকম মোক্ষম শিক্ষা লাভের পর কারাকক্ষ ছেড়ে কোনোক্রমে পালিয়ে বাঁচলেন।

নেহাৎই বরাতের জোরে জাজিবার থেকে আমেরিকান কনসালের একটি টেলিগ্রাম এসে হাজির হল।

তেরোই ডিসেম্বর ও জাজিবারের স্থানীয় সময় সকাল পাঁচটা টেলিগ্রামটির মাথার ওপরে লেখা রয়েছে। টেলিগ্রামটির বক্তব্য মোটামুটি এরকম, 'কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালার দক্ষিণে দারুণ কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে। সভাপতি বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল গত পাঁচ মাস যাবৎ সুলতান বালিবারির কৃষ্ণকায় মানুষদের নিয়ে পুরোদমে কাজ করে চলেছেন।'

একেই জে. টি. ম্যাসটনের বরাতের জোর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির গোপন তথ্য এভাবে ফাঁস হয়ে গেল। আর সে সঙ্গে ম্যাসটন ফাঁসিকাঠে ঝুলে প্রাণ দেওয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর জন্য কী নিদারুণ হতাশা আর হাহাকার সঙ্গাপনে অপেক্ষা করছে যদি তিনি ঘৃণাক্ষরে জানতে পারতেন তবে কেবল ফাঁসি কাঠেই নয়, যে কোনো উপায়ে মৃত্যু এলেও তাকে সাদরে আলিঙ্গন করতেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীর মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইশ্পে বার্বিকেন কি করে ক্যাপ্টেন নিকলকে নিয়ে কিলিমাঞ্জারোর পর্বতের পাদদেশে হাজির হলেন? কি করেই বা কামান ঢালাইয়ের এতবড় কারখানা গড়ে তুলতে পারলেন? গোলা বারুদ সংগে, এত কর্মী কি করে তাঁর পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হল? এমন সব অভাববীণী অবিস্বাস্য কাজ ইশ্পে বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের পক্ষে কি করে করা সম্ভব হল, তা পৃথিবীবাসীর কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল, থাকবেও চিরদিন।

ম্যাসটন মন্তব্য করলেন, এমন দুর্গম দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কিলিমাঞ্জারো পর্বতের পাদদেশে হাজির হওয়ার কিছুতেই সম্ভব নয়। আর যদি এ কাজে সুলতানের স্বার্থ জড়িত না থাকত তবে অবশ্যই তাদের পক্ষে অসভ্য জঙ্গিলাদের বশ মানিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াও কিছুতেই সম্ভব হত না।

জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থান যখন জানা সম্ভব হয়েছে তখন পৃথিবীর কোথায়, কেমন সর্বনাশা প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া কোনো সমস্যার ব্যাপারই নয়। পণ্ডিতরা হিসাব নিকাশ করতে বসে গেলেন। ভূ-গোলকের কোন জায়গায় কেমন পরিবর্তন ঘটবে তা চৌদ্দ থেকে ষোলোই সেন্টেম্বরের মধ্যেই জানা সম্ভব হল। খবরের কাগজের পাতায় বিবৃতি ছাপা হওয়া মাত্র পৃথিবীর মানুষের মন আতঙ্কে চিপসে গেল।

সভাপতি বার্বিকেন এবং ক্যাপ্টেন নিকলের পরিকল্পনাটি মোটামুটি এরকম— সেন্টেম্বরের বাইশ তারিখের মাঝরাাত্রি সাতাশ সেক্টিমিটারের দশ লক্ষ গুণ বেশি বড় কামান থেকে এক লক্ষ আশি হাজার টন ওজন বিশিষ্ট একটি গোলা আটশ হাজার কিলোমিটার গতিবেগে উৎক্ষিপ্ত হবে। কামান থেকে গোলাটি বেরিয়ে যাবার সময় কামানটিকে যে প্রচণ্ড ধাক্কা মারবে তাতেই বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির বাঙ্কা পূরণ হবে। নিরক্ষ রেখার কিছু নিচে, প্যারিস দ্রাঘিমার পশ্চিম দিকে চৌত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশ থেকে যদি দক্ষিণ দিকে কামান দাগা যায় তবে পিরছনদিকে যে ধাক্কা মারবে তার সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণনবেগ যুক্ত হয়ে নতুন এক অক্ষরেখার উৎপত্তি হবে। এতে ম্যাসটনের গাণিতিক হিসাব অনুযায়ী বর্তমান অক্ষরেখাটি ২৩°—২৮° সরে যাবে আর কক্ষপথের সঙ্গে সমকোণে অবস্থান করবে। নতুন সমাক্ষরেখা উত্তর অঞ্চলে গ্রিনল্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল বাফিন সাগর আর গ্রিনল্যান্ডে, দক্ষিণ অঞ্চলে অ্যাডেলিডাল্যান্ডের পূর্বদিকে আবির্ভূত হবে। নতুন শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমা কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালার ওপরে সৃষ্টি হবে। ফলে নিরক্ষরেখারও স্থানান্তর ঘটবে। সন্ধ্যা সরে যাওয়া নিরক্ষরেখার ওপর সূর্য সারা বছর অবস্থান করবে। তার অবস্থান একতিলও সরবে না। কলকাতার সামান্য নিম্নাংশ, গোয়া আর কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালা শ্যামের মান্দালয় আর চীনের হংকংয়ের ওপর দিয়ে নতুন বিষুবরেখা চলে যাবে। আর নতুন বিষুবরেখা প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ওয়াকার দ্বীপের ওপরেও অবস্থান করবে।

নিরক্ষরেখা যখনই স্থানচ্যুত হবে সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটে যাবে। এ ব্যাপারে উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থা সভ্য-সমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, স্বীকার না করে উপায় নেই। দক্ষিণ দিকের পরিবর্তে যদি দক্ষিণ-পূর্ব দিক লক্ষ্য করে কামানের গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে ঘন জনবসতিপূর্ণ সভ্য দেশগুলোর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটবে। আর দক্ষিণদিকে রয়েছে বিরল জনবসতি। ফলে সর্বনাশ হবে কম।

গণিত বিশারদ ম্যাসটনের হিসাব মতে মেরু প্রদেশের বরফ গলা জল এবং জলোচ্ছ্বাসের ফলে মহাসমুদ্র থেকে

জল কিছু সংখ্যক স্থলভূমিকে ছাপিয়ে অন্য দেশের দিকে ধেয়ে যাবে। জলের সর্বোচ্চ উচ্চতা হয়ে যাবে আট হাজার চার শো পনের ফুট।

বিপর্যয়ের ফলে প্রশান্ত মহাসাগর জলশূন্য হয়ে পড়বে। বার্মুডা নিকটে স্থলভূমি দৃশ্য হবে। আর এরই ফলে আমেরিকা আর ইউরোপের মধ্যবর্তী এলাকার নতুন বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবির্ভূত হবে। নিজেদের দেশের ভৌগোলিক অঞ্চলের সুবিধার দিক বিচার বিবেচনা করে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্পেন, পর্তুগাল ও ফ্রান্স সদ্য আবির্ভূত জমির দখল নেবার জন্য তৎপর হবে।

জল অপসারিত হয়ে যাওয়ার ফলে বাতাসের ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটবে। বাতাসের অভাব দেখা দেবে বার্মুডা অঞ্চলে। সম্প্রতি আট হাজার মিটার উর্ধ্বাকাশে যে স্বাসকষ্ট অনুভূত হয় ঠিক তেমনি স্বাসকষ্ট হবে বার্মুডায়। তাই সম্পূর্ণ অঞ্চল ছেড়ে মানুষ অন্যত্র পালাবে ভারত মহাসাগরে। প্রশান্ত মহাসাগরের কিছু পরিমাণ জল অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। সমুদ্র স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে অসংখ্য জলমগ্ন পাহাড় ও নতুন নতুন দ্বীপের আবির্ভাব ঘটবে। চীন, রাশিয়া, ভারত, জাপান, বেরিং সাগরের সুবিশাল এলাকা এবং আলাস্কা অঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে। মেক্সো, কলিকাতা, সেন্টপিটার্সবার্গ, পিকিং, হংকং ও ব্যাংকক ভূ-গোলক থেকে চিরদিনের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর সেসব শহরের মানুষ সময় থাকতে অন্যত্র চলে না গেলে অথৈ জলে হাবুডুবু খেতে খেতে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হবে।

কিলিমাঞ্জারো পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রশান্ত আর আটলান্টিকের জল ফুলে ফেঁপে আট হাজার চার শো পনের মিটার ওপরে উঠে গিয়ে চিলি, আর্জেন্টিনা, সেন্ট্রাল ব্রাজিল এবং উত্তরাংশে অন্তরীপ জলে তলিয়ে যাবে।

অতএব বার্বিকেন অ্যান্ড, কোম্পানি, অর্থাৎ দুটো মানুষের অপরাধমূলক পরিকল্পনাকে বন্ধ করতে না পারলে পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করার ক্ষমতা কারোরই নেই। পৃথিবীকে আসন্ন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীরা বিচার-বিবেচনা করে যে আসন্ন ভয়ঙ্করতার কথা ব্যক্ত করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে মানুষ দুটো উপায়ে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শিকার হবে—হয় অথৈ জলে তলিয়ে গিয়ে নতুবা স্বাস বন্ধ হয়ে। বায়ুর অভাবে স্বাসবন্ধ হয়ে মারা যাবে ইংল্যান্ড, আমেরিকা, স্পেন এবং ফ্রান্সের বহু অদৃষ্টবিড়ম্বিত মানুষ।

ফলে নতুন নতুন জমি লাভের সম্ভাবনা দেশের মানুষের মধ্যে পুলকের সঞ্চার করতে পারল না। প্যারিস নতুন কোনো জমি তো পাচ্ছেই না উপরন্তু সেখানকার মানুষ বাতাসের অভাবে ছটফট করবে। আর জলের তলায় তলিয়ে গিয়ে দম বন্ধ হওয়ার ফলে মারা যাবে কানাডা, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতবর্ষ আর অস্ট্রেলিয়ার হতভাগ্য মানুষগুলো। বহু উন্নত ও লাভজনক উপনিবেশ গ্রেট ব্রিটেন হারাবে। যেসব দেশ রসাতলে যাবে তাদের মধ্যে অননুত দেশের সংখ্যাই বেশি। অতএব উন্নত দেশগুলো মুখে কলুপ এঁটে রাখলেই তো পারত। অননুত দেশগুলো যদি জাহান্নামে যায় ক্ষতি কি? কিন্তু কার্যত তা হল না। পৃথিবী জুড়ে তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেলে ইউরোপ নিরাপদ থাকবে, পূর্বাঞ্চল জলে তলিয়ে যাবে আর পশ্চিমাঞ্চল মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে একদিকে অথৈ জল আর অন্যদিকে বায়ুর অভাব স্বাসকষ্ট। কী অসহনীয় যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভূমধ্য সাগরের জল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সুয়েজ খাল হয়ে যাবে একেবারে অকেজো।

মালটা, সাইপ্রাস ও জিব্রাল্টার যদি কর্পূরের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে ইংল্যান্ডের তো পুলকিত হবার কোনোই কারণ নেই। পাহাড়ের শীর্ষদেশে যুদ্ধান্ত্র নিয়ে যাবে কীভাবে? আটলান্টিক মহাসাগরের নতুন ভূখণ্ড উপরি পাওনা হচ্ছে সত্য। কিন্তু ইউরোপ যে-সব দেশ খোয়াবে তাকে ক্ষতি পূরণ হবে না।

পৃথিবীর ছোট-বড় সব দেশ সমস্তের প্রতিবাদে মুখর হল। যেখানে যত খবরের কাগজ ছাপা হল সব ক'টি কাগজের সাংবাদিকরা একজোট হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে লাগল।

সবার ক্রোধ পুঞ্জীভূত হয়ে বর্ষিত হতে লাগল নাটের গুরু গণিতবিদ ম্যাসটনের ওপর। অবশেষে এল সেন্টেম্বরের সতের তারিখ। ক্রোধোন্মত্ত জনতা কয়েদখানার ফটক ভেঙে বন্যার জলের মতো ছুড়ছুড়ি করে ভেতরে ঢুকে গেল। কিন্তু কোথায় ম্যাসটন? কারাকক্ষ যে শূন্য।

এবারও মিসেস স্করবিট টাকার ভেঙ্কি দেখালেন। কারারক্ষীকে গোছা গোছা নোট ঘুষ দিয়ে ম্যাসটনের জীবন রক্ষা করলেন।

আর মাত্র চারটি দিন বাকি। এই চারটি দিন কোনোরকমে ঝিম মেরে থাকতে পারলেই বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কামান তীব্র গর্জনে পৃথিবীর রূপ বদলে দেবে। ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্য দিয়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ নতুন এক অবয়ব ধারণ করবে।

এদিকে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির কাজের প্রতিবাদ করে এমনসব মন্তব্য এক ইস্তাহারে ছেপে জনসাধারণের মধ্যে বিলি হতে লাগল যা পড়ে এতদিন যারা তাদের কেবলমাত্র ধান্নাবাজ বলেই সন্তুষ্ট ছিল এখন তারাও তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ার উপক্রম হল।

ব্যাংস, আর কথা নেই, বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির খেয়াল খুশির ফলে কোনো কোনো দেশ অতল জলে তলিয়ে যাবে, আর কোন কোন অঞ্চল মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠে আসবে এমন সব স্থানের উল্লেখ করে মানচিত্র সমেত ইস্তাহার পৃথিবীর সব দেশে বিলি হতে লাগল। এর পরিণাম হল মারাত্মক। দলে দলে মানুষ প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে দেশ ছেড়ে পালাতে লাগল। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছোতে অন্তত একটি মাস সময় দরকার। কিন্তু এত সময় কোথায়? কোনো

কোনো দেশ কামান দাগার স্থান ঘোষণা হবার পর নিশ্চিত হল যে তাদের কোনোই সমস্যা নেই। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তারা।

পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ যখন নিদারুণ আতঙ্ক জুরে অস্থির, তখন একমাত্র অ্যালসিড পিয়ের্দো ব্যাপারটিকে আমল না দিয়ে ভাবতে চলেছেন, সাতাশ সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে দশগুণ কামান তৈরি করা কীভাবে সম্ভব! না, বার্বিকেন এমন একটি অবিদ্যাস্য কাজকে কি করে বাস্তবরূপ দেবেন? অস্থিরচিত্ত অ্যালসিড পিয়ের্দো সর্বক্ষণ আপন ভাবনায় মগ্ন রইলেন।

বার্বিকেন ওয়ামাসাই জায়গাটিকে কামান দাগার জন্য নির্বাচিত করেছেন। সেটি আফ্রিকার পূর্বদিকে অবস্থিত। তার অবস্থান ভিক্টোরিয়া নিয়ানজা লেক আর জাঞ্জিবারের উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। এখানকার শাসক সুলতান বালি-বালি। কিসোনগো তাঁর রাজধানী। ত্রিশ-থেকে চল্লিশ হাজার নিগ্রো তাঁর প্রজা। মধ্য এশিয়ার যেসব শাসক ইংরেজদের তোয়াক্কা না করে স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করছেন সুলতান বালি-বালি তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জানুয়ারি মাসে তারই রাজধানীতে বার্বিকেন হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে এলেন ক্যাপ্টেন নিকল আর অন্য ছ'জন অনুগত ব্যক্তি। কেবলমাত্র জে. টি. ম্যাসটন আর মিসেস স্করবিট ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের আর কেউ-ই তাদের গোপন অবস্থানের খবর জানে না। জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে প্রথমে উত্তমশা অন্তরীপ ও সেখান থেকে এসেছেন জাঞ্জিবারে। অভিযাত্রীরা গোপনে মোম্বামা থেকে এসেছেন সুলতানের ভাড়া করা জাহাজে চেপে। তারপর সুলতানের অনুচররা জঙ্গল-পথে তাঁদের রাজধানীতে নিয়ে এসেছে।

সুলতান বার্বিকেনকে জানান। পৃথিবী থেকে চন্দ্র অভিযানের কর্ণধার হিসাবে করিতকর্মা এই-আমেরিকানের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সুলতান অত্যুগ্র উৎসাহী ছিলেন। বার্বিকেন তাঁর এ-দুর্বলতাটিকে পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

বার্বিকেন সুলতানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে তিন লক্ষ ডলার গুঁজে দিয়ে কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ দিকটি ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে রাখলেন। সুলতান খুশি হয়ে বললেন, 'কোন চিন্তা নেই সাহেব, আমার প্রজারা ই মজুরের কাজ করে সাহায্য করবে।'

উত্তরমেরু ব্যবহারিক সংস্থার সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ডলার দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলটির মালিকানা লাভকরে বসলেন।

বার্বিকেনের মতো একটি জ্ঞানী-গুণী কর্ম বিশারদ কোন কাজ সিদ্ধ করতে চান তা না বুঝে, না জেনেই সুলতান ব্যাপারটিকে খুবই গোপন রেখেছিলেন। প্রজাদেরও কড়া হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন কাজ যতদিন না মিটে যায় ততদিন কেউ রাজ্যের বাইরে যেতে পারবে না। হুকুম যে অমান্য করবে তার কপালে কঠিন শাস্তি জুটবে। এত সতর্কতা অবলম্বন করার পরও খবরটি শেষপর্যন্ত চাউর হয়ে গেল। খবরটি চাপা থাকার জন্যই আমেরিকা ও বৃটেনের বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা বার্বিকেনের কোনো পাতাই পায় নি। কিন্তু নিগ্রোদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতকের অভাব নেই তাদেরই একজনের দ্বারা শেষপর্যন্ত খবরটি জাঞ্জিবারের কনসালের কানে গেল। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ইম্পে বার্বিকেনের দীর্ঘ আট মাসের প্রস্তুতি বরবাদ করার সম-সুযোগ আর নেই।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, পৃথিবীতে এত জায়গা থাকতে সভাপতি বার্বিকেন এ-জায়গাটিকেই কেনই বা কামান দাগার জন্য নির্বাচন করলেন?

এর উত্তর—ম্যাসটনের হিসাবে সঙ্গে ওয়ামাসাইয়ের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পূর্ণমিলে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা আফ্রিকার এ অখ্যাত অরাজত স্থানটির খবর কারোরই জানা নেই। পাহাড় আর জঙ্গলে ঘেরা এই-জায়গাটিতে ইতিপূর্বে কোনো অভিযাত্রীই আসেন নি। সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, কামান আর বারুদ তৈরির যা কিছু কাঁচামাল দরকার সবই এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়।

সুলতান বালি-বালি বার্বিকেনকে এক হাজার নিগ্রো প্রজা দিয়েছেন তাঁর ফরমশ অনুযায়ী কাজ করার জন্য। তাদের নিয়ে তিনি তিনটি কারখানা গড়ে তুললেন। তিন জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে, কামান কামানের গোলা আর মেলিমেলোনাট তৈরি করতে শুরু করলেন। কামান বলতে যে লোহার বিশালায়তন একটি চোঙ তৈরি করা হয় এক্ষেত্রে আসলে কিছু তা নয়। বার্বিকেন পাহাড় কেটে অতিক্রম একটি সুড়ঙ্গ তৈরি করে নিয়েছেন। এটি ফাঁটার কোনো সম্ভাবনা নেই। এতে ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাব অনুসরণ দুমিটার পুরু লোহার অন্তরণের টুকরো অন্য এক কারখানায় তৈরি হল। সেগুলোকে টেনে এনে একের পর এক সুড়ঙ্গটির ভেতরে আটকে দেওয়া হতে লাগল। একলক্ষ আশি হাজার টন লোহাকে অন্য জায়গায় তুলে নিয়ে বসানোর সাধ্য কারোর নেই। তাই কারখানায় ছোট ছোট টুকরো ঢালানো করা হতে লাগল। প্রতিটি টুকরোর ওজন এক হাজার টন। কামানোর মধ্যে মেলিমেলোনাট আগে থেকেই সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার গোলার টুকরোগুলিকে এ-প্রকোষ্ঠের ওপরে সাজিয়ে বিশালায়তন গোলাটি তৈরি করা হল।

এদিকে বারুদ কারখানায় বিস্ফোরক তৈরির দায়িত্ব রয়েছেন ক্যাপ্টেন নিকল। কোন রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে কোন পদার্থ মিশিয়ে বিস্ফোরক তৈরি করা হল তা কেউ টেরও পেল না।

সুলতান রাজ একবার করে এসে উৎসাহের সঙ্গে কারখানাগুলিতে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখেন। তাঁর রাজ্যে এমন কর্মযজ্ঞ হচ্ছে এ যে উৎসাহেরই ব্যাপার।

বার্বিকেন একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলেন পৃথিবীর চেহারাটাই পাণ্ডে দেব। সুলতানের নাম এতেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে। বাস, তারপর থেকে সুলতানের উৎসাহ আর দেখে কে!

আগস্টের উনত্রিশ তারিখে যাবতীয় কাজ মিটল।

সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ। এদিকে ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কন্টেজ ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলে আত্মগোপন করে রয়েছেন। উত্তেজিত জনসাধারণ কেবলমাত্র তাঁকেই নয়, ইম্পে বার্বিকেন এবং ক্যান্টেন নিকলকেও হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মাত্র আর কয়েক ঘণ্টা বাকি। ব্যস, তারপরই অতিকায় পাথর-কামান থেকে বিশালায়তন গোলাটি বায়ুর বেগে ধেয়ে যাবে।

ঠিক তখনই বাল্টিমোরের একনিরালা ঘরের কোণে বসে নিবিষ্ট মনে অঙ্ক কষতে কষতে অ্যালসিড পিয়ের্দো বিকট স্বরে চিল্লিয়ে উঠলেন, 'বোকা! ম্যাসটন একটি বোকার হৃদ! এত বড় একটি ভুল ভুললোক করলেন কিকরে! এতে যে বার্বিকেন অ্যান্ড কোম্পানির পুরো পরিকল্পনাটিই বরবাদ হয়ে যাবে! কী কেলেকারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে!'

বহু প্রতীক্ষিত সেপ্টেম্বরের বাইশ তারিখ এল। পৃথিবীর মানুষ প্রতিটি মিনিট-সেকেন্ডের হিসাব কষতে কষতে দমবন্ধ হওয়া আতঙ্কের মধ্যে সময় অতিবাহিত করে চলেছে। যার সঙ্গে এক হাজার সালের প্রথম দিনটির সঙ্গে বার বার তুলনা করা হয়েছে আজই সে-ভয়ঙ্কর দিনটি। রাত্রি বারোটায় ক্যান্টেন নিকল কামান থেকে গোলা বর্ষণ করবেন। সময় যত ঘনিয়ে আসছে মানুষের আতঙ্ক ততই বেড়ে চলেছে।

ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা পাঁচটা চব্বিশ মিনিট। কামান থেকে মাইল তিনেক দূরে সুলতান বালিবালি বিরাট এক ভোজ-সভার আয়োজন করেছেন। ভোজপর্ব সম্পন্ন করে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে ইম্পে বার্বিকেন উঠে দাঁড়ালেন। হাতের ক্রনোমিটারটির ওপর মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়ে নিলেন।

ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যান্টেন নিকল ব্যস্ত-পায়ে কামানটির কাছে গেলেন। ক্যান্টেন নিকল কামানের বোতামে হাত রাখলেন। ইম্পে বার্বিকেন নিম্পলক চোখে ক্রনোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে। বোতামে টিপ দেওয়ামাত্র এমন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে যা পৃথিবীর চোখে দেখা তো দূরের ব্যাপার কোনোনাদি কল্পনাও করতে পারে নি।

গণিতবিদ ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাব অনুযায়ী রাত্রি ঠিক বারোটায় সূর্য বিষুব রেখার ওপর অবস্থান করবে।

ক্রনোমিটারের চাকা তিরতির করে এগিয়ে চলেছে। বারোটো বাজতে পাঁচ-চার-তিন-দুই, আর মাত্র এক মিনিট বাকি। ক্যান্টেন নিকলের আঙুল বোতামের ওপর অনবরত কঁপে চলেছে। বার্বিকেন এক-দুই-তিন, ইয়া, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বোতামে টিপ দিতে হবে।

ক্যান্টেন নিকলের আঙুল তির তির করে কঁপছে। আর বুকের ভেতরে অনবরত চলছে হৃদপিণ্ডের লাফালাফি দাপাদাপি। এক সময় বার্বিকেন কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, 'ফায়ার!'

ব্যস, ক্যান্টেন নিকল সঙ্গে সঙ্গে বোতামের ওপর আঙুলটি চেপে ধরলেন। প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। চারদিক জমাটবাধা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। আর আগুনের হুঙ্কার ছড়াতে ছড়াতে অতিকায় গোলাটি উচ্চারণ বেগে ধেয়ে চলল।

পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ চরম মুহূর্তের জন্য রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগল। একমাত্র অ্যালসিড পিয়ের্দো-ই নির্বিকার। একেবারেই ভাবনা চিন্তাহীন।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার বাল্টিমোর, কনস্টান্টিনোপল, প্যারিস, লন্ডন প্রভৃতি অঞ্চলে সামান্যতম কম্পনও অনুভূত হল না। কয়লাখনির সিসমোগ্রাফেও সামান্যতম কম্পনের লক্ষণ লক্ষিত হল না।

ম্যাসটনের মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। হতাশাও কম হলেন না। এক্সপেরিমেন্ট সফল হওয়ার কোনো খবর না পাওয়ার জন্যই তাঁর এ-উদ্ভ্রাণ। সেপ্টেম্বরের তেইশ তারিখেও কোথা থেকেও ভয়ঙ্কর কোনো খবর পাওয়া গেল না।

ম্যাসটনের মনে সন্দেহের উদ্বেগ ঘটল। কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে কিনা এরকম সন্দেহও তাঁর মনের কোণে উঁকি দিতে লাগল।

ইউরোপিয় প্রতিনিধিরা বহুমূল্য সব যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষায় মগ্ন থেকে এক সময় উল্লসিত হয়ে পড়লেন। কোনো পরিবর্তন লক্ষিত না হওয়ার জন্যই তাদের মনের এ উল্লাস। ম্যাসটন আর মিসেস স্করবিট কিন্তু হতাশা হতে লাগলেন। ভাবলেন, তবে কি অঙ্কের হিসেবে কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

আমেরিকায় জাঞ্জিবারের কনসালের এক টেলিগ্রাফ এল। তাতে লেখা, জাঞ্জিবার, তেইশে সেপ্টেম্বর সকাল সাতটা পঁচিশ মিনিট তারিখ ও সময়ের উল্লেখ রয়েছে। আর টেলিগ্রামের বক্তব্য—কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে গতকাল কামান থেকে গোলা বর্ষিত হয়েছে। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেছে। সমুদ্রের বুকে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হলেও ক্ষয়ক্ষতি কিছুই হয়নি। পৃথিবী থেকে চাঁদে গোলা বর্ষণের সময়েও এমন আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল।

টেলিগ্রামটি থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল—(ক) কিলিমাঞ্জারো পর্বতশ্রেণীর পাদদেশ থেকে কামান দাগা হয়েছিল, আর (খ) কামান থেকে গোলাবর্ষণ পূর্ব নির্ধারিত বিধাতার সূত্র সবকিছু আগের মতো যথাস্থানেই রয়েছে।

মিসেস স্করবিট এতদিন ম্যাসটনকে কামরাবন্দি করে আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি আর তাঁকে আগলে রাখতে পারলেন না। অস্থিরচিত্ত ম্যাসটন একদিন তাঁর বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে পথে বেরিয়ে গেলেন। ব্যস, আর যাবে কোথায়! পথচারীরা চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে নানারকম টিটকিরি দিতে লাগল। উপায়াস্তর না দেখে ম্যাসটন জনতার হাত থেকে কোনোরকমে নিজেকে মুক্ত করে আবার মিসেস স্করবিটের প্রাসাদে ফিরে মান ও প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু বার্বিকেন আর নিকল কোথায় কি অবস্থা, যে আছেন কে জানে। মান-সম্মানের কথা না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে, প্রাণ বেঁচে আছেন কি?

বার্থ মনোরথ হয়ে বার্বিকেন স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। অক্টোবরের পনের তারিখে দুপুর বারোটায় তিনি গ্রিন পার্কের বাড়িতে গণিতবিদ জে. টি. ম্যাসটন এবং মিসেস স্ক্রবিটের কাছে হাজির হলেন।

ম্যাসটন তাঁদের মুখ থেকে সবকিছু শুনে, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তবে আমাদের একটি সিদ্ধান্তে আসতে হয়। গালাটির প্রাথমিক গতিবেগ বাঞ্ছিত সেই দুহাজার আটশো কিলোমিটার গুণে নি। আসলে পিছন থেকে বারুদ যে ধাক্কা দিয়েছিল তা ছিল খুবই কম।

ইম্পে বার্বিকেন বললেন, এতে আমাদের পরস্পরের প্রতি দোষারোপই করা হবে। আমি বলব, ম্যাসটনের অঙ্কের হিসাবনিকাশ নির্ভুলই ছিল। আর ক্যাপ্টেন নিকলের বারুদও নির্ভেজাল ছিল। আমাদের বার্থভার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের দক্ষতার অভাব।

সম্পূর্ণ অর্থই জলে গেল। কোম্পানির শেয়ারের মূল্য একটি কানাকড়িও আর রইল না। কোম্পানির লালবাতি জ্বলল। পৃথিবীর চারদিক থেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষিত হতে লাগল বার্বিকেনকে লক্ষ্য করে।

টাইমস পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ছাপা হল। পৃথিবীর সমাক্রমে থাকে নতুন করে সৃষ্টির প্রয়াস সম্পূর্ণ রূপে বার্থ হয়েছে। গণিতবিদ জে. টি. ম্যাসটন গোড়াতেই তো ভুল করে বসেছেন। তিনি অঙ্ক কষতে শুরু করেছিলেন পৃথিবীর পরিধি চল্লিশ হাজার মিটার ধরে। কিন্তু আসলে পরিধি চার কোটি মিটার। গোড়াতেই ভুল হওয়ায় পুরো অঙ্কটিই শেষপর্যন্ত ভুল হয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে তিনি প্রথম তিনটি শূন্য বসাতে ভুল করেছিলেন। আর এরই জন্য সব শেষে গিয়ে বারোটাই শূন্যের পার্থক্য হয়ে গেছে।

ম্যাসটনের ভুলের ব্যাপারটি খবরের কাগজ মারফৎ পৃথিবীর সবদেশে প্রচারিত হওয়ার পর চারদিক থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছে টেলিগ্রাম আসতে লাগল। ব্যাপারটি এমন দাঁড়াল যে, তাঁর ভুলটুকুর জন্যই পৃথিবীর এক বিরাট ভগ্নাংশ নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেল। প্রাণ বাঁচল কোটি কোটি মানুষের।

ম্যাসটন কিন্তু কিছুতেই মানতে উৎসাহ পেলেন না যে, গোড়ার তিনটি শূন্যের ভুলের জন্য শেষমেশ বারোটাই শূন্যের হেরফের হয়ে গেছে। তিনি কাগজ পেলিস নিয়ে বসলেন অঙ্কের সমাধানের জন্য।

ম্যাসটন ব্যালিস্টিক কন্টেজের দরজা-জানালা বন্ধ করে সবে ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে চল্লিশ লক্ষ সংখ্যাটি লিখলেন। ঠিক সেইমুহূর্তে কর্কশ আওয়াজ ভুলে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল। ফোন করেছিলেন মিসেস স্ক্রবিট। ফোনে সবে উভয়ের কথোপকথন শুরু হয়েছিল। ব্যাস, বিকট আওয়াজ করে বাজ পড়ে। ম্যাসটন ছিটকে পড়লেন। ঘরের মেঝেতে পড়ে যাওয়ার সময় তার হাতের স্পর্শে অঙ্কটির অংশ বিশেষ মুছে যায়। আবার অঙ্ক শুরু করলেন, চল্লিশ হাজার পর্যন্ত লিখতেই আবার টেলিফোনের ঘণ্টা ক্রিং—ক্রিং—ক্রিং শব্দে বেজে উঠল। মিসেস স্ক্রবিটের ফোন। তাঁর সঙ্গে কথা সেরে আবার তিনি অঙ্কটি কষতে শুরু করলেন? পৃথিবীর পরিধির সম্পূর্ণ মাপ লিখতে ভুলে গেলেন। অর্থাৎ শেষের শূন্য তিনটি বাদ-ই রয়ে গেল। মিসেস স্ক্রবিট প্রথমবার ফোন না করলে ম্যাসটন বজ্রাঘাতে ছিটকে পড়তেন না। দ্বিতীয়বার ফোনটি না করলে শেষের শূন্য তিনটি বাদ পড়ার কোনো কারণই থাকত না। তিনি নিবিষ্টচিত্তে অঙ্ক নিয়েই মেতে থাকতে পারতেন। অঙ্কও নির্ভুল হত। মিসেস স্ক্রবিটের জন্যই, নইলে আমৃত্যু এতবড় একজন গণিতবিদকে সমগ্র বিশ্বের কাছে এমন হয়ে প্রতিপন্ন হতে হত না।

ম্যাসটনের মনোবল ভেঙে গেল। অঙ্কের জগৎ থেকে তিনি নিজেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে নিলেন। একটি বিশেষ শর্তে ম্যাসটন আর মিসেস স্ক্রবিটের গুণপরিগণ্য সম্পন্ন হল যে, ম্যাসটন আর কোনোদিনই অঙ্ক কষবেন না। মিসেস স্ক্রবিটও মনে মনে তাই চাচ্ছিলেন। কারণ, অঙ্ক দেখলেই তাঁর মেজাজ খিটমিটে হয়ে যায়।

এদিকে অ্যালসিড শিয়েদৌ তাঁর যে-প্রেষয়ীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে দেশ ছেড়ে এসেছিলেন তার বাবা খবরের কাগজের পাতার প্রবন্ধ পড়ে অনুতাপে জর্জরিত হতে লাগলেন। এমন একটি সুপাত্র হাতছাড়া হওয়ায় অনুতাপ ভেে হবারই কথা।

তাই একদিন তিনি পিয়েরদৌকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

মান্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড

কতকগুলো বিশ্বয়কর ঘটনার সঙ্গে আমাকে লিপ্ত হতেই হয়েছিল। বিশ্বয়কর বলে উল্লেখ করছি এজন্য যে, হয়তো বিশ শতকে আর এমন অতুলনীয় বিশ্বয়ের উদ্ভব ঘটেবে না। মাঝে মধ্যে নিজের মনেই প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে, সত্যিই কি এমন অত্যাচার্য কোনো ঘটনা ঘটেছিল? আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে পটে আঁকা ছবির ঘটনাটা গেঁথে রয়েছে। বাল্যের সেই দূরন্ত দিনগুলো থেকেই অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করার জন্য আমি ঔৎসুক্য বোধ করতাম। আর রহস্যাবৃত ঘটনা তখন থেকে চুম্বকের লোহাকে আকর্ষণ করার মতো আমাকেও দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেত। আর তা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল বলেই আজ আমি ওয়াশিংটন ফেডারেল পুলিশ ডিপার্টমেন্টের চিফ ইন্সপেক্টরের পদ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি।

কর্তব্য আর নেশা উভয়ের তাগিদে আমি মাঝে-মধ্যে এমন সব অদ্ভুত-অবিশ্বাস্য ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি যা কখন সখন নিজের কাছে বিশ্বয়ের ব্যাপার বলে মনে হয়। সরকার আমার মতো একজন অল্পবয়স্ক কর্মীর ওপর গোপন রহস্য ভেদ করার দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। আবার বহুরকম জটিল সমস্যার গোপন তদন্তের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। তাই এ বিশ্বয়কর ঘটনার তদন্ত ও সমাধানের দায়িত্ব যে আমার উপরেই বর্তাবে তাতে আর অবাধ হবার কি-ই বা থাকতে পারে। অবিশ্বাস্য অত্যাচার্য ঘটনাটার তদন্ত করতে নেমে যেসব রহস্যাবৃত ঘটনার সঙ্গে আমাকে যুক্ত হয়েছিল তার আর দ্বিতীয় নজির আছে বলে আমার অন্ত জ্ঞান নেই।

অত্যাচার্য-অবিশ্বাস্য এই ঘটনাটার কেন্দ্রস্থল আমেরিকার দক্ষিণ ক্যারোলিনার পশ্চিমের এক স্থান। ব্রু-রিজ পর্বতমালা আর গ্রেট আইরি পর্বতশিখরের মধ্যবর্তী স্থানেই অবস্থিত। পাহাড়টার গুপ্তজাকৃতি চেহারাটা ক্যাট বা নদীর পাড়ে অবস্থিত মরগ্যাটন নামে পার্বত্য গ্রাম থেকে স্পষ্ট নজরে আসে। তবে প্রেক্ষান্ত গ্রামের মধ্যবর্তী পথ পাড়ি দেবার সময় পাহাড়টাকে আরও অনেক, অনেক স্পষ্ট দেখা যায়।

গ্রেট আইরির এরকম নামকরণ হয়েছে কেন, ভাববার মতো ব্যাপারই বটে। নইলে এত নাম থাকতে—আসলে স্থানীয় অধিবাসীদের কোনো নামই মনে ধরল না। হয়ত সদ্ভক্ত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার কথা ভেবেই তাদের এমন মতি হয়েছে। তবে আমার পক্ষে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

গ্রেট আইরির চূড়াটা একেবারেই ন্যাড়া। যা-ই হোক এটা তো নিছক একটা পাহাড়ই বটে। আর এটা তো পাথর, নিছকই নিরেট পাথর মাত্র। তবে? এর দিকে চোখ পড়ামাত্রই বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে থাকে। এর শীর্ষে আরোহন করার হিম্মত কারোরই নেই। বিশেষ বিশেষ আবহাওয়ায় পাহাড়টা নীল বর্ণ ধারণ করে।

নানারকম পাহাড়ী পাথির নামানুসারেই হয়তো বা পাহাড়টার নামকরণ করা হয়েছে। জানা-অজানা কতরকম অতিকায় সব পাখি যে পাহাড়টার গায়ে আশ্রয় নিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু গ্রেট আইরি এখন আর তাদের যেন আকৃষ্ট করতে পারছে না। তারা এখন পাহাড়টার শীর্ষদেশ বার-কয়েক চক্রের মেরে পরম বিভ্রম্ভায় অন্যদিকে চলে যায়।

তবে? গ্রেট আইরি নামটার অস্তিত্ব কি তবে অব্যাহত রয়ে গেল। তার চেয়ে বরং এর নাম আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ নামকরণ করলেই সঙ্গত হত। গুপ্তজাকৃতি পাহাড়টার গায়ে অতিকায় কোন গহবর আছে কিনা তাই বা কে বলতে পারে? তা যদি না হয় তবে কোনো হ্রদ আছে কিনা তাই বা কে জানে? অ্যাল্পাচিচান পর্বতমালার খানা খন্দে বৃষ্টি আর বরফগলা জল জমে জমে কিছু সংখ্যক উপহ্রদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়।

আসলে গ্রেট আইরি একটা প্রাচীন আগ্নেয় পর্বত কি না, কারোর জানা নেই। দীর্ঘদিন সূপ্ত, অগ্নি উদগীরণ করে নি। তবে কি গ্রেট আইরি তার পাশ্চবর্তী অঞ্চলগুলোতে আগ্নেয় পর্বত ক্রাকাটোয়া বা মঁপিলির মতো আবার ভেতরে ভেতরে ভয়ানক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে? পাথরের ফাটল দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে ভূগর্ভস্থ ফুটন্ত গলিত লাভার সংস্পর্শে গিয়ে বাষ্পীভূত হবে। বাস, তা বেরোবার উপযুক্ত পথ না পেয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটাবে। চোখের পলকে গলিত লাভা, বিষাক্ত গ্যাস, পাথরে পাথরে ছেয়ে ফেলবে শান্তি-সুখের ক্যারোলিনা গ্রামটাকে। ঠিক এমনই ভয়ঙ্কর ঘটনা তো উনিশ শো দুই-এ মাটিকিকে ঘটেছিল, ঠিক কি না? এরকম সম্ভাবনার ইঙ্গিতই যেন এখন প্রকাশ পাচ্ছে। আর এসবই অগুণপাতের ইঙ্গিতবাহী বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাদের একটা হচ্ছে, পাহাড়ে শীর্ষদেশে জমাটবাঁধা ধোঁয়া দেখা গেছে। আবার চাষীরা মাঠেঘাটে কাজ করতে যাওয়ার সময় পায়ে তলা থেকে চাপা আওয়াজ উঠতে শুনতে পেয়েছে। আবার এমনও দেখা গেছে গভীর রাতে পাহাড়ের ওপরের আকাশ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। বাতাসের কাঁধে ভর করে জমাটবাঁধা ধোঁয়া ভাসতে ভাসতে পূর্বের প্রেক্ষান্ত গার্ডেনের দিকে দুলকি চালে এগিয়ে গেছে। রাশি রাশি ছাই নেমে এসেছে ভূমিতে। ব্যাপার দেখে গ্রামের বাসিন্দারা চমকে উঠেছে। তারা ভেবেছে পাহাড়টা বুঝি প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ধারে-কাছের মানুষের আতঙ্ক-মিশ্রিত কৌতূহলের সঞ্চারণ ঘটেছে। ক্যারোলিনার সব ক'টা খবরের কাগজ 'গ্রেট আইরির রহস্য' নাম দিয়ে খবর ছেপে বাজার গরম করতেও দেরি করল না। সবাইই মোহা কথা, গ্রেট আইরির কাছাকাছি বাসবাস করা কি সম্ভব হবে? খবরের কাগজের বক্তব্য কারোর মধ্যে ভীতির সঞ্চারণ করল, আবার কারোর মধ্যে বা সঞ্চারণ করল অফুরন্ত কৌতূহল, আসলে তাদের বসতি যে বিপদ-সীমার বাইরে। তাই তো তাদের ভীতির বদলে কৌতূহলের সঞ্চারণই বেশি হল। প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটলে ধারে কাছে চাষীভূমিগুলিই আগে খতম হবে। সবচেয়ে

বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল প্রেজ্যান্ট গার্ডেন ও মরণানটনের বাসিন্দা আর পাহাড়ের গা-বেঁধে বসতি গড়ে তোলা চাষীভূমিরা।

এ-মুহুর্তে গ্রামবাসীদের সবচেয়ে বড় আপসোস, এতদিন কেন পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠে গ্রেট আইরি পাহাড়ের শিখর পর্যন্ত দেখা হয় নি? পর্বতারোহীদেরই দোষ দেওয়া যাবে কীভাবে? এমন মসৃণ-খাড়াই পাহাড়ের গা-বেয়ে শিখর অবধি উঠবেই বা কীভাবে? পাহাড়ের গায়ে ফাঁক-ফোকর থাকলে কি আর তারা আজও রহস্যটা ভেদ না করে নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকত? না, এখন তো আর নিশ্চিন্তে বসে থাকা সম্ভব নয়।

গ্রেট আইরির অভ্যন্তরে কোন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ডের মহড়া চলছে তা যত শীঘ্র সম্ভব চাক্ষুষ করা দরকার।

সে বছরের সেপ্টেম্বরের প্রথমে দিকে মরণটিনে উইলকার হাজির হলেন। বেলুনবাজ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। তাঁর সর্বসময়ের সম্বল বেলুনটা, সঙ্গেই রয়েছে। বাতাস পূর্বদিক থেকে বইছে। তাই সেদিক থেকেই তিনি বেলুনে চেপে গ্রেট আইরির শিখর ডিঙিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বহু উঁচু দিয়ে, তাঁর বা বেলুনের গায়ে যেন তাপ না লাগে এমন দূরত্ব দিয়ে বেলুনে পাড়ি জামাবেন। বেলুনের গায়ে তাপ লাগলে ফেসে যাওয়ার সম্ভাবনাও যথেষ্টই রয়েছে। অক্ষত বেলুনে চেপে তিনি শক্তিশালী দূরবীণের সাহায্যে গ্রেট আইরির অনেকখানি ভেতর অবধি দেখে নেবেন। পাহাড়ের তলদেশ ফাটিয়ে আগ্নেয় পর্বত জেগে ওঠার প্রস্তুতি নিচ্ছে কিনা এটা দেখাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর অগ্নি উদগীরণ যদি করেই তবে কি তার দেরি আছে, নাকি শীঘ্রই করবে? এতেই গ্রামবাসীদের ভাগ্য সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা যাবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ হল। উইলকারকে নিয়ে বেলুনটা শূন্যে উড়ল। তিনি চোখে দূরবীন লাগিয়ে তৈরি হয়ে দোলনায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জমাটবাঁধা ধোঁয়া না থাকলে পাহাড়ের জঠরের অনেকখানি তিনি অবশ্যই দেখে নিতে পারবেন। বিষাক্ত গ্যাস থাকলে ধরতে পারবেন কোন জায়গা দিয়ে তিরতির করে বেরিয়ে আসছে।

বেলুনটা চোখের পলকে শূন্য পনের ফুট উঠে গেল। পূর্বের হাওয়ার বেগ কম, তাই বেলুনটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবারই অঘটনটা ঘটে গেল। আচমকা হাওয়ার দাপটে বেলুনটা পূর্বদিকে উড়ে গিয়ে গ্রেট আইরি থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেল। আকাশচাষী বেলুনবাজ উইলকার প্রাণান্ত প্রয়াস চালানেন বিপথগামী বেলুনটাকে বাস্তিত্ব স্থানে ফিরিয়ে আনতে। ব্যর্থ প্রয়াস। বেলুনটা নিজগুণেই ভাসতে ভাসতে চোখের আড়ালে চলে গেল। পরে শোনা গেছে, উত্তর ক্যারোলিনার রাজধানী ব্যালের কাছাকাছি এক জায়গায় উইলকার বেলুন নিয়ে মাটিতে নেমেছেন।

এই অবসরে আবার পাহাড়ের ভেতরের থেকে অবাস্তিত্ব যে চাপা আওয়াজটা শোনা গেছে। জ্বালামুখ দিয়ে রাশি রাশি জমাটবাঁধা ধোঁয়ার মেঘ উঠে এসে, আগ্নেয় পর্বতের রক্তিম আলোর সংস্পর্শে এসে তা আকাশের অনেকখানি জায়গাকে লাল করে তুলেছে। এ কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে। অগ্নি উদগীরণের মুহূর্ত কি তবে ঘনিয়েই এসেছে? শুরু হবে, কি ভয়ঙ্কর-ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প? আর সময় নষ্ট না করে আকাশপথে গ্রেট আইরির জ্বালামুখটার তদন্ত তো করতেই হয়।

এপ্রিলের শুরুতেই ভয়-ভীতি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠল। সাংবাদিকরা খবরের কাগজের পাতায় পাতায় প্রবন্ধ ছেপে মরণটিনের মধ্যবর্তী অঞ্চলের মানুষগুলোর ভয়-ভীতিকে আর শতগুণ বাড়িয়ে দিল।

চোঁঠা এপ্রিল। রাত্রির অন্ধকারে আকস্মিক বিকট আওয়াজে প্রেজ্যান্ট গার্ডেনের সাদাসিধে নিরীহ মানুষগুলোর ঘুম ভেঙে গেল। মৃত্যুভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষগুলো আতর্জনাদ করতে করতে অন্ধকারে ছুটোছুটি দাপাদাপি শুরু করে দিল। অন্ধকারে হটোপাটা করতে করতে তারা চিল্লিয়ে বলতে লাগল, 'ভূমিকম্প! অগ্নুংপাত! গ্রেট আইরি অগ্নি উদগলিণ করছে।'

মরণটিনের সর্বত্র চোখের পলকে দুঃসংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল। চালাক-চতুর অধিবাসীরা একে গুজব বলেই উড়িয়ে দিল। অগ্নুংপাত যদি নেহাৎই ঘটত তবে গম গম আওয়াজটা অবশ্যই এত ভাড়াভাড়ি খেমে যেত না, বাড়তেই থাকত। আগুনের শিখাকে আকাশের দিকে তেলে উঠে যেতে দেখা যেত। আওয়াজ, আগুন কিছুই নেই অথচ ভূমিকম্প? বাড়ি ঘরও ধ্বংস পড়ে নি। তবে কি পাহাড় থেকে অতিকায় কোন পাথরের হাঁই খসে পড়েছে? তারই দাপটে কি মাটিতে কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে?

ইতিমধ্যে এক ঘণ্টা কেটে গেল। নতুন কোনো ঘটনাই ঘটতে দেখা গেল না। উদ্ভূত ভয়ভীতি ক্রমে ক্রমে কমে আসায় সবাই নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে শুরু করল।

রাত্রি তখন তিনটা। গ্রামবাসীদের কলিজা কেঁপে উঠল। গ্রেট আইরি শিখরের গহ্বর দিয়ে উদ্ধার বেগে লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশের দিকে ধেয়ে গেল। আর থেকে থেকে ফট ফট আওয়াজ বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। তবে? তবে কি দাবানল। পাহাড়ের গায়ের শুকনো গাছপালা পুড়ছে? বজ্রপাতের ফলে আগুন লেগেছে। কিন্তু আকাশে তো মেঘের লেশমাত্র নেই, বিদ্যুৎ ও চমকচ্ছে না। আর এ আগুন তো একটু-একটু করে বাড়তে ও নি। তবে কি দপ করেই জ্বলে উঠেছে?

হ্যাঁ, আগ্নেয় পর্বত জেগে উঠেছে। অগ্নি উদগীরণ শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে আতঙ্কিত মানুষের আতর্জনাদ ভেসে আসতে লাগল। গ্রেট আইরি তবে সুপ্ত আগ্নেয় পর্বত? এতদিন থমকে থাকার পর সে আগুন-বমি শুরু করে দিয়েছে? এর পরই কি শুরু হবে পাথর-বৃষ্টি? আগুনের সঙ্গেই কি গলিত লাভা বেরিয়ে আসতে শুরু করবে? গ্রাম, বাড়িঘর আর খামার সবকিছুই কি আগুন গ্রাস করে ফেলবে?

আতঙ্ক এবার বাঁধনহারা হয়ে উঠল। কোলের শিশুকে বুকে জাপ্টে ধরে মায়েরা আতঙ্কে রাস্তা বরাবর ছুটতে লাগল। আর পুরুষরাও চুপ করে বসে রইল না। চোখের পলকে আগ্নেয় পর্বতের আগুন জ্বালাশয়ে এসে পড়ে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে জলকে টগবগ করে ফুটিয়ে তুলবে। ব্যস, তখনই জ্বালাশয়ের পাড় ছাপিয়ে জল ধেয়ে চলেবে, গ্রাম, মাঠ আর

জঙ্গল ভাসিয়ে দেবে। তার ওপর গলিত লাভার শ্রোত ধেয়ে এলে তো আর কথাই নেই। তখন? তারা পালিয়ে যাবে কোথায়?

গ্রামবাসীদের মধ্যে যাদের একটু সাহস আছে তারা পলায়নরত মানুষগুলোর পথ আগলে তাদের ঠেকাতে চেষ্টা করতে লাগল। মাইল খানেক দূর থেকে দেখতে পেল আঙনের দাপট ইতিমধ্যেই কমতে শুরু করেছে। আর অগ্নি উদগীরণের সম্ভাবনা নেই। সম্ভাব্য কোনোরকম ক্ষতিই হল না। তারা নিঃসন্দেহ হল যে, আর অগ্নুৎপাতের কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভবিষ্যতের লাভা উদগীরণ করে গ্রেট আইরি মনুষ্য বসতি জালিয়ে পুরিয়ে খাঁক করবে এমন সম্ভাবনাবো আর দেখা গেল না।

তখন সকাল পাঁচটার কাছাকাছি। আবার, আবারও অত্যাশ্চর্য একটা আওয়াজ হল। গ্রেট আইরি আবার নড়েচড়ে উঠল। বিচিত্র একটা আওয়াজ চারিদিক কঁপে কঁপে উঠতে লাগল। পাহাড়ের চূড়ায় ঘূটঘূটে অন্ধকার বিরাজ না করলে হয়তো বা আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা দেখতে পেত অতিকায় একটা বাজপাখি গ্রেট আইরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরিয়ে এসে অন্ধকার আকাশে মিলিয়ে গেল। কিন্তু হায় তাদের আতঙ্ক ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। এ অবস্থায় গ্রামবাসীদের দীর্ঘশ্বাস ফেলা আর অসহায়-ভাবে রূপাল চাপড়ানো ছাড়া গতাত্তর রইল না।

সাতাশে এপ্রিল। ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা করে আমি উত্তর ক্যারোলিনার রাজধানী র্যালোতে হাজির হলাম। ফেডারেল পুলিশের বড় সাহেব আমাকে দুদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আমাকে দেখেই অস্থিরচিত্ত পুলিশের বড় সাহেব, মাঝ-বয়সী অদ্ভলোক, বলে উঠলেন, 'অতীতে বহুবার আপনার কর্মনিষ্ঠার প্রমাণ পেয়েছি। এমন কি কঠিনতম কাজও আপনি অনায়াসে সম্পন্ন করতে পারেন।'

আমি মুচকি হেসে বললাম, 'মি. ওয়ার্ড, যে-কোনো কাজ বা, যে-কোনো রহস্যের কিনারা করতে যে পারবই এমন কথা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমার প্রয়াস ও নিষ্ঠার অভাব ঘটবে না এটুকু কথা অন্তত দিতে পারি।

পুলিশের বড় সাহেব মি. ওয়ার্ড অতীতে কয়েকটি জটিল সমস্যার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে ফল পেয়েছেন, খুশি হয়েছেন। তাই আমার ওপর তাঁর বিশেষ আস্থা জন্মেছে।

'তখন, আসল কথায় আসা যাক, মর্গাটনের কাছাকাছি অবস্থিত ব্রিড্জ নামে ন্যাডা পাহাড়টায় ইদানিং যা ঘটতে চলেছে অবশ্যই শুনে থাকবেন। সেগুলোকে কেবলমাত্র অসাধারণ বললেই যথার্থ বলা হবে না, অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য। আসল রহস্যটা আমাদের ভেদ করতে হবে। গ্রামের নিরীহ মানুষগুলোও খুবই মুষড়ে পড়েছে। অতএব ব্যাপারটার কিনারা করতেই হবে।'

'স্যার, কারণ ছাড়া তো অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে না। এতে ভীতির সম্ভার হওয়া খুবই স্বাভাবিক।'

'নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, পাহাড়ের ওপরে কী অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে চলেছে, রহস্যভেদ করা এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যদি সত্য সত্যই প্রকৃতি সক্রিয়, মাথ্যাচাড়া দিয়ে উঠছে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তবে প্রতিকার করার কিছুই নেই। তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, মানে গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিতে হবে। অদূর ভবিষ্যতের বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করতে হবে।'

'অবশ্যই। পাহাড়ের ভেতরে হঠাৎ এমন ধুমুয়ার কাণ্ড কেন ঘটে চলেছে সে-রহস্য তো আমাদের ভেদ করতে হবে স্যার।'

'ঠিক বলেছেন। তবে কাজটা খুবই কঠিন সাধ্য। হাজারো সমস্যা রয়েছে এর পিছনে। পায়ে পায়ে বিপদ। সবাই একই কথা বলছে, ন্যাডা পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে ওঠার সাধ্য কারোর নেই। আর তার ভেতরে প্রবেশ করা তো স্বপ্নাতীত ব্যাপার। তবে আজ অবধি কেউ তো অনুকূল পরিবেশের উপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়ে গ্রেট আইরিতে আরোহণ করতে প্রয়াসীও হয় নি। তাই আমি নিঃসন্দেহ কেউ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় পাহাড়টার চূড়ায় উঠবেই, সে সাফল্য লাভ করবেই করবে।'

'আমারও বিশ্বাস, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারটাও তো অস্বীকার করা যায় না।'

'মি. স্ট্রক, এ-অঞ্চলের সব মানুষ ভয়ে যেমন কঁকড়ে রয়েছে তা থেকে তাদের অব্যাহতি দিতে আমাদের যা কিছু করা দরকার তার কিছুমাত্রও ত্রুটি করব না। আমরা গ্রেট আইরিকে যতটা দুর্জয় মনে করছি আসলে ঠিক অতটা না-ও হতে পারে হয়তো। কাজে নামলে দেখা যাবে, তার গায়ে ভেতরে ঢোকার মতো ঝাঁজ-টাঞ্জ, সহজ পথ হয়ত আছে। কোনো দৃষ্টকারীর দল সে-পথের সন্ধান পেয়ে হয়তো ভেতরে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

'আপনি কি দস্যু-তরুরের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

আমতা আমতা করে পুলিশের বড়সাহেব বলে উঠলেন, 'না, মানে আমার ভুলও হতে পারে। হ্যাঁ, এমনও হতে পারে, আলো ধোঁয়া আর বিচিত্র সব আওয়াজের পেছনে মানুষের হাত না-ও থাকতে পারে। হতে পারে সবই প্রকৃতিরই বিচিত্র খেলা, কারসাজি। প্রকৃত সত্যটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানার জন্য ব্যর্থ হয়ে পড়েছি মি. স্ট্রক।'

'আমার একটা ছোট্ট জিজ্ঞাসা রয়েছে স্যার। প্রশ্নটা হচ্ছে, কোনোক্রমে গ্রেট আইরির উদরে প্রবেশ করে যদি দেখা যায় অগ্নি উদগীরণের প্রকৃতি চলছে, তবে? তা থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় কি? প্রতিরোধ করব কীভাবে?'

'প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু বিপদের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করা তো যাবে। মার্টিনিককে গলিত লাভা দিয়ে মাউন্ট পিল্লি আগ্নেয় পর্বত যেভাবে ঢেকে ফেলে দিয়েছিল, গ্রেট আইরির অগ্নুৎপাতের ফলে যদি সেরকম সম্ভাবনা থাকে তবে আগে থেকেই নিরীহ গ্রামবাসীদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাব। মি. স্ট্রক, আপনার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। একমাত্র আপনিই গ্রেট আইরির উদরের প্রকৃত রহস্য ভেদ করতে পারবেন। আমি জানি পাহাড়ে আরোহণ করার জন্য পর্বতারোহীর দল জোগাড় করতে হবে। প্রচুর খরচ। অর্থের জন্য ভাববেন না।

চাহিদা অনুযায়ী অর্থ আপনাকে অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তবে একটা কথা আগেই তো বলেছি যে সে-অঞ্চলের মানুষ প্রতিনিয়ত নিদারুণ আতঙ্কে ভুগছে। তাই রহস্যভেদের ব্যাপারে যা কিছু করবেন সবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখবেন। মানুষের আতঙ্ক যাতে আর না বাড়ে সে জন্যই গোপনীয়তা অবলম্বন করা। আর একটা কথা-মরগানটনের মেয়র আপনাকে সার্বিক সাহায্য করবেন। আবারও সতর্ক করে দিচ্ছি, নিজের পরিচয়, কি করতে চলেছেন সবকিছুই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখবেন যদি অসুবিধা না থাকে তবে আগামীকালই ওয়াশিংটন থেকে মরগানটনের উদ্দেশে যাত্রা করুন। আগামী পরশু সেখানে পৌঁছে যাবেন।

‘ঠিক আছে, আগামীকাল আমি বেরিয়ে পড়ছি।’

পুলিশের বড় সাহেবকে যথোচিত অভিবাদন সেরে বিদায় নিলাম। তখন কি ঘণাক্ষরেও আমি জানতাম, গ্রেট আইরির উদরে কী অভাবনীয় বিশ্বয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছে!

যথা সময়ে মরগানটন রেলওয়ে স্টেশনে গাড়ি হাজির হল।

ছোট্ট সহর মরগানটান। সেখানে জুরাসিক আমলের কয়লা প্রচুর পরিমাণে উত্তোলন করা হয়। তাতে কাজ করে প্রচুর শ্রমিক। আর খনি অঞ্চল ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চাষের জমি আর খামারবাড়ি। তাই গ্রেট আইরি যদি সত্য সত্যই অগ্নি আর গলিত লাভা উদগীরণ করতে শুরু করে তবে কেবলমাত্র মানুষের চরমতম দুর্গতিই নয়, হাজার হাজার মানুষের জীবন সংশয় হতে বাধ্য।

মরগানটনের মেয়র ইলিয়াস স্থিথ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। প্রচুর নগদ অর্থ ও জমিজিরাতের মালিক। শিকারের ঝোঁক খুবই।

আমি মরগানটনে পৌঁছে সোজা মি. স্থিথের বাড়ি হাজির হলাম। আমাকে দেখেই কোনোরকম ভনিতা না করেই মুচকি হেসে তিনি বললেন, ‘আপনিই তো মি. স্ট্রক, তাই না? মি. ওয়ার্ড আমাকে টেলিগ্রাম মারফৎ আপনার আগমনবার্তা আগাম জানিয়ে রেখেছেন।’

ব্রাভি পানে আমাকে আপ্যায়িত করে মি. স্থিথ ঠোটের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখেই বললেন, ‘মি. স্ট্রক, এবার বলুন তো মি. ওয়ার্ড কোন ব্যাপারে ভাবিত, মানে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলছি।’

ব্যাপারটাকে খোলসা করে বলতে গিয়ে আমি মুখ খুললাম, ‘আপনাদের বড় সহেব মি. ওয়ার্ড আমাকে পুরোপুরি ক্ষমতা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার কাজ গ্রেট আইরি পর্বতের গর্ভে সত্যিই আগুন আর গলিত লাভা আছে কিনা তদন্ত করা। আর তার দ্বারা সে-অঞ্চলের অধিবাসীদের বড় রকমের কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা তা জানার দায়িত্বও আমার ওপরে বর্তছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মি. ওয়ার্ড-ই সরবরাহ করবেন।’

মি. স্থিথ আমার কথাগুলো এমন মনযোগ সহকারে শুনলেন যাতে করে ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও যে খুবই ভাবিত বোঝা গেল। গ্রেট আইরির রহস্যের কিনারা করা যে কেবলমাত্র আমারই অত্যাধি অগ্রহ তাই নয়। তাঁর অগ্রহও কোনো অংশে কম নয়।

‘মি. স্ট্রক, শুনে খুশি হলাম যে ব্যাপারটা ওয়াশিংটনের কর্তব্যজ্ঞদেরও ভাবিয়ে তুলেছে। আপনি জানেন কিনা জানি না, আমি এখানকার কয়েকটা খামারের মালিক। তার ওপর এ-অঞ্চলের মেয়রও বটে। তাই ব্যাপারটা নিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।’

‘মি. স্থিথ, আপনি তবে এক ঢিলে দু-দুটো পাখি মারতে চাইছেন, তাই না? যাক, এবার বলুন তো গ্রেট আইরির যে-সহস্য আজ সবার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা কি আপনার বিচার-বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, গ্রেট আইরি সত্য সত্যই ভয়ঙ্কর বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে?’

‘এর ব্যাখ্যা করা বাস্তবিকই অসম্ভব। গ্রেট আইরি কিন্তু আগ্নেয়গিরি নয়।’

‘এটা কি আপনার বিশ্বাস? তাই যদি হয় তবে পায়ের তলার মাটি কেন বার বার কেঁপে উঠেছিল?’

‘মি. স্থিথ প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে বসলেন, ‘আচ্ছা, মাটি কি সত্যিই কেঁপে উঠেছিল? পাহাড়ের শিখর থেকে যখন লকলকে আগুন বেরোচ্ছিল আমি তখন মাইল খানেক দূরবর্তী খামারবাড়িতে ছিলাম। কই, মাটি কাঁপছিল বলে অনুভব করিনি।’

‘মি. ওয়ার্ডের কাছে পাঠানো রিপোর্টগুলিতে—’

‘হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই বটে। প্রতিটা রিপোর্টেই মাটি কাঁপার উল্লেখ আছে, তাই তো। দেখুন, রিপোর্টগুলো তৈরি হয়েছে মানুষের আতঙ্কের ব্যাপার-স্বাভাবিকতার ওপর ভিত্তি করে। আমার রিপোর্টে কিন্তু মাটি কাঁপার উল্লেখ নেই।’

‘সবই তো বুঝলাম। কিন্তু পাহাড়ের শিখর ছাড়িয়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত আগুন উঠেছিল, ঠিক কিনা? এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?’

‘হ্যাঁ, এতক্ষণে জব্বর একটা প্রশ্ন করেছেন সাহেব। আমি নিজের চোখে জ্বলন্ত আগুনের শিখা দেখেছিলাম। শুধু কি তাই? আগুনের আলোয় আকাশে একটা বিরাট অংশ লাল হয়ে গিয়েছিল। আগুন ছাড়া বিচিত্র একটা আগুয়াজও হচ্ছিল থেকে থেকে। আর সেটা বেরোচ্ছিল পাহাড়টার গব্বর থেকে। বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে তার তুলনা চলতে পারে।’

‘চমৎকার! মি. স্থিথ মনে করে দেখুন তো, অত্যাস্র্য আগুয়াজটা হওয়ার সময় ডানার ঝটপটানির মতো কোনো আগুয়াজও কি শুনতে পেয়েছিলেন? খেয়াল রাখবেন, পাহাড়টা থেকে যত রকম শব্দ বেরিয়েছে এটা তাদের সবার চেয়ে অদ্ভুত ও গুরুত্বপূর্ণ।’

‘হ্যাঁ, আপনার কথাই সত্য। মনে হচ্ছে ডানার ঝটপটানি শুনছিলাম বটে। তবে একটা কথা, আগুন নিভে গেলে

উড়ে যায় সেরকম ভয়ঙ্কর শব্দ করে ডানা নাড়তে পারে তা-ও আমার অজানা। একটা কথা কি জানেন মি. স্ট্রক, অতিকায় কোনো পাখির অস্তিত্ব যদি থাকতই তবে অবশ্যই পাহাড়ের চূড়ার ধারে কাছে তাদের উড়তে দেখা যেত। গ্রামবাসীদের এমন কি আমার চোখেও অবশ্যই পড়ত। সত্য বলতে কি সাহেব, গ্রেট আইরির এত রহস্যের কিনারা করা সম্ভব নয়।'

'মি. স্থিথ, অসম্ভবকে সম্ভব, মানে রহস্যভেদ করব বলেই আমি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু আপনার সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে তো আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার নয়।'

'আমার সার্বিক সহযোগিতা আপনি প্রত্যাশা করতে পারেন। যদি সম্ভব হয় তবে চলুন না কাল থেকেই আমরা কাজে লেগে পড়ি।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব! কালই তবে রহস্যভেদের কাজে লেগে পড়া যাবে।'

পরদিন প্রত্যুষেই যাতে বেরিয়ে পড়া যায় তার তোড়জোড় শুরু করে দিলাম।

আমাদের প্রথম কাজ দুজন পথ প্রদর্শক জোগার করে গ্রেট আইরির শিকরে আরোহণ করা। দুজন পাওয়াও গেল। ঐ দুজন মিস্টার মিচেল আর অন্যান্য অভিযাত্রীদের পর্বতারোহণের কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কিন্তু দুর্লভ গ্রেট আইরির ব্যাপারে কেউই উৎসাহী হুন নি। খাড়া ও মৃণ পাহাড়টার গা-বেয়ে ওঠার সাধ্য অন্য কোনো প্রাণীর থাকলেও মানুষের অন্তত নেই, তাই গ্রেট আইরির ব্যাপারে সামান্যতম উৎসাহও দেখা দেয়নি।

সকাল হতে না হতেই গাইড দুজনের পিছন পিছন আমরা হাঁটা জুড়লাম। পথে যেতে যেতে মি. স্থিথ যা শোনালেন তাতে কিছুটা আশাবশিত হয়ে উঠলাম। কিছুদিন আগে নাকি গ্রেট আইরির গা থেকে একটা পাথরের টাই হঠাৎ খসে পড়েছে। তার ফলে পাহাড়ে ওঠার এবং তা গহ্বর দিয়ে ভেতরে ঢোকা কিছুটা সহজ হতে পারে।

গাইড দুজনের মধ্যে একজনের নাম হ্যারি হর্ন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আর দ্বিতীয় জন বছর পঁয়ত্রিশের জেমস ব্রাক। উভয়েই স্থানীয় অধিবাসী।

আমাদের গাড়টাকে জোর কদমে টেনে নিয়ে চলেছে দুটো তেজি ঘোড়া। এতে করেই গ্রেট আইরির পাদদেশে পৌঁছে দেবার কথা। দুপাশে গভীর পার্বত্যবন, তারই মাঝ দিয়ে আঁকারাকা পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। সারাদিন ঘনঘন চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে খানাপ্রদ ডিঙিয়ে তেজি ঘোড়া দুটো সন্ধ্যার কাছাকাছি আমাদের প্রেক্ষাগ্রস্ত গার্ডেনে পৌঁছে দিল। টাউন মেয়রের খামার বাড়িতে আরাম আয়েসের মধ্য দিয়েই রাত কাটলাম। গৃহকর্তা মি. স্থিথের বন্ধু। সহৃদয় ব্যক্তি।

আমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে গৃহকর্তা উদ্বেলকণ্ঠ বললেন, 'এখান থেকে পাহাড়টার আগাগোড়া দেখা যায়। কিন্তু কোনো শব্দ আজ অবধি আমার কানে আসে নি। আর আঙনের গোলা? না, তাও দেখি নি। আর যদি বলেন ডাইনিটাইনি গ্রেট আইরির উদরে আশ্রয় নিয়েছিল, মন্ত্র আওড়ে ভূত-প্রেত নাচাচ্ছিল তবে মনে করতে পারেন তারা আজ বে-পাতা হয়ে গেছে। তাদের কাছে গ্রেট আইরির দরকার ফুরিয়ে গেছে।

'ডাইনি বা ভূত-প্রেত যা-ই হোক না কেন তাদের কাজকর্মের কিছু না কিছু উপকরণ সেখানে পড়ে থাকবেই।' মি. স্থিথ মুখ বিকৃত করে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

সকাল হল। পরের দিন। উনত্রিশে এপ্রিলের সকাল। পূর্ব-আকাশ ফর্সা হতে না হতেই আমরা গ্রেট আইরির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার আগে আগে পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছে উইলডন খামার-বাড়িতে রাট্রিকু কাটিয়ে দেব। ঘন ঘন চড়াই-উৎরাই, জঙ্গল আর টুকরো টুকরো চাষের জমি ডিঙিয়ে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। বিকেলের দিকে ছয় মাইল দূরবর্তী ব্লু-রিজের পুরো পাহাড় শ্রেণী চোখের সামনে ভেসে উঠল। দেখলাম, হাজার সাতেক ফুট উঁচু র‍্যাকডোমের চূড়াটা মেঘের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।'

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে মি. স্থিথকে প্রশ্ন করলাম, 'ওই চূড়াটা কখনোদিন উঠেছেন কি?'

মি. স্থিথ ঘাড় ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন, 'বলেন কী সাহেব! যারা ওই চূড়ায় উঠেছে তাদেরই নাকি চূড়ান্ত দুর্ভোগ আর কষ্টভোগ করতে হয়েছে।'

'একটা কথা, ওই চূড়ায় দাঁড়ালে গ্রেট আইরির ভেতরের অংশ দেখা যায় না?'

'চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন সাহেব! কিন্তু, 'তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে গাইড হ্যারি হর্ন বলে উঠল, 'আমি নিজেও কৌতূহলবশত চেষ্টা করেছিলাম। আসলে গ্রেট আইরির এত উঁচু প্রাচীর ডিঙিয়ে গর্তটার ভেতরে নজর যায় না।'

মি. স্থিথ গর্বভরে বলে উঠলেন, 'পা চালিয়ে চল তো! আজ পর্যন্ত কেউ যা পারে নি তাকেই আমি সম্ভব করব। কেউ যা দেখতে পায় নি তাই দেখব।'

উইলডন খামার-বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন ঘড়িতে পাঁচটা বাজে। সন্ধ্যা হতে তখনও ঢের দেরি।

সেখানে চাষিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে একজন বলল, 'স্যার, গ্রেট আইরি অনেকদিন ঘুমের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। কোনোরকম ফোঁসফাঁসই করছে না। আর কোনোদিন জাগবে বলেও মনে হয় না।'

প্রসঙ্গটাকে আর দীর্ঘ না করে নাকেমুখে কিছু খাবার গুঁজে গুয়ে পড়লাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটেই আমরা সদলবলে গ্রেট আইরির গা-বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। এর উচ্চতা বড়জোর হাজার পাঁচেক ফুট। অ্যালিখানির মানুষ পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় হরদুম ওঠানামা করে। আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুট ওপরে তো রয়েছি। তাই পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারটা খুব বেশি কষ্টকর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এ-ও সত্য যে, পথের বাধা প্রচুর। খানাপ্রদ ডিঙিয়ে, ডাইনে-বামে বেকে, গুরপথে হাজির হতে হবে বাঙ্কিত সে

পর্বতশিখরে। সবচেয়ে বড় কথা, পাহাড়টা খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে। এগোতে গিয়ে যদি আঁকড়ে ধরার মতো কোনো কাঁজ না থেকে তবে ঘুরপথ অবলম্বন করতে হবে। মোন্দা কথা, হাজারো স্বপ্ন স্বামেলার মোকাবেলা করে তবেই একটু একটু করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। পায়ে পায়ে এর গায়ে বহু অজ্ঞাত বিপদ ঘাপটি মেরে রয়েছে। আমাদের গাইড দুটোও গ্রেট আইরির ব্যাপার-স্বাপারে তেমন ওয়াকিবহাল নয়। পথের বিপদ কোনপথে, কোনরূপ নিয়ে দেখা দেবে কিছুমাত্রও ধারণা তাদের নেই। তবে হ্যাঁ, মি. স্মিথ একটা আশার কথা শুনিয়ে রেখেছিলেন, পাহাড়টা থেকে একটা বড়সড় পাথরের চাঁই খসে পড়ছে।

আমি পথ পাড়ি দিতে দিতে বললাম, 'মি. স্মিথ, যত কষ্টই হোক আর সময় যতই লাগুক না কেন এর হিন্দে আমাকে করতেই হবে। তাছাড়া ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও নয় যে, আমি হতশ হয়ে ফিরে যাই।' ওদিকে মি. ওয়ার্ড গ্রেট আইরির প্রকৃত রহস্যটা কি তা শোনার জন্য অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন।

'অবশ্যই-অবশ্যই। দেখুন মি. স্ট্রক, যদি পাহাড়ের শিখরদেশ দিয়ে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হই তবে পাহাড়ের ফাটল দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেও বিধা করব না, ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি।' মি. স্মিথ বললেন।

'মি. স্মিথ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের দিনের মধ্যে আমরা অভিযান শেষ করতে পারছি না। খাবারের খোলাটা—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মি. স্মিথ বললেন, 'মি. স্ট্রক, খাবারের জন্য চিন্তা নেই। বনে পশু-পাখি রয়েছে, শিকার করে নিলেই হল। আর অতিক্রম্য উনুনের আঁচ তো—'

'উনুন? এখানে আবার উনুন কোথায় পেলেন মি. স্মিথ?'

'আরে সাহেব, এই তো সেদিন আগুনের শিখায় আকাশ রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। আপনার কি বিশ্বাস, সে আগুন একেবারে নিভে গেছে? তাই যদি হয় তবে তো বলতে হয় সেটা আগুয়ে পর্বতই নয়। আমি কিন্তু জোর দিয়েই বলছি সাহেব, আগুন সেখানে আছে, অবশ্যই আছে। তার চুড়ায় আগুনের শিখা যখন দেখা গেছে তখন আগুন কখনও না থেকে পারে?'

এর আগে আমার মনে ভাব ছিল, নেহাৎ ওপরওয়ালার আদেশ পালন করতে চলেছি। অর্থাৎ একবারটি চেষ্টা করে দেখাই যাক না পাহাড়টার রহস্যটা কি। কিন্তু, এখন ধরতে গেলে প্রতিজ্ঞা করেই ফেললাম, গ্রেট আইরির উদরে কি রহস্য ঘাপটি মেরে রয়েছে তা আমাকে উন্মোচন করতেই হবে।

আমরা গাইড দুজনকে অনুসরণ করে, বার বার বাঁক ঘুরে এগোতে লাগলাম। এবার পাহাড়ের গায়ের একটা ফাটল নজরে পড়ল। সেটা পাথরের গা-বেয়ে সোজা শিখরের দিকে উঠে গেছে। আমরা সেটাকে আঁকড়ে ধরে ধীর-মহুর গতিতে ওপরে উঠে যেতে লাগলাম। মাঝে-মাঝে পরিস্থিতি এমন হতে লাগল যে, হামাগুড়ি দিয়ে, এক ইঞ্চি করে করে এগোতে হচ্ছে। শীতের মধ্যেও গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

মি. স্মিথ একটু দম নিয়ে বললেন, 'এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল, কেন এতদিন গ্রেট আইরিতে উঠতে অগ্রহী হয়নি।'

'লাভই বা কী হত? কঠোর পরিশ্রম করে উঠে লাভই যদি কিছু না হবে, তবে কেনই বা উঠতে অগ্রহী হবে বলতে পারেন সাহেব? আর আমাদের কথা যদি বলেন তবে বলব, নিতান্ত দায়ে পড়ে—'

'এক্কেবারে ঠিক কথাই বলেছেন মি. স্ট্রক। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কতবার ব্ল্যাকডোমের শিখরে উঠেছি। কিন্তু এমন ফ্যাসাদে কোনোদিনই পড়তে হয় নি।'—হ্যারি হর্ন বলল।

'একের পর এক বাধা যেভাবে হাজির হচ্ছে তাতে করে চুড়ো অবধি উঠতে পারব বলে তো নিঃসন্দেহ হতে পারছি নে।' জেমস তার কথা সমর্থন করতে গিয়ে বলল।

আমাদের চারজনের মধ্যে জেমস ব্রাক খুবই চটপটে, উপস্থিত বুদ্ধিও রাখে যথেষ্টই। তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমি আর মি. স্মিথ তো হয়রানির চূড়ান্ত হতে লাগলাম। রীতিমতো হাঁপ ধরে গেল।

আমি কিন্তু শত কষ্ট স্বীকার করেও এটুলির মতো তার গায়ে গায়ে লেগে রইলাম। আসলে এটা আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। জেমস ব্রাক, যে পথে আর যখন যেখানে পৌছোচ্ছে প্রাণের মায়ী তুচ্ছ করে আমি ঠিক সেখানে হাজির হয়ে যেতে লাগলাম। কয়েকবার তো পা হড়কে পড়ে যেতে যেতে কোনোক্রমে আত্মরক্ষা করতে পারলাম। কিন্তু মরণাটনের ফার্স্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নাদুনুদুস মি. হিলিয়াস স্মিথের জন্যই সে মুহূর্তে আমার যত ভাবনা। তবে তাঁর জন্য আমাদের গতি যাতে মহুর না হয়ে পড়ে সে জন্য তিনি প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তখন দুপুর হতে চলেছে। ঘড়িতে বেলা এগারোটো। হিসাব করে দেখলাম, খাড়া দেওয়ালটার কাছেই আমরা পৌছোতে পারি নি।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। বারোটো প্রায় বাজে। এখন কয়েক শো ফুট উঠলে তবে বাঙ্কিত চুড়োয় পৌছোতে পারব।

আমরা সবাই একমত হলাম, পেটে দানাপানি না দিলে আর চলছে না। আহালাদি সেরে আবার পূর্ণ উদ্যম গ্রেট আইরির সঙ্গে লড়াই শুরু করা হবে।

নাকেমুখে কিছু গুঁজে আবার পাহাড়ে ওঠার ভোড়জোড় শুরু করলাম। মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে শিখরটা অবধি চোখ দুটো বুলিয়ে নিতে লাগলাম। বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। আপন মনে বলে উঠলাম, 'হায় ঈশ্বর! এত পরিশ্রম শেষপর্যন্ত পঞ্চমের পরিণত হবে না তো? চারদিকে ছোট-বড় যেসব আলগা পাথর ছড়িয়ে রয়েছে অজান্তে তাদের একটাকে আঁকড়ে ধরলে বা পা রাখলে আর দেখতে হবে না, একেবারে খাদের ভেতরে আছাড় খেয়ে

পড়তে হবে। পাহাড়ের এরকম গাকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'ব্লাইড' বলে। ব্লাইড মানে গড়াই। দেওয়ালটার মধ্য দিয়ে ওঠার আর কোনো পথই নেই।

ফ্যাকাশে মুখে হ্যারি তার বন্ধু জেমস ব্রাককে বলল, 'এবার কলিজা শুকিয়ে যাবার উপক্রম হবে!'

পাহাড়টার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই জেমস ব্রাক চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমিও তো তাই ভাবছি!'

তাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনেই ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

এ যে সর্বশেষ কাণ্ড! তবে কি ফিরেই যেতে হবে? রহস্যের কিনারা করা তো দূরের ব্যাপার, পাহাড়টার শিখর অবধি উঠতেই পারি নি এমন কথা মি. ওয়ার্ডকে মুখ ফুটে বলতে হবে ভেবেই আমার শরীর অবশ হয়ে আসতে লাগল। তার চেয়েও বড় কথা, আমার ভেতরের কৌতুহল নামক দৈত্যটা যে প্রতিনিয়ত আমাকে উত্তেজিত করে চলেছে, তাকে দমনই বা করব কি করে?

দ্বিধা ঘনত্ব ভূগতে ভূগতে ভাঙা মন নিয়ে গাইডদের অনুসরণ করে চললাম। তাদের চোখে-মুখেও দ্বিধার ছাপ সুস্পষ্ট। আগের মনের সে দৃঢ়তা আর নেই। গ্রেট আইরিশ শিখরে আরোহনের সাফল্য নিয়ে সংশয় দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে।

আমরা মানসিক দৃঢ়তা হারালেও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম না। হর্নকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ব্ল্যাকডোম পর্বতশৃঙ্গটা এবার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। সামনে এখনও বহু পথ পড়ে রয়েছে। পায়ের গাঁট দুটো ব্যথা করতে লাগল। শরীর আর চলতে চাইছে না। এমন পরিস্থিতিতে যে কি করে আরও দু শো ফুট পাড়ি দিলাম তা আমিই জানি। আর সে যে কী কষ্ট তা বলে বোঝাতে পারব না।

আরও সামান্য এগোতেই দেখলাম, পাথর ফেটে হাঁ হয়ে রয়েছে। গাঁইতি, শাবল বা কুড়ুল দিয়ে ঘা মেরে পাহাড়ের গা থেকে পাথরের চাঁই যেন খাবলে তুলে নেওয়া হয়েছে।

জেমস ব্রাক এবড়ো খেবড়ো জায়গাটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই কেটে কেটে বলতে লাগল, 'এ পথে, হ্যাঁ এ পথেই গ্রেট আইরিশ গা থেকে পাথরের চাঁই আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।'

'হ্যাঁ, কথটা ঠিকই বটে। তবে পথ যখন তৈরি হয়েই রয়েছে তখন সে পথই অবলম্বন করা যাক।' শেষপর্যন্ত তারা করলও তাই।

এবার পর্বতারোহীদের গতি দ্রুততর হল। দুপুর গড়াতে না গড়াতেই তারা ব্লাইড নামক অঞ্চলটার শেষ প্রান্তে উঠে গেল।

এবার আরও কিছুটা পর্বতারোহীরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল আরও শো খানেক ফুট ওঠা বাকি। এবার নতুনতর ও সর্বশেষ বাধা শুরু হল। একেবারে খাড়া প্রাচীর পুরো একশো ফুট ওপরে পর্যন্ত উঠে গেছে। মসৃণ একটা চোঙ যেন তাদের চোখের সামনে সদৃশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হ্যারি হর্ন আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'বাস, এ পর্যন্তই। আর কোনোদিক থেকেই ওঠা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা, পাথরের চাঁইটা এদিক দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে নেমেছিল। অতএব যদি এদিক দিয়ে ওঠা সম্ভব নাই হয় তবে আর অন্য কোনো দিক দিয়ে ওঠা যাবে না।'

মিনিট দশকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আমি একটু দম নিয়ে নিলাম। আবার শুরু হল পাহাড়ে ওঠা, হাড়ভাঙা পরিশ্রম। কোনোক্রমে পাথরের দেওয়ালটার গায়ে হাজির হতে পারলাম। গ্রেট আইরিকে এত কাছ থেকে দেখা সত্ত্বেও মনে হল যেন দারুণ কোনোকিছুকে দেখছি। 'এতে যেন বাস্তবতার ছোঁয়া নেই, একেবারেই কল্পনার সামগ্রীর মুখোমুখি আমি দাঁড়িয়ে।

খুবই সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পাথরের খাড়া দেওয়ালটার চারদিকে এক চক্র মেরে হতাশ মনে সে-জায়গায়ই ফিরে এলাম। না, পাথর বেয়ে ওঠার মতো, হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরার মতো সামান্য ঝাঁজও চোখে পড়ল না। পাহাড়ের গা যে এমন তেলতেলে মসৃণ হতে পারে, চোখে না দেখল অনুমান করা সম্ভব নয়। আর সবদিকেই কল্পনার প্রাচীরের মতো উচ্চতা ঠিক এক শো ফুট।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. স্থিথ বলে উঠলেন, 'ধূং! আগ্নেয়পর্বত-টর্বত বাজে কথা! আর ওটা জ্বালামুখও নয় মি. স্ট্রক।'

'নাই বা হল আগ্নেয় পর্বত। হলেই বা কি আর না হলেই বা কি! এতটা সময় ধরে লাড়াই করে চলেছে, আঙন তো দূরের কথা এক ছিটে ছাইও নজরে পড়ল না। কোনো আওয়াজও শুনতে পেলাম না। অতএব অগুণপাত বা লাভা উদগীরণের ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকার কোনোই কারণ দেখছি না মি. স্থিথ।'

আবার গোড়া থেকে পাহাড়টার শিখরদেশ পর্যন্ত চোখের মণি দুটোকে বুলিয়ে নিয়ে নিঃসন্দেহ হলাম, শিকরটার পরিধি বারো শো থেকে দেড় হাজার ফুটের মধ্যে। কিন্তু দেওয়ালটা কতখানি পুরু জানা সম্ভব হলে উদরের গহ্বরটার পরিধি সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা অন্তত করে নিতে পারতাম।

মুহূর্তের জন্য ঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। তিনটে বাজে। মি. স্থিথ রীতিমতো ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, 'মি. স্ট্রক, শুধুশুধু হাঁ করে পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে থেকে সময় নষ্ট করে লাভ কি? উদ্দেশ্য সিদ্ধ যখন কিছুতেই হবার নয় তখন চলুন দিনের আলো থাকতে থাকতে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাই। নইলে প্রেজ্যাক্ট গার্ডেনে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।'

আমি তাঁর কথার কোনো জবাব না দিয়ে তেমনি স্থবিরের মতোই দাঁড়িয়ে রইলাম।

মি. স্থিথ এবার অধিকতর গলা চড়িয়ে বলতে লাগলেন, 'সে কী সাহেব! কিছু বলছেন না যে! চলুন, নামা শুরু করা যাক! বুটমুট দেরি করে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরতে হবে যে!'

আমি যে কি বলব, কি করব নিজেই ভেবে উঠতে পারলাম না। আসলে আমার অবস্থা খুবই সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। উদ্দেশ্য বার্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে, লক্ষ্য পৌছাতে না পেরে ফিরে যেতেই হবে! অথচ কৌতূহলরূপী নৈত্যটা ভেতর থেকে উকানি দিয়ে চলেছে। শিরা-উপশিরায় তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম, অতীষ্টসিদ্ধ, রহস্যের কিনারা না করে কিছুতেই ফেরা সম্ভব নয়। কথায় আছে, ঝোক বাধার সঙ্গে পান্না দিয়ে বেড়ে চলে। আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ঝোক চেপে গেলেও করার তো কিছু নেই। পাহাড়টাকে কূপোকাৎ করে ভেতরে উঁকি দেব নাকি? অসম্ভব! অসম্ভব! একেবারেই অকল্পনীয় কাজ। যা কিছুতেই সম্ভব নয় তা নিয়ে বৃথা কালক্ষয় করে কি-ই বা লাভ? অনন্যোপায় হয়ে নীর্যশ্বাস ফেলে গ্রেট আইরির দুর্লভ শিখরটার দিকে শেষবারের মতো এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে সঙ্গীদের পিছন পিছন নামতে লাগলাম। পথ যেখানে নেই, সেখানে তো নামার সুবিধা আরও বেশি। মোটেই কষ্ট হল না। ব্লাইড বেয়ে হুড়হুড় করে নেমে এলাম। পাঁচটার মধ্যেই পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলাম।

আমাদের দেখে গ্রামের লোকজন অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে ছুটোছুটি করে চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই সমস্তর বলে উঠল, 'কেমন হল? পাহাড়টার উদরে ঢুকতে পারলেন না, এই তো?'

মি. শ্বিং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'পাহাড়টার ভেতরে যে ঢুকবে সেখানে কিছু থাকেই নেই। চাষাভুষাদের ব্যাপার স্যাপারই এরকম। কথা নেই বার্তা নেই, আশুন, ধোঁয়া আর ভূমিকম্প বলে জিগির তুলেছে।'

প্রেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়রের বাড়িতে রাতি কাটলাম। ঘুম কিছুতেই এল না। একবার ভাবলাম, পর্বতারোহীদের আর একটা দল জোগার করে ফের পাহাড়ে উঠব। মুহূর্তেই ভাবলাম, তাতে ফয়দাই বা কি? গ্রেট আইরি যে রূপ চাক্ষুষ করে এসেছি পাখি ছাড়া কারো হিম্মৎ নেই তার শিখরে ওঠে। অনেক ভেবেচিন্তে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, এত ঝামেলায় দরকার নেই। ফিরে গিয়ে মি. ওয়ার্ডকে সবকিছু খোলসা করে বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি শেষপর্যন্ত কোন মতলব দেন, দেখা যাক।

উপায়ান্তর না দেখে পরের রাতে ওয়াশিংটনগামী ট্রেন ধরলাম।

গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করা সম্ভব হল না। তবে? তবে কি রহস্যটা অনুদঘাটিতই থেকে যাবে। নাকি অভাবনীয় কোনো নতুন ঘটনার মাধ্যমে সে-রহস্যের জাল হঠাৎ করে সরে গিয়ে সত্য ঘটনাটা আচমকা উদঘাটিত হয়ে যাবে?

খুবই সত্য যে, উত্তর ক্যারোলিনার এতগুলো প্রাণীর জীবন অত্যাশ্চর্য ওই রহস্যটার ওপরই নির্ভর করছে।

আমার ওয়াশিংটনে ফিরে আসার প্রায় পনের দিন পরে নতুন একটা ঘটনার মাধ্যমে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। তাকে অবশ্য একেবারে নতুন কোনো ঘটনা বলা যাবে না। তবে গ্রেট আইরির মতোই যে সমান গুরুত্বপূর্ণ একথা অস্বীকার করার নয়।

মের মাঝামাঝি খবরটা চারদিকে চাউর হয়ে গেল। পেনসিলভেনিয়ার সবগুলি সংবাদপত্রের পাতায় একটা ঘটনাই ছাপা হল। প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে।

যেসব পথ ফিলাডেলফিয়া থেকে চারদিকে চলে গেছে সেগুলোর ওপর দিয়ে উষ্কার বেগে কি যেন দ্রুতবেগে ছুটে চলে যায়। কিন্তু সেটা কতবড় আর দেখতেই বা কেমন কেউ-ই তার সঠিক বর্ণনা দিতে পারে না। যন্ত্রযানটা এতই দ্রুত ধেয়ে যায়, যায় ফলে মনে হয় ধুলোর ঝড় চলেছে। আমতা আমতা করে সবাই বলল, 'যন্ত্রযানটা এক বিশেষ ধরনের মোটরগাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু জনগণের লাগামহীন কল্পনার মাধ্যমে সেটা অত্যাশ্চর্য অবিস্কাশ্য কোনো একটি বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল।'

যখনকার ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে তখনও পেট্রোল, বিদ্যুৎ বা বাষ্পচালিত মোটরগাড়ি প্রভৃতি ষাট মাইলের বেশি গতিবেগে ছুঁতে পারত না। এমন কি আমেরিকা ও ইউরোপের এক্সপ্রেস ট্রেনও এত জোরে চলতে পারত না। কিন্তু রহস্যজনক এ যানটা নাকি এচয়ে দ্বিগুণ জোরে ধেয়ে যায়।

আচমকা একানা শকট যদি এত দ্রুতবেগে ধেয়ে যায় তবে দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। ফলে কোনো পথই নিরাপদ থাকল না। তবে সেটা যে ধেয়ে আসছে তা তার গুর গুর আওয়াজের মাধ্যমেই অনুমান করা যেত। চলে যাওয়ার সমস্ত ঘর্ষিঝড় পিছনে ফেলে চোখের পলকে সেটা বে-পাত্তা হয়ে যেত। তার আওয়াজ পেয়েই মানুষ থেকে শুরু করে পশু-পাখি পর্যন্ত যে যেখানে থাকত সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে উর্দ্ধশ্বাসে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুঁতে। কিন্তু হাওয়ার টানে মানুষ ও পশু-পাখি কম মারাও যেত না।

অত্যাশ্চর্য কাহিনীটার সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ হচ্ছে এত দ্রুত ধেয়ে যাওয়া যন্ত্রযানটার সামান্যতম চাকার দাগ মাটিতে পড়ে না। কেন? এমন অবিস্কাশ্য ব্যাপার কি করে সম্ভব হয়? এ ব্যাপারটুকুকে খবরের কাগজওয়ালারা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন এক রোমহর্ষক পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করাতে লাগল যে, মানুষ ভয়ে রীতিমতো কঁকড়ে যেতে লাগল।

তবে হ্যাঁ, নিউইয়র্ক হেরল্ড পত্রিকা অবশ্য লিখল, কোনো বস্তু প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে যাওয়ার সময় তার ওজন অনেকাংশে লাঘব হয়ে যায়।

অবিস্কাশ্য এ-যন্ত্রযানটার ব্যাপার নিয়ে চারদিকে রীতিমতো হৈ-হুটগোল শুরু হয়ে গেল। বিপজ্জনক এ-যানটাকে বন্ধ করে দেওয়া হোক। ঠিক আছে বন্ধ না হয় করাই হবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, বন্ধ করবেটা কে? কাকে পাকড়াও করলে অদ্ভুত যানটা আর রাস্তায় হামলা হুজ্জতি করবে না? সেটার মালিকই বা কে? আর আসেই বা কোথেকে? গন্তব্যস্থলই বা কোথায়? চোখের পলকে ধেয়ে-যাওয়া শকটটা সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন ঝাপসা দেখায়, যেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উষ্কার বেগে ধেয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রযানটা কোন ইঞ্জিনের সাহায্যে ধেয়ে যায় তাই কেউ অনুমান করতে পারছে না।

বন্ধুকের গুলি ব্যারেল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যেমন পিছনে একরাশ ধোঁয়া ফেলে যায়, সেটাও যদি তেমনি

মুদ্র পেট্রোলের গন্ধ আর ধোঁয়া ছড়িয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যেত, তবে অন্তত কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। কিছু অত্যাচার্য যানটা থেকে পেট্রোলের গন্ধ তো দূরের ব্যাপার অন্য কোনো তেলের গন্ধও পাওয়া যায় না। আবার ধোঁয়া বা বাষ্পও নির্গত হয় না। তবে? তবে কি সেটা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে? অজ্ঞাত কোনো অ্যাকুমুলেটরে নতুন কোনো কেমিকেল দিয়ে অতি শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে?

কথায় বলে, কল্পনার লাগাম থাকে না। তাই জনসাধারণের কল্পনা মাত্রা ছাড়াতে ছাড়াতে নিত্যনতুন মজাদার গল্প তৈরি হয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিশ্বাসী-দের সংখ্যাও কম দেখা গেল না। সে-যন্ত্রটার মালিক ও চালক নাকি স্বয়ং শয়তান, এরকম গল্পও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। আর তার যাত্রী নরকের ভূত-প্রেতরা। পরলোকের ব্যাপার-সত্যতা বলেই সেটা প্রেতচ্ছায়ার মতো মিলিয়ে যেতে পারে, নজরে আসে না। মানুষ এমন কি শক্তি ধরে যে সেটাকে রূপে দেবে?

হোক না শয়তানের ব্যাপার! শয়তান বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? প্রচলিত আইন কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যা খুশি করে যাবে? যানটাকে পথে নামানোর আগে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া দরকার ছিল। পারমিট তো নেই-ই, এমন কি গাড়ির নম্বর আর লাইসেন্স কিছুই নেই। মামদোবাজি পেয়েছে নাকি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ঘটায় শো দুই মাইল বেগে গাড়ি হাঁকানোর লাইসেন্স শয়তানকে তো দূরের ব্যাপার, কোনো মানুষকেই আজ অবধি দেওয়া হয় নি। তাই সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হতে লাগল, মারাত্মক বেগে ধাবমান গাড়ির চালকের মুখোশ খুলে প্রকৃত ব্যাপারটা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হোক। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একাজটা অবশ্যই করা উচিত।

না, রহস্যসম্ভারকারী যানটা কেবলমাত্র ফিলাডেলফিয়া শহরেই নয় অন্যান্য অঞ্চলেও আচমকা দেখা দিয়ে আবার নিমেষে মিলিয়ে যেতে লাগল। উত্তেজনা, চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে লাগল একের পর এক অঞ্চলে। পুলিশের প্রতি অভিযোগ আসতে লাগল জেফারসনের অদূরবর্তী মিসৌরিতে, ফ্রান্সফোর্টের নিকটবর্তী কেনটাকিতে, অ্যামভিলের অদূরবর্তী টেনেসিতে, শিকাগোর লাগেয়া ইলিশয়েত আর কোলাম্বাসের অদূরবর্তী ওহিওতে অত্যাচার্য যন্ত্রযানটা রীতিমতো সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। আর এরই ফলে জনজীবন বিপর্যয় হয়ে পড়েছে।

চারদিক হৈ হৈ রব উঠল, বাঁচাও! রক্ষা কর! একি উটোকা আপদের আবির্ভাব ঘটল রে বাবা, নিরাপত্তা সম্পূর্ণ বিঘ্নিত। জনজীবন বিপর্যয়। একদল মন্তলব আঁটল, রাস্তায় রাস্তায় পাথর আর মাটির লোা জুপাকার করে রেখে শয়তানটার জারিজুরি বন্ধ করে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য দল সেটাকে হেসে উড়িয়ে দিল। কামানের গোলার মতো যন্ত্রটা ছুটে এসে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে অনায়াসে নিজের রাস্তা করে নেওয়া তার পক্ষে কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। অন্য এক দল মন্তব্য করল, 'সামনে বাধা দেখলে সেটাকে ডিঙিয়ে যাওয়ার হিম্মত তার অবশ্যই আছে।' অন্য একদল তাদের সমর্থন করে বলল, 'অবশ্যই, শয়তানের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।'

এরা আসলে বাক্যবাণীশ। মাথায় থিলুটিলু আছে বলে মনে হয় না। অজ্ঞাত বস্তুটা যে কি তা নিয়ে ভাববার মতো মানসিকতা, ধৈর্য ও সময় তাদের কোথায়?

চারদিক যখন পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তাল-উদ্দাম হয়ে উঠছে ঠিক তখনই, মে মাসের শেষ হওয়ায় ঘটে গেল একেবারেই অবিশ্বাস্য চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা। এর মাধ্যমে এটুকু অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল যে পুরো যুক্তরাষ্ট্র অতিকায় ও অমিত শক্তিধর এক দানবের পাল্লায় পড়ে অস্থির হয়ে পড়েছে। শয়তানটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন কি দৃষ্টির অগোচরে থেকে কল্পনাতীত উৎপাত চালিয়ে যাচ্ছে। আর তার প্রতিরোধ-প্রতিকার একেবারেই অসম্ভব।

সমগ্র আমেরিকা তোলপাড় করে হতচ্ছাড়াটা হয়ত বা এবার ইউরোপে হামলা হুজুতি জুড়ে দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রের সব ক'টা খবরের কাগজে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ব্যাপারটা নিয়ে ফলাও করে প্রচার করা হল। তাদের মূল বক্তব্য—উইসকনসিনের মোটর-ক্লাব এক মোটর রেসের ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিম দিকের প্রেসরি-দু-চিয়েন থেকে যাত্রা শুরু হয়ে মিচিগান তীরস্থ মিলকি শহরের বাইরে গিয়ে রেসটা শেষ করা হয়। পৃথিবীর কোনো দেশেও এইরকম দীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা নেই। নামজাদা বহু মোটরগাড়ি এ-রেসে অংশগ্রহণ করেছিল। কেবলমাত্র মোটরগাড়িই নয়, মোটর সাইকেলও প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল। হবে নাই বা কেন? পুরস্কার যে নগদ পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। একমাত্র এতগুলো অর্থ পুরস্কারের লোভে মোটর চালকরা রীতিমতো ক্ষেপে গিয়েছিল। আর সর্বোচ্চ বেগের কীর্তির মাধ্যমে মান রাখতেই হবে। মনে করে নেওয়া হল সর্বোচ্চ গতিবেগ সম্পন্ন মোটরটা আশিমাইল বেগে ধেয়ে যাবে। অর্থাৎ দু শো মাইল পথ পাড়ি দেবে প্রায় তিন ঘণ্টায়। এই তিন ঘণ্টা যাতে পথে অন্য কোনো যান না থাকে কর্তৃপক্ষ সে ব্যবস্থা করলেন। এ-ও বলা হল প্রতিযোগিতা চলাকালীন কেউ বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হলে কেউ দায়ী থাকবে না—এরকম সতর্কবাণীও ঘোষণা করা হল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোটর রেস দেখার জন্য দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষ ছুটে এসে পথের দু ধারে ভিড় জমাল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাধা বাধা ক্রীড়া-সাংবাদিকরাও ছুটে এলেন। আর এলেন দেশ-বিদেশের বহু স্পোর্টসম্যান। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বহু জুয়াড়িও এসে ভিড় জমাল। মোটা অর্থ বাজি ধরা হতে লাগল এক-একটা গাড়ির পিছনে। মোদা কথা, যেন যুক্তরাষ্ট্র রীতিমতো তোলপাড় হতে লাগল।

সকাল ঠিক আটটায় মোটর রেস শুরু হবার কথা। এক সঙ্গে এতগুলো গাড়িকে ছাড়লে দুর্ঘটনা রোধ করার সাধ্য কারো থাকবে না। তাই অনেক ভেবে চিন্তে সাব্যস্ত করা হল দুমিনিট বাদে বাদে এক-একটা করে মোটরগাড়ি ছাড়া হবে।

প্রথম দলের দশটা গাড়িকে আটটা থেকে আটটা কুড়ির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। দুমিনিট বাদে বাদে এক-একটা করে মোটরগাড়ি ছাড়া হবে।

প্রথম দলের দশটা গাড়িকে আটটা থেকে আটটা কুড়ির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। কোনো রকম বিপর্যয় দুর্ঘটনা না ঘটলে তারা সবাই এগারোটার মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। এবার এক এক করে গাড়ি ছাড়া হল। সবশেষে দেখা গেল, মাত্র একজন প্রতিযোগী অবশিষ্ট রয়েছে। তাকেও ছেড়ে দেওয়া হল। তীরবেগে ছুটে চলেছে প্রতিটা গাড়ি। এত সতর্কতা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা যে হচ্ছে না তা-ও নয়। বহু গাড়ি পরস্পরের সঙ্গে গুঁতো-গুঁতি করে পথের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল।

তখন প্রেস্‌রি-দু-চিয়েনের ঘড়ি-ঘরে সাড়ে নটা বাজে। ঠিক তখনই মাইল দুই দূর থেকে হঠাৎ একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। আর থেকে থেকে জাহাজের সাইরেনের মতো একটা আওয়াজ তুলে সেটা রহস্য সৃষ্টি করছে।

বাস, আর যাবে কোথায়। দর্শকদের মধ্যে পালাও পালাও রব উঠল। হুড়মুড় করে চিল্লাচিল্লী করতে করতে সবাই বলতে লাগল, 'পালাও! পালাও! শয়তানটা গাড়ি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে! নরক থেকে সে নারকীয় যানটাকে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছে। এবার একেবারে ধুকুমার কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে!'

মুহূর্তে এমন ছুটোছুটি দাপাদপি শুরু হয়ে গেল যে, কে যে কার ঘাড়ে পড়ছে সে হাঁস ও কারো রইল না। সবাই একই লক্ষ্য পিতৃদত্ত প্রাণটাকে রক্ষা করা।

সবাই শুধুমাত্র এটুকুই বুঝতে পারল কোনো একটা জিনিস অভাবনীয় গতিবেগে বুঝি বাতাসের চেয়েও দ্রুতবেগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর তার গতিবেগ যত কমই হোক না কেন কিছুতেই দেড় শোমাইলের কম নয়।

রহস্যসম্বলিতকারী নরকের যানটা নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিছনে রেখে গেল কেবল এক রাশ ধোঁয়ার কুণ্ডলি। ব্যাপারটা দেখে মনে হল অতি শক্তিশালী ইঞ্জিনচালিত একটা স্থলযান। প্রতিযোগীদের দ্বিগুণ গতিবেগে ধেয়ে গিয়ে এক সময় এটা তাদের ধরে ফেলবে, তাদের সবাইকে পিছনে ফেলে অনায়াসে সবার আগেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে স্বাভাবিকতা ফিরে এল। তারা এবার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'শয়তান! সাক্ষাৎ শয়তানের কারসাজি। শয়তান না হলে এমন নারকীয় যান জোগার করল কীভাবে? তার চেয়েও তার যন্ত্রযানটা ঢের ঢের রহস্যসম্বলিতকারী।'

অন্য একজন আগ বাড়িয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন সাহেব। শয়তানটা পৃথিবীর একটা সুবিশাল অঞ্চল সন্ধান সৃষ্টি করে শেষমেশ এখানে হাজির হয়েছে তার কেরামতি দেখাতে। পুলিশের হোমরাটোমরারা ভেবেছিলেন শয়তানটা তাদের ভয়ে তার অদ্ভুত যানটাকে নিয়ে পৃথিবী ছেড়ে ফের নরকে পাড়ি জমিয়েছে। তাঁদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে শয়তানটা দিব্যি পৃথিবীর বুকেই অবস্থান করছে। প্রমাণ তো হাতেনাতেই পাওয়া গেল সাহেব।'

কয়েকজন ছুটোছুটি করে টেলিফোন বুথে গিয়ে অগ্রবর্তী প্রতিযোগীদের সতর্ক করতে শয়তান চালক ও তার নারকীয় যানটার কথা জানিয়ে দিল।

কয়েকজন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'শয়তানটা এ ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ ভেবেছে নাকি? সামনের কোনো গাড়ির সঙ্গে যদি ধাক্কা লাগে তবে কি সে নিজেকে নিরাপদ ভাবে সে নিজে কি দুর্ঘটনার শিকার হবে না?'

অন্য একজন আমতা আমতা করে বলল, 'কারো সঙ্গে ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, খুবই ঘাঘু ড্রাইভার না হলে এমন তীরবেগে গাড়ি হাঁকাতে উৎসাহী হয়, নাকি হওয়া সম্ভব? তবে হ্যাঁ, শয়তান বা মানুষ যাই হোক না কেন, বৃকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হবে।'

সভা ব্যাপারটা ভাববার মতোই বটে। কর্তৃপক্ষ তো আগেভাগেই ফরমান জারি করে দিয়েছিল, একমাত্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী গাড়িঘোড়া বা অন্য কোনো যানই প্রতিযোগিতা চলাকালীন এ-পথে যেথে পারবে না। তবে? কোন অধিকারে শয়তানটা নিষিদ্ধ পথে গাড়ি চালিয়ে কেরামতি দেখাতে গিয়ে হামলা হুম্জতি জুড়ে দিয়েছে?

প্রতিযোগীরা টেলিফোনের মাধ্যমে আতঙ্ক সম্বলিতকারী নারকীয় যানটার খবর পেয়ে যথা সময়েই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তাই চুফটের মতো লম্বা একটা যান প্রবল গতিবেগে তীব্র আওয়াজ তুলে মুহূর্তের মধ্যেই সবাইকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তবে তাকে অদৃশ্য বলাই ভাল। আর কোনো রকম ধোঁয়া কিন্তু কারোরই নজরে পড়ল না। একটু আগে যাকে ধোঁয়া বলে সবার ভ্রম হয়েছিল সেটা আদৌ ধোঁয়া নয়, ধুলোর মেঘ।

মিলকিতে টেলিফোন মারফৎ নারকীয় যানটার উপস্থিতির খবর পৌঁছে গেল। ব্যাস, ব্যালিকেড তৈরির প্রকৃতি চলতে লাগল। পাথরের চাঁই, গাছের গুঁড়ি, মাটির ঢেলা প্রভৃতি এনে রাস্তার ওপর জড়ো করতে লাগল। ব্যাস, এবার কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এমন কোনো যানই নেই যা জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই চলতে পারে। অতএব যত শক্তিশালী যানই হোক না কেন এবার বাহাদুর ধরা দিতে বাধ্য।

আর মোটেই সময় নেই। নারকীয় যানটা চলে এলে বলে। পথের দুধারে অপেক্ষমান দর্শকরা দুক দুক বৃকে চরম মুহূর্তটা চাক্ষুষ করার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে লাগল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হিস-হিস শব্দ শোনা গেল আর ধুলোর মেঘ সবার চোখে পড়ল। হায় ঈশ্বর! শয়তানটা গাড়ির গতি কমাচ্ছে না যে! দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখা যাচ্ছে! নাকি চালক তার যানটাকে ধামাতেই পারছে না? শেষপর্যন্ত রহস্যসম্বলিতকারী যানটা শৌ করে মিলকি অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল। চোখের পলকে একেবারে বে-পাশা হয়ে গেল। তবে কি সেটা মিচিগান-হ্রদের বুকে আছাড় খেয়ে পড়বে?

খবরের কাগজের পাতা জুড়ে যখন এরকম গরম গরম খবর ছাপা হয়ে দেশে রীতিমতো আলোরন সৃষ্টি করে চলেছে ঠিক তখনই আমি ওয়াশিংটন শহরে ফিরে এলাম। বাড়ি না গিয়ে সোজা বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। তিনি দেশের বাড়ি গেছেন। তবে ধরে নেওয়া যেতে পারে তিনি খবরের কাগজের দৌলতে অবশ্যই আমার ব্যর্থতার খবরটা পেয়ে গেছেন।

আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে না পেরে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাতে লাগলাম। তবে কি গ্রেট আইরির রহস্যভেদের আশা মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দেবো? কিন্তু না, হাল ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি আরও বারোবার গ্রেট আইরির চুড়োর তলা থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয় তবুও আমার পক্ষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আর যে কেউ বিশ্বাস করুক না কেন, আমি অন্তত মানতে রাজি নই যে, গ্রেট আইরির দেওয়ালের অপর দিকে যাওয়া মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আর কিছু না হোক চারদিকে ভাড়া বেঁধে হলেও চুড়ায় পৌঁছানো সম্ভব। তা যদি না-ও হয় তবে পাথর ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তার উদরে প্রবেশ করাও একেবারে অলীক কল্পনা নয়। আজকের যুগের যন্ত্রবিদরা এর চেয়ে ঢেড়ে কঠিন বহু সমস্যার সমাধান করে ফেললেন। হ্যাঁ, একটা কথা থেকে যায়। এতে খরচের তুলনায় লাভের পরিমাণ যদি কম হয় তবে যাবতীয় অর্থ জলে ফেলার সামিল হবে বৈ কি। তখন ব্যাপারটা দাঁড়াবে, জনগণের আর আমার কৌতূহল চরিতার্থ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, তাই নয় কি?

আমার টেকের জোর খুবই সামান্য। তবে হ্যাঁ, মি. ওয়াডের পক্ষে সরকারি অর্থ ব্যয় করা সম্ভব। কিন্তু তিনি তো অনুপস্থিত।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। উপায়ান্তর না দেখে আমি কয়েকজন টাকার কুমিরের শরণাপন্ন হলাম। এতেও সমস্যা দেখা গেল। সোনার খনি আছে এরকম কোনো সম্ভাবনা না থাকলে তারা ট্যাক থেকে অর্থ খসাতে উৎসাহই বা হবে কেন? কিন্তু অ্যাগ্লাচিয়ান পর্বতশ্রেণী সোনার খনি-অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। অস্ট্রেলিয়ার বা প্যাসিফিক মাউন্টের ট্রান্সভালের সোনার খনির লোভ দেখালে তা বিশ্বাস করার মতো ব্যাপার বটে।

পনেরই জুন মি. ওয়ার্ড অফিসে ফিরে এলেন। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি জেনেও আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আমার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললেন।

আমি ব্যর্থতার কারণ বলতে গিয়ে ব্যক্ত করলাম, 'স্যার, আসলে গ্রেট আইরিকে জয় করার মতো উপযুক্ত সরঞ্জাম আমার সঙ্গে ছিল না। তাই অনন্যোপায় হয়ে,'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'সবই আমার জানা আছে মি. স্ট্রক। গ্রেট আইরিকে জয় করতে গিয়ে আপনি শুধু মরতে বাকি রয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কথা থেকে যাচ্ছে, মি. স্ট্রক শূন্য হাতে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছেন। গ্রেট আইরির উদরে যে কী কাণ্ড ঘটে চলেছে তার তিলমাত্র হদিসও করা সম্ভব হয় নি।'

আমি ফ্যাকাসে মুখে আমতা আমতা করে বললাম, 'স্যার, আগুন দেখা আমার পক্ষে সম্ভব তো হয়ই নি, কোনো আগুয়াজ টাওয়াজও স্তন্যে পাইনি।'

'এত কিছু সত্ত্বেও কি আপনার বিশ্বাস যে গ্রেট আইরির উদরে আগুন, গলিত লাভা প্রভৃতি রয়েছে?'

'স্যার, তা কি করে বলা সম্ভব, আপনিই বলুন?'

'তবে আমার বিশ্বাস আগুয় পর্বত হলেও চিরনিদ্রিত। তার ঘুম আর কোনোদিনই ভাঙবে না। সেরকম কিছু হলে এতদিন সেটা ঝিম মেরে থাকত না। লোকের মুখে মুখে যা কিছু ঘুরছে সবই মনগড়া কাল্পনিক গল্প ছাড়া কিছু নয়।'

'স্যার, সব কিছুকে ভুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলে হয়ত ভুলই করা হবে। আর প্রেজ্যান্ট গার্ডেনের মেয়র ও মরগানটন, এঁরা কিন্তু নিরক্ষর নির্বোধ নন। আর কিছু না হোক কাল্পনিক কাহিনীর পিছনে ছোট্টার পাত্র তাঁরা অন্তত নন। পাহাড়ের শিখরদেশে ছাড়িয়ে আগুনের হুকা ঠিকই দেখা গিয়েছিল। অদ্ভুত আগুয়াজও যে শোনা গিয়েছিল এ-ও খুবই সত্য। যা ঘটেছে ও রটেছে তার এক বর্ণণা মিথ্যা নয়।'

'তবে আপনি বলতে চাচ্ছেন গ্রেট আইরি আজও নিজেকে রহস্যাবৃতই রেখেছে?'

'স্যার, হুকুম পেলে আমি আজই ডিনামাইট আর গাঁইতি-শাবল নিয়ে গিয়ে গ্রেট আইরির উদরে ঢুকে যাচ্ছি। কিন্তু সমস্যা একটাই, মোটা অর্থের প্রয়োজন।'

'সবই বুঝলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে গ্রেট আইরি মৃত। ভবিষ্যতে কোনোদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলে তখন দেখা যাবে। এমনও তো হবে পারে প্রকৃতি দেবী নিজে থেকেই একদিন গ্রেট আইরির রহস্য সবার সামনে ভুলে ধরবেন।'

তাঁর কথায় আমার কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মতন হল। কাতর হয়ে বললাম, 'স্যার, আপনার দেওয়া কাজটা হাসিল না করতে পারায় আমি অন্তর্জালায় প্রতিনিয়ত জ্বলেপুড়ে থাকি হচ্ছি। তবে আবার যদি ভাবেন, আমি অপরাধমূলক কাজে উৎসাহ দিচ্ছি তবে কিন্তু আমাকে বুঝতে ভুলই করবেন। আমার বক্তব্য হচ্ছে, অপরাধীরা একটু-আধটু সামলে টামলে কাজকর্ম করুক। বেশি চাচুরি যেন না করে। আমার পরামর্শ কে-ই বা নেবে? তাই তো অপরাধীরা কাউকে তোয়াক্বা না করে তাদের কাজ করে চলেছে, আমরা তার কতটুকুই বা জানি বা জানার চেষ্টা করি?'

সম্পূর্ণ সত্য কথা। অপরাধীরা চালাকি করতে গিয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশি দেয়। তাই তো রহস্যজনক মোটরপাড়িটা যে তাত্ত্ব চালিয়ে যাচ্ছে তাকে পাকড়াও করা তো দূরের ব্যাপার, তার প্রকৃত পরিচয়ও আজ পর্যন্ত বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসাররাও আবিষ্কার করতে পারলেন না। তবে সত্য বলতে কি স্যার, আপনার মতো আমিও ব্যাপারটা নিয়ে কম বিষয়ের দোলায় দুর্লভি না।'

'দেখুন মি. স্ট্রক, অদ্ভুত যানটার চালক শয়তানটাকে পাকড়াও করা তো দূরের ব্যাপার, তাকে অনুসরণও পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। টেলিফোনে খবর পাওয়া মাত্র দলবল নিয়ে তৈরি হতে না হতেই হত্যাঘাটটা তার রহস্যজনক যানটাকে নিয়ে একেবারে বে-পাভা হয়ে যায়। বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার তাকে ধরতে গিয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে। অসামান্য গতিবেগে এক একবার এক এক জায়গায় আবির্ভূত হয়ে ভেঁকি দেখিয়েই যেন কর্পূরের মতো উবে যাচ্ছে। একমাত্র

মোটর রেসের সময়ই তার অবয়বটা একঝলক দেখা সম্ভব হয়েছিল। আশ্চর্য গতিবেগ, দেড় ঘন্টা দু শো মাইল পথ যন্ত্র-দানবটা অনায়াসেই পাড়ি দিয়ে দেয়।'

'বাস, অদ্ভুত যন্ত্রযানটা তারপর থেকেই একেবারে হাফিস হয়ে গেছে। দূরন্ত গতিবেগ সামলাতে না পেরে সেটা মিচিগান হ্রদে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গভীর জলে চিরনিদ্রায় সমাহিত হয়ে পড়ে নি তো? কেউ কেউ অবশ্য বলছে, শয়তানটা তার যন্ত্রদানবটাকে নিয়ে নির্ধাৎ আবার কোনো না কোনো অঞ্চলে উদয় হবে।'

মি. ওয়ার্ড নির্দিধায় অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে গিয়ে বললেন, 'যন্ত্র-দানবের ব্যাপারটা আগাগোড়াই অত্যাশ্চর্য ও অদ্ভুত রহস্যজন্য। যদি শয়তানটা আর আবির্ভূত নাই হয় তবে ঘটনাকে অলৌকিক কাণ্ড আখ্যা দিয়ে চাপা দিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।' জান বুদ্ধি দিয়ে যার কিনারা করা সম্ভব নয় পুলিশ সে রহস্যভেদ করবে কি করে? অসম্ভব। একেবারেই আবাস্তব চিন্তা।'

মুহূর্ত কাল অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে মি. ওয়ার্ড আবার মুখ খুললেন, 'এ ব্যাপারটার চেয়েও ঢের ঢের বেশি অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্য ও রহস্যজনক আর একটা ঘটনা ইদানিং ঘটে চলেছে। ঘটনাটা ঘটে চলেছে কানেকটিকাট, ম্যাসাচুসেটস আর মেইনের লাগোয়া অঞ্চলে। সেখানে অদ্ভুত গতিবেগ সম্পন্ন ছুটন্ত একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে। বাস, পরমুহূর্তে গৌত্তা মেরে জলে পড়ে হাফিস হয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য ব্যাপার! টেনিস্কোপও তার অবয়ব ধরতে অক্ষম। রহস্যসম্বলিতকারী বস্তুটার আকৃতি অনেকটা চুরুটের মতো। ফুট ত্রিশেক লম্বা। সবজে রঙ। ফলে অনায়াসেই জলে মিলিয়ে যেতে পারে। নোভা-স্কোটিয়া আর কেভ গডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উড়ন্ত রহস্যটাকে মাঝে মাঝেই দেখা যায়। সেটাকে কাছ থেকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করার জন্য পোর্টসমউথ, বোস্টন, পোর্টল্যান্ড আর প্রভিডেন্স থেকে মোটরবোট আর স্টিম লঞ্চ নিয়েও বহুবার চেষ্টা করা হয়। গোড়ায় ব্যাপারটাকে তিমির কারসাজি ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা কি করে ভেসে ওঠে? কিন্তু সেটা তো কখনও তিমির মতো মাথার ছিদ্রপথে জল নির্গত করে নি। শব্দকরা বা ভোস ভোস করে শ্বাসক্রিয়াও চালায় নি। যদি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী নাই হয়ে থাকে তবে সাগর-দানবটার প্রকৃত পরিচয় কি? গল্প-কাহিনীর আদিকালের দানবকৃতি সাগরনাগ, ক্রাকেম বা লেভিয়ানথান অষ্টোপাস প্রভৃতির বাস গভীর জলে। সমুদ্রের উপরিতলে তাদের বিচরণ করতে দেখা যায় না। সামুদ্রিক দানবটার আবির্ভাব ঘটতেই জেলেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমুদ্রে নামা বন্ধ করে দিয়েছে। জলের আতঙ্ক অতিকায় প্রাণীদের উদ্দেশ্যে তো কারো জানা নেই। যদি হিংস্র হয় আর তেড়ে এসে আক্রমণ করে? অমূল্য প্রাণ নিয়ে তো খামখেয়ালি করা চলে না। বিশালায়তন জাহাজের কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা অবশ্য নেই। কিন্তু তিমি বা সাগর-দানব যাই হোক না কেন আক্রমণ করে জাহাজকে ঘায়েল করার সাধ্য তাদের নেই। ইতিপূর্বে বহু জাহাজ থেকে বহুবার অতিকায় সাগর-দানবকে বহু দূরে দেখা গেছে। জাহাজের মাথা ঘুরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই প্রাণীটা উল্কার বেগে ধেয়ে উধাও হয়ে গেছে। কামান দেগে সেটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য বোস্টন থেকে একটা গান-বোট এসেছিল। বাস, নিমেষে সেটা উধাও হয়ে গেল। অহেতুক কামানের গোলা খরচ না করে ক্যান্টেন হতশ হয়ে বোস্টনে ফিরে গেল। এতে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল, সাগর-দানবটা যত শক্তিদ্রই হোক বা জলের ওপরে চক্কর মেরে বীরভূত যত প্রকাশ করুক না কেন অন্তত আক্রমণাত্মক মনোভাব তার নেই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এ-ও তো মনে করা যেতে পারে বড় জাহাজ দেখে সমুদ্র-দানবটা বয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু যদি নৌকো হত তবে কি ছেড়ে দিত, চড়াও হত না?'

'যদি সেটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী না হয়, তবে?'

'তবে আপনিই বা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছেন?'

'মাছের মতোই অবয়বধারী অমিত শক্তির আধার কোনো জলযান নয় তো?'

'ভাল কথা, যদি তাই হয়ে থাকে, তবে তার ইঞ্জিনটাও তো খুবই শক্তিশালী, তাই নয় কি? এবার বলছি, এমনও তো হতে পারে প্রকৃত রহস্যটার কিনারা করার পরামর্শদানের পরিবর্তে সাংবাদিক-ভ্রদ্রলোকের একমাত্র লক্ষ্য ব্যাপারটাকে নিয়ে বাজার গরম করা। আর পৃথিবীর নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে একটু-আধটু নামটাম কিনতে চাইছেন। আর যেটুকু লিখেছেন এতেই পৃথিবীর সবাই কলিজা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।'

তখন বিজ্ঞান জলযান নির্মাণের ব্যাপারে অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিল। বিশালায়তন জাহাজ মাত্র পাঁচদিনে আটলান্টিক মহাসাগর ডিঙাতে সক্ষম। যন্ত্রবিদরা এতেও তৃপ্ত নন। তারা আরও শক্তিশালী, আরও দ্রুত গতি সম্পন্ন জলযান তৈরি করার জন্য অতুপ্র আগ্রহী। নৌ-বাহিনীও কম দক্ষতার পরিচয় দেয় নি। তাঁদের তৈরি যুদ্ধ-জাহাজ, মোটর বোট, টর্পেডো, টর্পেডো ধ্বংসক্ষম জাহাজ প্রভৃতি তাদের যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির পরিচায়ক।

সাগরের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী জলযানটার প্রকৃত অবয়ব কেমন তা আজ অবধি জানা যায় নি। তার শক্তির উৎস কি তা-ও আমাদের অজ্ঞাত, জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত। আর একটা কথা, জলযানটা পাল ব্যবহার করে না, বাতাসের বলে যে চলে না তাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। আর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন হলে অবশ্যই চোঙ থাকত, কম-বেশি ধোঁয়াও অবশ্যই দেখা যেত। তবে? তবে সেটা আসলে কি? কিসের সাহায্যে চলে?

খবরের কাগজের আতঙ্ক সৃষ্টিকারী প্রবন্ধটার এ পর্যন্ত পড়ার পরই আমাকে থমকে যেতে হল। আসলে আচমকা কেমন যেন একটা ধাক্কা খেলাম। মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে আমি মুখ খুললাম, 'স্যার, ওই অত্যাশ্চর্য স্থলযান মোটরগাড়িটাও একই রকম প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন ছিল। জলযান ও স্থলযান কোনোটার ইঞ্জিন সম্বন্ধে আমরা একেবারে অথৈ জলে। সে দুটো যে কিসের এবং কিসের শক্তিবলে চলে তাও অজ্ঞাত। স্থলযানটা মিচিগান হ্রদের জলে পড়ে উধাও হয়েছে। রহস্য সৃষ্টিকারী চালক কে-পাড়া। আর সে স্থলযানটা অবশ্যই জলের তলগহবরে তলিয়ে গেছে। এমন ছুটন্ত এক জলযান নতুনতর রহস্যসৃষ্টি করে চলেছে, ঠিক কিনা? আমরা জলযানটাকে পাকড়াও করার জন্য কোমর বেঁধে লেগেছি। কিন্তু অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য স্থলযান বা জলযানটার আবিষ্কারের খোঁজ করার জন্য কোনোরকম আগ্রহ আমাদের

নেই। সবারই একই ভাবনা, স্থলযানটার মতো অদ্ভুত জলযানটা যদি বে-পাতা হয়ে যায় তবে অস্থিরভাবে হাত কামড়ানো ছাড়া গতানুগত থাকবে না। আমাদের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তার অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন যন্ত্রটাকে হাত করা। এমন একটা অবিশ্বাস্য আবিষ্কার কিনে নিতে কেবলমাত্র আমেরিকাই নয় পৃথিবীর যে-কোনো দেশই উৎসাহী হবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আবিষ্কারক আড়ালে থেকে তাদের আবিষ্কারের মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর বিশ্বয় উৎপাদনের অগ্রসর।

আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার কেবল আমিই নই, মি. ওয়ার্ল্ডও লক্ষ্য করেছেন, রহস্য সঞ্চরকারী স্থলযানটা বে-পাতা হতে না হতেই জলযানটার ভেঁকি শুরু হল। উভয় যানের যন্ত্রপাতিই অত্যাশ্চর্য। অসাধারণ তাদের গতি। আর উভয়ই মানুষের পক্ষে সমান বিপদের কারণ। দুটো যন্ত্র দানব যদি একই সঙ্গে পৃথিবীতে চক্রর মারতে শুরু করে তবে স্থল আর জল উভয় পরিবেশেরই নিরাপত্তা বলে আর কিছুই থাকবে না। ডাঙা ও জলে এরকম আতঙ্ক সৃষ্টিকারী ব্যাপারকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, উচিতও নয়। মি. ওয়ার্ল্ড আমার কাছে আকস্মিক উদ্ভূত সঙ্কটজনক পরিস্থিতিটা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সঙ্কটমুক্তির উপায় যে কি তা কেউ-ই উদ্ভাবন করতে পারল না।

মি. ওয়ার্ল্ড এবার বললেন, 'মি. স্ট্রক, একটা ব্যাপার হয়ত আপনার মাথায় আসে নি। স্থলযান মোটরগাড়ি আর জলযানটার গঠনগত সাদৃশ্য কিন্তু যথেষ্টই রয়েছে। আচ্ছা, উভয় যান আসলে একটাই হতে পারে কি?'

ব্যাপারটা আমার মাথায় জগদদল পাখরের মতো চেপে বসল।

মি. ওয়ার্ল্ডের ছাড়া থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। তাঁর সর্বশেষ মন্তব্যটা বার বার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। আমি তখন চুটিতে ছিলাম। দুমাসের ছুটি। ছুটির মধ্যেই বড় সাহেব তলব করেছিলেন। মাস দেড়েক ইতিমধ্যে কেটেছে। তখনও দিন পনের ছুটি বাকি। ভাবলাম, ছুটি বাতিল করে রহস্যের কিনারা করতে লেগে পড়ব কিনা। রহস্য তো আর একটা নয়, দু-দুটো। রহস্যভেদ না করা অবধি আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব না। কিন্তু কোন পথে অগ্রসর হ'ব সে-ও আর এক বড় সমস্যা।

প্রাতরাশ সেরে খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে আরাম কদরায় বসলাম। অন্যমনস্কভাবে টুকরো টুকরো খবরের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ভারতে লাগলাম, মি. স্মিথকে তো বলে এসেছিলাম, গ্রেট আইরির অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই যেন টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে জানিয়ে দেন। কিন্তু আজ অবধি কোনো টেলিগ্রামই এল না। অতএব নির্বাণ কোনো খবর নেই।

খবরের কাগজটা রেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। মি. ওয়ার্ল্ডের শেষ কথাটাই আমার অস্থিরতা জাগিয়ে তুলেছে, 'যন্ত্রযান দুটোই আসলে এক-ই নয় তো?' অর্থাৎ স্থলে চলে আবার দিবা জলেও বিচরণ করতে পারে। আবার এমনও হতে পারে দুটো যন্ত্রযান আলাদা আলাদা হলেও একই হাতেই তৈরিও হতে পারে। তাই উভয় যন্ত্রযানকেই সমান দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে যে সর্বাধিক গতিবেগ সম্পন্ন যন্ত্র আবিষ্কার করেছে অজ্ঞাত আবিষ্কারক অনায়াসে তার দ্বিগুণ গতিবেগ সম্পন্ন যন্ত্র উদ্ভাবন করে ফেলেছেন।

আমার মাথায় ভাবনার পোকা কিলবিল করেই চলেছে—উভয় যন্ত্রের আবিষ্কারক কি তবে একই ব্যক্তি। কী আশ্চর্য ব্যাপার! ধারণাটা সত্য হতেও পারে। কারণ, যন্ত্রদানব দুটো ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় হলেও একই সঙ্গে দেখা দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে বলে শোনা যায় নি। অতএব মি. ওয়ার্ল্ডের সন্দেহটাকে তো অবজ্ঞাভরে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। নিজের মনে বলেই উঠলাম, 'হায় ঈশ্বর! গ্রেট আইরির পাশাপাশি বোস্টন আর মিলকির রহস্য মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে!'

গ্রেট আইরি যদি অগ্নিবমন শুরু করে, বুদ্ধির কারণে বা ধর্মের দ্বারা তবে হাজার হাজার মানুষের ত্রাণ ডাক শুরু হয়ে যাবে। ব্লু-রিজ অগ্নিবমন আরম্ভ হলে সবাই কঠিন সঙ্কটের মুখে পড়বে। সে সঙ্গে অতি সম্প্রতিকালে নতুনতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। জনসাধারণের প্রাণ ছেলে খেলায় মেতেছে। ধুলার মেঘ উড়িয়ে যন্ত্রদানব উল্কার বেগে ধেয়ে এসে যানবাহন আর পথচারীকে পিষে মারবে। বিপদ স্থল থেকে এবার ধাওয়া করেছে জলে। লাগামহীন গতিবেগের শিকার হতে চলেছে নৌকো-জাহাজ প্রভৃতি জলযান। নিরপরাধ অসহায় মানুষ গতিবেগের উন্মত্ততার শিকার হতে চলেছে। খবরের কাগজগুলোর আর কিছু করার ক্ষমতা থাকুক আর নাই থাকুক বাজার গরম করে জনজীবনে চাঞ্চল্য আর হতাশার সঞ্চার করতে সক্ষম। যন্ত্র-দানবের ব্যাপার স্যাণ্ডার নিয়ে এমনসব ভীতি সঞ্চারকারী গল্পকথা প্রচার করেছে যা পড়ে সাধারণ মানুষ তো ভয়ে সিঁটকে যাবার জোগাড়। জীবনুত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। আমার বুড়ি-পরিচারিকার আশ মরা অবস্থা দেখেই অন্য দশজনের শোচনীয় অবস্থার আঁচ পাওয়া যায়। তা একদিন তো বলেই ফেলল, 'পুলিশ যদি যন্ত্র দানবের রহস্যভেদ নাই করতে পারে, শয়তান চালকটাকে কজা করতে নাই পারে, তবে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা খরচ করে পুলিশ পুষে ফয়দাই বা কি?'

আমি চোখ-মুখে হতাশার ছাপ ঐকে বলতে বাধ্য হলাম, 'আসলে আমরা, পুলিশের লোকেরা কিছু করা তো দূরের ব্যাপার, তার কোনো হৃদিসই পাচ্ছি না।'

এমন বহু কথা টেলিফোনে, এমন কি সামান্যামনি অনেকেই বলে থাকে। গোড়াতে একটু-আধটু রাগটাগ করতাম সত্য। কিন্তু এখন গা-সহ্য হয়ে গেছে। স্নান হেসে প্রসঙ্গটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করি। তবে নিঃসন্দেহ হলাম, শয়তানের ব্যাপার-স্যাণ্ডার জনজীবনের অনেক গভীরে গিয়ে আঘাত করেছে। এখন সাধারণ মানুষের সাক্ষ্য কথা, যন্ত্র-দানবটার চালককে পাকড়াও করতে পারলেই মানুষের মনে স্বস্তি ফিরে আসবে। হ্যাঁ, শয়তানের কারসাজি ছাড়া কি-ই বা হতে পারে। শয়তান। শয়তানই বটে। নইলে গ্রেট আইরির শিকার আগুন নিয়ে হোলি খেলছে, ভেঁকি দেখাচ্ছে কে? শয়তান। উইসকন্সিনের মোটর প্রতিযোগিতায় সবাইকে তাকে লাগিয়ে জয়ী হয়েছে কে? শয়তান। কানেকটিকাট আর ম্যাসাচুসেটসের উপকূলবর্তী সমুদ্রের আতঙ্ক সঞ্চার করে বেড়াচ্ছে কে? শয়তান। অতএব শয়তানই সর্বত্র তাণ্ডব চালাচ্ছে।

এখন ব্যাপার হচ্ছে—শয়তানের ওপর সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায়িত্ব কিছুটা হাল্কা করা যায়, খুবই সত্য। কিন্তু

এ-তো আর ঠেলাধাক্কার ব্যাপার নয়। আসলে বিপদ তো চূড়ান্ত রূপ নিয়ে একেবারে কাঁধে চেপে বসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দু-দুটো যন্ত্র-দানবই কি চিরদিনের মতো হাফিস হয়ে গেছে, নাকি আবার রক্তরূপ ধারণ করে জনজীবনের শক্তি তছনছ করতে মেতে উঠবে? এক শো বছর বাদে আজকের যন্ত্র-দানবদের কাহিনী নিয়ে কত গল্পকথারই না জন্ম হবে।

বেশ কয়েক দিন ইউরোপ ও আমেরিকার খবরের কাগজগুলো যন্ত্রদানবের ব্যাপারসম্পার নিয়েই মেতে রইল। ইউরোপবাসীরা আমেরিকার বরাতে ব্যাপার দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে থাক হতে লাগল। আর হবে নাই বা কেন? পৃথিবীতে ভোজবাজির খেল দেখাবার জন্য শেখপর্ষন্ত কিনা আমেরিকার মাটিকেই বেছে নিল। ইউরোপ তাদের কোন পাকাধানে মই দিয়েছেন যে তাদের নিমর্মভাবে বঞ্চিত করল। তবে কি আমেরিকাই স্থল ও জল যন্ত্র-যানের আবিষ্কারক? তাই যদি হয় তবে তো চোখের পলকে আমেরিকা স্থল ও জল উভয় পথেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সেনাদলকে কজা করে ফেলবে। আরে ব্যস, এয়ে সর্বনাশা কাণ্ড ঘটতে চলেছে!

জুনের দশ তারিখ। নিউ ইয়র্কের একটা দৈনিক পত্রিকার পাতায় একটা তথ্যসমৃদ্ধ লেখা ছাপা হল। তাতে প্রচলিত যন্ত্রযানের গতিবেগ ও আবির্ভূত যন্ত্রদানবের গতিবেগের তুলনা করা হয়েছে। আর বলা হয়েছে, আমেরিকা যদি যন্ত্রদানবের অস্বাভাবিক গতিবেগের উপায় রণ করে ফেলতে পারে তবে তাদের পক্ষে ইউরোপে পৌঁছতে মাত্র তিনদিন সময় দরকার হবে। কিন্তু ইউরোপ পাঁচদিনের আগে আমেরিকায় হাজির হতে পারবে না।

কেবলমাত্র আমেরিকার পুলিশের বাঘা বাঘা গুণ্ডচররাই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গুণ্ডচররাও আদাজল খেয়ে যন্ত্রদানবের পাতা লাগানোর কাজে মেতে গেল। নইলে সব দেশকেই বিপদে পরতে হবে।

মি. ওয়ার্ডের মুখোমুখি হওয়া মাত্র তিনি আমাকে গ্রেট আইরির ব্যর্থতার কথা শ্রবণ করিয়ে দিতে ছাড়লেন না। আমিও পাণ্টা জবাব দিলাম, 'ডলার খরচ করুন, গ্রেট আইরির প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করে আপনার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছি।'

'বহুৎ আচ্ছা। কিন্তু যদি জল আর স্থলের যন্ত্র-দানবের রহস্যের কিনারা করতে পারেন তবে আপনি আবারও জয়মাল্য লাভের অধিকারী হবেন। পৃথিবীর বাঘা বাঘা রহস্যভেদীরা আদাজল খেয়ে লেগেছেন। তাদের আগেই যদি আপনি রহস্যটার কিনারা করে ফেলতে পারেন তবে সবাই আপনাকে মাথা থেকে নামাতেই চাইবে না সাহেব! দুদিন অপেক্ষা করুন এ-রহস্যের কিনারা করার সার্বিক দায়িত্ব আপনার ওপরই অর্পণ করব, ঠিক করে রেখেছি।'

এরকম অবর্ণনীয় অস্থিরতার মধ্যে যখন আমার দিন কাটছে ঠিক তখনই পনেরোই জুনের রেজেক্সি ডাকে একটা চিঠি পেলাম। আমার সিকানার পাশে মরগানটন পোস্ট অফিসের সিলমোহর আঁকা। আর তারিখ দুদিন আগেকার।

মরগানের সিলমোহর দেখেই নিঃসন্দেহ হলো। মরগানের মেয়র মি. স্মিথের চিঠি।

খামটার মুখ ছিঁড়ে ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতেই চমকে উঠলাম। কই, এটা তো শিখ লেখা নয়। স্বাক্ষরের জায়গায় তিনটে সুস্পষ্ট অক্ষর। এমন নামধারী কাউকে তো আমি চিনি না। তবে হাতের লেখা খুবই স্পষ্ট, বলা চলে একেবারে ঝকঝকে চকচকে।

চিঠির ডানদিকে তারিখ ও প্রেরকের ঠেকানার জায়গায় লেখা, 'গ্রেট আইরি, ব্রু-রিজ মাউন্টেন—উত্তর ক্যারোলিনা, তেরোই জুন।' আর প্রাপককে সম্বোধন করে বক্তব্য লেখা হয়েছে, 'মি. স্ট্রক, চিফ ইন্সপেক্টর অব পুলিশ। ৩৪, লগ স্ট্রিট, ওয়াশিংটন, ডি. সি.। চিঠির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—আপনার ওপর গ্রেট আইরির গোপন রহস্যভেদ করার দায়িত্ব বর্তেছিল। এপ্রিলের আঠাশ তারিখে আপনি মরগানটনের মেয়র ও দুজন গাইড নিয়ে গ্রেট আইরিতে এসেছিলেন। পর্বতের গা দিয়ে এক চক্রের মেরে পথের হদিস না পেয়ে হতাশ হয়ে পাথরের গায়ে ফাটলের খোঁজ মন দেন। তাতেও হতাশ হতে হয়েছে আপনাকে। মনে রাখবেন, গ্রেট আইরির উদরে কেউ মাথা গলায় না। আর যদি মাথা গলায়ও তবে সে আর জান নিয়ে ফিরে আসে না। আর কিন্তু ভুলেও সে চেষ্টা করবেন না। পরিণাম কিন্তু প্রথম বারের মতো হবে না, মনে রাখবেন। আর যদি নেহাৎই যান তবে কিন্তু অন্তঃ হতে হবে। সতর্ক করে দিলাম। যদি সুমতি হয়, আমার কথাটাকে আমল দেন তবে তো মঙ্গলই। আর যদি পাতা না দেন তবে কিন্তু বরাতে দুর্ভাগ্য আছেই আছে, মনে থাকে যেন। চিঠির প্রেরকের স্থানে গোটাগোটা অক্ষরে স্বাক্ষর করা হয়েছে—এম. ও. ডব্লিউ।'

চিঠিটা পড়ে আমি কয়েক মুহূর্ত শূন্যদৃষ্টিতে হাতের কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, চিঠিটা পড়ে আমি হতভম্ব হয়ে স্থবিরের মত তাকিয়ে রইলাম। পর মুহূর্তেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম, নির্ধাৎ কেউ সুযোগ বুঝে রসিকতায় লিপ্ত হয়েছে।

আমার বুড়ি ঝি দারুণ কুসংস্কারাঙ্কন। সে চিঠিটা ডাকপিওনের কাছ থেকে নিয়ে আমার হাতে তুলে দিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে আমার প্রতিটা মুহূর্তের মুখাবয়বের পরিবর্তনের ওপর নজর রেখে চলছিল। শেষ অবধি আমার চোখ-মুখের ঘনঘন পরিবর্তনটুকু দেখে তার পক্ষে আর নিজেকে সামাল দেওয়া সম্ভব হল না। আমি তার কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে রহস্যজনক চিঠিটার বক্তব্য খোলসা করে না বলে পারলাম না।

সবকিছু গভীর মনযোগ দিয়ে শুনে সে মুহূর্তকাল নীরবে কি যেন ভাবল। এক সময় কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'কতা, মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের নয়। শয়তানের চিঠি নাই বা হল। শয়তানের সাকরদেদের কারো লেখা এ চিঠি! এসব ঝঙ্কি-ঝামেলায় যাওয়ার কি যে দরকার মাথায় আসছে না।'

বিড় বিড় করতে করতে বুড়ি ঝি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়ি ঝি ঘর ছেড়ে যেতেই আমি আবার গ্রেট আইরির প্রসঙ্গে চিন্তা করতে লাগলাম। গ্রেট আইরির রহস্যভেদ করতে গিয়ে আমি যে নিদারুণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি তা-তো আর খবরের কাগজের দৌলতে পৃথিবীর কারোরই আজ্ঞা অজানা নয়। তাই আমার ব্যর্থতা ও হতাশা নিয়ে আমেরিকারই কেউ আমার সঙ্গে রসিকতার লোভ সামলাতে না পেয়ে এমন একটা উড়ো চিঠি দিয়েও থাকতে পারে।

কিন্তু গ্রেট আইরি তো চোর-ডাকাত বা অন্য কোনোৱকম সমাজ বিরোধীদেরও ঘাঁটি নয়। সমাজ বিরোধীরা সবার ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকতে উৎসাহী। নিজেদের গোপন ঘাঁটির খবর পুলিশকে অবশ্যই জানাতে উৎসাহী হয় না। উড়ো চিঠি দিয়ে হলেও তাদের ঘাঁটিতে প্রবেশ না করতে সতর্ক করে না। এ তো রীতিমতো পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ের আশ্ফালন, চোখ রাজানি। যদি তাই হয়, গ্রেট আইরিতে প্রবেশের পথ নাই থাকে তবে চোর-ডাকাত বা সমাজ বিরোধীরাই বা সেখানে গেল কি করে? তবে এমন কোনো গোপন সুড়ঙ্গ নির্মাণ আছে যার হদিস আমরা পাই নি। পরমুহুর্তেই বিপরীত ভাবনায় ডুবে গেলাম, কেউ না কেউ রসিকতা করতে গিয়েই চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়েছে।

মি. ওয়ার্ডের কাছে উড়ো চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখলাম। ভাবলাম, ভবিষ্যতে আবার একরম মক্কা করলে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে।

কয়েকটা দিন ঘরে বসে শান্তিতেই কাটিয়ে দিলাম। তবে নিশ্চিত বলাটা ঠিক হল না। হঠাৎ কবে, কোথেকে যে ডাক আসবে, কে জানে? তবে পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, গ্রেট আইরিতে ব্যর্থতার পর যদি আবার নতুন করে ব্যর্থতার জ্বালায় ভুগতে হয় তবে চাকরি-ই ছেড়ে দেব।

এ-দিকে রহস্যসম্ভারকারী স্থলযানটার আর কোনোই খবর নেই। আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশের গুপ্তচররাও শ্যেন দৃষ্টিতে পথ-ঘাটের ওপর রাত্রি-দিন কড়া নজর রেখে-চলেছে। তবে একটা ব্যাপার, যন্ত্রদানবরা কিন্তু কোনো বারই নির্জন নিরাল স্থানে আবির্ভূত হয় নি। বরং জনবহুল স্থানেই ভোজবাজির খেল দেখাবার জন্য উৎসাহী হয়েছে। যদি হঠাৎ কেটে পড়ার ধাক্কা থেকেই তবে এরকম জায়গায় কায়দা-কসরৎ দেখাতে আসবে কেন? আর দীর্ঘদিন এমন নীরব দেখে মনে হচ্ছে এর মধ্যে নিশ্চয়ই চালকরা জান খুইয়েছে। আর যদি নেহাই বেঁচে থাকে তবে আর যেখানেই থাক অন্তত আমেরিকাতে নেই।

গোপন আস্তানা? কোথায় থাকতে পারে তার বা তাদের আস্তানা? তবে কি গ্রেট আইরিতে গিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছে। গোপন আস্তানার কথা মনে হতে গ্রেট আইরির কথাই মনের কোণে ঊকি দিয়ে উঠল। কিন্তু অমন খাড়া ও উঁচু পাহাড়ে মানুষ যখন উঠতে পারে না তখন যন্ত্রদানব মোটর কি করে উঠবে? চালক সাহেব যতই ভেঙ্কি দেখাক না কেন গ্রেট আইরির ওপর—অসম্ভব। ঈগল, বাজপাখি বা শকুন ছাড়া কারো পক্ষে সেখানে উঠে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়।

সেদিনটা ছিল উনিশে জুন। পুলিশ অফিসে যাবার জন্য সবে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। হঠাৎ থমকে যেতে হল। দেখি, দুজন লোক আমার দিকে তাকিয়ে। সতর্ক দৃষ্টি। কড়া নজর রাখা যাকে বলে। ব্যাপারটাকে তেমন আমল না দিয়ে নিজের পথে চলে গেলাম।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাবতে হল রাত্রে বাড়ি ফিরে বুড়ি ঝির কথা শোনার পর থেকে।

সে বলল, 'দুজন লোক নাকি কদিন ধরে আমার দিকে নজর রেখে চলেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরোলেই পিছন নেয়। আজও নাকি সে একই দৃশ্য ঘটতে দেখেছে।'

আমি বুড়ি ঝিকে নানভাবে জেরা করলে সে দৃততার সঙ্গেই বলল—সে লোক দুটোকে ভাল ভাবেই দেখেছে। এক ঝলক দেখলেই সনাক্ত করতে পারবে এবং এ-কথাও বলল, আবার দেখতে পেলে আমাকে চিনিয়ে দেবে।

পর পর দুদিন কোনো ঘটনাই ঘটল না। বাড়ি ছেড়ে বেরোবার সময় কাউকেই দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, ব্যাপারটা বুড়ির অস্বাভাবিক আচরণের জন্যই ঘটেছে। সাধারণ পথচারীকেই গুপ্তচর ভেবে মিথ্যা আতঙ্কে ভুগছে।

বাইশে জুন। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় বুড়ি ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিল, 'স্যার, এসে গেছে, গুপ্তচর দুজন এসে গেছে। সদর দরজা থেকে কয়েক হাত দূরে, পথের একধারে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে নিম্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।'

আমি ব্যস্ত পায়ের জানালার ধারে গেলাম। পাল্লা দুটো সামান্য ফাঁক করতেই দুজন লোককে আমার বাড়ির দিকে আড় চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখলাম। উভয়েরই বয়স চল্লিশের কম। গাট্টাগোটা চেহারা। সুপুরুষ। শিকারি বিড়ালের মতো ঘাপটি মেরে রয়েছে।

নিঃসন্দেহ হলাম, বুড়ি ঝির কথা মিথ্যা নয়। মনস্থির করে ফেললাম, এসপাড় ওসপাড় কিছু একটা করে তবে নিরস্ত হ'ব। তবে নিজে গিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসাবাদ করলে ফয়দা কিছুই হবে না। আমাকে তারা চেনে। কিছুতেই মুখ খুলবে না। শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম, তাদের পিছনে টিকটিকি লাগাব। তাদের প্রকৃত পরিচয় বের করে তবে ছাড়ান দেব।

আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশ অফিসে যাব। তারা আমার পিছু নেবে। সেখানে গিয়ে বাহাদুরদের হাজতে ঢুকিয়ে ঘা কতক দিয়ে আপ্যায়ণ করলেই পেট থেকে আসল ব্যাপারটা বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে আর লোক দুটোকে দেখতে পেলাম না। ভাবলাম, তারা ভুল করে আমার পিছু নিয়েছিল। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে কেটে পড়েছে।

বাস, গুপ্তচরদের কথা আমার মন থেকে উবে গেল। আর এম. ও. ডব্লিউ স্বাক্ষরিত উড়ো চিঠিটার কথা ক্রমেই ভুলে গেলাম।

সেদিনটা ছিল চব্বিশে জুন। সেদিন আর এক নতুন ঘটনা ঘটল। ওয়াশিংটনের ইভিনিং স্টার নামক কাগজে প্রথমে খবরটা ছাপা হল। পরদিন ভোরে সব কটা খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল—কিরডাল হ্রদ থেকে মাইল চল্লিশেক পশ্চিমে অখ্যাত-অবজ্ঞাত এক জায়গা রয়েছে। এবার থেকে জায়গাটা আর কারোর কাছেই অজানা-অচেনা থাকবে না। আজ কিরডাল হ্রদ মানুষের নজর কেড়েছে। সেখানে এক অবিখ্যাস কাণ্ড ঘটে চলেছে। পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা হ্রদটা থেকে জল বাইল বেরোবার উপায় নেই। হ্রদটার ক্ষেত্রফল প্রায় পঁচাত্তর বর্গমাইল। চারদিকে খাড়া পাহাড় আর মাঝখানে জলরাশি। অনেক, অনেক নিচে, পামলার তলায় জল পড়ে থাকার মতো একটা ব্যাপার মনে করা যেতে পারে। অনেক খাদ, সুড়ঙ্গ ও আঁকাবাঁকা খাদ ডিঙিয়ে তবে কোনোক্রমে হ্রদে পৌছনো যায়। হ্রদটাকে ঘিরে বেশ

কয়েকটা গ্রাম গড়ে উঠেছে। আর জলে মাছ ধরার জন্য জেলেদের নৌকো হরদম চক্কর মেঝে বেড়ায়। কিরডোল হ্রদের জলের গভীরতা পাহাড়ের কাছাকাছি পঞ্চাশ ফুট তো হবেই। পাহাড়ের কাছাকাছি বহু পাথরের টুকরো জল ভেদ করে উঁকি দিচ্ছে। হ্রদের কেন্দ্রস্থলে জলের গভীরতা তিন শো ফুটের বেশি ছাড়া কম নয়।

কিরডোল হ্রদের মাছের ওপর নির্ভর করে হাজার কয়েক জেলে বেঁচে রয়েছে। আর হ্রদ পারাপারের জন্য কয়েকটা ষ্টিমার ও নৌকো হরদম জলের ওপর দাপিয়ে বেড়ায়। পাহাড়ের বাইরে দিয়ে রেলপথ চলে গেছে। কনসাল এবং অন্য কয়েকটা প্রদেশে রেলযোগে মাছ চালান দেওয়া হয়।

কিরডোল হ্রদের এসব বিবরণ জানা না থাকলে অবিশ্বাস্য ঘটনাটা সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা করা সম্ভব নয়।

কিরডোল হ্রদের মুখবন্ধনের পর ইভিনিং স্টারের আসল বক্তব্যে কলিজা শুকিয়ে যাবার মতো ব্যাপারটা তুলে ধরেছে—জেলারা বেশ কিছুদিন যাবৎ অত্যাচার্য্য একটা ঘটনার মুখোমুখি হচ্ছে। হ্রদের তলদেশ থেকে কি যেন একটা জলকে ঠেলে ধাক্কা দিয়ে ওপরে তুলে দিচ্ছে। হাওয়ার দাপট না থাকলেও জল ফেনার মতো হয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠছে। শান্ত আবহাওয়ায় জল ফুলে ফেঁপে ওঠার ব্যাপারটা বিশ্বয়ের ব্যাপারই বটে। জল এমনভাবে ফুলে উঠলে ছোট ছোট নৌকাগুলো যে ভেসেই যাবে। জলের আফালনে নৌকাগুলো জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। জেলে-নৌকাগুলো পর্যন্ত তাল রাখতে না পেরে যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়ছে। যাকে বলে রীতিমতো ধুকুমার কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে।

হ্যাঁ, গভীর জলের তলদেশে নির্ঘাৎ এমন কিছু কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে যার ফলে জল এমন অবিশ্বাস্য রকম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। এর অনেক রকম সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে। গোড়ার দিকে সবার বক্তব্য ছিল, ভূমিকম্পই এরকম অত্যাচার্য্য কাণ্ডের জন্য দায়ী। তারপর দায়ী করা হল আগ্নেয়পর্বতকে। হঠাৎ কোথাও অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে জলে এমন তাণ্ডব দেখা যায়। কিন্তু জলস্ফীতি তো আর কোনো একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সম্পূর্ণ হ্রদ জুড়েই তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারো কারো মতে, জলের আতঙ্ক অবশ্যই কোনো দানবাকৃতি জলজপ্রাণী। অতিকায় প্রাণীটা অবশ্যই পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হ্রদে হাজির হয় নি, কিন্তু কোনদিক থেকে সে আসতে পারে, সাগর বা মহাসাগর ধারে কাছে থাকলে না হয় মনে করা যেত ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথে হ্রদ আর সাগরের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে। আর অতিকায় সামুদ্রিক দানবটা সে পথ ধরে কিরডোল হ্রদে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে তার পক্ষে আসা সম্ভব নয়। আসলের সঙ্গে খাদ মিলেমিশে প্রকৃত ব্যাপারটা ক্রমেই গভীর রহস্যাবৃত হয়ে পড়েছে।

আবার এমন কথাও কেউ কেউ ভাবছেন, হয়ত ডুবোজাহাজ নিয়ে কেউ জলের নিচে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যস্ত। এরকম জলযান আজকের যুগে অবাস্তব নয়। কয়েক বছর আগেকার কথা। 'প্রোটেকটর' নামক একটি অদ্ভুত জলযান কানেকটিকাটের ব্রীজ পোর্টে চক্কর মেঝে বেরিয়েছিল। প্রয়োজনে সেটা জলের তলায় তলিয়ে যেতে পারত। সেটার আবিষ্কারক ছিলেন বৈজ্ঞানিক লেক। তার উভচর ঘান্টাতে দুটো মোটর ব্যবহার করেছিলেন যাদের একটা আড়াই শো হর্স পাওয়ার সম্পন্ন, পেট্রোল চালিত। আর অন্যটা প্যান্ডার হর্স পাওয়ার সম্বলিত, বিদ্যুৎচালিত। এক গজ ব্যাস বিশিষ্ট ছিল তার চাকাগুলো। ফলে ডুবোজাহাজ প্রোটেকটর জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই অবাধে চলাচল করতে পারত।

ঠিক আছে। মনে করলাম, একটা ডুবোজাহাজ জলের তলদেশে তুলকালাম কাণ্ড করে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে পাহাড় বেষ্টিত কিরডোল হ্রদে ডুবোজাহাজের পক্ষে আসা কি করে সম্ভব? এ যে একেবারেই অবাস্তব চিন্তা।

আশে পাশের জেলেদের, জলের তলদেশের রহস্যটা আতঙ্ক সঞ্চার করল। তারা এতই ভীত যে, কারুরই বোঝা সম্ভব হল না। আতঙ্ক সৃষ্টিকারী আসলে কোনো দৈত্য-দান্যো নাকি কোনো যন্ত্রনায়।

জুন মাসের বিশ তারিখে সমস্যার সমাধান হল। মার্সেল নামে একটা পালতোলা জাহাজ চলতে চলতে এক সময় আচমকা বিরাট একটা ঝাঁকুনি খেল। জাহাজের তলদেশে কিসের সঙ্গে আচমকা ধাক্কা লেগেছে মনে হল। সেখানে জল আশি থেকে নব্বই ফুট গভীর। তাই চোরা পাহাড়ের কথা ভাবা যায় না। আঘাত পাওয়া মাত্র জাহাজটার গলুই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ব্যস, ডেক অবধি জলে ডরে গেল। তবে মার্সেল ডুবল না। কোনোরকমে তীর পর্যন্ত আসতে পারল।

পাম্প করে জল বের করে ভাঙাচোরা জাহাজটাকে পাড়ে তুলে আনা হল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আঁতকে উঠতে হল। অতিকায় একটা হুঁচালো জিনিসের সঙ্গে জাহাজের সংঘর্ষ হয়েছিল, নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, নির্ঘাৎ কোনো ডুবোজাহাজ প্রবল বেগে যাওয়ার সময় মার্সেলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায়। তবে একটা ডুবোজাহাজ ধাক্কা দিয়ে একটা জাহাজের এ দশা যখন করেছে তখন সেটা নির্ঘাৎ অবিশ্বাস্য শক্তিরই অধিকারী।

ব্যাপারটা কেমন তালপোল পাকিয়ে যাওয়ার মতোই বটে। ডুবোজাহাজ—কিন্তু হ্রদের জলে সেটা এলই বা কি করে? আর এসে থাকলেও হ্রদের জলে এমন করে লুকিয়ে থেকে রহস্য সঞ্চারই বা করছে কেন? জলের ওপরে উঠে আসতেই বা তার অন্যিহার কারণ কি থাকতে পারে? ডুবোজাহাজটার মালিক কি চিরদিনই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে চান? নাকি আরো এককায়ী জাহাজকে ঘায়েল করার মতলব আঁটছেন?

এবার ইভিনিং স্টারের পাতায় ছাপা হল—রহস্যসঞ্চারকারী মোটরগাড়ির আবির্ভাবের পর আবির্ভূত হল ডুবোজাহাজ! তবে: তবে কী তিন তিনটে যন্ত্রনাই একই ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে? আর তিনটে ইঞ্জিনই কি আসলে একই? একই যন্ত্রের তিনটি রূপ আমাদের সামনে আলাদা আলাদা রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে?

এ-প্রতিকার সর্বশেষ বক্তব্য বিদ্বজ্জনদের মাথায় নতুনতর চিন্তা ঢুকিয়ে দিল। বক্তব্য খুবই স্পষ্ট—তিনটে যন্ত্রের আবিষ্কারক একই প্রতিভাধর ব্যক্তি। আর তিনটি যন্ত্র একই। ব্যাপারটা খোলসা হল না। এমনতর একটা অসম্ভব কাজ কি করে সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল? একটা যন্ত্র সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির কাজ কি করে সম্পন্ন করতে পারে, কারোর মাথায়ই এল না। মোটরকে কি করে নৌকারূপে ব্যবহার করা যাবে? আবার নৌকাকে দিয়ে কীভাবে ডুবোজাহাজের কাজ করানো

যাবে? যন্ত্র যান যদি পাখির মতো শূন্যে উড়ে বেড়াতে পারত তবে ষোলকলা পূর্ণ হত। তিন-তিনটে যানরই অস্বাভাবিক গতিবেগ দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে, যন্ত্র মূলত একটাই। বিভিন্ন বার বিভিন্ন রূপ নিয়ে জনজীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করছে।

খবরের কাগজগুলো সুযোগ বুঝে অন্য পথ ধরল। মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সঞ্চার করার বদলে আবিষ্কারের গুরুত্বের দিকটা নিয়ে ভাবতে লাগল, যন্ত্রের সংখ্যা যতই হোক না কেন ইঞ্জিনের অবিশ্বাস্য শক্তি দেখে পৃথিবীর মানুষের চোখ ট্যাড়া হয়ে গেছে। নজির তো যথেষ্টই পাওয়া গেছে। এবার যে-কোনো উপায়ে আবিষ্কারকে হাতের মুঠোয় আনাই প্রথম ও প্রধান কাজ। অর্থ যতই খসাতে হোক না কেন অবিশ্বাস্য আবিষ্কারটাকে কজা করতেই হবে। এ কাজে যুক্তরাষ্ট্র সরকার অবশ্যই অনুদার হবে না। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো তাদের সামরিক বাহিনীর হাত শক্ত করার জন্য দুহাতে পাউণ্ড ছুড়তেও দ্বিধা করবে না। এরকম অত্যাশ্চর্য যন্ত্র যারা করায়ত্ত্ব করতে পারবে তাদের নৌ ও স্থলবাহিনী যে পৃথিবীতে একাধিপত্য বিস্তার করবে এ তো স্বাভাবিক কথা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার লক্ষ লক্ষ ডলার চেলেও আবিষ্কারটাকে হাতের মুঠোয় নেওয়ার জন্য বন্ধপরিকর। কিন্তু সমস্যা যে গোড়াতেই। যন্ত্রের মালিকের হদিস না পেলে সেটা কিনবেই বা কার কাছ থেকে?

জোর কদমে কাজ চলতে লাগল। খোঁজ করতে গিয়ে কিরডাল হ্রদের জল তোলাপাড় করা হল। বৃথা চেষ্টা। অত্যাশ্চর্য জলযানটা কিতবে-হ্রদ ছেড়ে চম্পট দিয়েছে। হ্রদে ঢোকা যেমন অসম্ভব ঠিক তেমনি বেরিয়ে যাওয়াও তো অসম্ভব। ডুবোজাহাজ পাহাড় ডিঙাবে কি করে? না, রহস্যের কিনারা করা বৃষ্টি আর সম্ভব নয়।

বাস, সব চূপচাপ। ডুবো জাহাজটার উপস্থিতির আর কোনো খবরই পাওয়া গেল না। হ্রদের ধারে কাছের মানুষের কাছ থেকেও কোনো খবর এল না।

ইতিমধ্যে কয়েকবারই মি. ওয়ার্ডের সঙ্গে আমার মোলাকাত হয়েছে। উদ্ভূত রহস্য নিয়ে দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু রহস্যভেদের ব্যাপারে এক তিলও এগোতে পারলাম না। আমাদের বাঘা বাঘা রহস্যভেদীরা যন্ত্রযান বা তার আবিষ্কারক কারোরই হদিস পেল না।

সাতাশে জুন মি. ওয়ার্ড আমাকে ডেকে বললেন, 'মি. স্ট্রক, আপনার প্রতিশোধ নেবার অপূর্ব সুযোগ হাতের মুঠোয় এসে গেছে। গ্রেট আইরিশে আপনার ব্যর্থতার প্রতিশোধের কথা বলতে চাইছি। তিন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের আবিষ্কারককে পাকড়াও করতে আগ্রহী কি?'

'অবশ্যই আগ্রহী। আপনার আদেশ পেলেই আমি কাজে বাঁপিয়ে পড়ি। কাজটা কঠিনসাধ্য হলেও বাধা যতই দুর্লভ হোক আমি ঠিক অতিক্রম করতে পারব, নিজের ওপর একটু আস্থা আমার আছে।'

ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে মি. ওয়ার্ড এবার বললেন, 'গ্রেট আইরিশর অভিযানের চেয়ে ঢের ঢের বেশি কঠিন কাজ, খেয়াল রাখবেন। তবে, আপনার কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার ওপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে বলেই তো আপনার ওপর কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করে আমি নিশ্চিত থাকতে পারি। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে গ্রেট আইরিশর রহস্যভেদ সমায় সুযোগ মতো পরেই না হয় করা যাবে। কিন্তু এখন যে কাজের দায়িত্ব আপনার ওপর বর্তেছে বাঘা রহস্যভেদী ছাড়া কিনারা করা সম্ভব নয়। অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের রহস্যজনক আবিষ্কারককে পাকড়াও করতে হবে। ডাক-সাইটে রহস্যভেদী ছাড়া এ কাজ হাসিল করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। যুক্তি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে লোকটা এখন কিরডাল হ্রদের অতলে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

'আমার বিশ্বাস, তিনি নিজে থেকে ধরা না দিলে তার হদিস পাওয়া সম্ভব নয়।'

'আমারও একই বিশ্বাস। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? লোকটাকে যদি মোটা অর্থের লোভ দেখানো হয়? টাকার লোভে এগিয়ে এসে তাঁর আবিষ্কারটা বেঁচে দিতে রাজি হবে। সরকার মোটা অর্থ ব্যয় করতে রাজি হয়েছেন। প্রচার করে দেওয়া হবে, সরকারের সামনাসামনি হয়ে দরদস্তুর পাকা করে নেবার জন্য। সরকারের ইচ্ছার কথা যন্ত্রযানের আবিষ্কারক জানতে পেরে উৎসাহী হবেনই।'

'মি. স্ট্রক, যন্ত্রটা যখন লোকটার কোনো কাজেই লাগবে না তখন দেশের কাজে বিক্রি করে দেওয়াই তো সঙ্গত। রাজি না হওয়ার তো কারণই নেই। তবে আবিষ্কারকের কোনো কুমতবল থাকলে অবশ্য বিক্রি করতে উৎসাহী হবে না।

মি. ওয়ার্ড এবার কত রকমভাবে আবিষ্কারককে পাকড়াও করার যে চেষ্টা চলছে সে কথা এক এক করে আমার কাছে ব্যক্ত করলেন। হয়ত বা আবিষ্কারক লোকটা ইতিমধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তা হলেও ভান্ডা-চোরা যন্ত্রাংশ তো কোথাও না কোথাও পড়ে থাকবেই। সেগুলো খুঁজে পেতে বের করতে পারলে ইঞ্জিনিয়ারদের অপরিসীম উপকারে লাগবে। আশ্চর্য ব্যাপার, মার্সেল জাহাজটাকে জখম করার পর যন্ত্রদানবটা একেবারে বে-পাশা হয়ে গেছে।

বে-পাশা ডুবোজাহাজটার কোনো খবর না পেয়ে মি. ওয়ার্ড বড়ই হতাশা ও অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। এটাই তো সঙ্কট। জনগণকে আতঙ্ক মুক্ত রাখা তার বড় কর্তব্য। অথচ ভীতসন্ত্রস্ত জনগণের সামনে তাঁকে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। একেবারেই অবিশ্বাস্য গতিতে যে যন্ত্রযান ছুটে গিয়ে হাফিস হয়ে যাচ্ছে তার পিছনে ধাওয়া করবেন কীভাবে? এদিকে খবরের কাগজ ও অন্যান্য সমালোচকরা যেভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে তাতে ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে থাক হওয়া ছাড়া গতাত্তরই বা কি? তাই সবার মধ্যে ধারণা বহুমূল হয়েছে কতগুলো নিষ্কর্মার ওপর দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাদের বসিয়ে বসিয়ে না খাইয়ে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি?

আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রায় পনের দিন আগে পাওয়া সতর্ক-পত্রটার কথা খচখচ করতে লাগল। তাতে আমার প্রাণহানিরও হুমকি দিতে ছাড়ে নি। দুজন গুণ্ডাচরের মুখ মনের কোণে উঁকি দিল, যারা আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিনিয়ত আমার গতিবিধির ওপর সতর্ক নজর রেখে চলছিল। মি. ওয়ার্ডকে এ-ব্যাপারটা সম্বন্ধে বলেই বা ফয়দা কি? উড়ে চিঠিটার সঙ্গে তো বর্তমান সমস্যার কোনোই যোগসাজস নেই। গ্রেট আইরিশর অগ্নি উদগীরণের সম্ভাবনা না থাকায়

সরকার এ-মুহুর্তে সেটা নিয়ে ভাবিত নয়। তাই সদা উদ্ভূত সমস্যায় আমাকে কাজে লাগানোর কথা ভাবছে। তাই মনস্থ করলাম, পরে সময় সুযোগ মতো তাঁর কাছে ব্যক্ত করব। তখন যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন সহ্য করা যাবে, এখন পারব না। তাই তার কথার পৃষ্ঠে বললাম, 'স্যার, যন্ত্রযানের মালিকের সঙ্গে কথাবার্তার উপায় আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। তিনি লোকচক্ষুর বাইরে চলে গেলেও একদিন না একদিন ফের বেঁচে আসতে পারেন। তখন আমরা—'

আমার মুখের কথা ছিনিয়ে নিয়ে মি. ওয়ার্ড বলে উঠলেন, 'মি. স্ট্রক, খবরদার মুহুর্তের জন্য আপনি বাড়ি ছাড়বেন না। হতচ্ছাড়াটার আবির্ভাবের খবর পাওয়ামাত্র আপনাকে তার পিছু নিতে হবে। আর আপনার পছন্দ মাফিক দুজন রহস্যভেদীকে সঙ্গে নিয়ে নিন।'

'ধন্যবাদ! কিন্তু স্যার আজ না হোক কাল যন্ত্রযানের মালিকের মুখোমুখি হবই। তখন আমার করণীয় কি হবে?'

'শ্রেণ্ডার। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণ্ডার করে টেলিগ্রাম মারফৎ আমাকে জানিয়ে দেবেন। তার পরের দায়িত্ব আমার। তার নামে শ্রেণ্ডারি পরোয়ানা আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে।'

মি. ওয়ার্ডের কাছ থেকে গুরুদায়িত্ব নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। খবর পাওয়ামাত্র রওনা দেওয়ার মতো ব্যবস্থাদি সেরে ফেললাম।

সহজেই দুজন ঘাঘু রহস্যভেদী সহকারীও জোগার করে ফেললাম। আমার দপ্তরেরই কর্মী। আগে বহবার আমার কাছাকাছি পাশাপাশি থেকে অসীম সাহস ও অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বাস, এবার চলল নীরব প্রতীক্ষা। দু-দুটো খবর পেলাম। বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বুঝলাম, দুটো খবরই বিশ্বাস করার মতো। দু-জনেই নিজের চোখে দেখেছে। একজন জানিয়েছে, সুপিরিয়র হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলে অদ্ভুত যন্ত্রযানটাকে চাক্ষুষ করেছে। আর অন্যজন দেখেছে, লিটল রকের নিকটবর্তী আরকানসাসে।

সমস্যা হচ্ছে, ঘটনা দুটোকে কিছুতেই মানিয়ে নেওয়া যাচ্ছে না। একজন ছাব্বিশে জুন বিকালে আরকানসাসে যন্ত্রযানটাকে চাক্ষুষ করেছে আর অন্যজন সে রাতেই সেটাকে সুপিরিয়র হৃদয়ে দেখেছে। উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধান প্রায় আটশে মাইল। যত জোরেই ছুটুক না কেন অত্যাধুনিক মোটরগাড়িটা লোকচক্ষুর আড়াল দিয়ে কি করে এতগুলো জনবসতি ডিঙিয়ে এমন দীর্ঘপথ পাড়ি দিল? সেটা আরকানসাস, মিসৌরি, আওয়া ও উইসকনসিনের এদিক দিয়ে ঢুকে বিপরীত দিক দিয়ে দিবা বেরিয়ে গেল আর সেটাকে আমাদের কোনো রহস্যভেদীই দেখতে পেল না। আশ্চর্য! টেলিফোন করে কেউ জানালও না! অদ্ভুত যন্ত্রযানটা পরপর দুবার দেখা দিয়ে আবার বেমানাম হাফিস হয়ে গেল!

বাস, আবার ব্যাপারটা খিতিয়ে পড়ল। সবাই চুপচাপ। মি. ওয়ার্ড আমাকে উড়ো খবরের পিছনে ধাওয়া করতে দিতে উৎসাহী হলেন না। তাঁর আদেশের অপেক্ষায় আমরা উদ্ভীৰ্ব হয়ে থাকলাম।

একটা কথা, অত্যশ্চর্য যন্ত্রটা যে হাফিস হয়ে যায় নি তা আবির্ভূত না হলেও তার উপস্থিতি সর্বদা প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

তেসরা জুলাই, যুক্তরাষ্ট্রের সবক'টা খবরের কাগজে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে যন্ত্রযানের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের প্রসঙ্গ ব্যক্ত করা হল। বিজ্ঞপ্তিটা ছয়টা ভাষায় ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটার বক্তব্য—এ বছর এপ্রিলে একটা মোটর পেনসিলভেনিয়া কেনটাকি, ওহিও, মিসৌরি, টেনেসি এবং ইলিনয়ের সদর রাস্তায় দেখা গেছে। তারপর আবার সাতাশে মে, আমেরিকান অটোমোবাইল ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় মোটর প্রতিযোগিতায় সেটাকে ফের দেখা গিয়েছিল। জুনের প্রথম সপ্তাহে নিউ ইংল্যান্ডের উপকূলে, বিশেষ করে বোস্টনের কাছে দুর্দান্ত গতিতে একটা নৌকাকে জলে ছুটে বেড়াতে দেখা গেছে। বাস, তারপরই একেবারে বে-পাত্তা ব্যাপার-সাপার দেখে মনে করা যেতে পারে, একই ব্যক্তিই তিন-তিনটে যন্ত্রযান নির্মাণ বা আবিষ্কার করেছেন। যন্ত্রযান তিনটে হলেও আসলে তা একটাই। এমন পদ্ধতিতে নির্মিত যাতে জল ও স্থল উভয় পরিবেশেই চলতে সক্ষম হয়।

যন্ত্রযানটার নির্মাতা-আবিষ্কারকের কাছ থেকে সেটার স্বত্ব লাভের জন্য তার কাছে প্রস্তাবগুলো রাখা হচ্ছে, 'সরকারের অনুরোধ তিনি যেন গুপ্তস্থান ছেড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসেন। সরকারের হাতে যন্ত্রযানটার স্বত্ব তুলে দিয়ে অগ্রহী হলে তিনি যেন সরকারকে জানান। তাঁর কাছে আরও অনুরোধ রাখা হচ্ছে, তিনি যেন যতশীঘ্র সম্ভব ওয়াশিংটনের ফেডারেল পুলিশ বিভাগে এ-বিজ্ঞপ্তিটার জবাব পাঠান।'

সরকার পক্ষ থেকে কোনোরকম শর্ত আরোপ করা হয় নি। অতএব ধরে নেওয়া যাচ্ছে, বিজ্ঞপ্তি পড়ে যন্ত্রযানের আবিষ্কারক স্বাধিকারী এগিয়ে আসতে উৎসাহী হবেন।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিটা ছাপা হতেই না হতে জনগণের কৌতূহল চরম পর্যায়ে পৌছে গেল। পুলিশ-বিভাগের অফিসের সামনে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যেন মেলা জমে রইল। সবার মনেই একই জিজ্ঞাসা, অজ্ঞাত পরিচয় যন্ত্রযানের আবিষ্কারক কি ধরা পড়েছে? বা কোনো খবর পাওয়া গেছে কি?

অজ্ঞাতনামা আবিষ্কারক সরকারের সঙ্গে যন্ত্রযানের স্বত্ব হস্তান্তর করার ব্যাপারে দর কষাকষি শুরু করেছে এরকম খবর যদি ছাপা হয় তবে মানুষের কৌতূহল যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভাবা যায় না।

আমেরিকা এমন একটা দেশ যেখানে অত্যশ্চর্য কোনো বস্তুর কদরও অত্যশ্চর্য রকমই দেওয়া হয়ে থাকে। তাবু আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো জবাবই এল না। বিজ্ঞপ্তিটা বেরোবার পর সকাল কেটে দুপুর এল, কোনো জবাব এল না। দুপুর গড়িয়ে বিকাল হল। না, তবুও কোনো খবরই এল না। পুলিশ বিভাগের কর্তব্যাক্রিয়া অধীর প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে লাগলেন। ক্রমে রাত্রি এল। না, তবুও কোনোই খবর নেই। সকালেও কোনো খবর এল না। তার পরের দিনও কাটল ব্যর্থ প্রতীক্ষায় তার পরের দিনও কাটল একই রকম উদ্বেগ-উৎকর্ষার মধ্য দিয়ে।

অন্য মহাদেশে বিজ্ঞপ্তিটার অন্যরকম এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে টেলিগ্রাফের তারের মাধ্যমে খবর পৌছে গেল ইউরোপ মহাদেশে। আমেরিকার অগ্রহ দেখে গ্রীষ্ম মহাদেশের দেশনায়করা তো আর

নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারে না। আবিষ্কারকের অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটাকে কিনে নেওয়ার জন্য তাঁরাও যারপরনাই তৎপর হলেন। আর সেটার মালিকানা লাভের জন্য প্রয়োজন হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতেও তারা পিছপাও নয়। প্রয়োজনে লক্ষ ডলার ঢালতে রাজি।

ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিও যন্ত্রটার মালিকানা স্বত্ব ক্রয়ের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়েছে। ইংল্যান্ডে, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালি কেউ-ই পিছিয়ে রইল না। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মতোই একটা বিজ্ঞপ্তি ইউরোপের খবরের কাগজগুলোও ছাপল। বলা হল তাদের প্রস্তাবে রাজি হলে অদ্ভুত যানের আবিষ্কারকও চালক রাতারাতি ধনকুবের বনে যাবে।

আশ্চর্য ব্যাপার, এতকিছু সত্ত্বেও যন্ত্রযানের আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো উৎসাহই লক্ষিত হল না। পৃথিবীর সবাই যেন তাঁকে টাকার লোভ দেখানোর প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। এরকম ঘটনার নজির পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা নেই। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস দর হাঁকল দুকোটি ডলার। বাস, এবার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো বিমিয়ে পড়ল। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কারোর মুখে টু-শব্দটিও শোনা গেল না, এতগুলো ডলারের বিনিময়ে যন্ত্রযানটা কেনা অর্থহীন। আর আমার মতো অন্যরকম, যন্ত্রটার দাম আসলে দুকোটি ডলারের চেয়ে ঢের, ঢের বেশি।

এক-দুই-তিন করে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। না, বাঞ্ছিত আবিষ্কারকের দিক থেকে কোনো জবাবই এল না। আমার বরাত যে মন্দ বুঝতে আর বাকি রইল না।

পনেরই জুন। সেদিন সকালে চিঠির বাস্তু খুলতেই অত্যাশ্চর্য একটা চিঠি নজরে পড়ল। কর্তৃপক্ষ চিঠিটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশিংটনের খবরের কাগজগুলো দপ্তরে পাঠিয়ে দেন।

চিঠিটা টেররের ডেক থেকে পনেরই জুলাই-এ লেখা। আর বক্তব্য মোটামুটি এরকম—‘পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর উদ্দেশ্যে—ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু রকম প্রস্তাব পেয়েছি। সব শেষে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একই রকম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। উত্তর দিতে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে সাফ কথা জানিয়ে দিচ্ছি—আমার আবিষ্কারটা খরিদ করার জন্য যে দাম ধার্য হয়েছে তা আমি প্রত্যাখ্যান করছি। দাম যখন চাই-ই না তখন দরদারির তো কথাই ওঠে না। আমার উদ্ভাবিত যন্ত্রটার স্বত্ব আমি হস্তান্তর করতে নারাজ, নেওয়ার অধিকারও কারো নেই। রাশিয়া, ফরাসি, জার্মানি, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া ও আমেরিকা কারোরই সে অধিকার নেই। আমার আবিষ্কারের স্বত্ব আমারই থাকবে। মর্জি মাফিক তাকে আমি ব্যবহার করব। পৃথিবীকে আমি হাতের মুঠোর মধ্যে রাখব। কিন্তু আমাকে কজা করার হিম্মৎ কারোরই নেই। আমাকে খেপ্তার করার চেষ্টা একেবারেই বৃথা। একেবারেই অসম্ভব প্রয়াস। আমার গায়ে কেউ সামান্যতম আঘাত যদি হানে তবে তাকে ভয়ঙ্কর আঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমি কথা ও কাজের মধ্যে ফারাক রাখতে জানি না, মনে থাকে যেন।

আমি হাত বাড়ালেই যখন কোটি কোটি মুদ্রা পেয়ে যেতে পারি সেখানে সামান্য অর্থের জন্য আমার তো লালসা থাকার কথা নয়। পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর রক্ষণায়করা মনে রাখবেন, আমার সামান্যতম ক্ষতি করার হিম্মৎ আপনাদের অবশ্যই নেই। কিন্তু আপনাদের চরমতম সর্বনাশ করার ক্ষমতা আমি রাখি। আমার খেয়াল খুশিতে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারোর নেই—কারোরই না।

সেভাবেই এ-চিঠিতে স্বাক্ষর করেছি।’

চিঠিটার শেষে স্বাক্ষর রয়েছে।—‘মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড।’

চিঠিটার বক্তব্য পাঠ করে সবাই তো রীতিমত স্তম্ভিত। চিঠিটার প্রতি ছত্রে যারপরনাই উদ্ভূত প্রকাশ করা হয়েছে। আর যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে চোখ-রাঙানো চিঠিটা চিঠির বাস্তু কে যে ফেলে গেল তা-ও ধরা সম্ভব হল না। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, পুলিশ-অফিসের সামনে সারারাত্রি সশস্ত্র প্রহরী টহল দিয়েছে। তার ওপরে দলে দলে কাতারে কাতারে কৌতূহলী মানুষের আনাগোনা লেগেই ছিল। হ্যাঁ, এটা অবশ্য হতে পারে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মূর্তিমান আতঙ্ক, যন্ত্রযানের উদ্ভাবক, চিঠির বাস্তু উদ্ভূতাপূর্ণ চিঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে, রাত্রির অন্ধকারে চিঠিটা বাস্তু ফেলে যাওয়া তেমন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চিঠিটা পাওয়া মাত্র বেশ কয়েকটা ব্লক তৈরি করে দেশের সব ক’টা খবরের কাগজের দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এরকম এটা চিঠি পড়ে নিছকই রসিকতা মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমিও এর আদ্যোপান্ত পাঠ করে ব্যাপারটাকে মোটেই আমল দিলাম না।

আসলে কিন্তু এ-চিঠিটার বেলায় বিপরীত প্রতিক্রিয়াই দেখা দিল। সবার একই মতো। এ-চিঠির লেখক নিছক রঙ্গ রসিকতার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লেখে নি। দু-চারজন বিপরীত মন্তব্য করতে গিয়ে সুবিধা করতে পারে নি। ফলে তারা শেষমেশ মুখে কলুপ এঁটে দিতে বাধ্য হল। যে-যন্ত্রটা সবার নাগালের বাইরে তার উদ্ভাবক ছাড়া অন্য কারোর পক্ষে এরকম একটা চিঠি লেখার হিম্মতে কুলোতো না। একের পর এক বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে প্রথমে থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেছে উদ্ভাবকের মানসিকতা অন্য সবার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আজ অবধি যেসব ঘটনা ঘটেছে যাদের তল খুঁজে পাওয়া যায় নি। অথচ একটামাত্র চিঠির মধ্যেই লোকটার সম্বন্ধে ধারণা করে নেওয়া যাচ্ছে। সত্যি লোকটা বিচিত্র চরিত্রের। ব্যাপারটা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল। উদ্ভাবক মনে-প্রাণে কি চাচ্ছে তাঁর আত্মগোপন করে থাকার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভবিষ্যতে আরও কিছু ভেঙ্কি দেখিয়ে চমক সৃষ্টি করা। কোনো দুর্ঘটনায় তিনি অক্কা পান নি। পুলিশের অজ্ঞাত কোনো গোপন স্থানে ঘাপটি মেরে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডাকবাস্তে না ফেলে চিঠির বাস্তু চিঠিটা ফেলতে উৎসাহী হলেন কেন? ডাক মারফৎ চিঠি এলে পুলিশ তার অবস্থিতির কথা, ঠিকানা ধরে ফেলতে পারত। আর সরকারের অনুরোধ ছিল, তিনি ওয়াশিংটনের পুলিশ-দপ্তরে এসে হাজির হয়ে যেন নিজের পরিচয় দান করেন। তিনি তো সেখানেই হাজির হয়েছেন। আর তাঁর হয়ত লক্ষ্য ছিল পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা। তাঁর সে বাস্তব সম্পূর্ণরূপে পূরণ হয়েছে।

খবরের কাগজে ব্লক করে ছাপানো চিঠিটা পড়ে দেশসুদূর মানুষের মাথা ঘুরে যাবার জোগার হল। অন্যের কথা আর

কি-ই বা বলব, আমারই তো চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল। খবরের কাগজটা চোখের সামনে ধরে রেখেই আমি আমাকা চিল্লিয়ে উঠলাম, 'আরে! মিলটুকু তো গোড়াতেই আমার চোখে ধরা পড়া উচিত ছিল। যে-পত্রের মাধ্যমে গ্রেট আইরির ব্যাপারে শাসনো হয়েছিল এটোও যে একই হাতের লেখা! কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার রে বাবা! দ্বিতীয় চিঠিটার ওপরে জায়গার নাম, অর্থাৎ কোথা থেকে লেখা হয়েছে উল্লেখ করেছে 'আতঙ্কর ডেক' থেকে। 'আতঙ্ক' তবে যন্ত্রযানটারই নাম। আর সে যানটার রহস্যসঞ্চারকারী ক্যান্টেনই তবে পত্রটা লিখেছেন? এম. ও. ডব্লিউর দ্বারা তারই উপাধি বুঝাতে চেয়েছেন? তিনিই তবে পত্র মারফৎ আমাকে শাসিয়ে ছিলেন আমি যেন গ্রেট আইরি মুখো না হই?

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে ড্রয়ার টেনে তেরোই জুনের লেখা চিঠিটা বের করে খবরের কাগজে ছাপানো দ্বিতীয় চিঠিটার পাশে রাখলাম। আমার মনে আর তিলমাত্রও সন্দেহ রইল না, উভয় চিঠি একই লোকের, অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের উদ্ভাবকের লেখা! ব্যস, আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম, আমাকে হত্যার ভয় যিনি দেখিয়েছিলেন তিনিই 'আতঙ্ক' নামক যন্ত্রযানটার ক্যান্টেন। নিজের মনের সঙ্গে ঝট করে বোঝাপড়া সেরে নিলাম, এবার কি রহস্যভেদের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে? চিঠি দুটোর মধ্যেই সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। যদি রহস্যভেদীদের কাজে লাগিয়ে দেই, তবে? এ-সূত্র অনুসরণ করে অগ্রসর হলে কি রহস্যভেদ করা খুবই দুষ্কর হবে?

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে চিঠি দুটো নিয়ে ব্যস্ত-পায়ে পুলিশ দপ্তরে হাজির হলাম। হাঁপাতে হাঁপাতে মি. ওয়ার্ডের ঘরে পা দিয়ে দেখি, তিনি চিঠিটার দিকে নিম্পলক চোখে তাকিয়ে। খবরের কাগজে ছাপানো চিঠিটা নয়, আসল চিঠি, যেটা থেকে ব্রক করে খবরের কাগজগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

আমি ঝট করে পকেট থেকে প্রথম চিঠিটা বের করে টেবিলে, তাঁর সামনে রাখলাম। বললাম, চিঠির শেষে তিনটে অক্ষরের মাধ্যমে চিঠিটাকে স্বাক্ষর করা হয়েছে। উত্তর ক্যারোলিনার মরণানটন ডাকঘর থেকে ছাড়া হয়েছে।

মি. ওয়ার্ড বললেন, 'আপনি কবে এটা হাতে পেয়েছেন মি. স্ট্রক?'

'জুনের তেরো তারিখে, এক মাস আগে। তখন তো নিছক রসিকতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। চিঠিটা ভাল করে আদ্যোপান্ত পড়লেই ব্যাপারটা খেলসা হয়ে যাবে স্যার।'

চিঠিটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মি. ওয়ার্ড বললেন, 'স্বাক্ষরটা তিনটা অক্ষরে করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ স্যার। এম. ও. ডব্লিউ। অক্ষর তিনটে অক্ষরের মাধ্যমে। অর্থাৎ 'এম' দিয়ে 'মাস্টার', 'ও' দিয়ে অব, আর 'ডব্লিউ' দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড' বোঝানো হয়েছে। সব মিলে 'এম. ও. ডব্লিউর অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড'।

'মি. স্ট্রক, উভয় চিঠিই একই হাতে লেখা, তাই না?'

'হ্যাঁ স্যার, সে রকমই তো মনে হচ্ছে।'

'চিঠিতে প্রাণ নেওয়া হবে বলে শাসিয়েছে! আচ্ছা, এক মাস আগে চিঠিটা এসেছে অথচ আপনি আমাকে দেখান নি, কারণ কি বলুন তো মি. স্ট্রক?'

'আসলে ব্যাপারটাকে আমি আগে মোটেই আমল দিই নি। কিন্তু আজকে 'আতঙ্ক' ক্যান্টেনের চিঠিটা পড়ার পর আমার টনক নড়েছে। ব্যাপারটা যে ভয়ানক কিছু এখন বুঝতে পারছি।'

'আপনার অনুমান অসঙ্গত। চিঠিটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ চিঠিটার সূত্র ধরে অগ্রসর হলে অদ্ভুত লোকটাকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে। একটা কথা, 'গ্রেট আইরি' ও 'আতঙ্ক'র মধ্যে কোনো যোগসূত্র রয়েছে বলে আপনি মনে করছেন মি. স্ট্রক? আমার মন হয়, তা অবিশ্বাস্য বলে বোধ হলেও যোগসূত্র একটা আছেই। ব্যাপারটা হচ্ছে, 'আতঙ্ক'র উদ্ভাবক গ্রেট আইরির উপরে তার যন্ত্রপাতি রাখেন। সেখানেই যন্ত্রযান তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন। আর এটাই—'

আমি তাঁর মুখের কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠলাম, 'না, এটা কিছুতেই হতে পারে না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কোনোনাদিক দিয়ে নিয়ে যান? যন্ত্র তৈরির কাজ সেরে তাকে কোন পথেই বা গ্রেট আইরির বাইরে নিয়ে আসেন? আমি নিজের চোখে গ্রেট আইরির রূপ দেখে এসেছি। তাই বলছি কি, আপনার অনুমান কিছুতেই ঠিক নয়।'

'হত, যদি তাঁর অদ্ভুত যন্ত্রযানে দুটো পাখা লাগিয়ে—'

'তাই বা কি করে হতে পারে। আতঙ্ক নামক যে-যন্ত্রযান জল তোলপাড় করে বেরিয়েছে সেই আকাশে উড়ে বেড়াবে? স্যার, এসব আশাড়ে গল্পে আমার আস্থা নেই।'

মি. ওয়ার্ড-ও যে গাঁজাখুরি গল্পে বিশ্বাসী নন তার মুখাবয়বেই সে প্রমাণ পেলাম।

মি. ওয়ার্ড আবারও চিঠি দুটো পাশাপাশি রেখে অনুসন্ধিৎসু নজরে দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। স্বাক্ষর দুটো বেশি করে পরীক্ষা করলেন। শেষমেশ নিঃসন্দেহ হলেন, উভয় স্বাক্ষর একই লোকের। আর কেবলমাত্র একই হাত নয়, একই কলমও ব্যবহার করা হয়েছে।'

মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে এক সময় মুখ খুললেন, 'মি. স্ট্রক, চিঠি দুটো আমার কাছে রাখছি। যদিও মাথায় আসছে না ঘটনা দুটোর মধ্যে কোনদিন থেকে যোগসূত্র রয়েছে। তবু আমার বিশ্বাস, ঘটনা দুটো স্বতন্ত্র প্রকৃতির হলেও কোথায় যেন অংশটুকু একটা মিল রয়েছে। আপনার কাজ হবে, মিলটার যোগসূত্রটা খুঁজে বের করা। তৈরি থাকবেন। যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো মুহূর্তে যাতে বেরিয়ে পড়তে পারেন তার জন্য তৈরি থাকবেন।'

এদিকে জনগণের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেল। সবাই দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে লাগল, আবিষ্কারের এত দম্ব এত দুঃসাহস! জনসাধারণের উত্তেজনা দেখে সরকার বড়ই দুর্ভাবনায় পড়ে গেলেন। হোয়াইট হাউস আর রাজধানীতে জনসাধারণের ক্ষোভ যেন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। সবাই যখন উত্তেজনায় ফুটেছে এখন আর কিছু না করে পারা যাবে না। কিন্তু কি করবেন, কোনোপথে অগ্রসর হবেন? দুনিয়াদারের ঠিকানা কি? ঠিকানা জোগার হলেও প্রেস্তার করার উপায়? তিনি নিশ্চয় মিথ্যা হৃদয়বির করছেন না। তাঁর হিম্মতের পরিচয় তো পাওয়া গেছে। এর চেয়ে বহুগুণ হয়ত করাসম্ভব

রয়েছে যার পরিচয় জনসাধারণের আয়ত্বের বাইরে। পাহাড় ডিঙিয়ে কারডাল হ্রদে কীভাবে হাজির হলেন? বেরোলেনই বা কোন উপায়ে? বহু গ্রাম-শহরের ওপর দিয়ে তিনি সুপিরিয়র হ্রদে হাজির হন, কারোর চোখেই পড়ে নি। এমন একটা অসম্ভব কীভাবে সম্ভব হয়ে উঠল?

ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবছি ততই যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবক লোকটা কোটি কোটি ডলার হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলিহারি সাহস বটে। অর্থের বিনিময়ে তার আবিষ্কারকে কেনা যায় না। এতেও তার ঔদ্ধত্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বহুং আচ্ছা, তবে শক্তির মাধ্যমেই তাঁর মোকাবেলা করা হবে। কারোর কোনো ক্ষতি করার আগেই সমাজের চরমতম শত্রুকে ঘায়েল করা যাক। যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী অক্সা পেয়েছেন ভেবে সরকার এতদিন নিচ্ছেত হয়ে বসেছিলেন। এখন দেখছেন, শত্রু জীবিত, ইহলোকেই রয়েছেন। জনসাধারণের ক্ষোভ অম্বাহ্য করতে না পেরে সরকার পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তিটার প্রচার করা হল, 'আতঙ্কর ক্যাপ্টেন যেহেতু তার আবিষ্কারকে কোনো মূল্যের বিনিময়েই বিক্রি করতে নারাজ তাঁর যন্ত্রটা জনসাধারণের মধ্যে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক সঞ্চার করতে পারে, যাকে কিছুতেই রোধা সম্ভব নয়, সে কারণেই আতঙ্কর ক্যাপ্টেনকে জানানো হচ্ছে যে, দেশের আইন তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম। তাঁকে অথবা তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রকে বন্দি বা ধ্বংস করার যে-কোনো প্রয়াসকে সরকার অনুমতি দিচ্ছে আর পুরস্কারও প্রদান করা হবে।'

ব্যস, পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলল। বিভিন্ন পক্ষ থেকে একের পর এক পুরস্কার ঘোষণা করা হতে লাগল। যন্ত্রের আবিষ্কার, যন্ত্র এবং যন্ত্র তৈরির কারখানার হদিস যে দিতে পারবে, দেশজোড়া আতঙ্ক সৃষ্টিকারীকে যে ধ্বংস করতে পারবে, বিপুল অর্থ দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। জুলাইয়ের শেষ অর্ধাংশে পরিস্থিতি যখন এমন জটিল রূপ নিল তখন অনন্যোপায়া হয়ে অদ্ভুতের ওপর সবকিছু ছেড়ে দিতেই হল। যে কোনো উপায়ে তাঁকে বন্দি করতেই হবে! কিন্তু কথটা মুখে বলা যত সহজ কার্যক্ষেত্রে ততটা সহজ অবশ্যই নয়। তবে মোটর বা বোটের অবস্থান করলে তার কেশপ্রগুৎ স্পর্শ করার হিম্মৎ কারোরই হবে না। অতএব সেটা প্রচণ্ড গতিবেগে বে-পাড়া হওয়ার আগেই তাকে টপ করে বন্দি করে ফেলতে হবে।

আমি ভেঁরি হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। মি. ওয়ার্ডের কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেলেই কাজে লেগে যাব। কিন্তু আদেশ এল না। কি করবে বা আসবে? যাকে বন্দি করতে যাব, তিনি যে নিখোজ।

এদিকে জুলাই শেষ হতে চলেছে। খবরের কাগজগুলো গরম গরম খবর ছেপে জনসাধারণের মধ্যে ভয়-ভীতি অব্যাহত রেখে চলেছে। খবরের নামে নিছকই গুচ্ছের খানেক গুজব ছেপে উত্তেজনাকে জিইয়ে রাখার অদ্ভুত কৌশল যাকে বলে।

শেষপর্যন্ত উনত্রিশে জুলাই মি. ওয়ার্ড টেলিফোন মারফৎ আমাকে জরুরি তলব করলেন।

আমি যেতেই তিনি কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে বললেন, 'মি. স্ট্রক। এক ঘণ্টার মধ্যেই টোলেডোর উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে। আতঙ্কর দেখা মিলেছে। আর সেখানে পৌঁছানোর পর চূড়ান্ত নির্দেশ পেয়ে যাবেন। অফিসের তরফ থেকে আপনার প্রতি আমার নির্দেশ রইল, এবার সাফল্য লাভ করতেই হবে। মি. ওয়ার্ডের নির্দেশ পেয়ে আমি অভিভাদন সেরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

হ্যাঁ, বোঝা গেল, নাগালের বাইরে যে ক্যাপ্টেন তিনি তবে আবার ভুঁইফোড়ের মতো যুক্তরাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছেন। একটা ব্যাপার, লোকটাকে কিছু কখনই ইউরোপের জলপথে বা স্থলপথে দেখতে পাওয়া যায় নি। তিনদিনের আটলান্টিক অতিক্রম করা সম্ভব? তবু সে চেষ্টা ভুলেও কোনোদিন তিনি করেন নি। তাঁর আসল ধাক্কাটা কি? কেবলমাত্র আমেরিকাতেই নিজের বিক্রম প্রদর্শন করা? তবে কি মনে করা যেতে পারে তিনি একজন আমেরিকানই বটে? চিন্তাটাকে মন থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হল না। পুরাতন ও নতুন পৃথিবীর কোনো জাহাজেরই নেই। 'আতঙ্ক' জলের তলদেশ দিয়ে পথ খাড়া দেবে, সাধারণ জাহাজের মতো তো তার গতি নয়। তাই আটলান্টিক মহাসাগর-নিরাপদে অতিক্রম করা একমাত্র সেটার পক্ষেই সম্ভব। ঝড় সেটাকে স্পর্শও করতে পারে না।

তবে? তবে কেন আবিষ্কারক আমেরিকা ছেড়ে ইউরোপে যেতে উৎসাহী হন নি? ওহিওর টোলেডো শহরে কেনই বা আবার আবির্ভূত হয়েছেন। আমেরিকাতেই কি তিনি বন্দি হতে উৎসাহী?

গুপ্তচরের দ্বারা পুলিশ-দপ্তরে খবরটা পৌঁছেছে বলেই হয়তো এবার ব্যাপারটা নিয়ে হৈ-হুটগোল সৃষ্টি হল না। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টিকারী যান আতঙ্কর আবিষ্কারক ও চালকের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য আমি চলেছি। খবরের কাগজগুলোও খবরটা না পাওয়ায় দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারল না। তদন্ত শেষ না হওয়া অবধি গোপনীয়তা রক্ষা অবশ্যই করা হবে।

আমি মি. ওয়ার্ডের আদেশপত্র নিয়ে আর্থার ওয়েলসের কাছে চলেছি। তিনি আমার জন্য টোলেডো-তে অপেক্ষা করছেন। ওহিওর ওপর দিয়ে রাতভর ট্রেন ছুটে পরের দিন দুপুরের কাছাকাছি টোলেডো স্টেশনে হাজির হল।

ন্যাব ওয়াকার আর জন হার্টের মতোই গুলিভরা পিস্তল আর সাইডব্যাগ নিয়ে আমি প্রাটফর্ম পা দিলাম। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার ভাগিদে অস্ত্রের প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। প্রাটফর্ম ধরে দুপা এগোতেই আর্থার ওয়েলসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিলাম আর তাঁর পরিচয়ও জেনে নিলাম।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়টুকু সেরে আমি বললাম, 'মি. ওয়েলস, আমাকে কি এখানে রাত্রি বাস করতে হবে?'

মুচকি হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'না, তবে সে তো আপনার ওপরই নির্ভর করছে মি. স্ট্রক।'

গেটের বাইরে ঘোড়ার গাড়ি অপেক্ষা করছিল। আমরা উঠতে কোচোয়ান চাবুক হাঁকাল। প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্তী র্যাক রক ক্রিকে আমাদের যেতে হবে। স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে একটা হোটেলের জিম্মায় সাইড ব্যাগটা রেখে আবার গাড়িতে উঠলাম।

পথ চলতে চলতে আর্থার ওয়েলস বললেন, ব্ল্যাক রক ক্রিক জায়গাটা পাহাড়ে ঘেরা, সবুজে ঢাকা অদ্ভুত একটা পরিবেশে অবস্থিত। মনে হচ্ছে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অভিযান-পর্বটা চুকিয়ে ফেলা যাবে। ফ্লাফল দূরকমই হতে পারে। আতঙ্ক-র আবিষ্কারক ও স্বত্বাধিকারী বন্দিও স্বীকার করবেন, নতুবা আমাকে ব্যর্থতার জ্বালা বুকে নিয়ে ফ্যাকাসে মুখে ফিরে যেতে হবে।

আর্থার ওয়েলসের বয়স বছর চল্লিশেক। গাটোগাটো চেহারা। গায়ে শক্তিও ধরেন যথেষ্টই। পুলিশ বিভাগের গুপ্তচর হিসেবে তাঁর নামডাক খুবই। অন্য এক কাজের তাগিদে টোলেডোতে গিয়ে বরাবের জোরে আতঙ্কর খবর পেয়ে গেছেন। আইরিহুদের তীর ধরে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে গাড়িটা ছুটে চলল। আইরিহুদের আয়তন প্রায় দশ হাজার বর্গমাইল। মোদ্দা কথা এটা চমক সৃষ্টিকারী একটা হ্রদ। সুমেরুর অস্বাভাবিক শৈত্য নির্বিবাদে ধৈর্যে এসে শীতকালে এর জল বরফে পরিণত হয়ে যায়।

নিউ ইয়র্ক রাজ্যের অন্তর্গত জমকালো বাফেলো শহরের পূর্ব তীরে আর ওহিও রাজ্যের বর্ধিষ্ণু শহর টোলেডো শহর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। আর উভয় তীর ঘেঁষে রয়েছে ছোট বড় অগণিত শহর ও গ্রাম। সে অনুপাতে যানবাহনও সংখ্যায় প্রচুরই। প্রায় বিশ লক্ষ ডলার বছরে আয় হয়।

লোকের তীর বরাবর গাড়িটা ছুটে যাবার সময় আর্থার ওয়েলস কি দেখেছে, কি শুনেছে আর কি বুকেছে আমার কাছে খোলসা করে ব্যক্ত করল।

তিনি দিন দুই আগে ঘোড়ায় চেপে জরুরি কাজের তাগিদে বনপথে হ্যালি নগরের দিকে যাবার সময় দেখলেন হ্রদের জলে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে একটা ডুবোজাহাজ ভুস করে ভেসে উঠল। নাগাল টেনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে, গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলেন, যন্ত্রযানটা অবস্বাভাবিক গতিতে ব্ল্যাক রক ক্রিকের মোহনায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাড়ের দিকে এগোতেই দুজন পুরুষ ডেকের ওপর এসে দাঁড়াল। একজন লাফিয়ে তীরে নামল। তবে কি ইনিই মাষ্টার অ বদ্য ওয়ার্ল্ড? আর এটাই রহস্যসম্বলিতকারী যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'? দীর্ঘদিন গা-ঢাকা দিয়ে আসার পর আবার গভীর জল ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে? আমি একেবারেই একা। নিদেন পক্ষে আপনারা তিনজনও যদি সঙ্গে থাকতেন তবে হতচ্ছারাটাকে ঠেসে ধরতাম। বাছাধনকে আর যন্ত্রযানে ফিরতে দিতাম না কিছুতেই। ডুবোজাহাজটাও দখল করে নিতাম। আর্থার ওয়েলস চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'মি. ওয়েলস, আমার আশঙ্কা একটাই, ইতিমধ্যে যদি অত্যদ্ভুত যন্ত্রযান আতঙ্ককে নিয়ে তার আবিষ্কারী মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড চুপি চুপি কেটে পড়ে।

রাত্রির অন্ধকারেই আমি টোলেডোতে ফিরে এসে সোজা টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে ওয়াশিংটন শহরে টেলিগ্রাফ করে বাড়ি ফিরি। তারপরও আমি ব্ল্যাক রক ক্রিকে গিয়েছিলাম। ডুবোজাহাজটাকে একই জায়গায় ভেসে থাকতে দেখেছি। আর মানুষও দুজনই। ব্যাপার দেখে মনে হল দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রযানটিকে বিকল হয়ে গেছে, সারাজে। আমি বললাম, 'আমরা পৌছনো পর্যন্ত সেখানে থাকবে কিনা কে বলতে পারে।'

'থাকবে। মনে হচ্ছে এখনও আছে। মেরামতি কাজ এর মধ্যে শেষ না হবারই কথা।'

'আপনি বললেন, তারা সংখ্যায় দুজন। মাত্র দুজনের পক্ষে এমন শক্তিশালী একটা যন্ত্রযানকে আয়ত্বে রাখা কি করে সম্ভব, ভাবছি।'

'আপনি বললেন, তারা সংখ্যায় দুজন। মাত্র দুজনের পক্ষে এমন শক্তিশালী একটা যন্ত্রযানকে আয়ত্বে রাখা কি করে সম্ভব, ভাবছি।'

'আমারও একই বিশ্বাস। কিন্তু দুজন ছাড়া তো কাউকে নজরেও পড়ে নি।'

'ভাল কথা, তাদের দুজনকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন তো মি. ওয়েলস?'

'অবশ্যই পারব। যাক যে কথা বলছিলাম, গতকাল আগের দিনের মতোই বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি বন ছেড়ে এসেছিলাম। তখনই মি. ওয়ার্ল্ডের টেলিগ্রাফটা হাতে পাই। আপনার আসার খবর পেয়ে যথাসময়ে স্টেশনে যাই। ট্রেন এল। যাত্রীদের মধ্যে থেকে আপনার চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা অনুযায়ী আপনাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হল না।'

এতক্ষণ আমাদের মধ্যে যে কথাপোকথন হয়েছে তার মূল বক্তব্য—ব্ল্যাক রক ক্রিকের মোহনায় প্রায় ঘণ্টা চল্লিশেক আগে দুজনকে একটা ডুবোজাহাজ মেরামত করতে দেখা গিয়েছিল। আমরা এ-যন্ত্রটার তত্ত্বাসেই হন্যে হয়ে দাপিয়ে বেড়াছি কিনা তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আর যন্ত্রযানটিকে বিকল না হলে সেটার ভেসে ওঠার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তবে আশা করা যাচ্ছে, আমরা গিয়ে তাঁদের দেখা পাব। এখন সবচেয়ে বড় জিজ্ঞাসা, যন্ত্রদানবটা আইরিহুদে কীভাবে ঢুকতে পারল? সবার শেষে সেটাকে সুপিরিয়র হ্রদে দেখা যায়। সেখান থেকে মিচিগানের পথ ধরে তাকে গ্রেট আইরিতে আসতে হবে। স্থলপথে মানুষের ভিড়, উৎপাত খুবই। তাই 'আতঙ্ক' জলপথ ধরেছে। অতএব কারোর নজরে পড়ার কথা নয়। আমরা যে-পথেই যাই না কেন, জায়গামতো পৌঁছে দেখব, আমাদের বাঙ্কিত মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড অনেক আগেই চম্পট দিয়েছে। তাকে অনুসরণ করা আমাদের সাধের বাইরে।

আইরিহুদের একেবারে শেষ প্রান্তে অবশ্য দুটো টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার আছে। যাত্রার পূর্বমুহুর্তে মি. ওয়ার্ল্ড আমাকে এরকমই বলে দিয়েছিলেন। তবে সেটা আতঙ্কর কাছে, মোচার খোলা, খেলনা-নৌকার সামিল। আর যদি সেটা টুপ করে জলে ডুব দেয় তবে তো আর কথাই নেই। আর আজ রাতে লড়াই করে যদি সফল না হই তবে অভিযান ব্যর্থ হবেই।

আমাদের গাড়ি জঙ্গল-পথ ধরতে সক্ষম ঘনিয়রে এল। বরাতে ভাল যে, আর্থার ওয়েলসের পথঘাট চেনা। হ্রদের কিনারা পর্যন্ত যাওয়ার চিন্তাই করা যায় না। বাঙ্কিত প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন আমাদের দেখেই চোখের পলকে সটকে পড়বে।

আরও কিছুটা এগিয়ে আর্থার ওয়েলস গভীর জঙ্গলে গাড়ীটাকে রেখে আমাদের নিয়ে পায়ে হেঁটে অগ্রসর হতে লাগলেন। গাড়ির আওয়াজ শুনে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট।

একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে আর্থার ওয়েলস বলল, 'রাত্রি একটু গভীর না হওয়া অবধি আমাদের অপেক্ষা করা উচিত'।

গাছের পাতায় ফাঁক দিয়ে উঁকি দেওয়া হাঝা চাঁদের আলোয় দেখলাম, সাড়ে আটটা বাজে। আমাদের চারজনের নৈশ-অভিযান শুরু হল। আর্থার ওয়েলস পথপ্রদর্শক। আমি তার পিছনে। তারপর ন্যাব ওয়াকার ও জন হার্ট।

ব্ল্যাক রক ক্রিকের তীরে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল। ভাবলাম, আতঙ্ক যদি এখনও থেকে থাকে তবে আছে কোনো বড়সড় পাথরের আড়াল। কিন্তু সে কি আদৌ আছে? প্রশ্ন তো একটাই। তার বা তাদের দেখা পাব কি?

আমরা পা টিপে টিপে গাছের আড়াল দিয়ে এগোতে লাগলাম। কারো মুখে টু-শব্দটি ও নেই। নিঃশ্বাস নিতেও যেন সাবধানতা অবলম্বন করে চলেছি। যাকে বলে চরম মুহূর্ত। আর মাত্র দুশো ফুট অতিক্রম করলেই বাঙ্কিত নদীর মোহনার ধারে পৌঁছে যাব। প্রায় দম বন্ধ করে মোহনার ধারের পাথরটার কাছে গিয়েই আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। হায় ঈশ্বর! পাখি যে পালিয়েছে! ভেঁ-ভেঁ! যন্ত্রযান উধাও। আর্থার ওয়েলস আতঙ্কে যেখানে দেখেছিল সে জায়গাটা ফাঁকা। কেবল নিঃশীম অন্ধকার সেখানে বিরাজ করছে। মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড ব্ল্যাক রক ক্রিক ছেড়ে পালিয়েছেন। আর্থার ওয়েলস সত্যিই যন্ত্রযান ও তার মালিককে দেখেছিল যদি ধরে নেওয়া যায় তবে তারা কোথায় উধাও হয়ে গেল। তার কলকজা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জলপথ বা স্থলপথে আতঙ্ক তার গোপন আস্তানায় তো যেতে পারেনি।

জন হার্ট ও ন্যাব ওয়াকার সাহসে ভর করে হ্রদের কিনারা বরাবর অনেকটা পথ হাঁটাচাঁক করে দেখে এল। কিন্তু বাঙ্কিত যন্ত্রযান বা তার কোনো ভাঙ্গা যন্ত্রাংশও দেখতে পেল না।

হঠাৎ হ্রদের জলে ঢেউ দেখা দিল। অনেকটা নৌকার দ্বারা সৃষ্ট উেয়ের মতোই ঢেউ। হয় জলের তলদেশ থেকে কিছু ঠেলে উঠে আসছে, নতুবা লেকের জলের ওপর দিয়ে যা হোক কিছু ক্রিক মোহনার দিকে এগিয়ে আসছে। আমরা চার-চারটে প্রাণী চার জোড়া অপলক চোখে হ্রদের জলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলাম। সবাই নির্বাক, নিস্তব্ধ। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতেও কারো সাহসে কুলোচ্ছে না। জলোচ্ছাস বাড়ছে বৈ কমছে না। আর প্রপেলারের পাখা ঘুরলে যেমন আওয়াজ হয় ঠিক সেরকম চাপা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। সেটা যে বোটের শব্দ সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহই রইল না। আইরি হ্রদে হাঙর বা তিমি থাকলে না হয় অন্য রকম সন্দেহের কোনো কারণ থাকত না। তবে? সেটা বোটের শব্দই বটে। আর শব্দটা মোহনার দিকেই এগিয়ে আসছে।

আর্থার ওয়েলস আমার দিকে ঝুঁকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল, 'মি. স্ট্রক, আমি যে-বোটের কথা আপনাকে বলেছিলাম সেটা যদি এ-বোটই হয় তবে নির্ধাৎ তার আগের জায়গাতেই ফিরে আসবে।'

আমি ও আমার তিন সঙ্গী বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে নীরবে অন্ধকার আইরি হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা আবছা বস্তুকে তীরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখরাম। মস্তুর তার গতি। এখনও ক্রিকের ভেতরে প্রবেশ করে নি। হ্রদের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে। জলযানটার ইঞ্জিনের চাপা আওয়াজও শোনা যেতে লাগল।

আর্থার ওয়েলস তেমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'ক্রিকের আড়ালে রাত্রি কাটানোর ধাক্কা যন্ত্রযানটা এগিয়ে আসছে।'

কথা হচ্ছে, আবার যদি আসবেই তবে নোঙর তুলে জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছিলই বা কেন? তবে কি ইঞ্জিনটা আবার বেগড়বাই করছে? শক্তি কমে যাওয়ার কোনো ব্যাপার-স্যাপার দেখা দিয়েছে নাকি? আবার এমনও তো হতে পারে হঠাৎ কোনো বিপদের আশঙ্কায় আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল? মেরামতি কাজ যদি মিটেই থাকে তবে ফিরে না এসে ওহিওর সড়কপথে চম্পট দিলেই তো পারত। তবে মনে করা যেতে পারে 'আতঙ্ক' সম্প্রতি মোটর-স্থলযানে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে?—এরকম হাজারো প্রশ্ন আমার মাথার চারদিকে ভিড় করতে লাগল। আমি আর আর্থার ওয়েলস একই চিন্তায় তন্ময় হয়ে রইলাম, সত্যি কি 'আতঙ্ক' নামক ভয়ঙ্কর সে যন্ত্রটাকেই দেখছি তো? নাকি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বশত ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়ে অস্তিরতার মধ্যে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছি?

কালো সে সচল বস্তুটা ধীর মস্তুর গতিতে ব্ল্যাক রক ক্রিকের দিকে এগিয়ে আসছে। চালকের আত্মনিঃশ্বাস এতই প্রবল যে, কেবিনে আলো পর্যন্ত জ্বলে নি।

মিনিট কয়েকের মধ্যে বোটটা জেটিতে ভিড়ল। প্রাকৃতিক জেটি।

আর্থার ওয়েলস আমার দিকে ঝুঁকে, কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে খুবই অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, 'মি. স্ট্রক, আমার মনে হয় এখানে আর থাকা ঠিক হবে না। যে-কোনো সময় আমাদের দিকে তাঁর চোখ পড়ে যেতে পারে।'

'বালির ওপর টান টান হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নয় তো পালিয়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। অন্ধকার বস্তুটা আরও এগিয়ে এসেছে। ওই—ওই দেখুন, ডেকের ওপরে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে, আবছা, খুবই অস্পষ্ট দুটো মনুষ্যমূর্তি।'

হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম। রহস্যময় লোকদুটো এবার আর আমাদের দেখতে পাবে না। আমরা কিন্তু তাদের কার্যকলাপ ঠিকই দেখতে পাব।

ডেকের ওপর দণ্ডায়মান ব্যক্তি দুজনের কথোপকথন অস্পষ্ট হলেও শুনতে পেলাম। ইংরেজিতে বাক্যলাপ করছে। বুঝতে দেরি হল না, তারা নোঙর ফেলার তোড়জোড় করছে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে তার সামনে এসে ঝপাৎ করে আছাড় খেয়ে দড়িটা পড়ল। তারপরই শোনা গেল নোঙরের লোহা আর পাথরের ঘর্ষণের শব্দ। আর্থার ওয়েলস সামান্য কোমড় বাঁকিয়ে দেখল, নাবিক দুজনের মধ্যে একজন চাতালে লাফিয়ে উঠে দড়িটা চেঁপে ধরেছে। পর মুহূর্তেই ভেজা

বাতির ওপর পা ফেলে ফেলে জাহাজের আলোয় পথ দেখে দেখে জঙ্গলের দিকে এগোতে লাগল। তারা কোথায় যাচ্ছে? এ তর্রাটে মনুষ্য বসতি নেই। তবে কি এখানেই তারা খাবার-দাবার ও অন্যান্য সামগ্রী মজুত রাখে?

তারা তখন ফুট ত্রিশেক দূরে। একজন আমাদের দিকে আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

আমি হঠাৎ ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম—আরে, একী! আমার ভুল হচ্ছে না তো? না। চোখের ভুল নয়। যে-দুজন আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখত এ যে তাদেরই একজন। না, ভুল অবশ্যই হয় নি। এ মুখ ভোলায় নয়। তিলমাত্র সন্দেহও রইল না। তবে কি, মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড 'আতঙ্ক'র ডেক থেকে হুমকি দিয়ে চিঠিটা লিখেছিল? আমি মেলাতে পালাম না, গ্রেট আইরির সঙ্গে এর কোন দিক থেকে যোগসাজস থাকতে পারে! নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে আর্থার ওয়েলসকে ফিসফিসিয়ে কথাটা বললাম।

আর্থার ওয়েলস নড়েচড়ে বসে অত্যাশ্চর্যের সঙ্গে বলল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বড়ই জটিল সমস্যা দেখছি।' এবার যেন একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'তারা যদি আমাদের উপস্থিতির কথা টের পেয়ে যায়, তবে? আর ঘোড়া দুটোও কোচোয়ানকে দেখে ফেলে?'

'ছুটে বোটের দিকে আসবে। আমরা কিছুতেই তাদের বোটে উঠতে দেব না।'

তারা জঙ্গলের দিকে উঠে গেলে আমরা পা টিপে টিপে নোঙরটার কাছে গেলাম। দড়িটার বিপরীত প্রান্ত আতঙ্কর সঙ্গে বাধা। আতঙ্ক জলে ভাসছে।

আর্থার ওয়েলস চাপা অথচ কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলল, 'মি. স্ট্রক, বোট থেকে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে না তো?'

এমন সময় লোক দুজন একটা কাঠের বোঝা নিয়ে জঙ্গল থেকে ফিরে এল। অন্ধকার থেকে কে একজন বলল, 'হ্যালো ক্যাপ্টেন।'

আর্থার ওয়েলস আমার কানে কানে বলল, 'কি বুঝছেন মি. স্ট্রক, তারা দুই নয়, সংখ্যায় তিনজন। চারজন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।'

'হ্যাঁ, চার কেন, পাঁচজন হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।'

পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। এত লোকের মোকাবেলা করা আমাদের চারজনের পক্ষে কি করে সম্ভব? কাজের গতিপ্রকৃতি, বুদ্ধির সামান্য অভাব, উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সামান্য দেরি হলেই সর্বনাশের চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

তাদের মতিগতিও বুঝা যাচ্ছে না। কাঠগুলো তুলে আতঙ্ককে নিয়ে কেটে পড়ার ধাক্কায় আছে নাকি? না, ভোরের আলো দেখা দেওয়া অবধি এখানেই রয়ে যাবে? এখনি নোঙর তুললে তো ধরার প্রশ্নই ওঠে না। আইরির হৃদ থেকে ছেঁয়েটে নদী পেরিয়ে হরগ হ্রদে হাজির হবে। গ্রেফ ব্ল্যাক রক ক্রিকের মতো অপূর্ব সুযোগ কি আর কোথাও পাওয়া যাবে?

আমি আক্রমণের সিদ্ধান্তই নিয়ে নিলাম। বললাম, 'আমরা চারজন মিলে যদি তাদের আচমকা আক্রমণ করে বসি তবে তারা ঘাবড়ে গিয়ে হাল ছেড়ে দিতে পারে। তারপর বরাতে যা আছে দেখা যাবে।'

বোট থেকে ক্যাপ্টেন বেশ একটু গলা চড়িয়েই বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে তো? আরও দুবোঝা কাঠ তো রয়ে গেছে, তাই না। বরং পা চালিয়ে গিয়ে সব এনে 'আতঙ্ক'র ডেকে তোল। ভোরের আলো ফুটলেই না হয় যাত্রা করব।'

ভাবলাম 'আতঙ্ক'তে মোট কজন আছে? মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড আর কাঠবাহক দুজন—মোট তিনজন।

তাদের পরিকল্পনাটা ধরা গেল। বোটে কাঠ তুলে বাকি রাত্রিকু ঘুমিয়ে কাটাবে। চমৎকার। ঘুমন্ত অবস্থায় আচ্ছা বেঁধে ফেলা কঠিন সমস্যা হবে না। অস্ত্র হাতে নেওয়ার সুযোগও দেব না। দেখব, বাহাদুররা করে কি। আর্থার ওয়েলস ও আমার আর দুজন সঙ্গীকে আমার পরিকল্পনাটা বললাম। সবাই সোলাসে আমাকে সমর্থন করল।

তখন সাড়ে দশটা। কাঠবাহকরা আবার জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

আমরা আবার পাথরটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারা কাঠ নিয়ে ফেরার পরও অন্তত ঘণ্টা খানেক ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হবে। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। একটু ভুলচুক হলেই মওকা হাতছাড়া হয়ে যাবে। দেখা যাবে, খাঁচা ফাঁকা, পাখি উধাও। তা যদি না-ও হয় আতঙ্ক খুপ করে জলে ডুব দেবে।

আমার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার উপক্রম হল। নির্ঘাৎ কাঠ নিয়ে ফেরার সময় তারা কোনোরকম বাধার সম্মুখীন হয়েছে। নইলে ফিরতে এত দেরি হবে কেন? হঠাৎ হৈ হইগোল কানে এল। দুটো ঘোড়া হ্রদের তীর ঘেঁষে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই চমকে ওঠলাম। সর্বনাশ! এযে আমাদের গাড়িরই ঘোড়া দুটো। পরমুহূর্তেই কাঠ বাহক দুজনকে উদ্ধৃষ্টাসে ছুটে আসতে দেখা গেল। আমরা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বুঝলাম তারা নির্ঘাৎ টের পেয়েছে। পুলিশ এসেছে।

আমি মরিয়া হয়ে হাঁক দিলাম, 'ধর! ধর! যেন পালাতে না পারে।'

খট করে কাঁধ থেকে কাঠের বোঝা ফেলে দিয়ে তারা পিস্তল টেনে হাতে নিয়ে নিল। এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল। জন হার্টের পায়ে গুলি লাগল।

আমাদের পিস্তলও গর্জে উঠল। চলল উভয় পক্ষের গুলি বিনিময়। আমাদের গুলি তাদের কারো গায়ে আঘাত করতে পারল না। তারা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে নোঙরের দড়ি ধরে কুলতে লাগল। নোঙর ভোলার সুযোগ পেল না। আমি আর ন্যাব ওয়াকার অতিকায় কালো বস্ত্রটাকে আটকে রাখার জন্য শরীরের সবটুকু শক্তি নিঙড়ে দড়িটাকে টেনে ধরে রাখলাম।

পরিস্থিতি জটিল দেখে ডেকের ওপর থেকে ক্যাপ্টেন অনবরত গুলি চালাতে লাগলেন। বরাত ভাল, অন্ধকারের বাধা থাকায় আমাদের কারোর গায়ে গুলি লাগল না। আমরা প্রাণপণে দড়ি টেনে বোটটাকে কাছে আনতে লাগলাম। কপলের ফের। টানাটানিতে আচমকা পাথরের খাঁজ থেকে নোঙর আলগা হয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল। নোঙরের হেঁচকা টানে আমি ঝপাং করে জলে পড়ে গেলাম।

নিমেষের মধ্যে আতঙ্ক অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল।

আমি যে কতক্ষণ জলের তলায় ছিলাম, বলতে পারব না। জল থেকে কীভাবে ওপরে উঠে এসেছি তা-ও আমার জানা নেই।

আমি এক সময় চোখ মেলে তাকালাম দেখি, ছোট্ট একটা কেবিনের চৌপায়ার ওপর শুয়ে। ধারে কাছে কেউই নেই। কেবিনটার দরজা বন্ধ। সূর্যটা তখনও বেশি ওপরে ওঠে নি। ভাবলাম আমি তবে কোথায়? আতঙ্কর ডেকে? আমার সঙ্গীরা? তারা হয়ত আইরি-হ্রদের জলে আমার মৃতদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

হ্যাঁ, আমি যে 'আতঙ্ক'র কেবিনে বন্দি রয়েছি এতে কোনো সন্দেহই রইল না। কিন্তু এটা এখন কোথায়? তবে তরল পদার্থের ওপর দিয়ে যে এটা পথ পাড়ি দিচ্ছে সে বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু যে-তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে 'আতঙ্ক' চলেছে তাকে তো জল বলে মনে হচ্ছে না। সূর্যের আলো পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে। পোর্টহোল কি ডুবে গেছে? মোটরগাড়ির মতো যন্ত্রযানটা রাস্তা দিয়ে চললে কম-বেশী ঝাঁকুনি লাগতই। তবে? এর উত্তর জানার জন্য দরজা খোলার চেষ্টা করতে ভরসা হল না। তা ছাড়া বাইরে দিয়ে হয়ত তালা খুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মাথার ওপরের ঢাকনা চৌপায়ার ওপর দাঁড়িয়ে ওপরের ঢাকনা খুলে বাইরের দিকে চোখ ফেলতেই দেখি, চারদিকে জল আর জল, ডাঙার চিহ্নও নেই। বহুদূরে সাগর আর আকাশ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একী সমুদ্র, নাকি হ্রদ তা-ও বোঝার উপায় নেই।

দু-চার ফোঁটা জল ছিটকে আমার গায়ে এসে পড়তে লাগল। তারই এক ফোঁটা আঙুল দিয়ে তুলে জিভের সঙ্গে লাগাতেই বুঝে নিলাম, জল নোনতা নয়, তবে? তবে কি আতঙ্ক আইরি-হ্রদের জলেই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে? ত্রিকের আস্তানা থেকে রওনা হবার পর ঘণ্টা আটেক সময় পেরিয়ে গেছে। আজ তবে জুলাইয়ের আটত্রিশ তারিখ। আইরি-হ্রদটা দুশো কুড়ি মাইল লম্বা। পঞ্চাশ মাইলের বেশি চওড়া। উত্তর-পশ্চিমের কানাডা এবং দক্ষিণ-পূর্বের যুক্তরাষ্ট্র কিছুই চোখে পড়ছে না।

দেখলাম, মাত্র দুজন ডেকে দাঁড়িয়ে। একজন পিছন দিকে রয়েছে আর অন্যজন গলুইয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে নজর রাখছে। একটু বাদে গলুইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ একটু গম্ভীর স্বরেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক্যাপ্টেন কোথায়?'

লোকটা আমার কথা বুঝতে পারে নি এমন এক ভান করে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বুঝতে না পারার তো কথা নয়। গতরাত্রি এদের ইংরেজিতে কথা বলতে শুনেছি। তব একটা ব্যাপার অবাক না হয়ে পারলাম না। আমি মাথার ওপরের ডালা তুলে কেবিন থেকে বেরাবার সময় লোকটা আমাকে দেখছে। কিন্তু টু শব্দটিও করে নি।

লোকটা আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হাতে ইশারা করল, দূরে সরে যাবার জন্য।

বাধ্য হয়ে তার কাছ থেকে চলে এলাম। পালানোই যখন যাবে না তখন যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'কে ঘুরে ঘুরে দেখে নিতে লাগলাম।

দেখলাম, ডেকের ওপরে যেসব জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে সবই অজ্ঞাত কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। হাত দিয়ে ধরেও বুঝতে পারলাম না কোন ধাতু।

একটা ধাতব সিঁড়ি। নিচের মেশিনরুমে নেমে গেছে। সামনে একটা পেরিস্কোপের চুঁড়ো নজরে পড়ল। গলুইয়ে আর একটা ঢাকনা দেখতে পেলাম। তৃতীয় ঢাকনা। পিছিয়ে গিয়ে সামান্য এগিয়েই আরও একটা দেখা গেল। ঢাকনার নিচে দুটো কেবিন। ডেকের ওপরে যারা দাঁড়িয়ে তাদের থাকার জায়গা।

যে যন্ত্রটা আতঙ্ককে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সেটাকে খুঁজে পেলাম না। প্রপেলারও চোখে পড়ল না। যন্ত্রটা তীরবেগে ছুটে চলেছে। পিছনে সুদীর্ঘ জললেখা তৈরি হচ্ছে। জলযানটার গঠন প্রকৃতি ছবির মতো। অনায়াসে জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রেও এটা নির্বিবাদে চলতে সক্ষম। ডেউয়ের ওপর বা তলা, কোনো জায়গা দিয়েই এর চলতে অসুবিধা হয় না।

আশ্চর্য ব্যাপার! এমন অতুলনীয় গতির উৎস কি জানা গেল না। মোটরগাড়ি বা ডুবোজাহাজে যে তেল ব্যবহার করা হয় সেরকম কোনো গন্ধই নাকে লাগল না। তবে নির্ঘাৎ বিদ্যুৎ শক্তির জোরেই জলযান 'আতঙ্ক' এমন তীরবেগে ছুটে যেতে পারে।

আর এর ভেতরেই বিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে। ব্যাটারি? অ্যাকুমুলেটর বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করছে? জল বা বায়ুমণ্ডল থেকে অজ্ঞাত কোনো উপায়ে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ করে নেওয়া হচ্ছে। আর তাকে যন্ত্রের ভেতরেই তৈরি করা হচ্ছে। হন্যে হয়ে সে-শক্তির উৎসের খোঁজ করলাম। না, হতাশ হতেই হল। পাইনি, কোনোদিন তার খোঁজ পাবও না। আমার পক্ষে কি কোনোদিন যান্ত্রিক শক্তির গোপন রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে?

ওদিকে মি. ওয়ার্ড আমার ব্যর্থতা ও চরম দুর্গতির কথা জানতে পেরে কি করছেন, ভাবনাটা মনের কোণে ভেসে উঠল। মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড-ক কজা করার জন্য তিনি নতুন কোনো পথের কথা ভাবছেন কিনা তাই বা কে জানে।

ক্যাপ্টেনের দেখা পাবার আশায় ডেকে দাঁড়িয়ে এমন বহু এলামেলো কথা ভাবতে লাগলাম। না, ক্যাপ্টেনের দেখা মিলল না। তবে কি তিনি কোনোদিনই আমাকে দেখা দেবেন না? আর মুক্তি না দিয়ে আমৃত্যু এখানেই আটকে রাখবেন মনস্থ করেছেন? তবে? সুযোগ মত যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করব তারও উপায় নেই। অন্তহীন জলরাশি অতিক্রম করে কোনোদিনই ডাঙায় উঠতে পারব না। আরও এক চিন্তা মাথায় এল। ক্যাপ্টেন আমার মুখোমুখি হলে কেমন আচরণ করবেন, ভাববার বিষয় বটে।

না, পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, উচিত নয়। কারণ, যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'র গুহ্য রহস্য না জেনে পালিয়ে গিয়ে লাভই বা কি? অভিযানে সামান্যতম অংশও সফল হই নি। রহস্যের জালের বাইরে ছিলাম। এখন তার ভেতরে অবস্থান করছি। ব্যস, এটুকুই এখন পর্যন্ত সাব্বনা।

সূর্য মূল মধ্যরেখা অতিক্রম করে গেল। নির্মেষ আকাশ। ঝলমলে রোদ চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। উভয় দিকে তীরের রেখা এখনও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে আমেরিকা বা কানাডা কোনো তীরই এখনও নজরে পড়ছে না। ক্যাপ্টেনের ধাক্কাটাই তো এখনও বুঝতে পারছি না। তিনি আদৌ আমার মুখোমুখি হবেন না? কেন? সারাদিন আড়ালে থেকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তিনি আড়ালে থেকেই আমাকে তীরে নামিয়ে দেবেন?

দুপুর দুটোয় আমাকে অবাক করে দিয়ে বহু আকর্ষণীয় ক্যাপ্টেন হঠাৎ আবির্ভূত হলেন। আমি আরও স্তম্ভিত হলাম যখন দেখলাম তিনি আমার দিকে না তাকিয়েই কাঁটামারা বুটে গম্বীর আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেলেন। তার সঙ্গে লোকটা ঢাকনা খুলে ডেকে নেমে গেল। ক্যাপ্টেন কম্পাসের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালেন। কি যেন ভেবে যন্ত্রযান আতঙ্কর মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমিই যে গ্রেট আইরির রহস্যভেদের দায়িত্ব নিয়ে অভিযানে গিয়েছিলাম এব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ। আমারও আর কোনোই সন্দেহ রইল না, যে এ লোকটিই আমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার ওপর কড়া নজর রাখতেন। আমার মনে হল, কথা বললে আমি যদি তাঁর কাছে মুক্তির জন্য আশ্রয় করে বসি। আর তাঁর সম্বন্ধে আমি যতটুকু জেনেছি বা বুঝেছি তা যদি সভ্য মানুষের কাছে ফাঁস করে দিই, সেজন্যই হয়ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমাকে বন্দি করে রেখেছেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি বুকে সাহস সঞ্চার করে দ্রুত-পায়ে ক্যাপ্টেনের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়িলাম। বেশ একটু রাগতস্বরেই বললাম, 'আপনিই তো এ জাহাজের ক্যাপ্টেন? আর এর নাম 'আতঙ্ক', ঠিক কি না?' ক্যাপ্টেন নীরব রইলেন। আমি তাঁর হাত ধরতে চাইলাম। বিতৃষ্ণা ভরে আমার হাতটা সরিয়ে দিলেন।

আমি এবার কণ্ঠস্বরে রীতিমতো উদ্ভ্রা প্রকাশ করেই বললাম, 'আমাকে এখানে কয়েদ করে রাখার উদ্দেশ্য কি? আমাকে নিয়ে কি করতে চাইছেন, বলবেন কি?'

আমার এবারের প্রশ্নেরও কোনো জবাব না দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঝট করে রেগুলেটরের মতো একটা যন্ত্রের হাতল ঘুরিয়ে দিলেন। ব্যস, আতঙ্কর গতি আরও বেড়ে গেল। উদ্ভ্রা বেগে ছুটে চল যন্ত্রযানটা।

ক্যাপ্টেনের আচরণে, তাঁর উদ্ভ্রা দেখে মাথায় খুন চেপে যাওয়ার জোগার হল। অনেক ক্যাপ্টেন নিজেকে সামলে নিলাম। এছাড়া উপায়ও তো নেই।

আতঙ্ক উদ্ভ্রা বেগে ছুটে চলছে তো চলছেই। তার এ-চলার বুঝি বিরাম নেই, শেষও নেই। ক্যাপ্টেন আবার গোপন অন্তরালে চলে গেলেন। চালক আবার ডেকে ফিরে এল। বার বার এদিক-ওদিক নজর ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে, ইঞ্জিন ঠিক মতো কাজ করছে কিনা। আতঙ্কর গতিমুখ অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। মনে হল বাফেলোতেই গিয়ে থামবে। সত্যি কি তাই?

বাফেলোর মতো জনবহুল স্থানে ক্যাপ্টেন যাবে কি? নইলে যেতে হয় নায়েরা জলপ্রপাতে। সেখানে অবশ্যই যাবেন না। কারণ, নায়েরার কাছে গায়ের জোর ও গোয়ারভূমি খাটবে না। আইরি-হ্রদ থেকে পালাবার একমাত্র পথ ছেট্রয়েট নদী। কিন্তু আতঙ্ক যে সে পথ ছেড়ে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন আবার রাত্রি নামলে পাড়ে নামার ধাক্কা নেই তো? জলযান আতঙ্ককে স্থলযানে পরিণত করে তীরবেগে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই যদি হয় তবে ডাঙায় অবস্থান করার সময়েই আমাকে সুযোগ বুঝে কেটে পড়তে হবে। আইরি-হ্রদের উত্তর প্রান্তের আমার খুবই পরিচিতি জায়গা। তবে মনে হচ্ছে, আতঙ্ক নায়েরার তীরভূমি পর্যন্ত যাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। সেখানে যাওয়ার অর্থ মরণফাঁদে মাথা গলিয়ে দেওয়া।

ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুতেই খোলসা হচ্ছে না। ক্যাপ্টেন আমাকে শাসিয়ে এমন চিঠি কেন লিখতে গেলেন? কেনই বা আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে টিকটিকির মতো আর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন? কেনই বা আমার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে সটকে পড়লেন? গ্রেট আইরির রহস্যজনক ঘটনার সঙ্গেই বা তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে? কিরডাল-হ্রদের তলদেশ দিয়ে না হয় যাতায়াতের সুড়ঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আইরির অজের চূড়া ডিঙিয়ে এলেন কীভাবে? তাই কি? তবে? তবে কি ক্যাপ্টেন বন্দরের দিকে না এগিয়ে পাশ কাটিয়ে সটকে পড়তে লাগলেন। আতঙ্ক এমন পাতলা, জলের সঙ্গে মিশে থাকে যে, এক মাইল দূর থেকেও এটা চোখে পড়ে না।

না, আতঙ্কর মুখ ঘুরিয়ে আবার ও বাফেলোর দিকেই ছুটে চলছে। নাকি বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে ঝট করে তাঁর জলযানের মুখ ঘুরিয়ে সটকে পড়বে। ক্যাপ্টেনের দৃঢ় বিশ্বাস, নৌকা বা অন্য কোনো স্থলযান তাকে আক্রমণ করলে চোখের পলকে সটকে পড়ার হিংস্র তার আছে।

একটু বাদেই আমি সচকিত হয়ে অগ্রসরমান অদূরবর্তী দুটো কালো বস্তুর দিকে অনুসন্ধিসূ নজরে তাকলাম। কালো বস্তু দুটো আতঙ্ককে লক্ষ্য করে দুদিন থেকে এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সে দুটো স্পষ্ট হয়ে ওঠায় চিনতে পারলাম, দুটোই টর্পেডো ডেব্রয়ার। মি. ওয়ার্ড কি তবে এ দুটোর কথাই আমাকে বলেছিলেন?

ক্যাপ্টেন ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজেই হালের চাকা ধরলেন। আর তাঁর সঙ্গী দুজন গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডেকের সামনে আর পিছন দিকে। আর আমি, আমার গতি কি হবে? আমার অন্যত্র সরে পড়ার হুকুম আছে কিনা তাও তো জানা নেই। আসলে আমাকে নিয়ে কেউই ভাবিত নয়। টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার দুটো ইতিমধ্যে কামানের গোলায় আওতায় এনে ফেলেছে। এবার কামান দাগলেই কাজ হাসিল।

আচর্চ ব্যাপার! এমন চরম সঙ্কট মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের মুখে সামান্যতম আতঙ্কের ছাপও দেখলাম না। তাঁর কাছে এটা যে খুবই মামুলি একটা ব্যাপার।

টর্পেডো ডেস্ট্রয়ার দুটো আরও এগিয়ে আসতেই যন্ত্রযান আতঙ্ক অদ্ভুত উপায়ে ইয়া লম্বা এক লাফ দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেল। তারপর গতিবেগ বাড়িয়ে উষ্কার বেগে ছুটে চলল। আমি বুঝে নিলাম, ক্যাপ্টেন টর্পেডো দুটোকে লেজে খেলিয়ে এক সময় টুপ করে আতঙ্কে জলের তলায় নিয়ে যাওয়ার ধাক্কায় রয়েছে।

হ্যাঁ, আমার অনুমান অশ্রান্ত। যন্ত্রযান আতঙ্ক সত্যি সত্যি জলে ডুব দিল। আমরা অতল জলে তলিয়ে গেলাম। মিনিট দশেকের মধ্যেই ক্যাপ্টেন আর তাঁর সঙ্গীদের হতাশা মিশ্রিত উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা কানে এল। তাদের বক্তব্য আতঙ্কের কোনো কোনো যন্ত্র ঠিকঠাক কাজ করছে না। ইঞ্জিন থেকেও অব্যাহত কর্কশ আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। নিঃসন্দেহ হলাম, যন্ত্রপাতি এমন বিগড়েছে যে, আতঙ্কে ওপরে তুলে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন তার সাধের আতঙ্কে জলের ওপরে তুলেই নিলেন। আমি দেখলাম, মণ্ডকা হাতের মুঠোয়। হ্যাচের মুখ খোলা। সুযোগের সদ্ব্যবহার অনায়াসেই করা যেতে পারে। মই বেয়ে তরতর করে নেমে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া যেতে পারে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

ক্যাপ্টেন আতঙ্কের গতিবেগ বৃদ্ধি করলেন না। অবাক না হয়ে পারলাম না। তবে কি তিনি তার জলযানটাকে ডাঙায় তুলে স্থলযানে রূপান্তরিত করে চম্পট দেওয়ার ধাক্কা খুঁজছেন। এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? টেলিগ্রাম মারফৎ খবর ছড়িয়ে পড়বে। তার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে সেনা বিভাগের শক্তিশালী বহু স্থলযান। তখন?

আতঙ্ক ইতিমধ্যেই আইরি দুর্গ ছাড়িয়ে এসেছে। সঙ্ঘার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে গেল। আতঙ্কের পক্ষে আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ডেস্ট্রয়ার দুটো কামান বাগিয়ে দুদিক থেকে তেড়ে আসছে। তাদের কামানভাররা অবশ্য জানেন না যে, আতঙ্কের যন্ত্রপাতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

মর্জিমাফিক এটাকে ডুবোজাহাজে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই বাজপাখির মতো সতর্ক দৃষ্টি রেখে তারা এগিয়ে আসছে।

আতঙ্কের যন্ত্রপাতি যতই শক্তিশালী হোক না কেন জলপ্রপাতের ভয়ঙ্করতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। জলপ্রপাত অনবরত তীব্রস্বরে গর্জন করে চলেছে। দুশো ফুট ওপর থেকে আছড়ে পড়া জলপ্রপাতের মধ্যে পড়লে আতঙ্ক নিম্নে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। এখনও তীর ভূমিতে উঠে স্থলযান হয়ে কেটে পড়ার সময়-সুযোগ আছে। আমি তীব্র উত্তেজনায় ধরধরিয়ে কাঁপতে লাগলাম। তবে কি আতঙ্ক নেভা আইল্যান্ড অবধি গেলে জলে জাঁপিয়ে পড়ে পাড়ে ওঠার চেষ্টা করবে? আমি এ সুযোগেরও যদি সদ্ব্যবহার না করি তবে কি মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড আমাকে কোনোদিন স্বেচ্ছায় মুক্তি দেবেন?

না, পালিয়ে যাওয়া বোধ হয় আর হয়ে উঠল না। আমাকে কেবিনে কয়েদ করে রাখে নি সত্য। কিন্তু নজরবন্দি যে রেখেছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

একদিক থেকে জলপ্রপাতের সুতীব্র গর্জন আর অন্যদিক থেকে টর্পেডো ডেস্ট্রয়ারের গুরুগম্ভীর শব্দ আমার মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার করেছে তা অস্বীকার করলে সত্য গোপন করাই হবে।

জলপ্রপাত থেকে ডেস্ট্রয়ার দুটোর ব্যবধান মাত্র দু শো ফুট। এবার শুরু হল ডেস্ট্রয়ার দুটো থেকে ঘন ঘন কামান দাগা। কামানের গোলাগুলো আতঙ্কের মাথার ওপর দিয়ে বিকট আওয়াজ তুলে ছুটে যেতে লাগল।

সামনেই থ্রি সিস্টার্স দ্বীপ। আমি বরাতে ঠুকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলাম। না, হল না। আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল। পিছন থেকে কে যেন আমাকে সাঁড়াশীর মতো আঁকড়ে ধরে ফেলল।

পর মুহূর্তেই অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আতঙ্কের দুপাশ থেকে দুটো ডানা বেরিয়ে এল। ব্যস, ডানা দুটোর ওপর ভর দিয়ে জলযান আতঙ্ক আকাশমানে পরিণত হয়ে শূন্যে উড়ে চলল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, আতঙ্ক নড়াচড়া করছে না, নিশ্চল নিথরভাবে যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। ভাবলাম, তবে কি মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড এমন কোনো গোপন ঘাটিতে যন্ত্রযানকে দাঁড় করিয়েছেন যার খোঁজ কারো পক্ষেই পাওয়া সম্ভব নয়। তবে কি এবার তাঁর গোপনতম রহস্য ভেদ করা সম্ভব হবে? একটা ব্যাপার, ভ্রদলোক কিন্তু আমাকে নিয়ে কিছুমাত্রও ভাবিত নন। কিন্তু আমার ঘুম দেখে আমি নিজেই কৌতূহল বোধ করতে লাগলাম। এত ঘুমও মানুষ ঘুমাতে পারেন? তবে কি আমার খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে? আকাশপথে কোনোদিকে ও কোথায় চলেছি তা যাতে আমি বুঝতে না পারি তার জন্যই হয়ত এ-পথ তিনি বেছে নিয়েছেন।

আমি যত দেখছি, ততই যেন অবাক হচ্ছি। একী যন্ত্রযান! জলে, স্থলে আর শূন্যে চলতে পারে এ যে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতে উৎসাহ পাওয়া যায় না। ক্যাপ্টেনের এ কী অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। সামান্য একটা বোতাম টিপতে না টিপতে জলের মাছ আকাশের পাখি হয়ে বাতাসে ভর করে উড়ে যেতে পারে—এ কী যে-সে ব্যাপার নাকি! তবে নিজের চোখ দুটোকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারি না? এটাই তো তবে ক্যান্ডার হয়ে মোটর রেসে বাজিমাৎ করেছিল। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে অনেক কায়দা কসরৎ দেখেছি বটে। কিন্তু আসল রহস্যটা এখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নি।

তিনি কোথা থেকে, কোন শক্তি আহরণ করেছেন, যা দিয়ে যন্ত্রযানকে সচল রেখে ত্রিভুবন জয় করছেন। আর তার পরিচয় জানাও আজ অবধি সম্ভব হল না। আর কিসের প্রেরণাতেই বা তিনি এমন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছেন তাও জানতে পারি নি। এত কীর্তির পর তিনি যদি মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড খেতাব গ্রহণ করে থাকেন তবে অবাক হবার তো কিছুই থাকতে পারে না। পৃথিবীর কোনো মানুষ সে-যন্ত্রের আবিষ্কার তো দূরের ব্যাপার, ভাবতেও পারে নি যে তিনি কি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন? তাই তাঁর মতো এক শক্তিমান অর্থ বা সোনাদানায় বশীভূত হবেন তা যে ভাবাই যায় না। কোটি কোটি মুদ্রা থেকে নিজেই দূরে রাখা একমাত্র তাঁর মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

আমি রাত্রি-দিনের একটা বড় ভগ্নাংশই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, একত্রিশে জুলাই রাতে কোনোকোনো, কোনো পথে বাকি পথটুকু পাড়ি দিয়েছিলাম, শূন্যপথে হ্রদের জলের ওপর দিয়ে, নাকি আমেরিকার সড়কে মানুষের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলাম কিনা—কিছু আমি বুঝতে পারি নি। আমার বরাতে যে শেষপর্যন্ত কি আছে তা-ও আমার অজানা।

আমাকে যে জানতেই হবে, যন্ত্রযান কোথায় নেমেছে, কোথায়ই বা অবস্থান করছে? সচল যান কেন হঠাৎ নিচল নিখর হয়ে পড়ল? ডেকে উঠে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেই হবে।

মই-বেয়ে উঠে ওপরের ঢাকনা খুলতে গিয়ে হতাশ হলাম। ওপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেবিনের দরজা তো অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছে। বুঝলাম, আবার যাত্রা শুরু না করা পর্যন্ত আমাকে কয়েদ থাকতে হবেই। নিঃসন্দেহ হলাম, পালাতে পারছি না। আতঙ্ক চলমান থাকলে তো পালাবার প্রস্তুতিও নেই।

প্রায় সোয়া ঘণ্টা পরে লোহার খিল খোলার আওয়াজ কানে এল। দেখলাম, কেবিনের ওপরের ঢাকনাটা খুলে যাচ্ছে। যন্ত্রচালিতের মতো লাফিয়ে কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। লম্বা লম্বা পায়ে হাজির হলাম ডেকের ওপরে। দেখলাম, বৃত্তাকার একটা পর্বতগহ্বরে যন্ত্রযান আতঙ্ক চুপচাপ দাঁড়িয়ে। গহ্বরটার পরিধি প্রায় আঠারো শো ফুট। নিরেট পাথরের দেওয়া। গহ্বরটাকে বৃত্তাকার না বলে ডিম্বাকার বলাই উচিত।

আগষ্টের পয়লা তারিখ। তবু কনকনে শীত। বুঝলাম, উত্তর মেরুতে অবস্থান করছি আমরা। আবার জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে। তবে নতুন মহাদেশের বাইরে আসি নি। কিন্তু ঠিক কোনো অঞ্চলে আমরা অবস্থান করছি তা অনুমান করাও আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

এমন সময়ে ক্যাপ্টেন একটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এলেন। ব্যাপার-সাপার দেখে আমার মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল, মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড মাঝে মাঝেই এখানে এসে বিশ্রাম নেন।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন এবং তাঁর সঙ্গী দুজন আবার গর্তটার মধ্যে ঢুকে গেলেন। মাঝখানে দু-একদিন আমার ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল সত্য। কিন্তু এখন তো স্বাধীন। তার ওপর তাঁরা অন্তরালে চলে গেছেন। অতএব এ মওকায় যন্ত্রযান আতঙ্ককে ভাল করে দেখে নিলে কেমন হয়?

আমার কেবিনের ঢাকনা ছাড়া বাকিগুলো বন্ধ। অতএব আতঙ্কর ভেতরের কলকজা দেখা সম্ভব নয়। তাই বাধ্য হয়ে প্রপেলারটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিতে লাগলাম। কোন ধরনের প্রপেলার এমন শক্তিশালী যন্ত্রযানটাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেটাকেই দেখতে লাগলাম। যন্ত্রযানটার বহিরাবৃত্তি চুক্রটের মতো লম্বাটে একথা তো আগেই বলে রেখেছি। পিছনের তুলনায় মুখের দিকটা বেশি মাড়ায় সর। এলুমিনিয়ামের পাত দিয়ে তার বাইরের দিকটা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র ডানা দুটো অন্য দাঙুর তৈরি। অজানা, অচেনা দাঙু। পুরো যন্ত্রযানটা চারটে চাকার ওপরে অবস্থান করছে। দুফুট ব্যাসযুক্ত বাতাসভর্তি রবারের চাকা। ঘুরন্ত কয়েকটা প্যাডেল জলে বা স্থলে চলার সময় যন্ত্রযানটাকে ঠেলে সামনের দিকে নিয়ে যায়। প্রপেলার নয়, চাকাগুলোই প্রধান ভূমিকা পালন করে। সামনে আর পিছনে দুটো শক্তিশালী টারবাইন ব্যবহার করা হয়েছে। এরাই প্রপেলার দুটোকে ঘোঁরায। শূন্যে ওড়ার সময় ডানা দুটোকে ভাঁজ করে ডেকের ওপর রেখে দেওয়া হয়। আতঙ্কর উদ্ভাবক প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্রকে বাতাসে বাসিয়ে রাখা সম্ভব। আর পাখির চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়তেও পারে।

কোনো শক্তির বলে এরকম জটিল কলকজা চলে? অবশ্যই বিদ্যুতের সাহায্যে। সন্দেহের আর অবকাশ রইল না। বিদ্যুতের সাহায্যেই যন্ত্রযান আতঙ্ক জলে ও স্থলে ও অন্তরীক্ষে চলাচল করে। তাই যদি সত্য হয় তবে এত বিদ্যুৎশক্তি তিনি কোথায় পান? তবে কি ব্যটারির সাহায্যে তিনি এমন অবিস্ফাস্য কাণ্ড ঘটান? কিন্তু অন্য কোনো গোপন অন্তরালে বিদ্যুতের কারখানা নেই তো? নাকি নতুন কোনো ধরনের ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে নিচ্ছেন?

পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ হল। আশা অনুযায়ী সব জানতে পারি নি। তিনটে মাত্র ব্যাপার জানতে পারলাম—যন্ত্রযানটা চাকার ওপর ভর দিয়ে স্থলে চলে, টারবাইন প্রপেলার দিয়ে জল কেটে কেটে, ডানার ওপর ভর করে শূন্যে ওড়ে। ব্যস, এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হল না। আর জেনেই বা ফয়দা কি? আমি যে কয়েদ হয়ে রয়েছি। মুক্তি পেলে তবে তো অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারব। তবে মুক্তি আমাকে পেতেই হবে। পালাব। পালাতে আমাকে হলেই। কিন্তু উপায় কি? চলন্ত যান থেকে যা পারি নি তা বিস্ময়রত যান থেকে কি আর সক্ষম হবে?

প্রথমে একটা ব্যাপারের ফয়দা করা যাক। আমি এখন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অঞ্চলে অবস্থান করছি? গর্তটা কোনো দেশে? আকাশপথ ছাড়া বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কি সম্ভব? উড়ন্ত যন্ত্রযান ছাড়া কি গহ্বরটা থেকে বেরনো সম্ভব? যন্ত্রযান আতঙ্ক নির্বাণ ডানার ওপর ভর দিয়ে কয়েক শো লিগ পাড়ি দিয়েছে। সে না হয় হল। তবে কোনোকোনো একে এসেছে?

আচমকা একটা আশঙ্কা আমার মাথায় খেলে গেল, ফ্রোট আইরি পর্বত ছাড়া তো নিশ্চিন্ত ঘাটি আতঙ্কর পক্ষে অন্য কোনো জায়গাই থাকতে পারে না। পুলিশের পক্ষে যে জায়গা দুর্বল সে জায়গায় যন্ত্রযান আতঙ্ক অনায়াসে পৌছে যেতে সক্ষম। অতএব মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ডের পক্ষে সে-জায়গা নির্বাচন করাই তো স্বাভাবিক। ন্যামেয়া জলপ্রপাত থেকে ব্রু

রিজ মডিফিকেশনের দ্রুত সাড়ে চার শো মাইল। আতঙ্ক এক রাত্রেই পাড়ি দিতে সক্ষম। এখন আর কোনো ঘটনাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হচ্ছে না। গ্রেট আইরি পর্বতটাকে নিয়ে অনেক কথাই তো শুনেছি। গ্রেট আইরি সম্বন্ধে আমাদের শাসিয়ে লেখা চিঠিটার সঙ্গে আইরি হ্রদের ব্যাপার-স্যাঁপার সম্বন্ধে আর কোনো দ্বিধা থাকতে পারে কি? কেন আমার পিছনে টিকটিকি দুটো লেগেছিল? কেনই বা গ্রেট আইরি রক্তমঞ্চে পরিণত হয়ে উঠেছিল? সবকিছু আমার চোখের সামনে যেন ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল। সামান্য দ্বিধা থাকলেও বুঝতে পারছি, মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রেট আইরির এ-গহ্বরটাতে বসেই আমাদের সতর্ক করে সে চিঠিটা লিখেছিলেন। আর আমি এখন সেখানেই অবস্থান করছি। এই সেই জীতি ও রহস্যসম্বলিত আইরি—গ্রেট আইরি।

বহু চেষ্টা করেও এক সময় যে পাহাড়ের উদরে ঢুকতে পারিনি, আজ কি সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? যন্ত্রযান আতঙ্কর কাঁধে ভর না দিয়ে গহবর থেকে বেরনো সম্ভব হবে কি?

পাথরের প্রাচীরটাকে পরিক্রমা করতে গিয়ে দেখলাম, পাথরের গায়ে অসংখ্য ফটল আর গর্ত রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, গহবরটা কতখানি গভীর, পাথরের দেওয়ালের উচ্চতাই বা কত—কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। হাতিয়ে হাতিয়ে বুঝলাম, দেওয়ালের গায়ের গর্তগুলো বেশি গভীর নয়। মানুষের জমানো আবর্জনা যত্নে ভর্তি। বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ। নিঃসন্দেহ হলাম, এগুলো নির্বাণ ক্যান্টেন আর তাঁর দুই সঙ্গীর পায়ের ছাপ। তবে কয়েক মাস আগেকার, টাটকা মনে হল না।

একটু বাদেই ক্যান্টেন ও তাঁর সঙ্গীরা একটা বোঝা নিয়ে ফিরে এলেন। মনে হল এবার এখন থেকে নোঙর তুলে যাওয়া করবেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, গহবরটায় রাশিকৃত ছাই, পোড়াকাঠি আর কাঠের খুঁটিতে মরচে ধরা কিছু লোহার পাত লাগানো রয়েছে। আর মনে হল ছোট ছোট কিছু যন্ত্রপাতির ধ্বংসাবশেষ, আন্তনে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতীতে কোনো একসময় গহবরটায় আঙনের খেলা চলেছিল। তারই উত্তাপে যন্ত্রাংশগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এ কি দুর্ঘটনা, নাকি হচ্ছে করেই কাণ্ডটা করা হয়েছে বোঝা গেল না। এই হচ্ছে গ্রেট আইরির মাথার সেই-আঙনের রহস্য। এ আঙনের শিখা দেখেই গ্রামবাসীরা ভয়ে মিইয়ে গিয়েছিল। এসব যন্ত্রাংশ কোনো যন্ত্রের? কেনই বা ধ্বংস করে দেওয়া হল?

হঠাৎ সূর্যের আলো চোখে লাগল। ওপরের দিকে চোখ ফেরাতেই বুঝে নিলাম পাথরের প্রাচীরটা প্রায় এক শো ফুট উঁচু।

যন্ত্রযান আতঙ্ক যে এক রাত্রের মধ্যেই আইরি হ্রদ থেকে গ্রেট আইরি পর্বতে উড়ে এসেছে সে সম্বন্ধে আর কোনোই সন্দেহ রইল না। গ্রেট আইরির উদরেই সে আশ্রয় নিয়েছে। ক্যান্টেনের আবিষ্কৃত এটা অভ্যাকর্ষ ও অতিকায় পাখিটার উপযুক্ত আশ্রয়স্থলই বটে। তিনি হয়ত পায়ের হেঁটে গ্রেট আইরির বাইরে যাওয়ার পথও আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আর সে পথেই দৈত্যাকৃতি পাখিটাকে রেখে হয়ত বা সঙ্গীদের নিয়ে লোকালয়ে যাতায়াত করেন। তিনি তো নিঃসন্দেহ, সেখানে ঢোকার হিম্মত কারোরই নেই।

আমি গ্রেট আইরির উদরে প্রবেশ-পথ আবিষ্কার করতে পারলে মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ডের জারিজুরি ফাঁস করে ছাড়তাম।

হঠাৎ আমার মধ্যে নিদারুণ অস্থিরতা ভর করল। ভাবলাম, যন্ত্রযান আতঙ্ককে ধ্বংস করার এই অপূর্ব সুযোগ। পৃথিবীর বুকে আর যাতে সন্তান সৃষ্টি না করতে পারে তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করার এটাই উপযুক্ত সময়।

এমন সময় যন্ত্রচালিতের মতো আমার সামনে এসে গম্ভীরমুখে দাঁড়িয়ে পড়লেন দানবাকৃতি পাখিটার আবিষ্কর্তা ও স্বত্বাধিকারী। গম্ভীর স্বরে উচ্চরণ করলেন, 'ইসপেক্টর ট্রক!'

আমি দুরূহ দুরূহ বুকে কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, 'আপনি? আপনার পরিচয়? আপনিই কি মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড?'

'মি. ট্রক, আমি তো কাজের মাধ্যমে অনেক আগেই প্রমাণ করেছি, পৃথিবীতে আমার চেয়ে শক্তিশালী দ্বিতীয় কেউ নেই। ভালো কথা, আপনি হয়ত এ-জায়গাটা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে চাইছেন, ঠিক কিনা? হ্যাঁ, এটাই দুনিয়ার আতঙ্কের আধার গ্রেট আইরি। আর আমিই সে মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড রোবার! আশমানরাজ রোবার!'

হ্যাঁ, রোবারের ছবিটাই আমার মনের কোনে বার বার উঁকি মারছিল। তেরোই জুন, ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভায় তার আকস্মিক আবির্ভাবের পরের দিনই বিশ্বয়কর মানুষটার ছবিসহ চাক্ষুষকর বিবরণ খবরের কাগজের পাতায় পাতায় ছাপা হয়েছিল। তার আকৃতি মনের কাণে গেঁথে ছিল। সে চেহারা কোনোদিনই মৃত্যুর পট থেকে মুছে যাবার নয়। এমন দশাসই চেহারা অধিকারী ক'জনই বা হতে পারে? মহাবলশালী রক্তমাংসের সে-রোবারই আমার সামনে।

রোবার কীভাবে রোবার দ্য কনকরারে পরিণত হয়েছিলেন, কীভাবে কিংবদন্তী হয়েছিলেন তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করছিলাম—ফিলাডেলফিয়ার ওয়েলডন ইনস্টিটিউট বেলুনবাজদের একটা নামকরা সংস্থা। যারা বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুনে চেপে আকাশপথে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল সেটা তাদেরই সংস্থা। ফিল ইডাল তার সম্পাদক, সভাপতির নাম আফ্রল প্রডেন্ট। এই দুই মাতব্বরের নেতৃত্বে সংস্থার সদস্যরা 'গো-অ্যাডেহ' নামে অতিকায় একটা বেলুন তৈরি করেছিলেন।

বেলুন নির্মাণের কৌশল নিয়ে সংস্থার সদস্যরা যখন বাকযুদ্ধে মগ্ন ঠিক তখনই অজ্ঞাত পরিচয় রোবারের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে। সফ কথা বললেন, আকাশে উড়তে হলে বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র চাই, বেলুনের সাহায্যে নয়। তিনি নিজেই নাকি এমন একটা যন্ত্রযান নির্মাণ করেছেন। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করা তো দূরের ব্যাপার, সদস্যরা তাকে নিয়ে

নানাভাবে রসিকতায় লিপ্ত হলেন। তাকে অভিহিত করলেন, রোবার দ্য কনকরার বলে। আরও কত কি বলে সবাই টিটকারি দিতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। সুযোগ বুঝে তিনি সেখান থেকে সটকে পড়লেন। 'অ্যালবেট্রস'য়ে কয়েদ করে ফেললেন। বেলুনবাজ দুজনকে দেখিয়ে দিলেন বাতাসের চেয়েও ভারি যন্ত্র আকাশযান অ্যালবেট্রস কী অসীম ক্ষমতা রাখে। আর তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই তাদের ধরে এনে কয়েদ করে রেখেছেন।

পৃথিবীকে চক্কর মারার কাজ যখন প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে ঠিক তখনই ফিল ইভান্স ও আঙ্কল ফ্রডেন্ট সুযোগ বুঝে অ্যালবেট্রস থেকে কেটে পড়লেন। আর ডিনামাইট দিয়ে আকাশযানটাকে উড়িয়ে দিলেন। তার আবিষ্কার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

রোবার দ্য কনকরার প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত 'এক্স' নামক এক অজ্ঞাত দ্বীপে ছিলেন। অ্যালবেট্রসকে নির্মাণ করেন আর মেরামতের ঘাঁটিও সেটা। রোবার দ্য কনকরারের নির্বাণ মৃত্যু হয়েছে অনুমান করে বেলুনবাজ দুজন সে-দ্বীপের খোঁজ না করে অ্যাহেড নামক বেলুন তৈরির কাজে ডুবে গেলেন। তাদের ইচ্ছা, প্রমাণ করে দেবেন, বাতাসের চেয়ে হালকা বেলুনে চেপেও আকাশ জয় করা সম্ভব। আর এটা অবশ্যই নিম্নমানের নয়।

বিশে এপ্রিল ফিলাডেলফিয়া উদ্যান থেকে হাজার হাজার কৌতূহলী দর্শকের উপস্থিতিতে অতিকায় বেলুন 'গো-অ্যাহেড' আকাশে উড়ল। একটু বাদেই আকাশে আর একটা আকাশযানকে দেখা গেল।

রোবার দ্য কনকরার মরেন নি। এক্স দ্বীপে গিয়ে আর একটা আকাশযান 'অ্যালবেট্রস' তৈরি করে আকাশে উড়েছেন। বেগতিক দেখে বেলুনবাজার বিশ হাজার ফুট ওপরে বেলুনটাকে নিয়ে চলে গেলেন। অ্যালবেট্রসও সেখানে হাজির হল। দুর্ভাগ্য বশত বেলুনটা ফেটে গেল। এত ওপরে ওঠার জন্য সূর্যের ভেজে বেলুনের গ্যাস প্রসারিত হয়ে সেটাকে ফাটিয়ে দিয়েছে। রোবার দ্য কনকরার পড়ন্ত বেলুনটা থেকে বেলুনবাজ দুজনকে তুলে নিলেন অ্যালবেট্রস-এ।

অ্যালবেট্রস ক্রমে নিচে নেমে এল। সেটা ছ'ফুট ওপরে অবস্থান করতে লাগল। রোবার দ্য কনকরারের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—'যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা শুনুন, ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সেক্রেটারি আমার হাতে বন্দি। তাঁরা আমার প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছেন। অতএব তাঁদের বন্দি করার অধিকার আমার রয়েছে। অ্যালবেট্রসের ক্ষমতা দেখে তাঁরা যেমন ঈর্ষান্বিত তাতে আমি নিঃসন্দেহ যে, তাঁদের আত্মতুষ্টি এখনও হয় নি। বৈপ্লবিক আবিষ্কারের মাধ্যমে অচিরেই আকাশ-বিজয়ের কাজ সম্পন্ন হবে, আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু ওয়েলডন ইনস্টিটিউটের সভাপতি ও সেক্রেটারির মধ্যে এমন বৈপ্লবিক মনোভাব আদৌ দেখা দেয় নি। ফিল ইভান্স ও আঙ্কল ফ্রডেন্ট শুনুন, আপনাদের মুক্তি দিলাম।যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা, এবার কি বলছি শুনুন, আকাশ-বিজয়ের কাজ এখন সম্পন্ন। কিন্তু এখনই সে-আবিষ্কারটা আপনাদের সমর্পণ করছি না। সময়মত 'অ্যালবেট্রস' অবশ্যই জাতির মঙ্গলার্থে ব্যবহৃত হবে। তাই তো আমি আমার গোপন আবিষ্কারকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাচ্ছি। পৃথিবীর মানুষ একদিন না একদিন এ-আবিষ্কারের গোপন রহস্য অবশ্যই জানতে পারবে। আপনারা যেদিন এ-আবিষ্কারকে নিয়ে টিটকারি না করে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারবেন সেদিনই এর অধিকার লাভ করবেন। আপনারা আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বিদায়—বিদায় আমেরিকার নাগরিকবৃন্দ।'

পর মুহূর্তে অ্যালবেট্রসের চুয়াত্তরটা প্রপেলার বাতাসে কেটে কেটে সোঁটাকে তীরবেগে পূর্বদিকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

হ্যাঁ, তাঁর কথাবার্তায় মধ্যে অবর্ণনীয় দৃষ্ট আর আত্মবিশ্বাস স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

তাঁর সে আত্মজরিতাই ক্রমে বৃদ্ধি পেতে পেতে আশ্চর্য হয়ে উঠেছে। সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার বাসনা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে দানা বাঁধতে শুরু করল। সবার সামনে তুলে-ধরা তাঁর চিঠির মাধ্যমে তাঁর এরকম অহমিকাই প্রকট হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধা হল না আকাশ-রাজ্য এতদিন গোপন অন্তরালে থেকে আকাশ বিজয়ের পরিকল্পনাকেই বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছেন।

তাঁর অন্তঃস্থ ইন আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে জলে, স্থলে ও শূন্যে বিচরণ করার যন্ত্রযান তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারখানা কোথায় গড়ে তুলবেন? সুদূর এক্স দ্বীপের চেয়ে থ্রেট আইরির গহ্বরকেই তিনি কারখানা তৈরির জন্য বেছে নিলেন। অত্যাশ্রয় আশ্রয়, ধৈর্য কারিগরি প্রতিভা ও দক্ষতা সহক করে ফেললেন অত্যাশ্রয় আবিষ্কার এক যন্ত্রযান 'আতঙ্ক'কে। এতে কাজে লাগলেন অ্যালবেট্রসের কলকজাতলোকে। আইরি হুদে টপেডো ডেস্ট্রয়ারকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জলের তলায় উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনাটার মাধ্যমেই তার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে। এমন একটা যন্ত্রযানের আবিষ্কারের মধ্যে আত্মজরিতা প্রকাশ পাওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই সত্য যে, রোবারের ঔক্কা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিজেকে তিনি সত্যি 'মাস্টার অব দ্য ওয়াল্ড' মনে করছেন।

আমার মনে একই চিন্তা জগদ্বন্দ্বল পাথরের মতো চেপে বসেছে, আমি কি কোনোদিন এখান থেকে মুক্তি পাব? তবে থ্রেট আইরির ব্যাপারে যেটুকু জানা দরকার জেনে ফেলেছি। এটা আদৌ আগ্নেয়গিরি নয়, এটা কোনোদিন অগ্নি উদগীরণ করেনি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন করবে না। রোবার এবার খাদ্যবস্তু, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রীকে মজুদ করার জন্যই এ-স্থানকে নির্বাচন করেছেন। শূন্যপথে উড়ে যাবার সময় থ্রেট আইরির গঠন বৈচিত্র্য দেখেই হয়ত তিনি নিরিবিচি এ জায়গাটাকে নির্বাচন করেছিলেন।

না, এর বেশি কিছু আমার পক্ষে জানা নম্বব হয় নি। যন্ত্রযান আতঙ্কর যান্ত্রিক কলা-কৌশল দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। যন্ত্রটা যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে চলে এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি। কিন্তু বিদ্যুৎ তৈরির রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। রোবার জনসমক্ষে না এসে অন্তরালে থেকে কাজ হাসিল করতেই অধিকাতর উৎসাহী। তাঁর চিঠি পড়ে একথাই অনুমান করা যেতে পারে, পৃথিবীর মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল সাধনেই তাঁর উৎসাহ বেশি। অতীতে যেমন গোপন অন্তরালে ছিলেন, তেমনই ভবিষ্যতেও জনসমক্ষে আসবেন। না।

পৃথিবীর মানুষ তো আমার মুক্তির চিন্তা করছে না, করার কথাও নয়। কারণ, আমার মৃতদেহ যখন পাওয়া যায় নি

তখন নির্ধাৎ আমার মৃত্যু হয়েছে। যদি নাই করে তবে ধরে নেবে আমি আতঙ্কতে কয়েদ হয়েছি। গোড়াতে আমার মৃত্যুর ব্যাপারটাই প্রচার করা হবে। প্রচার করবে, জন ষ্ট্রক আর ইহলোকে নেই। রোবারকে আমার মুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব সে-সুযোগও পাচ্ছি না।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। গ্রেট আইরির উদরে আমার প্রথম রাত্রিবাস।

খাবার-দাবার ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র আতঙ্ক-এর বাঁড়ারে তোলা হতে লাগল। বুঝলাম, রোবার এবার বেশ কয়েকদিনের জন্য গ্রেট আইরির উদর ছেড়ে আকাশে উড়তে চাচ্ছেন।

যন্ত্রযান আতঙ্ক কয়েদ হওয়ার পরই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এবার নতুন করে সাহস সঞ্চয় করে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আমি আবারও আপনাদের কাছে জনতে চাইছি, আমাকে নিয়ে আপনি কি করতে চাচ্ছেন?'

রোবার এবার চোখ দুটো বিস্ফারিত করে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন যে, ভয়ে আমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবার জোগার হল। মুহূর্তকাল নীরব চাহনি মেলে তাকিয়ে থেকে এক সময় কেবল হাতদুটো ভাঁজ করে বুকের কাছে তুলে নিলেন। মুখে টু-শব্দটিও করলেন না।

যন্ত্রযানে মালপত্র বোঝাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হল। রোবার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন। তিনি জানেন, ভবিষ্যতে কোনো না কোনো দিন গ্রেট আইরির উদরে মানুষ প্রবেশ করবেই, তিনি নিঃসন্দেহ। তাই গহ্বরটা ছেড়ে যাবার আগে আশুন দিয়ে এখানে তাঁর উপস্থিতির যাবতীয় চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার উদ্যোগ আয়োজন করলেন।

রাত্রি তখন নটা। তলার শুকনো কাঠকুটোয় আশুন ধরিয়ে দেওয়া হল। আশুন ক্রমে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে রোবার হালের চাকা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁর সহযোগী টার্নার ঢুকে গেল মেশিনরুমে। রোবার রেডলিটের দিকেও নজর রাখতে লাগলেন। দুদুটো দায়িত্ব একা পালন করছেন। যন্ত্রযান 'আতঙ্ক' এবার গ্রেট আইরির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশপথে উড়ে চলল।

কোথায়, কোনোদিকে, এমন কি কোনো সমুদ্রের ওপর দিয়ে আমরা উড়ে চলেছি কিছুই ঠাहर করতে পারলাম না। আতঙ্ক প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় পাখির মতো অবলীলাক্রমে শূন্যে ভেসে চলল।

রাত্রির অন্ধকার নেমে এলে রোবার আকাশযান আতঙ্ককে ডুবোজাহাজে পরিণত করে নিয়ে গেলেন গভীর জলের তালায়। আমি কখন যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, বুঝতেই পারি নি। যখন ঘুম ভাঙল চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি জলের তলা নয়, জলের ওপর দিয়ে আতঙ্ক তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ প্রবল ঝড় উঠল। উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের আকাশছোঁয়া ঢেউ আতঙ্কের ওপর বার বার আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। পর্বত প্রমাণ ফেনা আমাদের ঢেকে ফেলার জোগার করল। বরাত ভাল যে, আমি শক্ত করে একটা আঁটা ধরে রেখেছিলাম। নইলে এক ঝটকায় কোথায় গিয়ে যে পড়তাম তা স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

আমি নিঃসন্দেহ হলাম, বাঁচার রাস্তা একটাই, ডুবোজাহাজ হয়ে আবার সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া।

রোবার যেন সম্পূর্ণ অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। ভয় কাকে বলে তাঁর জানা নেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি এমন এক আচরণ করলেন যা একবারেই অপ্রত্যাশিত, অবিশ্বাস্য। আচমকা বিকট স্বরে হেসে উঠলেন তিনি। ঠিক যেন এক বন্ধ পাগল হো-হো করে হেসে চলেছে। কি ব্যাপার, রোবার কি তবে সত্যি পাগল হয়ে গেলেন? এক সময় হাসি থামিয়ে তর্জন গর্জন শুরু করে দিলেন, 'আমি রোবার! রোবার! আমি 'মাষ্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড!'

কথা বলতে বলতে তিনি দুই সহযোগীকে ইস্তিতে কি যেন বললেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুকুম তামিল করা হল। যন্ত্রযান আতঙ্কের গা থেকে দু পাশের অতিকায় ডানা দুটো খুলে ছড়িয়ে পড়ল। ব্যস, মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রযান শূন্যে বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে চলল। ঝড়ের ভাণ্ড অবস্রাস করে সেটার গতি অব্যাহতই রাখল।

পায়ের তলায় মেক্সিকো উপসাগরের তর্জন গর্জন সমান তালে চলতে লাগল।

অ্যালবের্টস আর আতঙ্কের মধ্যে পার্থক্য অনেক। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের কাছে অ্যালবের্টস পরাজয় স্বীকার করলেও আতঙ্ক কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না।

বিকালেও আতঙ্কর আকাশ পরিক্রমা অব্যাহত রইল। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হতে চলল। তবুও প্রকৃতি শান্ত হল না। তবে নতুন কোনো ঘটনার মুখোমুখিও আমাদের হতে হল না। আমার মনে হল রোবার রাত্রির অন্ধকারে নিকারাগুয়া আর গুয়াতেমালা পর্বত ডিঙিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত-অবজ্ঞাত এক দ্বীপে হাজির হবেন।

আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি রোবার হালের চাকা ধরে চোখ-মুখ বিকৃত করে আপন মনে কি যেন বলছেন। ভয়ঙ্কর তাঁর মূর্তি। ক'দিনের মধ্যে তাঁর এরকম রুদ্ররূপ আর চোখে পড়েনি? কিন্তু কেন? কিরে আশঙ্কায়? বহু চেষ্টা করেও এর উপযুক্ত কারণ বের করতে পারলাম না।

এ মুহূর্তে আমার কর্তব্য কী? উন্মত্তপ্রায় ক্যাপ্টেন রোবারকে বাধ্য করব যন্ত্রযান আতঙ্ককে নিচে নামিয়ে নেবার জন্য? আশুন-পোকার মতো জ্বলে পুড়ে খাঁক হওয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব? জলের তলায় যে তাঁর একমাত্র বাঁচার রাস্তা উদ্ভাস্ত রোবার কি সামান্য একখাটাও ভুলে গেছেন?

আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। আরও একটা কথা আমার স্নায়ুগুলোকে চঞ্চল করে তুলল—একটা মাত্র মানুষ দেশের আইনকে, সরকারের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নিজের জেদ বজায় রেখে চলেছে। আর আমি আইনের রক্ষক হয়েও দিনের পর দিন তার গোয়াভূমি বরদাস্ত করে চলেছি। আমি কোথায় আছি, তাদের তিনজনের কাছে আমি একা কত যে অসহায় তা-ও ভুলে গেলাম। এক লাফে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আচমকা গার্জে উঠল, 'আমি আইনের স্বার্থে আপনাকে—'

আমার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আচমকা কি যে ঘটে গেল, ঝট করে আমার মাথায় এল না। মনে হল ব্যাটারির কেন্দ্রস্থলে বিদ্যুৎ আঘাত হেনেছে। ব্যস, আর দেরি হল না। চোখের পলকে আতঙ্কর ডানা দুটো সম্পূর্ণ দেহটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল—দাঙ্কি আতঙ্করী রোবারের জেদ খান খান হয়ে গেল। ডানা জোড়া উধাও হয়ে গেছে। প্রপেলার টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়েছে। আহত পাখির মতো আতঙ্ক ঝড়ের মুখে পড়ে পাক খেতে খেতে আছাড় বেয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

ব্যস, সব শেষ!

আমি কতক্ষণ যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় এলিয়ে পড়েছিলাম, কিছুই জানা নেই। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চোখ মেলতেই দোঁধ ছোট্ট একটা কেবিন। মেক্সিকো উপসাগরের বুকে ভাসমান 'ওটাবা' স্টিমারের কেবিনে আমি শুয়ে। আমার মুখে অবিস্থাস্য কাহিনীটা শুনে নাবিকদের কেউ বিশ্বাস করল, আবার কেউ বা আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসল।

দশই আগস্ট অর্থাৎ পাঁচদিন পর আমাদের স্টিমার 'ওটাবা' বন্দরে পৌঁছল। উদ্ধারকারী সহৃদয় ক্যাপ্টেন ও নাবিকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওয়াশিংটনগামী ট্রেন ধরলাম।

আমাকে আচমকা দরজায় দেখেই পুলিশের বড়কর্তা মি. ওয়ার্ড ঘাবড়ে গিয়ে যন্ত্রচালিতের মতো সোজা হয়ে বসে পড়লেন। চোখের তারায় অবিস্থাসের ছাপ এঁকে নীরবে আমার আপদামস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি শুনছেন, আমার মৃত্যু হয়েছে। আইরি হৃদয়ের জলে ডুবে মরেছি।

আমি রোবার, মাস্টার অব দ্য ওয়ালডের অবিস্থাস্য কাণ্ডকারখানার কথা মি. ওয়ার্ডের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। সবশেষে আমি বললাম, 'রোবার সত্যি মাস্টার অব দ্য ওয়াল্ড উপাধি লাভের যোগ্য। তাঁর অনন্য প্রতিভা, উদ্ভাবনী আগ্রহ, ধৈর্য ও কর্মনিষ্ঠা সন্থল করে তিনি অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযান আবিষ্কার করেছিলেন সেকথা বিবেচনা করে তাঁকে অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে অবশ্যই চিহ্নিত করা চলে। কিন্তু তার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর 'আতঙ্করিতা'। পরমায়ু আর বরাতের জোরে আমার পিতৃদত্ত প্রাণটা কোনোরকম রক্ষা পেয়েছে।'

আমার বক্তব্য শেষ হলে মি. ওয়ার্ড চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মি. স্ট্রক, আপনি যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছেন এটাই যথেষ্ট বলে মনে করছি। রোবার কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। আর আপনি সুখ্যাতির শীর্ষে অবতীর্ণ হয়ে বিখ্যাত হতে চলেছেন। বরাতের কথা আমি বলব না। আপনার কর্তব্যবোধ ও কর্মনিষ্ঠাই আপনাকে সে জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক পত্রিকার পাতায় আমার জল, স্থূল ও আকাশপথে অভিযানের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা, মাস্টার অব দ্য ওয়াল্ড 'রোবারের' অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কাহিনী সবিস্তারে ছাপা হল। খবরের কাগজের মূল বক্তব্য, "ইন্সপেক্টর স্ট্রক—এর কর্তব্যবোধ ও কর্মনিষ্ঠার জন্য আমেরিকান পুলিশ পৃথিবীর পুলিশবাহিনীর শীর্ষে আজও অবস্থান করছে। পৃথিবীর কোনো কোনো দেশের পুলিশবাহিনী স্থূল আর জল পথে সামান্য সাফল্যলাভ করলেও আমেরিকান পুলিশ কিছু অপরাধীকে বন্দি করতে সাগর, মহাসাগর আর হৃদের অতল গহবরে ডুব দিয়েছে। আর শূন্যপথেও ধাওয়া করেছে, অপরাধী, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক—মাস্টার অব দ্য ওয়াল্ডকে হাতকড়া পরাতে।"

=== o ===

দ্য গ্রিন ফ্র্যাশ

স্যাম আর সিব অভিন্ন হৃদয় দুই ভাই। তাদের একজন পরিচারিকাকে বেটসি আর অন্যজন বেট্রি সন্ধান করে ডাকাডাকি করতে লাগল। তাদের ডাক শুনে ভৃত্য প্যাট্রিক হস্তদণ্ড হয়ে ছুটে এল হেলগবার হলঘরের দরজায়। বলল, 'স্যার, সে তো বাড়িতে নেই। ডেম বেস মিস হেলানার সঙ্গে বেরিয়েছে।'

সিব আর স্যামের আসল নাম যথাক্রমে সেবাস্টিয়ান ও স্যামুয়েল। তারা উভয়েই মিস ক্যাম্বলের মামা। তাদের মধ্যে স্যাম সিবের চেয়ে বয়সে মাত্র পনের বছরের বড়। ভাগ্নী মিস হেলানা স্যাম আর সিবের মনপ্রাণ জুড়ে রয়েছে। তাদের বিধবা দিদি শিশু-কন্যাকে রেখে পরলোকে পাড়ি জমিয়েছিলেন। ব্যস, তারপর থেকেই দুই ভাইয়ের সর্বস্ব হয়ে দাড়িয়েছে মা-বাপহারা শিশু ভাগ্নীটি। আজও সেই স্নেহের বন্ধন এতটুকুও ম্লান হয়নি। এমন কি ভাগ্নীর কোনোরকম অযত্ন হয় ভেবে দুভাই বিয়ে-থা পর্যন্ত করেন নি। ভাগ্নী তাদেরই মা বাবা জ্ঞান করে। সে সিবকে মা আর স্যামকে বাবা সন্ধান করে।

সিব আর স্যাম একই কলেজে, একই ক্লাসে পড়াশুনা করেছে। তাদের চাল-চলন আচার-আচরণ আর ভাবনাচিন্তার মধ্যে সামান্যতম ফারাকও নেই। বলা চলে আলাদা অবয়বধারী হলেও আসলে এরা একই ব্যক্তি। কেবলমাত্র দৈহিক গড়নের দিক থেকে তাদের মধ্যে একটু-আধটু বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাদাসিধে আচরণের মতোই পোশাক পরিচ্ছদের দিকেও তাদের ঔদাসিন্য দেখা যায়। কেবলমাত্র রঙের ব্যাপারে পছন্দের হেরফের হয় বটে। সিব যে-কোনো জিনিসে তামাটে লাল পছন্দ করে আর স্যামের পছন্দ গাঢ় নীল রঙ। তারা কোনো নেশারই বশীভূত নয়। সুঠামদেহীও বটে। তাই তারা বয়সে প্রবীণ হলেও মন কিছু আজও নবীন—কচিকাঁচাই রয়ে গেছে।

সিব আর স্যাম যে নিজেদের মধ্যে আমৃত্যু হৃদ্যতার সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে পারবে এতে তিলমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। আর একটা ব্যাপারে এ মানিকজোড়ের দারুণ মিল দেখা যায়—উভয়েই মুঠো মুঠো নসি ব্যবহার করে। তবে আলাদা আলাদা কৌটা থেকে আবশ্যই নয়, একই কৌটা থেকে তারা নসি নেয়। ইয়া পেন্সাই একটা কৌটা নিয়ে তার দিনভর লোফালাফি খেলে। ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাব তাদের। রাজনৈতিক জ্ঞান তো ছিটেফোঁটাও কারোর নেই।

ভাগ্নী হেলেনা বাড়ির বাইরে গেছে। পাঁচটা বাজে। দু-মামারই বিশ্বাস, সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে। হেলেনা অষ্টাদশী। রূপসী তো বটেই, এমন কি বুদ্ধি সুদ্ধিও রবরয়ের নায়িকার মতোই প্রখর। ওয়েভারলির নায়িকার মতো তার চিন্তাধারা একেবারে মৌলিক। সর্বজনবন্দিত সাহিত্যিক দুজনের এবং আরও কয়েকটা বিশিষ্ট চরিত্রের সঙ্গে ভাগ্নীর তুলনা করতে যারপরনাই গর্ববোধ করতে লাগল।

তাকে গোলাবের চারার মতো হেলেনা দ্রুত বেড়েই চলছে। হ্যাঁ এবার তার একটা অবলম্বন দরকার। মনের মতো একটা বর আর ঘর। কেবলমাত্র পণ্ডিত হলেই তো হবে না, কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ও তো থাকা চাই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ফ্যারারডের রসায়নে পাণ্ডিত্য আর টিনডালের মতো পদার্থবিদ্যায় দখল—জিভের ভগায় যাবতীয় প্রশ্নের জবাব থাকে—নামডাক আছে এমন ফাউন্ডেশনার পরিবারের সন্তান। কিন্তু এমন পণ্ডিত পাত্রকে কি হেলেনার পছন্দ হবে? ব্যাপারটা নিয়ে চিরকুমার ভাই দুজন মোটেই ভাবে নি। ভাবী বর হেলেনাকে দু-একবার দেখেছেও। কিন্তু হেলেনার রূপ-সৌন্দর্যতার মনে তেমন দাগ কাটতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। দু-ভাই হেলেনার সঙ্গে প্রখ্যাত উপন্যাসের ডায়না ভারনামের সঙ্গে তুলনা করে বসল। কিন্তু তারা ভুলেও কেউ ভাবল না, ডায়না যার সঙ্গে গোড়া থেকে হৃদতার সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছিল শেষপর্যন্ত সে কিন্তু তার গলায় বরমালা দেয় নি।

দুভাই এবার এক প্রখ্যাত কবির কথা ভাবতে লাগল। তাদের ভাবী বর যদি হেলেনাকে পছন্দ করে, হেলেনাও যে তাকে ভালবেসে কাছে টেনে নেবে ওতে দুভাইয়ের কারোরই তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এবার তারা শেক্সপিয়ারের কমেডি নাটক থেকে বাছা বাছা কটা উদ্ধৃতির আবতারণার মাধ্যমে মনের ভাব বিনিময় করল।

হেলেনার বিয়ের ব্যাপারে সিব আর স্যাম ভাই দুজন নিশ্চিত হতে পারল। এখন প্রশ্ন একটাই বিয়েটা কোথায় হবে? তার গ্রাসগোতে তো আবশ্যই। কিন্তু সেন্টম্যাগনাস আর সেন্ট মুলগো চার্চে জায়গা খুবই কম। অন্তত সেন্ট জর্জ চার্চে যেতে পারলে ভালো হয়। ব্যস, জোজের আসব কোথায় কীভাবে ব্যবস্থা করা হবে, কোনো পানীয় বিতরণ করা হবে, তাও সঙ্গে সঙ্গে তারা ঠিক করে ফেলল। ভাগ্নী ঘটা করে বিয়ে করতে রাজি না হলে তারা কিছুতেই তার ইচ্ছায় সম্মত হবে না।

দু-ভাই যখন ভাগ্নী হেলেনার বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত তখনই সমস্বরে তাকে বলল, 'শোন, মি. অ্যারিসটোবিউলিসের সঙ্গে তো বিয়ে আমরা দেব মনস্থির করে ফেলেছি।'

তাঙ্খিল্যের সঙ্গে হেসে হেলেনা বলল আমি যতদিন না সবুজ রশ্মিকে দেখতে পাচ্ছি, ততদিন বিয়ের কথা ভাবতেই পারছি না।

ক্রুইভ নদীর ডানদিকে গয়ার লেক নামে চমৎকার একটা লেক রয়েছে। লেকের লাগোয়া একটা বাড়িতে অভিনুহদয় দুই মামা বাস করে। গ্রাসগোর একটা পুরানো বাড়িতে তারা শীতের দু-মাস থাকে। হেলেনার মন চাইলে দুই মামা তাকে নিয়ে ইতালি, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে চক্রের মেরে বেড়ায়। হেলেনার মেজাজ মর্জি হলে সবাই ফিরে আসে গ্রাসগোর গয়ার লেকের ধারে বাড়িতে। মের তৃতীয় হওয়া গ্রাসগোর হৈ-হুটগোল ছেড়ে নিরিবিলিতে থাকার জন্য ভাগ্নী অস্থির হয়ে পড়ে। ব্যস তল্লি-তল্লা গুটিয়ে মামারা তার ইচ্ছা পূরণের জন্য গয়ার লেক থেকে প্রায় এক কিলোমিটার

দূরের শান্ত উপদ্রবহীন একটা গ্রাম্য বাড়িতে এখন গ্রীষ্মের দিনগুলো কাটাচ্ছে। চাকর-বাকরগুলো সঙ্গেই এসেছে। তাদের মধ্যে দুজন তো বালক বয়স থেকেই ক্যাম্পেল পরিবারের সেবায় নিযুক্ত। তাদের একজনের নাম প্যাট্রিজ। আর অন্যজনের নাম এলিজাবেথ। সে হেলানাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসে। সংসারের যাবতীয় বোঝা তারই কাঁধে। উবয়েই ঝুটিশ।

হেলেনার চরিত্র বাস্তবিকই অদ্ভুত। এমনিতে তার মতো মেয়ে হয় না। শান্ত, অমায়িক ব্যবহার। কিন্তু মুহূর্তে রেগে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। তার দুটো রূপ। সংসার আর কর্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট। আর ব্যক্তিত্ব ও ভাবজগৎ নিয়ে ডুবো থাকাও তার চরিত্রের অন্য একটা দিক। কুসংস্কার আর কাল্পনিক গল্প-কাহিনীতে তার আস্থাও কম নয়। তার উভয় সন্তানকেই দুই মামাই পছন্দ করে। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের শিকার হয়ে তাদের ভাগ্নী এমন সব খামখেয়ালীপনা জুড়ে দেয় যেমন মামারা রীতিমতো চমকে ওঠে। বিয়ের প্রস্তাব তোল মাত্র ভাগ্নী যে আচরণ করলে, সে কথাই বলতে চাইছি। এ কী আজব কথা রে বাবা। সবুজরশ্মি না দেখা অবধি বিয়ের পিঁড়িতে বসবে না। সবুজরশ্মির ব্যাপারটা কি? এ কী উদ্ভট কথা বলছে তাদের সোহাগিনী ভাগ্নী।

মর্নিং পোস্ট নামক খবরের কাগজের পাতায় খবরটা ছাপা হয়েছিল—

সূর্যকে কখনো সমুদ্রের বুকে ডুব দিতে দেখেছেন? সূর্যের ওপরের প্রান্তটা আবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু শেষ আলোকরশ্মিটুকু বিচ্ছুরিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অতুলনীয় প্রাকৃতিক বিষয়কর দৃশ্যটা চাক্ষুষ করেছেন কি? না, নিশ্চয়ই চাক্ষুষ করেন নি। সুযোগ এলে দেখে নেবেন। উজ্জ্বল লাল রশ্মি চোখে পড়বে ভেবে থাকলে ভুলই করছেন। বরং সবজ্ঞে একটা আভা নজরে পড়বে। কোনো শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয় এমন সবুজ রশ্মি সৃষ্টি করা। গাছগাছালির আর সমুদ্রের হাজারো সবুজের মেলায় আত্যাশ্চর্য অবিশ্বাস্য সে সবুজের হৃদিশ মিলবেনা। স্বর্ণে যদি সবুজের অন্তিত্ব থেকে থাকে তবে সে স্বর্ণীয় সবুজ রশ্মিচ্ছটা নির্ভেজাল ও নিশ্চিত আশার প্রতীক।

মিস হেলানা সেই খবরের কাগজটা হাতে করে হলঘরে এসেছে। হল্যান্ডের প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদেও সবুজ এ-রশ্মির কথা শুনেছে। মিস ক্যাম্পেল সেই প্রবাদের মর্মার্থ আজও উদ্ধার করতে পারেনি।

সবুজ রশ্মির আলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে মিস হেলানা আগেই শুনেছিল বলেই খবরের কাগজের পাতার ছাপান নিবন্ধটা পড়ে এমন অস্থির হয়ে পড়েছেন।

ভাগ্নীর মুখে ব্যাপারটা শুনে তার দুই মামাই বিষয়ে হতবাক হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ জানালা খুলে স্যাম সবুজরশ্মি দেখার উদ্যোগ নিতেই মিস হেলানা তার হাত চেপে ধরল। বলল, ‘এখন নয়, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আগে সূর্য ডুবুক। তবে দিগন্ত নির্মেষ—পরিষ্কার হতে হবে। আর এখান থেকে নয়, কাইড নদীরপাড়ে, টাওয়ারের ওপরে না উঠলে কিছু দেখা যাবে না। সমুদ্রের বুকে সূর্য ডুব না দিলে বাঙ্কা পূরণ হবে না। তাড়াতাড়ি কর। দেরি হলে—’

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে স্যাম বলে উঠল, ‘হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি তো অবশ্যই— মানে মি. অ্যারিসটোবিউলিস আরস্ক্রোসের জন্য তাড়াতাড়ি করতে বলছিস তো?’

‘হ্যাঁ, দেখবার পরই আমার বিয়ে। মানে মি. অ্যারিসটোবিউলিস আরস্ক্রোসের ব্যাপারে কথা বলা যাবে।’

দু-ভাইয়ের চোখেই ঝুশির ঝলক ফুটে উঠল। তারা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

পশ্চিম দিগন্ত পরিষ্কার দেখা যায়, ঝটল্যান্ডের এমন কোনো সমুদ্র উপকূলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ভাগ্নীর আকাজক্ষিত সবুজরশ্মি চাক্ষুষ না করা অবধি তার প্রতি সন্ধ্যায় ধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করবে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তারা ওবানের সমুদ্র উপকূলকেই এ কাজের উপযুক্ত স্থান হিসাবে বিবেচনা করল। সেখানে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে ছিটফোটাও মেঘ বা কুয়াশা থাকে না। ওবানের কথা উঠতেই স্যাম আর সিঁব সোল্লাসে, প্রায় সমস্তরই বলে উঠল, ‘তবে ওখানেই যাওয়া যাক। শুভস্য শীত্ৰম। ঝটপট তল্লিতল্লা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক।’

ওবানের ব্যাপারে তার মামারা কেন এমন উৎসাহী তা হেলেনার বুঝতে বাকি রইল না। কারণ, সেখানেই থাকে তার জন্য মামাদের নির্বাচিত পাত্র।

নতুনতর এক সমস্যা দেখা দিল। দুই মামারই ইচ্ছা স্থলপথে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে যাবে। কিন্তু ভাগ্নীর তাতে আপত্তি। তার ইচ্ছা সমুদ্র পথে যাবেন। আসলে সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে যাওয়ার সময় নজর রাখবে, ওখানে পা দেবার আগেই যদি আচমকা আকাজ্ষিত সবুজরশ্মি চোখে পড়ে যায়, তবে শুধু শুধু ওবান পর্যন্ত ধাওয়া করতে হবে না।

ভাগ্নীর অত্যাশ্রয় আশ্বাহের কাছে মামাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার ইচ্ছা ত্যাগ করতেই হল। শেষপর্যন্ত সমুদ্রপথে যাওয়াই স্থির হল।

সকাল হতে না হতেই দুই মামা, ভাগ্নী হেলানা আর পরিচারিকা বেস প্রেট্রিজ কলম্বো জাহাজে চেপে বসল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের তালে তালে দোল খেতে খেতে কলম্বো এগিয়ে চলল গভীর সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের পাড় জুড়ে রয়েছে বাড়ি-ঘর, গাছগাছালি আর কলকারখানার চিমনির সারি। মামারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো সবকিছু দেখতে লাগল। ভাগ্নী হেলেনার কিন্তু একই চিন্তা মন-প্রাণ জুড়ে রয়েছে, সবুজ রশ্মি। বহু আকাজ্ষিত সবুজ রশ্মি যদি চোখে পড়ে তবে সুযোগের সন্ধ্যাবহার করতে সে ভুলবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য পশ্চিম-আকাশে হেলে পড়ল। হেলানা অপলক চোখে বিদায়ী সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় তার মামারা তাকে খেতে যাওয়ার জন্য ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সে বিরক্ত হল। তবুও না গিয়ে পারল না।

ডেকে, যেখানে বসে তারা খাবার খাচ্ছে সেখান থেকে সূর্যটা, সমুদ্রের দিগন্ত নজরে আসছে না দেখে সে রেগে

একেবারে কাঁই হয়ে গেল। মামারা নিতান্ত অপরাধীর মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভাবটা এমন যেন, যত দোষ তাদেরই।

গ্লাসগো। এখন থেকেও দুটো পথ ধরে ওবান যাওয়া যায়। জাহাজে অনেক ঘুরে যেতে হয়। পথ দীর্ঘ। কিন্তু স্থলপথে তাড়াতাড়ি গেলে সময় অনেক কম লাগে। পয়সা খরচও কম।

ভাগীর ঐকান্তিক আগ্রহের মূল্য দিতে গিয়ে মামারা এবার আয়োনা জাহাজে উঠল। সময় ও অর্থ দুই বেশি লাগলেও তারা নিরুপায়। আসলে গত সন্ধ্যায় বিকেলে খাবার খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে তারা এমনিতেই তাকে ফেপিয়ে দিয়েছে। ডুবন্ত সূর্যের শেষ দৃশ্যটুকু তার দেখা হয়ে উঠে নি।

জাহাজ আবার দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলছে। সন্ধ্যা ছয়টার কাছাকাছি। আর ঘণ্টা তিনেক পরে সূর্য পা-ঢাকা দেবে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই আয়োনা ওবান বন্দরে ভিড়বে। আকাশে মেঘ বা কুয়াশা কিছুই নেই। অতএব সবুজ রশ্মি দেখা যাবেই। হেলেনা ব্যস্ত-পায়ে ডেকে পৌছে রেলিঙ ধরে দাঁড়াল। অপলক চোখে তাকিয়ে রইল বিদায়ী সূর্যের দিকে। মনে তার সবুজ রশ্মি দেখার অতৃপ্ত আগ্রহ।

জাহাজ বন্দরে নোঙর করার আগেই একেবারে অভাবনীয় অবিস্বাস্য কাণ্টা ঘট গেল।

হেলেনা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, অন্তরীপের একদিকে যে সুউচ্চ টেউয়ের মতো কি একটা যেন বার বার ওঠানামা করছে, সেটা আসলে একটা নৌকা। প্রবল ঘূর্ণির টানে বার বার ওঠানামা করতে করতে সেটা ডুবতে চলেছে। কাণ্ডন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে ব্যাপারটার দিকে নজর রাখছেন।

হেলেনার মন থেকে সবুজ রশ্মির কথা উবে গেল। নৌকাটাকে উদ্ধার করার জন্য কাণ্ডনকে বার বার অনুরোধ করতে লাগল।

প্রবল-ঘূর্ণির মধ্যে পড়লে জাহাজটাও যে বিপদে পড়তে পারে কাণ্ডন সে কথা বুঝেও রূপসী অষ্টাদশী হেলেনার অনুরোধ ফেলতে পারলেন না।

কাণ্ডন দূরবীণটাকে চোখে লাগিয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে আর একবার দেখে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। দেখলেন, ডুবন্ত নৌকাটতে আরোহী মাত্র দুজন। দেখলেন একজন গলুইয়ের ওপর চিৎ হয়ে টান টান হয়ে শুয়ে। আর দ্বিতীয় জন দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি টেনে ধরে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে নৌকাটাকে রক্ষ করার চেষ্টা করছে। ছোট জেলে নৌকা বলেই এখনো রক্ষ করতে পারছে।

কাণ্ডন স্টিম বাড়িয়ে নৌকাটার দিকে জাহাজ ছুটিয়ে দিলেন। উলকার বেগে ধেয়ে নৌকাটার কাছাকাছি যেতেই কাণ্ডন জাহাজের ডেকের ওপর থেকে একগাছি দড়ি নৌকাটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। দড়িহাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটা শায়িত লোকটাকে যত্নচালিতে মতো কাঁধে তুলে নিয়ে অন্যহাতে জাহাজ থেকে নেমে আসা দড়িটাকে শক্ত করে ধরল। জাহাজের খালাসিরা টানাটানি করে তাদের ওপরে তুলে নিল। ইতিমধ্যে কাণ্ডন জাহাজটাকে ঘূর্ণির এলাকা থেকে অনেকখানি দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন।

প্রবীণ সঙ্গাহীন নৌকারোহীর মুখে সামান্য কড়া মদ ঢেলে দিতেই তার মধ্যে ধীরে ধীরে সংজ্ঞা ফিরে এল।

সে ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল, 'মি. অলিভার।'

যুবকটা মুখ কাচুমাচু করে বলল, আমি দুঃখিত। আমার জেদের জন্যই আপনার ভবলিলা সাজ হতে চলেছিল।' এবার কাণ্ডনের দিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ঘাড় ঘুরাতেই কাণ্ডন বললেন, 'সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাতে নয়, যাত্রীরা পীড়াপীড়ি করতেই আমি জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

আসলে হেলেনা অপলক চোখে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে না থাকলে নৌকাটা কারোর নজরেই পড়ত না। তার মাথায় যে সবুজ রশ্মি জগদ্বন্দ পথরের মতো চেপে রয়েছে। নৌকাটাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় দিগন্ত রেখার দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখার কথা কিছু সময়ের জন্য উবে গিয়েছিল। সূর্য অনেক আগেই সমুদ্রে ডুব দিয়েছে কিন্তু এবার সে আর কারোর ওপরে উদ্ভা প্রকাশ করতে পারল না। আসলে এবার যে সম্পূর্ণ দোষ তার নিজের। তাই মুখ গোমড়া করে বসে রইল।

প্রৌঢ় মাঝি সুস্থ হয়ে নৌকা নিয়ে আবার সমুদ্রে ভাসল। অলিভার জাহাজেই রয়ে গেল। পর্যটকদের সঙ্গে ওবান বন্দরে এসে নামল। রাত্রির অন্ধকারে যাত্রীরা জাহাজ থেকে নামতে লাগল।

বহু পর্যটক ওবানে ছুটি কাটাতে এসেছে। দুচার দিন থেকে হাওয়া বদল করে শরীর ও মনকে একটু-আধটু চাঙা করে ফিরে যাবে। রাত্রির অন্ধকারেও জাহাজঘাটে মানুষের ভিড়।

ভিড় যতই থাক না কেন, অ্যারিসটোবিউলিস অ্যারিসক্লোসকে খুঁজে বের করতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। আঠাশ বছরের যুবক। তাকে দেখে কিন্তু তার বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। তার চেহারা ছবি ভালো নয়, খারাপও বলা চলে না। চোখ-মুখ কারোর নজর কাড়ার মতো নয়। মাথার চুল বড্ড সাদা। চোখে চশমা। চশমা ছাড়া মোটেই দেখতে পায় না। নাকটা অস্বাভাবিক ছোট। দাড়ি চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছেন। সব মিলিয়ে মুখটা যেন বাদরের মুখেরই মতো।

অ্যারিসটোবিউলিস অ্যারিসক্লোসের বুদ্ধি আর অর্থ কোনোটাই ঘাটতি নেই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা মগজ ধোলাই হলেও বাস্তবপাণে মানুষকে ঘায়েল করার কায়দা-কৌশল তার অজ্ঞাত। রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা আর গণিতে যতটা পাণ্ডিত্য তার আছে, সাহিত্যে ততটা দখল তার নেই। নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ফলাতে গিয়ে বোকামির পরিচয়ই বেশি দিয়ে ফেলে। তার আসল খেয়াল হচ্ছে, যাবতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া। এরই জন্য সে সবার চক্ষুশূল হয়ে ওঠে। লোককে হাসাতে গিয়ে নিজেই হাসির খোরাক হয়ে ওঠে। কারোর কথা ধৈর্য ধরে শোনা তার খাতে সয় না। নজর মেলে কিছু দেখার মতো মানসিকতাও তার নেই। সর্বক্ষণ বক বক করতে খুব ওস্তাদ।

এমন আজগুবি একটা লোককে দেখে হেলেনা যে ভাববিমুগ্ধ হয়ে উঠবে, এরকম কথা যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবেন।

আশ্চর্য ব্যাপারই বটে। আদরের দুলালী ভাগ্নীকে পাত্রস্থ করার জন্য এমন বিদঘুটে চরিত্রের একটা যুবককে মামারা নির্বাচন করায় অবাধ হাবার মতো ব্যাপারই বটে। হয়তো বা সে নিজেই মামাদের কাছে তাদের ভাগ্নীর বর হাবার জন্য অনুরোধ রেখেছে।

দু-ভাই এখন স্বীকার করছে, ভাগ্নীকে ব্যাপারটা না জানিয়ে এখানে নিয়ে আসাটা খুবই চালাকি করে ফেলেছে। তাদের বিশ্বাস, ভাগ্নীর মন থেকে সবুজ রশ্মি দেখার ঝোঁকটা কর্পূরের মতো উবে যাবে।

পরদিন ভোর হতে না হতেই দুভাই আনন্দে নাচতে নাচতে ক্যালিডোনিয়ান হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য, অ্যারিসটোবিউলিস আরসিক্রোসকে-খুঁজে বের করা। ভাগ্নী হেলেনা তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

দুই মামা খোঁজাখুঁজি করে অজুত জীবাটাকে বের করতেই সে সবিম্বয়ে বলে উঠল, 'আপনারা ওবানে, কি ব্যাপার বলুন তো। কবে এলেন?'

সংক্ষেপে কুশল সংবাদাদি আদান প্রদানের পর পণ্ডিত প্রবর সবিম্বয়ে বলে উঠল, 'ভালো কথা, টেলিগ্রামের খবরটা শুনেছেন কি? আমিও সবই খবরটা পেয়েছি।'

'আরে সাহেব, গ্লাডষ্টোনের কোনো ব্যাপারই এটা নয়। আবহাওয়ার রিপোর্টের কথা বলছি। জানেন সাহেব, ব্যারোমিটারে এক ইঞ্চির অর্থ হচ্ছে, পঁচিশ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ নেমে যাওয়া; আর তার জন্য নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। অচিরেই ঝলমলে আবহাওয়া বিদায় নেবে, আকাশ মেঘে ছেয়ে যাবে। আটলান্টিকের দিক থেকে প্রবল বাতাস বইতে থাকবে।

কথাটা শুনে দুই ভাই যারপরনাই খুশি হল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সবুজরশ্মি আর দেখা যাবে না। ফলে মতলব সিদ্ধ করতে এখানে কয়েকটা দিন অন্তত থাকা যাবে।

অ্যারিসটোবিউলিস একটা চকমকি পাথর নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে দুই ভাইকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য দয়া করে বলবেন কি?'

সিব জবাব দিল, 'উদ্দেশ্য তেমন কিছুই নয়। দিন কয়েক থেকে মুক্ত বায়ু সেবন করা, এই আর কি।'

স্যাম বলল, 'আমাদের ভাগ্নী মিস হেলেনাও এসেছে।'

'ভাই বুঝি? যাক, আপনাদের সঙ্গে তবে আবার দেখা হচ্ছে, কি বলেন? আচ্ছা, কেবলমাত্র মুক্তবায়ু সেবনই কি আপনাদের উদ্দেশ্য? আমার তো মনে হয় আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাকে নিবিড় করে তোলার উদ্দেশ্যেই আপনারা এখানে ছুটে এসেছেন ঠিক বলিনি?'

স্যাম স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিল- 'হ্যাঁ, এটাও একটা উদ্দেশ্য বটে।'

'যাক, কাজটা ভালোই করেছেন। এ সুযোগে তাঁকে সমুদ্রের ওঠানামা, তরঙ্গমালার উচ্চতা, বাতাসের গতিবিধি ও বেগ আর জোয়ার-ভাঁটার খেলা প্রভৃতি ব্যাপার সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া যাবে।'

তার কথায় দুভাই যারপরনাই আনন্দিত হলেন। তাঁকে একবারটি হেলসবারের প্রাসাদে পদার্পণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করে বসল।

'হ্যাঁ, আমাকে কিছুদিনের মধ্যেই একবারটি ওদিকে যেতেই হচ্ছে। বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন দিয়ে ক্লাইড নদীর জল বের করে দেওয়ার কাজেই আমাকে সেখানে যেতে হবে।'

তার কথায় দুই ভাই আনন্দে ডগমগ হয়ে গেল।

অ্যারিসটোবিউলিস মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললেন, 'আপনারা, আপনাদের ভাগ্নী নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করার জন্য এখানে ছুটে এসেছেন, তাহিনা? এবার বলুন তো কোনো প্রাকৃতিকদৃশ্য হেলসবারায় অনুপস্থিত?'

স্যাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব ভেবে দিল, 'সবুজ রশ্মি। সবুজ রশ্মির দেখা পাওয়ার প্রত্যাশায়ই—'

ভুরু কুঁচকে মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে অ্যারিসটোবিউলিস বলে উঠল, 'কি বলেন? সবুজ রশ্মি? কই এমন কোনো ব্যাপার চাক্ষুষ করা তো দূরের ব্যাপার, কোনোদিন নাম শুনেছি বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

দুই ভাই এবার মনিং পোষ্ট সংবাদপত্রের পাতায় সবুজ রশ্মির ব্যাপার যেটুকু জানতে পেরেছিলেন তার কাছে সন্তোষে ব্যস্ত করল।

'খ্যৎ সাহেব, ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা। নিছকই ছেলেমানুষী ব্যাপার।' মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বলল, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমিই তাকে সবুজ রশ্মি দেখিয়ে দেব। এরকম ছেলেমানুষী কারবার নিয়ে পদার্থবিজ্ঞান মাথা ঘামায় না।'

'আমাদের ভাগ্নীও তো আসলে নিছক ছেলেমানুষই বটে। বুদ্ধি পাকা হলে এমন একটা বিদঘুটে ব্যাপার, সবুজ রশ্মি নিয়ে এমন মাতামাতি করতে উৎসাহী হয়, বলুন? যাক, আপনি তাকে সবুজরশ্মি দেখানোর দায়িত্ব নিচ্ছেন শুনে আমরা দুই ভাই নিশ্চিন্ত হলাম।'

পথ চলতে চরতে অ্যারিসটোবিউলিস বলতে লাগল, 'একটা ব্যাপার হচ্ছে, পুরুষদের মগজের মতো মেয়েদের মগজের কোষ সুবিন্যস্ত নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মগজটাকে তো আর নতুন করে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই। একটু-আধটু প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলেই কাজ চালাবার মতো তৈরি করে নেওয়া যাবে। মেয়েদের সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট করে তা আর বলার নয়। তাই তো হার্ভে, এরিস্টটল, নিউটন, প্যাসকল, লাগ্রেস, এডিসন, অ্যারোগোভেডি ও অন্যান্য প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মতো মেয়েদের মধ্যে থেকে আজ পর্যন্ত একজনও নাম করতে পারে নি।'

দুই ভাই তার কথার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কথা বলতে বলতে তারা হোটেল পৌছে গেল।

হোটেল দুকেই অ্যারিসটোবিউলিস ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হেলেনার ঘরে হাজির হল। হেলেনা তখন খোলা জানালা দিয়ে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তাকে অভিবাদন জানাতে গিয়ে অ্যারিসটোবিউলিস মুচকি হেসে বলল, 'মিস হেলেনা, বরাবর জোরে আমাদের ওবানে দেখা হয়ে গেল।'

ভাইদের মধ্যে থেকে একজন অ্যারিসটোবিউলিসের দিকে আঙ্গুলি-নির্দেশ করে বলল, 'ইনি মি. আরসিক্রোস।'

মামার কথার জবাব না দিয়েই হেলেনা বলে উঠল, 'মামা, আমরা কি সত্যিই ওবানে এসেছি?'

স্যাম বলল, 'অবশ্যই। এটা পশ্চিম উপকূল।'

'পশ্চিম উপকূল। না মামা, তবে আর এক মুহূর্তও আমাদের এখানে থাকা চলবে না। তোমাদের তো আমি স্পষ্টই বলেছি, যেখান থেকে সমুদ্রের পূর্ব উপকূল, পাহাড় আর আকাশচুম্বী গাছগাছালি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।'

দায়সারা গাছের অভিবাদন করে ভাগ্নী হেলেনা লম্বা লম্বা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুই মামা নিতান্ত অপরাধীর মতো মুখ কাচুমাচু করে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

হায়! ওবান যে এমন জায়গা, সূর্যাস্ত দেখা যায় না, ডুবন্ত সূর্যকে সমুদ্রের বুকে গা-ঢাকা দেবার দৃশ্য দেখা যায় না তাও কি ছাই কেউ জানত?

আগন্তুকরা হোটেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে জানতে পেরে হোটেলের ম্যানেজারের তো মাথায় হাত পড়ার জোগার। সমুদ্র, পশ্চিম দিগন্ত দেখা যায় না বলে হোটেল ছেড়ে, একেবারে ওবান শহর ছেড়ে যেতে হবে, একী আজগুবি কথা। এটা কোনো সমস্যা নাকি? ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে মাইল চার-পাঁচ দক্ষিণ-পশ্চিমে গেলেই তো পশ্চিম দিগন্ত দেখার সাধ মিটতে পারে। সি আইল্যান্ডের ওপারে দাঁড়িয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে পশ্চিম দিগন্তের তিন চতুর্থাংশ পরিষ্কার দেখে নেওয়া যেতে পারে। এরকম একটা সামান্য ব্যাপারের জন্য হোটেল ছেড়ে যাওয়াটা বিশ্ময়কর ব্যাপারই তো বটে। তিনি বলে পাঠালেন, 'দেওয়ালে মানচিত্র টাঙানোই রয়েছে। মিস হেলেনা ইচ্ছা করলে নিজের চোখে দেখে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে নিতে পারে।'

হেলেনা মানচিত্রটার ওপর দীর্ঘ সময় ধরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আশ্বস্ত হল। শেষপর্যন্ত হোটেল থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিল। তার সিদ্ধান্ত পাষ্টানোর জন্য দুই মামা যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল।

আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা মোটেই বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তেসরা থেকে ৬ আগষ্ট মামারা ওবান শহরের বুকেই ঘুরে ফিরে দিন কাটিয়ে দিতে লাগল। হেলেনা কিন্তু ভিড়ের মধ্যে গেল না। হোটেলের ঘরে বসে পাহাড় আর জঙ্গল দেখেই দিন ক'টা কাটিয়ে দিল। মামারা ভাবল, তাদের ভাগ্নী বুঝি পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিসের ভাবনায় আত্মমগ্ন।

হেলেনা কিন্তু ঘূর্ণির চক্রে পড়ে যে নৌকাটা অনবরত পাক খাচ্ছিল সে দৃশ্যটার কথাই বার বার ভেবে চলেছে।

নৌকার মাঝি আর নৌকাটার ভাবনায় অস্থির হয়ে না পড়লে সে নির্ধাৎ সবুজ রশ্মি দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত না। এখন আর এক অদ্ভুত ভাবনা প্রায়ই মাথায় চক্কর মারে। নৌকার সেই 'গাট্টাগোষ্ট' অকুতোভয় যুবকটার কথা। সবুজ রশ্মির চিন্তা মাথায় আসতেই তার চেহারাটা যেন ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একী ঝকঝকিতে পড়া গেল রে বাবা। পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। ইতিমধ্যে হেলেনার সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। তার মগজে জ্ঞান-বুদ্ধি ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিন্দুমাত্র ক্রটি করেন নি। মেঘ কত প্রকার, তাদের চরিত্র, তাপমাত্রা কমে গেলে মেঘ কেন ও কীভাবে ভূমির দিকে নেমে আসে এসব ব্যাপার তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টার কসুর করে নি। কুয়াশার প্রকারভেদ ও তাদের চরিত্র কেমন তাও তার মগজে ঢুকিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছে। পণ্ডিত প্রবর যখন এসব ব্যাপার স্যাপার নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বক বক করছে, তখন হেলেনা হয় দূরের পাহাড়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে নতুবা পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা ঘরের মেঝেতে আলতোভাবে বুলিয়ে চলছিল। পণ্ডিত প্রবরের সারগর্ভ বক্তব্যের কিছুই তার মগজে ঢোকে নি।

এভাবেই, এদখতে দেখতে আগস্টের ৬ তারিখ পেরিয়ে গেল।

আকাশের মেঘ কেটে গিয়ে এবার একটু পরিষ্কার হল। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভও উর্ধ্বমুখী হল। ব্যাস, দুই মামা ব্যস্ততার সঙ্গে ভাগ্নী হেলেনা আর পরিচারিকা গ্যাট্রিজকে নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসল।

অ্যারিসটোবিউলিস তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তদন্ত নিয়ে মেতে থাকায় তাদের এসব ব্যাপার-স্যাপার কিছুই জানতে পারল না।

সিআইল দ্বীপের কিনারায় গাড়ি এসে থামল। সামনে বিশাল সমুদ্র। দিগন্তের তিন চতুর্থাংশ স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

এখানে আটটা বাজতে দশ মিনিট আগে সূর্যাস্ত হয়। বেচারি মামারা ঠায় বসে রইল। ভাগ্নী দিগন্তের দিকে নিম্পলক চোখে তাকিয়ে রইল। সূর্য ক্রমেই সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়ছে। এবার বহু আকাঙ্ক্ষিত সবুজ রশ্মির খেল নিশ্চয়ই দেখা যাবে।

হায়! একী সর্বনাশা কাণ্ড অবাস্তিত্ব এক টুকরো ঘন কালো মেঘ দ্রুত ভেসে এসে সূর্যটাকে আড়াল করে দিল। গোলাকার সূর্যটাকে দ্বিধা বিভক্ত করে ফেলল। মুহূর্তের মধ্যে হতছাড়া মেঘটা সম্পূর্ণ সূর্যটাকে মুড়িয়ে ফেলে সমুদ্রের বুকে তলিয়ে যেতে লাগল। ব্যাস, সবুজরশ্মি দেখতে পাওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না।

অবাস্তিত্ব মেঘটাই হেলেনাকে সবুজরশ্মি দেখার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে সেটা চুপি চুপি কেটে পড়ল।

মুখ গোমড়া করে হেলেনা হোটেল ফিরে এল। দুই মামাই নিশ্চিত। সবুজরশ্মি দেখতে না পাওয়ার জন্য ভাগ্নী তাদের অন্তত দোষারোপ করতে পারবে না।

সাব্যস্ত হল। এখন কিছুদিন আর এত হাস্যামা করে সিআইল দ্বীপে গিয়ে ফায়দা কিছুই হবার নয়। থেকে থেকে আকাশে মেঘের উদয় হবেই। তবে হতাশ হবারও কিছু নেই। মাস দেড়েক পরে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ আবার উর্ধ্বমুখী হলে আবার গাড়ি নিয়ে সিআইল দ্বীপে হাজির হওয়া যাবে।

একদিন ডানোলি দুর্গ-প্রাসাদে বসে একথা সেকথা বলতে বলতে পরিচারিকা বলল, 'বাছা, তোমাদের ওই পণ্ডিত সাহেব লোকটা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয় বলেই আমার বিশ্বাস। বড় বংশ আর ধনকুবের সত্য বটে।'

হেলেনা তার কথার জবাব না দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলে উঠল, 'আচ্ছা, সে যুবকটাকে আয়োনো জাহাজে উঠিয়ে এনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল, তার আর খোঁজ পাওয়া যায় নি?'

'দু্যৎ, ছোড়াটা একেবারে অকৃতজ্ঞ! তোমার জন্যই সে যমের দুয়ার থেকে ফিরে আসতে পেরেছে। কিন্তু জাহাজ ছেড়ে যাবার সময় সামান্য ধন্যবাদটুকু জানাবার দরকারও মনে করল না!'

'ধন্যবাদ যে জানাবে, আমার জন্যই যে যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছে তা কি সে জানতে পেরেছিল? যাকগে, ওবানে তাকে আর দেখা যাবার?'

'কেন দেখা যাবে না? ওই তো সেদিন সমুদ্রের ধারে হাওয়া খাচ্ছিল। আমাকে দেখে চিনতেই পারল না। তুমি কি বাছা, তাকে আচমকা দেখতে পেলে চিনতে পারবে?'

'কেন পারব না। আপনজনের মতো মধুর সম্ভাষণে কেউ যে কথা বলতে পারে, তাকে দেখার আগে পর্যন্ত আমার ধারণাই ছিল না। ভাড়া করা একটা নৌকামাত্র সম্বল।'

বাস, এ পর্যন্তই। তাদের আলোচনা আর বেশিদূর এগোল না।

এদিকে দুই মামা কী ফাঁপড়েই না পড়েছে। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে। একটু আধটু নামলেও তিলমাত্রও ওপরে উঠল না। রোজ বেশ কয়েকবার করে তারা ব্যারোমিটারের ওপরে চোখ বুলিয়ে চলেছে। ফলে ভাগ্নীর মুখ ক্রমেই গোমড়া হয়ে চলেছে। পণ্ডিত প্রবরকেও ভাগ্নী মন থেকে মেনে নিতে পারছে না। আবার মেঘের সঙ্গে বোঝাপড়া করে সবুজরশ্মিও রোজ লুকোচুরি খেলে চলেছে।

এডিনবরার এক নামকরা বংশের ছেলে অলিভার। অলিভার সিনক্রিয়ার। মা-বা বহু আগেই স্বর্গে গেছেন। কাকার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। কবি হিসাবে তার খুবই নামডাক। শিল্পী হিসাবেও তার খ্যাতি কম নয়। নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করেই গোছা গোছা ডলার রোজগার করতে পারে। অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়ে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে সে ডু-পয়টনে বেরিয়েছিল। ভারতবর্ষ আর আমেরিকার জাঁকজমকপূর্ণ শহরগুলোতে মনের সুখে চক্কর মেরে বেরিয়েছে। অটুট মনোবল, অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্যম আর সাহসও তার বুকভরা। এই করিভিচান উপসাগরের সেই যুবক।

এদিকে পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস দুই মামার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ক্রোচি খেলায় মেতেছে। অদূরে অলিভার আপন মনে ছবি আঁক চলেছে। ভাগ্নী হেলেনাও তাদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করেছে। শেষপর্যন্ত অ্যারিসটোবিউলিস গো হারা হেরে গেল। বেচারি লজ্জায় মুখ দেখাতে না পেরে পালিয়ে বাঁচল। এমন কি অলিভার সিনক্রিয়ারের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকারও মনে করল না। ফ্যাকাসে মুখে হোটেল ফিরে গেল।

খেলা বন্ধ হওয়ায় মামারা এবার যুবক শিল্পীর দিকে মন দিল। গুটি গুটি পায়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। ভাগ্নী হেলেনা তাদের অনুসরণ করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

কথা প্রসঙ্গে হেলেনা তার কাছে সবুজরশ্মির প্রসঙ্গ পাড়ল।

সবুজরশ্মির কথা শুনে অলিভার ক্র ক্রুচকে চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠল, 'সবুজরশ্মি! এর আগে তো এরকম কোনো কিছুর অস্তিত্বের কথা কোথাও শুনিনি। তবে তো আমাকেও দেখতে হয়। আর তা না দেখা অবধি আমি আর রঙ-তুলিতে হাত দিছি না।'

হেলেনা বলল, 'আমরা বরং এক সঙ্গে সবুজ রশ্মি দেখার চেষ্টা করি, আপত্তি আছে?'

'আপত্তি! এতো বরং আনন্দেরই কথা। আপত্তির তো কোনো কারণই থাকতে পারে না।' উল্লেখ্য প্রকাশ করে অলিভার সিনক্রিয়ার জবাব দিল।

এবার থেকে প্রতিদিনই তাদের দেখা সাক্ষাত হতে লাগল। অলিভার জাহাজ থেকে বিদায় নিয়ে এখানে, ক্যালিডোনিয়ান হোটলেই উঠেছিল।

এদিকে দুই মামা ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উর্ধ্বগতি দেখতে না পেয়ে মনমরা হয়ে পড়লেন। আবহাওয়ার উন্নতি না হলে সিআইল দ্বীপে গিয়ে তো ফায়দা কিছুই হবার নয়।

পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিস ক্যালিডোনিয়ান হোটলে নেই। ভূ-বিদ্যা বিষয়ক গবেষণার তাগিদে সুইং দ্বীপে গেছে।

১৬ আগস্ট। বরাত খুলল। ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ দ্রুত ওপরের দিকে উঠতে লাগল। আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটল। সূর্য ঝকঝকিয়ে উঠল। আকাশে মেঘের চিহ্নও নেই। দুই মামা ভাগ্নী হেলেনাকে নিয়ে সিআইল দ্বীপের প্রান্তে হাজির হল। শিল্পী অলিভার সিনক্রিয়ারও তাদের সঙ্গে রয়েছে।

তারা ঘীপের প্রান্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়েছে। সমুদ্রের বুকে আত্মগোপন করার জন্য বিদায়ী সূর্যটা তার রক্তিম অভ্যট্টক নিয়ে উন্মুখ হয়ে পড়েছে।

অকস্মাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল। একটা পালতোলা নৌকা যন্ত্রচালিতের মতো ঘীপের পাশ থেকে বেরিয়ে এসে দমকা হাওয়ার টানে ডুবন্ত রক্তিম সূর্যটার দিকে এগিয়ে চলল।

হেলেনা মনমরা হয়ে পড়ল। ইয়া পেল্লাই পাল নিয়ে নৌকাটা যদি এক ধারে সরে না যায় তবে আর সূর্যটাকে দেখা যাবে না। তার প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

মামার হাত নেড়ে, গলাফাটা চিৎকার করে নৌকারোহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। বৃথা চেষ্টা। নৌকাটা সূর্যকে আড়াল করেই তরতর করে এগিয়ে চলল। ঠিক সে সময়ে রক্তিম আভার গায়ে সবুজরশ্মি উদ্ভাসিত হওয়ার কথা তখনই হতচ্ছাড়া নৌকাটা তাকে আড়াল করে দিল! হেলেনা রীতিমতো ক্ষেপে গিয়ে সমানে কপাল চাপড়তে লাগল।

দুই মামা আর ভাগ্নী সবাই একেবারে ক্ষেপে লা। কেবলমাত্র শিল্পী সিনক্লিয়ার নির্বিকারচিত্তে অগ্রসরমান নৌকা ও পালটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্তিম অভ্যট্টকুর দিকে ভাবাগুত চোখে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদেই নৌকাটা সিআইল ঘীপের পাড়ে এসে ভিড়ল। নৌকা থেকে যে লোকটা নেমে এল তাকে দেখেই সবাই রীতিমতো থ-বনে গেল। নৌকারোহী অ্যারিসটোবিউলিস। সুইং ঘীপ থেকে ভূ-তত্ত্ববিষয়ক গবেষণা সেয়ে ফিরছে।

কোনরকম ভূমিকা না করেই মামাদের মধ্যে থেকে একজন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'দেখুন সাহেব, অলিভার সিনক্লিয়ারকে সমুদ্রের বুকে থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রথমবার সবুজরশ্মি দেখার সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল। সিনক্লিয়ার এর দিকে অস্থূলি নির্দেশ করে এবার বলল, 'তার জন্য ইনি বড়ই লজ্জিত। দ্বিতীয়বার বেরসিক নচ্ছার একটা মেঘ ঝট করে ডুবন্ত সূর্যটাকে ঢেকে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিল। আর তৃতীয়বার আমাদের সব চেষ্টা আপনার, মানে নৌকাটার জন্য ব্যর্থ হয়ে গেল।'

উদ্ভ্রজ্ঞায় কাঁপতে কাঁপতে হেলেনা বলে উঠল, 'এরকম একটা অপকর্ম না করলেই কি আপনার চলছিল না সাহেব! আপনি কী যে সর্বনাশ করলেন বুঝতে পারছেন না! আমারও এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে আপনাকে আমার মনের অবস্থাটা বুঝাতে পারি।'

দুই মামা, ভাগ্নী আর অলিভার সিনক্লিয়ার সবুজরশ্মির চিন্তায় একেবারে আত্মমগ্ন হয়ে রইল। কিন্তু বারবার যেমন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে আর আকাশও নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাকে—কবে, কখন যে বহু আকাজ্জিত সবুজরশ্মি অভাবনীয় রূপ নিয়ে দেখা দেবে তা ভগবানই জানেন। এসব বাজে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ও উৎসাহ কোনোটাই অ্যারিসটোবিউলিসের নেই।

কেবলমাত্র হেলেনার অতুঃপ্র আত্মহের ফলেই যে তার প্রাণটা রক্ষা পেয়েছিল একথা অলিভার সিনক্লিয়ার আজও জানে না। সে জেদ না ধরলে যে সমুদ্রের বুকে ঘৃণিপাকে পড়া অলিভারকে বাঁচানো যেতো না, একথা তাকে কেউ-ই বলে নি।

অবশ্য হেলেনাই তার মামাদের এই কথা ফাঁস করতে বারণ করে দিয়েছিল।

সম্প্রতি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছে। সবুজরশ্মি—সবুজরশ্মি করে চারজন সবকিছুই সবুজ দেখতে শুরু করেছে। সমুদ্র, আকাশ, পাহাড়, বন এমন কি খাদ্যবস্তু পর্যন্ত তাদের চোখে সবুজ হয়ে উঠেছে। অভাবনীয় এ-সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় অলিভারই তাদের বলে দিল। এ জায়গাটা থেকে কোনোদিনই সূর্যাস্ত দেখা যাবে না। সিআইল ঘীপ থেকেও নয়। আয়োনা গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক।

হেলেনা উল্লসিত হয়ে বলল, 'চমৎকার! চমৎকার যুক্তি! কিন্তু সেখানে গিয়েও যদি হতাশ হতে হয়, সবুজরশ্মির দেখা পাওয়া না যায় তবে?'

'কুছ পরোয়া নেই। সারা পৃথিবীটাকে চক্কর মারব। কোথাও না কোথাও থেকে তো আমাদের বাঙ্গা পূরণ হবেই।'

ব্যস, আর দেরি নয়। পরের দিন কাকডাকা ভোরে দুইমামা তাদের ভাগ্নী আর অলিভার সিনক্লিয়ারকে নিয়ে জাহাজে উঠল। দুই মামা হোটেল ছাড়ার পূর্বমুহুর্তে সৌজন্যর খাতিরে অ্যারিসটোবিউলিসকে তাদের যাত্রার কথা জানিয়ে এল। অ্যারিসটোবিউলিস কিন্তু নিজের মতলবের কথা ভুলেও তাদের কাছে ফাঁস করল না।

স্টাফ আর আয়োনা চক্কর মেরে স্টিমারটা সন্ধ্যার আগেই ওবানার ফিরে আসবে।

হেলেনা আর অলিভার সিনক্লিয়ার ডেকে পাশাপাশি চেয়ারে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখছে। 'সমুদ্র বাস্তবিকই চিরনতুন, চিরসুন্দর। সমুদ্র মানুষের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে তোলে। আশ্চর্য ব্যাপার কি জানেন, কেবল অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের মিলনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এমন অনিন্দ্যসুন্দর সমুদ্রের। অবশ্য তাদের সঙ্গে মাত্র শতকরা আটভাগ সোডিয়াম রয়েছে।'

হেলেনা আর অলিভার সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তাদের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে অ্যারিসটোবিউলিস নির্বিকারভাবে তাদের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বলছে।

অ্যারিসটোবিউলিস অনেক আগেই তাদের অগোচরে স্টিমারে উঠেছেন বসেছিল। স্টিমার আয়োনার কাছাকাছি আসতেই ডেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতির কথা এর আগে হেলেনা এবং অলিভার কেউ-ই শোনে নি।

স্টিমার আয়োনা বন্দরে নোঙর করল। একটা মাত্র স্টিমারই পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করে। নোঙর করার পর ঘণ্টা দুই পরে আবার স্টিমার ছাড়ে। এক সময় এ-দ্বীপ খুবই রমরমা ছিল। এখন ধ্বংসাবশেষটুকু অতীতের স্মৃতি বহন করছে।

দুই মামা ডানকান আর্মস নামে ভাঙাচোরা একটা বাড়িতে ভাগ্নী আর পরিচারিকাকে নিয়ে মাথা গুঁজল। আর অ্যারিসটোবিউলিস আর অলিভার উঠল অন্য একটা ডেরায়। আয়োনা দ্বীপটায় চারশো ফুট পাহাড় ছাড়া দেখার মতো আর কিছুই নেই। আর তিন হাজার মাইল দূরবর্তী আমেরিকার উপকূল—বাস। তবুও আগভুকরা সর্বক্ষণ দ্বীপের বুকে চক্কর মেয়ে বেড়াতে লাগল।

৩০ আগস্ট মঠ আর গির্জায় গিয়ে মনটাকে একটু চান্স করে ভোলায় জন্য আগভুকরা পা বাড়াল।

আগভুকরা যখন মনের আনন্দে ম্যাকনিলস ক্যাভারলির সমাধি ক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঠিক তখনই নিতান্ত অবাঞ্ছিত অ্যারিসটোবিউলিস দাঁত বের করে হাসতে হাসতে সেখানে হাজির হল। তাদের আনন্দটাই একেবারে মাটি করে দিল। একেবারেই উটকো খামেলা।

অলিভার কয়েক হাত দূরে আপন মনে ইজেলের গায়ে তুলি বুলিয়ে ছবি ঐকে চলেছে। এদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই।

কোনোরকম ভূমিকা না করেই অ্যারিসটোবিউলিস তার বিদ্যা জাহির করার কাজে মেতে গেল। তার বক্তব্য গির্জা আর মঠটার সৃষ্টির ইতিহাস।

হেলেনা চোখ-মুখে বিরক্তির ছাপ ঐকে গুটি গুটি সেখান থেকে সরে পড়ল। অলিভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সে অলিভারকে নিয়ে সমাধি-প্রাপ্তদের দিতে হাটা দিল। ছোট-বড় সমাধি সৌধগুলির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেলেনা ভাবাপ্রসূত কণ্ঠে বলে উঠল, 'অসংখ্য বিদেহী সন্তা এখানে পাথরচাপা হয়ে পড়ে রয়েছে। আমার ইচ্ছা করছে ডাকডাকি করে তাদের জাগিয়ে তুলি।'

ঠিক সে মুহূর্তেই পিছন দিক থেকে অ্যারিসটোবিউলিসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল 'সে কী মিস হেলেনা, আপনি আত্ম-ভূতপ্রেত বিশ্বাস করেন!'

'করি। অবশ্যই বিশ্বাস করি।' স্মৃতিসৌধের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই হেলেনা দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল।

'আমি কিন্তু বলব এসব কথা পাগলের কথা—সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। ভালো কথা বিদেহী সন্তাকে দেখিয়ে আমার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে পারেন?'

'আমার দেখিয়ে দিতে হবে না। দেখার মতো চোখ ও মন থাকলে আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। সবকিছুর কথা বাদ দিলেও, সবুজরশ্মি—সবুজরশ্মি সুদূর দিগন্তের বুকে কেন মুহূর্তের জন্য উঁকি মারে বলুন তো?'

চৌটার কোনে ভাঙিল্যের হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে অ্যারিসটোবিউলিস বলে উঠল, 'সবুজরশ্মি আসলে কি, জানেন? ভুবন্ত সূর্যের শেষ রশ্মিচ্ছটা সমুদ্রের ওপরের পাতলা জলের ভেতর দিয়ে আসতে গিয়ে রক্তিম আভাটুকু, মানে রঙটুকু গুণে নেয়। সূর্যের স্বাভাবিক প্রকাশই আপনার আকাঙ্ক্ষিত সবুজরশ্মি। তা চকিতে মিলিয়ে যায় সত্য। কিন্তু আমাদের চোখের রেটিনার গায়ে সবুজাভ ভাবটাকে ফুটিয়ে দিয়ে তবে সে অন্তর্হিত হয়। চক্ষু-বিজ্ঞানীদের মতে সবুজ রং লাল রঙের পরিপূরক। আপনার আকাঙ্ক্ষিত সবুজরশ্মি—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই হেলেনা মামাদের হাত ধরে টানতে টানতে সেখান থেকে সরে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

হেলেনা পণ্ডিত প্রবর অ্যারিসটোবিউলিসের ওপর রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে রইল। যে লোক সবুজরশ্মিতে কবিত্ব উপলব্ধি করে না, আত্ম-পরমাত্মা আর শাস্ত্রকথাকে মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রলাপ আত্মা দিতে দ্বিধা করে না, অনন্ত সৌন্দর্যের আধার সমুদ্রের জলে কেবলমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইডের অস্তিত্বের কথা ভাবে আর সবকিছুকে বিজ্ঞানের নিরস কাঠগোড়ায় ফেলে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তার নামটা শুনেও হেলেনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে।

দুই মামা অ্যারিসটোবিউলিসের সঙ্গে ভাগ্নী হেলেনার বিয়ের চিন্তাকে মাথা থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিতে বাধ্য হল। তবে অ্যারিসটোবিউলিস কি হেরেনকে পাবার আশা ছাড়তে পেরেছে? তা যদি হত তবে তো সে অনেক আগেই আয়োনা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেত।

অ্যারিসটোবিউলিস চরমতম বিপদে পড়ল। অলিভার না থাকলে তার যে কি গতি হত ভাবতে গেলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

পণ্ডিত প্রবর উঁচু একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যায়। গাছগাছালি আর লতা ধরে ধীরে ধীরে কোনোরকমে চূড়ায় গিয়ে দাঁড়ায়। পাহাড়ের গা একেবারেই মসৃণ। খানাপান তো দূরের কথা সামান্য খাঁজ বা ফাটল পর্যন্ত নেই।

পাহাড়টার গঠন বৈচিত্র্য দেখে অলিভার মুগ্ধ হল। রঙ-তুলি নিয়ে বসে গেল সেটার ছবি আঁকতে। ত্রিশ ফুট উঁচু গুহা। প্রস্থ পনের ফুট তো হবেই।

ছবি আঁকা শেষ করে তার তলায় লিখল, 'অলিভার সিনক্রিয়ারের পক্ষ থেকে মিস, হেলেনাকে উপহার।' সব শেষে লিখল, 'স্টাফা, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৮১।'

গুহাটায় স্থলপথে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। জলপথ ছাড়া সেটার মুখের কাছেই যাওয়া সম্ভব নয়। গুহাটার নাম 'ফিঙ্গলস গুহা।'

আগভুক দ্বীপবাসীরা পরের দিন গুহাটা দেখতে যাবে পরিকল্পনা করল।

এদিকে নিউইয়র্ক থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা জরুরি বুলেটিন টেলিগ্রাম মারফৎ জাহাজের কাপ্তেনদের সতর্ক করে দিয়েছে, “উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রলয়ঙ্কর তুফান আসছে। প্রবল বিক্রমে কটল্যান্ড আর আয়ারল্যান্ডের ওপর আছাড় খেয়ে পড়বে। তারপর নরওয়ের উপকূলে গিয়ে তার দাপট কমবে।”

এদিকে ক্রোনিংডা স্টিমারের কাপ্তেন ব্যারোমিটারের খামখেয়ালি দেখেই নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, প্রলয়ঙ্কর ঝড় ওঠার আর দেরি নেই। ব্যস্ত পায়ে দুই ভাইয়ের কাছে ঝড়ের পূর্বাভাসের দুঃসংবাদটা দিল। বলল, ‘এই মুহূর্তে স্টাফা দ্বীপ ত্যাগ করা দরকার। দূরবর্তী আকনলাক্রেগ দ্বীপের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া দরকার। সেখানে ঝড়ের দাপট কম থাকবে কোনোক্রমে স্টিমারটা রক্ষা করা যাবে। ঝড় ধামলে আবার এখানে ফেরা যাবে।’

অকুতোভয় অলিভারের খেয়াল চাপল, ঝড়ের রুদ্ররূপ দেখবে। প্রায় ফিসফিসিয়ে তার অদ্ভুত খেয়ালটার কথা বলল।

বাস, তার কথায় হেলেনাও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। দুই মামাকে রাজি করাতে দেরি হল না।

তাদের খাবার-দাবার ও জামাকাপড় নামিয়ে দিয়ে স্টিমারটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে গেল। আগন্তুকরা ক্যাম-শেল গুহায় গিয়ে অশ্রয় নিল। তার নামকরণ করল ‘মেলভিল হাউস’।

অভিযান পাগল অলিভার নৌকা নিয়ে পরিস্থিতিটা চাক্ষুষ করার লোভ সম্বরণ করতে পারল না। হেলেনাও তার সঙ্গে যেতে চাইল। শেষপর্যন্ত তার দুই মামাও নৌকায় উঠে বসল।

বিষ্কুম সমুদ্রের রূপ দেখার জন্য অত্যাৎসাহী অভিযাত্রীদের নৌকা ফিঙ্গালস গুহার দরজায় হাজির হল। অভিযাত্রীরা গুহার ভেতরে ঢুকেই তার ভেতরের অভাবনীয় দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য দৃশ্য। প্রায় দেড়শো ফুট গভীর অমর প্রস্থ প্রায় চ্যার্লিশ ফুট। তার ভেতরের থামগুলোর কোনোটা প্রিজমের মতো ত্রিকোনা বিশিষ্ট। আবার কোনোটি বা তার চেয়েও দৃষ্টিনন্দন। গুহার মুখ দিয়ে আলো ঢুকে, থামগুলোর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে শান্ত টলটলে জলের ওপর কমলা, লাল, হলুদ আর সবুজ রোশনাই লুটোপুটি খাচ্ছে। আর গুহার মুখ দিয়ে দমকা বাতাস ঢুকে অভাবনীয় এক শব্দলহরী সৃষ্টি করছে। এ যেন প্রাকৃতিক সংগীতলহরী সৃষ্টিকারী আ-না-ভাইন গুহা।

অভিযাত্রীরা বিশ্বয়-বিস্ফোরিত চোখের মণিগুলো চারদিকে বুলাতে বুলাতে গুহাটার আরও ভেতরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে গুহামুখ দিয়ে বাইরের মনোরম দৃশ্য দেখতে গেল।

ফিঙ্গালস গুহার সৌন্দর্য বুকে নিয়ে হেলেনা নিত্যন্ত অনিচ্ছায় অন্যান্যদের সঙ্গে ক্যাম-শেল গুহায় ফিরে এল।

৯ অক্টোবর বিকাল তিনটা থেকে হেলেনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছ’টার খাবার টেবিলেও সে হাজির হল না। সাতটা বাজল। অলিভার এবার দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

এদিকে ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেছে। স্টাফা দ্বীপের উন্মুক্ত প্রান্তে কিছু থাকলে তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোথায় ফেলবে ভাবাই যায় না।

কিন্তু হেলেনা? কোথায় সে? সে কি তবে ফিঙ্গালস গুহায় গেছে? তা হলে তো এ-প্রলয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে তার পক্ষে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।

অস্থিরচিত্ত অলিভার একাই হেলেনার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে উদ্ভ্রান্তের মতো গুহামুখে গিয়ে হাজির হল। হেলেনার দুই মামাও নিশ্চিন্তে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারল না। সেখানে হাজির হল। ইতিমধ্যেই গুহামুখে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের তাণ্ডবে সবকিছু বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ছর ছর করে জল ভেতরে ঢুকতে শুরু করেছে। একমাত্র চাতালটা এখনো ভেসে আছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গুহাটার ভেতর না ঢুকলে গুহামুখ জলে ভর্তি হয়ে যাবে। কি করবে তারা? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গুহার ভেতরে ঢুকলে ফায়দা কিছু হবে কি?

তবে হ্যাঁ, ইতিমধ্যে হেলেনার মুখে ফিঙ্গালস গুহার রূপ-সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা শোনা গিয়েছিল। সে যদি গুহাটার ভেতরে ঢুকে থাকে তবে অবশ্যই তার এখনো প্রাণে বেঁচে থাকার কথা।

দুই মামা হেলেনার নাম ধরে বুকফাটা আর্তনাদ জুড়ে দিল। না, ভেতর থেকে কোনো সাড়াই ভেসে এল না। অলিভার কম ডাকাডাকি করল না।

ঠিক সেই মুহূর্তেই গুহামুখ দিয়ে হেলেনার-চুলের ফিতাটা বেরিয়ে এল।

অলিভার বলল, ‘হেলেনা এ-গুহার ভেতরেই আছে। আর সে নির্যাত জীবিতই আছে। নইলে কেবল ফিতেটাই নয়, হেলেনার মৃতদেহটাও ডেউয়ের টানে বেরিয়ে আসত।’

অলিভার নৌকাটাকে কোনোরকমে গুহামুখে নিয়ে যেতেই জলের তোড়ে সেটা চোখের পরকে গুহার ভেতরে ঢুকে গেল। নৌকারোহী অলিভার একা। হেলেনার দুই মামা সঙ্গে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। অলিভার কিছুতেই রাজি হয় নি।

নৌকাটা এক ধাক্কায় ভেতরে ঢুকে যেতেই অলিভার আচমকা একটা পাথরকে ধরে ফেলল। সেটা ধরে বুলে রইল। পায়ের তলায় জলের দাপাদাপি সমানে চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাতের শিরা টনটন করতে লাগল। সে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, ‘মিস হেলেনা! মিস হেলেনা!’

পরমুহূর্তেই হেলেনার প্রত্যুত্তর ভেসে এল, ‘মি. সিনক্লিয়ার—মি. সিনক্লিয়ার, এই যে এখানে আমি।’

অলিভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগার হল। বেঁচে আছে। হেলেনা তবে বেঁচে আছে।

হেলেনা বিপদাশ্রয় পাথরের একটা গর্তের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তারই ভেতরে গুটিমুটি মেরে বসে রয়েছে। বৃষ্টিতে পরেছিল বাইরে বেরোবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। অলিভার নিজের প্রাণের মায়্যা ত্যাগ করে হেলেনার কাছে এল।

বলল, 'মিস হেলেনা আমি জানি আমি জানি মিস হেলেনা, করিভিচান উপসাগরে ঘূর্ণিচক্রে পড়ার পর আপনার জন্যই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছিল। অতএব এ মৃত্যুগুহা থেকে আপনাকে উদ্ধার করা আমার মানবিক কর্তব্য।' এদিকে থেকে থেকে জলের ঢেউ প্রবল বেগে গুহার মধ্যে ঢুকছে। তাদের দুজনকেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। অকুতোভয় অমিত শক্তিদ্বার অলিভারকে দু-হাতে জাপ্টে ধরে হেলেনা উনালু ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। কিন্তু অলিভারই বা আর কতক্ষণ লড়াই করে টিকে থাকতে পারবে? হেলেনাকে কীভাবে বাঁচাবে, নিজেই বা কি করে আত্মরক্ষা করবে? মৃত্যু যে হাতের নাগালের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে তর্জন গর্জন করে চলেছে। হেলেনা সংজ্ঞা হারিয়ে তার কাঁধে এলিয়ে পড়ে রইল। ক্রমে গুহামুখ দিয়ে ক্ষীণ আলো ভেতরে উঁকি দিল। ভোরের আলো। আচমকা এক ঝটকায় জলে আছড়ে পড়ল অলিভার। হেলেনাকে বিস্ত্র শত বিপদেও কাঁধ থেকে নামাল না। যে কারণেই হোক তাকে বাঁচাবে। মরতেই যদি হয় উভয়ে একসাথে মরবে।

এদিকে দুই মামা পাথরের একটা উঁচু ডিবির ওপর দাঁড়িয়ে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে সারাটা রাত্রি কাটিয়েছে।

এক সময় অলিভার ধুকতে ধুকতে হেলেনাকে কাঁধে নিয়ে গুহামুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। দুই মামার হাতে তাদের আদরের ভাগীকে তুলে দিল। পরমুহূর্তেই তার সংজ্ঞা লোপ পেল। পাথরের ডিবির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

ক্রাম-শেল গুহা। দুই মামার অক্লান্ত প্রয়াসে হেলেনা আর অলিভার সংজ্ঞা ফিরে পেল। উভয়ের চোখের তারায়ই আতঙ্কের সুস্পষ্ট ছাপ। ফিঙ্গালস গুহার সে আতঙ্ক।

বিকালে সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটাচাঁটি করার সময় দুই মামা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, অলিভারের ঋণ কীভাবে শোধ করবে। আর এ দিকে অলিভার দ্বীপের মালভূমিতে একা একা অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করছে। আর হেলেনা? সে পরিচারিকাকে নিয়ে গুহার ভেতরে অবস্থান করছে। ক্লাস্ত অবসন্ন তার দেহ। উঠে বসার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

সূর্য পশ্চিম আকাশের গায়ে ঝুঁকু পড়েছে। তার রক্তিম আভাটুকু ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। অলিভার বিদায়ী সূর্যটার দিকে মুহূর্তের জন্য চোখ বুলিয়েই ক্রাম-শেল গুহার দিকে ছুটতে লাগল। ভাবছে সবুজরশ্মি দেখার এমন অপূর্ব সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। অলিভার ব্যক্ত-পায়ে গুহার ফিরে সবাইকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। মালভূমিটার দিকে। সূর্য একটু একটু করে সমুদ্রের জল স্পর্শ করল। সবাইই দৃষ্টি থালার মতো গোল রক্তিম সূর্যটার দিকে। এবার হয়তো সবুজরশ্মি দেখা যাবে।

হায়! একী কাণ্ড! একটা কালো মতো বস্তু ক্রমে সূর্যটাকে আড়াল করে ফেলল। স্টাফ দ্বীপের দিকে ধীরে মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। হতস্রাড়া ওই কালো বস্তুটাকে এবার আর চিনতে বাকি রইল না। সেটা আরো কাছে এগিয়ে এলে সবাই চিনতে পারল অবাক্তিত কালো বস্তুটা ক্রোয়িডা স্টিমার। বাঁচা গেল! স্টিমারটা সূর্যালোক থেকে সরে গেল। এবার নির্ঘাত সবুজরশ্মি দেখা যাবে। সবাই চোখের তারায় অতুঃপ্রাণহের ছাপ একে দিগন্তের, ভুবন্ত রক্তিম সূর্যটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কোথায় সবুজরশ্মি? লাল, হলুদ, নীল, গোলাপি প্রভৃতি অসংখ্য রঙের রশ্মি সাগরের বুকে ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যটা প্রায় তিন চতুর্থাংশ সমুদ্রের বুকে ভলিয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সবুজরশ্মি? একসময় বিদায়ী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুও অদৃশ্য হয়ে যেতে চলেছে। দুই মামা হঠাৎ সোয়্যাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'সবুজরশ্মি! সবুজরশ্মি! ওই-ওই যে সবুজরশ্মি!'

দুই মামা আর পরিচারিকা পেট্রিজ আর ভৃত্য ডেম বেস বহু আকাঙ্ক্ষিত সবুজরশ্মিকে দুচোখ ভরে দেখে জীবন ধন্য করল।

কিন্তু হেলেনা আর শিল্পী অলিভার? তারা কি তবে তাদের স্বপ্নসাধের সবুজরশ্মি দেখতে পেয়েছে? না, অবশ্যই না। তবে? সবুজরশ্মি যখন ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠেছিল তখন তারা পরস্পরের চোখের কালো রশ্মির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। না, কালো নয়—নীলরশ্মির দিকে মজ্রমুন্ধের মতো উভয়ে তাকিয়ে। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। উভয়েই চোখের ভাষায় একে অন্যকে কাছে আসার আমন্ত্রণ জনাতে ব্যস্ত।

এক্সপেরিমেন্ট অব ড. অক্স

কুইকোয়েনডন নামক ছোট্ট শহরটার খোঁজ করতে গিয়ে যদি ফ্ল্যানডার্সের পুরনো বা নতুন যে-কোনো মানচিত্র চোখের সামনে ধরা যায় তবে হতাশ হতেই হবে। তবে? তবে কি এটাই মনে করতে হবে অন্য বহু শহরের মতোই কুইকোয়েনডন শহরটা হাফিস হয়ে গেছে অবশ্যই না। ভূগোলবিদদেরা যাই বলুন না কেন গত আট নশো বছর ধরে অবস্থান করছে। আর তার তিনশো নিরানব্বইজন বাসিন্দাও রয়েছে।

বার্গিস থেকে সোয়া কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং আডিনার্দে থেকে প্রায় সাড়ে তেরো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ ফ্ল্যানডার্সের প্রায় কেন্দ্রস্থলে শহরটা অবস্থান করছে। শহরটার তিনটে সেতুর নিচ দিয়ে এসকটের শাখানদী কুলকুল রবে বয়ে গেছে। এগারোশো সাতানব্বই খ্রিষ্টাব্দে বসতিটির প্রথম প্রস্তর ফলক স্থাপিত হয়। ফলকটা স্থাপন করেছিলেন কাউন্ট বডিইন। পরবর্তীকালে তিনি কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট হয়েছিলেন। এখানে ভূমি থেকে তিন শো সাতান্ন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটা টাউনহলেরও অস্তিত্ব রয়েছে। প্রাচীরবেষ্টিত সুউচ্চ বুরুজে রয়েছে অতিকায় একটা ঘন্টা, যা বাস্তবিকই বিশ্বয় উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে। প্রতিটা ঘন্টাদ্বিন এখান থেকে শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

কোন বিদেশী কুইকোয়েনডনে এলে টাউনহল না দেখে শহর ছাড়ে না। এখানে বারডনের আঁকা উইলিয়ম আব ন্যাওর পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। আর শোলশতকের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য-নিদর্শন ম্যাগলয়ের গির্জার ছবিও এখানে রক্ষিত আছে। আর দেখা যাবে, প্রেসসেন্ট এরনাকের লোহা ঢালাইয়ের কুঁয়োর ছবি। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব চিত্রকর-কর্মকার কুয়েনটিন মেটসিসেরই প্রাপ্য। আর দেখা যাবে, চার্লস দ্য বোল্ডের মেয়ে ম্যারি অব বার্গাণ্ডির প্রাচীন সমাধি-মন্দিরের চিত্র। সম্প্রতিকালে তাঁর কফিন নেতারদামের বার্গিস গির্জায় সংরক্ষণ করা হচ্ছে। টাউন হলে এরকম আরও কত মূল্যবান শিল্পকর্ম যে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

দুগ্ধজাত দ্রব্য আর প্রচুর পরিমাণে যবের চিনি তৈরি কুইকোয়েনডনের প্রধান উৎপাদন শিল্প। বাবার পর শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করছেন তাঁর ছেলে। তারপর শাসনভার বর্তাচ্ছে তাঁর ছেলের উপর—এভাবে বংশপরম্পরায় শাসন-কার্য পরিচালনা করছে। এতকিছু সত্ত্বেও কুইকোয়েনডন শহরের নাম ফ্ল্যানডার্সের মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যাপার কি? ভূগোলবিদদেরা কি হচ্ছে করেই কুইকোয়েনডনের নামটাকে বাদ দিয়েছেন, নাকি নামটার কথা ভুলেই গেছেন? আমার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয়। তবে এও ঠিক, ছবির মতো ছোট্ট শহর কুইকোয়েনডনের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। অবিস্বাস্য হলেও সত্য। সে কথাই এ কাহিনীতে ব্যক্ত করা হচ্ছে।

এ কাহিনীতে পশ্চিম ফ্ল্যানডার্সের ফ্রেমিংদের ব্যাপারে কোনো বক্তব্যই স্থান পাবে না। তবে মানুষ হিসাবে তারা ভালো, স্বীকার করতেই হবে কারণ, তাঁরা যথার্থই জ্ঞানী, অতিথিবৎসল সামাজিক এবং ঠাণ্ডামাথার মানুষ। এমনকি মানসিক নীচতাকে তারা এড়িয়ে চলে। তবুও তাদের দেশেরই এমন একটা সার্বাধিক কৌতুহল সঞ্চারকারী নগরকে কেন যে আধুনিক মানচিত্রে স্থান দেওয়া হয় নি—এর স্বপক্ষে কোনো যুক্তি মেলে না। এর জন্য আমরা অবশ্যই মর্মান্তিক। কুইকোয়েনডনের নামের উল্লেখ কি ইতিহাসেও নেই? ঐতিহাসিকরা যদি ভুল করে থাকে, তবে আঞ্চলিক নিবন্ধে? তাও যদি ভুল করে থাকে, তবে দেশসমূহের ঐতিহ্যের তালিকায়? মানচিত্র, ইতিহাস আর ঐতিহ্যের তালিকা প্রভৃতি কোথাও ছোট্ট এ শহরটা স্থান পায়নি, এতে দেশের সওদাগরী কাম-কাজের ক্ষতি হবে? কুইকোয়েনডন শহরে কোনো শিল্প বা রমরমা ব্যবসা নেই যার জন্য চিন্তা ভাবনা করা দরকার। আর নেহাত যদি কিছু থাকে তবে নগরবাসীরা নিজেরাই তৎক্ষণাত্ তার ফয়সালা করে নেয়। দুগ্ধজাত দ্রব্য আর যবের ছাতু যা উৎপাদিত হয় তা নিজেদের প্রয়োজনেই লাগে, রপ্তানির প্রশ্নই ওঠে না। মোটে কথা, কুইকোয়েনডনের অধিবাসীরা কারোরই ধার ধারে না। তাদের চাল-চলন সহজসরল আর চাহিদাও সীমিত। এসকট ও উত্তর সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এরকম মানুষের আজও অস্তিত্ব রয়েছে।

একদিন কাউন্সেলর নিকলসি ও বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আলোচনায় লিপ্ত। কথা প্রসঙ্গে বার্গোমাস্টার বললেন, 'দেখুন মি. ট্রিকসি, হঠাৎ করে এমন কাজ করা মোটেই সঙ্গত হবে বলে আমি অন্তত মনে করি না।'

'কিন্তু গত দশ দশটা বছর ধরে আমরা ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছি। কিন্তু আজ অবধি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

'কোন জায়গাটায় আপনার দ্বিধা তা আমি ভালোই বুঝতে পারছি। আর আমি আপনার দ্বিধার ভাগীদারও হচ্ছি। তবে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরও সতর্কতা অবলম্বন করে হে হটগোল জুড়ে না দেওয়াই আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'খুবই সত্য যে, কুইকোয়েনডনের মতো এমন একটা নিরুপদ্রব শান্তিপূর্ণ নগরের নগরপালের পদটা একেবারেই অনাবশ্যক'—কাউন্সেলর নিকলসি ভ্যান ট্রিকসির কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন।

'আমাদের পূর্বসূরীরা এমন কথা ঘুণাঙ্করেও বলেন নি যে, কোনে কিছু সম্পূর্ণ নিশ্চিত। বলার সাহসেও কুলোয়নি তাদের। তারা বিশ্বাস করতেন যে, কোনো নিশ্চিত কাহিনীর দুর্ঘটনা জড়িয়ে রয়েছে।'

বাস, উভয়েই নির্বাক। কারোর মুখে টু-শব্দটিও নেই। এক সময় নিকলসি বললেন, 'মি. ট্রিকসি, বলুন তো কুড়ি বছর আগে আর পূর্বসূরী কতোয়ালের এ অফিসটা ভুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ঠিক তো? ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। এ অফিসটার জন্য তেরোশো পঁচাত্তর ফ্রাঁ আর কয়েকটা সেনটাইম এ নগরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এরকম চিন্তা করা হয়েছিল বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই এমন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণমানুষটা পৃথিবী ছেড়ে গেলেন। ফেরল মাত্র এ ব্যাপারটাই নয় শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তাঁর সূচিস্তিত সিদ্ধান্ত

থেকে বঞ্চিত হ'ল। তাঁর প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলা উচিত নয় কি মি. নিকলসি? যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই দেহ রাখেন, তিনি অবশ্যই স্বর্ণলাভের অধিকারী হন।'

কথা বলতে বলতে বার্গোমাস্টার হাত বাড়িয়ে একটা ঘণ্টার বোতামে আঙুল রাখলেন। আলতো করে চাপ দিলেন। খুবই মৃদু শব্দের সৃষ্টি হল মুহূর্তের মধ্যে হাঙ্কা শব্দ করে দুটো পা এগিয়ে আসতে শোনা গেল। নিঃশব্দে দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। রূপ-সৌন্দর্যের ডালি মেলে ঘরে প্রবেশ করলেন এক যুবতী। নাম তার সুজেল ভ্যান ট্রিকসি। বার্গোমাস্টারের একমাত্র আদরের দুলালী। সে একটা তামাকের পাইপ ও অঙ্গারের পাত্র বাবার দিকে বাড়িয়ে দিল। পর মুহূর্তেই তেমনি ধীর পায়ের নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিচক্ষণ বার্গোমাস্টার মুখে পাইপটা তুলে আপন মনে টানতে লাগলেন। আর কাউন্সেলর নিকলসি গভীর চিন্তায় ডুবে রইলেন।

দুই খ্যাতিমান যে কামরাটায় বসে কুইকোয়েনডনের আলোচনায় মেতে রয়েছেন সেটা একটা সুদৃশ্য কারুকার্যমণ্ডিত বৈঠকখানা। ঘরের এক পাশে একটা অতিকায় চুল্লিতে আগুন জ্বলছে। এমনই বিশাল সেটা যে আস্ত একটা গাছকে তাতে ফেলে গোটা একটা ঘাড়কে ঝলসে নেওয়া যেতে পারে। চুল্লিটার বিপরীত দিকের কাঁচের জানালা দিয়ে সূর্যের মৃদু কিরণ এসে ঘরের স্নেহেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। চিমনির ওপারে শোভা পাচ্ছে মেমলিং এর আঁকা একটা প্রতিকৃতি। নির্ধাৎ এটা ভ্যান ট্রিকসির কোনো পূর্বসূরীর চিত্র। চৌদ্দশতকের এক পুরুষ, সেন ফ্রেমিংরা যখন হ্যাপসবুর্গের সম্রাট রুডলফের সঙ্গে আর গাই ড্যামপেরি যুদ্ধে মেতেছিলেন এ চিত্রটা সে সময়কার।

এ বৈঠকখানাটাই বার্গোমাস্টারের অট্টালিকার সবচেয়ে সেরা কামরা। কেবল এই নয়, কুইকোয়েনডনে যে কটা সবচেয়ে আশ্রয়দায়ক কামরা রয়েছে তাদের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সেরা। কনভেন্ট বা মুক-বধিরদের বাসস্থলেও বুদ্ধি এ প্রাসাদের চেয়ে কম নৈশদ বিরাজ করে না। এ বাড়িটার শব্দের নামগন্ধও নেই। এখানকার মানুষ বুঝি হাঁটার পরিবর্তে তারা ফিসফিসিয়ে কাজ সারে। তবে এ-ও সত্য নয় যে, এ প্রাসাদে কোনো নারী থাকেন না। আছেন, অবশ্যই আছেন। বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসির সহধর্মিণী ত্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি আর তার দুলালী সুজেল ভ্যান ট্রিকসি। গৃহস্থলীর কাজকর্মের তদারকি করার জন্য লোচ জানসো আর হারমাপ বার্গোমাস্টারের বোনও রয়েছেন। হারমাপ প্রোঁড়া, চিরকুমারী। বার্গোমাস্টারের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। তার চেহারা ছবি আর আচার-আচরণের মধ্যে কোনো কিছু মাত্রাতিরিক্ত কম বা বেশি নয়। তিনি সর্বদা ভালো পোশাকে সেজে গুজ থাকেন।

এই পেলাই একটা টুপি ব্যবহার করেন। ফ্রানভার্স তখন ইংল্যান্ড থেকে আলাদা হয়েছিল এ টুপিটা তখনকার। অত বয়স এটার বয়সে কম হলেও চল্লিশ বছর এতে কোনো সন্দেহই নেই। এবার কোন্ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে? আবেগ, উচ্ছাস আর উত্তেজনার মাধ্যমেই শারীরিক ও আত্মিক অবক্ষয় ঘটে থাকে। শরীর ও পোশাকের জীর্ণতা আসে। কিন্তু বার্গোমাস্টার কর্মজীত, উৎসাহ উদ্যমহীন আর বিবাসী প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও আবেগ প্রবণ অবশ্যই নন। তাঁর অলস মনকে কোনো কিছুই উত্তেজিত করতে পারে না। তার ধ্যান—ধারনার ক্ষয় আর ব্যয় বলে কোনো কিছুই অস্তিত্ব নেই। তাই তো তিনি নিজেকে কুইকোয়েনডন ও তার শান্ত স্বভাবের নাগরিকদের শাসন করার উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করেন।

এ নগরের এ-প্রাসাদেই বার্গোমাস্টারকে জীবনে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কাটাতে হবে। তবে হ্যাঁ, চোখ বোজার আগে তাঁকে দেখে যেতে হবে, ঘাট বছর সুখে সংসার-জীবন অতিবাহিত করার পর চিরশান্তিলাভের প্রত্যাশা নিয়ে তার আগেই তাঁর সহধর্মিণী ত্রিগিটি ভ্যান ট্রিকসি অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন।

ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করেই বলছি—ভ্যান ট্রিকসি-পরিবারে তেরোশো টোত্রিশ খ্রিস্টাব্দ থেকে একটা রীতি প্রচলিত রয়েছে। প্রচলিত রীতি হচ্ছে, এমন বয়স্কা এক যুবতীকে বিপত্নীক ভ্যান ট্রিকসি বিয়ে করবেন যার বয়স তাঁর তুলনায় খুবই কম। ভ্যান ট্রিকসির মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী আবার তাঁর চেয়ে খুবই কম বয়স্ক এক যুবককে বিয়ে করবেন। ফলে সমস্যাটা যুগযুগান্তর ধরে অব্যাহত থাকবে। সুদীর্ঘ দিন ধরে দিবা চলেও আসছে অন্ধুত এ রীতিটা। এভাবেই ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি বার্গোমাস্টারের ঘরপাতি হয়ে এসেছেন, ঘর-সংসার করছেন। স্বামীর চেয়ে তাঁর বয়স দশ বছর বেশি। তাই তাঁকে স্বামীর আগেই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। অন্য এক যুবতীর জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। বার্গোমাস্টারও প্রচলিত পারিবারিক রীতি ভঙ্গ করতে উৎসাহী নন। তাই তো তিনি এতদিন এ-দিনটার জন্য অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমন একটা হৈ-হুঁপোলহীন শান্তি-নীড়ে পত্নীর অধিকার নিয়ে ঘর করতে আসার লোভ রক্ত-মাংসের কোনো যুবতী তো দূরের ব্যাপার দেবী হারপোক্রটিসও বোধ করি উৎসাহী হয়ে পড়তেন।

বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলর নিকলসির মধ্যে যখন উপরোক্ত কথোপকথন সাজ হল তখন ঠিক দুপুর তিনটে বাজে। পৌনে চারটের সময় ভ্যান ট্রিকসি পাইপটা ধরিয়ে দিয়ে গেলেন। পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে তামাক সেবন সেরে পাইপটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন।

দীর্ঘ সময় ধরে, তাঁরা অশব্দ নীরবতার মধ্যে কাটালেন স্বভাব অনুযায়ী কাউন্সেলর নিকলসি মুখ না খুলে পারলেন না। তিনি আচমকা কথাটা ছুঁড়ে দিলেন, 'আমার তো মনে হচ্ছে, আপনার কথাই যুক্তিসঙ্গত।'

'মি. নিকলসি, আরও কিছু তথ্যাদির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। তারপর না হয় নগরপালের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। তবে মাসখানেকের মধ্যে কোনো কিছু করতে হবে না বলেই আমি মনে করছি।'

'মাসখানেক বলছেন কি মশাই। এক বছরের মধ্যেও আমাদের কিছু করতে হবে না বলে আমার বিশ্বাস।'

'হুম' বার্গোমাস্টার অস্ফুট উচ্চারণ করলেন। বাস, আবার বিশালায়তন হলঘরটায় নীরবতা নেমে এল। উভয়েই গভীর মুখে আপন ভাবনায় তন্ময় হয়ে রইলেন।

লোচ আটটার কাছাকাছি কাঁচের জারে পানীয় লমকো ও দুটো গ্রাস নিয়ে এল। বার্গোমাস্টার আবার মুখ খুললেন, 'মি. নিকলসি, অর্ডিনার্স গেষ্টের টাওয়ারটা নাকি ভেঙে পড়েছে শুনলাম।'

'সেটা পথচারীর মাথায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লেও আশ্চর্য হবার নয়।'

‘শুনুন, কোনো দুর্ঘটনা ঘটার আগেই টাওয়ারটা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তবে তার চেয়ে জরুরি ব্যাপার হচ্ছে চামড়ার বাজারের আশুনের ব্যাপারটা। আর একটা কথা, আপনি শোনেন নি, সেন্ট জেকুইসের অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গা জলে ডুবে যাওয়ার জোগার হয়েছে।’

‘হ্যাঁ, আমিও শুনেছি বটে। তবে দুঃখজনক ব্যাপার যে, জলের স্রোত চামড়ার বাজারের দিকে ধাওয়া করে নি। তাহলে চামড়ার বাজারের আশুনের তাগুবে একটু ভাঁটা পড়ত।’

‘দেখুন, দুর্ঘটনা কোন বাঁধাধরা নিয়ম কানুন মেনে চলে না। তা যদি চলত তবে তো মশাই আমরা তো নিজেদের অনেক হান্ধা বোধ করতে পারতাম।’

কাউন্সেলার নিকলসি এবার বললেন, ‘শহর আলোকিত করার সে বিরাট ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখনো কোনো আলোচনাই করি নি।’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি, আপনি ড. অক্সের শহরে আলো বসানোর ব্যাপারটার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, তাই না? কিন্তু সে কাজ তো শুরু হয়ে গেছে। পুরোদমে কাজ এগিয়ে চলেছে। পাইপ পর্যন্ত বসানো হয়ে গেছে মশাই। ধরতে পারেন কাজটা শেষই হয়ে গেছে।’

‘মি. বার্গোমাস্টার, কাজটা হয়তো আমরা একটু তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছি, তাই না?’

‘তাই হয়তো হবে। এতে একটা যুক্তি দেখান যেতে পারে যে, ড. অক্স একটা এক্সপেরিমেন্টের পুরো খরচটাই একদম নিজের অর্থ দিয়ে করছেন।’

‘হ্যাঁ, এটা তো বড় রকমের একটা যুক্তিই বটে। তবেই আমরা সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারব। দ্রুত উন্নতির ফলে এগিয়ে যেতে পারব। তাঁর পরীক্ষা নিরীক্ষা যদি সফল হয় তবে ফ্লানডার্সের মধ্যে একমাত্র কুইকোয়েনডন নগরেই এমন এক বস্তুর সাহায্যে আলো জ্বলবে যার নাম অক্সিডালো কণা, গ্যাসটার নাম যেন কি?’

‘অক্সিডাইড্রিক।’

‘হ্যাঁ-হ্যাঁ! অক্সিডাইড্রিক গ্যাস।’

এমন সময় ভেতর থেকে বার্গোমাস্টারের ডাক পড়ল। নৈশভোজ সেরে নেওয়ার তাগিদ।

সব শেষে উভয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, কিছুদিন বাদে, সময় মতো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের এক সভা ডাকা হবে। আলোচ্য বিষয় থাকবে, অভিনায়ে গেষ্টের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে কিনা।

এবার দুই শাসনকর্তা পরস্পরের বিপরীত দিকের দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

কাউন্সেলার নিকলসিকে বিদায় জানিয়ে বার্গোমাস্টার পিছন ফিরতেই বাইরে থেকে কেমন বিশী একটা শব্দ ভেসে এল। সত্যি বিশীই শুধু নয়, অবিশ্বাস্যও বটে। পনেরো শো তেরোতে স্পেনিয়াডার্সা কেন্দ্রা দখল করার পর এমন বিশী শব্দ কুইকোয়েনডনে মুহূর্তের জন্যও কোনোদিন শোনা যায় নি। ভয়ঙ্কর শব্দটায় ভ্যান ট্রিকসির প্রাসাদটার দীর্ঘদিনের সুপ্ত প্রতিধ্বনি কেন অকস্মাৎ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাউন্সেলার নিকলসি দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে থমকে গেলেন।

ব্যাপারটা এমন মনে হল যে কেউ যেন বড়সড় কোনো বস্তু দিয়ে দরজায় সজোরে আঘাত আনছে। আর হরদম চিৎকার চোঁচামেচি হচ্ছে। সব মিলিয়ে যেন ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

কাউন্সেলার নিকলসি এবং বার্গোমাস্টার এমন স্তম্ভিত হলেন যে, তেরোশো পঁচাশিতে যে-কামান দাগা হয়েছিল আচমকা কেউ যদি সেটাকে দেগে দিত তবুও এমন করে বিশ্বাসবিভূত হতেন না।

দরজায় দুম্ দুম্ করে আঘাত এবং চোঁচামেচি আরও বেড়ে গেলে লোচ বিশ্বয়ের ঘোর কাটিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় কোরকমে উচ্চারণ করলেন কে?—‘কে ওখানে?’

বাইরে থেকে গম্ভীর স্বর ভেসে এল, ‘আমি! আমি নগর পাল প্যাসফ!’

প্যাসফ! নগরের কর্তাব্যক্তির দশ বছরের জন্য যার অফিস বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন, ইনি সেই প্যাসফ। তবে কি চৌদ্দশতকের মতো বার্গাডিয়ানরা কুইকোয়েনডন নগরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে? নগরপাল প্যাসফ তো এর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আতঙ্কিত হতে পারেন না।

ভ্যান ট্রিকসির ইঙ্গিতে দরজার শিটকিনি খুলে দেওয়া হল। উদ্ভার বেগে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই নগরপাল প্যাসফ দুম্ করে মেঝেতেই বসে পড়লেন। অন্য সবার পরিস্থিতি সঙ্গী হলেও যুবতী লোচ মনে সাহস সঞ্চার করে বললেন, ‘কি ব্যাপার নগর পাল? আপনাকে এমন উদ্ভ্রান্তে মতো—’

‘আমি ড. অক্সের বাড়ি থেকে আসছি। তিনি নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন। সেখানে আলোচনা হচ্ছে—গত এক শতকেও কুইকোয়েনডনে যা ঘটে নি সেরকমই ঘটতে চলেছে। ড. ডোমিনিক কাসটোস আর আইনজ্ঞ আঁদে সুট এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে তাঁরা ডুয়েল না লড়ে ছাড়ছেন না। আপনারা তো জানেনই ড. কাসটোস কেমন ভয়ঙ্কর চিত্রের লোক, যারপরনাই বিপজ্জনকও বটে। আপনারা অনুগ্রহ করে একবারটি চলুন।’

বার্গোমাস্টারের সঙ্গে কাউন্সেলার নিকলসি আর নগরপাল প্যাসফ বৈঠকখানায় হাজির হলেন।

কে এই ড. অক্স? কি-ই বা তাঁর প্রকৃত পরিচয়? বিজ্ঞান সাধকরা তাঁকে ভালোভাবেই চেনেন। ফিজিওলজিষ্ট ডক্টর অক্সের নামে ইউরোপের শিক্ষিত ও স্ত্রী-শুণী ব্যক্তির শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। ডালটন, মেনজিস, ডেভিস, ভিরভার্টস, বসট্রপ আর গডুইন—এঁদের প্রত্যেকেই ফিজিওলজিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে গেছেন। ডক্টর অক্স এঁদের প্রত্যেককে প্রতিদ্বন্দী জ্ঞান করেন। তিনি কোন দেশের মানুষ। তাঁর বয়সই বা কত, কিছুই বলা সম্ভব নয়। এসবের খোঁজ করার দরকারও তো নেই। তিনি যে অত্যাচার্য ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এটুকু বললেই যথেষ্ট। তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও কুইকোয়েনডনের অন্যান্য নাগরিকদের থেকে তাঁকে আলাদা করে রাখে। কোথাও স্থির হয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যস্ততা যেন প্রতিনিয়ত তাঁকে ঝোঁচায়, অস্থির করে তোলে।

তবে কি এটাই মনে করতে হবে, ডক্টর অক্স একজন টাকার কুমির। তা যদি না-ই হবেন তবে কেন নিজের জুল বার্ন-২১(ক)

ট্যাকের পয়সা দিয়ে পুরো কুইকোয়েনডন শহরকে আলোকিত করার উদ্ভট পরিকল্পনা মাথায় আনলেন? হয়তো এটাই ঠিক। নইলে এমন অভাবনীয় বিলাসে তাঁর মতি হল কেন?

ডক্টর অল্প মাত্র পাঁচ মাস আগে কুইকোয়েনডন শহরে এসে মাথা গুঁজেছেন। এমন সাজানো শহর ফ্রেমিং ছেড়ে নীরবতার প্রতিমূর্তি কুইকোয়েনডন নগরকেই বা তিনি কেন বেছে নিলেন? অভাবনীয় এক পদ্ধতিতে নগরটাকে আলোকিত করার পরিকল্পনা কি বা কেন তিনি গ্রহণ করলেন? নাকি এটা তাঁর একটা বাহানামাত্র? নগরকে আলোকিত করার বাহন নিয়ে নগরের প্রাণবন্ত মানুষকে নিয়ে ফিজিওলজিক্যাল এক্সপেরিমেন্টের ধাক্কা দিয়েছে? মৌলিক চরিত্রের অধিকারী বিচিত্র এ-মানুষটা কোনো মতলবকে চরিতার্থ করার ধাক্কা দিয়েছেন?

তবে হ্যাঁ, ডক্টর অল্প যে নগরে আলো জ্বালার ব্যবস্থা করছেন এটা বাস্তবিকই অত্যাব্যশ্যক। এর সুবাদে গ্যাস তৈরির কারখানাও গড়ে তোলা হয়েছে। পুরোদমে কাজ চলছে।

সত্যি ডক্টর অল্পের আসল উদ্দেশ্যটা রহস্যবৃত্তই রয়ে গেল। কারণ, সহকারী ইঞ্জিনি ছাড়া দ্বিতীয় কারোর কাছে এ-ব্যাপারে মুখই খোলেন না। যাই হোক শহরের সদর-রাস্তাগুলোতে আলো জ্বলবে এটাই বড় কথা। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িগুলো তাঁর অত্যাচার্য আলো থেকে বঞ্চিত হবে না।

একটু আগেই বার্গোমাস্টার আর কাউন্সিলার বলাবলি করছিলেন, নগরে আলো জ্বালার পরিকল্পনাটা এই প্রথম নয়। কারবোরেট অব হাইড্রোজেন পাওয়া যায় করলাকে পাতনের মাধ্যমে। কিন্তু এ-নগরে আলো জ্বালা হবে অন্তত বিশপ্পে উজ্জ্বল গ্যাসের সাহায্যে। আর তা তৈরি করা হবে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের মাধ্যমে। তার নাম অক্সিহাইড্রিক গ্যাস। গ্যাসমিটার তো রয়েছেই।

অভিজ্ঞ ফিজিওলজিষ্ট ছাড়াও ডক্টর অল্প একজন বড় কেমিস্টও বটে। সাধারণ জল থেকে গ্যাস উৎপাদনের কৌশল তাঁর নখদর্পণে। তাই তো প্রথমে জলে অ্যাসিড মিশিয়ে নেন। তারপর নিজেরই উদ্ভাবিত কয়েকটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণের মাধ্যমে প্রচুর অক্সিহাইড্রিক গ্যাস তৈরি করে ফেলেন। জলভর্তি অতিকায় পাত্রের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করলেই অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন—জলের এ দুটো মৌলিক উপাদানে ভেঙে যায়। তাদের পৃথক পৃথক পাত্রে সংরক্ষণ করা হল। নইলে দুটো গ্যাসের মিশ্রণ ঘটলে তাতে কোনোক্রমে অগ্নি সংযোগ হয়ে গেলে প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে পিয়ে কারখানা পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ব্যস, অত্যাঙ্কুল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর এ-আলোকমালায় কুইকোয়েনডন নগর যে ঝলমলিয়ে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? কিন্তু এ নিয়ে ডক্টর অল্প আর তাঁর সহকারী যে মোটেই ভাবিত নন তা ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে।

নগরপাল প্যাসফ যখন উদ্ভাস্তের মতো বার্গোমাস্টারের প্রাসাদে হাজি হন তখন ডক্টর অল্প আর তাঁর সহকারী ইঞ্জিনি পরীক্ষাগারে পরামর্শে মগ্ন।

কথাপ্রসঙ্গে ডক্টর অল্প বলেন, 'ইঞ্জিনি, কাল আমার সংবর্ধনা সভায় তো স্বচ্ছক প্রত্যক্ষ করলে ঠাণ্ডা মেজাজের কুইকোয়েনডন নগরের মানুষগুলোকে। আচ্ছা রকম দাওয়াই না দিলে মজাটা জমবে না, বুঝলে?'

'একবারেই সত্যি কথাটা বলেছেন স্যার। এক্সপেরিমেন্টের গোড়াতেই জববর ফল পাওয়া গেছে। তখন ফলটা বন্ধ করে না দিলে পরিণামে কি যে ঘটত তা অনুমানও করা যায় না।'

'দুটো দিন ধৈর্য ধর, দেখবে নগরবাসীদের কী অবস্থা করে ছাড়ি। আর মাত্র—'।

'স্যার, একটা কথা, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট সফল করতে গিয়ে শহরের মানুষের স্বাসকষ্ট, স্বাসযন্ত্র বরদাদ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কি নেই?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য কম-বেশি আছে।' আমতা আমতা করে ডক্টর অল্প বললেন 'কিন্তু এটা তো বিজ্ঞানের কল্যাণেই আমরা করছি। এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে কুকুর-ব্যাঙকে টেরার জন্য ছুরি চালাতে গেলে তারা যদি আপত্তি করে তবে কি তুমি হাত থেকে ছুরিটা ফেলে দেবে, বল?'

'একি বলছেন স্যার! কুকুর-ব্যাঙ আর মানুষকে একই দাঁড়িপাল্লায় চাপাতে চাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, স্যার। ভুলটা আমারই হয়েছে। কুইকোয়েনডন শহর ছাড়া এমন নিরীহ গোবোঁচারা জীব আর কোথায়ই বা পাওয়া যেত। ভাল কথা, তাদের নাড়ী টিপে গড় গতি কত পেলেন।'

'মিনিটে পঞ্চাশেরও কম। তবেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি। এখানকার নাগরিকরা এমনই মাটির ঢেলা বনে রয়েছে যে, কোনো ব্যাপারেই এদের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর উত্তেজনার সঞ্চার ঘটে না। এখানে একশো বছরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ তো দূরের ব্যাপার, রেগে গিয়ে কেউ, কাউকে একটা থাপ্পড় পর্যন্ত মারে নি। তাই তো একটা পরিবর্তন ঘটানোর পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করেছি। শোন, যদি আমাদের পরিকল্পনা স্বার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে পৃথিবীর সংস্কার করা।' কথাটা বলেই বিজয়ী বীরের মতো ডক্টর অল্প সরবে হেসে উঠলেন।

বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি আর কাউন্সেলর নিকলসি নিরবচ্ছিন্ন দুর্বিষহ অস্থিরতার মধ্যে রাত্রি কাটালেন। ডক্টর অল্পের বাড়িতে কী যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে এ-ভাবনাটাই তাঁদের বিন্দ্রি রাত্রি কাটানোর কারণ। তাঁদের মাথায় ভাবনার উদয় হল, এ-পরিস্থিতিতে কেমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? উভয়েই পৌরসভার প্রতিনিধি তবে কি ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করতে কি তাঁরা বাধ্য হবেন? ভবিষ্যতে যাতে আর এরকম ন্যাকারজনক ঘটনা না ঘটে তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা কি সম্ভব হবে? এরকম হাজারো প্রশ্ন নিয়ে উভয়ে সারা রাত্রি গভীর ভাবনায় ডুবে রইলেন। কিন্তু কোনো ফলই হল না।

সকাল হতে না হতেই বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি কাউন্সেলর নিকলসির বাড়ি হাজির হলেন। উভয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্থির করলেন ডক্টর অল্পের বাড়ি দেখা করতে যাবেন। উদ্দেশ্য স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেন কিনা। তবে অল্পের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখা হবে।

তাঁরা সরাসরি ডক্টর অল্পের গবেষণাগারে হাজির হলেন। দেখলেন, তিনি সেখানে গবেষণায় ডুবে রয়েছেন।

এদিকে শহরের অধিবাসীদের মধ্যে এখানে-ওখানে সুট ও কাসটোসের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে জোর আলোচনা চলেছে। তবে এও সত্য বটে, কার পক্ষ নেওয়া সম্ভব হবে কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। উকিল সুট আজ অবধি কোনো মামলায়ই হারেন নি। আসলে কোনো মামলাই তো তাঁকে পরিচালনা করতে হয় নি। অতএব হারা-জেতার প্রশ্নই তো ওঠে না। সত্য বলতে কি কুইকোয়েনডন শহরের উকিল মোক্তারদের কোনো কাজই নেই। মামলা-মোকদ্দমা করার মতো হামলা হুজুর উদ্ভব হলে তবে তো কোর্ট-কাছারির শরণাপন্ন হবে। যদি না হয় তবে উকিল-মোক্তারদের থাকা আর না থাকা দুই সমান। আর ডক্টর কাসটোস? তার অবস্থাও একই রকম। অন্য সব ডাক্তাররা যা করে থাকেন তিনিও তাই করেন। যারা তাঁর কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য যায় তাদের ছাড়া অন্য সবার রোগ নিরাময়ে তিনি সর্বদা নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।

কাউন্সেলর আর বার্গোমাস্টার কেল্লার দিকে গেলেন বটে। তবে তার ধারে কাছেও গেলেন না। বলা তো যায় না, যে কোনো সময় মাথায় ভেঙে তো পড়তে পারে। দূর থেকে সেটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। তবে শক্ত কিছু দিয়ে প্যালা দিয়ে রাখলে সেটাকে রক্ষা করা যেতে পারে।

তাঁরা এবার ডক্টর অক্সের গবেষণাগারে হাজির হলেন। ডক্টর অক্স গবেষণায় ডুবে রয়েছেন। তাঁরা পাশের ঘরে অন্তত এক ঘণ্টা মুখে কলুপ এঁটে বসে রইলেন।

এক সময় ডক্টর অক্স সেখানে এসে তাঁদের দেখতে পেয়ে সলজ্জ বিনয়ে বললেন, ‘আপনাদের এতক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে বলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গ্যাসমিটারের জন্যই আমার দেরি হয়েছে। কয়েকটা যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছিল, মেরামত করতে হয়েছে। তবুও কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। অক্সিজেনের পাইপ বসানোর কাজও সেরে ফেলেছি। এবার দয়া করে বলুন তো, এত কষ্ট স্বীকার করে অধর্মের বাড়িতে আপনাদের আগমনের কারণ কি?’

‘আপনাকে নিজের চোখে দেখার সখ ছিল, বলে এলাম।’

ডক্টর অক্স বুদ্ধিদীপ্ত চোখের মণি দুটো মেলে আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

স্বাভাবিক হলেও বার্গোমাস্টারের চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠল। কারণ নিকলসিও উত্তেজনায় পা-দুটোকে অনরবত ঘষতে লাগলেন। বার্গোমাস্টার ডক্টর অক্সকে আক্রমণ করলে তিনি তাঁকে সাহায্য অর্থাৎ তাঁর হয়ে ডক্টর অক্সের সঙ্গে লড়াই করবেন।

বার্গোমাস্টার ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে গভীর স্বরে বললেন, ‘ড. অক্স, আপনার কাজ শেষ হতে আর ক’মাস লাগবে দয়া করে বলবেন কি?’

ডক্টর অক্স স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, ‘তিন-চার মাস তো বটেই। কাজটা সম্পূর্ণ করতে এটুকু সময় অবশ্যই লাগবে। আসলে মজুর আনতে হয়েছে। কুইকোয়েনডন থেকে যেসব শ্রমিক আনিয়েছি, তারা ফরাসি শ্রমিকের তুলনায় অনেক বেশি ঢিলে, জানেন নিশ্চয়। এদের দশজনের কাজ একজন ফরাসি মজুর অন্যায়সে করে ফেলবে। আসলে তারা যে আদর্শ ফ্রেমিং।’

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বার্গোমাস্টার অনবরত ঘরময় পায়চারি করতে লাগলেন। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে গভীর স্বরে বললেন, ‘শুনুন ডক্টর অক্স, এরকম ইঙ্গিত আমি পছন্দ করি না। কুইকোয়েনডনের মজুররা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের মজুরদের মতোই পরিশ্রমী ও নিপুণ। তাই ভাল শ্রমিকের খোঁজে পৃথিবী ঘুরে মরতে হবে না। শুনুন ড. অক্স। আর বেশিদিন আলোর অভাবে শহরটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখা সম্ভব নয়।’

‘কিছু আট-নেশো বছর তো অন্ধকারে দিবি—’

‘কাটিয়ে দেওয়া গেছে, তাই না? এখন প্রগতির যুগ, অগ্রগতির সঙ্গে পা মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। আমরা পিছিয়ে পড়ি এটা আমার ইচ্ছা নয়। সাফ কথা শুনে রাখুন, এক মাসের মধ্যে শহরে আলো জ্বলছে দেখতে চাই। অন্যথায় আপনাকে মোটা অর্থ জরিমানাস্বরূপ দিতে হবে। রাস্তায় হঠাৎ কোনো হাঁসমা-হুজুত বেঁধে গেলে কী কেলেক্সারী ঘটে যাবে ভাবতে পারছেন? অল্পতেই ফ্রেমিংদের মাথায় খুন চেপে যায়, আশা করি আপনার অজানা নয়। নগরপাল প্যাসফ বললেন, আপনার বৈঠকখানায় একটা সভা বসেছিল। আর তাতে যে রাজনীতি সাংক্রান্ত আলোচনা হয়েছে এ খবরটা কি মিথ্যা, বলুন ড. অক্স?’

ড. অক্স স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, ‘না, মিথ্যা নয়, অবশ্যই মিথ্যা নয়।’

‘তবে আন্দ্রে সুট ও ডোমিনিক কাসটোসের মধ্যে জোর তর্কাতর্কি বেঁধে ছিল, খবরটা সত্য?’

‘হ্যাঁ, সত্য বটে। তবে তেমন কোনো গুরুতর ব্যাপার নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা হয় নি।’

‘সে কী ড. অক্স! একজন আর একজনকে বলেছে ‘কথাবার্তা মেপে বলুন মশাই’—এটা গুরুতর আলোচনার উক্তি নয় বলতে চাইছেন! কুইকোয়েনডন শহরের চরমতম সর্বনাশ ঘটাতে এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার নেই, হয়তো বুঝতেই পারছেন? আমাকে যদি আপনি নিজে বা অন্য কেউ এরকম উক্তি করতেন তবে—’

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে প্রধান যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

ক্রোধোন্মত্ত বার্গোমাস্টার বাজখাই গলায় বলে উঠলেন, ‘ড. অক্স, আপনার বৈঠকখানায় যে-ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমি আপনাকেই দোষী সাব্যস্ত করছি। এ শহরের শান্তিরক্ষক আমি। শান্তি বিঘ্নিত হোক এটা আমার মোটেই মনঃপুত নয়। কাল রাতে যে-ঘটনা ঘটেছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে।’

মারমুখী আগন্তুক দুজন উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

ড. অক্স এত অপমানও নিজেকে সংযতই রাখলেন।

পথ চলতে চলতে নিকলসির মেজাজ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। তিনি নরম গলায়ই উচ্চারণ করলেন, ‘আর যাই বলুন, ডক্টর অক্স কিন্তু একেবারে ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলে আমি কিন্তু আনন্দিতই হব মি. বার্গোমাস্টার।’

বার্গোমাস্টার নীরবে পথ পাড়ি দিতে লাগলেন। ফ্রাঞ্জ! কাউন্সেলর নিকলসির ছেলে ফ্রাঞ্জ। আর সুজেল তার প্রেমিকা। বাগদত্তা। উভয়ের মধ্যে খুবই মিল। কেউ, কাউকে মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে পারে না।

এদেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়তে হলে অন্তত দশ বছর ধরে চলে পরস্পরকে যাচাই করা, চেনাচেনির পাট চুকাতে। দশ বছর ধরে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিয়ে নামক ভয়ঙ্কর বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। এটাই এদেশের প্রচলিত প্রথা। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মাত্র দু-বছরের আলাপ পরিচয়ে এদেশে মাত্র একটা বিয়েই হতে দেখা গেছে। আর তারা মোটেই সুখে-শান্তিতে ঘর সংসার করতে পারে নি। ফ্রাঞ্জের বয়স বাইশ। যাকে বলে রীতিমতো সুদর্শন যুবক। আর সুজেল! রূপ সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়।

ফ্রাঞ্জ যখন নদীর পাড়ে বসে বড়শি দিয়ে মাছ ধরে সুজেল তখন তার পাশে বসে উৎসাহ-উদ্দীপনা জোগায়। আর সর্বক্ষণ উভয়ের মধ্যে প্রেমালাপ চলে। পশ্চিম দিকে সূর্য চলে না পড়া পর্যন্ত তারা কাছাকাছি পাশাপাশি মহানন্দে কাটিয়ে দেয়। সারাদিনে মাছ তো ওঠে অষ্টরজ। আসলে প্রেমালাপই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য মাছ ধরা পড়ে না, তারা ধরতে আগ্রহী নয়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার আগেই প্রেমিক-প্রেমিকাদয় পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খুশিতে ডগমগ হয়ে যে যার বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

এদিকে গ্যাস-পাইপ বসানোর কাজ দ্রুত তালে চলছে। রাস্তা ও শহরের প্রাসাদোপম বাড়িগুলোতে অগ্নিহাইড্রিক গ্যাস নিয়ে যাওয়ার কাজে এতটুকুও শৈথিল্য লক্ষিত হচ্ছে না। তবে বার্গার বসানোর কাজ এখনো শুরু হয় নি। আসলে বার্গার তৈরি করতে যে সূক্ষ্ম কারিগরি বিদ্যা দরকার এখানকার মানুষের মধ্যে তার অভাব রয়েছে। ডক্টর অক্স আর তার সহকারী ইজিনি একটা মুহূর্তও বৃথা কালক্ষয় করতে নারাজ। গ্যাসমিটারের অত্যাব্যবশ্যক ও জটিল যন্ত্রপাতি তৈরির কাজও মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে যে মৌলিক পাদার্থ চৌবাচ্চার জলকে বিশ্লিষ্ট করে চলছে সে পদার্থকে দিনরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চৌবাচ্চাটার জলে বালতি বালতি ঢালা হতে লাগল। পাইপ বসানোর কাজ শেষ করতে না পারলেও ডক্টর অক্স ইতিমধ্যেই গ্যাস উৎপাদন করতে লেগে গেছেন। শহরের নাট্যালায় অচিরেই পিলে চমকাবার মতো একটা কাজ ডক্টর অক্স করে ফেলবেন। তার আবিষ্কারের উল্লাধনেন কথা বলা হচ্ছে।

কুইকোয়েনডন শহরের নাট্যালাটা বাস্তবিকই নজর কাড়ার মতো। এটা তৈরি করতে সাতাশ বছর সময় লেগেছিল। যুগের সঙ্গে তালমিলিয়ে এর স্থাপত্য শিল্পের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এ ঘণ্টা ঘরটাও লক্ষ্য করার মতো। নাট্যালাটাতে অগ্নিহাইড্রিক গ্যাসের দরজা জ্বালতে কোনো সমস্যাই দেখা দেওয়ার কথা নয়।

বিকাল চারটায় নাট্যালায় দরজা খোলা হয় আর অনুষ্ঠানের শেষে রাত্রি দশটায় দরজা বন্ধ করা হয়। এখানে প্রতিসপ্তাহে একদিন করে গানবাজনার ব্যবস্থা করা হয়।

একের পর এক শতক ধরে এখানে উপরোক্ত অনুষ্ঠান-সূচীই চলে আসছে

সেদিনটা ছিল রবিবার। নাটক মঞ্চস্থ করার কথা। নব আবিষ্কৃত আলোর উদ্বোধনের ব্যবস্থা নেই। এরকম কোনো কথাও ছিল না। পাইপ বসানোর কাজ অবশ্য মিটে গেছে। কিন্তু বার্গারের সমস্যার জন্য নতুন আলোর ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি। তাই লম্বা লম্বা মোমবাতি সারিবদ্ধভাবে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। হালকা আলোয় রঙ্গমঞ্চের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে প্রেক্ষাগৃহ ভরে গেল। কোনো মানুষ তো দূরের কথা একটা মশা-মাছি ঢোকার মতো ফাঁক-ফোকড়ও নেই। দরজার বাইরেও উৎসাহী ভিড়, গিজগিজ করছে। রীতিমতো আকর্ষণীয় নাট্যানুষ্ঠানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সেদিন ফ্রাঞ্জ আর সুজেল নাট্যানুষ্ঠান দেখতে যাবে। ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর টাটানেমসেরও যাবার কথা। কাউন্সেলর আর বার্গোমাস্টার উভয়েই ফ্রাঞ্জ আর সুজেলের বিয়ের ব্যাপারে রাজি। অতএব তাদের মেলামেশা চলাফেরা নিয়ে কোনো পক্ষেরই কোনোই আপত্তি নেই। বিয়ে তাদের হচ্ছেই।

সন্ধ্যায় প্রথম সারির শিল্পী ফিয়োভারানটি মঞ্চে অভিনয় করতে নামবেন। তিনি হিউগনটস অপেরাতে অভিনয় করেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফিয়োভারানটি যে অসাধারণ অভিনয় করছেন এমন অভিনয় আঠারো শো ছত্রিশ খ্রিস্টাব্দে হিউগনটস প্রতিষ্ঠার পর আর কারোর কাছ থেকেই পাওয়া যায় নি। আজ সন্ধ্যায় হলভর্তি দর্শকের উপস্থিতি আবার তাঁর অনন্য অভিনয় শুরু হবে।

চারটের সময় প্রেক্ষাগৃহে তিলধারনের জায়গা রইলনা। বক্স, অর্কেস্ট্রা আর প্যারাকেটে ঘরটা একেবারে ভর্তি।

দর্শকদের ভিড়ে বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসি, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর টাটানেমাসকে দেখা গেল। ফ্রাঞ্জ ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে কাউন্সেলর নিকলসি কয়েক হাত দূরে বসে। আইনজ্ঞ স্টুট, ডক্টর কাসটোস, অ্যাকাডেমির কর্তা জেরোমরেশ, প্রধান বিচারপতি এনোর মিমট্যান্স আর নগর কোতোয়াল প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সপরিবারে প্রেক্ষাগৃহের বিভিন্ন প্রান্তে বসে।

একটু বাদেই পর্দা ওঠার কথা। কিন্তু পর্দা ওঠার আগেই এক অভাবনীয়, একেবারেই অবিদ্যাস্য একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যারা চিরদিনই নিরুদ্বেগতা বলে বিবেচিত হয় তাদের মধ্যেও অবর্ণনীয় চাক্ষুষ দেখা গেল। আকস্মিক ব্যাপারটায় উপস্থিত সবাই রীতিমতো গুত্তিত হয়ে গেল। মোমবাতির সংখ্যা বাড়ানো হয় নি অথচ সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহটা অত্যন্ত আলোকরশ্মিতে ঝলমলিয়ে উঠল। এমন একটা অভাবনীয় ব্যাপারের মুখোমুখি হলে বিস্ময়ে অভিভূত তো হবার কথাই বটে।

উদ্ভাস-উত্তেজনা ক্রমে থিতিয়ে এল। দর্শকরা দেখল, ভ্যালেনটাইন গলা ছেড়ে গান গাইছেন। কিন্তু সে গানের ছন্দ বড়ই দ্রুত।

গান থামলে মঞ্চ দেখা দিলেন রাওল। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তাঁর মধ্যেও অস্বাভাবিক দ্রুততা লক্ষিত হচ্ছে যে! যে-

অংশটুকু গাইতে কুইকোয়েনডন বাসীদের সাইট্রিশ মিনিট লাগা উচিত তা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল তাহা অবাধ হবার মতো ব্যাপারই বটে।

এবার দেখা গেল, নেভাস, নেষ্ট ব্রিশ, ক্যাথোলিক প্রধানরা ও ক্যাডানিস নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মঞ্চে হাজির হয়ে গেছে। আসলে সবকিছুর মধ্যেই যেন কেমন একটা অবর্ণনীয় ব্যস্ততা লক্ষিত হতে লাগল। নাটকের দৃশ্যাবলী উদ্ভার বেগে এগিয়ে যেতে লাগল।

দর্শকদের মধ্যেও দারুণ উত্তেজনা দেখা দিল। একসময় তারা সবাই আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। সবাইকে ঠেলে-ধাক্কিয়ে এগিয়ে এলেন বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকস। দাঁড়িয়ে পড়লেন সবার সামনে গিয়ে।

রাওলের পর্দাটাকে আস্তে আস্তে তোলার কথা। কিন্তু সে এক হেঁচকা টানে পর্দাটাকে ছিড়ে ফেঁড়ে ভ্যালেনটাইনের সমনাসামনি হয়ে পড়ল। ব্যাপারটা এমন হল যে, অর্কেষ্ট্রা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে বাদ্যলহরী। বেহালার তার ছিড়ে গেল। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

এদিকে দর্শকদের মধ্যেও যেন অস্বাভাবিক মন্ততা শুরু হয়ে গেল। সবার শিরা-উপশিরায় যেন আগুনের বন্যা বয়ে চলেছে। ঠেলা-ধাক্কা গুঁতোগুঁতি করে সবাই চায় সবার আগে বেরিয়ে যেতে। এ যেন রীতিমতো এক তুলকালাম কাণ্ড। কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব যেন হারিয়ে গেছে। বার্গোমাস্টার বলেও যেন কেউ আর নেই সবার মধ্যেই যেন এক নারকীয় উন্মাদনা ভর করেছে। গুঁতোগুঁতি, ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি করে আর একে অন্যের পা মাড়িয়ে, লাথি গুঁতো মেরে বাইরে চলে আসে।

এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা নিয়ে দর্শকরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে এল। অস্বাভাবিক? হ্যাঁ, অস্বাভাবিকই বটে। হিউনটস-এর চতুর্থ অঙ্ক শেষ হতে পুরো দু-ঘণ্টা সময় লেগে যেত। কিন্তু আজ সাড়ে চারটায় আরম্ভ হয়ে পাঁচটা বাজার বারো মিনিট আগেই শেষ হয়ে গেল। মাত্র আঠারো মিনিটের মধ্যেই এতগুলো দৃশ্যের অভিনয় শেষ হয়ে গেল। উদ্ভার চেয়েও দ্রুতগতিতে যে অভিনয় এগিয়ে গেছে। এ যে একেবারে অভাবনীয়, অবিদ্যাস্য ব্যাপার!

সকাল হল। কুইকোয়েনডন শহরের নাগরিকরা এক-এক করে বিছানা ছেড়ে উঠতে লাগল। গত সন্ধ্যায় নাট্যশালার কথা সবার মনের কোণে ভেসে উঠতে লাগল। সবাই মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে মেতে গিয়েছিল। শতাব্দীর অভ্যাস, ধর্ম, শৈথিল্য আর সহনশীলতা সবাই হারিয়ে ফেলেছিল। আর এরই ফলে সবার মধ্যে আশ্রয় করেছিল অভাবনীয় ক্রান্তি। অবসাদে গা-ভাসিয়ে দিয়ে রাখিটা যে কোনোদিক দিয়ে, কীভাবে কেটে গেছে কারোর হৃদয় ছিল না। ঘুম ভাঙলে দেখা গেল কারোর জুতো হারিয়েছে, কারোর জামা ছিড়েছে আবার কারোর বা টুপি হয়েছে বে-পাশা। ব্যাপারটা সবচেয়ে অবাধ করেছে নগরের প্রধান বার্গোমাস্টার ভ্যান ট্রিকসিকে। নাগরিকদের এরকম আকস্মিক চারিত্রিক পরিবর্তনে চোখে সর্ষেফুল তো দেখার কথাই বটে। গালে হাত দিয়ে বসে তিনি ভাবতে লাগলেন, দেশে একী অশরীর উৎপাত শুরু হল রে বাবা! শহরের সব মানুষেরই কি একই সঙ্গে মস্তিষ্ক বিবৃত ঘটে গেল নাকি! পুরো কুইকোয়েনডন শহরটাই কি পাগলা গারদে পরিণত হয়ে গেছে নাকি! এরকম ভাববার কারণও তো রয়েছে যথেষ্টই। তিনি নিজেই তো কেবল নন। প্রধান বিচারপতি, কাউন্সেলর, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও চিকিৎসক প্রভৃতি সবাই তো সেখানে ছিলেন। তবে কি মনে নিতে হবে, শহরের এতগুলো গণ্যমান্য ব্যক্তির একই সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল? মারাত্মক ব্যামোটা সবাইকে ঘায়েল করে দিয়েছিল? এ শহরের মানুষ যতই নেশা করুক না কেন এরকম অভাবনীয় ব্যাপার তো কোনোদিনই ঘটে নি। তবে? এর পিছনে এমন একটা রহস্য কাজ করছে যা বাস্তবিকই তার জ্ঞান-বুদ্ধির বহির্ভূত। এর রহস্য তাঁকে উদ্‌ঘাটন করতেই হবে। তাঁর ওপরেই যে শহরবাসীদের সার্বিক সুখ-সুবিধার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অতএব উপযুক্ত তদন্ত করে এ রহস্যভেদ তাঁকে করতেই হবে।

অতএব পৌরসভার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটার তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। দীর্ঘদিন তদন্ত চললও। কিন্তু এপর্যন্তই। কোনোই ফায়দা হল না। ব্যাপারটা রহস্যের আড়ালেই রয়ে গেল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই নাগরিকদের মন থেকে নাটক ও নাট্যশালার অভাবনীয় ব্যাপারটার কথা মুছে গেল। সাংবাদিকরাও ব্যাপারটা নিয়ে আর আলোড়ন সৃষ্টি করতে উৎসাহী হল না। কুইকোয়েনডন নাট্যশালার অনুষ্ঠানের যে মন্তব্য খবরের কাগজের পাতায় ছাপা হল তাতে দর্শকদের চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির কথা একদম হেঁটে দেওয়া হয়েছে।

একটা পরিবর্তন ইদানিং লক্ষিত হতে লাগল, নাগরিকদের সামাজিক আচার আচরণ, পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে হৃদাতার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারটাতে ঘাটতি হচ্ছে। ডাক্তার ডোমিনিক কাসটোস মন্তব্য করলেন, নাগরিকদের স্নায়বিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এবার রহস্যটা সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখা যাক। কয়েকটা পরিস্থিতিতে যে অদ্ভুত অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে এতে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশও নেই। নগরবাসীরা আগের মতোই নিরুদ্বেগ ও নিরুদ্ভাপ ভাব নিয়ে রাস্তাঘাটে বাজার-হাটে চলাফেরা করছে। পারিবারিক জীবনেও নিরুদ্ভাপ নিরুদ্ধতা আগের মতোই অব্যাহত রইল। কারোর মাথায়ও এতটুকু চাঞ্চল্য ভর করে নি। বাগবিত্তা ঝগড়াঝাটির ধার কাছ দিয়েও কেউ যায় না। আর সবার নাড়ীর গতি আগের মতোই মিনিটে পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল।

কুইকোয়েনডনের নাগরিকদের পারিবারিক আচার আচরণের কিছুমাত্র হেরফের না হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে আকাশ পাতাল পরিবর্তন যে ঘটেছে স্পষ্ট লক্ষিত হতে লাগল। এমন ভূতুড়ে ব্যাপার-স্বাপার দেখলে প্রতিভাবান শরীরতত্ত্ববিদরাও হয়তো বা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নগরপাল প্যাসফ তো একদিন মন্তব্য করেই ফেললেন, কিছুসংখ্যক লোক মিলিত হয়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে, সবাই যেন কেমন বদলে যাচ্ছে! এমন কি কাউন্সিলের সভায় মুক্তাসনে, নাট্যশালায়

আর বিভিন্ন কারণে জমায়েত ক্ষেত্রে কিছু লোক জড়ো হয়ে চোখের পলকে অদ্ভুত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হতে লাগল। মানুষের মধ্যে থেকে সংঘম নির্বাসিত হয়েছে। বাইরে থেকে বাড়ি ফেরার পর আবার আগেকার সেই স্বভাব ফিরে আসে। তাদের ধৈর্য আর সংযম আশ্রয় নেয়। এজন্যই কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা নিয়ে তেমনি উদাসীনই রয়ে গেলেন। কাউন্সিল তো ত্রিশ বছর ধরে মাইকেল প্যাসফের অফিস বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছেন। তিনি মন্তব্য করলেন, শহরের মানুষ যেখানে কোনো না কোনো কারণে দশ-বিশজন লোক জড়ো হয় সেখানেই হাঙ্গামা বাধে। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে পুরোপুরি শান্তি অব্যাহত রয়েছে। এর পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর তা ভাবলেও গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। অচিরেই মানুষে মানুষে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে। কুইকোয়েডন শহরটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মাইকেল প্যাসফ চমকে উঠলেন।

এক সন্ধ্যায় বাতুকার কোলার্ট নিজের প্রাসাদে ফ্রেমিস নাচের আসর বসালেন। ধনকুবেরই বটে কোলার্ট। ফ্রেমিস নাচের বিশেষত্বই হচ্ছে, শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা। ধীর মন্থর গতিতে চলতে থাকে নাচ আর গান। আর নাচের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে মাত্র দু-বার ঘুরতে হয়। আর নাচের প্রয়োজনে হাত দুটোকে যতখানি ছড়িয়ে দেওয়া দিতে হয় ঠিক ততখানি ছড়িয়ে সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে ধরে। এটাই কুইকোয়েডন শহরের প্রচলিত নাচের পদ্ধতি। কিন্তু কোলার্ট-এর বাড়ির নাচের আসরে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষিত হল। ধীর মন্থর নৃত্য দ্রুততর হয়ে উঠল এমন কি অর্কেস্ট্রার মধ্যেও সুর-তাল-লায় অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেল। কেন? এমন রহস্যজনক দ্রুততার কারণ কি? কেনই বা মোমবাতিগুলো নাটকের দৃশ্যের মতোই অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলে উঠল। কোলার্ট-এর বৈঠকখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি কীভাবে আবির্ভূত হল? প্রাম্য নাচই বা কীভাবে অবিশ্বাস্য দ্রুততর হয়ে উঠল? নাচের আসরে নগরপাল প্যাসফও উপস্থিত রয়েছেন। প্রলয়ঙ্কর ঝড় যে দরজায় কড়া নাড়ছে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি নাচের আসরে বসে নতুন করে উপলব্ধি করছেন। এ প্রহেলিকার উত্তর কোনো ইডিপাস এসে তাঁর কানে কানে বলে দেবে। তাঁর মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরা আর কোষে কোষে অদ্ভুত একটা মানকতা যেন ভর করেছে। তার দৈহিক শক্তি চড়চড় করে বেড়ে যেতে লাগল আর প্রতিটা স্নায়ু অস্বাভাবিক উত্তেজনা ভর করল যে, তিনি বার বার মিষ্টি দ্রব্যের হাড়ির ওপর ঝাপিয়ে পড়ে টপাটপ মিষ্টি গালে পুরে চলেছেন। এমন একটা ভাব তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেল যেন দীর্ঘদিন পেটে দানাপানি পড়ে নি।

নাচতে নেমে সবাই যেন প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেল হয়ে উঠল। সবার ফুসফুস নিঃসৃত বেিরিয়ে আসতে লাগল দীর্ঘ গুঞ্জন। রীতিমতো প্রাণখোলা, নাচের মতো নাচ সবাই নাচতে লাগল। পা শুভো যেন উন্মাদনায় ক্রমেই অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠতে লাগল। সবার মধ্যে জেগে উঠল স্নায়বিক উন্মাদনা। আর অর্কেস্ট্রা তুফানের বেগে শুরু হল আওয়াজ। এবারই প্রলয়ঙ্কর তাণ্ডবনৃত্য গ্যালপ আরম্ভ হয়ে গেল। সে কী অবস্থা! হল জুড়ে যেন তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। এবার এক এক করে নিকলসি, প্রধান বিচারপতি, বার্গোমাস্টার, ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি আর প্যাসফ পর্যন্ত কেউ-ই তাণ্ডবনৃত্য থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না। উন্মাদনা এমন পেয়ে বসেছিল যে, কে যে নৃত্যে তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী হয়েছিল একথা প্যাসফ তো পরে আর স্মরণেই আনতে পারছিল না। কিন্তু একজনের অন্তরের অন্তঃস্থলে ব্যাপারটা যেন গেঁথে গিয়েছিল। পর পর ক'রাত তিনি অর্থাৎ টাটনোমাস তো প্যাসফকে স্বপ্নের মধ্যে আলিঙ্গনই করে ফেললেন।

এদিকে ডটর অক্স আর তার সহকারী ইজিনির মধ্যে কথাবার্তা হল—পাইপ বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এবার সম্পূর্ণ নগরটার অধিবাসীদের ওপর ব্যাপক আকারে এক্সপেরিমেন্টটা সেরে ফেললেই হয়ে যায়।

এর পরের কয়েকমাস পরিস্থিতির উন্নতি তো দূরের ব্যাপার ক্রমাবনতিই ঘটতে লাগল।

হায় একী কাণ্ড! এতদিন রহস্যজনক শক্তি নীরবে প্রাণীকূলের ওপরেই প্রভাব বিস্তার করেই সন্তুষ্ট ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ জগৎও দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষিত হল পরভোজী উদ্ভিদদের মধ্যে। তারা তড়িঘড়ি ঠেলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। আবার বীজ পুঁততে না পুঁততেই গাছের চারাগুলো দ্রুতগতিতে বেড়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্চতাকে ছাড়িয়ে গেল। আসপাৰাণাস তো কয়েক ফুট লম্বাই হয়ে গেল। ওলকপি? এক একটা তরমুজের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বড় হয়ে গেল। লাউয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠল এক একটা তরমুজ। আর লাউগুলো কুমড়োকেও ছাড়িয়ে গেল। আর গির্জার বেলফ্রি ঘণ্টাটার চেয়েও অতিকায় আকার ধারণ করল এক-একটা কুমড়ো। তাদের এক-একটার ব্যাস হয়ে গেল ন'ফুটের কাছাকাছি। একটা ফুলকপি যেন ইয়া বড় একটা ঝোপে পরিণত হল। আর ব্যাঙের ছাতা যেন আসল ছাতাকেও ছাড়িয়ে যেতে লাগল। কেবলমাত্র সজির কথাই বা বলি কেন? ফলের আকস্মিক অবিশ্বাস্য আকারও কম অবাক করল না। দুজন লোক ছাড়া একটা জামরুল খেয়ে শেষ করতে পারে না। চারজনে মিলে একটা নাসপাতি ভাগাভাগি করে খেলেও শেষ করতে যেন বেশ কষ্ট হয়। আবার ফুলের মধ্যে পরিবর্তনের জোয়ার এল। অতিকায় ভায়োলেটের গন্ধে চারদিক ছেয়ে যেতে লাগল। গোলাপের ঔজ্জ্বল্য চোখ ধাঁধিয়ে যেতে লাগল। আর লিলি, ডালিয়াম, ডেইজি প্রভৃতি ফুলবাগানের পথ ছেয়ে ফেলার উপক্রম করল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল ইয়া পেল্লাই পেল্লাই রডোডেনড্রন। আর টিউলিপগুলো এমন অতিকায় হয়ে উঠল যে টিউলিপ-শ্রেমিকরা তো তাদের এক-একটার আকার দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ার জোগাড় হল। তার একটা পাপড়ির বাটিতে রবিন পাখির পুরো একটা পরিবার অনায়াসেই বাসা বেঁধে বাস করতে পারে।

কিন্তু হায়! ফুল, ফল আর সজি যে অবিশ্বাস্য অতিকায়ত্ব লাভ করল, সবই স্বল্পকালের জন্য। অচিরেই সব ঝরে পড়তে লাগল। যে বাতাস নিজের উদরে ঢুকিয়ে সবাই ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে সে বাতাসই আবার তাদের সাবাড় করে দিল। তাই তো তারা অভ্যঙ্গকালের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে, মরে বৃষ্টিতে হয়ে পড়তে লাগল।

অবিশ্বাস্য এ পরিবর্তনের জোয়ার থেকে গৃহপালিত পশুরাও বাদ গেল না। কুকুর, বিড়াল, শুয়ের, মুরগি আর ক্যানারির মধ্যে আকার ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দিল। তারা যে কেবলমাত্র অতিকায়ত্ব লাভ করল তাই নয়, অদ্ভুত ক্ষিপ্ৰতা লাভ করল, হিংস্রও হয়ে উঠল। এতদিন যারা মনিবের মতোই নির্জীব-নিরুত্তাপ ছিল আজ তারাও বদরাগী আর

হিস্প হয়ে উঠল। কুকুর-বিড়াল যে আঁচড়-কামড় দিতে পারে মানুষের জানা ছিল, আজ এ-স্বভাবই তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দিল। দু-চারটেকে মেরেও ফেলতে হল। ভেড়া যদি ঘোড়ার মতো দাঁত বের করে বিশ্রী স্বরে খেঁকিয়ে ওঠে তবে কার পিলে না চমকাবে।

শেষপর্যন্ত কুইকোয়েনডনের রাস্তাঘাটের পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে পড়ল যে, বার্গোমাস্টারকে পুলিশি আইন-কানুনের পরিবর্তন না করে উপায় থাকল না। তবে ক্ষেপা কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতির দিকে নজর রেখেই নতুন আইন সৃষ্টি করা হল।

একী কেলেক্সারী কাণ্ড শুরু হয়ে গেল রে বাবা!

জন্তু জানোয়াররাই কেবল নয়, শহরের মানুষগুলোও যে রীতিমতো খ্যাপাটে হয়ে গেল। যে শহরে ছেলে-মেয়ে মানুষ করার কোনো সমস্যাই ছিল না, আজ সেখানে তাদের সামলে সুমলে রাখাই দায় হয়ে পড়ল। বিচারপতি সিমট্যাক্স এই প্রথম অন্যের ব্যাপারে ছড়ি ধরতে বাধ্য হলেন। শুধু কি এই? বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালে ঘেরা কামরার মধ্যে আটকা পড়ে থাকতে ছাত্র-ছাত্রীরা রাজি নয়। একই ছোঁয়াচে ব্যাধির কবলে পড়লেন শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। গাদাগাদা বাড়ির কাজ দিয়ে তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের কালখাম ছুটিয়ে দিতে লাগলেন। কাজ না পেলেই তাদের বরাতে জুটত কঠিন-কঠোর শাস্তি।

সমস্যা হাজারো। যে কুইকোয়েনডনবাসীদের প্রধান খাদ্যবস্তু ছিল দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, তারা এখন মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য ছাড়া এক মুহূর্তও স্বস্তি পায় না। আর? আর উদর তো নয় যেন এক-একটা জালা মানুষের দেহে লুকিয়ে রয়েছে। ফলে শহরের খাদ্যবস্তুর চাহিদা বাড়তে বাড়তে তিনগুণ হয়ে গেল। দু-বারের পরিবর্তে সবাই ছ'বার করে খাদ্যবস্তু উদরে ঢোকাতে লাগল। এমন কি স্বয়ং কাউন্সেলরই খাওয়া-রোগের শিকার হয়ে পড়লেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্কটজনক হয়ে পড়তে লাগল। বেহেড মাতালের দল পথে-পথে গড়াগড়ি যেতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকেই শহরের গণ্যমান্য নাগরিক।

এদিকে ডাক্তার ডেমিনিক কাসটোসের ডাক্তারানায়ে স্বাযবিক বিকার আর উদরের রোগীদের ভিড় জমে উঠল।

একদিন যে কুইকোয়েনডনের পথ প্রায় জনমানবশূন্য থাকত আজ সেখানে দলে দলে কাতারে কাতারে মানুষের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। আর পথের বাঁকে, গলির মুখে ক্রোধোন্মত্ত মানুষের আক্ষালন, বাক-বিতণ্ডা—এমনকি হাতাহাতি পর্যন্ত চলতে লাগল। ঘরের কোণে মুখ বুঁজে বসে থাকা কারোর পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমনই সঙ্গিন হয়ে পড়ল যে নতুন পুলিশবাহিনী নিয়োগ করা ছাড়া গতান্তরই রইল না। টাউন হলের একটা বড় ভগ্নাংশকে কয়েদখানায় পরিণত করতেই হল। কদিনের মধ্যে সে-জায়গা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি অবস্থা হয়ে পড়ায় নগরপাল প্যাসফের চোখে-মুখে হাতাশার ছাপ ফুটে উঠল।

এ-শহরের এক শতকের মধ্যে যা কোনোদিন ঘটেনি আজ তাই ঘটে গেল। দু-মাসের মধ্যে, না দু-মাসও নয়, মাত্র সাতান্ন দিনের মধ্যেই বিয়ের পাট মিটে গেল। আগে বিয়ের কথাবার্তার পরও বছরের পর বছর কেটে যেত। মেয়ে সুজেল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বার্গোমাস্টার ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেন।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিল যখন দেখা গেল সামান্য বচসা থেকে একটা ব্যাপার ডুয়েল লড়াই পর্যন্ত গড়াল। পিস্তলের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। আর তা হল নিরীহ নম্র গোবেচারার ফ্রাঞ্জ আর ধনকুবের বাংকারের ছেলে সাইমন কোলার্টের সঙ্গে। দ্বন্দ্বযুদ্ধের কারণ? বার্গোমাস্টারের আদরের দুলালী। সুজেল ছাড়া সে কাউকে ভালবাসতে পারে না বুঝতে পেরে সাইমন দ্বন্দ্বযুদ্ধের পথ বেছে নিল। তার সবচেয়ে বড়শত্রু, একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে লড়াইয়ে হারিয়ে রূপসী যুবতীকে লুণ্ঠ করার জন্য বন্ধপরিকর হল।

শহরের জীব-জন্তু থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটা স্তরের মানুষ যদি এমন অস্থিরচিত্ত হয়ে পড়ে, ক্ষেপাটে হয়ে যায়, তবে পথঘাটের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা তো কঠিন সমস্যার ব্যাপার হয়ে পড়ারও ব্যাপারই বটে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে যে সরকারী সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা দরকার এখানে তার নিতান্তই অনুপস্থিতির অভাব।

এদিকে বার্গোমাস্টারের সংসারের শান্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তাঁর সহধর্মিনী তো সর্বদাই রেগে একেবারে কাঁই হয়ে থাকেন। চাকরবাকরেরা নাকি তাঁকে পদে পদে অপমান করছে। কথায় কথায় যা নয় তাই বলে গালমন্দও করে। ভ্যান ট্রিকসি কিন্তু কোনো কর্তব্যেই অবহেলা করছেন না। প্রয়োজনে অনেককে চাকরি থেকে তাড়িয়েও দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর সহধর্মিনী পানের থেকে চূণ খসলেই রণরঙ্গিনী হয়ে ওঠেন। ভ্যান ট্রিকসি মাঝে মাঝে ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার চোঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলেন।

আগেই বলা হয়েছে, ভ্যান ট্রিকসি বংশের বিয়ের অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করা হয়েছে। বংশের পুরুষরা একের পর এক বিপত্তীক হবেন। আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। বংশের এ-প্রচলিত প্রথা কোনোদিনই বঙ্গ হবে না।

ভ্যান ট্রিকসি পরিবারের, শহরের প্রতিটা মানুষের মনের যে অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্যে কয়েকটা আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া ঘটল তা অগ্রাহ্য করার নয়। মানুষের মধ্যে যে আকস্মিক উত্তেজনার উদ্ভব হয়েছে তা আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত। আর এ উত্তেজনাই কয়েকটা দৈহিক পরিবর্তন নিয়ে এল। যে প্রতিভার সঙ্গে আদতেও পরিচয় ছিল না, আজ তাই হঠাৎ করে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিল। রাজনীতিতেই কেবল নয়, সাহিত্যেও বিরল প্রতিভাধরের আবির্ভাব ঘটল। কুইকোয়েনডনে কয়েকটা সভা-সমিতি গজিয়ে উঠল। কুইকোয়েনডন ইম্পিরিয়াল, কুইকোয়েনডন র‍্যাডিক্যাল এবং কুইকোয়েনডন সিগন্যাল প্রভৃতি বিশটা খবরের কাগজের পাতায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা নিয়ে বহু উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ ছেপে জনগণের মধ্যে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করল।

প্রায় আট নয় শো বছর আগে কুইকোয়েনডনবাসীরা যুদ্ধ ঘোষণার একটা বিশেষ কারণকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আজ সে কারণটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কুইকোয়েনডন ও ভারগামেন শহর দুটো ক্যানভাসে পাশাপাশি অবস্থান করছে। অনেকেরই জানা রয়েছে।

এগারো শো পঁচাশিতে, কাউন্ট বড়ুইনের ক্রুসেড যাত্রার আগে একদিন ভারগামেন শহরের একটা পথের গরু

কুইকোয়েনডনের এক মাঠে চলে যায়। তবে সে খুবই সামান্য বাস মুখে তুলতেও পারে নি। গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাবার একটা অবলম্বন পাওয়া গেল বটে। গরুটা বে-ওয়ারিস বটে। কিন্তু এদিকে প্রকৃত দোষী যে কে তাও অদ্ভুতভাবে নির্ণয় করা হয়ে গেল।

ক্রোধোদ্ভূত নাটালিস ভ্যান ট্রিকসি গর্জে উঠলেন, 'এ অনায়েবের প্রতিশোধ একদিন না একদিন আমরা নেবই। এ কাহিনীতে যে ভ্যান ট্রিকসির কথা বলা হচ্ছে তিনি নাটালিস ভ্যান ট্রিকসি-পরিবারের বত্রিশতম উত্তরসূরি।

হ্যাঁ, ভিরগামেনের মানুষগুলোকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হবে। কিছুতেই রেহাই নেই হতচ্ছাড়াগুলোর।

ভিরগামেন শহরের মানুষগুলোকে আগেভাগেই সতর্ক করে দেওয়া হল। ক্রমে মানসম্মান নষ্টের গাভ্রাদাই মন থেকে মুছে যাবে। একদিন সবকিছু ভুলে উভয় শহরের মধ্যে আবারও হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

সূটের মধ্যে অপমানের জ্বালাটা চাড়া হয়ে উঠল। যে জাতির সামান্য আত্মসম্মান বাধে রয়েছে তাদের পক্ষে কুইকোয়েনডনের এরকম জঘন্যতম অপমান বরদাস্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। ফলে ভিরগামেনের কিছু নাগরিক সূযোগ পেলেই কুইকোয়েনডনবাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্বেষের মাধ্যমে তাতিয়ে তোলার চেষ্টার কৃতি করেনা। নাগরিকরা বহু শতাব্দী ধরে অপমানের জ্বালাকে নিছক রসিকতা ভেবে গিয়ে না মেখে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কাহাতক এ ধরনের আচরণ বরদাস্ত করা যায়। আর নয়। সূট এবার তাদের মধ্যে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করলেন। তিনি নাগরিকদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার করে তুললেন। নাগরিকরা সমস্তই গর্জে উঠল, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতেই হবে। যুদ্ধ চাই। যুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা অপমানের প্রতিশোধ নেব।' আইনজ্ঞ সূট জীবনে এরকম সাফল্য আর কোনোদিন লাভ করেন নি। সাফল্যের আনন্দে তাঁর মন-প্রাণ নেচে উঠল।

কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টার এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা এক সভায় মিলিত হলেন। নাগরিকদের যুদ্ধের সূত্র দাবিকে অগ্রাহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হল না। দেশের কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলে নাগরিকদের ঐকান্তিক আগ্রহ- উৎসাহে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেই হল।

কুইকোয়েনডনবাসীদের যুদ্ধের সিদ্ধান্তের কথা ভিরগামেনবাসীদের কাছে পৌছোতে দেরি হল না। তারা যুদ্ধের জন্য মোটেই প্রস্তুত নয়। দেশ জুড়ে হায্যকার পড়ে গেল। একমাত্র কেমিস্ট জোসি লিয়েট্রিক্সই মাথা ঠাণ্ডা রেখে কর্তব্যে অবিলম্ব রইলেন। যুদ্ধ করতে গেলে কামান, বন্দুক আর গোলা-গুলি চাই, নাগরিকদের উত্তেজনাকে কিছুতেই প্রশমিত করা সম্ভব হল না। তাদের ওই একই কথা—যুদ্ধ! যুদ্ধ চাই।

এদিকে বার্গোমাস্টার নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে যুদ্ধের দাবি তুললেন, 'যুদ্ধ চাই! যুদ্ধ! তুমুল যুদ্ধ মাততে হবে। চলো ভিরগামেন। হাতিয়ার তুলে নাও। চল যুদ্ধে।'

বার্গোমাস্টার নিজেই সৈন্য পরিচালনার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিলেন। তাঁর একই কথা, যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য।

এদিকে ডক্টর অক্স তার আপন কর্তব্যে অবিলম্ব। তিনি কাজ করতে করতে তাঁর সহকারী ইজিনিকে বললেন, 'কি বুঝছ হে! আর বাকি কি থাকল? সমগ্র একটা জাতির কর্মক্ষমতা, কর্তব্য সচেতনতা, প্রতিভার স্ফূরণ এবং রাজনৈতিক চেতনার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সবকিছুই সম্ভব হল। আর একমাত্র অনুদের কল্যাণে সবকিছুকে সম্ভব করে তোলা হয়েছে।'

ইজিনি বলল, 'স্যার, সবই তো করলেন দয়া করে এবার একটু ভেবে দেখুন, নাগরিকদের মধ্যে আর উত্তেজনা সৃষ্টি করা কি ঠিক হবে?'

'অবশ্যই। ইজিনি, আমি এর শেষ দেখতে চাই। অলস আর প্রায় স্থবির মানুষগুলো মধ্যে উত্তেজনার হার কি পরিমাণে—'

'কিন্তু স্যার, আমাদের এক্সপেরিমেন্ট তো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে। এবার কলটাকে বন্ধ করে দিলে—'

'অসম্ভব! এমন চিন্তাও কোরো না ইজিনি! যদি এ চেষ্টা কর আমিই তোমার গলা টিপে ধরব, সাবধান করে দিচ্ছি।' সহকারী ইজিনির পরামর্শে ডক্টর অক্স ঘোরতর আপত্তি জানালেন।

এদিকে আসন্ন যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে বার্গোমাস্টার এবং কাউন্সেলর গভীর আলোচনায় লিপ্ত হলেন। উভয়েই একমত যে, যে কোনো উপায়ে ভিরগামেনবাসীদের জন্ম না করলে কুইকোয়েনডনবাসীদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। আর দেরি করার অর্থই হচ্ছে ইজ্ঞৎ থুইয়ে অপমানের জ্বালাকে নীরবে হজম করা।

দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—দু-দিনের মধ্যে কুইকোয়েনডনের সমস্ত সৈন্যরা শত্রু-দেশের দিকে অগ্রসর হবে। তীব্র আক্রমণ শুরু করবে।

বার্গোমাস্টার এবং নিকলসি উভয়ের উদ্দেশ্য লড়াই। লড়াইয়ের মাধ্যমে, কজির জোরে ভিরগামেন শহরবাসীকে জন্ম করা। তাদের একজনও যদি বিরুদ্ধ মতো পোষণ করতেন তবে হয়তো পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিত। অবশ্যজ্ঞাবী যুদ্ধের কবল থেকে দুটো দেশ রেহাই পেয়ে যেত।

এবার তাঁরা বেলফ্রি টাওয়ারের উদ্দেশ্যে পা-বাড়ালেন।

ব্যাপার দেখে মনে হল এদিকে বিবাদমান দুই পক্ষ যেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে চলেছেন। তাঁরাও আলোচনার মাধ্যমে আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, টাউন হল। সেখানকার সুউচ্চ টাওয়ারের মাথায় উঠবেন। সেখান থেকে পুরো কুইকোয়েনডন শহরকে চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট দেখা যায়। তারা স্থির করলেন, সেখান থেকে সৈন্য পরিচালনা করবেন। ব্যাপারটা নিয়ে তাঁরা একমত হলেন হঠাৎ করে উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। দুই নগর রক্ষকের ঝগড়া যেন নেহাৎই একটা মামুলি ব্যাপার বলে পথচারীদের কাছে মনে হল। তাই সবাই ব্যাপারটা মোটেই পাভা না দিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

কথা কাটাকাটি করতে করতে কাউন্সেলর এবং বার্গোমাস্টার টাওয়ারের পাদদেশে, সিঁড়ির কাছাকাছি পৌছালেন। বাস, ভখনই ঘটে গেল আরও বিষয়কর ব্যাপার। প্রধান বিচারপতি, শহরের সর্বাধিক সম্মানীয় ব্যক্তি ভ্যান ট্রিকসির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ দেখা। তাঁকে তারা এমন এক ধাক্কা দিলেন যার ফলে ভদ্রলোক কয়েকহাত দূরে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

এবার সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের চুড়ায় ওঠার পালা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিদমান দুই শত্রু পরস্পরের চৌক পুরুষ উদ্ধার করতে লাগলেন। এদিকে দীর্ঘসময় ধরে তর্কাতর্কি আর সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে উভয়েরই দম প্রায় ফুরিয়ে এল। ক্রমে উভয়েরই গলা নেমে আসতে লাগল। দম ফুরিয়ে যাওয়াই কারণ কিনা বলা মুশকিল। তবে উভয়ের গলাই যে ক্রমে নেমে আসতে লাগল এতে কোনো ভুল নেই। ব্যস, উভয়ের উত্তেজনাই প্রশমিত হল। স্বাস্থ্যও ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। মাথাও ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল। কিন্তু কারণ কি? এর কারণ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবে যা ঘটতে দেখা গেছে তা হল—টাওয়ারের দুশো ছেয়টি ফুট উঁচুতে, চুড়ায় ওঠার পর উভয়েই সমতল একটা চাতালের ওপর ধাপস করে বসে পড়তে বাধ্য হলেন। প্রধান বিচারপতি তাদের অনুসরণ করলেন।

কাউন্সেলর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মশাই, ভাবা যায় হামবুর্গের সেন্ট মাইকেল চার্চের চৌক ফুট ওপরে আমরা উঠে এসেছি!'

'হ্যা, জানি।'

সামান্য বিশ্রাম গ্রহণের পর উভয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন।

তিন শো চার নম্বর ধাপে এসে প্রধান বিচারপতি একেবারে দম হারিয়ে ধাপস করে বসে পড়লেন। নিকলসি বেগতিক দেখে তাকে হাত ধরে কোনোরকমে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললেন। ভ্রুলোক অকৃতজ্ঞ নন। টাওয়ারের চুড়ায় পৌঁছে তিনি নিকলসিকে ধন্যবাদ জানাতে ভুললেন না। আর এও বললেন, 'ভবিষ্যতে আমার দিক থেকে এর মূল্য আপনি অবশ্যই পাবেন। বার্গোমাস্টার ও নিকলসি একটু আগে ছিলেন পরস্পরের শত্রু। কিন্তু চুড়ায় পৌঁছে দেখা গেল তাদের মধ্যে যারপরনাই মধুর সম্পর্ক বিরাজ করছে।

তারা টাওয়ারের চুড়ায় চাতালের ওপর দিয়ে হাঁটাইটি করে চারদিকের দৃশ্যাবলী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

এক সময় ভ্যান ট্রিকসি চোখের তারায় জিজ্ঞাসার ছাপ ঝাঁকে বললেন, 'বন্ধু নিকলসি, আমরা কেন এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে টাওয়ারের চুড়ায় উঠে এসেছি, বলুন তো?'

বার্গোমাস্টারও একই প্রশ্নের অবতারণা করতে গিয়ে বললেন, 'তাই তো কি কারণে যে আমরা এখানে উঠেছি?'

নিকলসি মুচকি হেসে জবাব দিলেন, 'বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাসে ফসফুসটাকে একটু চাঙা করার জন্য আমাদের এত কষ্ট স্বীকার।'

ভ্যান ট্রিকসি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'চমৎকার! চমৎকার! এবার তবে ধীরে ধীরে নামা যাক, কি বলেন?'

তারা শেষ বারের মতো শহরের ওপর চোখের মণিগুলোকে বুলিয়ে নিয়ে প্রফুল্ল চিত্তে নামতে শুরু করলেন।

কয়েকটা ধাপ নামতে না নামতেই নিকলসিকে ভ্যান ট্রিকসি বলে উঠলেন, 'মশাই, এটা হচ্ছে কি শুনি! একটু ধীরে পা চালান সাহেব। বার বার এভাবে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে কাহাতক মেজাজ ঠিক রাখা যায়।'

বিশটা ধাপ নামার পর ভ্যান ট্রিকসি বাজখাই গলায় কাউন্সেলরকে দাঁড়াতে বললেন। উদ্দেশ্য, ইতিমধ্যে তিনি আর কয়েকটা ধাপ নেমে যাবেন। কাউন্সেলর সাফ জবাব দিলেন, বার্গোমাস্টারের জন্য তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।

ব্যস, আবার নিকলসি আর বার্গোমাস্টার-এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। স্থান খুবই সঙ্গী হওয়ার জন্য দুই প্রধানের মধ্যে জোর খাঙ্কা লেগে গেল। ব্যস, উভয়েই গুলি খাওয়া বাঘের মতো ভড়পাতে শুরু করলেন।

একটু বামেই মনে হল দুটো দেহ গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে আসছে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে টাওয়ারের রক্ষী দরজা খুলে দিল। ব্যাস ঠিক তখনই দুই প্রধান জড়াজড়ি করে, হুঁতুপি করতে করতে খোলা-দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তারা একেবারে রক্ষীর সামনে হাজির হলেন। ব্যাপার দেখে রক্ষী ক্ষেপে লাল হয়ে উঠল। তার মধ্যেও হাতাহাতিই ইচ্ছা হল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিল। সে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করতে লাগল, নিকলসি আর বার্গোমাস্টার শীঘ্রই ডুয়েল লড়তে চলছেন।

পরিস্থিতি ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে পড়তে লাগল। এতেই অনুমান করা যাচ্ছে, কুইকোয়েনডনবাসীদের কতখানি উত্তেজিত করে তোলা হয়েছে, যার ফলে তাদের মেজাজ এমন খিটমিটে হয়ে গেছে আর কথায় কথায় মারমুখী হয়ে পড়ে। অত্যাচার্য এ-উত্তেজনা মারমুখী মনোভাব গড়ে ওঠার আগে এ বন্ধু দুজন কি ঘৃণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে কথায় কথায় তারা কোনো দিন একে অন্যের ওপরে কারণে অকারণে এসে ক্ষেপে লাল হয়ে উঠবেন। কিন্তু টাওয়ারের চুড়ায় উঠে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? মাত্র কয়েক ধাপ নেমেই আবার তাদের মধ্যে পরস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা আর সহনশীলতা ফিরে এল।

শহরের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে বাঞ্ছিত মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছেন জানতে পেরে ডক্টর অক্সের মনে যেন আর আনন্দ ধরে না। শহরের অন্যান্য নাগরিকদের মত তারা যে উগ্রবৃত্তির লাভ করেছেন এ যে তার দারুণ সাফল্য।

এদিকে কুইকোয়েনডন শহরের পরিস্থিতি ক্রম অবনতি হচ্ছে দেখে ডক্টর অক্সের সহকর্মী ইজিনি যারপরনাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল।

এদিকে বার্গোমাস্টার আর কাউন্সিলর মধ্যে যে ডুয়েল লড়ার কথা ছিল তা ভিন্নগামেন সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রইল। দেশের এরকম সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে অহেতুক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকার আর যাদেরই থাক অন্তত দেশের কর্ণধার দুজনদের নেই।

সবর আগে ভিন্নগামেনের সমস্যা সমাধানই একান্ত কর্তব্য। তবে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি না দিয়ে শত্রু পথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে বার্গোমাস্টার নিতান্তই বোকামি বলে মনে করেন।

এগারোশো পঁচানব্বই-এর বার্গোমাস্টার ভিন্নগামেনের কৃত অপরাধের কাথা উল্লেখ করে সে দেশের কর্তৃপক্ষের কাছে এক চৌকিদারকে পাঠালেন। কথাতা শুনে ভিন্নগামেনের কর্তৃপক্ষ তো হেসেই খুন। চৌকিদারকে ধমক দিয়ে তিনি তাড়িয়ে দিলেন। এবার এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দিয়ে এগারোশো পঁচানব্বইয়ে রক্ষিত দোষপত্রটা ভিন্নগামেনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ফল একই হল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটাকেও ঘাড় ধরে সীমানা পার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল।

এবার বার্গোমাস্টার ভিন্নগামেনের কর্তৃপক্ষের কাছে এক চরমপত্র পাঠিয়ে বিবাদের কারণটা খোলাসা করে বুঝিয়ে

দিলেন। আর সময় দেওয়া হল মাত্র 'চকিষ ঘটী'। ইতিমধ্যে ভিরগামেনের কর্তৃপক্ষ যদি অনুশোচনা প্রকাশ না করে তবে তাদের শহর অচিরেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে, এরকম কথাও তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ এবারও ব্যাপারটাকে আমল দিল না।

ভিরগামেনবাসীদের উদ্ধৃত্যে 'বার্গোমাস্টার' যারপরনাই ক্ষুব্ধ হলেন। এবার আর তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত প্রচার হতে না হতেই কুইকোয়েনডন শহরের দু-হাজার তিনশো নিরানব্বইজন অধিবাসীদের প্রত্যেকের বাড়ি থেকে একজন করে যোদ্ধা জোগাড় করা হল। তাদের মধ্যে যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বালক সব বয়সী মানুষ রয়েছে। সবার হাতে যুদ্ধাস্ত্র—বন্দুক, বর্শা, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি যা হোক একটা না একটা ধরিয়ে দেওয়া হল।

আদিকালের কালভেরিন এনে গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে তোলা হল। ষোলা শতকের মরচে পড়া একটা কামানকে বেড়ে মুছে পাঁচ শতকের ময়লা দূর করা হল। তেরোশো উনচল্লিশে কুইসনয়েদের আক্রমণের পর যে ক'বার কামান ব্যবহার করা হয়েছে তাদের মধ্যে এ ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য।

যেসব যোদ্ধার ওপর কামান দাগার দায়িত্বভার অর্পণ করা হল তাদের হাতে গোলা বারুদ দেওয়া হল না। গোলা বারুদের দরকারই বা কি। কামানটা দেখিয়েই তো অব্যাহত শত্রুদের পিলে চমকে দেওয়া যায়। অত্যাধুনিক কামান আর মেশিনগানের পরিবর্তে আউট মনোবল, অদম্য সাহস আর প্রতিশোধম্পূর্ণতার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হল সবচেয়ে বেশি।

সেনাদল তৈরি। শুরু হল কুচকাওয়াজ। সর্বাত্মক রইলেন প্রধান বিচারপতি, বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর, নগরপাল, ব্যাংকার, শিক্ষক আর শহরের মাতকবররা। আর ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসির নেতৃত্বে আরও একটা অদ্ভুত সৈন্যদল রইল সবার পিছনে।

যুদ্ধোন্মাদ সৈন্যদল যখন শহরের প্রাচীর টপকাবার জন্য তৎপরতা শুরু করেছে ঠিক তখনই একটা গাঢ়াগোড়া লোক তাদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গলা ছেড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'আরে, রোসো! রোসো! তোমারা করছ কী! তোমাদের আকস্মিক উত্তেজনার মূলে রয়েছেন আমার প্রভু ডক্টর অল্প। তাঁরই দোষে তোমাদের ব্যবহারের এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। অস্ত্র-হাতিদ্রিক গ্রাস ব্যবহার করে শহরের বুকে আলো জ্বালাতে গিয়েই তিনি এ বিপর্যয়—'

ইজিনির মুখের কথা শেষ হবার আগেই, রহস্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে দেখে ডক্টর অল্প ক্রোধোন্মত্ত সিংহের মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

তার ওপর এলোপাথারি কিল-চড়-লাথি চালাতে আরম্ভ করলেন। বেচারী ইজিনের আর কথা বলার ক্ষমতা রইল না।

ইজিন এবং ডক্টর অল্পের আকস্মিক আবির্ভাবে বার্গোমাস্টার, কাউন্সেলর প্রভৃতি উপস্থিতি গণ্যমান্য ব্যক্তির থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভ্যান ট্রিকসিয়ার হুকুমে ডক্টর অল্প আর ইজিনকে ধরে সৈনিকরা গোলা-বাড়িতে হাজির হল।

ঠিক তখনই প্রচণ্ড বিক্ষোণের সম্মুখ কুইকোয়েনডন শহরটা ধ্বংসের কোঁপে উঠল। আগুনের শিখা উদ্ভার বেগে মহাশূন্যের দিকে খেয়ে গেল। কুইকোয়েনডন—এর বীরসৈন্যরা অস্ত্রহাতেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েকজনের গায়ে সামান্য আঁচড় ছাড়া তেমন আঘাত লাগল না বটে। তবে কম-বেশি আঘাত পেয়েছে অনেকই।

আশ্চর্য ব্যাপার! আকস্মিক বিক্ষোণণটার পরই কুইকোয়েনডনবাসীর মধ্যে অভাবনীয়, অবিশ্বাস্য পরিবর্তন লক্ষিত হল। তাদের মধ্যে আবার আগেকার ঢিলেমিভাব লক্ষিত হল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, বিক্ষোণণের ফলেও নাগরিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তেজনা, হে-হট্টগোল লক্ষিত হল না। কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টার, প্রধান বিচারপতি, নগরপাল আর অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তির, যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা জুড়লেন। ডক্টর কাসটোস আর আইনজ্ঞ সুট গলা ধরাধরি করে বাড়ির দিকে এগিয়ে চললেন।

কুইকোয়েনডন শহরের বুকে আবার বিরাজ করতে লাগল আগেকার সে অনাবিল আনন্দ। উত্তেজনা, চাঞ্চল্য আর ক্রোধপরায়ণতার স্মৃতি সবার মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এদিকে রূপসী যুবতী সুজেলেক ঘিরে ফ্রাঞ্জ আর সাইমন কোলার্টের মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল নিম্নেই তার অবসান ঘটল। সাইমন কোলার্ট আর ফ্রাঞ্জের পথের কাঁটা হয়ে থাকল না।

দশ বছরের মধ্যেই, যথা সময়ে ম্যাডাম ভ্যান ট্রিকসি দেহ রাঁখা হলেন। কম বয়স্কা খুঁড়ততো বোন পেলাগি ভ্যান ট্রিকসিকে বিয়ে করে বার্গোমাস্টার আবার নতুন করে সংসার পাতলেন। বার্গোমাস্টার দেহ রাখলে সুঠামদেহী পেলাগি যে বৈধব্য গ্রহণ করবেন এরকম সম্ভাবনা অন্তর্হিত হল। চারদিকেই আগেকার সে ধীর ও ঢিলেমি ভাব বিরাজ করতে লাগল।

তবে তব কি ডক্টর অল্পই কুইকোয়েনডন শহরে রহস্যের জাল ছড়িয়ে ছিলেন? তার চমৎকার একটা এক্সপেরিমেন্টই আকস্মিক পরিবর্তনের আসল কারণ। শহরের বুকের রাস্তাঘাট, পাবলিক বিল্ডিং এবং শেষে গৃহস্থ বাড়িতে কেবলমাত্র প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রজেন ছড়িয়ে দিলেন। তবে হাইড্রোজেনের একটা কণাও ছড়ালেন না। বাতাসে স্বাদহীন গন্ধহীন এ অস্ত্রজেন প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। স্বাস্থ্যক্রিয়ার মাধ্যমে এ-গ্যাস প্রণীদেহে গ্রহণ করলে দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রতন্ত্রে দারুণ চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সম্ভাবনা ঘটে, কিন্তু সে ব্যক্তিই সাধারণ আবহাওয়ায় গিয়ে পড়লে মনের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে—পূর্বকার ধীর স্থির ও ঢিলেমি ভাব ফিরে আসে। কাউন্সেলর, বার্গোমাস্টার ও নগরপাল প্রমুখরাও কিছু সময়ের জন্য হলেও পূর্বাবস্থা ফিরে পেয়েছিলেন। আবার সিঁড়ি বিয়ে নেমে মাত্রাতিরিক্ত অস্ত্রজেন অনুসিক্ত বাতাসের এলাকায় পা দিতেই আবার সে উত্তেজনা তাঁদের মধ্যে ফিরে এল। কারণ নিজের ওজনের জন্যই অস্ত্রজেন বাতাসের নিচের স্তরে জমাতে শুরু করে। এরকম গ্যাস দীর্ঘ সময় স্বাস্থ্যক্রিয়ার ফলে মানুষের শারীরিক ক্ষমতার রূপান্তর ঘটে। উন্মাদের মতো ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয়।

প্রচণ্ড বিক্ষোণণটার মাধ্যমে কুইকোয়েনডনে অবস্থিত ডক্টর অল্পের গ্যাস কারখানাটা উড়ে গেল। তবে কি আমরা এ-সিদ্ধান্তই গ্রহণ করব, আমাদের চিন্তাশক্তি, কল্পনাশক্তি, আউট মনোবল, প্রতিভার ওপর মাত্রাতিরিক্ত অস্ত্রজেনের ক্ষমতা অসীম—ডক্টর অল্পের এক্সপেরিমেন্ট কি এই সাক্ষ্যই দেয়।

দ্য স্কুল ফর রবিনসন

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত ছোট্ট একটা দ্বীপ। ছোট্ট এ-দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে যে এমন সোরগোল উঠবে তাই কে জানত। নির্জন-নিরালা দ্বীপটার ধারকাছ দিয়ে কোনো জাহাজ ভুলেও কোনোদিন যাতায়াত করে না। আসলে এটা মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী। এমন কি উল্লেখযোগ্য কোনো পশুও এখানকার জঙ্গলে দেখা যায় না।

এমন একটা অনাবশ্যক দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব হাতে রেখে লাভই বা কী? যে-দ্বীপ আজ কোনোই উপকারে লাগল না, ভবিষ্যতেও লাগবে বলে সম্ভাবনা নেই—সেটা বেঁচে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। বিনিময়ে যে অর্থাগম হবে তা উপরি পাওনা বলেই মনে করা যেতে পারে। তাই মার্কিন সরকার নিত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় 'স্পেনসার আইল্যান্ড'কে নিলামে বেচে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন।

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে খবরের কাগজের পাতায় স্পেনসার আইল্যান্ড সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ ছাপা হল। তবে এও লেখা হল দ্বীপটা যিনি কিনবেন তিনি কোনোদিক থেকেই লাভবান হবেন না।

আমেরিকায় ধনকুবেরের সংখ্যা কম নেই। সেরকম কারোর কাছে দ্বীপটাকে বেচে দিয়ে কিছু টাকা কামিয়ে নেওয়ার ধান্ডাতেই সরকার সেটাকে বেচার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নির্দিষ্ট দিনে নিলামঘর ক্রেতা ও কৌতূহলী মানুষের ভিড়ে রীতিমতো গমগম করতে লাগল। উপস্থিত অধিকাংশ মানুষের মুখেই একই প্রশ্ন—মানুষ নেই, এমন কি আগ্নেয়গিরি পর্যন্ত যে দ্বীপে নেই, এমন একটা দ্বীপ কিনতে কোনো আহ্বানক অগ্রহী হবে। উপস্থিত শ্রোতাদের টিটকিরি মধুরা এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে সেখানে ত্রিষ্ঠায় কার সাধ্য! নিলামওয়ালা শেষপর্যন্ত হে-ইটগোল থামাতে না পেয়ে ত্রিতি-বিরক্ত হয়ে নিলাম বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন ঠিক তখনই এতগুলো মানুষের কণ্ঠ চাপিয়ে একজন বাজখাই গলায় দর হেকে বসলেন। ব্যাপারটা উপস্থিত সবার মধ্যে কৌতূহলের সঞ্চার করল। অতুঃ অগ্রহের সঙ্গে সবাই যাড় ঘুরিয়ে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, সানফ্রান্সিসকোর ধনকুবের উইলিয়াম ডব্লিউ কোন্ডরুপ নিরুদ্বেগ মুখে এককোণে বসে রয়েছেন। হ্যাঁ, এর পক্ষে এতগুলো ডলার হাতের ময়লা মনে করে জলে ফেলে দেওয়া সম্ভব বটে। কোটি কোটি ডলারের মালিক ইনি। সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ব্যবসা ফেঁদে রেখেছেন। এরকম ধনকুবের নিলাম হেকেছেন। ব্যস, উপস্থিত সবার মুখ শুকিয়ে গেল। এর ওপরে নিলাম হাঁকার সাধ বা সাধি কোনোটাই কারোর নেই।

নিলামওয়ালা নানা কথার মারপ্যাচের মাধ্যমে নিলামের দর চড়াবার জন্য মরিয়া হয়ে চেঁচা চালাতে লাগল।

না, কারোর দিক থেকেই কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আসলে কোন্ডরুপের ওপরে দর হাঁকার মতো বুকের পাটা কারোর নেই, বুঝা গেল। কোনো বুদ্ধিই যখন খাটল না তখন নিলামওয়ালা বাধ্য হয়ে হাতুড়ির আঘাত হানল—এক-দুই-তিন বলার জন্য যেহিঁনা মুখ খুলতে বাবে, অমনি ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে একজনকে বজ্রগুণ্ডির কণ্ঠে কোন্ডরুপের দরকে ছাড়িয়ে দর হাঁকাতে শোনা গেল। আবার কৌতূহলী চোখগুলো ব্যস্ত হয়ে নতুন কণ্ঠস্বরের মালিককে খুঁজতে লাগল। বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হল না। নতুন কণ্ঠস্বরের কোন্ডরুপের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম টাসকিনার। কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। মোটাসোটা গোলগাল তার চেহারা।

কোন্ডরুপ আর টাসকিনারের মধ্যে দীর্ঘদিন দা-কুমড়ো সম্পর্ক। তাঁরা অর্থ, বুদ্ধি আর ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত। কেউ, কারোর নামটা পর্যন্ত শুনতে পারে না। তবে টাসকিনার মনে মনে কোন্ডরুপকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলেও কোন্ডরুপ কিন্তু তাঁকে পাস্তাই দেন না। আর আজকের নিলাম হাঁকার পিছনেও টাসকিনার-এর উদ্দেশ্য একই—কোন্ডরুপকে একটু জখ করা।

কিন্তু কোন্ডরুপ এত সহজে মাথা নোয়াবার পাত্র নন। তিনি এক লাফে অনেকটা উঠে গেলেন। টাসকিনারও পাণ্টা দর-হাঁকলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোন্ডরুপকে বে-ইজ্জৎ করা তো দূরের কথা নিজেই ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। মুখ গোমড়া করে নিলাম-ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেন।

শেষপর্যন্ত সবচেয়ে বেশি দর হেকে কোন্ডরুপই স্পেনসার দ্বীপের মালিকানা স্বত্ব লাভ করলেন।

পরাজিত টাসকিনার রাগে গমগম করতে করতে নিলামঘর ছেড়ে যাবার সময় বলে গেলেন, 'এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব!'

গডফ্রে নামে কোন্ডরুপের এক ভাগ্নে রয়েছে। তার বয়স বছর কুড়ি। আর ফেনা নামে পনের বছরের এক পালিতা কন্যা চোখের মণির মতো সর্বদা তাঁরা কাছাকাছি পাশাপাশি থাকে। কোন্ডরুপের ইচ্ছা গডফ্রে আর ফেনার বিয়েটা যতশীঘ্র সম্ভব মিটিয়ে দেবেন। তিনি চাইলেই তো আর বিয়ে হয়ে যাবে না। আসলে গডফ্রে যে সম্পূর্ণ অন্য ধাতের যুবক। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে জোয়াল ঘাড়ে নিতে কিছুতেই সে রাজি নয়। তাঁর একান্ত ইচ্ছা পৃথিবীটাকে ঘুরে ফিরে দেখে তারপর বিয়ের শেকল পায়ে জড়াবেন।

ফেনারও ইচ্ছা অল্পবয়সী ন্যাকাবোকা স্বামীকে বিয়ে করে সারা জীবন প্তানোর কোনো মানেই হয় না। তার চেয়ে গডফ্রে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে একটু চালাক চতুর হয়ে আসে মন্দ কি?

পালিতা কন্যা ফেনা আর ভাগ্নে গডফ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা কোন্ডরুপের পক্ষে সম্ভব হল না। উপায়ান্তর না দেখে ভাগ্নে গডফ্রেকে বিদেশ ভ্রমণে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করলেন।

• কোন্ডরুপ যেসব ব্যবসায় লিপ্ত তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাহাজের ব্যবসা। বেশ কয়েকটা জাহাজের মালিক তিনি। তিনি পরের দিনই এক জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ডেকে ভাগ্নে গডফ্রের বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানালেন। জাহাজে কোনো মালপত্র যাবে না। তবে পৃথিবীর যেসব বন্দর মারফৎ তাঁর ব্যবসা চলে সব বন্দরে যেন জাহাজ অবশ্যই ভেড়ানো হয়—ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন। সবশেষে তিনি ক্যাপ্টেনের কানে কানেও ইশারা ইঙ্গিতে এমন কিছু নির্দেশ দিলেন যা শুনে ক্যাপ্টেনের চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

কোন্ডরুপ ভাগ্নেকে একা ছাড়তে ভরসা পেলেন না। তাই গডফ্রের নাচের মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন।

কোন্ডরুপের ডাক পেয়ে নাচের মাষ্টার ভদ্রলোক হাসিমাখা মুখে নাচতে নাচতে তাঁর ঘরে ঢুকল। উভয়ের মধ্যে কথোপকথনের পর নাচের মাষ্টার যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন তখন আর তার মুখে হাসি দেখা গেল না। আর নাচতে নাচতে যে লোক ঢুকছিল সে বেরিয়ে এল হেঁটে, একেবারে ধীর মন্তর গতিতে। কোন্ডরুপের হুকুম, ভাগ্নে গডফ্রের সঙ্গে তাকে সমুদ্রযাত্রায় যেতে হবে।

এক সকালে ছোট জাহাজটা বুক কাঁপানো ভাঁ দিয়ে বন্দর ছাড়ল। বিদায় মুহূর্তে গডফ্রের বৃকে নতুন নতুন দেশ দেখার উচ্ছাস। ফেনার মুখে বিষাদের ছাপ। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা লক্ষিত হল নাচের মাষ্টারের মধ্যে। হবে না-ই বা কেন? এতদিন নেচে কুঁদে জমিন কাঁপিয়েছে এবার তাকেই নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ। নাচের বদলে তাকে দোদুল্যমান ডেকে নিশ্চল-নিবর থাকার সাধনায় লিপ্ত থাকতে হবে।

দুর্বীর গতিতে সমুদ্রের বুক চিরে এগিয়ে চলল ছোট জাহাজটা। অচিরেই আমেরিকার উপকূল চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। প্রথম দুটো দিন নির্বিঘ্নেই কেটে গেল। জাহাজের গতি এবার নিউজিল্যান্ডের দিকে। ব্যস, এর বেশি কিছু গডফ্রে জানে না। জানতে চায়ও না। জাহাজের কলকজার ব্যাপার-স্বাপার কতটুকুই বা সে জানে যে বুটমুট মাথা ঘামাতে যাবে? তাই বিচিত্র, একেবারে অভ্যাসার্চ্য একটা ব্যাপারের দিকে তার চোখই পড়ল না। রোজ সূর্য মাথার ওপরে উঠলেই জাহাজের ক্যাপ্টেন গুটিগুটি জাহাজ-অফিসারের কামরায় ঢোকেন। দুজনে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করেন। ব্যস। প্রতি রাতেই জাহাজের গতিবেগ কমে যায়। দিনের আলো ফুটে উঠলেই আবার গতিবেগ বেড়ে যায়। জাহাজ ভরতর করে এগিয়ে চলে।

জাহাজের গতিবেগ কমানো-বাড়ানোর ব্যাপারটা নিয়ে গডফ্রে মাথা না ঘামালেও মাঝি-মাল্লাদের কিন্তু নজর এড়াল না। তারা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করতে লাগল। কিন্তু ভুলেও কেউ ব্যাপারটা নিয়ে মুখ খুলল না।

একদিন জাহাজে তুমুল হে-ইউগোল শুরু হয়ে গেল। এক খালসি চিল্লাতে চিল্লাতে ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে এল। জাহাজের খোলে নাকি এক চিনাম্যান লুকিয়ে আছে।

চিনাম্যানের কথা শুনেই ক্যাপ্টেন তো রেগেমেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেলেন। তাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেল দেওয়ার হুকুম দিলেন।

হুকুম তামিল করার জন্য খালসিটা ছুটে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন গডফ্রে আর নাচের মাষ্টারকে নিয়ে নেমে এলেন নিচে, খোলের ভেতরে। ক্যাপ্টেন রাগে গস গস করতে লাগলেন। কথা বলে জানা গেল, চিনাম্যানটা এক কৌতুকাভিনেতা। বিনা স্বরচে সাংহাই যাওয়ার ধাক্কা জাহাজের খোলের মধ্যে সিঁধিয়েছে। তার বক্তব্য খোলটা তো খালিই পড়ে রয়েছে। একজন মানুষ যদি এখানে আশ্রয় নেয়ই ক্ষতি কি?

এতেও ক্যাপ্টেনের ক্রোধ প্রশমিত হল না। কড়া হুকুম দিলেন, 'ওসব ধাক্কা ছাড়। পকেটে পয়সা না থাকলে সাঁতরে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাংহাই যাও।'

গডফ্রে এগিয়ে এসে পরিস্থিটিকে সামান্য দেবার চেষ্টা করল, 'জাহাজের খাবারদাবার যখন ভাগ বসাচ্ছে না, আর তার ভারে জাহাজ যখন ডুবেও যাবেনা তখন বুটমুট ঝামেলা করে কি হবে?'

তার কথায় ক্যাপ্টেন নরম হলেন।

দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল একটু বাদেই। দেখতে দেখতে ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকতে লাগল। শান্ত সমুদ্র উত্তাল-উদ্দাম রূপ ধারণ করল। ঢেউয়ের দাপটে জাহাজটা মোচার খোলার মতো ঢেউয়ের তালে তালে বার বার ওঠানামা করতে লাগল। নাচের মাষ্টারের তো কলিজা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। কি যে দরকার ছিল এমন পৃথিবী পর্যটনের পোকা মাথায় ঢোকানো। পিতৃদত্ত প্রাণটা বুঝি এবার খোয়াতেই হবে।

গডফ্রের মন কিন্তু আতঙ্কের পরিবর্তে রোমাঙ্কতে ভরপুর হয়ে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আর বিপদ-আপদ জড়িয়ে তার মধোই তো অভিযানের সার্থকতা বুঁজ পাওয়া যায়। এদিকে জাহাজটা ঝড় আর ঢেউয়ের দাপটে তলিয়ে যেতে যেতে কোনো রকমে কাৎরাতে কাৎরাতে এগিয়ে চলল।

একটা ব্যাপার গডফ্রের মাথায় এল। ব্যাপারটা কি, রোজ ভোরের আলো ফুটে উঠলেই জাহাজটার নানানটি লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রাত্রির অন্ধকার নেমে এলেই এটা ধীর স্থির হয়ে পড়ে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ গডফ্রে'র নজরে পড়ল, চিমনির ধোঁয়া বাইরে বেরিয়েই বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে। কিন্তু দিনের বেলায় তো এমন দৃশ্য কোনোদিনই নজরে পড়ে নি। এক রাতে ক্যাপ্টেন অদূরবর্তী ডেকের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। গডফ্রেকে দেখতে পান নি। তন্ময় হয়ে কি যেন ভেবে চলেছেন। হঠাৎ গডফ্রে'র ডাকে সচকিত হয়ে ঘাড় ঘুরালেন।

গডফ্রে চোখের তারায় বিশ্বাসের ছাপ এঁকে বললেন, 'ক্যাপ্টেন ব্যাপারটা তো মোটেই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না! জাহাজটা কি বিপরীত দিকে ধেয়ে চলেছে? পর পর করাত্রে লক্ষ করছি, চিমনির ধোঁয়া বিপরীত দিকে ধেয়ে যায়। আজও একই দৃশ্য, ব্যাপার কি বলুন তো?'

আমতা আমতা করে ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ মানে ঝড়ের কবল থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই আমাদের বিপরীত দিকে চালাতে হয়।'

'সে কী সাহেব, দেরি হয়ে যাবে যে! এটা করছেন কী সাহেব!'

'সে তো আমার ব্যাপার।' বেশ একটু রাগত স্বরেই ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন।

সামান্য ব্যাপারে ক্যাপ্টেন কেন যে এমন রেগে গেলেন তা গডফ্রে'র মাথায় এল না।

ক'দিন ধরেই ক্যাপ্টেন যে দিনের বেলায় জাহাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যান আর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসতে আবার সমানে পিছাতে থাকে তা এর আগে গডফ্রে'র মাথায়ই আসে নি।

একদিন ঝড়-বৃষ্টির দাপট একেবারে কমে গেল। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। ডেউয়ের তাণ্ডবও নেই। গডফ্রে সকালের দিকে ক্যাপ্টেনের কেবিন এসে দেখে, কেবিন ফাঁকা। জাহাজ নাকি পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই বোট নিয়ে বেরিয়েছেন, ধারে কাছে ডাঙ্গা আছে কিনা খোঁজ করতে গেলেন।

একটু বাদেই ক্যাপ্টেন ফিরে এসে জানালেন, আতঙ্কের কোনো কারণই নেই। পথ ভুল হয়েছে ঠিকই। তবে শুধরে নেওয়া যাবে। আর যাকে ডাঙ্গা মনে করা হয়েছিল আসলে তা নয়। ধারে কাছে ডাঙ্গার কোনো চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না।

গডফ্রে'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাপ্টেন জাহাজ-অফিসারের কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন। উভয়ে ফিস ফিসিয়ে কি যেন পরামর্শ করলেন।

হ্যাঁ, সে রাত্রেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। ক্যাপ্টেন হঠাৎ বিকট স্বরে চিৎরাতে লাগলেন, 'মি. গডফ্রে, সর্বনাশ হয়ে গেল! আপনি জলে ঝাঁপ দিন। জাহাজ ডুবে যাচ্ছে। বোধ হয় ডুবো পাহাড়ের সঙ্গে ধাক্কা লেগে জাহাজ তলিয়ে যেতে শুরু করেছে।'

গডফ্রে আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'সে কী জলে ঝাঁপ দিতে হবে! কিন্তু মাস্টারসাহেব কোথায়?'

'মাস্টার সাহেবয়ের কথা পরে ভাবা যাবে। আপনি আগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান। সবার ব্যবস্থা করে তবেই আমি নিজের কথা ভাবব। আপনি জলে ঝাঁপ দিন।' ক্যাপ্টেন কঠোর স্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ করে কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন।

কথা বলতে বলতে ক্যাপ্টেন পিছন থেকে এক ধাক্কায় গডফ্রেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেন। সে সাঁতারে সামানে এগোতেই সামানে একটা দীপ দেখে কোনোরকমে উঠে গেল।

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, সত্যি সত্যি জাহাজটা ডুবে যাচ্ছে। অন্ধকার দীপে গডফ্রে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে মুখে হাতাশার ছাপ।

ভোরের আলো ফুটে উঠতেই গডফ্রে দীপটার ওপরে চোখ দুটো বার-কয়েক বুলিয়ে নিল খাবার ও পানীয় কিছুই তার চোখে পড়ল না। নিঃসন্দেহ হল নির্জন দীপে তাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। সে ভাবতে লাগল, জাহাজের কেউ-ই হয়তো জীবিত নয়, বোটটাও তবে বে-পাড়া হয়ে গেছে।

গডফ্রে ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। ভাবল, এটা কি আদৌ কোনো দীপ, নাকি অতিকায় এক তিমির পিঠ। ক্যাপ্টেন তো বোট নিয়ে চক্রের মেরে এসে বলেছিলেন, ধারে কাছে কোনো ডাঙ্গা নেই। তবে! হয়! এ-ও কি বরাতে ছিল। আমার বাড়ি দিব্যি সুখে দিন কাটছিল। দেশ ভ্রমণের পোকা মাথায় ঢুকতেই এমন ঝকঝকিতে পড়তে হয়েছে! আজ কোথায় পড়ে রইলেন মামা, কোথায় ফেনা আর কোথায়ই বা আমার বাড়ির সুখ-শান্তি!

হাতাশায় জর্জরিত মন নিয়ে গডফ্রে হাঁটতে লাগল। কোথাও বালি, কোথাও বা টুকরো টুকরো পাথর। আশ্চর্য ব্যাপার তো মানুষ তো দূরের ব্যাপার সামান্য একটা পণ্ড-পাখি পর্যন্ত নেই। না, আছে—কয়েকটা গাঙচিল এখানে-ওখানে অলসভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে।

গডফ্রে ভাবতে লাগল, তবে কি সত্যি, সে দীপেই অবস্থান করছে। হ্যাঁ, এটা দীপই বটে।

আচমকা থমকে দাঁড়িয়ে পড় গডফ্রে। সামনের এক দৃশ্য দেখে বিশ্বাসে তার চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল। দেখল, বালির ওপর বিচিত্র দর্শন একটা সামুদ্রিক প্রাণী পড়ে রয়েছে। দুরুদুরু বুকে এগিয়ে যেতেই তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এল—'হায় ঈশ্বর! একী করলে ভূমি!'

কেন সে এমন আত্ননাদ করে উঠল। ওটা কি আসলে কোনো সামুদ্রিক জন্তু?

না, তার নাচের মাস্টার। কোমরে লাইফ বেল্ট থাকার জন্যই তাকে এমন বিদ্যুটে দেখাচ্ছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে ছোট্ট করে ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করতেই বেচারি নাচের মাস্টার নড়েচড়ে উঠল। যাক, তবে ধড়ে প্রাণ আছে দেখা যাচ্ছে।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক বটে। চোখ মেলে তাকিয়েই পকেটে হাত দিয়ে দেখতে লাগল, তার বেহালা জায়গা মতো আছে কিনা। কোথায় আছে, কোথায় থাকবে, বাবেই বা কি এসব কথা না ভেবে বেহালাটার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। প্রাণেই যদি না বাঁচে তবে বেহালা বাজাবে কে? আর শোনাবেই বা কাকে? গুরু ও শিষ্য হাঁটাইটি করতে করতে মাথার ওপরে প্রচুর পাখি উড়তে দেখল। তারা ভাবল, পাখি যখন আছে তখন অবশ্যই কোথাও না কোথাও বাসা আছে। আর বাসায় হানা দিলে ডিম যে পাওয়া যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অতএব অন্তত না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না এটুকু ভরসা তাদের হল।

বাস, পেটের জ্বালা নেভানোর ধাক্কা গড়ফ্রে আর তার গুরু চারদিকে হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। সামান্য খোঁজাখুঁজি করতেই তারা পাথরের খোদালের মধ্যে কয়েকটা ইয়া বড় বড় ডিম পেয়ে গেল। ডিম তো জোগাড় হল। কিন্তু আগুন? শুকনো কাঠে-কাঠে ঘষে, পাথরে-পাথরে ঠোকাঠুকি করেও কিছুতেই আগুন জ্বালাতে পারল না। শেষপর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে তারা ডিমগুলো ফাটিয়ে কাঁচা কুসুম দিয়েই পেটের জ্বালা নেভাল। এবার মাথা গৌজার জায়গার খোঁজে আবার হাঁটাইটি করতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে তারা গভীর বনে ঢুকে গেল। দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটাইটি করেও মাথা গৌজার মতো জায়গা তারা খুঁজে পেল না। আগত্য বালির ওপর শুয়েই তারা রাত্রি কাটিয়ে দিল।

কাকডাকা ভোরে গড়ফ্রে ঘুম ভেঙে গেল। নিজের জন্য তার যা ভাবনা তার চেয়ে ঢেড় ঢেড় ভাবনা মাষ্টাসাহেবকে নিয়ে অন্দ্রলোকের বাস্তববুদ্ধি তিলমাত্র নেই। ঘুম ভাঙলেই হয়তো চা-কিছুটের জন্য হাঁকাহাঁকি জুড়ে দেবেন।

না, নাচের মাষ্টারের ওপর ভরসা করার অর্থই হচ্ছে নিজের পায়ে কুড়ুলমারা। বাস্তব বুদ্ধি যদি কিছুমাত্র তার থাকত তবে কি এমন কথা তার মুখ দিয়ে বেরতো, 'গড়ফ্রে সবচেয়ে কাছের ডাকঘরে গিয়ে তোমার মামা কোন্‌রূপকে একটা টেলিগ্রাম করে আমাদের দূরবস্থার কথা জানিয়ে দাও। আর কিছু টুকা পাঠাতেও বলে দিও।' বাস্তব বুদ্ধি থাকলে এরকম নির্জন-নিরালা দ্বীপে কেউ ডাকঘরের কথা ভাবতে পারে?

এদিকে গড়ফ্রে বনে জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে গিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল যে, এখানকার গাছপালাগুলোতে মার্কিন ছাপ সুস্পষ্ট। আমেরিকা থেকে কেউ যেন বীজ ও গাছ এনে দ্বীপে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল।

গড়ফ্রে হাঁটতে হাঁটতে জঙ্গল পেরিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হল। পাহাড়ের গা বেয়ে কিছুটা ওপরে উঠে চারদিক দৃষ্টিপাত করতেই তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কেবল জল আর জল। জলবেষ্টিত ছোট্ট এক স্থলভূমির মধ্যে তারা বন্দী হয়ে রয়েছেন।

দ্বীপ। গড়ফ্রে নিঃসন্দেহ হল নামগোত্রহীন এক দ্বীপে তারা বন্দী হয়েছে। মানচিত্রে যার উল্লেখ নেই এরকম একটা দ্বীপে তাদের কেউ উদ্ধার করতে আসবে এরকম সম্ভাবনা তার মনে থেকে উবে গেল।

গড়ফ্রে মনের দিক থেকে একটু-আধটু ভেঙে পড়েছে ঠিকই। কিন্তু অচিরেই মনে বল সম্বল করে নিজেকে সামলে নিল। তার বাগদত্তার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করল 'ফেনা দ্বীপ'।

গড়ফ্রে পাহাড় থেকে নামার সময় যে দিকে আকাশছোঁয়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখল।

ধোঁয়া? কিসের ধোঁয়া? ধোঁয়ার অস্তিত্ব যেখানে সেখানে তো মানুষের অস্তিত্ব থাকারই কথা। তবে? তবে কি দ্বীপে তারাই কেবল বন্দীদশা ভোগ করছে না। জাহাজডুবির ফলে আরও কেউ না কেউ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। লম্বা লম্বা পায়ে পাহাড় থেকে নেমে গড়ফ্রে হাঁপাতে হাঁপাতে নাচের মাষ্টারের কাছে এল। নাচের মাষ্টার তখন আপন মনে শুকনো কাঠে কাঠ ঘষে চলেছেন আগুন জ্বালাবার দূরন্ত আশা নিয়ে। ইতিমধ্যে কয়েকটা কাঁচা ডিম দিয়ে পেটের জ্বালা একটু নিভিয়ে নিয়েছেন।

কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে গড়ফ্রে ইতিমধ্যেই নিজেকে বেশ তৈরি করে নিয়েছে। সে এখন পরিস্থিতির সঙ্গে মোটামুটি সমঝোতায় এসে গেছে। কল্পনার জগৎ ছেড়ে সে এখন কঠিন বাস্তবের মোকাবেলা করতে শিখেছে। কাঁচা ডিম খাওয়ার জন্য এক রকম বুনা আপেল আর গাঁড়িগুলি সংগ্রহ করেছে। কাঁচা ডিম খেলে ঠেলে বমি আসতে চায় বটে, তবে পেটের জ্বালা নেভানোর ব্যবস্থা তো করতে পেরেছে।

গড়ফ্রে এবার বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য জরুরি সমস্যা সমাধানের চিন্তায় মেতে গেল। সবচেয়ে আগে দুটো জিনিস অত্যাবশ্যক। একটা মাথা গৌজার জায়গা আর অন্যটা আগুন। আগুনের ব্যবস্থা না করলে কতদিন আর কাঁচা খাবারদাবার গলা দিয়ে নামাতে পারবে?

দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বেড়িয়ে গড়ফ্রে কারোও দেখা পায় নি বটে। কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বড় রকমের লাভ তার হয়েছে। মাথা গৌজার মতো একটা জায়গার খোঁজ পেয়েছে। যেখানে মোটামোটা গাছের মেলা সেখানেই জায়গাটার খোঁজ সে পেল। মাথা গৌজার জায়গা বলতে একটা গাছের গুড়ির কাছাকাছি গহ্বর। ভেতরটা অন্ধকার থাকায় সে বুঝে উঠতে পারল না গহ্বরটা কত বড়।

গাছের গহ্বরে ঠাই নেওয়ার পরও নাচের মাষ্টারের মুখ কিন্তু বন্ধ হল না। এখন তার অভিযোগ গহ্বরটায় ধোঁয়া বেরোবার চিমনি নেই কেন?

হায় ঈশ্বর! আগুন জ্বালায় উপায়ই এখনো বের করা সম্ভব হল না, নাচের মাষ্টার গম গম করছেন গহ্বরের ধোঁয়া বেরোবার চিমনির জন্য অস্থির হয়ে পড়েছেন!

আগুন—আগুন চাই-ই। দ্বীপের ধারে প্রচুর মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। গডফ্রে কায়দা কসরৎ করে কয়েকটা মাছ ধরে ফেলল। কিন্তু নিদেন পক্ষে আগুনে না ঝলসে কাঁচা মাছ খাওয়া যায় কখনও?

জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে গডফ্রে আরও কয়েকরকম বুনো ফলের খোঁজ পেয়েছে। কিন্তু আগুন না হলে সেগুলোর সদগতি করবে কি করে?

ঈশ্বর মুখ তুলে তাকালেন। ঈশ্বরের করুণাধারা আকাশ থেকে আগুনের রূপ নিয়ে দেখা দিল। একবোরেই অপ্রত্যাশিতভাবে একদিন আকাশ থেকে আগুন নেমে এল।

একদিন গাছের গহ্বরটায় গুরু-শিষ্য শুয়েছিল। গডফ্রে গহ্বরটায় নামকরণ করেছে ‘মামার বাড়ি’।

হঠাৎ আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। কড় কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। পর মুহূর্তেই বিকট গর্জন করে পাশের শুকনো গাছটায় বাজ পড়ল। গাছটায় আগুন লেগে গেছে। দেখতে দেখতে পুরো গাছটাই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বরাত ভাল যে, গডফ্রে একটা জ্বলন্ত ডাল তুলে গাছের গহ্বরটায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। নইলে বৃষ্টির জল পেয়ে আগুন নিভে যেত। কারণ একটু বাদেই ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টির জল গাছের আগুন নিভিয়ে দিল। কিন্তু গহ্বরটায় আগুন থিক্ থিক্ করে জ্বলতেই লাগল।

হ্যাঁ, বহু প্রত্যাশিত আগুন তো পাওয়া গেল। কিন্তু তাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা। যে-কোনো মুহূর্তে নিভে যাবার সম্ভাবনা। রোজ রোজতো আর বজ্রপাত হবে না।

নাচের মাস্টার শুকনো ডালপালা জোগাড় করে আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব নিল।

আগুন পাওয়ায় মাংস ঝলসে নিয়ে পরমানন্দে উদরপূর্তি চলতে লাগল। কাঁচা ডিম, কাঁচা মাছ আর কাঁচা মাংসের পর ঝলসানো মাংস পরম উপাদেয় হয়ে উঠল।

রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে গডফ্রে নিশিচিন্তে ঘুমোতে লাগল। আর নাচের মাস্টার আগুনটাকে টিকিয়ে রাখার কাজে মেতে রইল। মাঝ-রাত্রে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগায় গডফ্রে ঘুম ছুটে গেল। সে বুঝে উঠতে পারল না হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে কোথেকে? তবে কি বজ্রপাতের ফলে গহ্বরটায় কোথাও ফাটলের সৃষ্টি হয়ে গেছে?

গহ্বরটায় বাইরে এসেই গডফ্রে আঁতকে উঠল। এ যে রীতিমতো সর্বনাশ কাণ্ড ঘটতে চলেছে। বাজ কেবলমাত্র পাশের গাছটোতেই পড়ে নি। তাদের গাছটার মাথাও পড়েছিল। বজ্রপাতে গাছের গুঁড়িটা ঝলসে গেছে। তবে তো বৃষ্টিবাদের সময় গাছের কেউটা নিরাপদ আশ্রয় নয়। সে ভাবল, বজ্রপাতে নির্ধাৎ গহ্বরটায় কোথাও ফুটো হয়ে গেছে। বরাত ভাল যে, বজ্রপাত তাদের স্পর্শ করেনি!

সকাল হলে গডফ্রে গাছটা বেয়ে ওপরে উঠেল। সামান্য খোঁজাখুঁজিতেই একটা ফুটো দেখতে পেল। আর লক্ষ্য করল গাছের প্রায় মাথা পর্যন্ত ভেতরটা ফাঁপা।

গাছ থেকে নামতে গিয়ে গডফ্রে আবার চমকে উঠল। দেখল সমুদ্রতটের কাছ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর একবার পাহাড়ের ওপর থেকে সে ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেয়েছিল। আজ ধোঁয়ার উৎসটাকে খুঁজে বের করার জন্য সে বন্ধপরিকর হল।

হস্তদন্ত হয়ে সে সমুদ্রের ধারে গেল। না, ধোঁয়া বা আগুন কিছুই তার নজরে পড়ল না। এমন কি সামান্য ছাই পর্যন্ত খুঁজে পেল না।

এ কী বিচিত্র ব্যাপার রে বাবা! তবে কি এটা ভুতুরে ব্যাপার নাকি?

গডফ্রে এক সময় ছিল সাংসারিক জ্ঞান-বুদ্ধিহীন এক যুবক। কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির চাপে পড়ে, বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে সে আজ একটু একটু করে বাস্তবজ্ঞান লাভ করে পাকা সংসারী হয়ে উঠতে লাগল। তার কাছে একটা বহুমুখী ছুরি রয়েছে। তা দিয়ে কাঠ কেটে বসবার টুল আর খাবার টেবিল তৈরি করে ফেলল। অন্য একটা গাছের গহ্বরে বুনো মুরগির পালকে ভরে রাখল। ডিম আর মাংসের জোগানের যাতে ঘাটতি না হয়।

এবার সে একটা জিনিসের অভাব বোধ করতে লাগল। মাছ ধরার একটা জাল আর বঁড়শি। আর বুনো ছাগল-ভেড়াগুলোর জন্য খোঁয়াড় তৈরির কথা এখন না ভাবলেও চলবে। পুরোদমে বর্ষা শুরু হলে দেখা যাবে কি করা যায়। এখন মাঠেই চরে বেড়ায়। দ্বীপবাসীদের দুধ আর মাংসের অভাব তারা পূরণ করছে।

এমন সময় গডফ্রে অদ্ভুত একটা জিনিস আবিষ্কার করে ফেলল। একদিন সমুদ্রের ধার দিয়ে ঘোরাফেরা করতে করতে অদ্ভুত একটা জিনিস তার নজরে পড়ল। ব্যস্ত পায়ের এগিয়ে যেতেই দেখল, ইয়া পেন্নাই একটা সিন্দুক। অর্ধেকটা বালিচাপা পড়ে রয়েছে। নির্ধাৎ কোনো জাহাজডুবি ফলে ঢেউয়ের চাপে এখানে এসে পড়েছে।

সিন্দুকটা খুবই মজবুত। বাইরের দিকটা তামার পাত আর ভেতরের দিকটা দস্তার পাত দিয়ে মোড়া। জল ঢোকার কোনো সুযোগই নেই।

সভাভাব্যভাবে জীবন যাপন করতে যা কিছু দরকার সবই সিন্দুকটার মধ্যে রয়েছে। অবাক কাণ্ড তো, জাহাজের মালিক কি তবে জানতেন, জাহাজডুবি হবেই আর নির্জন দ্বীপে ঠাই নিতে হবে? আর আশ্চর্য ব্যাপার, জিনিসপত্রগুলোর গায়ে কোথাও এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে যে সেগুলো কোন্-দেশের তৈরি। থালা, ঘটি, বাটি আর কড়াই, খুন্টি থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, দূরবীণ, ঘড়ি, কাঁটাকম্পাস আর জামাকাপড় পর্যন্ত এমন কিছু নেই যা সিন্দুকের ভেতরে পাওয়া যায় নি।

গডফ্রে সিদ্ধকটা চারদিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে খুঁজে দেখল কোথাও লেখা নেই কোন্ দেশে সেটা তৈরি।

রহস্যজনক সিদ্ধকটা গডফ্রেকে বড়ই ভাবনায় ফেলল। সে নাচের মাস্টারের সহযোগিতায় সিদ্ধকের জিনিসপত্র নিয়ে গাছের গহ্বরটায় জড়ো করতে লাগল। তারপর ঠেলে ধাক্কা খালি সিদ্ধকটাকে নিয়ে এল কোটরের গাছটার কাছে।

গডফ্রে একটা আলমারির অভাব বোধ করছিল। সিদ্ধকটা পাওয়ায় সে অভাব দূর হল। বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু দরকার সবই তো সিদ্ধকটার ভেতরে পাওয়া গেছে। ব্যস, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

গডফ্রে এবার সিদ্ধক থেকে পাওয়া যন্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মধ্যে কয়েকটা তাক তৈরি করে নিল। বাসনপত্র অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যা কিছু সবই তাক গুলোতে সাজিয়ে শুছিয়ে রাখল। রাতজাগা জন্তু জানোয়ারের ভয়ে দ্বীপবাসীরা এতদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে নি। তাই অস্ত্রপাতি দিয়ে গহ্বরটার মুখে একটা পাল্লা লাগিয়ে নিল।

গডফ্রে বন্দুক-কাঁধে দ্বীপের পাড়ের দিকে চক্কর মারতে আসত। দীর্ঘদিন ধরে ঘোরাফেরার ফলে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হল, দ্বীপে কোনো হিংস্র জানোয়ার নেই। বন্দুক দিয়ে হরিণ ও নিরীহ প্রাণী হত্যা করে তারা খাদ্যের অভাব মেটাতে লাগল।

এতকিছু সত্ত্বেও গডফ্রে মনে শান্তি নেই। পাহাড়ের ওপরে উঠে আবারও ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পায়। কিন্তু কিসের ধোঁয়া? আগুনের অবশ্যই কোনো না কোনো মানুষ জ্বলেছে। তবে মানুষটা গেল কোথায়?

আর একদিন পাহাড়টার ওপরে উঠে ধোঁয়ার রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে চমকে উঠল। ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা দ্বীপের ভেতর থেকে নয়, সমুদ্র থেকে উঠে আসছে।

গডফ্রে উর্ধ্বদ্বার্সে পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রের ধারে গেল। ব্যাপারটা এবার তার কাছে পরিষ্কার হল। সে বুঝল, ধোঁয়ার উৎস একটা জাহাজ। দ্বীপ মন্তর গতিতে জাহাজটা এগিয়ে আসছে। সেটা দ্বীপটার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে গডফ্রে আনন্দে আত্মাহারা হয়ে পড়ার জোগার হল।

জাহাজটার গতিপথ ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্বীপ থেকে মাইল দুই দূর দিয়ে সেটা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছে।

একী আজব ব্যাপার! একী নিয়তির এক নিষ্ঠুর পরিহাস! এতদিন পর যদিও বা একটা জাহাজ চোখে পড়ল তাও সটকে পড়ল। সেটাকে আমেরিকান জাহাজ বলে গডফ্রে মনে হয়েছিল।

হায় অদৃষ্ট! জাহাজের লোকগুলো অন্ধ নাকি! দ্বীপের গায়ে এতবড় একটা লাল পতাকা উড়ছে তাও দেখতে পেল না কেউ! তবুও জাহাজটা এগিয়ে এসে ভিড়ল না!

গডফ্রে কদিন আগে সিদ্ধক থেকে পাওয়া একটা লাল পতাকা গাছের ডালের মাথায় টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। তার সে প্রয়াস ব্যর্থ গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে ঝটপট কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো করে আগুন ধরিয়ে সঙ্কেত জানাল। কোনো কাজই হল না। জাহাজটা তার গতি অব্যাহতই রাখল। গডফ্রে হতাশ মনে গাছের কোটরে ফিরে এল।

পরের দিন নাচের মাস্টার জঙ্গলিদের একটা নৌকা দেখতে পেয়ে ভয়ে একেবারে মিইয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে কোটরে ফিরে এসে গডফ্রেকে ব্যাপারটা জানাল।

জঙ্গলিদের কথা শুনেই গডফ্রে ভয়ে একেবারে কঁকড়ে যাবার জোগাড় হল। পর মুহূর্তেই নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বলল, 'স্যার, এ দ্বীপে জঙ্গলি আসবে কোথেকে মাথায় আসছে না তো। আমি তো দ্বীপটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, এখানে কোনো মনুষ্য বসতিই নেই। জঙ্গলি-টঙ্গলি বোধ হয় আপনার চোখ ও মনের ভুল।

'ভয়াল দর্শন একদল জঙ্গলি নৌকা করে এসে দ্বীপে নামল, আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। আর তুমি বলছ কিনা চোখের ভুল! অসম্ভব! এত বড় ভুল আমার হতেই পারে না।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্যাকাস মুখে গডফ্রে বলল, 'হায় ঈশ্বর! একী সর্বনাশ ঘটতে চলেছে! এত কষ্ট করে বেঁচে থাকার মতো ফিকির করে নিলাম আর শেষপর্যন্ত কি তবে অসত্য জঙ্গলিদের হাতে জান খোঁয়াতে হবে! কপালে এ-ও লেখা ছিল!'

গডফ্রে ভাবল, দ্বীপে মানুষ এসে ঘাঁটি গেড়েছে জানতে পেরে জঙ্গলিরা হামলা হুজ্জত করার জন্য হাজির হয়েছে। আর যদি দেখে, কোটরে জীবনযাত্রার এত সুন্দর ব্যবস্থাদি করে রাখা হয়েছে তবে জঙ্গলিদের হাতে জান খোঁয়াতে হবেই। দুটো প্রাণিকে খুন করে গাছের কোটর ও অন্য সবকিছু দখল করতে কতক্ষণ।

সময় নষ্ট না করে গডফ্রে নাচের মাস্টারকে নিয়ে ঝটপট শুকনো লতাপাতা এনে গাছের কোটর ও অন্যান্য সবকিছু ঢেকে দিল। ব্যস, এবার গাছের কোটরের ওপরের অংশে উঠে গেল।

গডফ্রে সেখানে বসে নাচের মাস্টারের সঙ্গে পরামর্শ করল। জঙ্গলিরা যদি ভবিষ্যতে আর কোনোদিন তাদের পিছু নেয় তবে গাছের কোটর থেকে গুলি চালিয়ে তাদের খতম করে ছাড়বে।

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে গডফ্রে আর তার নাচের মাস্টার রাত্রি কাটাল। বার বারই তাদের মনে হয়েছে কে বা কারা যেন গাছটার চারপাশে চক্কর মারছে।

সকাল হলে কোটরের ছিদ্রটা দিয়ে গডফ্রে উঁকি দিয়ে দেখল, জঙ্গলিরা পালিয়েছে। সমুদ্রের ধারে তাদের নৌকাটাও নেই। অতএব এখনকার মতো তারা নিরাপদ। তবে দ্বীপে মনুষ্য বসতির কথা তারা টের পেয়ে গেছে।

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে লাল কাপড়টার খোঁজ করল। দেখতে পেল না। তারা নিঃসন্দেহ হল, জঙ্গলিরা যাবার সময় সেটা নিয়ে গেছে। এখন তারা কাপড়টার মালিকের খোঁজে মাতবে। এবার সংঘাত অনিবার্য। গডফ্রে আর তার নাচের মাষ্টার খুঁজবে জঙ্গলিদের আর জঙ্গলিরা খুঁজবে তাদের। ব্যস, তার পরই শুরু হবে গুলি আর তীর বৃষ্টি। দুটো বন্দুক আর পিস্তলের সঙ্গে সামান্য তীর-ধনুক পারবে কেন?

সমস্যা তো মাষ্টারকে নিয়ে। সে নাচতে পারে বটে। কিন্তু বন্দুক-পিস্তলের কাছে কাবু। গডফ্রে এবার কোমরে-পিস্তল আর কাঁধে বন্দুক নিয়ে জঙ্গলিদের খোঁজে বেরোলো। সঙ্গে রইল নাচের মাষ্টার। তারা ব্যস্ত-পায়ে দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দিনভর খুঁজে বেড়াল। না কোথাও তাদের দেখা পেল না। হতচ্ছাড়ারা হয়তো বা একরাত্রি হামলা চালিয়েই হতাশ হয়ে চম্পট দিয়েছে।

ধোঁয়া। আবার ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা দিল। ব্যাপার কি? দু-দুবার রহস্যজনক ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আশুন জ্বলছে তারা গোপন অন্তরালেই রয়ে যাচ্ছে। গডফ্রে কিন্তু এত সহজে রণে ভঙ্গ দিল না। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করতে করতে এক সময়ে খুঁজে পেল আশুন আর ধোঁয়ার উৎসটাকে। একটা পাথরের গর্তে ঝিক ঝিক করে আশুন জ্বলছে আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। ঘাড় ঘুরাতেই গডফ্রে যেন আচমকা এক হোঁচট খেল। দেখল, কয়েকজন ভয়াল দর্শন জঙ্গলি অদূরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের নীরব চাহনির অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। গডফ্রে দেখল, একজন জঙ্গলিকে সরু একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। গডফ্রে লাল কাপড়ের টুকরোটা সর্দারের কাঁধে ঝুলছে। আর নৌকোটাকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের ডালের সঙ্গে।

গডফ্রে নিজেকে 'রবিনসন ক্রুসোর' সঙ্গে তুলনা করতে লাগল। সে কাহিনীতে ফ্রাইডে নামক এক জঙ্গলিকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু পরাক্রমশালী ক্রুসো তাকে রক্ষা করে। পরবর্তীকালে জঙ্গলিটা তার পরম অনুগত ভক্তে পরিণত হয়ে যায়।

গডফ্রে মনে মনে স্থির করে ফেলল, এ মুহূর্তে তার করণীয় কি? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত জঙ্গলিটাকে রক্ষা করাই তার একমাত্র কর্তব্য।

জঙ্গলি-সর্দারের হুকুমে হতভাগা জঙ্গলিটাকে বাঁধন খুরে টেনে হিঁচড়ে আশুনের কাছে নিয়ে আসা হল। সে মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু হাত-পা বাঁধা। তা ছাড়া এতগুলো নরখাদকের সঙ্গে সে পেরে উঠবে কেন?

গডফ্রে পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিল। জঙ্গলি-সর্দার তাকে দেখল বটে। কিন্তু গ্রাহ্যই করল না।

একী আশ্চর্য ব্যাপার! সে চেয়েছিল তার মতো এক জন অপরিচিত, সভ্য সমাজের মানুষকে দেখে জঙ্গলি-সর্দার বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা মারমুখী হয়ে তেড়ে আসুক। সে সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক আর পিস্তলের কেরামতি শুরু করে দেবে।

জঙ্গলি-সর্দারের দিক থেকে হৃষিকার কোনো লক্ষণ না দেখে গডফ্রেই এক তরফা লড়াই শুরু করে দিল। রাইফেল থেকে ঝট করে একটা গুলি ছুঁড়ে দিল সর্দারকে লক্ষ্য করে। ব্যস, চোখের পলকে গাট্টাগাট্টি জঙ্গলি সর্দার আচমকা একটা বিকট আত্নবাদ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। ওষুধে কাজ হয়েছে। সর্দারের মর্মান্তিক অবস্থা দেখামাত্র অন্যান্য জঙ্গলিরা পড়ি কি মরি করে যে, যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল। নৌকায় চেপে চটপট দ্বীপ ছেড়ে পালিয়ে গেল।

পর মুহূর্তেই রবিনসন ক্রুসোর অন্য আর একটা দৃশ্য ঘটে গেল। যে-জঙ্গলিটাকে আশুনে পুরিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সে ছুটে এসে গডফ্রে'র পায়ে হামড়ি খেয়ে পড়ল। এ যেন বইয়ের কাহিনীটা গডফ্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মধ্যে দেখা নয়, না স্বপ্নে নয়, যেন বাস্তবে দেখছে।

গডফ্রে আর নাচের মাষ্টার জঙ্গলিটাকে নিয়ে তাদের গহ্বরে ফিরে এল। তারা সহজেই তাকে পোষ মানিয়ে ফেলল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিল। তবে কি ইংরেজিতে দরকারী কথাবার্তা চালানোর মতো বিদ্যা রপ্ত করাতে গিয়ে গডফ্রে'র কালখাম ছুটে গেল। শেষপর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। একদিন শিকারে বেরিয়ে জঙ্গলিটা আচমকা ইয়া পেল্লাই একটা কচ্ছপকে উল্টে দিয়ে দ্বীপবাসীদের তাকে লাগিয়ে দিল। সেটার মাংস অসময়ের, শীতের দিনের জন্য নুন মাখিয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হল।

জঙ্গলিটাকে নিয়ে আর একদিন তারা শিকারে বেরিয়ে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি হল। হরিণের পিছু নিলে জঙ্গলিটা দেখল, দশাসই একটা ভালুক গডফ্রে'র ঘাড়ে লাফাবার জন্যা ওৎ-পেতে বসে। জঙ্গলিটা, দৌড়ে গিয়ে গডফ্রে'কে জাপ্টে ধরে না ফেললে জানোয়ারটা নখের আঘাতে তার ভুড়ি ফাঁসিয়ে দিত।

গডফ্রে বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ল। তার হাতের নিশানা ভুল হবার নয়। গুলিটা ভালুকটার গায়ে নির্ঘাৎ লেগেছে। কিন্তু তার শেষ পরিণতি দেখা তাদের সম্ভব হল না। দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটু বাদে তারা ফিরে এসে একবারে তাজ্জব বনে গেল। সে জায়গাটার এক ফোটা রক্ত দেখতে পেল না। একটা জখমি জানোয়ার মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাবরিয়েছে, অথচ গাছপালা ডাঙা বা মাটিতে কোনোরকমের আঁচড়ট্যাঁচড় পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা বাস্তবিকই রহস্যজন্য। গডফ্রে'র পক্ষে রহস্যটার কিনারা করা সম্ভব হল না। ভালুকের দেহটা হাফিস হয়ে যাওয়ায় রহস্যটা আরও গভীরতর হয়ে উঠল।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হল। তারা গাছের গহ্বরের দরজার পাল্লাকে আরও মজবুত করে নিল।

নভেম্বর মাস এল। দ্বীপে বর্ষা নামল। বর্ষার সমস্যার কথা গডফ্রে আগেই ভেবে রেখেছিল। তাই মৃশলধারে বৃষ্টি নামলেও দ্বীপবাসীদের তেমন সমস্যা পড়তে হল না। বিপদ এবার নতুনতর রূপ নিয়ে দেখা দিল। ভালুকের পর বনে

বাঘের হামলা শুরু হল। গডফ্রে গুলিবিদ্ধ করল বিশালাকায় বাঘটাকে। বিকট আওয়াজ করে হিংস্র জানোয়ারটা মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে বুকফাঁটা আতঁনাদ জুড়ে দিল। জঙ্গলিটা ছুটে গিয়ে জখমি বাঘটার বুক হাতের ছুরিটাকে আমলে গৈথে দিল। কাৎরাতে কাৎরাতে আহত বাঘটা সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল। বাস, জোয়ারের টানে মুহূর্তের মধ্যেই সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

একী রহস্যের বাবা! যে-দ্বীপে ইতিপূর্বে বাঘ-ভালুক তো দূরের ব্যাপার একটা শেয়ালও দেখা যায় নি সেখানে বাঘ-ভালুকের উৎপাত শুরু হলে তো পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখাই সমস্যা।

বাঘ, সিংহ, ভালুক বা যে কোনো হিংস্রপ্রাণী হোক না কেন গডফ্রে এখন আর আতঙ্কে কঁকড়ে যায় না মোটেই। তার স্নায়ু এখন ঢের, ঢের সবল হয়ে গেছে।

গডফ্রে একদিন গহবরের ধারে, মাটিতে একটা বেড়া দিচ্ছিল। ঠিক তখন অদূরবর্তী জঙ্গল থেকে জঙ্গলিটা তীব্রস্বরে হাঁকডাক জুড়ে দেয়। গডফ্রে দূরবীণটা হাতে নিয়ে তরতর করে পাশের একটা গাছের মগডালে উঠে পড়ল। দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই সে চমকে উঠল। ধোঁয়া, দেখল গাছের মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়া কুঙ্কলী পাকিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে গাছ থেকে নেমে সে জঙ্গলটাকে খুঁজে বের করল। তাকে নিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল। আরও দু-দুবার ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। তবে আজকের ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি এবং অধিকতর ওপরে উঠে যাচ্ছে।

একী ভূতুড়ে ব্যাপার রে বাবা। ধোঁয়াটা হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে গেল যে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যে জায়গাটা থেকে ধোঁয়া উঠেছিল ছুটে ছুটে তারা সেখানে পৌঁছে দেখে পোড়া কাঠ, অঙ্গার পড়ে রয়েছে। কিন্তু যে বা যারা আগুন জ্বলেছিল সে বা তারা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় বে-পাশা হয়ে গেল?

গডফ্রে হতাশ হয়ে গহবরের আশ্রয়ে ফিরছে। এমন সময় জঙ্গলিটা পিছন থেকে তাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা মারল। সে কোনো রকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ঘাড় ঘুরাতেই চমকে উঠল। দেখল, প্রচণ্ড একটা বিষধর সাপ গাছের ফাঁক দিয়ে প্রকাণ্ড গ্রিবা বিস্তার করে রয়েছে আর নূপুর বাজানোর শব্দ ভেসে আসছে। র্যাটল সাপ। এদের লেজের দিককার হাড়গুলো আলগা। লেজ দোলাবার সময় হাড়ে হাড়ে ঠোঁড়ের লাগায় চমৎকার নূপুরধ্বনি উথিত হয়। তবে জঙ্গলিটার উপস্থিতি বুদ্ধি আর সতর্কতার জন্য এ যাত্রায়ও গডফ্রে প্রাণ রক্ষা পেল। পর মুহূর্তে আরও একটা সাপ ঝোপের ফাঁক দিয়ে কিলবিলিয়ে উঠল। জঙ্গলিটা কুড়লের এক কোপে তাকে খতম করে দিল।

গডফ্রে যারপরনাই অবাক হল যে-দ্বীপে একটা কেঁচো পর্যন্ত দেখা যায় নি সেখানে এত সাপ আমদানি হল কোথেকে, কীভাবে? প্রথমে ভালুকের আবির্ভাব। তারপর নরখাদক বাঘের উৎপাত। সবশেষে বিষধর সাপের ফোঁসফোঁসানি। একী অবাক কাণ্ডের বাবা।

গডফ্রে জঙ্গলটাকে নিয়ে গহবরটার কাছাকাছি আসতেই নাচের মাষ্টারের আর্ত চিৎকারে সচকিত হয়ে উঠল। ছুটে ছুটে গিয়ে দেখে, বিশাল দেহী নাচের মাষ্টার অনবরত ছুটছে আর বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। সে ছুটে ছুটে আস্তুলি-নির্দেশ করে কী যেন দেখাতে চাচ্ছে। গডফ্রে তার আস্তুলি-নির্দেশিত পথে ভাকিয়েই আঁতকে উঠল। দেখল, প্রায় চৈকীর মতো লম্বা একটা কুমির নাচের মাষ্টারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ভয়ে সঁটিকে লেগে থাকার সময় এটা নয়। আগে হতচ্ছাড়া কুমিরটাকে পরপারে পাঠানো দরকার। সেটাকে ঘায়েল করতে গডফ্রেকে তিন-তিনটে বন্দুকের গুলি খরচ করতে হল।

গডফ্রে মধ্য নতুনতর উপদ্রবটা ভাবনার সঞ্চার করল।

বর্ষা বিদায় নিল। দ্বীপটায় শুরু হল শীতের প্রকোপ। কিছুদিনের মধ্যে তুষারবৃষ্টিও শুরু হয়ে গেল। সিন্দুকটার ভেতর থেকে যে সব শীতবস্ত্র পাওয়া গিয়েছিল তা দিয়ে দ্বীপবাসীরা অনায়াসেই শীতের মোকাবেলা করতে পারল। এখন আর শুকনো ডালপালার অভাব রইল না। আগুনটাকে জিইয়ে রাখাও কিছুমাত্র সমস্যা হল না।

গডফ্রে মাথায় চমৎকার একটা মতলব খেলল। একটা মই তৈরি করে নেওয়া দরকার। ঝটপট গহবরটার ওপরের দিকে উঠে যাওয়ার জন্য একটা মই দরকার। জঙ্গলিটার সাহায্যে সে মজবুক একটা মই তৈরি করে ফেলল।

তিন দ্বীপবাসী এক রাতে গহবরটার ভেতরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে। এমন সময় গডফ্রে অদূরবর্তী ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে একদল জন্তু-জানোয়ারের ক্রুদ্ধগর্জন শুনতে পেল। গডফ্রে নাচের মাষ্টার জঙ্গলটাকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ক্রোধমত্ত জন্তু-জানোয়ারদের বুক-কাঁপানো হাঁকাহাঁকি যেন ক্রমে বেড়েই চলল। আর তাদের সংখ্যাও যেন বেড়েই চলেছে। ব্যাপার দেখে নাচের মাষ্টারের তো আছারাম বাঁচা ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল।

বরাত ভাল যে তারা দ্বীপবাসীদের কোটরটার হদিস পায় নি।

হঠাৎ কোটর থেকে পিস্তল গর্জে উঠল। তবু ভাল যে, গুলিটা দরজা ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। নাচের মাষ্টার বিছানায় শুয়েই কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলের খোড়াটা টিপে দিয়েছে। আর একটু হলেই কেলঙ্কারী ঘটে যেত।

পিস্তলের আওয়াজ হতেই গাছের কোটরে কারো না কারো উপস্থিতি সম্বন্ধে জানোয়ারগুলো নিঃসন্দেহ হল। তারা সদলবলে কোটরের দরজাটার ওপর হামলা শুরু করে দিল। পায়ের নখ আর দাঁত দিয়ে দরজার গায়ে অনবরত আঁচড় কাটতে লাগল। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গডফ্রে নাচের মাষ্টার আর জঙ্গলটাকে নিয়ে মই বেয়ে কোটরটার ওপরের দিকে উঠে গেল।

কোটরের ফাটলটা দিয়ে গডফ্রে আর জঙ্গলিটা এবার বন্দুক আর পিস্তল একের পর এক গুলি ছুঁড়তে লাগল। জঙ্গলিটার কাণ্ড দেখে গডফ্রে তে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবার জোগাড় হল। যার চৌদ্দপুরুষে কেউ বন্দুক দেখে নি সে কিনা বোমালুম গুলি করে চলেছে। তাও একটা গুলিও লক্ষ্যব্রত হয় নি।

গুলির আঘাতে পর পর কয়েকটা জানোয়ার ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে দেখে বাকিরা লেজ তুলে পালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে কয়েকটা জানোয়ার কোটরের পাল্লার ভেতরে ঢুকে পড়েছিল। ভাঙা-পাল্লাটা পড়ল আগুনের ওপর। মুড়ির মতো শুকনো কাঠে সহজেই আগুন লেগে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

আচমকা ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। গোলাবারুদে আগুন ধরে গেছে। এতে একটাই লাভ হল। জানোয়ারদের কয়েকটা মারা পড়ল আর বাকিরা প্রাণের মায়ায় চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। দ্বীপবাসীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদিকে বারুদের স্তুপে আগুন লাগায় চোখের পলকে সম্পূর্ণ গাছটাই জ্বলতে শুরু করল।

বেচারী দ্বীপবাসীরা প্রমাদ গুনল। কোটরের ওপরের অংশ থেকে নেমে আসার কোনো ফিকিরই করতে পারল না। ফলে আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সেটা এক সময় হুড়মুড় করে কাৎ হয়ে পড়ল।

একের পর এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ায় গডফ্রে রীতিমতো মুখড়ে পড়ল। বরাতে যে আরও কত কী লেখা রয়েছে, কে বলতে পারে? এভাবেই হয়তো এক দিন তার ভবলীলা সাজ হয়ে যাবে।

ঠিক তখনই পরিষ্কার ইংরেজিতে কে যেন অন্ধকার বনভূমি থেকে চিল্লিয়ে বলতে লাগল—‘মি. মরণ্যান, ভোরেরই আপনার মামা মি. কোন্ড্রপের এ-দ্বীপে আসার কথা। তিনি যদি না আসেন তবে কারোরই বাঁচার আশা নেই।’

গডফ্রে মরণ্যান কোনোরকমে গলা বাড়িয়ে দেখল, তাদের সঙ্গীটা পরিষ্কার ইংরেজিতে কথাটা বলেছে। যাকে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও ইংরেজি ভাষাটা রপ্ত করাতে পারে নি তার মুখে এমন শুদ্ধ ইংরেজি ও পরিষ্কার উচ্চারণ শুনে গডফ্রে মূর্ছা যাবার জোগাড় হল।

একটু বাদেই ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ হতে লাগল। সে সঙ্গে একদল খালাসির হৈ হট্টগোল দ্বীপবাসীদের কানে এল। খালাসিদের পিছন থেকে কে যেন তারস্বরে চিৎকার করে বলছেন, ‘গডফ্রে, গডফ্রে, আমি এসে গেছি।’

কণ্ঠস্বরটা গডফ্রে খুবই পরিচিত। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কণ্ঠস্বরটার মালিক কাছে এগিয়ে এসে মুচকি হেসে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, এই সে রবিনসন ক্রুসো, কেমন আছি সব?’

গডফ্রে চমকে উঠে বলে উঠল, ‘আরে মামা! তুমি, এখানে এলে কি করে মামা?’

‘আরে এতে এমন অবাক হবার কি আছে? দ্বীপটার মালিক তো আমিই। আমার দ্বীপে আমি আসব এতে তো অবাক হবার কিছু নেই।’

‘এটা তো ফেনা দ্বীপ। এটা তোমার দ্বীপ?’

‘ফেনা দ্বীপ! সে কী রে, এটা তো স্পেনসার দ্বীপ। ছ-মাস আগে নিলাম ডেকে আমি এর মালিকানা কিনে নিয়েছি। এটা আবার ফেনা দ্বীপ কি করে হল মাথায় আসছে না তো!’

পিছন থেকে মিষ্টি-মধুর স্বর ভেসে এল। ‘বাবা, গডফ্রে আমার নামানুসারে দ্বীপটার নামকরণ করেছে। এর নাম দিয়েছে ফেনা দ্বীপ।’

‘কি রে গডফ্রে, অভিযানের সাধ মিটেছে কি? নাকি দ্বীপটায় আরও কয়েক মাস থাকার ইচ্ছা রয়েছে?’

‘না মামা, অভিযানের সাধ আমার চিরদিনের মতো মিটে গেছে। কিন্তু মামা, তোমার জাহাজটা ডুবে যাওয়ায় অনেকগুলো ডলার ক্ষতি হয়ে গেছে।’

‘খুৎ! জাহাজটা মোটেই ডোবে নি। তোকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যই ক্যাপ্টেন জাহাজ ডোবানোর অভিনয় করে। তুই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তেই পাম্প করে জল বের করে ফেলে। তারপরই সেটাকে নিয়ে তিনদিনের পথ পাড়ি দিয়ে জাহাজটা নিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে হাজির হয়। জাহাজের কেউই প্রাণে মারা যায় নি। তবে হ্যাঁ, সেই সে চিনেম্যানটা কেবল তার পাশা পাওয়া যায় নি।’

‘কিন্তু মামা নৌকা বোঝাই জঙ্গলিদের ব্যাপারটা মাথায় চুকছে না তো।’

‘দূর পাগলা কোথাকার। ওরা জঙ্গলি হতে যাবে কেন? তারা তো আমার ভাড়া করা অভিনেতারে। তবে বরাত ভাল যে, তাদের বন্দুক-পিস্তলের গুলিতে কারো প্রাণ যায় নি। আর তোর সঙ্গী জঙ্গলিটা? ওতো আমার নিম্নো অনুগামী রে!’

‘বাঘ-ভালুক যেভাবে রাত্রের অন্ধকারে আমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল?’

‘আরে ও দুটো তো খড়ের বাঘ-ভালুক রে। রাত্রির অন্ধকার বলেই আসল-নকলের পার্থক্যটা বুঝতে পারিস নি। তোর নিম্নো সঙ্গীটাই তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে পথের ধারে রেখে দিয়ে তোর মধ্যে ভীতির সঞ্চার ঘটাত রে।’

‘কিন্তু কুমির আর সাপের ব্যাপারটা? তাদেরও কি—’। কুমির আর সাপের কথা শুনে মিষ্টার কোন্ড্রপ আঁতকে উঠলেন। চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, ‘কুমির আর সাপ? কই না তো, কুমির আর সাপ তো আমি পাঠাই নি। আরে স্পেনসার দ্বীপে কোনো হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই, দলিলেও লেখা রয়েছে। দলিলের বক্তব্যের ওপর ভরসা করেই তো তোকে এখানে পাঠিয়েছিলাম গডফ্রে।’

ক্যাপ্টেন এবার খালাসিদের দিয়ে গাছের মগডাল থেকে পৌনেমরা নাচের মাষ্টারকে নামিয়ে আনলেন।

‘মামা, আমাকে উচিত শিক্ষাই যখন দিতে চেয়েছিলে তখন আর শুধু শুধু সিন্দুক ভর্তি এতসব জিনিসপত্র না পাঠালেই তো পারতে?’

‘সিন্দুক? জিনিসপত্র কই সিন্দুক তো আমি পাঠাই নি!’ কথা বলতে বলতে তিনি জিজ্ঞাসুদৃষ্টি মেলে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন।

বেচারি ক্যাপ্টেন খতমত খেয়ে বললেন, ‘স্যার, আমার কোনো দোষ নেই। সবই ফেনার কারসাজি। সে আমাকে এমন পীড়াপীড়ি শুরু করল যেন না বলার উপায় ছিল না।’

রুডলফ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুচকি হাসলেন। মুখের হাসিটুকু অব্যাহত রেখেই বললেন, ‘শোন গডফ্রে, এ দ্বীপটা আমি তোকেই দান করেছি। বিয়ে থা করে তুই আর ফেনা এখানেই থেকে যা।’

ফেনা আর গডফ্রে বিয়ে হয়ে গেল। গডফ্রে যে কুমিরটাকে গুলিবিদ্ধ করে নাচের মাষ্টারের জীবনরক্ষা করেছিল সেটার গায়ে একটা লেবেল সাঁটা দেখা গেল। কোনো চিড়িয়াখানা থেকে সেটা কেনা হয়েছে তার লেবেল। মি. টাসকিনার সেটা খরিদ করে গোপনে দ্বীপে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বীপটাকে নিলামে কিনতে না পেরে রাগের বশে শত্রুতা করেছেন। শুধুমাত্র কুমিরই নয় প্রচুর ডলারের বিনিময়ে হিংস্র জন্তু জানোয়ারগুলোকে চুপিচুপি ছেড়ে দিয়ে গেছেন।

গডফ্রে এবার বলল, ‘মামা, সবইতো বুঝলাম। কিন্তু একটা রহস্য এখনো চাপা পড়েই রইল। ধোঁয়ার ব্যাপারটা কী?’

‘ধোঁয়ার রহস্যটাও উদ্ঘাটন করা গেছে। জাহাজের খোলের মধ্যে সে চিনাম্যানটা আশ্রয় নিয়েছিল এটা তারই কাজ। জাহাজডুবির অভিনয়ের সময় সেও এ-দ্বীপেই আশ্রয় নিয়েছিল। সেই মাঝে মধ্যে আগুন জ্বলত। ছয় মাস সে এখানে একা কাটিয়েছে। জানিসই তো চিনারা একা থাকতে ভালোবাসে, কষ্টও করতে পারে। তাই সে তাদের সংস্রব এতদিন এড়িয়ে চলছে।

চিনাম্যানটাও ধোঁয়ার মাধ্যমে গডফ্রে পিলে চমকে দিয়েছিল।

ফেনা আর গডফ্রে সুখে বিবাহিত জীবন যাপন করতে লাগল। কিন্তু হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো একে অন্যকে খেয়ে সাবাড় না করা পর্যন্ত তারা কেউ-ই ‘ফেনা দ্বীপে’ থাকতে রাজি নয়।

=== ○ ===

সিটি ইন দ্য সাহারা

পৃথিবীর প্রায় তিনলক্ষ বর্গমাইল এলাকা মরুভূমির অবস্থান। এ শতকের প্রারম্ভে আধুনিক মানচিত্রে এ জায়গাকে ফাঁকা দেখানো হয়েছে। বারজাক কমিশন যখন অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট স্বীকার করে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন এ মরুভূমি অতিক্রম করা তো দূরের ব্যাপার কেউ পদচিহ্নও আঁকেনি এর বুকে। আসলে সাহারা তখনো সভ্য মানুষের কাছে অজানা-অচেনা ছিল। তখন থেকে এ-অঞ্চলটাকে নিয়ে কতই না মজার মজার কল্পকাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত। কারো কারোর মুখে শোনা যেত, লকলকে আগুনের শিখা মুখ দিয়ে অনবরত নির্গত করতে করতে আগুন-পাখি মরুপ্রান্তরের ওপর দিয়ে চক্কর মেরে বেড়াতে দেখেছে। তার চোখ দুটো দিয়েও নাকি আগুনের শিখা ঠিকরে বেরতো। আবার লাল দৈত্যাকৃতি দস্যুরা নাকি দল বেঁধে মরুভূমির বুকের ওপর দিয়ে ছুটে যেত। আগুনে জ্বালিয়ে পুরিয়ে খাক করে দিত একের পর এক শহর। লুণ্ঠ করে আবার উদ্ধার বেগে ধেয়ে যেত মরুভূমির বুকে। মোট কথা মরুভূমি ছিল অপদেবতাদের নিশ্চিন্ত বাসস্থল। কেউ এ রহস্যভেদ করতে প্রয়াসীও হয় নি। সমগ্র নাইজার এবং মরুভূমির প্রান্তদেশ থেকে প্রায় একশো মাইল পর্যন্ত আজও অসহায় মানুষরা এমনি হাজারো গুজবে আতঙ্কিত বুকে গুনেছে। ভয় ভরে সিটিকে থেকে এমনি করে কাটিয়েছে সহায়স্বলহীন মানুষগুলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর।

কিন্তু কেউ যদি দুঃসাহসের কাঁধে ভর করে মরুভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে যেত তবে চমৎকার একটা শহর দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করতে পারত। শহর বলতে যা বুঝায় সবই তার রয়েছে। এর বয়স্ক অধিবাসীর সংখ্যা ছ'হাজার আটশো আট। কিন্তু ম্যাপে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য এর হয়নি। সাহসে ভর করে যে কোনো অভিযাত্রী মরুর কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জানতে পারবে শহরটার নাম 'ব্র্যাকল্যান্ড'।

আফ্রিকার জঙ্গলে যখন বারজাক কমিশন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন, তখন ব্র্যাকল্যান্ড শহরে অবস্থান করছে পাঁচ হাজার সাতশো আটাত্তর জন সাদা চামড়ার মানুষ। তাদের অধিকাংশই জেল পালানো কয়েদি আর এরকমই কোনো না কোনো অসামাজিক কাজে অপরাধী। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছে বলে তাদের জাত, ধর্ম ও ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। তবে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হচ্ছে ইংরেজরা। তাই সরকারী কাজকর্ম সবই চলত ইংরেজিতে। ব্র্যাকল্যান্ডে 'খাতার বাস্‌' নামে একটা দৈনিক সাংবাদপত্রও প্রকাশিত হত ইংরেজি ভাষাতেই। সংবাদপত্রটার রকমসকম কেমন অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল, তা তার কয়েকটা সংখ্যার বক্তব্য পড়লেই সম্যক ধারণা করে নেওয়া সম্ভব। একটা সংখ্যায় ছাপা হয়েছে—নিগ্রো কোরোমোকো মধ্যাহ্ন ভোজনের পর পাইপ আনতে ভুলে যাওয়ার জন্য জন অ্যাড্‌ম্‌ তাকে ফাঁসির কাঠে বুলিয়েছেন। আর একটা কাগজে ছাপা হয়েছে, 'কর্নেল হিরাম হার্বার্ট দশজন মেরিফেলোসহ হেলিপ্রেনে চেপে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় কৌরসো ও বিডি যাচ্ছেন। তিন বছর বাদে ফের গ্রামের ওপর হামলা হুজ্জতি চালিয়ে, বেধড়ক হত্যা আর লুণ্ঠরাজ চালিয়ে প্রচুর ধনদৌলত নিয়ে চম্পট দেবে।' আর একদিনের খবর—খবর পাওয়া গেছে বারজাক নামক এক ডেপুটির অধিনায়কত্বে কোনাক্রি থেকে অতি শীঘ্র এক ফরাসি অভিযাত্রী দল যাত্রা করছে। কমিশন সিকাসো ও ওখাদোসৌয়ের ওপর দিয়ে নাইজারে যাবে। দুজন মেরিফেলো এবং বিশজন ব্র্যাক গার্ড নিয়মিত কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। পরবর্তীকালে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজের দলে যোগ দেওয়ার কথা, তিনি পদাতিক সেনাবাহিনীর একজন পলাতক সৈনিক। তিনি কৌশলে সুযোগ মতো লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর ছদ্মনামে বারজাকের অভিযাত্রীদের দলে ভিড়ে যাবেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে অভিযাত্রীরা যাতে নাইজারে পৌঁছতে না পারে, কৌশলে সে প্রয়াস চালিয়ে যাবেন।

কাউন্সিলর এ হল উইলিস ভাবলেন মেরিফেলো কনস্টানটিন বার্নার্ডের মাথার খুলির মধ্যে কয়েকটা কার্তুজ ঢুকিয়ে দিতে হবে। তাঁর মাথার খুলির ওজন এমনিতেই বেশি, তার ওপর কার্তুজের ওজন যোগ হলে সেটা অনায়াসেই রেড রিভারের জলে ডুবে যাবে। বার্নার্ডের পরিবর্তে গিলম্যান হিলিকে নতুন মেরিফেলো নিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি জার্মানি, ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের আদালত থেকে সতেরো বার শাস্তি পেয়ে মোট উনত্রিশ বছর কারাগারে এবং পঁয়ত্রিশ বছর জাহাজের খোলের অন্ধকারে কাটানোর শাস্তি পেয়েছিলেন। গিলম্যানক সিভিল বডি থেকে মেরিফেলোর বাড়িতে আনা হল।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ব্র্যাকল্যান্ড কেবলমাত্র চিফ এবং জনা কয়েককে ছাড়া কাউকেই পদবি অনুযায়ী সম্বোধন করা হবে না। একমাত্র 'চিফ'ই পদবি জানবেন। তাই খবরগুলোতে কেবলমাত্র পদের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। চিফের এক নাম অবশ্যই আছে। সে নাম গুনলেই বুকের ভেতরে টিবিটবানি গুরু হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর সে নামটা হচ্ছে—'হ্যারি কিলার'।

বারজাক কমিশনের অভিযান ব্যর্থ হওয়ার দশ বছর আগে হ্যারি কিলার এখানে আস্তানা গেড়েছিল। সে যে কোনো দেশের কোনো অঞ্চল থেকে এখানে উদয় হয়েছিল কারোরই জানা নেই। সাম্প্রতিককালে যে অঞ্চল ব্র্যাকল্যান্ড বলে চিহ্নিত সেখানে একটা তাঁবুর খুঁটি মাটিতে গুঁজে দিয়ে ঘোষণা করেছিল, 'এখান থেকেই নগর পত্তন করা হোক।' বাস, এবার ভেজবাজির খেলার মতো বিস্ময়কর নগরী 'ব্র্যাকল্যান্ড' গড়ে উঠল।

তখন তাফাসেট আউদ একটা মজে যাওয়া খাল বা খাদ। হ্যারি কিলারের প্রয়াসে সেটা জলপূর্ণ হয়ে একটা নদীতে পরিণত হয়ে গেল। তার বাঁ দিকে গড়ে উঠল নগর। তার ক্ষেত্রফল তিনশো বিঘার কিছু বেশি। প্রাচীর তুলে নগরটাকে তিনটে ভাগে বিভক্ত করা হল। নদীটার নাম দেওয়া হল 'হ্যারি কিলার রেড রিভার'। নদীর তীরবর্তী নগরটার ব্যাসার্ধ দুশো পঞ্চাশ গজ। একটা চমৎকার বাগিচা নদীর তীরের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশের সংযোগ সাধন করেছে। এতে প্রথম অংশের সঙ্গে ক্ষেত্রফল বেড়ে গিয়ে মোট ক্ষেত্রফল দাঁড়িয়েছে প্রায় এক শো বিঘা।

নগরের প্রথম অংশে বসবাস করে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা। তাদের নামকরণ করা হল 'মেরিফেলো'। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক হচ্ছে মেরিফেলোর পুরনো সাকরেদ, আরও উন্নতি করার সম্ভাবনা যাদের রয়েছে। তারাই মেরিফেলোর মূল ও প্রাচীন বাসিন্দা। এবার নগরের চারদিকে এসে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করল। তাদের কেউ জেল-পালানো দুষ্কৃতকারী আর কেউ বা জাহাজ-পালানোর ডাকাতি। তারা নিজেদের মেজাজ মজি মফিক দুর্কর্ম সাধনের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে এরকম আশা ভরসা হ্যারি কিলারের কাছ থেকে পেয়ে তারা নিশ্চিন্ত হল। মেরিফেলোর সংখ্যায় পাঁচশো তেবন্তি জন। এ সংখ্যা বাড়ানো হবে না সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

তাদের ওপর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর মতো ব্র্যাকল্যান্ডের হয়ে তাদেরই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যদের মোকাবেলা করতে হয়। তাদের অভিধানে যুদ্ধের সংজ্ঞা হচ্ছে লুণ্ঠতরাজ, হত্যা করা, গ্রাম পুড়িয়ে ছাড়বার করে দেওয়া, অসহায় নিম্নোদের জোরজবরদস্তি ধরে নিয়ে এসে এনে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা। চাষবাস থেকে শুরু করে যাবতীয় কায়িক পরিশ্রমের কাজকর্ম করতে হয়। অদৃষ্ট বিড়ম্বিত নিম্নো ক্রীতদাসদেরই। চিফের দেহরক্ষী হিসাবে তাদের লিগু থাকতে হয়। নগরের দ্বিতীয় অংশে তাদের বাস।

আর নগরের তৃতীয় অংশ? সিভিল বডি অর্থাৎ নগরের প্রথম অংশে যেসব সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা থাকার অনুমতি পায় না তাদের বসবাসের জন্য এ স্থান নির্ধারিত। তবে নিজেদের আচার-আচরণ ও কাজকর্মের মাধ্যমে তারা তৃতীয় অংশ থেকে প্রথম অংশে স্থানলাভের যোগ্যতা অর্জন করে থাকে। কালোমুন্ডকের ভয়ঙ্কর শাসনব্যবস্থায় যেকোন মুহূর্তে মেরিফেলোদের কতল করে রেড রিভারের জলে ফেলে দেওয়া হয়। শূন্যপদ পূরণ করা হয় নগরের তৃতীয় অংশের সিভিল বডির মাধ্যমে। মোদা কথা হচ্ছে, মেরিফেলো স্বর্ণভূলা আর সিভিল বডি জঘন্য নরকের মতো বিবেচিত হয়।

চিফের ওপর কেব মেরিফেলোদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বর্তায়। সিভিল বডির ওপর তাঁর কোনো দায়দায়িত্বই নেই। তাই নিজেদের খাওয়া-পরার অর্থাপার্জন করতে হয় হরেকরকম ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে। চিফ লুণ্ঠতরাজের মাধ্যমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করে তা কারাবারীদের মারফৎ বাজারে বিক্রি হয়। তবে ইউরোপিয় দ্রব্যসামগ্রী কীভাবে চিফের কাছে পৌঁছায় সে হিন্দস একমাত্র তার নিকটম পার্শ্চররা ছাড়া আর কেউই পায় না।

নগরের তৃতীয় অংশে পয়তাল্লিশজন নারীসহ মোট দুশো ছেচল্লিশজন বাসিন্দা রয়েছে। মেয়েরাও পুরুষদের মতোই বিভিন্ন প্রকার অসামাজিক কাজকর্মের মাধ্যমেই অর্থাপার্জন করে থাকে।

ভোরে নগরের চারটে দরজা খুলে দেওয়া হলে নিম্নো দাসরা দল বেঁধে মাঠে যায় চাষ-আবাদ করতে। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্তদেহে ফেরে নিজ নিজ ঝুপড়িতে। নগরের দরজা আবার বন্ধ হয়। ফের ভোরে খোলা হয়। তাদের নগর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনো পথই খোলা নেই।

একদিকে সিভিল বডি আর অন্যদিকে মেরিফেলোদের কড়া নজর রয়েছে নিম্নো দাসদের ওপরে। একটু বেগড়বাই করলেই মেরিফেলোদের গুলির আঘাতে বেচারাদের প্রাণ দিতে হয়। সে জায়গায় গ্রাম থেকে আমদানি করা হয় নতুন দাসদের। এ-ব্যবস্থা হচ্ছে রেড রিভারের ডান তীরের নগরের। আর বাম তীরের নগরটা বিপরীত তীরের নগরের তুলনায় আয়তনে সামান্য ছোট, প্রাচীর দিয়ে দৈর্ঘ্য বরাবর দু-ভাগ করা হয়েছে। এখানে গড়ে তোলা হয়েছে ফোর্ট্রেস উদ্যান এখান থেকে গার্ডেন ব্রিজ অতিক্রম করে সিভিল বডি আর মেরিফেলোদের বসতিতে যাওয়া যায়।

আর অন্য অংশটা পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এটা নগরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাবলিক গার্ডেনের গায়ে প্রাচীর ঘেরা একটা পাকাবাড়ি রয়েছে। এটা রাজপ্রাসাদ। হ্যারি কিলার আর তার ন'জন পার্শ্চরের বাসস্থান। চিফ যত সব দুর্কর্মে লিপ্ত হয় ও সম্পাদন করে তাকে পার্শ্চররা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাকে সাহায্য করে থাকে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, চিফ সর্বদা গোপন অন্তরালে অবস্থান করে। তাকে কেউ-ই দেখার সুযোগ পায় না, কাছে ঘেঁষতে পারে না, তার হুকুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেও কোনো ফায়দা হয় না।

আর একটা ব্রিজ রয়েছে ব্র্যাকল্যান্ডের প্রধান কেন্দ্র থেকে ডান তীর অবধি। এটা কাসল ব্রিজ নামে পরিচিত। রাড্রে এটা বন্ধ করে রাখা হয়। রাজপ্রাসাদের গায়ে ব্যারাকে পঞ্চাশজন পৈশাচিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নিম্নো সদা জাগ্রত অবস্থায় থাকে। তাদেরই ব্র্যাকগার্ড নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য আর একটা ব্যারাকে চল্লিশজন স্বেতাঙ্গ। এরাও পঞ্চাশজন ব্র্যাকগার্ডের মতোই এক একটা দানব বিশেষ। তারাই হেলিপ্লেন চালানোর দায়িত্বে রয়েছে। বাস্তবিকই হেলিপ্লেন অত্যর্চব এক আবিষ্কার। একবার মাত্র জ্বালানী ভরে দিলে ক্রমাগত তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে ঘণ্টায় গড়ে দুশো পঞ্চাশ মাইল গতিতে। এরই সাহায্যে ব্র্যাকল্যান্ডের দুষ্কৃতকারীরা চোখের পলকে বাঞ্ছিত স্থানে উপস্থিত হয়ে কাছ মিটিয়ে আবার মুহূর্তে চম্পট দিতে পারে। একরম একটা অত্যর্চব ও অবিস্বাস্য যান্ত্রযানের দৌলতেই হ্যারি কিলার একনায়কতত্ত্ব চালিয়ে যেতে পারছে।

ব্র্যাকল্যান্ড অজানা অচেনা অঞ্চলটার রাজধানী, একসা-এ সঙ্গ্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে হ্যারি কিলার সুবিশাল অঞ্চলে স্বৈচ্ছচার চালিয়ে যেতে পারছে। বিক্ষোভ-বিন্দোহের আশঙ্কা মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলা কিন্তু হ্যারি কিলারের পক্ষে সম্ভব হয় নি; কালো অথবা সাদা চামড়ার মানুষ যেকোন সময়, যেকোন অজুহাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, এই আশঙ্কাতেই তো রাজপ্রাসাদটাকে এত ওপরে তৈরি করা হয়েছে। অতিকায় কামানগুলোর মুখ নগর, ব্যারাক আর টাউন হলের দিকে ঘোরানো হয়েছে। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ একজন খুনি হ্যারি কিলার। সামান্য ফাঁস করামাত্র তার মাথার খুলিটা কে উড়িয়ে দেওয়া হবে। মরুভূমি ডিঙিয়ে যাওয়ার চিন্তা পাগলের প্রলাপ মাত্র। ডাকাতের আন্তানায় একবার হে মাথা গলিয়েছে সেখান থেকে জান নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা নিছকই আত্মঘাতী হওয়া। তবে ব্র্যাকল্যান্ডের পরিস্থিতি খুবই চমৎকার। পাইপের জল আর বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি এরকম পথ, বাড়িঘর খুঁজে পাওয়া ভার। দাসদের ঝুপড়িতে পর্যন্ত বিজলি বাড়ির রোশনাই দেখা যায়। দশ বছর আগে ব্র্যাকল্যান্ডের গোড়াপত্তন কিন্তু বালির রাজ্যের উপর গড়ে উঠেছিল। আজ অবিস্বাস্য জাদুকারি ছোঁয়ায় বালির রাজ্যকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। শাক-শবজি আর ফলমূল চাষ হচ্ছে। চাষ-আবাদের পদ্ধতিই অদ্ভুত ধরণের।

একাজের পিছনে কুমতলব না থাকলে হ্যারি কিলারের এ কাজ অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য সন্দেহ নেই, সত্যই এ অসম্ভবকে সম্ভবনায়ম করে তুলেছে। শুক বালির রাজ্যে এমন সতেজ শাক-শব্জির ক্ষেত যে সে কি করে তৈরি করল! জলই জীবন। জল ছাড়া বসুমতী অকৃপণ হতে পারে না। যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সারা বছর এক ফোঁটা জল হয় না সেখানে কোন অলৌকিক শক্তিবলে এমন ভোজবাজির খেলা সে দেখাতে পারল? তবে কি ধরে নিতে হবে, প্রেচ্ ভোজবাজির তুচ্ছভাবের বেশই সে অসম্ভবকে সম্ভব করল? না, অবশ্যই নয়। হ্যারি কিলার জাদুবিদ্যা তুচ্ছভাবকে কিছুমাত্রও জানে না, কিন্তু যাই করুক না কেন, যেকোন শক্তি এর পিছনে, কার্যকারী হোক না কেন, হ্যারি কিলার কিন্তু একা নন। আর এক ব্যক্তি তার কাছাকাছি পাশাপাশি অবস্থান করে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করতে প্রাণান্ত প্রয়াস চালিয়েছে। কে সে? কার উন্নত মস্তিষ্ক এর পিছনে রয়েছে? সে প্রসঙ্গে যথা সময়ে উত্থাপন করব।

প্রথম নগরটার মধ্যেই যেন অন্য আর একটা নগর গড়ে তোলা হয়েছে। একটা শহরে যা কিছু বাঙালীয় সবই এখানে লক্ষিত হয়। এর সবকিছুই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। বিরাট একটা কারখানা ষাট বিঘা জমি নিয়ে মাথা উঁচিয়ে অবস্থান করছে। হ্যারি কিলার একে গড়ে তুলতে খইয়ের মতো টাকা ছিটিয়েছে, এমন কি হ্যারি কিলার নিজেও এ কারখানাটাকে ভেতরে ভেতরে ভয় পায়, সমীহ করে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এ-শহরটাতে। হ্যারি কিলার যে নগরের পত্তন করেছে তার নক্সা কিন্তু এ কারখানা থেকে বেরিয়েছে, সমগ্র ইউরোপ যা ধারণায় আনতেও পারবে না এমন সব যন্ত্রপাতি আর কলকজার উপস্থিতি এ কারখানাতে লক্ষ্য করা যাবে। আগামী দীর্ঘ কয়েক বছরেও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা এমন অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার করতে পারবেন বলে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

অত্যাধুনিক এ কারখানার প্রাণপুরুষ হচ্ছেন এর ডিরেক্টর। শতক খানেক কর্মী তার সহকারী। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের বাছাই করা মস্তিষ্ক সোনার ওজনে সংগ্রহ করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজার হালে রাখা হয়েছে।

তাদের মধ্যে অধিকাংশই মেকানিক। তাদের অনেকেই বিয়ে-থা করেছে। তাই সাতশো মহিলা রয়েছে। ছেলেপুলের সংখ্যাও কম নয়। তবে ব্ল্যাকল্যান্ডের অন্যান্য বাসিন্দাদের চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এক কথায় তারা সচ্চরিত্র উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। তবে হ্যাঁ, তাদের জীবনধারণের মতো যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে সত্য, কিন্তু সে সঙ্গে নগর ছেড়ে যাতে বাইরে না যেতে পারে তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চাকরিতে বহাল হবার সময় সবাই জেনে গেছে মোটা বেতনের বিনিময়ে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রায় বন্দি জীবনযাপন করতে হবে। এমন কি চিঠিপত্রের মাধ্যমেও বাইরের জগতের কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে না। বাইরের কোনো দেশ থেকে এখানে চিঠিপত্রও আসে না। গোছা গোছা নোট ফেলে দরকারই বা কি? তাই কোনোরকম দ্বিধা না রেখেই তারা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে এখানে কাজে যোগ দিয়েছে। তারপরই জাহাজে চাপিয়ে তাদের আনা হয়েছে পূর্ণিগণি গিনি উপকূলের সামান্য দূরবর্তী বিশাণো দ্বীপপুঞ্জের একটা জনমানবহীন ছোট দ্বীপে। এবার তাদের চোখ বেঁধে একটা হেলিপ্লেনে তোলা হয়েছে। ছ-ঘণ্টারও কম সময়ে চৌদ্দশো মাইল পথ পাড়ি দেওয়া হয়েছে। চোখে পড়ি খুলে তাদের হাজার করা হয়েছে কারখানার অভ্যন্তরে। চুক্তির মেয়াদকাল অবধি তারা এখানেই রয়েছে। মেয়াদ পূরিয়ে গেলে যে, যার দেশে ফিরে গেছে। হ্যাঁ, চুক্তি করার সময় এরকম শর্ত অবশ্যই ছিল, কারখানার কাজকর্ম যদি উৎসাহ না পায়, ভাল না লাগে তবে চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাদেরকে নিজের দেশে ফিরে যেতে দেওয়া হবে। তাদেরকে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য হেলিপ্লেনে তোলা হয়। তারপর যে তার কি গতি হয় তা কারখানার কমরেডরা জানতে পারে না, ব্ল্যাকল্যান্ডের গোপনীয়তা সভ্যজগতের কাছে গোপনই থেকে যায়। তবে বড়জোর দু—একজন ছাড়া কেউ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য পীড়াপীড়িও করতে না। ফলে মরু সাম্রাজ্যের পৈশাচিক কাজকর্মের কথা সঙ্গী গম্ভীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। আবার নিশ্চো দাস মেয়ে-পুরুষদের ক্ষেত্রে একই নিয়ম কার্যকরী হয়, তবে তাদের মতে নিজের দেশের চেয়ে এখানেই বেশি সুখে নিরাপদে জীবনযাপন করছে।

তাদের ডিরেক্টর এক ফরাসি ভদ্রলোক। নাম তাঁর মারসেন ক্যামারেট। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। কারখানার কর্মীরা তাকে দেবজ্ঞানে মান্য করে। কেবল তারই ব্ল্যাকল্যান্ডের সর্বত্র অবাধে যাতায়াতের অধিকার আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে তিনি স্বাধীন জীবনযাপন করলেও ব্ল্যাকল্যান্ডের মনুষ্যরূপী দৈত্যদের ব্যাপারসম্পার সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধ্যান-ধারণা নেই—জানার আগ্রহও নেই। কেউ এ প্রসঙ্গে কিছু জানতে চাইলে সংক্ষেপে সাফ জবাব দিতে, 'আমি কিছু জানি না'।

কারো কারোর মতে ডিরেক্টর মারসেন ক্যামারেটের নির্দ্বাং মাথার দোষ আছে। তবে মাত্রাতিরিক্ত প্রতিভাবানরা সর্বদা কামকাজে ও কথাবার্তায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারেন না, খুবই সত্য বটে। তবে তার মধ্যে যে অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হয় তা খুব সামান্যই বটে।

ভদ্রলোক খুবই ভীতু প্রকৃতির সত্য, কিন্তু উৎসাহ-উদ্দীপনাসহীন অবশ্যই নন। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্তর্জগৎ, মানে আপন চিন্তায় সর্বক্ষণ বিভোর হয়ে থাকতেই তার আগ্রহ বেশি। তাঁর যাবতীয় চিন্তাভাবনার মূলে রয়েছে কারখানার উন্নতি সাধন। একের পর এক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, গভীর নিরাক্ষরতা চিন্তার মাধ্যমে সে সবার সম্মুখাদেশের সূত্রও তিনিই বের করছেন। তাঁর চিন্তার মূলে রয়েছে ভয়ঙ্কর ও নিরীহ একটা যন্ত্র। অন্য়মনস্কতার জন্য তিনি যে কতবার হুমড়ি খেয়ে রেড রিভারের জলে পড়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। এমন কি নিজের ক্ষিদে তেষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁর হাঁস থাকে না!

অদ্ভুত এ যন্ত্রটার মস্তিষ্কে নকল বৃষ্টিপাতের অত্যশ্চর্য এক পরিকল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

পরিকল্পনাটা উদ্ভট হলেও বাস্তবতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সত্যই বিনা মেঘে নকল বৃষ্টি ঝরল।

বাস, যাত্রা শুরু হল। ক্যামারেট এবার একের পর এক নিতানতুন আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকলেন। করলেনও বহু অবিশ্বাস্য আবিষ্কার। তার প্রায় একশো অত্যশ্চর্য আবিষ্কারের মাধ্যমে হ্যারি কিলার যারপর নাউ উপকৃত হলেন। তাঁর জঘন্য মনবৃত্তি-চরিতার্থ করার কাজে অনেকগুলো ধাপ অগ্রসর হতে সক্ষম হলেন। আবিষ্কারক ভুলেও কিন্তু কৌতূহলী হলেন না। জানতে উৎসাহী হলেন না তাঁর অভাবনীয আবিষ্কারগুলোর মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হচ্ছে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোনো আবিষ্কার কুর্মে ব্যবহৃত হলে তার জন্য আবিষ্কারকের কাঁধে দোষ চাপানো সঙ্গত নয়। তবে হ্যাঁ, পিস্তলের আবিষ্কারক অবশ্যই জানতেন তাঁর আবিষ্কারকে কোনো কাজে ব্যবহার করা হবে। কিন্তু মি. ক্যামারেটের ব্যাপারে এ যুক্তি প্রযোজ্য হয়। তাঁকে প্রচলিত কামানের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী কোনো কামান তৈরি করে দিতে অনুরোধ করলে তিনি তা তৈরি করার পর বিরাট ধ্বংসকান্ডের খবর তাকে শোনাতে তিনি চোখ দুটো কপালে তুলে বলেন, 'সে কী হে! এমনটা হবে আমার তো জানা ছিল না!'

মোদ্দা ব্যাপার হচ্ছে তিনি কামান তৈরি করবেন অফুরন্ত আবিষ্কারের মোহ নিয়ে। কিন্তু তার প্রয়োগ সম্বন্ধে তার ভিলমাত্রও ভাবনা চিন্তা নেই।

বৃষ্টি প্রত্যাশা করেছিলেন হ্যারি কিলার। মি. ক্যামারেট বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণ করেছিলেন। হ্যারি কিলার কৃষিকাজের যন্ত্র চেয়েছিলেন। মি. ক্যামারেট এমন এক যন্ত্র তৈরি করে দিয়েছিলেন যেটা ব্যবহারের মাধ্যমে জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজবোনা, আগাছা পরিষ্কার করা এবং গাছ থেকে পাকা শষ্য ঝাড়াই বাছাই করে গাছ থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছিল। একটা মাত্র যন্ত্র দিয়ে এতগুলো কাজ সম্পন্ন করা আশ্চর্য্য তো বটেই। হ্যারি কিলার শূন্যে একনাগাড়ে তিন হাজার বার অতিক্রম করার উপযুক্ত ওড়ারযন্ত্র তৈরি করে দিতে বলেছিলেন। ক্যামারেট দিব্যি হেলিপ্লেন বানিয়ে দিলেন।

ক্যামারেট তাঁর আবিষ্কার কোনো কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার খোঁজখবর নেওয়া তো দূরের কথা জানার জন্য সামান্যতম কৌতূহলও বোধ করেন নি। তার পরিবর্তে মস্তিষ্ক চিত্তাঙ্গ উপাদান যোগান দিয়ে সমস্যার সমাধান করতেই তিনি অধিকতর উৎসাহ-আনন্দ পান। এভাবেই তো মরুভূমির রক্ষণ রুই বালির ওপর ব্ল্যাকল্যান্ড নগর গড়ে উঠল। কিন্তু প্রথম যন্ত্র তৈরির কলকজা ও কাঁচামাল, পরবর্তী অগণিত যন্ত্র তৈরি করার কলকজা ও যন্ত্রপাতি কোথেকে, কীভাবে এসেছে তা জানার কিছুমাত্র আগ্রহও তিনি অনুভব করেন নি। তিনি শ্রমিক জোগান দিতে বললেন। ব্যস, যেন ভোজবাজার খেলার মতো অত্যন্ত কালের মধ্যে একের পর এক শ্রমিক আসতে লাগল ক্যামারেটের কাছে। আর এই অপরিসীম অর্থই বা কোথেকে আসছে তা নিয়েও মুহূর্তের জন্য তার মাথাব্যথা হয় নি।

একদিনের কথা, সেদিন বেলা এগারোটায় হ্যারি কিলারের বৈঠকখানার টেলিফোন বেজে উঠল। গৃহকর্তা হ্যারি কিলার সে ঘরেই আপন মনে চিন্তার জট ছাড়িয়ে চলছেন।

টেলিফোনের রিসিভারটা কানের কাছে ধরতেই শুনতে পেলেন, 'পশ্চিম-দিকে, সতের ডিগ্রি দক্ষিণে, দশটা হেলিপ্লেন অগ্রসর হতে দেখা যাচ্ছে।'

ত্রিশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটা টাওয়ারের চূড়ার ওপর থেকে একজন মেরিফেলো টেলিফোন করছেন।

হ্যারি কিলার ক্রেডেলের ওপর টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছুটে এসপ্লানেড, কারখানা ও রাজপ্রাসাদের মধ্যবর্তী স্থানে হাজির হলেন। ফোন ছাড়ার আগে কোনোরকমে মেরিফেলোকে নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন, কাউন্সিলরদের যেন যত শীঘ্র সম্ভব খবর দেওয়া হয়। মেরিফেলোর কাছ থেকে হ্যারি কিলারের জরুরি তলব পেয়ে কাউন্সিলররা পড়ি কি মরি করে ছুটে এলেন।

হ্যারি কিলার দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হেলিপ্লেন দেখতে ব্যস্ত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেগুলো এসপ্লানেডে নেমে এল। মোট দশটা। তাদের চারটেতে রয়েছে শুধুই পাইলট। আর বাকি ছ'টা থেকে পাইলট ছাড়াও দুজন করে আরোহী নেমে এল। মুখ ঢাকা পিঠমোড়া করে বাঁধা কয়েদি আর একজন ব্ল্যাকগার্ড।

হ্যারি কিলারের নির্দেশে তাদের হেলিপ্লেনের বাইরে এনে চোখ মুখ ও হাত পায়ের বাঁধন খুলে দেওয়া হল।

অতিকায় হেলিপ্লেনগুলো, কারখানার চিমনি, ধোঁয়া আর আকাশচুম্বী ইস্পাতের কাঠামো আর ছাউনি প্রভৃতি দেখে তো তারা যেন সদ্য আকাশ থেকে পড়ল ত্রিশজন ব্ল্যাকগার্ড। তারা কোথায় অবস্থান করছে এ মুহূর্তে সে চিন্তায় তারা অস্থির হয়ে পড়ছে। তারা আফ্রিকা-মানচিত্র বহুবার বহু কারণে ঘাঁটাঘাটি করেছে। কিন্তু এমন অদ্ভুত কর্মযজ্ঞের নজির কোথাও প্রত্যক্ষ করবেন স্বপ্নে ভাবে নি।

হ্যারি কিলারের হস্তিতে ছ'জন ব্ল্যাকগার্ডকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েদখানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল।

অজানা-অচেনা সাম্রাজ্যের রাজধানী ব্ল্যাকল্যান্ডের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হ্যারি কিলারের হাতের মুঠোয় বন্দি হলেন বারজাক, মিস ব্রেজেন, আমিদি ফ্লোরেন্স, চেতোন্ন আর মঁসিয়ে ফ্লোরেন্স। কয়েদখানার দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের দিনলিপি পাতায় চব্বিশে আগস্ট তারিখে লেখা হয়েছিল, 'আমরা চব্বিশ ঘণ্টা আগে এখানে পৌঁছেছি। কিন্তু কোথায় এসে হাজির হয়েছি? যদি কেউ বলে আমরা চাঁদে এসেছি, কিছুমাত্রও বিস্তৃত হব না। সত্যি, এ যে কোনো দেশ, কোনো অঞ্চল, কিছুই বুঝতে পারছি না। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আমরা কয়েদ হওয়ার পর পুরো চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। রাত্রিটা মোটামুটি শান্তি-স্বস্তিতে কাটার ফলে শরীর-মন একটু সতেজ হয়ে উঠেছে। তাই তো দিনলিপিটা নিয়ে বসা সম্ভব হয়েছে। আকাশখানে না চড়ে উড়ায় ছিল না। সেন্ট বেরেন কোমরের বাতে একটু-আধটু কাবু হয়ে পড়লেও আমরা বাকি সবাই যে সুস্থ-স্বাভাবিক রয়েছি তা অবাক হবার মতো ব্যাপারই বটে।' রাত পরে শেষ রাত্রের দিকে বিকট আওয়াজ কানে এল। একবার নয়, তিনবার ভয়ঙ্কর আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবার জোগাড় করেছিল। মাথার ওপর দিয়ে অস্বাভাবিক আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের কান ও চোখ দুটোর কর্মক্ষমতা লোপ করে দিলে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিটা কাটিয়ে ওঠার আগেই কারা যেন অকস্মাৎ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখে ন্যাকড়া গুঁজে দিল। দড়িদাড়া দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পর মুহূর্তেই লেফটেন্যান্ট ল্যাকো হেড়ে গলায় বলে উঠলেন, 'সবাই আছে তো? একটু বেগড়বাই করলে গুলির আঘাতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।'

তাদের কথোপকথনের মাধ্যমে জানতে পারলাম জঙ্গলের গাছপালার বাইরে, কৌরবৌসৌয়ের দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সেখান থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে সে জায়গাটা। লেফটেন্যান্ট ল্যাকো বলল, 'তবে সন্ধ্যাই যাত্রা করতে হবে।' পরমুহূর্তেই আচমকা আকাশ-গর্জনটা অনেকাংশে বেড়ে গেল। তারপর দূরে সরতে সরতে এক সময় একেবারে মিলিয়ে গেল। আওয়াজটা যে কিসের তা অনুমানও করতে পারলাম না।

এবার আমাদের হাত-পা ধরে জাহাজের মালের মতো দম দম করে ঘোড়ার পিঠে ফেলে দিল। উদ্ধার বেগে ছুটে চলল বুনো ঘোড়াগুলো। আমার মাথা ছিল ঘোড়ার একদিকে আর বিপরীত দিকে পা দুটো। সে যে কী অসহনীয় অবস্থা তা আর বলার নয়। চলন্ত অবস্থাতেই শুনতে পেলাম, 'বজ্রাত মেয়েটা বুঝি পটল তুলেছে।'

পাশ থেকে হেঁড়ে গলায় জবাব এল, 'না, সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। এলিয়ে পড়ে রয়েছে।'

'ঠিক আছে বাঁধন খুলে দাও। ডাক্তারের বাঁধনও খুলে ফেল।'

এবার চলন্ত ঘোড়ার পিঠেই আমার বাঁধন ক্রমে আলগা হতে লাগল। বুঝতে পারলাম, আমাকে ডক্টর চেতানু ভেবে ভুল করেছে। কিন্তু মুখের কাপড় সরাত্তাই আমাকে চিনতে পেরে আবার ঝটপট কাপড়টা মুখের ওপর তুলে দিয়ে বাঁধাবাঁধি শুরু করে দিল। হতচ্ছাড়াটাকে চিনতে পারলাম, লেফটেন্যান্ট ল্যাকো। শয়তানটাকে দেখেই আমার সর্বাস্থে জ্বালা ধরে গেল। অনুশোচনায় দম্ভে মরতে লাগলাম—তখন যদি নচ্ছাড়টার মুখোশ খুলে দিতাম, প্রকৃত পরিচয় ফাঁস করে দিতাম তবে আজ আর দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হত না। কোনোদিন মওকা পেলে এর শোধ তুলে ছাড়ব।

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের আসল নাম যে ক্যাপ্টেন রুফুজ এবার জানতে পারলাম।

আমি বস্তাবন্দি থেকে থেকে স্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার জোগাড় হলাম। তার ওপর বে-কায়দায় ঘোড়ার ওপর পড়ে থাকার ধকল তো রয়েছেই।

অবোধ ভাষায় লেফটেন্যান্ট, মানে ক্যাপ্টেন রুফুজ কি বলল। বাস, মুহূর্তের মধ্যে দুজন আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমার দেহ-তন্ত্রাঙ্গি চলতে লাগল। এমন কি আমার স্বাক্ষরযুক্ত দিনলিপিখ খাতাটাও কেড়ে নিল। এবার আমাকে বস্তা থেকে বের করে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল। সে মুহূর্তে মনে হল পুনর্জন্ম হল আমার।

সূর্যোগের সন্ধ্যাবহার করতে ছাড়লাম না। অনুসন্ধিৎসু নজর মেলে সবকিছু দেখতে লাগলাম। যত দেখছি ততই যেন অবাক হতে লাগলাম। ইম্পাতের প্রাটফর্মের ওপর ইম্পাতের কাঠামোর একটা পাইলন। উচ্চতা বারো থেকে পনেরো ফুট। মধ্যস্থলে রয়েছে দুটো প্রপেলরের ব্লেড। ঠিক যেন উড়ন্ত, ডানামেলা একটা বক। বিশালকায় একটা বক। ডানা দুটো সূর্যের কিরণে চকচক করছে। তাদের মোট দৈর্ঘ্য আঠারো ফুট। এরকম দশটা কলকজা। পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এদের কোনো কাজে লাগানো হবে আমার মাথায়ই এল না।

আমার সঙ্গী-সাথীরা মাটিতে পড়ে। মিস ব্রেজনের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। কাগজের মতো শাদা হয়ে গেছে তাঁর মুখ। ডক্টর চেতানু তাঁর শিরে বসে। সেন্ট বেরেনের অবস্থাও তখৈবচ। তবে পঁসি আর বারজাকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু টোনাগানে কোথায়? ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে বেচারার ভবলীলা সঙ্গ হয়ে যায় নি তো? সে জন্যই নিম্নো সন্তান মালিকের চোখে জল দেখা যাচ্ছে।

আমি কোনোরকমে মিস ব্রেজনের কাছে গেলাম। আমার আগেই ক্যাপ্টেন রুফুজ তাঁর কাছে পৌঁছে গেছেন দেখলাম। ডক্টর চেতানুকে বললেন, 'মাদাম মোরনাস কেমন আছেন বলুন তো? এখন কি যাত্রা করা যেতে পারে?'

আমি তাঁর কথায় একটু অবাকই হলাম। মিস ব্রেজনকে তিনি এখনো তাঁর আগেকার সে ছদ্মনাম 'মোরনাস' বলেই জানেন দেখছি।

ডক্টর চেতানু জবাব দিলেন, 'এখন একটু ভাল। তবে অনন্ত ঘণ্টা খানেকের আগে যাত্রা করা সম্ভব নয়। একটা কথা, ওই রকম জন্তু-জানোয়ারের মতো নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে কিন্তু কেউ-ই প্রাণে বাঁচবে না।'

ক্যাপ্টেন রুফুজ তাঁর কথার জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পঁসি আর বারজাক মিস ব্রেজনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মিস ব্রেজন চোখ মেলে তাকিয়েই কঁদে ফেললেন। কান্নাপুত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'আমি দুঃখিত! আমার জেদের জন্যই আপনাদের এমন দুর্ভোগ।'

তাকে প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা বৃথা অনুমান করে প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে গিয়ে বললাম, 'মিস ব্রেজন, ক্যাপ্টেন রুফুজ কিন্তু আপনাকে মাদাম মোরনাস বলেই জানেন।'

মিস ব্রেজনের আসল নামটা শয়তানগুলো জেনে ফেললে ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে অনুমান করে তাঁর আসল নাম ও পরিচয় গোপন রাখার সিদ্ধান্তই সবাই নিলেন। এও সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার থেকে তাকে মিস মোরনাস নামেই সম্বোধন করা হবে।

হঠাৎ যমদূতাকৃতি গাটীগোড়া একদল লোক ছুটে এল। যন্ত্রচালিতের মতো আমাদের সবাইকে হাত-পা বেঁধে বস্তায় পুরে ফেলল। না, মাজেস্পার মতো আবার ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে জন্তু-জানোয়ারের মতো নেওয়ার ব্যবস্থা না করে একটা সমতল স্থানে দম্ভ করে বস্তাবন্দি আমাকে ফেলে দিল। ঘোড়ার পিঠে ফেললে অন্য রকম বোধ হত। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে বার বার এদিক-ওদিক দোল খেতে লাগলাম। ক্যানক্যানে যে রহস্যজনক আওয়াজ শুনছিলাম, অবিকল সেরকম ভয়ঙ্কর শব্দ আমার কানের পর্দা ফাঁটিয়ে দিতে চাইছে। ক্রমেই আওয়াজটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। আর একটা ব্যাপার স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম, যেন লিফটে করে উঠতে, অনেক উঠতে উঠে যাচ্ছি। এক সময় পরিস্থিতিটাকে শরীর ও মন সামাল দিতে পারল।

এক সময় বুঝলাম, আমার হাতের বাঁধন শিথিল হয়ে গেছে। আসলে নড়াচড়া করতে করতে অল্প অল্প করে বাঁধন খুলেছে। তবে পরিস্থিতিটা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখলাম।

একটা হাত কোনোরকমে পকেটে চালান করে দিয়ে ছোট্ট ছুরিটা বের করে আনলাম। পেন্সিল কাটা হয় এটা দিয়ে।

চোখের কাছে বস্তার কিছুটা কেটে দেখার মতো ব্যবস্থা করে নিলাম। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর, একেবারেই অবিস্বাস্য এক দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠল। চমকে উঠলাম। যা দেখছি তা, পাঁচশো গজ নিচে ভূ-পৃষ্ঠ রয়েছে। নিঃসন্দেহ হলাম, উড়ন্ত যানে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার গতিবেগ এক্সপ্রেস ট্রেন থেকেও অনেক অনেক বেশি।

বেশিক্ষণ চোখ মেলে তাকিয়ে সে দৃশ্য দেখতে পারলাম না। বুকের ভেতরে ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ভাবলাম, এ কাদের খপ্পরে পড়েছি রে বাবা!

উড়ন্তযানটার গতিবেগ কত? ঘন্টায় একশো নাকি দুশো মাইল? পায়ের তলায়, পাঁচশো মাইল নিচের ভূমি মরুভূমির মতো।

ভয়ে ভয়ে আবার চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আর ওপরে ও নিচে একই রকম আরও উড়ন্তযান তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে। তবে এরা উড়ন্ত যান তৈরি করেছে? উড়ন্ত কল! কলকজায় পাখির ডানার শক্তি নিয়োগ করেছে? এক সময় যা উপকথা হয়ে লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াত, ইকারাসের কাহিনীর অত্যাশ্চর্য ভাবনাকে কৌশলের মাধ্যমে বাস্তবতায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে? ছোট্ট ছিদ্রটা দিয়ে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। তবু একের পর এক মরুদ্যান পাড়ি দিয়ে উড়ন্ত যানগুলি এগিয়ে চলল অবিস্বাস্য গতিতে।

মাত্র তো পাঁচশো গজ ওপর দিয়ে উড়ন্ত যানগুলি ধেয়ে চলেছে। বিকট গর্জন যে ভূমি পর্যন্ত অনায়াসে পৌঁছে গেছে তার প্রমাণ পেলাম মরুদ্যানের বাড়িগুলো থেকে মানুষকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে। শুধু কি এই! হাত মুঠো করে আমাদের শাসাচ্ছে। নাগালের মধ্যে পেলো যেন মুণ্ডপাত করে ছাড়বে।

মরুদ্যানের ভেতর সারিবদ্ধভাবে খুঁটি পোতা রয়েছে দেখলাম। এর আগেও এরকম খুঁটির সারি দেখেছিলাম বটে। দড়ির মতো তারও পাতা দেখলাম, সেগুলোর ওপর। তবে? টেলিফোন, নাকি টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা। একী স্বপ্ন, নাকি সভ্য? সাহারা মরুভূমিতে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ? না, আর ভাবতে পারলাম না। মাথার ভেতরে বিমবিক্ষিত করতে লাগল।

তৃতীয় মরুদ্যানের সারি পার হতে না হতেই আরও অবাক হতে হল শস্যক্ষেত্র দেখে। নিম্নো চাষীরা কোথাও বা লাঙ্গল দিচ্ছে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আরও একটু এগোতেই দেখলাম, কয়েকজন নিম্নো বিকট গর্জন শুনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে দৌড়ে ঘরে ঢুকে গেল। বাইরে দিকে শাদা চামড়ার মানুষদের আধিক্য লক্ষ্য করলাম। তারাও হাত মুঠো করে হস্তিত্বি করছে। আমাদের ওপর তাদের ক্রোধের কারণ কি, বুঝতে পারলাম না।

উড়ন্ত যান এবার নিচে নামতে নামতে একটা নাম না জানা নদী অতিক্রম করল। বৃত্তাকার পথ ধরে নামার জন্য মাথা চক্কর মারছে।

প্রপেলারের হস্তিত্বি ক্রমে স্তিমিত হতে হতে এক সময় একেবারে থেমে গেল। বুঝলাম, উড়ন্ত যান আমাদের নিয়ে ভূমি স্পর্শ করেছে।

আচমকা টান মেরে বস্তাটাকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে বাইরে বের করে আনা হল। এরকম পরিস্থিতির কথা ভেবে আমি আগেভাগেই দড়ির বাঁধনে হাত দুটো গলিয়ে রেখেছিলাম। আমি চোখ-মুখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বাজখাই গলায় উঠে দাঁড়ানোর জন্য হুকুম দিল। হুকুমদারের মুখটা দেখা গেল না।

ঘরটায় দরজা-জানালা আছে বটে। সামান্যতম ছিদ্র তো নেই-ই, এমন কি ঘুলঘুলি পর্যন্ত নেই। ঘরটার একদিকে অতিকায় টাওয়ার। কারখানা? সুউচ্চ একটা পাইলনও নজরে পড়ল। টাওয়ার থেকে শো খানেক গজ উঁচু। আর ডানদিকে বিশাল প্রাসাদ। পাশাপাশি দুটো প্রাসাদ। তাদের মাঝখানে একটা দুর্গ-প্রাসাদ সদস্তে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মালিক ছাড়া আর সবাইকেই এক এক করে দেখতে পেলাম। কিন্তু সকালেও তো তাকে দেখা গেছে। বস্তার ভেতর থেকে সবে মুক্তি পাওয়া আমার সঙ্গী-সাবীদের চোখে আচমকা আলো পড়ায় চোখে যেন ধাঁধা লেগে গেছে। সুযোগ করে নিয়ে আমি যা কিছু দেখছি তারা তো সেসব কিছুই দেখতে পায় নি। তাদের চোখ স্বাভাবিকতা ফিরে পাওয়ার আগেই সবাইকে নিয়ে অন্ধকার কারাগারে পুরে দিল। ইতিমধ্যে যা কতক সবার পিঠে পড়ে গেছে।

আমরা যে কোন পাশেওর কবলে পড়েছি, কারাগারে বন্দি হয়েছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আর কোথা উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আমাদের পাকড়াও করে নিয়ে এসেছে, তাও মালুম হল না। আর জায়গাটাই বা কোথায় কিছুই আন্দাজ করতে পারলাম। না অন্ধকার কামরায় হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার রইল না।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের দিনলিপি পাতায় ছাব্বিশে মার্চ তারিখে লেখা রয়েছে—কারাকক্ষে প্রায় অন্ধকারে বসে তিনি লিখেছেন—মাজেপ্লার ভূমিকায় অভিনয় সাস্র করে এখন তিনি পেলিকোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন সিলভিও কারাবারোনোর সঙ্গে গুপ্ত সমিতিতে লিপ্ত থাকার অপরাধে দশ বছর যার কারাদণ্ড হয়েছিল, ইতালির এক নাট্যকার, লর্ড বায়রনের এক বন্ধু, যার কীর্তি-কাহিনী নিয়ে নাটক রচনা করেছিলেন।

গত পরশুর আগের দিন দুপুরে তাকে কয়েদখানায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সশস্ত্র প্রহরীরা কড়া নজর রাখছে। পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কামরাটার বারো ফুট উঁচুতে একটা মাত্রই জানালা। মোটা মোটা লোহার শিক দেওয়া। দরজায় ইয়া পেল্লাই তিনটে তালু বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি একা বসে আকাশপাতলা ভেবে চলেছেন। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে তন্ময় হয়ে ভাবার পর দুম্ব করে দরজা খুলে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। এমন একজন ঘরে ঢুকে এল যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, কল্পনাও করা সম্ভব নয়। চৌমৌকি। সেই বিশ্বাসঘাতক নিম্নো চৌমৌকি। যে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের প্রবন্ধগুলো ঘোড়ার জিনের সঙ্গে গুঁজে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল এ সেই চৌমৌকি।

তিনি রাগে গস্ গস্ করতে করতে তেড়ে যাবার উদ্যোগ নিতেই সে দুম্ব করে দরজা বন্ধ করে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

নিতান্ত অনিচ্ছায় হলেও যার অতিথি অঙ্গকার কারাগারে তিনি ধুকছেন সবাই তাঁকে হ্যারি কিলার বলে সম্বোধন করে। রাজা, এখানকার সর্বসর্বা। তাঁর কৃত্তিককে অস্বীকার করেন কি করে। উড়ন্তযানে গুয়ে, বস্তার ফুটো দিয়ে তিনি যে সবই দেখতে পেয়েছেন;

একথা সত্য যে, মোরিলিরেই চৌমৌকিকে দল থেকে কৌশলে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে এসেছিল। সে হ্যারি কিলারের একেবারে হাতের মুঠোয়, একেবারে কাছের লোক।

খেতে বসে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স চৌমৌকির কাছে টোনগানের খবর জানতে চাইলে মুহূর্তে তার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, সে দুনিয়া ছেড়ে গেছে।

চৌমৌকি যে রাতে চম্পট দিয়েছিল সে রাত্রিই কলের উড়ন্তযানে চড়ে ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রুফুজের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাদের চেড়ে পালিয়ে আসার সময় নিছক তামাসা দেখার জন্যই সার্জেন্ট দুজন নিম্নো সৈন্যদের দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠরাজ করে, আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। উড়ন্তযানে চড়ে চৌমৌকি এখানে হাজির হয়েছিল। তাই তখন তার বিকট আওয়াজটা এত কাছ থেকে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল।

চৌমৌকির মুখেই সাংবাদিক সাহেব জানতে পারলেন, তিনি এখন মরু অভ্যন্তরস্থ ব্র্যাকল্যান্ড নগরের কারাগারে বন্দি-জীবন যাপন করছেন। পৃথিবীর কোনো ভূগোলবিদই এ নগরটার খবর জানেন না। মানচিত্রে এর উল্লেখ নেই।

প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তিনি চৌমৌকিকে হাতের মুঠোয় আনার চেষ্টা করলেন। বিমর্ষ মুখে সে সবিস্ময়ে বলল, 'সে কী! কেটে পড়বেন কি কর্ত্তা! চারদিকে বিশাল মরুভূমি, আকাশ ছোয়া প্রচীর ঘেরা নগরী। তার ওপর চারদিকে বন্দুক-হাতে প্রহরী নিযুক্ত! খবরদার পালাবার চিন্তাও মাথায় আনবেন না। নির্ধাৎ জানে মরতে হবে।'

পরের দিন পঁচিশে মার্চ সাংবাদিক চৌমৌকি ছাড়া কাউকেই দেখতে পেলেন না। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলও না। তারপরের দিন ছাব্বিশে মার্চ মরুভূমির ব্র্যাকল্যান্ডের সর্বসর্বা, রাজা হ্যারি কিলারকে সাংবাদিকের দেখা সৌভাগ্য হল। সারাদিন চৌমৌকি আসেনি। বিশ্বাসঘাতক শয়তান মোরিলিরে এল সঙ্গে করে কুড়িজন নিম্নোকে নিয়ে। বুঝলেন, সেই তাদের পাণ্ডা। তাদে পেছনে হাত-বাঁধা অবস্থায় সেট বেরেন ছাড়া সবাই রয়েছে দেখা গেল। সাংবাদিকসহ সবাইকে নিয়ে লম্বা বারান্দা আর বহু গলি-ঘুপচি পেরিয়ে ইয়া বড় একটা কামরায় নিয়ে যাওয়া হল। মোরিলিরে বাইরে, একটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

মদের গ্রাস হাতে নিয়ে মূর্তিমান শয়তান হ্যারি কিলার আরাম কেরারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বসে। গায়ে হাতির শক্তি ধরে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি মনে হলেও আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি। চোখের তারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। তবে আচমকা দেখলে মনে হয় লোকটা শয়তানের সাক্ষাৎ চর ছাড়া আর কিছু নয়।

ডক্টর চেতোনু ইঙ্গিতে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন শয়তান হ্যারি কিলার মাত্রাতিরিক্ত মদ খেয়ে চুর হয়ে রয়েছে। উপস্থিত সবার মুখের ওপর ঢুলুঢুলু লাল চোখের মণি দুটো একবার বুলিয়ে নিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় হ্যারি কিলার বললেন, 'আপনারা ছ'জন শুনেছি, কিন্তু পাঁচজন এসেছেন যে।'

ডক্টর চেতোনু দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আপনাদের মাত্রাতিরিক্ত আপ্যায়নে একজন অসুস্থ, শয্যাশায়ী।' 'কোন দূরভিসন্ধি নিয়ে আমাদের দেশে হানা দিয়েছেন, জানতে পারি কি? গোয়েন্দাগিরি করতে নাকি?' 'স্যার, অনুগ্রহ করে অপরাধ নেবেন না।' বারজাক মোলায়েম স্বরে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন।

বাজখাই গলায় হ্যারি কিলার গর্জে উঠলেন, 'স্যার নয়—বলুন 'মাষ্টার'। সবাই আমাকে 'মাষ্টার' বলেই সম্বোধন করে। খোলসা করে বলুন, কোন কুমতলব নিয়ে আমাদের এখানে হানা দিয়েছেন? সাফ কথা শুনুন, আমার রাজ্যের ধারে কাছে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দিতে আমি কিছুতেই রাজি নই।'

অভিযাত্রীরা নীরবে, চোখের তারায় বিশ্বাসের ছাপ ঐকে তাকিয়ে রয়েছেন দেখে হ্যারি কিলার যন্ত্রচালিতের মতো দুম করে লাকিয়ে সোজাভাবে খাড়া হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখের তারা দুটো দিয়ে যেন আগুনের হস্কা ছিটকে বেরোচ্ছে। সাধামত গলা চড়িয়ে গর্জে উঠলেন, 'আপনারা যদি ভেবে থাকেন আপনাদের কুমতলবের কথা কিছু বুঝতে পারিনি তবে খুবই ভুল করবেন। ফরাসিরা টিষাকটু পর্যন্ত এসে, সেখানে অবস্থান করে প্রায়ই লাইজারে টিকটিকিদের পাঠিয়ে দিচ্ছে—আমার কাওকারখানার খবরাখবর নিয়ে যাবার জন্য। জানেন কি, আপনাদের হাড়গোড় ভেঙে একসার করে দিতে পারি? ঠিক এরকম করে—' কথা বলতে বলতে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাচের গ্লাস নিয়ে দড়াম করে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

মুহূর্তকাল নীরবে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলেন শয়তানরূপী হ্যারি কিলার। এক সময় বোম ফাটার মতো গর্জে উঠলেন, 'আমি বার বার সাবধান করে দিয়েছি—কেউ কান দেয় নি। ভোওং-কোনো বিষের ব্যাপারটা আমি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করি। আপনাদের হিতসাধনের ব্যাপারে, সতর্ক করে দেওয়ার সেটাই ছিল আমার প্রথম পদক্ষেপ। তারপর সতর্ক করে দিয়েছিলাম ওঝাকে দিয়ে। আপনাদের পথরোধ করার জন্য আমিই কৌশলে মোরিলিকে পাঠিয়েছিলাম। সে সিকাসোতে আপনাদের সঙ্গে মিলিতও হয়েছিল। আমার দিক থেকে সেটাই ছিল আপনাদের হিতসাধনের শেষ প্রয়াস। সৈন্যদের সরিয়ে আনার পরও আপনাদের হুঁস হল না। যাক নাইজারে তো পৌছেই গেছেন, প্রভুদের এবার কি বলবেন, বলুন তো?'

কথা বলতে বলতে হ্যারি কিলার গুলি খাওয়া বাঘের মতো, বন্ধ উম্মাদের মতো ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তারপর এক সময় বারজাকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তেমনি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনাদের গন্তব্যস্থল তো ছিল 'সায়ো' তাই না? তাই যদি হয় তবে হঠাৎ উল্টো পথে কৌবোতে-যাওয়ার কারণ কি?'

বারজাক স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল 'টিষাকটু', 'সায়ো' নয়।' মুহূর্তকাল গুম হয়ে কাটিয়ে এবার অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বললেন, 'তবে কি নাইজারের পূর্বদিকে যাওয়ার ইচ্ছা আদৌ আপনাদের ছিল না? হুম আগে আমার জানা থাকলে আপনাদের এত কষ্ট করে এখানে আসার কোনো দরকারই ছিল না।'

বারজাক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমাদের এত কষ্ট দিয়ে এখানে না এনে যদি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতেন। তবে তো ফরাসি সরকারের কানে জল ঢুকত।'

'কানে জল তো এখনো ঢুকতে পারে। আর তা ঢুকবেও।'

'তাই তো সহজে আপনাদের এখানে নিয়ে আসতে উৎসাহী হই নি। ফিরিয়ে দিতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছিলাম।'

শয়তান হ্যারি কিলারের উপস্থিতি বুদ্ধির তারিফ করার মতো বটে। সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স এবার আগ বাড়িয়ে বললেন, 'তা-ই যদি হয় তবে তো আমাদের যেখান থেকে তুলে এনেছেন সেখানেই রেখে দিয়ে আসতে পারেন।'

'আর আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে ব্র্যাকল্যাড আর আমার কাণ্ডকারখানার কথা টোল পিটিয়ে প্রচার করে দিন, তাই না? আমার সাফ কথা শুনে রাখুন একবার এখানে যে মাথা গলায় সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে না। আপনাদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবার নয়।'

'আপনি যত যাই করুন না কেন সরকার পক্ষ থেকে তদন্ত কমিশন আসবেই।'

'আসুক। লড়াইয়ে আমিই জিতব। কিন্তু আমার ইচ্ছা আপনাদের দিয়ে অন্যভাবে কাজ হাসিল করতে। কীভাবে, তাই না? জামিন থাকুন। তাতে আপনাদের লাশের চেয়ে বড় কাজ হবে। আমি নিঃসন্দেহ।'

অভিযাত্রীরা এটুকু অন্তত বুঝতে পারলেন, 'তাদের জান খতম করার অভিপ্রায় নেই।'

হ্যারি কিলার এবার বললেন, 'আপনারা জামিন থাকুন তাতে আপনাদের খুন করার চেয়েও বেশি উপকার আমার হবে। আমার শেষ কথা শুনুন, হয় জামিন থাকুন, নয় তো আমার কর্মযজ্ঞের সহযোগী হয়ে এখানেই নিরাপদে বসবাস করুন। সত্যি কথা কি জানেন? ফরাসি সৈন্যরা আজ না হোক কাল আমার রাজ্যের সন্ধান পাবেই। আমি বালির ফসল ফলানোর কাজে মেতে রয়েছি, তারা ব্যস্ত নাইজার কলোনি নিয়ে। দুই রাজ্য হাত মিলিয়ে, বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে কাজ করলে উভয়েরই মঙ্গল।'

বারজাক অভিযাত্রীদের সবার হয়ে জবাব দিতে গিয়ে বললেন, 'বন্ধুত্ব? আপনার সঙ্গে?'

'ব্যঙ্গ করছেন নাকি সাহেব। আপনারা এখন সমতল ভূমি থেকে একশো কুড়ি ফুট ওপরে অবস্থান করছেন। চারদিকে নজর ঘুরিয়ে তাকান, আমার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা অন্তত অনুমান করতে পারবেন। বারোশো বর্গমাইল জুড়ে আমার রাজ্য। অন্তত দশ বছর ধরে একে আমি গড়ে তুলেছি। এর কোনো এক প্রান্তে অবাস্তব কোনো ঘটনা ঘটমাএ টেলিফোন মারফৎ আমার কাছে খবর চলে আসবে। টেলিফোনের তার টেনে রাখার জন্য সারিবদ্ধভাবে খুঁটি পোতা রয়েছে। আর ওই যে আকাশ-ছোঁয়া টাওয়ার দেখছেন, এটা আলো নির্গত হয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দিনের আলোর মতো আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। এখান থেকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত মানের 'সাইকোসকোপ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে এ টাওয়ারটার ওপর থেকে আমার রাজ্যের সর্বত্র নজর রাখি।'

অভিযাত্রীদের দিকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা এগিয়ে দিয়ে হ্যারি কিলার বললেন, 'ইচ্ছে হলে দূরবীক্ষণ চোখে লাগিয়ে দেখতে পারেন।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স দূরবীক্ষণ যন্ত্রটায় চোখ লাগিয়েই চমকে উঠলেন।

হ্যারি কিলার বললেন, 'কী, দুজন নিম্নোকে দেখতে পাচ্ছেন? মনে করুন, তারা পালিয়ে যাবার ফিকির করছে। বেশি দূর যাওয়া হিম্মতে কুলোবে না। লক্ষ করুন আমি তাদের কি হাল করি।' কথা বলতে বলতে এক নম্বর টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলে বললেন, 'সাকের চৌদ্দ নম্বর। আর ব্যাসার্ধ পনেরশো দুই।' এবার বন্দি অভিযাত্রীদের দিকে মুহূর্তের জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'তামাশাটা কি হয় দেখুন।'

মুহূর্তের মধ্যেই একটা কালো দাগ দেখা গেল। তার ওপর দেখা গেল ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালো দাগটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হ্যারি কিলার এবার বললেন, 'লোকটাকে নিকেশ করে দিয়েছি।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বললেন?—এ কী অমানুষিক কাজ! লোকটাকে খতম করে দিলেন?

হ্যারি কিলার তাম্বিল্যের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'খুৎ। এ আবার একটা সমস্যা নাকি? একটা গেলে হাজারটা নিগ্রো আমদানি করা যাবে। কিন্তু আমার হিম্মৎ, আকাশ টপ্পেডের হিম্মৎটা চোখের সামনেই দেখলেন তো? কী ভয়ঙ্কর গতিশক্তি, অব্যর্থ টিপ—একচুলও হেরফের হবার নয়।'

কী পাশবিক প্রবৃত্তি! অভিযাত্রীদের মনপ্রাণ বিষিয়ে উঠল।

অকস্মাৎ কালো মতো একটা বস্তু আকাশের গায়ে আবির্ভূত হল। উদ্ধার বেগে আর একটা কালো বস্তু প্রথমটার দিকে ধেয়ে চলল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। অভিযাত্রীরা কিছুই বুঝতে পারলেন না।

মিস মোরনাস ভীত-সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন, 'লোকটাকে কি পরপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি ইহলোকেই আছে?'

'পরলোকে নয়, ইহলোকেই। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চোখের সামনে দেখতে পাবেন।' কথাটা ছুঁড়ে দিয়েই হ্যারি কিলার সেখান থেকে চলে গেলেন।

আমরা চাতালে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম কালো মতো একটা বস্তু শূন্যপথে অভিযাত্রীদের দিকে ছুটে আসছে। একটু বাদেই সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স বুঝতে পারলেন, যে-উড়ন্ত যন্ত্রের সাহায্যে তাঁদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এটা সেই যন্ত্রযান। কিন্তু যন্ত্রযানটার নিচে যেন কি একটা বুলছে।

হ্যারি কিলার পিছন থেকে বললেন, 'এটাই আমার আকাশযান 'হেলিপ্লেন'। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারবেন, আমার খপ্পর থেকে পালাবার চেষ্টা করার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর!'

হেলিপ্লেনটা অভিযাত্রীদের মাথার ওপরে আসতেই অদৃষ্ট বিড়ম্বিত একটা নিগ্রো সেটা থেকে দুম্ করে আছাড় খেয়ে তাদের সামনে পড়ল। তার মাথার খুলিটা টুকরো টুকরো হয়ে ঘিলু চারদিকে ঠিকরে পড়ল। আর সর্বাস্থ থেথলে গেল।

মিস মোরনাস বিকট আত্নানাদ করে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। পরমুহূর্তেই উম্মাদিনীর মতো ছুটে গিয়ে হ্যারি কিলারের গলা টিপে ধরে গর্জে উঠলেন, 'শয়তান! পিশাচ কাহিকার!'

হ্যারি কিলার তাঁর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ঝট করে কয়েক হাত সরে গেলেন।

ব্যস, যমদূতাকৃতি প্রহরীরা ছুটে এসে কেবলমাত্র মিস মোরনাসকেই নয়, অন্যান্যদেরও জাপ্টে ধরে ফেললেন। সবাইকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। হ্যারি কিলার বিকট স্বরে হাসতে লাগলেন, শয়তানের হাসি।

হ্যারি কিলার তাঁর সুসজ্জিত কামরায় আরাম কেমারায় শরীর এলিয়ে বসে। এমন সময় বক্ষীরা অভিযাত্রীদের তাঁর সামনে হাজির করল। তাঁদের ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি তড়িৎ-গতিতে সোজা হয়ে বসে পড়লেন। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন মিস মোরনাসের মুখের দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে শয়তানের লালসা সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেল।

এক সময় হ্যারি কিলার গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করলেন, 'আমার হিম্মত তো আপনারা চোখের সামনেই দেখলেন। ভবিষ্যতে আরও দেখার সৌভাগ্য হবে। এবার যা বলছি তার জবাব দিন। শুনেছি, আপনারদের মধ্যে একজন চিকিৎসক, একজন রাজনীতিজ্ঞ, একজন সাংবাদিক আর দুজন নিরোট বোকা রয়েছেন। হ্যাঁ প্রয়োজনে ফ্রান্সের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে পারেন, কথা দিচ্ছি রাজনীতিজ্ঞ, চিকিৎসকের হাসপাতাল গড়ে দেব আর সাংবাদিকের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করব ব্র্যাকল্যান্ড থান্ডারবোল্টের। আর বাকি দুজনেরও জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেব। আর রূপসী যুবতী? তাকে আমার খুবই চোখে লেগেছে। তাকে বিয়ে করে আমার স্ত্রীর মর্যাদা দেব মনস্থ করছি।'।

বারজাক বাঁঝালো গলায় বললেন, 'স্বেচ্ছায় কোনোটাও হবার নয়, জেনে রাখবেন। তবে বলপূর্বক যেটুকু করতে পারবেন করে নবেন।'

শয়তানের হাসি হেসে হ্যারি কিলার বললেন, 'বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা! আরে এত ব্যস্ততার কিছু নেই। এক মাস সময় আপনারদের দিচ্ছি। তাবুন, ভেবে আপনারদের সিদ্ধান্তের কথা আমাকে জানান।'

এবার বক্ষীদের হুকুম দিলে বন্দিদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

বারজাক গর্জে উঠলেন, 'এক মাস পরেও যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই তবে কোন্ পথ গ্রহণ করবেন?'

তাচ্ছিল্যের স্বরে হ্যারি কিলার জবাব দিলেন, 'তখনকার কথা তখনই না হয় ভাবা যাবে। হয়তো বা ফাঁসির হুকুমই দিতে হতে পারে।'

বক্ষীরা বন্দিদের নিয়ে কয়েদখানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

শয়তান! হ্যারি কিলার সাক্ষাৎ শয়তান। কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য একটা নিম্নোকে নির্মম নিষ্ঠুরভাবে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেন। হিংস্র জন্তু জানোয়ার ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে এরকম অমানবিক কাজ করা একেবারেই অসম্ভব।

উপরোক্ত ঘটনার পর থেকে অভিযাত্রীরা কয়েদখানায় বসেই উপলব্ধি করতে লাগলেন হ্যারি কিলার যেন কেমন বদলে গেছেন। আগেকার নিষ্ঠুরতা, পৈশাচিক মনোভাব তাঁর মধ্যে থেকে অভর্জিত হয়ে সেখানে মমত্ববোধ নিয়েছে। তাঁরা সকাল-বিকাল কয়েদখানার বাইরে এসে খেলায়ুখি মাফিক ব্র্যাকল্যান্ড নগরের সর্বত্র ঘোরাফেরা করতে পারছেন। কেউ বাধা দিচ্ছে না। তবে বক্ষীরা প্রতিনিয়ত তাদের চোখে চোখে রাখছে। কিন্তু পালানোর চিন্তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

রেড রিভার ছাড়া পালাবার সামান্যতম সুযোগও নেই। সেও দুরাশা, পাগলের চিন্তা, রেড রিভার পেরোবার মতো নৌকা কোথায়? তাও আবার নব্বই ফুট নিচে। দড়িদাড়া থাকলে না হয় ঝুলতে ঝুলতে নামার চেষ্টা করা যেত।

কয়েদখানার ছাদে দাঁড়িয়ে বন্দি-অভিযাত্রীরা ব্র্যাকল্যান্ড শহর আর কারখানাটাকে বিশ্বয় মাখানো দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। শহরের ভেতরে শহর। কারখানা উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত। কিন্তু এমন সুক্ষ্ম-ব্যবস্থার কি-ই বা দরকার ছিল? এ-ওতো কম বিশ্বয়ের উদ্বেক করছে না। নিছক কারখানাই যদি হয় তবে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি দেখা যাচ্ছে না তো? এরও একটা টাওয়ার রয়েছে। উচ্চতা একশো গজের কম নয়। কারণ কি? উঁচু প্রাচীরটা রেড রিভার আর এসপ্লান্ডেডে এসে শেষ হবার পিছনেই বা কোন্ কারণ রয়েছে? আরও অবাক কাণ্ড! ছোট্ট একটা নগর যার বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। হ্যারি কিলার নিজেই এখানকার যাবতীয় চাহিদা পূরণ করছেন।

অভিযাত্রীরা দিনের পর দিন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেও পালাবার মত উপযুক্ত কোনো পথের হদিস করতে পারলেন না। কার্সল ব্রিজে একজন মেরিফেলো সর্বদা পাহারায় নিযুক্ত। তার ওপর শাস্ত্রীরা তো রয়েছেই। অতএব পালানোর চিন্তা পুরোপুরি বাতিল।

তেসরা এপ্রিল। সেদিনই পরপর দুটো রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে গেল। দুপুর তিনটার কাছাকাছি নিম্নো পথপ্রদর্শক মালিক এসে হাউমাউ করে কঁদে পড়ল জেন রেজনের পায়ে। টোনগানের খবর তার জানা নেই। তারা উভয়েই অভিযাত্রীদের দল ছেড়ে গোপনে পালিয়েছিল।

আর দ্বিতীয় ঘটনাটা? বিকাল পাঁচটার কাছাকাছি সে ঘটনাটা ঘটে। চৌমৌকি হ্যারি কিলারের হুকুমে ছুটে এসেছে। তিনি তাকে হুকুম দিয়েছেন মিস মোরনাসকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অভিযাত্রীরা তাকে তাড়িয়ে দিলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, কিছুতেই তাঁকে কাছ ছাড়া করবেন না। বরাতে যাই ঘটুক, বাধা সৃষ্টি করে যাবেনই। একটু বাদেই চৌমৌকি উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সেখানে হাজির হল জানাল, মিস মোরনাসকে যদি তাঁর সামনে হাজির করা না যায় তবে ছ'জনকেই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে।

মিস মোরনাস সহ-অভিযাত্রীদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে রাজি হলেন। তিনি শয়তান হ্যারি কিলারের কাছে যাওয়ার জন্য পা—বাড়ালেন, কারোর বাধাই মানলেন না। ঘণ্টা তিনেক পর তিনি তাঁদের কাছে ফিরে এলেন। এদিকে সেন্ট বেরেন তিন ঘণ্টা ধরে আকুল হয়ে কঁদে বুক ভাসিয়েছেন।

সেন্ট বেরেনের প্রশ্নের উত্তর মিস মোরনাস ঠোঁটের কোণে বিদূষের হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'শয়তানটা নিজের ব্যাভারের কথা শোনাবার জন্যই আমাকে ডাকিয়ে নিয়েছিল। আমাকে বিয়ে করে নাকি রানীর হালে রাখবেন। আমি ফৌস করে উঠলাম, এক মাস সময় তো দেওয়াই হয়েছে। তার আগে একথা তো বলা উচিত নয়। মুখে শয়তানের হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, 'বহুৎ আচ্ছা, এক মাস সময়ের ব্যাপারটাই তবে বহাল থাকবে। তবে ইতিমধ্যে রোজ বিকালে একবার করে এসে আমার সঙ্গে কিছুটা করে সময় কাটাতে হবে, মনে থাকে যেন।'

এবার থেকে মিস মোরনাস রোজ তিন ঘণ্টা করে হ্যারি কিলারের সঙ্গে কাটিয়ে রাখি আটটায় সহ-অভিযাত্রীদের কাছে ফিরে আসতে লাগলেন। সেখানে তিনি দেখতেন হ্যারি কিলার রোজ সন্ধ্যায় কাউন্সিলারদের নিয়ে সভা করেন। রাজা চালাতে গিয়ে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোর সূত্রে মীমাংসাই সভার আলোচ্য বিষয়। তার রাজা চালানোর মধ্যে কোনো অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যখন দেখলেন, হ্যারি কিলার মাঝে মাঝে কাউন্সিলারদের সঙ্গে কানে কানে শলা পরামর্শ করছেন। কিন্তু আলোচ্য বিষয় যে কি সে সম্বন্ধে মিস মোরনাস তিলমাত্র ধারণাও করতে পারলেন না। সবার শেষে হ্যারি কিলার একা আধ ঘণ্টার জন্য পাশের ছোট্ট একটা কামরায় চলে যান। তখন ঘরটার ভেতর থেকে কাতর আর্থবর ভেসে আসে। কে যেন অসহ্য যন্ত্রনায় হুটফুট করে।

নির্দিষ্ট সময় অন্তে হ্যারি কিলার ফিরে এলে মিস মোরনাস গ্লাসের পর গ্লাস মদ নিজে হাতে তাকে খাওয়ান। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে। একেবারে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। মিস মোরনাস একাধিক দিন ভেবেছেন, তার কোর্টের পকেট থেকে চাবিটা নিয়ে তালো খুলে দেখবেন, ছোট্ট কামরায় কে বা কারা রয়েছে। কিন্তু সাহস পান নি।

হ্যারি কিলার এক ঘণ্টারও বেশি সময় বেহঁস হয়ে পড়ে থাকে। তখন অনায়াসে তার বুকে ছুরি গেঁথে দেওয়া যায়, মিস মোরনাস মাঝে-মাঝে একথাও যে ভাবেন নি তা নয়, পর মুহূর্তেই ভেবেছেন, শয়তানটা তো একা নয়। ব্ল্যাকগার্ড, কাউন্সিলার আর মেরিফেলোরা তো রয়েই যাবে। অতএব তাকে খতম করে কি-ই বা ক্ষয়দা হবে।

কিন্তু শান্তি চুড়ি হলোও ব্ল্যাকল্যান্ড যে শেষপর্যন্ত তার দাম দেবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আর একমাত্র হ্যারি কিলারই ভাবছে, কয়েদিদের হত্যা বা কয়েদ করে রাখার চেয়ে মুক্তি দিলেই লাভ বেশি। অতএব তাকে বাঁচিয়ে রাখলে তাদের লাভের সম্ভাবনাই বেশি। তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে তার সহকর্মীদেরই মওকা। আপদ নিকেশ হলো তারা স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করতে পারবে। আর রাজ্যের যাবতীয় স্বাবর-অস্বাবর সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারবে। এক এক করে পাঁচটা দিন কেটে গেল।

অবশেষে এল আটাই এপ্রিল। রেড রিভারের লাগোয়া প্রসাদের ছাদের ওপর অভিযাত্রীরা জড়ো হয়েছেন। মিস মোরনাস হ্যারি কিলারের সেদিনের কাণ্ডকারখানা বলার জন্য সবে মুখ খুলেছেন। ইঠাৎ ছাদের এক ধারে খুপ করে একটা আগুয়াজ হল। সবাই অন্ধকারে স্থবিরের মতো বসে রইলেন। বুকের ভেতরে ধুকপুকানি শুরু হয়ে গেছে।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স সাহসে ভর করে উঠে গিয়ে একটা ছোট্ট পাথরের টুকরো কুড়িয়ে আনলেন। পাথরটার গায়ে দড়ি বাঁধা। সক্র দড়ি। সেটা ধরে টানতেই ত্রিশ ফুট মতো মোটা দড়ি উঠে এল। এক সময় সেটা আটকে গেল। দড়ির প্রান্তটা একটা শক্ত লোহার আঙুরের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে দেওয়া হল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দড়িটা বেয়ে উঠে এল টোনগানে। জানা গেল, সে হেলিপ্লেনের তীর সার্চ লাইটের এন্টিয়ারের বাইরে ছিল। ফলে সহজেই আত্মরক্ষা পান করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। অশ্বারোহী সৈন্যদের পিছনে এঁটুলির মতো লেগেছিল। দিনে ত্রিশ মাইল পথ দৌড়ে এতটা পথ অতিক্রম করে সে এখানে, ব্ল্যাকল্যান্ডে পৌঁছাতে পেরেছে। পথে একটা পরিত্যক্ত কুঁড়েঘরে এক গোছা দড়ি পেয়েছিল। আসার সময় সেটা সঙ্গে নিয়ে আসে। আশ্চর্য অন্ধকারে মনিবদের হাঁটাইটি করতে দেখে চুপি চুপি পাথর বেঁধে দড়ির প্রান্তটা ছুঁড়ে দেয়।

বাস, আর এক মুহূর্তও দেরি না করে অভিযাত্রীরা নেমে এলেন নিচে। টোনগানে রেড রিভারে একটা নৌকা বেঁধে রেখেছিল। চার-পাঁচ রাত্রি নৌকা চালালে দুষ্টো আশি মাইল পথ পাড়ি দেওয়া যাবে। সেখান থেকে সায়েরের অদূরবর্তী বিকিনি গ্রামে হাজির হওয়া যাবে, অভিযাত্রীরা তরতর করে নিচে নেমে গেলেন, টোনগানে সবার শেষে নামল। তারা নদীর পাড়ে হাজির হলেন, অন্ধকারে রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে। দশটার একটু বাদেই নৌকার নোঙর খোলা হল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে। সর্বনেশে কাণ্ডটা ঘটে গেল। নগরটাকে পিছনে ফেলে নৌকাটা এগিয়ে যেতে যেতে আচমকা কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। নদীর একূল-ওকূল জুড়ে পেতে রাখা হয়েছে একটা লোহার জাল, পাশেই সিবিল বডি আর মেরিফেলোর কোয়ার্টাল।

পালিয়ে যাবার রাস্তা বন্ধ। হ্যারি কিলার তো বলেছেই ব্ল্যাকল্যান্ডে কেউ একবার এলে তার পক্ষে আর জ্যান্ড পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। নদীপথ রাত্রির অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে জাল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ব্যাপার দেখে অভিযাত্রীরা হতোদ্যম হয়ে পড়লেন, নদীপথ ছাড়া স্থলপথে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা পাগলের প্রলাপ।

এখন উপায়? তবে কি তারা রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজা সাহেব হ্যারি কিলারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। না, যমলোকেও তাঁরা যেতে রাজি, কিন্তু শয়তানটার খপ্পরে আর নয়।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মাথা দিয়েই অত্যাশ্চর্য মতলবটা বেরোলো। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাই গুটিগুটি কারখানার দরজায় হাজির হলেন। মুঘলধারে বৃষ্টি পড়ছে। দ্বাররক্ষী নিজের জায়গা ছেড়ে গুমটির ভেতরে চলে গেছে। চুপি চুপি গুমটির মুখে ঢুকে সেন্ট বেরেন আচমকা পিছন দিক থেকে রক্ষীকে জ্ঞাপ্টে ধরলেন। টোনগানে আর আমিদি ফ্লোরেন্স তার মুখে জোর করে রুমাল গুঁজে দিয়ে বাকশক্তি রহিত করে দির্লেন। টোনগানে দড়িটা সঙ্গেই নিয়ে এসেছিল। সেটা দিয়ে তাকে পিঠমোড়া করে বেঁধে মেঝের কোণে ফেলে রাখল।

কাজ হাসিল করে পলাতক অভিযাত্রীরা এবার এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু হয় গুমটি ঘরটার ভেতরের দিকের দরজাতেও ইয়া পেলাই দুটো তালো খুলছে। ভাঙতে গেলে লোকজন ছুটে আসবে। উপায়ত্তর না দেখে সবাই

প্রাচীরের পা—ঘেঁষে হাঁটতে লাগলেন। সামনে পেলেন আর একটা দরজা। তালা ঝুলছে। হঠাৎ দেখলেন বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে এক বুড়ো ধীরপায়ে জল-কাদা বাঁচিয়ে ছোট-বড় পা ফেলে দরজাটার দিকেই এগোচ্ছে। প্রাচীরের সঙ্গে সঁটে সবাই লুকিয়ে রইলেন।

বুড়োটা এবার পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খোলার উদ্যোগ নিল। আটজন পলাতক অভিযাত্রী পা টিপে টিপে তার পিছনে এসে দাঁড়াল।

তালা খুলে দরজার পান্না সরতেই সবাই মিলে ঠেলে ধাক্কা বুড়োটাকে দিলেন ভেতরে ঢুকিয়ে। নিজেরা ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

মিস মোরনাস বৈদ্যুতিক টর্চ জ্বালতেই টোনগানে এবং অদ্ভুত বুড়োটা পরস্পরকে দেখে চমকে উঠলেন। বুড়োর পরিচয় হচ্ছে 'মারসেন ক্যাম্যারেট'। টোনগানে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করল, 'আরে, আপনি ক্যাম্যারেট।'

ক্যাম্যারেটের নামটা শোনামাত্র মিস মোরনাসও সচকিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। সবিম্বয়ে বলে উঠলেন, 'ক্যাম্যারেট তো আমার নিহত দাদার সহকর্মী ছিলেন। তবে কি ইনি সেই ক্যাম্যারেট।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স তাকে খামিয়ে দিয়ে বললেন, 'মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা—' ক্যাম্যারেট স্বাভাবিক স্বরেই বললেন, 'কথা? আমার সঙ্গে? ঠিক আছে আসুন আমার সঙ্গে।'

ক্যাম্যারেট পলাতক অভিযাত্রীদের নিয়ে বেশ বড় সড় একটা ঘরে ঢুকলেন। আগোছাল হলেও আলমারি, চেয়ার, টেবিল সবই ঘরটায় রয়েছে।

সত্যি ক্যাম্যারেট নামধারী অদলোক বিচিত্র চরিত্রের। একটু আগে জেটিতে পলাতক অভিযাত্রীদের অঙ্ককারে হাঁটাচাটি করতে দেখেও কিছু ভাবেন নি। তালা খুলতেই তাকে ঠেলে ধাক্কা ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে সামান্য অবাক হয়েছেন বটে। কিন্তু চৌকোমচি করেন নি। শিশুর মতোই সহজ সরল তার মন।

বারজাক ঘরে ঢুকেই ক্যাম্যারেটের কাছে সবিনয় নিবেদন রাখলেন, 'মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আমরা চরম বিপদাপন্ন। আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি। আমাদের প্রাণ বাঁচান। নইলে আমাদের—'

'বাঁচা? কার কাছ থেকে বাঁচাতে হবে?'

'অত্যাচারী দাঙ্কি হ্যারি কিলারের কবল থেকে।'

'সে কী হ্যারি কিলার অত্যাচারী! দাঙ্কি! এমন কথা তো আমার জানা নেই।'

'কই আমি তো—হ্যারি কিলার নগরের ব্ল্যাকল্যান্ড নামকরণ করেছেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, আর হ্যারি কিলার লোকটা অত্যাচারী—দাঙ্কি—হেরাচারী, নাকি পাগল সঠিক বলা মুশকিল। তবে কিছু না কিছু মাথায় পোষ তাঁর অবশ্যই আছে।'

একটা অত্যাচার্য্য ব্যাপার লক্ষ করা গেল। অভিযাত্রীদের পরিচয় জানার কিছুমাত্র আগ্রহও অদ্ভুত মানুষ ক্যাম্যারেটের মধ্যে লক্ষিত হল না।

বারজাক আবার মুখ ঝুললেন, 'একটা কথা, টোনগানে তো আপনার দীর্ঘদিনের পরিচিত, তাই না? আপনি নিজে তো একজন ফরাসি, ঠিক কিনা?'

'যে কথা বলতে চাইছি, ফরাসি পডর্নমেন্টের হুকুমে একটা কমিশন মিশরে আসে। বারজাক কমিশন। আমি নিজেই সে কমিশনের পরিচালক। আর এই সঙ্গীরা আমার সহযোগী। হ্যারি কিলার কেবলমাত্র যে আমাদের পথই আগলাচ্ছেন তাই নয়, আমাদের ওপর অত্যাচারও চালাচ্ছেন। আসলে তাঁর গোপন কাণ্ড-কারখানার কথা ইউরোপের কেউ জানতে না পারে। এমন কি এখানে কয়েদখানায় আমাদের পুরে রেখেছেন।'

'এ কি করে হয়! ইউরোপের কাছে এখানকার কথা গোপন থাকার তো কথা নয়। এখানকার যেসব কর্মী দেশে ফিরে যাচ্ছে তারা অবশ্যই সেখানে এসব কথা বলছে ও বলেছে।' না। এমন কথা ভাবাই যায় না—ভাবতে উৎসাহই পাওয়া যায় না।'

'তবুও সম্পূর্ণ সত্য। আপনাকে তো বললামই, হ্যারি কিলার আমাদের ওপরও অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। এমন কি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। আরও আছে, নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিতে গিয়ে একজন নিম্নোকে শূন্য থেকে আছড়ে ফেলে আর অন্যজনকে আকাশ—টর্পেডো মেরে খুন করেছে।'

মারসেন ক্যাম্যারেট যেন আচমকা হোঁচট খেয়ে সবিং ফিরে পেলেন। বাস্তব জগতের স্বাসরুদ্ধ হওয়া পাশবিকতার কথায় তিনি যেন আচমকা ভাবনার জগৎ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। এমন একটা মানুষ নামধারী নরপিশাচের সঙ্গে এতদিন কাটিয়েছেন ভেবে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল।

এবার বারজাক বললেন, 'এমন জঘন্যতম কাজ যে করেছে সে নির্যাত আরও অনেক, অনেক দুর্কর্ম করেছে যা আমাদের ধ্যানধারণা বহির্ভূত। একটা কথা ভেবে পাচ্ছি নে মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, হ্যারি কিলারের মগজ তো মদ আর অপকর্মের চিন্তা ভরনায় ভাঁতা হয়ে গেছে। তাই যদি হয় তবে মক্ভূমির বুকো ব্ল্যাকল্যান্ডের মতো শহর, কারখানা, চাষের জমি, টেলিফোন-ব্যবস্থা প্রভৃতি সৃষ্টির মূলে কার অবদান রয়েছে?'

ক্যাম্যারেট চোখে-মুখে বিরক্তির ছাপ একে বললেন, 'হ্যারি কিলারের কিছুই করার ক্ষমতা নেই। তবে হ্যাঁ, গোয়ার্ডুমিই তার চরিত্রের একমাত্র স্বল। ব্ল্যাকল্যান্ডে যা কিছু দেখছেন সবই আমার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে। আমিই এর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা।'

ডক্টর চেতোন সবিম্বয়ে বললেন, 'সে কী! নিজের যাবতীয় সৃষ্টি আপনি ওই নরপিশাচ হ্যারি কিলারের হাতে ভুলে দিলেন! আপনি ভুলেও ভাবেন নি, হ্যারি কিলার আপনার সৃষ্টিকে কোন্ কাজে লাগিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে? এরকম একটা নগর প্রতিষ্ঠার চিন্তাই বা আপনার মাথায় আসার কারণ কি?'

'খ্যৎ সাহেব! ব্ল্যাকল্যান্ড পত্তনের চিন্তা আমার মাথায় আসতে যাবে কেন? এ তো পুরোটাই হ্যারি কিলারের

পরিকল্পনা। আমি এর রূপকার মাত্র। শুনুন তবে বলছি—একবার জর্জ ব্রেনন নামে এক ক্যাপ্টেন ইংরেজ সেনাবাহিনী নিয়ে অফ্রিকা অভিযানে আসেন। আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। টোনগানে ছিল সে-বাহিনীর সার্জেন্ট। আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। পৃথিবীর জলভাগ, পর্বত প্রভৃতি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে তখন আমি লিপ্ত ছিলাম। দুমাস বাদে পথে একসময় আমাদের অভিযানে যোগদেন হ্যারি কিলার। ব্যস, তার পর থেকে আমরা একে অন্যের কাছাকাছি পাশাপাশি রয়েছি।

এবার মিস মোরনাস মুখ খুললেন, 'দলে যোগদানের পর সুচতুর ও কূটনীতিজ্ঞ হ্যারি কিলার এসে ক্যাপ্টেন ব্রেননকে কোণঠাসা করে নিজে তাঁর জায়গা দখল করে বসলেন, ঠিক কি না?'

'এখবর আমি রাখিনি। আসলে আমি সর্বদা নিজের চিন্তার জগতে ডুবে থাকতাম। তারপর কি বলছি, শুনুন—আটচল্লিশ ঘণ্টা ব্যক্তিগত অভিযান সেরে আমি একদিন তাঁবুতে ফিরে তাজ্জব বনে গেলাম, দেখি, সৈন্য-সামন্ত আর যন্ত্রপাতি সবই বে-পাতা হয়ে গেছে। কেউ নেই—কিছু নেই। হতাশ হয়ে পড়লাম। একা মনমরা হয়ে বসে। হঠাৎ হ্যারি কিলার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ক্যাপ্টেন ব্রেনন সবাইকে নিয়ে উপকূলের দিকে পাড়ি জমিয়েছেন। আমার সঙ্গে কুড়িজন লোক রয়েছে। উপায় নেই। চলুন, বাকি পথটুকু আমরাই অভিযান চালাই। আমি নিরুপায়। অনন্যোপায় হয়ে তাঁর সঙ্গে নিতেই হল। পথ পাড়ি দিতে দিতে আমার মাধ্যম উকি দেওয়া কয়েকটা পরিকল্পনার কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করি। তিনি শেষমেশ আমাকে এখানে হাজির করলেন।

আমাকে একদিন বলল, 'আপনার যা মন চায় করুন, আমি আপনার পিছনে। আছি। ব্যস, আমি এবার আবিষ্কারের কাজে মেতে গেলাম।'

মিস মোরনাস বললেন, 'আপনি যে সব ঘটনার কথা জানেন না, অবশ্য জানার কথাও নয়। কারণ, আপনি যে অন্য জগতের লোক। যাক, হ্যারি কিলার অভিযানে যোগ দেওয়ার পর থেকে অভিযাত্রীরা মারদাঙ্গা, খুন-খারাপি আর লুণ্ঠ-তরাজ সমানে চালিয়ে যেতে লাগল। সৈন্যদল হয়ে উঠল লুণ্ঠেরা।'

'মানতে পারছি না। আমার চোখে কি তবে কিছুই পড়ত না?'

'এখানকার ভয়ঙ্কর সব ঘটনা তো কিছুই আপনার চোখে পড়ে নি। দশো বছর ধরে, আপনার উপস্থিতিতে, আপনার সামনেই বহু বহু নারকীয় কাণ্ড ঘটেছে। অথচ শয়তানটা কিন্তু আপনার শক্তিতেই শক্তিদ্বর, ঠিক কিনা? সত্য তো সর্বদাই সত্য থেকে যায় মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট।'

'তলে তলে এত কিছু ঘটে অথচ আমি কিছুই জানতে পারলাম না!'

'হ্যারি কিলারের প্ররোচনায় ও সক্রিয় অংশগ্রহণে নৃশংস ঘটনাবলীর কথা ইউরোপে পৌছে যায়। সভ্যজগৎ লজ্জায় মুখ ঢাকে। সশস্ত্র সৈন্যদল পাঠানো হয় ক্যাপ্টেন ব্রেননের লুণ্ঠারাদের দমন করার জন্য। তারা লুণ্ঠারাদের ধ্বংস করে। তাই আপনি ব্যক্তিগত অভিযান থেকে ফিরে তাঁর ফাঁকা দেখেছিলেন। ক্যাপ্টেন ব্রেননকে খুন করা হয়েছে। ছুরির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।'

'সে কী! তাকে খুন করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। দেখুন আমি মিস মোরনাস ছদ্মনাম ধারণ করে এখানে রয়েছি। আমার আসল নাম জেন ব্রেনন। ক্যাপ্টেন ব্রেননের ছোট বোন আমি। আমার দাদা যে নিরপরাধ তা প্রমাণ করার জন্যই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এ পর্যন্ত ছুটে এসেছি। দাদার নামে সারা ইউরোপে যে সব কুকর্মের কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবই যে মিথ্যা তা প্রমাণের জন্যই আমার এ কষ্ট স্বীকার, এবার ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। অন্য একজন আমার দাদার নামে ডাকাতি খুনখারাপি করে শেষপর্যন্ত সে-ই তাকে গুম করে দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে জামার তলা থেকে একটা ছোরা বের করে মিস মোরনাস এবার বললেন, 'হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমার দাদাকে পিছন থেকে আঘাত করে খুন করেছে। দাদার কবর খুঁড়ে তার কঙ্কাল থেকে এ ছোরাটাকে উদ্ধার করেছি। হাতলে খুনির নাম লেখা ছিল। সবগুলো অক্ষর নেই। এখন বুঝতে পারছি, পুরো নামটা ছিল 'হ্যারি কিলার।'

ক্যাম্যারেট আতঙ্কে উঠে বললেন, 'কী সাম্রাজ্যিক ব্যাপার! কী সাম্রাজ্যিক কাণ্ডের বাবা! আমি এসবের কিছুই জানি না!'

মিস মোরনাস এবার বললেন, 'কি ভাবছেন মঁসিয়ে ক্যাম্যারেট, আমরা আপনার কাছে আশ্রয় পাব তো?'

'অবশ্যই এমন জঘন্যতম অন্যায় যে করেছে তার সঙ্গে সমঝোতার আর প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা যে আমার আশ্রয়ে রয়েছেন একথা হ্যারি কিলার জানে না। আর যদি জানেও তবু আপনারদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই।'

ক্যাম্যারেট পলাতক অভিযাত্রীদের নিজের আশ্রয়ে রেখে দিলেন।

সকালে ক্যাম্যারেট হাসিমুখে অভিযাত্রীদের কাছে এলেন। বিনম্র বিনয়ে বললেন, 'ভাইসব, এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' কথা বলতে বলতে হাতের কাছে একটা বোতাম টিপ দিলেন। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কারখানায় ঘণ্টা বাজতে শুরু হল।

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানায় হাজির হলেন। তার নির্দেশে শ্রমিকদের হাজিরা খাতা খুলে রিগড নাম ডাকল। দেখা গেল, সবাই উপস্থিত।

ক্যাম্যারেট এবার শ্রমিকদের কাছে আগন্তুক অভিযাত্রীদের পরিচয় দিলেন তারপর গতরাতে শোনা হ্যারি কিলারের নৃশংস কাণ্ডকারখানার কথা সবিস্তারে তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন।

শ্রমিকরা ডিরেক্টরকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। তাঁর কোনো কথা অবিশ্বাস করার মতো ইচ্ছা তাদের নেই।

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, 'একজন খুনি ডাকাতিতে আমরা না জেনে সাহায্য করে যাচ্ছি। এর প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে। বারজাক কমিশনের কোনো অভিযাত্রীর ওপর অত্যাচার করা বা বন্দি করে রাখার কোনো অধিকার জ্ঞাদ হ্যারি কিলারের নেই। আরো গভীর রহস্য হচ্ছে, মরুভূমির কেন্দ্রস্থলে যে এমন নগর ও কারখানা গড়ে তোলা হয়েছে তা

ইউরোপের মানুষের কাছে অজ্ঞাত। এখানে কাজ করতে করতে বাড়ির জন্য, আপনজনের সান্নিধ্য লাভের জন্য প্রত্যেকেরই মন কাঁদে। তোমাদেরও একই অবস্থা। কালরাত্রি হিসাব করে দেখছি, মোট একশো সাইক্লিস্ট জন শ্রমিক-কর্মচারী কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে। তাদের দুচার জনও যদি দেশে পৌঁছতে পারত তবে এখানকার কাণ্ডকারখানার কথা সারা ইউরোপে প্রচার হয়ে যেত। তবে কি এটাই মনে করা যেতে পারে, একশো সাইক্লিস্ট জনের এজনও শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি? তাদের পরিণাম কি হয়েছে, তোমাদের আর খোলসা করে বলার দরকার আছে বলে মনে করি না। হ্যারি কিলার আমাদের কাউকেই শেষপর্যন্ত দেশে পৌঁছতে দেবে না। অতএব আমাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহে সোচ্চার হতে হবে।

উত্তেজিত শ্রমিক সমন্বরে বলে উঠল, 'আমরা আপনার সঙ্গে আছি। বুদ্ধি দিন, কোন্ পথে, কীভাবে আমাদের অগ্রসর হতে হবে।'

শ্রমিকদের আশ্বাস দিয়ে ক্যাম্যারেট কারখানা থেকে বেরিয়ে অভিযাত্রীদের নিয়ে নিজের বাসভবনে ফিরে এলেন। ঠিক তখনই হ্যারি কিলারের ফোন এল। কথা বললেন। ফ্রেডলের ওপর রিসিভারটা রেখে বললেন, 'হ্যারি কিলার ফোন করেছিলেন, আপনারা যে আমার আশ্রয়ে রয়েছেন তা সে জেনে গেছে, টোমৌকি নামে এক কর্মচারী খবরটা তাকে দিয়েছে।'

বারজাক তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের আত্মরক্ষার জন্য রাইফেল দিন।'

মুচকি হেসে ক্যাম্যারেট বললেন, 'রাইফেল আর পিস্তল এখানে পাওয়া যায় না। ওসব দিয়ে কাজ হবার নয়। অন্যভাবে, অন্যপথে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হবে। একটা কথা জানবেন, আমি চাইলে নগর, কারখানা আর সবকিছু চোখের পলকে উড়িয়ে দেওয়ায় হিম্মৎ রাখি। আর আমার ক্ষমতার কথা হ্যারি কিলারের অজানা নয়। তা ছাড়া কারখানার অর্ধেকটাই শেল—পুফ। কামান দেগে এর একচুল ক্ষতিও করা সম্ভব নয়। আর কারখানাটাই তার সব শক্তির মূল।'

ঠিক তখনই একটা চাপা গুম্ গুম্ শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তকাল উৎকর্ষ হয়ে শুনে ক্যাম্যারেট বললেন, 'ওই দেখুন, শয়তানগুলো দরজা ভাঙার জন্য প্রাণান্ত প্রয়াস চালাচ্ছে। কিন্তু ভাঙা সম্ভব নয়।'

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানার নিরাপত্তা-ব্যবস্থাদি দেখালেন। প্রাসাদ-দুর্গে যেমন একটা সাইক্লোসকোপ আছে ঠিক তেমনি এখানেও একটা রয়েছে। এটা বসানো হয়েছে পাইলনের মাঝামাঝি জায়গায়। ক্যাম্যারেট অভিযাত্রীদের নিয়ে সাইক্লোসকোপটার ভেতরে ঢুকে গেলেন। সেটা দেখাতে গিয়ে বললেন, 'প্রাসাদ-দুর্গের সাইক্লোসকোপটার মতো এটা দিয়ে বেশি দূরবর্তী অঞ্চলের জিনিস দেখা যায় না। প্রাসাদ-দুর্গের বিভিন্ন কোণে কৌশলে কতগুলি আয়না বসানো রয়েছে। কারখানার প্রাচীরের তলদেশ পর্যন্ত আয়নাগুলোতে প্রতিফলিত হয় এটাতে তা দেখা যায়। আমি এ ব্যবস্থায় দেখতে পেয়েছি হ্যারি কিলার কারখানার ভিতরে লোক ঢোকাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। বহুৎ আচ্ছা। মেরিফেলেরা মই বেয়ে উঠে প্রাচীরের মাথা স্পর্শ করা মাত্র নাচানাচি জুড়ে দিল। যেন আঠায় তাদের হাত আটকে গেছে। সবাই পুতুলের মতো শূন্যে ভাসছে। নিরেট বোকা তারা। বিদ্যুৎ পরিবাহিতা শক্তি যার তামার চেয়ে একশো গুণ বেশি আমার আবিষ্কৃত এমনই এক রকম ধাতু দিয়েছি। তাতে এ. সি. বিদ্যুৎ চালিয়ে দিয়েছি। পরিণাম তো নিজের চোখেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তারপর ঘটল আরও অবিশ্বাস্য কাণ্ড। যারা মাটিতে ছিল তারা ওপরের লোকগুলো স্পর্শ করামাত্র আরও অত্যর্শ্ব নাচ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু হাত ছাড়িয়ে নেবার উপায় নেই।

'এবার আরও আশ্চর্যজনক একটা খেলা দেখুন।'

কথা বলতে বলতে ক্যাম্যারেট একটা বোতামে টিপ দিলেন। বাস, সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত লোকগুলো দুম দাম পড়তে লাগল।

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, 'এর রহস্য কি জানেন? ইথারের মধ্যে যাবতীয় শক্তি বিশেষ বিশেষ কয়েকটা কল্পনামাত্র। বিশেষ এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের কম্পনের ফল আলো। বিদ্যুতেও একই—একমাত্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য স্বতন্ত্র প্রকৃতির। আমি মনে করি শেষের কম্পন আর তাপমাত্রার মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু প্রকৃতির কারণটা যে কি তা আমিও জানতে পারি নি। কিন্তু ইথারের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করতে আমি সক্ষম, প্রমাণ তো চোখের সামনেই পেলেন।'

সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ক্যাম্যারেট বললেন, 'এবার যারা দরজা ধাক্কাধাক্কি করছে তাদের একটু তামাশা দেখানো যাক, চলুন।'

ক্যাম্যারেট এবার টেলিফোন ট্রান্সমিটার তুলে বললেন, 'বিগড তৈরি হয়েছে? ঠিক আছে ছেড়ে দাও।'

কথাটা শেষ হতে না হতে দুর্গটার দিক থেকে চোঙের মতো অত্যর্শ্ব একটা যন্ত্র বেরিয়ে এল। একটা মুখ মোচার অগ্রভাগের মতো হুঁচালো। বিচিত্র দর্শন চোঙটার পিছনে চারটে প্রপেলার লাগানো। সবকটা তীব্রবেগে ঘুরছে। এবার শূন্যে, অনুভূমিক অবস্থায় প্রাচীরের গা বরাবরা উড়ে যেতে লাগল। একই রকম বিচিত্র দর্শন একের পর এক বেরিয়ে একই দিকে উড়ে যেতে লাগল। পর পর কুড়িটা যন্ত্র। এবার সেগুলো থেকে লাখে লাখে ভিন্নরঙের বেরিয়ে হানাদারদের মাথার ওপর ভন ভন করে চক্রর মারতে লাগল। আসলে এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি সেগুলো, তাদের পিছনে উড়ে এল আর এক ঝাঁক। তার পেছনে আর এক জাঁক। হানাদাররা গুলির ঘায়ে কাবু হয়ে বিকট আত্ননাদ করতে করতে যে, যেদিকে পারল চোঁ চোঁ দৌড় দিল।

ক্যাম্যারেট এবার আগন্তুক অভিযাত্রীদের কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। তাদের সামনের কারখানার পূর্ণাঙ্গ নকসটা মেলে ধরলেন। কারখানাটার দৈর্ঘ্য তিন'শ ষাট গজ আর প্রস্থ আড়াইশো গজ, ক্ষেত্রফল ষাট বিঘা। রেড রিভারের তীর বরাবর এর অবস্থান। ষাট বিঘার প্রায় ছত্রিশ বিঘাই বাগান। সেখানে খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা হয়। বাকি খাদ্যবস্তু বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, আর জেটির লাগোয়া জমিতে আড়াইশো গজ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট জমির ওপর

কারখানাটা গড়ে তোলা হলেছে। তারই মধ্যে রয়েছে চৌদ্দটা চারতলা বাড়ি। একশো কুড়িটা ফ্ল্যাট। একশো লোক বৌ-ছেলেপুলে নিয়ে বাস করে।

ক্যাম্যারেট এবার তাঁদের নিয়ে কারখানার নিচের তলায়, যেখান থেকে ভিন্নরঙের উড়ছে সেখানে গেলেন। ভিন্নরঙের ছোট ছোট কামরাগুলোর পাশেই গোলা-বারুদের গুদাম। সেগুলোর ওপর দিয়ে এবার হাজির হলেন সারিবদ্ধ গ্যারাজপে।

এগুলোতে ঢালাই থেকে শুরু করে ফিটিং পর্যন্ত আলাদা আলাদা যাবতীয় বিভাগ রয়েছে।

কারখানা থেকে বেরিয়ে বাগানে আসতেই দেখা গেল প্রাসাদ-দুর্গের চূড়ায় দাঁড়িয়ে হ্যারি কিলার তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আচমকা বিকট আওয়াজ করে একটা বুলেট অভিযাত্রীদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল।

ক্যাম্যারেট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বলে উঠলেন, 'এক্কেবারেই বোকা হাঁদা দেখছি!' কথা বলতে বলতে ডান-হাতটা শূন্য তুলে ইশারা করলেন। প্রাসাদ-দুর্গের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন। দেখা গেল প্রাসাদ-দুর্গের চূড়ার সাইক্লোসকোপটা যেন কর্পুরের মতো উবে গেছে।

ক্যাম্যারেট বললেন, 'বাছান এতেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবে। সাইক্লোসকোপ আর আকাশ টর্পেডো যাই বলা হোক না কেন সবই তো আমারই আবিষ্কার। ওদের চেয়ে আমার শক্তিই কিন্তু বেশি মনে রাখবেন।'

ক্যাম্যারেট এবার আগভুক্ত অভিযাত্রীদের নিয়ে নিরাপদে বাগানটা অতিক্রম করলেন। এবার সবাইকে নিয়ে তিনি পাওয়ার হাউসে গেলেন। ইতিপূর্বে কাঠ পুড়িয়ে বয়লার চালানো হত। তাতে অনেক হাস্যাম। তাই এখন আকাশ থেকে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে, নদী সৃষ্টি করে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ছ' মাইল দূরে, নদীর ওপর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটা গড়ে তোলা হয়েছে। ধোঁয়া নেই বলে চিমনির প্রয়োজন হয় না। জেনারেটর থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতে দরকার মেটানো হয়।

ক্যাম্যারেট এবার সবাইকে নিয়ে অস্ত্রকারখানায় নিয়ে গেলেন। ট্রান্সফরমার, ডায়নামো, অলটারনেটর আর কয়েলে বোঝাই ঘরটা। উৎপাদিত বিদ্যুতের সাহায্যে তিনি অস্ত্রপাতি তৈরি করেন। যন্ত্রপাতির মধ্যে অধিকাংশই তিনি নিজ হাতে তৈরি করে নিয়েছেন, বাকি প্রয়োজনীয়টুকু বাইরে থেকে আনানো হয়েছে। আর এত সব কাঁচামাল যে কোথেকে আসছে সে খবর তিনি রাখেন। চাহিদা অনুযায়ী হ্যারি কিলার সরবরাহ করেছেন। আর যাবতীয় অর্থও তিনিই জোগাড় করেছেন।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স চোখ দুটো রীতিমতো কপালে তুলে বললেন, 'হ্যারি কিলার এমন অচেন অর্থ পেলেন কোথায়। তাঁর কি টাকার গাছ আছে নাকি!'

'ধ্যুং ছাই! এসব নিয়ে আমি কোনোদিন মাথা ঘামিয়েছি নাকি যে বলব? যা বলতে চাচ্ছি, দেখাতে চাচ্ছি দেখে যান। প্রশ্ন যা কিছু পরে করবেন।' এবার অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এটা কমপ্রেসার্স। বহু রকম তরল গ্যাস আর তরল বাতাস এখানে ব্যবহার করা হয়। যাবতীয় গ্যাসই তরল অবস্থায় নিয়ে আসা হয়। গ্যাসকে নির্দিষ্ট চাপ ও তাপে রাখলে তরল হয়ে যায়। চাপ বিচ্ছিন্ন করলে আবার তা তরল অবস্থা থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু আমি একটি পাত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে তা আর হতে দিই নি। আর একটা আবিষ্কার যাকে সম্পূর্ণ অ্যান্টি-ডায়াক্সারসিক—যার ভেতরে তিলমাত্র উত্তাপও প্রবেশ করতে পারে না। এটা দিয়ে তৈরি করে গ্যাস বা তরল রেখে তাদের তাপমাত্রার পরিবর্তন কিছুমাত্রও হয় না। তরল গ্যাস—গ্যাসীয় অবস্থায় ফিরে এসে পাত্রটাকে ফাটিয়ে দিতে পারে না। তারপর এ-আবিষ্কারকে কাজে লাগলাম। হেলিপ্লেন, এটাও আমারই সৃষ্টি। এটার তিনটে বৈশিষ্ট্য বর্তমান—স্থির থাকা, আকাশে ওড়া আর অনবরত তিন হাজার মাইল ওড়ার ক্ষমতা। মোদা কথা এর চলনশক্তিকে মোটিভ পাওয়ার বলা হয়।

এবার বলছি, কীভাবে হেলিপ্লেন স্থির অবস্থায় থাকে। জীববিজ্ঞানীগণ যাকে রিফ্লেক্স-অ্যাকশন বলে আমি তা এতে প্রয়োগ করেছি। পাইলনের ওপরের দিকে এক জোড়া ডানা আপনারা নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন। তবে সবার মূলে কাজ করছে ভারকেন্দ্র-হ্রাস করার উপায়। পাইলন ডানার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্যবহার করা হয় নি। পাইলন শীর্ষ বিন্দুকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনে সামান্য দুলতে পারে, কীভাবে? আসলে উচ্চতা ও দিকনির্দেশি হালের বাধা থাকার ফলেই এটা সম্ভব হয়। এর ফলে কম-বেশি ঝাঁকুনি লাগলে বুঝা যায় না।

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা শুনুন, ভূমি থেকে আশমানে ওড়ার ক্ষমতা বলতে চাইছি। টেক-অফের সময় ডানা দুটো নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, পাইলনের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়। তখন অনুভূমিক অবস্থায় প্রপেলার ভ্রুত্ব করে ঘুরতে আরম্ভ করে। এর ফলে হেলিকপ্টার হেলিপ্লেনে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রপেলারের জন্যই উড্ডয়নটা শূন্য ভেসে থাকতে পারে। অনেকটা ওপরে উঠে গেলে ডানা দুটো ছড়িয়ে পড়ে। আর তখনই প্রপেলার সামনের দিকে ঝুঁকে যায় এরই ফলে হেলিপ্লেনটা এরোপ্লেনে রূপান্তরিত হয়। হেলিপ্লেনের গতিবেগ ঘণ্টায় আড়াইশো মাইল। জ্বালানী বোঝাই করে নিলে একনাগাড়ে তিন হাজার মাইল পথ পাড়ি দিতে পারে।'

ক্যাম্যারেট এবার অভিযাত্রীদের নিয়ে কারখানার প্রধান কেন্দ্রে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, 'আমরা টাওয়ারের যে তলায় অবস্থান করছি, আমাদের মাথার ওপরে এরকমই আরও পাঁচটা তলা রয়েছে। সবগুলোই এমনই সব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতিতে ভরা। টাওয়ারের ওপরে সে অতিকায় পাইলনটা রয়েছে সেটা আমার ওয়েভ-প্রোজেক্টর। ব্যাপারটা খোলসা করে বলছি, হার্জ-জার্মানি বৈজ্ঞানিক। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, ইনডাকশন তার থেকে একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক যদি একটা কনডেনসারের টার্মিনাল পয়েন্টে দুটো ছিদ্র দিয়ে চালিয়ে দিলে স্পার্কের জন্য যন্ত্রটার মেরু দুটোর ভেতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। কারো কারো কাছে কনডেনসার অসিলেটর নামে পরিচিত। এবার পয়েন্ট দুটোর মধ্যে যে-দোলনের উদ্ভব হল তা পয়েন্ট দুটোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। ইথারেও আলোড়ন সৃষ্টি করে।'

ইথার কি? কাকে আমি ইতার বলতে চাইছি, শুনুন—সে গ্যাসীয় পদার্থের কথা বলছি। যা ওজনহীন, লঘু এবং অনুভূত হয় না তা কিন্তু এক নক্ষত্র থেকে অন্য একটা নক্ষত্রের মধ্যবর্তী মহাশূন্য থেকে আরম্ভ করে বস্তুর মধ্যস্থিত এক কোষ থেকে অন্য কোষের মধ্যবর্তী শূন্যস্থানকে পূর্ণ করে রেখেছে। প্রত্যেকটা প্রতিটা দোলন অনুরূপ ইথারিয় অনু

ভাইব্রেশনের উদ্ভব ঘটায়। এই ভাইব্রেশনই ইজিয়ান ওয়েভ নামে পরিচিত। এ ওয়েভকে বাস্তবে প্রয়োগ করার কথা কারোর মাথাতেই এতদিন আসে নি। বলতে দ্বিধা নেই, সর্বপ্রথম আমিই ব্যবহার করেছি।

ইতিপূর্বে বহু বিজ্ঞানীই লক্ষ করেছিলেন, আলোকরশ্মি যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়, এ-ওয়েভকেও প্রতিফলিত করা সম্ভব। লক্ষ করলে কী হবে, কারোর পক্ষেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। প্রাচীরের মাথায় আমার আবিস্কৃত যে সুপার কনডাকটিভ মেটার ব্যবহারের এমন রিসিফার নির্মাণ করেছি, সে যেকোন দিকে আমি ওয়েভসের সম্পূর্ণ শক্তিকে সংহত করতে সক্ষম। আকাশ পথে পাড়ি দেওয়ার সময় একতিল শক্তিও অপচয় না হওয়ার জন্য শুরুতে যা ছিল শেষেও তা-ই থেকে যায়। এবার রিসিভার তৈরিতে হাত দিলাম, ওয়েভ যে ফ্রিকোয়েন্সিতে সৃষ্টি হয় সেই একই ফ্রিকোয়েন্সি সম্পন্ন রিসিভার তৈরি হওয়া চাই। এই রিসিভারকেই আমি বহু কাজে ব্যবহার করে নগরটাকে অত্যাশ্চর্য করে তুলেছি।

অভিয়াতীরা এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো ক্যাম্যারেটের বস্তু গুনছিলেন। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বারজাক বলে উঠলেন, 'এবার বলুন তো, আপনি এখান থেকে নগরটাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারেন?'

ক্যাম্যারেট বললেন, 'অবশ্যই। এক তুড়িতে উড়িয়ে দিতে পারি। হ্যারি কিলারের ইচ্ছা অনুযায়ী আমি অজেয় নগরটা তৈরি করে দিয়েছি। কারখানা, বাড়িঘর প্রভৃতি প্রত্যেকটার তলায় এমন উচ্চশক্তি সম্পন্ন বারুদ রেখে দিয়েছি, আর এমন বিস্ফোরক লাগিয়ে রেখেছি যার সঙ্গে বিশেষ প্রকৃতির ওয়েভের সিনটোনাইজেশন আছে। আর সে ওয়েভের কথা আমি ছাড়া আর কোরোরই জানা নেই। এখান থেকে ওয়েভ চালান করে দিলে একটার পর একটা মাইন ফাটতে থাকবে। ব্যস, মুহূর্তে সব কিছু ছারখার হয়ে যাবে।'

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স দিনলিপি পাতায় ঘটনাবলী লিখতে লিখতে বললেন, 'তা যদি হয় তবে হ্যারি কিলারের হবিতম্ব বন্ধ করে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।'

মুচকি হেসে ক্যাম্যারেট বললেন, 'ওয়েভ বেশি দূরে পাঠাবার দরকার দেখা দিল আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত ঘটানোর তাগিদে। একদিন আমার এ-পরিচালনার কথা শুনে হ্যারি কিলার আমাকে সার্বিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। মেঘ লক্ষ করে আমি বিস্ফোরক পাইলনের সাহায্যে দিলাম ওয়েভ পাঠিয়ে। তড়িৎ প্রবাহের মাধ্যমে মেঘের জলরাশিকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করি। তখন মেঘের পক্ষে জল ধারণের আর ক্ষমতা থাকে না। মাটির ভেতরের প্রবল শক্তি এবং আকাশের পাশাপাশি দুটো মেঘ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে—অল্পক্ষণের মধ্যেই তা ঘটে যায়। তখনই ঝড়ের উদ্ভব ঘটে, বৃষ্টিপাত ঘটতে থাকে। এভাবেই আমি অনূর্বর মরুভূমিকে উর্বর করে তুলি।

তবে হ্যাঁ, আকাশে মেঘ না থাকলেও আর্দ্র আবহাওয়াতেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সম্ভব। আজ না হোক কাল মেঘ জমবেই। সমস্যা হয় তা এখানে বৃষ্টিপাত না ঘটিয়ে ভাসতে ভাসতে অন্যত্র চলে যায়। তা থেকে জলরাশি নামানো আমার কাজ। সমস্যা আছে, উপায়ও বের করেছি।

দেখুন, আপনারা লক্ষ্য করতে পারছেন না বটে, কিন্তু এখনই পাইলনের শীর্ষদেশ থেকে ওয়েভ ছুটে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। এদের হরেক রকম কাজে লাগানো সম্ভব। বিনা তারে পৃথিবীপৃষ্ঠে টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা পত্তনের কথা আমি ভাবছি। কায়দামত একটা রিসিভার তৈরি করে নিতে পারলেই তারের কোনো দরকার পড়বে না। আমার এ গবেষণার কাজ প্রায় শেষের দিকে। সাধারণ টেলিগ্রাফে মর্স যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।' এবার একটা যন্ত্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বললেন, 'এটা একটা বিশেষ ধরনের সার্কিট। এটাকে তড়িৎ প্রবাহের পথে বসিয়ে দিয়েছি। বোতাম টেপামাত্র সার্কিট ওয়েভ সৃষ্টিকারী তড়িৎ সাংযোজন ঘটবে। মার্স-চাবি নামানো থাকলে পাইলন থেকে ওয়েভ যাবে। মার্স-চাবি তোলা থাকলে কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভ পাঠানো সম্ভব নয়। রিসিভারটায় রিসিভার রয়েছে জানা না থাকলে এ বোতামটা টিপে রিসিফটরকে লাইন থেকে বাদ দিয়ে দিলেই কাজ মিটে যাবে। কোথাও রিসিভার থাকলে সেখানে আমার টেলিগ্রাফের বার্তা পৌঁছে যাবে।'

মিস মোরনাস ভুরুদুটো কুঁচকে বললেন, 'টেলিগ্রাফের ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে একটু খোলসা করে যদি বলেন—' 'দেখুন, টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদের জানা আছে বোতাম টিপে কীভাবে মার্স-হরফ পাঠানো হয়। মনে করুন কোথাও একটা রিসিভার রয়েছে, এবার বলুন কার কাছে টেলিগ্রাফ পাঠাতে চাচ্ছেন!'

খতমত খেয়ে মিস মোরনাস বলে উঠলেন, 'মনে করুন ক্যাপ্টেন মারসিনেকে—'

'তাঁর ঠিকানা?'

'হয়ত এখন টিম্বাকটুতে।'

বার কয়েক বোতাম টিপে ক্যাম্যারেট বললেন, 'এবার বলুন তার কাছে কি খবর পাঠাতে চাইছেন?'

'তিনি আমাকে জেন মোরনাস নামে জানেন।'

'এটা কোনো সমস্যাই নয়। আসলে এ খবর তাঁর কাছে আদৌ পৌঁছাবে না। তবে খবর পাঠাচ্ছি-মিস জেন মোরনাসকে ব্ল্যাকল্যান্ড থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যান।'

আরে ব্ল্যাকল্যান্ড তো দুনিয়ার কাছে অজ্ঞাত। তবে ঠিকানার পরিবর্তে বলছি—১৫ ডিগ্রি ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ। আর দ্রাঘিমা—'

হ্যারি কিলার কারেন্ট বন্ধ করে দিল যে! একটু আগে আপনাদের বলেছিলাম, এখান থেকে ছ' মাইল দূরবর্তী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এখানে কারেন্ট সরবরাহ করা হয়, মনে আছে তো? হ্যারি কিলার কারেন্ট পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কারেন্ট বন্ধ করেও তার ফায়দা কিছুই হয় নি।' কথা বলতে বলতে অভিয়াতীদের নিয়ে ওপর তলায় উঠে গেলেন, সাইক্লোসকোপে গিয়ে ঢুকলেন। প্রাচীরের বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, দেখলেন মেরিফেলোরো উল্লাস প্রকাশ করতে করতে ছুটে আসছে। আবার আক্রমণ চালাতে চায়। প্রাচীরের ওপারে ভিন্নরকমের গায়ে হাত দেওয়ামাত্র বিকট আর্তনাদ করে পরিবার ভেতরে ছিটকে পড়তে লাগল। এবার আর হতজ্ঞাড়াবাদের বাঁচানোর চেষ্টা করব না। হ্যারি

কিলার কারেন্ট বন্ধ করে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পাত্রের মুখ খুলে দিয়েছে। নালা গ্যাসে বোঝাই হয়ে গেছে। বাতাসের চেয়ে এটা বেশি ভারি বলে ওপরে উঠতে না পেরে নালার মধ্যেই জমা থাকবে, যে ছিটকে নালার ভেতরে পড়বে তারই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। দম বন্ধ হয়ে পটল তুলবে।

কিছু মনে করবেন না, এখন আর আমার পক্ষে ওদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। ব্যবস্থাটি আগেভাগেই করা রয়েছে। বিদ্যুৎশক্তির পরিবর্তে তরল গ্যাসের সাহায্যে যন্ত্রটাকে চালানোর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। সামনের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন ভিন্নরঙের ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে শুরু করেছে।'

ভিন্নরঙের হলের ভয়ে মেরিফেলোরার অনুগামীদের নালার মধ্যে রেখেই উর্ধ্বাধাসে ছুটতে শুরু করল।

বারজাক কমিশন ছেড়ে আসতে গিয়ে ক্যাপ্টেন মারসিনকে বড়ই মর্মবেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। সত্যিকারের সৈনিক বলতে যা বুঝায় তিনি ঠিক তা-ই। দেশের কল্যাণার্থে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে তিনি পিছপাও নন। বাইশে ফেব্রুয়ারি হাজির হন সিকৌসিকোরো নগরে। ন' দিনে তিনশো মাইল পাড়ি দিয়েছেন।

ক্যাপ্টেন মারসিন পরের দিন সকালে কর্নেল সেন্ট আবানের আদেশনামা নিয়ে কর্নেল সারজাইন্সের সামনে হাজির হলেন। যথোচিত সম্মান জানিয়ে আদেশনামাটা তাঁকে দেখালেন। আদেশনামাটার ওপর পর পর তিনবার চোখ বুলিয়ে কর্নেল সারজাইন্স চোখ দুটো কপালে তুলে সবিস্ময়ে বললেন, 'একী অবাক কাণ্ড। সিকাসো থেকে টিষাকটু থেকে লোক পাঠাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে।'

'লেফটেন্যান্ট ল্যাকো তো বললেন টিষাকটুতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আমাদের আগমনবার্তা পান নি?'

'না, তা ছাড়া পিরোলিজতো গতকালই এখান দিয়ে গেছেন। টিষাকটু থেকে যে ডাক্তার যাচ্ছেন এমন কোনো ইঙ্গিতও তিনি দেন নি। টিষাকটুতে যাওয়ার আদেশ যখন আপনার ওপর বর্তছে তখন অবশ্যই যাবেন। তবু আমি বলছি, আদেশনামাটার বিন্দুবিন্দুও আমার হৃদয়ঙ্গম হল না।'

ক্যাপ্টেন মারসিন আটদিন ধরে সবকিছু গোছগাছ করে দোসরা মার্চ টিষাকটুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এখানে পৌছলেন সতেরই মার্চ।

কর্নেল মোরনাস সেন্ট আবানের আদেশনামাটা কর্নেল অ্যালিগ্নের হাতে তুলে দিলেন। সেটা পড়ার পর তাঁর তো চক্ষু স্থির। তার মনটা খচখচিয়ে উঠল ব্যাপার কি, স্বাক্ষরটা কি তবে নকল?

কেনই বা এমন কাজ করতে যাওয়া। এ যে বারজাক কমিশনকে জেনে শুনে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। ক্যাপ্টেন খুবই মর্মান্বিত হলেন। সন্দেহটা আরও গাঢ় হল, লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর নাম কেউ শোনেও নি জানতে পেরে। এদিকে মিস মোরনাসের যে কী পরিণতি হয়েছে তা ভেবেই মুষড়ে পড়লেন।

সমস্যা আরও বেড়ে গেল সেন্ট আবানের স্বাক্ষর পরীক্ষা করার পর দেখা গেল সেটা মোটেই নকল নয়। অতএব আদেশনামাতে ছিল চাতুরির আশ্রয় নেওয়া হয় নি।

পাক্কা দশ মাইল পথ পাড়ি দেওয়া এবং সেখান থেকে ফেরা সমস্যা বটে। সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন পেরিগনি নামে ক্যাপ্টেন মারসিনের এক বহু দিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেখানে হাজির হলেন। কাজের ফাঁকে বিজ্ঞান চর্চা করেন। যন্ত্রপাতি সর্বদা সঙ্গেই থাকে। তাঁর এ ঝোঁকের জন্য সহকর্মীরা প্রায়ই তাঁকে নিয়ে রঙ্গ রসিকতাও কম করেন না।

একদিন তাঁর তাঁবুর সামনে গিয়েই ক্যাপ্টেন মারসিন থমকে গেলেন।

তাঁকে টেলিগ্রাফের রিসিভার যন্ত্রটা দেখিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'এসো বন্ধু, তোমাকে আজ ডাকিনি-বিদ্যার জারিজুরি দেখাব।'

ক্যাপ্টেন মারসিন ভেতরে ঢুকে আসন গ্রহণ করলে ক্যাপ্টেন পেরিগনি বললেন, 'শোন, কিছুদিনের মধ্যে বিশ্বের দুজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী দুটো আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তাঁদের একজন ইতালির মার্কনি। তিনি শূন্যে হার্জিয়ান ওয়েভস প্রেরণ করার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। আর দ্বিতীয় জন ফরাসির ডক্টর ব্রানলি। তিনি ওয়েভকে ধরার উপযোগী রিসিভার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন লোহা-চুঁড়ের তড়িৎ পরিবাহিতা শক্তি খুবই কম, নেই বললেও চলে। কিন্তু হার্জিয়ান ওয়েভসের সংস্পর্শে আসামাত্র তাদের মধ্যে তড়িৎ পরিবাহিতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। সরু ও ছোট একটা নল দেখিয়ে এবার বললেন, 'এটার ভেতরেই সংশ্লিষ্ট-প্রবণতার ভোজবাজির খেল চলে। আসলে এটা তখন ওয়েভ-ডিটেকটরের ভূমিকা পালন করে। লোহা-চুঁড় পূর্ণ নলটাকে সংযোগস্থাপনের উদ্দেশ্যে হচ্ছে নলটাকে তড়িৎ পরিবাহী করে তোলা। তড়িৎশক্তি প্রবেশ করবে ব্যাটারি সার্কিটের ভেতরে। এর পরের যা কিছু সবই আমার মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়েছে। তড়িৎশক্তি মার্স রিসিভারকে সক্রিয় করে তোলায় ফলে তা থেকে কাগজের ফিতে ছাপা হয়ে বেরোতে থাকে। সে সময় ছোট্ট হাতুড়িটা অনবরত আঘাত করতে থাকে ওয়েভ ডিটেকটর অর্থাৎ নলটার গায়ে। আঘাতের ফলে লোহা-চুঁড়গুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কারেন্ট আসা বন্ধ হয়ে যায়। কাগজের ফিতে ছাপাও বন্ধ হয়ে যায়। মানে রিসিভার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এভাবে একের পর এক পয়েন্ট ছাপা হতে পারে, যতক্ষণ হার্জিয়ান ওয়েভ অ্যান্টেনার ভেতর আসবে। টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে যার জ্ঞান আছে সে পয়েন্টের সারি দেখেই কি লেখা আছে ধরে ফেলতে পারবে।'

ঠিক তখনই যন্ত্রটার মধ্যে আওয়াজ হতে লাগল। ঠিক যেন কেউ বার্তা প্রেরণ করছে। পেরিগনি অনুসন্ধিৎসু নজরে যন্ত্রটার দিকে তাকালেন। দেখলেন, যন্ত্রে ক্যাপ্টেন মারসিনে শব্দ লেখা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন মারসিন যন্ত্রে তাঁর নাম দেখে যারপর নাই অবাক হলেন। একটু বাদে তার ঠিকানা 'টিষাকটু' ছাপা হল। আবার সব নিস্তব্ধ। পরমুহূর্তেই কাগজের ফিতার গায়ে আবার লেখা হল, 'আমি সেন্ট ব্রেনজ'।

মারসিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কই আমি তো একে চিনি না। নির্ধাৎ কেউ আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে, বুঝলে পেরিগনি?'

আবার যন্ত্রটা সক্রিয় হয়ে উঠল। ভেতর থেকে আওয়াজ উঠিত হতে লাগল। পরমুহূর্তেই কাগজের ফিতার গায়ে লেখা ফুটে উঠতে লাগল, 'জেন মোরনাস....ব্ল্যাকল্যান্ডে কারারুদ্ধ....উদ্ধার করুন'

পেরিগনি চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার বল তো ব্ল্যাকল্যান্ডের অবস্থান যে কোথায় তাই তো বুঝতে পারছি না।'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আবার যন্ত্রটা থেকে আওয়াজ নির্গত হতে লাগল। কাগজের ফিতার গায়ে আবার লেখা ছাপা হল—১৫ ডিমি ৫০ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ।

বাস, এবার যন্ত্রটা সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়ে গেল, আর কোনো রেখা ছাপা তো হলই না, যন্ত্রটা থেকে তার গৌঁ গৌঁ আওয়াজটাও উঠিত হল না।

পেরিসিনির মনে ভাবনার উদয় হল। সভ্য জগৎ থেকে দূরে, ধরতে গেলে জনমানবহীন প্রান্তরে সন্ধের বেতারযন্ত্র নিয়ে কাজে মেতে রয়েছেন। তবু তাকে কেউ না কেউ আবশ্যই চেনে।

মারসিনে জেন মোরনাসকে ভালই চেনে। মোরনাস যে তাঁরই পথ চেয়ে বসে। তাকে বিয়ে করে ঘর পাতবার আসায় অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছেন, তিনি আজ বিপদাপন্ন। মর্স ফিতেতে নিজের নাম দেখে যারপারনাই উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতে লাগলেন। সেন্ট আবানের জাল আদেশনামা পাঠিয়ে সৈন্য তুলে নেওয়া হয়েছে। জেন মোরনাসকে কারারুদ্ধ করার জন্যই এত কারসাজি।

পেরিগনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন জেন মোরনাসকে উদ্ধার করা আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আর তিনি একা অবশ্যই কারারুদ্ধ হন নি। নইলে বেতার প্রেরক যন্ত্র পাওয়ার কথা নয়, এর আবিষ্কারক অবশ্যই একজন বিরল প্রতিভাধর, আর তিনিই তাকে অর্থাৎ পুরোদলটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। বন্ধু, তিনি তোমার কাছে দুঃসংবাদটা পৌঁছে দিলেন।'

এবার তারা দৃষ্টিস্ত মাথায় নিয়ে কর্নেলের শরণাপন্ন হলেন।

কর্নেল ফিতার বক্তব্য পড়ে কপালের চামড়ায় ভাজ একে বললেন, 'বারজাকের প্রসঙ্গ তো এতে উল্লেখ নেই। মিস মোরনাস তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরে অন্য দলের সঙ্গে অগ্রসর হয়েছেন কি? সমস্যা হচ্ছে এত উঁচু দ্রাঘিমায়ে?'

'হ্যাঁ, মিস মোরনাস উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেছিলেন।' মারসিনে বললেন।

'তবে তো সমস্যার আর কিছুই রইলো না। বারজাক কমিশন সরকারী অভিযান। তারা সমস্যার সম্মুখীন হলে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।'

মারসিনে বললেন, 'যারা জাল আদেশনামা দিয়ে আমাকে মারিয়েছে তাদের হাতেই মিস মোরনাস বন্দি হলেছেন কিনা তাই বা কে জানে।'

'সবই বুঝলাম, ব্ল্যাকল্যান্ড যে কোথায় অবস্থিত তাই তো আমার মাথায় আসছে না। আর যে দ্রাঘিমার কথা ফিতার বার্তায় রয়েছে সেটা তো মরুভূমির প্রায় কেন্দ্রস্থলে। এমন এক অজানা উদ্দেশ্যে যুঁকি নেওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া সে জায়গার অদূরেই ইংরেজ কর্নেলি সোকোটো। সৈন্য পাঠিয়ে শেষপর্যন্ত হাস্যমায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম নয়। কিছু মনে করবেন না ক্যাপ্টেন মারসিনে, এ পরিস্থিতিতে সৈন্যসহ আপনাকে সেখানে যাওয়ার হুকুম দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মিস মোরনাস একবার যখন টেলিগ্রাফ মারফৎ খবর পাঠিয়েছেন তখন অবশ্যই আবার যোগাযোগ করবেন।'

'হ্যাঁ, এরকম সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। কিন্তু, যদি টেলিগ্রাম না আসে, অর্থাৎ মাঝপথে বন্ধ হলেও অধিকতর বিপদ মনে করা যেতে পারে।'

'সে যাই হোক, আমি নিরুপায় ক্যাপ্টেন। ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন আইন আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছে। আবার যদি আপনি একাই যেতে চান তবু ছুটি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'ঠিক আছে, আমি তবে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিচ্ছি।' ক্যাপ্টেন মারসিনে রাগত স্বরেই বললেন।

'সে কী! আপনার ইস্তফা পত্র নেওয়া আমার এক্সিয়ার বহির্ভূত। যথাস্থানে পাঠালে ওপরওয়ালার বিবেচনার ব্যাপার। আপনার মেজাজ মর্জি এখন স্বাভাবিক নয় বলেই আমার মনে হচ্ছে। এখন বিশ্রাম করুন গে। কাল যা হয় করবেন।'

ক্যাপ্টেন মারসিনে বিষণ্ণমনে কর্নেলের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

৯ এপ্রিল হ্যারি কিলার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে নিজের ফাঁদে নিজেই মাথা গলিয়ে দিলেন। পরের দিন আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। ফলে নগরের বাড়িঘর, রাস্তাঘাট ও কারখানা সর্বত্র অন্ধকারে তলিয়ে গেল। দশই এপ্রিল আবার বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করে হ্যারি কিলার ক্যাম্যারেটকে ফোন করলেন। কয়েদিদের ফিরিয়ে দিতে বললেন, ক্যাম্যারেট সরাসরি না বলে দিলেন।

হ্যারি কিলার রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কারখানার সবাইকে না খাইয়ে মারবেন বলে হুমকি দিতেও দ্বিধা করলেন না। গুনে ক্যাম্যারেট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাসলেন।

ক্যাম্যারেট হিসাব করে দেখলেন ওদামে যা খাবার আছে তা দিয়ে এতগুলো লোকের হস্তা তিনেক ভালভাবে চলে যাবে। বারজাক ও তার সহযাত্রীদের আশ্বস্ত করতে গিয়ে বললেন, 'মুখড়ে পড়ার কিছু নেই মি. বারজাক। দুদিনের মধ্যে আমি হেলিপ্লেন বানিয়ে ফেলছি। বারোই এপ্রিল আপনারা তাতে চড়ে পরীক্ষা করতে পারবেন।'

তা' না হয় করলেন। কারখানার এতগুলো লোকে, ছেলপুলে, মেয়ে মোট দেড়শ লোককে একটামাত্র হেলিপ্লেনে করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবেন কি করে মি. ক্যাম্যারেট?'

'এখান থেকে সায়ের দূরত্ব দুশো মাইল। আর সাড়ে চারশো মাইল টিষাকটু। আকাশ টপেডোর আক্রমণ বাঁচিয়ে

হেলিপ্লেনে প্রতি ক্ষেপে দশজন করে পার করলে দেড়শো লোককে পাঁচদিনে সায়ে পৌছে দেওয়া যাবে। আট দিন লাগবে টিষাকটু পৌছোতে, বুঝতে পারছেন?’

অস্তিরচিণ্ড অভিযাত্রীদের কাছে দশটা দিন যেন দশ বছরের সমান মনে হতে লাগল।

এবার আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। পাম্প বিকল হয়ে গেছে। জলের বাধা না মেনে পাম্পটা শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিস্টনটা তোলা হল, ভেঙেছে কিনা দেখার জন্য, মেরামতে লেগে গেল।

ক্যাম্যারেটের হেলিপ্লেন তৈরির কাজ সম্পন্ন। খবরটা শোনামাত্র অভিযাত্রীদের বুকে উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের ঢেউ বয়ে গেল। রাতেই টিষাকটু পৌছে যাবেন। শয়তানের থাবা থেকে অব্যাহতি পেয়ে যাবেন।

পাম্প মেরামত হয়ে গেল। পাম্পের পিস্টন বসিয়ে দেওয়া হল।

অতিথিরা যখন বাগানে পৌছল তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। এখান থেকেই হেলিপ্লেনে গুঠার কথা। যাত্রী মোট আটজন।

হেলিপ্লেনের দরজা খোলামাত্রই সর্বনশে কাণ্ডটা ঘটে গেল, দরজার পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটল। চোখের পলকে হেলিপ্লেনটা ধ্বংস হয়ে গেল। তার বিভিন্ন অংশ খইয়ের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

ছাই আর ধ্বংসপ্রাপ্ত হেলিপ্লেনের টুকরোগুলো সরাতেই ক্যাম্যারেট চমকে উঠলেন। দেখলেন, মাটিতে ইয়া বড় একটা ছিদ্র। ক্যাম্যারেট আঁতকে উঠে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, ‘ডিনামাইট! ডিনামাইট!’ কীভাবে এল। ব্যাপার কি দেখার জন্য রাবিশ পুরোপুরি সরতে গিয়ে একটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ বেরিয়ে এল। অভিযাত্রীদের চিনতে দেরি হল না। চৌমৌকি। বেইমান চৌমৌকির খণ্ডবিখণ্ড দেহ এটা।

অবাক হবার মতো রূপারই বটে। সে এখানে ঢুকল কি করে? একজন যখন ঢুকতে গেরেছে তখন অন্য যে কেউ-ও ঢুকতে পারে।

ক্যাম্যারেটের নির্দেশে চৌমৌকির দেহ খণ্ডগুলোকে প্রাচীর টপকে বাগানের বাইরে ফেলে দেওয়া হল। উদ্দেশ্য সবাই দেখুক বেইমানি করতে এসে তার দেহ পাওয়া গেল। তবে তার মধ্যে এখনো প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে।

উত্তর চেতানু চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুললেন। উদ্দেশ্য, তার মুখ থেকে প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে হবে।

ক্যাম্যারেট অভিযাত্রীদের আশ্বাস দিলেন, মাস দুইয়ের মধ্যেই তিনি আর একটা হেলিপ্লেন তৈরি করে ফেলবেন। দু-মাস। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আর মাত্র হুগা দুইয়ের খাবার রয়েছে। ব্যাপারটা অভিযাত্রীদের কাছে সত্যি বড়ই দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাম্যারেট কিন্তু এসব নিয়ে মোটেই ভাবিত নন বলেই বুঝা গেল।

অভিযাত্রীদের মনোবল ভেঙে গেল। সারা রাত্রি নির্ধুম অবস্থার মধ্যেই সবাই কাটালেন। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কোনো পথই বের করতে সক্ষম হলেন না।

তবে ক্যাম্যারেট মুখে প্রকাশ করুন আর নাই করুন ভেতরে ভেতরে তিনি যে ভাবিত নন এ কথা জোর দিয়ে বলা চলে না। দু-মাসের আগে নতুন হেলিপ্লেন তৈরি করা সম্ভব নয়। এপ্রিল মাস শেষ হবার আগেই খাবারের ভাড়ার খালি হয়ে যাচ্ছে।

ডা. চেতান্নের চেষ্টায় আহত লোকটাকে সুস্থ করা সম্ভব হল। সে এখন ক্যাম্যারেটের বন্দি। তার পরিচয় জানার জন্য সবাই মিলে যারপর নাই পীড়াপীড়ি করলেন। ক্যাম্যারেটও কম চেষ্টা করলেন না। বৃথা চেষ্টা। আন্যোন্য়ানায় হয়ে তাঁকে বাঁকা পথ বেছে নিতেই হল। বন্দি পায়ের এবং হাতের চারটে বুড়া আঙুলের তলায় একটা করে ধাতব পাত বেঁধে দিলেন। তারের মাধ্যমে পাতগুলোর সংযোগ সাধন করে তারটাকে প্রাণে লাগিয়ে দিলেন। এবার দিলেন বোতাম টিপে। ব্যস, বন্দির সর্বাস্ব ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মতো বার বার বেকে যেতে লাগল। যন্ত্রণায় চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। আবার বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করলেন। তার মুখ থেকে কথা বের করার চেষ্টা করলেন। তাতেও কাজ হল না। ক্যাম্যারেট হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন না। আবারও বোতাম টিপলেন। আবার তার সর্বাস্ব বার বার বেকে দুমড়ে যেতে লাগল। চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। চোখের মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। ক্যাম্যারেট আবার বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দিলেন।

হ্যাঁ, এবার কাজ হয়েছে। বন্দি নিজের নাম বলল, ফারগুম ডেভিড। এটা ছদ্ম নাম। ধমক খেয়ে এবার আসল নাম বলল—ডেনিয়েল ফ্রাসনে। ইংরেজ। গ্ল্যাকল্যান্ডের কাউন্সিলার। হ্যারি কিলারের সরকার যারা চালান তাদেরই একজন। সে আরো বলল, ‘হ্যারি কিলার একসময় ব্লেজেন বাহিনীতে ছিল। আর চেহারার পরিবর্তনের জন্যই ক্যাম্যারেট তাকে আজ আর চিনতে পারছেন না।’

এবার জেন ব্লেজনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ডেনিয়েল ফ্রাসনে বলল, ‘হ্যারি কিলার দলে আসার পর থেকেই ডাকোনি, লুঠতরাজ আর খুন জখম শুরু করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এতে ক্যান্টেন ব্লেজনের কোনোই হাত ছিল না।’

জেন ব্লেজেন এবার প্রশ্ন করলেন, ‘ক্যান্টেন ব্লেজনের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?’

ডেনিয়েল ফ্রাসনে বলল, ‘লড়াই করতে গিয়ে। পরিস্থিতি তাঁকে লড়াই করতে বাধ্য করেছিল।’

ক্যাম্যারেট বললেন, ‘আর একটা কথা, এ-নগরে এত নিগ্রোর আদমানি কি করে হল?’

‘এ তো সাধারণ কথা! গ্রাম থেকে জোর করে আনা হয়েছে?’

‘এখানে এতসব যন্ত্রপাতি কোথেকে আমদানি করা হয়েছে? কীভাবেই বা আনা হয়েছে?’

‘ইউরোপ থেকে। জাহাজে করে।’

‘বহু নিগ্রোর মৃত্যু হয়েছে নিশ্চয়?’

‘তা তো হয়েছেই। যত নিগ্রো জানোছে তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশি মারা গেছে।’

ক্যাম্যারেট এবার বললেন, ‘ব্ল্যাকল্যান্ডে এত টাকা কোথেকে আসে?’

‘আশ্চর্য প্রশ্ন তো! আপনার হেলিপ্লেনগুলো তৈরি করার উদ্দেশ্য কি, জানেন না? এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন কিছুই জানেন না আপনি। হেলিপ্লেনে করে হ্যারি কিলার আমাদের নিয়ে প্রায়ই বিশাগো দ্বীপে যেতেন। আর সেখান থেকে জাহাজে গিয়ে ইউরোপের ব্যাংক আর কঙ্ক্স ধনকুবেরদের বাড়ি হানা দিয়ে টাকার পাহাড় নিয়ে ফিরে আসতেন। বছরে তিন-চারবার তো যেতামই। চার মাস আগে শেষ যাওয়া হয়।’

‘আবার কার বাড়ি হানা দেন?’

‘সেবার আমি দলের সঙ্গে যাই নি। তবে শুনেছি, একটা ব্যাংক ডাকাতি করে প্রচুর অর্থ আনা হয়।’

‘এবার জবাব দিন, কারখানায় কি করে ঢুকেছিলেন?’

এবার একটু মুশকিলেই পড়ল ডেনিয়েল ফ্রাসনে। কিন্তু আর না দিয়েও উপায় নেই। আমতা আমতা করে বলল, ‘রিজার্ভারের ভেতর দিয়ে। গত পরশুর আগের দিন ওয়াটার গেট বন্ধ করা ছিল। পাশ্প করে জল তোলা যায় নি। তাই প্রাসাদ ও কারখানার রিজার্ভার দুটোই খালি হয়ে যায়। জলনালির ভেতর দিয়ে আমি হামু দিয়ে কারখানার ভেতরে ঢুকে আসি।’

ক্যাম্যারেট এরকম চিন্তা করেই চৌমৌকির ঋণবিখণ্ড লাশটাকে প্রাচীর উপক্কে কারখানার বাইরে ফেলে দেন। ফলে সবাই দেখে বুঝতে পারবে, কারখানার ভেতরে যে ঢুকবে তারই এ-হাল হবে।

ক্যাম্যারেট তাকে আর কোনো প্রশ্ন করার দরকার মনে করলেন না।

মেরিফেলোরা কারখানার চারদিকে কড়া পাহারা দিচ্ছে। খাবারের ভাড়ার খালি না হওয়া পর্যন্ত তারা পালা করে পাহারা চালিয়ে যাবে, অনুমান করা হচ্ছে।

চৌদ্দ তারিখে সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্সের মাথায় একটা ফন্দি এল। টোনগানের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে ক্যাম্যারেটের সঙ্গে আলোচনা করতে গেলেন। দুদিন ক্যাম্যারেটকে আর দেখা যায় নি। তাঁর মন-প্রাণ বিধিয়ে উঠেছে, তাঁকে দিয়ে হেলিপ্লেন তৈরি করিয়ে শয়তান হ্যারি কিলার ইউরোপ আর আফ্রিকায় সমানে লুণ্ঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ নিগ্রোদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে, বারজাক কমিশনকে ভেঙে তছনছ করেছে, ক্যাপ্টেন ব্লেজককে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

তাঁরই মস্তিষ্ক প্রসূত বুদ্ধি-কৌশলকে কাজে লাগিয়ে যে একের পর এক জঘন্যতম কাজ হাসিল করেছে। অথচ তিনি এসবের বিন্দু বিসর্গ জানেন না। নিজের কাজের জন্য তিনি ভিতরে ভিতরে জ্বলেপুড়ে ঝাঁক হতে লাগলেন। দুদিন দাঁত দিয়ে একটা কুটোও কাটেন নি।

সাংবাদিক আমিদি ফ্লোরেন্স ক্যাম্যারেটকে বললেন, ‘এ পরিস্থিতিতে শয়তান হ্যারি কিলারের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই। নির্যাতিক নিগ্রোরা আমাদের হয়ে অবশ্যই লড়বে, তারা সংখ্যায় চার হাজার পুরুষ ও দেড় হাজার মেয়ে। এখন কথা হচ্ছে, মি, ক্যাম্যারেট যদি একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করে দিতে পারেন তবে গোপনে বাইরে গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে আমাদের সিদ্ধান্তের কথা জানানো যেতে পারে।’

ক্যাম্যারেট জানালেন। কমদিনের মধ্যেই তিনি সুড়ঙ্গ তৈরি করে দেবেন। আর নিগ্রোদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বন্দুক, বর্শা, বল্লম, তরবারি আর কুড়োল প্রভৃতিও তৈরি করে দিতে পারবেন।

আমিদি ফ্লোরেন্স এবার বললেন, ‘আমি যে-পরিকল্পনা করে রেখেছি টোনগানে সুড়ঙ্গ-পথে কারখানার বাইরে, মাঠে-ময়দানে গিয়ে কর্মরত নিগ্রোদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আমাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়ে তাদের এককাত্তি করবে, হ্যারি কিলারের ওপর ক্ষেপিয়ে তুলবে।’

তাঁর পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে ক্যাম্যারেট ও টোনগানে থেকে শুরু করে অভিযাত্রীরা পর্যন্ত সবাই রাজি হয়ে গেল। কাজ শুরু হয়ে গেল।

এবার খাবার ফুরিয়ে এল। পেটে টান পড়ল, ক্যাম্যারেট বিষণ্ণ মনে ঘরের কোণে বসে। তবে দেখা যাচ্ছে, হ্যারি কিলারের শক্তির বেশি।

হ্যারি কিলারের তো দাবি একটাই। সে মিস মোরনাসকে বিয়ে করতে চায়। একটা মেয়ের জন্য কারখানার এতগুলো শ্রমিক থেকে শুরু করে অভিযাত্রীরা পর্যন্ত সবাই উপোষ করে মরবে?’

ব্যাপারটা নিয়ে জেন মোরনাসও কম ভাবিত নন। তাঁরই জন্য এতগুলো লোকের চরমতম দুর্গতি, একথা তাঁরও অজানা নয়। সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শেষ হল। বাস, আর দেরি নয়। ১ মে টোনগানে সুড়ঙ্গ-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার শুরু হল তার সবুজ সঙ্কেতের জন্য অধীর প্রতীক্ষা।

এদিকে খাবারের অভাবে এতগুলো প্রাণী ক্ষিদেয় জ্বালায় ভুগতে লাগল। মে মাসের পাঁচ তারিখ হয়ে গেল। তবু টোনগানের কোনো খবর নেই। তার কাছ থেকে কোনোরকম সঙ্কেতই পাওয়া গেল না।

সবার একই কথা। মরতে হয় সবাই এক সাথে না খেয়ে গুকিয়ে মরবে, তবুও মিস মোরনাসকে শয়তানটার খপ্পরে পাঠাতে রাজি নয়।

পাঁচই মে অন্ধকার ভেদ করে একটা মিটমিটে আলো দেখা গেল। নিগ্রো দাসদের কোয়ার্টারের প্রাচীরের ওপর থেকে আলোর সঙ্কেত পাঠানো হচ্ছে। সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

দাস কোয়ার্টার আর কারখানার প্রাচীরের মধ্যে দড়ির সেতু তৈরি করা হল, কামান দেশে দড়ির গোলা নিক্ষেপ করা হয়। দড়িটার এক প্রান্তে নোঙর বাঁধা। সেটা গিয়ে দাস কোয়ার্টারের প্রাচীরে আটকে গিয়ে দিবা সেতুটাকে তৈরি করে

নিয়েছে। এটার সাহায্যেই বন্দুক, বর্শা, বল্লম, তরবারি ও কুড়ুল প্রভৃতি কারখানার ভেতর থেকে নিম্নো কোয়ার্টারে রাখে অন্ধকারে চালান করে দেওয়া হল। যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়ে গেল। এখন হই হই করে কাঁপিয়ে পড়লেই হল।

এদিকে মিস মোরনাসকে খুঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। কারখানার আনাচে-কানাচে সর্বত্র চিহ্ননি তল্লাশি চালিয়েও তাঁর হদিস পাওয়া গেল না।

কারখানার সামনের দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। সেই সুযোগে চুপি চুপি চম্পট দিয়েছেন। সাইক্লোস্কোপে তাঁকে দেখা গেছে। তবে নিশ্চিত করে চেনা যায় নি। অনুমান করা হচ্ছে, তিনি হ্যারি কিলারের কাছে গেছেন, তার একার জন্য এতগুলো মানুষ বা মেয়ে শুকিয়ে মরতে বসেছে, এরকম অনুতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হয়েই তিনি স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে চলেছেন। আসলে টোনগানে সঙ্কেত পাঠাতে দেরি করার জন্যই এরকম একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল।

নিম্নো ব্ল্যাকগার্ডরা তাঁকে চেনে। তারা দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিল।

হ্যারি কিলার মিস মোরনাসকে দেখে চমকে উঠল। এরকমটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, এ যে তার কাছে একবারেই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার, তাঁকে দেখেই চমকে উঠে হ্যারি কিলার কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কারখানা থেকে এলেন?'

'হ্যাঁ, আত্মাহুতি দিতে, নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে ছুটে এলাম।'

'কেন? হঠাৎ এমন মতি—'

'কিছুদিন আগে আপনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, রাজি হই নি। আজ স্বেচ্ছায় নিজেকে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি। তবে একটা শর্তে, আমার দলের সবাইকে মুক্তি দিতে হবে।'

'শর্তটর বুঝি না। আপনি না এলে কারখানাসহ সবাইকে উড়িয়ে দিতাম। স্বেচ্ছায় এসেছেন বলে রেহাই পাবেন ভেবেছেন? কে আপনাকে রক্ষা করবে? যাকগে, এসব কথা বলে এমন সুন্দর রাত্রিটা নষ্ট করা ঠিক হবে না। আসুন একটু আনন্দ করা যাক।' কথা বলতে বলতে হ্যারি কিলার মদের বোতলটা উপড় করে গলায় ঢেলে দিলেন।

মিস মোরনাস দেখলেন, দাদার হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেবার এই সুযোগ, সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। ছোরাটা জামার তলায়ই রয়েছে।

হ্যারি কিলার কিছুক্ষণের মধ্যেই মদের মেশায় আরাম-কেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বেঁস হয়ে পড়ল।

মিস মোরনাস এবার ভাবলেন, কাজ হাসিল করার আগে যা হোক কিছু খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নেবেন। দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঠুকেই তিনি চমকে উঠলেন। দেখলেন—ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন লুই ব্রেজেন—তার দাদা, লুই রবার্ট ব্রেজেন। সবাই জানে পাঁচ মাস আগে ব্যাংক ডাকাতি করার পর তিনি বোপান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। লুই ব্রেজেন তাঁর বোনকে দেখে চিনতে পেরে গেছেন।

লুই ব্রেজেনের গায়ে অসংখ্য কাটা-দাগ, বোনকে জড়িয়ে ধরে শিশুর হতো কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন, 'পাঁচ মাস আগে ব্যাংক বসে থাকার সময় পিছন থেকে কে যেন আমার ঘাড়ো আচমকা আঘাত করল। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন সংজ্ঞা ফিরে পেলাম তখন দেখি আমি একটা সিঁদুরের মধ্যে বন্দি। ব্যস, তার পর থেকেই এখানে কাটাচ্ছি।'

আচমকা ঘাড় ঘুড়িয়েই ভাই-বোন দেখলেন, মূর্তিমান শয়তান হ্যারি কিলার দরজায় দাঁড়িয়ে। বিকট স্বরে হেসে বলল, 'হায় সুন্দরী, এত সহজে হ্যারি কিলারের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ হাসিল করবে ভেবেছ! অসম্ভব! মিস মোরনাস জামার তলা থেকে ঝট করে ছোরা বের করে গর্জে উঠলেন, 'খবরদার। এক পা এগোলে ছোরা বুকে গেঁথে দেব বলে দিচ্ছি!'

লুই ব্রেজেন হকচকিয়ে গেলেন। অপলক চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিস মোরনাস এবার বললেন, 'এটা কিন্তু সাধারণ একটা ছোরা নয়। কৌবার একটা খবর থেকে উদ্ধার করেছে। এতে কিলার নামটা লেকা রয়েছে।'

'কিন্তু বোন, এর আসল নাম হ্যারি কিলার নয়। আসল নামটা তোমার খুবই পরিচিত বোন।' লুই ব্রেজেন বললেন, 'উইলিয়াম ফারনি এর আসল নাম, আমার বাবার সঙ্গে তোমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল, হয়তো শুনে থাকবে বোন। উইলিয়াম ফারনি তোমার সং দাদা।

উইলিয়াম ফারনি গম্ভীর স্বরে বলল, 'এবার বুঝলাম, ভূমিই তবে জেন ব্রেজেন, মিস মোরনাসনও।' দাঁতে দাঁতে চেপে পরম বিতৃষ্ণায় কথাটা ছুটে দিল। 'তবে ভূমি কৌবা গিয়েছিলে, কি বল? হ্যাঁ, আমি তোমাদের দুজনকে খুন করে রক্ত দিয়ে হোলি খেলব। তোমারা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। আর আজ সেই তোমরাই আমার প্রাসাদে আশ্রয় নিয়েছ। তোমরা ভেবেছ, সবই জেনে গেছ। আসলে কাঁচকলা, কিছুই জানতে পার নি। আমিই বলছি, তোমাদের বাবা তো আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আজ তোমাদের সেই পাশও বাবাকে জানিয়ে দিতে চাচ্ছি আমিই তোমাদের মেরে যমের দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছি। তোমাদের বাবা আমাকে শেয়াল-কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল, তারপর রোজগারের ধাক্কা করলাম। কাড়ি কাড়ি নেট আর এত এত সোনা রোজগার করলাম, তোমরা যাকে নাক সিটকে বল জখন্যা—খুন-জখম, লুঠতরাজ করে রোজগার করেছে আমি। আমি প্রতিহিংসার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধ পরিকর ছিলাম। তাই তো জর্জের পিছনে ধাওয়া করলাম। অনুতাপ জ্বালায় জর্জরিত হচ্ছি এরকম বাহানা করলাম। জর্জ আমার অভিনয়ে প্রীত হল, ভুলে গেল। তার ভাবুতে আমাকে ডেকে নিয়ে থাকতে দিল। আমি গোপনে তার খাবারের সঙ্গে রোজ একটু একটু করে অফিৎ মিশিয়ে দিতাম। ব্যস, জর্জ ব্রেজেন আমার কজায় এসে গেল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেনাবাহিনীর সর্বেসর্বা হয়ে গেলাম। তার নামে হুকুম জারি করতে লাগলাম, দেশজুড়ে জর্জ ব্রেজেনের নামে হই হই পড়ে গেল। সবাই তাকে বেইমান, উন্মাদ, খুনী আর দাঙ্গাবাজ প্রভৃতি বিশেষণে সম্বোধন

করতে লাগল। এবার জর্জ ব্রেজনের দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলাম। তাকে বাঁচিয়ে রাখলে সে আমার কীর্তির কথা ফাঁস করে দিত।

এবার এখানে, মরুভূমির দেশে হাজির হলাম। যাকে একদিন শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই গড়ে তুলল ব্ল্যাকল্যান্ড নগর। আমি এখানকার রাজা-বাদশা, আমি প্রভু। এতেও আমার মন ভরল না। তোমাদের বাবার যে আরো একটা ছেলে আর মেয়ে রয়েছে তাই তো একটা ব্যাংকে লুঠ করলাম। টাকা জোগাড় করতে লুইয়ের মাধ্যম ভাণ্ডা মেয়ে অজ্ঞান করে বাস্তববন্দি করে এখানে এনে ফেললাম। একেও নির্মমভাবে হত্যা করব। আর তোমাকে বিয়ে করে সহধর্মিণী করব ভেবেছিলাম। জানতে পারলাম, তুমি আমার বোন। তাই তোমাকে আমি নিজে বিয়ে না করে আমার সবচেয়ে বখাটে ক্রীতদাস, পৈশাচিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে আমৃত্যু যাতে জুলেপুড়ে দগ্ধ মরতে হয় তার ব্যবস্থাই করব। আর লর্ড ব্রেজন থাকবে একা, একেবারেই নিঃসঙ্গ। ব্যস, তবেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। ব্রেজন বংশের মেস সলতেটা জুলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র জানোয়ারের মতো এতক্ষণ তর্জন গর্জন করল উইলিয়াম ফারনি। ঠিক তখনই আচমকা যেন বিস্ফোরণের শব্দ হল। সবকিছু থর থরিয়ে কেঁপে উঠল। উইলিয়াম ফারনির মুখ অকস্মাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কারারক্ষী ব্ল্যাকগার্ড দৌড়ে এসে জানাল, শহরে আগুন লেগেছে।

উইলিয়াম চমকে উঠল। লুই আর জেন তার পথ রোধ করার চেষ্টা করলেন। সজোরে ধাক্কা মেয়ে তাদের ছিটকে ফেলে দিয়ে সে উম্মাদের মতো ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল।

লুই খুবই দুর্বল। বলতে গেলে তার হাঁটা চলার শক্তি নেই। জেনের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি কোনোরকমে শয়তান উইলিয়ামের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চারদিকে কবরস্থানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ব্ল্যাকগার্ড নিগ্রোর বারান্দায় পাহারায় নিযুক্ত থাকার কথা। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা চম্পট দিয়েছে। কোনোরকমে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। ঘর খালি।

দুর্বল লুইকে একটা চেয়ারে বসিয়ে রেখে জন ব্রেজন একাই আকস্মিক আওয়াজটার রহস্য ভেদ করতে বেরিয়ে পড়লেন, একের পর এক ঘরে গেলেন। সবই ভৌঁ ভৌঁ। ঘরগুলো খালি।

এত বড় একটা প্রাসাদে রক্ষীদের একজনও উপস্থিত নেই।

ব্যাপার দেখে জেন ব্রেজন রীতিমতো হকচকিয়ে গেলেন। এবার ছাদে গেলেন। কারখানার অত্যাঙ্ক আলোয় দেখতে পেলেন প্রাসাদের ছাদে অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে। উইলিয়ামও সেখানে উপস্থিত। ব্ল্যাকগার্ড আর নিগ্রো দাসরাও রয়েছে। সবাই কোমরে পিস্তল, হাতে রাইফেল নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলাবলি করছে। আচমকা উইলিয়ামের নজর গেল জেন ব্রেজনের দিকে। গলাছেড়ে রক্ষীদের কি যেন হুকুম দিল। জেন ব্রেজন আতঙ্কে ঝট করে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিয়ে দিল।

ব্ল্যাকগার্ডরা দমাদম দরজায় আঘাত হানতে লাগল। ইস্পাতের দরজা। ভাঙতে পারল না। জেন ব্রেজন লম্বা লম্বা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলেন এক এক করে প্রাসাদের সবকটা দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবার হাজির হলেন মেজদা লুইয়ের কাছে।

শয়তান উইলিয়াম ফারনি তার সাদৃশ্যদের নিয়ে ছাদে বন্দি হয়ে পড়েছে। হতাশায় ভেঙে পড়ল। আগুন রেড রিভারের ডানদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। নিগ্রো দাসদের বস্তি পুড়ে ছাই হচ্ছে। এবার সিভিল বডির কোয়ার্টারে, মেরিফেল্ডেনের কোয়ার্টারে আগুন ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দাসরা বিদ্রোহে সোচ্চার হয়েছে। জেন ব্রেজন এবং লুই দুজনে মহাফাঁপড়ে পড়ল। এ-অবস্থায় প্রাসাদের বাইরে বেরোলে বিক্ষুব্ধ নিগ্রোদের হাতে তাদের প্রাণ দিতে হবে। তারা প্রাসাদে খোঁজাখুঁজি করে দুটো পিস্তল, দুটো রাইফেল কিছু গুলি পেলেন, সেগুলো নিয়ে তারা দরজার কাছে এসে দেখলেন, চল্লিশটা হেলিকপ্টার তার ব্ল্যাকগার্ডদের কোয়ার্টার, আগুনের কবলে পুড়ে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এদিকে শয়তান উইলিয়াম ফারনি আর তার সাকরেন ব্ল্যাকগার্ডরা ছাদ থেকে অনবরত গুলিবৃষ্টি করে চলেছে। নিগ্রোরা এতটুকুও দমল না। মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ।

আবার প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরণ হল, ইয়া লম্বা প্রাচীরের বেশ কিছুটা অংশ ধ্বসে গেল।

বিস্ফোরণের পিছনে যে-কোনো রহস্য কাজ করছে বুঝার উপায় নেই। তবে পরিকল্পনা মাফিক যে কাজ হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রথম বিস্ফোরণের চার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আবার পর পর দুটো বিস্ফোরণ ঘটল। সর্বনাশ যা কিছু সিভিল বডির কোয়ার্টারে হতে লাগল।

কালো চামড়ার মানুষগুলো গুলি খাওয়া বাঘের মতো ক্ষেপে গেল। সাদা চামড়ার মানুষগুলো ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মেরিফেল্ডোরাই শেষপর্যন্ত যুদ্ধে জয়লাভ করল।

এদিকে শয়তান উইলিয়াম ফারনির যাতাকলে আটক পড়া ইঁদুরের মতো ছটফট করতে লাগল। দরজার পাল্লাম দমাদম লাগি মেয়ে ভাঙার চেষ্টা করতে লাগল। বৃথা চেষ্টা। ইস্পাতের দরজা। ভাঙা তো দূরের ব্যাপার সামান্য ঘামেলও করতে পারল না।

কারখানার কর্মীরা অনেক আগেই ব্ল্যাকল্যান্ডের অধিবাসীদের অগোচরে বেশ কিছু সংখ্যক ডিনামাইট, কার্তুজ ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র কোয়ার্টারে চালান দিয়ে দিয়েছে। সবই মারসেন ক্যামারেট ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অস্ত্রশস্ত্র চালান দেওয়ার একটু পরেই প্রবল বিস্ফোরণ ঘটল। আবার বিক্ষুব্ধ ক্রীতদাসরা সিভিল বডির বাড়িতে হানা দিয়ে বাসিন্দাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে লাগল।

এদিকে অভিযাত্রীরা পরিস্থিতি সঙ্গীন দেখে ব্যস্ত হয়ে কারখানায় ফিরে গেলেন। তারা নিঃসন্দেহ হতে পারলেন না, কে বা কারা এ কাজ করছে।

আসলে মারসেন ক্যাম্যারেট, তিনি রীতিমতো ক্ষেপে গেছেন। নিজে হাতে গড়া ব্ল্যাকল্যান্ড নগরকে নিজে হাতেই ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী। বিষয়কর তার আবিষ্কার। তার ভারসাম্য কোনোদিনই ছিল না। সর্বদা আনমনা, অপ্রকৃতিস্থ ভাব। তার ওপর এমন জঘন্য একটা বিশ্বাসঘাতকতার পর তিনি প্রায় উন্মাদদশা প্রাপ্ত হয়েছেন। তারপর যখন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সিভিল বডি আর দাসদের কোয়ার্টারগুলো হুড়মুড় করে পড়তে শুরু করল তখন তিনি উন্মাদের মতো বারবার চিলিয়ে উঠলেন, 'শেষ! আমার সৃষ্টি আজ ধ্বংস হতে চলেছে। ব্ল্যাকল্যান্ড নগরের ওপর পরম পিতার অভিশাপ লেগেছে।' কথা বলতে বলতে তিনি এমনভাবে হাত দুটোকে চালাতে লাগলেন যে, 'পরম পিতা' তিনি যেন নিজেকেই বুঝাতে চাইছেন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা। আবার নিজের সৃষ্টি তিনি নিজেই ধ্বংস করছেন।

তরল গ্যাসের শক্তিতে জেনারেলের চলতে লাগল। বিস্ফোরণ সমান তালেই চলতে লাগল।

সারারাত্রি ক্যাম্যারেটের দেখা মেলে নি। ভোরের আলো ফুটতেই গম্ভীর মুখে প্রাটফর্ম এসে দাঁড়ালেন। এক সময় উন্মাদের মতো গলা ছেড়ে চিলিয়ে উঠলেন, 'পরম পিতার অভিশাপ—পরম পিতার অভিশাপ লেগেছে! পালাও—সবাই পালাও। সবকিছু হারবার হয়ে যাবে।' চিৎকার করতে করতে তিনি টাওয়ারে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। ব্যস, আর তাকে দেখা গেল না।

এদিকে উইলিয়াম ফারনিরা দরজা ভাঙার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। ছিটকিনি বা দরজার পাল্লা কোনোটাও ভাঙা সম্ভব হল না। এবার দরজার পাশের পাথর খসানোর কাজে প্রাণান্ত প্রয়াস চালাতে লাগল উইলিয়াম ফারনিরা এবং চারতলায় আটকাপড়া হতভাগারা। ছাদের দরজাটা বেশি সময় আঘাত সহ্য করতে পারল না। এক সময় সশব্দে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। এবার তারা তিনতলার ও দোতলার সিলিং এক এক করে ভাঙল।

এদিকে ধ্বংসকার্য অব্যাহতই রইল। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটতে লাগল। এমন বিস্ফোরণ আরও ঘন ঘন ঘটতে লাগল। নিজের সৃষ্টি নিজে হাতে ধ্বংস করে ক্যাম্যারেট যেন অপরিসীম আনন্দ পাচ্ছেন।

ভোর চারটে থেকে ধ্বংসলীলা যেন প্রলয়ঙ্কর রূপ নিল। সারাদিন ধরে চলল বিক্ষুব্ধ নিম্রো শ্রমিকদের আশ্রয়। ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীকে একেবারে ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত যেন তাদের স্বস্তি নেই। মোদা কথা, তাদের ভগবান হ্যারি কিলারের ওপর তাদের এখন আর তিলমাত্রও ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। তবে এ ও সত্য এতদিন তারা যে তাকে দেবতা জ্ঞান করেছে তা ভক্তিতে নয়, ভয়ে। তার পৈশাচিক আচরণের ভয়ে।

সকাল নটা পর্যন্ত অনবরত বিস্ফোরণ চলল। অব্যাহত রইল ধ্বংসলীলা। তারপরই মেরিফেলোরা দোতলার একটা দেওয়াল ফুটো করে তাতে বারুদ গুঁজে দিল। এবার অগ্নি সংযোগ করতেই প্রচণ্ড আগুয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটল। দোতলার শিলিংটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। অভিযাত্রীরা প্রমাদ গলেন। আর একটা দেওয়াল বা সিলিং ভাঙতে পারলেই গুলি খাওয়া বাঘের মতো তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

একটু বাদেই নতুনতর একটা বিস্ফোরণ ঘটল। এতক্ষণ যে ধরনের আগুয়াজ করে বিস্ফোরণ ঘটেছে। এবারের আগুয়াজটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগুয়াজটা এসেছে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীর দিক থেকে। আবার—আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল।

হঠাৎ দেখা গেল, হ্যারি কিলার ও তার সাঙ্গপাদরা সিলিং বা দেওয়াল ভাঙা ছেড়ে দিয়ে উদ্ধারের মতো ছাদে উঠে গেল। এ কী কাণ্ড! সবাই আবার ছাদে উঠল কেন? অভিযাত্রীরা প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে এসপ্লানেডে বেরিয়ে এলেন। মেরিফেলোরা কেন আবার ছাদে উঠে গেল তা বুঝার জন্য।

এমন সময় বিউগল বাজার শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, বিউগলই বাজছে বটে। কারখানার ভেতর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল নিম্রো শ্রমিকের দল। এবার ক্যাপ্টেন মারসিনেকে দেখা গেল। তিনি বিউগল বাজিয়ে সবাইকে আশ্বাস দিয়েছেন। ক্যাপ্টেন মারসিনে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্ল্যাকল্যান্ড নগরীকে দেখে বিষমভরা চোখে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মহা দুঃখিত্যয় পড়লেন, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোথায় মেয়েটার খোঁজ করবেন। যদি খুঁজে পানও তবে তাকে যে জীবন্ত অবস্থায় পাবেনই তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়?

জেন ব্রেজনেই ক্যাপ্টেন মারসিনেকে আগে দেখতে পেলেন। আনন্দে আত্মহারা প্রায় জেন ব্রেজনেই ছুটে ছুটে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা পরস্পরকে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন। অনাবিল আনন্দের জোয়ারে ভাসতে লাগলেন উভয়ে।

ঠিক তখনই প্রচণ্ড আগুয়াজ তুলে এসপ্লানেডের দুদিক থেকে দু-দুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে কারখানা আর দুর্গ-প্রাসাদ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

টাওয়ারের চূড়ায় দেখা গেল এক অভাবনীয় দৃশ্য। উইলিয়াম ফারনি আর তার বাইশ জন সাকরেন্দ করজোড় প্রাণ ভিক্ষা চাইছে ক্যাপ্টেন মারসিনের কাছে।

পরমুহূর্তেই আবার পর পর দুবার বিকট আগুয়াজ হল। বিস্ফোরণ। প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। ব্যস, চোখের পলকে প্রাসাদ-দুর্গ ও কারখানা-দুর্গ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ব্যস, সব শেষ। ব্ল্যাকল্যান্ডের শ্রষ্টা মারসেন ক্যাম্যারেট আর হ্যারি কিলার তার সাকরেনদের নিয়ে পাথরচাপা পড়ে চিরদিনের মতো দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস

রোন নদীর ওপর ছোট্ট একটা দ্বীপ। এ দ্বীপেরই এক পুরনো বাড়িতে বাস করেন মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস। সবাই তাঁকে ঘড়ির কারিগর মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস বলেই জানে। তাঁর চেহারা দেখে বয়স সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়। কুচকুচে কালো মানুষটার বয়স যে কতো তা কারোরই জানা নেই। তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো বাস্তবিকই বিচিত্র। তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন ঘড়িনির্মাতা হিসেবে।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের হাতে তেমন কাজ না থাকলে আপনমনে নদীর দিকে তাকিয়ে তার রূপ সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এমনভাবেই তনুয় হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টার কাটিয়ে দেন।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস শহরের ঘড়িগুলোতে দম দেয়ার সময় ছাড়া ভুলেও বাড়ির ত্রিসীমানায় বের হন না। তবে খাবার সময় অবশ্য তাঁকে বেরোতেই হয়। তাঁর ঘড়ির কারখানার জন্য আলাদা কোনো ঘর নেই। শোবার ঘরটাতেই তিনি কারখানা গড়ে তুলেছেন। সারাক্ষণ টেবিল আর ঘরের মেঝের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে ঘড়ির ছোট-বড় সব যন্ত্রাংশ। তবে সবই তার নিজেরই আবিস্কৃত। তবে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিস্কার হচ্ছে, ঘড়ির প্রাণ। একটি ছোট্ট যন্ত্র তৈরি করে তিনি তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাকে সচল করে তোলেন। যাবতীয় ঘড়ির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। আর এটা নাকি তাঁর একান্তই নিজস্ব আবিস্কার।

বাড়ির সবচেয়ে সাজানো গোছানো একটা ঘরে বাস করেন জেরাঁদে-মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের আদরের দুলালী। সে এতই সুন্দরী না যে, কয়েকটা শহর ঘুরে এলেও সৌন্দর্যের দিক থেকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর মতো কাউকেই পাওয়া যাবে না। সে অষ্টাদশী, পূর্ণ যৌবনা। মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস, তাঁর মেয়ে জেরাঁদে আরও দুজন এ বাড়িতে বাস করে। তাদের একজন তাঁর সহকারী ও শিষ্য অবর্তা। আর অন্যজন পরিচারক স্লামস্টিকা।

রোজ তারা চারজন একসঙ্গে, একই টেবিলে বসে নৈশভোজ সারে। এক রাতে এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য লক্ষিত হল। টেবিলে সব উপাদেয় খাবার সাজানো থাকলেও মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস কিছুই মুখে তুললেন না। তিনি কিছু না খেয়েই, অভ্যাসমতো মেয়েকে আদর না করেই কারখানা ঘরে চলে গেলেন।

বাবার অভাবনীয় কাণ্ড দেখে জেরাঁদে হতভম্ব হয়ে বসে রইল। ভাবল, তবে কি তিনি সুস্থ নন। এ বাড়িতে এ যে একোবারেই অবিস্কার্য কাণ্ড। ইতিপূর্বে এমন কোনো ঘটনা তো আর ঘটে নি। তবে?

স্লামস্টিকা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কর্তা সাহেবের মধ্যে কদিন ধরে অদ্ভুত একটা ভাবান্তর লক্ষিত হচ্ছে। তবে কি ঘাড়ে ভূত চাপল নাকি? ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা তাঁর মধ্যে ভর করেছে। কিসের উদ্বেগ, কেনই-বা তাঁকে এমন অস্থিরতা গ্রাস করে ফেলল, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

কর্তা সাহেবের শিষ্য অবর্তা বলল, 'এ অস্থিরতার কারণ আমি জানি। কয়দিন যাবত অত্যাশ্চর্য একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে। তাঁর তৈরি ঘড়িগুলো ইদানীং এক-এক করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তিনি সারাই করতে গিয়ে কলকজাগুলো খোলাখুলি করেও গলদ ধরতে পারছেন না। সবই ঠিকঠাক, অখচ-'

আগ বাড়িয়ে স্লামস্টিকা বলে উঠল, 'হবার কথা তো বটে! তামা-পেতল দিয়ে বানানো ঘড়ি আবার ভালো হয় নাকি। দম দিয়ে কি আর ঘড়িকে সচল রাখা সম্ভব? এর চেয়ে বরং 'ছায়াঘড়ি' অনেক ভালো ছিল। কোনো জটিল যন্ত্রাংশ নেই। দম দেবার দরকারও হয় না।'

জেরাঁদে সেদিকে কান না দিয়ে বলল, 'এক কাজ করা যাক বরং। চলো গির্জায় গিয়ে বিকল ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেয়ার জন্য আমরা পরম্পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই, যাতে তিনি বাবার তৈরি ঘড়িগুলোকে আবার সচল করে দেন।'

এবার তাঁরা মোমবাতি জ্বেলে, হাঁটুগেড়ে ঈশ্বরের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করল। তারপর সবাই নিজের নিজের ঘরে গুতে চলে গেল।

জেরাঁদে বিছানায় শুয়ে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটাতে লাগল। কিছুতেই মুখোতে পারল না। বাবার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার মধ্যেও ভর করল। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড। যাঁর হাতে ঘড়ি তৈরি তিনিই তার ক্রটি ধরতে পারছেন না! এ নিতান্তই অবিস্কার্য ব্যাপার!

জেরাঁদে যন্ত্রচালিতের মতো লাফ দিয়ে বিছানার ওপর বসে বসে গুনল। হঠাৎ ঝড় উঠেছে। প্রবল ঝড়। ঠিক তখনই ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে কার যেন কণ্ঠস্বর জানালা দিয়ে ভেসে এল। উৎকণ্ঠ হয়ে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করল। হ্যাঁ, করুণ আর্তস্বরই বটে। খাট থেকে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি দিতেই আরও চমকে উঠল। তার বাবার ঘরের জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। ব্যাপার কী? এত রাতে তাঁর ঘরে আলো কেন?

জেরাঁদে উদ্ভাস্তর মতো ছুটে গিয়ে দেখে তার বাবার ঘরের দরজার পাল্লা হাট হয়ে খোলা আর তিনি স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে। ঘড়ির কারিগর জ্যাকারিয়ুস পাগলের মতো বিভ্রিভি করে বলে চলেছেন, 'আমার জীবনে কী-ই আর অবশিষ্ট থাকল? ঘড়িগুলোর মধ্যে আমি আমার প্রাণটাকেই টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। আমার প্রাণের কণাতেই ঘড়িগুলোর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলাম। সোনা, রূপা, লোহা, তামা আর পেতলের মধ্যে আমি মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসই তো সূক্ষ্মভাবে অধিষ্ঠান করছি। আমি তাদের স্রষ্টা, দেবতুল্য। তারা এতদিন আমার অংশ নিয়েই প্রাণবন্ত ছিল। কিন্তু আজ তারা একে একে থেমে গেছে। তবে তো তারা থেমে যাওয়ায় আমার প্রাণের অস্তিত্বও থাকবে না, থেমে যাবে।' এমন সব কথা বিভ্রিভি করে বলতে বলতে তিনি টেবিল আর ঘরময় ছড়ানো যন্ত্রাংশগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে

হল কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, পাচ্ছেন না। বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রাংশ হাতে তুলে পরমুহূর্তেই আবার ছুড়ে ফেলে দিতে লাগলেন। সবই আছে, সবই আছে ঠিকঠাক। কেবল প্রাণের স্পন্দনেরই অভাব। এতদিন যে-প্রাণকে তিনি সযত্নে আগলে রেখেছিলেন আজ তা কর্পূরের মতো উবে গেছে।

জেরাঁদে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে বাবার প্রায় অশ্রুত কথাগুলো শুনে ভাবতে লাগল-ঠিকই তো নিজের আত্মা দিয়ে ঘড়িগুলোকে সৃষ্টি করেছিলেন। এ যে বাস্তবসত্য। একবর্ণও মিথ্যা প্রলাপ নয়।

কখন যে অবার্ট তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে জেরাঁদে টেরই পায় নি। সে বলল, 'জেরাঁদে, রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। ঘরে চলো-শুয়ে থাক গে।'

অবার্টের কথায় জেরাঁদে যেন সন্ধি ফিরে পেল। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আত্মা অবার্ট, ঘড়িগুলোর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বাবা কি পরমপিতার কাছে অপরাধী হয়েছেন?'

এর কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে অবার্ট বলল, 'জানি না অপরাধী কি না। রাত হয়েছে, শোবে চলো।'

অবার্টের সঙ্গে জেরাঁদে নিজের ঘরে ফিরে এল। আর মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস জানালা দিয়ে অপলক চোখে উত্তাল উদ্দাম নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

জেনেভার ব্যবসায়ীদের সততার সুনাম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। আজ লজ্জায় মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের মাথা কাটা যাবার অবস্থা।

এতকাল সবাই বলাবলি করত, মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস নাকি একজন প্রেতসাধক। ডাইনিদের সঙ্গে তাঁর যোগসাজেস রয়েছে। তাই তিনি ধাতুর মধ্যেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। পারেন ঘড়ির মধ্যে হৃদযন্ত্র স্থাপন করে দিতে। আজ সেগুলোই স্তব্ধ। এবার সবাই সরব হল, মাষ্টার কি তবে সত্যিই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী? তা যদি নাই হবেন তবে ঘড়িগুলো নিজে থেকেই এক-এক করে স্তব্ধ হয়ে যাবার কারণ কী? যন্ত্রপাতি সবই জায়গামতো ঠিকঠাক রয়েছে। অথচ ঘড়ি বন্ধ। এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা!

সকাল হলে গুরু-শিষ্যের আলোচনা শুরু হল। আলোচনা ঠিক নয়, জোর তর্কবিতর্ক। কথাপ্রসঙ্গে শিষ্য অবার্ট বলল, 'স্যার, আপনার খুবই অহমিকা। বিজ্ঞান নিয়ে এত বড়াই করা ঠিক নয়।'

'বলো কী হে! বড়াই করব না! আমি তো শুধুমাত্র ঘড়ির কারিগরই নই, প্রাণদাতাও বটে! আমার পরামর্শ অনুযায়ীই তো তুমি ঘড়ি মেরামত-'

'হ্যাঁ, তা করি বটে। কিন্তু আপনিও তো আমার দক্ষতার কথা একবাক্যে স্বীকার করেন।'

'হ্যাঁ, তা করি সত্য। কিন্তু ঘড়িতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পার কি? না, অবশ্যই পার না। লোহা, তামা আর পিতলের মধ্যে তোমার প্রাণকে তো বিলিয়ে দাও না। তাই ঘড়ির মৃত্যুতে তোমার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে না। যাবে কি? কিন্তু আমার মৃত্যু কিন্তু অবশ্যই হবে।'

গুরুকে উদ্ভা প্রকাশ করতে দেখে অবার্ট তোয়াজ করতে লাগল, 'স্যার, ঘড়ির কাজে আপনার জুড়ি মেলা ভার। কোয়ার্জ-ঘড়ি নিয়ে আপনার গবেষণার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

মাষ্টারের মুখে হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। বুক ফুলিয়ে তিনি বললেন, 'খুবই সত্যি কথা বলছে অবার্ট। কোয়ার্জকে কেটে কেটে কীভাবে হীরের আকৃতিবিশিষ্ট করে তোলা সম্ভব সে কৌশল তো আমিই তোমাকে শিখিয়ে দেব হে।'

বাস্তবিকই কোয়ার্জ কাটার কাজে মাষ্টার অনন্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। কোয়ার্জ কেটে কেটে তৈরি করেন। অত্যাশ্চর্য আধার, ঘড়ির চাকা, সূক্ষ্ম ও জটিল সব যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন। এ ঘড়ি নিখুঁত সময় নির্দেশ করবে। ঘড়ি চলাকালীন মনে হবে ঠিক যেন হৃদপিণ্ড ধুকধুক করছে। সত্যি অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বটে।

একটু দম নিয়ে বুড়ো বললেন, 'আমাকে যত বোকাই তোমরা ঠাহর কর না কেন, প্রাণ কী বস্তু আমি কিন্তু তা আবিষ্কার করে ফেলেছি। জানতে পেরেছি, দেহ আর আত্মার মধ্যে কোনো যোগসূত্রের অস্তিত্ব রয়েছে।'

অবার্ট গুরু মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের মুখের দিকে বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সত্যিই তাঁর এ অহমিকা অমূলক নয়। তাঁর শৈশবকালে ঘড়িশিল্প তখন আতুরঘরেই রয়েছে বলা যেতে পারে। তখন ঘড়ির সময়ের দিকটা নয়, সৌন্দর্যের দিকেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত। সোনা, রূপা, তামা ও কাঠ প্রভৃতি খোদাই করে ঘড়ি গড়ে তোলা হত। আসলে তখনকার মানুষ ঘড়ি ধরে কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল না।

কালের পরিবর্তন ঘটল। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতে লাগল। কিন্তু মাষ্টার ঘড়ির পেটুলামের মধ্যে একটা কৌশল আবিষ্কার করলেন। আর তা তাঁর তৈরি ঘড়িগুলোর মধ্যে ব্যবহার করতে লাগলেন। গতি নিয়ন্ত্রণের মূল রহস্যটা আবিষ্কার করে, নির্ভুল সময় দেয়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারায় তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর জ্ঞান করলেন। ভাবলেন, প্রাণের রহস্য তাঁর হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। দেহ ও আত্মার মিলনস্থল তিনি ধরতে পেরে গেছেন।

কথাপ্রসঙ্গে অবার্টকে বললেনও তাই। একটু নড়েচড়ে বসে বলতে লাগলেন 'শোনো অবার্ট, প্রাণ আসলে কী? প্রাণ কতগুলো প্ৰিণ্ডের সমষ্টি বৈ কিছুই নয়। নিজের দেহটাকে বাইরে থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই আমি প্রাণতত্ত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি। দেহটা সুস্থ-স্বাভাবিক থাকলেই প্রাণও ঠিকঠাক থাকে। এটাকে ঠিকঠাক চালানোই তো প্রাণের কাজ। অতএব নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত চাকা বানাতে পারলেই আমার আবিষ্কৃত ঘড়ির প্রাণ, আমার প্রাণেরই কণা ছাড়া কিছুই নয়। আমাদের প্রাণ কী? দেহের গতি ও আত্মার নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে আমাদের প্রাণ। অর্থাৎ প্রাণ হচ্ছে একটি অত্যাশ্চর্য ফল-।'

স্বয়ংক্রিয় নিখুঁত ও নির্ভুল ফল ছাড়া আর কী-ই বা একে বলতে পারি?'

তাঁর মেয়ে জেরাঁদে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবার কথা এতক্ষণ শুনছিল। এবার সে চোখের পানি মুছতে মুছতে

বলল, 'বাবা আমার বৃকে হৃদযন্ত্রের বদলে একটা শিশু থাকলে কি আমি তোমাকে এমন করে ভালোবাসতে পারতাম, বলে?'

মাষ্টার পরিস্থিতিটা সামাল দেবার আগেই সদর-দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হল। ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখে মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস বললেন, 'আর একটা ঘড়ি বুঝি খরাপ হল। যাও অবাট, দেখে এসো তো। আমার হৃদপিণ্ড তো ভুল করতে পারে না।'

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস শয্যা নিলেন। কঠিন ব্যামো। চিকিৎসক এসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিধান দিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁর রোগ নিরাময় করা সম্ভব হল না। জেনেভার ঘড়ির কারিগররা তার বিচিত্র ব্যামোর কথা শুনে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়ল। একদিকে তাঁর ঘড়িগুলো এক এক করে বিকল হয়ে পড়ছে, আর সে সঙ্গে তাদের সৃষ্টিকর্তা মাষ্টারও শয্যা নিলেন। চিকিৎসকরা মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করেছেন তার হৃদযন্ত্রের গতি শুদ্ধ হয়ে গিয়েও, পরমুহূর্তে আবার টিকটিক করে চলতে শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে তারা শেষপর্যন্ত সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। অদ্ভুত-একেবারেই অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে।

আগেকার গুজবটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তবে কি মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস সত্যিই শয়তানের চর-সাক্ষাৎ শয়তান। পিশাচসিদ্ধ পুরুষ? ডাইনির সঙ্গে তাঁর যোগসাজেস রয়েছে?

মেয়ে জেরাঁদে আর শিশ্য অবাট যথাসাধ্য সেবাযন্ত্রের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে লাগল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের ইচ্ছা, একটু সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর সাধের জেরাঁদেকে অবাটের হাতে তুলে দিয়ে তাকে জামাই করে নেবেন। শহরের বাসিন্দারা বলাবলি করত, বুড়ো মাষ্টার শিষ্যের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে তাকে ঘরজামাই করে রাখার ধান্য্য রয়েছে। এ-প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠলে অদ্ভুত একটা দৃশ্যের অবতারণা ঘটতে দেখা যায়। অতি কদাকার একটা মূর্তিকে নজরে পড়ে। একে এর আগে কোনোদিনই শহরে দেখা যায় নি। তার মুখটা ঠিক যেন একটা ঘড়ির ডায়াল। আর ঘড়ির দেহটার মতো তার দেহকাণ্ডটা। হাত থেকে ঘড়ির কাঁটার মতো থেকে থেকে নাড়াচাড়া করে। বৃকে কাত করে রাখলে নির্যাত শোনা যাবে ভেতরে অনবরত টিকটিকানি চলছে। গ্রীবা বিস্তার করলে মনে হয় বুঝি বা খাঁজকাটা দাঁতগুলোর মধ্যে দিয়ে অনবরত চাকা ঘুরে চলছে। লক্ষ করলে দেখা যায়, বেটেখাটো কুদর্শন মানবুটা প্রতি ঘণ্টায় এক লিগ পথ রোজ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেয়। বৃত্তাকার পথে চলে। রোজ দুপুর বারোটোর ঘণ্টা বাজার সময় তাকে গির্জার তলায় ঠিক মোতায়েন থাকতে দেখা যায়।

এবার থেকে কুদর্শন বেটে লোকটাকে সর্বত্র দেখা যেতে লাগল। তবে জেরাঁদে আর অবাটের বিয়ের কথা যেখানেই উত্থাপন করা হয় সেখানে সে আচমকা দেখা দেবেই। শুধু কি এই? খাঁজকাটা দাঁতের পাটি বের করে বিন্দুপাত্তক স্বরে বলে ওঠে-'ধুৎ! এ বিয়ে কিছুতেই হবার নয়!'

এক বিকালে জেরাঁদে তার বাবাকে নিয়ে পথে পায়চারি করার সময় অত্যাশ্চর্য মূর্তিটাকে দেখতে পেল। তার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে। মুখের দিকে চোখ পড়ামাত্র ফিক করে হিসে ফেলে।

আর একদিন বেড়াতে বেড়াতে কুদর্শন সে লোকটাকে দেখেই জেরাঁদে চমকে উঠে তার বাবার হাত চেপে ধরল। ভীত সন্ত্রস্ত, কাঁপা কাঁপা গলায় কোনোরকমে উচ্চারণ করল, 'বাবা, ওই কিছুতকিমাকার লোকটা আমার দিকে কেমন ঢাবা ঢাবা চোখে তাকাচ্ছে।'

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস মুচকি হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'কেন শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিস জেরাঁদে। ওটা একটা ঘড়ি। ঠিকই তো চলছে। এখন চারটে বাজে।'

চোখের তারায় অবিশ্বাসের ছাপ ঐকে জেরাঁদে তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নতোক্তি করল, 'ঘড়ি? এ কী অদ্ভুত কথা! বাবা কি সত্যি মানুষ, নাকি তাঁর মধ্যে পিশাচ ভর করেছে? মানুষের মুখে ঘড়ির কাঁটা কী করে খুঁজে পেলেন, মাথায় আসছে না তো!'

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস বাড়ি ফিরে কারখানা ঘরে ঢুকলেন। কয়েক মুহূর্তে নিশ্চল-নিখর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ঠিক পাঁচটা। আশ্চর্য ব্যাপার! ঘড়িগুলোতে আগে পরে পাঁচটার ঘণ্টা বাজতে লাগল। এর আগে এমন ঘটনা ঘটে নি কোনোদিন। সব কয়টা ঘড়িতে একইসঙ্গে পাঁচটার পর ঘণ্টা বাজত। সামান্য হেরফের হত না। একের পর এক ঘড়ির ঘণ্টা পনের মিনিট ধরে বাজল। ব্যাপারটা তাঁর মধ্যে আরো বেশি অস্থিরতা জাগিয়ে তুলল। এমন এক চরম মুহূর্তে হঠাৎ কে যেন তার দরজায় করাঘাত করল। বট করে দরজা খুলতেই দেখা গেল অবিকল ঘড়ি মতো দেখতে মূর্তিমান সেই কিছুতকিমাকার লোকটা দাঁত বের করে দরজায় দাঁড়িয়ে।

কোনোরকম ভূমিকা না করে সে বলে উঠল, 'আমি আপনার সেবা করার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। সূর্যের ওপর খবরদারি করাই আমার একমাত্র কাজ। আমি নির্যাত আপনার বাগ না মানা ঘড়িগুলোকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হব।'

শুকনো গলায় মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস বললেন, 'আমি কি ততদিন পৃথিবীতে থাকব? ধড়ে কি প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে?' কথটা বলেই তিনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

খ্যাকখ্যাক করে হেসে অদ্ভুত লোকটা বলল, 'কী যে বলেন! পৃথিবীতে থাকবেন না কেন, বলুন তো? অবশ্যই থাকবেন।'

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'ঠিকই তো। ঠিক কথাই তো বলেছ। কেন বাঁচব না! আমার তো মৃত্যু হবার কথা নয়। ঘড়ির সৃষ্টিকর্তা আমি। ঘণ্টা, মিনিট আর সেকেন্ডের জন্মদাতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা পরমপিতার মতোই আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আমার মৃত্যু নেই। আমি অমরাত্মা! আমি মৃত্যুঞ্জয় পরমপিতারই সমান। সমান ক্ষমতাস্বরূপ।'

'দেখুন স্যার, শয়তান ও নিজেকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে তুলনা করে থাকে। তাই তো আমি যে আদপ ঘড়িগুলোকে টিট করতে ছুটে এসেছি।'

'কিন্তু কীভাবে তো সম্ভব করবে, বল তো?'

'উপায় জ্ঞানার আগে আপনার মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।'

'সে কী কথা! এ যে নিতান্তই অসম্ভব প্রস্তাব! অবাটের সঙ্গে তার বিয়ে দেব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে আমি নিয়ে রেখেছি।'

'একবারেই অলীক কল্পনা। অবাকের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হবার নয়।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এবার সে বলল, 'বহুং আচ্ছা। তবে আমি বিদায় নিচ্ছি। শুনে রাখুন সাহেব, বিয়েটা না হলে আপনার রোগ নিরাময়ও হচ্ছে না। ঘড়িগুলোও মেরামত হচ্ছে না। বিদায়, বিদায় মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস।' লম্বা লম্বা পায়ে সে বাড়ির সীমানার বাইরে চলে গেল। ঠিক তখনই তাঁর বৃকের ভেতরে কে যেন পর পর দুবার হাতুড়ির আঘাত হানল। ছয়টা বাজল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের রোখ চেপে গেল। তাঁকে বাঁচতেই হবে। যে করেই হোক ঘড়িগুলোকে মেরামত করে আবার চালু করবেন। অবাকের সঙ্গে আদরের দুলালী জেরাঁদের বিয়ে তিনি দেবেনই। বারবার তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে অদ্ভুতদর্শন লোকটার ভবিষ্যদ্বাণী জেগে উঠতে লাগল, 'অবাকের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে কিছুতেই হবার নয়।' কথাটা যখনই তাঁর মনের কোণে ভেসে ওঠে তখনই অধিকতর উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ঘড়ি সারাইয়ের কাজে মেতে ওঠেন। প্রতিটা যন্ত্রাংশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। না, কোথাও কোনো ত্রুটিই তো ধরা পড়ছে না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! তবে কেন ঘড়িগুলো অচল-অনড় হয়ে পড়ছে।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের আশ্চর্যরিতা কিছু এতটুকুও হাস্য পায় নি। এখনো তিনি নিজেকে সৃষ্টিকর্তা পরমপিতার সমান জ্ঞান করেন। শহরের কোথাও, কারো বাড়িতে ঘড়ি বিকল হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র উজ্জ্বল মতো সেখানে ছুটে যান। ঘড়ি বারবার নাড়াচাড়া করেন, কষে দম দেন। কিছু হয়! পেতুল্যাম কিছুতেই দোলে না। স্থবির, একেবারে অনড়। প্রায়শ বারবারই ব্যর্থ হয়ে যান।

অবাক ভেবে চিন্তে বলে, 'স্যার, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যন্ত্রাংশগুলো হয়তো ক্ষয় হয়ে গেছে। চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কি-লক জায়গা মতো না বসায়-'

তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস ধমক দিয়ে ওঠেন, 'খুৎ! যতসব অবাস্তব কথা, চাকার দাঁত ক্ষয় হয়ে গেছে-অসম্ভব। প্রত্যেকটা আমার টুকরো আঙুলে নরম করে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে নিজে হাতে যন্ত্রাংশগুলো তৈরি করেছি। আর যে-সব শিশু ব্যবহার করছে তাও মামুলি শিশু মোটেই নয়। কিছুতেই সেগুলো ক্ষয়ে ক্ষয়ে অকেজো হয়ে পড়তে পারেন না। নির্ধাত ঘড়ির ভেতরে ভূতপ্রেত ঢুকে ঘাপটি মেরে রয়েছে।'

ঘড়ির মালিকদের ঘন ঘন যাতায়াতে বাড়িতে তিষ্ঠনাই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়ি ফেরত-তারা কড়া কথা, গালমন্দ করতেও দ্বিধা করছে না। টাকার থলেতে টান পড়ল। এবার তিনি বাসনপত্র বিক্রি করে ঘড়ির ক্রেতাদের দাম ফেরত দিতে লাগলেন। তারপর আসবাবপত্রও হাত পড়ল। শেষপর্যন্ত অবাক নিজের সঞ্চিত অর্থ তুলে দিয়ে শিক্ষাগুরুর মান বাঁচাতে লাগল।

পরিচারিকা স্ফলস্টিকা তার প্রভুর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কথা বড়াই করে প্রতিবেশীদের কাছে বলে। কেউ তার প্রভুর কুৎসা গাইলে সে ছেড়ে কথা বলে না। বরং বুক ফুলিয়ে বলে, 'সব ঘড়ি বিকল হয়ে যাচ্ছে কোন নিম্নক বলো? লোহার সে-ঘড়িটার কথা মনে নেই? দাম এতই বেশি যে জেনেভার কারোর হিম্মতেই কুলোয় নি। আঁদোনাভের বাগানবাড়িতে সেটা গেলে আজ দেখা যাবে।'

হ্যাঁ, তার কথা শতকরা একশো ভাগই সত্যি। অত্যাশ্চর্য যে লোহার ঘড়িটা মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি, স্বীকার করতেই হয়। বিশ বছর ধরে প্রাণবন্ত মানুষের মতো আজও সেটা রীতিমতো সচল রয়েছে। নিজে থেকে চলে। কারো দেখার করার দরকার পড়ে না।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস মনের দিক থেকে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। শেষপর্যন্ত মেয়ে জেরাঁদের বিয়েটা দিয়ে যেতে পারবেন কি না, যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে।

সম্প্রতি তার গির্জায় যাওয়া, প্রার্থনাসভায় যোগদান করা শিকয়ে উঠে গেছে। শয়তান ক্রমেই কাঁধে চাপছে, ঈশ্বর দূরে সরে যাচ্ছেন।

এক রবিবার সকালে জেরাঁদে তাঁকে খুব করে বুঝিয়ে শুনিয়ে গির্জায় নিয়ে গেল। তিনি গির্জার এক কোণে জুবুখুব হয়ে বসে রইলেন। তাকে দেখেই উপস্থিত সবাই ভয়ে সরে গেল।

সবাই যখন প্রার্থনাসঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করল তিনি তখন জুলজুল করে তাকিয়ে রইলেন। তাবটা এমন যে, তিনি ঈশ্বরের চেয়ে কোন অংশে কমতি? একেই বলে শয়তান কাঁধে চাপা।

গির্জার নিয়ম অনুযায়ী দুপুর ঠিক বারোটায় দেবদূতের প্রার্থনা হয়। সবাই ঘড়িতে বারোটো বাজার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে বারোটোর কাছাকাছি এগিয়ে গল। হঠাৎ মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন। ঘড়ির কাঁটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেছে। আর কোনোদিন বারোটো বাজবে না। কোনোদিনই না।

গির্জার ভক্তরা মাষ্টারকে আচ্ছন্নমতো পিটুনি দিল। সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আশ্চর্য ব্যাপার। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি আবার চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার মৃত্যু নেই! আমি জ্যাকারিয়ুস! আমি অমর! কে বলল আমি মাঝা মাঝা যাব? আমার হিসেবের খাতা কোথায়?'

কথা বলতে বলতে তিনি তাক থেকে একটা খাতা টেনে নিয়ে উন্মাদের মতো তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তাঁর ঘড়ি বিক্রির সংখ্যা দেখে নিলেন। হাতে ক্রেতাদের নাম-ঠিকানা বিস্তারিতভাবে লেখা। দেখলেন, একটা ঘড়ি ছাড়া বাকি সব ঘড়িই তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। একমাত্র লোহার ঘড়িটার কথা উল্লেখ নেই। তবে? সেটা এখনো স্তব্ধ হয়ে যায় নি? তাতে প্রাণের অন্তিম রয়েছে? তবে সেটা এখনো ঠিকঠাক। আছে। আবার উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠলেন, 'বন্ধ হয় নি। এখনো চলছে সেটা। আমি যাব। তদ্ব্যস্ত করে বের করব লোহার ঘড়িটাকে। কিছুতেই বন্ধ হতে দেব না। কিছুতেই না। তার প্রাণপাখি এখনো সাড়া দিচ্ছে, ধুকধুক করছে। সেটাকে জিইয়ে রাখলেই আমিও বেঁচে থাকব। আমি হব মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুকে জয় করে বেঁচে থাকব অনন্ত কাল।' কথা বলতে উত্তেজনাবশত আবার তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

মৃত্যুপথযাত্রী মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের মধ্যে এক অভাবনীয় অমানুষিক শক্তি আশ্রয় নিল। মৃত ব্যক্তি যেন সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রাণ ফিরে পেলেন। হঠাৎ একদিন তিনি বেপাজ হয়ে গেলেন।

জেরাঁদে সারা জেনেভা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও বাবার হদিস পেলেন না।

অবাকও গুরুর খোঁজ করে হতাশ হয়ে বলল, 'তিনি নির্ধাত ওই লোহার ঘড়িটার খোঁজে ছুটেছেন। তাঁর প্রাণপাখি যে ওই ঘড়িটার মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।'

অবার্ট আর জেরাঁদে হিসাবের খাতা খেঁটে বের করল লোহার ঘড়িটার ক্রেতার নাম, ঠিকানা। দেখল, সেটা সুইজারল্যান্ডের শেষপ্রান্তে আঁদেরনাতের বাগানবাড়িতে, জেনেভা থেকে বিশ ঘণ্টার রাস্তা।

মুহূর্তমাত্র দেরি না করে অবার্ট আর জেরাঁদে পরিচারিকা ক্লান্তিকাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের আঁদেরনাতের বাগানবাড়ির উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

পথ চলতে চলতে তারা তিনজন রাত্রির অন্ধকারে ক্রান্ত অবসন্ন দেহে এক মঠে হাজির হল।

মঠের পাদরির সামনে জেরাঁদে কঁাদতে কঁাদতে তার বাবা মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের অন্তহীন অহমিকার কথা বলতে লাগল।

এমন সময় দরজায় দমাদম করাঘাত হতে লাগল। দরজা খুলতেই উন্মাদপ্রায় জ্যাকারিয়ুস ছুটে এসে ঘরের মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

জেরাঁদে বাবাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বহুভাবে বুঝাতে লাগল।

বুড়ো জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন, 'কোথায় যাব? কেনই বা যাব? আমার প্রাণের অস্তিত্ব যেখানে নেই সেখানে আমি তো থাকতে পারি না। আমি তো সেখানে প্রাণহীন জড়পদার্থ। আমি আমার প্রাণের কাছে—আঁদেরনাতের বাগানবাড়িতে। আমাকে তোরা বাধা দিসনে। আমার বাঙ্কিত প্রাণের কাছে আমাকে যেতে দে! আঁদেরনাতের বাগানবাড়িই—'

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মঠের পাদরি সাহেব সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস, আমার কথা তনু—আত্মার মতো নেই। আত্মা অক্ষয়-অমর।'

'আমি একথা জানি, আমিও। সে অক্ষয়-অমর আত্মাকে তো আমিই সৃষ্টি করেছি। আমি মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস, আত্মাকে সৃষ্টির পর লোহার খাঁচায় বন্দি করে রেখেছি। আমার সৃষ্ট আত্মা এখন বন্দি হয়েই রয়েছে।

পাদরি সাহেব বুকে ক্রশ একে সবিষ্ময়ে বলে উঠলেন, 'এ কী পাপকথা! এ কী পাপ! একথা শুনেও যে নরকগামী হতে হবে! এ কী পাপকথা।'

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুহূর্তে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আমি যাই আমার সৃষ্ট আত্মার কাছে। আমার আত্মার কাছে—আমারই সৃষ্ট আত্মার কাছে।'

অবার্ট, জেরাঁদে আর পরিচারিকা ক্লান্তিকা তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

হায়! এ কী হল। কোথায় গেলেন মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস? অন্ধকার আর দুর্যোগের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন তিনি?

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের মধ্যে যেন অমানুষিক শক্তি ভর করেছে। অন্ধকার আর দুর্যোগ অপেক্ষা করে উন্মাদের মতো তিনি হাজির হলেন আঁদেরনাতের বাগানবাড়িতে, পুরনো ভাঙাচোরা দুর্গে।

লোকে বলে, আঁদেরনাতের বাগানবাড়ির দুর্গে অশরীরীরা ছাড়া নাজি কেউ থাকে না। একসময় যে দুর্গপ্রাসাদ মানুষের কর্মচাক্ষুণ্যে গমগম করত, আজ সেখানে বিরাজ করছে অবর্ণনীয় নিস্তব্ধতা। অশরীরী আত্মা আর বিষধর সাপের নিশ্চিন্ত আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো দুর্গের দরজায় করাঘাত করতে করতে চিৎকার করতে লাগলেন, 'দরজা খোলো! দরজা খোলো! আমার আত্মা—আমার সৃষ্ট আত্মা আছে এখানে।'

অমানুষিক শক্তি প্রয়োগ করে অনবরত ধাক্কাধাক্কিতে পুরনো দুর্বল দরজা বেশিক্ষণ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারল না। একসময় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো ছুটে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলতে লাগল, 'আমার আত্মা! কোথায় আমার আত্মা—আমার সৃষ্ট আত্মা!'

তার পিছন পিছন অবার্ট, জেরাঁদে আর পরিচারিকা ক্লান্তিকা শ্রেতপুরীর মতো অন্ধকার কামরটায় ঢুকে গেল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি, তাঁর সৃষ্ট অতিকায় লোহার ঘড়িটা দেয়ালের গায়ে বুলছে। বিশ বছর আগে তিনি মনপ্রাণ সঁপে, নিজেকে নিভেড়ে দিয়ে তিল তিল করে তৈরি করেছিলেন নিজের হৃদপিণ্ডের সমান অত্যাশ্চর্য এ লোহার ঘড়িটাকে।

অন্ধকার ভেদ করে কিছুতকিমাকার সেই বেটেখাটো লোকটা মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের সামনে এসে দাঁড়াল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস সচকিত হয়ে প্রায় আতঁনাদ করে উঠলেন, 'কে? কে তুই? কী চাস এখানে? কে তুই?' কিছুতকিমাকার লোকটা উন্মাদের মতো বিকট স্বরে দাঁত বের করে হেসে, জবাব দিল, 'আমি এ ঘড়ির মালিক। আমার নাম পিস্তোনোচ্চিয়ে। মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস, উচিতমূল্য দিয়ে আমি এ-ঘড়িটা আপনার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম। এখন এর একমাত্র মালিকানাধীন আমি।'

'আমার আত্মা যে এ ঘড়ির মধ্যে বাঁধা আছে। আমার আত্মা—'

তাকে মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে অদ্ভুত দর্শন লোকটা এবার বলল, 'মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস, তাই তো ঘড়িটা আপনার হাতেই তুলে দেয়ার জন্য আমি উদগ্রীব। এর বিনিময়ে আমি কী চেয়েছিলাম, আশা করি তুলে যান নি? আমার হাতে আপনার মেয়েকে তুলে দিতে হবে। মানে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

উত্তেজনায কাঁপতে কাঁপতে অবার্ট গুলিবিদ্ধ জানোয়ারের মতো গর্জে উঠল—বজ্জাত শয়তান! বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চাচ্ছিস। তোর বিয়ের সাধ জনোর মতো মিটিয়ে দেব! ঘৃষি পাকিয়ে তার দিকে এগিয়ে যেতেই তাকে হঠাৎ থমকে ঘেতে হল। কাকে মারবে? কোথায় কিছুতকিমাকার লোকটা? সে যে চোখের পলকে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। একেবারে ভোঁ-ভোঁ।

জমাটবাধা অন্ধকারে কবরস্থলের নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। অলৌকিক নীলাভ এক আলো যেন ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মৃত্যুঘড়িটা থেকে থেকে নীরবতা ভঙ্গ করে বেজে উঠতে লাগল।

একসময় ভাঙা জানালা দিয়ে ভোরের আলো উঁকি দিল। কিন্তু মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস কোথায়? সবাই ছুটোছুটি করে ভাঙাচোরা দুর্গপ্রাসাদের সর্বত্র তন্ন তন্ন করে উন্মাদের মতো তাঁর খোঁজ করতে লাগল। নাম ধরে বারবার ডাকাডাকি করল। না, কেউ সাড়া দিল না।

সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে সবাই উল্কাস্তের মতো বিশালায়তন হলঘরটায় হাজির হল। হঠাৎ দেখতে পেল মড়ার

মতো আড়ষ্ট অবস্থায় বুড়ো জ্যাকারিয়ুস এক কোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। আর একটা শ্বেতপাথরের টেবিলের কাছে অভ্যুদগমন সে লোকটা বসে।

তারা ঘরে ঢুকতেই মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো ছুটে এসে জেরাঁদের মাথায় হাত রেখে বলে উঠলেন, 'জেরাঁদে-মা আমার, ওই দেখ, তোমার ভাবী স্বামী বসে রয়েছে। ওর স্পন্দেই আমি তোমার বিয়ে দেব। দেখ, ভালো করে চেয়ে দেখ।'

জেরাঁদে দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্ননাদ করে উঠল, 'না, না! এ যে অসম্ভব বাবা! একেবারেই অসম্ভব!'

অভ্যুদগমন লোকটা দাঁতের পাটি বের করে হোঁ হোঁ করে হেসে উঠল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উন্মাদের মতো গর্জে উঠলেন, 'এ কী কথা! আমার কথা অমান্য করবে জেরাঁদে!' পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে আবেগমধুর স্বরে বলতে লাগলেন, 'আমার কথা শোনো মা, আমাকে বাঁচতে দাও। ওই ঘড়িটার মধ্যে আমার প্রাণপাখি বাঁধা রয়েছে। এখনো লোকটা এর মালিক। ঘড়িটার চাবিকাঠি ওর কাছে গচ্ছিত আছে। দম দিতে হবে। কতদিন ওটাতে দম দেওয়া হয় নি। অনেকদিনের ময়লা জমে রয়েছে। দম দিতে হবে। চাবি চাই। জেরাঁদে-মা আমার, আমাকে ভূমি কি মেরে ফেলতে চাও? ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। ভূমিই-হ্যাঁ, জেরাঁদে একমাত্র ভূমিই পার আমাকে বাঁচাতে। আমি বাঁচতে চাই! আমাকে বাঁচতে দাও জেরাঁদে। পাঁচটা বাঁচল। শোনো, কান পেতে শোনো জেরাঁদে, আমার প্রাণপাখি কী বলে।'

ঠিক সে মুহূর্তেই দেয়ালের অতিকায় লোহার ঘড়িটা ঢং-ঢং করে পাঁচটার শব্দ করল। তখনই অদৃশ্য কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হল, 'তোমাকে বিজ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতেই হবে। অবশ্যই খেতে হবে।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখে জেরাঁদে আর অবার্ট রীতিমতো আঁতকে উঠল। এ কী সর্বনেশে বাণী রে বাবা। এমন কোনো ঘটনা, এমন বাণী তো তার বাবার তৈরি কোনো ঘড়ি থেকে কোনোদিনই নির্গত হয় নি। এ কী ভূতুড়ে কাণ্ড রে বাবা!

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস মেয়ের হাত ধরে ভাবাগ্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'জেরাঁদে-মা আমার, আমি বাঁচতে চাই। অনেক, অনেক দিন বাঁচতে চাই। আমাকে ভূমি বাঁচতে দাও। আমি অবিনশ্বর হতে চাই মা। আমার সৃষ্ট ঘড়িগুলোর মধ্যে একমাত্র একটাই এখনো সচল, এখনো বেঁচে আছে। আমি এর মধ্য দিয়েই অক্ষয় অমর হব। একমাত্র ভূমিই পারো আমাকে বাঁচাতে। রাজি হয়ে যাও মা।'

জেরাঁদে ফ্যাকাশে-বিবর্ণ মুখ তুলে অবার্টের দিকে তাকিয়ে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'প্রিয়তমে, ভূমি আমাকে জুল বুঝো না। বুঝতেই পারছ, আমার বাবার প্রাণ, তাঁর মরণ-বাঁচন একমাত্র আমার ওপরই নির্ভর করছে।'

মেয়ের সম্মতি পেয়ে মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস উল্লসিত হয়ে কিছুতকিমাকার লোকটাকে বললেন, 'আমি রাজি। জেরাঁদে তোমাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। আজ রাত ঠিক বারোটায় আমি তোমার হাতে আমার আদরের দুলালী জেরাঁদেকে তুলে দেব। তোমাদের বিয়ে হবে।'

কথা বলতে বলতে বাজপাখির মতো হোঁ মেরে তার হাত থেকে চাবিটা নিয়ে উন্মাদের মতো ঘড়িটার কাছে ছুটে গেলেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তাতে দম দিতে লাগলেন। দম দিতে দিতে বললেন, 'যাক, একশো বছর, এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত। অনেক, অনেক দম দিয়েছি। এক শতকের জন্য নিশ্চিন্ত। আমার আত্মার স্পন্দন অব্যাহত থাকবে।' কথা বলতে বলতে তিনি দুম করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

এদিকে একটা প্রাণের বিনিময়ে কিছুতকিমাকার লোকটার হাতে শ্রেয়সীকে তুলে দিতে চলেছেন দেখে অবার্ট হতশা হয়ে বৃদ্ধ পাদরির কাছে ছুটে গেল।

পাদরি সাহেব অবার্টের সঙ্গে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে দেখলেন, জেরাঁদে নিশ্চল-নিথর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে।

বুড়ো মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস অতিকায় লোহার ঘড়িটায় কান লাগিয়ে তন্ময় হয়ে শুনেছেন তার টিক-টিক-টিক শব্দ। তার হৃদপিণ্ডটায় থেকে থেকেই এই টিক-টিক-টিক শব্দ উথিত হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটাটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে-বারোটায় ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে বীরমুহুর গতিতে। আর মাত্র কয়েক ঘর, মাত্র কয়েক ঘর এগিয়ে গেলেই ঢং-ঢং-ঢং করে বারোটায় ঘণ্টা বাজবে।

মঠের পাদরি যন্ত্রচালিতের মতো এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে ঘড়ির কাঁটাটাকে চেপে ধরলেন। ঘড়িটার টিকটিকানি বন্ধ হয়ে গেল, স্তব্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। আর কোনোদিনই বারোটো বাজবে না।

মুহূর্তে বিকট আওয়াজ হল। যেন বাজ পড়ল। ঘড়িটা ভেঙেচুরে একসার হয়ে গেল। আর যন্ত্রাংশগুলো চারদিকে ছিটকে পড়ল। অভ্যুত কৌশলে শিশুটা সর্পিলাগতিতে এগিয়ে চলল। উন্মাদের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস শিশুটাকে ধরতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ঝট করে মুঠো থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কিছুতকিমাকার লোকটা সেটা ধরে ফেলল। তার কুদর্শন মূর্তিটা যেন মুহূর্তে মাটিতে মিলেয়ে গেল।

মাষ্টার জ্যাকারিয়ুস মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর নিথর দেহটা মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। নিশ্চাপ নিস্তব্ধ। শেষ! সব শেষ!

পাদরির উপস্থিতিতে অবার্ট আর জেরাঁদের বিয়ে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। তারা জীবনভর বিজ্ঞানতাপস মাষ্টার জ্যাকারিয়ুসের আত্মার শান্তির জন্য পরমপিতার কাছে প্রার্থনা জানাল।

মিস্ট্রিয়াস ডকুমেন্ট

১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দের উনত্রিশে জুলাই।

নর্থ চ্যানেল দিয়ে হেলতে দুলতে একটা ছোট্ট জাহাজ এগিয়ে চলেছে। তার চোঙ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। মাস্তুলের ডগায় ব্রিটিশ পতাকাটা পংপং করে উড়ছে। আর সোনালি সুতো দিয়ে আঁকা ইংরেজি 'ই. জি.' অক্ষর দুটো, মার্কুইসের নিম্নপদস্থ অভিজাত আর্লের সম্মানসূচক চিহ্ন।

জাহাজটার গায়ে তার নাম 'ডানকান' কথাটা স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। মালিকের নাম লর্ড গ্লেনারভান। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল টেমস ইয়ট ক্লাবের এক নামকরা সদস্য। তাঁর সহধর্মিণীও লেডি হেলেনা সঙ্গে রয়েছেন। আর রয়েছেন তাঁর খালাতো ভাই ম্যাকনবস।

জাহাজ উত্তাল উদ্দাম সমুদ্রের বুক চিরে উদ্ধার বেগে ধেয়ে চলেছে। হঠাৎ দূরে, অনেক দূরে একটা বিশালায়তন মাছ দেখা গেল।

জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে লর্ড গ্লেনারভান জানতে পারলেন, সেটা একটা হাঙর। এরা স্থানীয় মানুষদের কাছে 'ব্যালেন ফিস' নামে পরিচিত। দুর্দান্ত প্রকৃতির। লর্ড গ্লেনারভান ক্যাপ্টেনকে নির্দেশ দিলেন হাঙরটাকে মারার জন্য।

ব্যাপারটা লেডি হেলেনাকে দেখানোর জন্য তাঁকে ডেকে আনানো হল।

নাবিকরা মোটা দড়ির মাথায় শক্ত বঁড়িশি বেঁধে তার সঙ্গে মাংসের টুকরো গেঁথে দিল। এবার সেটাকে ফেলে দেয়া হল সমুদ্রের পানিতে। মাংসের গন্ধে হাঙরটা দ্রুত বেগে ধেয়ে এল। তার কালো আর ছাই রঙের ডানাটা কেবল জলের ওপর ভেসে রইল। থেকে থেকে তার মাথাটা ভুস করে জলের ওপর ভেসে উঠতে লাগল। হ্যাঁ করামাত্র ঝকঝকে চকচকে দাঁতের পাটি সূর্যের কিরণে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন, এরা মৎস্যপরিবারের জঘন্যতম শ্রেণী।

ছুটতে ছুটতে এসে হাঙরটা টপ করে বঁড়িশিসহ মাংসের টুকরোটা গিলে ফেলল। ব্যাস, দড়ি ধরে টানতে শুরু করল। তাকে কাবু করার জন্য এবার তারা ল্যাজে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে সবাই মিলে ডেকের ওপর তুলে নিল। একজন নাবিক মসৃণ কুড়ুলের এক কোপে তার ল্যাজটাকে কেটে ফেলল।

নাবিকরা এবার তার পেট চিড়ে সোনা দানা কিছু আছে কি না দেখতে লাগল।

লেডি হেলেনা সে বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে না পেরে দ্রুত নিজের কেবিনে চলে গেলেন। হাঙরটার ওজন প্রায় দুশো পাউন্ড। আর দৈর্ঘ্য দশফুট তো হবেই। সেটাকে টুকরো টুকরো করে নাবিকরা জলে ফেলে দেয়ার জন্য তৈরি হতে লাগল। ঠিক তখনই দেখা গেল তার পাকস্থলিতে পাথরের টুকরোর মতো কী যেন ঝুলছে। ঘাঁটাঘাটি করে তারা একটা বোতল বের করল। ফিদের জ্বালায় কবে এটাকে গিলে ফেলেছিল কে জানে। বোতলের কথা শুনে কেবিন থেকে লেডি হেলেনা ছুটে এলেন। বোতলের ছিপিটা খোলা হল। তার ভেতর থেকে বের করা হল কয়েকটা কাগজের টুকরো। খুবই জীর্ণদশা। কী সব লেখা সেগুলোর গায়ে। প্রায় মুছে গেছে। তিনটে কাগজেরই একই হাল হয়ে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান কাগজ তিনটেকে আলোর সামনে নিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনটে দলিল। ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান তিন ভাষায় তর্জমা করা। যেটুকু ইংরেজিতে লেখা তা হল—'Sink, a land, this. and. los, শব্দগুলো সম্পূর্ণ। আর 'Skip' এক জায়গায় লেখা, শেষেরটুকু মুছে গেছে। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'Skip' বলতে 'Skipper' বুঝানো হচ্ছে। আর একজায়গায় লেখা রয়েছে 'gr'। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'মনে হচ্ছে 'gr' জাহাজটার নামের অংশবিশেষ। অর্থাৎ যে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে তার কথা বলতে চাইছি।'

ক্যাপ্টেন কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বলতে লাগলেন, 'docum এবং assistance শব্দাংশ দুটোর বক্তব্য অবশ্য পরিষ্কার। নিশ্চয়ই এদের একটার দ্বারা document এবং Assistance অন্যটার দ্বারা বুঝে নিতে হবে।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু অনেকগুলো ছত্র যে মুছে গেছে। জাহাজের নাম, জাহাজডুবির জায়গাটার নাম-ঠিকানা কিছুই তো পাওয়া যাচ্ছে না।' মেজর কপালের চামড়ায় চিন্তার ভাঁজ একে বললেন।

এবার ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় কাগজটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন, 'সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এটার। এখানে লেখা '7 Juni' মানে ৭ জুন, ইংরেজি কাগজটার সঙ্গে তারিখটা জুড়ে দিলে মানে দাঁড়াচ্ছে, ৭ জুন, আঠারোশো বাষষ্টি। জার্মান glas-এর পাশে ইংরেজি 'gow'-কে এনে রাখলে মানে দাঁড়াচ্ছে 'Glasgow'। এতে বোঝা যাচ্ছে, জাহাজটা গ্লাসগো বন্দরের। কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রটার অস্তিত্বই নেই। সম্পূর্ণ মুছে গেছে। তবে তৃতীয় ছত্রে দুটো খুবই দরকারি দুটো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। জার্মান ভাষায় 'Zwei' মানে দুই। আর 'atresen' বা 'matrosen' উভয়ের অর্থই নাবিক। চতুর্থ ছত্রে দেখা যাচ্ছে 'graus' শব্দটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারছি নে। তৃতীয় কাগজটা থেকে যদি এর অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। আর বাকি শব্দ দুটো—'bring ihem' আর 'bring ihhen'-কে ইংরেজি 'assistance' অথবা 'assistance'-এর পাশে রাখলে হবে 'bring them assistance'—এতে বুঝাচ্ছে সাহায্য পাঠাও।

লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'সাহায্য পাঠাতে বলছে। কিন্তু কীরকম সাহায্যের কথা বলতে চাইছে তার পরের কাগজটা থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।' তৃতীয় কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে তিনি এবার বললেন, 'এটা ফরাসি ভাষায় লেখা। আমাদের কারোই পড়তে অসুবিধা হবে না। এই যে, এখানে লেখা 'trois' এবং 'ats'—বলতে চাইছে, 'trois mats' অর্থাৎ তিনটে মাস্তুল বিশিষ্ট জাহাজ। ফরাসি আর ইংরেজি কাগজ দুটোর বক্তব্য জুড়ে জাহাজটার নাম পাওয়া যাচ্ছে 'Britania' এবং 'Austral'-এর ফরাসি ও ইংরেজিতে একই অর্থ—দক্ষিণ দিক।'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'তবে বুঝা যাচ্ছে, ভূগোলকের দক্ষিণার্ধে জাহাজডুবিটা হয়েছে, তাই না?' লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'হ্যাঁ। তারপর দেখুন, Eabor হচ্ছে 'aborder'-এর প্রথম অংশ। এতে বুঝাচ্ছে জমিতে নামার কথা বলতে চাইছে। অর্থাৎ নাবিকরা জমিতে নেমেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোথাকার জমিতে? এবার দেখা যাচ্ছে 'contin' বলতে অবশ্যই 'continent' অর্থাৎ মহাদেশ বুঝানো হচ্ছে।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'cruel' বলতে জার্মান শব্দ 'grus' বলতে বুঝানো হচ্ছে grausam—নিষ্ঠুর।'

এ পর্যন্ত পড়ার পর ব্যাপারটা সম্বন্ধে লর্ড গ্লেনারভানের অগ্রহ তুঙ্গে উঠে গেল। তিনি এবার পড়তে লাগলেন, 'এখানে 'Indi' লেখা রয়েছে। এতে 'India' বুঝানো হয়েছে। এবার 'ongit'-এর অর্থ কী? বুঝেছি, বলতে চাচ্ছে 'Longitude' মানে দ্রাঘিমা। আর 'Latitude' অর্থ তো অক্ষাংশ। তবে বলতে চাচ্ছে অক্ষাংশ—সাঁইক্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট। যাক তবে কোনোরকমে ঠিকানাটা উদ্ধার করা গেল।'

ম্যালকম বলল, 'সবই তো হল, কিন্তু দ্রাঘিমা কত তা তো পাওয়া গেল না।'

লর্ড গ্লেনারভান এবার তিনটে কাগজের বক্তব্য একত্রে ইংরেজিতে লিখতে বসলেন। ডামবার্টন নামে একজন নাবিক এসে জাহাজের গতি কোনদিকে হবে জানতে চাইলে লর্ড গ্লেনারভান তাকে বললেন, 'শুনুন, লেডি হেলেনা ম্যালকম দুর্গে যাবেন। আমি লন্ডনের নৌ-বিভাগের অফিসে যাব। এ কাগজ তিনটে তাঁদের দেখাব ভাবছি।'

নাবিককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে এবার উপস্থিত সবাইকে লক্ষ করে লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'শুনুন আপনারা, কাগজ তিনটির বক্তব্য মোটামুটি এরকম—১৮৬২ সালের ৭ জুন তিনটে মাঙ্গুল বিশিষ্ট কামানসহ ব্রিটানিয়া নামক একটা যুদ্ধজাহাজ গ্রাসগো থেকে যাত্রা করে সমুদ্রে ডুবে গেছে। জাহাজটার ক্যাপ্টেন ও দুজন নাবিক সাঁইক্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে এ কাগজ তিনটে বোতলে পুরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রত্যাশা করেছে। আর বুঝা যাচ্ছে ভূগোলার্ধের দক্ষিণাংশের সমুদ্রে সেটা ডুবেছে। তবে সমস্যা হচ্ছে 'gonie' শব্দটার সাহায্যে কী বুঝাতে চাইছে? এটা কি 'country' শব্দের অংশ?'

লেডি হেলেনা কপালের চামড়ায় চিত্তার ভাঁজ ঝাঁক বসলে, 'Patagonie' ফরাসি শব্দ। এর ইংরেজি সমার্থক শব্দ হচ্ছে Patagonia।' মেজর চট করে বলে উঠলেন—ঠিকই তো Patagonia সাঁইক্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশের অন্তর্ভুক্ত। এবার ব্যাপারটা সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করে নেয়া যেতে পারে, তারা একটা মহাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেছিল। এবার 'pr' বর্ণ দুটোর কথা ভাবা যাক। এর সাহায্যে 'Prisoner' বুঝানো হয়েছে। তারপর 'cruel indi' এতে সহজেই অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে, 'cruel indi'—অর্থাৎ তারা নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হয়েছিল—এরকম হতে পারে কি না, বলুন?'

লর্ড এবার বললেন, 'আমাদের কাজ হচ্ছে, গ্রাসগো গিয়ে খোঁজ নেয়া ব্রিটানিয়া জাহাজটা কোনদিকে পাড়ি জমাচ্ছিল?'

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জাহাজি গেজেট বের করে পাতা উল্টে এক জায়গায় অস্থূলি নির্দেশ করে বললেন, 'আঠারোশো বাষট্টির গ্রিগে যে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ব্রিটানিয়া জাহাজে ক্যালাও থেকে গ্রাসগো যাত্রা করেছিলেন।'

লর্ড গ্লেনারভান আঁতকে উঠে বললেন, 'গ্রান্ট! ক্যাপ্টেন গ্রান্ট তো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে নতুন স্টল্যান্ড গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন।'

'ঠিকই বটে। তিনি আঠারোশো বাষট্টিতে গ্রাসগোতে হাজির হয়ে ব্রিটানিয়া জাহাজটা নিয়ে যাত্রা করে বেপান্তা হয়ে যায়। বাস, তার আর হদিস পাওয়া গেল না।'

'তবে আমাদের ধারণাকে আরো অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। গ্রিগে যে ক্যালাও থেকে যাত্রা করে—৭ জুন—অর্থাৎ ঠিক সাতদিন বাদে প্যাটাগোনিয়া উপকূলে জাহাজটা তলিয়ে যায়। এখন দরকার দ্রাঘিমা নির্ণয় করা।'

ক্যাপ্টেন বললেন, 'দ্রাঘিমা না হলেও চলবে, জায়গাটা আমার পরিচিত। জায়গামতো ঠিক হাজির হয়ে যাওয়া যাবে।'

লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'চমৎকার! তবে বক্তব্যটা দাঁড় করিয়ে ফেলি, 'আঠারোশো বাষট্টির ৭ জুন গ্রাসগোর তিনটে মাঙ্গুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়া দক্ষিণ গোলার্ধে প্যাটাগোনিয়ার সমুদ্রে তলিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ মহাদেশের ভূখণ্ডে নামার চেষ্টা করবেন—মাটিতে পদার্পণ করামাত্রই নির্মম নিষ্ঠুর ইন্ডিয়ানদের হাতে কয়েদ হবে। কাগজ তিনটে বোতলে পুরে তারা সাঁইক্রিশ ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে সমুদ্রের বুকে ফেলে দেন। যেখানে জাহাজটা সমুদ্রে তলিয়ে গেছে সেখানে সাহায্য পাঠান।'

লর্ড গ্লেনারভান কাগজ থেকে কলমটা তুলে এবার বললেন, 'এ বক্তব্য পড়ে সরকার অবশ্যই সাহায্য পাঠাবেন, আর ক্যাপ্টেন গ্রান্টের স্ত্রী পুত্র-কন্যার খরচ আমিহি বহন করব।'

জাহাজ বন্দরে ভিড়ল। লেডি হেলেনা গাড়ি নিয়ে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

লন্ডনগামী ট্রেনে ওঠার আগে লর্ড গ্লেনারভান মর্নিং ক্রনিকল আর টাইমস পত্রিকায় টেলিগ্রাম করলেন, 'তিনটা মাঙ্গুলবিশিষ্ট যুদ্ধজাহাজ ব্রিটানিয়ার খবর কেউ জানতে আগ্রহী হলে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ, লাস ডামবার্টন, স্কটল্যান্ড।'

ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদ। লাসের অদূরবর্তী হাইল্যান্ডে এর অবস্থান। লর্ড গ্লেনারভান-এর স্বত্বাধিকারী। স্কটল্যান্ডের সামাজিক বিপ্লবে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে, দেশ ছেড়ে পালিয়েছেও অনেকেই। কিন্তু গ্লেনারভান পরিবার এখানেই রয়ে গেছেন। প্রজাদেরও আশা ভরসা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ প্রাসাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করছে। আবার কেউ-বা গ্লেনারভানের ডানকান জাহাজে কাজ করছে।

- লর্ড গ্লেনারভান অগাধ অর্থের মালিক।

দেশবাসীর স্বার্থরক্ষা করতে তাঁর কোনোরকম কাৰ্পণ্য লক্ষিত হয় না। এককথায় তিনি একজন উদারহৃদয় ব্যক্তি। তাঁর বয়স বত্রিশ বছর। অসীম সাহসী। পরোপকারব্রতী। মাত্র তিন বছর আগে লেডি হেলেনাকে বিয়ে করে তিনি ঘর বাঁধেন। লেডি হেলেনা স্কটল্যান্ডের মেয়ে। তাঁর বাবা বিখ্যাত পরিব্রাজক উইলিয়াম টাফনেল। দরিদ্র। লর্ড গ্লেনারভান বিয়ের পর ডানকান জাহাজটা তৈরি করালেন সস্ত্রীক সাগরবিহারের উদ্দেশ্যে। জাহাজ থেকে নেমে স্ত্রীকে ম্যালকম প্রাসাদে পাঠিয়ে দিয়ে লর্ড গ্লেনারভান লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পরের দিনই লেডি হেলেনা একটা টেলিগ্রাম পেলেন, লর্ড গ্লেনারভান শীঘ্রই ফিরছেন। সে রাত্রেই আর একটা টেলিগ্রাম পেলেন, তার ফিরতে কয়েকদিন দেরি হবে। পরস্পর বিপরীত বক্তব্য সখ্যলিত টেলিগ্রাম দুটো পেয়ে লেডি হেলেনা বড়ই চিন্তিত হলেন।

একটা ছেলে আর একটা মেয়ে বহু দূর থেকে ট্রেনে চেপে লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে দেখা করতে এল। তাঁর অবর্তমানে লেডি হেলেনা তাদের সঙ্গে কথা বললেন। খুবই গরিব। ছেলোটার বয়স বারো, নাম রবার্ট। আর মেয়েটার শোল বছর, নাম মেরি—ভাই—বোন। তারা ক্যান্টন গ্রান্টের খবর জানতে এসেছে। তাঁর ছেলে-মেয়ে।

লেডি হেলেনা তাদের কাছে বোতলের ভেতরে পাওয়া কাগজ তিনটে এবং তাতে লেখা বক্তব্যের কথা তাদের কাছে ব্যক্ত করলেন। আর এও বললেন, লর্ড গ্লেনারভান সে কাগজগুলো নিয়ে নৌ-বিভাগের অফিসে গেছেন। আগামীকাল ফিরবেন।

রবার্ট আর মেরি লেডি হেলেনার আতিথ্য গ্রহণ করে ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদে রয়ে গেল।

লেডি হেলেনা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রবার্ট আর মেরির কাছে আসল কথাটা গোপন করলেন। ক্যাপ্টেন হার্ট অসভ্য ছত্রলিদের হাতে বন্দি হয়েছেন। লর্ড গ্লেনারভান নিজে গিয়েও নৌ-বিভাগের সাহায্য আদায় করতে পারছেন না, এসব কথা তাদের কাছে গোপন রাখলেন।

নৈশ ভোজের পর লেডি হেলেনা রবার্ট আর মেরির মুখ থেকে তাদের দুর্দশার কথা শুনলেন। অসীম সাহসী ক্যাপ্টেন গ্রান্ট বাধীন স্কটল্যান্ডের কলোনি পড়ে তোলার অত্যাশ্র আশ্রহ নিয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। এক শ্রৌঢ়া আত্মীয়র ভতাবধানে ছেলে-মেয়ে দুটোকে রেখে যান। কিছুদিনের মধ্যে আত্মীয়টি মারা যান। তারা জানতে পেরেছে তাদের বাবাও আজ পৃথিবী ছেড়ে গেছেন।

স্ববরের কাগজের বিজ্ঞপ্তিটা পড়েই রবার্ট আর মেরি ছুটে এসেছে লর্ড গ্লেনারভানের কাছে। তারা এবার বুঝতে পেরেছে, তাদের বাবা তবে জীবিত।

পরের দিন ভোরে লর্ড গ্লেনারভান ফিরে এলেন। কোনো বিহিত করতে পারলেন না। সরকার হাজারো অজুহাত তুলেছেন। দু-বছর আগে সাগরের বুকে তলিয়ে যাওয়া জাহাজের খোঁজে যাওয়ার অর্থ সময় ও টাকার অপব্যয়মাত্র। আর দলিলের বক্তব্যও পরিষ্কার নয়, নিতান্ত ঝাপসা। তার ওপর মাত্র তিনজন স্কটল্যান্ডবাসীর জন্য পুরো একটা জাহাজ কী করে পাঠানো যায়।

লর্ড গ্লেনারভানের মুখে সবকিছু শুনে রবার্ট ও মেরি হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে লেডি হেলেনা বাধা দিলেন। রানীর সঙ্গে কথা বলে কিছু করা যায় কি না দেখতে চাচ্ছেন। লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'কোনোই উপায় হবে না।'

লেডি হেলেনা এবার লর্ড গ্লেনারভানকে অনুরোধ করলেন, 'শোনো, তোমার নিজেরই তো ডানকান জাহাজ রয়েছে। সেটা নিয়ে এদের বাবার খোঁজ করলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।'

লর্ড গ্লেনারভান স্ত্রীর পরামর্শও এ-ব্যাপারে তার অত্যাশ্র আশ্রহ দেখে যারপরনাই খুশি হলেন।

ডানকান খুবই ছোট্ট একটা জাহাজ। মাত্র দুশো দশ টনের জাহাজ। তবে এটুকু ভরসা, কলম্বাস আর ম্যাগেলান তো এর চেয়েও ছোট জাহাজ নিয়ে উত্তাল-উদ্দাম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে যেতে পেরেছিলেন।

পালে হাওয়া না পালে ডানকান একশো ষাট অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিনের বলে চলে। এটা ঘণ্টায় সতের মাইল গতিবেগে ছুটেতে পারে। এটা নিয়ে অনায়াসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসা যায়। তবে সে সঙ্গে নতুনতর কিছু ব্যবস্থা কৈরে নেয়া হল।

লর্ড গ্লেনারভান ছোট্ট একটা কামান কিনে জাহাজের সামনে বসিয়ে দিলেন। আর কাণ্ডোনের সাহস, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও উপস্থিত বুদ্ধি অতুলনীয়। সে সঙ্গে অভিজ্ঞ নাবিক ফার্স্টমেন্ট টম আর্স্টিন। ক্যাপ্টেন আর মেটসহ মোট পাঁচিশজন কর্মী সফরের জন্য নিযুক্ত করা হল। আর সঙ্গে গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, লেডি হেলেনা ও তাঁদের ছেলে-মেয়ে। আর রবার্ট আর মেরি তো আছেই। শেষপর্যন্ত মেজর ম্যাকনবসও এসে হাজির হলেন। ম্যালকম দুর্গপ্রাসাদেই থাকেন, স্কটল্যান্ডের অধিবাসী।

২৫ আগস্ট রাত ঠিক বারোটায় ডানকান জাহাজ বন্দর ছেড়ে যাত্রা করল। ডামবারটনের পাহাড় যখন পেরিয়ে গেল তখনও ভোর হয় নি। তিনটে বাজে।

ডানকান যখন গিয়ে সমুদ্রে পড়ল তখন সকাল ছয়টা। জাহাজ তখন ঘণ্টায় সতের মাইল বেগে ছুটে চলেছে। পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই কেপহর্নে পৌঁছে যেতে পারবে কাণ্ডোনের বিশ্বাস।

এদিকে বালক রবার্ট খুশিতে ডগমগ হয়ে জাহাজের সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। তা দেখে লর্ড গ্লেনারভান হাসতে হাসতে মেরিকে বললেন, 'একদিন তোমার ভাইকে আমি একজন জবরদস্ত নাবিক বানিয়ে দেব।'

মেজর রোগা ও লম্বাটে চেহারা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখ। হাসিখুশি স্বভাব। তবে খুবই অন্যমনস্ক।

জাহাজে অপরিচিত এক ভদ্রলোকের উপস্থিতি মেজরকে অবাক করল। চল্লিশের কাছাকাছি তার বয়স। খুবই আনমনা। সর্বদা একটা টেলিস্কোপ কাঁধে ঝুলিয়ে রাখেন। খুবই চঞ্চল স্বভাব। এক সময় কাঁধ থেকে টেলিস্কোপটা

নামিয়ে টেনে লম্বা করলেন। সেটা প্রায় চারফুট লম্বা। দিগন্ত পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত হলেন। তিনি ছয় নম্বর কেবিনের প্যাসেঞ্জার। ভদ্রলোকটি প্যারিস জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। বার্লিন-বোম্বে-আর্মস্টাড-লিপসিক-লন্ডন-পিটার্সবার্গ-ভিয়েনা-নিউইয়র্ক সোসাইটির মেম্বর। আর রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল অ্যান্ড এথনোগ্রাফিক্যাল ইন্সটিটিউটেরও মেম্বর তিনি। দীর্ঘ বিশ বছর ঘরে বসে ভূগোল নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। এবার ইন্ডিয়ায় চলেছেন, সেখানে পায়ে হাঁটা হাঁটি করে বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে লিপ্ত করতে। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকের নাম জ্যাকুইস পাজালেন। লর্ড গ্লেনারভান সোসাইটির বুলেটিনে পাজালেনের বহু আবিষ্কারের কথা পড়েছেন। বলা যায় বিজ্ঞান আর ভূগোল বিষয়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত। তিনি আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেনের সঙ্গে করমর্দন সারতে সারতে জানতে পারলেন, গতপরাৎ রাত আটটায় তিনি জাহাজের ছয় নম্বর কেবিনে উঠেছেন। খুবই ক্লান্ত ছিলেন বলে তাঁনা ছত্রিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে ক্লান্ত অপনোদন করে নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করবেন। জিওগ্রাফিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজ বলে বড়লাটের কাছে সেরকমই সুপারিশসহ আবেদন গেছে।

জ্যাকুইস পাজালেনের এবারের পরিকল্পনা তিব্বতের ইয়ারো-জাংবো চৌ নদীটা হিমালয়ের দক্ষিণদিক থেকে এগিয়ে আসামের ব্রহ্মপুত্র নদীতে পতিত হয়েছে কি না পর্যবেক্ষণ করবেন। ক্রিক আঠারো শো ছেচল্লিগে এ কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হয়েছিলেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে জ্যাকুইস পাজালেন যখন শুনলেন এটা স্কোটিয়া জাহাজ নয়, ডানকানের নাম তখন একদম মুগ্ধে পড়লেন। কথাটা কানে যেতেই তিনি হতাশায় ভেঙে পড়ে আর্ডনাদ করতে করতে ছয় নম্বর কেবিনে চলে গেলেন। তাঁর অন্যান্যমস্ততার জ্যাই ভুল করে অন্য জাহাজে উঠে পড়ে বিপদে পড়েছেন।

লর্ড ভাবলেন তাঁর জাহাজ প্রথমে চিলি বন্দরে নোঙর করবে, ভদ্রলোককে সেখানেই নামিয়ে দেবেন। সেখান থেকে অন্য জাহাজ ধরে তিনি গন্তব্যস্থলে চলে যেতে পারবেন।

একটু বাদেই আগন্তুক জ্যাকুইস পাজালেন আবার লর্ডের কাছে ফিরে এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন ডানকান চিলি-দক্ষিণ আমেরিকায় যাবে। কপালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। এ যে কেলেক্সারী ব্যাপার। সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলেছেন।

লর্ড বললেন, 'ইচ্ছা করলে আপনিও আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন। তা নইলে আপনাকে মাদিরা বন্দরেই নামিয়ে দিতে পারি। সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপে চলে যেতে পারবেন।'

'উপায় থাকলে অবশ্যই আপনাদের সঙ্গী হতাম। কিন্তু একটা জরুরি সভায় আমাকে যোগদান করতেই হবে। ভালো কথা, দেখে তো মনে হচ্ছে আপনারা দেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার দিকে না গিয়ে তার চেয়ে বরং ভারতবর্ষ, মানে কলকাতায়ই চলুন না কেন।'

'কিন্তু আমাকে জরুরি একটা কাজের তাগিদে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে হচ্ছে, লর্ড গ্লেনারভান বললেন।'

পাজালেন লর্ড গ্লেনারভানের সঙ্গে প্যাটাগোনিয়ায় যেতে কিছুতেই সম্মত হলেন না। কথাপ্রসঙ্গে পাজালেন জানতে পারলেন লেডি হেলেনা একটা বিখ্যাত ব্যক্তি উইলিয়াম টাফনেলের মেয়ে। টাফনেল তাঁর অভিনু হৃদয় বন্ধু ছিলেন। বন্ধু-তনয়্যার সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় এবং একটা জাহাজে যাত্রা করার জন্য তিনি বহুভাষে উচ্ছাস প্রকাশ করলেন।

ডানকান জাহাজ ৩০ আগস্ট মাদিরা বন্দরে নোঙর করল। পাজালেন এখানে নামতে রাজি হলেন না। এখানে নাকি দর্শনীয় কিছুই নেই। জাহাজ এরপর ক্যানারিতে নোঙর করলে নেমে যাবেন, লর্ড গ্লেনারভানকে জানালেন। লর্ড গ্লেনারভান তাঁর ইচ্ছার কথা শুনে নীরবে ঠোটটি টিপে হাসলেন।

ডানকান আবার বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল। প্রায় আড়াইশো মাইল দূরবর্তী ক্যানারি বন্দরে পৌঁছতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। পাজালেন এখানে পৌঁছে আবার বাহানা জুড়ে দিলেন। লর্ডকে মুখ ব্যাজার করে বললেন, 'ভেবেছিলাম বটে ক্যানারিতে নামব। কিন্তু এখানে হামবোডট পাহাড়ের যে পাঁচটা অংশ আছে তা অনেক আগেই আমি দেখে নিয়েছি। এমন কি আগ্নেয় পর্বতের ভেতর পর্যন্ত নেমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি। দেখার মত আর কিছুই এখানে নেই। আপনারা তো এরপর কেপ ভাদিতে জাহাজ নোঙর করছেন। আমি বরং সেখানেই নেমে যাব। যদিও সেখানেও দর্শনীয় কিছুই নেই। তবে একটা কথা কী জানেন, দেখার মতো চোখ মন থাকলে সবকিছু বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আর পর্যবেক্ষণের অন্য নমাই তো বিজ্ঞান।'

৩ সেপ্টেম্বর ডানকান কেপ ভাদিতে নোঙর করল। কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করার সময়ই আকাশ মেঘে ছেয়ে রেখেছিল। এবার মুষলধারে বৃষ্টি নামল। পাজালেন এখানে এসেও বাহানা শুরু করে দিলেন। কিছুতেই জাহাজ থেকে নামতে রাজি হলেন না। অজুহাত দেখালেন, দেড় দুই মাসের আগে এখান থেকে ফেরার জাহাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর যা বৃষ্টি, মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি ভিজে বরবাদ হয়ে যাবে। আর দেখার মতো তেমন কিছু নেই, যাতে এতগুলো দিন কাটাতে পারবেন।

লর্ড গ্লেনারভান মুচকি হেসে বললেন, 'এবার কিন্তু একেবারে চিলি বন্দরে গিয়ে জাহাজ ডিডবে। যদি চান তো আমাদের সঙ্গেই চলুন, প্যাটাগোনিয়ার ইন্ডিয়ানদের দেখে ও আলাপ-পরিচয় করে আনন্দ পাবেন। তারা অবিকল পাঞ্জাবের ভারতীয়দের মতো। তিব্বতের 'ইয়ারো-জাংবো-চৌ দেখতে না পেলেও রিও কলোরাদো দেখেও চোখ ও মন কম তৃপ্ত হবে না।'

লেডি হেলেনাও তাঁকে তাঁদের সঙ্গী হতে অনুরোধ করলেন।

শেষপর্যন্ত আমতা আমতা করে হলেও ডানকান জাহাজেই থাকবেন, প্যাটাগোনিয়াতেই যাবেন।

আগন্তুক পাজালেন বারক রবার্টের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাছা, তোমাকে আমি একজন নামজাদা ভৌগোলিক তৈরি করে ছাড়ব।'

বালক রবার্টকে নিয়ে কতজন কতরকম চিন্তাই না করেছেন। ইতিপূর্বে ক্যান্টেন তো বলেই রেখেছেন, তাকে পাল্লা নাবিক তৈরি করবেন, লর্ড গ্লেনারভানেরও একই ইচ্ছা। তবে তিনি তাকে একজন সত্যিকারের ভদ্রলোক তৈরি করবেন। মেজর মত প্রকাশ করেছেন, তাকে রীতিমতো দুরন্ত ও অসম সাহসী করে তুলবেন। আর লেডি হেলেনা চান সে ভবিষ্যতে একজন সফল দয়ার অবতার হয়ে উঠুক।

পেজালেন জাহাজের ডেকের এক কোণে একগাদা বই পেলেন। সেগুলো সবই স্পেনীয় ভাষায় লেখা। বইগুলো পাঠোদ্ধার করতে হলে সবার আগে স্পেনীয় ভাষাটা রপ্ত করতেই হয়। অত্যাগ্রহ অগ্রহ ও অসাধারণ প্রতিভাবলে তিনি মাত্র কদিনের মধ্যেই ভাষাটা রপ্ত করে ফেললেন।

পেজালেন একদিন ডেকের ওপরে রবার্টকে নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাকে আমেরিকার ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানদান করছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, 'পরিভ্রমণের বিষয় কী জানো রবার্ট? অদৃষ্ট বিড়ম্বিত কলঙ্কাস কিন্তু জানতে পারেন নি, তিনি একটা মহাদেশের আবিষ্কারক। তাঁর অনন্য কীর্তির কথা জানার আগেই তাঁকে পরপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে। তিনি দেশ থেকে যাত্রা করেছিলেন এশিয়ায় পাড়ি জমানোর সোজা পথ আবিষ্কারের আশা নিয়ে। কিন্তু তিনি মধ্য আমেরিকায় পৌঁছে ধরেই নিলেন, জাপান বা চীনের ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি, নতুন এক মহাদেশের মাটিতে অবস্থান করছেন। সেজন্যই তো তাঁর নামে কোনোকিছুই নামকরণ হল না। আমেরিকা নামকরণ হয়েছে আমেরিগো ভেসপুসির নামানুসারে। আর ম্যাগেলান অন্তরীপের নাম দেয়া হয়েছে নাবিক ম্যাগেলানের নামানুসারে।

ম্যাগেলান অন্তরীপে জাহাজ হাজির হল। এখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত আকৃতি ও দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এদের দেহকাণ্ডের তুলনায় পা দুটো খুবই ছোট। বসে থাকলে একরকম উচ্চতা মনে হয়। আবার যখন সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন অন্যরকম দেখা যায়। অবাধ হবার মতো ব্যাপারই বটে।

ডানকান জাহাজ ক্রাইভ বন্দর ছাড়ার বিয়াল্লিশ দিন পর তালকাহুয়ানো উপসাগরে পৌঁছল।

জাহাজ নোঙর করামাত্র লর্ড গ্লেনারভান পাঞ্জালেনকে নিয়ে তীরে নামলেন। তাঁরা সোজা কাস্টমস হাউসে গিয়ে ঢুকলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন প্রায় একঘণ্টা গেলে ইংরাজ কনসালের দেখা পাওয়া যাবে। জরাগাটার নাম কনসিপসিয়ন। দুটো ঘোড়া ভাড়া করে উভয়ে কনসাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলেন।

ইংরাজ কনসাল লর্ড গ্লেনারভানের মুখে তাঁদের আগমনের কারণ শুনে পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, ক্যান্টেন গ্রান্টের জাহাজডুবি কথ্য তিনি কারো মুখে শোনেন নি।

উপায়ান্তর না দেখে তাঁরা হতাশ হয়ে ফের বন্দরে ফিরে এলেন। ছয় জন লোক নিযুক্ত করা হল, উপকূল ধরে এগিয়ে গিয়ে স্থানীয় লোকজনের মুখ থেকে জাহাজ ডুবির কোনো খবর সংগ্রহ করতে পারেন কি না। বৃথা চেষ্টা। তারাও বিষণ্ণমুখে ফিরে এল।

এবার বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটির বক্তব্য ভালো করে পাঠ করে পাঞ্জালেন বললেন, 'লর্ড, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা শব্দের ভুল অর্থ করা হয়েছে বলেই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কই ক্যান্টেন গ্রান্ট তো 'বন্দি হব' এমন কোনো কথা লেখেন নি। হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন 'বন্দি হয়ে গেছি'। ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দি হওয়ার পর তিনি এ কাগজ তিনটির বক্তব্য লিখেছিলেন। আর কাগজ তিনটে সহ বোতলটা ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে হাজির হয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য একটাই—সাঁইগ্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আমেরিকার উপকূলকে যেখানে স্পর্শ করেছে সে রেখা বরাবর জাহাজ নিয়ে আটলান্টিকে হাজির হওয়া। আশা করা যাচ্ছে, জাহাজডুবির লোকজনদের কারোর না কারো দেখা মিলবেই। আর এটাই কিন্তু একমাত্র সম্ভাবনাময় লর্ড।'

'কিন্তু আমরা কি—' লর্ডকে কথটা শেষ করতে না দিয়েই পাঞ্জালেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রিও নিগ্রো বা রিও কিলোরাদো নদী কোনো না কোনো শাখানদীর নিকটবর্তী কোনো রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যান্টেন গ্রান্ট কয়েদ হয়েছেন। আমরাই তাঁকে উদ্ধার করব। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে মেজর ম্যাকনাবসের সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিতে পারব।'

১৪ অক্টোবর সেন্ট অ্যাটোনিও এবং কেপ করিয়েনতিসের মধ্যবর্তী স্থানে ডানকানকে দাঁড় করিয়ে লর্ড, পাঞ্জালেন, মেজর এবং রবার্ট জাহাজ থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন। আর জাহাজে রইলেন, রইলেন লেডি হেলেনা আর মেরি। লর্ডের সঙ্গে তিনজন নাবিকও গেল।

কূলে নেমে লর্ড এক ছোকরা ও তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়ে নিলেন। একজন ইংরেজ তাদের দলপতি। তার নাম কাটোপেজ। তার পেশা জাহাজের যাত্রীদের পথ দেখিয়ে কডিলেরার গিরিসংকট অতিক্রম করে আরজেন্টিনার পথ প্রদর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ঘোড়ায় চেপে তাঁরা যাত্রা করলেন।

১৭ অক্টোবর দূরবর্তী একটা পর্বত তাদের নজরে পড়ল। পথে যেতে যেতে যে-সব নদী পড়ছে তাদের মধ্যে যাদের নাম মানচিত্রে স্থান পায়নি পেজালেন তাদের নাম বিবরণাদি দিনলিপি পাতায় টুকে নিতে লাগলেন।

এবারই অভিযাত্রীরা পথ চলার কষ্ট কাকে বলে হাড়ে হাড়ে টের পেলেন। পাহাড়, পার্বত্যপথ, ঘন ঘন চড়াই উৎরাই। আশির্জ পর্বত ডিঙানোর জন্য আনটুকো গিরিসঙ্কটের পথ ধরতে হল। বড়ই দুর্গম এ-পথ। খচ্চর পর্যন্ত পথ পাড়ি দিতে নাজেহাল হয়ে যায়। কাটোপেজ এপথে যেতে রাজি হল না। খচ্চর আর তার দলবল নিয়ে সে এখান থেকে কেটে পড়ল। অল্প সময়ে পথ পাড়ি দিতে পারবে বলেই অভিযাত্রীরা একরকম জেদ করেই এ-পথ বেছে নিলেন।

বারো হাজার ফুট ঠঠার পরই সবার শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে। ফুসফুস ফেটে যাওয়ার জোগাড় হল। সবাই কাহিল হয়ে পড়ল। শেষপর্যন্ত প্রায় বৃকে হেঁটে পথ পাড়ি দিতে লাগল। আর বালক রবার্টকে তো একজন নাবিক কাঁধে করে আবার টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। অভিযাত্রীরা যখন একেবারে সঙ্গীন হয়ে পড়ল তখন অদূরে একটা ঝুপড়িঘর দেখতে পেল।

ঝুপড়িঘরটার কাছে গিয়ে অভিযাত্রীরা দেখল, সেটা প্রায় বরফচাপা পড়ার জোগাড় হয়েছে। এটা রেড ইন্ডিয়ানদের আস্তানা। বরফ সরিয়ে মেজর সেটাকে কোনোরকমে রাত কাটানোর উপযোগী করে তুললেন।

বিকট একটা শব্দ শুনে অভিযাত্রীরা ঘুম থেকে হুড়মুড় করে উঠে পড়লেন। ভয়ঙ্কর এক সঙ্কটের মুখে পড়েছে তারা। ঝুপড়িঘরটাসহ পাহাড়ের বিশালায়তন একটা অংশ ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে নিচে নেমে যেতে লাগল। যে যেদিকে পারল ছিটকে পড়ল। তুষারের রাজ্য থেকে নিচের বনাঞ্চলে এসে হাজির হল।

মেজর কোনোরকমে পরিস্থিতিটা সামাল দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক-এক করে সবাইকে খোঁজাখুঁজি করে বের করলেন। কিন্তু দীর্ঘ তল্লাশি চালিয়েও রবার্টকে কোথাও পেলেন না।

ভূমিকম্প! ভূমিকম্পের ফলেই অভিযাত্রীদের এমন অবগুনীয় দুর্গতি।

রবার্ট? কোথায় হারিয়ে গেল সে। তাকে না নিয়ে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সামনে অভিযাত্রীরা দাঁড়াবেন কী করে? সবাই মিলে উন্মাদের মতো তার নাম ধরে ডাকাডাকি করল। না, কেউই সাড়া দিল না।

দুপুর পর্যন্ত হন্যে হয়ে তল্লাশি চালিয়ে সবাই যখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন ঠিক তখনই অতিকায় একটা কনডর পাখিকে দেখা গেল। সবাই একে দক্ষিণ আন্ডিজের বাদশা বলে। বিশ হাজার ফুট ওপর থেকেও এরা নিচের শিকার বাদুড়, ছাগল, ভেড়া, খচ্চরের বাচ্চা প্রভৃতি দেখতে পায়। চোখের পলকে হৌ মেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে চলে যায়।

মুহূর্তে কনডরটা ঠোট আর পায়ের নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে একটা দেহকে বয়ে নিয়ে যেতে দেখল অভিযাত্রীরা। মেজর যন্ত্রচালিতের মতো লর্ড গ্লেনারভানের হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে চালিয়ে দিলেন কনডরটাকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যদ্রষ্ট হল গুলিটা। পর মুহূর্তেই গোপন অন্তরাল থেকে একটা গুলি ছুটে এসে কনডরটার মাথায় আঘাত করল। শূন্যে কয়েকবার পাক খেয়ে অতিকায় পাখিটা নদী থেকে ফুট দেশে দূরে ধীরে ধীরে পড়ে গেল। সবাই উদ্ধাস্তের মতো ছুটোছুটি করে গিয়ে দেখল আহত কনডরটার ডানার ভেতরে রবার্টের মাথাটা ঢুক রয়েছে।

লর্ড গ্লেনারভান টানাটানি করে রবার্টের মাথাটা পাখির ডানার ভেতর থেকে বের করে ব্যস্ত হয়ে তার বুকে কান পেতে সোশাশে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আছে! প্রাণ আছে! বঁচে আছে। রবার্ট বঁচে আছে। নদী থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দিতেই সংজ্ঞা ফিরে এল।

সবার মনে একই প্রশ্ন। মেজরের গুলি লক্ষ্যদ্রষ্ট হয়ে থাকলে কার গুলিতে কনডরটা আহত হয়ে মাটিতে পড়ল। কে সে? সে পরোপকারবৃত্তী ব্যক্তিটা কে? কী-ই বা তার পরিচয়? মুহূর্তকাল পরেই দীর্ঘাৃক্তি এক পুরুষমূর্তিকে দেখা গেল একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে। ফিতে দিয়ে মাথার লম্বা চুলগুলো বাঁধা। চোখ-মুখে কালো, সাদা আর লাল রঙের ছোপ। শেয়ালের চামড়ার কোটটা হাঁটুর তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ঝাঁড়ের চামড়ার বুটটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে।

পাজালেন ও লর্ড গ্লেনারভান তার সঙ্গে কথা বলে নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করলেন। ইচ্ছা থাকলেও কেউ, কাউকে মনের কথা বোঝাতে পারলেন না। তবে লোকটা আঁকার ইঙ্গিতে যা বলল তাতে কোনোরকমে উদ্ধার করা গেল, অজানা-অচেনা পাহাড়ী হিতাকাঙ্ক্ষীর নাম থালকেভ। এর অর্থ বজ্র। পেশায় পথপ্রদর্শক। থালকেভ দৌড়ে গিয়ে কিছু বুনা পাতা এনে রস করে রবার্টের ক্ষতস্থানে ঘষাঘষি করে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনল।

অভিযাত্রীরা থালকেভকে পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে নিল। সে লর্ড গ্লেনারভানকে সাতটা ঘোড়া কিনিয়ে দিল। পথ যতই বন্ধুর হোক না কেন, পথ পাড়ি দিতে তার পা দুটোই যথেষ্ট।

২২ অক্টোবর অভিযাত্রীরা থালকেভের পরামর্শে পশ্চিম থেকে আরো পূর্বে অগ্রসর হতে লাগল। সারাদিন পথ চলে তারা আটত্রিশ মাইল অতিক্রম করে একটা নদীর তীরে হাজির হল। পাজালেন যেন একটা জ্যাক ভুগোল বই। এক এক করে নদী, পাহাড় প্রভৃতির নাম অভিযাত্রীদের কাছে বলে যেতে লাগলেন। ঝড়ের সজাবনা দেখা দিলে ঝোলা থেকে ব্যারোমিটারটা বের করে তার পারদস্তম্ভের দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'পারদস্তম্ভের গতি উর্ধ্বমুখী। পারদস্তম্ভ নিম্নমুখী হলে বুঝা যেত ঘূর্ণিঝড়ের সজাবনা রয়েছে। অতএব ভয়ের কিছু নেই।'

কার্যত হলও তাই। সন্ধ্যার দিকে সামান্য ঝড় উঠলেও রাত একটার মাছা থেমে গেল।

পথপ্রদর্শক থালকেভ কথাপ্রসঙ্গে পাজালেনকে বলল, 'হজুর, আপনারা সোজা পূর্বদিকে চলেছেন যে বড়? সেদিকে আপনাদের কাউকে কয়েদ করে রেখেছে বুঝি? শুনেছি, গত বছর দুই আগে এক ষ্ঠেতাস্কে রেড ইন্ডিয়ানরা কয়েদ করে রেখেছে। ব্যস, এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

পথপ্রদর্শক থালকেভের কথায় অভিযাত্রীদের মধ্যে অবগুনীয় আশার সঞ্চার হল। হাবিস্বে অক্টোবর অভিযাত্রীরা রেড ইন্ডিয়ানদের চামড়ার সেতু ধরে ধরে কোরোরকমে কলোরাডো নদী অতিক্রম করল। এবার তারা বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থে পরিপূর্ণ তেঁতো জলের হ্রদের ধারে উপস্থিত হল। এবারের পথ আরও বন্ধুর। অভিযাত্রীদের পথ পাড়ি দিতে নাকের জল আর চোখের জল একাকাকার হতে লাগল। তার ওপর ইয়া বড় বড় মশার কামড়ে পাজালেনের প্রাণ ওঠাগত হয়ে উঠল। অভিযাত্রীরা যখন লেক সালিনার তীরে পৌঁছলেন তখন রাত্রি আটটা বাজে। লেকে এক ফোঁটাও জল নেই। এক সময় সোডিয়াম ক্রোমাইডের জন্য বুইনস আয়ারস নগরে এর জল নিয়ে যাওয়া হত। অভিযাত্রীরা এবার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা বরাবর গেলেন লর্ড গ্লেনারভান, রবার্ট, আর পথপ্রদর্শক থালকেভ, আর অন্য দলটা জলের খোঁজে দক্ষিণ দিকে পঁচাত্তর মাইল পথ ঘুরে। শেষমেশ দুই দলের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা। লর্ড গ্লেনারভানের দল পরের দিন হাজির হল গুয়ামিনি নদীর পাড়ে। নদীর ঠাণ্ডা পানি খেয়ে ঘোড়া আর মানুষগুলোর প্রাণ বাঁচল।

একটা পরিত্যক্ত খোয়াড়ের মধ্যে তারা রাত কাটাতে লাগল। মাঝরাতে খালকেভের ঘুম চটে গেল। কিম মেরে পড়ে রইল খড়ের বিছানায়। অকস্মাৎ জমাটবাঁধা অন্ধকারে অনুজ্জ্বল একটা আলো দেখে সে ঝট করে বসে পড়ল। তার মনে হল কারা যেন অন্ধকারে বারবার সরে যাচ্ছে। ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে। হঠাৎ নেকড়ে আর কুকুরের গর্জন শোনা গেল। বিচিত্র কঠোর গোঙানি শুনে খালকেভ যন্ত্রচালিতের মতো রাইফেলটাকে বাগিয়ে ধরল। গুলির শব্দে লর্ড গ্রেনারজন আর রবার্ট হুডমুড় করে উঠে বসে পড়লেন। উভয়ের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। খালকেভ বলল, 'একটা আন্তঃরাস উৎপাত শুরু হয়েছিল। পমপাসের লাল নেকড়ে। খুবই হিংস্র। এক গুলিতেই খতম করে দিয়েছি।'

বাস, আর যাবে কোথায়। প্রায় একশো নেকড়ে একসঙ্গে তর্জন গর্জন জুড়ে দিল। তাদের মাথা শেয়ালের মতো আর ঝুটী দেখতে কুকুরের মতো। রাতের অন্ধকারে যা পায় ছিড়ে ফেড়ে খায়। ভোরের আলো ফুটলে তাদের টিকির নালিশ পাওয়া যায় না। খালকেভ আগুন জ্বেলে খোয়াড়ের মুখ বন্ধ করে দিল। এবার শুরু করল বন্দুকের আওয়াজ। নেকড়ে-দল ঝটপট খোয়াড়ের পিছনে চলে গেল। কাঠের ঝুটি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। খালকেভ এবার একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। ঘোড়ায় চেপে সে নেকড়েগুলোকে দূরে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। ঘোড়া এতই কিংবদন্তি হুটে চলে লাগল যে, নেকড়ের দল শত চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারল না। ভোর হতে আর দেরি নেই। তখন রবার্ট সবার অলক্ষ্যে অন্য একটা ঘোড়ায় চেপে খালকেভকে অনুসরণ করল। পাজালেন হঠাৎ দেখলেন, রবার্ট ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছে। তিনিও অন্য একটা ঘোড়া নিয়ে তৎক্ষণাৎ তার পিছন পিছন ছুটলেন।

ভোরের আলো ফুটে উঠলে পাজালেন আর রবার্ট ফিরে এল। গ্রেনারভান বললেন, 'কী ব্যাপার রবার্ট, তুমি এ বিপদের মুখে হঠাৎ ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেলে কেন? যে-কোনো সময় হিংস্র নেকড়ের খপ্পরে পড়ে যেতে যে।' রবার্ট বলল, 'বিরেকের তাড়নায় আমাকে যেতেই হল। আমার বিপদে নিজের প্রাণের মায়ী বিসর্জন দিয়ে সে আমাকে রক্ষা করেছিল। আর আপনি আমার বাবাকে উদ্ধার করতে চলেছেন বলে আমি নেকড়েগুলোকে তাড়িয়ে আপনার প্রাণ রক্ষা করলাম। নইলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হত।'

সকালে, একটু বেলা পড়লে অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। ৩ নভেম্বর পমপাসের সীমান্তে পৌঁছল। বাইশ দিনে মোট তারা সাড়ে চার শো মাইল অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত যাত্রাপথে তিন ভাগের দুভাগ পথ পেরিয়ে এসেছে।

একটা রহস্যের সমাধান করা কিছুতেই সম্ভব হল না খালকেভও কোনো কিনারা করতে পারল না। এ পরিবেশে ইন্ডিয়ানদের ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা ইন্ডিয়ানকেও অভিযাত্রীরা দেখতে পেল না। একদিন অবশ্য অস্ত্রশস্ত্র সহ তিনজন রেড ইন্ডিয়ানকে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেয়েছিল। অভিযাত্রীদের দেখামাত্র ঝট করে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপারটা কারোরই মাথায় এল না। এমনকি খালকেভও কোনো সদুত্তর দিতে পারল না। এখন তো উত্তরে বায়ুর দাপট নেই। তাই মেজর পাজালেনকে ব্যাপারটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

পাজালেন মুখ বিকৃত করে বললেন, 'এরা মোটেই গচোস নয়। ঠিক যেন গুণ্ডাদের মতো দেখতে সবাই। কথার মোড় ঘুরিয়ে খালকেভ বলল, 'হুজুর, আরো ষাট মাইল গেলে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্টে হাজির হব। সেখানে পৌঁছে খোজখবর করে দেখা যাবে, ক্যাপ্টেন গ্রান্টকে যারা কয়েদ করে রেখেছে তাদের হদিস যদি মেলে।'

তার কথায় অভিযাত্রীরা আশ্বস্ত হল।

৬ নভেম্বর পথের ধারে কিছুসংখ্যক স্যালডেরোস দেখা গেল। এগুলো মাংসের নুন মাখানোর ঘাটি। কিন্তু কোন মানুষের টিকি দেখা গেল না। লতার দড়ির ফাঁস পরিয়ে ঝাঁড়, গরু, বুনো ছাগল আর ভেড়া নিয়ে এসে জবাই করা হয়। নাড়িভুড়ির লোতে ষাট মাইল দূর থেকে শকুনের পাল উড়ে আসে। ভাঁটকা গন্ধে কাঁছে যাওয়া তো দূরের ব্যাপার, দুএক মাইলের মধ্যে ঘাস কাঁচ বাপের সাধি।

অভিযাত্রীরা একসময় ইন্ডিপেন্ডেন্স ফোর্টের ভাঙাচোরা প্রাচীরের গায়ে হাজির হল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এ স্থানটা সিয়েরা টানডিল নামে পরিচিত।

বাইরে থেকে পোর্টটাকে পরিত্যক্ত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাঙা প্রাচীর দিয়ে অভিযাত্রীরা ভেতরে ঢুকেই রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল, একদল কুচোকাচা কুচকাওয়াজ করছে। একটা করে প্যান্ট পরনে। বেল্ট বাঁধা। খালি গা। ফরাসি চম্বে ইয়া লম্বা তরবারি আর বন্দুক নিয়ে কসরৎ করে চলেছে। সবার মুখের আদল দেখে মনে হল সবাই একই পরিবারভুক্ত। তারা সংখ্যায় তেরোজন। এখানকার রীতি এটাই। এক এক পরিবারে নয়টা ছেলে মেয়ে তো আশ্চর্য্যই দেখা যায়।

পোর্টটার মালিক সার্জেন্ট ম্যানুয়েল। একসময় ফরাসি ছিলেন। স্থানীয় মেয়ে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের পাভা মিলল না। তবে পয়চিস সম্প্রদায়ের ইন্ডিয়ানরা কয়েক বছর আগে একজন ফরাসি আর একজন ইতালিয়ানকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিল। সুযোগ বুঝে ফরাসি লোকটি চম্পট দেয়। আর বোচারা ইতালিয়ানটাকে কোতল করে। তারা কিন্তু মোটেই ইংরেজ নয়।

কথাটা শোনামাত্র পাজালেন সোম্বাশে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'আরে বাস! এতদিন তবে ভুল কথা জানতাম। এখন বুঝলাম তাদের একজনের নাম মার্কেভাজেলো আর অন্যজনের নাম গুইনার্ড।'

খালকেভ ভুল খবর দেয়ার জন্য যারপরনাই লজ্জিত হল। ইন্ডিয়ানদের সাধারণত একরম ভুল হওয়ার কথা নয়। সার্জেন্ট রহস্যটা খোলসা করে দিলেন, কেন রেড ইন্ডিয়ানদের চোখে পড়ছে না। বুয়েনস আরিয়ান আর প্যারাগুয়ানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে মেতেছে। রেড ইন্ডিয়ানরা সুযোগের সদ্ব্যবহারে মেতেছে। উভয় সম্প্রদায়ের জিনিসপত্র বেপরোয়াভাবে লুটপাট করছে।

তবে এটুকু অন্তত জানা গেল, রেড ইন্ডিয়ানদের হাতে ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কয়েদ হন নি। পাজালেন আবার বোতলে

পাওয়া কাগজগুলো পাঠ করতে লাগলেন। সেগুলোর বক্তব্য উদ্ধার করতে কোনো না কোনো ভুলচুক হতেও পারে। তার বিশ্বাস, ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কোথায় রয়েছেন তা হদিস করতে পারবেনই।

সেখান থেকে দেড়শো মাইল দূরে আটলান্টিক পথের পাশে খরগোস দেখতে পেয়ে কুসংস্কারের দাস নাবিকরা আগেই আশঙ্কা করেছিল বিপদ সামনে ওঁত পেতে রয়েছে। কার্যত হল তাই। দেখা গেল লম্বা লম্বা ঘাসের ফাঁক দিয়ে জোড়া জোড়া ষাঁড়ের শিং উঁকি দিচ্ছে। তেড়ে এসে ভুঁড়ি ফাসিয়ে দিতে তাদের জুড়ি নেই। কোনরকমে খুঁজে একটা রাধেণ্ডাতে রাত্রিটুকু কাটানো গেল। মুশলধারে বৃষ্টি নামল। আবার যাত্রা শুরু করল অভিযাত্রীরা। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ঘোড়াগুলোকে নিয়ে। বিপদাশঙ্কায় তারা এতই মুখড়ে পড়ছে যে তারা আর এগোতেই রাজি নয়। থেকে থেকে ঘাড় বাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

হঠাৎ গম্ভীর গম গম শব্দ কানে এল। মুহূর্তে নদীতে বান এল। জলোচ্ছ্বাস। পানি তীরবেগে ধেয়ে আসতে লাগল। বিপদ বুঝে খালকেভ সবাইকে বিশালায়তন একটা গাছে তুলে নিল। পানির তোড়ে খাউকা নামে ঘোড়াটা করুণ আত্নানাদ করতে করতে ভেসে যেতে লাগল। খালকেভ গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে জাপটে ধরল ঘোড়াটাকে। মানুষ আর ঘোড়া উভয়েই ভেসে যেতে লাগল।

আরো চল্লিশ মাইল যেতে পারলে আটলান্টিক মহাসাগরের দেখা পাওয়া যাবে।

খাবারের ব্যাগ পানিতে ভিজ়ে গেছে। মেজর ব্যাগটা তুলে সবাইকে দেখালেন। খাবার যা আছে আর মাত্র দুদিন কোনোরকমে টেনেটুনে চলবে। ব্যস, তারপরই নিরপ্স উপবাস।

গাছের ডালে বসেই পাজালেন বললেন, ‘আমেরিকা থেকে বেরিয়ে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখা আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে ত্রিসদান দ্য আকুহান দ্বীপ অতিক্রম করে গুডহোপ অন্তরীপের দুই ডিগ্রি নিচ দিয়ে ভারত মহাসাগরে আমস্টারডাম আর সেন্টপলস দ্বীপের ধার দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের ওপর দিয়ে অনায়াসে—’

পাজালেনের মুখেরকথা শেষ হবার আগেই গাছের দুটো ডালের ফাঁকে কাত হয়ে পড়লেন। সংজ্ঞা লোপ পেয়ে গেল তাঁর। মেজর ঝট করে হাত বাড়িয়ে ধরে না ফেললে ঝপাৎ করে জলেই পড়ে যেতেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে পাজালেন রীতিমতো হায় হায় করে উঠলেন, ‘আমি বোকার হদ্দ! সত্যি আমি বোকা! ক্যাপ্টেন যেখানে নেই ঠিক সে জায়গাতেই আমরা হলো হয়ে তার খোঁজ করে মরিছি! তিনি কোনোদিনই সেখানে যান নি।’ লর্ড গ্লেনারভান অত্যুগ্র অগ্রহ প্রকাশ করে বলে উঠলেন, ‘ব্যাপার কী বলুন তো। কাগজগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে আপনি এমন কোনো গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন যার ফলে এমন জোর দিয়ে কথাটা বলতে পারলেন?’

পাজালেন বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটির একটা লর্ড গ্লেনারভানের সামনে মেলে ধরে বললেন, ‘দেখুন, আমরা এতক্ষণ ‘Austral’কে পুরো শব্দ মনে করে দারুণ ভুল করেছি। আসলে এটা হবে ‘Australia’-র অংশ। কারো কারোর মতে অস্ট্রেলিয়া একটা দ্বীপ হলে ভূগোলবিদদের কাছে সেটা কিন্তু একটা মহাদেশ।’

লর্ড গ্লেনারভান তৎক্ষণাৎ অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়াই স্থির করে ফেললেন। কিন্তু ডানকান জাহাজ রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরে। তার কাছে পৌঁছতে পারলে তবেই অস্ট্রেলিয়ার দিকে যাত্রা করা সম্ভব।

বন্যার পানি থাকায় অভিযাত্রীদের পুরো একটা দিন গাছের ডালে বসেই কাটাতে হল।

গাছের ডালে বসেই তারা ক্রমে রাতের অন্ধকার নেমে আসতে দেখল।

রাত একটু গভীর হতেই তারা অবিশ্বাস্য এক দৃশ্যের মুখোমুখি হল। টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ রহস্যজনক একটা গুমগুম আওয়াজ তাদের কানে এল। কারা যেন মাদল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এগিয়ে আসছে। কয়েকটা মশাল মিটিমিট করে জ্বলছে। রহস্যটা ফাঁস করে দিলেন পাজালেন। মাদল মশাল কিছুই না। আসলে ঝাঁকে ঝাঁকে টিউকো পোকা উড়ে বেড়াচ্ছে। কারো কারোর কাছে এরা ফসফরাস পোকা নামে পরিচিত। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা। ঠিক যেন হীরে, জ্যাস্ট হীরে। এখানকার আদিবাসী মেয়েরা গয়না তৈরি করে পরে। অন্ধকারেও ঝকঝক করে।

একটু বাদেই মুশলধারে বৃষ্টি নামল। সে কী বৃষ্টি। সবকিছু যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দেবে।

সকাল হল। ঠিক তখনই দেখা গেল বানের পানিতে ভেসে যাওয়া খালকেভ আর খাউকা নামক ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে জলের টানকে কোনোরকম সামাল দিয়ে দুটো গাছের ফাঁকে আটকে গিয়ে তারা জীবনরক্ষা করতে পেরেছে। পানি সরে গেলে একটা পরিত্যক্ত ঝুপড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। খালকেভ জানত, বন্যার পানি নেমে গেলে অভিযাত্রীরা এপথেই আসবে।

অভিযাত্রীরা খালকেভের ঝুপড়ীতেই কোনোরকমে রাত কাটাল।

রাত্রি আটটায় তারা আটলান্টিক থেকে মাত্র সাত মাইল দূরবর্তী এক ফাঁকা জায়গা হাজির হল। ভেবেছিল এখান থেকে ডানকান জাহাজকে দেখা যেতে পারে। সবাই মিলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে দূরবর্তী সাগরের দিকে তাকিয়ে খোঁজাখুঁজি করল। ব্য্থা চেষ্টা। জাহাজ তো দূরের কথা, জাহাজটার মাথুলটা পর্যন্ত কারোর নজরে পড়ল না।

ফাঁকা মাঠেই অভিযাত্রীরা রাত কাটাতে বাধ্য হল। ভোরে আবার সুমন্দের দিকে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। হ্যাঁ, এবার দেখাতে পেয়েছে। তাদের বাঙ্কিত জাহাজ ডানকান দেখতে পেল।

খালকেভ কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করল। কাজ হয়েছে মনে হল। একটু বাদেই কালোমতো একটা বক্ৰুকে দেখা গেল। হ্যাঁ, অনুমান অশ্রান্ত। একটা নৌকা তরতর করে এগিয়ে এসে অভিযাত্রীদের সামনে দাঁড়াল।

অভিযাত্রীরা হুড়মুড় করে নৌকায় উঠে পড়ল। কিন্তু খালকেভ তার প্রিয় ঘোড়া খাউকাকে নিয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইল। সে আর যাবে না। এটা তার দেশ। কাছেই তার বাড়ি।

অভিযাত্রীরা দক্ষিণ আমেরিকা অভিযান সেরে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল।

অন দ্য ট্রাক

লর্ড গ্রেনারভান ডানকান জাহাজে ফিরে সহধর্মিণী লেডি হেলেনার কাছে তাঁদের দক্ষিণ আমেরিকা সফরের ব্যর্থতার কাহিনী সস্তিপুরে বর্ণনা করলেন। তিনি একথাও বলতে ভুললেন না, আসলে বোতল থেকে উদ্ধার করা কাগজের বক্তব্য উদ্ধার করতে পিছেই তারা মারাত্মক ভুল করেছিলেন।

পজ্জান্নে কসজ তিনটে নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে যে অর্থ উদ্ধার করেছেন তা নিম্নরূপ—

‘অস্ট্রেলিয়া’ বাহুর সাতই ছুন ব্রিটানিয়া নামক তিন মাস্তুলবিশিষ্ট গ্যাসগোর যুদ্ধজাহাজটা অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে জলমগ্ন হয়ে যায়। ক্যাপ্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ মহাদেশের মাটিতে পদার্পণ করেন। তারা নিমর্ম-নিষ্ঠুর অসভ্য আদিবাসীদের হুমুসু কয়েদ হন। তারা কাগজসহ বোতলটাকে —সাঁইক্রিস ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করেন। যেখানে জাহাজটা ভলিয়ে গেছে সেখানে সাহায্য পাঠান।’

পাজ্জালেন বিশ্বরণীটা পাঠ শেষ করা মাত্র মেজর বলে উঠলেন, ‘কিন্তু আমি বলব, অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানোর আশে আমাদের ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। একবার ভুল যখন হয়েছে তখন আবারও যে আমাদের ভুলের হ্যাণা পোহাতে হবে না তারইবা নিশ্চয়তা কোথায়?’

‘সবার আগে আমাদের দেখা দরকার সাঁইক্রিস ডিগ্রি এগারো মিনিট অক্ষাংশ কোন মহাদেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে সেটা যে-সব জায়গার ওপর দিয়ে অবস্থান করছে তাদের অধিকাংশই পানি। স্থলের পরিমাণ খুবই কম। দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ আমেরিকার পর স্থলভূমি পড়ছে জিতান দ্য কুন্হা আইল্যান্ড। কাগজে এর নামগন্ধও নেই। অতএব একে বাদ দেয়া যাক। এরপর পাওয়া যাচ্ছে ভারত মহাসাগরের অন্তর্গত আমস্টারডাম আইল্যান্ডে। কাগজ তিনটেতে উল্লেখ না থাকায় বাদ দিলাম। এবার পাওয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। ইংরেজিতে লেখা বিবরণীটার ‘stra’ এবং ফরাসি ভাষায় লেখা বিবরণীটার austral-এর অর্থ বুঝাচ্ছে ‘Australia’। অস্ট্রেলিয়ার পর পাওয়া যাচ্ছে নিউজিল্যান্ড। অদৌ মহাদেশ নয়। আসলে দুটো আইল্যান্ডের সমষ্টি। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন দক্ষিণ আমেরিকা ও নিউজিল্যান্ড উপকূলের বিশালায়তন সমুদ্রের মধ্যে একটামাত্র ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে অক্ষাংশ বিস্তৃত। সেটা হচ্ছে মেরিয়া থেরেসা নামক আইল্যান্ড। কিন্তু কাগজ তিনটার কোনোটাতেই মেরিয়া তেরেসার উল্লেখ নেই। এবার আপনারাই স্থির করুন কোনদিকে, কোথায় যেতে চাচ্ছেন?’

অভিযাত্রীরা সম্মত হয়ে বলে উঠলেন, ‘অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া।’

ডানকান দুর্বীর গতিতে এগিয়ে চলল। দুই হাজার একশো মাইল দশদিনেই অতিক্রম করল। সবাই জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচু জিতান পর্বতের শিখরটাকে দেখল।

জাহাজ নোঙর করা হল। গভর্নর লর্ড গ্রেনারভানকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করেও ব্রিটানিয়া জাহাজ বা ক্যাপ্টেন গ্রান্টের হদিস পেলেন না। রাত্রির অন্ধকারেই ডানকান দ্বীপ ছেড়ে আবার যাত্রা করল।

৬ ডিসেম্বর ডানকান আমস্টারডাম আইল্যান্ডে নোঙর করল। মাত্র তিনজন দ্বীপটায় বাস করে। তাদের দুজন নিম্রো মূল্যটো আর একজন ফরাসি প্রৌঢ়। তাদের মুখে জানা গেল ব্রিটানিয়া জাহাজের কোনো নাবিক বা ক্যাপ্টেন কেউই এ-দ্বীপে আসেন নি।

পরের দিন আমস্টারডামে কাটিয়ে ডানকান ফের এগিয়ে চলল।

পাজ্জালেন এবার বোতলের কাগজ তিনটার বক্তব্যের নতুন অর্থ বের করলেন। তিনি বললেন, ‘তবে কি ব্রিটানিয়ার পক্ষে পেরু উপকূলে পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে পড়া সম্ভব?’

‘একদিনে অর্থাৎ প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় দশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে যে-কোনো জাহাজের পক্ষে এক মাসে আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে যাওয়া সম্ভব। লর্ড গ্রেনারভান বললেন।

পাজ্জালেন মুহূর্তকাল নীরবে চিন্তা করে কাগজ তিনটার মধ্যে একটার ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে বললেন, ‘এক মাসে যদি যাওয়া সম্ভবই হয় তবে এর সাত তারিখের আগে এক বা দুই যা হোক কিছু লেখা ছিল। মুছে গেছে।’

ডানকান জাহাজ বিশে ডিসেম্বর বারনউইলি অভরীপে পৌঁছে গেল। দু-বছর বাদে ব্রিটানিয়া জাহাজটার ধ্বংসাবশেষ—ভাঙাচোরা অংশের হদিস এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এত হ্যাণা করে যখন এসেই পড়া হয়েছে তদ্রূপ চালিয়ে দেখতেই হবে।

লর্ড গ্রেনারভান মনস্থির করে ফেলেছেন, এখানে যদি নেহাৎই ব্রিটানিয়া জাহাজটার বা ক্যাপ্টেন গ্রান্টের হদিস না পান তবে ইউরোপেই ফিরে যাবেন। কারণ পাজ্জালেন তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, ব্রিটানিয়া এখানে তলিয়ে না গিয়ে যদি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে তলিয়ে গিয়ে থাকে তবে অনেক আগেই ক্যাপ্টেন গ্রান্ট ইউরোপে ফিরতেন। সেখানে ফেরার জাহাজের সমস্যা নেই আর ইংরেজদের উপনিবেশও রয়েছে সেখানে। কিন্তু ডানকান বর্তমানে যেখানে অবস্থান করছে পশ্চিম উপকূলে উপনিবেশ তো দূরের কথা, কেবলই মরু অঞ্চল।

জাহাজ থেকে নেমে অভিযাত্রীরা সামান্য এগোতেই এক পল্লীতে হাজির হল। বেশ বড়সড় একটা বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় চারটে ছেলে ও চারটে কুকুর নিয়ে তাদের কাছে এল। তাদের অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

আপায়ন করে অতিথি ভোজন করাল। খাবার টেবিলে বসে লর্ড গ্লেনারভান একথা সেকথার পর কাণ্টেন গ্রান্ট এবং ব্রিটানিয়া জাহাজের প্রসঙ্গ তুললেন।

গৃহকর্তা ষ্ট্রীট তাকে হতাশ করল। সবার মন যারপরনাই বিধিয়ে উঠল।

সে মুহূর্তেই কে যেন আচমকা বলে উঠল, 'ক্যান্টেন যদি সত্যি জীবিত থাকেন তবে তিনি অস্ট্রেলিয়ারই কোথাও না কোথাও আছেন।'

লর্ড গ্লেনারভান উন্মাদের মতো চোঁচিয়ে উঠলেন, 'কে? কে একথা বলল? কে?'

সেই বাড়িরই এক কর্মচারী বলল, 'আমি। ব্রিটানিয়া জাহাজে আমি নিজেও ছিলাম। আমার নাম আয়ারটন। স্কটল্যান্ডের অধিবাসী। জাহাজের কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম।' আয়ারটনের বয়স পয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

লর্ড গ্লেনারভান সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'তুমি—তুমি ব্রিটানিয়া জাহাজে ছিলে?'

'অবশ্যই, জাহাজ তলিয়ে যাওয়ার পর আমি ক্যান্টেন গ্রান্টের সঙ্গে ডাঙায় উঠতে পারি নি। ডেক থেকে ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম।'

লর্ড গ্লেনারভান এবার বললেন, 'বোতলের ভেতরে পাওয়া কাগজে দুজন নাবিকের কথা লেখা রয়েছে। তুমি কি তাদের মধ্যে একজন নও আয়ারটন?'

'না, বোতলের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। আমার ধারণা ছিল, ক্যান্টেন গ্রান্টের সলিল সমাধি হয়ে গেছে। আর একমাত্র আমিই জীবিত রয়েছি।'

'কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বললে ক্যান্টেন গ্রান্ট জীবিত। ব্যাপারটা কি খুলে বলো তো।'

'হ্যাঁ, আমি বলেছি তিনি জীবিত থাকলে অস্ট্রেলিয়াতেই আছেন।'

মেজর জিজ্ঞাস করলেন, 'বুঝলাম। কিন্তু ব্রিটানিয়া কোথায় ডুবেছিল, বলো তো?'

'অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে। সাঁইত্রিশ ডিগ্রি অক্ষাংশে। পূর্ব উপকূলে। সেটা ছিল আঠারো শো বাষট্টির ২৭ জুন রাতের ঘটনা।'

লর্ড গ্লেনারভান উচ্চস্বস প্রকাশ করে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে আরে, তারিখটা ঠিক মিলে যাচ্ছে!'

আয়ারটন এও বলল, রবার্ট আর মেরিকেও সে ছোটবেলা থেকেই চেনে। রবার্টের বয়স তখন দশ বছর ছিল। রবার্ট তার কথায় সায়দিল, 'ঠিক। ঠিকই বলেছেন।'

আয়ারটন যা কিছু বলল তাতে কারোর মনে কিছুমাত্রও সন্দেহ রইল না।

আয়ারটন এবার যা বলল তা হল, ক্যান্টেন গ্রান্ট তখন নাকি পাণ্যুর পশ্চিম উপকূলে নতুন এক স্কটল্যান্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। বিশেষ যে ব্রিটানিয়া জাহাজ ক্যান্টেন গ্রান্টের অতিক্রম করে ভারত মহাসাগর হয়ে ইউরোপের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখন তুমুল ঝড় উঠল। সে যে কী ঝড়ের তাগুব ভায়ায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। জাহাজের ভেতরে ছয় ফুট জল জমে গেল। জাহাজ ডুবে যাওয়ার জোগাড় হল। বাইশে জুন অস্ট্রেলিয়ার উপকূল নজরে পড়ল। চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ থমকে গেল। তখনই আয়ারটন ডেক থেকে সমুদ্রের বুকে আছাড় খেয়ে পড়ে। ব্যাস, তারপর ক্যান্টেন গ্রান্টের আর কোনো খবর সে পায় নি। সে নিঃসন্দেহ হয়েছিল, ব্রিটানিয়া টুফোন্ড উপসাগরে তলিয়ে গিয়েছে। কেউই প্রাণে বাঁচতে পারে নি। লর্ড গ্লেনারভানের কাছে এখন শুনল, ক্যান্টেন গ্রান্ট দুজন নাবিকসহ অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে কয়েদ হয়েছে। জঙ্গলিদের হাতে আয়ারটনও বন্দি হয়। তারা তাকে দাস বানিয়ে রাখে। দুবছর পরে মওকা বুঝে সে পালিয়ে আসে। তখন থেকেই এখানে, এ-বাড়িতে চাকরি করছে। সে এবার মেজরের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি যে ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টার মাস্টার ছিলাম, সে-সব কাগজপত্র কিছুতেই নষ্ট হতে দিই নি। সঙ্গে করে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটু অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসছি।' কথা বলতে বলতে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

মিনিটখানেকের মধ্যেই আয়ারটন একগোছা কাগজ নিয়ে আবার অভিযাত্রীদের কাছে ফিরে এল।

কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মেজর তার মুখের দিকে তাকালেন।

লর্ড গ্লেনারভান বললেন, 'আয়ারটন, এখন তুমিই বল, এ-পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য কী?'

কয়েক মুহূর্ত ভেবে আয়ারটন বলল, 'ক্যান্টেন গ্রান্ট অবশ্যই অসভ্য জঙ্গলিদের হাতে কয়েদ হয়েছেন। ডানকানে চেপে জাহাজডুবির স্থানে যাওয়ার দরকার, সেখান থেকেই আমাদের তল্লাশি আরম্ভ করা উচিত।'

ক্যান্টেন জানালেন, 'জাহাজের কিছু গুণগোল দেখা দিয়েছে। মেরামত না করলে আর চলছে না। কদিন সময় লাগবে।'

উপায়ন্তর না দেখে অভিযাত্রীরা এবার জাহাজ ছেড়ে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি বরাবর এগোতে লাগল। ঠিক হল টুফোন্ড থেকে জাহাজ তাদের তুলে নেবে। গাড়ি রোজ বারো মাইল পথ পাড়ি দিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার একমাসেই পৌছে দিতে পারবে। হেলেনাও তাদের সঙ্গে গাড়িতে যেতে রাজি হলেন।

সিদ্ধান্ত পাকা হল লর্ড গ্লেনারভান জাহাজের ছুঁতোর মিস্ত্রিকে গাড়ি তৈরির কাজে লাগিয়ে দিলেন। ছয় জোড়া বলদ জোগাড় করে নিয়ে এল আয়ারটন। কদিনের মধ্যেই চার চাকাওয়ালা বিশ ফুট লম্বা চমৎকার একটা গাড়ি তৈরি হয়ে যায়। এবার খাবারদাবার ও অন্যান্য অত্যাৱশ্যক সামগ্রী সদ্য তৈরি গাড়িটাতে তুলে নেয়া হয়।

অভিযাত্রীদের নিয়ে বিশালায়তন গাড়িটা ছয়জোড়া তেজি বলদের টানে দিব্যি এগিয়ে চলে। জাহাজটাকে মেলবোর্নে নিয়ে যেতে নাবিক দরকার। তাই গাড়িতে তাদের বেশিসংখ্যক না নিয়ে জাহাজেই বেশি রাখা হল। মেলবোর্নে জাহাজ মেরামত করা সম্ভব না হলে সেটাকে টুফোন্ডে নিয়ে যাওয়া হবে।

অষ্টরোশে সৌরষ্টির ভেইশে ডিসেম্বর। ছয় জোড়া বলদে টানা গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এখানকার অধিকাংশ কলেনিই উপকূলের গা ঘেষে অবস্থিত। সুখের বিষয় সাঁইগ্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখার দু-ধারের জায়গাগুলো জনবসতিহীন নয়।

দুই তিনদিন একনাগাড়ে গাড়ি চলার পর অভিযাত্রীরা 'ক্রাউন ইন' নামক সরাইখানায় রাত কাটালেন। অস্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক বিবরণ সম্বন্ধে কিছু শোনার জন্য অভিযাত্রীরা পাজালেনকে ঘিরে বসলেন। তিনি যে তথ্য পরিবেশন করলেন তা হল—অস্ট্রেলিয়া সত্যিই অদ্ভুতত্বের দাবি করতে পারে। এখানকার মাটি, জল, বাতাস আর গাছ-পালা প্রভৃতি সবকিছুই বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই, বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে পৃথিবীর সেরা জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে আজও এ মহাদেশটা রীতিমতো রহস্যসম্বলিত করে চলেছে। এখানকার পাছগুলো 'পাতাঝরা' নয়, বছরে একবার করে ছাল পাল্টায়। নদীগুলো ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে আরও বিচিত্র ব্যাপার, গাছের পাতাগুলো উর্ধ্বমুখী—সূর্যের দিকে মাথা উঁচিয়ে না থেকে নিচের দিকে ঝুলেছে ফলে ছয়' দানে অক্ষম। কাঠের গায়ে আগুন ধরাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। আরো অবিশ্বাস্য ব্যাপার হচ্ছে, বৃষ্টির জল এখানকার পাথরকে গলিয়ে দেয়। চতুষ্পদীদের পাখির মতো ঠোঁট রয়েছে। ক্যাডারুলোর পা অবিশ্বাস্যরকম লম্বা। শেয়াল, বানরের মতো এগাছ থেকে ওগাছে লাফলাফি করে বেড়ায়। ভেড়াগুলোর ধরে যেন শুয়েয়ের মাথা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাখির মতো গাছের ডালে বাসা বানিয়ে ইঁদুরগুলো দিবা বাস করে। বিচিত্র সুরে গান গায় আবার মুখে এমন বিচিত্র শব্দ করে, হঠাৎ করে শুনলে মনে হয় কেউ যেন গানের সঙ্গে তবলা বাজাচ্ছে। এখানকার মানুষগুলোর চরিত্রেও বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। তারা সকালে ঘুম থেকে উঠেই কারণে অকারণে হো-হো রব করে হাসে, আবার রাতে শুতে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ বিলাপ করে কাঁদে। পৃথিবীর কোন দেশের নিয়মের সঙ্গেই এখানকার প্রচলিত নিয়মের সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। আর অক্সিডাইড না হওয়ার ফলে এখানকার কোনো ধাতুই চরমতম শত্রু মরচের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। আবার বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত কম, অক্সিজেন বেশি। তাই এখানকার মানুষ, বনাশ্রমী, গাছগাছালি, ধাতু এবং অন্যান্য জড়বস্তু অন্তত তা হয়ই না বরং স্থানমাধ্যমে অশুদ্ধরা শুদ্ধ হয়ে যায়। এরকম অদ্ভুতত্বের কথা বিবেচনা করে পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আত্মতত্ত্বির জন্য অস্ট্রেলিয়ায় নির্বাসন দেয়া হয়। আরো অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এখানকার কোনো প্রাণীই হিংস্র নয়।

একদিন গাড়িটা বিগড়ে গেল। মেরামত না করলে আর চলছে না। বাধ্য হয়ে আয়ারটন প্রায় বিশ মাইল দূরবর্তী ব্র্যাকপয়েন্ট স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সেখান থেকে পাকা মিস্ত্রিকে আনিয়ে গাড়িটাকে মেরামত করে নেবে।

আয়ারটন ফিরে না আসা পর্যন্ত অভিযাত্রীদের নিয়ে লর্ড গ্লেনারভান তাঁর খাঁটিয়ে সেখানেই রয়ে গেলেন। তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন, আয়ারটন মিস্ত্রী না পেলে এখানে শুয়ে বসে কদিন যে নষ্ট করতে হবে কে জানে।

সকাল হতে না হতেই অভিযাত্রীদের যাবতীয় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আয়ারটন গাড়ির মিস্ত্রি নিয়ে ফিরে এল। শুভাদ বটে, ঘটনা দুইয়ের মধ্যেই সে গাড়িটাকে মেরামত করে ব্যবহারোপযোগী করে দিল।

অভিযাত্রীরা আবার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে যাত্রা করল। কিছুদূর এগিয়ে গাড়িটা রেললাইন ও পথের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে পড়ল। সিটি দিতে দিতে একটা ইঞ্জিন পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সবে একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। সেতু ভেঙে কয়েকটা বগি নদীতে পড়ে গেছে, সবার শেষে যে লাগেজ ভ্যানটা ছিল একমাত্র সেটাই অক্ষত রয়েছে। ইঞ্জিনটার সারভেয়র এসেছে দুর্ঘটনা পরিদর্শন করতে, যে যেখানে ছিল দূর দূর বৃকে ছুটে এসেছে ব্যাপারটা দেখার জন্য।

ঠিক তখনই একটা রোমহর্ষক দুষ্টের মুখোমুখি হল সবাই। রক্তমাখা একটা লাশ সেতুর কাছ থেকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। তার বুকে একটা ছোরা গাথা। ক্ষতস্থানটা থেকে ইঁইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। পুলিশের কর্তাব্যক্তি ওসারভেয়র অদ্রলোক এরকম আশঙ্কাই করছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বন্দিদের এখানে ছেড়ে দেয়ার প্রতিক্রিয়া ফলতে শুরু করেছে। তারাই ব্রিজ ঝুলে রেখে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। লাগেজ ভ্যানের মালপত্তর লুট করাই ডাকাতিদের একমাত্র উদ্দেশ্য। করেছেও তাই।

অভিযাত্রীরা পথের ধারের এক কবরখানায় একটা ছোট্ট ছেলেকে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখতে পেল। তার গলায় সুতোয় বাঁধা একটা চিরকুট দেখা গেল। তার গায়ে একটা কুলির নাম লেখা। তার হেফাজতে টোলিন নামে এ-ছোট্ট ছেলেটাকে হুলে দেয়া হল ঠিকানামতো পৌছে দেবার জন্য। অভিযাত্রীরা নিজেদের মধ্যে কথাবর্তার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌছল, ছেলেটার বাবা ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছেলেটা ঘুম থেকে উঠে বসল। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে সে বলল, 'আমি মিশনারি স্কুলের ছাত্র। ভূগোলে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। বাবা-মাকে খুশির খবরটা দিতে যাচ্ছিলাম। স্যার তাকে শিখিয়েছেন, ইংরেজ জাতটা সারা পৃথিবীর ভাগ্যানিয়ন্তা। এমন কি ফ্রান্সের অধীশ্বর। তার কথা শুনে ভূগোলবিদ পাজালেন বিম্বয়ে হতবাক হলে গেলেন। লর্ড গ্লেনারভান ডাম্যমাণ গ্রন্থাগার থেকে রিচার্ডসনের লেখা একটা ভূগোল বই তাকে উপহার দিলেন। পরের দিন সকালে অভিযাত্রীরা এক অভাবনীয় ঘটনা লক্ষ্য করল। লেডি হেলেনার বৃকের ওপর একগোছা ফুল আর উপহৃত ভূগোল বইটা পাজালেনের কোর্টের পকেটে গুজে রেখে ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে।'

৩১ ডিসেম্বর, ক্রান্ত অবসন্ন অভিযাত্রীরা সোনার পাহাড় আলেকজান্ডার মাউন্টেনে উপস্থিত হলেন। লর্ড গ্লেনারভান সহযাত্রীদের নিয়ে খনি থেকে সোনা উত্তোলনের কারসাজি দেখলেন।

৩ জানুয়ারি অভিযাত্রীরা রাতে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিল। একটা ব্যাপার দেখে তারা যারপরনাই অবাক হল। এই অঞ্চলের সব বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতর থেকে খিল দেয়া। ভুলেও কেউ দরজা খুলল না।

সরাইখানার মালিকের সঙ্গে কথা বলে লর্ড গ্লেনারভান জানতে পারলেন, ট্রেন ডাকাতির খবর পাওয়ার পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ খুবই সতর্ক হয়ে গেছে। আর অস্ট্রেলিয়ান গেজেটে নাকি ছাপা হয়েছে ট্রেন ডাকাতদের পাশ্চাত্য মিলেছে। ব্যাপারটা লেডি হেলেনা আর রবার্ট ঘুমিয়ে পড়লে অভিযাত্রীরা সরাইখানার মালিককে খুঁচিয়ে আর যে গুরুত্বপূর্ণ খবরটা বের করল তা হল ছয় মাস আগে নরফোক আয়ারল্যান্ডে চালান দেয়ার সময় উনিশজন নামকরা ডাকাত পুলিশের হেফাজত থেকে হাফিস হয়ে গেছে। তাদের সর্দার জয়েস। সে বহু কুকর্মের নায়ক। অনেক চেষ্টা করেও পুলিশ তার হাতে বেড়ি পড়াতে পারে নি। তার অস্ট্রেলিয়ায় আগমনের ব্যাপারটাও রহস্যজন্য। সেতুর ওপরের দুর্ঘটনাটা তারাই ঘটিয়েছে। কী পাশ্চাত্য তাদের হৃদয়!

খবরটা শোনার পর লর্ড গ্লেনারভানের কলিজা শুকিয়ে গেল। তিনি মেলবোর্ন থেকেই ডানকান জাহাজে ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর যাই হোক ডাকাতদের হাতে জান খোয়াতে কিছুতেই তিনি রাজি নন।

আয়ারটন তাঁর মনে সাহস সঞ্চার করতে গিয়ে বলল, 'কর্তা, সঙ্গে আটটা বন্দুক তো রয়েছেই। এগুলো দিয়ে উনত্রিশটা ডাকাতকে ঘায়েল করা কোনো সমস্যাই নয়।' শেষপর্যন্ত এগিয়ে যাওয়াই স্থির হল।

৫ জুলাই অভিযাত্রীরা মুরে নামক এমন এক জেলায় হাজির হলেন যেখানে কেবল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিশ্চিত বাসস্থান। কালো চামড়ার মানুষগুলো গ্রামের গভীর বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গরা অবাধে যাতায়াত করে।

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাজালেন বললেন, 'আজ এখানে আর আদিবাসীদের তেমন দেখাই যায় না। অচিরেই শ্বেতাঙ্গরা অস্ট্রেলিয়ার একাধিপত্য বিস্তার করে ফেলবে।'

ঠিক তখন গাছের ডালে কারা যেন লাফালাফি দাপাদপি করছে মনে হল। অভিযাত্রীরা এগিয়ে-পিছিয়ে, ডাইনে বাঁয়ে হেলে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার জন্য তৎপর হল। কী জানি বলা তো যায় না, এখানে হয়তো শেয়ালের মতো উড়ন্ত বানর থাকলেও থাকতে পারে।

পাজারেনই শেষপর্যন্ত উৎকর্ষা দূর করতে গিয়ে বললেন, 'অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এমন করে, বানরের মতো গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, নামে মানুষ বটে, কিন্তু মুখ চোখ বানরের মতোই।'

আয়ারটন এরকমই একজন আদিবাসীর দাস হয়ে দু-দুটো বছর কাটিয়েছে। এদের মেয়েদেরকে কৃতদাসীর মতো শিশু লালনপালন থেকে শুরু করে শিকার করে পুরুষদের পেটের জোগাড় করা পর্যন্ত যাবতীয় কাজ করতে হয়। পান থেকে চুন খসলেই পুরুষরা লাঠির মাধ্যমে আদর-সোহাগ করে। নারীজাতীয় এমন হীন জীবনযাত্রা দেখে লেডি হেলেনার দুচোখ জলে ভরে গেল, তিনি নিজেদের খাবার থেকে দুগ্ধিনী মেয়েদের জন্য খাবার দিলেন। হায়! হতচ্ছড়া পুরুষগুলো জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে গোত্রাসে গিলতে লাগল।

আয়ারটন শুকনো গলায় বলল, 'ক্যাপ্টেন গ্রান্ট হয়ত এরকমই কোনো আদিবাসীদের মহল্লায় বন্দিজীবন যাপন করছেন। তবে পালিয়ে এসে আমি দাসবৃত্তি করে যে অমানুষিক দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছি তার চেয়ে আদিবাসীদের হাতে আত্মত্যা কয়েদ হয়ে থাকা অনেক অনেক বেশি শাস্তির।

এমন সময় একদল এমু পাখি দেখে আদিবাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে তেড়ে গেল, আরেকবার! তারা ঘোড়ার চেয়ে তীব্রবেগে ছোটে। তারা অভিজ্ঞ হাতে পাঁচ পাঁচটা এমু পাখিকে ঘায়েল করে ফেলল। আসলে ডানার পরিবর্তে দেহের দুপাশে মাংসপিণ্ড থাকার জন্য তারা উড়তে পারে না।

আদিবাসীদের মহল্লায় আরো অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার দেখা গেল। গাছের মগডালে নীলাভ কয়টা কাকাতুয়াকে মারার জন্য দুই ফুট ওপর দিয়ে তীর বেগে কাঁপানো একটা কাঠের টুকরো ছুঁড়ে দিল। সেটা প্রায় চল্লিশ ফুট খেয়ে গিয়ে হঠাৎ একলাফে প্রায় একশো ফুট ওপরে উঠে গিয়ে ডজন খানে কাকাতুয়াকে ধরাশায়ী করে কাঠটা আবার নিষ্ক্ষেপকারীর কাছে ফিরে এল, এমন জাদু একমাত্র অস্ট্রেলিয়ানরাই দেখাতে পারে। আশ্চর্য জাত বটে!

পরের দিন ভোরে অভিযাত্রীরা আবার পথে নামলেন। কিছুদূর যেতেই প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু ও পনের মাইল লম্বা অস্ট্রেলিয়ান আল্পস পর্বতমালার কাছাকাছি পৌঁছলেন।

আয়ারটন এক সরাইখানার মালিকের কাছ থেকে জেনে নিল, কোন পথে পাহাড়টা ভিঙানো সম্ভব।

সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় দেয়ালের গায়ে সাঁটা একটা বিজ্ঞপ্তির দিকে লর্ড গ্লেনারভানের চোখ পড়ল। পুলিশ কর্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি। বেন জয়েসের সন্ধান যে দিতে পারবে তাকে নগদ একশো পাউন্ড পুরস্কার দেয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিটার পড়ে তিনি চোখ মুখ বিকৃত করে বলে উঠলেন, 'অপদার্থটিকে ফাঁসির দড়িতে লটকে দেয়া দরকার।'

আয়ারটন বলল, 'কর্তা, তাঁর মাথার দাম কিন্তু একশো পাউন্ড হওয়া উচিত নয়।'

পাহাড় ভিঙাতে গিয়ে একটা বদল আর একটা ঘোড়া অক্লান্ত পেল। শেষ রাত্রির দিকে আরো একটা বদল আর ঘোড়া পৃথিবী ছেড়ে গেল। এ যেন বদল আর ঘোড়ার মড়ক লেগে গেল।

পাহাড়ের গুহায় অভিযাত্রীরা রাত কাটাতে লাগল। তখন রাত প্রায় এগারোটা। হঠাৎ মেজরের ঘুম ভেঙে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে বসে পড়লেন। দেখতে পেলেন ফসফরাস ফার্নের নীল আলোকচ্ছটায় প্রায় আধমাইল অঞ্চল জুড়ে আলোর বন্যা বয়ে চলেছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে আদিম যুগের অসভ্য জঙ্গলিনদের মতো এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করলেন।

একটু বাদেই মুঘলধারে বৃষ্টি নামল, সে সঙ্গে অনবরত কর্কশধরে মেঘ ডাকাডাকি করতে লাগল। অভিযাত্রীরা উৎকর্ষার মধ্যে সময় কাটাতে লাগল। এদিকে মেজর যে গুহায় নেই, সেদিকে কারোর খেয়ালই নেই। কিন্তু তাঁর পক্ষে কিছুই আবিষ্কার করা সম্ভব হল না। হতাশা হয়ে ফিরে এলেন।

মেজর কিন্তু ঘোড়া আর বলদগুলো মরার ব্যাপারে আয়ারটনকে তলে তলে সন্দেহ করে চলেছেন। পাজালেনও ভাবছেন, সে গোপনে পলাতক কয়েদিদের সঙ্গে গোপন আঁতাত, ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নি তো? তিনি অভিযাত্রীদের কাছে মনের কথা ফাঁস করতে ক্যান্টেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে চেপে ধরলেন, 'সে কী সাহেব! একই মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছেন যে বড়! এত বড়াই করে বলেছিলেন, ভিক্টোরিয়ায় কোনো কয়েদি থাকে না। আপনিই আবার আশঙ্কা করছেন, আয়ারটন হয়তো কয়েদিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বলদ আর ঘোড়াগুলোকে মেরেছে।'

পাজালেন একদম বেকুব বনে গিয়ে মুখে কলুপ এঁটে বসে রইলেন।

পরিস্থিতি বড়ই সঙ্গীন, গাড়ির আশা ছেড়ে দিয়ে এখন পায়ে হেঁটে পথ পাড়ি দেয়া ছাড়া গতাত্তর নেই। টুফোল্ড উপসাগর মাইল-পাঁচেকের পথ। লেডি হেলেনা ও মেরি হাঁটতে রাজি হলেন। তবে ভিক্টোরিয়ার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চলের ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মাথা সমান উঁচু ঘাস। সেগুলো কেটে কেটে পথ তৈরি করে তবেই অগ্রসর হওয়া যাবে। তবে কোনোভাবেই টুফোল্ড উপসাগরে ডানকান জাহাজটা যদি চলে আসে তবে কোনো সমস্যাই থাকে না।

শেষপর্যন্ত অভিযাত্রীরা দীর্ঘ আলোচনার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, আয়ারটন ঘোড়ায় চেপে লক্ষ্যে রোড ধরে মেলবার্নে হাজির হবে। সময় লাগবে চারদিন। টুফোল্ড পৌঁছতে লাগবে দুদিন। সাতদিনের মধ্যেই সে ডানকান জাহাজকে টুফোল্ডে নিয়ে আসতে পারবে, কথা দিল।

লর্ড গ্লেনারভান জাহাজের কাণ্ডের কাছে চিঠি লিখতে বসলেন। মেজর বললেন, 'আমরা মুখে কথা বলার সময় আয়ারটন বলি বটে। কিন্তু লিখতে গেলে 'বেন জয়েস' লিখতে হয়, খেয়াল রাখবেন।'

বেন জয়েস! বেন জয়েসের নামটা উচ্চারিত হওয়ায় অভিযাত্রীদের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হল। চোখের পলকে কোর্টের ভেতরের পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে আয়ারটন লর্ড গ্লেনারভানকে গুলি করল। ব্যস, বাইরেও গুলির আওয়াজ হতে লাগল।

আয়ারটনকে ধরার জন্য জন ম্যাস্‌লস ছুটল, ব্যর্থ হল। সে জঙ্গলে ঢুকে তার সাকরদেদের সঙ্গে মিলিত হয়ে গেল।

লর্ড গ্লেনারভানের আঘাত তেমন কিছু নয়। চামড়া ছুঁয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সহধর্মিণী লেডি হেলেনা আর মেরিকে টেনে গরুর গাড়ির ছাঁটনির মোটা চামড়ার আড়ালে নিয়ে চলে গেলেন। আর অন্যান্য অভিযাত্রীরা শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে পড়ল। মেজর ম্যাস্‌লসকে নিয়ে শত্রুর খোঁজে এগিয়ে গেলেন। হতাশ হয়ে একটু বাদেই ফিরে এলেন। আয়ারটন বা তার কোনো সাকরদেদকেই চোখে পড়ল না।

দেখা যাচ্ছে, বিপদ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল।

লেডি হেলেনা আর মেরির কাছে রেল ডাকাতির খবরটা এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। মেজর এবার তাদের কাছে ব্যাপারটা খোলসা করে বললেন। আর নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার গেজেটের পাঠাও দেখালেন। আর এও বললেন গোড়া থেকেই আয়ারটনের ওপর তাঁর সন্দেহ হয়েছিল। এবার তিনি কতকগুলো টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে তাঁর এরকম সন্দেহের কারণ তুলে ধরলেন। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, আয়ারটন গাড়ি মেরামতের জন্য যে মিস্ত্রিকে ডেকে এনেছিলেন তার সঙ্গে তার ইশারায় কথাবার্তার মধ্যে তিনি উভয়ের গোপন আঁতাতের গন্ধ পেয়েছিলেন। তারপর কোনো গ্রাম বা শহরে ঢোকার কথা উঠলেই আয়ারটন কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়ত। আবার ডানকান জাহাজকে টুফোল্ড উপসাগরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আয়ারটন বারবার যেভাবে পীড়াপিড়ি করেছে, সেটাও মেজরকে ভাবিয়ে তোলে। সবশেষে ঘোড়া আর বলদগুলোর দেখভালের দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছিল। কিন্তু তারা একেই করে মারা যাওয়ায় ব্যাপারটাও তাঁর মনে কম রহস্যের সঞ্চার করে নি। সবকিছু জেনে-বুঝেও একমাত্র উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তিনি আয়ারটনকে কিছু বলতে পারেন নি। ভেতরে ভেতরে ছটফট করা ছাড়া কোনো উপায়ও তো তাঁর ছিল না। গতরাতে প্রমাণ হাতেনাতে পেয়ে গেলেন, সেটা হচ্ছে, ফসফরাসের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন, গাড়ির সে মিস্ত্রি, আয়ারটন আর একজনকে ঠিক চিনে উঠতে পারলেন না। তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্তাও শুনেছেন। যেমন গ্যাসট্রোলিয়ানের পরিমাণ এতই বেশি যে, পুরো একটা অশ্বারোহী দলকে মেরে সাবাড় করে দেয়া যাবে—এ পরিকল্পনায় বেন জয়েস সাফল্যলাভ করলে মনে করব, তার মতো ঘাঘু কোয়ার্টার মাস্টার দ্বিতীয় আর কেউই নেই—এমন আরো কিছু কথা তারা আলোচনা করছিল, যাতে মেজর নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন, যে তার ছদ্ম নাম বেনজয়েস। আসল নাম আয়ারটন। কুখ্যাত ডাকাত-সর্বদার বেনজয়েস।

অভিযাত্রীরা বুঝলেন, আয়ারটন কোনোদিনই সেই ব্রিটানিয়ান জাহাজে কাজ করে নি, তবে ক্যান্টেন গ্রান্ট তার পরিচিত। তবে ব্রিটানিয়ার কোয়ার্টার মাস্টারের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার হাজার হওয়া কীভাবে সম্ভব হল? কিন্তু এও সত্য যে, আয়ারটন আর বেনজয়েস যে একই ব্যক্তি, পুলিশ তা আজও জানতে পারে নি।

সব কিছু শুনে ভীতসন্ত্রস্ত কণ্ঠে লেডি হেলেনা বললেন, 'শয়তানটা নিখাঁত কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে লোকটার বাড়িতে চাকরির নামে মাথা গুঁজেছিল।'

'অবশ্যই, সেখানেও হয়তো চরম বেইমানি করত। কিন্তু আমাদের সঙ্গ নেয়ায় সে বেচারার বেঁচে গেল।'

মেরির চোখে মুখে হতাশার কালো ছায়া নেমে এল। সে নিঃসন্দেহ হল তার বাবাকে পাওয়ার চিন্তা নিতান্তই দুরাশা। আর আয়ারটনই যে কুখ্যাত ডাকাত বেনজয়েস এ ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যাওয়ার পর ক্যান্টেন গ্রান্টের হৃদিস

পাওয়ার ব্যাপারে অভিযাত্রীরা যারপরনাই হতাশ হয়ে পড়ল। আর তারা এও বুঝল, ব্রিটানিয়া জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে, টুফোল্ড উপসাগরে নিমগ্ন হয় নি, এবারও বোতল থেকে পাওয়া কাগজ তিনটির বক্তব্য উদ্ধার করতে পাজালেনও ভুল করেছেন।

অভিযাত্রীরা ভাবল শয়তান আয়ারটন অবশ্যই তার সাকরেদদের ডেকে আনতে গেছে। অতএব সাধ্যমতো সতর্ক থাকতে হবে। দুজন নাবিক বন্দুক হাতে সারারাত পাহারায় নিযুক্ত রইল।

আয়ারটন দুদিন আগে যে প্রস্তাব দিয়েছিল ম্যাক্সলস এবার সে প্রস্তাবই দিল, ঘোড়া নিয়ে কোনো একজন দুশো মাইল দূরবর্তী মেলবোর্নে যাওয়া দরকার। দুদিনের মধ্যে ডানকান জাহাজকে টুফোল্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হোক। অনেকেই যেতে চাইল। বাধ্য হয়ে লটারির মাধ্যমে স্থির করা হল মুলরাডি যাবে। ডানকানের মেট টম অস্টিনের নামে লর্ড গ্লেনারভান চিঠি লিখে দিলেন, পত্র পাওয়ামাত্র তিনি যেন ডানকানকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে নিয়ে যান।

মুলরাডি লর্ড গ্লেনারভানের আদেশপত্র নিয়ে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে গেল।

একটু পরেই মুলরাডি যে দিকে ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেছে সেদিক থেকে হঠাৎ গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অভিযাত্রীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার জোগাড় হল। সে নিশ্চয় বিপদাপন্ন। লর্ড গ্লেনারভান এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেজর তাঁর পথ আগলে দাঁড়ালেন। ঠিক তখনই করুণ আর্তস্বর ভেসে এল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে, কোথায় আছ—বাঁচাও!'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় মুলরাডি বিকট আর্তনাদ করতে করতে অভিযাত্রীদের কাছে হাজির হল। পাঁজরে গুলি লেগেছে। রক্ত ঝরছে। সে লর্ড গ্লেনারভানকে বলল, 'কর্তা, চিঠিটা শয়তান বেনজয়েস...' ব্যস, সংজ্ঞা হারিয়ে সে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে যন্ত্রণাকাতর মুলরাডি কোনোরকমে যা বলল তার মর্মার্থ হল, 'তাকে গুলি করে বিশ্বাসঘাতক বেনজয়েস জোর করে পকেট থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়। যাবার আগে সে বলে, দু-চারদিনের মধ্যেই আমরাই ডানকান জাহাজের মালিক হচ্ছি। তারপর নিজেই চিঠিটা নিয়ে ডানকান জাহাজের মেট মি. টম অস্টিনের কাছে ছুটল। আর তার সাকরেদদের বলে গেল, তারা যেন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে টুফোল্ডে গিয়ে অপেক্ষা করে।

দুঃসংবাদটা পাওয়ামাত্র পাজালেন ক্যাপ্টেনকে নিয়ে টুফোল্ডের দিকে রওনা হলেন। ডাকাতদের আগেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে যেতে চান। শেষপর্যন্ত ডানকান জাহাজ ডাকাতদের কবলে পড়বে, কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দশ মাইল পায়ে হেঁটে, হতাশায় জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত দেহে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। কেম্পল পায়ার সেতু ছাড়া স্লোয়ি নদী অতিক্রম করার অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। শয়তান বর্বর ডাকাতরা সেটাকে পুড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু সাধের ডানকান জাহাজ ডাকাতদের কবলে চলে যাবে এটা লর্ড গ্লেনারভান হতে দিতে রাজি নন। তিনি টুফোল্ডেযাবার জন্য যারপরনাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

অনেক চেষ্টার পর ১৮ জানুয়ারি ম্যাক্সলসগাছের মোটা মোটা ছাল জুড়ে জুড়ে চমসৎকার একটা ভেলা তৈরি করে ফেলল। কিন্তু তার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য মহড়া দিতেই সেটা জলের চাপে ফেঁপে গেল। এবার ২১ জানুয়ারি পেজালেনের পরামর্শ মফিক গাছের গুড়ি দিয়ে একটা ভেলা তৈরি করা হল। কোনোরকমে অভিযাত্রীরা সেটায় চেপে স্লোয়ি নদী অতিক্রম করলেন।

২৫ জানুয়ারি বেলা এগারোটায় অভিযাত্রীরা টুফোল্ড থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী ডেলিগেট নামক গ্রামে, সেখান থেকে একটা গাড়ি ব্যবস্থা করে তারা সমুদ্রোপকূলে সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সমান্তরাল রেখায় উপস্থিত হল। হতাশ হল। ডানকান জাহাজের দেখা পাওয়া গেল না।

গ্লেনারভান সহযাত্রীদের নিয়ে একটা সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। মেলবোর্নে টেলিগ্রাম করে জানতে পারলেন। আঠারোই জানুয়ারি ডানকান যাত্রা করেছে। কিন্তু, কোথায়, কোনদিকে গেছে বলতে পারল না।

লর্ড গ্লেনারভানের ফুসফুস নিঙড়ে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এ—তবে কি ডানকান সত্যি ডাকাতদের কজায় চলে গেল।

দ্য সিক্রেট অব দ্য আয়ল্যান্ড

১২৩

আজ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। রহস্যময় লিঙ্কন দ্বীপে আজ সত্যি সত্যিই জাহাজ এসে নোঙর করল। কিন্তু দ্বীপবাসীরা মোটেই আনন্দিত হতে পারছে না। কেন? নির্বাসন-জীবনের অবসান ঘটতে চলেছে, তবু কেন তাদের মনপ্রাণ আনন্দের বদলে বিষাদে ভরপুর? আসলে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে দ্বীপের প্রতিটা জিনিসের সঙ্গে আত্মিকযোগ, নাড়ীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আজ সে সম্পর্ক চিরদিনের মতো ছিন্ন হতে চলেছে।

চোখে দূরবীণ লাগিয়ে পেনক্রফট জাহাজটার ওপর সতর্কদৃষ্টি রেখে চলেছে। জাহাজ ও দ্বীপের মধ্যে এখন বিশ মাইল ব্যবধান। দ্বীপবাসীরা বন্দুকের গুলির মাধ্যমে আওয়াজ করে পাহাড়ের মাথায় আশুন জেলে এবং নিশানের মাধ্যমে সন্ধেতে জানিয়ে জাহাজের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার কোনোরকম ক্রটি রাখল না।

ব্যাপারটা কিন্তু ভাববার মতোই বটে। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অবস্থিত অখ্যাত অবজ্ঞাত এ দ্বীপটার খোঁজ কারোরই জানা নেই। তাই যদি হয় তবে জাহাজটা গতি এমুখো কেন? কী তার উদ্দেশ্য? হার্বার্টের সন্দেহ হল, এটা ডানকান জাহাজ হলেও হতে পারে। স্পিলেটের পরামর্শে টেলিগ্রাফ করে আয়ারল্যান্ডকে তলব করা হল। সে দূরবীণটা চোখে লাগিয়েই বলে উঠল—‘খু্য এটা ডানকান জাহাজ হতে যাবে কেন। ডানকানের তো আসার কথাও নয়।’

পেনক্রফট চোখে দূরবীণ লাগিয়েই রেখেছে। একসময় দেখল, জাহাজ অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

হার্ভিং কিন্তু ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক মনে করতে পারলেন না। এ দ্বীপের দিকে জাহাজ আসার এমন কী কারণ থাকতে পারে?

পেনক্রফট আর নেব পাহাড়ের মাথায় আশুন জ্বালার উদ্যোগ নিতে লাগল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, আবার জাহাজটার মুখদ্বীপের দিকে ঘুরে গেছে। তবে কি জাহাজটা বেলুন বন্দরেই নোঙর করবে?

আয়ারল্যান্ড দূরবীণের সাহায্যে স্পষ্ট লক্ষ করল, এতে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি অনুপস্থিত। অতএব এটা কিছুতেই ডানকান হতে পারে না।

পেনক্রফট দূরবীণটা চোখে লাগিয়ে রেখেই বলে উঠল—‘জাহাজের মাস্তুলের ওপরের উড়ন্ত নিশানটা ইংল্যান্ডের নয়। ইংল্যান্ডের নিশানের রঙ লাল। আমেরিকারও নয়। জর্মানি বা ফ্রান্সেরও নয়। স্পেনেরও নয়। সে দেশের নিশান হলুদ। আর রাশিয়ার হলে সাদা হত। তবে যাই হোক না কেন এক রঙের—’

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই আয়ারল্যান্ড দূরবীণের মুখটাকে অস্থিরভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে সচকিত হয়ে প্রায় আত্ননাদ করে উঠল—‘কী সর্বনাশা কাণ্ড! এ যে কালো নিশান বলেই মনে হচ্ছে। তবে? তবে কি জলদস্যুদের জাহাজ ওটা!’

হার্ভিং সবাইকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন, ‘ব্যাপারটা ভাববারই বটে। তবে এত সহজে মুষড়ে পড়লে চলব কেন? আবার এমনও তো হতে পারে লিঙ্কলন দ্বীপ তাদের লক্ষস্থল নয়। তবু আমাদের সতর্ক হতেই হবে।’

নেব আর আয়ারল্যান্ড দৌড়ে গিয়ে বায়ুকলের ছাউনি নামিয়ে নিল। যাবতীয় আশুন নিভিয়ে দিল। আর ডালপালা দিয়ে থানাইট হাউসের দরজা-জানালাগুলো চাপা দিয়ে দিল।

হার্ভিং এবার নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতে গিয়ে বললেন, ‘জলদস্যুরা যদি লিঙ্কলন দ্বীপ বা আমাদের ওপর চড়াও হয়, তবে আমাদের কর্তব্য কী হবে?’

সবাই সমস্তর গর্জে উঠল, ‘আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ করব। জীবন গেলেও লিঙ্কলন দ্বীপের দখল হাতছাড়া করব না।’

রাত ক্রমে গভীর হল। আচমকা কামান দাগার শব্দে উৎকণ্ঠিত দ্বীপবাসীদের কানে এল। মনে হল জলদস্যুরা বুকি থানাইট হাউসের পায়েই জাহাজ ভিড়িয়েছে। সেখানেই রাতের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

হার্ভিং বেগতিক দেখে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করার জন্য প্রতুতি নিয়ে নিলেন।

এগিয়ে গিয়ে আয়ারল্যান্ড কাণ্ডেন হার্ভিংয়ের কাছে অনুমতি চাইল, অন্ধকারে সবার নজরের আড়াল থেকে দেখে আসবে জাহাজে কয়জন জলদস্যু রয়েছে। সওয়া মাইল সাঁতারে যাওয়া তার পক্ষে মোটেই সমস্যা নয়। কাণ্ডেন হার্ভিং দেখলেন, আয়ারল্যান্ডের আহুত এমন অভূত য়ে, তাকে বাধা দেওয়ার পরিণাম ভালো হবে না।

আয়ারল্যান্ড কাণ্ডেন হার্ভিংয়ের অনুমতি পাওয়ামাত্র পেনক্রফটকে নিয়ে তীরের দিকে যাত্রা করল। আর নেব মার্সি নদীর তীর থেকে ছোট ডিঙিটা নিয়ে এল। সেটা দুজনকে নিয়ে অন্ধকারে ভেদ করে এগিয়ে চলল। দ্বীপের অন্যদিকে পৌঁছে আয়ারল্যান্ড নৌকা থেকে পানিতে নামল। আর পেনক্রফট পাহাড়ের পাথরের-আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

আয়ারল্যান্ড সাধ্যমতো সতর্কতার সঙ্গে জাহাজটার নোঙরের শব্দকে বেয়ে ডেকের ওপরে উঠে গেল। দেখল একধারে খালাসিদের পোশাক শুকোতে দিয়েছে। ঝট করে একটা জামা প্যাট টেনে নিয়ে গিয়ে চাপিয়ে নিল। এবার দুই পা এগিয়ে গিয়ে জলদস্যুদের বাক্যলাপ শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। সে জানতে পারল, জাহাজটার নাম ‘স্পিডি’ আর কাণ্ডেনের নাম বব—বব হার্ভিং।

বব হার্ডি নামটা শোনামাত্রই আয়ারটনের বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। সে যে তার খুবই পরিচিত। সে অস্ট্রেলিয়ার জেল পলাতক বন্দিদের নিয়ে যে ডাকাত দলটা গড়ে তুলেছিল বব হার্ডি সে দলে ছিল। সে ছিল আয়ারটনের খুবই অনুগত। তার মধ্যে দু-দুটো গুণ রয়েছে। অসীম সাহসী অকুতোভয় আর পাকা নাবিক।

বব হার্ডি নাকি অস্ট্রেলিয়ার নরফোক দ্বীপে পিপিডি জাহাজটাকে ছিনিয়ে নিয়েছে। খাবার দাবার অন্ত্রপাতি ও প্রচুর গোলাবারুদ জাহাজে রয়েছে। বর্তমানে তার অভিপ্রায় লিঙ্কলন দ্বীপটা তার মনে ধরে গেলে এখানেই গোপন আশ্রানা গড়ে তুলবে।

কথাটা শোনামাত্র আয়ারটনের শরীরের সব কটা স্নায়ু একসঙ্গে সতর্কিত হয়ে উঠল। বুকের ভেতরে ফুসফুসের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল। কাণ্ডেন সাইরাস হার্ডিং লিঙ্কলন দ্বীপটাকে যেভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়েছেন তাতে এটা দেখামাত্রই তার যে মনে ধরে যাবে আশ্চর্য হবার কিছুই নয়।

জাহাজের চারদিকে চারটে কামান বসানো রয়েছে। আর জলদস্যুরা সংখ্যায় জনা পঞ্চাশেক। এমন পরিস্থিতিতে দুজনের পক্ষে শত্রুপক্ষের মোকাবেলা করা খুবই সমস্যা। কিন্তু যে-কোনোভাবে শয়তানগুলোর পরিকল্পনাটাকে ভেঙে দিতেই হবে। জাহাজের ডেকের অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎকর্তব্য সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে ঝট করে ভয়ঙ্কর একটা ফন্দি তার মাথায় এল। তবে এতে নিজের প্রাণও অবশ্যই যাবে। কিন্তু যারা তার উপকারের চূড়ান্ত করেছে তারা তো বেঁচে যাবে। আর তার একটামাত্র প্রাণের বিনিময়ে কাণ্ডেন সাইরাস হার্ডিংয়ের নিজেহাতে গড়া স্বপ্নসাধের লিঙ্কলন দ্বীপটা তো রক্ষা পেয়ে যাবে। এমন মৃত্যুতেও শান্তি। কিন্তু কীভাবে সে পিপিডি জাহাজটাকে ধ্বংস করতে চাইছে? বারুদের গুদামে আগুন দিয়ে জাহাজটাকে উড়িয়ে দেবে।

আয়ারটন মাতাল নাবিকদের নজর এড়িয়ে গুটিগুটি এগিয়ে জাহাজের পিছনের দিকে গিয়ে দেখল, গোলাবারুদের ঘরের দরজাটা বন্ধ। ইয়া পেল্লাই একটা তালু বুলছে। সে প্রমাদ গুল। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা। মাতুলের চারদিকে পিস্তল আর বন্দুক বুলতে দেখে এসেছিল। আগের মতো পা টিপে টিপে গিয়ে একটা পিস্তল নিয়ে জামার তলায় গুঁজে নিল; আত্মরক্ষা ছাড়াও বারুদের গুদাম ধ্বংস করতে একটামাত্র পিস্তলের গুলি ব্যবহার করলেই কাজ হাসিল, সে আবার গুদামটার কাছে গেল। শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃসৃত দিয়ে তালুটাকে ভেঙে ফেলল। আচমকা তার বুকের ভেতরে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেল গেল। কাজ প্রায় হাসিল হতে চলেছে, খুশি হবার কথাই বটে। ঠিক তখনই কার যেন একটা হাত তার কাঁধে নেকড়ে মতো থাবা বসিয়ে বাজখাই গলায় গর্জে উঠল—“কি রে শয়তান, এখানে কী করছিস?”

আয়ারটন ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়েই চিনতে পারল, বব হার্ডি। তার একসময়ের অনুগত সাকরেন্দ। বর্তমানে পিপিডি জাহাজের মালিক জলদস্যু বব হার্ডি তার কাঁধটাকে সাঁড়াশির মতো আকড়ে ধরেছে। বব হার্ডি কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। বব হার্ডির গলা শুনে দু-তিনজন গাট্রোগেট্টা দলদস্যু হতদস্ত হয়ে ছুটে এল।

আয়ারটনের গায়ে যেন আচমকা আসুরিক শক্তি ভর করেছে। সে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে দুজনকে ধরশায়ী করে দিল। ঠিক তখনই জলদস্যুদের একজন তার কাঁধে ছুরির ফলা গাঁথে দিল। বব হার্ডি ঝট করে বারুদের গুদামের পাল্লাটা টেনে বন্ধ করে দিল। পরিস্থিতি অনুকূল নয় ভেবে আয়ারটন চম্পট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল, পিস্তল থেকে দু-দুটো গুলি ছুড়ল, একটা বব হার্ডির গা-ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। বেঁচে গেল সে। চিংকার চোঁচামেচি পিস্তলের আওয়াজ শুনে অন্যান্য জলদস্যুরা ছুটোছুটি করে সেখানে হাজির হল। হঠাৎ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে তারা যেন রীতিমতো ভড়কে গিয়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

আয়ারটন আচমকা গুলি চালিয়ে লণ্ঠনটাকে ভেঙে ফেলল। জাহাজের বৃকে নেমে এল ঘুটঘুটে অন্ধকার। আয়ারটন এবার ডেকের ওপর থেকে লাফিয়ে পানিতে পড়ে গেল।

জাহাজের জলদস্যুরা এবার যেন সখিৎ ফিরে পেল। তারা পিস্তলের মুখ জলের দিকে নামিয়ে দমাদম গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু আয়ারটন ইতিমধ্যে ডুবসাঁতারে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে।

তখন রাত প্রায় বারোটো, আহত আয়ারটনকে নিয়ে পেনক্রফট অন্য দ্বীপবাসীদের কাছে হাজির হল। জাহাজটাকে ধ্বংস করতে গিয়ে আয়ারটন ব্যর্থ হয়েছে শুনে সবার বুক কঁপে উঠল। তারপর যখন শুনল, জাহাজে জনাপঞ্চাশেক জলদস্যু রয়েছে তখন তাদের আত্মা ঝাঁচাছাড়া হয়ে যাবার অবস্থা হল। পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে মাত্র দুজন লড়াই করতে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আত্মহত্যার জন্য এগিয়ে যাওয়া। তবু দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত লড়ে যেতে হবে। তারা ভোরের আলো ফোটার আগেই যুদ্ধের কৌশল স্থির করে ফেলল। দুজন করে চার দলে ভাগ হয়ে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে আক্রমণ চালাবে। জলদস্যুরা যাতে মনে করে দ্বীপবাসীরা সংখ্যায় অনেক।

সকাল ছয়টা নাগাদ কুয়াশার পর্দা সরে গিয়ে পরিবেশ ক্রমশ ফরসা হয়ে এল। হার্ডিং চোখে দূরবীণ লাগিয়েই চমকে উঠল। দেখল, জাহাজ থেকে চার চারটে কামানের মুখই দ্বীপের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

একটু বাদেই জলদস্যুরা জাহাজ থেকে একটা ক্যানো নামিয়ে তাতে করে সাতজন বন্দুক পিস্তল নিয়ে দ্বীপের দিকে যাত্রা করল।

পাথরের আড়ালে বসে পেনক্রফট আর আয়ারটন বন্দুক বাগিয়ে ক্যানোটোর দিকে তাক করে বসে রইল। ক্যানোটো বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসামাত্র দু-দুটো বন্দুক গর্জে উঠল। ব্যস, দুজন জলদস্যু খতম হয়ে গেল।

জলদস্যু সর্দার কামান দাগল। বিরাট একটা আগুনের গোলা পেনক্রফট আর আয়ারটনের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে পাহাড়ের মাথায় আঘাত হেনে চূড়াটাকে উড়িয়ে দিল।

ক্যানোটো মার্সি নদীতে এসে পড়ল। এবার স্পিলেট আর নেবের বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছিটকে গিয়ে আরো দুজন জলদস্যুকে ঘায়েল করল।

বাস, আবার একটা কামানের গোলা প্রবল বেগে ছুটে এসে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ল। পাথর টুকরো টুকরো হল বটে। কিন্তু দ্বীপবাসীদের কেশাশ্রুও স্পর্শ করতে পারল না।

এদিকে চারজন জলদস্যু খতম হওয়ায় অবশিষ্ট তিনজন অনন্যোপায় হয়ে ক্যানোর মুখ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। বন্দুকের পাল্লার বাইরে থাকার জন্য হার্বাট ও হার্ভি তাদের গুলি করার চেষ্টা করলেন না।

ক্যানোটো জাহাজের গায়ে ভেড়ামাত্র বারোজন জলদস্যু ঝটপট তাতে চেপে বসল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ থেকে আরো একটা ক্যানো নামিয়ে দিয়ে তাতে আটজন জলদস্যু চেপে তীরবেগে দ্বীপের দিকে এগিয়ে গেল। একটা ক্যানো ছুটে মার্সি নদীর দিকে আর দ্বিতীয়টা উপদ্বীপের দিকে এগোতে লাগল।

একটা ক্যানো বন্দুকের গুলির পাল্লার মধ্যে আসতেই আয়ারটন আর পেনক্রফটের বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছিটকে বেরিয়ে এসে দুজন জলদস্যুকে ধরাশায়ী করে দিল। এবার ক্যানো থেকে একর পর এক গুলি বেরিয়ে এসে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগল।

এদিকে নেব আর স্পেলট আটজন জলদস্যুর ক্যানোটোর দুজন জলদস্যুকে খতম করতেই সেটা বার-কয়েক প্রচণ্ড দূরে উঠেই পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেল। তার ছয়জন জলদস্যু বন্দুক বাগিয়ে ধরে তীরে এসে দাঁড়াল তারা ছুটে ছুটে ফোর্টসাম পয়েন্টের দিকে গিয়ে উধাও হয়ে গেল।

পরিস্থিতি এবার সঙ্গীন দেখে পেনক্রফট আর হার্ভি গ্রানাইট হাউসে গিয়ে আত্মপোষন করার জন্য ছুটে লাগল। হ্যা, হার্ভিথের অনুমান অশ্রুত। জাহাজটার নোঙর তুলে জলদস্যুরা খড়ির দিকেই এগোতে লাগল। জলদস্যু সর্দার বব হার্ভি এবার কামান দেখে চিমনিটা গুড়িয়ে দিতে লাগল। দ্বীপবাসীরা এরকমই আশঙ্কা করেছিল, জলদস্যুরা সবার আগে চিমনিটা গুড়িয়ে দেবে। কার্যত করলও তাই। দ্বীপবাসীরা অনন্যোপায় হয়ে গ্রানাইট হাউসে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।

গ্রানাইট হাউসের জানালা দিয়ে আয়ারটন উঁকি মেরে দেখতে পেল খাড়ির মুখে জাহাজটা দাঁড়িয়ে। আর কামান থেকে অনবরত গোলা ছুড়ে চলেছে। চোখের পলকে একটা গোলা ছিটকে এসে গ্রানাইট হাউসের জানালার গায়ে আছড়ে খেয়ে পড়ল। জানালার গায়ে ডালপালা চাপিয়ে দিয়েই তারা আসল ভুলটা করেছিল। ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে ডালপালা দেখলে সবারই সন্দেহ হবার কথা। আবার ভুল পথে ছুটে এসেও কামানের গোলাটা জানালাটার গায়ে আঘাত হানতে পারে।

মুহূর্তে কীভাবে যুগ্ম ক্রী হয়ে গেল, দ্বীপবাসীরা টেরও পেল না। হঠাৎ জাহাজের দিক থেকে ভয়ঙ্কর একটা শব্দ বেলে এল। পর-মুহূর্তেই জলদস্যুরা সমবেত কণ্ঠে বিকট চিৎকার চৌচামেচি শুরু করে দিল। দ্বীপবাসীরা উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করে জানালায় এসে ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য চাক্ষুষ করল। একেবারেই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। এতবড় জাহাজ স্পিডি অকশ্যন বেন ছিটকে গিয়ে পড়ল বেশ কয়েক গজ দূরবর্তী গভীর পানিতে। তার তলা ফেঁসে গেল। জলদস্যুদের নিয়ে জাহাজের টুকরো দুটো চোখের পলকে পানিতে ডুবে গেল। দ্বীপবাসীরা তা দূরের ব্যাপার, জাহাজের এতগুলো জলদস্যুর কেউই বুঝতে পারল না এমন ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার কী করে ঘটে গেল।

জলদস্যুদের জাহাজ স্পিডি জলে তলিয়ে যাওয়ায় দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউস থেকে বেরিয়ে ছুটোছুটি করে খাড়ির মুখে হাজির হল।

পেনক্রফট রহস্যটার মীমাংসা করতে গিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এর মধ্যে সামান্যতম রহস্যের গন্ধও পাচ্ছিনে। হয়ত বা অসতর্কতার জন্য জলদস্যুদেরই বন্দুকের গুলি ছিটকে গিয়ে বারুদের গুদামে পড়ে। বাস, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে, জাহাজটা ধ্বংস হয়ে যায়।'

বেলা একটু বাড়লে জোয়ারের জল ছড়ছড় করে নামতে লাগল। এবার ভাঙা জাহাজের টুকরো দুটোর অনেকাংশ ভেসে উঠল। দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে জাহাজের টুকরো দুটোর ওপর উঠে জাহাজটা কেন ধ্বংস হয়েছে তার কারণ বের করতে প্রয়াসী হল।

পেনক্রফটের অনুমান সত্য নয়। জাহাজটার সামনের দিকটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। কিন্তু পিছনের দিকটা সম্পূর্ণ অক্ষত রয়ে গেছে।

গোলা বারুদের গুদাম ছিল জাহাজটার পিছনের দিকেই। তার কোনো ক্ষতিই হয় নি। অতএব বারুদের গুদামে আগুন লাগার ফলে জাহাজটা অবশ্যই ধ্বংস হয় নি। তবে? দ্বীপবাসীরা এর উত্তর খুঁজে পেল না।

একটু বাদেই আবার জোয়ার আসবে। তখন ছড়ছড় করে জল এসে জাহাজের টুকরোগুলোকে তলিয়ে দেবে। তাই দ্বীপবাসীরা ব্যস্তহাতে জাহাজ থেকে যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, খাবারদাবার, বাস্ক-পেটরা ও সিন্দুক প্রভৃতি নামিয়ে দ্বীপে নিয়ে যেতে লাগল। শুধু কি এই? গাদাগাদা বন্দুক পিস্তল আর সিল করা কুড়িটা বারুদের পিঁপে তারা নামিয়ে নিল।

সবশেষে প্রাণপণ চেষ্টার মাধ্যমে চার-চারটে কামানও দ্বীপবাসীরা নামিয়ে গ্রানাইট হাউসের গায়ে নিয়ে গেল। সেগুলোকে গ্রানাইট হাউসের চারটে জানালায় বসিয়ে দিল।

৩০ নভেম্বর হার্ভি সমুদ্রের ধার দিয়ে আসার সময় একটা ভাঙা টর্পেডোর টুকরো কুড়িয়ে পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। স্পিডি জাহাজটা ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে এর যে যোগসাজেস আছে এ ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। জাহাজ ধ্বংস করতে ভয়ঙ্কর এ অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। রহস্য! গভীর রহস্য দ্বীপবাসীদের মধ্যে দানা বাঁধল। কে ভয়ঙ্কর এ অস্ত্রটা ছুড়ে জলদস্যুদের জাহাজ স্পিডিকে ধ্বংস করে দ্বীপবাসীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে? বহু আলোচনা ও চিন্তা ভাবনা করেও দ্বীপবাসীরা কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারল না।

সাইরাস হার্ডিং আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় টর্পেডোর জাহাজ ধ্বংসকারী ক্ষমতা অনেকবার চোখের সামনে দেখেছেন। তার কাছে ছোট জাহাজ স্পিডি তো খুবই নগন্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন হিতাকাঙ্ক্ষী খড়ির মুখে জাহাজ ধ্বংসকারী টর্পেডোটাকে রেখে দিয়ে দ্বীপবাসীদের অশেষ উপকার সাধন করেছে? দ্বীপবাসীরা আলোচনার মাধ্যমে সে অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীর প্রসঙ্গে এল। আড়ালে থেকে দ্বীপবাসীদের একের পর এক উপকার করে বিভিন্ন সময়ে তাদের রক্ষা করেছে। কে সে? কী-ই বা তার উদ্দেশ্য দ্বীপবাসীরা স্থির করে ফেলল, যে করেই হোক অজ্ঞাত পরিচয় হিতাকাঙ্ক্ষীকে তারা খুঁজে বের করবেই।

দ্বীপবাসীদের মনে নতুনতর এক ভাবনার উদয় হল। যে ছয়জন জলদস্যু ক্যানোটা উল্টে যাবার পর দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাদের খুঁজে বের করতে বন্ধপরিকর হল। এ মুহূর্তে দ্বীপবাসীদের সামনে দুটো জরুরি কর্তব্য—অদৃশ্য হিতাকাঙ্ক্ষীকে খুঁজে বের করা আর পলাতক জলদস্যুদের বের করে নিজেদের নিরাপত্তা বজায় রাখা।

আয়ারটন খোঁয়াড়ে গিয়ে পতদের পরিচর্যায় মন দিল। টেলিগ্রাফ মারফত কুশল জানিয়ে দিল।

এদিকে পেনক্রফট আর হার্বাটিকে নিয়ে স্পিলেট বন-অ্যাডভেঞ্চারকে দেখতে গেল। কাছে গিয়ে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। সেটা স্বাভাবিকভাবেই জলের ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে। তার কাছে গিয়ে পেনক্রফট চমকে উঠে প্রায় আতর্জন করে উঠল, 'এ কী সর্বনেশে কাণ্ড! নোঙরের দড়িতে এমন করে গিট দিল কে? এরকম গিট তো আমি কোনদিনই দিই নি। ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে তারা বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ল।

বিকেলের দিকে খোঁয়াড়ে আয়ারটনকে টেলিগ্রাম করা হল। আশ্চর্য ব্যাপার! তার দিক থেকে কোনো উত্তরই এল না।

আয়ারটন রাতে ফিরল না। সকালে আবার টেলিগ্রাফ করা হল। এবারও তার দিক থেকে কোনো জবাব এল না। ব্যাপারটা সবাইকে ভাবিয়ে তুলল। নেবকে গ্রানাইট হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রেখে বাকি চারজন গুলিভরা বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। তারা টেলিগ্রাফের খুঁটি অনুসরণ করে এগোতে এগোতে মাইল দুই এসে একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, চূয়াতর নম্বর টেলিগ্রাফের খুঁটিটা মাটিতে পড়ে রয়েছে। কে বা কারা যেন সেটাকে উপড়ে ফেলেছে আর তারগুলোও ছিঁড়ে জড়িয়ে রয়েছে।

আতঙ্কিত দ্বীপবাসীরা ব্যস্তপায়ে খোঁয়াড়ের দিকে ছুটল। কাছাকাছি গিয়ে তারা আয়ারটনের নাম ধরে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করতে লাগল। না, খোঁয়াড়ের দিক থেকে কোনো প্রতি উত্তরই ভেসে এল না। তারা অধিকতর ক্ষিপ্ৰগতিতে এগোতে লাগল। আচমকা খোঁয়াড়ের দিকে থেকে একটা বন্দুকের গুলি ছুটে এসে হার্বাটের বুকে গেঁথে গেল। সে সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হার্ডিং আর স্পিলেট তাকে ধরাধরি করে খোঁয়াড়ে নিয়ে চলল। হঠাৎ একজন জলদস্যু একলাফে তাদের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার বন্দুকের গুলি ছুটে এসে হার্ডিংয়ের টুপিটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। চোখের পলকে হার্ডিং তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের ছুরিটা তার বুকে গেঁথে দিল। জলদস্যুটা বিকট আতর্জন করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। গল গল করে রক্ত বেরোতে লাগল ক্ষতস্থানটা দিয়ে। কয়েকবার দাপাদাপি করে হতচ্ছাড়াটা নিশ্চল নিখরভাবে এলিয়ে পড়ল।

এদিকে স্পিলেট পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারল, বন্দুকের গুলিটা হয়ত হার্বাটের ফুসফুস স্পর্শে করতে পারে নি। পাঁজর ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। তবু কেন সে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল?

পরের দিন, ১২ নভেম্বর হার্বাট সংজ্ঞা ফিরে পেল।

আয়ারটনকে খোঁয়াড়ে পাওয়া গেল না। কী হল তার? তবে কি সে আবার জলদস্যুদের দলে ভিড়ে গেল?

এদিকে নেবকে নিয়েও স্পিলেট আর হার্ডিংয়ের ভাবনার শেষ নেই। বলা তো যায় না, আয়ারটনকে ঘায়েল করার পর জলদস্যুরা হয়ত খোঁয়াড়ের ভেতরেই থেকে গিয়েছিল। তাদের আসতে দেখে চুপিচুপি গা ঢাকা দিয়েছে।

দ্বীপবাসীরা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল, শিকারি কুকুর টপ খবর নিয়ে গ্রানাইট হাউসে যাবে। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে সে খবর নিয়ে আবার খোঁয়াড়ে ফিরে আসবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী হার্ডিং একটা চিরকুটে লিখলেন—'হার্বাট গুলিবিদ্ধ জখম। আমরা খোঁয়াড়ে অবস্থান করছি। তুমি যেন ভুলে গ্রানাইট হাউসের বাইরে বেরোবার চেষ্টা করো না। জলদস্যুদের কি কাছেপিঠে চোখে পড়েছে? টপকে দিয়েই খবর পাঠাও। সাবধানে থেকো।'

হার্ডিংয়ের লেখা চিঠিটা দাঁতে চেপে ধরে প্রশিক্ষণ গ্রাণ্ড শিকারি কুকুর টপ ছুটল গ্রানাইট হাউসের উদ্দেশ্যে।

এক ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই আচমকা বন্দুকের গুলির গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। দ্বীপবাসীরা খোঁয়াড়ের দরজা সামান্য ফাঁক করতেই অদূরবর্তী খোপের ভেতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। ঠিক তখনই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছুটে টপ দরজার ফাঁকটুকু দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

তার দাঁতে চেপে রাখা নেবের লেখা চিরকুটটা নিয়ে হার্ডিং ব্যস্ততার সঙ্গে পড়তে লাগল—'না, গ্রানাইট হাউসের কাছে পিঠে জরদস্যুদের দেখা মেলে নি। আমি আপনাদের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রানাইট হাউসের বাইরে যাব না। সাবধানে থাকব। ইতি—নেব।'

হ্যাঁ, দ্বীপবাসীদের অনুমানই তবে অপ্রান্ত। স্পিডি জাহাজটা ধ্বংস হয়ে গেলে ছয়জন জলদস্যু গুটি গুটি এসে খোঁয়াড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। জায়গাটা দ্বীপের একান্তে। খাবার দাবারের অভাব নেই। শূয়ের ছাগলের মাংস খেয়ে ছয়জন পিতৃদত্ত জীবনরক্ষা করতে পারবে। সবার সঙ্গেই বন্দুক ও কার্তুজ রয়েছে, আত্মরক্ষার চেষ্টা তো অসম্ভব করতে পারবে।

জলদস্যু ছয়জন খোঁয়াড়েই রয়ে গেল। আচমকা একদিন আয়ারটন একা খোঁয়াড়ে হাজির হল। তাকে অনায়াসেই

তারা ঘায়েল করে ফেলল। কিন্তু পরবর্তীতে দ্বীপবাসীদের চারজনের দলকে আসতে দেখেই তারা বেগতিক দেখে ঝটপট গাঢ়াকা দিয়েছে।

২২ নভেম্বর। হার্বার্টের ক্ষত প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ সময় শুয়ে বসেই কাটায়। ভাগ্য ভালো সে গুলিটা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। নইলে হাত কেটে বাদ দেয়া ছাড়া গতান্তর থাকত না।

নেব নির্বাক। তার কাছ থেকে আর কোন খবরই আসে নি, তবে তার জন্য ভাবনা নেই। সে থাকতে গ্রানাইট হাউসে ঢোকা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, তার ওপর দ্বীপবাসীদের একটু অন্তত ভরসা রয়েছে।

দ্বীপবাসীদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ করছে আয়ারটন জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে প্রাণ দেয় নি, জলদস্যুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের দলের সঙ্গে মিশে গেছে। কিন্তু স্পিলেট ও পেনক্রফট কিছুতেই আয়ারটনকে এতটা নীচ ভাবতে পারল না।

সাতাশে নভেম্বর স্পিলেট টপকে সঙ্গে নিয়ে খোঁয়াড় থেকে প্রায় সোওয়া মাইল দূরবর্তী গভীর জঙ্গলে ঢুকে জলদস্যুদের তল্লাশে ঘুরে বেড়াতে গিয়ে এক সময় চমকে উঠল। টপ হঠাৎ বিকট স্বরে খেউ খেউ করতে করতে উন্মাদের মতো দাপাদাপি করতে লাগল।

মনে হল ব্যাপারটা এমন যে, টপ যেন হঠাৎ কোন একটা রহস্যের গন্ধ পেয়ে এমন করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। একসময় সে ঝোপের মধ্যে প্রায় সমস্ত শরীরটাকে চালন করে দিয়ে একটা রক্তমাখা ন্যাকড়া বের করে আনল।

মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে স্পিলেট রক্তমাখা ন্যাকড়াটা নিয়ে উর্ধ্বাঙ্গসে ছুটে ছুটে খোঁয়াড়ে হাজির হল। এক নজরে দেখেই বুঝা গেল, ন্যাকড়াটা গ্রানাইট হাউসের কারখানাতেই তৈরি। আয়ারটনের ওয়েস্ট কোর্টের ছেঁড়া টুকরো।

দ্বীপবাসীর এবার নিঃসন্দেহ হল আয়ারটন জলদস্যুদের দলে ভেড়া তো দূরের ব্যাপার তাকে রীতিমত টানাটানি করে, জোর জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে হয়েছে।

তবে কি আয়ারটন এখনও জীবিত? কিন্তু তাকে তো খোঁয়াড়ের ভেতরে খুন করা হয় নি। অতএব সে হয়ত জীবিতই রয়েছে। এদিকে গ্রানাইট হাউসে ফিরে যাওয়ার জন্য হার্বার্ট পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছে। তার একদিন বাদে, উনত্রিশে নভেম্বর আবার টপের মধ্যে দারুণ অস্থিরতা লক্ষিত হল। সে গলা ছেড়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, সেই সঙ্গে অনরবত লেজ নাড়াতে লাগল, তবে রাগতভাব নয়, খুশির প্রকাশ বলেই মনে হল। নির্ধাৎ তার পেয়ারের কাউকে আসতে দেখেই তার মধ্যে এমন উল্লাস জেগেছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই একটা ছায়ামূর্তি এসে খোঁয়াড়ের দরজার কাছে দাঁড়াল। জাপ। তার গলায় একটা থলে ঝুলছে। স্পিলেট ছুটে গিয়ে থলের ভেতর থেকে এক চিলতে কাগজ বের করল। নেবের হাতের লেখা। তাতে লেখা—‘সক্ৰবার, সকাল ছয়টা। জলদস্যুরা প্রেটো আক্রমণ করেছে।—ইতি, নেব।’

হার্বার্ট গ্রানাইট হাউসে যাবার জন্য যারপরনাই পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল।

অনন্যোপায় হয়ে দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউসে ফিরে যাওয়াই সাবাস্ত করল।

গাড়িতে ওনেগা জুড়ে দেয়া হল। পেনক্রফট গাড়ি চালাতে লাগল। আহত হার্বার্টকে লতাপাতার বিছানায় শুইয়ে দেয়া হল। হার্ডিং আর স্পিলেট বন্দুক হাতে গাড়ির দুদিকে বসল।

গ্রানাইট হাউসের কাছাকাছি যেতেই পেনক্রফট বুকফাটা আর্তনাদ জুড়ে দিল—‘হতচ্ছাড়াগুলো সব কিছু ছারখার করে দিয়ে গেল।’

পোলটি আর উইগমিল থেকে কুন্সী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে দ্বীপবাসীদের হা ছতশ আর শতগুণ বেড়ে গেল। গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজ শুনে নেব হাপিত্যশ করতে করতে এগিয়ে এসে বলল, ‘একটু আগে, আধঘণ্টা হল হতচ্ছাড়া জলদস্যুরা সবকিছু ছাড়খার করে দিয়ে চম্পট দিয়েছে।’

গ্রানাইট হাউসের দরজায় পৌঁছে আহত হার্বার্টকে নামাতে গিয়ে দেখা গেল, আবার তার সংজ্ঞা লোপ পেয়েছে। গায়ে জ্বর। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, পেরুভিয়ান গাছের চাল বা কুইনাইন, কিছুই নেই যা দিয়ে তার জ্বরের উপশম করানো যেতে পারে।

হার্ডিং ব্যস্ত পায়ে লেকের ধার থেকে উইলো গাছের ছাল নিয়ে এলেন। তার রস করে হার্বার্টকে খাইয়ে দেয়া হল। তার লিভার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এখন ঘটেছে মস্তিষ্ক বিকৃতি। এর নাম ম্যালিগন্যান্ট ফিভার। কুইনাইন ছাড়া এর উপশম কিছুতেই হবার নয়। সে জলা থেকে এ জুরটা আমদানি করেছে। উইলো গাছের ছালে কুইনাইনের পরিমাণ খুবই নগণ্য।

কুইনাইন ছাড়া হার্বার্টের জ্বর ছাড়ার নয় শুনে পেনক্রফট গভীর হয়ে ভাবতে বসল, কোথায় কুইনাইন পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে কয়েক মুহূর্তের জন্য সংজ্ঞা ফিরে পেলেও পর মুহূর্তেই সে আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। এমন করেই সারাদিন কাটল, রাত্রিও কাটল একইরকম সঙ্গীন অবস্থার মধ্য দিয়েই। কুইনাইন না দিতে পারলে সে নির্ধাত মুছুর শিকার হবে। হার্বার্টের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ল। ঠিক তখনই একটা অবিস্বাস্য কাণ্ড ঘটল। দেখা গেল, গ্রানাইট হাউসের দরজায় ছোট্ট একটা কৌটো পড়ে রয়েছে।

সাইরাস হার্ডিং দৌড়ে গিয়ে কৌটোটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তার গায়ে তিনটে শব্দ লেখা রয়েছে ‘সালফেট অব কুইনাইন।’

কৌটোর মুখটা খুলতেই দেখা গেল, সাদা রঙের গুড়ো ভর্তি। প্রায় দুশো গ্রেন গুড়ো। স্পিলেট তার কয়েকটা দানা আঙুলে করে তুলে নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে বুঝল, আশ্চর্যজনক তেতো। অতএব এগুলো যে কুইনাইন এতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ রইল না।

দশদিন ধরে ঠিক তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর কুইনাইন খাইয়ে হার্বটিকে চাড়া করে তোলা সম্ভব হল। কিন্তু দুর্বলতা কাটাতে আরও কদিন সময় লাগল তবে তার নিরাময়ের ব্যাপারে স্পিলেটের অবদান যথেষ্ট। তার সেবায়ত্ত্বও হার্বটের রোগ নিরাময়ের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। দলের সবাই তাকে এবার থেকে ডক্টর স্পিলেট বলে সম্বোধন করতে লাগল।

দ্বীপবাসীদের কাছে এখন দুটো কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত পাঁচ জলদস্যুকে নিপাত করা আর তাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষীর গোপন ঘাঁটির তদ্ব্যস্ত করা।

১৪ ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা গ্রানাইট হাউস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। টপ আর জাপও সঙ্গে গেল। গ্রানাইট হাউস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেউই রইল না।

ওনাগা গাড়ি টানছে। হার্বট গাড়িতেই রইল। সে সুস্থ হলেও বনজঙ্গল আর পার্বত্যপথের ধকল সে সহিতে নাও পারে।

গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর একটা ব্যাপার সাইরাস হার্ডিংয়ের মনে দাগ কাটল। জন্তু-জানোয়াররা তাদের দেখেই উর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারল প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। ব্যাপারটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। তারা ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই মানুষের বা জলদস্যুদের সংস্পর্শে এসেছিল। মানুষের নিষ্ঠুরতার পরিচয় না পেলে কখনও এমন ভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি দাপাদপি করতে পারে না।

পথ চলতে গিয়ে ছেঁড়া লতাপাতা, ভাঙা ডালপালা এবং আধোপোড়া কাঠ ও ছাই দেখে জলদস্যুদের খোঁজ মিলল বটে। সে সঙ্গে মাটিতে পায়ে ছাপও এখানে ওখানে দেখতে পেল।

অর্নার ধারে প্রায় সমতল একটা অতিকায় পাথরের ওপর শুয়ে বসে দ্বীপবাসীরা রাত কাটাল। ভোরের আলো ফুটলে বর্নার পাড় ধরে হাঁটাধাঁটি করতে গিয়ে তারা জলদস্যুদের কটা পায়ের ছাপ দেখতে পেল। অনুসন্ধিৎসু নজরে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারল, পাঁচজনের পায়ের ছাপ রয়েছে। দ্বীপবাসীরা নিঃসন্দেহ হল, জলদস্যুরা অবশ্যই আয়ারটনকে দলে ভেড়াতে পারে নি। অর্থাৎ সে তার পুরানো ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় নি।

দ্বীপবাসীরা পরের দিন দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! জলদস্যুর দল বা সে হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃদদের টিকির নাগালও পেল না।

এতো ভারী অবাক কাণ্ড! ব্যাপার কী! জলদস্যুরা কোথায় গা-ঢাকা দিল! তবে কি ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের কোন গোপন শুয়াই হতচ্ছাড়াগুলো লুকিয়ে রয়েছে? সাইরাস হার্ডিং পরামর্শ দিলেন, খোঁয়াড়কে কেন্দ্র করে তদ্ব্যস্ত চালানো হোক। সবাই এক কথায় তাঁর প্রস্তাবের রাজি হয়ে গেল। তবে সেখানে ঢোকার আগে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে জলদস্যুরা ইতিমধ্যে সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে কিনা।

উনিশে ফেব্রুয়ারি কেবল পেনক্রফটকে নিয়ে স্পিলেট খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল।

খোঁয়াড়ের সদর দরজার কাছাকাছি গিয়ে তারা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে অনুসন্ধিৎসু নজরে মেলে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে সামান্য আঁচ নিয়ে নেবার চেষ্টা করল। খোঁয়াড়ের দরজা বন্ধ। সামনের ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে দরজায় হাজির হওয়াই সমস্যা, রীতিমতো ঝুঁকির ব্যাপার। শত্রুপক্ষ, জলদস্যুরা ভেতর থেকে দমাদম গুলি চালাতে শুরু করলে এক মিনিটও লাগবে না দুজনকে ধরাশায়ী করতে।

দরজা যখন ভেতর থেকে বন্ধ তখন হতচ্ছাড়াগুলো নির্ঘাত খোঁয়াড়ের ভেতরেই মাথা গুঁজেছে।

তারা রাতের অন্ধকার নামার অপেক্ষায় ঝোপের আড়ালে বসে রইল। অন্ধকার নেমে এলে স্পিলেট আর পেনক্রফট প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগিয়ে দরজার কাছে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। দরজাটা কোলা। একটু আগে, অন্ধকার নামার আগেও দরজাটা বন্ধ ছিল। তবেকি জলদস্যুরা অন্ধকারে চম্পট দিয়েছে? ইতিমধ্যে সাইরাস হার্ডিং ভেতরে ঢুকে পরিস্থিতিটা সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে এসেছে। মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

আলোর কথা শুনে ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং গলা নামিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, ‘শয়তানগুলো তবে খোঁয়াড়ের ভেতরেই রয়েছে। হতচ্ছাড়া জলদস্যুদের খতম করার এটাই অপূর্ব সুযোগ।’ কথা বলতে বলতে তিনি অন্যান্যদের নিয়ে গুটি গুটি ভেতরে ঢুকে গেলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তারা ছাউনির দরজায় পৌঁছে গেলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতেই চোখে পড়ল, একজন মেঝেতে শুয়ে।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং এবার এগিয়ে এসে ভেতরে উঁকি দিয়েই ঝট করে একেবারে খাড়া হয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলেন, ‘আরে এ যে আয়ারটন!’

তাঁর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই অন্য সবাই হুড়মুড় করে পাতার ছাউনিটার ভেতরে ঢুকে গেল। আয়ারটন আহত। কথা বলার শক্তি ধরতে গেলে রহিত।

সাইরাস হার্ডিংয়ের নির্দেশে গাড়িটাকে খোঁয়াড়ের ভেতরে নিয়ে আসা হল।

এমন সময় টপ আর্ডনাদ করতে করতে দ্বীপবাসীদের কাছে ফিরে এল। তার এমন অস্থিরতায় দ্বীপবাসীরা নতুনতর কোনো রহস্যের গন্ধ পেলেন। টপ কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল না, সে অনবরত ঘেউ ঘেউ করতে করতে অন্ধকার বনভূমির দিকে ছুটতে লাগল। দ্বীপবাসীরা গুলিভরা বন্দুক বাগিয়ে ধরে লম্বা লম্বা পায়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। বেশকিছুটা পথ গিয়ে টপ একজায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দ্বীপবাসীরা এগিয়ে গিয়ে দেখল, প্রায় সমতল একটা পাথরের ওপর পাঁচ পাঁচটা মৃতদেহ এলিয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের বুঝতে ভুল হল না, শয়তান জলদস্যুদের মৃতদেহ এগুলো। শত্রুরা নিপাত হয়েছে।

এ কী অবিশ্বাস্য কাণ্ড! এমন এক অভ্যর্থন্য ব্যাপার কী করে সম্ভব হল! যশ্চামার্ক পাঁচ পাঁচটা জলদস্যুকে কে ঘাসেল করল?

সকাল হল। আয়ারটনের সংজ্ঞা ফিরে এল। তবে খুবই দুর্বল। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। তবু ক্ষীণকণ্ঠে, দম নিয়ে নিয়ে নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা কাণ্ডেন সাইরাস হার্ডিংয়ের কাছে বলতে লাগল। সে যেদিন খোঁয়াড়ে হাজির হয়েছিল সে রাতেই জলদস্যুরা তার মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলল। শেয়াল কুকুড়ের মতো টানতে টানতে নিয়ে গেল তাদের গুহায়। সে গুহাটাই ছিল তাদের মাথাগোঁজার জায়গা। তাদের একজন তাকে চিনে ফেরল—সে অস্ট্রেলিয়ার বেন জয়েস। তাদেরই দলে ছিল। তাই তাকে হত্যা করতে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখল। আয়ারটনই একসময় অস্ট্রেলিয়ার জলদস্যুদের দলে থাকার সময় বেন জয়েস নামে পরিচিত ছিল। রাস, তাকে আবার দলে টানার জন্য জলদস্যুরা সাধ্যমতো প্রয়াস চালাতে লাগল। তাদের ইচ্ছা ছিল, দ্বীপবাসীদের ঘাসেল করে দ্বীপের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করবে।

আয়ারটন কিন্তু শত নির্মম নিষ্ঠুর নির্ধাতনেও দ্বীপবাসীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হল না। পাষাণ জলদস্যুরা তার চোখ ও কান দুটো প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে। খুবই ক্ষীণ তার দৃষ্টিশক্তি আর ধরতে গেলে কানে শোনেই না।

এর পরের ঘটনা কিছুই সে বলতে পারল না। কীভাবে যে সে খোঁয়াড়ে এসেছে তাও তার অজানা। এও এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে। আয়ারটনকে ধরাধরি করে নিয়ে আসা হল মৃতদেহ পাঁচটার কাছে। রহস্যজনক ব্যাপারটা তার মধ্যেও কম বিশ্বাসের সম্ভার করল না।

মৃতদেহগুলো বার বার পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও কোনো ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হল না। তবে প্রত্যেকের দেহে একটা করে বিশেষ চিহ্ন দেখা গেল। তবে সবার দেহের একই স্থানে অবশ্যই নয়। কারোর হাতে, কারোর বুকে, কারোর পিঠে আবার কারোর কাঁধে অত্যাশ্চর্য চিহ্ন আঁকা রয়েছে। বিশেষ ধরনের অস্ত্রের দাগ। মনের করা যেতে পারে মারগান্ডটা বিদ্যুৎচালিত।

সবার মনেই একই প্রশ্ন চক্কর মারতে লাগল, অস্ত্রটা যে ধরণেরই হোক না কেন জলদস্যুদের খতম করে দ্বীপবাসীদের পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে? তাকে খুঁজে বের করা এমুহূর্তে দ্বীপবাসীদের প্রথম ও প্রধান কাজ। আরও একটা জরুরি কাজ তাদের সেরে ফেলতে হবে। ট্যাবর দ্বীপের প্রান্তে একটা বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দিতে হবে। বলা তো যায় না, নইলে ডানকান জাহাজ এসে ফিরে যেতে পারে।

দ্বীপবাসীরা সবাই মিলে আর একটা বড়সড় নৌকা তৈরি করে ফেলল। এত বড় একটা নৌকা তৈরি করতে পাঁচ ছয় মাস লেগে গেল। এ সময়ে তারা আশ্রয় নিয়েছিল আগ্নেয়গিরির জঠরে। একদিন যে পর্বত উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোত আর বিষাক্ত গ্যাস উদগীরণর করতে আজ তাই মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

দ্বীপবাসীদের সবার মধ্যে একই চিন্তা কাজ করে চলছে, কোথায় হিতাকাজকী পরোপকারী অধিদেবতা? দেখা দাও, একটিবারের জন্য তোমাকে দেখে চোখ ও মনকে তৃপ্ত করা সুযোগ দাও। সুযোগ দাও কৃতজ্ঞতা জানাবার। কিন্তু কোথায় সে অদৃশ্য বান্ধব, দ্বীপবাসীদের আত্মার আত্মীয়? অলৌকিক শক্তিধর সে মহাত্মা কি তবে কোথাও নেই? এতগুলো মানুষের ধারণা কি শেষপর্যন্ত ভ্রান্ত হয়ে যাবে?

২৫ ফেব্রুয়ারি দ্বীপবাসীরা সদ্য তৈরি বিশালায়তন নৌকাটায় চেপে গ্রানাইট হাউসে ফিরে এল। হার্বাট সম্পূর্ণ সুস্থ। আয়ারটনও প্রায় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

ফ্রাঙ্কলিন পাহাড়ের মাথা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাহাড়টা তবে মৃত আগ্নেয় পাহাড় নয়। এতদিন সুপ্ত অবস্থায় ছিল। আজ আবার জেগে উঠেছে। আগুন, গলিত লাভা আর বিষাক্ত গ্যাস নির্গত করতে শুরু করেছে। তবে এখনো পুরোপুরি জেগে ওঠে নি। কিন্তু যদি সে রুদ্ররূপ ধারণ করে তবে লিঙ্কলন দ্বীপের চেহারা কি আর এরকম থাকবে? রীতিমত একটা আগুনের কুণ্ডে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। আর যদি পাহাড়ের দক্ষিণ দিক দিয়ে, আগেকার সে পথে লাভাস্রোত গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করে তবে খোঁয়াড়টা চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বিপদ দুয়ারে হানা দিতে চলেছে। করে যে দ্বীপবাসীদের ওপর ঈশ্বরের অভিিশাপস্বরূপ লাভাস্রোত গড়িয়ে এসে পড়ে জীবন্ত দগ্ধে মারবে তাই বা কে বলতে পারে। পাহাড়ের মাথা দিয়ে তিরতির করে ধোঁয়া অনবরত বেরিয়েই চলেছে। তাই দ্বীপবাসীরা দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্বীপনা নিয়ে জাহাজ তৈরির কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জাহাজের কাঠামো তৈরির কাজ অনেক আগেই সেরে ফেলেছে। এখনো অনেক অনেক কাজ বাকি। অষ্টোবরের পনের তারিখে একেবারে নতুনতর অবিশ্বাস্য এক কাণ্ড ঘটে গেল।

দ্বীপবাসীরা নৈশভোজ সেরে গল্পগজবের মাধ্যমে সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনে লিপ্ত। হঠাৎ খোঁয়াড়ের কলিং বেল বেজে উঠল। সবাই তো রীতিমতো স্তম্ভিত। আশ্চর্য ব্যাপার তো! খোঁয়াড়ে তো কেউই নেই। তবে? সেখান থেকে কলিং বেল বাজিয়ে সঙ্কেত দিচ্ছে কে? এ কী অলৌকিক কাণ্ডের বাবা!

মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে পেনক্রফট মুখ ঝুলল, 'শুনুন মি. হার্ডিং, যেই কলিং বেল বাজান না কেন, আবার বাজাবেন। আর বাজাচ্ছেন নির্ধাত সেই তিনি, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত অধিদেবতাটি।'

হ্যাঁ, পেনক্রফটের ধারণা অপ্রান্ত প্রামাণিত হল। মিনিট দুয়ের মধ্যে আবার ঘণ্টাধ্বনি হল। হার্ডিং একলাফে যন্ত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যালো, কী চাই? কাকে চাই? কে আপনি?'

হার্ডিংয়ের প্রশ্নগুলোকে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গিয়ে বিপরীত দিকের কণ্ঠস্বরের মালিক খুবই ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলে উঠল, 'এক্ষনি চলে আসুন, যত শীঘ্র সম্ভব খোঁয়াড়ে চলে আসুন।'

বাস, আর কোনো কথা শোনা গেল না। ব্যাপারটা হার্ডিংয়ের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করল। হ্যাঁ, এমনটা হবার কথাই তো বটে। দ্বীপে পা দেবার পর থেকে যিনি সবার অলক্ষে থেকে একের পর এক অবিশ্বাস্য ঘটনার মাধ্যমে রহস্য সঞ্চার করে চলেছেন তার দর্শন দ্বীপবাসীরা অচিরেই পেয়ে যাবেন।

কেবলমাত্র জাপ আর টপের জিম্মায় এনাইট হাউসটা' রেখে দ্বীপবাসীরা খোঁয়াড়ের উদ্দেশ্য রওনা হল। খোঁয়াড়ে পা দিয়েই দ্বীপবাসীরা হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ার জোগাড় হলেন। কোথায় সে বাড়ি! কোথায় সে বাড়ি! কোথায় অধিদেবতা? খোঁয়াড় ফাঁকা।

সাইরাস হার্ডিং তাঁর নির্দেশ স্পষ্ট শুনেছেন, 'এক্ষুনি চার্জ আসুন। যতশীঘ্র সম্ভব খোঁয়াড়ে চলে আসুন।'

ব্যাপারটা এবার হার্ডিংয়ের কাছে খোলসা হয়ে গেল। টেলিগ্রাফটা অবশ্যই খোঁয়াড় থেকে করা হয় নি। পুরনো তারের সঙ্গে তারের সংযোগ সাধন করে বার্তা প্রেরক নিজের আশ্রয় থেকে টেলিগ্রাফ করেছিল।

তার অনুমানটা আরও বিশ্বাসযোগ্য হল যখন তারের ওপর চিরকুট পাওয়া গেল। হার্ডিং সেটা তুলে চোখের সামনে ধরতে একটা মাত্র ছত্র দেখতে পেলেন, 'নতুন তার ধরে ধরে চলে আসুন।'

মুহূর্তমাত্রও সময় নষ্ট না করে হার্ডিং টেলিগ্রাফের নতুন তার অনুসরণ করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। অন্যান্যরা চলল তার পিছন পিছন। চলল তারটা পাহাড়ের গা বেয়ে সোজা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেছে। আকাশে মেঘের আচ্ছাদন। পিলে চমকানো বাজ পড়ার আওয়াজ আর বিদ্যুতের ঝলকানি। এ যেন রীতিমত এক প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে চলেছে।

দ্বীপবাসীরা যখন দ্বীপের পশ্চিমদিকে হাজির হল তখন রাতি এগারোটার কাছাকাছি। এখান থেকে তার বাঁক নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে তারা এক সময় একেবারে সমুদ্রের ধারে হাজির হল।

হার্ডিং দেখলেন, একটা সুড়ঙ্গ জলের তলা দিয়ে এগিয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে তারটা চলে গেছে। গুহার মুখের কাছাকাছি ছোট্ট একটা ক্যানো বাঁধা দেখতে পেল। বাস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেটায় চেপে বসল। আয়ারটন, পেনক্রফট আর নেব দ্রুত হাত চালিয়ে দাড় টেনে ক্যানোটাকে সুড়ঙ্গটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সুড়ঙ্গের ছাদটা ধনুকের মতো বাঁকানো। তারের লাইন ধরে তারা ক্যানোটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সুড়ঙ্গটা ক্রমেই চওড়া হতে লাগল। ব্যাপারটা এমন হল যে সেটা যেন পাতালের কোনো একটা হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে।

হ্যাঁ, দ্বীপবাসীদের অনুমান অশ্রান্তই বটে, সুড়ঙ্গটা এগোতে এগোতে একসময় একটি সুবিশাল হ্রদে গিয়ে শেষ হয়েছে। ক্যানোটা হ্রদে পড়তেই জলে অতিক্রম একটা বস্তুকে ভাসতে দেখা গেল। এমনই বিশাল সে, ঠিক যেন একটা ভিমা মাছ ভুস করে জলের ওপরে ভেসে উঠেছে। কিন্তু মাকুর মতো। দুদিন ক্রমশ সৰু হয়ে গেছে। আরো আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে তার একপ্রান্তে জুলজুলে দুটো চোখ। সে দুটো দিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর অত্যাশ্চর্য দৃষ্টি যেন বেরিয়ে আসছে।

ভাসমান অত্যাশ্চর্য বস্তুটার আরো কাছাকাছি ক্যানোটাকে নিয়ে গেলে দেখা গেল, তার দৈর্ঘ্য কম হলেও আড়াইশো ফুট তো হবেই। আর উচ্চতা? দশ-বারো ফুট। একেবারেই স্থিরভাবে জলের ওপরে ভাসছে।

দ্বীপবাসীরা, বিশেষ করে সাইরাস হার্ডিং উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপতে লাগলেন। হার্ডিং আচমকা স্পিলেটের হাত দুটো চেপে ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন, 'তিনিই! হ্যাঁ, আমি বলছি তিনিই বটে! তিনি ছাড়া অন্য কেউই হতে পারেন না, অবশ্যই না।' কথা বলতে বলতে এক পা সরে গিয়ে স্পিলেটের কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রায় অস্ফুটস্বরে একটা নাম বললেন।

নামটা কানে যেতেই স্পিলেট যন্ত্রচালিতের মতো ঝট করে সোজাভাবে দাঁড়িয়ে পড়লেন। নামটা তারও পরিচিত। ভয়ঙ্কর এক আপরাধী, সমাজবিরোধী! জেল পলাতক কয়েদি!

সাইরাস হার্ডিং ভাগ্য ঠিকে সদলবলে অতিক্রম বস্তুটার ওপর উঠে গেলেন। ওপরের চৌকো পা ডালটা তুলে যন্ত্রচালিতের মতো সবাই ঝপাঝপ লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। ভেতরটা অনেকটা জাহাজের ডেকের মতো দেখতে। অত্যাশ্চর্য আলোকচ্ছটায় দিনের মতো ঝকঝক করছে।

সাইরাস হার্ডিং এগিয়ে গিয়ে একপ্রান্তে দরজার পাল্লা হেঁচকা টানে খুলে ফেললেন অত্যাধুনিক দ্রব্যসামগ্রীতে সাজানো গোছানো একটা ঘর। তার পাশেই এল্লোগার। বড় বড় আলমারি ও তাকগুলো দেশী-বিদেশী বইয়ে ঠাসা। এবার দরজা ঠেলে এমন এক ঘরে গেলেন যাকে দুশ্চাপ্য দ্রব্যসামগ্রীর মিউজিয়াম বলা চলে।

ঘরটার দ্রব্যসামগ্রীর ওপর চোখ বুলাতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন, এক বৃদ্ধ আরাম কেরারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে তদ্রাশ্রয় অবস্থায় বসে।

হার্ডিংয়ের চিনতে ভুল হল না, ইনি ক্যাপ্টেন নিমো। ধীরপায়ে দুপা এগিয়ে গিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'ক্যাপ্টেন নিমো, আমরা এসেছি। আপনার নির্দেশ পেয়ে আমরা এসেছি।'

সাইরাস হার্ডিংয়ের উপস্থিতি ভদ্রলোক এতক্ষণ টের পান নি। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন। অত্যাশ্চর্য চোখের মণি দুটোতে এমন এক সুস্পষ্ট ছাপ তিনি লক্ষ করলেন, যেন কারো হুকুম তামিল করতে নয়, হুকুম পালন করানোই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় মুনি-ঋষিদের মতো লম্বা পাকা দাড়ির গোছা বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। একনজর দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যায় এক সময়ের দীর্ঘাকৃতি দশাসই চেহারা আজ জরার কবলে পরে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'আমি নাম-গোত্রহীন। আমার কোনো নামই নেই।'

'সে যা-ই হোক, আপনার সব বৃত্তান্ত আমার জানা আছে ক্যাপ্টেন।'

‘ভালো কথা। যদি জেনেই থাকেন তাতে আমার কিছুই আসে যায় না। আমি তো পরপারের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েই রয়েছি।’

স্পিলেট বিশ্বয় মাখানো দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন নিমোর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, হার্ডিং ওনাকে ভালোই চেনেন দেখা যাচ্ছে। নাম ধাম সবই জানেন, কী করে সম্ভব হল?

ক্যাপ্টেন নিমোর কথায় স্পিলেটের ভাবনায় ছেদ পড়ল।

ক্যাপ্টেন নিমো হার্ডিংয়ের মুখের পর নিতেজ চোখেরমণি দুটোকে আবদ্ধ রেখেই বললেন, ‘আপনি আমাকে চেনেন বলছেন? আমার আগের নাম জানেন আপনি?’

‘হ্যাঁ, জানি। আপনার ডুবো জাহাজ নোটিরাসের ব্যাপার স্যাপারও আমার নখদর্পণে।’

‘আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমি তো একনাগড়ে তিন তিনটা বছর সাগরের তলায় স্বৈচ্ছা নির্বাসন, অজ্ঞাতবাসে—খবরটা চাউর করল কে?’

‘এমন এক ব্যক্তি আপনার অজ্ঞাতবাসের খবরটা চাউর করেছে যার ওপর আনপার প্রভাব থাকার কথা নয়। আবার বিশ্বাসঘাতক বলেও তাকে দিষ্কার দিতে পারবেন না ক্যাপ্টেন।’

‘হ্যাঁ, এবার ধরতে পেরেছি। এক ফরাসি ভ্রমলোক। নাম তাঁর অধ্যাপক ম্যারোনাস্ত্র। যোল বছর আগে ধরতে গেলে ধূমকেতুর মতোই তিনি একদিন হঠাৎ জাহাজে এসে পড়েছিলেন। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নরওয়ের কুখ্যাত ঘূর্ণিপাকে পড়ে তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন।’

‘ঠিকই। প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। স্বদেশের মাটিতে ফিরে আপনার বৃত্তান্ত, আপনার নোটিরাসের কীর্তিকথা নিয়ে ‘টোয়েন্টি থাউজেন্ড লগিস আভার দ্য সি’ নামে এক মহামূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।’

‘আমার জীবনের মাত্র সাত মাসের কীর্তিকথা বলুন।’

‘হলই বা সাত মাসের, তাতেই আপনি বিখ্যাত ও স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন।’

‘বিখ্যাত? স্মরণীয়? অপরাধী, সমাজবিরোধী হিসেবে বিখ্যাত?’

ক্ষীণকণ্ঠে সাইরাস হার্ডিং উচ্চারণ করলেন, ‘ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার অতীত কীর্তিকথা নিয়ে সমালোচনা করা একবারেই এক্সিয়ার বহির্ভূত। এরকম বিচিত্র জীবনযাপনের পথ যে কেন আপনি বেছে নিয়েছিলেন তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তা জানার তিলমাত্র ইচ্ছাও আমার নেই। তবে এটুকু জানি আমরা লিঙ্কলন দ্বীপে আসামাত্র আপনি পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, অভিনুহুদয় বন্ধু ও আত্মার আত্মীয়রূপে আমাদের প্রতিমুহূর্তে রক্ষা করেছেন। একমাত্র আপনার অকৃত্রিম স্নেহ-ময়া-মমতার জন্যই আমরা আজও পৃথিবীতে নিজেদের অস্তিত্ব অব্যাহত রাখতে পেরেছি।’

ক্যাপ্টেন নিমো আরাম কদারাটায় সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন, ‘আমার অতীত কাহিনী আগে আপনারা শুনুন। সবকিছু শুনে, বিচার বিবেচনা করে যা বলার তারপরই না হয় বলবেন।’

ক্যাপ্টেন নিমো নিজের প্রসঙ্গে যা কিছু বললেন তা মোটামুটি এরকম, ‘ক্যাপ্টেন নিমো একজন ভারতীয়। একসময় স্বাধীন রাজ্য বুন্দেলখণ্ডের রাজকুমার ছিলেন। তিনি রাজকুমার ডক্কার নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা পুত্রকে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষালাভান্তে স্বদেশে ফিরে অন্তত বুন্দেলখণ্ডকে যাতে ইউরোপীয় ধাঁচে গড়ে তুলে উন্নত রাজ্যে পরিণত করতে পারেন। রাজপুত্র ডক্কার ছিলেন অসাধারণ দীর্ঘজীবী। দীর্ঘ বিশ বছর সে-দেশে অবস্থান করে তিনি বিজ্ঞান, শিল্প আর সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। সেই সঙ্গে সমগ্র ইউরোপে ঘুরে বেড়ালেন। একে রাজকুমার তার ওপর অগাধ বিস্ময়সম্পদের অধিকারী। তাই সবাই তাঁকে খুবই স্বাতির কর্ত।

রাজকুমার ডক্কারের মধ্যে চিরদিনই বিলাস ব্যসন ও আনন্দ স্ফূর্তির প্রতি দারুণ অনীহা ছিল। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি প্রতিনিয়ত মানসিক চাঞ্চল্য অনুভব করতেন। ভবিষ্যতে তিনি যাতে এক স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতির কর্ণধার হয়ে উঠতে পারেন এটাই ছিল তাঁর উচ্চাভিলাষ—সর্বক্ষেণের ভাবনা।

১৮৪৮। রাজকুমার ডক্কার বুন্দেলখণ্ডে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এলেন। বিয়ে থা সংসার পাতলেন। দুই পুত্রের পিতা হলেন। কিন্তু ঘরের বাঁধন তাকে আটকে রাখতে পারল না। মইৎব্রতে নিজেকে আত্মতৃপ্তি দিলেন। আর তাতেই আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন।

এল ১৮৫৭ সাতান্ন খ্রিষ্টাব্দ। সিপাহী বিদ্রোহে ভারতবর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল। বিদ্রোহের আগুন থেকে রাজকুমার ডক্কার নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে না। যুদ্ধে সমিল হলেন। দশটা যুদ্ধে সর্বাস্থে বিশ-বিশটা ক্ষতচিহ্ন আঁকলেন। বিদ্রোহীরা এঁটে উঠতে পারল না। পরাজয়ের ধানি গায়ে মেখে নিতে বাধ্য হল। লড়াই করতে গিয়ে রাজকুমার ডক্কার এমন অসম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে তাঁর নাম ভারতীয়দের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তাঁর দিকে ইংরেজ শাসকের শ্যেন দৃষ্টি পড়ল। ঘোষণা করলেন, তাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পুরস্কার দেবেন। উপায়ান্তর না দেখে রাজকুমার ডক্কার গোপন আস্তানায় আশ্রয় নিলেন।

ইংরেজ শাসকরা আবার স্বাধীন রাজ্যগুলোকে এক-এক করে গ্রাস করে নিল। বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করলেন রাজকুমার ডক্কার। এতদিনের ইচ্ছা, এতদিনের সাধনা আর প্রায়স মুহূর্তের মধ্যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে এ তো হতে দেয়া যায় না। কিন্তু তিনি নিরুপায়, অসহায়। সভ্যসমাজ ও সভ্যজাতের ওপর তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন, বিষিয়ে উঠল মনপ্রাণ। তাই বিস্ময়সম্পদ যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা একত্র করলেন। বিশ জন একান্ত অনুগত ভক্ত নিয়ে বিফল মনোরথ রাজকুমার ডক্কার একদিন বোপান্তা হয়ে গেলেন। কেউই তাঁর হৃদিস পেল না। সবার মনেই একই প্রশ্ন, লোকটা কি কর্পুরের মতো উবেই গেল নাকি? ব্যস, তারপর থেকে তিনি বোপান্তা হয়েই রইলেন।

বিফলকাম হতোদম রাজকুমার ডাক্তার তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অতল সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কারোর হুকুম খাটে না। শ্বেতাঙ্গরা যেখানে তার টিকির নাগালও পাবে না এরকমই এক স্বাধীন রাজ্য হল তাঁর আশ্রয়স্থল।

একদিন প্রশান্ত মহাসাগরের এক আখ্যাত অবজ্ঞাত জনমানবহীন দ্বীপে তাঁকে অনুগামীদের সঙ্গে দেখা গেল। জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে তোলা হল। নিজেই তৈরি নকশা অনুযায়ী বানিয়ে ফেললেন অত্যাধুনিক এক সাবমেরিন। সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করলেন। সে শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কেবল সাবমেরিনটা চালানাই নয়, সাবমেরিনের ভেতরের বায়ু উত্তপ্ত রাখা, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো প্রভৃতি বিভিন্ন অবিস্কার কাজ সম্পন্ন করতে লাগলেন। সাবমেরিনটা তৈরি করে পৃথিবীর কারিগরি বিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন রাজকুমার ডাক্তার। সমুদ্রের তলদেশে অফুরন্ত খাদ্যসম্ভার। নিজে ক্যাপ্টেন নিমো ছদ্মনাম ধারণ করলেন। বাস, ক্যাপ্টেন নিমো এবার আশ্চর্য জলযান নোটিলাসকে নিয়ে সাগর-মহাসাগরের বুকে চক্রর মেরে বেড়াতে লাগলেন।

নোটিলাস ক্রমে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু, পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। সমুদ্রের বুকে কত জাহাজ কত সব ধনসম্পদ নিয়ে নিমগ্ন হয়, ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সে-সব সংগ্রহ করে নিজের প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করতে লাগলেন। তার একটা বড় অংশ স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। তিনি সাহায্য সহযোগিতা করে যান ঠিকই, নিজের পরিচয় সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখে চললেন।

সেটা ছিল ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। ক্যাপ্টেন নিমো পৃথিবীর সভ্য সমাজ সংসার থেকে নিজেকে সতর্কতার সঙ্গে গোপন রেখে চললেও একদিন ঘটনাক্রমে তিনজন নোটিলাসে আশ্রয় নিলেন। তাঁদের একজনের নাম অধ্যাপক অ্যারোনাক্স এক ফরাসি প্রবীণ। আর একজন তাঁর গৃহভৃত্য, তৃতীয়জন একজন জেলে। সমুদ্রের দানব ভেবে আমেরিকার এক জাহাজ নোটিলাসের পিছু নেয়। অক্রমণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু নোটিলাসের সঙ্গে চক্রর মেরে নিজেই হুড়মুড় করে পানির তলায় তলিয়ে যায়। তারই তিনজন যাত্রী নোটিলাসে আশ্রয় নেয়। অধ্যাপক অ্যারোনাক্সের মুখেই ক্যাপ্টেন নিমো জানতে পারেন, পৃথিবীর মানুষ নোটিলাসকে জলদস্যুদের জাহাজ বলেই জানে। ক্যাপ্টেন নিমো তিনজনকে নোটিলাসের ভেতরে কয়েদ করে রাখেন। পৃথিবীর মানুষের কাছে তাঁর কাণ্ডকারখানার কথা গোপন রাখার জন্যই তিনি এ পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। দীর্ঘদিন বহু কায়দা কসরত করে শেষপর্যন্ত আঠারো শো সাতষট্টির বাইশে জন নোটিলাসেরই এক বোটে চেপে তাঁরা পালিয়ে যান। সমুদ্রের সে জায়গাটায় তখন দারুণ ঘূর্ণিপাক চলছিল। ফলে ক্যাপ্টেন নিমো নিঃসন্দেহ হলেন, তিনজনেরই সলিল সমাধি হয়েছে।

না, অধ্যাপক অ্যারোনো এবং তাঁর সঙ্গী দুজনের কেউই মারা যান নি। দেশের মাটিতে পা দিয়ে অধ্যাপক অ্যারোনো তাঁর সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা এবং অত্যাশ্চর্য জলযান নোটিলাসের কাণ্ডকারখানার বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

তারপরও ক্যাপ্টেন নিমো বেশ কয়েক বছর সমুদ্রের বুকে চক্রর মেরে বেড়িয়েছেন। নানা ঘটনা-দুর্ঘটনায় তাঁর বিশজন শিষ্যই এক-এক করে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। আজ কেবল বেঁচে রয়েছেন ক্যাপ্টেন নিমো, অতিবৃদ্ধ। তাঁর সাধের নোটিলাস জীর্ণপ্রাণ ঋণ্ডা হয়েছে। ক্যাপ্টেন নিমো কোনোরকমে নড়বড়ে নোটিলাসকে চালিয়ে নিয়ে এলেন লিঙ্কলন দ্বীপের তলদেশে। এখানে মাথা গোঁজার পরই বিপদের সম্মুখীন হলেন। দীর্ঘ ছয় বছর তিনি এখানে কাটান। আগেই পাহাড়ের লাভাস্রোত, তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। ছোট-বড় নৌকা যাতায়াত করতে পারলেও নোটিলাসের পক্ষে বেরোনো একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ল।

এক সকালে দ্বীপের কিনারা দিয়ে পায়চারি করার সময় ক্যাপ্টেন নিমো দেখলেন কজন লোককে নিয়ে একটা নৌকা দ্বীপে থামল। দেখলেন, তাঁরা সংখ্যায় পাঁচজন। বাস, তাঁর মাথায় তখনই চিন্তার উদয় হল অসহায় মানুষগুলোকে কীভাবে রক্ষা করা যায়। তবে তাদের কাছ থেকে দূরে, গোপন অরণ্যাল থেকেই যা কিছু করার করতে হবে। তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে এরকম মমত্ববোধ ও সহমর্মিতার উদয় হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ, দ্বীপে আশ্রিত মানুষগুলো সং, পরিশ্রমী ও উদ্যমী। আর নিজেদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়াও রয়েছে। গোপনে তাঁদের আলাপ আলোচনা থেকে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে জানতে পারলেন। এরকম লোকদেরও তো তিনি এতকাল গোপনে বিভিন্ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে এসেছেন।

তিনি সাইরাস হার্ডিংকে রক্ষা করা ছাড়াও টপকে চিমনিতে নিয়ে যান, বিপদাপন্ন টপকে হ্রদের পানি থেকে উদ্ধার করে ভয়ঙ্কর ডুগুটাকে মেরেছিলেন। অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী বোঝাই করে সিদ্ধকটাকে তিনিই সমুদ্রের ধাপে গোপনে রেখে আসেন। তিনিই মার্সি নদীতে বোটটাকে নোঙর করে রেখে দিয়েছিলেন, আয়ারটনের খবর দিয়ে তিনিই সমুদ্রের পানিতে বোটলটাকে ভাসিয়ে দেন, টর্পেডো নিক্ষেপ করে জলদস্যুদের জাহাজটাকে উড়িয়ে দেয়ার নায়ক ছিলেন তিনিই, আঙনের সঙ্কেত দিয়ে তিনিই পেনক্রফটকে ভুল পথ থেকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন। শুধু কি এই? ইলেকট্রিক বুলেট নিক্ষেপ করে পাঁচ পাঁচটা জলদস্যুকে তিনি সাবাড় করেন আর মৃত্যুপথযাত্রী হার্বটিকে কুইনাইন দিয়ে জীবনরক্ষা তিনিই করেন।

ক্যাপ্টেন নিমো জানতেন না যে, সাইরাস হার্ডিং তার নাড়িনক্ষত্র সবই জানেন। তা যদি জানতেন তবে কষ্ট করে টেলিগ্রাফের তারের সংযোগ সাধন করে তাদের অবশ্যই তলব করে এখানে নিয়ে আসতে উৎসাহী হতেন না। তবে তাঁদের নিয়ে এসেছেন কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে উপকার করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে।

ক্যাপ্টেন নিমো মুহূর্তকাল নীরবে ভেবে নিয়ে আবার মুখ খুললেন, 'আমার অতীত কাহিনীর অনেক কিছুই আপনি জানেন দেখছি। এবার বলুন তো, আমার সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কী জন্মেছে?'

তার কথার ইস্তিত সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পেরেছেন। 'টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস আন্ডার দ্য সি' গ্রন্থে এক জাহাজডুবির বর্ণনা রয়েছে। তাতে অসহায় নারী ও শিশুও ছিল। নোটিলাস তাদের সমেত জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

ব্যাপারটা নিয়ে পৃথিবীর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। এতে ক্যাপ্টেন নিমোও কম মর্মান্বিত হন নি। তবে পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাকে এমন নিষ্ঠুর একটা কাজে উৎসাহী হতে হয়েছিল।

সাইরাস হার্ডিং অন্যান্যমস্ততার ভান করে তাঁর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে গভীর মুখে রইলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো অন্যান্যপায় হয়ে বলতে লাগলেন, 'জাহাজটা কিন্তু শত্রু পক্ষের ছিল। আমি নই, তারাই আমার পিছনে ছুটতে থাকে। আমার পালাবার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। সন্ধীর্ণ একটা উপসাগরে আটকা পড়ে যাই। আমাকে বে-কায়দায় ফেলে পিছনে ধাওয়া করার জন্যই নিজেকে বাঁচার তাগিদে জাহাজটাকে ডুবিয়ে দিতে হয়েছিল। এবার বলুন তো, আমার কি কোনো অপরাধ এতে হয়েছিল?'

'ক্যাপ্টেন নিমো, আপনার কাজের সমালোচনা করা আমার অধিকার বহির্ভূত। মানুষ তো পরমপিতার হাতের পুতুলমাত্র। তিনি যা করান মানুষ তাই করে। তাই মানুষের কাজের বিচার তিনিই করেন। তবে আমি কেবল একটা কথাই বলতে চাই ক্যাপ্টেন, আপনার মতো একজন পরোপকারী সুহৃদকে হারালে আমাদের পরিতাপের সীমা থাকবে না।' কথা বলতে বলতে সাইরাস হার্ডিং ক্যাপ্টেন নিমোর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর ডান হাতটা টেনে চুষন করলেন।

ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন, 'পরম পিতা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হোক।'

পরদিন সকালে ক্যাপ্টেন নিমো দ্বীপবাসীদের সঙ্গে নিয়ে নোটিলাসের সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দেখা গেল, সংগ্রহশালার ওপরে নোটিলাসের মহান আদর্শের কথা বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে—'মোবিলিস ইজ মোবাইল'।

কিছুক্ষণ হাঁটাইটির পর হাঁপাতে লাগলেন। দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্পিলেট তাঁর হাত ধরে নিয়ে আরাম কেন্দ্রাটায় বসিয়ে দিল। নাড়ি পরীক্ষা করে দেখল, গতি খুবই ক্ষীণ। জীবনীশক্তি অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তাঁকে আর বেশিদিন টিকিয়ে রাখা যাবে না। অচিরেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে পরপারে পাড়ি জমাবেন। বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু সময় রোদে বসিয়ে রাখতে পারলে পরিস্থিতির উন্নতি হত। কিন্তু নোটিলাস ছেড়ে কোথাও যেতে তিনি নারাজ।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, 'না, আমি নোটিলাস ছেড়ে কোথাও যাব না। নোটিলাসেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই। আপনাদের কাছে আমার শেষ ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করছি। তা রক্ষা করলেই জানবেন যাবতীয় ঋণ শোধ হয়ে যাবে। আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব। আমার অনুগামীদের মতোই আমিও সমুদ্রের জলে অন্তিম নিদ্রায় শায়িত হব। এখানে, খুবই গভীর পানিতে আমার স্বপ্ন সাধের নোটিলাস অবস্থান করছে। চিরদিন এখানেই এমনি করে ডুবে থাকবে। এটাই হবে তার সমাধি।

শুনুন, আগামীকাল আমার দেহাবসানের পর আপনারা এ স্থান ত্যাগ করবেন। রাজকুমার ডঙ্কারের পক্ষ থেকে এক বাস্ক হীরা আপনাদের উপহারস্বরূপ দান করছি। আমি যখন স্বামী ছিলাম, সন্তানের পিতা ছিলাম এসব হীরা আমার তখনকার সঞ্চয়। এগুলো ছাড়াও বেশকিছু মণিমুক্তা নোটিলাসে রয়েছে। আপনাদের সততার ওপর আমার আস্থা আছে। আশা করি এসব বিত্তসম্পদ আপনারা সৎ কাজেই ব্যয় করবেন। আর যা-কিছু মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে সবকিছু নিয়ে নোটিলাস চিরদিনের মতো সলিল সমাধিতে নিমগ্ন থাকবে। তবে এও জানবেন, মৃত্যুর পরও আমি আপনাদের কাছাকাছি পাশাপাশি থাকব।

আপনারা বোটে উঠে নোটিলাসের সামনের দিকে দুটো ছিদ্র দেখতে পাবেন, সে দুটো মুখ খুলে দেবেন। ব্যস, সমুদ্রের পানি দ্রুত নোটিলাসের ট্যাঙ্কে ঢুকতে থাকবে। ফলে এটা ভারী হতে হতে একসময় সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে।'

দ্বীপবাসীরা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল।

ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'তবে আমাকে কিছুটা সময় একা থাকতে দিন। আমি আত্মগম্ভ—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই দ্বীপবাসীরা এক-এক করে ঘর ছেড়ে যেতে লাগল।

নৈশভোজের পর ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনীশক্তি ও চোখের জ্যোতি কিছুটা ফিরে এল। তিনি দ্বীপবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা কি এ দ্বীপে ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে চাইছেন?'

'আমরা চাচ্ছি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে লিঙ্কলন দ্বীপের সংযোগ সাধন করি। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের একটা ঘাঁটিরূপে গড়ে তুলব।'

মান হেসে ক্যাপ্টেন নিমো এবার বললেন, 'মি, হার্ডিং, আপনার সঙ্গে গোপনে দুটো কথা বলতে চাচ্ছি। যদি—'

তাঁর কথা শেষ না হতেই সাইরাস হার্ডিং ছাড়া অন্যান্য দ্বীপবাসীরা ঘর ছেড়ে গেল। একটু পরে যখন সবাই আবার একসঙ্গে মিলিত হল, তিনি এ ব্যাপারে কারোর কাছে মুখ খুললেন না। অন্যান্যরাও কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল না।

এদিকে ক্যাপ্টেন নিমো ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলেন।

রাত তখন একটা, মৃত্যুপথযাত্রী ক্যাপ্টেন নিমো প্রায়-অসুস্থ উচ্চারণ করলেন—'পরম পিতা!—স্বদেশ!' তাঁর মাথাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল। ব্যস, সব শেষ, ক্যাপ্টেন নিমোর অবিনশ্বর আত্মা পরমপিতার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অনন্ত সুন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

ক্যাপ্টেন নিমোর নির্দেশ অনুযায়ী দ্বীপবাসীরা হীরার বাস্কটা নিয়ে নোটিলাস থেকে বেরিয়ে এল। তাঁর সবকটা নির্দেশ এক-এক করে পালন করা হল। সবশেষে সবাই বোটে চেপে নোটিলাসের সামনে গিয়ে বড় বড় ছিদ্র দুটোর মুখ ঝুপ

কর্ক ঘুরিয়ে খুলে দিতেই হুঁড়ি হাড় করে জল জলাধারে ঢুকতে লাগল। ডুবোজাহাজটা ভারী হয়ে পড়ায় ধীরে ধীরে সমুদ্রের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে লাগল। রাজকুমার ডঙ্কারের মৃতদেহসহ ডুবোজাহাজ-কফিনটা চিরদিনের মতো পানির তলায় অশ্রয় নিল।

ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই দ্বীপবাসীদের নিয়ে বোটটা সুড়ঙ্গের মুখে ফিরে এল। সুড়ঙ্গটার নামকরণ করা হল—‘ডঙ্কার সুড়ঙ্গ’।

সাইরাস হার্ডিং এবার তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বড়সড় একটা নৌকা তৈরির কাজে মেতে গেলেন। ট্যাবর দ্বীপে যত শীঘ্র সম্ভব খবর রাখা একান্ত দরকার। দেরি হলে ডানকান জাহাজটা এসে ফিরে যেতে পারে।

১৮৬৯-এর পয়লা জানুয়ারি প্রকৃতি রুদ্ররূপ ধারণ করল। লিঙ্কলন দ্বীপটার ওপরই যেন তার যত আক্রোশ। প্রলয়ঙ্কর তুফান, বিদ্যুতের ঝলকানি আর ঘন ঘন বজ্রপাত দ্বীপটাকে যেন ধ্বংস করে দেয়ার জন্য বন্ধপরিকর। বজ্রাহত হয়ে বড় বড় গাছগুলো যেন জ্বলেপুড়ে ঝাঁক হয়ে যেতে লাগল। সাইরাস হার্ডিং অনুভব করলেন। আকাশের এ বল্লাহীন উন্মত্ততার সঙ্গে পাতালপুরীর নিবিড় যোগসাজেশ রয়েছে। তা যদি নাই হবে তবে আগ্নেয়পর্বতটার মধ্যে এমন অস্তিত্বতা কেনই বা প্রকাশ পাবে?

৩ জানুয়ারি হার্বাট প্রেটোতে উঠেই চমকে উঠল। দেখল পাহাড়টার শিখরদেশ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। সাইরাস হার্ডিং ব্যাপারটা একনজরে লক্ষ করেই নিঃসন্দেহ হলেন, আগ্নেয় পর্বতটার আগুন ঠিকরে বেরিয়ে এল বলে।

ব্যাপারটা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হবার জন্য আয়ারটন মুহূর্তের জন্য মাটিতে কান পাতল। ব্যস, তড়াক করে লাক্ষ্যি উঠে চিৎকার করতে লাগল, ‘আরে সর্বনাশ! মাটির নিচ থেকে গভীর আওয়াজ ভেসে আসছে!’

আয়ারটনের দেখাদেখি অন্যান্যরাও মাটিতে কান ঠেকিয়ে অবাক্তিত্ব আওয়াজটা শুনল। গুম গুম আওয়াজ হতে হতে হঠাৎ প্রচণ্ড গভীর আওয়াজ হচ্ছে।

সাইরাস হার্ডিং হতাশায় ভেঙে না পড়ে বরং নৌকা তৈরির বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার জন্য তৎপর হলেন।

সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার নামতে না নামতেই পাহাড়ের মাথা দিয়ে আগুন বেরোতে দেখা গেল। কোনো দৈত্য যেন পাহাড়ের মাথায় বিশাল একটা মশাল জ্বলে দিয়েছে। আর সে সঙ্গে অনবরত গুরু গভীর আওয়াজ হয়েই চলেছে।

সাইরাস হার্ডিং প্রামাদ গণলেন। তিনি চোখ দুটো কপালে তুলে বলে উঠলেন—‘এ কী কেলঙ্কারী কাণ্ড ঘটতে চলেছে। এত তাড়াহাড়ি যে সর্বনাশা ব্যাপারটা শুরু হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবি নি।’

স্পিলেট ফ্যাকাশে মুখে বলল, ‘মি. হার্ডিং তাড়াহাড়ি তো নয়। আড়াই মাস আগেই ব্যাপারটা আমাদের জানান দিয়েছিল। তখন আগুনের শিখা ছিল ক্ষীণ, এখন প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে।’

আগুনের সঙ্গে নতুন একটা উপসর্গ এসে যোগ দিল। মাটির কাঁপনি। থেকে থেকে মাটি ভয়ানক কেঁপে উঠতে লাগল। ভূমিকম্পেও মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে বটে। কিন্তু ভূমিকম্পের সঙ্গে এ কাঁপনির যথেষ্ট ফারাক রয়েছে। তিরতির করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিচ্ছে। লাল টকটকে পাথরের টুকরো লাক্ষ্যি শূন্যে উঠে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই আবার পাহাড়ের মুখের কাছেই আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এ যেন ভোজবাজির খেল। শুধু কি এই? আকাশ থেকে অনবরত কালো ঝড়ো পড়তে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং প্রমাদ গণলেন। তিনি নিঃসন্দেহ হলেন, অচিরেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটে যাবে। খনিজ পদার্থের ঝড়োগুলোই সর্বনাশের পূর্বাভাস। আগুন পাহাড়টার উদরে যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে চলেছে তারই লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে এগুলোর মাধ্যমে। তিনি ব্যস্তপায়ে গন্ধক প্রস্রবণে গিয়ে লক্ষ্য করলেন, সেখানে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। পাশাপাশি কাছাকাছি তেরোটা গন্ধক প্রস্রবণ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়েছে। ভেতর থেকে কোন অমিত শক্তির দৈত্য যেন মাটি ফাটিয়ে দিতে বন্ধপরিকর। উৎকট গন্ধযুক্ত গ্যাস ও কার্বনিক অ্যাসিড পুরো অঞ্চলটাকে যেন বিষম করে তুলেছে। মাটি অস্বাভাবিকভাবে কাঁপতে শুরু করেছে। তিনি ভেবে অবাক হচ্চেন, পাহাড়টা তো এখনও গলিত লাভা বর্মণ শুরু করে নি। তবে? তবে কি ক্যাপ্টেন নিমোর অনুমানই অশ্রুত? তিনি তো বারবার বলেছিলেন, ‘বিপদ এখানে ঘটবে না, এখানে না।’

সাইরাস হার্ডিং অন্য সবার কাছে ফিরে এলেন। একে বাতাসে উৎকট গন্ধ তার ওপর কালো ঝড়োতে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে। আগুনের মতো গরম বাতাস গায়ে ফোঁসকা ফেলে দেয়ার জোগাড় করল। বাতাসের অস্তিত্বজেনের পরিমাণ কমে গেছে। নইলে শ্বাসক্রিয়ার এমন কষ্ট হবে কেন?

সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনকে নিয়ে বোট চোপে বসলেন। দ্রুত দাঁড় টেনে হাজির হলেন দ্বীপের বিপরীত প্রান্তে। চারদিকে জমাটবাধা অন্ধকার। নোটিলাস থাকলে না-হয় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে নেয়া যেত। এখন তো সেও জ্বলের তলায় চিরনিদ্রায় সমাহত। পাতাল সুড়ঙ্গে একটামাত্র গুম গুম আওয়াজই বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। পাথরের দেয়াল ফুটোফাটা হয়ে গেছে। লষ্ঠনটাকে দাড়ের মাথায় বেঁধে নিয়ে হার্ডিং প্রতিটা ফাটল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। আগুনপাহাড়ের কেন্দ্রস্থলটাকে দেয়ালটা ঘিরে রেখেছে। একা কতটা পুরু তাই বা কে জানে। সাইরাস হার্ডিং বুঝলেন, ক্যাপ্টেন নিমোর কথাই সত্যি। ভয়ঙ্কর বিপদের কেন্দ্রস্থল এটাই বটে।

পরীক্ষা নিরীক্ষা সেরে সাইরাস হার্ডিং বোট নিয়ে ফিরে এলেন।

পরের দিন, আটই জানুয়ারি সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনকে নিয়ে ডেরায় ফিরে এলেন। সবাইকে কাছে ডেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘ডঙ্কার সুড়ঙ্গে ফাটল দেখে এলাম। অভাবনীয় সর্বনাশা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনাই দেখছি না!’ মুহূর্তকাল নীরবতার মধ্যে কাটিয়ে তিনি আবার মুখ খুললেন, ‘এখন বুঝছি, ক্যাপ্টেন নিমো যা কিছু বলে গেছেন তার প্রতিটা বর্ণ সত্যি। আমাকে তখন গোপনে একথাই বলেছিলেন, লিঙ্কলন দ্বীপের চারিদিক বৈশিষ্ট্য

অন্য দশটা দ্বীপের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যে-কোনো মুহূর্তে পুরো দ্বীপটাই সমুদ্রের অতল গহবরে ডুব দেয়ার সম্ভাবনা যথেষ্টই রয়েছে। সমুদ্রের পানি আর আগ্নেয় পর্বতটার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে রেবেছে একটামাত্র পাথরের দেয়াল। পর্বতটার উদয়ে যে প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে চলেছে তার চাপের ফলে যে-কোনো সময় দেয়ালটা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে। তখন সমুদ্রের পানি আগ্নেয় পর্বতটার গায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। অভাবনীয় উত্তাপে যেখানে লাভা টগবগ করে ফুটছে সেখানে জল গিয়ে পড়লে সে কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে তা কল্পনা করা যাচ্ছে না। মুহূর্তে রাশি রাশি বাষ্প সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণ দ্বীপটাকে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় ফেলে দেবে।

দ্বীপবাসীরা এবার বুঝতে পারল, কী ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি তারা দাঁড়িয়ে নিশ্চিত সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই। ডক্টার সুডপ্সের পাথরের দেয়ালটা যতদিন চাপ সহ্য করে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে ততদিনই তাদের পরমায়ু।

দ্বীপবাসীদের দুচোখের কোল বেয়ে পানি বেরিয়ে আসার জোগাড় হল। যে লিঙ্কলন দ্বীপের সঙ্গে তারা আত্মিকসম্বন্ধ গড়ে তুলেছিল, যাকে মনের মতো করে সাজিয়ে তুলেছে, যাকে স্বর্ণপুরী করে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিল, আজ তা সমূলে ধ্বংস হতে চলেছে। এর পরমায়ু কয়েক বছর, কয়েক মাস হতে পারে। আবার কয়েক ঘণ্টা হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তারপরই চিরদিনেই মতো যবনিকা পতন।

২৩ জানুয়ারি লিঙ্কলন দ্বীপে আচমকা ভয়ঙ্কর একটা শব্দ হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বীপটা প্রচণ্ড কঁপে উঠল।

মৃত্যু অবশ্যজ্ঞানী ভেবে দ্বীপবাসীরা ছুটোছুটি করে গুহার বাইরে এসে আতঙ্কে কাঁপতে লাগল। হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করছিল-সে-রকমই একটা ব্যাপার ঘটে গেল বটে। পাহাড়ের চূড়াটা উধাও হয়ে গেছে। প্রায় এক কোটি পাউন্ড ওজনের চূড়াটা হাজারখানেক ফুট ওপর থেকে গড়িয়ে হুড়মুড় করে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। আর অতিকায় হিন্স দ্বিগুণে আগুন আর উষ্ণ বাতাস গলগল করে বেরিয়ে আসছে। কেবল আগুন! আগুন! আগুন! আর তার সঙ্গে প্রবল বেগে পাহাড়ের গা বেয়ে লাভাস্রোত ধেয়ে আসছে। উত্তপ্ত গলিত লাভা খোঁয়াড়ের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই পত্তনলো শরীরের সর্বশক্তি নিয়োগ করে খোঁয়াড়ের বড়া ভেঙে গভীর জঙ্গলের দিকে মরিয়া হয়ে ছুটতে লাগল।

উত্তপ্ত লাভার ছোয়া লাগামাত্র বিশাল বিশাল গাছগুলো দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। দেখতে দেখতে বন-জঙ্গল অসংখ্য পানীয় জলের বর্না নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

পাহাড়ের উপরাংশ থেকে অসংখ্য ছোট বড় উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

লাভার স্রোত গড়াতে গড়াতে হ্রদের দিকে ধাওয়া করলে সাইরাস হার্ডিং অন্ত্রপাতি নিয়ে বাঁধ দেয়ার কাজে লেগে গেলেন। বাঁধ দিয়ে লাভার স্রোতের গতিপথ ঘুরিয়ে হ্রদের পানিতে ফেলার জন্য অমানুষিক কসরত করে চলেছেন। হ্যাঁ, পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হয়েছে। লাভার স্রোত লাফাতে লাফাতে হ্রদের পানিতে এসে পড়তে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তপ্ত গলিত লাভা ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে আসা মাত্র শক্ত পাথরে পরিণত হতে লাগল। গ্রানাইট হ্রদের জল বাষ্পীভূত হয়ে উঠে যেতে দেরি হল না। হ্রদের পানি নিশ্চিহ্ন হল বটে। কিন্তু লাভাস্রোত অনবরত ধেয়ে আসতেই লাগল। একসময় যেখানে অগাধ পানি ছিল এখন সেখানে গড়ে উঠতে লাগল লাভার পাহাড়। পানির সংস্পর্শে এলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে এসে পানি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন! অদ্ভুত হলেও বাস্তবে তাই ঘটল।

লাভার স্রোতকে মোড় ঘুরিয়ে হ্রদের দিকে চালান দেয়ার ফলে কিছুদিনের জন্য অন্তত প্রফেট হাউস, গ্রানাইট হাউস আর নৌকার কারখানাটিকে বাঁচানো সম্ভব হল।

চব্বিশ থেকে ত্রিশ জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বীপবাসীরা একনাগাড়ে ছয়দিন নৌকা তৈরির কাজে লেগে থেকে অন্তত বিশ দিনের কাজ সেঁরে ফেলল। ফলে তারা গ্রানাইট হাউসের সঙ্গে সম্পর্ক হিন্স করে মার্সি নদীর তীরে তাঁবুর তলায় বাস করতে লাগল। মরুভূমি? না, লিঙ্কলন দ্বীপ দেখতে দেখতে শাশানে পরিণত হয়ে গেল।

নৌকা তৈরির কাজ যে গতিতে চলছে তাতে অনুমান করা যাচ্ছে, ২০ ফেব্রুয়ারি এটাকে পানিতে নামানো যাবে। আজ বিশ জানুয়ারি, আরো পুরো একটা মাস একনাগাড়ে মেহনত করলে তবেই অতীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন লিঙ্কলন দ্বীপ এতদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে কি?

আগুনপাহাড়ের অনিবার্য আগুনের শিখায় দ্বীপবাসীরা রাতদিন নৌকা তৈরির কাজে লেগে রইল। ৩ মার্চ দেখা গেল, আর মাত্র দিনদশেক কাজ চালিয়ে যেতে পারলে নৌকাটা তৈরি হয়ে যাবে। দ্বীপবাসীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, এখান থেকে নৌকা নিয়ে তারা প্রথমে ট্যাবর দ্বীপে যাবে।

মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকেই আগুন পাহাড়টা রুদ্ধমূর্তি, একেবারে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। উত্তপ্ত গলিত লাভা এবার বৃষ্টির মতো লক্ষ-কোটি ফোটার আকারে পড়তে লাগল। আগুন আর বাষ্পবৃত্তিতে আকাশ যেন ঢেকে ফেলেছে। এতদিন কোনোরকমে পিতৃদত্ত জীবনটাকে টিকিয়ে রাখা গেছে বটে। ব্যস, এ পর্যন্তই। এবার আর রেহাই নেই। মৃত্যু অবশ্যজ্ঞানী। সময় আর নেই। অসমাপ্ত নৌকাটাকে জলে ভাসানো ছাড়া আর উপায় নেই। আর একটা দিন এ দ্বীপে থাকতে হলে অর্দ্ধদম্ব অবস্থাতেই পরপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ছাড়া গতাত্তর থাকবে না।

সাইরাস হার্ডিং ভাবলেন, ডক্টার সুডপ্সের দেয়ালে নির্ঘাত বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। আর সমুদ্রের পানি ফাটল দিয়ে প্রবল বেগে আগুন পাহাড়ের উদরে ঢুকে যাচ্ছে।

৮ মার্চ হঠাৎ আগুন পাহাড়ের জ্বালামুখ দিয়ে গরম বাষ্প আর আগুন ভয়ানক শব্দে গলগল করে বেরিয়ে আসতে লাগল। আর টুকরো টুকরো অসংখ্য পাথর প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে উঠতে শুরু করল। একসময় আরও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে গেল। আগুন পাহাড়টা টুকরো টুকরো হয়ে সববেগে আকাশের দিকে উঠে গিয়ে পরক্ষণেই সেগুলো সাগরের বুকে এক এক করে পড়তে লাগল। এরকম নরকীয় দৃশ্য চোখে না দেখলে বলে বুঝানো সম্ভব নয়। লিঙ্কলন দ্বীপটা একেবারে বেপাতা হয়ে গেল। সাগরের বুকে আকাশছোয়া ঢেউ ছাড়া সে তল্লাটে আর কিছুই নজরে পড়ল না। তবে অতিকায় একটা পাথরের টুকরো সদন্তে সাগরের বুকে মাথা উঁচিয়ে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করতে লাগল। সেটা ত্রিশ

ফুট লম্বা আর কুড়িফুট চওড়া। সাগরের জল থেকে দশ ফুট ওপরে তার মাথাটা উঁকি দিচ্ছে। পাহাড়ের এ ভগ্নাংশটাই লিঙ্কলন দ্বীপে সাক্ষীস্বরূপ অবস্থান করছে।

লিঙ্কলন দ্বীপের মাত্র সাতটি প্রাণী আজ জীবিত। জন্তু জানোয়ার আর যা-কিছু ছিল সবাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। সাতটা প্রাণীর মধ্যে ছয়জন দ্বীপবাসী আর তাদের প্রিয় শিকারি কুকুর টপই কেবল জীবিত।

দ্বীপবাসীরা টপকে নিয়ে পাহাড়ের ওই অবশিষ্ট ভগ্নাংশটুকুতে আশ্রয় নিয়ে নয়টা দিন কাটাল। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তারা পাথরটার ওপর শরীর এলিয়ে পড়ে রইল। সঙ্গে যা খাবার রয়েছে তা দিয়ে কোনোরকমে দিন দুই চলতে পারে।

২৪ মার্চ। দূরে, বহু দূরে সমুদ্রের বুকে একটা কালো মতো কী যেন আয়ারটন দেখতে পেল। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়েই দেখল। কী ভেবে আচমকা উঠে বসল। এবার কালো বস্তুটার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ইঙ্গিত দিতে লাগল।

কালো বস্তুটার আয়তন ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল। আরও কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হল সেটা একটা পালতোলা জাহাজ। মাস্তুলটা জলতল থেকে অনেকটা উঁচুতে থাকায় এবার সেটাকে স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। আয়ারটন আচমকা যন্ত্রচালিতের মতো খাড়া হয়ে পড়ল। এবার সে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছে, পালতোলা জাহাজটা তাদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তার কাঁপা কাঁপা গলা দিয়ে কোনোরকমে বেরিয়ে এল—‘ডানকান! ডানকান জাহাজ!’ ব্যস, আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সংজ্ঞা হারিয়ে পাথরটার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

দ্বীপবাসীরা এক-এক করে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখল, একটা জাহাজের কেবিনে শুয়ে।

দ্বীপবাসীরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে কী করে জাহাজটার কেবিনে এল?

ডানকান! এটা ডানকান জাহাজই বটে। জাহাজটা চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন গ্রান্টের ছেলে রবার্ট গ্রান্ট। আয়ারটনকে ট্যাবর দ্বীপে ছেড়ে দেবার মুহূর্তে সেও উপস্থিত ছিল। আজ বারো বছর পরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য সে ডানকান জাহাজ নিয়ে হাজির হয়েছে। কিন্তু এটা তো ট্যাবর দ্বীপ নয়, লিঙ্কলন দ্বীপের অংশমাত্র। তাছাড়া ট্যাবর দ্বীপ অখ্যাত অবজ্ঞাত একদ্বীপ। মানচিত্রে খোঁজাখুঁজি করে এর হদিস মেলে না। তবে? রবার্ট গ্রান্ট ট্যাবর দ্বীপে না গিয়ে এখানে আসতে গেল কেন?

সাইরাস হার্ডিংয়ের মুখে সবকিছু শুনে রবার্ট গ্রান্ট তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠল, ‘এ কী কথা বলছেন মি. হার্ডিং!’ এবার কোটের পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে তাঁর সামনে মেলে ধরে বলল, ‘এই তো, আপনাদেরই টাঙানো বিজ্ঞপ্তি। এর মধ্যে কেবল আয়ারটন নয়, আপনাদের সবার খবরই তো রয়েছে।’

সাইরাস হার্ডিংয়ের এবার ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না। পরোপকারব্রতী ক্যাপ্টেন নিমোই বিজ্ঞপ্তিটা টাঙিয়ে রেখে এসেছিলেন।

তাদের অজ্ঞাতে তিনি আরো একটা উপকার করে গেছেন, কারোর মনে তিলমাত্র দ্বিধা রইল না।

দ্বীপবাসীরা পরমপিতার কাছে ক্যাপ্টেন নিমোর অমর আত্মার শান্তির জন্য আবার প্রার্থনা করল।

আয়ারটন এবার ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরার বাস্ফটী সবার সামনে রেখে বলল, ‘এটাকে এবার কোথায় রাখবেন ব্যবস্থা করুন। মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমি কিছুতেই এটাকে হাতছাড়া করি নি।’

আয়ারটনের আচরণে সাইরাস হার্ডিং থেকে গুরু করে রবার্ট গ্রান্ট পর্যন্ত সবাই মুগ্ধ হলেন। আগুনে পুড়ে পুড়ে যেমন সোনা খাঁটি হয় ঠিক তেমনি সংসঙ্গে মোলামেশা করে ও নিরবচ্ছিন্ন দুঃখযন্ত্রণা সয়ে তার চরিত্রের কালিমাটুকু ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। সাইরাস হার্ডিং আকস্মিক উচ্ছ্বাসটুকু সামলাতে না পেরে ‘আয়ারটন! আয়ারটন! বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কয়েক সপ্তাহ অনবরত জাহাজ চালিয়ে রবার্ট গ্রান্ট দ্বীপবাসীদের নিয়ে আমেরিকায় উপস্থিত হল।

ক্যাপ্টেন নিমোর দেয়া হীরা-মুজোগুলো বিক্রি করে আইওয়া রাজ্যে অভিবাস্ত্রীরা আর একটা লিঙ্কলন দ্বীপ গড়ে তুলল। লিঙ্কলন দ্বীপে ছয়জন অধিবাসী আর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেল না। তারা সাইরাস হার্ডিংয়ের নেতৃত্বে নিজ নিজ ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সদ্য প্রতিষ্ঠিত লিঙ্কলন দ্বীপকে সর্বাসুন্দর করে তোলার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে লাগল। আর ওইদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ডেউ ভেদ করে আর সদস্ত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মাত্র অতিকায় পাথর, ক্যাপ্টেন নিমো আর লিঙ্কলন দ্বীপের সমাধির ওপর অবস্থানরত প্রস্তরফলক।

সমাপ্ত

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেস্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ ৮৮০১৭৩৪৫৫৫৫৪১

৮৮০১৯২০৩৯৩৯০০